ষাণ্মাসিক সূচী

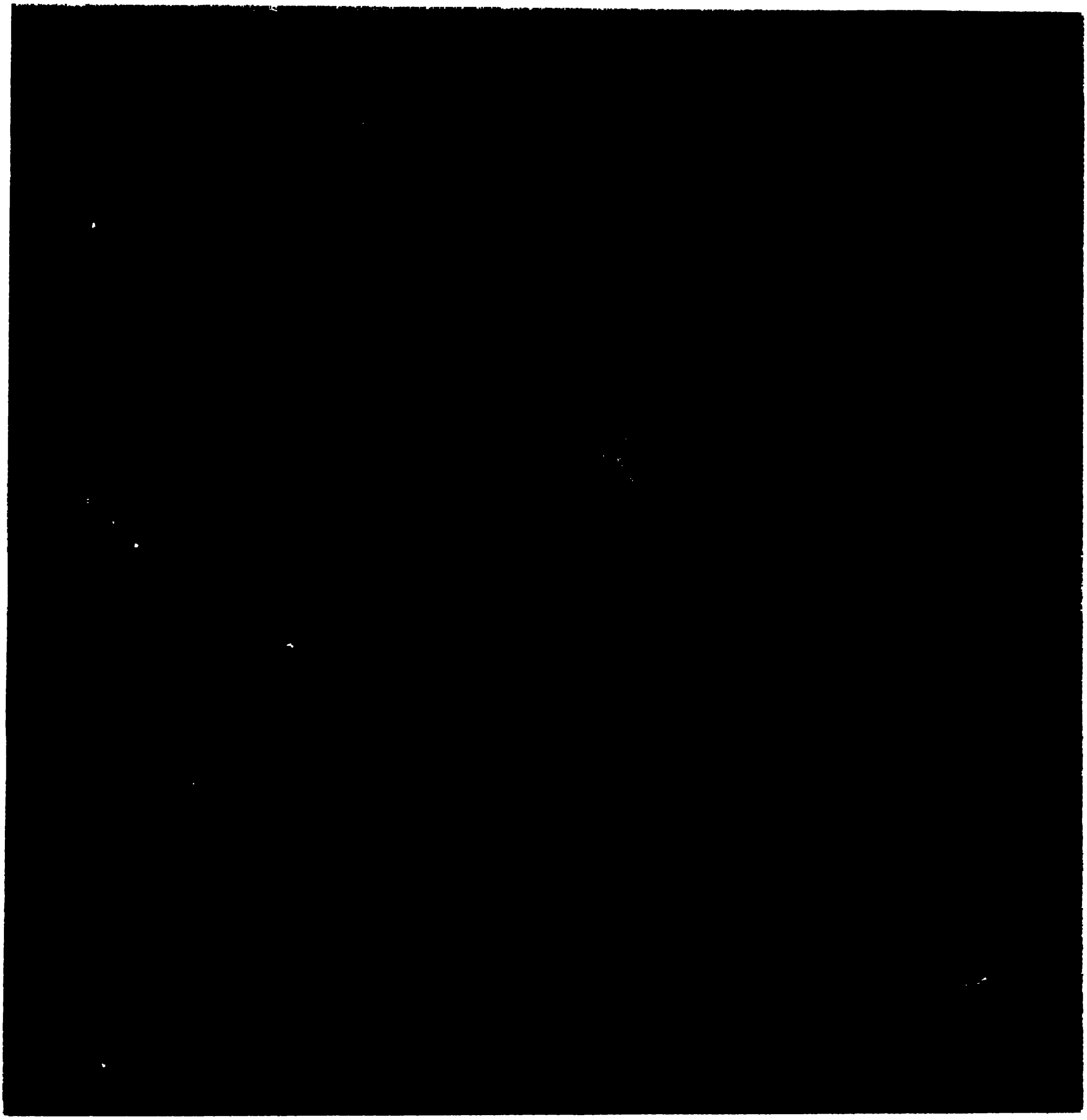
ষাণ্মাসিক সূচী

লেখক-সূচী

ষাণ্মাসিক সূচী

চিত্র সূচী

[কেবল পূর্ণপৃষ্ঠ]



কুমারী

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় অঙ্কিত

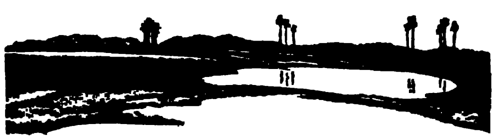
"বিচিত্রা," আষাঢ়, ১৩৩৪

বিচিত্রা

প্রথম বর্ষ, ১ম খণ্ড	আষাঢ়, ১৩৩৪	প্রথম সংখ্যা

বিচিত্রা

ছিলাম যবে মায়ের কোলে,
বাঁশি-বাজানো শিশুরে ছলে
চোরাই করে এনেছ মোরে তুমি,
বিচিত্রা হে, বিচিত্রা,
যেখানে তব রঙের রঙ্গভূমি।
আকাশতলে এলায়ে কেশ
বাজালে বাঁশি চুপে,
সে মায়াসুরে স্বপ্নছবি
জাগিল কত রূপে,
লক্ষ্যহারা মিলিল তারা
রূপকথার বাটে,
পারায়ে গেল ধূলির সীমা
তেপান্তরী মাঠে॥





নারিকেলের ডালের আগে
দুপুরবেলা কাঁপন লাগে,
ইসারা তারি লাগিত মোর প্রাণে
বিচিত্রা, হে বিচিত্রা,
কী বলে তা'রা কে বলো তাহা জানে!
অর্থহারা সুরের দেশে
ফিরালে দিনে দিনে,
ঝলিত' মনে অবাক্ বাণী,
শিশির যেন তৃণে।
প্রভাত-আলো উঠিত কেঁপে
পুলকে কাঁপা বুকে,
কারণহীন নাচিত হিয়া
কারণহীন সুখে॥

জীবনতরী অকূলে ভাসে,
দুঃখে সুখে তুফান ওঠে,
আমারে নিয়ে দিয়েছ তাহে খেয়া,
বিচিত্র হে, বিচিত্র,
কালো গগনে ঢেকেছে ঘন মেঘা।
প্রাণের সেই ঢেউয়ের তালে
বাজালে তুমি বীণ,
হৃদয় মোর জাগায়ে দিয়ে
তারের রিনিঝিন্।
পালের 'পরে দিয়েছ বেগে
সুরের হাওয়া তুলে,
সহসা বেয়ে নিয়েছ তরী
অপারের কূলে॥

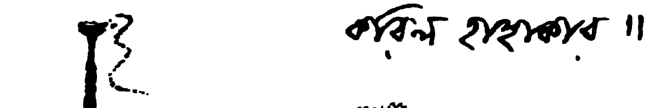




চৈত্রমাসে শুক্লনিশা
জুঁই বেলির গন্ধে মিশা
জলের ধ্বনি তটের কোলে কোলে
বিচিত্রা, হে বিচিত্রা,
অনিদ্রারে আকুল করি তোলে।
যৌবনে সে উতলরাতে
করুণ কার চোখে
মোহিনী রাগে মিলাতে মীড়
চাঁদের ক্ষীণালোকে।
কাহার ভীরু হাসির পরে
মধুর দ্বিধা ভরি'
সরমে-ছোঁওয়া নয়নজল
কাঁপাতে থরথরি?



হঠাৎ বজ্র ঝলকিয়া উঠি'
ছিন্ন করি' ফেলেছ টুটি'
নিশীথিনীর মৌন যবনিকা,
বিচিত্রা হে, বিচিত্রা,
হেনেছ তারে বজ্রানল-শিখা।
গভীর রবে হাঁকিয়া গেছ
"অলস থেকো না গো!"
নিবিড় রাতে দিয়েছ নাড়া,
বলেছ "জাগো, জাগো।"
বাসরঘরে নিবালে দীপ,
উড়ালে ফুলহার,
ধূলি-আঁচল দুলায়ে ধরা
করিল হাহাকার ॥



বুকের শিরা ছিন্ন করে
ভীষণ পূজা করেছি তোরে,
কখনো পূজা শোভন শতদলে
বিচিত্রা, হে বিচিত্রা,
হাসিতে কভু, কখনো আঁখিজলে।
ফসল যত উঠেছে ফলি
বক্ষ বিভেদিয়া
কণায়-কণায় তোমারি পায়
দিয়েছি নিবেদিয়া।
তবুও কেন এনেছ ডালি
দিনের অবসানে?
নিঃশেষিয়া নিবে কি ভরি
নিঃস্ব-করা দানে? ॥

৭ বৈশাখ
১৩৩৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের কথা

এই ক্ষুদ্র নিবন্ধের নাম 'আমাদের কথা' না হলেই বোধ হয় ভাল ছিল, কারণ এ নিবন্ধকে আশ্রয় করে আমাদের বিশেষ কোনো কথাই বল্‌বার নেই। প্রথম যখন কোনো মাসিক পত্র প্রকাশিত হয় তখন সেই নব অভ্যুদয়ের কারণ এবং ক্রিয়া সম্বন্ধে সামান্য যা-হয়-কিছু জ্ঞাপন করার প্রথা আবহমান কাল চলে আস্‌ছে। সেই বহু-আচরিত প্রথার অনতিবর্ত্তনীয় প্রভাব থেকে আমরা পরিত্রাণ পেলাম না।

ভূমিকা লেখার মূলে মানুষের স্বকৃত কর্ম্মের কৈফিয়ৎ দেওয়ার স্বাভাবিক আগ্রহ নিহিত আছে। মানব-প্রকৃতি সাধারণতঃ এমন জটিল যে, কোনো একটা নূতন অনুষ্ঠান আরম্ভ করবার আগে প্রথমেই মনে হয় তার একটা পরিচয় দেওয়া একান্ত আবশ্যক। অথচ অনেক সময়ে দেখা গেছে যে, সেই পরিচয় দেওয়ার ফলেই ভবিষ্যতে একটা অ-বোঝাবুঝির উৎপাত উপস্থিত হয়েছে।

বিশ্ব-প্রকৃতির সম্পর্কে এই কৈফিয়ৎ দেওয়া-নেওয়ার কোনো বালাই নেই। আষাঢ় মাসের আকাশে কোনো দিন মেঘ আসে, কোনো দিন বা আসে না। কোনো দিনের মেঘে বৃষ্টিপাত হয়, চাষীরা মাঠে উপস্থিত হয়ে রোপণ-বপনের কাজ আরম্ভ করে, অন্য দিকে পুষ্পোদ্যানে যূথিকা-জালক বর্ষাগ্রবিন্দুতে সজল হয়ে ওঠে। কোনো দিন মেঘের লীলা গুরু-গুরু ডমরু-ধ্বনিতেই শেষ হয়; সে-দিন গৃহ-শিখরে-শিখরে ভবন-শিখীরা বিচিত্র ভঙ্গীতে পুচ্ছোৎক্ষেপসহ নৃত্য আরম্ভ করে। কোনো দিন বা বর্ষণক্লান্ত মেঘের শ্যামলিমায় অপূর্ব্ব বর্ণে রামধনু ফুটে ওঠে; তা' দেখে সৌধ-বাতায়নে চকিত-হরিণী-নেত্রার মুগ্ধ-দৃষ্টি স্থির হয়ে আসে। কিন্তু মেঘের এই বিচিত্র অসম আচরণের জন্য কোথাও কোনো দিন কোনো কৈফিয়ৎ তলব হয় না। তার জলে মানুষের মাঠ সরস হয়, তার রূপে মানুষের মন শ্যামল হয়।

বৈচিত্র্যের এই অসমতার মধ্যেই অফুরন্ত রসোপলব্ধির সৃষ্টি। দীর্ঘ-পথ যখন ঋজু হয়ে চলে তখন তার অনেকখানি পরিচয় একসঙ্গে জান্‌তে পারায় পথিক-চিত্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ে; দক্ষিণে বামে যে-দিকে-হয় ফিরে একটা যা-হয়-কোনো অজানার মধ্যে প্রবেশ কর্‌বার জন্য সে ব্যগ্র হয়ে ওঠে। পরিচয়ের উৎপীড়নে তখন সে এতই পীড়িত! রসলীলার ধারা ধরা-বাঁধা পাথর-বাঁধানো ঋজু-পথে চালালে চল্‌বে কেন?

বৈচিত্র্য অনেক সময়ে নিজের স্বরূপ সাধারণ পরিচ্ছদে ঢেকে রাখে। সূর্য্য-রশ্মি সাধারণতঃ শাদা; কিন্তু কাঁচ-কলমের মধ্যে প্রবেশ কর্‌লে তা একেবারে ভেঙ্গে-চুরে

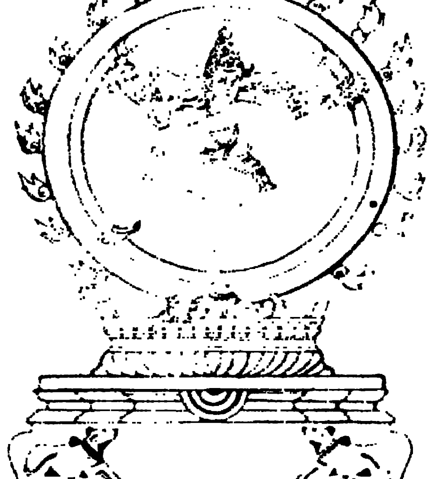
বার হয় বিচিত্র সপ্ত বর্ণে। মানুষের জীবন, যা এমনি অনেক সময়ে বৈচিত্র্যহীন বলে মনে হয়, একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যায় তা বিবিধ রসসম্ভারে বিচিত্র। কল্পনা এবং বাস্তবের উভয় লোকে 'বিচিত্রা' কাঁচ কলমের কাজ করলে তার অস্তিত্ব সার্থক হবে।

আজকালকার তথা-কথিত স্বাধীনতা-প্রিয়তার যুগে সংযমের কথা তুলতে ভয় হয়; কিন্তু শক্তির তথ্য যাঁরা জানেন, সংযমের মহিমা তাঁদের অবিদিত নেই। খাপের মধ্যে তলোয়ারের মত সংযমেরই আশ্রয়ে শক্তির নিবাস। এ কথা সাহিত্য বিষয়েও সম্পূর্ণরূপে খাটে। স্বাধীনতা এবং স্বেচ্ছাচারিতার মধ্যে যে সূক্ষ্ম সীমান্ত-রেখা আছে, সাহিত্যিকের সতর্ক-দৃষ্টি থেকে তা লুপ্ত হওয়া উচিত নয়। জল স্বেচ্ছা-ক্রমে বইলে তার নাম হয় বন্যা; তট-সীমার মধ্যে স্বাধীন স্রোতে বইলে তাকে বলে নদী। সাহিত্য-সাধনায় শক্তি ও সংযম সম্বন্ধে জাগ্রত অথচ উদার দৃষ্টি রাখতে পারলে 'বিচিত্রা'র একটা অভিপ্রায় সফল হবে।

'বিচিত্রা'র যাত্রারম্ভ হ'ল আজ আষাঢ়ের প্রথম দিবসে---মন্দাক্রান্তা ছন্দে। অ-সঙ্কল্পিত সহজ-সৌভাগ্যে এর গতি অভিসূচিত হয়েছে ঋতুরঙ্গশালায় নটরাজের বিচিত্র নৃত্য-লীলায়। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, গ্রীষ্মের অগ্নিকণা, বর্ষার জলবিন্দু, শরতের নির্ম্মলতা, হেমন্তের কুজ্ঝটিকা, শীতের নিবিড়তা এবং বসন্তের পুষ্পোৎসব 'বিচিত্রা'কে বর্ষে বর্ষে বিচিত্র করুক।



বিচিত্রা



আষাঢ়, ১৩৩৬



“নটরাজ”-রচনা-নিরত রবীন্দ্রনাথ

শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোমের সংগ্রহে

নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা

নৃত্য গীত ও আবৃত্তি যোগে "নটরাজ" দোলপূর্ণিমার রাত্রে শান্তিনিকেতনে অভিনীত হইয়াছিল।

নটরাজের তাণ্ডবে তাঁহার এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক আবর্তিত হইয়া প্রকাশ পায়, তাঁহার অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশে রসলোক উন্মথিত হইতে থাকে। অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যছন্দে যোগ দিতে পারিলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়। "নটরাজ" পালাগানের এই মর্ম।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর


ঋতুরঙ্গশালা

উদ্বোধন

মন্দিরার মন্দ্র তব বক্ষে আজি বাজে, নটরাজ,
নৃত্যমদে মত্ত করে, ভাঙে চিন্তা, ভাঙে শঙ্কা লাজ,
তুচ্ছ করে সম্মানের অভিমান, চিত্ত টেনে আনে
বিশ্বের প্রাঙ্গণতলে তব নৃত্যচ্ছন্দের সন্ধানে।

মুক্তির প্রয়াসী আমি, শাস্ত্রের জটিল তর্কজালে
যৌবন হয়েছে বন্দী বাক্যের দুর্গের অন্তরালে ;
স্বচ্ছ আলোকের পথ রুদ্ধ করি ক্ষুব্ধ শুষ্ক ধূলি
আবর্তিয়া উঠে প্রাণে অন্ধতার জয়ধ্বজা তুলি'
চতুর্দ্দিকে। নটরাজ, তুমি আজ করগো উদ্ধার
দুঃসাহসী যৌবনেরে, পদে পদে পড়ুক্ তোমার
চঞ্চল চরণ ভঙ্গী, রঙ্গেশ্বর, সকল বন্ধনে
উত্তাল নৃত্যের বেগে,—যে-নৃত্যের অশান্ত স্পন্দনে
ধূলিবন্দিশালা হতে মুক্তি পায় নব-শষ্পদল ;
পুলকে কম্পিত হয় প্রাণের দুরন্ত কৌতূহল,

আপনারে সন্ধানিতে ছুটে যায় দূর কাল পানে,
দুর্গম দেশের পথে, জন্ম মরণের তালে তানে,
সৃষ্টির রহস্যদ্বারে নৃত্যের আঘাত নিত্য হানে ;
যে-নৃত্যের আন্দোলনে মরুর পঞ্জরে কম্প আনে,
ক্ষুব্ধ হয় শুষ্কতার সজ্জাহীন লজ্জাহীন শাদা,
উচ্ছিন্ন করিতে চায় জড়ত্বের রুদ্ধ-বাক্‌ বাধা,
বন্ধ্যতার অন্ধ দুঃশাসন ; শ্যামলের সাধনাতে
দীক্ষা ভিক্ষা করে মরু তব পায়ে; যে-নৃত্য আঘাতে
বহ্নিবাষ্প সরোবরে ঊর্ম্মি জাগে প্রচণ্ড চঞ্চল,
অতল আবর্ত্তবক্ষে গ্রহ-নক্ষত্রের শতদল
প্রস্ফুটিয়া স্ফুরে নিত্যকাল ; ধূমকেতু অকস্মাৎ
উড়ায় উত্তরী হাস্যবেগে, করে ক্ষিপ্র পদ-পাত
তোমার ডম্বরুতালে, পূজা-নৃত্য করি দেয় সারা
সূর্য্যের মন্দির-সিংহদ্বারে, চলে যায় লক্ষ্যহারা
গৃহশূন্য পান্থ উদাসীন।

নটরাজ, আমি তব
কবি-শিষ্য, নাটের অঙ্গনে তব মুক্তি-মন্ত্র ল'ব।
তোমার তাণ্ডব-তালে কর্ম্মের বন্ধন-গ্রন্থিগুলি
ছন্দবেগে স্পন্দমান পাকে পাকে সদ্য যাবে খুলি ;
সর্ব্ব অমঙ্গল-সর্প হীনদর্প অবনম্র ফণা
আন্দোলিবে শান্ত-লয়ে।

প্রভু, এই আমার বন্দনা

নৃত্যগানে অর্পিব চরণতলে, তুমি মোর গুরু,
আজিকে আনন্দে ভয়ে বক্ষ মোর করে দুরু দুরু।
পূর্ণচন্দ্রে লিপি তব, হে পূর্ণ, পাঠালে নিমন্ত্রণে
বসন্তদোলের নৃত্যে, দক্ষিণ-বায়ুর আলিঙ্গনে,
মল্লিকার গন্ধোল্লাসে, কিংশুকের দীপ্ত রক্তাংশুকে,
বকুলের মত্ততায়, অশোকের দোদুল কৌতুকে,
বেণুবনবীথিকার নিরন্তর মর্ম্মরে কম্পনে
ইঙ্গিতে ভঙ্গীতে, আম্রমঞ্জরীর সর্ব্বত্যাগপণে,
পলাশের গরিমায়। অবসাদে যেন অন্যমনে
তাল ভঙ্গ নাহি করি, তব নামে আমার আহ্বান
জড়ের স্তব্ধতা ভেদি' উৎসারিত ক'রে দিক্ গান!
আমার আহ্বান যেন অভ্রভেদী তব জটা হ'তে
উত্তারি' আনিতে পারে নির্ঝরিত রস-সুধা স্রোতে
ধরিত্রীর তপ্ত বক্ষে নৃত্যচ্ছন্দ-মন্দাকিনী ধারা,
ভস্ম যেন অগ্নি হয়, প্রাণ যেন পায় প্রাণ-হারা॥



নৃত্য

গান

নৃত্যের তালে তালে, নটরাজ,
ঘুচাও সকল বন্ধ হে।
সুপ্তি ভাঙাও, চিত্তে জাগাও
মুক্ত সুরের ছন্দ হে॥

তোমার চরণ পবন পরশে
সরস্বতীর মানস সরসে
যুগে যুগে কালে কালে,
সুরে সুরে তালে তালে,
ঢেউ তুলে দাও মাতিয়ে জাগাও
অমল কমল গন্ধ হে ॥

নৃত্যে তোমার মুক্তির রূপ,
নৃত্যে তোমার মায়া।
বিশ্বতনুতে অণুতে অণুতে
কাঁপে নৃত্যের ছায়া।

তোমার বিশ্ব নাচের দোলায়
বাঁধন পরায়, বাঁধন খোলায়,
যুগে যুগে কালে কালে,
সুরে সুরে তালে তালে ;
অন্ত কে তার সন্ধান পায়
ভাবিতে লাগায় ধন্দ হে ॥

নৃত্যের বশে সুন্দর হ'ল
বিদ্রোহী পরমাণু ;
পদযুগ ঘিরে জ্যোতি-মঞ্জীরে
বাজিল চন্দ্র ভানু।

তব নৃত্যের প্রাণ বেদনায়
বিবশ বিশ্ব জাগে চেতনায়,

যুগে যুগে কালে কালে
সুরে সুরে তালে তালে,
সুখে দুখে হয় তরঙ্গময়
তোমার পরমানন্দ হে ॥

মোর সংসারে তাণ্ডব তব,
কম্পিত জটাজালে।
লোকে লোকে ঘুরে এসেছি তোমার
নাচের ঘূর্ণি তালে।

ওগো সন্ন্যাসী, ওগো সুন্দর,
ওগো শঙ্কর, হে ভয়ঙ্কর,
যুগে যুগে কালে কালে,
সুরে সুরে তালে তালে,
জীবন-মরণ নাচের ডমরু
বাজাও জলদ-মন্দ্র হে ॥

মুক্তি-তত্ত্ব

মুক্তি-তত্ত্ব শুন্‌তে ফিরিস্‌
তত্ত্ব-শিরোমণির পিছে ?
হায়রে মিছে, হায়রে মিছে !

মুক্ত যিনি দেখ্‌না তাঁরে,
আয় চ'লে তাঁর আপন দ্বারে,
তাঁর বাণী কি শুক্‌নো পাতায়
হল্‌দে রঙে লেখেন তিনি ?

মরা ডালের ঝরা ফুলের
সাধন কি তাঁর মুক্তি-কূলের ?
মুক্তি কি পণ্ডিতের হাটে
উক্তি-রাশির বিকি-কিনি ?

এই নেমেছে চাঁদের হাসি
এই খানে আয় মিল্‌বি আসি,
বীণার তারে তারণ-মন্ত্র
শিখে নে তোর কবির কাছে।

আমি নটরাজের চেলা,
চিত্তাকাশে দেখ্‌চি খেলা,
বাঁধন-খোলার শিখ্‌চি সাধন
মহাকালের বিপুল নাচে।

দেখ্‌চি, ও যা'র অসীম বিত্ত
সুন্দর তার ত্যাগের নৃত্য,
আপ্‌নাকে তার হারিয়ে প্রকাশ
আপ্‌নাতে যার আপ্‌নি আছে।

যে-নটরাজ নাচের খেলায়
ভিতরকে তার বাইরে ফেলায়
কবির বাণী অবাক্ মানি
তা'রি নাচের প্রসাদ যাচে।

শুন্‌বিরে আয়, কবির কাছে
তরুর মুক্তি ফুলের নাচে,
নদীর মুক্তি আত্মহারা
নৃত্যধারার তালে তালে।

রবির মুক্তি দেখ্ না চেয়ে
আলোক-জাগার নাচন গেয়ে,
তারার নৃত্যে শূন্য গগন
মুক্তি যে পায় কালে কালে।

প্রাণের মুক্তি মৃত্যুরথে
নূতন প্রাণের যাত্রা-পথে,
জ্ঞানের মুক্তি সত্য-সূতার
　　নিত্য-বোনা চিন্তাজালে।

আয় তবে আয় কবির সাথে
মুক্তি-দোলের শুক্লরাতে,
জ্বল্‌ল আলো, বাজ্‌ল মৃদঙ্‌
　　নটরাজের নাট্যশালে ॥

ঋতু-নৃত্য

বৈশাখ

ধ্যান-নিমগ্ন নীরব নগ্ন
নিশ্চল তব চিত্ত ;
নিঃস্ব গগনে বিশ্ব ভুবনে
নিঃশেষ সব বিত্ত।

রসহীন তরু, নিৰ্জ্জীব মরু,
পবনে গর্জ্জে রুদ্র ডমরু,
ঐ চারিধার করে হাহাকার
ধরা-ভাণ্ডার রিক্ত॥

তব তপ-তাপে হের' সবে কাঁপে,
দেব-লোক হ'ল ক্লান্ত।
ইন্দ্রের মেঘ, নাহি তার বেগ,
বরুণ করুণ শান্ত।

দুর্দ্দিনে আনে নির্দ্দয় বায়ু,
সংহার করে কাননের আয়ু,
ভয় হয় দেখি নিখিল হবে কি
জড়দানবের ভৃত্য॥

জাগো ফুলে ফলে নব তৃণদলে
তাপস, লোচন মেল' হে।
জাগো মানবের আশায় ভাষায়,
নাচের চরণ ফেল' হে।

জাগো ধনে ধানে, জাগো গানে গানে,
জাগো সংগ্রামে, জাগো সন্ধানে,
আশ্বাস-হারা উদাস পরাণে
জাগাও উদার নৃত্য॥

ভুলেছে ছন্দ, ভালোয় মন্দ
একাকার তাই হায় রে।
কদর্য্য তাই করিছে বড়াই,
ধরণী লজ্জা পায় রে।

পিনাকে তোমার দাও টঙ্কার,
ভীষণে মধুরে দিক্ ঝঙ্কার,
ধূলায় মিশাক্ যা কিছু ধূলার,
জয়ী হোক্ যাহা নিত্য॥





বৈশাখ-আবাহন

গান

এসো, এসো, এসো, হে বৈশাখ !
তাপস নিঃশ্বাস বায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে,
বৎসরের আবর্জ্জনা দূর হয়ে যাক্।

যাক্ পুরাতন স্মৃতি, যাক্ ভুলে যাওয়া গীতি,
অশ্রুবাষ্প সুদূরে মিলাক্।

মুছে যাক্ সব গ্লানি, ঘুচে যাক্ জরা,
অগ্নিস্নানে দেহে প্রাণে শুচি হোক্ ধরা।

রসের আবেশ রাশি শুষ্ক করি দাও আসি',
আনো, আনো, আনো তব প্রলয়ের শাঁখ,
মায়ার কুজ্‌ঝটি-জাল যাক্ দূরে যাক্ ॥



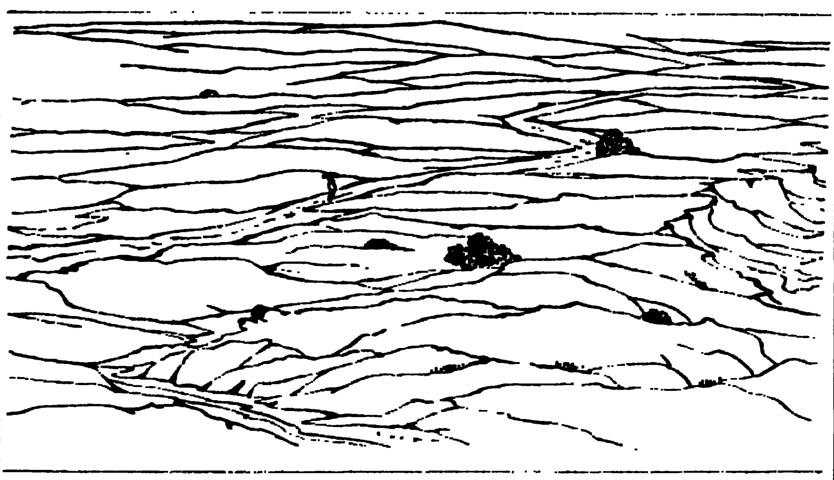
ব্যঞ্জনা

শুনিতে কি পাস্
এই যে শ্বসিছে রুদ্র শূন্যে শূন্যে সন্তপ্ত নিঃশ্বাস
এরি মাঝে দূরে বাজে চঞ্চলের চকিত খঞ্জনী,
মাধুরীর মঞ্জীরের মৃদুমন্দ গুঞ্জরিত ধ্বনি ?
রৌদ্র-দগ্ধ তপস্যার মৌনস্তব্ধ অলক্ষ্য আড়ালে
স্বপ্নে-রচা অর্চ্চনার থালে
অর্ঘ্য-মাল্য সাঙ্গ হয় সঙ্গোপনে সুন্দরের লাগি ।
মগ্ন যেথা ধেয়ানের সর্ব্বশূন্য গহনে বৈরাগী,
সেথা কে বুভুক্ষু আসে ভিক্ষা-অন্বেষণে ;
জীর্ণ পর্ণ-শয্যাপরে একা রহে জাগি'
কঠিনের শুষ্ক প্রাণে কোমলের পদস্পর্শ মাগি' ॥

তাপিত আকাশে
হঠাৎ নীরবে চলে' আসে
একটি করুণ ক্ষীণ স্নিগ্ধ বায়ুধারা,
কে অভিসারিণী যেন পথে এসে পায় না কিনারা।

অকস্মাৎ কোমলের কমলমালার স্পর্শ লেগে
শান্তের চিত্তের প্রান্ত অহেতু উদ্বেগে
ভ্রূকুটিয়া ওঠে কালো মেঘে ;
বিদ্যুৎ বিচ্ছুরি' উঠে দিগন্তের ভালে,
রোমাঞ্চ-কম্পন লাগে অশ্বত্থের ত্রস্ত ডালে ডালে ;
মুহূর্ত্তে অম্বর বক্ষে উলঙ্গিনী শ্যামা
বাজায় বৈশাখী-সন্ধ্যা-ঝঞ্ঝার দামামা,
দিগ্বিদিকে নৃত্য করে দুর্ব্বার ক্রন্দন,
ছিন্ন ছিন্ন হয়ে যায় ঔদাসীন্য কঠোর বন্ধন ॥





মাধুরীর ধ্যান

গান



মধ্যদিনে যবে গান
বন্ধ করে পাখী,
হে রাখাল, বেণু তব
বাজাও একাকী।

শান্ত প্রান্তরের কোণে
রুদ্র বসি তাই শোনে,
মধুরের ধ্যানাবেশে
স্বপ্নমগ্ন আঁখি ;
হে রাখাল, বেণু যবে
বাজাও একাকী ॥



সহসা উচ্ছ্বসি উঠে
ভরিয়া আকাশ
তৃষাতপ্ত বিরহের
নিরুদ্ধ নিঃশ্বাস।

অম্বর প্রান্তের দূরে
ডম্বরু গম্ভীর সুরে
জাগায় বিদ্যুৎ ছন্দে
আসন্ন বৈশাখী।
হে রাখাল, বেণু তব
বাজাও একাকী॥





প্রত্যাশা

গান

তপের তাপের বাঁধন কাটুক্
রসের বর্ষণে,
হৃদয় আমার, শ্যামল বঁধুর
করুণ স্পর্শনে ॥

অঝোর-ঝরণ শ্রাবণ জলে,
তিমির-মেদুর বনাঞ্চলে
ফুটুক্ সোনার কদম্ব ফুল
নিবিড় হর্ষণে ॥

ভরুক্ গগন, ভরুক্ কানন,
ভরুক্ নিখিল ধরা,
দেখুক্ ভুবন মিলন স্বপন
মধুর বেদন ভরা।



পরাণ-ভরানো ঘন ছায়াজাল
বাহির আকাশ করুক্ আড়াল,
নয়ন ভুলুক্, বিজুলি ঝলুক্
পরম-দর্শনে ॥

আষাঢ়

ওগো সন্ন্যাসী, কী গান ঘনালো মনে।
গুরু গুরু গুরু নাচের ডমরু
বাজিলো ক্ষণে ক্ষণে ॥

তোমার ললাটে জটিল জটার ভার
নেমে নেমে আজি পড়িছে বারম্বার,
বাদল আঁধার মাতালো তোমার হিয়া,
বাঁকা বিদ্যুৎ চোখে উঠে চমকিয়া।

চির জনমের শ্যামলী তোমার প্রিয়া
আজি এ বিরহ-দীপন-দীপিকা
পাঠালো তোমারে এ কোন্ লিপিকা,
লিখিল নিখিল-আঁখির কাজল দিয়া,
চির-জনমের শ্যামলী তোমার প্রিয়া ॥





মনে পড়িল কি ঘন কালো এলোচুলে
অগুরু ধূপের গন্ধ ?
শিখি-পুচ্ছের পাখা সাথে দুলে দুলে
কাঁকন-দোলন ছন্দ ?

মনে পড়িল কি নীল নদীজলে
ঘন শ্রাবণের ছায়া ছলছলে,
মিলি মিলি সেই জল-কলকলে
কলালাপ মৃদুমন্দ ;

থকিত-পায়ের চলা দ্বিধাহত,
ভীরু নয়নের পল্লব নত,
না-বলা কথার আভাসের মত
নীলাম্বরের প্রান্ত ?

মনে পড়িছে কি কাঁখে তুলে ঝারি
তরু তলে তলে ঢেলে চলে বারি,
সেচন-শিথিল বাহু দুটি তা'রি
ব্যথায় আলসে ক্লান্ত ?

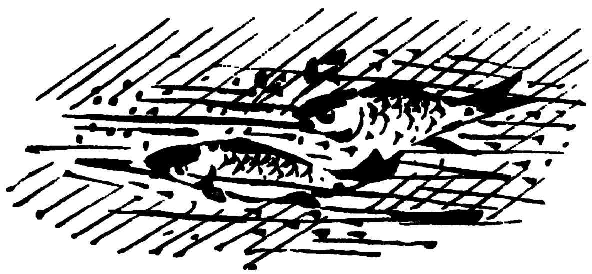


ওগো সন্ন্যাসী, পথ যায় ভাসি'
ঝর ঝর ধারাজলে—
তমাল-বনের শ্যামল তিমির তলে।
দ্যুলোক ভূলোকে দূরে দূরে বলাবলি
চির-বিরহের কথা,

বিরহিনী তার নত আঁখি ছলছলি'
নীপ অঞ্জলি রচে বসি গৃহকোণে,
ঢেলে ঢেলে দেয় তোমারে স্মরিয়া মনে,
ঢেলে দেয় ব্যাকুলতা।

কভু বাতায়নে অকারণে বেলা বাহি'
আতুর নয়নে দু'হাতে আঁচল ঝাঁপে।
তুমি চিত্তের অন্তরে অবগাহি'
খুঁজিয়া দেখিছ ধৈরজ নাহি নাহি,
মল্লার রাগে গর্জ্জিয়া ওঠ গাহি,
বক্ষে তোমার অক্ষের মালা কাঁপে।





যাক্ যাক্ তব মন গ'লে গ'লে যাক্,
গান ভেসে গিয়ে দূরে চ'লে চ'লে যাক্,
বেদনার ধারা দুর্দ্দাম দিশাহারা
দুখ-দুর্দ্দিনে দুই কূল তার ছাপে।

কদম্ববন চঞ্চল ওঠে দুলি,
সেই মতো তব কম্পিত বাহু তুলি'
টলমল নাচে নাচো সংসার ভুলি,
আজ, সন্ন্যাসী, কাজ নাই জপে জাপে ॥





লীলা

গান

গগনে গগনে আপনার মনে
কী খেলা তব।
তুমি কত বেশে নিমেষে নিমেষে
নিতুই নব ॥

জটার গভীরে লুকালে রবিরে
ছায়াপটে আঁকো এ কোন্ ছবিরে!
মেঘমল্লারে কী বলো আমারে
কেমনে ক'ব ॥

বৈশাখী ঝড়ে সে দিনের সেই
অট্টহাসি
গুরু গুরু সুরে কোন্ দূরে দূরে
যায় যে ভাসি।

সে সোনার আলো শ্যামলে মিশালো,
শ্বেত উত্তরী আজ কেন কালো?
লুকালে ছায়ায় মেঘের মায়ায়
কী বৈভব ॥

শ্রাবণ-বিদায়

যায়রে শ্রাবণ-কবি রস-বর্ষা ক্ষান্ত করি তা'র,
কদম্বের রেণুপুঞ্জে পদে পদে কুঞ্জবীথিকার
ছায়াঞ্চল ভরি দিলো। জানি, রেখে গেলো তার দান
বনের মর্ম্মের মাঝে; দিয়ে গেলো অভিষেকস্নান
সুপ্রসন্ন আলোকেরে; মহেন্দ্রের অদৃশ্য বেদীতে
ভরি' গেলো অর্ঘ্যপাত্র বেদনার উৎসর্গ-অমৃতে;
সলিল-গণ্ডূষ দিতে তটিনী সাগর-তীর্থে চলে,
অঞ্জলি ভরিল তা'রি; ধরার নিগূঢ় বক্ষতলে
রেখে গেলো তৃষ্ণার সম্বল; অগ্নিতীক্ষ্ণ বজ্রবাণ
দিগন্তের তূণ ভরি একান্তে করিয়া গেলো দান
কাল বৈশাখীর তরে; নিজ হস্তে সর্ব্ব ম্লানতার
চিহ্ন মুছে দিয়ে গেলো। আজ শুধু রহিল তাহার
রিক্তবৃষ্টি জ্যোতিঃশুভ্র মেঘে মেঘে মুক্তির লিখন,
আপন পূর্ণতাখানি নিখিলে করিল সমর্পণ ॥



শান্তি

গান

পাগল আজি আগল খোলে
বিদায় রজনীতে,
চরণে ওর বাঁধিবি ডোর,
কী আশা তোর চিতে ?

গগনে তার মেঘ-দুয়ার ঝেঁপে,
বুকেরি ধন বুকেতে ছিল চেপে,
হিম হাওয়ায় গেলো সে দ্বার কেঁপে,
এসেছে ডাক ভোরের রাগিণীতে ॥

শীতল হোক্ বিমল হোক্ প্রাণ,
হৃদয়ে শোক রাখুক্ তার দান।

যা ছিল' ঘিরে শূন্যে সে মিলালো,
সে ফাঁক দিয়ে আসুক্ তবে আলো,
বিজনে বসি' পূজাঞ্জলি ঢালো
শিশিরে ভরা শিউলি-ঝরা গীতে ॥





শেষ মিনতি

গান

কেন পান্থ এ চঞ্চলতা ?
শূন্য গগনে পাও কার বারতা ?
নয়ন অতন্দ্র প্রতীক্ষারত,
কেন উদ্‌ভ্রান্ত অশান্ত-মতো,
কুন্তলপুঞ্জ অযত্ন-নত,
ক্লান্ত তড়িৎ-বধূ তন্দ্রাগতা।



ধৈর্য্য ধরো, সখা, ধৈর্য্য ধরো,
দুঃখে মাধুরী হোক্ মধুরতর ;
হেরো গন্ধ নিবেদন-বেদন সুন্দর
মল্লিকা চরণতলে প্রণতা ॥



শরৎ

ধ্বনিল গগনে আকাশ-বাণীর বীণ্,
শিশির-বাতাসে দূর দূরে ডাক দিলো কে ?
আয় সুলগনে, আজ পথিকের দিন,
এঁকে নে ললাট জয়-যাত্রার তিলকে।

গেলো খুলি গেলো মেঘের ছায়ার দ্বার,
দিকে দিকে ঘোচে কালো আবরণ-ভার,
তরুণ আলোক মুকুট পরেছে তা'র,
বিজয়-শঙ্খ বেজে ওঠে তাই ত্রিলোকে ॥

শরৎ এনেছে অপরূপ রূপ-কথা
নিত্যকালের বালক-বীরের মানসে।
নবীন রক্তে জাগায় চঞ্চলতা,
বলে, "চলো চলো অশ্ব তোমার আনো' সে।

ধেয়ে যেতে হবে দুস্তর প্রান্তরে,
বন্দিনী কোন্ রাজকন্যার তরে,
মায়াজাল ভেদি' চলো সে রুদ্ধ ঘরে,
লও কার্ম্মুক, দানবের বুক হানো' সে ॥"

ওরে শারদার জয়মন্ত্রের গুণে
বীর-গৌরবে পার হতে হবে সাগরে।
ইন্দ্রের শর ভরি নিতে হবে তূণে
রাক্ষসপুরী জিনে নিতে হবে, জাগো রে।

"দেবী শারদার যে প্রসাদ শিরে লয়ি'
দেব-সেনাপতি কুমার দৈত্য-জয়ী,
সে প্রসাদ খানি দাওগো অমৃতময়ী"
এই মহা-বর চরণে তাঁহার মাগো রে॥

আজি আশ্বিনে স্বচ্ছ বিমল প্রাতে
শুভ্রের পায়ে অম্লান মনে নম' রে।
স্বর্গের রাখী বাঁধো দক্ষিণ হাতে
আঁধারের সাথে আলোকের মহাসমরে।

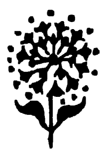
মেঘ-বিমুক্ত শরতের নীলাকাশ
ভুবনে ভুবনে ঘোষিল এ আশ্বাস :—
"হবে বিলুপ্ত মলিনের নাগপাশ,
জয়ী হ'বে রবি, মরিবে মরিবে তম রে"॥



শরতের ধ্যান

গান

আলোর অমল কমলখানি
কে ফুটালে,
নীল আকাশের ঘুম ছুটালে ॥



আমার মনের ভাবনা গুলি
বাহির হোলো পাখা তুলি,
ঐ কমলের পথে তাদের
সেই জুটালে ॥

শরৎবাণীর বীণা বাজে
কমলদলে।
ললিত রাগের সুর ঝরে তাই
শিউলি তলে।



তাইতো বাতাস বেড়ায় মেতে
কচি ধানের সবুজ ক্ষেতে,
বনের প্রাণে মর্মরানির
ঢেউ উঠালে ॥

শরতের বিদায়

গান

শিউলি ফুল, শিউলি ফুল,
কেমন ভুল, এমন ভুল ?



রাতের বায় কোন্ মায়ায়
আনিল হায় বন-ছায়ায়,
ভোর বেলায় বারে বারেই
ফিরিবারেই হ'লি ব্যাকুল ॥

কেনরে তুই উন্মনা,
নয়নে তোর হিমকণা ?



কোন্ ভাষায় চাস্ বিদায়,
গন্ধ তোর কী জানায়,
সঙ্গে হায় পলে পলেই
দলে দলেই যায় বকুল ॥



হেমন্ত

১

হে হেমন্ত-লক্ষ্মী, তব চক্ষু কেন রুক্ষ চুলে ঢাকা,
ললাটের চন্দ্রলেখা অযত্নে এমন কেন ম্লান ?
হাতে তব সন্ধ্যাদীপ কেন গো আড়াল ক'রে আনো
কুয়াশায় ? কণ্ঠে বাণী কেন হেন অশ্রুবাষ্পে মাখা
গোধূলিতে আলোতে-আঁধারে ? দূর হিমশৃঙ্গ ছাড়ি'
ওই হের রাজহংসশ্রেণী, আকাশে দিয়েছে পাড়ি
উজায়ে উত্তর বায়ু-স্রোত, শীতে ক্লিষ্ট ক্লান্ত পাখা
মাগিছে আতিথ্য তব জাহ্নবীর জনশূন্য তটে
প্রচ্ছন্ন কাশের বনে। প্রান্তর-সীমায় ছায়াবটে
মৌনব্রত বউ-কথা-কও। গ্রাম-পথ আঁকা বাঁকা,
বেণুতলে পান্থহীন অবলীন অকারণ ত্রাসে,
ক্বচিৎ চকিত-ধূলি অকস্মাৎ পবন-উচ্ছ্বাসে।

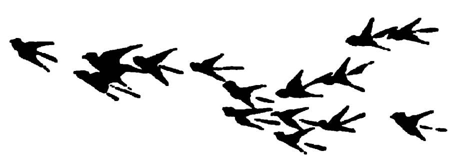
কেন বলো, হৈমন্তিকা, নিজেরে কুণ্ঠিত ক'রে রাখো,
মুখের গুণ্ঠন কেন হিমের ধূমলবর্ণে আঁকা॥

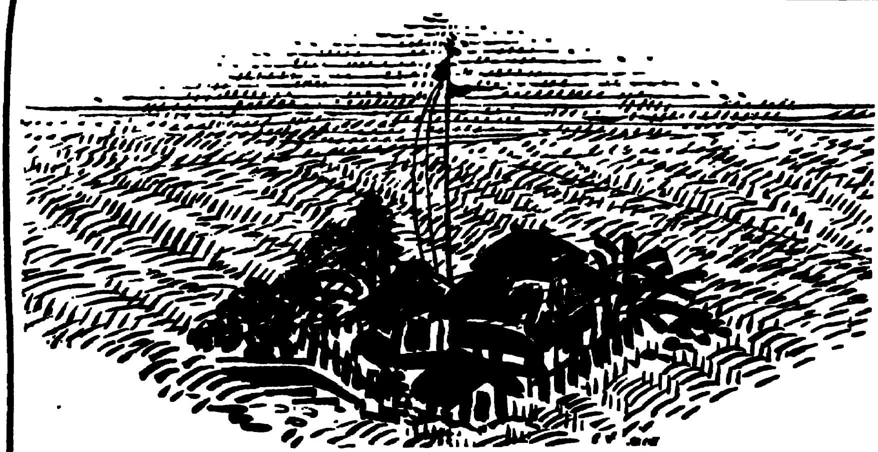
২

ভরেছ, হেমন্ত-লক্ষ্মী, ধরার অঞ্জলি পক্বধানে।
দিগঙ্গনে দিগঙ্গনা এসেছিল ভিক্ষার সন্ধানে
শীতরিক্ত অরণ্যের শূন্যপথে। বলেছিল ডাকি,
"কোথায় গো, অন্নপূর্ণা, ক্ষুধার্ত্তেরে অন্ন দিবে না কি?
শান্ত করো প্রাণের ক্রন্দন, চাও প্রসন্ন নয়ানে
ধরার ভাণ্ডার পানে।" শুনিয়া, লুকায়ে হাস্যখানি,
লুকায়ে দক্ষিণ হস্ত দক্ষিণা দিয়েছ তুমি আনি,'
ভূমিগর্ভে আপনার দাক্ষিণ্য ঢাকিলে সাবধানে।

স্বর্গলোক ম্লান করি' প্রকাশিলে ধরার বৈভব
কোন্ মায়ামন্ত্রগুণে, দরিদ্রের বাড়ালে গৌরব।

অমরার স্বর্ণ নামে ধরণীর সোনার অঘ্রাণে।
তোমার অমৃত নৃত্য, তোমার অমৃতস্নিগ্ধ হাসি
কখন্ ধূলির ঘরে সঞ্চিত করিলে রাশি রাশি,
আপনার দৈন্যচ্ছলে পূর্ণ হ'লে আপনার দানে॥





দীপালি

গান

হিমের রাতে ঐ গগনের
দীপগুলিরে
হেমন্তিকা করল গোপন
আঁচল ঘিরে।

ঘরে ঘরে ডাক পাঠালো—
"দীপালিকায় জ্বালাও আলো,
জ্বালাও আলো, আপন আলো,
সাজাও আলোয় ধরিত্রীরে"॥



শূন্য এখন ফুলের বাগান,
দোয়েল কোকিল গাহে না গান,
কাশ ঝরে যায় নদীর তীরে।

যাক্ অবসাদ বিষাদ কালো,
দীপালিকায় জ্বালাও আলো,
জ্বালাও আলো, আপন আলো,
শুনাও আলোর জয়-বাণীরে॥

দেব্‌তারা আজ আছে চেয়ে
জাগো ধরার ছেলে মেয়ে,
আলোয় জাগাও যামিনীরে।

এলো আঁধার, দিন ফুরালো,
দীপালিকায় জ্বালাও আলো,
জ্বালাও আলো, আপন আলো,
জয় করো এই তামসীরে॥



আসন্ন শীত

শীতের বনে কোন্ সে কঠিন
আস্‌বে ব'লে
শিউলিগুলি ভয়ে মলিন
বনের কোলে ॥

আম্‌লকি ডাল সাজ্‌লো কাঙাল,
খসিয়ে দিলো পল্লব জাল,
কাশের হাসি হাওয়ায় ভাসি,
যায় যে চ'লে ॥

সইবে না সে পাতায় ঘাসে
চঞ্চলতা,
তাই তো আপন রঙ ঘুচালো
ঝুম্‌কো লতা।

উত্তর বায় জানায় শাসন,
পাত্‌লো তপের শুষ্ক আসন,
সাজ খসাবার এই লীলা কা'র
অট্টরোলে ॥



শীত

ওগো শীত, ওগো শুভ্র, হে তীব্র নির্ম্মম,
তোমার উত্তর বায়ু দুরন্ত দুর্দ্দম
অরণ্যের বক্ষ হানে। বনস্পতি যত
থর থর কম্পমান, শীর্ষ করি' নত
আদেশ-নির্ঘোষ তব মানে। "জীর্ণতার
মোহবন্ধ ছিন্ন করো" এ বাক্য তোমার
ফিরিছে প্রচার করি জয়ডঙ্কা তব
দিকে দিকে। কুঞ্জে কুঞ্জে মৃত্যুর বিপ্লব
করিছে বিকীর্ণ শীর্ণ পর্ণ রাশি রাশি
শূন্য নগ্ন করি' শাখা, নিঃশেষে বিনাশি'
অকাল-পুষ্পের দুঃসাহস।
হে নির্ম্মল,
সংশয়-উদ্বিগ্ন-চিত্তে পূর্ণ করো বল ;
মৃত্যু-অঞ্জলিতে ভরো অমৃতের ধারা,
ভীষণের স্পর্শঘাতে করো শঙ্কাহারা,

শূন্য করি দাও মন ; সর্ব্বস্বান্ত ক্ষতি
অন্তরে ধরুক্ শান্ত উদাত্ত মূরতি,
হে বৈরাগী। অতীতের আবর্জ্জনা ভার,
সঞ্চিত লাঞ্ছনা গ্লানি শ্রান্তি ভ্রান্তি তার
সম্মার্জ্জন করি' দাও। বসন্তের কবি
শূন্যতার শুভ্র পত্রে পূর্ণতার ছবি
লেখে আসি, সে শূন্য তোমারি আয়োজন,
সেই মতো মোর চিত্তে পূর্ণের আসন
মুক্ত করো রুদ্র-হস্তে ; কুজ্ঝটিকা রাশি
রাখুক্ পুঞ্জিত করি' প্রসন্নের হাসি।
বাজুক্ তোমার শঙ্খ মোর বক্ষতলে
নিঃশঙ্ক দুর্জ্জয়। কঠোর উদগ্রবলে
দুর্ব্বলেরে করো তিরস্কার ; অট্টহাসে
নিষ্ঠুর ভাগ্যেরে পরিহাসো ; হিমশ্বাসে
আরাম করুক্ ধূলিসাৎ ! হে নির্ম্মম,
গর্ব্বহরা, সর্ব্বনাশা, নমো নমো নমঃ ॥





শীতের বিদায়

তুঙ্গ তোমার ধবল-শৃঙ্গ-শিরে
উদাসীন শীত, যেতে চাও বুঝি ফিরে ?
চিন্তা কি নাই সঁপিতে রাজ্যভার
নবীনের হাতে, চপল চিত্ত যা'র ?
হেলায় যে-জন ফেলায় সকল তা'র
অমিত দানের বেগে ?
দণ্ড তোমার তা'র হাতে বেণু হ'বে,
প্রতাপের দাপ মিলাবে গানের রবে,
শাসন ভুলিয়া মিলনের উৎসবে
জাগাবে, রহিবে জেগে ॥
সে যে মুছে দিবে তোমার আঘাত চিহ্ন,
কঠোর বাঁধন করিবে ছিন্ন ছিন্ন।
এতদিন তুমি বনের মজ্জামাঝে
বন্দী রেখেছ যৌবনে কোন্ কাজে,
ছাড়া পেয়ে আজ কত অপরূপ সাজে
বাহিরিবে ফুলে দলে।

তব আসনের সম্মুখে যার বাণী
আবদ্ধ ছিল বহু কাল ভয় মানি'
কণ্ঠ তাহার বাতাসেরে দিবে হানি'
বিচিত্র কোলাহলে ॥

তোমার নিয়মে বিবর্ণ ছিল সজ্জা,
নগ্ন তরুর শাখা পেত তাই লজ্জা।

তাহার আদেশে আজি নিখিলের বেশে
নীল পীত রাঙা নানা রঙ্ ফিরে এসে,
আকাশের আঁখি ডুবাইবে রসাবেশে
জাগাইবে মত্ততা।

সম্পদ তুমি যা'র যত নিলে হরি'
তার বহু গুণ ও যে দিতে চায় ভঁরি,'

পল্লবে যা'র ক্ষতি ঘটেছিল ঝরি,
ফুল পাবে সেই লতা ॥

ক্ষয়ের দুঃখে দীক্ষা যাহারে দিলে,
সব দিকে যা'র বাহুল্য ঘুচাইলে,
প্রাচুর্য্যে তা'রি হ'ল আজি অধিকার,
দক্ষিণ বায়ু এই বলে বার বার,
বাঁধন-সিদ্ধ যে-জন তাহারি দ্বার
খুলিবে সকলখানে।

কঠিন করিয়া রচিলে পাত্রখানি
রস-ভারে তাই হবে না তাহার হানি,
লুঠি লও ধন, মনে মনে এই জানি'
দৈন্য পূরিবে দানে।

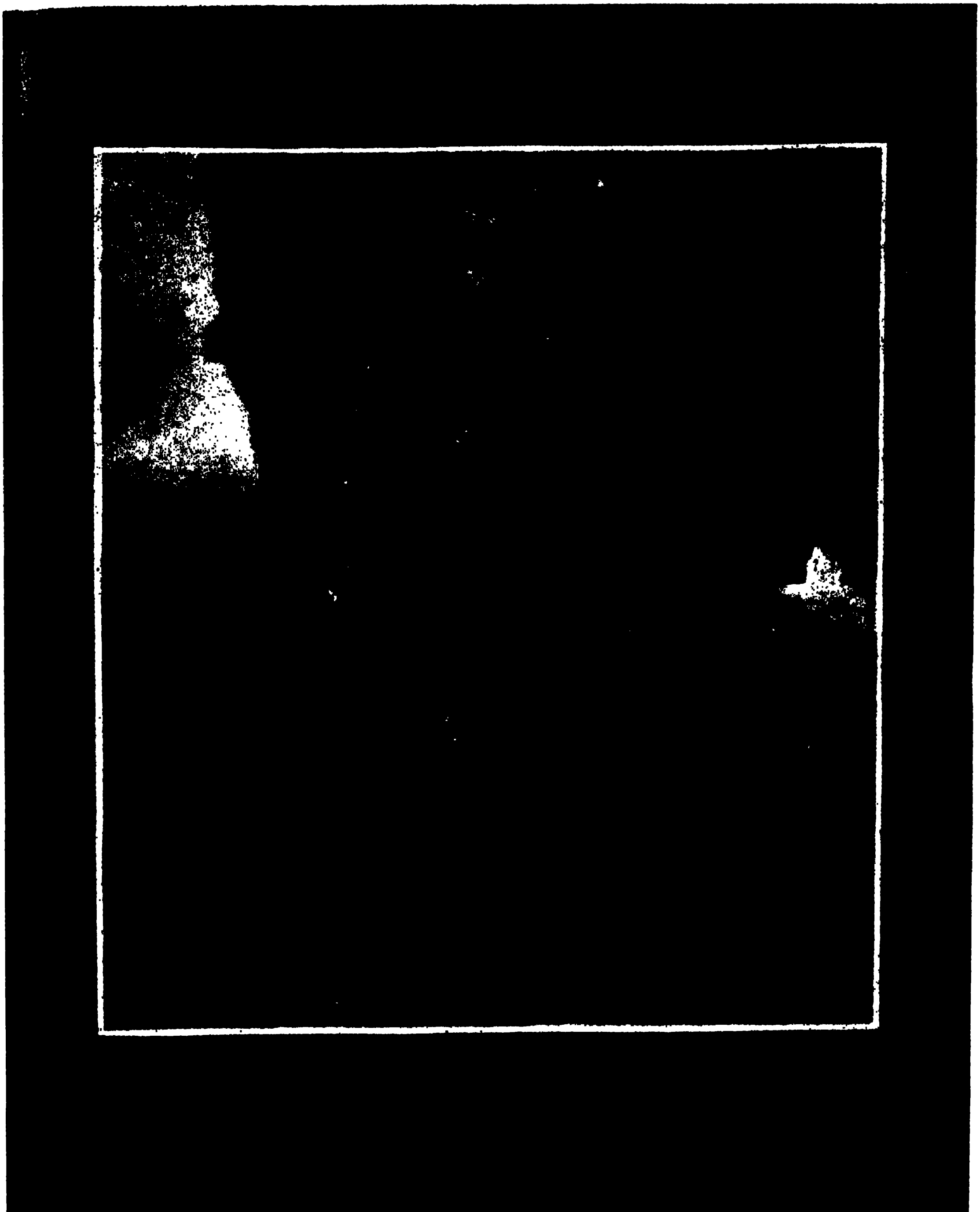




বসন্ত

হে বসন্ত, হে সুন্দর, ধরণীর ধ্যান-ভরা ধন !
বৎসরের শেষে
শুধু একবার মর্ত্ত্যে মূর্ত্তি ধরো ভুবন-মোহন
নব বরবেশে।
তারি লাগি' তপস্বিনী কী তপস্যা করে অনুক্ষণ,
আপনারে তপ্ত করে, ধৌত করে, ছাড়ে আভরণ,
ত্যাগের সর্ব্বস্ব দিয়ে ফল-অর্ঘ্য করে আহরণ
তোমার উদ্দেশে॥

সূর্য্য প্রদক্ষিণ করি' ফিরে সে পূজার নৃত্য-তালে
ভক্ত উপাসিকা।
নম্র ভালে আঁকে তা'র প্রতিদিন উদয়াস্তকালে
রক্তরশ্মি-টীকা।
সমুদ্র-তরঙ্গে সদা মন্দ্রস্বরে মন্ত্র পাঠ করে,
উচ্চারে নামের শ্লোক অরণ্যের উচ্ছ্বাসে মর্ম্মরে,
বিচ্ছেদের মরুশূন্যে স্বপ্নচ্ছবি দিকে দিগন্তরে
রচে মরীচিকা॥



বসন্ত

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় অঙ্কিত

আবর্ত্তিয়া ঋতুমাল্য করে জপ, করে আরাধন
দিন গুণে' গুণে'।
সার্থক হ'লো যে তা'র বিরহের বিচিত্র সাধন
মধুর ফাল্গুনে।
হেরিনু উত্তরী তব, হে তরুণ, অরুণ আকাশে,
শুনিনু চরণধ্বনি দক্ষিণের বাতাসে বাতাসে,
মিলন-মাঙ্গল্য-হোম প্রজ্জ্বলিত পলাশে পলাশে,
রক্তিম আগুনে॥

তাই আজি ধরিত্রীর যত কর্ম্ম, যত প্রয়োজন
হ'লো অবসান।
বৃক্ষ শাখা রিক্তভার, ফলে তা'র নিরাসক্ত মন,
ক্ষেতে নাই ধান।
বকুলে বকুলে শুধু মধুকর উঠিছে গুঞ্জরি'
অকারণ আন্দোলনে চঞ্চলিছে অশোক মঞ্জরী,
কিশলয়ে কিশলয়ে নৃত্য উঠে দিবস শর্ব্বরী,
বনে জাগে গান॥

হে বসন্ত, হে সুন্দর, হায় হায়, তোমার করুণা
ক্ষণকাল তরে।
মিলাইবে এ উৎসব, এই হাসি, এই দেখাশুনা
শূন্য নীলাম্বরে।

নিকুঞ্জের বর্ণচ্ছটা একদিন বিচ্ছেদ-বেলায়
ভেসে যাবে বৎসরান্তে রক্ত-সন্ধ্যা-স্বপ্নের ভেলায়,
বনের মঞ্জীর-ধ্বনি অবসন্ন হবে নিরালায়
শ্রান্তি ক্লান্তি-ভরে ॥

তোমারে করিবে বন্দী নিত্যকাল মৃত্তিকা-শৃঙ্খলে
শক্তি আছে কার ?
ইচ্ছায় বন্ধন লও, সে বন্ধন ইন্দ্রজাল-বলে
করো অলঙ্কার।
সে বন্ধন দোলরজ্জু, স্বর্গে মর্ত্ত্যে দোলে ছন্দভরে,
সে বন্ধন শ্বেতপদ্ম, বাণীর মানস-সরোবরে,
সে বন্ধন বীণাতন্ত্র, সুরে সুরে সঙ্গীত-নির্ঝরে
বর্ষিছে ঝঙ্কার ॥

নন্দনে আনন্দ তুমি, এই মর্ত্ত্যে, হে মর্ত্ত্যের প্রিয়,
নিত্য নাই হ'লে !
সুদূর মাধুর্য্যপানে তব স্পর্শ, অনির্ব্বচনীয়,
দ্বার যদি খোলে,
ক্ষণে ক্ষণে সেথা আসি নিস্তব্ধ দাঁড়াবে বসুন্ধরা,
লাগিবে মন্দার-রেণু শিরে তার ঊর্দ্ধ হ'তে ঝরা,
মাটির বিচ্ছেদপাত্র স্বর্গের উচ্ছ্বাস-রসে ভরা
র'বে তার কোলে ॥

বসন্ত-আবাহন

গান

তোমার আসন পাত্‌ব কোথায়,
হে অতিথি ?
ছেয়ে গেছে শুক্‌নো পাতায়
কানন বীথি।

ছিল ফুটে মালতী ফুল, কুন্দ কলি,
উত্তর বায় লুঠ্‌ ক'রে তায় গেল চলি,
হিমে বিবশ বনস্থলী
বিরল গীতি,
হে অতিথি ॥

সুর ভোলা ঐ ধরার বাঁশী
লুটায় ভুঁয়ে,
মর্ম্মে তাহার তোমার হাসি
দাও না ছুঁয়ে।

মাত্‌বে আকাশ নবীন রঙের তানে তানে,
পলাশ বকুল ব্যাকুল হবে আত্মদানে,
জাগ্‌বে বনের মুগ্ধ মনে
মধুর স্মৃতি,
হে অতিথি ॥

বসন্তের বিদায়

মুখখানি করো মলিন বিধুর
যাবার বেলা,
জানি আমি জানি সে তব মধুর
ছলের খেলা।

জানিগো, বন্ধু, ফিরে আসিবার পথে
গোপন চিহ্ন এঁকে যাবে তব রথে,
জানি তুমি তারে ভুলিবে না কোনমতে,
যার সাথে তব হ'ল একদিন
মিলন-মেলা ॥

জানি আমি যবে আঁখিজল ভরে,
রসের স্নানে
মিলনের বীজ অঙ্কুর ধরে
নবীন প্রাণে।
খনে খনে এই চির-বিরহের ভাণ,
খনে খনে এই ভয়-রোমাঞ্চ দান,
তোমার প্রণয়ে সত্যসোহাগে
মিথ্যা হেলা ॥

প্রার্থনা

গান

জানি তুমি ফিরে আসিবে আবার জানি,
তবু মনে মনে প্রবোধ নাহি যে মানি।
বিদায় লগনে ধরিয়া দুয়ার
তবু যে তোমায় বলি বারবার
"ফিরে এসো, এসো বন্ধু আমার"
বাষ্প বিভল বাণী॥

যাবার বেলায় কিছু মোরে দিয়ো দিয়ো
গানের সুরেতে তব আশ্বাস, প্রিয়।
বনপথে যবে যাবে, সে ক্ষণের
হয় তো বা কিছু র'বে স্মরণের,
তুলি ল'ব সেই তব চরণের
দলিত কুসুমখানি॥



অহৈতুক

গান

মনে র'বে কি না র'বে আমারে
সে আমার মনে নাই গো।
ক্ষণে ক্ষণে আসি তব দুয়ারে
অকারণে গান গাই গো।

চ'লে যায় দিন, যতখন আছি
পথে যেতে যদি আসি কাছাকাছি
তোমার মুখের চকিত সুখের
হাসি দেখিতে যে চাই গো,
তাই অকারণে গান গাই গো॥

ফাগুনের ফুল যায় ঝরিয়া
ফাগুনের অবসানে।
ক্ষণিকের মুঠি দেয় ভরিয়া
আর কিছু নাহি জানে।

ফুরাইবে দিন, আলো হ'বে ক্ষীণ,
গান সারা হ'বে, থেমে যাবে বীণ্,
যতখন থাকি ভ'রে দিবে না কি
এ খেলারি ভেলাটাই গো;
তাই অকারণে গান গাই গো॥

বিলাপ



গান

চরণ-রেখা তব
যে পথে দিলে লেখি
চিহ্ন আজি তারি
আপনি ঘুচালে কি ?
অশোক রেণু গুলি
রাঙালো যার ধূলি
তারে যে তৃণতলে
আজিকে লীন দেখি ?
ফুরায় ফুল ফোটা,
পাখীও গান ভোলে
দখিন বায়ু সেও
উদাসী যায় চলে।
তবু কি ভরি তারে
অমৃত ছিলনারে ?
স্মরণ তারো কি গো
মরণে যাবে ঠেকি ?



মনের মানুষ *

কত না দিনের দেখা
কত না রূপের মাঝে,
সে কার বিহনে একা
মন লাগে নাই কাজে।

কার নয়নের চাওয়া,
পালে দিয়েছিল হাওয়া,
কার অধরের হাসি
আমার বীণায় বাজে॥

কত ফাগুনের দিনে,
চলেছিনু পথ চিনে,
কত শ্রাবণের রাতে
লাগে স্বপনের ছোঁওয়া।

* এই ছন্দ চৌপদী জাতীয় নহে। ইহার যতি-বিভাগ নিম্নলিখিত রূপে :—

কত না দিনের। দেখা
কত না রূপের। মাঝে।
সে কার বিহনে। একা
মন লাগে নাই। কাজে।

চাওয়া-পাওয়া নিয়ে খেলা,
কেটেছিল কত বেলা,
কখনো বা পাই পাশে
　　কখনো বা যায় খোওয়া ॥

শরতে এসেছে ভোরে
ফুল-সাজি হাতে ক'রে,
শীতে গোধূলির বেলা
　　জ্বালায়েছে দীপ-শিখা,

কখনো করুণ সুরে
গান গেয়ে গেছে দূরে,
যেন কাননের পথে
　　রাগিণীর মরীচিকা ॥

সেই সব হাসি কাঁদা,
বাঁধন খোলা ও বাঁধা,
অনেক দিনের মধু,
　　অনেক দিনের মায়া,

আজ এক হয়ে তা'রা,
মোরে করে মাতোয়ারা,
এক বীণা-রূপ ধরি'
　　এক গানে ফেলে ছায়া ॥

নানা ঠাঁই ছিল নানা,
আজ তা'রে হ'ল জানা,
বাহিরে সে দেখা দিত
মনের মানুষ মম ;

আজ নাই আধাআধি,
ভিতর বাহির বাঁধি'
এক দোলেতেই দোলে
মোর অন্তরতম ॥

চঞ্চল

ওরে প্রজাপতি, মায়া দিয়ে কে যে
পরশ করিল তোরে !
অস্ত-রবির তুলিখানি চুরি ক'রে।

বাতাসের বুকে যে-চঞ্চলের বাসা
বনে বনে তুই বহিস্ তাহারি ভাষা,
অপ্সরীদের দোল-খেলা ফুল-রেণু
পাঠায় কে তোর দুখানি পাখায় ভ'রে ॥

যে গুণী তাহার কীর্ত্তি-নাশার নেশায়
চিকন রেখার লিখন শূন্যে মেশায়,
সুর বাঁধে আর সুর যে হারায় ভুলে',
গান গেয়ে চলে ভোলা রাগিণীর কূলে,
তার হারা সুর নাচের হাওয়ার বেগে
ডানাতে তোমার কখন্ পড়েছে ঝ'রে ॥





দোল

আলোক-রসে মাতাল রাতে
বাজিল কা'র বেণু।
দোলের হাওয়া সহসা মাতে
ছড়ায় ফুল-রেণু।
অমল-রুচি মেঘের দলে
আনিল ডাকি গগনতলে,
উদাস হয়ে ওরা যে চলে
শূন্যে চরা ধেনু॥

দোলের নাচে সে বুঝি আছে
অমরাবতী পুরে ?
বাজায় বেণু বুকের কাছে
বাজায় বেণু দূরে।
সরম ভয় সকলি ত্যেজে
মাধবী তাই আসিল সেজে,
শুধায় শুধু "বাজায় কে যে
মধুর মধু সুরে!"
গগনে শুনি এ কী এ কথা,
কাননে কী যে দেখি!

একি মিলন-চঞ্চলতা ?
বিরহ-ব্যথা একি ?
আঁচল কাঁপে ধরার বুকে,
কী জানি তাহা সুখে না দুখে !

ধরিতে যা'রে না পারে তা'রে
স্বপনে দেখিছে কি ?
লাগিল দোল জলে স্থলে,
জাগিল দোল বনে,
সোহাগিনীর হৃদয়তলে
বির'হণীর মনে ।
মধুর মোরে বিধুর করে
সুদূর তার বেণুর স্বরে,
নিখিল হিয়া কিসের তরে
দুলিছে অকারণে ॥

আনো গো আনো ভরিয়া ডালি
করবীমালা ল'য়ে,
আনো গো আনো সাজায়ে থালি
কোমল কিশলয়ে ।

এসো গো পীত বসনে সাজি',
কোলেতে বীণা উঠুক্ বাজি',
ধ্যানেতে আর গানেতে আজি
যামিনী যাক্ ব'য়ে ॥

এসো গো এসো দোল-বিলাসী
বাণীতে মোর দোলো।
ছন্দে মোর চকিতে আসি
মাতিয়ে তারে ভোলো।
অনেক দিন বুকের কাছে
রসের স্রোত থমকি আছে,
নাচিবে আজি তোমার নাচে
সময় তারি হোলো॥

কিশোর, আজি তোমার দ্বারে
পরাণ মম জাগে।
নবীন কবে করিবে তারে
রঙীন্ তব রাগে?
ভাবনাগুলি বাঁধন খোলা
রচিয়া দিবে তোমার দোলা,
দাঁড়িয়ো আসি, হে ভাবে-ভোলা,
আমার আঁখি-আগে॥

শেষের রং

গান

রাঙিয়ে দিয়ে যাওগো এবার
যাবার আগে, --
আপন রাগে,
গোপন রাগে,
তরুণ হাসির অরুণ রাগে,
অশ্রুজলের করুণ রাগে ॥
রং যেন মোর মর্ম্মে লাগে
আমার সকল কর্ম্মে লাগে,
সন্ধ্যাদীপের আগায় লাগে,
গভীর রাতের জাগায় লাগে ॥

যাবার আগে যাওগো আমায়
জাগিয়ে দিয়ে,
রক্তে তোমার চরণ-দোলা
লাগিয়ে দিয়ে।
আঁধার নিশার বক্ষে যেমন তারা জাগে,
পাষাণ গুহার কক্ষে নিঝর ধারা জাগে,
মেঘের বুকে যেমন মেঘের মন্দ্র জাগে,
বিশ্ব-নাচের কেন্দ্রে যেমন ছন্দ জাগে,
তেমনি আমার দোল দিয়ে যাও
যাবার পথে আগিয়ে দিয়ে,
কাঁদন-বাঁধন ভাগিয়ে দিয়ে ॥

শেষ মধু

বসন্তবায় সন্ন্যাসী যায়
চৈৎ-ফসলের শূন্য ক্ষেতে,
মৌমাছিদের ডাকিয়ে জাগায়
বিদায় নিয়ে যেতে যেতে ঃ—

আয়রে, ওরে মৌমাছি, আয়,
চৈত্র যে যায় পত্র ঝরা,
গাছের তলায় আঁচল বিছায়
ক্লান্তি-অলস বসুন্ধরা ॥

সজ্‌নে ঝুলায় ফুলের বেণী,
আমের মুকুল সব ঝরেনি,
কুঞ্জপথের প্রান্তধারে
আকন্দ রয় আসন পেতে।

আয়রে, তোরা মৌমাছি, আয়
আস্‌বে কখন শুক্‌নো খরা,
প্রেতের নাচন নাচ্‌বে তখন
রিক্ত নিশায় শীর্ণ জরা ॥

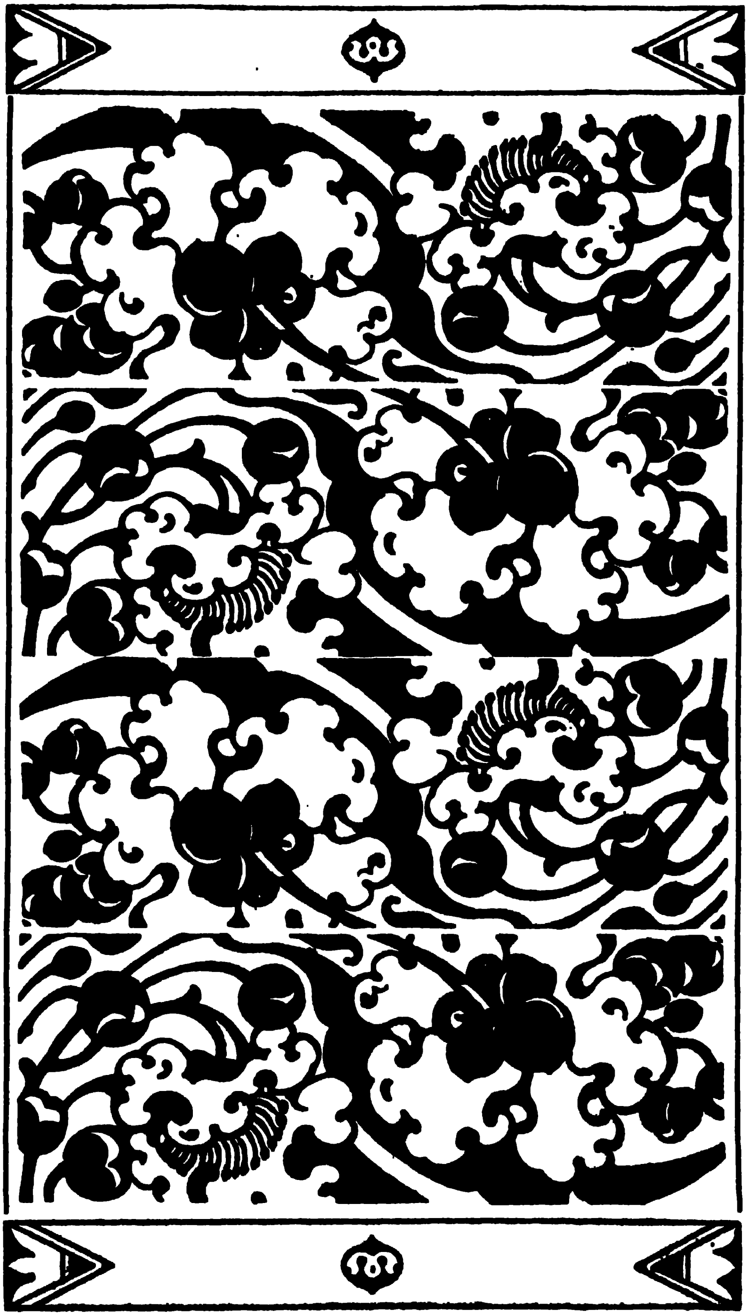
দক্ষিণবায় কানন শাখায়
মিলন-শেষের বাজায় বেণু ;
মাখিয়ে নে আজ পাখায় পাখায়
স্মরণভরা গন্ধ-রেণু।
কাল যে-কুসুম পড়্‌বে ঝ'রে
তাদের কাছে নিস্‌ গো ভ'রে
ওই বছরের শেষের মধু
এই বছরের মৌচাকেতে।

নূতন দিনের মৌমাছি, আয়,
নাইরে দেরি, করিস্‌ ত্বরা,
চরম দানে ঐরে সাজায়
বিদায় দিনের দানের ভরা॥

চৈত্রমাসের হাওয়ায় কাঁপা
দোলন-চাঁপার কুঁড়িখানি
প্রলয়দাহের রৌদ্রতাপে
বৈশাখে আজ ফুটবে, জানি।

যা-কিছু তার আছে দেবার
শেষ ক'রে সব নিবি এবার,
যাবার বেলায় যাক্‌ চলে যাক্‌
বিলিয়ে দেবার নেশায় মেতে।

আয়রে, ওরে মৌমাছি, আয়,
আয়রে গোপন মধুহরা,
পরম দেওয়া দিতে যে চায়
ঐ মরণের স্বয়ম্বরা॥



''নটরাজ"-কাব্যকে চিত্রভূষণে অলঙ্কৃত করিয়াছেন সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু-মহাশয়।

—"বিচিত্রা-"সম্পাদক

নতুন ও পুরোনোর ছন্দ

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সৃষ্টি হবার বেলায় গাছ ধরলে নতুনের ছন্দ, কিন্তু ফুল ফোটানর, ফল ধরানোর বেলায় ছন্দ বদল হ'ল— গোড়াতে পুরোনো এল, আগাতে নতুন!

বেশ একটুখানি পুরোনো হয়ে বড় হ'ল গাছ, তবে ধরল তাতে নতুন ফুল, ফলের মঞ্জরী ও কলি; নতুন রকমের হ'ল না তাদের সাজ, পুরোনো চালেই বাঁধা গেল তাঁদের রূপের এবং সাজ-সজ্জার ছাঁদ-বাঁধ সবই।

পুরোনো ডালে ধরা থাকে অগনিত নতুন জীবন-বিন্দু গোপনভাবে, পুরোনোর কোল ছাড়ার উপায় নেই তাদের—যদিও তারা নতুন, সবাই প্রতীক্ষা করছে নব বসন্তের দূত এসে পৌঁছনোর।

আমূল পুরোনো অথচ নতুনের সন্ততি এবং নতুনের জননী এই পুরোনো এবং নতুন বাগানের সব গাছ,— এরা নতুনের পক্ষে পুরোনোটা যে বাধা, এ সাক্ষী দিচ্ছে না একেবারেই,—নতুনে পুরোনোয় চলেছে কাজ বাগানে—যেখানে নতুন বৃন্তে গিয়ে পৌঁছচ্চে কত কালের গাছের সকল রসের সঞ্চয়; সেইখানে বাঁধা পাচ্ছে পুরোনোর সঙ্গে নতুন চমৎকার সুপরিণত ছন্দে! কত যুগ আগেকার কুহুধনি, তাই শুনে ডালের আগল ভেঙ্গে বেরিয়ে আস্‌ছে কত দিকে কত নতুন নতুন পাতার মঞ্জরী ফুল ফল কত কী, কিন্তু ডালকে জোরে আঁকড়ে রয়েছে এরা, পুরোনোকে অস্বীকার করে আস্‌ছে না,— নতুন যদিও সবাই! কেউ এরা পুরোনোকে ধিক্কার দিচ্ছে না, কিন্তু সাজাচ্ছে পুরোনোকে। মঞ্জরী বলছে—'ওগো আমি সেই পুরাতন যাকে নিয়ে রচনা হয়েছিল পুষ্প-বাণ'; মঞ্জরীর সঙ্গী কুহুধনি, সেও বলছে,—'আজ্‌কেরও অথচ কাল্‌কেরও আমি এবং আমারি মতো নূতন পুরাতনের ছন্দে বাঁধা এই জগৎশুদ্ধ সবই।'

পুরোনো আমের কসিটাকে নতুন একটা ছেলে বাঁশি করে নিয়ে যখন খেলা-শেষে ফেলে গেল মাটিতে, তখন একাধারে পুরোনো কসি এবং নতুন বাঁশি থেকে বার হ'ল ফুল আর নতুন আমগাছের গোটা দুই সবুজ পাতা, কিন্তু ফলই বা কোথা, বউলই বা কোথা নতুনে তখন? নতুনে পুরাতনে মিল্লো, তবে উঠ্‌লো জেগে ছন্দ ফুলের পাতায়, নতুন বৃন্তে, পুরোনো ডালে; পুরোনো বাগানের যা কিছু হিল্লোল পেলে সমীরণে, পরিণীত হ'ল পরিণত অপরিণত দু'য়ে!

পুরোনো হবার দিকে তেজে চল্লো গাছ, তবে আশা করলেম্ ফল ধরবার, ফুল ফোট্‌বার। এ না হয়ে গাছটা বলে বস্‌তো যদি—'আমি নতুন এবং একেবারে বরাবরই সবুজ ও তরুণ থাক্‌বো'—তবেই আশা উড়্‌লো আকাশে ফুল ফলের। নতুন নতুন কল্পনা ধরে আকাশ কুসুমের ফোটা, তাও পুরোনো আকাশে ঘট্‌ছে দেখি।

নতুন সাহিত্য, নতুন আর্ট, নতুন সঙ্গীত, নতুন নাট্যকলা, এমন কি নতুন যুগের মানুষের জীবনটাও আমূল নতুন হবো, কাঁচা রইবো, পাক্‌তে চাইবোই না বলে' পুরানো থেকে বিমুখ হয়ে বস্‌লেই মুস্কিল! মানুষ ভাব্‌বে মানুষের মতো, গাছ ভাব্‌বে নিজের মতো, মানুষকে গাছের হিসেব ধরে দেখা চলে না, কিন্তু এ-কথাজানা, যে পুরোনো হওয়াকে অস্বীকার ক'রে পাতা কিম্বা মাথার চুল বর্জ্জে থাক্‌তে পারে একমাত্র কলপের দোকানে আর গ্রীণ্‌রুমে— সবুজ, কালো, কাঁচা, তরুণ, অরুণ, ইত্যাদি কেমিকেলের বিজ্ঞাপন দিয়ে।

পুরোনো পিঁড়িতে নতুন আল্‌পনা, নতুন পিঁড়িতে পুরোনো আল্‌পনা এই করেই চলে গেছে কাজ এতকাল— সাহিত্যজগতে, শিল্পজগতে, নাট্যজগতে সব জায়গাতেই।

বুকে সবুজ ফিতের ফুল একটা একটা আল্‌পিন্ দিয়ে ফুটিয়ে নিয়ে ত আমি মনে করতে পারচিনে যে সত্যিই

টান্‌তে হবে নতুন পিঁড়িতে একটা নতুন আল্‌পনা এবং তারি হুকুম হাওয়ায় এসে গেছে—একমাত্র বাংলার লেখক-মহলে, এইমাত্র বিলাতের বিনা-তারের আফিস থেকে সবুজ গালামোহর-করা মোড়কে।

কাঁটাল গাছে ইঁচড় ফলে,—যতটা পারে সে পুরোনো ডালের সংস্রব ছেড়ে একেবারে গোড়ায়,—যেখান থেকে গাছটা নতুন বেলায় গজিয়েছিল, সেইখানেই ঝোলে মাটির দিকে মুখ করে'। নতুনের স্বপ্নে কণ্টকিত-কলেবর, দেখ্‌তেই পায় না ইঁচড় পুরোনো মাটিকে, পুরোনো শিকড়কে—যার রস টেনে সে ফুলে উঠ্‌ছে; ক্রমাগত নতুন বিস্ফুরণে পুরোনো গাছের গোড়াটার শক্ত ছালকে ভেবে নেয় সে কেবলমাত্র কড়া বুরুষ। পরগাছা হাওয়াতে শিকড় ছাড়ে, কিন্তু সেও বলে—'পুরোনো ডালে আমি অদ্ভূত রকমের এক হাল্কা ছন্দে বাঁধা পড়ে আছি, কেননা নতুন ডালে ফুল ফল, পরগাছা, পাখী, মানুষ, বনমানুষ কারো ভর সয় না, পঙ্গপালেরও নয়'; নতুন বোঁটা পুরোনোর সঙ্গে ছন্দে বাঁধা শক্ত রকমে, তাতেই ধরে সে ফুলের ভার—দোপাটি থেকে আরম্ভ করে শতদল, সহস্রদল, এমন কি শতদলবাসিনীর ভারটি পর্য্যন্ত!

সেখ সাদীর গুলেস্তার গোলাপ আর আজ্‌কের ইডেন-পার্কের গোলাপ, এদের একটা পুরোনো, একটা নতুন এ ভাবে দেখা চলে এবং চলে নাও। লেখার বেলাতেও এই, গানের বেলাতে, ছবির বেলাতেও এই একই কথা। সেকালের পাতাগুলো যতটা সবুজ একালের পাতা তা'র চেয়ে বেশী সবুজ হয়ে উঠ্‌বে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ এল বলেই—তা'র তো জো নেই বাংলাতেও।

এখানে মাটি ভয়ঙ্কর পুরোনো, আকাশ তা'র চেয়েও পুরোনো এবং আকাশকে ঢেকে, মাটিকে ভিজিয়ে আসে যে নতুন বাদল, এত পুরোনো সে, যে মেঘদূতের আমল তা'র কাছে হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে দেখা যায়। কাব্যে, সাহিত্যে, শিল্পে, সঙ্গীতে কোন্‌টা নতুন যুগ, কোন্‌টা পুরোনো, আর এই সবের রচকের মধ্যে প্রাচীন কেবা, নবীন কেবা, আর কেই বা এদের মধ্যে আমূল নতুন, এ ভেবে ঠিক করতে পারলে না মহাকাল বুড়ী—ম'রে পুনর্জ্জন্ম পেয়েও এ পর্য্যন্ত! আমূল নতুন উৎকর্ষ হ'ল—ব্যাঙের ছাতা, পুকুরের পানা, শেওলা এম্‌নি গোটাকতক জিনিষ, কিন্তু পুরোনো পুকুর, পুরোনো তক্তা ইত্যাদি হ'ল আলম্বন তাদের, এবং চেহারার প্রাচীনতা, বর্ণের প্রাচীনতা ধরেই রইলো সবাই!

পিঁপড়ের পালক হঠাৎ নতুন যদিও, কিন্তু মরবার আগডালে ছাড়া সেও গজায় না। হঠাৎ বয় ঘূর্ণি বাতাস নতুন ছন্দে, মাঠে-হাটে, কিন্তু তার ধূলোর ধ্বজাটা প্রাচীনের রেণুকণা দিয়ে অবিকল নতুন একখান কাঁথার পেঁচ্-ফুলের নক্সার ছন্দে অবিরল করে গাঁথা হ'য়ে গেছে, সম্পূর্ণ নতুন হ'তে ফাঁকই পাচ্ছে না বেচারা,—সবুজ মাঠ্‌টাতে গড়াগড়ি দিয়েও!

ইতিহাস

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

প্রাচীন ভারতবর্ষের যে ইতিহাস নেই এই ঘটনায় আমরা কখনও লজ্জা পাই, কখনও গর্ব্ব করি। আর সব সভ্যজাতির লোকেরা তাদের জয় পরাজয়, কাজ অকাজের নানা কাহিনী লিখে গেছে; প্রাচীন হিন্দু তা করে নি। এই স্বাতন্ত্র্যকে, মনের অবস্থা মত, আধ্যাত্মিকতার প্রমাণও বলা চলে, আবার ঐতিহাসিক বোধের অভাবও বলা যায়। কিন্তু প্রাচীন ভারতবাসীর কথা যা-ই হোক, নবীন ভারতবাসীর ইতিহাসকে উপেক্ষা করার জো নেই। আধ্যাত্মিকতার দাবী তাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের ছেড়ে দিতে হয়েছে, সুতরাং আধুনিকতার দাবী আর ছাড়া চলে না। এবং ঐতিহাসিক বোধ হচ্ছে আধুনিকতার একটা প্রধান লক্ষণ। নবীন ভারত-বাসীর প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস-অনুসন্ধানের চেষ্টায় মধ্যে প্রাচীনের উপর ঔৎসুক্য যতটা আছে, আধুনি-কতার দৌড়ে পিছিয়ে পড়ার লজ্জা তার চেয়ে কম নেই।

লজ্জার খাতিরে ইতিহাস-প্রীতি আমাদের অস্বাভা-বিক অবস্থার আর পাঁচটা ফলের মতই একটা অদ্ভুত ফল। প্রাচীন যুগের কথা শোনার মানুষের যে স্বাভা-বিক আগ্রহ, আর ভবিষ্যৎ-মানুষকে নিজের কথা শোনাবার যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা, এই দু-এ মিলে প্রকৃত ইতিহাসের সৃষ্টি। আজ্‌কের দিনের যে-সব ছোট-খাটো তুচ্ছ ঘটনা, অখ্যাত মানুষের অকিঞ্চিৎকর কাহিনী, মানুষের চোখ ও মন স্বভাবতই এড়িয়ে যায়, হাজার বছর আগেকার ঠিক এম্‌নি সব ব্যাপারের কথা শুন্‌তে মানুষের কৌতূ-হলের সীমা নেই। আবার হাজার বছর পরের মানুষের কাছে এই সব তুচ্ছ ঘটনা ও নগণ্য কাহিনীই, কবির কথায়—"সে দিন শুনাবে তাহা কবিত্বের সম"।

অতীতের আলো-ছায়ার খেলায় মানুষের মনে যে বিস্ময়রসের সৃষ্টি করে ইতিহাসের তাই প্রধান আকর্ষণ। আর ছবি এঁকে, মূর্ত্তি গড়ে', অক্ষরে লিখে, অনাগত কালকে নিজের কথা জানাবার মানুষের যে-সব উপায়, তারাই ইতিহাসের প্রধান উপকরণ। ভবিষ্যৎকে লক্ষ্য না করে' শুধু বর্ত্তমানে আবদ্ধ মানুষের যে ক্রিয়াকলাপ ও জীবনখাতা, তার প্রত্নখণ্ড দিয়ে ইতিহাসকে পরীক্ষা করা চলে, সৃষ্টি করা চলে না। মানুষ প্রাচীন ইতিহাস জান্‌তে পারে প্রাচীনকালের লোকেরা কোনও না কোনও উপায়ে সে ইতিহাস জানিয়ে গেছে ব'লে।

মানুষ অতীতের মধ্যে নিজেকে দেখ্‌তে চায়, ভবিষ্যৎকে নিজের স্পর্শ দিতে চায়। ইতিহাস এই আকাঙ্ক্ষা-নিবৃত্তির উপায়। কিন্তু যারা ইতিহাস লেখে ও যারা ইতিহাস পড়ে তারা এ-কথা মান্‌তে রাজী নয় যে, ইতিহাসের কাজ মানুষ সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহল মেটান। তাদের মতে এতে ইতিহাসকে অতি খাটো ও খেলো করা হয়। যে জিনিষ মানুষের হাতে হাতিয়ারের যে-কাজ তার সাহায্য না করে, তার আবার মূল্য কি? সুতরাং তারা প্রমাণ করে যে ইতিহাস মানুষের মহা উপদেষ্টা। অতীতের আলো দিয়ে ইতিহাস বর্ত্ত-মানের পথ দেখায়। "বর্ত্তমানের ঘটনা বা উদ্যোগ-অনুষ্ঠান অতীতের ঘটনা-প্রবাহের সহিত কার্য্য-কারণ সম্বন্ধে অচ্ছেদ্যরূপে বদ্ধ মানবের সমাজগত জীবনের অখণ্ড ঘটনা-প্রবাহের প্রত্যক্ষ অংশ; সুতরাং বর্ত্তমানের উদ্যোগ-অনুষ্ঠান সুচারুরূপে পরিচালিত করিতে হইলে অতীতের ইতিহাসের ধারা দেখিয়া শুনিয়া লওয়া, অর্থাৎ প্রচলিত কথায় যাহাকে বলে দেশ, কাল, পাত্র, তাহা সাবধানে হিসাব করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া কর্ম্মী মাত্রেরই কর্ত্তব্য, নতুবা অনেক ভ্রম-প্রমাদ ঘটিতে পারে।" (শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ—"ভূত ও বর্ত্তমান"। 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪।) বর্ত্তমান যদি 'অতীত'-কারণের কার্য্য হয়, অখণ্ড ঘটনা-প্রবাহের

একটা অংশ মাত্র হয়, তবে ঐ প্রবাহের বেগে তা নির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতের দিকে ভেসে যাবেই। ইতিহাস সে দিকটা পূর্ব্ব থেকে ব'লে দিতে পারে এ যদি সত্যও হয়, তবুও সে জ্ঞানের ফলে দিকের কোনও পরিবর্ত্তন ঘটার কথা নয়। স্রোতের টানে কোথায় যাচ্ছি তা জানা থাক্‌লেই সে গতিকে কিছু নিয়ন্ত্রিত করা যায় না। আর কর্ম্মীরা যে দেশ, কাল, পাত্রের হিসাব ক'রে কর্ম্মে সফলতা লাভ করে তা বর্ত্তমান দেশ, বর্ত্তমান কাল ও বর্ত্তমান পাত্র। সে বর্ত্তমানের অতীত ইতিহাস অবশ্য আছে, কিন্তু কর্ম্মীর যা সাবধানে হিসাব করতে হয় তা ঐ ইতিহাস নয়, ইতিহাসের ফলে যে বর্ত্তমান গড়ে' উঠেছে সেই বর্ত্তমান। যাকে পাথর কাট্‌তে হয়, পাথরের গড়ন জানা তার দরকার। কিন্তু সে গড়নের যে-ইতিহাস ভূতত্ত্ব থেকে জানা যায় তাতে তার প্রয়োজন হয় না। আর ভূতত্ত্বের পণ্ডিত-যে পাথর কাটার কাজে অন্যের চেয়ে সহজে ওস্তাদি লাভ করতে পারে একথা অবশ্য কেউ বিশ্বাস করে না। পৃথিবীর বড় কর্ম্মীরা সকলেই নিজের প্রতিভার আলোতে বর্ত্তমানকে চিনে নিয়েছে, ইতিহাসের আলোতে নয়।

প্রাচীন ইতিহাসের-যে বর্ত্তমানকে চেনাবার শক্তি কত কম ঐতিহাসিক গিবন্ তার একটা 'ক্লাসিক' উদাহরণ রেখে গেছেন।

এডোয়ার্ড্ গিবনের তুলি রোম-সাম্রাজ্য ধ্বংসের তেরশ' বছরের যে-ইতিহাস এঁকেছে, তার মত প্রকাণ্ড ও জটিল ঐতিহাসিক চিত্র আর কোনও ঐতিহাসিক এখনও আঁকে নি। এই বহু জন, বহু জাতি, ও বহু ঘটনা-সঙ্ঘাতের বিচিত্র কাহিনীর বর্ণনায় গিবন মানব-সমাজের স্থিতি, গতি ও ধ্বংসের যে উদার, গভীর ও সূক্ষ্ম জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন সকল ঐতিহাসিকের তা চিরদিন বিস্ময় জাগাবে। গিবন রোমান সাম্রাজ্য থেকে মাঝে মাঝে চোখ তুলে তাঁর সমসাময়িক ইউরোপীয় রাজ্যগুলির দিকে তাকিয়েছেন। পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংসের ইতিহাস শেষ করে' গিবন লিখ্‌ছেন, ". . . and we may inquire, with anxious curiosity, whether Europe is still threatened with a repetition of those calamities which formerly oppressed the arms and institutions of Rome. Perhaps the same reflections will illustrate the fall of that mighty empire, and explain the probable causes of our actual security." এবং এই পরীক্ষার ফলে গিবনের মনে হয়েছে যে তার সমসাময়িক ইউরোপের রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থা মোটামুটি দৃঢ় ভিত্তির উপরই দাঁড়িয়ে আছে। "The abuses of tyranny are restrained by the mutual influence of fear and shame; republics have acquired order and stability; monarchies have imbibed the principle of freedom, or at least of moderation."। গিবন তাঁর ইতিহাস লিখে শেষ করেন ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ ফরাসী বিপ্লবের দু' বছর পূর্ব্বে। তাঁর সমসাময়িক ইউরোপের সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তিমূলে-যে বিপ্লবের আগ্নেয়গিরির পাথর-গলা আরম্ভ হয়েছে, তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ গিবনের মনে হয় নি! রোম-সাম্রাজ্য ধ্বংসের ইতিহাস তার বর্ত্তমানের দৃষ্টিকে কিছুমাত্র তীক্ষ্ণতর করে নি। যে ঐতিহাসিক ইতিহাস-জ্ঞানের জোরে বর্ত্তমানকে উপদেশ দিতে সাহস করেন, তাঁর একবার ভেবে দেখা ভাল যে তাঁর ঐতিহাসিক দৃষ্টি গিবনের চেয়ে সূক্ষ্মতর কিনা!

২

বর্ত্তমান-যে অতীতের ইতিহাসকে কাজে লাগায় না তা নয়। বর্ত্তমানের কাজে মানুষ প্রাচীন ইতিহাস অনেক সময়েই ডেকে আনে; কিন্তু-সে উপদেশ লাভের জন্য নয়, অতীতকে উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায়স্বরূপ অস্ত্রের মত ব্যবহারের জন্য। ইতিহাসে যা এর অনুকূল লোকে তাকে প্রচার করে; যা প্রতিকূল তার দিকে চোখ বুজে থাকে। ইংলণ্ডের ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর পলিটিশ্যনেরা দেশের প্রাচীন ইতিহাস থেকে নজীর তুলে রাজশক্তির বিরুদ্ধে জনসাধারণের স্বত্ব ও স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করেছেন। সে ইতিহাস-যে সব সময়েই সত্য ইতিহাস, তার ব্যাখ্যা যে সকল সময়েই নির্ভুল ব্যাখ্যা

ইতিহাস

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

হ'তো—একথা এখন কোনও ঐতিহাসিক স্বীকার করবে না। কিন্তু ঐ ইতিহাসই ছিল সে-দিনের কাজের ইতিহাস। বিশুদ্ধ ও নির্ভুল ইতিহাসে সেদিনকার কাজ চল্‌তো না, কাজ অচল হ'তো; এর উদাহরণের জন্য সাগর-পারে যাবার প্রয়োজনও নেই। বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজের যাঁরা সংস্কার চান আজ তাঁরা হিন্দুর প্রাচীন ইতিহাস থেকে নজীর আন্‌ছেন, আর যাঁরা সে সংস্কারকে বন্ধ রাখ্‌তে চান তাঁরাও ঐ ইতিহাস থেকেই নজীর তুল্‌ছেন। এর কোনও ইতিহাসই সম্পূর্ণ সত্য নয়, বা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। গোটা প্রাচীন ইতিহাসকে কোনও কাজে লাগান যায়না, তা থেকে অংশবিশেষ বেছে নিতে হয়। কে কোন অংশ বেছে নেবে তা ঐতিহাসিক সত্যের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে তার গরজের উপর।

৩

যাকে 'ঐতিহাসিক সত্য' বলা হয়,—যা-থেকে মানুষ তার বর্ত্তমান গতিবিধি সম্বন্ধে মূল্যবান উপদেশ পায় বলে' অনেকের বিশ্বাস,— তার স্বরূপটা কি? যা ঘটে' গেছে সেই ঘটনার তথ্য-নির্ণয় 'ঐতিহাসিক সত্য' নয়, প্রত্নতত্ত্ব মাত্র। ইতিহাস থেকে যারা উপদেশ চায় তারা ধরে নেয় যে ঐতিহাসিক ঘটনার তথ্যের মধ্যে তত্ত্ব লুকিয়ে রয়েছে, যাকে ঘটনার বিশেষত্ব থেকে মুক্ত করে' অবিশেষ সাধারণ সত্য বলে' ব্যবহার করা চলে। ঐতিহাসিকের সব চেয়ে বড় কাজ প্রত্নতত্ত্বের তথ্য থেকে এই ঐতিহাসিক সত্য বা তত্ত্বের আবিষ্কার করা। প্রতি ইতিহাসের মধ্যেই কোনও না কোনও তত্ত্ব আছে। যথার্থ ঐতিহাসিকের চোখে সে তত্ত্ব ধরা পড়ে।

সমসাময়িক ঘটনা, অনুষ্ঠান ও অনুষ্ঠাতৃদের সম্বন্ধে মানুষের ধারণা ও মত এক নয়। এদের মূল্য ও ভালমন্দ বিচারে মতভেদের অন্ত নেই। বর্ত্তমান থেকে অতীতের কোঠায় গেলেই যে এদের মূল্য সবার চোখে এক দেখাবে, এদের বিচারে মতভেদের অবসর থাক্‌বে না, এমন বিশ্বাসের কারণ কি? বর্ত্তমানের ঘটনা নিয়ে অনেক তর্ক-যে ভবিষ্যতের ঘটনা দিয়ে মীমাংসা হয় সে কথা সত্য, কিন্তু ঘটনা থেকে যে তত্ত্বোপদেশের আশা করা হয় তার তর্কের অবসান নেই। কারণ একই ইতিহাস সকলের চোখে ও সকল সময়ের চোখে একরূপ নয়। মানুষের মনের আশা ও আকাঙ্ক্ষা, ভাব ও চিন্তার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ইতিহাসেরও মূর্ত্তি-পরিবর্ত্তন হয়। মানুষের যাত্রাপথের প্রতি বাঁক থেকে পেছনের ইতিহাসের চেহারা বিভিন্ন দেখায়; যেমন পাহাড়-পথের যাত্রী পথের নানাস্থান থেকে সমতলভূমির নানা চেহারা দেখে। এর কোন্ চেহারা সত্য, কোন্ চেহারা মিথ্যা? প্রতি যুগের মানুষ ইতিহাসকে নূতন করে' লিখ্‌ছে ও নূতন করে' লিখ্‌বে। ইতিহাসের এই নূতন নূতন রূপের কোনও রূপই মিথ্যা নয়, কারণ ওসব রূপই ব্যবহারিক অর্থাৎ আপেক্ষিক। ইতিহাসের কোনও পারমার্থিক রূপ নেই। ইতিহাসের ঘটনা নির্ণয়ের শেষ থাক্‌তে পারে, কিন্তু তার ব্যাখ্যার কখনও শেষ হবে না।

ইতিহাসকে যারা উপদেশের খনি মনে করে, তারা তার এই রূপ-পরিবর্ত্তনের কথাটা ভুলে থাকে। অথচ ইতিহাস সম্বন্ধে এর চেয়ে সহজ সত্য আর কি আছে! কোন্ বড় ঐতিহাসিক ঘটনা অথবা ব্যক্তির বিচারে ঐতিহাসিকেরা এক মত? বেশী উদাহরণের প্রয়োজন নেই, এক ফরাসী বিপ্লব ও তার কর্ম্মীদের যে-সব ইতিহাস লেখা হয়েছে ও হচ্ছে, তার কথা মনে করলেই যথেষ্ট হবে। ইতিহাসের ঘটনা ঐতিহাসিক তত্ত্বের উদাহরণ নয়। ও তত্ত্ব মানুষ নিজের মনে-মনে গড়ে' নেয়, অর্থাৎ যার যেমন মন সে তেমনি তত্ত্ব ইতিহাসের মধ্যে খুঁজে পায়। ইতিহাসের যে-উপদেশ তা ইতিহাস থেকে মানুষের মনে আসে না, মানুষ নিজের মন থেকে ইতিহাসে তা আরোপ করে।

৪

মানব-সমাজের গতি নিয়ন্ত্রিত হয় তার জীবনের প্রয়োজনে। মানুষের আশা ও ভয়, বর্ত্তমানের চাপ ও ভবিষ্যতের কল্পনা তার জীবনের পথ কেটে চলেছে। ইতিহাসের কাজ জীবনের এই বিচিত্র লীলাকে দর্শন করা, মনন করা, নিদিধ্যাসন করা। যে-সব তত্ত্ব দিয়ে মানুষ জীবনকে ব্যাখ্যা কর্‌তে চায়, জীবন তাদের চেয়ে অনেক জটিল। তাই কোনও ঐতিহাসিক তত্ত্বই ইতি-

হাসের চরম ব্যাখ্যা দিতে পারে না এবং এক আংশিক ব্যাখ্যায় অসন্তুষ্ট হ'য়ে ঐতিহাসিকেরা অন্য এক আংশিক ব্যাখ্যার চেষ্টা করেন। ইতিহাস-জ্ঞানের চরম লাভ মানব-সমাজের গতি ও পরিণতির এই রহস্যলীলার সঙ্গে পরিচয়। যে ইতিহাস পাঠকের মনে এই রহস্যের বোধকে জাগিয়ে তোলে, সেই ইতিহাসই যথার্থ ইতিহাস। বাকী সব হয় গল্প, নয় 'প্রপাগাণ্ডা'। ইতিহাস জীবন-লীলার কাব্য। যার চোখে 'আর্টিষ্টের' উদার দৃষ্টি নেই, আজকের দিনের ভাল-মন্দ, রাগ-বিরাগের উপরে উঠে মানুষের জীবন-ধারাকে যে দেখ্‌তে জানে না, তার ঐতিহাসিক হবার চেষ্টা বিড়ম্বনা। আর ইতিহাসের প্রতি পাতায় যারা উপদেশ খোঁজে তাদের বিশ্বাস ইতিহাস হচ্ছে 'কথামালার'ই জ্ঞাতি-ভাই।

৫

ইতিহাস কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ দিয়ে ঐতিহাসিক ঘটনার ব্যাখ্যা করে। তার অর্থ এ নয় যে, মানুষ সমাজে ও জীবনে নূতন কিছু ঘটাতে পারে না, তার বর্ত্তমান তার অতীতের কার্য্য মাত্র, আর তার ভবিষ্যৎ তার বর্ত্তমানের অবশ্যম্ভাবী ফল। কিন্তু ঐতিহাসিকেরা যখন ইতিহাসকে 'বিজ্ঞান' বলে' চালাতে চান, তখন এমনি একটা ধারণা তাঁদের ভাবনার মধ্যে গুপ্ত থাকে। সাদা চোখে অবশ্য আমরা সবাই দেখি যে, মানুষ তার জীবনে নিত্য এমন সব ঘটনা ঘটাচ্ছে যা তার অতীত ও বর্ত্তমান থেকে কেউ কখনও অনুমান কর্‌তে পার্‌তো না। ঘটনা যখন ঘটে' যায় তখন কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ দিয়ে তার ব্যাখ্যাও সম্ভব হয়। কিন্তু তত্ত্বের খাতিরে সত্যকে উপেক্ষা না কর্‌লে সহজেই বোঝা যায় যে কার্য্য-কারণের ব্যাখ্যা পেলেই নূতনের অভিনবত্ব দূর হয় না। মানুষের ইতিহাসে যে-গুলি তার গৌরবের অধ্যায় তার অনেক ঘটনাকে মানুষ ঘটিয়েছে অতীতকে অতিক্রম করে', বর্ত্তমানকে নাকচ করে',—ইতিহাসকে ধরে' থেকে নয়।

বাঙ্গালী ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ-মহাশয়ের যে-প্রবন্ধ থেকে পূর্ব্বে বচন তুলেছি তাতে তিনি "কার্য্যক্ষেত্রে ঐতিহাসিক হিসাব-কিতাবের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিবার জন্য" যে দুটী উদাহরণ দিয়েছেন তার প্রথম উদাহরণ, 'অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন' নিয়ে পরীক্ষা করা যাক্। চন্দ-মহাশয় "চৈতন্য-চরিতামৃত" থেকে কয়েকটী ঘটনা তুলে প্রমাণ করেছেন যে "অস্পৃশ্যকে স্পর্শ করিলে উভয় পক্ষই পাপভাগী হইবে, এই প্রকার বিশ্বাস অস্পৃশ্যতার মূল।" এবং তিনি বলেন, "এই প্রকার বিশ্বাস হিন্দুসাধারণের মধ্যে এখন খুব দুর্ব্বল হইলেও ইহার বীজ যে এখনও হিন্দুর মনের ভিতর হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে, এমন কথা বলা যায় না"। এর শেষ সত্যটি ঐতিহাসিক সত্য নয়, বর্ত্তমান কালের কথা। যার চোখ আছে সে, "চৈতন্য-চরিতামৃত" পড়া না থাক্‌লেও, বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ দেখে এ তথ্য জান্‌তে পার্‌বে। যার সে চোখ নেই "চৈতন্য-চরিতামৃত" তার এ কাজে কোনও সাহায্য কর্‌বে না। তারপর চন্দ-মহাশয় বলেছেন, "ধর্ম্মবিশ্বাস অপেক্ষাও অস্পৃশ্যতার প্রবলতর সহায় জাত্যাভিমান। ইউরোপ এবং আমেরিকা প্রত্যাগত অনেকের হিন্দুজাতিতে উঠিবার আকাঙ্ক্ষা হইতে বুঝিতে পারা যায় জাত্যাভিমান কি প্রবল পদার্থ।" চন্দ-মহাশয় প্রশ্ন করেছেন, "এই প্রবর্দ্ধমান ব্যাধির আরোগ্যের উপায় কি?" এবং উত্তর দিয়েছেন, "আমার মনে হয়, এই ব্যাধির আরোগ্যের প্রধান উপায়, যথাবিধি সামাজিক রীতি-নীতির ইতিহাস অনুশীলন এবং জনসাধারণকে ঐতিহাসিক এবং বৈজ্ঞানিক হিসাবে এই সকল বিষয়ের বিচার করিতে শিক্ষা দেওয়া।"

ঐতিহাসিক অনুশীলন ও বৈজ্ঞানিক বিচার যে কি উপায়ে অপচীয়মান ধর্ম্মবিশ্বাস ও প্রবর্দ্ধমান জাত্যাভিমানের ধ্বংস কর্‌বে চন্দ-মহাশয় তা কিছু বলেন নি। ইতিহাস অনুশীলনে হয়ত পাওয়া যাবে-যে মানুষের সমাজে বড় ছোটর বোধ সভ্যতার সঙ্গে এক-বয়সী। আর ঐ ভেদকে অবলম্বন ক'রেই সভ্যতার ইমারত গাঁথা আরম্ভ হয়েছিল। এ বোধ বা জাত্যাভিমান যা হোক্ কিছু একটাকে অবলম্বন ক'রে চিরদিন মানুষের সমাজে আত্মপ্রকাশ করেছে। এর "যথাবিধি" ঐতিহাসিক শিক্ষাটি কি? এ ভেদকে দূর কর্‌লে সভ্যতার মন্দির ভেঙ্গে পড়্‌বে, না সভ্যতার মন্দির এতটা গড়ে' উঠেছে যে ও

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

'হ্যাকোন্ডিং' এখন সরিয়ে নেওয়া চলে? এর কোনও অনুমানকেই কি অনৈতিহাসিক বলা যায়? আর যদি বলাও যায়, তবে ইতিহাসের তর্কে হেরে এক মতের লোক অন্য মতের চালে চল্‌বে এ মনে করা মানব-চরিত্রের সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় নয়। লেনিন্ ও মুসোলিনীর দ্বন্দ্ব-যে ঐতিহাসিক সম্মিলনীতে মীমাংসা হবে, এ স্বপ্ন ঐতিহাসিকেও কখনও দেখে না। আর রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় কি সত্য সত্যই বিশ্বাস করেন যে 'অ্যান্‌থ্রপলজি' থেকে মানুষ সমাজ-সংস্কারের প্রেরণা পাবে!

চন্দ-মহাশয় "চৈতন্য-চরিতামৃতের" যে-সব ঘটনা তুলেছেন তার প্রধান কথা শ্রীচৈতন্য স্পৃশ্যাস্পৃশ্যের ধর্ম্ম-সংস্কারকে নিজে বিন্দুমাত্র মান্‌তেন না।

"মোরে না ছুঁইহ প্রভু পড়োঁ তোমার পায়।
একে নীচ জাতি অধম আর কণ্ডুরস গায়॥
বলাৎকারে প্রভু তারে আলিঙ্গন কৈল।
কণ্ডুক্লেদ মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল॥"

এ যে 'ঐতিহাসিক অনুশীলন' বা 'বৈজ্ঞানিক বিচারের' ফল নয় তা চন্দ-মহাশয়কেও স্বীকার কর্‌তে হবে। চৈতন্যের যে-সব ভক্তেরা তাঁর পাণ্ডিত্যের দীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন, তাঁরাও তাঁদের তালিকায় ইতিহাস ও বিজ্ঞানের নাম উল্লেখ করেন নি। মহাপ্রভু "কণ্ডুক্লেদ গায়" অস্পৃশ্যকে আলিঙ্গন দিয়েছিলেন ইতিহাস অনুশীলন ক'রে' নয়, সমস্ত ইতিহাসকে অগ্রাহ্য করে'।

সমাজে নূতন কিছু আন্‌তে হ'লে শ্রীচৈতন্যের প্রয়োজন হয়। ইতিহাস-অনুসন্ধান-সমিতি দিয়ে সে কাজ চলে না! মানুষ জীবনের টানে এগিয়ে চলে, সৃষ্টির প্রেরণায় নূতন সৃষ্টি করে। ইতিহাস জীবনের এই সৃষ্টি-লীলার দর্শক। এ লীলার কল-কৌশল বুঝ্‌লেই সৃষ্টির ক্ষমতা আসে না; যেমন কাব্য বুঝ্‌লেই কবি হওয়া যায় না। তা যদি হ'ত তবে মম্‌সেন্ ইতিহাসের পুঁথি না লিখে একটা রাজ্যস্থাপন করতেন, আর ব্র্যাড্‌লির হাতে আর একখানা হ্যাম্‌লেট লেখা হ'তো।

ভাগ্যের জের

—গল্প—

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

বাড়ীতে কেউ বা ভালবাসে কেউ বা বাসে না এমন সর্ব্বত্রই দেখা যায়। সুশীলার বেলায় কিন্তু মনে হয় যেন কেউই তাকে দেখতে পারে না। দোষ তার অনেকই অবশ্য,—কিন্তু কি-কি তা' ব্যাখ্যা করা শক্ত। দোষ খুঁজলে কি তার সীমা পাওয়া যায়? তাকে যে ভাল লাগে না ব'লেই সে ভাল নয়। মোট কথা, এই দোষই হয়ত তাকে প্রিয়জনের কাছে প্রিয় করতে পারত, যা' অপ্রীতজনের কাছে তাকে নানারকম আখ্যা দিয়েছে।

তার এই সব নামকেও সে হেসেই স্বীকার করে নিত, পাশের বাড়ীর বৌ,—তার সখীর কাছে। সে হাসত, রহস্য করে ব'লত,—"মা বাপের উচিত পাঁচ বছরে হাতেখড়ির সময়ে নাম রাখা, তাহ'লে যেমনটী মানুষ কতকটা তেমনি হয় নামটা। আমার নাম কি তা'হলে সুশীলা হ'ত? কিন্তু কি নাম রাখা হ'ত, ভাই, বল্‌না?"

তার যত-সব অনাসৃষ্ট গায়ে না-মাখা রহস্য-পরিহাসে সখী রাগ ক'রত। ব'লত—"মরণ, এত হাসি কোথায় পাস্? হাসির খোরাকের তো ছড়াছড়ি! সারাদিন মরিস্ পরের মুখভার আর ছলখোঁজা দেখে আর ভূতের বেগার খেটে—"

"তুই কার জন্যে খাটিস্ ভাই—দেবতার? তা' আমারো তার পায়ে একটু পৌছয়ত?"

"থাম্ দিকি!"—সখীর মুখটা একটু গম্ভীর হ'য়ে উঠ্‌ত। মনে মনে ব'লত—স্বামীর যে মাথা খারাপ, নইলে কি আর এমন দশা ওর!

সুশীলা তবু হাসত, রঙ্গ ক'রত—যেন মনের সবটাই ঐ হাসির আড়ালে রাখা যায়—দেখতে পাবে না কেউ। কিন্তু তার চোখের দৃষ্টির সঙ্গে হাসিটা মিশ্‌খেত না; যেন মনে হ'ত তার ভিতর দিয়ে অতল অশ্রুসমুদ্র দেখা যাচ্ছে।

যাই হোক্, সে যেমনই হোক, সকলেরই দরকার পড়ে তাকে—কাজে-কর্ম্মে, বিপদে-আপদে, রোগে-আঁতুড়ে, নিত্য নৈমিত্তিক ভাঁড়ারে, রান্নাঘরে,—ছোট-বড় সব ব্যাপারেই। দিদি-শাশুড়ী, মাস্‌-শাশুড়ী, মামী-শাশুড়ীদের সবারি সে যথাসাধ্য, এমন-কি সাধ্যের অতীতও, সেবা করে। মনের গোপন কোণে একটু দুরাশা উঁকি মারে—এবারে কেউ ভালবাসবে হয় ত।

হায়রে কাঙাল মন! সবাই বলে, "দাঁড়া-হাত-পা—ক'রবে না? চিরকালই তো এখানে কাট্‌ছে, দুটো মানুষের খরচ আছে তো।" সুশীলা আবার হাসে, সইয়ের কাছে বলে, "সত্যিইতো, আমার ক'রছে, আমার বরের ক'রছে। তা' ভাই, দু'যুগ বয়সের একযুগ ছোটয় কেটেছে, একযুগ এদের কাছে কাট্‌ল। জানিস্ ভাই, এতদিন সে ওদের ছেলে ছিল, বিয়ে হ'তেই—আমার বর ছাড়া তার আর কোনো পরিচয় নেই।"

সখী হাসে না, চুপ ক'রে থাকে। সুশীলার চোখের সঙ্গে হাসিটা খাপ খায় না যে।

পাড়ার মিশন-স্কুলের কৃপায় ইংরাজীর অ আ আর বাংলার মোটামুটি বিদ্যালাভ সুশীলার হ'য়েছিল, কিন্তু 'গুণ হইয়া দোষ হইল সে বিদ্যায় তার।' পাড়ার মেয়েরা ঠিকানা লেখাতে আসে, নিরক্ষর গৃহিণীরা চিঠি লেখাতে আসেন। তাদের কাছে যে কদরটুকু সে পায় তাও বিধাতার সয় না। মামী-শাশুড়ী ঠেস্ দিয়ে বলেন,—"আপনি তো দু'দিনের দিন পা দিয়ে দোয়াত উলটে ফেলে শেষে ছাই দিয়ে কপালের লেখা লিখেছিলেন, তাতেও হয়নি?"

মাস্‌শাশুড়ী বলেন, "হ্যাঁগা বৌমা, নেকাপড়া আর এখনকার দিনে না জানে কে বাছা? সমস্ত দুপুর ব'সে নেড়ার ঠাকুমা'র, খুদির শাশুড়ীর চিঠি লিখ্‌বে, কারো শিরোনামা লিখবে, নয় তো আপনি দু'পাতা প'ড়তে ব'সবে। তেঁতুল

ভাগ্যের জের

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

কাটা, ডাল চাল বাছা, দু'দশ কুলো ঝেড়ুই বা রাখা, এই কাঁথা ক'টা সেলাই—এসব ক'রলে সংসারের কাজ হয়, সাশ্রয়ও হয়। তা' সেলাই তো জানো বাছা, কই কর কি? মানুষ কি মুখে ব'লবে যে 'এটা কর,' 'ওটা কর', হাম্না বুদ্ধি খরচ ক'রে ক'রতে হয়।"

সুশীলা লজ্জিত হ'য়ে আপনার স্ত্রী বুদ্ধি খরচ ক'রে ঐ সব কাজের খোঁজ ক'রে ক'রতে লাগল। কিন্তু 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে,' পড়াশুনা তার আর ছাড়া হয় না।

বাপের বাড়ীও আছে একটা এবং শ্বশুর বাড়ীও আছে। সৎ শাশুড়ী—তাঁর একঘর ছেলে মেয়েতে। নিজের শাশুড়ী ছেলে ভূমিষ্ঠ হ'তেই ম'রেছিলেন। মামার বাড়ীতে ছেলে মানুষ হয়। শ্বশুর বিয়ে দিতে নিয়ে গিয়ে যৌতুকের টাকা ক'টি নিয়ে বছর খানেক পরে মারা যান। আস্তে আস্তে ছেলেরও মাথা খারাপ হ'ল। চিরদিন মামী দিদিমা দেখেছিল, তারাই আবার দেখ্‌তে শুন্‌তে নিয়ে এল। সুশীলারও খোঁজ পড়্‌ল—কিছু না পারে পাগলকে দেখ্‌বে শুন্‌বে, হেঁসেলটা সাম্‌লাবে। কিছু-না-পারে-পারে ক'রতে ক'রতে সে সবই ক'রতে লাগল। ফল—যা' পূর্ব্বে বলেছি—'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।'

সে সইয়ের কাছে ব'ল্‌ত,—"জানিস্ গীতায় আছে, অসৎ-কর্ম্মে ষোল আনার ওপর আঠারো আনাও ফল জন্মান্তরের রাস্তা বেয়ে ফ'লে চলে। আর সৎকর্ম্মে দেখ্‌ছিস্ তো—যদি বা থাকে তো আশা—'মা ফলেষু কদাচন।

সখী ব'ল্‌ত—"মরণ নেই?—কি সব বকিস্ বোঝাও যায় না।"

সে হাস্‌ত,—"দেখ্‌না তোর কাছে এসে কথা কই এটা ভাল কাজ নয়, আর-সব যায়গায় এর ফল ভোগ ক'রতে হয়।"

যাই হোক্, কাজেরও ভূত নামে না, হাসির ভূতও ছাড়ে না।

আবার কর্ম্মফল! তা' সেটা জন্মান্তরের রাস্তা ব'য়ে, কি এ-জন্মের অবশিষ্ট ভাগটুকু নিয়ে—তা' চিরদিনের মতন অজানাই রইল। কিন্তু তা' এলো। পাগলকে আর ঘরে রাখা চ'লছে না; বাড়ীতে জায়গা কম, ঘর নেই, বড় মামা শ্বশুরের ছেলে নিতাইয়ের বিয়ে, খেঁদির সাধ, ছোট মামা-শ্বশুরের মেয়ে পুটি শ্বশুর বাড়ী থেকে আসবে। একটা ঘর জোড়া ক'রে বারমাস থাক্‌লে কি চলে?

স্থানাভাব জিনিষটা যদি মনে একবার ঢোকে, তাকে আর বের করা শক্ত। মামা শ্বশুররা স্থির ক'রলেন—পাগলকে রাঁচিতে কি বহরমপুরে, কি ওই রকম কোথাও রাখ্‌বার একটা ব্যবস্থা করা হোক্। এই ভাদ্রমাস গেলে সাম্‌নে পূজার ছুটী, তখন দেখা যাবে। দিদিশাশুড়ীর ক্ষীণ আপত্তি শোনা গেল না। তিনি আঁতুড় থেকে-মানুষ-করা দৌহিত্রের জন্যে কখনো বা পুজো ক'রতে বসে', কখনো শেষ রাত্তিরে ঠাকুর দেবতার নাম করবার সময়ে, চোখ মুছ্‌তে লাগ্‌লেন। আবার অকল্যাণের ভয়ে সবই স'য়ে নিলেন। অদৃষ্ট!

বধূ পরের মেয়ে, তার জন্য কারুরই বাজ্‌ল না। মামা-শ্বশুররা বল্লেন,—"বৌমা এখন বাপের বাড়ী কি সৎশাশুড়ীর কাছে যান, দরকার মত আনা যাবে।"

যেখানে ছেলের স্থান নেই সেখানে বৌয়ের কোথায়?

বিবাহিত জীবনের আরম্ভের সুখ যতটাই হোক্, তবু দু'বছর কি তার কিছুদিন বেশী হয়ত স্বাভাবিক ভাবে কেটেছিল; স্বামীর সোহাগ-সমাদর এবং তার আত্মীয়স্বজন সকলের স্নেহ-সম্মান—তারপর এই চ'লেছে। সবারি মতন ক'রে সে স্বামীরও সেবার আয়োজন করে, সেবা ক'রে, কিন্তু কোনো প্রতিদান আসে না—যেমন আর সকলের কাছে থেকে আসে। স্বামী তাকে চেনেও না! তবু জড়-মস্তিষ্ক নিরীহ স্তব্ধ ব্যক্তিটাকে নিয়েই তার একটা প্রয়োজনীয়তার সৃষ্টি হ'য়েছিল। দিন কাটে ত!

অদৃষ্টকে মেনে নেওয়া যায়। এবার চোখের জলকেও মেনে নিতে হ'ল। হাসির উপদেবতা এতদিন পরে ঘাড় থেকে নাম্‌ল।

পূজার ছুটী এসে প'ড়েছে। ছোট মামা শ্বশুর সপরিবারে রাঁচিতে স্বাস্থ্য সঞ্চয় ক'রতে গেলেন। পরামর্শমত ভাগিনাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। 'দেখ যদি সেরে ওঠে।' সবাই তাই জান্‌লে।

ছোট মাস্-শাশুড়ী বল্লেন,—"বৌমা, কি করি বাছা, তোমার শাশুড়ী তো চিঠির জবাব দিলে না। মার কাছে যাবে ভাবছিলাম তা' তাঁরা সেই কোন্ দেশে তোমার ভাইয়ের কাজের জায়গায় গেছেন। লিখেছেন, 'এখন কিছুদিন রাখো, কেউ এলে গেলে আনিয়ে নেবো'। তা' আমি বলি কি, আমার বড় যা কাশীবাস ক'রতে যাচ্ছেন, একটী জাতের মেয়ে খুঁজছেন—দেখাশোনা ক'রবে, কাছে কাছে থাকবে। আমি তার সঙ্গে যাচ্ছি এখন, আবার ফিরব। তা' তুমি আর কি ক'রবে? চল্‌না কিছুদিন। আর সবই তো গেছে,—ও'তো ভাল হবার অসুখ নয়, এই দশ বছর দেখ্‌ছ তো, পেটের একটা নেইও—ধর্ম্ম কর্ম্ম কর......তোমার নিজের হাতে তো একটা পয়সাও নেই দু'খানা গয়না ছাড়া। তা' পরের তাতেই যদি তীর্থ-ধর্ম্ম হয়......তা' না হয় আবার ফিরে এলেই হবে এখন। যাবে তবে?"

সুশীলার বুক থেকে গলা অবধি কি যেন ভ'রে উঠেছিল। সে শুধু মাথা নেড়ে সম্মতি জানালে।

দুই সখীতে শোবার ঘরের জানালায় দেখা হয়, দুজনেই ছুতো ক'রে স'রে যায়—যেন সওয়া যায় না।

সুশীলাদের যাবার দিন এসে পড়েছে, মামী-শাশুড়ীর বড় যা এসেছেন। খুব শান্ত মমতাময়ী—সুশীলার এই বয়সেই অন্তহীন জীবনের সীমাছাড়া দুঃখ যেন অনেকটা অনুভব ক'রতে পেরেছিলেন। পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে বল্লেন—"আহা মা, এই বয়সে, এখনো এমন লক্ষ্মী ছিরিখানি ......তা' যেমন কপালে লিখেছেন!"

সুশীলা জানালার কাছে এসে ডাক্‌লে—"সই।"

সই এলো।

"যাচ্ছি ভাই, গাড়ী আন্‌তে গেছে।"

"সত্যি যাওয়া? কোথায় যাচ্ছিস? তোর দাদা এসেছে?"

"না। সেই যমের বাড়ির একটু আগের ষ্টেশনেই অপেক্ষা ক'রতে যাচ্ছি।" অনেকদিন পরে সুশীলা হাস্‌লে। মুখে মানালো না কিন্তু।

সই হাস্‌লে না। তার চোখ ভ'রে উঠেছিল, মুখটা নীচু ক'রে গলির দিকে চেয়ে রইল।

সুশীলা বল্লে, "কেঁদে ম'রছিস্ কেন?" রাস্তায় গাড়ীর শব্দ শোনা গেল। সিঁড়ি থেকে মামাতো দেবর ডাক্‌লে,—"তোমরা এসো গো, পিসিমা বৌদি।"

আগামী সংখ্যায়

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-মহাশয়ের

গদ্য-ছন্দ

"পাহাড়িয়া"

পূর্ব্ব ও পশ্চিম

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

১

জ্ঞান হয়ে অবধি পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মধ্যে যে মস্ত একটা প্রভেদ আছে, এইরকম একটা কথা শুনে আস্‌ছি। কিন্তু সে প্রভেদটা যে কি ও কোথায়, তা এতদ্দেশীয় কোনও বক্তা কি লেখক আমাদের স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেননি। অন্ততঃ আমার মন যে-সকল কথায় সম্পূর্ণ সায় দিতে পারে, এমন কথা আমি ত অদ্যাবধি কোনও স্বদেশী বক্তা কিম্বা লেখকের মুখে শুনিনি।

পূর্ব্ব-পশ্চিমের কথা উঠ্‌লেই, সূর্য্যের উদয়-অস্তের কথাই প্রথমে মনে পড়ে। আর তার পিঠ পিঠ নানারকম উপমা এসে আমাদের নয়ন, মন অধিকার করে বসে। যথা, সভ্যতার উদয় পূর্ব্বে, অস্ত পশ্চিমে। আলো আগে পূবে ওঠে, তারপর পড়ে পশ্চিমে—ইত্যাদি ইত্যাদি। ফলে জিওগ্রাফির পূর্ব্ব অলক্ষিতে আমাদের মনে হিষ্ট্রির পূর্ব্ব হয়ে ওঠে, আর তখন আমরা দেশের ধর্ম্ম কালের উপর আরোপ করি, আর কালের ধর্ম্ম দেশের উপর। আর এর ধর্ম্ম ওর ঘাড়ে চাপাবার ফলে আমাদের মন চিন্তারাজ্যে দিশেহারা হয়ে যায়।

সত্যকথা এই যে, যখন আমরা পূর্ব্ব-পশ্চিমের কথা বলি, তখন আমরা ইউরোপ ও এশিয়ারই ভেদাভেদের কথা ভাবি। বর্ত্তমান ইউরোপের সঙ্গে বর্ত্তমান এসিয়ার অবশ্য কতকগুলো স্পষ্ট প্রভেদ আছে। সাংসারিক হিসেবে ইউরোপ সমৃদ্ধ, এসিয়া দরিদ্র। দেহে মনে যে-সকল গুণের সদ্ভাবে মানুষের পলিটিক্যাল এবং ইকনমিক ঐশ্বর্য্য লাভ হয়, সে-সকল গুণ ইউরোপীয়দের দেহমনে যে-পরিমাণে আছে, আমাদের দেহমনে সে পরিমাণে নেই। এটি ত প্রত্যক্ষ সত্য। এই মোটা সত্য থেকে একটী মোটা তথ্য জন্মলাভ করেছে। সে তথ্য এই যে—পূর্ব্ব হচ্ছে spiritual, এবং পশ্চিম materialistic।

২

Spirituality এবং Materialism, দু'টো কথাই আমরা বিলেত থেকে আমদানি করেছি। প্রমাণ—এ দুটি শব্দের বাঙলা প্রতিশব্দ নেই। Spirituality-র তর্‌জমা আমরা সংস্কৃতের সাহায্যে কোনরকমে করতে পারি, কিন্তু তাও ভুল অনুবাদ হবে। সংস্কৃত আধ্যাত্মিক শব্দ ইংরেজি spirituality-র প্রতিশব্দ নয়। কিন্তু materialism-এর তর্‌জমা করতে মোটেই পারি নে। সাংসারিক অভ্যুদয় সাধনের প্রবৃত্তি মানুষমাত্রেরই অন্তরে আছে; সুতরাং সে প্রবৃত্তি চরিতার্থ কর্‌বার অক্ষমতার নাম spirituality নয়, আর ক্ষমতার নাম materialism নয়। কারণ materialism নামক দার্শনিক মতবাদের সঙ্গে কর্ম্ম-কুশলতার কোনও যোগাযোগ নেই; এবং spirituality নামক দার্শনিক মতবাদের সঙ্গে অকর্ম্মণ্যতারও কোনও যোগাযোগ নেই।

বড় বড় কথাগুলোর অর্থ প্রায়ই অস্পষ্ট হয়ে থাকে। কারণ সে সব কথা নানা লোকে নানাভাবে হৃদয়ঙ্গম করে। কিন্তু সেই সব বিভিন্ন মনোভাবের একই নাম থেকে যায়, এবং সে নাম বাদ দিয়ে কোনও বিষয়ের আলোচনা করাও অসম্ভব। অথচ এই দার্শনিক কথাবার্ত্তা নিয়ে নিয়ত আলোচনা করা নিতান্ত প্রয়োজন। কেননা সেই আলোচনাসূত্রেই সেই কথাগুলোর অর্থ আমাদের কাছে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে।

সুতরাং ধরে নেওয়া যাক্ যে—আমরা spiritual, এবং ইউরোপের লোক materialistic। এই ইউরোপীয় materialism-এর প্রভাব আমাদের মনের উপর কি সূত্রে কতদূর হয়েছে, এবং আমাদের spirituality-র প্রভাব ইউরোপীয় মনের উপর কি ভাবে কতটা হয়েছে, আর সে প্রভাবের ফল বিশ্বমানবের পক্ষে আশঙ্কার কথা কিম্বা আশার কথা—তাও বিবেচ্য।

৩

ইউরোপ যে কর্ম্মক্ষেত্র ও এসিয়া যে ধর্ম্মক্ষেত্র, এই রকম একটা ধারণা উক্ত দুই ভূভাগের লোকের মনে অনেকদিন থেকে দিব্যি বসে গিয়েছে। এবং সে কারণ

ইউরোপের লোকেরা এই ভরসায় নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, এসিয়াতে কর্ম্ম নেই; আর আমরা এই ভেবে নিশ্চিন্ত ছিলুম যে, ইউরোপে ধর্ম্ম নেই। দু' পক্ষই এই ভেবে মনস্থির করেছিলেন যে, কর্ম্মরাজ্যে এসিয়া ইউরোপের ঘাড়ে চড়্‌তে পারবে না—আর ধর্ম্মরাজ্যে ইউরোপও এসিয়ার ঘাড়ে চড়্‌তে পারবে না। একটা স্পষ্ট ও সহজ-বোধ্য মত পেলেই মানুষে মনের আরামে থাকে। আর ইউরোপের লোক যে সব পুরুষ, ও এসিয়ার লোক যে সব মেয়ে, এর চাইতে সহজ ভাগ আর কি হ'তে পারে?

ফলে এসিয়ার কাছ থেকে ইউরোপের কোনও ভয় ছিল না। গত যুদ্ধের প্রবল ধাক্কায় বিধ্বস্ত হয়ে ইউ-রোপের মনে নানারকম ভয়ভাবনা জন্মেছে। নিজেদের সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব সম্বন্ধে ইউরোপের লোকের মনে যে অগাধ বিশ্বাস ছিল, সে বিশ্বাসের গোড়া আল্‌গা হয়ে গিয়েছে। ফলে তারা নানাদিকে নানারূপ বিভীষিকা দেখ্‌ছে। ইউরোপের, বিশেষতঃ ফরাসীদেশের বর্ত্তমান সাহিত্যের সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে তিনিই জানেন যে, এসিয়া এখন সে দেশের সাহিত্যিক মনের অনেকটা অংশ অধিকার করেছে। যে-সকল ইউরোপীয়েরা এখন ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবেন, তাঁরা এসিয়ার কথা বাদ দিয়ে ইউরোপের ভবিষ্যৎ গণনা করতে পারেন না। ফলে নিজের নিজের প্রকৃতি ও বুদ্ধি অনুসারে কেউ বা এসিয়ার সভ্যতা ইউরোপীয় সভ্যতার পরিপন্থী মনে করেন, কেউ বা তাকে আবার তার সহায় মনে করেন।

৪

এই উভয় শ্রেণীর লেখকদের মধ্যে মতের অনৈক্য কোথায় এবং কি কারণে, তা ফরাসীদেশের দুটী গণ্যমান্য সাহিত্যিকের লেখায় খুব স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়েছে। আমি সংক্ষেপে উভয়ের বাদানুবাদের পরিচয় দিতে চেষ্টা করব। কারণ এদেশে যাঁরা পূর্ব্ব-পশ্চিমের ভেদাভেদ নিয়ে মাথা বকান, পশ্চিমের লোকেরা সে বিষয়ে কি ভাবছে, তা জানবার জন্য আশা করি তাঁদের কৌতূহল আছে।

H. Massis বর্ত্তমান ফ্রান্সের জনৈক ধনুর্দ্ধর লেখক। তিনি প্রথমে ছিলেন, Renan ও Anatole France-এর মন্ত্রশিষ্য। পরে তিনি আরিষ্টটেল এবং যীশুখৃষ্টের হস্তে আত্মসমর্পণ করেছেন। তাই তিনি এখন তাঁর পূর্ব্ব শিক্ষাগুরু ও সতীর্থদের উপর নির্ম্মমভাবে সমালোচনার বাণ নিক্ষেপ করছেন। তাঁর সমালোচনার বাণ উক্ত সাহিত্যিকদের বধ না করতে পারুক, কিছুকিঞ্চিৎ জখম্ যে করেছে, সে বিষয়ে ফ্রান্সের সাহিত্য-সমাজে দ্বিমত নেই। Massis প্রথমত অতি চটকদার লেখক, দ্বিতীয়ত অতি শক্তিমান লেখক। উপরন্তু খৃষ্টানধর্ম্ম ও খৃষ্টান দর্শনে তাঁর বিশ্বাস অটল। এই বিশ্বাসের বলেই তিনি সম্পূর্ণ নির্ভীক এবং মারাত্মক লেখক হয়ে উঠেছেন। তাই যাঁরা তাঁর মতাবলম্বী নন, তাঁরাও স্বীকার করছেন যে, তাঁর মতামতের ভিতর অনেক নিগূঢ় সত্য আছে। তবে সকলেই বলেন তাঁর দোষ এই যে, অবিশ্বাসী সাহিত্যিক-দের প্রতি তাঁর কোনরূপ মায়ামমতা নেই। দ্বিতীয় কুমারিল ভট্টের মত তিনিও ফরাসী সাহিত্যরাজ্যে নাস্তিক নিগ্রহ করতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। ইনি সম্প্রতি "ইউরোপের আত্মরক্ষা" নামক একখানা বই লিখেছেন। উক্ত গ্রন্থের সমালোচনা করেছেন Edmond Jaloux নামক জনৈক খ্যাতনামা সাহিত্যিক। সাহিত্য সমালোচনা যে কা'কে বলে, Jaloux-র সমালোচনাকে তার আদর্শ বলা যায়। "উদার চরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্" এ কথা যে সাহিত্য-রাজ্যেও খাটে, তার জীবন্ত প্রমাণ হচ্ছেন উক্ত সমালোচক।

৫

মাসি মহোদয়ের দৃঢ় বিশ্বাস যে, ইউরোপ ধ্বংসপথের যাত্রী হয়েছে। তাই তিনি ইউরোপকে আত্মরক্ষার জন্য সতর্ক হতে পরামর্শ দিয়েছেন। মাসির মতে আত্মরক্ষার অর্থ—আত্মার রক্ষা। তাঁর বিশ্বাস পৃথিবীর প্রতি জাতেরই একটী বিশেষ নিজস্ব আত্মা আছে, আর স্বকীয় আত্মার সেই বিশিষ্টতা রক্ষা করারই নাম আত্মরক্ষা। কারণ কোনও জাতি যদি তার আত্মাকে সজীব ও সুস্থ রাখতে পারে, তাহ'লে সে জাত জীবনেও সুস্থ ও সফল হতে বাধ্য।

পূর্ব্ব ও পশ্চিম

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

তাঁর মতে ইউরোপীয় মন যুগ যুগ ধরে গ্রীক সাহিত্য ও খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাবে গড়ে উঠেছে। ইউরোপীয় মনের যা-কিছু শক্তি, যা-কিছু সৌন্দর্য্য, যা-কিছু মহত্ত্ব আছে, সে সবই ঐ দুই প্রভাবের ফল। ইউরোপের লোক প্রায় দু' হাজার বৎসর ধরে এই শিক্ষা লাভ করেছে যে, এ বিশ্বের মূলে আছেন ভগবান, এবং তিনি হচ্ছেন মঙ্গলময় পুরুষ, ভাষান্তরে সগুণ ঈশ্বর। ইউরোপের লোক যে কর্ম্মজগতে এত ঐশ্বর্য্য লাভ করেছে, তার কারণ সকল কর্ম্ম ভগবানে সমর্পণ করাই ইউরোপের যথার্থ আদর্শ। এর অর্থ অবশ্য এ নয় যে, যুগ যুগ ধরে ইউরোপের লোক শুধু ধর্ম্মভাবে প্রণোদিত হয়ে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করেছে। অধিকাংশ মানুষ শুধু নৈসর্গিক প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হয়েই কর্ম্ম করে; ইউরোপের অধিকাংশ অধিবাসী তাই করেছে। কিন্তু আমাদের যে-সকল প্রবৃত্তি পশু-সামান্য, তারই চরিতার্থ করাটা আমরা পূর্ব্বে কখনো সভ্য মনোভাব বলে গ্রাহ্য করিনি। যে মনোভাবকে পূর্ব্বে ইউরোপের মনীষীবৃন্দ ইউরোপীয় সভ্যতার প্রাণস্বরূপ মনে করতেন, সে মনোভাব হচ্ছে ভগবৎশক্তি এবং ভগবৎঅনুগ্রহের উপর একান্ত নির্ভর। এবং বহুকাল ধরে Roman Catholic Church ইউরোপের মনকে এই সত্য ভুলতে দেয় নি, তার কড়া শাসনের বলে।

৬

ইউরোপের এই আদর্শের উপর প্রথম ধাক্কা লাগায় ইটালীর Renaissance, তারপর জর্ম্মাণীর Reformation। Renaissance আত্মার চাইতে বুদ্ধির, অন্তরের চাইতে বাহ্যবস্তুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করলে; আর Reformation authority-র চাইতে liberty-র শ্রেষ্ঠত্বের বাণী প্রচার করলে। এর ফলে সাধারণ লোকে বুঝলে যে, authority না মানার নামই liberty। মানুষ নামক পশু authority মেনেই, নিজের বিদ্যাবুদ্ধির বহির্ভূত অনেক সত্য অর্থাৎ মনোভাবকে মেনে নিয়েই যে মানুষ হয়, এ কথা ইউরোপের অধিকাংশ লোক ভুলতে আরম্ভ করলে। আর সেই অবধি liberty-র অর্থ হল প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার স্বাধীনতা। এই হচ্ছে ইউরোপীয় সভ্যতার অধোগতির প্রথম পদ।

এখন আবার এসিয়ার মনোভাব ইউরোপের মন অধিকার করছে, এবং সে মনোভাবের বশবর্ত্তী হলে ইউরোপীয় সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য্য। এসিয়ার মনোভাব অবশ্য materialistic নয়। মনোজগতে ইউরোপের উপর এসিয়ার আক্রমণ হচ্ছে ইউরোপীয় spirituality-র উপর এসিয়াটিক spirituality-র আক্রমণ। আসলে materialism-এর চাইতে এ ঢের প্রবল শত্রু। কারণ ইউরোপীয় materialism-এর শূন্যগর্ভতা প্রমাণ করা তেমন কঠিন নয়। Renan, Anatole France, Gide, Romain Rolland প্রভৃতির বাণী সবই অন্তঃসার-হীন। কারণ এঁদের সকলেরই আত্মা ক্ষুদ্রাত্মা। কিন্তু এসিয়ার spirituality-র অবতার হচ্ছেন চীনের Lao-t-se আর ভারতবর্ষের বুদ্ধ। এ দু'জনেই মহাপুরুষ ও অসামান্য মহৎ অন্তঃকরণের ব্যক্তি। এঁদের কথাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা চলে না। কিন্তু তাহ'লেও এ কথাও অস্বীকার করবার জো নেই যে, বুদ্ধ ও লাউট্‌সের মতের বশবর্ত্তী হলে ইউরোপীয় মনোরাজ্যে অরাজকতা ঘট্‌বে।

৭

মাসির মতে বুদ্ধদেবের প্রচারিত ধর্ম্মমত যার মনে বস্‌বে, সে ভালমন্দ সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করতে বাধ্য, অবশ্য সে যদি logical হয়। আর কর্ম্মযোগী হওয়াই ইউরোপের বড় আদর্শ। তা ছাড়া এসিয়ার দর্শনের সার কথা হচ্ছে অহং (subject) এবং ইদং (object)-এর অভেদজ্ঞান। অপরপক্ষে ইউরোপের মন এ দুয়ের একান্ত ভেদজ্ঞানের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

এখন জিজ্ঞাস্য যে—এই এসিয়াটিক মনোভাব ইউরোপীয় মনের অন্তরে কোন ছিদ্র দিয়ে কি সূত্রে প্রবেশ করছে ?

মাসি বলেন—প্রথমত জর্ম্মাণীর, দ্বিতীয়ত রাষিয়ার মারফৎ।

শনিমঙ্গলবারের মড়া দোসর পোঁজে। গত যুদ্ধের পর জর্ম্মাণী যখন আবিষ্কার করলে যে তার স্বার্থান্ধ

সভ্যতা ম্রিয়মাণ হয়েছে, তখন সে বাদ-বাকী ইউরোপীয়দের ধ্বংসপথের যাত্রী করবার জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে পড়ল। জর্ম্মাণী কামানের গোলা দিয়ে যখন ইউরোপকে মারতে পারলে না, তখন সে সাহিত্যিক poison-gas দিয়ে ইউরোপীয়দের মোহাচ্ছন্ন করবার চেষ্টা সুরু করলে। আর আমাদের মন ও চরিত্র দুর্ব্বল করবার তারা অব্যর্থ উপায় ঠাউরেছে, এসিয়ার ধর্ম্মমত ইউরোপীয় সাহিত্যে প্রচার করা। তারা সকলে আমাদের বোঝাচ্ছে যে, মুক্তির মানে নির্ব্বাণ, আর নির্ব্বাণপ্রাপ্তিই ইউরোপীয়দের আদর্শ হওয়া উচিত। Spengler, Keyserling প্রভৃতি এ যুগের জর্ম্মাণ দার্শনিকেরা মাসির মতে, সব প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ।

আর রুষ সাহিত্যেরও প্রধান কথা হচ্ছে যে, ইউরোপ এতদিন ধরে যে সভ্যতার সাধনা করে এসেছে, তার খোল কড়াই কাণা। ধর্ম্ম রীতিনীতি প্রভৃতিকে জলাঞ্জলি দিলেই মানুষ দেবতা হয়ে উঠবে, এই হচ্ছে রুষ সাহিত্যের বাণী। আর রাসিয়ানরা যে এসিয়াটিক, তা সকলেই জানে।

এ ছাড়া ফ্রান্সের বহুলোক আজ Lao-t-se ও বুদ্ধের ভক্ত হয়ে উঠেছে।

৮

এখন এর উত্তরে Jaloux কি বলেন শোনা যাক্। তিনি বলেন যে, মাসির রচনাচাতুর্য্য এতই অপূর্ব্ব এবং তাঁর চিন্তা এতই সুশৃঙ্খলিত যে, তাঁর লেখা প্রথমেই মনকে অভিভূত করে। এবং তখন মনে হয় যে, তাঁর সকল কথাই ত সত্য। লেখক হিসেবে মাসির শক্তির মূলে আছে তাঁর ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি জিনিষে অটল বিশ্বাস। তাঁর মনে কোনরূপ সন্দেহ নেই। যার মনে কোনরূপ দ্বিধা নেই, সে ব্যক্তির অদম্য শক্তির পরিচয় কর্ম্মজগতেও যেমন পাওয়া যায়, মনোজগতেও তেমনি। কিন্তু আমাদের মন যখন নানা বিষয়ে সন্দেহ-দোলায় দোলায়মান, তখন মাসির কথার মোহ কেটে গেলেই আমাদের মনে নানারূপ প্রশ্ন ওঠে। তিনি আমার মনে যে সকল জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করেছেন, একে একে সেগুলি প্রকাশ করছি।

ইউরোপের বর্ত্তমান মনোভাব দেখে মাসি যে ভয় পেয়েছেন, সে ভয় অকারণ নয়। বর্ত্তমান ইউরোপের লোকের প্রকৃতি যে মনুষ্যত্বহীন হয়ে পড়ছে, এ বিষয়ে আমরা সকলেই একমত। এমন কি ইউরোপের যে-দলের লোক সব চাইতে জ্ঞানান্ধ—অর্থাৎ politician-রা—গত যুদ্ধের ধাক্কা পেয়ে তারাও চোখ মেলে দেখছে যে, যাকে তাঁরা ইউরোপীয় সভ্যতা বলে, তার অন্তরে ঘুণ ধরেছে। কিন্তু আমাদের এই অধোগতির জন্য এসিয়া কি হিসেবে দায়ী, তা ঠিক বোঝা গেল না।

এসিয়ার কথা মনে করতে মাসির মন কি জন্য আতঙ্কে ভরে ওঠে? তিনি কি ভয় পান্—এসিয়া আমাদের বাহুবলে পঙ্গু করবে, না মন্ত্রবলে নির্জ্জীব করবে? তার ভয়টা পলিটিকাল না দার্শনিক?—মাসি হয় ত উত্তরে বলবেন যে, মানুষের দার্শনিক মনোভাবের সঙ্গে পলিটিকাল মনোভাবের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ।

দার্শনিক মনোভাবের সঙ্গে পলিটিকাল মনোভাবের যে একটা সুদূর ও অস্পষ্ট যোগাযোগ আছে, এ কথা স্বীকার করলেও আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, দার্শনিক মন ও পলিটিকাল মন সম্পূর্ণ বিভিন্ন। জ্ঞান ও কর্ম্মের অভেদ জ্ঞান আমার আজও হয় নি। সে যাই হোক, পলিটিকাল হিসাবে এসিয়া ইউরোপের স্কন্ধে ভর করবে কি না, সে বিষয়ে কোনরূপ মত দিতে আমি সম্পূর্ণ অপারগ। কারণ এত অসংখ্য ও অজ্ঞাত ঘটনার সমবায়ের উপর এই দুই ভূভাগের পলিটিকাল ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে যে, ভবিষ্যতে ইউরোপ যে এসিয়ার দাস হবে, এ ঘটনা ঘটা যেমন সম্ভব, তেমনি অসম্ভব। আর যদিই বা তাই হয়, তাহলেই যে সৃষ্টির ধ্বংস হবে, তা ত মনে হয় না।

ও সব ভাবনা ভাবতে গেলে মানুষের দার্শনিক মন ঘুলিয়ে যায়। সুতরাং ইউরোপের পলিটিকাল সমস্যার মীমাংসা পলিটিসিয়ানরা করুন; আমরা মাসি মহোদয় যে দার্শনিক বিপদের কথা বলেছেন তারই বিচার করব।

৯

জার্ম্মাণী ও রুষিয়ার এসিয়াটিক্ মনোভাবের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক্। মাসি হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু দর্শনের যে পরিচয়

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

দিয়েছেন, সংক্ষেপে তারই বিচার করা যাক। সংস্কৃত শাস্ত্র ও সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় আমারও নেই, মাসিরও নেই। আমরা উভয়েই গ্রীক দর্শন ও গ্রীক সাহিত্যেই শিক্ষিত হয়েছি। তবুও জিজ্ঞাসা করি—তিনি হিন্দু মনোভাব সম্বন্ধে তাঁর মতামত কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন? ঋগ্বেদ থেকে, না গান্ধীর কাছ থেকে, না Romain Rolland-র বই পড়ে? তিনি যার কাছ থেকেই তা সংগ্রহ করুন, তিনি হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুদর্শনের যে বর্ণনা করেছেন, তা হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু দর্শনের সংক্ষিপ্ত সার ত নয়ই, এমন কি তা Caricature পর্য্যন্ত নয়। এমন কথা আমি বলতে সাহসী হয়েছি, কারণ বুদ্ধের বাণী আমার কানে লেগে আছে। আমি ফ্রান্সের সেই intellectual দলের অন্যতম, যাদের অন্তরে বুদ্ধ-বচন বিশেষ করে ঘা দেয়। মাসি আরও বলেন, সংস্কৃত সাহিত্যের ভিতর সে-রস নেই, যে-রস বিশ্বমানবের মন সরস করতে পারে। আমরা দেশশুদ্ধ লোক যে, হিন্দু সভ্যতা ও হিন্দু সাহিত্য সম্বন্ধে উদাসীন, তার জন্য দায়ী ইউরোপের Orientalist-রা। এই Orientalist-দের দল দার্শনিকও নয়, 'আর্টিষ্ট'ও নয়; তাঁরা প্রায় সকলেই philologist মাত্র। কাজেই এই সব পণ্ডিতের লেখা তাঁদের সমব্যবসায়ী পণ্ডিতের দলেরই পাঠ্য। আর এঁরা যখন philology ছেড়ে হিন্দু সভ্যতার ব্যাখ্যান সুরু করেন, তখনই ধরা পড়ে যে, কোনও বড় জিনিষ এঁদের ধারণার বহির্ভূত। উদাহরণ স্বরূপ আমাদের একজন বড় Orientalist, Sylvain Levi-র কথা ধরা যাক্। Levi বলেছেন যে, হিন্দু দর্শন ও হিন্দু সাহিত্যের, ভারতবর্ষের বাইরে কোনও সার্থকতা নেই। তার ভিতর এমন কিছুই নেই, যা সকল দেশের সর্ব্বকালের মানুষের মনকে উন্নত করতে ও আনন্দদান করতে পারে; যেমন পারে গ্রীক সাহিত্য। আমি জিজ্ঞাসা করি—এ সব কথার কি কোনও অর্থ আছে? হোমারের ইলিয়াড যদি সকলের মনের জিনিষ হয়, তবে বাল্মীকির রামায়ণই বা তা হবেনা কেন? রামায়ণ যে কাব্য হিসেবে সত্য-সত্যই একটি মহাকাব্য, তা উক্ত কাব্যের সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে তিনি কখনই অস্বীকার করতে পারবেন না; অবশ্য কাব্য কাকে বলে, সে সম্বন্ধে যদি তাঁর কোনরূপ ধারণা থাকে। আমরা যে ইলিয়াডের এতদূর ভক্ত, তার কারণ ছেলেবেলা থেকে আমরা তা পড়তে বাধ্য হয়েছি। হোমার পড়া আমাদের কলেজী শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ। আর রামায়ণের উপর আমাদের যে কোনও ভক্তি নেই, তার কারণ—রামায়ণ আমাদের কেউ পড়ায় নি, আমরাও অধিকাংশ লোক তা পড়িনি। গ্রীক সাহিত্যের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আছে, কেননা সে সাহিত্য আমরা জানি; আর ছেলেবেলা থেকে সে সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা আমাদের গুরুরা আমাদের মনে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। মাসি যে Sylvain Levi-র মত Orientalist-দের কথায় আস্থা স্থাপন করে ভারতবর্ষীয় সভ্যতার বিচার করেছেন, তাতেই তিনি তার উপর অবিচার করতে বাধ্য হয়েছেন। গ্রীক মন উদার আর হিন্দু মন সঙ্কীর্ণ, এমন কথা বলায় ইউরোপীয় মনের উদারতা নয়, সঙ্কীর্ণতারই পরিচয় দেওয়া হয়।

১০

এখন হিন্দুদর্শনের কথা ধরা যাক্। Massis-র বিশ্বাস যে, ইদম্ এবং অহংয়ের অভেদ জ্ঞানের নিরাকার ভিতের উপরই হিন্দু সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত। এতবড় একটা metaphysics-এর মতবাদ যে ভারতবর্ষের সর্ব্বলোকসামান্য, এ কথা মানা কঠিন। কারণ অধিকাংশ লোক দ্বৈতবাদ কিম্বা অদ্বৈতবাদের চূড়ান্ত মীমাংসা করে তারপর জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতে আরম্ভ করে না! ধরে নেওয়া যেতে পারে পৃথিবীর অপর দেশেও যেমন, ভারতবর্ষেও তেমনি metaphysics-এর সমস্যা আছে শুধু metaphysicians-দেরই কাছে। অন্যান্য দেশেও যেমন, সে দেশেও তেমনি সভ্যতা গড়ে উঠেছে বহুবিধ মানব মনোভাবের উপর। যে ধর্ম্মমতকে মাসি ইউরোপীয়দের একচেটে মনে করেন, আমার বিশ্বাস ভারতবর্ষেও তার সন্ধান মিলবে। একদেশের লোক যে আগাগোড়া কর্ম্মযোগী, আর অপর এক দেশের লোক যে আগাগোড়া জ্ঞানযোগী, এরকম রূপকথায় ছোট ছেলেরাই শুধু বিশ্বাস করে। আর যদি তাই হয় ত, ইউরোপের জন্য Massis-র কোনও ভয় নেই। ইউরোপের সব লোক—মায় কুলিমজুর, পলিটিসিয়ান, কলওয়ালা—সবাই যে জ্ঞানযোগী হয়ে উঠবে, তার কোনও সম্ভাবনা নেই। বর্ত্তমান ইউরোপ

যে তার পূর্ব্ব spiritual সভ্যতা থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে তার কারণ, তারা সব অতিমাত্রায় materialism-এর ভক্ত হয়ে উঠেছে। *সুতরাং তারা যে আবার হিন্দু spirituality-র* বশবর্ত্তী হবে তার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই—সম্ভাবনা আছে শুধু আর এক বিপদের। সে বিপদ এই যে, নবীন এসিয়ার লোক সব নকল ইউরোপীয়ান হয়ে উঠবে। আমাদের ব্যবহার দেখে ও আমাদের দত্ত শিক্ষাদীক্ষা লাভ করে, তারাও সব পলিটিক্স্ ও industrialism-এর মহাভক্ত হয়ে উঠবে, আর তখন বুদ্ধদেবের বাণী এসিয়ার কোনও লোক আর প্রচারও করবে না, কেউ তার প্রতি কর্ণপাতও করবে না। ইউরোপই এখন এসিয়ার মনকে বিপর্য্যস্ত করছে; এসিয়া বেচারা ইউরোপের মন ঘুলিয়ে দিচ্ছে না।

১১

ইউরোপে বুদ্ধদেবের বাণী মর্ম্মস্পর্শ করেছে শুধু জনকতক সাহিত্যিকের ও আর্টিষ্টের। এ জাত ইউরোপের সর্ব্বনাশ করবে না, কারণ তাদের এই জ্ঞানটুকু আছে যে তারা ইউরোপের ভাগ্যনিয়ন্তা নয়। ইউরোপের এ যুগের ভাগ্যনিয়ন্তা হচ্ছে সব বুদ্ধিপৌরুষহীন পলিটিসিয়ান ও কলকারখানার মালিক; আর গুরুপুরোহিত হচ্ছে সেই দলের লোকেরা, যারা বিজ্ঞানদর্শনের বড় বড় কথার দোহাই দিয়ে মানুষের সর্ব্বপ্রকার প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করে। সুতরাং আমাদের মত সাহিত্যিক ও আর্টিষ্টদের মনোভাবের কোনও প্রভাব এ সমাজের উপর হবে না।

বর্ত্তমান ইউরোপ যে নীচাশয়তার পঙ্কে নিমগ্ন হয়েছে, এ বিষয়ে আমরা সকলেই একমত। এ পাঁক থেকে ইউরোপের মনকে কে টেনে তুলবে? Massis-র বিশ্বাস Roman Catholic Church। ইউরোপের মন কামনার বিষে জর্জ্জরিত, সুতরাং তার মন থেকে কামিনী-কাঞ্চনের উন্মত্ত কামনা দূর করতে না পারলে তাকে আবার সুস্থ সবল করতে পারা যাবে না। Massis-র বিশ্বাস এ রোগের চিকিৎসক হচ্ছে Church, কারণ Church-এর মূলমন্ত্র হচ্ছে ত্যাগ (renunciation)। Church যে আবহমান কাল ত্যাগের ধর্ম্ম প্রচার করেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু তা করেছে শুধু আংশিক ভাবে। Church-এর ত্যাগধর্ম্মের ভিতর অনেকখানি বিষয়বুদ্ধির ভেজাল চিরকাল ছিল, আজও আছে। পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র জাত শুধু পূর্ণ ত্যাগধর্ম্মের মহিমা স্পষ্টাক্ষরে প্রচার করেছে। বুদ্ধ মানুষের শুধু ঐহিক নয়, পারলৌকিক অভ্যুদয়ের বাসনাকেও নির্ম্মূল করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন; হিন্দু দার্শনিকরাও তাই করেছেন। বুদ্ধের বাণী যদি ইউরোপীয় সামাজিক লোকের মনে বসে, তাহলে তারা বৌদ্ধ হবে না, হবে শুধু Massis-র আদর্শ খৃষ্টান।—ইউরোপের মনকে যদি বৌদ্ধধর্ম্মের বরফজলে নাইয়ে তোলা যায়, তাহলে সে মন আবার সুস্থ সবল ও সুন্দর হবে।

১২

আমি যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে ছুটি করাসী সাহিত্যিকের পূর্ব্ব-পশ্চিম সম্বন্ধে মতামত লিপিবদ্ধ করলুম। পাঠকমাত্রেই দেখতে পাবেন যে, এঁরা কেউ নির্ব্বোধ নন। শুধু Massis হচ্ছেন বীরপ্রকৃতির লেখক, আর Jaloux শান্তপ্রকৃতির।

এখন আমার বক্তব্য এই যে, মাসির ভয় সম্পূর্ণ অমূলক, আর Jaloux-র ভয়ই সকারণ। বর্ত্তমান ইউরোপের মনে প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের ছোপ লাগবার কোনই সম্ভাবনা নেই। "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা"—এ কথা ইউরোপের কানে ঢুকবেনা। বর্ত্তমান ইউরোপের materialism-ই নবীন এসিয়ার মনকে মুগ্ধ করতে পারে। কারণ এ materialism দার্শনিক materialism নয়, কিন্তু ব্যবহারিক materialism। এ materialism সাংখ্য দর্শনের "প্রধান বাদ" নয়, চার্ব্বাকদর্শনের প্রধান কথা; এবং চার্ব্বাকের মতে "নীতিকাম শাস্ত্রানুসারেণার্থ কামাদেব পুরুষার্থৌ"। এ নীতির মানে পলিটিক্স্ এবং ইকনমিক্স্। আর এ মত যে সর্ব্বলোকসামান্য তা প্রাচীন হিন্দুরা জানতেন এ মতকে তাঁরা "লোকায়ত" বলেছেন।

ঘরের কথা



—গল্প—

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

আমরা যাকে অবতার বলি, সেই সেদিন "ঘরে বাইরে"র কথাটা পাড়লে।

সমীর ছাদে ব'সেই কথা হচ্ছিল। আমাদের গলির উনিশটা ভদ্র পরিবারের উনিশটা অতীব-ভদ্র ড্রয়িং-রুমের আবহাওয়ার বাইরে ছিল সমীর এই ছাদ। এই ছাদের আকর্ষণে যারা আসত, তারা এই গলির উনিশটা পরিবারের সঙ্গে কোন-রূপেই সংশ্লিষ্ট ছিল না—শুধু আমি আর নরেশ ছাড়া।

নরেশ আমাদের বাল্যবন্ধু হ'লেও পাড়ায় ছিল নবাগত। আমাদের উনিশটা পরিবারের তথাকথিত সম্ভ্রম-নিষ্ঠা তাকে তখনও অভিভূত ক'রতে পারেনি আর আমাকেও যতটুকু ক'রেছিল তা' সমী-র পরিহাসের আওতায় বেশী বাড়তে পায়নি। সেই জন্যই সমী-র বাড়ী যাওয়া-আসাতে এই উনিশ-জোড়া ভ্রু'র সঙ্কোচন প্রসারণ আমাদের দু'জনকে বিশেষ বিচলিত ক'রতে পারত না।

"ঘরে বাইরে" তখন সবে বেরিয়েছে। তার অদ্ভুত সমালোচনাও তখন আরম্ভ হয়েছে। সেগুলো যে ব্যক্তিগত ঈর্ষ্যার বিষ উদ্গীরণ মাত্র——সে বিষয়ে আমরা সকলেই একমত ছিলুম। অতএব আলোচনাটা ওদিক দিয়ে বেশী অগ্রসর হয়নি। হচ্ছিল একটা বিশিষ্ট দিক নিয়ে। অর্থাৎ—

নিখিলেশের অবস্থায় প'ড়লে আমরা কে কি ক'রতুম—এইটেই ছিল আলোচ্য।

কথাটা প্রথম পাড়লে আমরা যাকে অবতার বলি, সে।

বলা বাহুল্য, সমীর বাড়ীতে খোলাখুলি ভাবে নিজের মতামত ব্যক্ত ক'রতে কারুর কোনো বাধা ছিল না। অনিচ্ছাতো ছিলই না।

কথাটা পাড়তে আমাদের মধ্যে একজন দু'দিক বজায় রেখে ব'ল্লে——ও অবস্থাটা যাতে না ঘটে গোড়া থেকে তারই চেষ্টা ক'রতুম। তবে যদি নিতান্তই ঘ'টত, তা'হলে বোধ হয় নিখিলেশের মতন ব্যবহারটা স্বভাবতই এসে প'ড়ত।

আর একজন তাকে সমর্থন ক'রে ব'ল্লে———বাস্তবিকই যে-কোনও আত্মসম্মান-বিশিষ্ট স্বামীর পক্ষে ও-রকমটা ছাড়া অন্য কোনো রকম ব্যবহার অসম্ভব হ'ত।

চায়ের শূন্য পেয়ালা টেবিলে রেখে আমাদের তৃতীয় বন্ধুটী ব'ল্লে—ও-অবস্থাটা হৃদয়ঙ্গম ক'রতে আমার চায়ের চেয়েও কিছু জোরালো পানীয়ের দরকার হ'ত। তার পরে যে কি ক'রতুম বলা শক্ত।

অবতার নিজেই তখন আস্তিনটা গুটিয়ে ব'ল্লে—ও অবস্থায় প'ড়লে আমি প্রথম সন্দীপকে আচ্ছা ক'রে চাবকে দিতুম আর বিমলাকে বেশ ভাল ক'রেই বুঝিয়ে দিতুম—বাইরের মালিক যিনিই হোন্, ঘরের মালিক হচ্ছি আমি।

সমী আধখোলা চোখে আরাম কেদারায় শুয়ে চুপ ক'রে শুনে যাচ্ছিল। এতক্ষণ পরে ব'ল্লে—অবস্থাটা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু নিখিলেশের ও-রকমটার জন্যে আগে হ'তেই প্রস্তুত থাকা উচিত ছিল। বোধ হয় সে তা' চেষ্টাও ক'রেছিল। নারী-চরিত্র নিয়ে যারা

গবেষণা ক'রেছেন, তাঁরা এর ভিন্ন ভিন্ন রকমের ব্যাখ্যা করেন। যেমন, ল্যুদোভিচির মতে—

সমীর কথাটা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক—আমাদের আলোচনার গণ্ডীর বাইরে। তাই কথাটা শেষ হবার আগেই তাকে জানিয়ে দেওয়া হ'ল যে ল্যুদোভিচির মতামত শোন্‌বার জন্যে আমরা এতটুকুও আগ্রহান্বিত নই এবং এ বিষয়ে সমীর মতো অবিবাহিত লোকের মতামত প্রকাশ আমরা ধৃষ্টতা ব'লেই মনে করি।

বলা বাহুল্য, আমাদের মধ্যে সমীই ছিল একমাত্র অবিবাহিত।

কিছু মাত্র অপ্রস্তুত না হ'য়ে সম্পূর্ণ উদাসীনভাবে সমী তার চুরোটিকায় মনোনিবেশ ক'রলে।

নরেশ তার স্বভাবসিদ্ধ শান্ত স্বরে তখন ব'ল্‌লে—দেখ, ও-রকম অবস্থাটা যে নিছক কবি কল্পনা, তা' নয়। আমাদের সমাজের এই দ্রুত-পরিবর্ত্তমান যুগে ও-রকম ঘটনা অনেক ঘটে যার সবগুলোই ইতিহাসে ওঠে না। যত বিরল মনে করা যায়, তত নয়।

সে বিষয়ে আমাদের মতদ্বৈধ ছিল না। নরেশ ব'লে যেতে লাগল—আর ও-রকম অবস্থায় প'ড়লে কে কিরূপ ব্যবহার ক'রবে, তা' কেউ—এমন কি অতি সাবধানী স্বামীও—আগে থাকতে ভেবে নিতে পারে না। কতকটা তার স্বভাব-চরিত্র, শিক্ষা-দীক্ষার উপর নির্ভর করে সত্য, কিন্তু সবটা নয়। এর ভিতর এমন কতকগুলো ফ্যাঁকড়া আছে যাদের সঙ্গে একমাত্র কার্য্য-ক্ষেত্রেই বোঝাপড়া হ'তে পারে। নিজের ব্যবহারে নিজেই অনেক সময় আশ্চর্য্য হ'য়ে যেতে হয়। আমি জানি—কেননা আমি নিজে ভুক্তভোগী।

ঠিক এ রকমটার জন্যে প্রস্তুত ছিলুম না। তাই নরেশের কথা আমাদের সকলকেই কতকটা আশ্চর্য্য ক'রে দিলে। চৈত্র-সন্ধ্যার ঘনিয়ে-আসা অন্ধকারে আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি ক'রতে লাগলুম।

নরেশের স্ত্রী লীনাকে যে আমরা সকলেই চিনি। আমাদের পাড়ায় নবাগত হ'লেও লীনা ইতিমধ্যেই তার সৌজন্যে ও আতিথেয়তায় আমাদের সকলেরই মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক ক'রেছিল। এ আলোচনার মধ্যে তাকে টেনে আনা—

নরেশ আমাদের মনোভাব বুঝতে পেরে ব'লে উঠল—ঠিক ও রকমটা নয় আর অতটাও নয়। অন্ততঃ ব্যাপারটা যে ট্র্যাজেডিতে পরিণত হয়নি, এটাতো স্বীকার কর?

সেটা অস্বীকার করবার জো নেই। নরেশের পুত্র-কন্যা-পরিবেষ্টিত নিবিড় সুখের সংসারটী আমাদের অনেকেরই আদর্শ ছিল। আজ রাত্রেতো সেখানেই আমাদের খাবার নিমন্ত্রণ আছে।

নরেশ আরও ব'ললে—ব্যাপারটাতে ট্র্যাজেডির উপাদান বিশেষ কিছু ছিল না। তবুও সমস্যা জিনিষটার যতক্ষণ না সমাধান হয় ততক্ষণ সেটা সমস্যাই থেকে যায় এবং যে-কোনও মুহূর্ত্তে সেটা ট্র্যাজেডিতে পরিণত হ'তে পারে। কিন্তু আগাগোড়া না শুন্‌লে তোমরা সব বুঝতে পারবে না।

চৈত্র সন্ধ্যা ইতিমধ্যে রাত্রে পরিণত হ'য়েছিল। আকাশে চাঁদ ছিল না, কিন্তু বাতাসে মাদকতা ছিল। সমীর চিরপরিচিত ছাদের উপর কতকগুলো চীনেবেতের আরাম-কেদারায় শুয়ে আমরা নরেশের গল্প শোনবার জন্যে প্রস্তুত হলুম। টিপয়ে রাখা ছাইদানি, চুরোটিকাধার এবং হুইস্কির ক্রমশূন্যায়মান ডিক্যাণ্টার অন্ধকারের মধ্যে মাঝে মাঝে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ ক'রছিল।

নরেশ ব'লে যেতে লাগ্‌ল——

ডাক্তারি পড়া সুরু করবার কিছু পর থেকেই তোমাদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি। তার বছর তিন পরেই বিলেত যেতে হ'ল। ইতিমধ্যেই আমার বিবাহ হ'য়ে গিয়েছিল এবং পুত্রমুখ দেখ্‌বারও সৌভাগ্য হ'য়েছিল। বিলেতে কিছুদিন থাকতেই স্ত্রীপুত্র উভয়েরই সংক্রামক ন্যুমোনিয়ায় মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে মনের অবস্থাটা কি রকম হ'ল বুঝতেই পার। পাশ করবার পর সেখানেই একটা হাঁসপাতালে কাজ জুটল। দেশে ফেরবার মতন মানসিক অবস্থা হ'তে আরও বৎসর কয়েক কেটে গেল।

বিবাহ করবার আর ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু দেশে ফিরে দেখলুম বিবাহ না ক'রলে ডাক্তারের পক্ষে পসার জমানো বড় শক্ত ব্যাপার। ঠিক বিলেতেরই মতো। কিন্তু

ঘরের কথা

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

একটা জিনিস দেখলুম যা' বিলেতের মত মোটেই নয়। সেখানে অবিবাহিত ডাক্তারের পসারে ঘা প'ড়লেও তা'র অবসর-যাপনে বিশেষ কোন অসুবিধা ভোগ ক'রতে হয় না। এখানে তা' নয়। এখানকার সামাজিক আবহাওয়ায় আমার নিঃসঙ্গতা আমার কাছে বড় বেশী পরিস্ফুট হ'য়ে উঠতে লাগল। সারাদিন খেটে এসে বিরল সন্ধ্যায় দু'খানি কল্যাণ হস্তের সেবা যত্ন পেতে মনটা এক-এক সময় বড়ই চঞ্চল হ'য়ে উঠত, কিন্তু নিজের কাছেও অনেক সময় সেটা স্বীকার ক'রতে লজ্জা বোধ হ'ত। ওটা একটা সাময়িক দুর্ব্বলতা ব'লেই মনকে প্রবোধ দিতুম।

এই রকম ক'রে বছর দুয়েক কাটবার পর বুঝলুম--মনকে ফাঁকি দেওয়া চলে না। আরও দেখলুম মনটা সত্যিই যা' চায়, বাইরে তার আয়োজনের অপ্রতুল হয় না। সমাজের যে-স্তরে আমার পসার গ'ড়ে উঠছিল, সেখানে বিবাহযোগ্যা কন্যার অভাব ছিল না আর পরোপকারী বন্ধু তো সমাজের সর্ব্বস্তরেই বিরাজমান। অতএব লীনার সঙ্গে সম্বন্ধ ঠিক হ'তে বিশেষ কিছু বেগ পেতে হ'ল না। লীনা সুন্দরী এবং শিক্ষিতা। সকলেই ব'ললে—সর্ব্বাংশে আমার উপযুক্ত। আমিও পৌরুষগর্ব্বে সেটা নির্ব্বিবাদে মেনে নিলুম। যেমন হ'য়ে থাকে, পূর্ব্বরাগের একটা ঠাট বজায় ছিল মাত্র, বিশেষ কোন আয়োজন ছিল না। কথাবার্ত্তা ঠিক হ'য়ে যাবার পর লীনার সঙ্গে একটু আলাপের সুযোগ পেয়েছিলুম—এই যা'। সেই সুযোগের অবসরে আমার ভাবী স্ত্রীকে স্পষ্ট ক'রে জানিয়ে দিলুম তাকে যে বিবাহ ক'রছি সে আমার পসারের খাতিরে। এই ইতর কাপুরুষোচিত উক্তিটা সে-সময় বীরত্বব্যঞ্জক বলেই মনে হ'য়েছিল। বিবাহ ঠিক হ'য়ে যাবার পর, কেন জানি না, মনটাতে একটা বিষম বিরক্তি ভাব এসেছিল। এটা তারই প্রকাশক। মনে হচ্ছিল রোমান্স জিনিসটা আমার প্রথমা স্ত্রীর সঙ্গেই শেষ হ'য়ে গেছে। দ্বিতীয় বার বিবাহ নিতান্ত সুখ-সুবিধার জন্যই। তারির বদলে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে অর্থ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং সামাজিক প্রতিপত্তি দিতে পারলেই যথেষ্ট। ভাগ্য এবং অবস্থা এ বিষয়ে আমার অনুকূল ছিল। আমার ভাবী স্ত্রী সমস্ত শুনে ভাল-মন্দ কোন মন্তব্যই প্রকাশ ক'রলে না। তখন জানতুম না যে এর ফল—কিন্তু আগে থাকতে তা ব'লে কি হবে?

স্ত্রী যে স্বামীর কাছ থেকে আরও বেশী কিছু চায় তা' বুঝলুম বিবাহের মাসকতক পরে। কিন্তু সেটা যে কী তা' ঠিক বুঝতে পারিনি তখনও। মিলনের মোহটা কেটে গিয়ে যখন প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হ'ল তখন তা'র হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলুম নিজেকে বাইরের কাজে ব্যাপৃত রেখে। ভেবে চিন্তে নয়, আমার ভাগ্য দেবতা এ বিষয়ে আমার সাহায্য ক'রেছিলেন। সেইজন্যে যেটুকু সময় লীনার সঙ্গে কাটাতে পেতুম সেটুকু খুব নিবিড় ভাবেই উপভোগ করতুম। কিন্তু এ উপভোগটা ছিল আত্মসর্ব্বস্বতায় ভরা। লীনার প্রচুর অবসর যে কি ক'রে কাটে সে ভাবনা তখনও পর্য্যন্ত আমাকে চঞ্চল করেনি। কতকগুলো ব্যাপারে সেটা আমার কাছে পরিস্ফুট হ'য়ে উঠল।

গৃহে দাসদাসীর অভাব ছিল না, তবু হঠাৎ দেখলুম লীনা রান্না এবং ভাঁড়ার ঘরের খুঁটিনাটিতে নিজেকে জড়িত ক'রে ফেলেছে। সামাজিক ব্যাপারে নিজেকে প্রতিষ্ঠাপন্ন করবার আগ্রহ লীনার মোটেই ছিল না; হঠাৎ দেখে আশ্চর্য্য হলুম যে কোথাও যাবার কথায় লীনার উৎসাহ আর বাধা মানতে চায় না—নিতান্ত লৌকিকতার নিমন্ত্রণ যেখানে আমাদের অনুপস্থিতি কারুর লক্ষ্যগোচর হবে না.—এমন-সব জায়গাতেও যাবার ইচ্ছা শত অসুবিধা সত্ত্বেও লীনা দমন ক'রতে পারত না। তখন মনে করতুম এগুলো নারীসুলভ দুর্ব্বলতা—সদ্য-বিবাহিতা বধূর পোষাক এবং গহনা দেখাবার লোভ মাত্র। তবু মনটা ক্ষুণ্ণ হ'য়ে উঠত। আমার বিরল অবসরটুকুতেও লীনাকে অনেক সময় কাছে পেতুম না—নিতান্ত অদরকারী কাজে ভাঁড়ার-ঘরে ব্যাপৃত দেখতুম নয়ত নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকেই তাকে নিমন্ত্রণ সভায় নিয়ে যেতে হ'ত। মনে এক-এক সময় অভিমান হ'ত, আমি তাকে যেমন ক'রে চাই, সে আমাকে তেমন ক'রে চায় না কেন? বাইরের কাজের মধ্যে সান্ত্বনা খোঁজবার চেষ্টা করতুম।

এমন সময় কাথিওয়াড়ে আমার ডাক প'ড়ল—এক দেশীয় রাজ্যের যুবরাজের চিকিৎসার জন্যে। তিন

সপ্তাহের জায়গায় সেখানে তিন মাস কেটে গেল। লীনা এই সময়টা তা'র আত্মীয়দের কাছেই ছিল।

এই তিন মাস—সত্য কথা ব'ল্‌তে কি—একটু হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলুম। লীনার চিঠি প্রথম প্রথম রোজই পেতুম। তারপর ক্রমশঃ সময়ের ব্যবধানটা বেড়ে যেতে লাগল। এতে আমার অনুযোগ করবার কিছু ছিল না, কেননা আমি নিজে চিঠির উত্তর দেওয়া সম্বন্ধে ঠিক নিয়ম পালন ক'রতে পারতুম না—কতকটা কাজের ভিড়ে এবং কতকটা জন্মগত আলস্যের দরুণ। অনুযোগ করবার মতো মনোভাবও আমার ছিল না কেননা লীনার শেষদিক্‌কার চিঠিগুলো অনিয়মিত হ'লেও আকারে বেশ বড় হ'ত। তাতে অনেক রকম কথা থাকৃত—কার্ কার্ সঙ্গে আলাপ হ'য়েছে কোথায় কোথায় যাওয়া হ'য়েছে, নিমন্ত্রণ-সভার চেনা-অচেনা সুন্দরীদের রূপ এবং পোষাক বর্ণনা, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু বান্ধবদের ভাল-মন্দ বিবরণ—সবই তাতে থাকৃত।

এই চিঠিগুলো থেকে জানলুম- লীনার সঙ্গে এই ক'সপ্তাহে অনেকের আলাপ হ'য়েছে। তা'র মধ্যে লীনার জ্ঞাতিভ্রাতা বুটিদা'র বন্ধুবর্গের বর্ণনা আমাকে খুব আমোদ দিত। শ্বশুর-গৃহের এই বুটিদা'টার উপর আমার একটু টান ছিল- তবে সেটা যতটা স্নেহের ততটা শ্রদ্ধার নয়। এ-গল্পের সঙ্গে তা'র এত কম সম্পর্ক যে তা'র বেশী পরিচয় দেবার দরকার নেই। এইটুকু ব'ল্‌লেই যথেষ্ট হবে যে, শত দোষ সত্ত্বেও লীনার তা'র উপর একটা নির্ভরতার ভাব ছিল আর সেও লীনাকে কতকটা স্নেহ-চক্ষে দেখ্‌ত। তবে এ লোকটার দায়িত্ব জ্ঞান একেবারে ছিল না ব'ল্‌লেই হয়।

বুটিদা' কতকগুলো কর্ম্মহীন যুবককে চরিয়ে নিয়ে বেড়াত—কি উদ্দেশ্যে তা' কখনো খোঁজ করবার দরকার বোধ করিনি। লীনা এই দলটাকে একটু মমতার চক্ষে দেখেছিল,—তার চিঠিতে এদের বিষয়ে কৌতুক-উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে একটা করুণ সহানুভূতির আভাসও পেতুম। এদের নিয়ে লীনার একটু সময় কাটাবার সুবিধা হ'য়েছে জেনে আমিও কতকটা আশ্বস্ত হতুম।

কা'লকাতায় ফিরে এই দলটার সঙ্গে আমার পরিচয় হ'ল। এই দলের মধ্যমণি ছিল খদ্যোৎ। তা'র পরিচয় দিলেই দলের আর কারুর পরিচয় দেবার দরকার হবে না, কেননা আর সকলে এই খদ্যোতেরই কম বেশী প্রতিরূপ ছিল মাত্র।

খদ্যোৎ লোকটা ছিল হ'লে-হ'তে-পারত রকমের। অর্থাৎ তার বড়-একটা কিছু হওয়া হ'ল না—পৃথিবীশুদ্ধ লোকের ষড়যন্ত্রে। কবি, আর্টিষ্ট, পাটের ফড়িয়া, রাজনীতি-ওয়ালা, অভিনেতা, উকীল, ইন্‌সিওরেন্সের দালাল—এর যে কোন একটা এবং খুব বড় একটা হ'তে পারত—শুধু হ'ল না ওই ষড়যন্ত্রের ফলে। এমন ষড়যন্ত্র কেউ কখনো দেখেনি। তার শত্রু অনেক—ঘরে এবং বাইরে। এই কথাটা সে এমন বিনিয়ে বিনিয়ে ব'ল্‌ত যে প্রথম প্রথম তাকে দয়া না ক'রে থাকতে পারা যেত না। নারীর মন তো ভিজ্‌বেই। বিশেষ ক'রে লীনার মনটা ছিল স্বভাবতই কোমল, দয়াপরায়ণ।

সাধারণ মেস্‌পালিত যুবকের একটা সামাজিক আড়ষ্ট ভাব থাকে, খদ্যোতেরও তা' ছিল। কিন্তু একটু রকম-ফেরও ছিল। সে পাঁচজনের কথাবার্ত্তায় যোগ দিতে পারত না সত্য, কারুর মুখের দিকেও ঋজুভাবে চাইতে পারত না, কিন্তু লীনাকে একটু একলা পেলে তা'র আড়ষ্টভাব ঘুচে যেত। তবে সকলের কানের আড়ালে জানলার কাছে না গেলে তা'র মুখ ফুট্‌ত না, নয়ত ঘরের এক কোণে বই প'ড়বার অছিলায় লীনার কাছে সে তা'র মনের কবাট খুল্‌ত। সে যে কী ব'ল্‌ত তা' জানি না এবং লীনাকে কখনো জিজ্ঞাসাও করিনি। পরে জেনেছিলুম লীনার দুর্ব্বলতা সে বেশ বুঝ্‌তে পেরেছিল। নিজের তথাকথিত দুর্ভাগ্যের কথা ব'লে সে একদিক থেকে লীনার মনে দয়ার উদ্রেক ক'রতে চেষ্টা ক'রত, আর একদিক থেকে লীনাকে বোঝাত যে সে তা'রই প্রেরণায় এতদিন পরে জীবনে একটা নির্দ্দিষ্ট পথ খুঁজে পেয়েছে। লীনার অনভিজ্ঞ নারীহৃদয় এতে গর্ব্বিত না হ'য়ে থাক্‌তে পারত না।

খদ্যোতের ভিতরে একটা মনুমেন্ট-প্রমাণ আত্মম্ভরিতার ভাব ছিল। সেটা তা'র বাহ্য দীনভাবের আবরণে সাধারণত

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

ঢাকা থাকৃত। একটু ঘনিষ্ঠ আলাপেই সেটা প্রকাশ পেত। আমার সঙ্গে আলাপের দিনকয়েক পর থেকেই তা'র আড়ষ্টভাবের বদলে সপ্রতিভ ভাবটাই বেশী ক'রে নজরে প'ড়তে লাগ্‌ল। এতে আশ্চর্য্য হই নি, কেননা আমার সঙ্গে আলাপের অনেক দিন আগেই লীনার সঙ্গে সে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পেয়েছিল। লীনার কাছে উৎসাহ পেয়ে তার এই সপ্রতিভ ভাবটা কত শনৈঃ শনৈঃ বেড়ে উঠ্‌ছিল, তা' একটা দিনের সামান্য কথাবার্ত্তা থেকেই বুঝতে পারা যাবে।

একদিন থিয়েটারী ঢঙে ঘরে ঢুকে খদ্যোৎ ব'ল্‌লে—নরেশ বাবু, আমাকে এমন একটা ওষুধ দিতে পারেন, যা' খেলে আমার মনোহারী শক্তিটা একটু কমে। আর তা' যদি সম্ভব না হয়, তা'হলে লীনাদি', আপনি আমায় পর্দ্দানশীন ক'রে রাখুন। আর পারা যায় না।

কি ব্যাপার?

লীনার দিকে চেয়ে সে ব'ল্‌লে—আর কি?—সেই পুরাতন কথা!

অর্থাৎ খদ্যোৎকে দেখে এতগুলো অপরিচিত নারী যদি প্রেমে পড়ে, তা'হলে বেচারার খেয়ে-শুয়ে স্বস্তি কোথায়? রেল ষ্টেশনে, ট্রামগাড়ীতে, থিয়েটারে, ফুটবল্ ম্যাচে—কোথাও বেচারার শান্তি নেই। এমন কি রাস্তা দিয়ে চল্‌বার সময়েও গাড়ীর খড়খড়ির ভিতর দিয়ে তার ওপর কটাক্ষবাণ এসে প'ড়বেই! বেচারা করে কি?

খদ্যোৎ দেখ্‌তে মন্দ ছিল না। ধরণ-ধারণে সম্ভ্রমের অভাব থাক্‌লেও, তা'র চেহারাটা ছিল বেশ লম্বা চওড়া। তবে সামান্য লক্ষ্য ক'র্‌লেই দেখা যেত যে তা'র মুখে একটা বিশ্রী চোয়াড়ে রকমের ভাব সর্ব্বদা লেগে আছে। সেইটেই ছিল তা'র বিশেষত্ব। কিন্তু তা'র নিজের স্থির বিশ্বাস ছিল, যে তা'র চেহারার মধ্যে এমন একটা মোহিনী শক্তি আছে যা' দেখে নারীমাত্রেরই মন ভুলে যায়। এই বিশ্বাসের ফলে একবার সে যে কি নাজেহাল্ হ'য়েছিল—কিন্তু সে গল্প আজ আর নয়।

খদ্যোতের দলটী ছিল পেশাদারি স্বদেশিয়ানায় একেবারে পক্ক। ভেক্-এর কিছুমাত্র ত্রুটি ছিল না। মোটা ধুতি এবং জামার সঙ্গে চাদরটা এবং অনেক সময় জুতোটাও এদের কাছে বাহুল্য ব'লে মনে হ'ত। সত্য কথা ব'ল্‌তে কি—এরা এত ময়লা ঘামে ভেজা কাপড় প'র্‌তে অভ্যস্ত ছিল যে এদের বসাবার জন্যে আমাকে একটা স্বতন্ত্র ঘর ঠিক ক'র্‌তে হ'য়েছিল। এতে তাদের কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না, বরং সেই ঘর উপলক্ষ্য ক'রেই এদের একটা আলোচনা সভা স্থাপনের সুবিধা হ'ল। লীনা এবং আমি কাজের অবসরে মধ্যে মধ্যে সেই সভায় এসে ব'স্‌তুম। সেদিন এদের উৎসাহের অন্ত থাক্‌ত না। লীনা ছিল এদের দেবী, এদের রাণী, এদের দিদি—একাধারে সবই। আমি খুব আমোদ পেতুম, কিন্তু লীনা দেখ্‌তুম এতে বেশ একটু গর্ব্ব অনুভব ক'রত। প্রথম প্রথম আমার পরিহাসে লীনা চুপ ক'রে থাক্‌ত। ক্রমশঃ দেখলুম আমার পরিহাস তা'র বিরক্তির কারণ হ'য়ে উঠ্‌ছে। অতএব আমোদটা আমি একাই উপভোগ ক'র্‌তে লাগলুম।

এদের সভায় বিশেষ ক'রে আলোচনার বিষয় ছিল দেশের দুর্গতি এবং বর্ত্তমান য়্যুরোপীয় সাহিত্য—তবে তার ইংরাজী অংশটুকু বাদ দিয়ে। ইংরাজী সাহিত্যের উল্লেখ মস্ত অপরাধ ব'লে গণ্য হ'ত। তার কারণ হ'চ্ছে এই যে, ইংরাজী সাহিত্যের সঙ্গে এদের অনেকেরই পরিচয় ছিল না এবং কন্টিনেন্টাল্ সাহিত্যের সঙ্গে এদের সকলেরই যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় ছিল—বাংলা কাগজের সমালোচনা স্তম্ভের উদ্ধৃত অংশ প'ড়ে।

একদিন সভায় ঘেঁটুফুলের উপর খদ্যোতের লেখা এক সুদীর্ঘ কবিতা পড়া হ'ল। সমালোচনাচ্ছলে সকলেই বাহবা দিলে। তারপর আরম্ভ হ'ল খদ্যোতের ব্যাখ্যা। সে এক পুরোদস্তুর বক্তৃতা। তাতে অনেক কথাই ছিল। তবে তার সারমর্ম্ম হচ্চে এই যে দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় সৌখীন জিনিস নিয়ে মনের অপব্যবহার করা উচিত নয়। দৈনন্দিন জীবনেও নয়, আভ্যন্তরিক জীবনেও নয়। দেশকে একটা বস্তুভাবে দেখ্‌তে হবে এবং তা' দেখ্‌তে গেলে দেশের মধ্যে যা' কিছু কুৎসিত, যা' কিছু ঘৃণ্য তা'কেই বরণ ক'রে নেওয়া উচিত। সুন্দরের পূজা ক'রেই আমাদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা। জীবনটাকে বস্তুগত ক'রে তোলার সঙ্গে

সঙ্গে সাহিত্যকেও বস্তুতন্ত্রপরায়ণ ক'রে তুলতে হবে। অর্থাৎ যা' কিছু নোংরা, বীভৎস, এমন কি সাধারণে যাকে অশ্লীল বলে, তাই নিয়ে—এবং একমাত্র তাই নিয়েই—আমাদের এখন সাহিত্যের ও জীবনের পুষ্টি সাধন ক'রতে হবে। এ থেকে যিনি সঙ্কুচিত হবেন, তিনি যেন স'রে দাঁড়ান। তাঁর বর্ত্তমান জগতের চিন্তাধারার সঙ্গে, অর্থাৎ কিনা কন্টিনেন্টাল সাহিত্যের সঙ্গে, পরিচয় নেই বুঝতে হবে।

রাত্রে লীনাকে জিজ্ঞাসা ক'রলুম—এর ইঙ্গিত বা implication-টা কিছু বুঝলে?

লীনার মেজাজটা সেদিন ভাল ছিল না বোধ হয়। আমার কথার উত্তর না দিয়ে ব'লে উঠল—এরা গরীব ব'লেই তুমি এদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য কর—শুধু পরিহাসের পাত্র ব'লেই মনে কর। এটা অন্ততঃ মানবে কেন যে, আমরা যা' ক'রতে পারিনি, ওরা তা' ক'রেছে? স্বদেশ ও সাহিত্যের ওরা একটা আদর্শ খাড়া ক'রেছে এবং তা'র জন্যে দারিদ্র্যকে মাথা পেতে নিতে ওদের এতটুকুও আপত্তি নেই।

এ কথার কি উত্তর দেব? লীনাকে কি শেষে তর্ক ক'রে বোঝাতে হবে যে এ লোকগুলো বাইরে যা' দেখায় ভিতরে ঠিক তার উল্টো? এরা ইচ্ছা ক'রে দারিদ্র্যকে মাথা পেতে নিয়েছে ব'লে প্রচার করে, কিন্তু বাঁকা পথে অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টায় ঘোড়দৌড়ের মাঠে এবং বড়বাজারে তুলোর খেলার আড্ডায় যেতে ছাড়ে না। এরা বিলাসিতাকে বর্জ্জন করবার ভাণ করে, কিন্তু যখন সেটা বিনা-পয়সায় হয়, তখন তাতে এদের কোন আপত্তিই থাকে না। তা'র সাক্ষী আমার সিগারেটের কৌটা এবং টয়লেটের দ্রব্যাদি। এগুলো থাকতো বাইরে রোগী-দেখবার ঘরেরই পাশে একটা ছোট কামরায়—এবং সেখানে তাদের অবাধ গতিবিধি লীনার খাতিরে আমায় সহ্য ক'রতে হ'ত। ব'লতে ভুলেছি, কাপড়-চোপড় যতই নোংরা হোক, এদের চুলের পরিপাট্য ছিল অসাধারণ রকমের।

দেখলুম তর্কে কিছুই হবে না—লীনার উপর এদের প্রভাব ধীরে ধীরে বেশ বিস্তৃতি লাভ ক'রেছে। বিলেতে থাকতে ডাক্তারী বিদ্যার সঙ্গে, পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতির ফলে, মনোবিজ্ঞানের নূতন অঙ্গগুলোও আয়ত্ত ক'রেছিলুম। তাইতে বুঝেছিলুম, ফ্রয়েড্-শাস্ত্রে যাকে Inferiority Complex বলে, লীনা তাইতে ভুগছিল। নানা কারণে কিশোর বয়স থেকে লীনা ঠিক স্বাভাবিক ভাবে ফুটতে পায়নি। নিজেকে চেপে চেপে রেখে সে এমন অবস্থায় এসে পৌচেছিল যেখানে তা'র ব্যক্তিত্বকে তা'র নিজের পক্ষে খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর হ'য়ে উঠেছিল। লীনার মনীষা, অন্তর্দৃষ্টি, চিন্তাশক্তি সাধারণ স্ত্রীলোকের চেয়ে বেশী বই কম ছিল না; কিন্তু নিজের উপর বিশ্বাসের অভাব এর কোনটাই কার্য্যকরী হ'য়ে উঠতে পারে নি। যে যা' জোর ক'রে ব'লত, তাই সে মেনে নিত, এবং কয়েক দিন পরে সেটা তা'র নিজের কাছে নিজেরই মতামত ব'লে মনে হ'ত। ভিতরে ভিতরে সে একটা আত্যন্তিক দীনতার ভাব পোষণ ক'রে রেখেছিল। তাই যে কোনও লোকের সামান্য মাত্র অনুরাগ, শ্রদ্ধা বা স্তুতিবাদ তাকে চঞ্চল ক'রে তুলত এবং কৃপণের মতো সকলকার চোখের আড়ালে সে সেগুলো সঞ্চয় ক'রে রাখত। সে সকলকেই খুশী রাখবার চেষ্টা ক'রত এবং তা'র মূলেও ছিল এই ভাবটা। সর্ব্বোপরি তা'র হৃদয়টা ছিল স্নেহ-কোমলতায় ভরা। তাই এই খদ্যোতিগণের তথাকথিত দুঃখের জীবন সংসারের নিষ্ঠুরতার নিদর্শনরূপে তা'র কাছে প্রতিভাত হ'ত। আমি এই সব জেনে কখনো নিজের মতামত জোর ক'রে তা'র উপর চালাবার চেষ্টা করিনি। সেটা অত্যন্ত সহজ ছিল ব'লেই করিনি। আমি চেয়েছিলুম, সে তা'র নিজের রকমে নিজে ফুটে উঠুক। কে জানত যে আমার বদলে এই অপদার্থগুলোর মনের প্রভাব তাকে এত শীঘ্র অভিভূত ক'রবে? যদিও তা'র জন্যে আমার আগে থেকেই প্রস্তুত হওয়া উচিত ছিল।

ভাবলুম লীনাকে এদের প্রভাব থেকে মুক্ত ক'রতে গেলে এদের স্বরূপটা লীনার সামনে ব্যক্ত ক'রে দেখাতে হবে। কথায় নয়, কাজে। ভাইফোঁটার দিনকয়েক আগে লীনাকে ব'ললুম—তুমি তো ওদের সকলকারই দিদি, দেবী ইত্যাদি। এবার ওদের ভাইফোঁটা পাঠালে কেমন হয়? লীনা মহা উৎসাহিত হ'য়ে উঠল এবং ভাই-ফোঁটা উপলক্ষ্যে এই ক'টী প্রাণী কাপড়-চাদর ইত্যাদিতে

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ।

এত জিনিষ পেলে যা' তাদের নিজের উপার্জ্জনে কখনো হ'ত কিনা সন্দেহ এবং যা' তারা সম্বৎসর ধ'রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব্যবহার ক'রতে পারবে। খদ্যোতের জন্য লীনার বিশেষ ক'রে নিজের হাতে তৈরী করা জামা পাঠালো ব'ল্‌লে। আহা, ও বেচারার টাকা নেই, ক'রে দেবারও কেউ নেই!

যা' ভেবেছিলুম, তাই। দু'একদিনেই এদের সব ভোল্ ফিরে গেল। মোটা এবং নোংরা পরিধেয়ের প্রতি আসক্তিটা যে কোথায় অন্তর্দ্ধান ক'রলে তার ঠিকানাই পাওয়া গেল না। তা'র বদলে গন্ধদ্রব্য, বিলাতী রূপটান প্রভৃতির উপর আসক্তিটা হঠাৎ এত ভয়ঙ্কর ভাবে দেখা দিলে যে তাতে আমিও চমৎকৃত না হ'য়ে থাকতে পারলুম না। খরচটা পরোক্ষে আমাকেই জোগাতে হ'ত।

লীনা খাওয়াতে ভালবাস্‌ত। এদের সভা বস্‌বার দিনে লীনা নিজের হাতে নানা রকম সৌখীন খাবার তৈরী ক'রে এদের খাওয়াত। পরিবেশনের জন্যে কুমারটুলী থেকে বিশেষ ক'রে মাটীর থালা এবং গেলাস আনাতে হ'ত পাছে এদের স্বাদেশিকতা ক্ষুণ্ণ হয়। কিন্তু আমার বরাবরই মনে হ'ত, এতে এ হতভাগাদের পেট ভ'রলেও মনের ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না এবং বিলাতী দোকানের নিভৃতে কি বিলাতী খানায় এদের কিছুমাত্র বিতৃষ্ণা নেই, শুধু আদব কায়দা না জানার দরুণ এরা এই সব ভাণ করে। কিছু দিন পরে দেখলুম আমার অনুমানই সত্য। আমার কাছে উৎসাহ এবং শিক্ষা পেয়ে এরা দিনকতকের মধ্যেই বিলাতী খানায় এমন পরিপক্ক হ'য়ে উঠ্‌ল যে পরিবেশকের কেতাদুরস্ততার লেশমাত্র অভাবও এদের নজর এড়াত না এবং খাবার টেবিলেই সমস্বরে চীৎকার ক'রে এরা তার ভ্রম সংশোধন ক'রে তবে ছাড়ত। আমার এতে যতই মজা বোধ হ'ত লীনা রেগে উঠ্‌ত। রাগটা হ'ত আমারই উপর—আমি লোভ দেখিয়ে এদের আদর্শ ভ্রষ্ট ক'রছি ব'লে।

লীনার চোখ খুল্‌ছিল, কিন্তু সত্যের আলো প্রথমটা সে কিছুতেই মেনে নিতে রাজী হ'ল না। সে নিজে টেবিল ছেড়ে মাটীতে খাওয়া আরম্ভ ক'রলে। রেশমের কাপড়-জামা জলাঞ্জলি দিয়ে মোটা সূতোর বিশ্রী রং-করা কাপড় পরা সুরু ক'রে দিলে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। তা'র ভক্তের দল এগুলো আর মেনে নিতে পারলে না। তা'রা নিজেরাই পরিহাস-অনুযোগ জুড়ে দিলে; তাতেও লীনাকে টলাতে না পেরে মনে মনে বড়ই অসন্তুষ্ট হ'য়ে রইল। খদ্যোৎ কিন্তু এ বিদ্রোহিতায় যোগ দেয়নি। সে লীনার তালে ঠিক তাল রেখে চ'ল্‌ছিল।

কিন্তু ভাঙ্গন যখন ধরে, তখন তাকে ঠেকিয়ে রাখা দুষ্কর। লীনা শত চেষ্টা ক'রেও তা'র ভক্তবৃন্দকে আর বেঁধে রাখতে পারলে না। তাদের বিদায়ের দিন ঘনিয়ে আস্‌ছিল।

ব'ল্‌তে ভুলেছি, এই সভার উপলক্ষ্য ক'রে লীনার বিবাহিত এবং অবিবাহিত সহপাঠিনীদের মধ্যে কেউ কেউ আমাদের এখানে আসত। তাদের আসবার দিনে দেশমাতৃকার শ্রাদ্ধটা মুলতুবি থাকত। সেদিন শুধু সাহিত্য-চর্চ্চাই হ'ত। কিন্তু সেটা নামে। ভাঁড়ে কর্পূর না থাকায় সেটা গান গাওয়াতেই পর্য্যবসিত হ'ত। এই মহিলাদের মধ্যে বিশেষ ক'রে একজনকে খদ্যোৎ-ভাবের নারী প্রতীক ব'লে বর্ণনা করা যেতে পারে। অবিবাহিতা নারী—প্রথম দর্শনেই খদ্যোৎকে দেখে ব'লে উঠ্‌ল—লীনাদি', এ যে সর্ব্বহারা, আমি যে একে যুগযুগান্তর ধ'রে চিনি। ওই উস্কোখুস্কো চুল, ওই আপন ভোলা দৃষ্টি, ওই শরতের আকাশের মত মুখভাব, বেহাগের রাগিণীর মত কণ্ঠস্বর—এ সব যে আমার অনেক দিনের কল্পনার সাথী। লীনার এতটা বাড়াবাড়ি রকমের উচ্ছ্বাস মোটেই ভাল লাগেনি। সে চুপ ক'রেই রইল। খদ্যোৎ একটু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে নবাগতার পাশে গিয়ে ব'স্‌ল। বেচারা সেদিন ভুলোর খেলায় ট্রামভাড়ার পয়সাগুলোও জলাঞ্জলি দিয়ে বউবাজার থেকে এতটা পথ হেঁটে এসেছিল। অতএব চেহারাটা একটু কবির-রকম হবার কথাই।

লীনার এই সহপাঠিনীটী ছিল একেবারে ভাবালুতা-রোগগ্রস্ত। শীতের রাত্রে ছাদে ব'সে সে খদ্যোতের কবিতা মুখস্থ ক'রত, দুপুরে কলেজ কামাই ক'রে কবি কল্পনা নিয়ে থাকত এবং আরও কত রকম সব ক'রত, যা' তা'র নিজের

বাড়ীর লোকের কাছেও চাষা ব'লে মনে হ'ত। আমি জানি, লীনাকে তা'র জন্যে মাঝে মাঝে বেশ অপ্রস্তুত হ'তে হ'ত।

এই সহপাঠিনীটীর ইচ্ছামতই একদিন এদের গানের সন্ধ্যাটী "সার্থক" ক'রে তোলবার আয়োজন হ'ল। অর্থাৎ সেদিন সন্ধ্যায় আলো না জ্বেলে আধ আলো আধ ছায়ায় গান শোনবার প্রস্তাব হ'ল। কে যেন আরও প্রস্তাব ক'রেছিল যে গান শোনবার সময় যার যাকে ভাল লাগে, সে তা'র পাশে গিয়ে ব'সবে। এ প্রস্তাবগুলো কার্য্যে পরিণত হ'য়েছিল কিনা জানি না। তবে এই সূত্রে গোড়া থেকেই কি একটা মনোমালিন্যের সূচনা হয় যে-জন্য সেদিনের অধিবেশন স্থগিত রাখ্‌তে হয়। ব্যাপারখানা আমার কাছে এখনও রহস্যময় হ'য়ে আছে। আমি ওদের সভায় প্রায়ই উপস্থিত থাকতুম না, সেদিনও ছিলুম না। তার পরদিন কোনো সূত্রে ওই প্রস্তাবের কথা শুনে মনটা এত বিরক্তিতে ভ'রে গিয়েছিল, যে আমি সেই দিনেই ঘরটা থেকে ওদের সভার জিনিস পত্র বার ক'রে দিয়ে সেটা নিজে দখল ক'রে ব'সলুম। লীনা এতে কিছুই আপত্তি ক'রলে না—কি ভেবে তা' বুঝতে পারলুম না। তবে ওরকম একটা প্রস্তাব তা'র নিজের মাথা থেকে বেরোয়নি, সেটা ঠিক।

এই সূত্রে খদ্যোতের দল বিদায় নিলে, কিন্তু খদ্যোত নিজে র'য়ে গেল। সে আর কিছু না জানুক টিঁকে থাক্‌বার আর্টটা খুব ভালরকম ক'রেই শিখেছিল। লীনার দেবীত্বের দোহাই দিয়ে এবং আমাকে খোস মেজাজে রেখে সে তা'র পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখ্‌লে। কিন্তু তাকে এভাবে রাখ্‌তে আমার যে কত টাকা খরচ হচ্ছিল, তা' আমার তখন কোন ধারণাই ছিল না। লীনাকে উৎসর্গ-করা তা'র একখানা কবিতার বই ছাপা হ'য়ে বেরোল—সেটা যে আমারই খরচায় তা' পরে জেনেছিলুম। বইখানা পদ্য কি গদ্য এবং তা'র ভাষাটা বাংলা কি আর কিছু—তা' আজ অবধি ঠিক ক'রতে পারিনি। আমার কাছে বইখানা তো অসম্বদ্ধ পাগলের প্রলাপ ব'লেই মনে হ'য়েছিল। তবে এ বিষয়ে আমার মতামতের হয় তো কোনো মূল্য নেই। ডাক্তারী হিসাবে বাতুলতার অনেক গুলো দিকের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল, তবে সাহিত্যের দিক দিয়ে পরিচয় সেই প্রথম। অতএব আমার ভুল হওয়া অসম্ভব নয়। যাই হোক্‌, বইটা নিয়ে খদ্যোতের বন্ধুমহলে একটা সাড়া প'ড়ে গেল এবং তাকে একটা অভিনন্দন ভোজ দেবার প্রস্তাবও হ'য়েছিল শুনিছিলুম। তবে সেটা হ'য়েছিল কিনা জানি না এবং লীনা তাতে যোগ দিয়েছিল কিনা, তাও খোঁজ করিনি। বইখানাতে নিতান্ত খোলাখুলি রকমের বস্তুতান্ত্রিকতা ছিল না, তাই রক্ষা। পরে জেনেছিলুম লীনার নির্ব্বন্ধাতিশয্যেই সেগুলো বাদ দিতে হ'য়েছিল।

কিন্তু এই বইখানা বেরোবার পর থেকেই খদ্যোতের প্রতিভা একটা ভিন্ন দিক আশ্রয় ক'রলে। তা'র দল ভেঙ্গে গিয়েছিল, অতএব কলাচর্চ্চার তেমন সুবিধে ছিল না, তাই তাকে একটা নূতন দল খুঁজে নিতে হ'ল। সহরে হুজুকের অভাব কোনো কালেই নেই। সে সময় একদল শ্রমজীবির ধর্ম্মঘট চল্‌ছিল এবং সেই উপলক্ষে রোজই কোথাও না কোথাও মিটিং হ'ত। খদ্যোৎ তাদের একজন নেতৃস্থানীয় হ'য়ে উঠ্‌ল। খদ্যোৎ গাইতে পারত মন্দ নয়। এখন প্রতি সপ্তাহে একটা ক'রে নতুন গান রচনা ক'রত আর মিটিংএ সেটা নিজেই খুব উদ্দীপনার সুরে গাইত। এর জন্যে গান পিছু এবং গাড়ীভাড়া বাবদ তা'র কিছু কিছু উপার্জ্জন হ'তে লাগল। এসব ব্যাপারে মেতে ওঠ্‌বার সঙ্গে সঙ্গে তা'র কথাবার্ত্তা ধরণধারণে একটা পরিবর্ত্তন এসে গেল। তা'র প্রচ্ছন্ন আত্মম্ভরিতা এখন প্রকাশ্য প্রগল্‌ভতায় পরিণত হ'ল। কথায় কথায় দেশমাতৃকার দোহাই দেওয়া এবং উঁচু গলায় তর্কশাস্ত্রের সূত্রগুলোর মুণ্ডপাত করা তা'র এখন প্রকৃতিগত হ'য়ে দাঁড়াল। এ পরিবর্ত্তনটাতেও আমি বেশ আমোদ পেতে লাগলুম। কিন্তু খদ্যোতের সম্পর্কে আমোদ পাওয়া এইখানেই শেষ। এই আমোদ পাবার জন্যে তাকে যে অনেকটা প্রশ্রয় দিয়েছিলুম সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তা' নইলে তা'র কথায় সস্ত্রীক একদিন ঐ রকম একটা ধর্ম্মঘটের মিটিংএ

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ।

উপস্থিত হ'ব কেন? সভায় একমাত্র মহিলা ছিল আমার স্ত্রী—অতএব দেশমাতৃকার প্রতিরূপ ব'লে কথায় যতটা সম্ভব সমস্ত বক্তার কাছে থেকে সে ততটাই সম্মান পেলে। আমি গিয়েছিলুম কি ভেবে জানি না, কিন্তু বাড়ী ফিরলুম একটা দুঃসহ ঘৃণার ভাব মনে নিয়ে। স্নান ক'রে তবে নিজেকে কতকটা শুদ্ধ বোধ ক'রলুম।

খদ্যোতের সেদিন উৎসাহ দেখে কে? খাবার সময়—আজ কাল সে প্রায় রোজই আমাদের সঙ্গে খেত—তা'র সে কী বক্তৃতা! কিন্তু অন্য দিনের মতো সেদিন তা'র কথায় একটুও আমোদ উপভোগ ক'রতে পারলুম না। সেদিন এ লোকটা পূর্ব্ববঙ্গে যাকে "সীমা দেওয়া" বলে, তাই দিয়েছিল। তার প্রগল্ভতা সত্যিই সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু লীনার ভাব দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলুম। সেদিনকার সম্মানে সে বেশ একটু গর্ব্ব অনুভব ক'রেছিল—এই থেকে বোঝা যায় যে খদ্যোতের সংস্পর্শে তা'র রুচিটা কি রকম পরিবর্ত্তিত হ'য়ে আসছিল। খাবার সময় খদ্যোতের বক্তৃতার বাঁধি গৎগুলো—মনে হ'ল—যেন তা'র কাছে কি-এক অভূতপূর্ব্ব বার্ত্তা ব'য়ে নিয়ে আসছে। একটা আসন্ন জয়ের পূর্ব্বাভাস্ তা'র গণ্ডে ফুটে উঠছিল আর এই কথাবার্ত্তার সময় তা'র চোখ দুটো যেন মাঝে মাঝে জ্বলে উঠছিল।

সেইদিন প্রথম আমার মনে একটা বিতৃষ্ণা ভাব এল। আমি নিজে আমার স্ত্রীর মনের উপর কোনো প্রভাব বিস্তার ক'রতে চেষ্টা করিনি—তা'র কারণ আগেই বলেছি। সেই সুযোগে এই ভণ্ডামি এবং ন্যাকামির অবতার খদ্যোৎ আমার স্ত্রীর মনটা ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলছিল। এত দিন দেখেও দেখিনি কিন্তু আজ সেটা বেশ পরিস্ফুট হ'য়ে উঠল। লীনা আমার সঙ্গে বড় তর্ক ক'রতনা কিন্তু অনেক সময় দেখিছি আমার ইচ্ছা অনুসারে কাজও ক'রতনা। খদ্যোতের সামান্য ইঙ্গিতে কিন্তু সে অনেক ত্যাগ স্বীকার ক'রতে প্রস্তুত ছিল। এই সত্যটা সেদিন আমার কাছে নূতন ভাবে দেখা দিলে। এর ভিতর ঈর্ষ্যার ভাব হয়ত ছিল কিন্তু তাতে লজ্জিত হবার কারণ কিছু দেখিনি। পুরুষকে ঈর্ষ্যা সম্বন্ধে লজ্জিত হওয়া নারীই শিখিয়েছে—নিজের কার্য্যোদ্ধারের জন্য। আমার তাই বিশ্বাস ছিল এবং সে বিশ্বাসটাকে চাপা দেবার মতন দুর্ব্বলতা আমার ছিল না। স্থির ক'রলুম লীনাকে খদ্যোতের প্রভাব থেকে মুক্ত ক'রতেই হবে। এটা আমার শুধু মনের ইচ্ছা নয়, আমার কর্ত্তব্যও।

সেই রাত্রেই মফঃস্বল যেতে হ'ল সপ্তাহ খানেকের জন্যে। পথে ভাবতে লাগলুম, লীনাকে কি ক'রে খদ্যোতের প্রভাব থেকে মুক্ত করা যায়।

ফেরবার দিন ট্রেণে এক খবরের কাগজে দেখলুম—একটা বিরাট শ্রমজীবি-সভায় ডাক্তার নরেশচন্দ্রের স্ত্রী শ্রীমতী লীনা দেবী খদ্যোৎ-লিখিত এক উদ্দীপনাপূর্ণ কবিতা পাঠ ক'রেছেন। সম্পাদকীয় স্তম্ভে ডাক্তার নরেশচন্দ্র এবং তাঁর স্ত্রীকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করে দেশের সমস্ত নরনারীকে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রবার জন্যে আহ্বান করা হ'য়েছে।

এটা প'ড়ে আমার যে কী ভয়ানক রাগ হ'য়েছিল, তা' কথায় ব্যক্ত করা যায় না। বুঝলুম, আমার অনুপস্থিতিতে খদ্যোৎ লীনাকে এই সব হুজুকের আসরে নামিয়েছে। রাগটা দমন ক'রতে অনেকটা সময় গেল। ইতিমধ্যে কি ক'রতে হবে, তাও ভেবে নিলুম। কোলকাতা পৌছে ষ্টেশন থেকেই একেবারে বুটিদা'র বাড়ী গিয়ে উঠলুম।

বুটিদা' একটা নূতন কেশতৈল বার্ ক'রেছিল, তারই প্রশংসা-পত্র ছাপাবার সম্পর্কে সে তখন ব্যস্ত ছিল। আমায় দেখে ব'ললে—আপনার নামেও একখানা ছাপিয়ে নিয়েছি। আপনি তো এখানে ছিলেন না তাই অনুমতি নেবার অবসর পাইনি। জানি, আপনি কোন আপত্তি ক'রবেন না। কিন্তু খদ্যোৎটার কি ব্যবহার বলুন দিকিন। বলে কিনা, নগদ পাঁচটা মুদ্রা না পেলে ও একটা প্রশংসা-পত্র লিখে দেবেনা। এর নাম কি বন্ধুত্ব? আপনিই বলুন তো।

ব'ললুম—ওসব শুনতে আসিনি। তার পর আমার যা' ব'লবার ব'লে জিজ্ঞাসা ক'রলুম—লীনা তোমার স্নেহের পাত্রী ব'লেই জানি। তাকে এই সব প্রস্তাবের মধ্যে আনার মূল হ'চ্ছ তুমি। এখন এসব থেকে তাকে

বাঁচাতে কোনও সাহায্য ক'রতে পার কিনা ?

বুটিদা' খানিকক্ষণ ভেবে ব'ল্‌লে—হ্যাঁ, খদ্যোৎটা আজ কাল বেজায় বাড় বেড়েছে। আচ্ছা, আমি এর বিহিত ক'রব।

বাড়ী ফিরে এসে লীনার কাছে সভার কথা কিছুই তুললুম না। কিন্তু দু'জনেই বুঝতে পারলুম যে পরস্পরের মনে এই কথাটাই বড় হ'য়ে জেগে আছে। লীনার ভাবটা দেখ্‌লুম একটু সঙ্কুচিত রকমের। সে বোধ হয় পরে বুঝেছিল, কাজটা ঠিক হয়নি।

দিন তিনেক পরে লীনার নামে এক চিঠি এল। চিঠিখানা খদ্যোতের স্ত্রীর লেখা। তিনি লিখেছেন—অনেকদিন তাঁর স্বামী বাড়ী আসেন নি। লীনা দেবীকে তাঁর স্বামী অতীব শ্রদ্ধার চোখে দেখেন, তা' তিনি শুনেছেন, অতএব যদি লীনা দেবী স্ত্রীর কষ্ট বুঝে তাঁর স্বামীকে দিনকতকের জন্য দেশে আস্‌তে বলেন, তা'হলে তিনি লীনা দেবীর কাছে চিরকৃতজ্ঞ হ'য়ে থাকবেন। তাঁর নিজের জন্য নয়, ছেলের হাতে খড়ি হবে, সে সময়ে তা'র পিতার অনুপস্থিতি বাঞ্ছনীয় নয়। নিজে কুরূপা ব'লে স্বামীসুখ থেকে বঞ্চিতা, কিন্তু তাই ব'লে ছেলে তো কোন অপরাধ করেনি। তিনি নিজের জন্য কিছু ভিক্ষা চান না, ভগবানের আশীর্ব্বাদে তাঁ'র শ্বশুর বাড়ীর অবস্থা ভাল, বড়-লোক না হ'লেও তাঁ'রা পল্লীগ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থ। যদি দয়া ক'রে লীনা দেবী তাঁ'র স্বামীকে বুঝিয়ে দিনকতকের জন্যও পাঠিয়ে দেন ইত্যাদি।

লীনা চিঠিখানা প'ড়ে ভয়ানক উত্তেজিত হ'য়ে উঠ্‌ল। এ কখনই সত্যি নয়, সত্যি হ'তে পারে না। খদ্যোৎ অতি দরিদ্র, সংসারে তার স্ত্রীপুত্র কেউ নেই। এ সমস্তই তা'র কোন শত্রুর কারসাজি। এ চিঠি জাল। এটাকে টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলা উচিত এবং এর কথা খদ্যোৎকে ঘুণাক্ষরেও জানতে দেওয়া হবে না। তাতে তাকে অপমান করা হবে।

শান্তভাবে স্ত্রীকে বুঝিয়ে ব'ললুম—যদি এখানা বেনামী চিঠি হ'ত, তা'হলে তুমি যা' ব'লছ সেই মত ব্যবস্থাই সঙ্গত। কিন্তু এ চিঠিতে স্পষ্টাক্ষরে নাম-ঠিকানা দেওয়া আছে। যদি এটা জাল হয়, তা'হলে আগেই এটা খদ্যোৎকে দেখান উচিত। সে হয়ত এ থেকে একটা সন্ধান পেয়ে অপরাধীর শাস্তির ব্যবস্থা ক'রতে পারে।

লীনা এ যুক্তির সারবত্তা বুঝলে। বুঝে, গম্ভীর হ'য়ে রইল। কিন্তু খদ্যোৎ আস্‌তেই ব'লে উঠ্‌ল—দেখুন, আমি আগে থেকেই ব'লে রাখ্‌ছি, এ চিঠির কথা আমি মোটেই বিশ্বাস করি না। এ আপনার কোনো শত্রুর কাজ—আমাদের চক্ষে আপনাকে হীন মিথ্যাবাদী প্রমাণ ক'রবার চেষ্টা।

খদ্যোতের সে কথা কানেই গেল না। হস্তাক্ষর দেখে তা'র মুখ ফ্যাকাসে হ'য়ে গিছ্‌ল। চিঠিটা প'ড়তে প'ড়তে আমাদের উপস্থিতি ভুলে গিয়ে সে উদ্যত মুষ্টি হ'য়ে ব'ল্‌তে লাগল—এ সেই বুটির কাজ। বুটি ছাড়া আমার ঘরের কথা কেউ জানে না। সেই আমার স্ত্রীকে দিয়ে লিখিয়েছে। এতটা বিশ্বাসঘাতক হবে—তা' কখন ভাবিনি। ফাণ্ডের টাকার ভাগ পায় না, সে কি আমার দোষ? আচ্ছা, আমিও দেখে নেব।

তারপর চিঠিখানা ছিঁড়তে ছিঁড়তে কোনও দিকে না তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

লীনা প্রস্তরমূর্ত্তির মত নিশ্চল শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

তারপর দিন থেকে লীনার একেবারে ভাবান্তর দেখ্‌লুম। বেচারী একেবারে মুশ্‌ড়ে গিয়েছিল। এমন নম্র-কোমল ভাব, আমার সামান্য ইচ্ছা পূরণ করবার জন্যে এমন ব্যগ্রতা লীনার এর আগে কখন দেখিনি। অবশ্য এটা লক্ষ্য করেছিলুম, আমাদের মনোমালিন্য সত্ত্বেও, সে কখনো গৃহকর্ম্মে বা সেবাযত্নে অমনোযোগী হয়নি। কিন্তু এখনকার ভাব সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। মাঝে মাঝে এমন দীন-করুণ দৃষ্টিতে চাইত, যেন সে আমার কাছে কত অপরাধী, যেন সে মনের সমস্ত সম্পদ হারিয়ে ফেলেছে। তার মনে পাছে ব্যথা লাগে, আমি তাই এসব কথা মোটেই তুল্‌তুম না। সেও নিজে থেকে কিছু বল্‌ত না। আশা ছিল, সময়ে সব ঠিক হ'য়ে যাবে। কিন্তু দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগ্‌ল, লীনার মনোভাবের বৈলক্ষণ্য দেখ্‌লুম না। একটু চিন্তিত হ'য়ে উঠ্‌লুম। একদিন দেখি—সন্ধ্যার সময় জানালার ধারে লীনা একাকী ব'সে কাঁদছে। সে দেখতে

শ্রীকা[illegible] ঘোষ

পাবার আশায় ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। সেই দিনই মনস্থির ক'রলুম। বেচারী লীনা!

খদ্যোৎকে খুঁজে বার ক'রতে বিশেষ বেগ পেতে হ'ল না। সে ইতিমধ্যে একটা থিয়েটারে গান শেখাবার কাজ জুটিয়ে নিয়েছিল। তার সঙ্গে দেখা ক'রে ব'ললুম—আমার নিজের সময়াভাব, অতএব আমার স্ত্রীকে গান শেখাতে এবং তা'র সঙ্গে গল্প ক'রতে তোমাকে রোজ আসতে হবে, আগে যেমন আসতে। তার ইতঃস্তত: ভাব দেখে আরও ব'ললুম—তোমার এখানকার ষাট টাকা মাইনের বদলে আশী টাকা ক'রে পাবে। তার চেয়ে বেশী চাও, তা'ও পাবে। কিন্তু যদি "না" বল, তা'হ'লে—হাতের লাঠিটার দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রলুম।

পরের দিন থেকে খদ্যোৎ পূর্ব্বের মতো রোজই আসতে লাগল। লীনা প্রথমটা একটু উৎফুল্ল হ'য়ে উঠেছিল, কিন্তু সে ক্ষণেকের জন্য। তাদের কথাবার্ত্তা আর জ'মল না—তাদের দু'জনের মধ্যে এই ক'দিনের ভিতরেই একটা বিপুল ব্যবধান রচিত হ'য়ে গিয়েছিল। উভয়ে উভয়ের কাছে যত সহজ হবার চেষ্টা ক'রতে লাগল, ব্যবধানটা ততই স্পষ্টতর হ'য়ে উঠতে লাগল। আমার চেষ্টাতেও এটা ঘুচল না। লীনা খদ্যোৎকে এখন যতই দেখতে লাগল ততই সেই ব্যাপারটার সম্পর্কে খদ্যোতের নীচতা তার কাছে পরিস্ফুট হ'য়ে উঠতে লাগল।

খদ্যোৎ সেটা দিনকতকের মধ্যেই বুঝতে পারলে, তার উপস্থিতিটা তাই ক্রমশঃ অনিয়মিত হ'য়ে উঠল। সেই সঙ্গে লীনার পীড়িত ভাবটাও কমে আসতে লাগল। এটাও লক্ষ্য ক'রলুম যে যেদিন খদ্যোৎ অনুপস্থিত থাকত, লীনা সেদিন বেশ-একটু স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব ক'রত। এই অনুপস্থিতির দিনগুলোর সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লীনা আমার কাছে সহজ হ'য়ে আসতে লাগল—ঠিক আগেকার মতো। এমন কি ক্রমশঃ আমাদের ভিতর খদ্যোতের বিষয় নিয়ে আলোচনাটাও বেশ সহজ হ'য়ে এল—যেটা একেবারেই হবার আশা করিনি। তারপর ক্রমশঃ খদ্যোতের আসা একেবারেই বন্ধ হ'য়ে গেল। আমি আমার স্ত্রীর মধ্যে সেই আগেকার সরলমনা বান্ধবীকে ফিরে পেলুম।

গল্প শেষ ক'রে নরেশ ব'ললে—আরম্ভ হয়। খাবার সময় হ'য়ে গেছে। লীনা হয়ত অপেক্ষা ক'রছে। চল—বাকীটুকু না হয় তারি কাছে শুনবে।

নরেশের বাড়ী গিয়ে দেখলুম আমাদের কর্ত্তব্যপরায়ণা গৃহিণীরা তখনও কেউ এসে পৌঁছননি। অতএব নরেশের লাইব্রেরী-ঘরে গিয়েই ব'সলুম। লীনা গল্পের কথা শুনে মধুর হাস্যে ঘরটা ভরিয়ে দিলে। ব'ললে—গল্পটা ঠিক ওঁর অজীর্ণরোগসঞ্জাত নয়। তবে ওটার জল্পনা যদি আপনাদের ক্ষুধার উদ্রেক ক'রতে সাহায্য ক'রে থাকে, তার চেয়ে সুখের বিষয় আমার আর কিছু হ'তে পারে না আজ। কিন্তু ওঁর মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণগুলো বাদ দিয়ে গল্পটা শুনলে আরো ভাল হ'ত। ওগুলো ঠিক হজমে সহায়তা ক'রবে না।

তারপর আমার দিকে ফিরে ব'ললে—আচ্ছা, আপনিই বলুন তো মণিবাবু, স্ত্রীর কর্ত্তব্য কোনটা; স্বামীর পদার-বাহী জীববিশেষের জীবন যাপন করা, না স্বামীকে একটু পত্নীব্রত হ'তে শিক্ষা দেওয়া?

কথাটা লীনা এমন ভাবে ব'ললে যাতে আমরা সকলেই হেসে উঠলুম।

সমী অন্যমনস্ক ভাবে ব'লে উঠল—How clever!

ক্লেভারত্বর প্রাসঙ্গিকতা ঠিক বুঝতে পারলুম না। সমীকে জিজ্ঞাসা ক'রতে যাচ্ছিলুম এমন সময়ে নিমন্ত্রিতারা এসে পৌছলেন। কথাটা ওইখানেই চাপা প'ড়ল।

রাত্রে সমীকে বাড়ীর দরজা অবধি পৌছে দিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলুম—তুমি লীনার ক্লেভারত্ব কোথায় দেখলে? স্বামীর হৃদয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করানোতে? সেটা তো খুবই স্বাভাবিক।

সমী ব'ললে—যদি বলি গল্পটা ওই রকম ভাবে মোড় ফেরানোতে?

ব'ললুম—তা' ঠিক তোমার উপযুক্তই হবে। কিন্তু সত্যিই কি তাই?

সমী আমার দুই স্কন্ধে দু'টো হাত রেখে মুখের দিকে চেয়ে ব'ললে—বিবাহিত লোকদের এরূপ প্রশ্ন করা আমি ধূর্ত্ততা ব'লেই মনে করি।

ব'লে সে তার নিজের বাড়ীতে ঢুকে প'ড়ল।



শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী

পাচ বছর আগে বৃত্তি পেয়ে যখন পশ্চিম-যাত্রা না ক'রে পূর্ব্ব-যাত্রা করেছিলাম, তখন আত্মীয়স্বজন অনেকেই নিরুৎসাহ হয়েছিলেন; ছাত্রাবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী অধ্যয়ন না করে সংস্কৃত পড়্‌লে যেমন ভবিষ্যৎ উন্নতির বিশেষ কোনো সম্ভাবনা থাকে না, পূর্ব্ব-যাত্রার ফলও যে ভবিষ্যতে অনেকটা সেইরূপ দাঁড়াবে এ-কথাও অনেকে বার বার বলেছিলেন। সে যাই হোক্, হঠাৎ একদিন তল্পিতল্পা গুছিয়ে বেরিয়ে প'ড়লাম,—অনেকে পরামর্শ দেবার অবকাশও পেলেন না।

সিংহল থেকে জাহাজে চ'ড়ে ইন্দোচীন অভিমুখে যাত্রা করবার সময় যখন ভারতের শেষ নিশানা—কলম্বো-সৈকতের নারিকেলবন—চোখের সামনে দিগন্তে মিলিয়ে গেল, মনে তখন জাগ্‌ছিল ইতিহাসের পুরাণো কথা; সাগর-পারের সেই দ্বীপগুলিতে ভারত-সন্তানগণ কবে তাঁদের সভ্যতা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তাই জান্‌বার উৎসাহে মনটা তখন ভরপূর ছিল। এসিয়ার নানা দেশে ঐ সভ্যতার যে ধ্বংসাবশেষ রয়েছে তার কিয়দংশ দেখে চক্ষু সার্থক করাই ছিল মনের একান্ত কামনা: উদ্দেশ্য ছিল—ভারত-ইতিহাসের একটা বড় অধ্যায়ের কিছু উপাদান সংগ্রহ করা।

কলম্বো থেকে পেনাং প্রায় ছ'দিনের পথ। এ ছ'দিন বিশেষ কিছু করবার মত কাজ জাহাজে ছিল না। অসীম জলরাশির দিকে তাকিয়ে প্রভাত ও সন্ধ্যায় প্রকৃতির বিরাট সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ ক'রতাম, আর ভাব্‌তাম, ভারত-সন্তানগণ যখন এই বিশাল সাগর-বক্ষ উত্তীর্ণ হ'য়ে ইন্দোচীনে তাঁদের উপনিবেশ বিস্তার করেছিলেন তখন তাঁরা যে কত বড় উদারতা হৃদয়ে পোষণ ক'রতেন, ইতিহাসে তার তুলনা নেই। তাঁরা উপনিবেশ বিস্তার করেছিলেন—কিন্তু রক্তপাত করেন নি; তাঁরা দেশ ত্যাগ করে এসেছিলেন—পরকে শোষণ করবার জন্য নয়; তাঁরা সভ্যতা দিয়েছিলেন—পরের বুকের উপর আরোহণ না ক'রে। পরের দেশের বাজারে এসে সে-সভ্যতা মুক্তহস্তে তাঁরা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, যার পছন্দ হয়েছিল সে ওজন করে কিনে নিয়েছিল, নিজের মনের মত ক'রে তাকে ভেঙ্গে নিজের জিনিষের মত ক'রে, নিজের অভিরুচি অনুসারে গ'ড়ে তুলেছিল। আজ যখন এই সাগরের উপকূলের দিকে তাকাই তখন দেখি নানা জাতির হা-হুতাশে বাতাস অগ্নিময় হ'য়ে উপকূলভাগ দুঃসহ হয়েছে। এই সমুদ্র-তীরবর্ত্তী জনসমাকুল নগরসমূহের মন্দিরচূড়া পূর্ব্বে যেখানে অভ্যাগতকে সাদর আহ্বান জানাত এখন সেখানে শাস্ত্রীর তাড়নায় মানুষের নাম্‌তেও ঘৃণা বোধ হয়।

আমরা কত কথাই না ভুলে গেছি। কাশ্মীরের রাজকুমার গুণবর্ম্মণ যে-দিন ভারতের পতাকা বহন ক'রে এই সাগরের উপর দিয়ে সিংহল থেকে যবদ্বীপে গিয়ে উপনীত হয়েছিলেন, উজ্জয়িনীর পরমার্থ যখন তাঁর পারদর্শী-বিদ্যা নিয়ে ইন্দোচীনে ও চীনে গিয়ে নূতন বাণী প্রচার করেছিলেন,—তখন ছিল ভারতের এক স্মরণীয় যুগ।

গুণবর্ম্মণ ছিলেন কাশ্মীরের যুবরাজ। তাঁর পিতা সজ্ঝানন্দ কূটচক্রীর চক্রান্তে বাধ্য হ'য়ে সিংহাসন ত্যাগ ক'রে বনবাসী হয়েছিলেন। গুণবর্ম্মণ কাশ্মীরের প্রত্যন্ত-

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী

দেশের বনেই তাঁর পিতার ক্রোড়ে শৈশবে পালিত হ'য়ে ধর্ম্মশিক্ষা লাভ করেছিলেন। সজ্ঘানন্দের মৃত্যুর পর যখন তাঁর শত্রুপক্ষ অন্তর্হিত হ'লেন, তখন মন্ত্রীপরিষৎ একবাক্যে

সিংহল ছিল তখন বৌদ্ধ-সাহিত্য আলোচনার একটা বড় কেন্দ্র। সেখানে কিছুদিন ধরে তিনি জ্ঞানচর্চ্চা ক'রলেন; তার পর সিংহল থেকে শ্রেষ্ঠীদের অর্ণবপোত চ'ড়ে, ভারত-



সিংগাপুর—বেলাভূমি

এসে গুণবর্ম্মণকে রাজপদে অভিষিক্ত ক'রবার জন্য তাঁকে আহ্বান ক'রলে। পিতার মুখে বুদ্ধের যে করুণাকাহিনী তিনি শুনেছিলেন তা'তে গুণবর্ম্মণের রাজপদে অভিষিক্ত হবার বাসনা অনেকদিন থেকেই দূর হ'য়ে গিয়েছিল। তাই তিনি মন্ত্রীপরিষদের প্রার্থনাকে অগ্রাহ্য ক'রে "ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি" ব'লে প্রচারে বেরিয়ে প'ড়লেন। বোধিসত্ত্বের ত্যাগধর্ম্ম জগতকে শোনাবেন ও পাপীতাপীকে করুণা বিতরণ ক'রে মুক্তির পথে তুলে দেবেন এই হ'ল তাঁর জীবনের একান্ত কামনা; নিখিল বিশ্ব হ'ল তাঁর গৃহ আর জগতশুদ্ধ শাক্যপুত্রেরা হ'ল তাঁর সোদর। তাই দেশবিদেশের প্রভেদ তাঁর মন থেকে অপসারিত হ'ল, তিনি কাশ্মীর ছেড়ে সিংহল দ্বীপে গিয়ে উপনীত হ'লেন।

মহাসাগর অতিক্রম ক'রে, তিনি যবদ্বীপে গিয়ে উপনীত হ'লেন। যবদ্বীপ তখন ভারতের উপনিবেশ। সেখানে বহু ভারত-সন্তানের বাস। রাজাও ছিলেন ভারতীয় কোন এক রাজবংশের। তাঁরা সব দেশ ছেড়ে গিয়ে নূতন দেশমাতৃকার উন্নতিকল্পে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। দেবভাষা সংস্কৃতে তাঁদের বহুল অধিকার ছিল এবং তাঁরা তখন সে-ভাষার যথেষ্ট চর্চ্চাও ক'রতেন। গুণবর্ম্মণের কাছে রাজবংশ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা নিয়ে তাঁর উপদেশমত এই নূতন ধর্ম্ম প্রচারে বদ্ধপরিকর হ'লেন। গুণবর্ম্মণের কার্য্য সিদ্ধিলাভ ক'রল। তাঁর নাম চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে প'ড়ল। চীন দেশের শ্রেষ্ঠীরা সেই খবর দেশে গিয়ে প্রচার ক'রলেন। চীনের বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীরা গুণবর্ম্মণকে চীন-দেশে আনবার জন্য

সম্রাটের কাছে প্রার্থনা জানালেন। ফলে গুণবর্ম্মণ শীঘ্রই চীনে এসে উপনীত হ'লেন (৪২৪ খৃঃ অঃ) এবং চীনের নানাস্থানে পর্য্যটন ক'রে তিনি বৌদ্ধশাস্ত্রের আলোচনা ও অনেক বৌদ্ধগ্রন্থের চীনা অনুবাদ প্রকাশ ক'রলেন। বুদ্ধের বাণী পৃথিবীর নানাস্থানের শাক্যপুত্রদের কাছে নূতন ক'রে শোনাবার আকাঙ্ক্ষা তাঁর সফল হয়েছিল। অবশেষে ৪৩১ খৃষ্টাব্দে নান্‌-কিং নগরের জেতবন-বিহারে তিনি শাক্যপুত্র পরিবেষ্টিত হ'য়ে প্রাণত্যাগ করেন।

গুণবর্ম্মণের পর শতাধিক বৎসর ধরে যে-সব ভারত-সন্তানেরা তাঁর পথাবলম্বন করেছিলেন, তার ভিতর সকলের চেয়ে বড় নাম হচ্ছে পরমার্থের। চীন-সম্রাট মগধের রাজার কাছে দূত পাঠালেন। প্রার্থনা—ভারতীয় একজন খ্যাতনামা বৌদ্ধপণ্ডিতকে চীনে প্রেরণ করা হোক। চীনদূত কম্বোজের রাজদূতকে সঙ্গে নিয়ে মগধে এসে উপনীত হ'লেন ও তাঁর প্রার্থনা জানালেন। উজ্জয়িনীর ও ভয় ছিল না; প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে সংসারের মোহ কাটিয়েছেন; যেখানেই বুদ্ধের বাণী লোকে শুনতে চাইবে সেখানে যেতেই তাঁর পরম আগ্রহ। ভারতবর্ষ থেকে সমুদ্রপথে রওনা হ'য়ে তিনি ৫৪৬ খৃষ্টাব্দে নান্‌-কিং নগরে গিয়ে উপনীত হলেন। বৌদ্ধসাহিত্যে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, তর্কশাস্ত্রে ও দর্শনশাস্ত্রেও তাঁর বিশেষ অধিকার ছিল, সাংখ্য ও যোগও তিনি ভাল ক'রেই অধ্যয়ন করেছিলেন। প্রায় বিশ বৎসর ধরে তিনি দক্ষিণ-চীনের নানাস্থানে ঘুরে ধর্ম্মালোচনা ও বহু গ্রন্থ চীন ভাষায় অনুবাদ করলেন। শেষ বয়সে একবার তাঁর দেশে ফিরবার ইচ্ছা হয়েছিল; কিন্তু তাঁর এই নূতন দেশ—চীন—তাঁকে ছাড়তে চাইলে না; ভীষণ ঝটিকা প্রতিহত হয়ে তাঁদের অর্ণবপোত চীনের উপকূলে ফিরে এল ও তিনি অবতরণ করতে বাধ্য হলেন। অবশেষে নান্‌-কিং নগরে ৫৬৪ খৃষ্টাব্দে তিনি দেহ রক্ষা করেন।



সাইগন—বু'ল্ভার্ শার্নে

পরমার্থের নামই তখন দেশদেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। মগধরাজের প্রেরণায় তিনি বহু পুঁথি নিয়ে বিদেশ যাত্রা ক'রলেন। তিনি শ্রমণ, বিদেশ-যাত্রায় তাঁর মনে কোন বিধা

শত শত ভারত-সন্তান এই সমুদ্রের উপর দিয়ে পূর্ব্ব-দেশে গমন করেছিলেন—একই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে। তাঁদের মধ্যে এই দু'টী নাম কালের মালায় গাঁথা রয়েছে। ভারতের

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগ্চী

নিঃস্বার্থপরতার এ-গুলি হচ্ছে জাজ্বল্যমান নিদর্শন,—গরিমাময় দৃষ্টান্ত। কিন্তু ইন্দোচীন সে পুরাণো কাহিনী ভুলে গিয়েছে, যবদ্বীপ সে পুরাণো কাহিনী ভুলে গিয়েছে, চীন এমন বদ্‌লেছে যে সে আর ভারতকে পূর্ব্বের মত সাদর আহ্বান করে না। আর সব চেয়ে দুঃখের কাহিনী হচ্ছে—নি! তাই আমরা সেই অতীতের কথা চোখের সাম্‌নে এখনো জাজ্বল্যমান করে ফুটিয়ে তুল্‌তে পারিনি।

সপ্তাহকাল সমুদ্রে ভাস্‌বার পর আমরা যখন পেনাং বন্দরে পৌছুলাম তখন মনটা অনেকটা হাল্‌কা হ'ল। দু'বেলা সমুদ্র দেখ্‌তে প্রথম ক'দিন বেশ ভালই লাগে, তারপর



সাইগণ্—সঙ্গীতরতা আনামী

ভারতের। তা'র ইতিহাসের পাতা তিল তিল ক'রে খুঁজ্‌লেও ভারতের এই সব গৌরবমণির নাম পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। কোথায় [illegible] কোথায় পরমার্থ—কোথায়ই বা গুণরুদ্র? ভারত [illegible]-সব কৃতী সন্তানের নামও মনে রাখে নি; [illegible] আঠার খানি পুরাণ ও উপপুরাণের ভিতর ব্রতকথা বাড়িয়ে, ফেনিয়ে শোনাতেই সে ব্যস্ত। যে-ইতিহাসের ছত্রে ছত্রে তা'র গৌরবস্মৃতি চিহ্নিত করা থাক্‌বে, পাতায় পাতায় তা'র পুণ্যকীর্ত্তি সন্তানদের গরিমাময় কার্য্যকলাপের সত্য বর্ণনা থাক্‌বে ও যা' দেখে তার সন্তানেরা নিত্য নূতন পথ চোখের সাম্‌নে খুঁজে পাবে, সেই পুরাতন আদর্শ আবার নূতন করে ফুটিয়ে তুল্‌বে, কৈ এমন ইতিহাস ত ভারত রাখে প্রত্যহই সেই সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত [illegible] দেখ্‌তে মানুষ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তাই পেনাং [illegible] যখন জাহাজ ভিড়্‌লো তখন সবাই [illegible] আগ্রহে অস্থির হয়ে [illegible];—নূতন স্থানটা ঘুরে [illegible] দেখে নেব এই ইচ্ছাটা মনে প্রবল ভাবে জাগ্‌ছিল।

পেনাং একটা ছোট দ্বীপ—মালাক্কা প্রণালীর কূলে অবস্থিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে [illegible] রাজের হস্তগত হয়। সেই সময় হতে এখানে ব্রিটীশ উপনিবেশ স্থাপিত ও স্থানটী বন্দরে পরিবর্ত্তিত হয়। ইংরাজেরা দ্বীপটীর নূতন নাম রাখেন Prince of Wales' Island; কিন্তু পুরাণো নামটী নূতন নামকে হার মানিয়েছে। ভূগোল বা মানচিত্র ছাড়া নূতন নামটীর আর কোথাও

সন্ধান মিলে না। মালয় ভাষায় "পেনাং" বা "পিনাং"-এর অর্থ হচ্ছে শুপারী; পূরো নাম—"পুলো পেনাং"; পুলো অর্থে দ্বীপ। দ্বীপটীর আকৃতি অনেকটা শুপারীর মতো বলেই নাকি স্থানটীর ঐ নামকরণ হয়েছে। পুরাণো নামটী যতই চিত্তাকর্ষক হোক্ না কেন স্থানটীর মোটেই সে-গুণ নেই। প্রথম দফায় হচ্ছে বন্দরে নামার হাঙ্গামা। আমি ছিলাম ফরাসী জাহাজের যাত্রী। তা'ছাড়া ভারত-বাসী, তাই পুলিশ এ'সে খুঁটিনাটি করে ছাড়পত্র (Passport) পরীক্ষা করে দেখ্‌লেন আমি বন্দরে নাম্‌বার উপযুক্ত কিনা। এইটী নির্দ্ধারণ ক'রতে ক'রতে এক ঘণ্টা সময় কেটে গেল। জাহাজ পিনাংয়ে থাক্‌বার কথা ছিল মাত্র চার ঘণ্টা। এ'র ভিতর বিশেষ কিছু দেখ্‌বার অবকাশ ছিল না; শুধু রাস্তাগুলি ঘুরে আসা গেল মাত্র।

পিনাংয়ে প্রায় দেড় লক্ষ লোকের বাস। চীনেরাই সংখ্যায় বেশী। তা'ছাড়া মালয়, তামিল, ফিরিঙ্গি ও ইংরাজ, সবই কিছু কিছু আছে। জাহাজ থেকে নেমেই পূর্ব্ব মহাদেশ ভ্রমণে এসে প্রথমেই চিড়িয়াখানার খোঁজ করেন। ছোট্ট একটী পাহাড়ের (Crag Hill) উপর কিছুদিন থেকে একটী বৌদ্ধমন্দির নির্ম্মাণ করা হয়েছে, চীনেদের পয়সায়। কয়েকজন চীনা ভিক্ষুও সেখানে বাস করেন। স্থানটী খুবই চিত্তাকর্ষক ও মনোরম। মন্দিরের অদূরে একটী জল-প্রপাত সহরের শব্দকে ছাপিয়া উঠেছে। সেখানে একটু বস্‌লে মনে শান্তি পাওয়া যায়। এই শান্তিই হচ্ছে ভারতের নিজস্ব বস্তু। হাজার বছর ধরে সে তা' পূর্ব্ব মহাদেশের নানাস্থানে ছড়িয়েছে। পাশ্চাত্য জগতের সংস্পর্শে আসা অবধি সে পুরাণো ধারা দ্রুত বদ্‌লে যাচ্ছে। কিন্তু এই মহাদেশের নানাস্থানে, লৌহবর্ম্ম থেকে দূরে, বহুদূরে, কোনও দুর্গম প্রদেশে, পর্ব্বতের পাদদেশে অথবা মনোহারিণী কল্লোলিনীর তটভূমিতে, অথবা হাজার বছরের সাক্ষ্য দিতে পারে এমন পাদপপরিশোভিত নির্জ্জন বনান্তরালে বা গিরিকন্দরে তাপস ও ভিক্ষু ভারতের সে পুরাণো ধারা সযত্নে রক্ষা করছেন। তাঁদের ভরসা—হয়তো



আনাম-সম্রাটের হস্তীশকট—আনামের রাজধানী হুয়ের রাজপথে।

'টুরিষ্ট্'রা দেখ্‌তে যান পিনাংএর চিড়িয়াখানা; সেটা নাকি খুব দেখ্‌বার মত জিনিস। বিশেষতঃ য়ুরোপ ও মার্কিণ দেশের যাত্রীদের খুব ভাল লাগে। অবশ্য পূর্ব্ব মহাদেশটা সবই তাঁদের চোখে হচ্ছে চিড়িয়াখানা, তাই বোধ হয় তাঁরা আবার এমন দিন ফিরে আস্‌বে যখন প্রাচ্য মহাজাতি তার নূতন সভ্যতার আদর্শকে পদদলিত করে সেই পুরাণো স্মৃতিরেখা [illegible] করে নেবে ও জাগিয়ে তুল্‌বে।

ইন্দোচীন ভ্রমণ

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী

পিনাং থেকে সিংগাপুর দু'দিনের পথ। সিংগাপুরে জাহাজ অনেকক্ষণ থাম্‌বে কথা ছিল। বিকালে পৌঁছে সমস্ত রাতটা আমাদের সেখানে থাক্‌তে হয়েছিল। সিংগাপুর পিনাংএর চেয়ে বড় বন্দর। এখানে প্রায় আড়াই লক্ষ লোকের বাস—তার ভিতর দেড় লক্ষই হচ্ছে চীনা। এ অঞ্চলে সিংগাপুর ইংরাজের সব চেয়ে বড় বন্দর ও সেজন্য সেখানে তাঁর বহু শক্তির সমাবেশ। এখান থেকে যে নূতন মহাদেশের আরম্ভ তার শক্তির সঙ্গে ভাবী সংঘর্ষের আশঙ্কাতেই ইংরাজ এ-স্থানকে যথাসম্ভব সুরক্ষিত করেছেন। জাপান ও চীন এই উভয় শক্তির বিরুদ্ধেই ইংরাজের এই আয়োজন। সিংগাপুরের বল আরও বাড়িয়ে তুল্‌বার জন্য সিংগাপুরকে অবিলম্বে একটা বড় নৌ-কেন্দ্র (Naval Base) করতে হলে যা কিছু আয়োজনের দরকার ইংরাজ তা' করছেন।



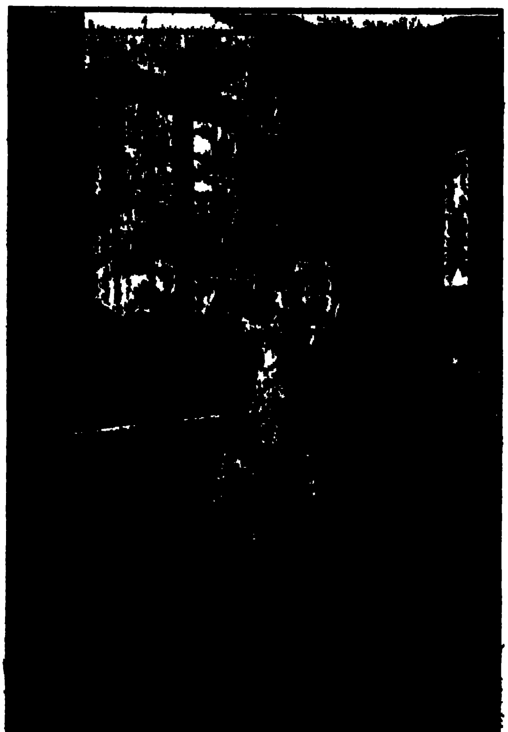
ইন্দোচীন-তরুণী।

যাক্, সে-সব ত গেল বর্ত্তমানের কথা। কিন্তু পুরাণো কথাও কিছু না বলে থাকা যায় না। কারণ সিংগাপুরে পৃথিবীর নানা জাতির সমাবেশ আজ নূতন নয়। দু' হাজার বছরের উপর থেকে এই পথ দিয়ে অনেক জাতি বাণিজ্য বা উপনিবেশ সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে সুদূর অজানা দেশের খোঁজে গেছে। এ বিষয়ে প্রথম পথ দেখিয়েছিলেন হিন্দু ঔপনিবেশিকগণ। খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভের তাঁরা এই জলপথ অতিক্রম ক'রে মালাক্কা উপদ্বীপ, যবদ্বীপ, কাম্বোজ প্রভৃতি স্থানে উপনীত হ'ন। তারপর চীনারা এই পথের সন্ধান পেয়ে নানা স্থানে দূত পাঠাতে থাকেন। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে রোম সম্রাট মার্কাস্ অরেলিয়স্ এণ্টনিয়াসের (Marcus Aurelius Antonius) প্রেরিত দূত এই পথে চীনদেশে আগমন করেন—রাজনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপনের আশায়। এই হচ্ছে পূর্ব্বদেশে পাশ্চাত্য জগতের প্রথম দূত প্রেরণ। সেই অবধি কত জাতিই না এ পথ দিয়ে গমনাগমন করেছেন। হিন্দুদের পরই পারসিক ও আরব নাবিকেরা এই পথে অনেকদিন ধরে তাঁদের প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তার পরই বর্ত্তমান য়ুরোপ এসে ছড়িয়ে পড়েছে।

বর্ত্তমান সিংগাপুর খুব আধুনিক সহর; ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে (১৮১৯) ইংরাজ কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। সিংগাপুরের পুরাণো নাম সিংহপুর। ত্রয়োদশ কিম্বা চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে যবদ্বীপের মজ্জপহিৎ রাজাদের সময়ে যবদ্বীপের ঔপনিবেশিকেরা ইহার স্থাপনা করেন।

অনেকে মনে করেন সিংহপুর মালয় কথা,—'সিংগগ্' অর্থে অবস্থান করা, 'পোরা-পোরা' অর্থে ভাণ করা। যবদ্বীপের ঔপনিবেশিকগণ এই পথে যখন মালাক্কা-জয়ে বেরিয়েছিলেন তখন সিংহপুরেই তাঁরা প্রথম অবস্থান করেন ও পরে তথা হতে উত্তরাভিমুখে রওনা হ'ন। এ তথ্যের সত্যতা নির্দ্ধারণ একটু কঠিন, তবে সিংহপুর স্থানটী যে আরও প্রাচীন তাতে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সিংগাপুরের ভিতর দিয়ে যে ছোট নদীটি সমুদ্রে পড়েছে তার সম্মুখবর্ত্তী পাহাড়ের উপর চতুর্থ শতাব্দীর যে সংস্কৃত লেখ পাওয়া গিয়াছে তাতে জানা যায় যে হিন্দু ঔপনিবেশিকেরা এই পথে অনেক পূর্ব্বেই এসেছিলেন ও স্থানীয় লোকের সঙ্গে একত্রে বসবাস আরম্ভ করেছিলেন। যে-স্থানে প্রাচীন লেখটী আবিষ্কৃত হয় সেটী ধ্বংস ক'রে এখন সাহেবের বাংলো উঠেছে। পুরাতত্ত্ববিৎ সে খবর জানেন; সাধারণে জানে না।

হিন্দুরা এই পথে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকেই বোধ হয় উপনিবেশ বিস্তার আরম্ভ করেন। মালাক্কা উপদ্বীপে ক্রমশঃ ছোট ছোট হিন্দু রাজত্ব গঠিত ও সংস্থাপিত হয়। এর ভিতর টক্কোল (কয়েকাল্) বন্দরের নাম আমরা খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতেই পাই। এটী ক্র-যোজকের (Isthmus of Kra) নিকটে অবস্থিত ছিল। প্রথমে হিন্দুরা, বোধ হয়, ঐ পর্য্যন্ত অর্ণবপোতে আসতেন ও তার পর পদব্রজে শ্যাম ও কম্বোজ প্রভৃতি দেশে যেতেন। তৎপরে সমুদ্রোপকূল দিয়ে আরও দূরে এসে উপনীত হয়েছিলেন। ওয়েলসি জেলায় খৃষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর প্রাচীন লেখ পাওয়া গেছে—সংস্কৃতে লেখা। মালাক্কা উপদ্বীপে ক্রমে যে-সব হিন্দুরাজ্য গড়ে উঠেছিলো তাদের নাম আমরা পরবর্ত্তী যুগে জানতে পারি। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে যখন চোল-রাজ রাজেন্দ্র চোলের অর্ণবপোত দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছিল তখন যে-সব রাজ্য ভারতের অধীনতা স্বীকার করেছিল, তাদের নাম হচ্ছে কটাহ (কড়ার—কা), শ্রীবিজয় (বর্ত্তমান পালেম্বাং), পন্নৈ (পনে—সুমাত্রার উত্তর-পূর্ব্ব উপকূলে), মলয় (মালাক্কা), মায়িরডিঙ্গ (গিরদিঙ্গ—মালাক্কা উপদ্বীপের সন্নিহিত), ইলঙ্গশোগম্ (লঙ্কাশুক—মালাক্কা উপদ্বীপের পূর্ব্বাংশে অবস্থিত) তলইতক্কোল (টক্কোল—মালাক্কা উপদ্বীপের পূর্ব্বাংশে), দামলিঙ্গ (তাম্রলিঙ্গ) ও ইলামুরি-দেশ (সুমাত্রার উত্তরাংশ)। এই ছোট রাজ্যগুলি মাঝে মাঝে কোন কোন শক্তিশালী প্রতিবেশীর অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হ'ত। তার ভিতর শ্রীবিজয় (সুমাত্রার-



ইন্দোচীনের আধুনিকা

ফরাসী প্রভাবে ইন্দোচীন-বাসীগণ শুধু বিদেশী পুস্তকাদি গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হননি, ইন্দোচীন রমণীরা য়ুরোপীয় পোষাক পরিচ্ছদও ব্যবহার শুরু করেছেন।

ইন্দোচীন ভ্রমণ

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী

পালেম্বাং প্রদেশে অবস্থিত ছিল) ও পরবর্ত্তী যুগে যব-দ্বীপ খুবই ক্ষমতাশালী হয়ে উঠে এবং এই সব রাজ্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। রাজেন্দ্র চোলের দিগ্বিজয় অবশ্য খুব ক্ষণস্থায়ী ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক সম্বন্ধ বড় একটা না থাক্‌লেও ভারতের ও এই ক্ষুদ্র হিন্দুরাজ্যের ভিতর বেশ একটা আদান প্রদান নিয়মিত ভাবে চল্‌ত। সেই সময়েই আমাদের সিংহপুরের সূচনা।

সিংগাপুর থেকে ইন্দোচীন প্রায় চারদিনের পথ। মালাক্কা উপদ্বীপটা বাঁয়ে রেখে জাহাজ সোজা উত্তরাভিমুখে গিয়ে কোচীন-চীনের বন্দর সাইগনে গিয়ে পৌছল। সাইগন মেকং-নদীর মোহানার কাছে অবস্থিত ইন্দোচীনের খুব বড় বন্দর ও ফরাসী কারবারের মস্ত কেন্দ্র। ইন্দোচীন হচ্ছে ইংরাজ-বর্জ্জিত দেশ। সাইগনে পৌছেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে ইংরাজী কথা বল্‌লে কেউ বুঝ্‌বে না। ফরাসী ভাষা ছাড়া গতি নেই। মুটে থেকে আরম্ভ করে হোটেলওয়ালা পর্য্যন্ত ফরাসী বলছে। সাইগন সহরটা খুব প্রাচীন নয়। সহরের পুরাণো অংশটা বাইরে পড়ে গেছে। সেখানে শুধু চীনাদের বাস, যেমনি দুর্গম তেমনি অপরিষ্কার। নূতন সহরটা দেখ্‌লেই মনে হয় এতে ফরাসী জাতির হাত পড়েছে। দু'দিকে রাস্তা—মাঝখানটা ঘাসে ও গাছে সবুজ হয়ে আছে। সেইটী হচ্ছে রাস্তায় বেড়ানর যায়গা। এই রাস্তাগুলিকে ফরাসী ভাষায় বলে Boulevard ('বুলভার্')। ষ্ট্রীট কিম্বা রোডের এখানে তেমন ছড়াছড়ি নেই। বড় রাস্তাগুলি হয় 'বুলভার্', না হয় 'আভেন্যু' (Avenue)। গলিগুলিকে সাধারণতঃ বলা হয় 'রু' (Rue)। সাইগনে ভারতবাসীও আছেন – তবে তাঁরা সাধারণতঃ পন্দিচেরী থেকে সেখানে ব্যবসায় বা কার্য্যোপলক্ষে আসেন।



আনাম-রমণী

সাইগনে আমাদের তিন চার দিন থাক্‌বার কথা। সেখান থেকে যেতে হবে কম্বোজে—হিন্দু কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দেখ্‌তে। আচার্য্য সিলভ্যাঁ লেভি ও হানয়ের (Hanoi) প্রাচ্য-বিদ্যাপীঠের কর্ত্তৃপক্ষ, লুই ফিনো (Louis Finot) ও আঁরি পার্মাতিয়ের (Henri Permutier) সঙ্গে কম্বোজ রওনা হ'বার কথা। সাইগনে দু'তিন দিন থেকে দীর্ঘ সমুদ্র-বাসের ক্লান্তিটা দূর করাই ছিল উদ্দেশ্য। সাইগনে দেখ্‌বার মত যে-সব জিনিষ আছে তার মধ্যে যাদুঘর (museum) সব চেয়ে চিত্তাকর্ষক। কম্বোজের ও প্রাচীন চম্পার ধ্বংসাবশেষ থেকে মূর্ত্তি বা

স্থপতিশিল্পের সংগৃহীত নিদর্শনের কিছু এখানে সংরক্ষিত হয়েছে। সেই সব সংগ্রহ দেখেই প্রথম বুঝ্তে পারলাম ফরাসীরা ইন্দোচীনের প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে কতটা কাজ করেছেন।

বর্ত্তমান ইন্দোচীনে ফরাসীজাতির প্রতিপত্তি খুব বেশী। কোচীন-চীন ও টঙ্কিন্ (Tonkin) দুইটী বিভাগই তাঁদের উপনিবেশ। তা' ছাড়া কম্বোজ (Cambodia) আনাম (Annam) ও লুয়াং প্রবং (Luang Probang বা Laos) তাঁদের 'সংরক্ষিত রাজ্য' (Protectorate); ভারতের করদরাজ্যের চেয়ে এ-রাজ্যগুলির স্বাধীনতা খুব বেশী নয়। তিনটী রাজ্যের ভিতর কম্বোজই সব চেয়ে ক্ষমতাশালী; তারপরই আনাম। আনামীরা এখন পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য ব্যগ্র। সেই উদ্দেশ্যে কয়েক বৎসর থেকে রাজনৈতিক দলও সংগঠিত হয়েছে। পারীতে (Paris) অবস্থানকালে এই দলের কয়েকজন নেতার সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ হয়েছিল। কোচীন-চীনের অধিবাসীরা হচ্ছে আনামীজ, কম্বোজে অধিবাসীরা মালয়। আনামীদের উৎপত্তি চীনা ও তিব্বতী হ'তে (Sino-Tibetan family); এরা দক্ষিণ চীন ও তিব্বতের প্রত্যন্ত-দেশের আদিম অধিবাসী। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে প্রাচীন হিন্দুরাজ্য চম্পা ধ্বংস ক'রে, এরা বর্ত্তমান আনাম রাজ্যের সংস্থাপনা করে। সেই থেকে ঐ প্রদেশে হিন্দুকীর্ত্তি লোপ পায়। কোচীন-চীন ও কম্বোজে যা'রা বাস করে তাদের অধিকাংশই মালয় জাতি। প্রাগৈতিহাসিক যুগে এরা গঙ্গানদীর উপত্যকা থেকে অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ভারতীয় দ্রাবিড় ও আর্য্য জাতির আগমনে ও আক্রমণে এরা মালাক্কা উপদ্বীপ থেকে ইন্দোচীন পর্য্যন্ত যে ভূমিভাগ, তার মধ্যেই আবদ্ধ হ'য়ে পড়ে। নৃতত্ত্ববিৎগণ এই প্রাচীন মহাজাতির নামকরণ করেছেন অষ্ট্রে-এসিয়াটিক্ (Austro-Asiatic) বা মালয়-পলিনেশীয় (Malay-Polynesian)। কম্বোজের অধিবাসীরা খ্মের (Khmer) এই মহাজাতির একটী শাখামাত্র। অবশ্য অন্য জাতির সঙ্গে এদের সংমিশ্রণ ঘটেছে ও ভারতীয় হিন্দু ঔপনিবেশিকগণের নিকট হ'তে এরা ভারতীয় সভ্যতা গ্রহণ করেছে।

(ক্রমশঃ)



ভৌতিক প্রেম

—গল্প—

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

১

মিত্তিরদের পুকুর-পাড়ে একটা বেলগাছ ছিল, সেটার বয়স অগস্তি। তার বেল বড় মিষ্টি। বেলের মধ্যে বিচি বড় কম, যেমন সেকালের বেলে হ'য়ে থাকে।

একে মিষ্টি বেল, তাতে পুষ্করিণীর পাড়, তাতে চতুর্দ্দিকে নানাপ্রকার ফুলের সুগন্ধ, তার উপর স্নিগ্ধ শান্তিময় আঁধার, এহেন স্থানে ভূত না থেকে যায় না। সবলোকেরই মত ছিল তাই।

তবে কি আপনি মনে ক'রছেন যে, যে-সে ভূত সেখানে আসে? তা নয়। যাদের বুক ভেঙ্গে গিয়েছে, কি জ্বলে পুড়ে গিয়েছে, সেই রকমের ভূতই মাঝে মাঝে এসে বেলপাতার মধ্যে বাসা ক'রে থাকত। প্রবাদ ছিল যে সমাজের সভ্যভূত, কিংবা কবি-ভূত, কিংবা গায়ক-ভূত, কিংবা এক-কথায় বাছা বাছা প্রেমিক-ভূত মাঝে মাঝে সেখানে এসে হাওয়া বদলে যেত। নিয়ম ছিল যে একটা ভূত সেই গাছে উপস্থিত হ'লে অন্য কোনো ভূত এক বৎসরের মধ্যে সেখানে আসত না। বোধ হয় বাৎসরিক শ্রাদ্ধের মর্য্যাদারক্ষার জন্য।

এই অবসরে ভূতের সম্বন্ধে কিছু জেনে রাখা ভাল, কারণ, হয়ত আপনি spiritualist ন'ন। ভূতবর্গের মধ্যে প্রেমিক ভূতই নিরীহ ও বিনম্র প্রকৃতির। আপনি জানেন বোধ হয় যে প্রেমিক-ভূত দেহত্যাগ ক'রলেও প্রাণত্যাগ করে না, কারণ জীবের প্রাণই প্রেম। যাদের হৃদয়ে প্রেম নেই, তারা চতুর্দ্দশীর পঞ্চভূত কিংবা সাংখ্যের চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব, কিংবা কণাদের পরমাণুর সামিল্। তাদের প্রাণ থেকেও নেই। কিন্তু প্রেমিক ভূতের মধ্যে প্রাণ, মন ও আত্মার মিলিত সাড়াশব্দ ও স্পন্দন আছে। তাদের একরকম মাটিই ব'ল্লেও চলে। দেখ্‌তে শুনতে ভাল, একটুতেই হাসিকান্নার অশ্রু বেরিয়ে পড়ে, অসুখ ক'রলে এক ডোজ্ পালসেটিলা দিলেই যথেষ্ট। এই শ্রেণীর ভূতের মধ্যে স্ত্রীভূতের সংখ্যাই বেশী। তাদের পেত্নী ব'ল্লে অপমান করা হয়। পেত্নী কথাটা নিতান্ত কদর্য্য। আটের বিবাদী। অন্য পরিচয় ক্রমশঃ দেওয়া যাবে; এখন গল্পটা চলুক।

লোকে কানাঘুসা ক'রত যে পয়লা বৈশাখ থেকে একটা স্ত্রীভূত সেই বিল্ববৃক্ষে আশ্রয় নিয়েছে। অনুমানে, সে বালিকা কিংবা যুবতী। সে কুন্দনন্দিনী প্রভৃতির মতো বিধবা কিনা, সে সম্বন্ধে অনেক তর্কবিতর্ক চ'লত, যেমন মাসিক পত্রের সমালোচনার মধ্যে আমরা দেখ্‌তে পাই। একদলের মতে সে বিধবা, কারণ সে স্বামীকে খুঁজে বেড়াত। আর একদল ব'লত যে, সধবা ভূত হলেও হ'তে পারে; অন্ততঃ তার মরবার পরে তার স্বামীর কাল হয়, সুতরাং মরবার পরে সে বিধবা হয়েছিল। যা হোক সেটার কোনো প্রমাণ ছিল না, কারণ তার সীঁথায় সিঁদুর ছিল কি-না সেটা রাত্রিতে দেখা যেত না। কিন্তু সবলেই একমনে দুঃখ প্রকাশ ক'রত যে 'হায়! হায়! এত অল্প বয়সে ভূত হয়ে গেল কেন?'

বগলাপিসি তাকে দু'বার দেখেছিলেন। তিনি বলেন এমন সুন্দরী কখনো দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। দুপুর রাত্রে গাছ হ'তে নেমে যখন সে পুকুরের পাড়ে আসে বাগান আলোতে ভ'রে যায়, ছোটো ঘাটটাতে তার মাথার চুল আঁটে না, গুমরে গুমরে কাঁদে, লুটিয়ে কাদা মাখে, পরণে একটা গেরুয়াবসন, সেটা গায়ে জড়িয়েই আর্দ্র অবস্থায় আবার গাছের উপর গিয়ে বসে। তার পরে আর দেখা যায় না। তবে বেলের খোসা বৃক্ষতলে দেখে বোধ হয় যে, খিদে লাগ্‌লে সে বেল ছাড়া আর কিছু খায় না।

কৃষ্ণকালী মিত্তির, যাঁদের পুকুর, থাক্‌তেন কল্‌কাতায়। বাগানের ফটক্ খোলা থাকৃত। সে পুষ্করিণীটাতে পাড়ার মেয়েছেলেরাই স্নান ক'রত। কিন্তু বগলাপিসির জবানবন্দীর পরে সে দিকটা কেউ মাড়াত না। কাজেই পুষ্করিণীর পাড় জঙ্গলে ভ'রে গেল। আরও আঁধার হ'ল।

কৃষ্ণকালী বাবুর ছেলে সুবোধের তখন কলিকাতায় বিয়ের কথা চ'ল্‌ছে। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ ছেলেটি, বয়ঃক্রম প্রায় পঁচিশ, এম এ পাশ, দেখ্‌তে কার্ত্তিকের মতন, শান্ত, শিষ্ট, সচ্চরিত্র। মস্ত একজন আর্টিষ্ট্। বাপের বিষয়ও অনেক। বাপ টাকাকড়ি চায় না। কত সুন্দরী মেয়ে দেখা হয়ে গেল। কিন্তু সুবোধ করযোড়ে ব'ল্‌ত, 'বাবা! এখন নয়, দিন কতক পরে।' তাতে পিতা নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হতেন ও মাতা হাপুস-নয়নে কেঁদে ব'ল্‌তেন, 'ওর কোষ্ঠীতে এই সময়ে একটা ফাঁড়া আছে, আমার কপালে বোধ হয় তাই ফ'লে যাবে।'

অবশেষে স্থির হ'ল যে হাওয়া বদলালে মন বদলান খুব সম্ভব। কিন্তু সুবোধ দিল্লী আগ্রায় যাবার ছেলে নয়; তার মনের মধ্যে একটা পল্লীগ্রাম জ্বল্-জ্বল্ করত। সুতরাং, 'যদি যেতে হয় তবে আমার জন্মস্থানটা একবার দেখ্‌ব,' এই পর্য্যন্ত স্বীকৃত হয়ে সুবোধ তার চাকর গদাধর ও একটা পোর্টম্যাণ্টো নিয়ে প্রস্থানোদ্যত। সুবোধের দিদি খানকতক উপন্যাস ও 'অবসর মতো' দেখ্‌বার জন্য জনকতক অবিবাহিতা সুন্দরী কুমারীর একখানা ফটো-অ্যালবম্ তার হাতে দিয়ে বল্লে, 'আমার মাথা খেয়ো, মাঝে মাঝে ওগুলো দেখো; বর্ষা আস্‌ছে এক মাসের বেশী থেক না।

২

বর্ষা মরতে মরতে বেঁচে গেল। প্রথমে এক মাস অনাবৃষ্টির ব্যাপার দেখে সকলেই মনে করেছিল যে, ঘোর দুর্ভিক্ষ হবে, কিন্তু হঠাৎ তিনদিন ধরে বৃষ্টি হওয়াতে আশার সঞ্চার হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে সকলে দেখলে যে, মিত্তিরদের বাগানবাড়ী পরিষ্কার হচ্ছে, পুষ্করিণীর পাড়ের জঙ্গল কাটছে, ফুলের গাছে জল দেওয়া হচ্ছে। সুবোধ তার দিদিকে চিঠি লিখলে, 'দিদিমণি, এটা ভূস্বর্গ। এক মাস থেকে দেখি, তার পর তোমাকে নিয়ে আস্‌ব। তোমার খোকা ও খুকিকেও খবর দিও। মা যদি তখন আসতে চা'ন সঙ্গে নিয়ে আসবে।'

সুবোধের সকলের চেয়ে প্রিয়স্থান হয়ে গেল সেই পুষ্করিণীর পাড়। সে একদিন সন্ধ্যার সময়ে বাঁধানো ছোট ঘাটটির দিকে যাচ্ছে, এমন সময় গদাধর একটু গম্ভীরভাবে বললে, 'দাদাবাবু, একটা কথা শুনেছি,—বড় ভয়ের কথা। যারা কখনো মিথ্যে কথা কয়না এমন লোকের কাছে শুনলুম যে, ও-ই পুকুর পাড়ের বেলগাছে একটা মেয়ে ভূত থাকে।'

সুবোধ। তাকে কোনো অত্যাচার করতে কেউ দেখেছে? দাঁত খিঁচোয়? গলা টিপে ধরে?

গদাধর। তা কেউ দেখেনি, কিন্তু শাঁকচুন্নির মতো নাকিসুরে কাঁদে।

সুবোধ একটু হেসে চাকরকে বললে, 'থিয়েটারেও আমরা কতবার সেরকম কান্না দেখেছি, তাতে তুই কখনো ভয় পেয়েছিলি?'

গদাধর উত্তর না দিয়ে চলে গেল। তার মনে হল যে, দাদাবাবুর কোষ্ঠীতে ফাঁড়ার কথা নিতান্ত অগ্রাহ্য করবার মতো নয়। কাজেই সে বগলাপিসি ও হারানের মা'র কাছে পরামর্শ ক'রতে গেল যে, কি করে দাদা বাবুকে এযাত্রা রক্ষে করা যায়।

হারানের মা বল্লেন যে, মেয়েভূত পুরুষের প্রাণবধ করে এমন কখনো শোনা যায়নি। যদি নিতান্ত দরকার হয় তবে কেবল স্ত্রীই স্বামীর গলা টিপে ধ'রতে পারে। অন্য পুরুষের গায়ে হাত সে দেবে কেন?

বগলাপিসি ব'ল্লেন, 'ওরে গদা! সে তেমন মেয়ে ভূত নয়রে, তেমন নয়! যদি একবার দেখতিস্! সাক্ষাৎ গৌরী-জগদ্ধাত্রী! মনের মধ্যে কি একটা আছে তাই কাঁদে।'

বগলাপিসি যতই আশ্বাস দিন্ না কেন, গদাধরের মনে দৃঢ় বিশ্বাস যে, আজকালকার মেয়ে-ছেলে সেকালের ভারতবর্ষের কাঠামোর নয়। যদি কিছুতে সন্তুষ্ট তারা হয় ত' চায়ে। সুতরাং প্রভুর হিতার্থে সে সঙ্কল্প ক'রলে যে, একপেয়ালা ফাইনেষ্ট-অরেঞ্জ-পিকো, আট্ চাম্‌চে খাঁটি দুধ দিয়ে ও চার চাম্‌চে দোবরা চিনি দিয়ে গরমাগরম সেই বেলগাছের নিচে প্রত্যহ রেখে আস্‌বে। দেবীই হন, কিংবা অপদেবীই হন, খুসি না হয়ে থাকতে পারবেন না। তাই সে ইতস্তত না ক'রে, সুবোধের অসাক্ষাতে এক পেয়ালা চা প্রাণপণে তৈরি ক'রে রাত্রি আটটার সময় বেলগাছের নিচে প্লেট্ ঢাকা দিয়ে রেখে, করযোড়ে বৃক্ষের দিকে চেয়ে বল্লে, 'মা! এ দীন-হীন কৈবর্ত্ত-

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

সন্তানের হাতের চা আপনি খাবেন কিনা জানিনে, কিন্তু বেসের সঙ্গে খেয়ে দেখ্‌বেন এমন সুস্বাদু জিনিষ আর নেই! আমার নিবেদন যে, দাদাবাবুর কোষ্ঠীতে যে ফাঁড়াটা আছে সেটা কাটিয়ে দিন্। তিনি একবগ্‌গা লোক, কারো কথা শোনেন না, সুতরাং আপনি ছাড়া তাঁকে রক্ষা করবার আর এসময় কেউ নেই। কোনো রকমে চেষ্টা ক'রবেন যেন তাঁর বিয়েটা শীগ্‌গির ঠিক হয়ে যায়, তাহলে আমরা সকলেই নিশ্চিন্ত হই।'

এইরূপে সজলনয়নে কাতরস্বরে খানিকটা প্রার্থনা করবার পর গদাধর দেখ্‌লে যে, চা-র পেয়ালাটা উল্টে প'ড়ে গিয়েছে, অথচ কোনো দমকা হাওয়া সেদিকে আসেনি কিম্বা পেয়ালার নীচে কোনো কীটপতঙ্গও ঠেলে ওঠেনি। উপরন্তু, সে যেন শুন্‌লে কে বল্‌ছে, 'তোর কোনো ভয় নেই'। গদাধর কৃতার্থ হয়ে পেয়ালার শেষের দু' ফোঁটা চা প্রসাদস্বরূপ মাথায় ঠেকিয়ে বাঁধানো ঘাটে গেল, ও সেখানে পেয়ালাটা ধুয়ে ফেলে এক দৌড়ে রান্নাঘরে ঢুকে বামন ঠাকুরের সঙ্গে রাত্রির খাবারটা বন্দোবস্ত ক'রতে বস্‌ল।

সুবোধ তার শয়নগৃহের বাতায়নের মধ্য দিয়ে দেখ্‌ছিল চারিদিকে ঘোর অন্ধকার। নিবিড় কাল মেঘ পূর্ব্বদিকের আকাশে বিদ্যুচ্ছটার সঙ্গে অগ্রসর হ'চ্ছিল। প্রকৃতির এই বিরাটপর্ব্বের মধ্যে ক্ষুদ্র মানুষটি অদৃষ্টের কথা ভাব্‌ছিল। নিজের অদৃষ্ট, সমাজের অদৃষ্ট, দেশের অদৃষ্ট, জীবের জন্ম-মৃত্যু, প্রেম ও সখ্যের বন্ধন, জনক-জননীর স্নেহ!

সুবোধের বাগানবাড়ী দোতালা। সেখান থেকে পুকুরপাড়ের বেলগাছটা বেশ দেখা যায়। দু' তিনবার বিদ্যুতালোকে গাছটার সবুজপাতা সুবর্ণাভ হয়ে ঝলসে উঠল। সুবোধের মনে পড়ে গেল সেই ভূতের কথা। অত-বড় মেঘখানা আধঘণ্টার মধ্যে কেটে গিয়ে আকাশ ও বাতাসের সঙ্গে মিশে গেল। সজনে গাছের পরপারে দশমীর চাঁদ ধীরে ধীরে উঠ্‌ছিল। গুমোট গরমটা কেটে গিয়ে শীতল বাতাস তখন উঠেছে। মনে কোনো সন্দেহ হ'লে সুবোধ সেটাকে চেপে রাখ্‌তে পারত না। সে ভয় পাবার ছেলেও নয়। হয় ভূত আছে, কিংবা নেই। আপাততঃ সেটার মীমাংসা না করাটা কাপুরুষের কাজ। এই কথা ব'লে, একখানা ছড়ি নিয়ে, সে নিঃশঙ্কচিত্তে পুকুরের দিকে চলে গেল।

৩

যদি দৃষ্টিবিকার না ঘ'টে থাকে তা'হলে স্বীকার ক'রতেই হবে যে অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্না, লাবণ্যময়ী, দীর্ঘকেশা, কৃশাঙ্গী একটি মেয়ে বাঁধাঘাটের তৃতীয় সোপানে আব্-ছায়ার মতো আরাম ক'রে বসে আছে! হাতে দুগাছি কাঁচের চুড়ি, পরিধানে একখানা কালাপেড়ে ফরাসডাঙ্গার কিংবা শান্তিপুরের শাড়ী, এলোচুল, প্রসন্নমুখ। চাঁদের আলোতে দেখাচ্ছিল একখানা ছবির মতো।

স্বভাবত সুবোধের গা শিউরে উঠ্‌ল। কিন্তু সেটা ভীতির শিহরণ। খুব সাহসী লোক যারা, তাদেরও ভূত দেখ্‌লে হৃৎকম্প হয়। কিন্তু সটান পলায়ন, বিশেষতঃ স্ত্রীলোক দেখে, নিতান্ত লজ্জার কথা! খানিকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থেকে সুবোধ একটু গলা পরিষ্কার করে বল্‌লে, 'কেও'? বলা বাহুল্য সেটা কম্পিতস্বর।

ভীতির Psychology বোধ'হয় আপনারা শুনে থাক্‌বেন আরসুল্লা ও কাঁচপোকার প্রবন্ধে। যে ভয় পায়, সে ভয়াবহ পদার্থে তন্ময় হয়ে পড়ে। এটা একটা Mediumistic ব্যাপার। অর্জ্জুন বিশ্বরূপ দর্শন ক'রে ভয় পেয়েছিলেন। আমরাও এক সময় সাহেব দেখ্‌লে ভয় পেতাম, এখন নির্ভয়ে 'গুড্ মর্ণিং স্যার, হা' ডু' ডু' প্রভৃতি বলে থাকি। যা-হোক্, মেয়েটি একটু হেসে ধীরে ধীরে বল্‌লে,—'মাফ কর্‌বেন, আমি একজন trespasser, ঐ বেলগাছে বাসা করেছি। কিন্তু ভয় পাবেন না; আমার দ্বারা আপনার কোনো অনিষ্ট ঘটবে না, সেটা নিশ্চয়।'

প্রত্যেক কথাই অতি মধুর বীণা-ধ্বনির মতো সুবোধের কানে বাজ্‌ছিল। কিন্তু সুবোধের নির্ব্বাক ও নিস্পন্দ ভাব দেখে সে আবার বল্‌লে,—'এত ভয় কিসের? আপনাদের বেলগাছে অনেক পাখী এসে বাস করে, তাদের দেখে ত আপনি কখনো ভয় করেন না। যদি

তারাই ভূত হ'ত ? তারা ত আমাকে দেখে ভয় করে না ! মানুষের কাছে মানুষই কি এত হিংস্র ?' কথাটা শুনে ক্রমে সুবোধের সাহস ও কৌতূহল বেড়ে উঠ্‌ল ।

সুবোধ বল্‌লে,—'আমি কাপুরুষ তার সন্দেহ নেই, কিন্তু ইহলোক ও পরলোকের সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ ও পরিচয় নিতান্ত কম, কাজেই একটু—'

মেয়ে-ভূত। আতঙ্ক হয় ? মনে করুন যদি আপনার স্ত্রী নিউমোনিয়াতে মরেন, ও দশ দিন পরে ভূত হ'য়ে দুপুর রাত্রে আপনার শয়নগৃহের জানালার সম্মুখে এসে দাঁড়ান, তখন আপনি নিশ্চয় ভয় পেয়ে শার্সিগুলো বন্ধ করে দেবেন ত ? কি দুর্ভাগ্য তাঁর ! স্বামী থাক্‌তেও তিনি অনাথা !

সুবোধ। ভদ্রে ! জীবন-মরণের ব্যবধান ভয়ানক। তার রহস্যের মধ্যে আমি প্রবেশ ক'রতে অক্ষম।

মেয়ে-ভূত। ভদ্র ! তবে উপন্যাস, কাব্য, ও দর্শন-গুলো পড়েন কি কর'তে ? ভারতবর্ষের যে-কোনো সতীকে জিজ্ঞাসা করুন, সে এক কথায় বলে দেবে স্বামীর সঙ্গে জীবনে মরণে কি সম্বন্ধ। স্বামী-ভূতের ভালবাসা রূপ, যৌবন, ও দেহের সঙ্গেই শেষ। তিনি ম'রে গেলে বিধবার নির্জ্জন গৃহে একবারও ফিরে এসে খবর নিতে চান না। কিন্তু স্ত্রী-ভূত মায়ার টানে বারম্বার আসে। যদি সুযোগ পায় তবে ছায়ার মতো সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। স্বামীকে প্রাণপণে বিপদ আপদ হ'তে রক্ষা করে।

এই বলে সে এলোচুলগুলো একটু গুছিয়ে নিয়ে, নতমুখে সরসীর জলের দিকে চেয়ে রইল। তার পরেই কি মনে ক'রে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।

সুবোধের মনে সন্দেহ ক্রমশঃ ঘনীভূত হ'চ্ছিল, এবং ন্যায়-শাস্ত্রের সাহায্যে সেটার মীমাংসা ক'রতে সে চেষ্টা করছিল। এটা কি নিজের চৈতন্যের বিকার ? ভূত কি কথা কয় ? সত্য-সত্যই কি ভূত আছে ? যদি থাকে তবে হয়ত মেয়েটি বিধবা। হ'তে পারে কাল্পনিক ভূত। হয়ত বঙ্কিমের উপন্যাসের কুন্দনন্দিনী, কিংবা শরৎ চন্দ্রের, কিংবা অন্য কোন শ্রেষ্ঠ উপন্যাস লেখকের উপন্যাসের নায়িকা। কিন্তু তাদের মতো এ বেশী কথা শেখেনি। আবার তারা ত বাস্তব ভূত নয়, বাস্তব-কল্পনা। ভূতের সঙ্গে কল্পনার কি তফাৎ ? যদি সত্য-সত্যই ভূত হয় তবে কতদিনের ভূত ? বয়স দেখ্‌লে বোধ হয় ষোল কিংবা সতের। যদি তের বৎসরে বিবাহ হয়ে থাকে তবে চার বৎসরের মধ্যে যে-সব উপন্যাস বেরিয়েছে সেগুলো তার প'ড়তে বাকি নেই। তার অল্পদিন পরেই স্বামীর মৃত্যু হয়েছে বোধ হয়। হয়ত কোনো শিক্ষিত গৃহস্থ ঘরের মেয়ে, কারণ অজানা পুরুষের সঙ্গে কথা-বার্ত্তায় সঙ্কুচিত হয় না। কিংবা হয়ত ভূত হবার পরেই সেই স্বাধীনতাটুকু পেয়েছে। আবার সুবোধ ভাব্‌লে, ভূতের ত ইন্দ্রিয় নেই, তার পক্ষে স্বাধীনতা থাকা-না-থাকা সমান। ভৌতিক জগতে কি সমাজ আছে ? পাশবিক লালসা ও আক্রমণ আছে ? কেমন ক'রে থাক্‌বে ? ওদের সূক্ষ্মদেহ, স্বচ্ছন্দে উড়ে বেড়াবে, অদৃশ্য হয়ে যাবে। কিন্তু 'ইন্দ্রিয় নেই' এ কথাই বা কেমন ? গতিশক্তি, দৃষ্টিশক্তি সবই ত র'য়েছে !

একবার জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ্‌লে হ'ত।

তাই সুবোধ শূন্য সোপানের দিকে চেয়ে আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা ক'রলে, 'আপনি কোথায় গেলেন ? অনুগ্রহ ক'রে আর একবার দেখা দিন্‌।'

মূর্ত্তি এবার দ্বিতীয় সোপানে এসে নির্ভয়ে সুবোধের কাছে ব'সল। তখন সুবোধ সাহস করে জিজ্ঞাসা ক'রলে, 'আপনি কি বিধবা ?'

৪

ভৌতিক মুখখানি ঈষৎ হেসে বল্‌লে'—'দেখুন, সত্যকথা বল্‌তে গেলে পুরুষ মাত্রেই আজন্ম-বিপত্নীক, ও স্ত্রী মাত্রেই আজন্ম-বিধবা। আমার ছোট মুখে বড় কথা শুনে আপনি হয়ত আমাকে নির্লজ্জা মনে ক'রবেন, কিন্তু আমি যে-পথে বেড়াচ্ছি সেটা সংসার ও সমাজের বহির্ভূত। মনের কথা বলি এমন কোন সাথী নেই। আপনি ভূতের কথা বুঝবেন কি না সন্দেহ।'

সুবোধ। চেষ্টা ক'রলে বোধ হয় পারব। ভূতের ইন্দ্রিয় আছে ?

মেয়ে-ভূত। আমরা কথাগুলো শুনতে পাই, কিন্তু প্রাণের কথা না হলে বুঝতে পারিনে। রূপ দেখ্‌তে পাই;

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

সেটা যে-রকমই হো'ক না কেন, তার মধ্যে প্রাণের রূপ আমরা দেখি। প্রাণের স্পর্শ না থাকলে রস গন্ধ ও স্পর্শের মধ্যে কোনো তফাৎ দেখিনে। আমরা যখন প্রাণকে স্পর্শ করি, তার কথা শুনতে পাই, তার রূপ দেখতে পাই, তখন বলি স্বামী পেয়েছি। কিন্তু সকল ভূতের কাছেই শুনেছি যে স্বামী কি স্ত্রী এক জন্মে কেউ পায় না। অনেক জন্মের পর কখনো মিলে যায়।

সুবোধ। আপনাদের ভূতের দেশে কি প্রাণ নেই? যদি থাকে তবে জন্মজন্মান্তরে এ সংসারের কষ্টটা বিধাতা দেন কেন? শুনেছি যে প্রাণ সর্ব্বত্রই আছে। তা যদি হয়, তবে পরলোকেই ত ঘটা ক'রে বিবাহ হতে পারত। প্রাণ ত একটাই? ভূতের মধ্যে কি বিবাহ হয় না?

মেয়ে-ভূত। তা হয় না, সেখানে দুঃখ নেই। যারা ফিরে গিয়েছে তারা বলে যে দুঃখটা পেতেই হবে। জন্ম হ'তেই সুরু। পাঠশালায়, বাসরঘরে, স্বামী-সহবাসে, রোগে-শোকে, আহারে-অনাহারে, ইন্দ্রিয়সুখে, প্রসব-যন্ত্রণায়, তাড়নায়, অভাবে, ঘর-সংসারে, সমাজে সবই দুঃখ। একজন পণ্ডিত-ভূতের সঙ্গে দেখা হয়েছিল প্রায় এক বছর আগে। তিনি বলেছিলেন 'মা! এর কোন চারা নেই। ভগবানের কলেবর প্রতিমুহূর্ত্তে ভেঙ্গে গ'ড়ে নূতন রকম হচ্ছে। সেটাকে বলে বিপ্লব। আমাদের তার মধ্যে থাকতেই হবে, ও ভাঙ্গা গড়ার দুঃখ সইতেই হবে। তার জন্য প্রত্যেককে মনে ক'রতেই হবে, 'আমি ভাঙ্ছি, আমি গড়ছি, আমি তার ফল ভোগ কচ্ছি।' তার জন্য দশকথা শুনতে হবে, শোনাতেও হবে। কলঙ্ক, নিন্দা, মিথ্যা অপবাদ, প্রবঞ্চনা, ধর্ম্মের গ্লানি, অধর্ম্মের জয়জয়কার পদে পদে। মাঝে মাঝে বিশ্রামের জন্য আমরা ম'রে ভূত হয়ে আসি কিছুদিনের জন্য।'

সুবোধ। ভদ্রে! আর কোনো পণ্ডিত এ দুঃখটা এড়াবার উপায় ব'লে দেন নি?

মেয়ে-ভূত। একজন সিদ্ধ-পুরুষ-ভূত দুর্গাপুরের মাঠের শুক্‌নো নিমগাছের ডালে ব'সে তপস্যা করেন; তিনি বলেছিলেন জপ-তপ ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু পণ্ডিত-ভূত ব'ল্লেন যে, নব-কলেবরের মধ্যে শুক্‌নো নিম-ডালও আছে, শ্মশানও আছে; তারও দুঃখ বড় কম নয়। তার চেয়ে স্বামী-প্রেমের শীতল ছায়াতে আশ্রয় নেওয়া ভাল।

সুবোধ। হে চন্দ্রলোকের সাথী! আমার শোনবার বড় ইচ্ছা হচ্ছে যে, আপনি কখনো সে শীতল ছায়া অনুভব ক'রেছেন কি না। এতে অপরাধ হয়ে থাকে ত মার্জ্জনা ক'রবেন। ছায়াতেই প্রাণের স্পর্শ, সেই ছায়াটুকু দেবে ব'লেই গাছের সৃষ্টি।

আবছায়ার মৃণাল বাহু দুটো ঈষৎ কেঁপে উঠ্‌ল। সরসীর জলও সঙ্গে সঙ্গে নেচে উঠল। মূর্ত্তি সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেল। সুবোধ এবার সাহস ক'রে তার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। মূর্ত্তি প্রেমময়ী! দূর হ'তে ক্ষীণ ভগ্নস্বরে কে যেন বল্‌ছিল 'না, আমি এখনো তা জান্‌তে পারিনি।'

সুবোধ বেলবৃক্ষের চতুষ্পার্শ্বের নিবিড় অন্ধকার লক্ষ্য ক'রে বল্লে, 'হে সঙ্গিনী! জেনে দরকার নেই। কেবল একটা বৃক্ষের ছায়াতে সন্তপ্ত দিশাহারা পাখীর মন উঠে না; সে বহু আশ্রয় খুঁজে বেড়ায়। কেবল একটা পাখীতে বৃক্ষের মন উঠে না; সে শত-শাখা বিস্তার ক'রে বহুবর্ণের, বহু জাতির পাখীকে তার ছায়াতে ডেকে আনে। বৃক্ষের প্রাণ ও পাখীর প্রাণ উভয়ই অস্থির হয়ে পড়ে। তার চেয়ে ম'রে গিয়ে ভৌতিক প্রাণ নিয়ে থাকাই ভাল। বিশ্বপ্রাণকে অবলম্বন ক'রে থাক।'

আঁধার ভেদ ক'রে কে যেন বল্লে, 'হে সাথী! সেই ভৌতিক জগতে কার রূপ দিন রাত্ দেখ্‌বে? আর একটা প্রাণে প্রাণ জড়িয়ে না থাকলে মানুষের সঙ্গে পাঁচটা ভূতের তফাৎ কি? তুমি হয়ত দেবতা, প্রাণের দেবতাকে নিয়ে সার্থক হবে। আমি কার সঙ্গে প্রাণের দেবতাকে দেখ্‌ব? সে চোখ আমার এখনো ফোটে নি।'

সুবোধ চ'ম্‌কে উঠ্‌ল, যেন তার বাহু কে স্পর্শ ক'রে প্রাণের অনুভূতি শতগুণ বাড়িয়ে দিয়ে গেল।

দূরে গদাধর ডাক্‌ছিল, 'দাদাবাবু, লুচি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। প্রায় এগারটা রাত্তির। পুকুরের পাড়ে ম্যালেরি জ্বরের ভয় আছে।'

৫

একাদশী, দ্বাদশী, ত্রয়োদশী কেটে গেল, সুবোধ সন্ধ্যা হ'লেই পুকুরের পাড়ে যায়, রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত ব'সে

থাকে, কিন্তু তার ভৌতিক সঙ্গিনী আর দেখা দেয় না। একদিন শুনতে পেয়েছিল ক্ষীণ কাতর-স্বর। যেন কে বলছে, 'দিদি! একটু জল দাও। ওষুধ খেলে কি হবে, ওষুধে কি প্রাণের জ্বালা যায়?'

সুবোধের প্রাণ তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু সে ত' ইহলোকের নয়। ইচ্ছা ক'রলেই সে দেখা দেবে, তাও কখনো হয় না। প্রাণের ব্যাকুলতা ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। তাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করবার ছিল। সেগুলো ছাই-ভস্ম প্রেমের কথা। প্রেমের কথার কি শেষ আছে? শত শত দীর্ঘজীবন কেটে গিয়েও মানব এখনো তার শেষ করতে পারে নি, এক রাত্রিতে কি প্রাণের তৃষ্ণা মিটে? এক-একবার ভাবত, ঐ পুকুরের জলে ডুবে ম'রলে কি হয়? হয়ত ভূতের জগতে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা হবে।

কিন্তু অদৃষ্টচক্রে জলে ডুবে মরবার দরকার হ'ল না। চতুর্দ্দশীর দিন সুবোধের দিদির একখানা চিঠি ডাকে এসে পৌঁছুল, তাতেই বোধ হয় জলডুবির ফাঁড়াটা কেটে গেল। দিদিমণি লিখেছেন, 'ভাই, তোমাকে একবার চট্ ক'রে আসতে হবে। আমি বড় বিপদে পড়েছি। আমার একটি বন্ধুর মেয়ে কানপুরে থাকত, তিনি মেয়েটির বিয়ের যোগাড় কর্ত্তে কলকেতায় এসে মহাবিপদে পড়েছেন। মেয়েটির জ্বর হয়েছিল, এখন বিকারে দাঁড়িয়েছে। ডাক্তার বলে, 'মেনিনজাইটিস্'। আমি ক'দিন ধরে রাত্তির জাগছি, কিন্তু মা খোকাকে একলা সামলাতে পাচ্ছেন না। এর মধ্যে আরও অনেক আশ্চর্য্য কথা আছে। সেগুলো ডাক্তার বলে, 'বুঝতে পাচ্ছি না।' আমি যে ফটো-অ্যালবম্‌খানা তোমাকে দেখতে দিয়েছিলাম তার মধ্যে একখানা ফটোর নীচে যে মেয়েটির নাম লেখা আছে 'আশালতা', এ মেয়েটি সেই। সে ফটোখানা প্রায় পাঁচ বৎসর আগে আমাদের কলকেতার বাড়ীতে নেওয়া হয়। বোধ হয় তুমি তাকে দেখে থাকবে। সুন্দর মুখখানি শুকিয়ে কঙ্কালসার হয়েছে।'

সুবোধের সে ফটো-অ্যালবম্‌খানার কথা মনে ছিল না; একবার দেখতে ইচ্ছা হ'ল। গোটা কতক ফটো উল্টেই আশালতার ছবি তার চ'খের সম্মুখে পড়ল। যে ভৌতিক মূর্ত্তি সুবোধকে পাগল করেছিল—এ সেই!

সুবোধ কম্পিতস্বরে ডাকলে, 'গদা!'

গদা এসে ত্রস্ত হয়ে দাঁড়াল।

সুবোধ জিজ্ঞাসা করলে, 'ট্রেন কটার সময় ছাড়ে?'

গদা। আর আধঘণ্টা দেরি আছে। কিন্তু এখনো খাবার তৈরি হয় নি।

সুবোধ। আমার খাবার চেয়ে যাবার দরকার আগে। আমি কলকেতায় এক-কাপড়ে চললাম, তুই পরের ট্রেণে জিনিষগুলো নিয়ে আয়।

গদা। কোনো বিপদ হয়নি ত?

সুবোধের রক্তবর্ণ কেন্দ্রভ্রষ্ট চক্ষু দেখে গদাধর ভয় পেয়েছিল।

সুবোধ ছড়িগাছটা নিয়ে পাগলের মতো একটু হেসে বললে, 'এমন কিছু বিপদ নয়। দিদিমণি আমার বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়েছেন। মেয়ে ঠিক হয়ে গেছে। দুটোর মধ্যে পৌঁছুতে না পারলে তার অন্য দেশে বিয়ে হয়ে যাবে।'

সুবোধ চলে গেল। গদাধর হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। সে এক দৌড়ে বেলগাছতলায় গিয়ে ডালের দিকে তাকিয়ে বললে, 'মা, অধীনের চা খেয়ে যে তুমি খুসি হয়েছ সেটা আমার পরম সৌভাগ্যি। যখন দাদাবাবুর বিয়ে করবার ইচ্ছা হয়েছে তখন ফাঁড়া কেটে গেছে নিশ্চয়। বিয়ে হয়ে গেলে তোমাকে এখানে এনে প্রত্যহ চা খাওয়াব। নতুন বৌকে আশীর্ব্বাদ কর মা।'

গদাধরের বেশ বোধ হ'ল যে, আশীর্ব্বাদের যোগাড় হয়েছে।

কলিকাতায় পৌঁছেই সুবোধ এক নিশ্বাসে বাড়ী গিয়ে উপস্থিত। জননী বল্লেন, 'এসেছিস্, বেঁচেছি। তোর দিদি কোথাকার এক রোগা-পটকা পাগলি মেয়েকে নিয়ে পড়েছে, তার জ্বর-বিকার সারছে না। মেয়েটা একগুঁয়ে, ওষুধ-পত্র খাবে না, কেবল আবোল-তাবোল বকে।'

সুবোধ। তারা কোথায়?

ভৌতিক প্রেম

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

জননী। পাশের বাড়ীতে। তোর গিয়ে কাজ নেই। হয়ত তার বসন্ত বেরুবে। আজ্‌কাল কিছুরই বিশ্বাস নেই।

সুবোধ। এখনো যখন বেরোয় নি, তখন একবার দিদিকে দেখে আসি।

সুবোধের রুক্ষ চুল ও শুক্‌নো মুখ দেখে জননী বল্লেন, 'আগে স্নান ক'রে চায়টে খেয়ে নে।'

সুবোধ। রুগীর বাড়ী থেকে ফিরে এসেই স্নান করা ভাল। আলাই-বালাই একবারেই পরিষ্কার করা উচিত।

সুবোধ দ্রুতপদে চলে' গেল।

জননী বাধা দিলেন না। তিনি হিসেব ক'রে দেখে-ছিলেন যে দশমীর দিনই সুবোধের কোষ্ঠীর ফাঁড়া কেটে গিয়েছে। এখন ততটা ভয় নেই।

৬

ডাক্তার প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন লিখ্‌ছিলেন। সুবোধ তার দিদিমণি ও তাঁর বন্ধু সেই রুগ্নার জননীকে প্রণাম ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রলে, 'আমি একবার তাকে দেখ্‌তে পারি কি?'

দিদি ব'ল্লেন 'না, প্রথমে ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ। আমি একটু ঘুমিয়ে নিই। আশারও তন্দ্রা এসেছে বোধ হয়। ক্রাইসিসের দিনে সেটা সুলক্ষণ। এখন পূর্ণিমার রাত্রিটা কাটলে হয়।'

ডাক্তার বন্ধু খুব বিচক্ষণ ডাক্তার। তিনি সুবোধদের family physician, ও সুবোধকে ভাল ক'রেই জানেন। সুবোধেরও একবার সঙ্কটাপন্ন জ্বর হয়েছিল, তিনিই আরোগ্য করেন। সুবোধের সঙ্গে দেখা হয়ে নিতান্ত আহ্লাদিত হ'লেন।

সুবোধ। কি রকম মনে ক'চ্ছেন? বাঁচবে?

ডাক্তার বন্ধু হেসে বল্লেন, 'সুবোধ! তোমার যখন টাইফয়েড হয়েছিল তখন তুমিও একদিন জিজ্ঞাসা করে-ছিলে 'আমি কি বাঁচব?' এখনো কি ঠিক সেই রকম ভয় হচ্ছে?'

সুবোধ (সলজ্জে)। হচ্ছে।

ডাক্তার। তুমি সত্যকথা ব'লেছ, সে জন্য তোমাকেও সত্য কথা বল্‌ব। তোমার স্নায়ুর যে রকম গঠন, এ মেয়েটির ঠিক তারই প্রতিরূপ। তোমার বিকারের সময় যে ওষুধ দিয়েছিলাম, একেও ঠিক সেই ওষুধ দিচ্ছি। কিন্তু তার চেয়ে ভাল হ'ত যদি তুমি তার ঘুমের ঘোরে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে। What she wants is sympathy from a nervous organisation like you। এ কে 'প্রাণ-বায়ুর চিকিৎসা', কিংবা 'ভৌতিক চিকিৎসা', কিংবা 'মেস্‌মেরিক চিকিৎসা' ব'ল্‌তে পার; তবে আসল কথাটা এই, ওষুধের উপর প্রাণ অবলম্বন ক'রতে পারে সেই সময়ে যখন তার চৈতন্য একেবারে স্থূল দেহে বদ্ধ। কিন্তু প্রাণের একটা স্বাধীনতা আছে। সে মধ্যে মধ্যে স্থূল দেহের স্নায়বিক গ্রন্থি-গুলো খুলে ফেলে কেবল আত্মা হয়ে দাঁড়ায়। যাকে আমরা বলি 'জীবন্দশা' তারই মধ্যে এই রকম অনেক সময় ঘটে। এমন অবস্থায় ওষুধগুলো পেটেই থেকে যায়, কিম্বা বড়-জোর circulatory system এর স্রোতে মিশে যায়, কিন্তু ভৌতিক মানুষটাকে স্পর্শ ক'রতে পারে না। এ রকম case বেশীভাগ, যাদের আমরা 'sentimental' বলি, তাদেরই অসুখে দেখেছি।

সুবোধ। আপনিও দেখ্‌ছি আমার মতো spiritua-lism বিশ্বাস করেন।

ডাক্তার। Seeing is believing; আমরা বিশ্বাস করি চিকিৎসার ফল দেখে। তর্ক-বিতর্কে কোনো সিদ্ধান্ত হয় না।

যারা Materialist তারা ব'লবে আত্মা, মন, প্রাণ সবই atomic combination-এর ফল। প্রণয়, যৌন-সম্মিলনেচ্ছার বিকাশ, পুত্রবাৎসল্য, জননীর স্নেহ ঈশ্বর-ব্যাকুলতা, ধর্ম্ম, এ-সব আত্মরক্ষা অর্থাৎ দেহরক্ষা ও সমাজ-রক্ষার কতকগুলো উপায়। Spiritualist ব'লবেন যে, আর একটা দিক্ হতে অলক্ষ্যে আত্মার ও আদর্শের বিকাশ হচ্ছে ভাবজগত দিয়ে। ভাবগুলো atomic combination-কে ছিন্নভিন্ন ক'রে ক্রমশঃ নূতন সৃষ্টি ক'রছে। সেটা কি রকম ক'রে হচ্ছে তার প্রণালী আমরা এখনো বুঝ্‌তে পারি না। মাঝামাঝি-গোছ theory এই যে, সকলেরই একটা aural কিংবা astral body আছে, সেটা স্থূল ও সূক্ষ্মের স্নায়ুমণ্ডলী দুটোকে জড়িয়ে থাকে। জন্মের পর ক্রমে দুটোর সম্বন্ধ ঘনীভূত হয়,—heredity-র

আইন তাতে খাটে না। Spirit-এর জগত স্বাধীন, matter-এর জগত বদ্ধ। Spiritual স্ত্রী ও spiritual স্বামী পরস্পরকে মুক্ত ক'রতে চায় স্থূলবন্ধন থেকে। সেই ব্যাকুলতাকে প্রেম ব'লতে পার। সেটুকুর মধ্যে মান, অভিমান, বিরহ, আত্মত্যাগ, নানারকম ভাবের বিকাশ আমরা দেখি। কিন্তু theory-গুলো বাদ দিয়েও আমরা একটা আশ্চর্য্য জিনিষ প্রত্যক্ষ ক'রেছি যে, একটা প্রাণ যদি আর একটাকে, তাদের স্থূল দেহ বিস্মৃত হয়ে, কেবল ভাব-জগতে স্পর্শ করে, তাহ'লে একজনের স্বাস্থ্য আর একজন স্বচ্ছন্দে লাভ করে। বিকারগ্রস্ত রোগীর মানসিক শান্তি চাই। স্থূলদেহের স্পর্শে সে শান্তি হয় না।

সুবোধ। Mesmerism-এর মতো কিছু ক'রতে হয়?

ডাক্তার। মনের অবস্থা বিশেষে। পরস্পরের মধ্যে spiritual প্রেমের সঞ্চার হ'লে কোনো বিশেষ প্রণালীর প্রয়োজন হয় না। বোধ হয় লক্ষ্য ক'রে দেখেছ যে, আজকাল শিক্ষিতা মেয়েদের মধ্যে স্বপ্নের মতন প্রেমের একটা নূতন ভাব এসেছে!

সুবোধ। শুন্‌তে পাই চা খেয়ে ও উপন্যাস প'ড়ে।

ডাক্তার (হেসে)। কোন্‌টা কোন্‌টার কারণ তা বলা বড় শক্ত। বিশ্ব জুড়ে একটা নূতন ভাবের তরঙ্গ উঠেছে ব'লে বোধ হয়। তারই ফলে কাব্য ও উপন্যাসের ছড়াছড়ি। নিতান্ত দরকার ও সময়োপযোগী ব'লেই ভাবের ভূত সাহিত্যিকদের ঘাড়ে চেপে সেইগুলো বের করে। যার যতদূর উৎকর্ষ সেই অনুসারে সে কাব্য ও উপন্যাসের কথাগুলো বেছে নিয়ে পড়ে। যে নিতান্ত স্থূল সে নিকৃষ্টগুলোই প্রথমে পছন্দ করে, তাতে মাথার রোগ হ'লে, আবার তার চেয়ে উৎকৃষ্টগুলোর ভাবের মধ্যে প্রবেশ ক'রতে চায়।

সুবোধ। আচ্ছা, মনে করুন, যদি আমি সত্য-সত্যই ভূত দেখে থাকি, ও সেই ভূত ঐ রুগ্নার মতো হয়, তাহ'লে কি বুঝতে হবে?

ডাক্তার। তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখো। আপাততঃ এই প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন্‌টা রেখে দাও।

৭

ডাক্তার চ'লে গেলে সুবোধ খানিকক্ষণ চুপ ক'রে বসে থাক্‌ল। তারপর স্নান ক'রে, এক পেয়ালা চা খেয়ে দিদিকে জিজ্ঞাসা করলে, 'আমি ও-ঘরে এখন যেতে পারি? ডাক্তার বলেছেন মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে।'

দিদিমণি অর্দ্ধঘুমন্ত অবস্থায় বল্লেন, 'তবে যাও। আমিও বাঁচি।'

সুবোধ খুব ধীরে ধীরে শয্যার কাছে গিয়ে ব'স্‌ল। একটা অসাধারণ দায়িত্ব সে নিজের ঘাড়ে নিয়েছিল! রোগীর জীবন-মরণ তার হাতে!

দেখ্‌লে যে আশালতার চক্ষুপল্লব কাঁপ্‌ছে। কেঁপে কেঁপে দৃষ্টি ফুটে উঠ্‌ল। কোথা হতে রক্তকণিকা এসে রক্তহীন কপোল রঙ্গিয়ে দিলে, যেন তুলি দিয়ে! নীল শিরাগুলি তার পাশে কি সুন্দর দেখাচ্ছিল! বাহুতে শক্তি ছিল না, কিন্তু কোথা হ'তে শক্তি এসে স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে তার কর-শাখা জীবন্ত ক'রে তুল্‌লে। চিন্‌তে পেরেছিল কিনা কে জানে? তবে হাত দু'খানি মাথার কাপড় একটু টেনে দিতে চেষ্টা কর্‌লে, না পেরে হতাশ হয়ে পড়ে গেল।

সুবোধ। ডাক্তার ব'লেছেন চুলগুলো এলিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে।

শুষ্ক ওষ্ঠাধর রসাল হয়ে কেঁপে উঠল। মুখে অভিমানের কথা ফুটে উঠল, 'তুমি আমাকে ছুঁওনা। আমি তোমাকে চিনেছি!'

সেই দুটো কথায় সুবোধের জন্মজন্মান্তরের রুদ্ধ প্রেম-প্রবাহ হৃদয় পরিপ্লুত ক'রে আশালতার দীর্ঘ কেশজাল তার হাতে জড়িয়ে দিলে।

সুবোধ বললে, 'নিশ্চয় ছোঁব, আমার অধিকার আছে, ছিল, ও জন্ম-জন্ম থাক্‌বে।'

আশালতার চক্ষু মুদ্রিত হ'য়ে গেল। বোধ হ'ল সে যেন সুবোধের স্পর্শে ঘুমিয়ে প'ড়েছে। কিন্তু তখনো নিদ্রিতার জড়িত কথা সুবোধের কানে বাজ্‌ছিল। 'তুমি ত আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে, তাকি ভুলে গিয়েছ? তোমার ছায়াতে সাধ ক'রে থাক্‌তে চেয়েছিলাম,

ভৌতিক প্রেম

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

কিন্তু তুমি শত শত পাখীর জন্ত ঘর বেঁধে রেখেছ, আমাকে মনে ধ'রবে কেন ?'

সুবোধ। অপরাধ ক্ষমা কর! তখন জীবিত ও মৃতের একত্ব বুঝতে না পেরে আত্মবিস্মৃত হয়েছিলাম।

আশা। এখন করুণা প্রকাশ ক'রতে এসেছ ডাক্তারির ছল ক'রে ?

সুবোধ। তুমি আমাকে সিঁড়ির ঘাটে স্পর্শ করার পর আমার ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছে। তারপর তোমাকে হাত বাড়িয়ে কত ডেকেছি, অন্ধকারে ঘুরে বেড়িয়েছি, জলে ডুব্‌তে গিয়েছি!

আশা। সব আমি জানি। কিন্তু তোমাকে জলে ডুব্‌তে দিসে ত ?

কি ভেবে আশালতা আবার বল্‌লে,—'আমার সঙ্গে তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ কিসের ? তুমি বলেছিলে আমাকে বিশ্ব-প্রাণ অবলম্বন করে থাক্‌তে। আমি এখন সন্ন্যাসিনী।'

সুবোধ। তুমি কতদূর সন্ন্যাসিনী, আমি কতদূর সন্ন্যাসী, সেটুকু পরে বোঝা যাবে ; এখন তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিই, একটু ঘুমুতে চেষ্টা কর।

অভিমানের নিশ্বাস স্নিগ্ধ ও স্থির হয়ে গেল। শোক-দুঃখ-জরামরণের অতীত প্রেমস্পর্শ পেয়ে আশা গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়ল।

দিদিমণি পা টিপে টিপে ঘরে প্রবেশ করে সুবোধকে বল্লেন, 'মা বল্‌ছিলেন আশার বসন্ত বেরুবে। তাই ত দেখ্‌ছি।'

সুবোধ। মোটেই না।

দিদিমণি। আমি জীবনের বসন্তের কথা বলছি, মরণের বসন্ত না। কাল ছিল মড়ার আকার, আজ যেন ফুল্ল কুসুমটি! জর ত মোটে নেই দেখ্‌ছি।

সুবোধ। হয়ত rise ক'রতে পারে।

দিদিমণি। আর rise ক'রবে কোথায় ? আকাশে ? জর মৃত্যুর হাত এড়িয়ে জীবনের অন্বেষণ ক'রতে গিয়ে rise করে, আমরাও করি। যাকে খুঁজছিল তাকে পেয়েছে। তার 'লেভেলে' এখন থেকে যাবে। আগে যদি জানতাম যে পুকুরের পাড়ে গিয়ে ভৌতিক প্রেম বাধাবে, তা হ'লে কানপুরেই তোমাকে নিয়ে যেতাম। মিছে মিছে আমার বন্ধুর রাশি রাশি টাকা খরচ করে কল্‌কাতায় এসে ডাক্তার ডাক্‌তে হ'ল। তোমাদের কোনো কালে বুদ্ধি-সুদ্ধি হবে না, তা আমরা জানি।

সুবোধ। আমার দোষ কি ?

দিদিমণি। কপালের দোষ। আমি বরাবর ওকেই তোমার জন্য মনে-মনে ঠিক ক'রে রেখেছিলাম। কেবল বাবা টাকা খুঁজ্‌ছিলেন, ও মা কোষ্ঠীর ফাঁড়া দেখ্‌ছিলেন।

সুবোধ চলে গেল। দিদিমণি গদাধরের কাছে তার চা' তৈরি ও বেলগাছের কাছে প্রার্থনার কথা আদ্যোপান্ত শুনে-ছিলেন। তাই যখন আশালতার ঘুম ভাঙ্গল্‌, তখন জিজ্ঞাসা কল্লেন , 'আশা, একটু চা খাবি ? খুব পাত্‌লা ক'রে ?'

আশা বল্‌লে, 'তাহলে বেঁচে যাই। এতদিন ত একথা বলেন নি।'

দিদিমণি। তোর ভৌতিক প্রেমের কথাও ত এতদিন বলিস নি। এখন সুবোধকে পেয়েছিস বলে বুঝি—! কি পাকা মেয়ে গো আজকাল্‌কার!

বেতার বার্ত্তা

শিশিরকুমার মিত্র



বিনা তারে টেলিগ্রাফের কথা সকলেই অনেক দিন হইতে শুনিয়া আসিতেছেন। গত চার পাঁচ বৎসর হইল বিনা তারে কথাবার্ত্তা, বক্তৃতা, সঙ্গীত, অর্থাৎ বেতার টেলিফোনির সৃষ্টি হইয়াছে। সম্প্রতি আবার বেতারে চিত্র, হস্তলিপি ইত্যাদি আদান-প্রদানের ব্যবস্থাও হইয়াছে। বেতারই হউক আর স-তারই হউক টেলিগ্রাফি ও টেলিফোনি দুই-ই মানুষের অত্যাশ্চর্য্য উদ্ভাবনা। স-তার টেলিগ্রাফি ও টেলিফোনি আমরা অপেক্ষাকৃত বেশী দিন হইতে দেখিয়া আসিতেছি বলিয়া আমাদের নিকট তত আশ্চর্য্য ঠেকে না। বেতার টেলিগ্রাফি ও টেলিফোনির উদ্ভাবনার ইতিহাস যেমন কৌতূহলোদ্দীপক তেমনই শিক্ষাপ্রদ। আজ এই দুইয়ের কথা কিছু বলিব।

গোড়াতেই বেতার-বার্ত্তা কি—এইটুকু পরিষ্কার করিয়া বুঝিয়া লইলে ভাল হয়। বেতার বা wireless বলিতে আমরা সাধারণত বুঝি, যে একজন প্রেরক ও একজন গ্রাহক আছেন—দুইয়ের মধ্যে দৃশ্যত কোনরূপ বাস্তব সংযোগ নাই—অথচ একজন কথাবার্ত্তা বলিলে আর একজনের কাছে সেই কথাবার্ত্তা ও সংবাদ পৌঁছিতেছে। বেতারের এই সংজ্ঞা যদি ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে বেতার-বার্ত্তা কি বাস্তবিকই এত অভিনব ব্যাপার? আমি এইখানে বসিয়া কথা বলিতেছি, আর আপনি আমার সম্মুখে পাঁচ-সাত হাত দূরে বসিয়া আমার কথা শুনিতেছেন, এই ব্যাপার ত আমি-আপনি সকাল-সন্ধ্যা করিতেছি—আমার আর আপনার মধ্যে ত তারের কোনও যোগ নাই—তবে ইহাও ত বেতার-বার্ত্তা। ইহাও একরকম বেতার-বার্ত্তা ঠিক। আমি যখন কথা বলিতেছি তখন আমার জিহ্বা সম্মুখস্থ বায়ুতে আন্দোলন তুলিতেছে, সেই আন্দোলন বায়ুদ্বারা বাহিত হইয়া আপনার কানে পৌঁছিতেছে। এই ভাবের সাধারণ কথাবার্ত্তার শব্দের বেতার বেশীদূর পৌঁছায় না। কথাবার্ত্তা বিশ-পঁচিশ ফুট যায়—খুব জোর গলায় বক্তৃতা করিলে তা' না হয় ২।৩ শত ফিট পৌঁছায়। কামানের গর্জ্জন হয়ত ৮।১০ মাইল যায়। ইহার বেশী দূরে শব্দ সাধারণত যায় না। শব্দের ঢেউ চলেও মন্থরগতিতে—সেকেণ্ডে মাত্র ১১০০ ফিট। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে এত জোরে শব্দ হইল যে তাহা কলিকাতা হইতে বর্দ্ধমান পৌঁছিতে পারে, তবে পৌঁছিতে ৪॥০ মিনিট লাগিবে।

আচ্ছা আর একরকম বেতারের কথা ধরা যাউক। ভোরবেলা সূর্য্যদেব যেই উঠিলেন, অমনি আমি টের পাইলাম যে তিনি উঠিয়াছেন। আমার চোখে আলোর ও ত্বকে উত্তাপের অনুভূতি জানাইয়া দেয় যে, সূর্য্যদেব দেখা দিয়াছেন। ইহা একরকম বেতার সংবাদ; কর্ণেন্দ্রিয় না দিয়া অপর দুই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমি সূর্য্যোদয়ের সংবাদ পাইলাম। আলোক ও উত্তাপ দ্বারা সূর্য্যদেবের উদয় জানা এটা অবশ্য খুব মোটা রকমের খবর, কিন্তু আমার বীক্ষণাগারে এমন সূক্ষ্ম যন্ত্র আছে যে তাহার

বেতার-বার্ত্তা

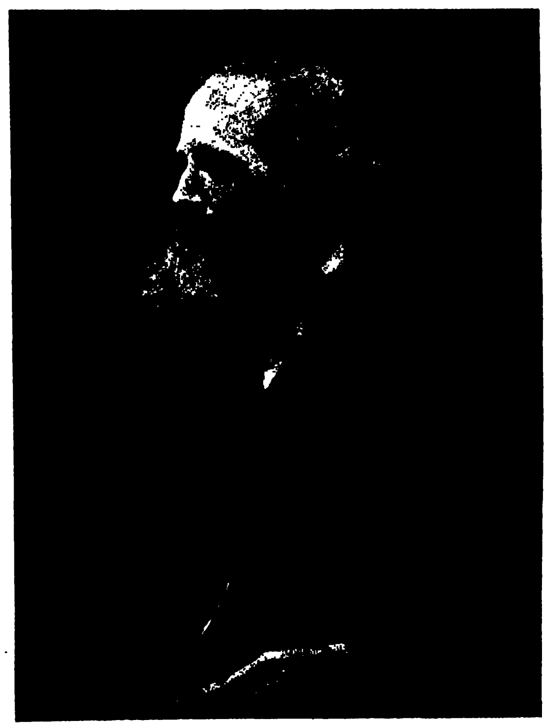
শ্রীশিশিরকুমার মিত্র

সাহায্যে আমি সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া দিতে পারি সূর্য্যে কি কি ধাতু আছে, সূর্য্যের উত্তাপ কত, সূর্য্য কঠিন, না তরল, না বায়বীয় ইত্যাদি। সূর্য্যালোকের



মাইকেল ফ্যারাডে

এই যে বেতার সংবাদ, ইহা চলে অতি ভীমবেগে, সেকেণ্ডে প্রায় ১৮০,০০০ মাইল। বেগটা বড় কম নয়। এই বেগে চলিলে ১ সেকেণ্ডে পৃথিবীকে সাতপাক দেওয়া যায়। সূর্য্য এত দূরে যে, সেখান হইতে এই আলোকের বেতার সংবাদ আসিতে প্রায় ১০ মিনিট সময় লাগে। তারকাগুলি আরও দূরে, নিকটতম তারকা হইতে আলো আসিতে প্রায় ৩৷০ বৎসর লাগে। আচ্ছা, শব্দের বেলা শব্দের বাহক হইল বাতাসের আন্দোলন বা ঢেউ—কিন্তু আলোকের বাহক কি? সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে, পৃথিবী ও তারকার মধ্যে যে কোটি কোটি যোজন শূন্য আকাশ বিস্তৃত রহিয়াছে, সেখানে ত বায়ু নাই, বায়ুর ঢেউও নাই, তবে আলোক কি বাহিয়া আসে? বৈজ্ঞানিকেরা এইখানে পরিকল্পনা করেন যে এই আপাত-প্রতীয়মান শূন্য আকাশ ইথর নামক এক অতি ঘন পদার্থে পূর্ণ। এই সর্ব্বব্যাপী ইথরের ঢেউই আলোকের বাহক। আমি একটা দিয়াশিলাইয়ের কাঠি জ্বালিবামাত্র কাঠির বারুদের গ্যাসের অণু-পরমাণু ও বিদ্যুৎকণাগুলি ভীষণ চঞ্চল হইয়া উঠে। তাহাদের চাঞ্চল্য ইথরে সংক্রমিত হইয়া ঢেউ সৃষ্টি করে। স্থির জলে ঢিল ফেলিলে যেরূপ ঢেউ হয়, সেই ঢেউ-ও তদ্রূপ চারিদিকে গোলাকার ভাবে ছড়াইয়া সেকেণ্ডে ১৮০,০০০ মাইল ছুটিতে থাকে; চলিবার পথে মানুষের চক্ষু পড়িলে, চক্ষুর অভ্যন্তরস্থিত নেত্রপটে (retina) আঘাত করিয়া মানুষের আলোকানুভূতি ঘটায়। মানুষের বেতার উদ্ভাবনের বহু পূর্ব্ব হইতে প্রকৃতি মানুষের চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের গোচরে শব্দ ও আলোকের বেতার সংবাদ প্রেরণের এই ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে



ম্যাক্স ওয়েল্

বেতারের এত রকম ব্যবস্থা থাকিতে আবার নূতন করিয়া বেতার সংবাদ-প্রেরণের উপায় উদ্ভাবন করিবার কি আবশ্যকতা ছিল—আর সে উদ্ভাবনের নূতনত্বই বা কোথায়? শব্দের বেতার ও আলোকের

বেতার এই দুই বেতারের সুবিধা-অসুবিধা দুইই আছে। প্রথমতঃ ইহাদের জন্য বিশেষ কোনও যন্ত্রপাতি আবশ্যক হয় না। তা' ছাড়া শব্দের বেলা একটা সুবিধা এই যে, শব্দ চলিতে চলিতে সাম্‌নে বাধা পাইলে বাঁকিয়া ঘুরিয়া যাইতে পারে। আমি ঘরে বসিয়া কথা বলিতেছি আপনি ঠিক দরজার সামনে না দাঁড়াইয়া আড়ালে দাঁড়াইয়াও আমার কথা শুনিতে পান। শব্দ দরজার পাশে ঘুরিয়া আপনার কানে পৌছায়। পক্ষান্তরে ইথরে আলোকের ঢেউ সোজাসুজি চলে, পথে বাধা পাইলে ঘুরিয়া যাইতে পারে না। ঘরে আলো জ্বলিতেছে, আমি যদি সাম্‌নে একখানা বই তুলিয়া ধরিয়া আড়াল করি তবে আপনি চক্ষে অন্ধকার দেখিবেন। কিন্তু আলো শব্দের অপেক্ষা অনেক বেশী দূর যাইতে পারে—আর বেগও



হাৎর্জ্

অতি ভীষণ। শব্দ বেশী দূর যাইতে পারে না, গতিও আলোর তুলনায় মন্থর। মানুষের উদ্ভাবিত বেতার এই দুইয়ের গুণসমন্বয় করিয়াছে। এই বেতারের সংবাদ অতি দূরে যাইতে পারে—গতির বেগ ঠিক আলোকেরই মত—আবার শব্দের ঢেউয়ের মত সাম্‌নে বাধা পাইলে ঘুরিয়া বাঁকিয়া যাইতে পারে। বেতারের ঢেউ আলোকের মত ইথরের ঢেউমাত্র, তফাৎ এই যে এই ঢেউগুলি আলোকের ঢেউয়ের চাইতে ঢের বেশী লম্বা। আলোকের ঢেউয়ের দৈর্ঘ্য * এক ইঞ্চের লক্ষ ভাগের এক ভাগ



অলিভার লজ্

হইবে; বেতারের ঢেউগুলি ১০০, ২০০, ১০০০, ২০০০ ফিট লম্বা। এইখানে ঢেউয়ের বাঁকিয়া যাওয়া সম্বন্ধে একটা কথা বলিয়া রাখা দরকার। ঢেউয়ের বাঁকার পরিমাণ নির্ভর করে দৈর্ঘ্যের উপর। লম্বা লম্বা ঢেউগুলি সহজেই বাঁকিতে পারে। বাতাসে শব্দের ঢেউ ২০, ২৫, ১০০ ফিট লম্বা, সুতরাং সেগুলি সহজেই ঘুরিয়া যাইতে পারে। ইথরে আলোকের ঢেউ একেবারে যে বাঁকিতে ঘুরিতে পারে না তাহা নহে, তবে অত্যন্ত ছোট ছোট বলিয়া অতি সামান্যই বাঁকে। † তাহা হইলে মোটামুটি-ভাবে বলিতে গেলে বলা যায় যে মানুষের উদ্ভাবিত

* ঢেউ-এর দুইটা মাথার মধ্যে যে দূরত্ব তাহাকে ঢেউ-এর দৈর্ঘ্য বলে।

† বড় ঢেউ কেন বেশী বাঁকিতে বা ঘুরিতে পারে ও ছোট ঢেউ কেন তত পারে না তাহার কারণের অবতারণা করা এখানে সম্ভবপর নয়।

বেতার-বার্ত্তা

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র

বেতার-যন্ত্রে এক জায়গায় একটী প্রেরক ও আর এক জায়গায় একটী গ্রাহক-যন্ত্র থাকে। প্রেরক-যন্ত্র হইতে ইথরে বড় বড় লম্বা লম্বা ঢেউ তোলা হইতেছে; এই

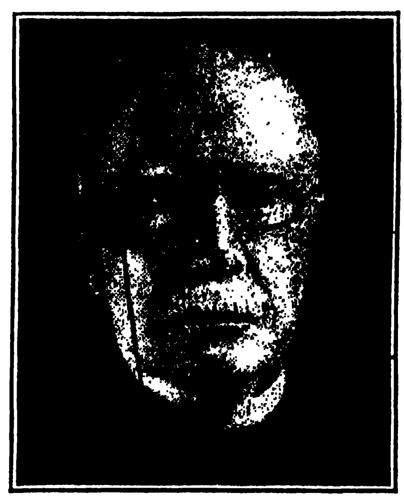


জগদীশ বসু

ঢেউ সেকেণ্ডে ১৮০,০০০ মাইল বেগে চারিদিকে ছুটিয়া চলিতেছে, সম্মুখে পাহাড় পর্ব্বত পড়িলে তাহা বেষ্টন করিয়া ঘুরিয়া যাইতেছে, দূরে গ্রাহক যন্ত্র এই বেতার ঢেউ ধরিয়া ঢেউ হইতে প্রেরক-যন্ত্রের সংবাদ আদায় করিতেছে। প্রেরক-যন্ত্র যেন আলোক-বর্ত্তিকা ও গ্রাহক-যন্ত্র যেন চক্ষু; আলোক-বর্ত্তিকা ইথরে ছোট ছোট ঢেউ তুলে, আর আমাদের প্রেরক-যন্ত্র লম্বা লম্বা ঢেউ সৃষ্টি করে; চক্ষু খালি ছোট ছোট আলোক-ঢেউ ধরিতে পারে, বড় ঢেউ চক্ষু এড়াইয়া যায়, আমাদের গ্রাহক-যন্ত্র বড় বড় ঢেউ ধরিয়া সেগুলিকে মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে। কথাটা সাধারণ ভাষায় বেশ সহজ বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু কাজের বেলায় এই প্রেরক ও গ্রাহক-যন্ত্র উদ্ভাবন ও তৈয়ারি করিতে মানুষকে অনেক বেগ পাইতে হইয়াছে। এই উদ্ভাবনের ইতিহাস মোটামুটিভাবে বলিতেছি।

ইথরে ঢেউ তোলা, ঢেউ ধরা ইত্যাদি সবই বিদ্যুতের খেলা। সুতরাং আবিষ্কারের কথা বলিতে গেলে বিদ্যুৎ সম্বন্ধে সর্ব্ব প্রথম যিনি বিশেষভাবে গবেষণা করিয়াছিলেন সেই মাইকেল ফ্যারাডের নামই সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে।

একটা ছোট সাধারণ পরীক্ষা ছেলেবেলায় সকলেই বোধ হয় করিয়াছেন। শীলমোহর করিবার এক টুক্‌রা গালা লইয়া সেটাকে রেশমের কাপড়ে ঘষিলে তাহাতে বিদ্যুৎ-সঞ্চার হয়। গালার টুক্‌রা ছোট ছোট কাগজের টুক্‌রার সাম্‌নে ধরিলে কাগজের টুক্‌রা লাফাইয়া গালায় আসিয়া লাগে। বৈদ্যুতিক আকর্ষণের এই ব্যাপারের হেতু নির্দ্দেশ করিতে ফ্যারাডেই প্রথম চেষ্টা করিয়াছিলেন।



ব্রাঁলি

ফ্যারাডে বলেন যে আপাত-দৃষ্টিতে যদিও মনে হয় এই আকর্ষণী শক্তি ঐ গালা ও কাগজে আছে, কিন্তু আসলে তাহা নহে। কাগজ ও গালা উভয়ের মধ্যে

যে আকাশটুকু আছে, সেই আকাশেই এই টানাটানি ব্যাপার ঘটাইতেছে। গালা রেশমে ঘষিয়া তাহাতে বিদ্যুৎ-সঞ্চার করা মানে গালার চতুষ্পার্শস্থ আকাশে টান (strain) পড়ানো। গালা ও কাগজের মধ্যস্থিত আকাশে টান পড়ার ফলে কাগজ লাফাইয়া গালাতে আসিয়া লাগে। এই টানাটানি কেন হয় তাহা ফ্যারাডে বলিবার চেষ্টা করেন নাই। আজ পর্য্যন্ত টানাটানির তথ্য নির্ণীত হয় নাই বটে, কিন্তু বস্তুতে বিদ্যুৎ-সঞ্চার হইলে যে আকাশে টান পড়ে এই কথা মানিয়া লইলে অনেক বৈদ্যুতিক ব্যাপার বুঝিবার খুব সুবিধা হয়। ফ্যারাডে ছিলেন দপ্তরীর ছেলে। নিজের বুদ্ধি ও অধ্যবসায়ের গুণে ইনি বৈজ্ঞানিক সমাজে সেকালে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ফ্যারাডে ইথরে এই টানাটানির পরিকল্পনা করিয়া গেলেন বটে, কিন্তু তাঁহার কথা বৈজ্ঞানিক-সমাজ সহজে মানিতে প্রস্তুত হন নাই। ফ্যারাডে গণিতবিদ্ ছিলেন



মার্কনি

না, আর বৈজ্ঞানিকের কাছে গণিতের কষ্টিপাথরে যে কথার পরীক্ষা হয় নাই, তাহা কেহই সহজে বিশ্বাস করিতে চান না। গণিতসিদ্ধ প্রমাণ প্রথম দেন কেম্ব্রিজের অধ্যাপক ক্লার্ক ম্যাক্স্‌ওয়েল্। ইনি দেখাইলেন যে ফ্যারাডের পরিকল্পনা মোটেই আজগুবি ব্যাপার নয়। গণিতের হিসাবে দেখা যায় যে বিদ্যুৎ-সঞ্চারিত দুইটী



লি-ডি-ফরেষ্ট্

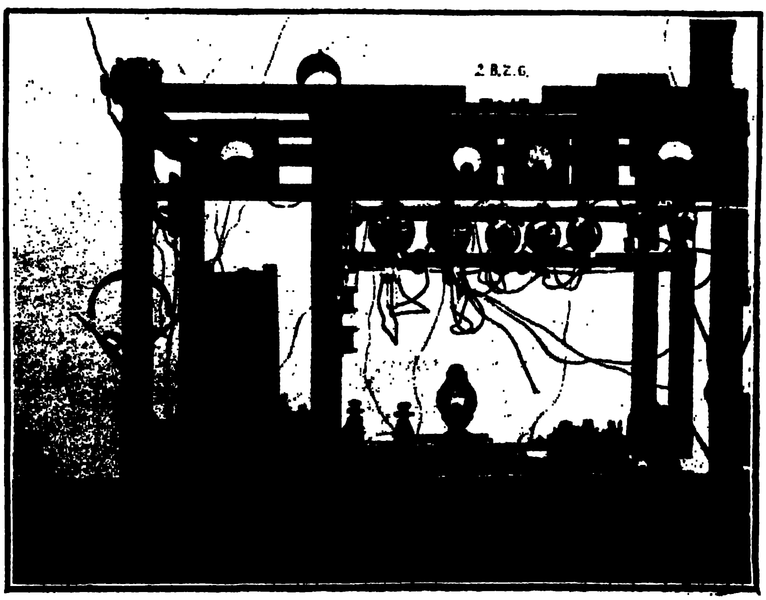
বস্তুর মধ্যস্থিত আকাশে টান বা মোচড় পড়া খুবই সম্ভব। শুধু তাহাই নহে; ম্যাক্স্‌ওয়েল্ আরও দেখাইলেন যে কোনও স্থিতি-স্থাপক পদার্থ ধরিয়া টানাটানি করিলে যেমন ঢেউ উঠে, তেমনি ইথরে এই বৈদ্যুতিক টানাটানির ফলে ঢেউ উঠিবে। আর সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইথরে এই বৈদ্যুতিক মোচড়ের ঢেউ ঠিক আলোকের ন্যায় সেকেণ্ডে ১৮০,০০০ মাইল বেগে ছুটিয়া চলিবে। ম্যাক্স্‌ওয়েলের এই কথায় সে সময়ে বৈজ্ঞানিক-সমাজে তুমুল গবেষণা উঠিয়াছিল। ম্যাক্স্‌ওয়েল্ অল্পবয়সে মারা যান। তাঁহার পরিকল্পনার পরীক্ষাসিদ্ধ প্রমাণ তিনি করিয়া যাইতে পারেন নাই। সে প্রমাণ প্রথম করেন এক জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক হার্ৎজ্ (Heinrich Hertz)। বিদ্যুৎ-তরঙ্গ কিরূপে সহজেই তোলা যায় তাহা তিনিই প্রথম হাতে-কলমে দেখাইয়া দেন। বিদ্যুৎ-তরঙ্গের যে আলোক-তরঙ্গের মত পরাবর্ত্তন

বেতার-বার্ত্তা

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র

(reflection), তির্য্যগ্‌বর্ত্তন (refraction) হয় তাহাও তিনি দেখাইয়া যান। এতদিন আলোকতত্ত্ব ও বিদ্যুৎতত্ত্ব পদার্থ-বিজ্ঞানের দুই বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে ছিল, দুইয়ের মধ্যে কোনও যে সম্বন্ধ আছে তাহা কেহই জানিত না। এখন দেখা গেল দুই-ই এক,—ইথরে খুব ছোট ছোট ঢেউ হইলে তাহাকে আলোক বলি, আর বড় বড় হইলে তাহাকে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বলি। হার্‌ৎজের পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক বৈজ্ঞানিক এই ব্যাপার লইয়া গবেষণা আরম্ভ করিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ইংলণ্ডে স্যর্ অলিভার্ লজ্, ফ্রান্সে ব্রাঁলি (Branly) ও ভারতবর্ষে স্যর্ জগদীশ বসু অগ্রণী। ব্রাঁলি ঢেউ ধরিবার একটী অতি সুন্দর ও সহজ যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। যন্ত্রটী Branly Coherer নামে অনেক দিন বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রচলিত ছিল। জগদীশ বসু বিদ্যুৎ-তরঙ্গের গুণ পরীক্ষার জন্য চমৎকার একটী যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। তাঁহার যন্ত্রকে সে-সময়ের বৈজ্ঞানিক-সমাজ শতমুখে প্রশংসা করিয়াছিলেন।

যা' হউক এ সমস্তই হইল বৈজ্ঞানিক গবেষণা। আলোক ও বিদ্যুতের খেলা একই প্রাকৃতিক নিয়মে হয় কি হয় না, জগতের আকর্ষণ বিকর্ষণের ধর্ম্ম বস্তুতে আছে না আকাশে আছে, ইথরে টান বা আঁচড় কি রকমে পড়ে ইত্যাদি বিষয় লইয়া পদার্থবিদ্‌গণ মাথা ঘামাইয়া থাকেন।



বিজ্ঞান-কলেজের বেতার-বার্ত্তা প্রেরক যন্ত্র

নূতন তথ্য আবিষ্কারের চেষ্টাই তাঁহাদের পেশা। বাহিরের সাধারণ লোকের কাছে এই সব গবেষণায় বিশেষ কিছু আসে যায় না। যতদিন না বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার কাজে (বা অকাজে) লাগে ততদিন বৈজ্ঞানিক তথ্য, যত গভীরই হউক না কেন, সাধারণের কাছে তাহার মূল্য নাই,—যদিও আজ পর্য্যন্ত সকল রকম মানুষের কাজে লাগা কল-কারখানার মূলে প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের নিঃস্বার্থ গবেষণার ফল রহিয়াছে।

বৈজ্ঞানিক ছাড়া আর এক রকমের লোক আছেন। ইঁহারা ইঞ্জিনিয়ার ও inventor (discoverer নহেন); ইঁহারা বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কৃত তথ্যগুলি কাজে লাগাইতে ব্যস্ত। ইঁহাদের উদ্ভাবনের ফলে মানুষের কাজও হয়, আবার ইঁহাদের নিজেদের ঘরেও দু' পয়সা আসে। ইঁহারা ভাবে ভোলা বৈজ্ঞানিক নহেন। আমি ইঁহাদের নিন্দা করিতেছি না, ইঁহারা জগতের অনেক উপকার করিয়াছেন, কিন্তু ইঁহারা ঠিক বৈজ্ঞানিক নহেন। ইঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্র ও বৈজ্ঞানিকের কর্ম্মক্ষেত্র বিভিন্ন। আমেরিকার এডিসন্ ও আধুনিক বেতার-বার্ত্তার মার্কনি এই ধরণের উদ্ভাবক। মার্কনি নূতন তথ্য কিছু আবিষ্কার করেন নাই, তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তিগণের আবিষ্কৃত তথ্য মানুষের কাজে লাগাইয়াছেন। মার্কনির আবিষ্কার মোটা-

মুটি এই। যখন বিদ্যুৎ-তরঙ্গ লইয়া, ফ্যারাডে-ম্যাক্স্‌ওয়েলের তথ্য লইয়া, হার্ৎজ্‌-লজ্‌-বসু-ব্রাঁলির পরীক্ষা লইয়া বৈজ্ঞানিক সমাজে আলোচনা চলিতেছে, তখন মার্কনির উর্ব্বর মস্তিষ্কে উদয় হইল যে, এই বিদ্যুৎ-তরঙ্গ দ্বারা সংবাদের আদান-প্রদান করা যাইতে পারে। মার্কনি বড়-লোকের ছেলে, চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে কাজ সুরু করিয়া দিলেন। বিদ্যুৎ-তরঙ্গ তুলিবার জন্য হার্ৎজের যন্ত্র রহিয়াছে, কিন্তু তাহার ঢেউ বেশী দূর যায় না,—সেই ঢেউকে দূরে কিরূপে পাঠান যায়? রাশিয়াতে পপফ্‌ (Popoff) একটা উঁচু মাস্তুলে তার লাগাইয়া আকাশ হইতে বিদ্যুৎ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আচ্ছা, উঁচু তার লাগাইয়া দেখা যাউক, যদি তাহা আকাশ হইতে বিদ্যুৎ সংগ্রহ করিতে পারে, তবে সেই রকম তারে বৈদ্যুতিক আন্দোলন সঞ্চারিত করিলে, সেই তার আকাশে বৈদ্যুতিক আন্দোলন দূরে ছড়াইয়া দিতে পারে কিনা। পরীক্ষায় দেখা গেল বাস্তবিক এই উপায়ে ঢেউ অনেক দূর যায়। ঢেউ দূরে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইল, কিন্তু ঢেউ ধরা যাইবে কিরূপে? কেন, ব্রাঁলির উদ্ভাবিত coherer রহিয়াছে হার্ৎজের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ তুলিবার যন্ত্র—scillator, পপফের দূরে পাঠাইবার উপায়—aerial-ও ব্রাঁলির গ্রাহক-যন্ত্র—coherer এই তিনের সমবায়ে মার্কনি বেতারে সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করিলেন। মার্কনির উদ্ভাবিত এই বেতার গত বিশ বৎসর মনুষ্য-সমাজের অনেক কাজে লাগিয়াছে। দূরদেশে, যেখানে সাধারণ টেলিগ্রাফের তার বসাইবার কোনও উপায় নাই, সেখান হইতে সংবাদ আদান-প্রদান এই ব্যবস্থায় সহজেই হয়। জাহাজ-ডুবির সময় জাহাজে বেতার থাকিলে সে অপর জাহাজকে নিজের বিপদের কথা জানাইতে পারে। আবার যুদ্ধের সময় অগ্রগামী দূত শত্রুর সংবাদ পাইলে বেতার-সাহায্যে গোলন্দাজকে খবর দিয়া শত্রুধ্বংসের সুবিধা করিয়া দেয়।

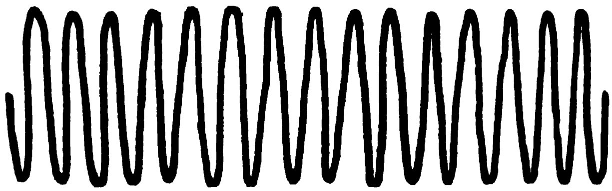


বেতার টেলিগ্রাফের জন্য ব্যবহৃত খণ্ডতরঙ্গ

যা' হউক, মার্কনি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন বেতার টেলিগ্রাফি। ইহার সাহায্যে এতদিন শুধু 'টরেটক্কার' আদান-প্রদান হইয়া আসিতেছিল। বেতার টেলিফোনির উদ্ভাবন হইয়াছে অতি সম্প্রতি। যুদ্ধের সময় কিছু কিছু কাজ ফ্রান্সে ও জার্ম্মাণীতে হইয়াছিল—কিন্তু পাছে শত্রুপক্ষ জানিতে পারিয়া কিছু সুবিধা করিয়া লয় সেই জন্য সমস্ত ব্যাপারটা খুব গোপন রাখা হইয়াছিল। যুদ্ধের পর টেলিফোনির কথা সাধারণে প্রকাশ পাইয়াছে। বেতার টেলিফোনির এতদিন দুইটী প্রধান অন্তরায় ছিল—একটী প্রেরক-যন্ত্রের দিক হইতে, অপরটি গ্রাহক যন্ত্রের দিক হইতে। বেতার টেলিফোনির জন্য ইথরে অবিচ্ছিন্ন অবিরাম ঢেউ তোলা দরকার—কিন্তু টেলিগ্রাফির জন্য এতদিন শুধু টুক্‌রা টুক্‌রা ঢেউয়ের সমষ্টি তোলা হইত। অবিচ্ছিন্ন ঢেউ তোলার কোন আবশ্যকতাও ছিলনা, ব্যবস্থাও ছিল না। একটা উদাহরণ দিলে কথাটা পরিষ্কার হইবে। ধরুন, স্থির জলে আপনি একবার আঙ্গুল নাড়িয়া আঙ্গুল তুলিয়া লইলেন, দুই তিনটা ঢেউ বৃত্তাকারে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল; পাচ সেকেণ্ড বাদে আবার একটু আঙ্গুল নাড়িয়া আঙ্গুল তুলিয়া লইলেন, আবার দুই তিনটা ঢেউ বৃত্তাকারে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। যদি এই রকম পাঁচ সেকেণ্ড অন্তর একবার করিয়া ঢেউ তোলেন, তাহা হইলে দেখিবেন যে স্থির-জলের উপর দুই তিনটা ঢেউ চলিয়াছে, তারপর খানিকটা স্থির জল, তারপর আবার দুই তিনটী ঢেউ। আবার ধরুন, আপনি যদি জলে আঙ্গুল দিয়া অনবরত জল নাড়িতে থাকেন তবে দেখিবেন জলের উপর দিয়া অবিরাম ভাবে ঢেউয়ের উপর ঢেউ চলিয়াছে, কোথাও ফাঁক নাই। টেলিগ্রাফের জন্ত ইথরে প্রথমোক্ত রকম ঢেউয়ের সমষ্টি তোলা হয়। এই রকম ঢেউয়ে টেলিফোনি চলে না। টেলিফোনির জন্ত অবিরাম ঢেউ চাই। এই অবিরাম ঢেউ তোলার কোনও রকম

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র

উপায় এতদিন জানা ছিল না। এই হইল একটী অন্তরায় প্রেরক-যন্ত্রের দিক হইতে। অপর দিকে গ্রাহক-যন্ত্রে ক্ষীণ ঢেউ ধরিয়া তাহাকে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য করিবারও কোন সূক্ষ্ম যন্ত্র ছিল না। প্রেরক-যন্ত্র হইতে ঢেউ যত দূরে যায় তত ক্ষীণ হইয়া আসে। ক্ষীণ ঢেউ ধরিয়া তাহাকে পরিবর্দ্ধিত (amplify) করার কোনও উপায় যদি না থাকে তবে যত জোরাল প্রেরক-যন্ত্রই হউক না কেন, ৪০।৫০ মাইলের বেশী দূরে সংবাদ পাওয়া যায় না। টেলিগ্রাফির 'টরেটক্কা'র পরিবর্দ্ধক যন্ত্র অনেক দিন হইতেই ছিল কিন্তু টেলিফোনির কথাবার্ত্তা, সঙ্গীত ইত্যাদির পরিবর্দ্ধক যন্ত্র বিশেষ কিছুই ছিল না। এই দুই অন্তরায়ের জন্য বেতার টেলিফোনির প্রচলন এতদিন হয় নাই। সম্প্রতি, যুদ্ধের সময়ে একটা ছোট যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে। যন্ত্রটী দেখিতে সাধারণ বিজলী-বাতির মত- নাম valve tube। এই যন্ত্রটি একদিকে যেমন উপরে অবিরাম ঢেউ তোলার জন্য ব্যবহার করা যায়, তেমনি আবার অপর দিকে গ্রাহক-যন্ত্রের ক্ষীণ সংবাদকে লক্ষ লক্ষ গুণ পরিবর্দ্ধিত করার জন্যও ব্যবহার করা যাইতে পারে। যন্ত্রটি বাস্তবিকই অতি আশ্চর্য্য; এক কথায় বলিতে পারা যায় যে,এই যন্ত্র বৈজ্ঞানিকের গবেষণাগারে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। যন্ত্রের উদ্ভাবকের নাম সকলেই জানিতে চাহেন। উদ্ভাবক কে তাহা লইয়া অনেক বাক্‌বিতণ্ডা, তর্কবিতর্ক এমন কি মামলা-মোকর্দ্দমা পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। যন্ত্রের কতক অংশের কল্পনা Fleming নামে একজন ইংরাজ বৈজ্ঞানিক কয়েক বৎসর পূর্ব্বে করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার যন্ত্র বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই। উপস্থিত পূর্ণ-গঠিত যন্ত্রটির উদ্ভাবক একজন আমেরিকান, নাম লি, ডি, ফরেষ্ট্ (Lee de Forest)। যন্ত্রটির ভিতরে কি আছে, এবং ঠিক কি উপায়ে উহা বেতার টেলিফোনিতে ব্যবহৃত হয়, তাহা সাধারণ ভাষায় বুঝান শক্ত। এ প্রবন্ধে তাহার অবতারণা সম্ভবপর নয়—বারান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।



অবিরাম ঢেউ

মাত্র ৪।৫ বৎসর বেতার টেলিফোনির উদ্ভাবনা হইলেও ইতিমধ্যে ইহার অনেক উন্নতিসাধন হইয়াছে। ইংলণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে নিয়মিত-ভাবে বেতার টেলিফোনি চলিতেছে। আমেরিকার ভিতরে বেতার টেলিফোনি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আজকাল ব্রড্‌কাষ্টিং-এর (Broadcasting) কথা সবাই জানেন। এক জায়গায় একটা বড় প্রেরক-যন্ত্রের কাছে গান, বাজনা, বক্তৃতা ইত্যাদি হয়। কোন্ কোন্ সময় হইবে আগে হইতে সংবাদ-পত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া থাকে। যাঁহারা এই সব শুনিতে চাহেন তাঁহারা নিজেদের ঘরে একটা গ্রাহক-যন্ত্র বসাইলেই এই সব শুনিতে পাইবেন। বিলাতে এইরূপ একটা ব্রড্‌কাষ্টিং কোম্পানী গত চার বৎসর কাজ করিতেছে। প্রায় বিশ লক্ষের অধিক লোক গ্রাহক-যন্ত্রের সাহায্যে নিয়মিতভাবে সঙ্গীতাদি উপভোগ করে। সম্প্রতি ভারতবর্ষেও একটা ব্রড্‌কাষ্টিং কোম্পানী হইয়াছে। কাশীপুরে ইঁহাদের প্রেরক-যন্ত্র, মাস্তুল ইত্যাদি বসানো হইতেছে। সম্ভবতঃ ২।৩ মাসের মধ্যেই ইঁহারা কাজ আরম্ভ করিবেন। ব্রড্‌কাষ্টিং কোম্পানীর অবর্ত্তমানে প্রায় এক বৎসর হইল কলিকাতা বিজ্ঞান-কলেজে একটা প্রেরক-যন্ত্র বসান হইয়াছে। সেখান হইতে সপ্তাহে পাঁচ দিন সঙ্গীত, বক্তৃতাদি প্রেরণ করা হয়। বারাণসী, বর্ম্মা, লক্ষ্ণৌ ইত্যাদি দূর জায়গা হইতে ভাল গ্রাহক-যন্ত্রের সাহায্যে উক্ত প্রেরিত বেতার-বার্ত্তা নিয়মিতভাবে শুনা যায়। অনেকে গ্রাহক-যন্ত্রের দাম জিজ্ঞাসা করেন। দাম অনেকটা নির্ভর করে গ্রাহক প্রেরক-যন্ত্র হইতে কতদূরে রহিয়াছেন ও কি রকম ভাবে শুনিতে চান তাহার উপর। যদি এমন হয় যে গ্রাহক প্রেরক-যন্ত্রের ২৫।৩০ মাইলের মধ্যে আছেন ও তিনি যদি একলা শুনিয়াই সন্তুষ্ট হন, তবে ১৫৲।২০৲ টাকার মধ্যে একটা গ্রাহক-যন্ত্র তৈয়ার করা যায়। যদি তিনি এমন চান যে ঘরশুদ্ধ

লোক একসঙ্গে শুনিতে পাইবে, তাহা হইলে পরিবর্দ্ধক যন্ত্র (valve set) লাগাইতে হয় এবং তাহাতে ২০০৲।৩০০৲ টাকাও লাগিতে পারে।

অপর পৃষ্ঠায় বিজ্ঞান-কলেজের প্রেরক-যন্ত্রের একটা চিত্র দেওয়া হইয়াছে। চিত্রে যে কাচের গোলক দেখা যাইতেছে ঐগুলি নবোদ্ভাবিত valve। ওগুলি বড় বড় প্রেরক-যন্ত্রে ব্যবহারের জন্য। সাধারণত গ্রাহক-যন্ত্রে পরিবর্দ্ধকরূপে যেগুলি ব্যবহার হয় সেগুলি আরও ছোট ছোট।

এইখানে একটা কথা মনে হইতে পারে। আমাদের কাছে যদি পরিবর্দ্ধক যন্ত্র থাকে তবে যতদূরেই যাই না কেন, আমরা বেতার টেলিফোনি শুনিতে পাইব। সংবাদ যদি দূরত্বের জন্য কোটি গুণ ক্ষীণ হইয়া যায় তবে কোটী গুণ পরিবর্দ্ধক লাগাইলেই হইবে সাধারণ ভাবে এইরূপ মনে হয় বটে, কিন্তু কাজের সময় এইরূপ হয় না। আমাদের চারিদিকে অনবরত নৈসর্গিক কারণে বৈদ্যুতিক উৎপাত হইতেছে। আকাশে কোথাও হয়ত বিদ্যুৎ-সঞ্চারিত একখণ্ড মেঘ রহিয়াছে; অথবা হয়ত দূরে ঝড়বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাত হইতেছে; এই সব কারণে ইথর কখনও স্থির নিশ্চল থাকে না, তাহাতে অনবরত আন্দোলন ও আলোড়ন বা তরঙ্গবিক্ষেপ হইতেছে। ধরুন এখন আমাদের গ্রাহক-যন্ত্র আমরা বেতার শুনিবার জন্য লাগাইয়াছি। প্রেরক বহু দূরে আছে বলিয়া আমাদের যন্ত্রের পরিবর্দ্ধন-শক্তি খুব বেশী করিয়াছি। ক্ষীণ বেতার সংবাদ ধরিয়া যন্ত্র তাহাকে কোটি গুণ পরিবর্দ্ধিত করিতেছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে ইথরে অন্য বৈদ্যুতিক উৎপাতের জন্য যে আন্দোলন আলোড়ন হইতেছে তাহাকে ধরিয়া পরিবর্দ্ধিত করিতেছে। ফলে বেতার সংবাদ যদি বৈদ্যুতিক উৎপাত অপেক্ষা ক্ষীণ হয় তবে উৎপাতজনিত গোলমালের জন্য সংবাদ কিছুই পাওয়া যাইবে না। ঠিক যেমন কিছু দূরে সঙ্গীত হইতেছে, আমি সঙ্গীত শুনিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু বাহিরে রাস্তায় এত বেশী গোলমাল হইতেছে যে, কানে চোঙা লাগাইয়াও ভাল শুনিতে পাইতেছি না—কারণ চোঙা দিয়া সঙ্গীত যেমন জোরালো হয় গোলমালও সেইরূপ বৃদ্ধি পায়।

এই যে নৈসর্গিক উৎপাত, ইংরাজিতে ইহার সাধারণ নাম Atmospherics। আজকাল ইহাই দূর হইতে ক্ষীণ বেতার টেলিফোনি শুনিবার প্রধান অন্তরায়। ফলে বেশী দূরে সংবাদ পাঠাইতে হইলে শুধু গ্রাহক-যন্ত্রকে বেশী পরিবর্দ্ধিত করিয়া কোনও লাভ নাই, প্রেরক-যন্ত্রকেও খুব শক্তিশালী করিতে হয়। আমাদের দেশে এই প্রকার নৈসর্গিক উৎপাত সাধারণত চৈত্রমাস হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ষার শেষ পর্য্যন্ত বেশী থাকে। শীতকালে অপেক্ষাকৃত কম। এই উৎপাত কোন্ দিক হইতে বেশী আসে, সকাল-সন্ধ্যায় অথবা রাত্রে কখন্ বাড়ে কখন কমে, বৎসরের কোন্ সময়ে ঠিক কতটুকু ইহার হ্রাসবৃদ্ধি হয়, এই সব খবর জানা অত্যন্ত দরকার। বিজ্ঞান-কলেজে ইহার সম্বন্ধে গবেষণা করার জন্য একটী যন্ত্র তৈয়ার হইয়াছে।

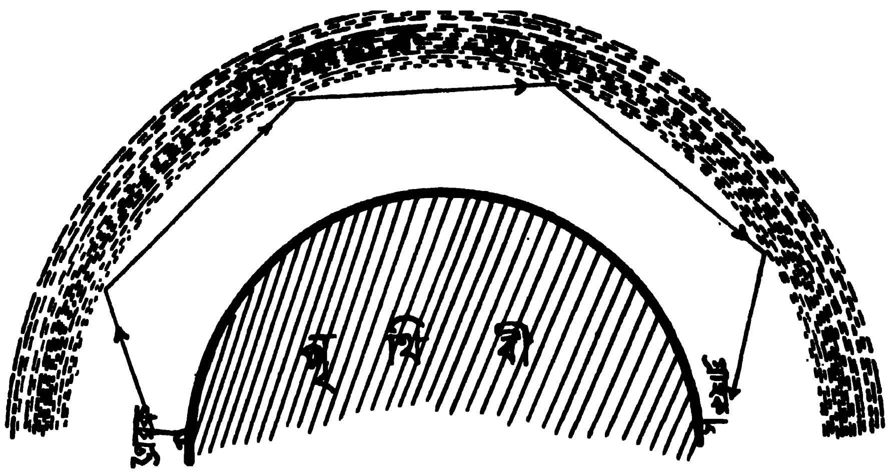
পৃথিবীর কুব্জ-পৃষ্ঠের উপর দিয়া বেতার ঢেউ এক জায়গা হইতে অপর জায়গায় কি উপায়ে যায় সেই সম্বন্ধে কিছু বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

পৃথিবীর পৃষ্ঠে আমেরিকা ভারতবর্ষের ঠিক উল্টা দিকে অবস্থিত। কিন্তু দেখা যায় যে আমেরিকা হইতে শক্তিশালী প্রেরক-যন্ত্রের ঢেউ ভারতবর্ষে পৌঁছায়। ভারতবর্ষের গ্রাহক-যন্ত্র আমেরিকা হইতে বেতার সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারে। প্রশ্ন উঠে বেতার ঢেউ পৃথিবীর এতটা কুব্জ-পৃষ্ঠ (প্রায় ১৮০ ডিগ্রী) কিরূপে ঘুরিয়া আসে। আমরা গোড়ায় বলিয়াছি যে ইথরে বেতারের লম্বা লম্বা ঢেউ সম্মুখে বাধা পাইলে বাধাকে ঘুরিয়া বেষ্টন করিয়া যাইতে পারে। সুতরাং সহজেই মনে হইতে পারে যে বেতারের ঢেউ এই কারণে পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আমেরিকা হইতে ভারতবর্ষে পৌঁছায়। কিন্তু হিসাব করিয়া দেখা যায় যে, বেতার ঢেউ যদিও পৃথিবী-পৃষ্ঠের উপর বাড়ীঘর পাহাড়-পর্ব্বত বেষ্টন করিয়া যাইতে পারে (একটা পাহাড় কতই বা উঁচু হইবে? খুব বেশী হয় ত ৩।৪ মাইল) কিন্তু পৃথিবীর পৃষ্ঠ দিয়া

বেতার-বার্ত্তা

শ্রীশিশির কুমার মিত্র

১৮০ ডিগ্রী ঘোরা তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। এইরূপে ১৮০ ডিগ্রী ঘোরা ও ৪০০০ মাইল উচ্চ একটা পাহাড়কে লঙ্ঘন করিয়া যাওয়া একই কথা। এতটা উঁচু বাধা ঘুরিয়া যাওয়া সম্ভবপর নয়। তাহা হইলে আমেরিকা হইতে ভারতবর্ষে পারে না। ৫০।৬০ মাইল উপরে গিয়াই এই প্রতিফল স্তরে ঠেকিয়া আবার নীচের দিকে ফিরিয়া আ প্রেরক-যন্ত্র হইতে বেতার ঢেউ এইভাবে পরিচা স্তরে ধাক্কা খাইয়া গ্রাহক-যন্ত্রে কিরূপে পৌছায় তা



বেতার তরঙ্গের গতিধারা

বেতার ঢেউ পৌছায় কিরূপে? এই প্রশ্নের উত্তরে বৈজ্ঞানিকেরা কল্পনা করেন যে, যদি পৃথিবী-পৃষ্ঠ হইতে ৫০।৬০ মাইল উর্দ্ধে উঠা যায় তবে দেখা যাইবে যে সেখানকার বিরল বায়ুমণ্ডল বিদ্যুৎ-পরিচালক। আমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ সাধারণ বায়ুরাশি বিদ্যুতের অপরিচালক। সূর্য্য-কিরণের বেগুণিয়ার পরের অদৃশ্য (ultra-violet) রশ্মিগুলি উচ্চস্তরের বায়ুমণ্ডলের উপর পড়িয়া সেখানকার অণুপরমাণুগুলিকে বিদ্যুৎ-কণা ও বিদ্যুৎ-সঞ্চারিত পরমাণুতে বিভক্ত করিয়া ফেলে। তাহার ফলে ঐ উচ্চস্তরের বায়ুমণ্ডল অতিমাত্র বিদ্যুৎ-পরিচালক না হইয়া পারে না। এখন বিদ্যুৎ-পরিচালক বস্তুর একটা ধর্ম্ম এই যে, তাহা বিদ্যুৎ-তরঙ্গ প্রতিফলিত করিতে পারে—কতকটা দর্পণের আলোক-তরঙ্গ প্রতিফলিত করার মত। পৃথিবী ঠিক যেন ৫০।৬০ মাইল উপরে একটা বিদ্যুৎ-তরঙ্গ-প্রতিফলক আস্তরণে ঢাকা রহিয়াছে। ইহার ফলে প্রেরক-যন্ত্র হইতে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ পৃথিবী-পৃষ্ঠ ছাড়াইয়া বেশী দূর যাইতে

একটা চিত্র দেওয়া গেল। হেভিসাইড (Heavisid নামে একজন বৈজ্ঞানিক এই বিষয়ের প্রথম কল্পনা কর বলিয়া এই প্রতিফলক স্তরকে অনেক সময় হেভিসা স্তর (Heaviside Layer) বলা হয়। নাতি- মণ্ডলে অবস্থিত ভারতবর্ষের মত দেশে এই প্রতিফলক- কত উচ্চে অবস্থিত তাহা মাপিবার চেষ্টা আমা বিজ্ঞান-কলেজে হইতেছে। হেভিসাইডের এই পরিকা অনুসারে প্রেরক-যন্ত্র হইতে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ কখনও পৃথি ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। বেতারবিদ্গণ মাঝে অ করিয়াছিলেন যে চেষ্টা করিলে বেতার-সাহায্যে মঙ্গ গ্রহের সঙ্গে সংবাদ আদান-প্রদান হয় ত করা যাই পারে। কিন্তু এখন বুঝা যাইতেছে যে প্রেরক-যন্ত্র শক্তিশালীই হউক না কেন, তাহার ঢেউ পৃথি বাহিরে পাঠান সম্ভবপর নহে, প্রতিফলক-স্ত ধাক্কার পর ধাক্কা খাইয়া তাহা পৃথিবীর পৃষ্ঠের উপরে ঘুরিতে থাকিবে।

ক্রমশঃ-প্রকাশ্য উপন্যাস

সতী

শ্রী নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

১

কৃষ্ণদাস চৌধুরী যখন মারা যান তখন তাঁর বড় ছেলে ভূপতির বয়স ত্রিশ বৎসর। চৌধুরী মহাশয় সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন; তাঁর বিষয়ের আয় ছিল দশ বারো হাজার টাকা; তা ছাড়া কিছু কোম্পানীর কাগজ ও ক্ষেত-খামারও ছিল। তাঁর সন্তান হইয়াছিল অনেকগুলি, তন্মধ্যে মৃত্যু-কালে ছিল মাত্র দুই পুত্র ভূপতি আর জ্যোতি, দুইটি বিবাহিতা কন্যা সুশীলা ও সরলা, আর একটি ছোট মেয়ে বয়স আট বছর, নাম তরলা। সাত বছর আগে তাঁর স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছিল, তখন হইতেই ভূপতির স্ত্রী সুরমা তাকে মানুষ করিয়াছে; সে প্রায় সুরমার মেয়েরই মত।

ভূপতির চেয়ে সুরমা ছিল আট বছরের ছোট। সুরমার অনেকদিন ছেলে পিলে হয় নাই, তাই সে তরলাকে ঠিক মেয়ের মত করিয়াই মানুষ করিয়াছিল। বিশ বছর বয়সে তার প্রথম ছেলে হয়; সে ছেলে তার শ্বশুরের মৃত্যুর পরই মারা গেল।

পিতা ও পুত্রের এক সঙ্গে মৃত্যু হওয়ায় ভূপতির মন বড় অস্থির হইয়া উঠিল। সুরমাও যন্ত্রণায় ছট্‌ ফট্‌ করিতে লাগিল। সে ছিল শ্বশুরের বড় আদরের বউ আর শ্বশুরকে সে ভালবাসিত ঠিক বাপের মত। এমন শ্বশুর গেলেন, তারপর ছেলেটি গেল; সমস্ত বাড়ীখানা যেন তাকে হাঁ করিয়া গিলিতে আসিল। তারা কিছুতেই দেশে থাকিতে পারিল না।

জ্যোতি সুরমার চেয়ে দুই তিন বছরের ছোট। সে তখন কলিকাতায় এম-এ, পড়ে। ভূপতি ও সুরমা ঠিক করিল তা'রা কলিকাতায় গিয়া বাস করিবে। জ্যোতি ইহাতে খুব খুসী হইল। শ্যা.বাজারের কাছে একখানা. বাড়ী ঠিক হইল, ভূপতি সুরমাকে লইয়া কলিকাতায় আসিল।

ভূপতি অনেক দিন হইতেই স্থির করিয়াছিল যে, সে একটা চাকরী-বাকরী অথবা ব্যবসায় বাণিজ্য করিবে; তাদের যা সম্পত্তি তাতে দুই ভা'য়ে ঘরে বসিয়া খাইলে কেবল পেটভাতার বেশী কিছু হইবে না। চাকরীর চেষ্টা করিলে সে অনায়াসে পাইত, কেননা ভূপতি ভাল ছেলে, এম-এ, পরীক্ষায় বিশেষ সম্মানের সহিত পাশ হইয়াছিল, এবং কলেজের প্রিন্সিপ্যাল তাহাকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখি-তেন। কিন্তু কৃষ্ণদাস বাবু কিছুতেই তাহাতে সম্মত হন নাই। তিনি জমীদারী ভাল বুঝিতেন, ঘরে বসিয়া জমীদারী দেখিলে তাহা হইতে বেশ আয় করা যাইবে, বিদেশে পড়িয়া থাকিলে সম্পত্তি নষ্ট হইবে, এই আশঙ্কায় তিনি ভূপতির চাকরী লওয়ায় আপত্তি করিয়াছিলেন। তাঁর অভিপ্রায় ছিল ভূপতি বিষয় দেখুক, জ্যোতির ইচ্ছা হয় তো সে চাকরী অথবা ওকালতী করিতে পারে।

জ্যোতি ছিল ভূপতিরও চেয়ে ভাল ছেলে। সে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সব ক'টা পরীক্ষাতেই প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া গিয়াছে। এখন সে ইকনমিক্‌স্‌-এ এম-এ দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, সকলেই জানে সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিবেই। সুতরাং তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সবাই নিশ্চিন্ত হইয়া ছিলেন, এবং ভূপতিও এতদিন বাপের ইচ্ছা-মত গ্রামে বসিয়া জমীদারী করিতেছিল।

সতী

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

এখন ভূপতি কলিকাতায় আসিয়া চাকরীর সন্ধান করিতে সৌভাগ্যক্রমে খুব একটা ভাল চাকরী জুটিয়া গেল। চাকরীতে পঞ্চাশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ জামিন দিয়া তার বেতন হইল পাঁচ শত টাকা—তা ছাড়া ভবিষ্যতে উন্নতির যথেষ্ট আশা রহিল।

কলিকাতায় আসিবার পনেরো দিন পরেই ভূপতি চাকরীতে ভর্ত্তি হইল। সুরমা ক্রমশঃ তার দুঃখ ভুলিয়া মনের আনন্দে সংসার করিতে লাগিল। দেবতার মত স্বামী, লক্ষ্মণের মত দেবর, আর চাঁদের মত তার কন্যা-প্রতিম ননদিনী তরলা। তা ছাড়া টাকা পয়সা স্বচ্ছল। এ সংসার তার বড় সুখেরই হইল—শুধু তার কোলের নিধি নাই।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় ভূপতি আফিস হইতে ফিরিয়া হাত মুখ ধুইয়া খাইতে বসিয়াছে। সুরমা নিজ হাতে খাবার তৈয়ার করিয়া স্বামীকে দিয়া সামনে বসিয়া অতৃপ্ত নয়নে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া আছে। ভূপতি খাইতে খাইতে একবার চাহিয়া দেখিল পত্নীর-প্রেম বিহ্বল মুখ-খানি। হাসিয়া বলিল, "কি দেখ্‌ছো? তোমার সাতরাজার ধন মাণিক?"

লজ্জিত হইয়া সুরমা বলিল, "না গো না, অত অহঙ্কারে কাজ নেই, আমি তোমাকে দেখ্‌ছিনে।"

"তবে কি দেখ্‌ছো, আর ভাব্‌ছোই বা কি?"

"দেখ্‌ছি তোমার পাতের ওই পেঁপেটা, আর ভাব্‌ছি কি দেশ এই ক'লকাতা সহর! ওই পেঁপেটার দাম চার আনা! বাবারে, কোনও জিনিষ যদি ছোঁবার জো আছে। মাটি, তাও পয়সা দিয়ে কিন্‌তে হয়। এ দেশে লোকে বাস করে!"

"কিন্তু এ দেশে বাস না ক'রলে মাসে পাঁচ্‌শো টাকা মাইনে আসে না।"

"তা মানি, তবু তোমার এ পাঁচ্‌শো টাকা নিয়েও তো বাপু খরচ কুলিয়ে উঠ্‌তে পারিনে।"

"কই, না-কুলোবার তো কোনও গতিক দেখছি নে। এই তো সেদিন খেঁদির বিয়েতে পাঁচশো টাকার নেকলেস পাঠালে। আর বাড়ীতে তো সদাব্রত লেগেই র'য়েছে, ভিকিরি কখন এলে ফেরে না।"

"আহা, কি-যে বল তার ঠিক নেই। তোমার বোনের মেয়ের বে, তাতে পাঁচশো টাকার নেকলেস্ দেওয়া কি একটা বেশী হ'ল! আর গরীব ভিকিরি; তাদের যদি আমরা না দিই তো তারা খাবে কি? ভগবান যে তাদের অন্ন আমাদের ঘরেই দিয়েছেন!"

হাসিয়া ভূপতি বলিল, "তোমার ভগবান তো বড় বোকা সুরমা। তাঁর যদি ওই ভিকিরিদের দেবারই মতলব হ'বে তবে তিনি সোজাসুজি তাদের ঘরে না পাঠিয়ে এমন হাত ঘুরিয়ে টাকা দেন কেন বল দেখি? আমরা ত না-ও দিতে পারি।"

"সে কি হ'বার জো' আছে! আমরা যদি না দিই তা হ'লে দেখবে ভগবান আর আমাদের-ও দেবেন না, তা'ছাড়া এমন একটা কিছু ক'রবেন যাতে যা' আমরা পেয়েছি তাও বেরিয়ে যাবে।"

"হ'ল না-হয় তাই, তবু এতটা ঘোর-পেঁচ না ক'রে সোজাসুজি গরীবের ঘরে টাকাটা দিলেই তো বেশ হ'ত; আমাদের এ হাঙ্গামাটাও বেঁচে যেত।"

"কিন্তু আমাদের পরীক্ষাটা তো হ'ত না। এ কেমন চমৎকার কৌশল বল দেখি; টাকা যা'কে তাঁর দেবার সে ঠিক পাচ্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও পরীক্ষা হ'য়ে যাচ্ছে।"

ভূপতি মুখ মুছিয়া উঠিয়া বলিল, "হার মানলাম তোমার কাছে সুরমা। তুমি যে-সব কথা বল্‌ছো এর একটাও যুক্তিতে টিঁক্‌বে না; জিজ্ঞেস করে দেখো জ্যোতিকে, তাদের অর্থশাস্ত্র এ-সব যুক্তি একেবারে মানে না। কিন্তু তবু সব যুক্তি হার মানে তোমার ওই উদার অন্তরের কাছে।" তারপর সুরমার অত্যন্ত কাছে আসিয়া কস্ করিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিল।

চকিতা হরিণীর মত সুরমা উঠিয়া চমকিত দৃষ্টিতে চারিদিক চাহিয়া দেখিল। তারপর আনন্দে বিগলিত-কণ্ঠে লজ্জারক্ত-মুখে স্বামীর মুখের পানে মনোরম কটাক্ষ হানিয়া বলিল, "ছি, তুমি কি-যে কর তার ঠিক নেই! এখনি যদি কেউ এসে প'ড়তো?"

ভূপতি হাসিয়া বলিল, "তা হ'লে বেশ হ'ত। সেই লজ্জায় তোমার মুখখানির যা শোভা হ'ত প্রাণ ভ'রে তাই দেখে নিতাম।"

সুরমা বলিল, "যাও !"

ভূপতি বলিল, "আচ্ছা যাই।" বলিয়া বাহিরের দিকে অগ্রসর হইল।

সুরমা খপ্ করিয়া তার হাত ধরিয়া বলিল, "যাচ্ছ যে বড়; সারাদিন দেখা নেই, সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফিরেই—যাই !"

"বাঃ, তুমি যে যেতে বল্লে।"

"আমার খুসী আমি ব'লেছি—এখন আমার খুসী আমি যেতে দেব না।"

"বেশ তবে যাব না," বলিয়া হাসিতে হাসিতে ভূপতি একখানা ইজি-চেয়ারে বসিয়া পড়িল। সুরমা পানের বাটা আনিয়া চেয়ারের হাতলের উপর রাখিয়া নিজে তার পাশে মেঝের বসিয়া পড়িল।

কথায় কথায় সুরমা বলিল, "তুমি কি ভেবেছ মনে, ঠাকুরপো'র বিয়ে দেবে না ?"

"কেন ? সে কি অরক্ষণীয় হ'য়ে উঠেছে না কি ?"

"অরক্ষণীয় বই আর কি ? বিশ বছর বয়েস হ'ল ছেলের, এ-এ দেবে এবার, এখনও বিয়ে ক'রবে না ! দেখ, ছেলেদের বেশী দিন বিয়ে না ক'রে থাক্তে নেই।"

"আচ্ছা মান্লাম নেই; কিন্তু আমি তার কি ক'রবো বল !"

"শোন কথা ! বাবা নেই, এখন তুমিই সংসারের কর্ত্তা। তুমি না ক'রলে কে ক'রবে ? মেয়ে-টেয়ে ত একটু খোঁজ ক'রতে হয়।"

"না, এ দুর্ভাগা দেশে মেয়ের খোঁজ ক'রতে হয় না সুরমা, বরং মেয়ের বাপেদের খোঁজের জ্বালায় আমি অস্থির হ'য়ে উঠেছি। তুমি যদি ক'রে-কম্মে জ্যোতির বিয়ে দিয়ে আমাকে এ যন্ত্রণা হ'তে উদ্ধার কর তা হ'লে তোমাকে একটা মোতির মালা বকশিশ করতে আমি রাজী আছি।"

"তা বেশ তো এর আর কি ? তুমি মেয়ে দেখ না; মেয়ে দেখে বিয়ের ঠিক কর।"

"কি রকম ! কথাটা ঠিক বুঝে উঠ্তে পারছি না। বলি, বিয়ে ক'রবে কে ? আমি ? তা বল ত রাজী আছি।"

"ইস্, বড় সখ যে !"

"কেন কথাটা অন্যায় ব'লেছি। দুটো বিয়ে কি কেউ কখনো করে না ?"

"যাদের পোড়া-মুখ তারা করে। তোমার আর ক'রতে হয় না !"

"এ কথাটা কি তোমার পক্ষে সঙ্গত হ'ল সুরো ? আমার যদি বিয়ে ক'রতে ইচ্ছেই হয় তা হ'লে তোমার বরঞ্চ উচিত জোগাড় ক'রে বিয়ে দিয়ে দেওয়া।"

"আমার উচিত নুড়ো জেলে তাদের মুখে দেওয়া যারা তোমার হাতে মেয়ে দিতে চায়।"

"এ তো ঠিক সতীর মত কথা হ'ল না সুরো। জান তো লক্ষহীরার কথা—সতী স্ত্রী কুঠে স্বামীকে ঘাড়ে ব'য়ে কোথায় দিয়ে এসেছিল !"

"মুখে আগুন সে সতীর ! আমি তেমন সতী নই। স্বামী অধর্ম্ম ক'রবে আর আমি দাঁড়িয়ে দেখ্‌বো—এটা সতী-ধর্ম্ম নয়। সতী বলি তাকে, যে স্বামীকে কিছুতে অধর্ম্মে পড়্তে দেবে না; পড়লে টেনে তুল্‌বে।"

"এটা কোনো শাস্ত্রে লেখে না।"

"সব শাস্ত্রে লেখে, শাস্ত্র পড়তে জানলে হয়। চুলোয় যাক্ এ-সব কথা। শোন, তুমি মেয়ে দেখতে বেরোও।"

"ভাল রে ভাল, বিয়ে করবে কে যে আমি মেয়ে দেখবো ! যে বিয়ে ক'রতে চায় তাকে তুমি দেবে না বিয়ে ক'রতে; আর যার বিয়ের গরজ মোটেই নেই তার জন্যে মেয়ে দেখে বেড়াব আমি !"

"গরজ নেই বল্লেই হ'ল আর কি ? ছেলেমানুষের অমন কথা ঢের শুনেছি। লজ্জায় মুখ ফুটে বলে না তাই, নইলে ঠাকুরপোর বে'র খুব ইচ্ছে আছে।"

"মুখ ফুটে বলে না কি রকম ? আজ সকালে হরিশ রায় যখন এসে মেয়ে দেখবার জন্য আমাকে ঝুলো-ঝুলি ক'রছিল তখন জ্যোতিকে জিজ্ঞেস ক'রতে সে দিব্যি মুখ ফুটে সাফ জবাব দিয়ে দিলে, দুবছরের মধ্যে সে বিয়ের কোনো প্রসঙ্গেই থাকবে না।"

অবাক হইয়া সুরমা বলিল, "ও মা তাই না-কি ! তবে যে আমার সঙ্গে দিন রাত মস্করা করে সে-সব বুঝি ভণ্ডামী !"



ভোরের আলো

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় অঙ্কিত

"বিচিত্রা," আষাঢ়, ১৩৩৪

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

"তোমার কি মনে হয় ?"

"আচ্ছা র'সো, আজই আমি এর হেস্ত-নেস্ত করছি, আসুক আগে ঠাকুরপো।"

বলিতে বলিতেই জ্যোতি আসিয়া প্রবেশ করিল, কিন্তু তার মুখের ভাব দেখিয়াই সুরমার রক্ত শুকাইয়া গেল। ঘরে ঢুকিয়াই জ্যোতি বলিল, "বউ-দি, তরু কই ?"

সুরমা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "কেন ? সে ওই কচিদের বাড়ী গেছে খেল্‌তে।"

কচি ইহাদের প্রতিবেশীর কন্যা; তার সঙ্গে তরলা ইতিমধ্যেই বেশ ভাব জমাইয়া লইয়াছে। কচিদের বাড়ী ভূপতির বাড়ীর দুই-তিন বাড়ী অন্তরে, একটা মোড় ঘুরিয়াই।

শুষ্ক মুখে জ্যোতি বলিল, "সে সেখানে নেই; তারা বল্লে সে বাড়ী গেছে।"

"ওমা, কি বলছো ঠাকুর পো! তবে কোথায় গেল সে ?" সুরমার দুই চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।

ভূপতি ভীত হইয়া বলিল, "অ্যাঁ! কার সঙ্গে গেছে সে ?"

ব্যগ্রস্বরে সুরমা বলিল, "রামধনি গিয়ে তাকে রেখে এসেছে। ও-গো যাও, শীঘ্র তোমরা যাও, দেখগে রাস্তায় কোথায় গেল সে!"

ভূপতি ও জ্যোতি দুইজনেই তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া পড়িল। পাড়ায় যে-সব বাড়ীতে তরলা যাইত সে-সব বাড়ী সন্ধান করিয়া যখন তাহাকে পাওয়া গেল না তখন ভূপতি একখানা ট্যাক্সি লইয়া থানায় চলিয়া গেল। জ্যোতি ও চাকরেরা পাগলের মত কেবল রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সুরমা আছড়াইয়া পড়িয়া কান্না আরম্ভ করিল।

কিন্তু দিনের পর দিন অক্লান্তভাবে নানা স্থানে অনুসন্ধান করিয়াও কোনো সন্ধান মিলিল না। সুরমার সুখের সংসারে আবার ছাই পড়িল। দুঃখ-শোকে সে অধীর হইয়া উঠিল;—বাড়ীটা শ্মশানের মত খাঁ-খাঁ করিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

ধার

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

জানি না কোন্ মহাত্মা কোন্ 'আদিম বসন্ত-প্রাতে' চিন্তা-সমুদ্র মন্থন ক'রে এই অপূর্ব্ব সুধা তুলেছিলেন। আগুন ও অক্ষরের আবিষ্কর্ত্তাদের মত তাঁর নামও সভ্যতা-প্রাসাদের ভিত্তি-প্রস্তরে খোদাই হ'য়ে থাকা উচিত।

'দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য বা যথোপযুক্ত মূল্য' এই সনাতন বর্ব্বর প্রথার শাসনে মানুষের জীবন যখন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলো, তখন তিনিই সেই দাবদগ্ধ মরুভূমিতে প্রথম শান্তির বারি প্রক্ষেপ করলেন; মানুষের জীবন স্নিগ্ধ শ্যামল হয়ে উঠ্‌লো—মানুষ হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌লো।

অবশ্য নগদ মূল্যের বিভীষিকা এখনো পৃথিবী হতে একেবারে অন্তর্হিত হয়নি। এখনো আপণ-বিপণীতে 'ধারে কারবার নাই' 'হাতে হাতে দাম চাই' প্রভৃতি নিষ্ঠুর মর্ম্মের বাক্যবিন্যাস দেখ্‌তে পাওয়া যায়। হিংস্র শ্বাপদের বিকট দংষ্ট্রাবলির ন্যায় ঐ সকল বিধি-জ্ঞাপক অক্ষরগুলি নিরীহ পাদচারী পথিকেরও দর্শনমুগ্ধ নেত্রদুটীকে কি এক অজানা ব্যথায় ব্যথিত করে তোলে,—কি এক অজানা ত্রাসে তার স্ফুটনোন্মুখ অন্তরাত্মা শিউরে বুজে যায়। মানব-হৃদয়ের প্রতি এ কি অযাচিত অপ্রত্যাশিত অত্যাচার! তবে আশা আছে এ অত্যাচার বেশী দিন টিক্‌বে না—জগৎ একদিন শুধু ধারেই চল্‌বে।

ধার! এমন গাল-ভরা মধুর নাম, এমন কান-জুড়ানো, প্রাণ-কেড়ে-নেওয়া কথা কে আমদানি করলে? এ নাম নীরক্ত দরিদ্রের একমাত্র 'টনিক্', একমাত্র 'ষ্টিমুলেণ্ট্'। এ নাম জপ্‌তে জপ্‌তে কত কাপ্তেন পোষ্য-পুত্রের উড্ডীয়মান দেহ আবেশে অবশ হয়ে এলিয়ে পড়ে, কত বনেদী সদাগরের সুপ্রতিষ্ঠিত গণেশও দেখ্‌তে দেখ্‌তে উল্টে যায়। ধারার্ণব-তন্ত্রে লেখা আছে যে, এ নাম লক্ষ বার জপ করলে মানুষ ধারসিদ্ধ হয়— অর্থাৎ ধারের অবিশ্রান্ত উষ্ণ ধারাপাতেও আর গায়ে ফোস্কা পড়ে না।

ধার! ধারের প্রভাবেই জগতের কর্ম্মস্রোত জরাক্রান্ত রোগীর নাড়ীর মত পূর্ণ দ্রুততালে চ'লেচে। ধার তুলে দাও, দেখ্‌বে এক নিমেষেই সংসার-কলের বিজ্‌নেস্-চাকা দমফুরানো লাট্টুর মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়েচে।

ধার! কে বল্‌বে যে আমি ধারের ধার ধারি না বা ধারের ধার দিয়ে যাই না? এ ধারে না কাটে এমন দুঃসময় অভাব্য, এ ধারে না সিঞ্চিত হয় এমন কৃতকার্য্যতা দুর্লভ। ধার নেই কার? রাজা প্রজার কাছে দু'হাত পেতে ধার নিচ্চে। য়ুরোপ ইহুদীদের ধারেই মানুষ, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি শেঠেদের ধার দিয়েই গড়া। ধার করে না কে? সমুদ্র মেঘের কাছ থেকে জল ধার করে, চন্দ্র সূর্য্যের কাছ থেকে আলো ধার করেন, বোধ হয় উপযুক্ত 'পার্টি' পেলে ভগবানও কিছু বুদ্ধি ধার করেন। ধার নেয় না কে? আমার চাকর কাবলী-আলার কাছে ধার নিয়েচে, আমি মাড়োয়ারীর গদীতে হুণ্ডী কেটেছি, আমার সাহেব ব্যাঙ্কে আর 'লোন্-আপিসে' 'ক্রেডিট' বাঁধা দিয়েচেন।

ক্রেডিট্! কি সুন্দর এই অশরীরি বস্তু! এ-কে চোখে দেখা যায় না, হাতে ধরা যায় না, অথচ কর্ম্ম-ফলের মত এ সঙ্গে সঙ্গেই আছে। যার ক্রেডিট্ নেই তার বেঁচে থাকাই ভুল।

'ক্রেডিট্' কি? ধারের উল্টো পিঠ। দার্শনিক ভাষায় 'ক্রেডিট্' হচ্চে ধারের সম্ভাবনা, আর ধার হচ্চে সম্ভূত 'ক্রেডিট্'। বিজ্ঞানের ভাষায় 'ক্রেডিট্' হচ্চে 'লেটেণ্ট্' ধার, আর ধার হচ্চে 'কাইনেটিক্ ক্রেডিট্'। আর শাদা লোকের শাদা কথায় 'ক্রেডিট্' হচ্চে সোনা আর ধার হচ্চে কষ্টিপাথর; অর্থাৎ 'ক্রেডিটে'র দর কম্‌চে কি বাড়্‌চে তা ধার করতে গেলেই বোঝা যায়।

'ক্রেডিটে'র জোয়ার ভাঁটা আছে। কিন্তু সম্পন্নতা ভিন্ন যে 'ক্রেডিটে'র নদীতে জোয়ার ডাকে না তা নয়। যিনি করিভুক্ত কপিত্থবৎ ফোঁপরা তিনিও অনেক সময়ে

ধার

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

আত্মগুপ্তির বলে 'ক্রেডিট্' বজায় রাখতে পারেন। অবশ্য 'ক্রেডিটে'র হওয়া উচিত আর্থিক অবস্থার 'মিটার', কিন্তু সব সময়ে তা হয় না। কখনো বা 'ক্রেডিট্' যায় আর্থিক অবস্থাকে ছাপিয়ে, কখনো বা আর্থিক অবস্থা যায় 'ক্রেডিট'কে লাফিয়ে। সময়ের 'মিটার' হিসাবে অনেক ঘড়িরও এই সুলক্ষণ আছে।

এইটেই কিন্তু সভ্য-জীবনের 'রোমান্স্'। যা অনিশ্চিত, যাকে এঁচে নেওয়া যায় না, যার কারো সঙ্গে একটা নির্দ্দিষ্ট অনুপাত নেই,—এক কথায় যাকে 'লজিক্যাল' ত্রৈরাশিকের বাঁধা ছাঁচের মধ্যে ফেলা যায় না,—তার মধ্যেই মানুষের যা কিছু আনন্দ, যা কিছু কৃতিত্ব, যা কিছু স্বাধীনতা। ধার যেমন 'ক্রেডিটে'র উপর নির্ভর করে, 'ক্রেডিট'ও যদি তেম্নি আর্থিক অবস্থার উপর নির্ভর করতো তা'হলে ধার হয়ে যেত একটা রহস্য-শূন্য, 'পেথস্'-শূন্য প্রহসন-শূন্য নির্জ্জীব পদার্থ। তা'হলে আঙুল কামড়ানো, দাড়ী ওপড়ানো প্রভৃতি অনেক সামাজিক অভিনয় মাঠে মারা যেতো।

ধারের সঙ্গে 'ক্রেডিটের' সম্পর্কটা বড়ই কৌতুকাবহ। 'ক্রেডিট্' বাড়লে ধার বাড়ে কিন্তু ধার বাড়লে ক্রেডিট্ কমে। এ যেন ঠিক সেই ধরণের কথা—'বুদ্ধি বাড়লে বিদ্যা বাড়ে কিন্তু বিদ্যা বাড়লে বুদ্ধি কমে'।

যাই হোক্, 'ক্রেডিট্' বাড়লে যখন ধার বাড়ে তখন 'ক্রেডিট্' বাড়াবার চেষ্টা সকলের পক্ষেই কর্ত্তব্য। 'ক্রেডিট্' হাল্কা হয়ে আস্চে বুঝলেই হাবভাব, চালচলন ও কথাবার্ত্তায় যারপর নাই সতর্ক হওয়া উচিত—কারণ 'ক্রেডিটের' প্রতিশব্দ যদি বাজার-বিশ্বাস হয়, তাহলে সমস্ত বাজারে জিনিষের যে দস্তুর 'ক্রেডিটেরও' ঠিক তাই। রদ্দি-পচা, মরচে-ধরা 'ক্রেডিট্কে'ও ঘষে-মেজে সর্ব্বদা চক্চকে করে রাখ্তে হবে—কেউ না কেউ ভুল্বেই। যার বুদ্ধি আছে, বাক্য আছে, 'টাইটেল' আছে, পরিচ্ছদ আছে, পরিচয় দেবার মত আত্মীয় আছে, তার 'ক্রেডিট্' মারা কি সহজ কথা?

'ক্রেডিট্' যখন বড়ই দুর্ব্বল হয়ে পড়ে, অর্থাৎ যখন ধার আর শুধু 'ক্রেডিটে'র কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে না, তখন চিঠা, নোট্, বণ্ডের মত চাড়ার সাহায্য দরকার হয়। চাড়ার মধ্যে সব চেয়ে মোটা ও সব চেয়ে ভয়ঙ্কর হচ্চে বন্ধক। যখন বন্ধকের জোরেও ধারকে তুলে ধরে রাখা কষ্টকর হয়, তখনই বুঝবে 'ক্রেডিটে'র নাভি-শ্বাস উপস্থিত।

কিন্তু সুস্থ সবল 'ক্রেডিটে'র কি অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তি! ঐ যে মোটর-গাড়ী কাঁপানো-চীৎকারে শাসাতে শাসাতে চোখে মুখে ধূলো উড়িয়ে দিয়ে গেল, নিরীহ হণ্টনকারী চাপা পড়্তে পড়্তে কোনক্রমে বেঁচে গেল, খোঁজ নিয়ে দেখ ও হয় ত 'ক্রেডিটে'। ঐ যে সহরের ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে ও-বাড়ীতে আলো বাজ্নার ধূম লেগে গেছে, নিরন্নদের খিদা লালায়িত করে টেবিলের উপর ভোজ্য-পানীয়ের স্রোত বয়ে যাচ্চে, খোঁজ নিয়ে দেখ, ও-ও হয়ত 'ক্রেডিটে'।

তোমার ক্রেডিট্ আছে? কেন তুমি শীতে হি হি করে কাঁপ্চো? না-ই থাক্ তোমার রেস্ত, শালের দোকানে চল। পছন্দমত একখানা টেনে নাও, চাকরকে দিয়ে ভাড়া গাড়ীতে তুলে দাও, তারপর পা-দানীতে পা ঠেকিয়ে একটু হেসে ফিরে বল, 'হিসাবে লিখে রাখ্বেন।' তোমার ঘরে চাল নেই? 'ক্রেডিট্' খাটিয়ে নাও। চল, চালের আড়তে চল। যা সব-চেয়ে সরেস তাকেও মোটা বলে নিন্দা ক'রে বিরক্তির সুরে বল, 'দিয়ো মন-দশেক পাঠিয়ে, চাকর-বাকরে খাবে'। ব্যস, আর কথা নয়—পকেট থেকে ঘড়ি টেনে বের করে লাফিয়ে উঠে বল্বে, 'ওঃ! বড্ড দেরী হয়ে গেল—এখনই কাউন্সিলে (কি লাটদরবারে) যেতে হবে'। খুব সম্ভব তুমি এদিক-ওদিক একটু পাইচারী করে বাড়ী ফিরে গিয়ে দেখ্বে, তোমার আগেই চাল এসে হাজির। ব্যস, চুকে গেল তোমার তিন মাসের ভাবনা। তারপর মাসের শেষে যদি বিল আসেও, তার পিঠে চড়চড় করে তেজ-কলমে লিখে দিয়ো, 'সামান্যের জন্য এত তাগিদ কেন? এমন করলে কিন্তু খদ্দের থাকৃতে পারবো না।' এম্নি করে তুমি এক মাসের জায়গায় ছ'মাস, ছ'মাসের জায়গায় এক বছর হেসে খেলে কাটিয়ে দিতে পারবে। তারপর নেহাৎ পেড়াপীড়ি করে, নালিস করতে দাও;—ওজর আছে, আপত্তি আছে, উকিল আছে;—আর তাতেও না কুলোয়

'ইন্‌সলভেন্সি' ত কেউ নেবে না। কিন্তু সাবধান, 'ক্রেডিটে'র চরমসীমা না দেখে, ধারের উচ্চতম শৃঙ্গে না উঠে, কখনো 'ইন্‌সলভেন্সি' নিও না। যদি নিজের নামে ধার নিতে অসুবিধা হয়, বেনামি করে নিয়ো,—হয়, সেবাব্রত সমিতির সেক্রেটারী হয়ে, না হয় লিমিটেড্ কোম্পানীর ম্যানেজার হ'য়ে।

অবশ্য 'ক্রেডিট্' বাঁচিয়ে রাখ্‌তে হলে দশটা ধারের মধ্যে দুটো ধারও পরিশোধ করতে হবে, অন্তত আংশিক ভাবে। তা' তার জন্ত ভাবনা কেন? ধার দিয়ে ধার পরিশোধ কর। রামের পাওনা যদুকে দিয়ে শোধ করাও। যদুর বেলায় কি করবে? হরির তবিল ধরে টেনো। এমনি করে দরকার হয় ফের রামের কাছে যেয়ো—সে সন্তুষ্টচিত্তেই দেবে—কেননা কাকেও ত তুমি ফাঁকি দিচ্চ না।

তবে ধারের একটা মস্ত দোষ এই যে তা সুদে বাড়ে। রামের কাছে দশ টাকা ধার করে যদুর কাছে পঞ্চাশ টাকা ধার করতে হয়। যার ক্রেডিটের সীমা পাঁচশো টাকা মাত্র সে তিন চার কিস্তির বেশী ধার করতে পারবে কেন? তা ছাড়া জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য নতুন ধারও ত আছে; সব গুলোই যদি বেড়ে চলে, তা সে চক্র-বৃদ্ধির হিসাবেই হোক্ আর জোয়াল-বৃদ্ধির হিসাবেই হোক্, তাহ'লে উপায়? উপায়—প্রথমত কুসীদগ্রহণ সম্বন্ধে আইন, দ্বিতীয়ত তামাদী, তৃতীয়ত অস্বীকার ও তদুপযুক্ত দলিল, চতুর্থত মানহানির নালিশ এবং পঞ্চমত অজ্ঞাতবাস বা 'ইনসল্‌ভেন্সি'।

ধার বহুরূপী। 'ওঠ্‌না', 'জাকড়', 'দাদন' এ সবই ধারের মূর্ত্তিভেদ। "একোঽহং বহুস্যামঃ" এই মহদ্বাক্য ব্রহ্ম সম্বন্ধেও যেমন খাটে ধার সম্বন্ধেও তেম্‌নি। চার্লস্ ল্যাম্বের মতে মনুষ্যজাতির বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগের একমাত্র মূলই হ'চ্ছে ধার; অর্থাৎ মানুষ মূলতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—এক যারা ধার নেয়, আর যারা ধার দেয়। এ ছাড়া অন্য যে শ্রেণী-বিভাগই কর না, তাই কৃত্রিম;—তা-সে রং ধরেই হোক্, চেহারা ধরেই হোক্, ভাষা ধরেই হোক্ আর ধর্ম্ম ধরেই হোক্। অবশ্য এতে একই মানুষ দুই শ্রেণীতে পড়্‌তে পারে কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। একই মানুষ মনিবও হতে পারে, চাকরও হতে পারে, কিন্তু যখন সে মনিব তখন সে চাকর নয়, যখন সে চাকর তখন সে মনিব নয়।

উত্তমর্ণ ও অধমর্ণের মধ্যে কি ভাবের সম্পর্ক বিদ্যমান তা নিয়ে কিঞ্চিৎ মতদ্বৈধ আছে। তুলনার চক্ষে কারো মতে উত্তমর্ণ গর্দ্দভ, অধমর্ণ শৃগাল—কারো মতে উত্তমর্ণ ব্যাঘ্র, অধমর্ণ মেষ। কিন্তু আমার বিশ্বাস এই দুই মতের মধ্যে কোন আত্যন্তিক বিরোধ নেই;—এদের সমন্বয় করা যেতে পারে। ধারের স্তরে উত্তমর্ণ গর্দ্দভ, দেনার স্তরে ব্যাঘ্র,—ধারের স্তরে অধমর্ণ শৃগাল, দেনার স্তরে মেষ।

ধার ও দেনার মধ্যে প্রভেদ কি? যথেষ্ট। ধার বল্লেই মনে পড়ে সেই ছবি যাতে একজন প্রশান্ত মুখে টাকা গুনে দিচ্ছে, আর একজন চঞ্চল হস্তে তাই আত্মসাৎ করচে। কিন্তু দেনা বল্লে মনে পড়ে সেই ছবি যাতে একজন লাঠি হাতে করে দরজায় ঘা দিচ্ছে, আর একজন লুকিয়ে থেকে বলে পাঠাচ্ছে—'বাড়ী নেই'।

ধারের মহিমা খুঁটিয়ে বলতে পারি এমন সাধ্য আমার নেই। যে-সব পূজ্যপাদ সাহসিকেরা সাঁতার না জেনেও কেবল ধারের ভেলায় বুক বাধিয়ে অবলীলাক্রমে সংসার-তরঙ্গ ভেদ করে যাচ্চেন, তাঁরাই জানেন ধারের কি মহিমা। তাঁদের কাছে শিক্ষানবিশী করাও ভাল। তাঁরা ধার নেবার পূর্ব্বে কখনো করুণ সুরে দুর্দ্দশা জানান্ না। তাঁদের মুখে তখন এই সব মহৎ বাণীই ধ্বনিত হয়,—'পরস্পরের সাহায্যেই সমাজ,' 'বন্ধু-পরীক্ষার জন্যই ঋণের সৃষ্টি' 'সাময়িক অর্থাভাব কার না ঘটে?' কিন্তু ধার নেবার পরই তাঁদের সুর একেবারে বদ্‌লে যায়। তখন সেই সব উত্তমর্ণদের কাছেই তাঁরা গাইতে থাকেন,—'কুসীদবৃত্তির মত জঘন্য বৃত্তি আর নেই' 'প্রত্যাশাহীন দানই দান,' 'অর্থের চেয়ে কৃতজ্ঞতার মূল্য বেশী।' ধারের মাহাত্ম্য চার্ব্বাক কিছু-কিছু বুঝেছিলেন। তাই তিনি ঋণ করেও ঘৃত খাবার সুপরামর্শ দিয়েচেন। আর বুঝেছিলেন বিষ্ণুশর্ম্মা। তাই তিনি স্পষ্টাক্ষরেই লিখে গেছেন,—'বন্ধু হে, সে দেশে কখনো বাস ক'রোনা যে দেশে বৈদ্য নেই, শ্রোত্রিয় নেই, সজলা নদী নেই;—কিন্তু যে দেশে ও-সবই আছে সে দেশেও কখনো বাস ক'রোনা যদি না সে দেশে ঋণদাতা কেউ থাকে।'

ক্রমশঃ-প্রকাশ্য উপন্যাস



১

প্রত্যূষে চা-পানের পর কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার দ্বিজনাথ মিত্র জশিডির একটী সুবৃহৎ অট্টালিকার দক্ষিণ বারাণ্ডায় বসিয়া সদ্য-লব্ধ সংবাদ-পত্রে সবেমাত্র মনোনিবেশ করিয়াছেন এমন সময়ে একটী বাঙ্গালী যুবক তথায় উপস্থিত হইয়া অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনিই কি মিষ্টার ডি, এন, মিটার্?"

নাসিকা হইতে চশমা খুলিয়া যুবকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দ্বিজনাথ বলিলেন, "হ্যাঁ, আমারই নাম দ্বিজনাথ মিত্র। বসুন।"

আগন্তুক দ্বিজনাথের ইজি-চেয়ারের হাতলের উপর একখানা কার্ড এবং ক্ষুদ্র পুস্তিকা আকারে ছাপা একখণ্ড প্রশংসা-পরিচয়-লিপি রাখিয়া একখানা বেতের চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল।

ছয় মাসের জন্য গৃহখানি ভাড়া লইয়া দ্বিজনাথ মাসাধিক কাল হইতে জশিডিতে বাস করিতেছেন। সহধর্ম্মিণী বিমলা কিছুদিন হইতে একটা কোনো দুঃসাধ্য রোগে ভুগিতেছিলেন। রোগ যে কি, এবং তাহার উৎপত্তি যে কোথায়,—ফুসফুসের গভীর গহ্বরে, অথবা যকৃতের নিভৃত নিলয়ে, মস্তিষ্কের উৎকট উত্তেজনায়; অথবা দেহ-যন্ত্রের অপর কোনো বিপর্য্যয়ে—কলিকাতার চিকিৎসকেরা যখন কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না তখন স্থির হইল, এমন অবস্থায় একটা সাধারণ চিকিৎসা-ধারা অবলম্বন করিয়া দীর্ঘকালের জন্য কোনো স্বাস্থ্যকর স্থানে বায়ু পরিবর্ত্তন করাই কর্ত্তব্য।

এই মীমাংসার পর কোথায় যাওয়া হইবে তাহা লইয়া একটা প্রখর আলোচনা উপস্থিত হইল। ভারতবর্ষের ত্রিসীমার অন্তর্গত যতগুলি প্রসিদ্ধ স্বাস্থ্য-নিবাস আছে আলোচনা হইতে কোনটাই বাদ পড়িল না। কাশ্মীরের শ্রীনগর, নীলগিরির উটাকামণ্ড, হিমালয়ের মশৌরী, আসামের শিলং, ব্রহ্মদেশের বাসীন্, উড়িষ্যার পুরী; তৎপরে ওয়ালটেয়ার, এটাওয়া, আম্বালা, উদয়পুর হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিবাঙ্কুর, মহিসুর, নাগপুর, মাণিকপুর পর্য্যন্ত একে একে সবগুলিই আলোচিত হইয়া গেল। কেহ বলিল দেহের ভিতর যদি প্রচ্ছন্ন শ্লেষ্মার প্রকোপ থাকে রাজপুতানার মরুভূমির উষ্ণতা তাহা আরোগ্য করিবে; কেহ বলিল মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতাই যদি প্রকৃত কারণ হয়, হিমালয়ের শীতলতায় তাহা নিরাময় হইবে। স্নায়ু, মস্তিষ্ক, ফুসফুস্, পাকস্থলী এবং দেহের অপরাপর যন্ত্রের সহিত বিভিন্ন স্থানবিশেষের জলবায়ুর যে নির্ব্বিকল্প যোগ আছে তাহা লইয়া নিরতি-সূক্ষ্ম বিচার হইয়া গেল। সর্ব্বশেষে দ্বিজনাথ যখন রোগিণীর নিজ অভিপ্রায়ের কথা জানিতে চাহিলেন তখন নিঃসংশয়-নিরুদ্বেগ মুখে বিমলা বলিলেন, "জশিডি।"

প্রজ্বলিত অঙ্গারে জল পড়িলে যে অবস্থা হয় বিমলার কথা শুনিয়া আলোচনাকারিগণের মধ্যে সেই অবস্থা উপস্থিত হইল। জশিডি! কলিকাতা হইতে সাতঘণ্টার পথ, বৈদ্যনাথযাত্রিগণের গাড়ী বদলাইবার ক্ষুদ্র জংশন্ সেই বহু-পুরাতন জশিডি! হিমালয় নয়, দাক্ষিণাত্য নয়, কাশ্মীর নয়, বর্ম্মা নয়, এমন কি চুনার-মন্দার পর্য্যন্ত নয়—জশিডি!

সহাস্যমুখে দ্বিজনাথ বলিলেন, "জশিডিই তোমার ইচ্ছা হচ্ছে বিমলা? এত জায়গা ছেড়ে তুমি জশিডি কেন পছন্দ কর্‌ছ বল ত?"

বিমলা বলিলেন, "তোমার মনে নেই, একবার জশিডি গিয়ে আমার কি রকম উপকার হয়েছিল? আমার বিশ্বাস এবারো জশিডিতে আমার উপকার হবে।"

তখন দ্বিজনাথ আর সকলের কথা অগ্রাহ্য করিয়া বলিলেন, "ঠিক কথা। জশিডিতেই তোমার উপকার হবে।"

তাহার পর তিনি জনৈক কর্ম্মচারীকে জশিডিতে পাঠাইয়া আপাতত ছয় মাসের জন্য একটী সুরম্য গৃহ ভাড়া লইলেন এবং সত্বর জশিডি যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এমন সময়ে নূতন এক ফেকড়া উপস্থিত হইয়া নিরূপিত কার্য্য-সঙ্কল্পে পরিবর্ত্তন ঘটাইল। কিছুদিন হইতে বিমলার মাতা দুই পুত্র, পুত্রবধূ এবং পৌত্র-পৌত্রী লইয়া কোষ্ট-লাইন ষ্টীমারে কলিকাতা হইতে সিংহল বেড়াইতে যাইবার সঙ্কল্প করিতেছিলেন। সহসা এই সময়ে তাঁহাদের সিংহল যাত্রা স্থির হইয়া গেল।

দ্বিজনাথের শ্বশ্রূ দ্বিজনাথের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "দেখ বাবা, জশিডি ত তোমরা যাচ্ছ; কিন্তু এই হাতের কাছে জশিডিতে এমন কি চেঞ্জ হবে সত্যি-সত্যি আমিও তা বুঝতে পারছি নে। তার চেয়ে তোমরা তিনজনে যদি আমাদের সঙ্গে সীলোন্ চল তা হলে-যে বিশেষ উপকার হয় সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমার বিশ্বাস সমুদ্রের হাওয়াতেই বিমলার যা-কিছু রোগ সমস্ত সেরে যাবে।"

দ্বিজনাথ উৎফুল্ল হইয়া বলিল, "এ বেশ কথা মা! এ যোগাযোগ ভগবানের কৃপায় উপস্থিত হয়েছে। আপনি আপনার কন্যাকে আর কমলকে সঙ্গে নিয়ে যান, আমার কিন্তু যাওয়া হবে না। আপনি ত' জানেন সমুদ্রযাত্রা আমার ধাতে একেবারেই সয় না। ব্যারিষ্টারী পাশ করবার জন্য বাধ্য হয়ে একবার যেতে হয়েছিল, তারপর সখ করে একবার গিয়েছিলাম। দু-বারই যে ভীষণ নাকাল হয়েছি তাতে প্রতিজ্ঞা করেছি যে, সহজে আর সমুদ্রযাত্রা করছি নে।"

শ্বশ্রূ কহিলেন, "সবাই ত' বল্‌ছে এখন সমুদ্র তত কষ্টকর হবে না। তা ছাড়া তোমাকে একলা ছেড়ে যেতে বিমলা কি রাজী হবে? তোমারো ত' শরীর ভাল নয়; সেদিন কোর্টে বক্তৃতা কর্‌তে কর্‌তে মাথা ঘুরে গিয়েছিল।"

কথাটা যখন বিমলার কাছে উঠিল বিমলা একেবারেই আমল দিলেন না; বলিলেন, "সমুদ্রের হাওয়া কি এতই অদ্ভুত জিনিষ যে, সব দুঃখই তাতে উড়ে যাবে? দেহেরও —মনেরও?"

দ্বিজনাথ তাঁহার বয়সে প্রৌঢ়া কিন্তু নিরুদ্ধ-যৌবনা সুন্দরী পত্নীর নাসিকাগ্রে তর্জ্জনী দিয়া মৃদু আঘাত করিয়া কহিলেন, "মনের দুঃখ উড়ে না গেলে তত ক্ষতি হবে না, কারণ মনের দুঃখ অনেক সময়ে দেহে সারের কাজ করে। কাব্যে বিরহ যত নিন্দিত হয়েছে বাস্তব জীবনে তত নিন্দার যোগ্য নয়। এ কথা মুখ ফুটে বলতে মনে লাগে, কিন্তু কথাটা অপ্রিয় হলেও সত্য।"

বিমলা স্বামীর দক্ষিণহস্ত-খানা দুই হস্তের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া শিরঃসঞ্চালন করিয়া বলিলেন, "একটুও সত্যি নয়। স্বকার্য্যসাধনের জন্য এজলাসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যাদের অনর্গল সত্যি-মিথ্যে বলবার অভ্যাস হয়ে গিয়েছে দরকার হলে তারা এ রকম কথা বলেই থাকে।"

বিমলার মন্তব্য শুনিয়া দ্বিজনাথ পুলকিত হইয়া হাসিয়া উঠিলেন; তাহার পর সহসা কপট গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া বলিলেন, "স্বীকার না কর নজীর দিচ্ছি; বিরহের নয়, একেবারে বৈধব্যের। তোমাদের পদ্ম-দিদির কথা মনে আছে ত? সধবা অবস্থায় কি চেহারা ছিল? তারপর যে-দিন বিশ্বেশ্বর মারা গেল ঠিক সেই দিন থেকে শরীর ফুলতে আরম্ভ হয়ে এখন কি হয়েছে একবার ভেবে দেখ! স্বামী বর্ত্তমানে ছাগমাংস অথবা ছাগলাদ্য ঘৃত যা করতে পারে নি বৈধব্য অবস্থায় আলো-চাল কাঁচকলা তার চতুর্গুণ করেছে এর ভূরি ভূরি উদাহরণ দিতে পারি। কাব্যে এ কথা না মানো, মেনো না; কিন্তু জীবনে বৈজ্ঞানিক তথ্য না মান্‌লে চল্‌বে কেন?"

বিমলা তর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "রেখে দাও তোমার বৈজ্ঞানিক-তথ্য! যত সব গাঁজাখুরী কথা!"

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

দ্বিজনাথ স্মিতমুখে বলিলেন, "কিন্তু এ গাঁজাখুরী কথা থেকে তুমিও পরিত্রাণ পাবে না! সীলোনে পৌঁছেই বুঝতে পার্‌বে আমার কথা সত্যি কিনা।"

বিমলার মুখ লাল হইয়া উঠিল; কুপিতস্বরে বলিলেন, "এ-সব যা-তা কথা যদি বল তা হলে আমি মরে গেলেও সীলোন্ যাব না তা বল্‌ছি!"

বেগতিক দেখিয়া দ্বিজনাথ রহস্তের গতিরোধ করিলেন, এবং অমিশ্র পরিহাসকে সত্য বলিয়া ভুল করিয়া মাঝে মাঝে যে অকারণ অনর্থের সূত্রপাত হয় তদ্বিষয়ে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

পরিহাসের ধারা যে সত্য-সত্যই বন্ধ না হইয়া চতুর-তরভাবে চলিতেছে মনে-মনে তাহা বুঝিয়াও বিমলা বাহ্য সন্তোষের ভাব ধারণ করিয়া বলিলেন, "নিজের শরীরের জন্য তোমাকে ছেড়ে আমি একা সীলোন্ গেলে মা কি ভাব্‌বেন বল দেখি?"

"আমাকে ছেড়ে তুমি সীলোন্ না গেলে মা যা' ভাব্‌বেন তা'তেও তোমার কম লজ্জার কারণ হবে না।" বলিয়া দ্বিজনাথ হাসিতে লাগিলেন।

স্বামীর প্রতি একবার চকিত-মধুর দৃষ্টিপাত করিয়া নিরুদ্ধ হাস্তের সহিত বিমলা বলিলেন, "তা হোক্! জামায়ের প্রতি মেয়ের টান দেখলে কোনো মা-ই মন্দ কিছু ভাবে না। বাবা যখন মকর্দ্দমা করতে মফঃস্বলে যেতেন মা যে কতবার সঙ্গে যেতেন সে ত' মা ভুলে যান্ নি।"

সহাস্তমুখে দ্বিজনাথ বলিলেন, "সে ধারা তুমিও একেবারে বাদ দাও নি বিমল। জানকী চৌধুরীর মানহানির কেসে আমার সঙ্গে ঢাকা গিয়েছিলে সে কথা ভুলে গিয়েছ?"

প্রভাত-সূর্য্যের উপর সহসা ঘন মেঘখণ্ড আসিয়া পড়িলে শরৎকালের প্রসন্ন শস্তক্ষেত্রের যে অবস্থা হয়, দ্বিজনাথের এই কথায় বিমলার মুখমণ্ডলে ঠিক সেই অবস্থা উপস্থিত হইল। বিমর্ষ-করুণমুখে দুঃখার্ত্তস্বরে তিনি বলিলেন, "ভুলে গেছি! জীবনে সে কি কোনো দিন ভুলব! যে শাস্তি পেয়েছিলাম আর কখনো তোমার সঙ্গে মফঃস্বলে যাওয়ার কথা মুখে আনি নি!—আচ্ছা, সে কতদিনের কথা হ'ল?"

এক মুহূর্ত্ত দ্বিজনাথ মনে-মনে হিসাব করিয়া বলিলেন, "প্রায় বাইশ বৎসর হয়ে গেল।"

বিমলা আর কোনো কথা বলিলেন না, শুধু একটা তপ্ত দীর্ঘশ্বাস মর্ম্মস্থল হইতে বাহির হইয়া বায়ুতে মিশাইয়া গেল।

ইহার পর ক্রমশঃ নানাদিক দিয়া কথাটা অগ্রসর হইয়া বিমলার সীলোন্ যাওয়াই স্থির হইল। বিদেশ-দর্শনের আনন্দ, সমুদ্র-যাত্রার আগ্রহ, আত্মীয়বর্গের সহিত সহ-যাত্রার প্রলোভন এবং সর্ব্বোপরি স্বামীর সনির্ব্বন্ধ উপরোধ বিমলা অতিক্রম করিতে পারিলেন না। কিন্তু দুইটী বিষয়ে তিনি দ্বিজনাথকে স্বীকৃত করাইয়া লইলেন; প্রথমত কন্যা কমলা সীলোন্ না গিয়া দ্বিজনাথের পরিচর্য্যায় সঙ্গে থাকিবে, এবং দ্বিতীয়ত জাহাজে তাঁহা-দিগকে তুলিয়া দিয়া পরদিনই দ্বিজনাথ কমলাকে লইয়া জশিডি যাত্রা করিবেন। কিছুদিন হইতে অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে দ্বিজনাথ বিশ্রামের প্রয়োজন বোধ করিতেছিলেন, পূজার দীর্ঘ অবকাশও নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছিল; সুতরাং জশিডি যাইবার প্রস্তাবে তাঁহার বিশেষ আপত্তি ছিল না, কিন্তু কমলা সীলোন্-ভ্রমণে বঞ্চিত হইয়া তাঁহার কাছে থাকিবে ইহা তাঁহাকে পীড়ন করিতেছিল।

স্বামীর এই কুণ্ঠা উপলব্ধি করিয়া বিমলা কহিলেন, "সে যখন তোমাকে এক্‌লা রেখে সীলোন্ যেতে কিছু-তেই রাজী হচ্ছে না—তোমার কাছে থাকাই স্থির করেছে তখন তুমি অনর্থক কুণ্ঠিত হচ্ছ কেন? তা ছাড়া শুধু এক পক্ষ দেখ্‌লেই ত' চলে না; বেচারা সন্তোষের কথাও ভাবো। কমলা জশিডি যাবে শুনে যার মুখ শুকিয়েছে—কমলা লঙ্কা যাবে শুন্‌লে তার কি অবস্থা হবে সেটাও ত' ভাবা উচিত!" বলিয়া বিমলা মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

পত্নীর কথা শুনিয়া দ্বিজনাথের মুখে হাসি দেখা দিল; তিনি বলিলেন, "তা বটে, জশিডি হলে মাঝে

মাঝে শনি-রবিবারে যাওয়া চলবে; সীলোন্ হলে একেবারে নিরুপায়। কম্‌লিও সেইজন্যে সীলোন্ যেতে চায় না না-কি?”

সহাস্যমুখে বিমলা বলিলেন, “তা কি করে বলব বল? তোমার মেয়ের পেটের মধ্যে কি আছে তা'ত সহজে বোঝবার উপায় নেই। বাপ্‌রে কি ভীষণ চাপা মানুষ!”

দ্বিজনাথ বলিলেন, “আমি কিন্তু যতটা বুঝতে পারি পেটের মধ্যে বিশেষ কিছু নেই। সন্তোষের জন্য সে যে খুব বেশী ব্যস্ত তা' মনে হয় না।”

বিমলাও মনে মনে কতকটা এইরূপ অনুমান এবং আশঙ্কা করিতেন। অপ্রসন্নমুখে তিনি বলিলেন, “ব্যস্ত না হওয়াই অন্যায়! রূপে, গুণে, অর্থে, বিদ্যায় সন্তোষের মত দ্বিতীয় একটা ছেলে পাওয়া শক্ত। এ যদি ওঁর কপালে না থাকে ত' কপালে বোধ হয় দুঃখই আছে। অথচ সন্তোষ ত' কমলা বল্‌তে অজ্ঞান! কমলের ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার সময়ে দু-দিন দিবারাত্র কি সেবাটাই সে করেছিল দেখেছিলে ত? মেয়ে ত' বিকারে অচৈতন্য হয়েই রইলেন তা বুঝ্‌বেন কি!”

পত্নীর আগ্রহ এবং উৎকণ্ঠা দেখিয়া দ্বিজনাথ সহাস্যমুখে বলিলেন, “বুঝ্‌বে, বুঝ্‌বে। অচেতন অবস্থায় যে ঘটনা ঘটেছে, সচেতন অবস্থাতেই ত' তার সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছিল।”

সন্তোষকুমার চৌধুরী কলিকাতা হাইকোর্টের একজন নব-নিযুক্ত ব্যারিষ্টার। অক্‌স্‌ফোর্ড হইতে বি, এ এবং লণ্ডন হইতে ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া মাত্র এক বৎসর হইল সে দেশে ফিরিয়াছে। কলিকাতায় প্রত্যহ দুই-বেলা সে নিয়মিতভাবে দ্বিজনাথের গৃহে হাজিরা দেয়। সকালে অবশ্য প্রধানত দ্বিজনাথের জুনিয়ারী করিতে, এবং সন্ধ্যায় যে-উদ্দেশ্যে, তাহা পূর্ব্বোক্ত কমলার প্রসঙ্গেই ব্যক্ত হইয়াছে।

কমলা দ্বিজনাথের একমাত্র সন্তান, সুতরাং ভবিষ্যতে বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী, বেথুন কলেজের তৃতীয়-বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী এবং দেখিতে পরমা সুন্দরী। প্রেম যখন প্রেমাস্পদার পিতার সোনা-রূপা বাঁধানো প্রণালীর মধ্য দিয়া বহিবার সুযোগ পায় তখন ঈষৎ অবলীলারই সহিত বয়। সন্তোষ কিন্তু তাহার আসক্তিকে দ্বিজনাথের সম্পত্তি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া যে-সম্পদ কমলা তাহার দেহে মনে বহন করিত তাহারই মধ্যে নিবদ্ধ রাখিত। প্রণয়ের অনন্যমুখিতায় বিঘ্ন সম্পাদন করিয়া অর্থ অনর্থ ঘটাইবে কাব্য-লোকের এ দুর্ঘটনাকে সে মনের মধ্যে এক মুহূর্ত্তও স্থান দিত না। কমলা-যে বড় লোকের মেয়ে, খনি হইতে সূর্য্যকান্ত মণির মতো দরিদ্রের পর্ণকুটীর হইতে তাহাকে যে আহরণ করা যাইবে না—এই ছিল তাহার ভাবপ্রবণ হৃদয়ের দুঃখ।

দ্বিজনাথ যখন মনোযোগসহকারে পরিচয়-পত্র পড়িতেছিলেন তখন নবাগত যুবক উৎসুক-বিমুগ্ধচিত্তে চতুর্দ্দিকের দৃশ্য উপভোগ করিতেছিল। জশিডি রেল-ষ্টেশনের কিয়দ্দূর দক্ষিণ হইতে যে দীর্ঘ গিরিপৃষ্ঠ দক্ষিণ দিকে চলিয়া গিয়াছে তাহারই উপর এই গৃহখানি অবস্থিত। গৃহসংলগ্ন ভূমিতে নানাবিধ ফলের ও ফুলের গাছ। প্রাচীরের বাহিরে গিরি-গাত্রে স্থানে স্থানে আতাগাছের এবং কয়েক-প্রকার বনতরুর ঝোপ অনিচ্ছায় অনাদরে জন্মিয়া আছে। পথের ধারে গেটের উপর অর্দ্ধ-বৃত্তাকার লোহ-বেড় আশ্রয় করিয়া লতা উঠিয়াছে, তাহার দেহ কমলানেবু রং-এর অজস্র ফুলে ভরিয়া গিয়াছে। গেট হইতে গৃহ-সোপান পর্য্যন্ত ঘুটিং-এর পথ—তাহার উভয় পার্শ্বে মর্ম্মরিত তরুবীথি। গৃহ-প্রাচীরের ধারে ধারে সমান্তরালে দীর্ঘ ইউক্যালিপ্টাস্ গাছের শ্রেণী আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে,—তাহাদের গাত্র হইতে নির্গত মিষ্ট গন্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। গৃহের পশ্চিম দিকে নিম্নভূমিতে কলিকাতাগামী রেল-পথ সরীসৃপের মত আঁকিয়া বাঁকিয়া মিলাইয়া গিয়াছে। তাহার পরপারে উপত্যকাভূমিতে দুই-তিনখানি পাহাড়ী-গ্রাম দেখা যাইতেছে, এবং তৎপশ্চাতে ঘনতরুনিবদ্ধ ডিগ্‌রিয়া পাহাড় আরব্যোপন্যাসের দৈত্যের মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে। পূর্ব্বদিকে রাজপথের পার্শ্বেই বৈদ্যনাথ যাইবার রেলপথ; তাহার নীচে শাল-বৃক্ষখচিত উপত্যকা। দূরে নন্দন পাহাড়ের পার্শ্বে বনান্তরাল দিয়া মাঝে মাঝে দেওঘরের সৌধরাজি

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

দেখা যাইতেছে, এবং বহুদূরে ত্রিকূট পর্ব্বতের অস্পষ্ট শিখরগুলি আকাশ-গাত্রে অঙ্কিত মনে হইতেছে। ভাদ্র মাসের শেষ, প্রত্যূষে বৃষ্টি হইয়া আকাশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। লঘু-বায়ু-হিল্লোলিত তরুশীর্ষে এবং লতা-পল্লবে প্রভাত-রৌদ্র পড়িয়া ঝিল্‌মিল্‌ করিতেছে।

আগন্তুক বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকের এই অপরূপ শোভা দেখিতেছিল এমন সময়ে পার্শ্বের ঘর হইতে পুরু পর্দ্দা ঠেলিয়া একটী তরুণী নির্গত হইয়া ডাকিল, "বাবা!"—তাহার পর সহসা অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিতে পাইয়া পশ্চাতে ঈষৎ সরিয়া গিয়া পর্দ্দার পার্শ্বে অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইল।

দ্বিজনাথ চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, "কমল, এদিকে এসো। এঁর পরিচয় পেলে তুমি নিশ্চয় খুসী হবে। ইনি আর্টিষ্ট্‌ বিনয়ভূষণ রায়।"

কমলা উৎফুল্লনেত্রে অগ্রসর হইয়া আসিয়া বিস্ময়োৎসুক স্বরে বলিল, "ইনিই?"

বিনয় তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া অভিবাদন করিয়া সকৌতূহলে কমলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার নাম আপনারা শুনেছেন না কি?"

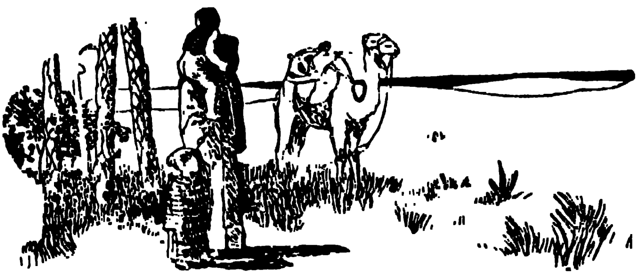
দ্বিজনাথ বলিলেন, "হাঁ, আমাদের একটি বন্ধু আপনার কথা আমাদের কাছে বলেছিলেন। তিনিও একজন আর্টিষ্ট্‌!" তাহার পর এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আপনি ত' পোর্ট্রেট্‌ আঁকেন—আমার এই মেয়েটীর একটী ছবি আঁকুন না?"

কমলা ততক্ষণে একটা বেতের চেয়ারে বসিয়া সলজ্জ-মুখে মৃদু-মৃদু হাস্য করিতেছিল। বিনয় চাহিয়া দেখিল এ প্রতিমা শিল্পীর কল্প-লোকেই সম্ভব,—বাস্তব-জগতের রক্তমাংসের দেহে এ সৌভাগ্য কদাচিৎ কাহারো ভাগ্যে জোটে! সপ্তবর্ণের অধীর বাসনা বিনয়ের চকিত-বিমুগ্ধ হৃদয়ের মধ্যে ইন্দ্রধনু রচনা করিয়া বসিল! উৎফুল্লমুখে সে বলিল, "অনুগ্রহ করে আদেশ করলেই আরম্ভ করব।"

(ক্রমশঃ)



সহযোগী-সাহিত্য



ডাউটি—আরবের কথা

শ্রীযতিনাথ ঘোষ

১

রেলগাড়ী ও ষ্টীমারের কল্যাণে যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হওয়াতে অনেকেই এখানে ওখানে ঘুরিয়া আসেন এবং তাহারি কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতেও ছাড়েন না। আমাদের দেশেই য়ুরোপ ও আমেরিকা হইতে কত লোক আসেন,—কেহ এখানকার শাসনতন্ত্রের খোঁজখবর লইতে, কেহ বা আমরা যথোচিত পরিমাণে সভ্য হইয়াছি কি না তাহা পরীক্ষা করিতে, অপর কেহ বা অন্য কোনও উদ্দেশ্য-সাধনের চেষ্টায়। মানুষের বাহন যতই দ্রুত হইতে চলিয়াছে, লেখনীও, বোধ করি, তাহার সহিত সমান তাল রাখিবার জন্যই, নিজের কাজ যথাসম্ভব শীঘ্র সারিয়া লয়, আর রচনা সমাপ্ত হইলে তাহা মুদ্রা-যন্ত্রের অনুগ্রহে দেখিতে না দেখিতেই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

এইভাবেই ত আধুনিক ভ্রমণ-কাহিনীর বেশীর ভাগ লেখা। সময়ে সময়ে এরূপ গ্রন্থ সুখপাঠ্য হয় সত্য, কিন্তু তাহাতে আমরা পাই কি? লেখক কয়েকদিনের জন্য বিদেশে আসিয়াছেন, সেখানে তাঁহার চোখে যাহা পড়িয়াছে তাহাই তাড়াতাড়ি 'নোট' করিয়া লইতেছেন, কেননা, সময় বড় বেশী নাই, নির্দ্দিষ্ট দিবসের মধ্যে ফিরিয়া গিয়া আবার অন্য কাজে মনোনিবেশ করিতে হইবে, অবসর কোথায়? তাহার পর সেই 'নোট'গুলিকে কোনও প্রকারে সাজাইয়া প্রবন্ধাকারে পরিণত করা—ইহাই ত লেখকের একমাত্র কাজ। লিপি-কৌশলের অবকাশ যথেষ্ট থাকে, বহিরঙ্গের কোন অভাবই দেখিতে পাওয়া যায় না, তবুও পাঠ শেষ হইলে এই কথাই মনে বিশেষ করিয়া উদয় হয়—অনেক নূতন কথা জানা গেল বটে, কিন্তু বর্ণিত দেশের অথবা দেশের মানুষের ত বিশেষ পরিচয় পাওয়া গেল না; এ যেন কেবলমাত্র কয়েকটি বাহিরের কথা তালিকাভুক্ত করিয়া যে কোনো উপায়ে একটি বই দাঁড় করানো হইয়াছে;—বই ত বলিতেই হইবে, যেহেতু আকার-প্রকার সব বইয়েরই মতো, বোধ হয় যৎসামান্য উপযোগিতাও আছে; শুধু উহাকে সাহিত্যের আসরে স্থান দিতে পারা যায় না, এইটুকুই দুঃখের বিষয়।

আরেক শ্রেণীর ভ্রমণ-কাহিনী আছে—সংখ্যায় বেশী নয়, কিন্তু নিঃসংশয়ে তাহাদের সাহিত্যের, এমন কি উচ্চ অঙ্গের সাহিত্যের, সামগ্রী বলিয়া মনে করিতে পারা যায়। বিখ্যাত ফরাসী লেখক পিয়ের লোটীর নাম বঙ্গীয় পাঠক-সমাজে অপরিচিত নহে। তাঁহার তাম্বুলের কাহিনী, জাপানের কথা, ইংরাজ-বর্জ্জিত ভারতবর্ষে পর্য্যটন

ডাউটি—আরবের কথা

শ্রীযতিনাথ ঘোষ



চার্লস্ মণ্টেগু ডাউটি

পুস্তকগুলি অনেকেই আনন্দের সহিত পাঠ করিয়াছেন, এবং সে-আনন্দ যে সাহিত্য-সম্ভোগেরই আনন্দ তাহাতে কাহারো অণুমাত্র সন্দেহ হয় নাই। পিয়ের লোটীর রচনা-রীতির বিশেষ ধারা এইরূপ,—তিনি বাক্যের পর বাক্য যোজনা করিয়া চলেন, আর সেই সঙ্গে পাঠকের মনে ছবির পর ছবি ফুটিয়া উঠে। অনবদ্য ভাষা, অপূর্ব্ব কলা-কৌশল, অদ্ভুত চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা, এই সমস্তের একত্র সমাবেশে তাঁহার গ্রন্থগুলি বিশেষ উপভোগ্য, কিন্তু একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, তাঁহার পুস্তক-পাঠে যথেষ্ট আনন্দ পাওয়া গেলেও শেষ পর্য্যন্ত একটা অতৃপ্তি থাকিয়াই যায়। অজানিত দেশ,—সেখানকার বহিঃ-প্রকৃতি, সেখানকার মানুষ, সমস্ত মিলিয়া মিশিয়া আমাদের মনের মধ্যে পরম রহস্যময় হইয়া রহিয়াছে; তাহার সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহলের অন্ত নাই। পিয়ের লোটীর নিপুণ তুলিকার স্পর্শে সেখানকার কয়েকটি সুন্দর ছবি ফুটিয়া উঠে,—কিন্তু ইহাতে মনের ক্ষুধা মিটে না। মন চায় সেই দেশের সহিত অন্তরঙ্গ ভাবে পরিচয় করিতে; যিনি সে কাজের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, কেবল মাত্র লিপিকুশলতাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট নহে; ভাষা, জাতি, ধর্ম্ম, আচার-ব্যবহার, এই সমস্ত বিষয়ের পার্থক্য ভেদ করিয়া আসল মানুষটিকে জানিবার বুঝিবার জন্য যে সহৃদয়তা, যে অন্তর্দৃষ্টি আবশ্যক, তাহা তাঁহার নিতান্তই থাকা চাই।

বলা বাহুল্য, বিখ্যাত সাহিত্যিকদের মধ্যেও এইভাবে অপরকে বুঝিবার ক্ষমতা কচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজ-কবি ডাউটির (Charles Montague Doughty—চার্লস মণ্টেগু ডাউটি) কিন্তু ইহা প্রচুর পরিমাণে ছিল। তিনি একবার আরবে গিয়াছিলেন; সেখানে তাঁহাকে প্রায় দুই বৎসর থাকিতে হইয়াছিল। আরবের মরুভূমির মধ্যে তাঁহাকে অনেক ঘুরিতে হয়;—তাঁহার সেই ভ্রমণের কাহিনী তিনি যে পুস্তকে প্রকাশ করেন, তাহার নাম *Travels in Arabia Deserta* (আরব মরুভূমিতে ভ্রমণ)। তাঁহার রচনা-রীতি পিয়ের লোটী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তিনি শুধু আরবের কয়েকটী ছবি আঁকিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহার সহৃদয়তার গুণে

সে-দেশের অধিবাসী তাঁহার লেখনীর নিকট একান্ত ভাবেই ধরা দিয়াছে। আমরা এই প্রবন্ধে তাঁহার এই অপূর্ব্ব পুস্তকের সামান্য পরিচয় দিতে ইচ্ছা করি।

২

কয়েক মাস হইল, ডাউটি সম্বন্ধে ইংরাজী মাসিকপত্র "লণ্ডন মার্‌কারি"তে (*London Mercury*) একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। ইহাতে স্বল্প পরিসরের মধ্যে তাঁহার জীবনী ও বিবিধ রচনার কথা প্রকাশ পাইয়াছে।

আরব-যাত্রার পূর্ব্বে ডাউটির জীবনে তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায় না। ভদ্রঘরের সাধারণ ইংরাজের মতই কেম্ব্রিজ্, অক্‌স্‌ফোর্ড্ এবং য়ুরোপের বিভিন্ন স্থানে তিনি শিক্ষালাভ করেন। বিজ্ঞান-শিক্ষার দিকে একটা ঝোঁক তাঁহার বরাবরই ছিল। আরবের কোনও কোনও স্থানে পর্ব্বতগাত্রে খোদিত যে-সকল মূর্ত্তি এবং শিলালিপি বহুযুগের বিস্মৃত শতাব্দীর স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ এখনও বর্ত্তমান, তাহাদেরি আকর্ষণে, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে, তেত্রিশ বৎসর বয়সে, তাঁহাকে ঘরের



মক্কার 'কাবা'-তীর্থ

বাহির হইতে হইয়াছিল। মরুভূমির মধ্যে শিলালিপি নকল করা শীতপ্রধান দেশের অধিবাসীর পক্ষে যথেষ্ট কষ্টসাধ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু সে সত্ত্বেও, বৈজ্ঞানিক কৌতূহল চরিতার্থ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ফিরিয়া না আসিয়া, আরবের অধিবাসীদের সমস্ত কথা ভাল করিয়া জানিবার জন্য, প্রায় দুই বৎসর কাল, সেখানে নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়ান। আশৈশবের সমস্ত অভ্যাস ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাকে আরবদের মধ্যে, তাহাদেরি একজনের মতো, হইয়া থাকিতে হয়; কিন্তু তাঁহার অদৃষ্টে যখন নির্য্যাতন,

তাঁহার গদ্যগ্রন্থ "আরব মরুভূমিতে ভ্রমণ" যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে বলিয়াই বোধ হয় লেখক, জন ফ্রীম্যান্ (John Freeman), তাহার কথা বিশেষভাবে না বলিয়া তাঁহার কাব্য-গ্রন্থাবলীর বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। ডাউটির কবিতা আমাদের এ-প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে, কিন্তু তাঁহার গদ্যরচনার সহিত পরিচয়ের প্রারম্ভে ডাউটি ব্যক্তিটির সম্বন্ধে মনে আপনিই কৌতূহল উপস্থিত হয়। সেই কারণে ফ্রীম্যানের প্রবন্ধ হইতে ডাউটির জীবনের কথা এইখানে সঙ্কলন করিয়া দেওয়া গেল।

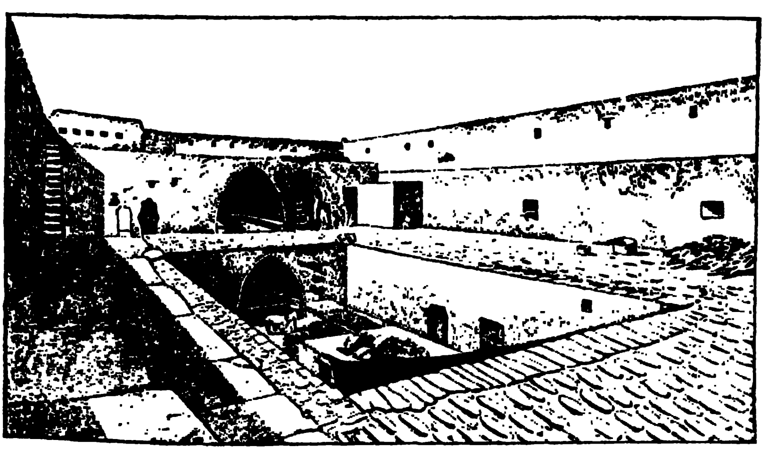
শ্রীযতিনাথ ঘোষ

প্রহার, এমন কি কয়েদ পর্য্যন্ত ভোগও ছিল, তখন আর এই সামান্য শারীরিক অসুবিধার কথা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিবার কোন প্রয়োজন নাই।



ডামাস্কাস্

আরব-ভ্রমণ যে তাঁহার পক্ষে সুখের অথবা স্বাচ্ছন্দ্যের হইবে না, এ-কথা তিনি পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন। মক্কা-যাত্রীদের সহিত ডামাস্কাস্ নগর হইতে তিনি এল্-হেজর্ পর্য্যন্ত যান। তীর্থযাত্রীরা তাহাদের গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল, মেদাইন্-সালি ও এল্-আল্লির নিকট বলিয়া সেই সব স্থানের শিলালিপি ও অন্যান্য প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ভাল করিয়া দেখিবার ও তাহাদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিবার ইচ্ছায় ডাউটি সেখানে থাকিয়া গেলেন। ঠিক ছিল, তীর্থযাত্রীরা যখন দুই মাস পরে ফিরিয়া আসিবে, তিনিও সেই সময় তাহাদের সহিত ডামাস্কাসে ফিরিবেন। কিন্তু সেখানকার কাজ শেষ হইলে পর তাঁহার আর ফিরিবার প্রবৃত্তি রহিল না;—আরবের নানাস্থান পর্য্যটন করিবার বাসনা তখন তাঁহার মনকে বিশেষ করিয়া পাইয়া বসিয়াছে। একে ত এল্-হেজর্ পর্য্যন্ত আসাতে তাঁহার পক্ষে ভয়ের কারণ যথেষ্ট ছিল, ইহার উপর আবার যখন তিনি আরবের অন্যান্য বিপদ-সঙ্কুল স্থানে যাওয়া স্থির করিলেন, তখন তাঁহার মুসলমান বন্ধুরাও তাঁহাকে নিরস্ত করিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন।—"তুমি ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ, এখনও ফিরিবার সময় আছে, এস, আমরা একসঙ্গেই ফিরিয়া যাই। এই রৌদ্র-বিশুষ্ক মরুভূমি মানুষের আবাসভূমি হইবার উপযুক্ত নহে, এখানে দানবেই থাকিতে পারে। তুমি জান না, বেদুরা দানববিশেষ, তুমি অন্যধর্ম্মাবলম্বী এই অপরাধেই তাহারা তোমাকে হত্যা করিবে। আর যদিই বা ভগবানের কৃপায় তুমি বাঁচিয়া যাও, এত কষ্টের পরিবর্ত্তে তুমি কী পাইবার আশা রাখ? দেখ লোকে, একটা কোনও লাভের আশায় কিছু লোক্সান করিতে পারে, তুমি কিন্তু অকারণেই সর্ব্বস্ব পণ করিতে বসিয়াছ।"—অনেকেই তাঁহাকে এই মর্ম্মে অনুরোধ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, তাহাতে কোনই ফল হয় নাই। তাঁহার বন্ধুরা কিছুই অন্যায় বলেন নাই, দুঃখকষ্টের তাঁহার অবধি ছিল না। শ্রান্ত, ক্লান্ত, অবসন্ন হইয়া যখন তিনি তায়িফে আসিয়া



মরুমধ্যে কেল্লার অভ্যন্তরে কূপ

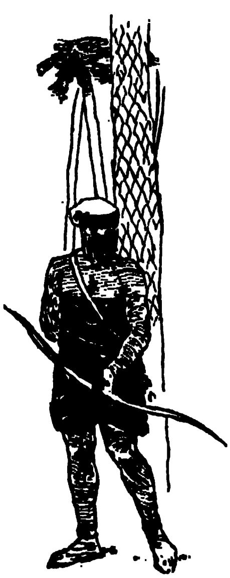
পৌঁছিলেন, তখন তাঁহার গায়ের জামা ছিঁড়িয়া গিয়াছে, মাথার চুল ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, দাড়ি অত্যন্ত উস্কোখুস্কো, চোখ দুটি লাল, মুখের চামড়া যেন ঝল্‌সিয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় তিনি জনৈক তুরস্ক-সেনানীর আতিথ্য লাভ করেন, এবং তাঁহারি যত্নে শীঘ্র সারিয়া উঠেন। সেখান হইতে জিদ্দায় আসিলে পর তাঁহার আরব ভ্রমণ শেষ হয়।

ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিয়া ডাউটি বিবাহ করেন। সেই সময় হইতেই তিনি হইলেন গৃহবাসী, নিজের রচনার প্রতি একান্ত মনোযোগী, ভ্রমণবিমুখ। "আরব মরুভূমিতে ভ্রমণ" (*Travels in Arabia Deserta*) লেখা শেষ করিতে তাঁহার কয়েক বৎসর লাগিয়াছিল; আরো কয়েক বৎসর পরে, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে, কেম্ব্রিজ্ য়ুনিভার্সিটী প্রেস্ (Cambridge University Press) হইতে পুস্তক-খানি প্রকাশিত হয়। সেই সময়েই ইহার যথেষ্ট আদর হইয়াছিল। ইহাই ডাউটির একমাত্র গদ্যগ্রন্থ। ইহার পর তিনি কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। গতবৎসর, বিরাশি বছর বয়সে, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।



অশ্বপৃষ্ঠে বর্শাধারী আরব

আরব্য-উপন্যাসের মনোহর মোহ আমাদিগকে শিশু-কাল হইতে এমনভাবে আবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে যে, আরবের কথা ভাবিতে গেলে সেই উপন্যাসলোকই আমাদের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাত হইয়া সত্যের সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া লয়। তাহার পর আরব মরুভূমির অন্তহীন বালুকা-বিস্তার ও তাহারি মাঝে মাঝে মানুষের থাকিবার মত আবাস-স্থল, ইহাদের সহিত সত্য পরিচয় স্থাপিত হইলেও বিস্ময়ের সীমা থাকে না. এক এক সময় মনে হয়, বুঝি বা এমন আশ্চর্য্য রিক্ততা মানুষেরই কল্পনা, বাস্তবের মধ্যে ইহার কোন সত্তা নাই।



আরব তীরন্দাজ্

সেই মরুভূমির মধ্যে যে ধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ প্রতি বৎসর ডামাস্কাস্ নগর হইতে সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রী মক্কায় গমন করে। তাহারা সকলে একসঙ্গে দল বাঁধিয়াই যায়; অনেক দিন হইতে এই প্রথার প্রচলন থাকাতে হজের জন্য বেশ একটি সুবন্দোবস্তও আছে। যাত্রারম্ভের কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতে ডামাস্কাস্ নগরে সাড়া পড়িয়া যায়, সেখানকার প্রায় প্রত্যেক মুসলমান-গৃহীর কোন না কোন আত্মীয় ধর্ম্মপিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য সেই যাত্রীদের দলে যোগদান করে। পথে যে-সকল দ্রব্যাদির প্রয়োজন হইতে পারে বাজারে তাহার কেনা-বেচা চলিতেছে, যাহারা তাঁবু প্রস্তুত করে, তাহারা হয় নূতন তাঁবু সেলাই করিতেছে, নয়ত পুরাণো তাঁবু মেরামত করিতেছে,

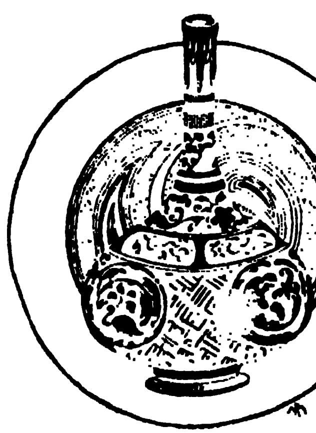
শ্রীযতিনাথ ঘোষ



আরব সর্দার

ছুতার-মিস্ত্রী শিবিকা প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত, বাজারের সঙ্কীর্ণ রাস্তার মধ্য দিয়া শিবিকাবাহী বড় বড় উটের উপর চড়িয়া তাহাদের চালকগণ উদ্ধতভাবে আস্তাবলের দিকে চলিয়াছে,—মরুভূমি-যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে সমস্ত নগরের এই চাঞ্চল্যের ছবি, ইহাও যেন উপন্যাসলোকেরই অন্তর্গত বলিয়া মনে হয়।

কত শতাব্দী হইয়া গেল, বৎসরের মধ্যে একবার করিয়া এইরূপ যাত্রার প্রবর্ত্তন হইয়াছে, তাহার জন্য মানুষকে পথ প্রস্তুত করিতে হয় নাই, তীর্থযাত্রী ও তাহাদের উটের পায়ের তলায় এই পথ আপনি তৈয়ার হইয়া গিয়াছে। পথিক-কবি ডাউটি যেবার এই যাত্রায় যোগ দিয়াছিলেন, সেবার যাত্রী-সংখ্যা ছিল ছয় হাজার, আর উট, ঘোড়া, গাধা, খচ্চর প্রভৃতি সব মিলিয়া পশু-সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। রাস্তা যে খুব বেশী চওড়া তাহাও নহে, এক সারিতে চারিটি উট, কখনো কখনো পাঁচটি উটও চলিতে পারে। এই যাত্রীর দল পথের প্রায় এক ক্রোশ জুড়িয়া চলিয়াছে, কোথাও নিয়ম শৃঙ্খলার কোনই অভাব নাই, সকলেই আপন আপন স্থান রক্ষা করিয়া মক্কার দিকে অগ্রসর হইতেছে। জনশূন্য প্রান্তরের মধ্য দিয়া পথ, সেখানে ভয়ের কারণও যথেষ্ট, বিশেষতঃ নগর-বাসীগণ বেদুদের বড়ই ভয় করে, সেইজন্য যাত্রীদের রক্ষার্থ একদল সৈন্যকে তাহাদের সহিত সমস্তক্ষণই থাকিতে হয়। পথের মধ্যে মধ্যে আড্ডা, সেখানে সকলে তাঁবু খাটাইয়া রাত্রিতে বিশ্রাম করে, আবার সকাল হইলে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। দশটার মধ্যেই তাঁবুগুলিকে খুলিয়া ফেলা হয়, উটেদের সজ্জিত করিয়া আপন আপন নির্দ্দিষ্ট স্থানে আনা হয়, তাহার পর সঙ্কেতস্বরূপ বন্দুকের শব্দ হইলে সমস্ত বোঝা উটেদের পিঠে চাপাইয়া আরোহীগণ আপনাদের স্থান অধিকার করিয়া যাত্রার জন্য অপেক্ষা করে। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে আবার বন্দুকের শব্দ হয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখবর্ত্তীগণ অগ্রসর হইতে থাকে, এবং আধঘণ্টার মধ্যেই একক্রোশব্যাপী এই বিপুলবাহিনীর যাত্রা সুরু হইয়া যায়। যে-সকল অনুচরবর্গকে তাঁবুর ভার দেওয়া হইয়াছে, তাহারা দ্রুতগামী উটের উপর তাঁবুগুলিকে বোঝাই করিয়া দল হইতে পৃথক্ হইয়া পরবর্ত্তী আড্ডায় অনেক আগে আসিয়া উপস্থিত হয়। যাত্রীরা আসিয়া দেখে, তাঁবুগুলি সবই নিয়মমত সংস্থাপিত রহিয়াছে, তাহাদের শৌচাদি স্থির জন্য বিশেষ কোনও কষ্ট পাইতে হয় না, সকলেই আপন আপন স্থানে গিয়া বিশ্রাম করিতে পারে। কিছুক্ষণ পরে সমস্তই নিঝুম হইয়া যায়,



রক্ষী-সৈন্যের দল শুধু বেদুদের অত্যাচারের ভয়ে পালা করিয়া রাত্রি জাগিয়া সকাল পর্য্যন্ত পাহারা দিতে থাকে।

এই 'মহাপিপাসার রঙ্গভূমির' মধ্য দিয়া যাত্রীদের চলিতে হয় বলিয়া জলকষ্ট নিবারণেরও যতদূর সম্ভব ভাল রকমেরি বন্দোবস্ত আছে। পথিমধ্যে যেখানেই জল পাইবার সম্ভাবনা, সেখানেই একটি করিয়া কূপ খনন করা হইয়াছে। সেই কূপকে ঘিরিয়া সুদৃঢ় করিয়া কেল্লা গাঁথা, একদল সৈন্য সর্ব্বদাই সেস্থান পাহারা দিবার জন্য নিযুক্ত। জল কাছাকাছি বড় পাওয়া যায় না, সেই কারণে এইরূপ এক একটি কেল্লা অন্য আর একটি হইতে অনেক দূরে অবস্থিত। কেল্লার প্রাচীরের বাহিরে একটি প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা, যন্ত্রের দ্বারা কূপ হইতে জল তুলিয়া সেই জলে চৌবাচ্চা ভর্ত্তি করা হয়। মরুভূমির যাযাবর জাতিদের অর্থাৎ আরবদের কাহাকেও এই জল ছুঁইতে দেওয়া হয় না, তাহাদের কেহ জল লইতে আসিলে কেল্লার সৈন্যগণ তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি গুলিবর্ষণ করে।



টমাস্ এড্‌ওয়ার্ড্ লরেন্স্

পিপাসায় কাতর তীর্থযাত্রীদের প্রাণরক্ষার উপায় একমাত্র এই চৌবাচ্চাগুলি, সেই জন্যই ইহাদের প্রতি এইরূপ সতর্ক দৃষ্টি।

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে হজ্জের বন্দোবস্ত এইরূপই ছিল এবং এই বর্ণনা হইতেই পুস্তকখানির আরম্ভ। আগেই বলিয়াছি, ডাউটি হজ্জের সহিত মেদাইন্‌-সালি পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। হজ্জের বিধি-ব্যবস্থা সমস্তই তুর্কীরা করিত, আরবদের সহিত তাহার কোন সংশ্রবই ছিল না, সময়ে সময়ে বেদুয়ীন্‌রা ভৃত্যরূপে নিযুক্ত হইত, এইমাত্র। ডাউটি যাহা যাহা দেখিয়াছেন, তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে তাহার কিছুই বাদ দেন নাই। বেদুয়ীন্‌দের দলের একটি মোড়লের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হইয়াছিল, তাহাকে সঙ্গে করিয়া তিনি মেদাইন্‌-সালি হইতে মরুভূমির মধ্যে প্রথম যাত্রা করেন। সেখানকার যাযাবর জাতিদের জীবন-যাত্রা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিবার সুযোগ তাঁহার ঘটিয়াছিল। বেদুয়ীন্‌রা এক এক দল কি ভাবে এক সঙ্গে তাঁবু ফেলিয়া থাকে, উটকে তাহারা কি রকম অমূল্য সম্পদ মনে করে, এক

শ্রীযতিনাথ ঘোষ

একটি দলের সঙ্গে কত অসংখ্য উট থাকে, মরুভূমিতে সামান্য যে কাঁটাগাছ বা আগাছা জন্মায় তাহাই তাহাদের একমাত্র আহার বলিয়া উটেরা এক এক স্থানের সমস্ত আগাছা কাঁটাগাছ খাইয়া নিঃশেষ করিয়া ফেলিলে, দলটি তাহাদের তাঁবু তুলিয়া লইয়া কি ভাবে অন্য আর এক স্থানে আসিয়া বসবাস করে, এই সমস্ত বিষয়ের অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা তাঁহার পুস্তকে পাওয়া যায়।

ডাউটি প্রায় দুই বৎসরকাল আরবের নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়ান। এই সময় যে তাঁহার কিরূপ কষ্টে কাটিয়াছিল, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। একে ত বিধর্ম্মী বলিয়া আরবেরা তাঁহার প্রতি বিরুদ্ধভাব পোষণ করিত, ইহার উপর আবার তিনি ইংরাজ, এই জন্য অনেকেই তাঁহাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিত। এমন দিনও গিয়াছে, তাহাদেরি একদল তাঁহাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া ফেলিবে বলিয়া শাসাইয়াছে, নিতান্ত কপালগুণে তাহাদের কবল হইতে তিনি উদ্ধার পাইয়াছেন। দস্যুভয়ও যথেষ্ট ছিল; মরুভূমির মধ্য দিয়া যাতায়াতের সময় উটের-উপর-চড়া বর্শা-হাতে-করা কালান্তক যম-সদৃশ ইহাদের কাহারো সহিত সাক্ষাৎ হইলে প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসার সম্ভাবনা খুব কমই থাকিত।

আশ্চর্য্যের কথা এই যে, এত দুঃখকষ্ট, বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও ডাউটি সেখানে এতদিন থাকিতে পারিয়াছিলেন। চিকিৎসা-শাস্ত্রে তাঁহার যৎসামান্য জ্ঞান আরবদের অনেক কাজে লাগিত, সেইজন্যই বোধ হয় শত্রুতাভাব মনের মধ্যে থাকিলেও তাহারা তাঁহার বিশেষ অনিষ্ট করে নাই। নিজের সহৃদয়তার গুণে তাহাদের ভাল করিয়া চিনিতে পারা তাঁহার পক্ষে বিশেষ কঠিন হয় নাই; তাহাদের বিসদৃশ আচার ব্যবহার, তাহাদের আপাত-প্রতীয়মান দোষ-সমূহ, এই সমস্ত বাহিরের আবরণ ভেদ করিয়া, তাহাদের আসল মনুষ্যত্বের সন্ধান তিনি পাইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার পুস্তকের পাতায় পাতায় তাহারা এমন জীবন্ত ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বোধ হয় তাঁহার এই সহৃদয়তার পরিচয় পাইয়াই আরবদের মধ্যে কয়েকজন তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিত; বিপদ-সঙ্কুল বিদেশে এই বন্ধুত্ব তাঁহার অনেক কাজে লাগিয়াছিল; সে কথা স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াও তাঁহার মনে ছিল, এবং তাঁহার পুস্তকে সে-কথা তিনি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

এই সব বন্ধুদের কথা ত তাঁহার পুস্তকে পাওয়াই যায়; যাহারা তাঁহার শত্রুতা করিয়াছিল, তাহাদের কথাও তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; বস্তুত, আরবের কোন্ কথাই, এমন কি শিলালিপি অথবা প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের কথাও, তাঁহার পুস্তক হইতে বাদ পড়ে নাই। তাঁহার রচনা-রীতি, প্রথম পরিচয়ে একটু কেমনতর মনে হইলেও, পুস্তক-পাঠ কিছুদূর অগ্রসর হইলেই বুঝিতে পারা যায়, ভাষা ঠিক ভাবের অনুগামী হইয়াই চলিয়াছে, কোনো স্থানেই স্বাতন্ত্র্য-বৃত্তি অবলম্বন করে নাই। নিজের কথা তিনি কিছুই বলিতে চাহেন নাই, তবে ভ্রমণ-কাহিনী হইতে নিজেকে একেবারে বাদ দেওয়া সম্ভব নয় বলিয়া সামান্য কিছু বলিতে হইয়াছে, কিন্তু সমস্ত বইখানি পড়া শেষ হইলে পর, সৌর-তাপে মূর্চ্ছিত সেই "পথশূন্য তরুশূন্য অশেষ প্রান্তরের" মধ্যে এই অসমসাহসী পথিক-কবির চিত্রই মানস-নেত্রের সম্মুখে বারম্বার উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

৪

১৯২১ খৃষ্টাব্দে "আরব মরুভূমিতে ভ্রমণের" তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণের একটু বিশেষত্ব ছিল। কর্ণেল লরেন্স্ (Thomas Edward Lawrence) ইহার একটি ভূমিকা লিখিয়া দেন। বিগত যুদ্ধের পূর্ব্বে চারি বৎসর ধরিয়া ইনিও ডাউটির মতন আরবদের মধ্যে বসবাস করিয়াছিলেন। তাহাদের বেশ-ভূষা, আচার-ব্যবহার সমস্তই তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, বাহিরের দিক হইতে কোনরূপ পার্থক্য রাখেন নাই। ডাউটির পর গিয়াছিলেন এই কারণেই, বোধ হয়, বিদেশী হইলেও তাহারা তাঁহার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করে নাই। তুর্কীদের শাসন হইতে নিজেদের মুক্ত করিয়া আরবেরা আবার স্বাধীন হয়, এই ইচ্ছা তাঁহার ছিল, এবং যুদ্ধের সময় ইহার জন্য তিনি চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। তাহার পর পশ্চিম আরবের যাযাবর জাতিসমূহ যখন তাহাদের অনেক কালের বিবাদ-বিসম্বাদ সমস্ত ভুলিয়া গিয়া স্বাধীনতালাভের জন্য

তুর্কীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল, কর্ণেল লরেন্স্ এবং মক্কার এমির ফয়সাল্ এই দুইজনেই সেই সংগ্রামে তাহাদের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। ডাউটি হজের সহিত যে-পথ দিয়া ডামাস্কাস্ নগর হইতে মরুভূমির মধ্যে আসিয়াছিলেন, মেদাইন্-সালি ও এল্-আল্লি দখল করিয়া ইঁহাদের বিজয়-বাহিনীও তীর্থ-যাত্রীদের সেই পুরাতন পথেই বিপরীত মুখে ডামাস্কাস্ নগর পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিল।

আরবদের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ হইয়াছিল বলিয়াই "আরব মরুভূমিতে ভ্রমণ" সম্বন্ধে লরেন্সের মতামতের যথেষ্ট মূল্য আছে। তিনি বলেন—আরব সম্বন্ধে যতই বেশী জানিতে পারা যায়, ততই দেখিতে পাই বইখানিতে কিছুই বাদ পড়ে নাই, ডাউটি সমস্ত কথাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি, বিচার-বুদ্ধি, কলা-কৌশলের প্রতি শ্রদ্ধা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে। আরব মরুভূমি, সেখানকার অধিবাসীগণ, তাহাদের দোষগুণ সমস্তই ইহাতে যথাযথভাবে প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে, তাহাদের বিষয় জানিবার ইচ্ছা হইলে এই পুস্তক পাঠ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। এই উক্তি যে কতদূর সত্য, বোধ হয় এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যুদ্ধের সময় সামরিক পাঠ্য-পুস্তক হিসাবেও ইহা ব্যবহৃত হইয়াছিল। ডাউটি যে-সব আরবদের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তাহারা তাঁহার চরিত্রমাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছিল। তাহাদের পুত্রপৌত্রেরা এখনও তাঁহার কথা মনে রাখে। সেখানকার একজন এমির (রিয়াথের এমির—ওয়াহাবি বংশীয়) একবার ইংলণ্ডে কয়েকটি প্রতিনিধি পাঠান, তাঁহার পুত্রও তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন। তাঁহারা সকলেই ইংলণ্ডে আসিয়া ডাউটির সহিত দেখা করেন; ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইবে আরবেরা ডাউটিকে কিরূপ শ্রদ্ধা করিত।

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ডাউটি যে-সময় আরবে গিয়াছিলেন, সে-সময় যাতায়াতের যেরূপ কষ্ট ছিল, এখন আর সেরূপ নাই। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ডামাস্কাস্ নগর হইতে মেদিনা পর্য্যন্ত রেলপথ খোলা হয়; তাহার পর হইতে বাৎসরিক তীর্থযাত্রার সেই বিপুল সমারোহ আর নাই, তীর্থযাত্রীগণ সকলেই রেলপথে যায়। এখন সেই মরুভূমির বালুকার উপর দিয়া কত মোটর চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেখানকার আকাশকেও এরোপ্লেন স্থির থাকিতে দেয় নাই। বিংশ-শতাব্দীর জয়-যাত্রা সেখানে সুরু হইয়াছে, দেখিতে দেখিতে সেখানকার অধিবাসীদের বেশ-ভূষা, আচার-ব্যবহার সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে, কিন্তু তখনো এই পুস্তকখানি আরবের পুরাকালীন জীবনের নিখুঁত চিত্র-হিসাবেই চির-কৌতূহলী মানবমনের তৃপ্তি বিধান করিতে সক্ষম হইবে।



স্বরলিপি

"নটরাজ"

লীলা—"গগনে গগনে আপনার মনে"

কথা ও সুর—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর   স্বরলিপি—শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

II সা সা সা। সরা -সা রা I রপা -া -া। -া -া -া I পমা পা ধা। পা
গ গ নে গ ০ গ নে ০ ০ ০ ০ ০ আ প না র

মপা -ধপা I মজ্ঞা -া জ্ঞা। জ্ঞরা জ্ঞা -া I -া -া জ্ঞা। রা সা -া I -সা -র্সা
ম ০০ নে ০ কী খে লা ০ ০ ০ কা খে লা ০ আ ০

র্সা। র্সণা ধণা -পা I -পমা -পা -ধা। ধপা মজ্ঞা -া I জ্ঞরা সা সা। সরা -সা
কী খে লা ০ ০ ০ ০ ত ব ০ গ গ নে গ ০

রা I রপা -া -া। -া -া -া I পধা ধা ধা। ধা -া ধা I ধা -া ধা। ধা ধণা -া I
গ নে ০ ০ ০ ০ ০ তু মি ক ত ০ বে শে ০ নি মে ষে ০

-া -া ণা। ণধা পা -ধা I ধমা পা -মণা। ণপা মজ্ঞা -রসা I
০ ০ নি মে ষে ০ নি তু ই ন ব ০০

I সা -র্সা র্সা। র্সণা -ধণা -পা I -পমা -পা -ধা। ধপা মজ্ঞা -া I জ্ঞরা সা
কী ০ খে লা ০০ ০ ০ ০ ০ ত ব ০ গ গ

সা। সরা -সা রা I রপা -া -া। -া -া -া I { পনা না না। না -া না I না -া
নে গ ০ গ নে ০ ০ ০ ০ ০ { জ টা র গ ০ ভী রে ০

-া। -না -পা -না I না র্সা র্সা র্সর্রা -র্সনা না I র্সা -া -া। -া -া -া I র্সনা
০ ০ ০ ০ লু কা লে র ০০ দি রে ০ ০ ০ ০ ০ ছা

র্রা র্সা। র্সা -ণা ণধা। ণা -া -া I ণর্সা র্সণা -া। ধণা -া ধা I পা -া -া।
য়া প টে ০ আঁ কো ০ ০ এ কো ন ছ ০ বি রে ০ ০

-া -া (-না) I -পা I মা -ধা ধা। ধা -া ধা I ধা -া ধা। ধা ধণা -া I
০ ০ ০ ০ মে ০ ঘ ম ল্ লা রে ০ কি ব লো ০

I -া -া ধা। ধা ধণা -া I -া -া ণা। ণধা পা -ধা I ধমাঃ -পধঃ ধপা। মজ্ঞা
০ ০ কি ব লো ০ ০ ০ কি ব লো ০ আ ০০ মা রে

-া -রা I রা রমা মজ্ঞা। রা সা -া I সা -র্সা র্সা। র্সণা -ধা -পধা I পমা
০ ০ কে ম নে ক থ ০ কী ০ থে লা ০ ০০ ০

-পা -ধা। ধপা মজ্ঞা -া I রা সা সা। সরা -সা রা I রপা -া -া। -া -া -া I
০ ০ ত ব ০ গ গ নে গ ০ গ নে ০ ০ ০ ০ ০

ন্া -া ন্া। ন্া -া ন্া I ন্া -া ন্া। ন্া ন্া -সা I সা -া -া। -া -া -া I
বৈ ০ শা খী ০ ঝ ড়ে ০ সে দি নে র্ সেই ০ ০ ০ ০ ০

সা -া সণা। ণধা পা -ক্ষা I পণা ণা ণধা। ণা -া ণধা I ণা -া -া।
অ ০ ট্ট হা সি ০ গু রু গু রু ০ সু রে ০ ০

-া -া -া I ণধা -র্সা র্সা। র্সণা -া ণধা I র্সণা -া ণা। -ধা -পা -ধা I
০ ০ ০ কো ন্ দূ রে ০ দূ রে ০ যা ০ ০ ০

ধমা -ধা ধা। ধপা মজ্ঞা -রা I সা -ন্া ন্া। ন্া -া ন্া I ন্া -া ন্া।
০ র্ যে ভা সি ০ বৈ ০ শা খী ০ ঝ ড়ে ০ সে

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ন্‌া ন্‌া -সা I সা -া -া । -া -া -া I না -া না । না -া না I ধনা -া -া ।
দি নে র সেই ০ ০ ০ ০ ০ সে ০ সো না র্‌ আ লো ০ ০

-পা -া -না I না র্সা র্সা । র্সরা -র্না না I নর্সা -া -া । -া -া -া I র্সা -না র্সা ।
০ ০ ০ শ্যা ম লে ঘি ০ শা লো ০ ০ ০ ০ ০ শে ০ ভ

র্সর্রা -র্সা র্রা I র্মজ্ঞা -া -া । -া -া -া I জ্ঞর্রা -র্সা র্মজ্ঞা । জ্ঞর্রা -র্সা না I নর্সা
উ ০ ত্ত রী ০ ০ ০ ০ ০ আ জ্‌ কে ন ০ কা লো

-া -া । -া -া -া I র্সা র্সরা র্নর্সা । ণা ণা । I ণর্সা সণা ণা । ণধা ণা -া I
০ ০ ০ ০ ০ লু কা নো ছা য়া য়্‌ মে ঘে র মা য়া য়্‌

ণর্সা সণা -া । ণধা পা -মা I পা -র্সা র্সা । মনা -ধা -পধা I -ধমা -পা ধা ।
কি বৈ ০ ভ ব ০ কি ০ ০ শা ০ ০০ ০ ০ ০

ধপা মজ্ঞা -া I রা সা সা । সরা -রসা রা I রপা -া -া । -া -া -া II
ত ব ০ গ গ নে গ ০ গ নে ০ ০ ০ ০ ০



বিবিধ সংগ্রহ

স্পার্টার অতীত

যীশুখৃষ্টের জন্মের চারিশত আশী বৎসর আগেকার কথা—সমগ্র ভূমধ্য-সাগরের আধিপত্য লইয়া, ভারত-মহাসমুদ্রে বাণিজ্য-ব্যবসায়ের প্রভুত্ব লইয়া বিরাট পারস্য-সাম্রাজ্যের সহিত ক্ষুদ্র কিন্তু অমিত-বিক্রম, বীর্য্য-দর্পিত স্পার্টা-রাজশক্তির তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। থার্ম্মপিলির গিরিবর্ম্মের মুখে দাঁড়াইয়া তিনশত মাত্র মুষ্টিমেয় সৈনিক লইয়া স্পার্টা-সম্রাট লিওনিদাস্ অপূর্ব্ব বুদ্ধি ও বীর্য্যের বলে বিপুল পারস্য-বাহিনীকে প্রাণপণে বাধা দিতেছেন। জারেক্সেসের সেনাদল শুধু শুধুই সুদীর্ঘ ছয়টি দিন আক্রমণের সুযোগের প্রতীক্ষায় কাটাইয়া দিল; লিওনিদাসের ব্যূহ ভেদ করা কিছুতেই সহজ হইল না। কিন্তু অবশেষে গ্রীক-ফোকিয়ান্দের আলস্যে ও অবহেলায় এবং জনৈক মিসেণীয়-সৈন্যের বিশ্বাস-ঘাতকতায় জারেক্সেসের সৈন্য স্পার্টান্দের ব্যূহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া বিপুল গর্জ্জনে থার্ম্মপিলির উপর ভাঙিয়া পড়িল। পরাজয় ও মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া লিও-নিদাস্ ও তাঁহার তিনশত স্পার্টান্ সৈন্য বুকের শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত যুঝিয়া স্বদেশ ও স্বজাতির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণ দিলেন।

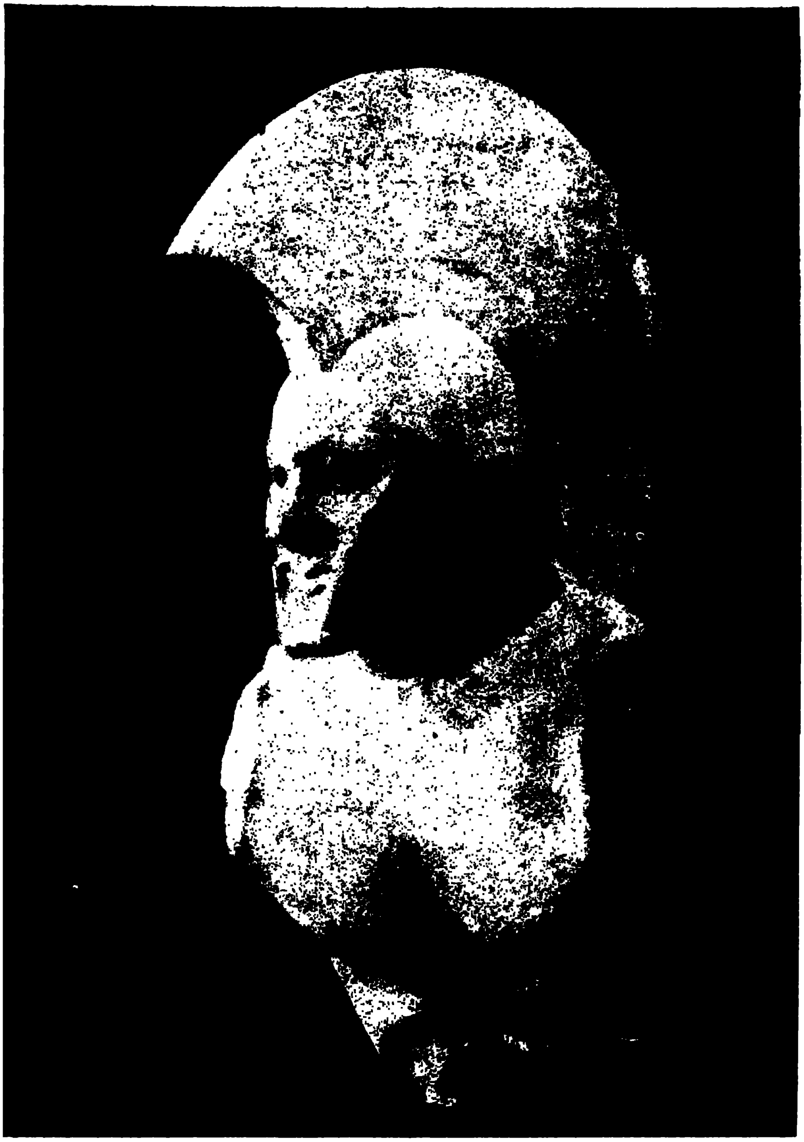
থার্ম্মপিলির যুদ্ধে পারস্য-সম্রাট জয়ী হইলেন সত্য, কিন্তু গ্রীসের ইতিহাসে যে নাম অমর ও উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে তাহা জারেক্সেসের নহে—পরাজিত লিও-নিদাসের।

এই লিওনিদাস্ দেখিতে কেমন ছিলেন, থার্ম্মপিলির গিরিবর্ম্মের মুখে দাঁড়াইয়া যোদ্ধৃবীরের মুখে-চোখে কি দৃঢ়তা, কি বীরত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছিল—তাহা কি জানিতে ইচ্ছা হয় না? বিশেষ করিয়া তাঁহার দেশবাসীর সে ইচ্ছা হওয়া তো খুবই স্বাভাবিক। ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের কল্যাণে স্পার্টার সে ইচ্ছা সম্প্রতি সফল হইয়াছে।

বিস্তৃত শ্যামল এক প্রান্তর জুড়িয়া স্পার্টার ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে—তাহারই এক প্রান্তে ছোট একটি পাহাড় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া। এই পাহাড়টির উপরে ছিল স্পার্টার প্রসিদ্ধ সহরতলী Acropolis। পশ্চিমে ইউ-রোটাস্ নদী, দূরে টেগেটাস্ পাহাড়;—স্পার্টা-যুবক তাহারই গুহায় জঙ্গলে শিকার করিয়া বেড়াইত। এই টেগেটাস্ পাহাড়ের উপর স্পার্টা-সহরতলীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অল্পদিন হইল আবিষ্কৃত হইয়াছে একটি যোদ্ধৃ-বীরের প্রস্তর-প্রতিকৃতি;—খণ্ডে খণ্ডে করিয়া পাওয়া, সবগুলিকে একত্র গ্রথিত করিয়া মূর্ত্তিটিকে সম্পূর্ণ করা সম্ভব হইয়াছে। বিশেষজ্ঞেরা বলিয়াছেন এটি থার্ম্মপিলি-বীর লিওনিদাসের প্রতিকৃতি। শিল্প-সমালোচকেরা বলেন, গ্রীসে বহুকাল এমন সুন্দর প্রস্তরমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয় নাই।

যেখানে এই মূর্ত্তিটি আবিষ্কৃত হইয়াছে—প্রধান প্রধান বীরের স্মৃতি সেইখানে রক্ষিত হইত। সেইজন্যই বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন, আবিষ্কৃত মূর্ত্তিটি লিওনিদাসেরই। কিন্তু তাহার অপেক্ষাও বড় প্রমাণ আছে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে মূর্ত্তিটি খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৮০—৪৭০ অব্দের মধ্যে গঠিত। থার্ম্মপিলির যুদ্ধ হইয়াছিল ৪৮০ খৃষ্টপূর্ব্বে; তাহার অব্যবহিত পরেই Acropolis-এ যোদ্ধৃ-বীরের স্মৃতি-মূর্ত্তি স্থাপন এক লিওনিদাসের ছাড়া আর কাহার হইতে পারে? বহু চেষ্টা করিয়াও মূর্ত্তিটির নীচের দিকের অংশ পাওয়া যায় নাই; পাওয়া গেলে এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারা যাইত, সঙ্গে সঙ্গে ভাস্করের নামও জানা সম্ভব হইত। কিন্তু সে-অংশটুকু

স্পার্টার অতীত



স্পার্টান-বীর লিওনিদাস্
স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য থার্ম্মপিলি-গিরিবর্ত্মে পারসীক সৈনিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া ইতিহাসে অমর হইয়া আছেন।

গুলিও হয়তো ক্রমে পাওয়া যাইতে পারে।

সামান্য একটা ডোরীয় গ্রাম-পত্তন হইতে কি করিয়া ধীরে ধীরে স্পার্টা গ্রীসের অন্যতম সুবৃহৎ শক্তিতে উন্নীত হইয়াছিল, ইংরেজ পণ্ডিতদের আবিষ্কারে ও গবেষণায় তাহার একটা সুনির্দ্দিষ্ট ইতিহাস উদ্ধার সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু কঠোর বীরত্বের সাধনা ও অদ্ভুত সমর-প্রতিভা ছাড়া স্পার্টার আর এমন কিছু ছিল না যাহা লইয়া সে এথেন্সের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে। এথেন্স্ যুগে যুগে পৃথিবীর তীর্থভূমি হইয়া রহিয়াছে; এথেন্সের প্রতি ধূলিকণা তাহার অতীত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ললিত-কলার, তাহার অপূর্ব্ব সাধনার ও সভ্যতার কাহিনীতে মুখর; আর স্পার্টার বিরাট ধ্বংসস্তূপ স্তব্ধ মূক। এই গভীর নীরবতার মধ্যে আজ এতদিন পরে লিওনিদাসের মূর্ত্তি অতীত ইতিহাসের ক্ষেত্রে সকলকে আমন্ত্রণ জানাইয়াছে; প্রত্ন-তত্ত্ববিদ্‌গণের অক্লান্ত পরিশ্রমে আজ তাহার প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার নাট্যমন্দির নয়নগোচর হইয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে আরও অনেক দ্রষ্টব্য আবিষ্কৃত হইতেছে। সমগ্র গ্রীসে এথেন্সের নাট্য-মন্দিরের পরেই এই নাট্যশালার স্থান। এই সমস্ত আবিষ্কার হইতে

পাওয়ার সম্ভাবনা এখনও যায় নাই। মূর্ত্তিটির প্রথম পাওয়া গিয়াছিল শুধু শিরস্ত্রাণটি, তাহার পর ক্রমে ক্রমে মাথাটি ও দেহটি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সম্প্রতি বর্ম্মা-বৃত বাম পদটিও পাওয়া গিয়াছে, বাকী অংশ-

এ-কথা প্রমাণ করা সহজ হইয়াছে যে স্পার্টার একটা বিশিষ্ট 'কালচার' ও শিল্পসম্পদ ছিল।

লিওনিদাসের মূর্ত্তি ছাড়া স্পার্টায় আর একটি অতি অদ্ভুত জিনিস আবিষ্কৃত হইয়াছে,—এথেন্স নগরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী "এথেনা"র একটি প্রতিমূর্ত্তি। স্পার্টার অ্যাক্রপলিসের (Acropolis) উপর তাহার মন্দির দাঁড়াইয়া আছে। পণ্ডিতেরা আজও ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন নাই স্পার্টা-নগরীতে কেন এই এথেন্সের অধিষ্ঠাত্রী 'এথেনা'-দেবীর পূজা হইত!

ইউরোটাস্ নদীর পূর্ব্ব-তীরে, ক্ষুদ্র একটি পাহাড়ের উপর অতীতের আর একটি নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে,—বিরাট একটি চতুষ্কোণ ধ্বংসস্তূপ। লোকে বলে, ট্রয়ের ধ্বংসের পর হেলেন্ যখন ফিরিয়া আসেন, তখন এই সুবৃহৎ মন্দিরের মধ্যে হেলেন্ ও মেনিলাসের পূজা হইত।

——



শিশু কাইজার

মাতামহী মহারাণী ভিক্টোরিয়া কর্ত্তৃক অঙ্কিত

কাইজারের বাল্য ও কৈশোর

নির্ব্বাসনে বসিয়া জার্ম্মাণীর ভূতপূর্ব্ব ভাগ্যবিধাতা কাইজার্ তাঁহার ঘটনাবহুল জীবনের কাহিনীকে উইল্‌হেল্ম্ সাহিত্যের সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার জীবনস্মৃতি উপন্যাসের মতো মনোরম, য়ুরোপীয় ইতিহাসের দিক হইতেও তাহা অত্যন্ত মূল্যবান্। তাঁহার বাল্য ও কৈশোর কি ভাবে এবং কোন্ প্রভাবের ভিতর দিয়া বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার আত্মজীবনী হইতে সে-কাহিনীর পরিচয় পাওয়া যায়। কোনো জীবনী-লেখকের পক্ষেই সে-পরিচয় দিতে পারা সম্ভব হইত না।

কাইজার্ যে বিশিষ্ট শিক্ষানীতি ও কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতার মধ্যে 'মানুষ' হইয়াছিলেন, হোহেন্‌জোলার্ণ্ বংশের এক ফ্রেড্‌রিক-দি-গ্রেট্ ছাড়া আর কেহ তেমন কঠোরতার মধ্যে বাল্য ও কৈশোর যাপন করেন নাই। সারা বৎসরের মধ্যে শুধু একবার বসন্তকালে বার্লিণের বাহিরে, পট্‌সডাম্ প্রাসাদে, একটি মাস ছুটি। এই কঠোরতার মধ্যে বালক উইল্‌হেল্মের জীবন একেবারে হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার শিক্ষয়িত্রী, ফ্রাউলিন ফন্‌ডোবেনেক্ ছিলেন নীরস কঠোরতার এক মূর্ত্তিমতী নিদর্শন! এই মমতাহীন শিক্ষয়িত্রীর সুকঠোর শাস্তির মধ্যে বালকের সমস্ত মন ক্ষুব্ধ ও বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। মায়ের সঙ্গেও ছেলের সদ্ভাব ও সম্প্রীতি বড় একটা ছিল না; কিন্তু পিতার সহিত বালকের চিরকাল একটা সুমধুর প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল।

সাত বৎসর বয়স হইতে হিন্‌স্‌পিটার নামক এক সেনানী-শিক্ষকের অধীনে উইল্‌হেল্মের সৈনিক-বৃত্তির শিক্ষানবিশী সুরু হইল। এই শিক্ষার প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ও উৎসাহ ছিল কিন্তু তাঁহার কঠিন-মন গুরুর কঠোর শাসনে সে অনুরাগ ও উৎসাহ তিক্ত এবং বিরূপ হইয়া উঠিল। তাঁহার শাসনে উইল্‌হেল্মকে সকল রকম দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছে—সমস্ত দিনের মধ্যে এক মুহূর্ত্তের ছুটি নাই, একটু খেলা বা আমোদের অবসর নাই—

কাইজারের বাল্য ও কৈশোর

তাহার উপর অর্দ্ধাহার, শুক্নো রুটি খাইয়া দিনের পর দিন যাপন, এ-সব তো ছিলই।

জন্ম হইতেই উইল্হেল্মের বাঁ-হাত অপটু ও অক্ষম অথচ সেই হাত লইয়াই শিকারে, বন্দুক ছোঁড়ায়, ব্যায়ামে কী অদ্ভুত ক্ষমতাই না তিনি অর্জ্জন করিয়াছিলেন! কিন্তু ঘোড়ায় চড়া শিখিতে গিয়া অশেষ কষ্ট তাঁহাকে সহিতে হইয়াছে। হাতের দোষে, শরীরের ভার-সমতা রক্ষা করিতে না পারিয়া, কতদিন ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়া কত কষ্ট তিনি পাইয়াছেন, কিন্তু নিস্তার নাই। কতবার কাঁদিয়া কাঁদিয়া অনুনয় জানাইয়াছেন, কিন্তু ক্ষমা নাই, মুক্তি নাই; 'মর ক্ষতি নাই, তবু শিখিতেই হইবে।' নীরবে, সকলের দৃষ্টির আড়ালে বসিয়া, ভগবানের কাছে উদ্দেশ্য-সাফল্যের জন্য কত প্রার্থনাই না তিনি জানাইয়াছেন!

আড়াই বৎসর বয়সে যে উইণ্ড্সর্-প্রাসাদে তিনি মাতামহী ভিক্টোরিয়ার আদর পাইয়াছিলেন এবং সেখানে জানালায় দাঁড়াইয়া ইংরেজ সৈন্যদলের 'কুচ্‌কাওয়াজ' দেখিয়াছিলেন, সে-কথা তাঁহার বড় হইয়াও মনে ছিল। যুদ্ধযাত্রা, সৈন্যচালনা প্রভৃতি ব্যাপার শিশুকাল হইতেই উইল্হেল্মের মনকে বিপুলভাবে নাড়া দিয়াছে। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন, "বার্লিনে যে শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং সেইখানেই যাহার শৈশব অতিক্রান্ত হইয়াছে, তাহার চিত্তে চিরকাল সৈনিক-জীবনের ছবি মুদ্রিত হইয়া থাকিবেই। সৈনিক ও সৈন্যচালনা ছাড়া প্রুসিয়ার রাজধানীর কোনো ছবি কল্পনাই করা যায় না।..................'অপেরা হাউস্ স্কোয়ারে' দাঁড়াইয়া আমার পিতামহ সৈনিকদলের নমস্কার গ্রহণ করিতেন এবং রাজপ্রাসাদের জানালায় দাঁড়াইয়া রাজকুমারীগণ ও রাণীরা সেই দৃশ্য দেখিতেন; তাহারই পাশে আর একটি জানালায় দাঁড়াইয়া আমরা, ছেলেমেয়ের দল, সেই দিকে চাহিয়া থাকিতাম।.........



বালক কাইজার্
(শা-সেনানীর পোষাকে দশ বৎসর বয়সে)

"এখনও আমার চোখের সম্মুখে ভাসিতেছে, ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ান্ সৈন্য কেমন করিয়া ক্রাউন-প্রিন্সের রাজপ্রাসাদের নীচ দিয়া বীরদর্পে তালে তালে পা ফেলিয়া অগ্রসর হইতেছিল। সেই বৎসরেই বিজয়ী সৈন্য কেমন উন্মত্ত কোলাহলে নগরে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল সে কথাও আমি ভুলি নাই।" দুই বৎসর পরে তাঁহার পিতা যুদ্ধক্ষেত্রে স্বয়ং সৈন্য পরিচালনা করেন। "যুদ্ধের পরে তাঁহার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন আমার পরিষ্কার মনে পড়ে। সেই সময়ই আমি দ্বিতীয় বার বিজয়ী প্রুসীয় সৈন্যের জয়-যাত্রা প্রত্যক্ষ করিলাম।"

উইল্হেল্ম পিতাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন এবং দুইজনেই একসঙ্গে তাঁহাদের জন্মভূমির ভবিষ্যৎ গৌরবের স্বপ্ন দেখিতেন। তাঁহার সমস্ত আত্ম-

জীবনীটি পিতার প্রশংসায় ও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধায় ভরপুর।

"আমার পিতার জীবনে এমন কোনো সময় আমি জানি না যখন তিনি জার্ম্মাণীর ভবিষ্যতে বিন্দুমাত্রও আস্থা হারাইয়াছিলেন। প্রতি মুহূর্ত্তে তিনি এক নব জার্ম্মাণ-সাম্রাজ্যের কল্পনায় চির-জাগরূক থাকিতেন। আমি যখন শিশু, তখন একখানি বই তিনি আমাকে সর্ব্বদাই পড়িতে দিতেন—বকের (Bock) সেই অপূর্ব্ব বই,—German Treasures of the Holy Roman Empire। এই বই পড়িতে পাওয়া আমি একটা মস্ত সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিতাম। বইখানি এত বড় যে আমি ঘরের মেজের উপর সে-খানি খুলিয়া বসিয়া নিবিষ্ট হইয়া দেখিতাম; আর আমার পিতা আমারই পাশে জানু পাতিয়া বসিয়া আমাকে তাহা বুঝাইয়া দিতেন। .... আমার পিতা বর্ত্তমান জার্ম্মাণ-সাম্রাজ্যকে মধ্যযুগের 'পবিত্র' রোম-সাম্রাজ্যেরই (Holy Roman Empire) পরিণত রূপ এবং জার্ম্মাণ-সম্রাটকে শার্লেমা'রই (Charlemagne) বর্ত্তমান বংশধর বলিয়া মনে করিতেন।"



যোদ্ধৃ-বেশে কাইজার্

বিগত মহাযুদ্ধের সময়ে অঙ্কিত

কি কঠোরতার ভিতর দিয়া উইল্‌হেল্‌মের শৈশব অতিক্রান্ত হইয়াছিল তাহার কিছু আভাস দেওয়া গিয়াছে। "সাত বৎসর পর্য্যন্ত আমার শিক্ষার ভার নারীহস্তেই অর্পিত ছিল—কিন্তু নারী বলিয়া তাহাদের হৃদয়ে ও চরিত্রে কোনো কোমলতা ছিল, এমন মনে করিবার কোনো কারণ নাই।" সৈনিকবৃত্তি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সাধারণ শিক্ষাও লাভ হউক্, এই উদ্দেশ্যে হিন্‌স্‌পিটার তাঁহার শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার সম্বন্ধে কাইজার লিখিয়াছেন, "এই একটি ব্যক্তি আমার পরবর্ত্তী জীবন গঠনের পক্ষে যতখানি দায়ী, এমন আর কেহই নহে। * * * * কঠোর কর্ত্তব্য বোধ ও নিস্পৃহ সেবার উপর তিনি আমার শিক্ষার সমস্ত ভিত্তি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। প্রতি মুহূর্ত্তে নিঃস্বার্থ ত্যাগের দ্বারা চরিত্রকে দৃঢ় করিতে হইবে, প্রাচীন গ্রীসীয় আদর্শে জীবনকে গঠন করিতে হইবে—ইহাই ছিল তাঁহার শিক্ষার আদর্শ। মেইনইন্‌জেন্ (Meinengen) হইতে একবার আমাদের কয়েকজন আত্মীয় আমার এখানে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। টেবিলে বসিয়া আমাকে আমার অতিথিদের খাবার তুলিয়া দিতে হইয়াছিল কিন্তু শিক্ষকের কঠোর শাসনে আমি একটী কেক্‌ও খাইবার অনুমতি পাই নাই। 'ত্যাগী ও নির্লোভ হও' ইহাই ছিল তাঁহার আদেশ। স্পার্টার যুবকেরা যেমন সুপ্ খাইয়া প্রাতরাশ সমাপন করিত, আমাকে তেমনি শুধু এক টুক্‌রা শুকনো রুটি খাইয়া সারাটা সকাল বেলা কাটাইতে হইত। কোনো রকম প্রশংসা আমার প্রাপ্য ছিল না। * * * * যাহা অসাধ্য, অসম্ভব তাহাই আমাকে করিতে বলা হইত;—উদ্দেশ্য এই, সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া যতটুকু সাধ্য ও সম্ভব ততটুকু করিতেই হইবে। * * *"

কাইজার্ বলিতেছেন:—"এই ধরণের শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে অনেকের হয়ত নানারকম মত আছে। কিন্তু যে

রাফেলের ম্যাডোনার আদর্শ

শিক্ষার মধ্যে রস নাই, আনন্দ নাই, আমার মনে হয় সে শিক্ষা মিথ্যা। * * * এই নীরস কঠোর স্পার্টান্ আদর্শবাদী শিক্ষকের হাতে পড়িয়া আমি যে কৈশোর জীবন যাপন করিয়াছি তাহা রসলেশহীন ও আনন্দবিহীন এবং সেই হেতু ব্যর্থ ও নিরর্থক।"



রাজ্যচ্যুত কাইজার্
আধুনিক প্রতিকৃতি

র‍্যাফেল "ম্যাডোনা"র আদর্শ পাইয়াছিলেন কোথায়?

আজ যদি অজন্তার "মাতা ও কন্যা", অবনীন্দ্রনাথের "মহাকাল-মন্দিরের নর্ত্তকী" কিম্বা নন্দলালের "পার্ব্বতীর" প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কোনো শিল্পসমালোচক সহসা বলিয়া বসেন যে, ইহারা শিল্পীর কল্পিত মানসমূর্ত্তি নহে, বাস্তব জীবন্ত মানবী-মূর্ত্তি হইতে ইহাদের আদর্শ পরিকল্পনা করা হইয়াছে, তাহা হইলে সেটা যে খুব বিস্ময়ের বস্তু হইবে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। কিন্তু এমন একটি আবিষ্কারের সম্ভাবনা খুব সামান্য, কারণ জীবন্ত মানব অথবা মানবীমূর্ত্তি হইতে তাঁহাদের শিল্পসৃষ্টিকে প্রাণবন্ত করিয়াছেন এমন কথা ভারতীয় শিল্পাদর্শে অনুপ্রাণিত কোনো রূপদক্ষ সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত শোনা যায় নাই।

কিন্তু য়ুরোপে এমনই একটা আবিষ্কার সহসা সকলকে বিস্ময়াভিভূত করিয়া দিয়াছে। রেঁণেসাঁস্ বা য়ুরোপের নবোদ্বোধন যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পী র‍্যাফেলের মাতৃ-মূর্ত্তি "ম্যাডোনা"কে ঘিরিয়া কত রূপ, কত রহস্য যে লীলায়িত ও রূপায়িত হইয়া আছে তাহার শেষ নাই, সীমা নাই। এই দেবীমূর্ত্তিটি শান্ত সৌন্দর্য্যে, ভঙ্গির অপূর্ব্ব রহস্যে, রূপের অদ্ভুত পরিকল্পনায় শতাব্দীর পর শতাব্দী কত নয়নকে রসে ও সৌন্দর্য্যে স্নিগ্ধ করিয়াছে, কত হৃদয়কে শ্রদ্ধায় ও ভালবাসায় অভিষিক্ত করিয়াছে।

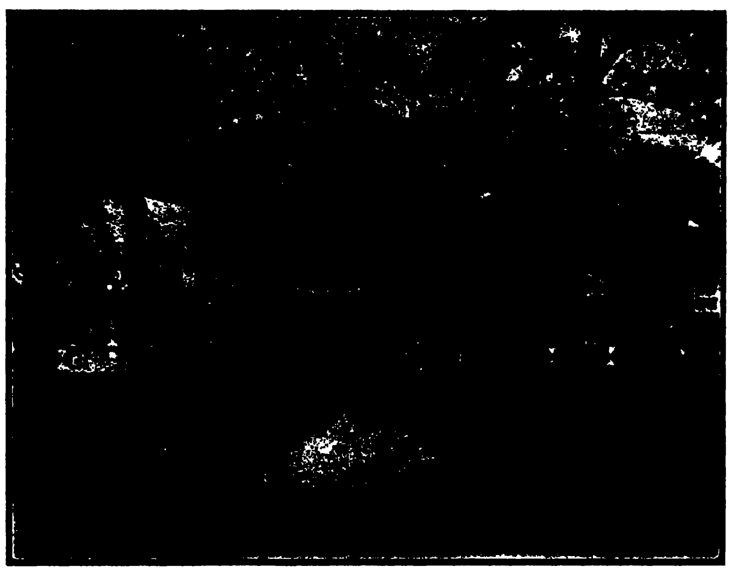
কিন্তু "ম্যাডোনার" এই মূর্ত্তি, ইহা কি র‍্যাফেলের কল্পনারই সৃষ্টি, না, ইহার কোন বাস্তব রূপ ছিল? পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, "ম্যাডোনা" র‍্যাফেলের মানস-সুন্দরী নহেন—"ম্যাডোনা" র‍্যাফেলের প্রিয়া ফরনারিণার (Fornarina) প্রতিরূপ। কিন্তু ঐ যে জানু পাতিয়া উৎসুক উর্দ্ধ দৃষ্টিতে শ্বেতশ্মশ্রুমণ্ডিত ভক্ত-শিষ্য সেণ্ট্ সিক্সটাস্ ও অপূর্ব্ব রূপসী উপাসিকা সেণ্ট্ বার্‌বারা ডাইনে ও বামে শিল্পরূপ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কে? এ রহস্য ভেদ করিবার চেষ্টা শতজনে করিয়াছেন। সম্প্রতি ড্রেস্‌ডেনের এক শিল্প-সমালোচক, ডক্টর মরিৎস্ ষ্টুবেল (Dr. Moritz Stubel) এ সম্বন্ধে এক অভিনব তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলেন, র‍্যাফেল্ ও মাইকেল্ এঞ্জেলোর যিনি ছিলেন 'মুরুব্বি', সেই পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াস্ই (Julius II) "ম্যাডোনা"র ছবিতে র‍্যাফেলের তুলিতে সেণ্ট্ সিক্সটাইনের রূপ লাভ করিয়াছেন আর সেণ্ট্ বার্‌বারার যিনি রূপাদর্শ তিনি জুলিয়াসেরই এক শিষ্যা—উরবিনো'র ডচেস্ (Duchess of Urbino)

র‍্যাফেলের এই অপূর্ব্ব চিত্রখানি এখন ড্রেস্‌ডেনের চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। ১৭২ বৎসর আগে স্যাক্‌সনীর রাজা তৃতীয় অগষ্ট্ (August III) পিয়ান্‌সেন্‌জার (Piancenza) সান্‌-সিষ্টো-মঠের (San-Sisto) ভিক্ষুদের নিকট হইতে উহা কিনিয়া লইয়া আসেন। এই চিত্রটির জন্মকথা সম্বন্ধে খুব কম তথ্যই এ পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে, কারণ নেপোলিয়ানের দিগ্বিজয়ের সময় সান্‌-সিষ্টো-মঠের সমস্তই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। র‍্যাফেলের সমসাময়িক ভ্যাসারীর রচিত আর্টের ইতিহাসে আমরা সর্ব্ব প্রথম "ম্যাডোনা"র উল্লেখ দেখিতে পাই। পিয়ান্‌সেন্‌জার মত সুদূর একটি সহরের গরীব ভিক্ষুরা কি করিয়া র‍্যাফেল্‌কে দিয়া এত বড় একটা মূল্যবান্ চিত্র অঙ্কিত করাইয়া লইতে পারিলেন, এ রহস্য এখনো উদ্ঘাটিত হয় নাই। পিয়ান্‌সেন্‌জা যে তখনকার দিনে ইটালির একটা সমৃদ্ধ সহর ছিল এবং তাহাতে যে অনেক কবি ও শিল্পী বাস করিতেন সে সম্বন্ধে অবশ্য যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

বহুবৎসর এই সুবৃহৎ চিত্রখানির কোন ক্রেতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই এবং যখন পাওয়া গেল তখন স্থান হইতে স্থানান্তরে সেখানিকে বহন করিয়া লইয়া যাওয়াও এক সুকঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। তাহাতে ছবিটির কম ক্ষতিও হয় নাই। তাহা ছাড়া মঠের মধ্যে ধূপের ধূমে ও হিম বাতাসে ছবির রংও অনেকটা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর কতজনে উহার সংস্কার করিতে গিয়া বৎসরের পর বৎসর কত রঙের তুলি চালনা করিয়াছেন, কত তেলের ছোপ্, কত বার্ণিশ যে উহার উপর পড়িয়াছে তাহার আর হিসাব নাই। ফলে, এতদিন পরে, একথা বলা শক্ত হইয়া পড়িয়াছে, ছবিখানির কতখানি র‍্যাফেলের নিজস্ব, কতটা তাঁহার শিষ্যবর্গের, কতটুকুই বা পরবর্ত্তী তথাকথিত সংস্কারক দলের। ডক্টর ষ্ট্র্যবেল্ তো বলেন যে ছবির দুই ধারের পর্দ্দা দুটি, সাদা মেঘখণ্ডগুলি এবং নীচেকার দুটি উন্মুক্ত-পক্ষ দেবশিশু র‍্যাফেলের নিজের সৃষ্টি নহে—পরবর্ত্তী সংযোজনা।

কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, ছবির দু'ধারে যে সেণ্ট্ সিক্সটাইন্ ও সেণ্ট্ বার্‌বারার মূর্ত্তি রহিয়াছে, ইঁহারা কে? ষ্ট্র্যবেল্ বলেন যে, অন্যান্য অনেক সমসাময়িক শিল্পীদের মত র‍্যাফেলের শিল্পসৃষ্টিগুলি শুধু তাঁহার মানস-মূর্ত্তিই নয়—তাহারা জীবিত ও মৃত সমসাময়িক মানবীরই রূপমূর্ত্তি এবং এই হিসাবে তিনি রেঁণাসাঁস্ যুগের চিরাচরিত প্রথাকেই মানিয়া চলিয়াছেন।

ষ্ট্র্যবেলের এ কথা যে অনুমানমাত্র নহে তাহার সমর্থনে তিনি স্যাক্‌সনীর রাজকীয় দলিল-পত্রের মধ্যে একটা চিঠি আবিষ্কার করিয়াছেন। সেই চিঠিতে পিয়ান্‌সেন্‌জা হইতে এই ছবিটি স্যাক্‌সনীতে স্থানান্তরিত করিবার প্রসঙ্গে এই কথার উল্লেখ রহিয়াছে যে, সেখানকার লোকের বিশ্বাস ছবির সেণ্ট্ সিক্সটাইন্ পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াসেরই রূপমূর্ত্তি এবং সেণ্ট্ বারবারা এই দ্বিতীয় জুলিয়াসেরই একজন



ডুর্ণের উদ্যানবাটিকা

হল্যাণ্ডে নির্ব্বাসিত কাইজারের আবাস

র‍্যাফেলের ম্যাডোনার আদর্শ

প্রিয় শিষ্য। দ্বিতীয় জুলিয়াস্ ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে পোপের সিংহাসনে আরোহন করেন এবং ১৫০৮ খৃষ্টাব্দে র‍্যাফেলকে রোমে আহ্বান্ করেন। ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। র‍্যাফেলের অনেক চিত্রে এবং মাইকেল্ এঞ্জেলোর ভাস্কর্য্যে



র‍্যাফেলের "ম্যাডোনা"

র‍্যাফেল্ কর্ত্তৃক ম্যাডোনা বা মাতৃ-মূর্ত্তি চিত্রাবলীর মধ্যে এই চিত্রখানি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ। স্যান্-সিষ্টোর মঠে রক্ষিত ছিল বলিয়া ইহা 'সিষ্টাইন ম্যাডোনা' নামে বিখ্যাত।

এই পোপ জুলিয়াস্ অমর হইয়া আছেন। "ম্যাডোনা"র ছবির সেণ্ট্ সিবাষ্টিয়ানের সহিত র‍্যাফেল্-অঙ্কিত জুলিয়াসের ছবির অতি আশ্চর্য্য রকমের মিল আছে। দুজনেরই সেই কোটরগত অক্ষিচক্ষু, চাপা ঠোঁট, উন্নত নাসিকা, এবং রুক্ষ অবিন্যস্ত কেশদাম—পোষাক ইত্যাদিও অনুরূপ। কিন্তু সেণ্ট্ বার্‌বারা কে? পোপ্ জুলিয়াস্ তাঁহার বংশের ধারা যাহাতে রক্ষা পায় সে জন্য অতিমাত্রায় ব্যস্ত ছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যেই তিনি তাঁহার বংশধর উরবিনো'র ডিউকের সঙ্গে মার্কগ্রেভ্ ফ্রান্সিস্কো গোন্‌যাগার (Markgrave Francisco Gonzaga) কন্যা লিওনোরার বিবাহ দেন। তাঁহার মত সুন্দরী, শিল্পরসিকা কন্যা য়ুরোপে তখন খুব কমই ছিলেন। এই লিওনোরাকে জুলিয়াস্ অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং লিওনোরাও জুলিয়াসের প্রতি বিশেষ ভক্তিমতী ছিলেন। ষ্ট্যুবেলের মতে "ম্যাডোনা"র সেণ্ট্ বার্‌বারা'র রূপাদর্শ এই লিওনোরা।

ষ্ট্যুবেলের পক্ষে সেণ্ট্ সিবাষ্টিয়ানের সঙ্গে পোপ্ জুলিয়াসের সাদৃশ্য খুঁজিয়া বাহির করা যতটা সহজ ছিল সেণ্ট্ বার্‌বারার সঙ্গে লিওনোরার সাদৃশ্য আবিষ্কার করা ততটা সহজ হয় নাই। সৌভাগ্যক্রমে শিল্পী টিশিয়ান্ (Titian) লিওনোরার যে কয়খানি প্রতিকৃতি আঁকিয়াছিলেন তাহার চারিখানি এখনও বিদ্যমান আছে। এই ছবি চারিখানির সহিত সেণ্ট্ বার্‌বারার মূর্ত্তির তুলনা করিয়াই ষ্ট্যুবেল্ এ কথা প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন যে র‍্যাফেলের বার্‌বারা লিওনোরারই শিল্পমূর্ত্তি।

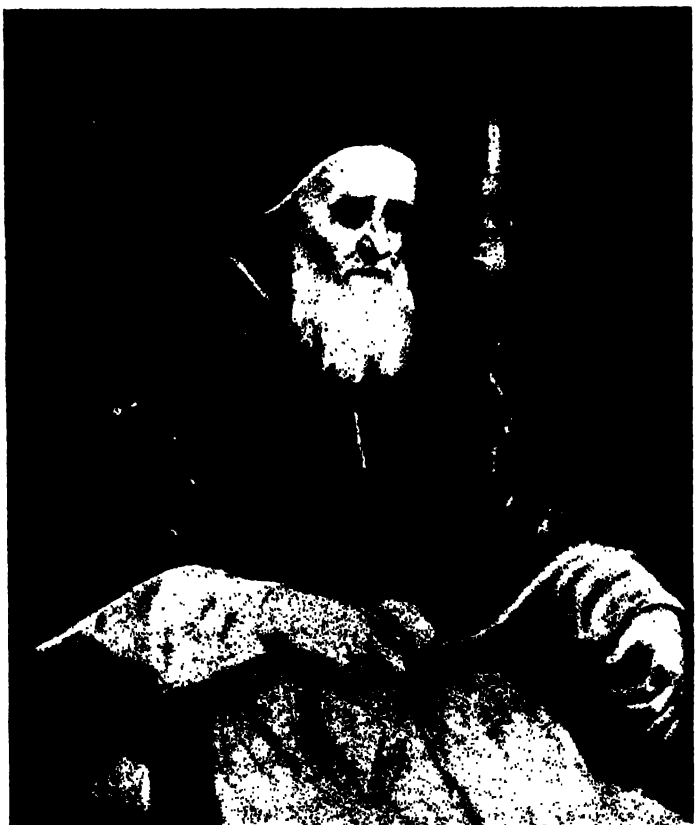
ষ্ট্যুবেলের গবেষণা শুধু এখানেই সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে নাই। র‍্যাফেল্ এই চিত্র প্রথম কি উদ্দেশ্যে আঁকিয়াছিলেন, কাহার আগ্রহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় ইহার সৃষ্টি সম্ভব ছিল, এবং পরে কি করিয়া পরবর্ত্তী শিল্পীদের হাতে উহার উদ্দেশ্য কতটা পরিবর্ত্তন লাভ করিয়াছিল, ছবিখানি প্রথম একটা রাজপ্রাসাদের নিতান্ত ঘরোয়া ছবি হইতে কি

করিয়া অবশেষে একটা ধর্ম্মমন্দিরে কোন বিশিষ্ট ধর্ম্মভাবেরই প্রতীক হইয়া উঠিয়াছিল—এ সমস্ত তথ্যই ষ্টুবেলের আলোক-বর্ত্তিকায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীনীহার রঞ্জন রায়

মুসোলিনি ও ফ্যাশিসম্‌।

প্রায় সাত বৎসর আগে ইটালিতে মুসোলিনির নেতৃত্বে ফ্যাশিষ্ট-সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়; সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত মুসোলিনি তাঁহার অসাধারণ শক্তি ও ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এই প্রচেষ্টাকে এরূপভাবে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন, যে লোকে ফ্যাশিসম্‌ বলিতে মুসোলিনিকেই বোঝে।



পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াস্‌

"র‍্যাফেল্‌-অঙ্কিত ম্যাডোনার চিত্রের বাম-পার্শ্বে নতজানু সেণ্ট সিক্সটাইনের মূর্ত্তির আদর্শ।

মুসোলিনির ব্যক্তিগত জীবন আলোচনা করিলে দেখা যায় ফ্যাশিষ্ট-সম্প্রদায় আজ যে পন্থা অনুসরণ করিতেছে এক সময়ে মুসোলিনি ছিলেন তাহার ঘোর বিরোধী। ফ্যাশিষ্ট-সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে মুসোলিনি সোস্যালিষ্টদের একজন অগ্রণী ছিলেন, যুদ্ধবিগ্রহে তাঁহার মোটেই মত ছিল না। কিন্তু তখনকার সেই শান্তিপ্রিয় সমাজতন্ত্রবাদী ব্যক্তিটি কেমন করিয়া এখনকার দুর্দ্ধর্ষ মুসোলিনিতে পরিণত হইয়াছেন তাহা জানিতে হইলে ফ্যাশিষ্ট-সম্প্রদায়ের গত সাত বৎসরের ইতিহাস জানা আবশ্যক।

ইংলণ্ডের বিখ্যাত লেখক এইচ্‌ জি ওয়েলস্‌ "নিউ ইয়র্ক-টাইমস্‌"-পত্রিকায় ফ্যাশিসম্‌ সম্বন্ধে এক প্রবন্ধে লিখিতেছেন, যে সাত বৎসর পূর্ব্বে মুসোলিনি যে-সকল মত পোষণ করিতেন তাহারই উপর ফ্যাশিসম্‌-এর প্রতিষ্ঠা হয়। তখন ফ্যাশিষ্ট-সম্প্রদায়ের লক্ষ্য ছিল গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও যুদ্ধনিবারণ; ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ছিল তাহাদের মূলমন্ত্র এবং স্বাধীনভাবে সভাসমিতি গঠনের ও মত প্রকাশের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা তাহারা অন্যায় মনে করিত। এক কথায় তখন ফ্যাশিষ্ট-সম্প্রদায়কে সোস্যালিষ্ট দলেরই একটি শাখা বলা যাইতে পারিত।

ফ্যাশিষ্ট দল অতি অল্পকালের মধ্যেই যে প্রচণ্ড শক্তিশালী হইয়া উঠিল তাহার মূল কারণ ছিল তাহাদের মতবাদ নয়—তাহাদের কার্য্যপ্রণালী। এই কার্য্য-প্রণালীর মধ্যে এমন একটা আড়ম্বর ও সৌষ্ঠবের ভাব ছিল, যে সমগ্র ইটালির যুবকগণ অতি সহজেই তাহাতে মুগ্ধ হইয়া দলে দলে ফ্যাশিষ্ট-মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে লাগিল, ফ্যাশিসম্‌-এর বাণী তাহারা নবীনের বিজয়-আহ্বান বলিয়া

মুসোলিনি ও ফ্যাশিসম্

বরণ করিয়া লইল। এ-যেন তরুণ-প্রাণের জয়যাত্রা—কি বিপুল তাহার সমারোহ!—এবং এই তরুণ-সম্প্রদায়ের পথ প্রদর্শক ও গুরু হইলেন মুসোলিনি।

কিন্তু দিনে দিনে ফ্যাশিষ্ট্-সম্প্রদায়ের দল ও শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল তাহাদের মতামতও আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে। ১৯২১ সালে যখন ইটালির শাসনভার সম্পূর্ণরূপে ফ্যাশিষ্ট্-সম্প্রদায়ের হাতে আসিল তখন আর তাহাদের পূর্ব্বেকার মতবাদের কোনো চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট রহিল না। এমন কি তাহার কথাও লোকের স্মৃতি হইতে একেবারে লোপ পাইত যদি না ষ্টারজো, নিটি প্রভৃতি দুই চারিজন ঘোর ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী স্বদেশভক্ত ক্রমাগত তাহা উল্লেখ করিয়া ফ্যাশিষ্ট্‌দলের বিরুদ্ধে জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেন। এই বিরুদ্ধ-সমালোচকগণকে লইয়া মুসোলিনিকে প্রথম প্রথম একটু বিব্রত হইতে হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার অতি সহজ উপায় তিনি অল্পদিনের মধ্যেই আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। নির্ব্বাসন, প্রাণদণ্ড, কয়েদ, গুপ্তহত্যা ও আরও নানাবিধ উপায়ে ফ্যাশিষ্ট্‌দলের শত্রুগণের মুখবন্ধ করা হইল। এই নির্য্যাতনের শোণিত-রেখা চিরকালের জন্য ফ্যাশিসম্-এর কাহিনীকে কলঙ্কিত করিয়া রাখিবে।

এই ভাবে দিনে দিনে ইটালিতে ফ্যাশিষ্ট-শক্তি দৃঢ় ও সংহত হইয়া উঠিয়াছে এবং বহু লোক আজ মুসোলিনিকে ইটালির নবজীবনদাতা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে। কিন্তু এইচ্-জি-ওয়েলস্‌এর মতে, মুসোলিনি যাহা করিয়াছেন তাহার মধ্যে আর যাহাই থাকুক, নূতনত্বের দাবী করিতে পারে এমন কিছুই নাই। রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট্‌দল, চীনের কুওমিন্‌টাঙ্ সম্প্রদায় এবং ইটালির ফ্যাশিষ্টদের ন্যায় সুগঠিত, সুনিয়ন্ত্রিত সংঘগুলি পৃথিবীর ভবিষ্যৎ ইতিহাসে যে খুবই বড় স্থান অধিকার করিবে তাহা ভাবিবার যথেষ্ট কারণ আছে কিন্তু কুওমিন্‌টাঙ্ বা কম্যুনিষ্ট্‌দলের সহিত ফ্যাশিষ্ট্‌দলের পার্থক্য আকাশ-পাতাল। কুওমিন্‌টাঙ্ বা কম্যুনিষ্ট্‌দল হইল নূতনপন্থী; তাহারা চায় পুরাতনের বন্ধন কাটাইয়া নবীনকে



আরবিনোর ডচেস্

র‍্যাফেলের ম্যাডোনার চিত্রের ডানদিকে নতজানু সেণ্ট্ বারবারার আদর্শ; ছবিখানি টিশিয়ান কর্ত্তৃক অঙ্কিত

বরণ করিয়া লইতে এবং পৃথিবীতে নববিধানের প্রতিষ্ঠা করিতে। কিন্তু ফ্যাশিষ্ট-দল ঘোর পুরাতনপন্থী—তাহাদের দৃষ্টি অতীতের উপর নিবদ্ধ। বিরুদ্ধ সমালোচনা ফ্যাশিষ্টগণের নিকট অসহ্য—অণুমাত্র সন্দেহ বা বিরাগের চিহ্ন দেখিলে তাহারা অধীর হইয়া তাহার উচ্ছেদসাধন করে। এইখানে রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট-দলের সহিত ফ্যাশিষ্ট-সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য বর্ত্তমান।

মুসোলিনিকে যে আজ সমগ্র ইটালির লোক অবতারের মতন পূজা করে তাহার কারণ ইহা নয় যে, মুসোলিনি ফ্যাশিষ্ট-দলের চিন্তাধারার প্রবর্ত্তক; তাহার কারণ এই যে, মুসোলিনি, সময় ও সুযোগ বুঝিয়া, সমগ্র ইটালির লোকের মনের কথা জোর-গলায় ব্যক্ত করিতে পারিয়াছেন। তাই তাঁহাকে আজ ইটালিয়গণ স্বদেশ-প্রেমের মূর্ত্তিমান আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু কোন দিন যদি মুসোলিনি তাঁহার স্বদেশবাসিগণের সুরে সুর মিলাইয়া কথা বলিতে না পারেন, যদি কোন দিন তাঁহার মধ্যে দেশের লোক যে আদর্শকে পূজা করিতেছে তাহাকে তিনি খর্ব্ব করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে সেই দিনই মুসোলিনির আধিপত্যের অবসান হইবে। কেননা ফ্যাশিষ্ট-সম্প্রদায় চায় শুধু একনিষ্ঠ অন্ধ পূজা—বিচার-বুদ্ধির প্রবৃত্তিকে তাহারা মহাপাপজ্ঞানে পরিহার করে।

একটি সমগ্র দেশের লোকের এইরূপ মনস্তত্ত্বের কারণ কি তাহা আলোচনা করিতে হইলে সেই দেশের শিক্ষা-প্রণালীর অবস্থা ভাল করিয়া বুঝা দরকার। কুশিক্ষার ফলেই হোক্ বা যথেষ্ট শিক্ষার অভাবেই হোক্, যাহাদের লইয়া ফ্যাশিষ্ট-সম্প্রদায় গঠিত, সেই ইটালির যুবকদল, অত্যধিকমাত্রায় কল্পনাবিলাসী ও ভাবপ্রবণ হইবার জন্যই ফ্যাশিষ্ট্-প্রচেষ্টার গড্ডলিকা-প্রবাহ সম্ভবপর হইয়াছে। সমগ্র ইটালি আজ ফ্যাশিষ্ট্-আদর্শের উত্তেজনায় একেবারে মাতিয়া উঠিয়াছে—ইহার মধ্যে ভাল ও মন্দের পরিমাণ যাচাই করিয়া দেখিবার অবসর ও প্রবৃত্তি কাহারও নাই।



অশ্বপৃষ্ঠে মুসোলিনি
ফ্যাশিষ্ট্-বাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ করিতেছেন

কিন্তু ফ্যাশিসম্ যে নিছক মন্দ এমন কথা এইচ্-জি-ওয়েলস্ মনে করেন না। ফ্যাশিষ্টগণ যথার্থই সাহসী ও

মুসোলিনি ও ফ্যাশিসম্

আদর্শনিষ্ঠ ; স্বদেশকে তাহারা প্রাণ ভরিয়া ভালবাসে ; এবং যে নেতাকে তাহারা অনুসরণ করে তাহাদের প্রতি অদ্ভুত অনুরাগ ও ভক্তি। স্বদেশের আহ্বানে, নেতার আদেশে তাহারা দুস্কর ব্রত সাধন করিয়াছে, প্রাণ পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিয়াছে। ত্যাগের আদর্শে তাহারা অনুপ্রাণিত, কিন্তু দৃষ্টি তাহাদের সঙ্কীর্ণ, নিজেদের মতবাদের প্রতিষ্ঠার জন্য তাহারা কোন অন্যায় বা অত্যাচারে পশ্চাৎপদ নয়, নরহত্যা তাহাদিগের নিকট খেলামাত্র। ভিতরে ভিতরে তাহাদের এই অনাচার-দুর্নীতি সমগ্র ইটালির প্রাণকে রুদ্ধশ্বাস করিয়া মারিতেছে। ফলে স্বাধীন-প্রাণের বা প্রয়াসের প্রচেষ্টা আজ ইটালিতে বন্ধ। নিশীথ-দুঃস্বপ্নের মত ফ্যাশিসম্ ইটালির বুকের উপর এমন চাপিয়া বসিয়াছে যে ফ্যাশিসম্‌এর পতন হইলে তাহার পরিবর্ত্তে আর অন্য কোনও শাসন প্রণালী সহজে সেখানে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না। সমগ্র দেশের মেরুদণ্ড ফ্যাশিসম্ একেবারে ভাঙিয়া দিয়াছে।

ক্রমশই বৃদ্ধিলাভ করিতেছে কিন্তু তাহাদের আহার্য্য-সংগ্রহের কোনই উপযুক্ত ব্যবস্থা নাই। এই ভাবে কিছু দিন চলিলে ইটালিকে বিদেশী ও স্বদেশী বণিকগণের একেবারে পদানত হইয়া পড়িতে হইবে এবং দেশের মধ্যেও দারিদ্র্য ও অসন্তোষ ক্রমশঃই বাড়িয়া উঠিবে—এবং শেষে এমন একদিন আসিবে যখন, দেশব্যাপী অশান্তির আগুনে কিম্বা বহিঃশত্রুর আক্রমণে, ফ্যাশিসম্ এর সমস্ত প্রতাপ ছারখার হইয়া উড়িয়া যাইবে। ফ্যাশিসম্-এর বিপুল দর্প ও আড়ম্বরের তলে তলে এই সর্ব্বনাশী পরিণামের সূচনা আজও স্পষ্ট বুঝা যায়।

কিন্তু অন্যান্য দেশের উপর ইটালির প্রভাব তাই বলিয়া কখনই লোপ পাইবে না—কেননা ইটালি বলিতে তো শুধু নানা গিরিনদীসম্বলিত ফ্যাশিষ্ট-অত্যাচার জর্জ্জরিত একটি বিপুল ভূখণ্ড বুঝায় না। ফ্যাশিষ্টদের দ্বারা বিতাড়িত ও নির্ব্বাসিত ইটালির শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ আজ পৃথিবীর নানা



ফ্যাশিষ্ট-বাহিনী দক্ষিণ বাহু উত্তোলন করিয়া মুসোলিনিকে অভিবাদন করিতেছে

কিন্তু ফ্যাশিসম্ আজ, ওয়েলস্‌এর মতে, ধ্বংসের মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। য়ুরোপের অন্যান্য সমস্ত দেশের সহিত নানাসূত্রে ফ্যাশিষ্ট-মদমত্ত ইটালির কলহ ঘনাইয়া উঠিতেছে। কিন্তু এই সকল দেশের সহিত যুদ্ধ বাধিলে ইটালির অবস্থা শোচনীয় হইবে ; কেননা তাহার না আছে কয়লা, না আছে ইস্পাত বা রাসায়নিক শ্রমশিল্প এবং বিদেশীর সাহায্য ভিন্ন কোনো শিল্পবাণিজ্য গড়িয়া তুলিবার মতো সম্বলও তাহার নাই। এদিকে তাহার জনসংখ্যা

দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন ও তাঁহাদের চিন্তা ও ভাবসম্পদে সমগ্র পৃথিবীকে ঐশ্বর্য্যশালী করিতেছেন ; একদিন তাঁহারা শুধু ইটালিরই বরপুত্র ছিলেন, আজ তাঁহারা সমগ্র পৃথিবীর, সমগ্র মানবের আপন হইয়াছেন। ফ্যাশিসম্ লোপ পাইলেও তাঁহাদের প্রতিভার আলোক নির্ব্বাপিত হইবে না এবং সমগ্র জগতের পক্ষে তাহাই হইবে ইটালির শ্রেষ্ঠ দান।

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

সঙ্কলন

রবীন্দ্রনাথ

গত মে-মাসের "মডার্ণ রিভিয়ু" পত্রিকায় "লীডার", "ট্রিবিউন" ও "করাচী টাইমস্‌" প্রভৃতি সংবাদপত্রের ভূতপূর্ব্ব সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক, সাহিত্যরসিক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় বঙ্গের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ মনীষীর স্মৃতিচিত্র আঁকিয়াছেন। সেই সকল চিত্র হইতে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের যুবা-বয়সের চিত্রটি নিম্নে প্রদত্ত হইল। নগেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :—

রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন বিশ বৎসর তখন তাঁহার সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎলাভ হয়। রবীন্দ্রনাথের আধুনিক আকৃতি পৃথিবীশুদ্ধ লোকের নিকট আজ পরিচিত। তখন ছিল তাঁহার সুদীর্ঘ দেহযষ্টি এবং সুস্পষ্ট (finely chiselled) অঙ্গ-সৌষ্ঠব, অংসচুম্বী নিবিড় কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদাম ও অনায়ত শ্মশ্রু।

তিনি বিলাতে হেনরী মর্লীর ছাত্র ছিলেন। মর্লী রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী গদ্য রচনার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু, ইংরেজী সাহিত্যে বহুশ্রুত হইয়াও, বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া অনেক দিন পর্যান্ত ইংরেজী রচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই—বাংলা সাহিত্যের সেবাতেই সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার "সন্ধ্যাসঙ্গীত" ও "প্রভাত-সঙ্গীত" নামক দুখানি গীতি-কাব্যগ্রন্থ এই সময়েই প্রথম প্রকাশিত হয়। "ভারতী"র সম্পাদকীয় কর্ত্তব্য তিনিই করিতেন, যদিও তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর দ্বিজেন্দ্রনাথের নামেই পত্রিকাখানি তখন সম্পাদিত হইত।

স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যখন কারাবাস হইতে মুক্তিলাভ করেন তখন তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীটের তখনকার ফ্রি-চার্চ্চ কলেজ-গৃহে এক সভা আহূত হয়। সেই সভায় স্বনামধন্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন; আশুতোষ তখন প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র। বক্তৃতাদির পর, একটি গান গাহিবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে সকলে ধরিয়া বসিল; রবীন্দ্রনাথ গান করিলেন। তখন কে ভাবিতে পারিয়াছিল যে এই তরুণ গায়ক উত্তরকালে পৃথিবীর সর্ব্বত্র রাজোচিত সম্মান লাভ করিবেন?

আমাদের একটি সাহিত্য-সভা ছিল; উহার বৈঠক বন্ধুদের গৃহেই বসিত। অক্রুর দত্ত ষ্ট্রীটের যে বাড়ীতে "সাবিত্রী লাইব্রেরী" ছিল, সেই বাড়ীতে একদিন এবং রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে একদিন সমিতির বৈঠক হইত। এই সকল বৈঠকে সাহিত্যালোচনায় আমাদের মধ্যে তর্কের তুফান ছুটিত। অন্তরের কিন্তু দেবতাটি অনাহূত হইতেন না; প্রচুর জলযোগের ব্যবস্থাও হইত।

রবীন্দ্রনাথ দানে মুক্তহস্ত ছিলেন। এই সময়ে তাঁহার নিজস্ব কোন আয় ছিল না; পিতার নিকট হইতে মাসহারা স্বরূপ যাহা-কিছু পাইতেন। তবু, কোন ব্যক্তিকে সাহায্যের জন্য তাঁহার কাছে আসিয়া কখনও বিমুখ হইয়া ফিরিয়া যাইতে দেখি নাই।

কঠোর নিয়ম-সংযমের মধ্যে মানুষ হওয়ার ফলে, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কোন প্রকার উদ্দামতা কখনও প্রশ্রয় পায় নাই। মিতাচারে তিনি স্পার্টান্‌, আজীবন স্বল্পাহারী এবং তামাক-তাম্বুল পর্য্যন্ত তিনি কখনও স্পর্শ করেন নাই। কিছুদিন তিনি জামা গায়ে দিতেন না; অনেক সময় শুধু ধুতি ও লংক্লথের চাদর পরিয়াই আমাদের বাড়ী আসিতেন। ইংরেজী জুতা কখনও তিনি পরিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না; বেশী সময়ই চটিজুতা পায় দিতেন। এই চটিজুতা যত বেশী অদ্ভুত রকমের হইত, তত বেশী তাঁহার পছন্দ হইত।

কিন্তু একবার মাত্র বোহেমিয়ানসুলভ উদ্দামতা তাঁহাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়া কলিকাতা হইতে পেশোয়ার পর্য্যন্ত সমস্ত রাস্তা হাঁটিয়া যাইবার এক খেয়াল রবীন্দ্রনাথকে পাইয়া বসিল। তখন তাঁহার কি উত্তেজনা ও ঐকান্তিকতা দেখিয়াছি! কল্পনাটি অবশ্য কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথের রসিকতা তাঁহার সাহিত্যেই সুস্পষ্ট। কিন্তু, একটি হাসির কথা তিনি প্রায়ই বলিতেন। রবীন্দ্রনাথ কোন গ্রন্থকারের তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন; কিছুকাল পর এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে অতিশয় গাম্ভীর্য্যসহকারে বলিল, "মশাই,

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গ্রাজুয়েট্ আপনার সমালোচনার তীব্র প্রতিবাদ লিখ্ছেন," রবীন্দ্রনাথ তো গ্রাজুয়েট বা আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট্ কিছুই ন'ন, সুতরাং, লোকটি ভাবিয়াছিল কথাটা কবির মনে ত্রাসের সঞ্চার করিবে। রবীন্দ্রনাথ এই গল্পটি বড় রসের সঙ্গে বলিতেন।

আমি রবীন্দ্রনাথের বিবাহে উপস্থিত ছিলাম। নিমন্ত্রণ-পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন :—"আমার পরম আত্মীয় শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভ বিবাহ হইবে।" —"র"

ভারতীয় শিল্প

গত এপ্রিল মাসের "বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি" (ত্রৈমাসিকী) পত্রে শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সেন "দি প্রব্লেম্ অব্ ইণ্ডিয়ান্ আর্ট" (ভারতীয় শিল্পের সমস্যা) শীর্ষক এক সুচিন্তিত ও সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ভারতীয় শিল্পের আলোচনায় পাশ্চাত্য সমালোচকগণ ভারতের প্রাকৃতিক আবেষ্টন, তাহার সাহিত্য, বহুশাখায় বিভক্ত দর্শনশাস্ত্র, ধর্ম্মভাব ইত্যাদির বিচার না করিয়া, কেবলমাত্র কোন বিশেষ যুগের শিল্পনমুনা দেখিয়াই মতবাদ করিয়া থাকেন। ভারতীয় শিল্পবিষয়ে পাশ্চাত্য সমালোচকগণের নিন্দা বা প্রশংসার এই জন্য বিশেষ মূল্য নাই; কেননা, কোন শিল্পের মূল ভাবটি (Spirit) কি তাহা ধরিতে হইলে তাহাকে তাহার আবেষ্টনের (environment) সহিত মিলাইয়া বিচার করা দরকার। নতুবা, আসল সত্যটি চক্ষুর অগোচরেই থাকিয়া যাইবে। যামিনীবাবু তাঁহার সুদীর্ঘ প্রবন্ধে এই তথ্যটি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার পর, উপসংহারে ভারতীয় শিল্পের বিশেষত্ব ও মূল উদ্দেশ্যটি কি তাহা বুঝাইতে গিয়া তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহার সারমর্ম্ম এই :—

যে কোন আর্টের বিচার করিতে হইলে, ইহার অভিব্যঞ্জনার জীব গতিটির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে, ইহার লক্ষ্যটি কি তাহা ধরিতে হইবে। গ্রীক্ আর্টের বিচার করিতে হইলে রাগদ্বেষাদি রসের ব্যঞ্জনায় ইহা কতদূর সার্থকতা লাভ করিয়াছে তাহা দেখিলে চলিবে না। গ্রীক্ শিল্পীরা বাহ্য অঙ্গসৌষ্ঠবের অভিব্যঞ্জনাতেই সিদ্ধহস্ত; কিন্তু তাঁহারা মুখমণ্ডলের ভাবকে অঙ্গভঙ্গিমার সহিত সুসমঞ্জস করিয়া তুলিতে পারেন নাই। মুখমণ্ডলকে শরীরের একটা অংশমাত্র মনে করেন; পরন্তু অঙ্গভঙ্গিমার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া মুখে যে অন্তরের কোন বিশেষ ভাবকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে ইহা তাঁহাদের খেয়ালেই আসে নাই।

কিন্তু, ভারতীয় শিল্পের শতধারার মধ্যে একটি সাধারণ গুণ দেখা যায় এই যে, ইহা রস বা ভাবপ্রধান; সকল রসসমূহের মধ্যে প্রধান রসটির দ্যোতনই হইল ইহার চরম লক্ষ্য। বাহ্য অঙ্গসৌষ্ঠবের প্রতি ইহার লক্ষ্য খুব কম। আর সঙ্গীত-নাট্যাদি ভারতের অন্যান্য ললিত-কলারও এই একই লক্ষ্য; অর্থাৎ কোন বিশেষ রস বা ভাবকে ব্যক্ত করিয়া তোলাই এই সকল কলার প্রধান লক্ষ্য এবং এই তত্ত্বটিকে ভিত্তি করিয়াই ভারতীয় শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বোধ হয় ইহাই মনে হয় যে, ভারতীয় শিল্প, পাশ্চাত্য শিল্পের গতি কোন্ দিকে তাহা যেন বহু পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়া, আপনার স্বধর্ম্মানুগত পথটি বাছিয়া লইয়াছে। পাশ্চাত্য শিল্প ভারতকে যেন বলিয়াছিল, "মানবের জটিল ও সূক্ষ্ম ভাবসমূহকে পাথরের মধ্যে মূর্ত্তিদান করিতে পারা যায় না।" ভারত যেন পূর্ব্ব হইতেই পাশ্চাত্যের এই ভাবটি ধরিতে পারিয়া বলিয়া উঠিল, "না, ভাবকেও পাথরের মধ্যে রূপ-দান করিতে পারা যায়।" বস্তুতঃ ভারতের অসংখ্য হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্ত্তি ঘনীভূত ভাবের প্রকাশ বাহ্যমূর্ত্তি ছাড়া কিছুই নহে। ইহাই তো ভারতের পক্ষে স্বাভাবিক; কেননা, ভারতই মনস্তত্ত্বের আদিগুরু। এই যে সৃজনীশক্তির অনুপ্রেরণা (creative impulse), ইহাই ভারতীয় শিল্পকে পাশ্চাত্য শিল্প হইতে পৃথক করিয়া দিয়াছে। পাশ্চাত্য শিল্প প্রকৃতির অনুকরণ মাত্র; ইহাকে এক প্রকার "মুদ্রণকলাও" (art of impression) বলা যাইতে পারে; অর্থাৎ বাহির হইতে শিল্পীর মনে যে ছাপটি পড়ে, তাহারই প্রকাশের প্রয়াসে পাশ্চাত্য শিল্পের সৃষ্টি। কিন্তু ভারতীয় শিল্প শিল্পীর মনে স্বয়ম্ভূত ভাবের বহিঃপ্রকাশের প্রয়াসে উদ্ভূত। ইহা ধ্যানলব্ধ ভাবের মূর্ত্তিদান। ইহাই ভারতীয় শিল্পের বিশেষত্ব। ভারতীয় শিল্প হইল "art of expression"।

—"র"

রমঁ্যা রলঁ্যা।

সুবিখ্যাত "মডার্ণ রিভিয়ু" ও "প্রবাসীর" শ্রদ্ধেয় সম্পাদক, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, লীগ্ অব্ নেশন্‌স বা জাতিসঙ্ঘের বিগত অধিবেশনে আমন্ত্রিত হইয়া সম্প্রতি জেনেভাতে গিয়াছিলেন, এ সংবাদ সংবাদপত্র-পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। জেনেভাতে অবস্থানকালে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সেখান হইতে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে ভিল্‌নভ্ নামক স্থানে আধুনিক য়ুরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী ও সাহিত্যস্রষ্টা রমঁ্যা রলঁ্যার সহিত দেখা করিতে যান। রামানন্দবাবুর সঙ্গে তাঁহার কয়েকজন বন্ধুও ছিলেন। এই সাক্ষাৎকারের একটি মনোজ্ঞ বর্ণনা জ্যৈষ্ঠের "প্রবাসী"তে প্রকাশিত হইয়াছে। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিতেছেন :—

"রম্যাঁ রলাঁ......ভিলা অল্গা নামক ভবনে তাঁহার পিতা ও ভগিনীর সহিত বাস করেন। ভিল্‌নভ্‌ ষ্টেশনে নামিয়া কিছুদূর হাঁটিয়া ভিলা অল্গা পৌঁছিতে হয়। ভিলা অল্গার অব্যবহিত নিকটের রাস্তাটির দুদিকে এমন ঘনপত্রাবলীবিশিষ্ট দুই সারি ছায়াতরু আছে যে, রোদ ত দূরে থাক্‌, অল্প বৃষ্টি হইলে তাহাও বোধ করি গায়ে লাগে না। রম্যাঁ রলাঁ ও তাঁহার ভগিনী শ্রীমতী মাদ্‌লিন্‌ আমাদিগকে তাঁহাদের বাগানে বসাইলেন। আমার জামাতা শ্রীমান্‌ কালিদাস নাগের নিকট হইতে তাঁহারা আমার নাম শুনিয়াছিলেন। কালিদাস ফ্রান্সে অধ্যয়ন করিবার সময় রলাঁ মহাশয়কে মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধীয় পুস্তক রচনায় কিছু সাহায্য করিয়াছিলেন। এই সূত্রে রলাঁ-পরিবারের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হয়। রলাঁর বয়স ষাটের উপর। তখন অল্পদিন আগে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা হইতে সবে আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন। এইজন্য স্বাস্থ্য ভাল দেখাইতেছিল না। তাঁহার চক্ষু সুনীল ও প্রতিভায় সমুজ্জ্বল। মুখে দাম্ভিকতা বা তদ্রূপ কিছুর লেশমাত্র নাই। তিনি ইংরেজী বলেন না, তাঁহার ভগিনী বলেন। তাঁহার সহিত অল্প যাহা কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা শ্রীমতী মাদ্‌লিনের মধ্যবর্ত্তিতায়। তাঁহাদের অধ্যয়ন-কক্ষের টেবিলে শ্রীমান্‌ কালিদাস ও শ্রীমতী শান্তার ফটোগ্রাফ দেখিয়া আমি আহ্লাদ প্রকাশ করায় শ্রীমতী মাদ্‌লিন্‌ হাসিয়া বলিলেন, 'আপনাকে দেখাইবার জন্য উহা ওখানে রাখা হয় নাই; উহা এমনিই সব সময় টেবিলের উপর থাকে।' রম্যাঁ রলাঁর বৃদ্ধ পিতা ভারতবর্ষের লোক আসিয়াছে শুনিয়া বাহির হইয়া আসিলেন ও আমাদের সহিত করকম্পন করিলেন। তাঁহার বয়স নব্বই পার হইয়াছে। সেরূপ বয়সের পক্ষে তিনি এখনও বেশ সোজা ও শক্ত আছেন। তাঁহার সাক্ষাৎ-লাভ যে আনন্দ ও সম্মানের বিষয়, তাহা তাঁহাকে ইংরেজীতে জানাইলাম। তাঁহার কন্যা তাঁহাকে তাহা ফরাসীভাষায় বলিলে তিনিও আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন।

"রম্যাঁ রলাঁর গ্রন্থাবলীর ভারতবর্ষে কিরূপ প্রচার, সে-বিষয়ে কথা উঠিলে আমি বলিলাম, ভারতবর্ষে ফ্রেঞ্চ বেশী লোক জানে না, এই জন্য জ্যাঁ ক্রিস্তফ্‌ (জন্‌ ক্রিষ্টোফার) প্রভৃতি বহির ইংরেজী অনুবাদ ইংরেজী-জানা অনেক লোকে পড়ে। মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধীয় তাঁহার ফ্রেঞ্চ বহির যে ইংরেজী অনুবাদ ভারতবর্ষে বাহির হইয়াছে, তাহারও কয়েকটা সংস্করণ হইয়াছে। তাহার পর বোধ হয় আমি বলিলাম, জ্যাঁ ক্রিস্তফের বাংলা অনুবাদও ক্রমশঃ বাহির হইতেছে। তখন শ্রীমতী মাদ্‌লিন্‌ বলিলেন, 'হাঁ, উহা 'কল্লোলে' বাহির হইতেছে বটে।' তাহাতে আমাদের দলের একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কি বাংলা জানেন? কেমন করিয়া শিখিলেন?' তিনি বলিলেন, 'অল্পস্বল্প জানি, কালিদাস কিছু শিখাইয়াছিলেন।" রবীন্দ্রনাথের ইটালী-ভ্রমণ সম্বন্ধে কথা উঠিলে, আমরা জানিতে পারিলাম, তথায় দার্শনিক ক্রোচের সহিত রবীন্দ্রনাথের যাহাতে সাক্ষাৎকার না হয়, তাহার জন্য কিরূপ চেষ্টা হইয়াছিল এবং কি প্রকারে সে চেষ্টা ব্যর্থও হইয়াছিল। ক্রোচে মুসোলিনীর দলের লোক নহেন বলিয়া এই চেষ্টা হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার সঙ্গীরা যখন ভিল্‌নভে হোটেল-ডি-বায়রনে ছিলেন, তখন তাঁহাদের যে ফটোগ্রাফ তোলা হইয়াছিল, শ্রীমতী মাদ্‌লিন্‌ আমাদিগকে তাহা দেখাইলেন। আমরা অবগত হইলাম, রলাঁ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রীকান্ত উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদের ইটালীয় অনুবাদ পড়িয়াছেন। তিনি বলিলেন, 'শরৎচন্দ্র একজন প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক,' এবং জিজ্ঞাসিলেন, তিনি আর কি কি বহি লিখিয়াছেন। আমি বলিলাম। জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের বৈজ্ঞানিক কার্য্যের কথা উঠিলে রলাঁ বলিলেন, তাঁহার কবি-জনোচিত কল্পনা-শক্তিও আছে। তাহাতে আমাদের দলের এক জন এই মর্ম্মের কথা বলিলেন যে, ভারতবর্ষে কবি-প্রতিভা, দার্শনিক প্রতিভা, বৈজ্ঞানিক প্রতিভা প্রভৃতির কার্য্য আলাদা আলাদা করিয়া সম্বন্ধবিহীন ভাবে দেখা হয় না; সমুদয়ের সমন্বয় সাধন করিয়া জাগতিক সকল বিষয়ের একটা সামঞ্জস্যীভূত ধারণা করাই ভারতবর্ষের আদর্শ ও লক্ষ্য। তখন রলাঁ জিজ্ঞাসা করিলেন, এই আদর্শানুযায়ী পুস্তক কোন ভারতীয় লিখিয়াছেন কি? আমি বলিলাম আমি ত জানি না। তিনি জানিতে চাহিলেন, তেমন উপযুক্ত লোক কেহ আছেন? আমি আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের নাম করিলাম। রলাঁ জানিতে চাহিলেন, তিনি এখনও কেন লেখেন নাই। অবশ্য এরূপ প্রশ্নের উত্তর শীল মহাশয়ই দিতে পারেন। আমি কেবল বলিলাম, হয়ত তিনি নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান, অথবা হয়ত তিনি মনে করেন ইহার জন্য এখনও তিনি প্রস্তুত হইতে পারেন নাই, কিম্বা ক্রমাগত নূতন অধ্যয়ন ও চিন্তা দ্বারা তাঁহার ধারণা অল্পস্বল্প পরিবর্ত্তিত হইতেছে, ইত্যাদি।"

রবিবাবুর গান

লক্ষ্ণৌ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ধূর্জ্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বৈশাখের "বঙ্গবাণীতে" 'সঙ্গীতের কথা' প্রসঙ্গে রবিবাবুর গান সম্বন্ধে আপনার রসগ্রাহিতা ও সমঝদারিতার পরিচয় দিয়াছেন।

রবিবাবুর গান

আজকাল অনেকের মুখে শোনা যায়—

"আমরা রবিবাবুর গান, বিশেষতঃ তাঁর পুরাতন গান, এই যেমন—'যামিনী না যেতে' 'অলি বারবার ফিরে আসে' 'সত্যমঙ্গল প্রেমময় তুমি'—অত্যন্ত ভালবাসি, অতুলপ্রসাদের সব গানই আমাদের প্রাণস্পর্শী ; কিন্তু রবিবাবুর অনেক গান, বিশেষতঃ তাঁর নোবেল প্রাইজ পাবার পর রচিত গানগুলি আমাদের মোটেই ভাল লাগে না, তার চেয়ে থিয়েটারের গান ভাল লাগে, রজনী সেনের গান ভাল লাগে।"

ধূর্জ্জটীবাবু তাঁহাদের বুঝাইয়া বলিতেছেন—

"রবিবাবুর গানে তিন চারিটি স্তর আছে। প্রথম ব্রহ্ম-সঙ্গীতের যুগ, তখন যদু ভট্ট, রাধিকা বাবুর মুখে ভাল ধ্রুপদ, খেয়াল শুনে হিন্দুস্থানী কথার বদলে বাংলা কথা বসানই তাঁর কাজ ছিল। যেমন 'সতবার আলো নিভাতে চাই,' 'মন্দিরে মম কে' গানগুলি হিন্দুস্থানী সুরের তর্জ্জমা। দ্বিতীয় যুগে তিনি কথায় ভাল ভাল সুর বসাচ্ছেন, যেমন 'ঝর ঝর বরিষে বারি ধারা,' 'রিম্‌, ঝিম্‌, ঘন ঘনরে' প্রভৃতি গান ; তখন তিনি হিন্দুস্থানী সুরের কাঠামোটি বজায় রেখে experiment কোরছেন, সুরগুলি মিশ্র হয়ে যাচ্ছে ; এই সময়ের গানগুলি সকলেরই ভাল লাগে। তৃতীয় যুগে তিনি সঙ্গীত রচনা কোরলেন। এই সময় আপনাদের মতে বেখাপ্পা মিশ্র জংলা সুর তৈরী হল, বাহারের সঙ্গে মল্লার মিশ্‌ল, ভৈরবীর সঙ্গে খাম্বাজ, বেহাগের সঙ্গে কেদারা মিশ্‌ল। এর পরের যুগ এখনও চল্‌ছে,—সেটি বাউল কীর্ত্তনের যুগ। এর প্রথম স্তরে শুধু বাউল ও দ্বিতীয় স্তরে মুসলমানী কাঠামোর ভিতর বাউলের প্রাণ প্রতিষ্ঠান। এই যুগে একেবারে নতুন সৃষ্টি! মিশ্রণকে আপনারা যদি পাপ বিবেচনা না করেন, অর্থাৎ ইতিহাসকে যদি খাতির করেন, তা হলে এই শেষ যুগের সঙ্গীতকে শ্রদ্ধা সহকারে গ্রহণ কোরতেই হবে। মিশ্রণই হচ্ছে সঙ্গীতের ধারা, কেননা—Genius compresses the accomplishment of years into an hour glass.

"রবিবাবুর সঙ্গীতের কৃতিত্ব এ নয় যে, সে সঙ্গীতে দরদ আছে, দরদ দেখাবেন গায়ক। তিনি স্বরের মালা গেঁথে সুর সৃষ্টি কোরবেন। সুর সৃষ্টির তরফে তাঁর বিপক্ষে আপত্তি এই যে, তিনি সুরকে বিকৃত কোরছেন বাদী স্বরকে না শ্রদ্ধা কোরে, অনুবাদীকে বাদী কোরে এবং বিবাদী স্বরকে প্রকট কোরে, এই যেমন ভৈরবীতে তিনি শুদ্ধ 'রে' ও কোমল 'রে' দুইই ব্যবহার করেন, কোমল গান্ধার, শুদ্ধ গান্ধার, কোমল ও শুদ্ধ ধৈবত, কোমল ও শুদ্ধ নিখাদ সবই লাগান। এতে আপত্তি কি? ঠুংরীতে সবই লাগে, অনেক ওস্তাদও তানের সময় সব কার্‌বাই করে থাকেন। ও আপত্তি হচ্ছে begging the question মাত্র। রবিবাবু ভৈরবীতে ঐ সব বেপর্দা ব্যবহার কোর্‌ছেন বল্‌বার কি অধিকার আছে আপনাদের? তিনি কি গানের মাথায় স্বাক্ষর কোরে লিখে দিয়েছেন 'ভৈরবী'? আর যদি দিতেনও, তা হলে প্রমাণ হত যে তিনি সুরের নাম জানেন না। সে ভুলে কি ক্ষতি হত? তবে যদি আপনারা বলেন, 'ঐ সুরে ভৈরবীর ছায়া রয়েছে, অতএব ভৈরবীর কায়াকে প্রত্যাশা করছিলাম,' তার উত্তর আমি দেব—'আমাদের অনেক সুরেই অন্য সুরের ছায়া পড়ে। মেঘমঞ্জরী শুনেছেন? বুঝ্‌তেই পারবেন না, ললিত, কি বসন্ত, কি বাঙ্গালী। আপনারা কোরবেন ভুল প্রত্যাশা, আর সেটি না পূরণ হলেই আর্টিষ্টের ঘাড়ে দোষ চাপাবেন। পরিচিত কিম্বা প্রত্যাশিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দেওয়া দূতীর কায হতে পারে, আর্টিষ্টের নয়। গানে Realism হয় না ; যদি হত, তা হলে পাখীর ডাক এবং সমুদ্র-গর্জ্জনের অনুকরণই শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত হত। রবিবাবুর গানের বিপক্ষে সুর হিসাবে দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, তিনি সঞ্চারীতে Surprise note বসান, যেটি এমন একটি সুরের বাদী কিম্বা অনুবাদী স্বর যার সঙ্গে অস্থায়ীর সুরের মিল খায় না।—এই যেমন—'একলা ঘরে বসে বসে কি সুর বাজালে' গানটির কেদারা সুর, হঠাৎ দ্বিতীয় পদে তিনি বাউল এনে ফেল্লেন। 'তুমি কোন পথে যে এলে' গানটি বাউল, হঠাৎ আভোগীতে কোমল ধৈবত এল। 'কবে তুমি আসবে' গানটিও বাউল ; 'শুকনো ফুলের পাতা ছুটি পড়্‌ছেছে খসে' লাইনটিতে পঞ্চম ও কোমল ধৈবতের মজা রয়েছে, তারপর 'আ---আ---র সময় নাহিরে' লাইনটি বাউল রইল না, হয়ে গেল কালাংড়া কিম্বা রামকেলী, অর্থাৎ ভৈরোঁর মা পা দা, মা গা মা পা দা পা। কি মজা হল ভাবুন দেখি! 'ধীরে বন্ধু ধীরে' গানটিতে প্রায় ১২টি স্বরই লাগছে। ওস্তাদের ভাষায় সুরটি মুলতান ও টোড়ী মেশান, মুলতানের কোমল রে, কোমল গান্ধার, তীব্র মধ্যম, কোমল ধৈবত, তার ওপর আবার টোড়ীর কোমল নিখাদ। শুদ্ধ টোড়ীর সঙ্গে মালকোষ কিম্বা ললিতের শুদ্ধ মধ্যম মিশিয়ে যদি বিলাসখানী টোড়ী হয়, তা হলে 'ধীরে বন্ধু ধীরে' কেন ঠাকুরী টোড়ী হবে না? আমার স্থির বিশ্বাস যে, কবি এমন কোন সুরের সঙ্গে এমন কোনো প্রতিকূল অর্থাৎ বেখাপ্পা সুর মেশাননি, যার ফলে সঙ্গীত অশ্রাব্য হয়ে উঠেছে। বেহাগের সঙ্গে কেদারা খাপ খায়, কেননা দুই সুরেই শুদ্ধ এবং তীব্র মধ্যমের কায রয়েছে এবং বাকী স্বরগুলি বিকৃত নয়। মুলতানের সঙ্গে টোড়ীর মিল খুবই রয়েছে—তফাৎ আরোহী, অবরোহীতে এবং কোমল নিখাদে। গাইবার সময়, অবরোহীতে শাস্ত্রমত শুদ্ধ নিখাদ থেকে কোমল ধৈবতে নাম্‌বার সময়, বড় বড় ওস্তাদও মুলতানে এমন একটি নিখাদ ব্যবহার করেন যেটি না শুদ্ধ না কোমল। ওস্তাদে সব কার্‌বাই কোরে থাকেন—তাঁদের সাতখুন মাপ,—কেননা তাঁরা বিশ বছর ধরে সার্গমই সেধেছেন! রবিবাবু ওস্তাদ নন, কিন্তু কবি ও আর্টিষ্ট.

অনেক ভাল গাইয়ে বাজিয়ের কাছে কান সজাগ রেখেই গান-বাজনা শুনেছেন, এবং গান বাজনা সত্যই ভালবাসেন বোধ হয় স্বীকার কোরবেন। তিনি যে ইমনের সঙ্গে ভৈরবী মিশিয়ে, কিম্বা পর পর শুদ্ধ ও কোমল পর্দ্দা লাগিয়ে sin against taste কোরবেন তা সহজে বিশ্বাস করা যায় না। তিনি অ-সাধারণ, তার মানে সাধারণের কান ত তাঁর আছেই, উপরন্তু আরো কিছু তাঁর আছে। তৃতীয় আপত্তি তাঁর গানের চালে। তাঁর গানের চাল হদ্দু খাঁর চাল নয় নিশ্চয়ই। কিন্তু স্বর-সঙ্গীত ছেড়ে দিয়ে অর্থ-সঙ্গীতের, অর্থাৎ টপ্পা ঠুংরীর চাল কি প্রকার স্মরণ রাখিলেই দেখা যাবে যে, রবিবাবুর গানের চাল অত্যন্ত মধুর। স্বর-সঙ্গীতের Style নির্ভর করে' কথার ওপর, গায়কের ওপর এবং তালের ওপর। আপনারা স্বীকার কোরবেন কিনা জানি না, কথা-হিসাবে রবিবাবুর সোরী মিঞার চেয়ে অন্ততঃ কিছু বড়। রবিবাবুর চাল বুঝতে হলে তাঁর নিজের মুখে কিম্বা দিনেন্দ্রবাবু, সাহানা দেবী, চিত্রলেখা দেবী এবং রমা দেবীর মুখেই শুনতে হয়। অন্যান্য ছেলেমেয়েরা যে তাঁর গানের সর্ব্বনাশ করে এ কথা বলাই বাহুল্য। তাঁরা হদ্দু-খাঁর ঘরোয়ানা Style নিয়েও যে সর্ব্বনাশ করে না তা বোল্‌তে পারেন? অপকর্ম্ম করবার স্বাধীনতা এ যুগে আমাদের সকলেরই আছে, কিন্তু এই যুগ কি আমাদের এমন কোন অধিকার দিয়েছে যে ভক্তের দোষ গুরুর ঘাড়েই ফেল্‌তে হবে? তালের কথা এই যে, সাধারণতঃ রবিবাবুর গান জলদ একতালা, ঝাপতাল তেওরা কিম্বা কাওয়ালী ঢিমে-তেতালাতেই গাওয়া হয়। ধরা যাক্, রবিবাবু ব্রহ্মতাল ও রুদ্রতাল জানেন না, ধামার, আড়া-চৌতাল তাঁর গানে নেই, তাঁর ভক্তবৃন্দেরাও ঐ সব তাল সম্বন্ধে Muff মূর্খ। আপনারা ত সব ঐ তাল সম্বন্ধে পণ্ডিত! অতএব আপনারাই শুদ্ধ কোরে তাঁর প্রদত্ত সোজা তালেই গান না, আপত্তি কি? সুরে তাল নেই কিন্তু গায়কের গলায় তা আছে। অতএব রবিবাবু যদি ভুল করেন আপনারা ঠিক কোরে গান্ না! অবশ্য এ কথা মানতেই হবে যে তাল সম্বন্ধে আপনাদের স্বাধীনতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, কেন না সেটি সঙ্গীতের ছন্দের ওপরই নির্ভর কোরছে। তাল সম্বন্ধে আর একটি বক্তব্য এই যে, রবিবাবুর মত অত বড় ছন্দের ওস্তাদ সাধারণের অপেক্ষা লয় ও তাল বেশী বোঝেন স্বীকার করাই ভাল। ধরুন তাঁর সঙ্গীতে, দিনুবাবুর গলাতেও তাল ভঙ্গ হয়েছে। কিন্তু মনে রাখ্‌বেন যে সুরের তাল এক রকম, কবিতার ছন্দ অন্য প্রকার। সুরকে যে-কোন তালেই গাওয়া যায়, তার নিজস্ব কোন তাল নেই কিন্তু সঙ্গীত তার কথার ভাব-অনুসারে ছন্দে বাঁধা। সঙ্গীতে তালের অপেক্ষা লয়ই বেশী প্রয়োজনীয়। তাও ধ্রুপদে আভোগীর লয় অন্তরার লয়ের চেয়ে দ্রুততর হয়, চতুরঙ্গে ত হয়ই। রবিবাবুর সঙ্গীত লয়ভ্রষ্ট হয় না, কেন না তাঁর সঙ্গীত কবিতা হিসাবেও খুব বড়। সঙ্গীতে তালভ্রষ্ট হবার কিছু স্বাধীনতা আছে, যেটি কবিতায় নেই।"

ওমর খৈয়ম্ কি কবি ছিলেন ?

এ প্রশ্ন বাঙ্গালী পাঠক-সমাজে নিতান্ত হেঁয়ালি বলিয়াই মনে হইবে। ১৮৫৯ খৃঃ ইংরেজ কবি ফিট্‌স্‌জেরাল্‌ড্ সর্ব্বপ্রথম ওমর খৈয়ামকে ইরানের কবিরূপে আপনার ভাষাভাষীদের কাছে উপস্থাপিত করেন। হায়দারাবাদ ওস্‌মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পারস্য ও আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমৃতলাল শীল মহাশয় জ্যৈষ্ঠ মাসের "প্রবাসী"তে লিখিতেছেন যে খৈয়ামের দেশবাসীরা তাঁহাকে কোন কালে কবির আসন দেন নাই। অমৃতবাবু বলেন, "প্রাচীন কাল হইতেই ইরানে পার্সী ভাষায় তজ্‌করাৎ-উল্‌-শোয়রা [কবিদের বিবরণ] অনেকগুলি লেখা হইয়াছে ; এরকম কোনও পুস্তকে কোনও লেখক তাঁহাকে কবি বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। কয়েকখানি তারিখ-উল্‌-হুকমাতে [দার্শনিকদের ইতিহাসে] তাঁহার নাম ও বর্ণনা পাওয়া যায়। যে প্রাচীনতম গ্রন্থে তাঁহার বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা ১১৫৫ ঈশাব্দে রচিত ; ও তাহার নাম চহার-মকালা। তাহার প্রণেতা কবি নিজামী উরূসী খৈয়ামের কাছে দর্শন-শাস্ত্র পড়িয়াছিলেন, তিনি বাল্যাবস্থা হইতেই খৈয়ামকে ভাল করিয়া জানিতেন। খৈয়াম সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা তাঁহার নিজের দেখা কথা, পরের কাছে শোনা কথা নহে।"

"চহার-মকালা" শব্দের অর্থ চার পর্ব্ব, উহা চার ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে নিজামী বড় বড় গদ্য-লেখকদের কথা, দ্বিতীয় ভাগে পদ্য-লেখক কবিদের, তৃতীয় ভাগে নজুমী [ফলিত জ্যোতিষী]-দের ও চতুর্থ ভাগে চিকিৎসকদের কথা লিখিয়াছেন। তিনি কেবল তৃতীয় ভাগে ফলিত জ্যোতিষীরূপে খৈয়ামের কয়েকটি গল্প দিয়াছেন। তাঁহার পর জমাল উদ্দীন কফতী, শহর জোরী, দওলৎ শাহ ইত্যাদি প্রসিদ্ধ ইতিহাস-লেখকেরা খৈয়ামকে হকীম [দার্শনিক] ও নজুমী-রূপেই বর্ণিত করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই খৈয়ামের সম্বন্ধে হুজ্জৎ-উল্‌-হক্ [হুজ্জৎ = প্রমাণ ; হক = সত্য। সত্যের প্রমাণ স্বরূপ. Authority. যে বিদ্বানের বচন বা অবস্থা সত্যের প্রমাণ স্বরূপ, যাঁহার আদেশের উপর আর তর্ক করা চলে না] অ-অলম্-ইলম্-ইউনান্ [ইউনান দেশের বিদ্যায় অর্থাৎ দর্শনশাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায়] ও অল্লামা-জমা [সেকালের সর্ব্বাপেক্ষা বড় বিদ্বান, greatest scholar of the age] শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে কবি বলেন নাই।"

"ইরানে বিদ্বানমাত্রেই পদ্যরচনা করিতে অভ্যাস করেন ও পদ্যে আপনার মনের ভাব প্রকাশ করেন। যে কিছু পদ্য রচনা করিয়াছে সে-ই যদি কবি হয়, তবে অবশ্য খৈয়াম কবি ছিলেন।"

সমালোচক

বৈশাখের "কালিকলমে" শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় সমালোচক কে, কাহাকে বলে, সে সম্বন্ধে "তত্ত্বজ্ঞান" দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাহার মতে "যাঁর অনুভূতিতে সাধারণ দৃষ্টির অতীত সুষমা ও রসের উপলব্ধি হয়, তাঁর যদি অপরকে তা দেখিয়ে দেবার শক্তি ও প্রেরণা থাকে, তবে তিনিই সমালোচক। সাহিত্যের জগতে সমালোচক হচ্ছেন দ্রষ্টা ও দর্শয়িতা।" এই ভূমিকার অবতারণা করিয়া গুপ্ত মহাশয় বলিতেছেন—"অকবি লোকেও কাব্য লেখে এবং যার কোন রকম সাহিত্যিক সূক্ষ্মদৃষ্টি নাই সেও সমালোচক হয়। স্বভাবতই তাদের সমালোচনায় আলো থাকে না, থাকে শুধু উত্তাপ। কোনো সৌন্দর্য্য, কি রস, তারা পাঠকদের দেখাতে পারে না, কারণ তা' তাদের নিজের চোখেই পড়ে না; সুতরাং তারা সোজাসুজি সাহিত্যের বিচারক হয়ে বসে' ডিক্রি-ডিসমিসের রায় দিতে থাকে এবং ডিক্রির চেয়ে যে তাদের ডিস্‌মিসের রায় হয় অনেক বেশী তার কারণ এতে সহজেই প্রমাণ হয় যে, তাদের সাহিত্যিক আদর্শটা ভারি উঁচু, এত উঁচু যে বেশীর ভাগ সাহিত্যই তার সিকিও নাগাল পায় না। 'কিছু-হচ্ছে-না' বল্লেই ইঙ্গিতে জানানো হয় যে, 'হওয়া-যাকে বলে' তার ধারণাটা কত বড় তা তোমরা সাধারণ লোকেরা ধারণাই করতে পারবে না।

"সাহিত্যের এই হাকিম-সমালোচকেরা সচরাচর নবীন সাহিত্য ও নূতন লেখকদের সমালোচনা করেন। কালের কষ্টি-পাথরে যে সাহিত্য সোনা বলে' প্রমাণ হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা কঠিন কাজ। তাকে 'কিছু নয়' বলা চলে না, 'খুব ভাল' বল্‌লে কিছু বলা হয় না। অন্য লোকে সে সম্বন্ধে যা বলেছে তার অতিরিক্ত কিছু চোখে পড়লে তবেই তা নিয়ে আলোচনা করা যায়। কিন্তু সমালোচক নাম নিলেই চোখে দৃষ্টি আসে না, সেটা বিধাতার দান। নবীন লেখকদের সমালোচনায় এ সব আপদ নেই। সেখানে নির্ভয়ে হাকিমী করা চলে। চোখের দৃষ্টির প্রয়োজন নেই, বুদ্ধির জোর থাকলেই যথেষ্ট।

"এই সমালোচকেরা ভাবেন যে, তাঁদের নিন্দা-প্রশংসা সাহিত্যের বড় হিতকর। তাঁদের প্রশংসায় সু-সাহিত্য উৎসাহ পায়, আর অ-সাহিত্য ও কু-সাহিত্য লজ্জায় মুখ ঢেকে সাহিত্য-সমাজ থেকে বিদায় হয়। এর কোনটাই ঘটে না। সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা রসগ্রাহী পাঠকের অপেক্ষা রাখলেও সমালোচনার কোনও অপেক্ষা রাখে না। আর সাহিত্যের সংসারে অসাহিত্য টিকে থাকে বি-রসজ্ঞ পাঠকদের কৃপায়। তারা যতদিন আছে, এবং তারা চিরকাল থাকবে, ততদিন সমালোচকের লাঠি তার কিছুই করতে পারবে না। সাহিত্যের জগতে সমালোচক ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর—কিছুই নয়। সাহিত্যের সৃষ্টি, কি পালন, কি সংহারে তার কোনও হাত নেই। যে সমালোচক মনে করে যে, সাহিত্য সৃষ্টির কাজে তার সহায়তা আছে, তার ভুলটা ঠিক সেই রকমের, যদি জ্যোতিবিদ পণ্ডিত মনে করত যে, গ্রহের চলা-ফেরার রাস্তা আবিষ্কার করে তার গতির সহায়তা করা হচ্ছে। বিশ্বের রহস্যকারীর মনে যে প্রকাশের আবেগ আনে তা থেকে কাব্যের সৃষ্টি হয়। সাহিত্যের বিজ্ঞ তত্ত্বদর্শী রসজ্ঞের মনে যে আনন্দের আবেগ আনে সমালোচনা তার অভিব্যক্তি। ইন্‌স্‌পেক্‌টারি করা সমালোচকের কাজ নয়, তা 'স্যানিটেরিই' হোক আর 'লিটেরেরিই' হোক। সাহিত্যের হিতেচ্ছায় যে সব সমালোচনা হয় তা অনেক পরহিতৈষণার মত শুধুই পীড়াদায়ক।"

—"র"

"হিন্দুধর্ম্ম না বিশ্বধর্ম্ম ?"

প্রাচীন ভারতে "হিন্দুধর্ম্ম" বলিয়া কোন একটা বিশিষ্ট ধর্ম্ম ছিল এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ঋষিগণ অনুশাসন দিয়াছেন, 'ধর্ম্মমাচর' কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম 'আচরণ' কর, একথা বলিয়াছেন এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। স্মৃতিতে সদাচারের প্রশংসা আছে। সদাচার ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ হইলেও, তাহাদ্বারা ধর্ম্মের সবখানিকে বুঝায় না। ভারতবর্ষে সদাচার যে-রূপ লইয়াছিল, তাহা দেশ-কাল-পাত্রানুসারেই গড়িয়া উঠিয়াছিল—উহা নিত্য বস্তু নহে। কিন্তু ধর্ম্ম নিত্য বস্তু—এই ধর্ম্ম সর্ব্বকালের, সর্ব্বদেশের ও সর্ব্বজাতির মানবের জন্য এক; তাই প্রাচীন ঋষিরা ধর্ম্মকে বিশিষ্ট করেন নাই। কেননা ধর্ম্ম নিত্য সত্য; সুতরাং "বিশ্বতোমুখী" অর্থাৎ "যত মানুষ তত ধর্ম্ম।" ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। এই তত্ত্বটি বুঝাইবার জন্য গত বৈশাখের "বিশ্ববাণী"তে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র পাল মহাশয় লিখিয়াছেন:—"হিন্দুধর্ম্ম নামে আমাদিগের শাস্ত্রে ও সাধনায় কোন ধর্ম্ম নাই। হিন্দু নামে যাহারা পরিচিত তাঁহাদের শাস্ত্রে "সনাতন ধর্ম্মের" উপদেশ আছে; বিশ্বধর্ম্মের" আদর্শ আছে; "মোক্ষধর্ম্মের" অনুশাসন আছে, কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া কোন কিছুর উল্লেখ নাই। এই সাধনাতে ধর্ম্মবস্তুকে কোন প্রকারের বিশেষণের দ্বারা বিশিষ্ট করিয়া সঙ্কীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ করিতে চাহে নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম ভগবান বুদ্ধদেবের সাধনা ও সিদ্ধির উপরে প্রতিষ্ঠিত। বুদ্ধ-শিষ্যেরা পুরুষপরম্পরায় বুদ্ধদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া যে সকল সাধনসম্পদ এবং আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহারই উপরে বৌদ্ধ সাধনা এবং বৌদ্ধসমাজের অনুশাসন গড়িয়া উঠিয়াছে। সেইরূপ ভগবান যীশুখৃষ্টের সাধনা এবং সিদ্ধির আশ্রয়ে এবং পুরুষপরম্পরা সঞ্চিত খৃষ্ট-শিষ্যদিগের অপরোক্ষ অনুভূতি ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার উপরে খৃষ্টীয়ান

ধর্ম্ম ও খৃষ্টীয়ান সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। হজরত মহম্মদের সাধনা এবং সিদ্ধি এবং তাঁহার মতানুবর্ত্তী মুসলমান সাধকদিগের অভিজ্ঞতা এবং অনুশাসনের উপরে বর্ত্তমান মুসলমান সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এইজন্য বৌদ্ধ ধর্ম্ম, খৃষ্টীয়ান ধর্ম্ম এবং ইস্‌লাম ধর্ম্ম এক একটা বিশিষ্ট ধর্ম্ম হইয়া আছে। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম বলিতে আমরা আমাদের শাস্ত্রে, সাহিত্যে যে বস্তুকে পাইয়া আসিয়াছি, তাহা একরূপ একটা বিশিষ্ট ধর্ম্ম নহে, তাহা সনাতন ধর্ম্ম। যাহা চিরদিন আছে, চিরদিন থাকিবে, যাহার উপচয় নাই, অপচয় নাই, যাহা সকল কালে, সকল দেশে এক ও সমান তাহাই সনাতন। সনাতন ধর্ম্ম বলিতে সেই ধর্ম্মই বুঝায় যে ধর্ম্ম কালপ্রভাবে বা দেশভেদে কোন প্রকারের ইতরবিশেষ হয় না এবং হইতে পারে না।"

—"র"

সাহিত্য-শ্রুতি

যবদ্বীপ ও বলীতে প্রাচীন হিন্দু-কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ বিষয়ে অনুসন্ধান, অনুশীলন ও গবেষণার জন্য তদ্দেশীয় গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃক বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। এই কার্য্যে বহু য়ুরোপীয় পণ্ডিত যোগদান করিয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহারা তদ্বিষয়ে বিশ্বভারতী তথা ভারতবর্ষের সহযোগিতা প্রার্থনা করায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কয়েক-জন ভারত-তত্ত্ববিদ্ ও শিল্পী সমভিব্যাহারে যাভা যাত্রা করিতেছেন। শিল্পীগণ তথায় চিত্রাদি অঙ্কিত করিবেন, এবং সুধীবর্গ গবেষণা কার্য্যে ব্রতী হইবেন। স্থির হইয়াছে এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ মলয়-উপদ্বীপ, যাভা, বলী, শ্যাম ও কম্বোজ পরিদর্শন করিবেন।

* * *

লিথুয়ানিয়া আগে ছিল রাশিয়ার বিপুল বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের অংশ; যুদ্ধের পর, ১৯১৮ সালে, সোভিয়েট্ গভর্ণমেণ্ট তাহার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিলে পর লিথুয়ানিয়াতে 'রিপব্লিক্' প্রতিষ্ঠিত হইল। জারের শাসনকালে লিথুয়ানিয়াতে রাজ অত্যাচারের অন্ত ছিল না। লিথুয়ানিয়াবাসীদের মন হইতে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা যাহাতে একেবারে মুছিয়া যায়, তাহার জন্ত রাশিয়ান গভর্ণমেণ্ট ১৮৬৪ সাল হইতে ১৯০৫ সাল পর্য্যন্ত সেখানে যত ছাপাখানা আছে শুধু তাহা বন্ধ রাখিয়াই ক্ষান্ত হন্ নাই, সঙ্গে সঙ্গে লিথুয়ানিয়ান্ ভাষা ব্যবহার পর্য্যন্ত দণ্ডনীয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইচ্ছামত যে-কোন বই লিথুয়ানিয়াতে তখন কেহ পাঠ করিতে পারিত না। স্বাধীনতা পাইয়া লিথুয়ানিয়া তাহার সে-সব দুর্দ্দিনের কথা একে-বারে ভুলিয়া গিয়াছে, তাহার 'রিপব্লিকান'—গভর্ণমেণ্ট এখন সেখানে শুধু নিজেদের পছন্দ মত পুস্তক প্রচার করিতেছেন। যে-কোন কারণেই হউক্, দেশী বা বিদেশী কোন লেখকের রচনা, তাঁহাদের মনোমত না হইলে, তাহার পঠন পাঠন তাঁহারা বন্ধ করিয়া দিতেছেন। সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে লিথুয়ানিয়াতে বার্ণার্ড্-শ, এইচ্-জি-ওয়েলস্, আরি বারবুস প্রভৃতি ইংরেজ ও ফরাসী লেখকদের রচনার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-মহাশয়ের পুস্তকাদির প্রচার নিষিদ্ধ হইয়াছে। লিথুয়ানিয়া যে তাহার নবলব্ধ স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করিতেছে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে!

* * *

বছর দুই আগে চীনদেশ হইতে, বুদ্ধদেবের জীবন ও ধর্ম্মপ্রচারের কাহিনী অবলম্বন করিয়া অঙ্কিত চৌদ্দখানি আলেখ্য য়ুরোপের কোন শিল্প-সংগ্রাহক ক্রয় করেন। এই আলেখ্যগুলি অতি প্রাচীন, খৃষ্টীয় দ্বাদশ-শতাব্দীর মিং-বংশীয় চীন-সম্রাটদের সমসাময়িক। চিলি-প্রদেশে শিনাংটাং সহরের নিকট কোন বৌদ্ধ-মন্দিরে এগুলি প্রথম আবিষ্কৃত হয়। চিত্রগুলি রেখা ও বর্ণ-সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়। সম্প্রতি ব্রিটিশ-মিউজিয়মের ভারতীয়-শিল্পবিভাগের অধ্যক্ষ লরেন্স্ বিনিয়ন-সাহেব এই আলেখ্যগুলির প্রতিলিপি প্রকাশ করিয়াছেন। (The Eumorfopoulos collection. Catalogue of the Chinese frescoes. By Lawrence Binyon. Ernest Benn, London £ 12-12 s) তাঁহার সংগ্রহ-পুস্তকের ভূমিকায় তিনি ইহাদের সবিশেষ ব্যাখ্যা ও ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন যে সুবৃহৎ বুদ্ধ-মূর্ত্তির অটল স্থানুভাবের মধ্যে শিল্পী অদ্ভুত নৈপুণ্যে গতি-ব্যঞ্জনা দিয়াছেন। বুদ্ধদেবের চারি-পাশের বৃহদাকার মূর্ত্তিগুলিও দেখিলে মনে হয় যে, যে-পদ্মের উপর শিল্পী তাঁহাদের আসন দিয়াছেন সেই পদ্মেরই মতো তাহারা সুকুমার ও "অতি লঘুভার"।

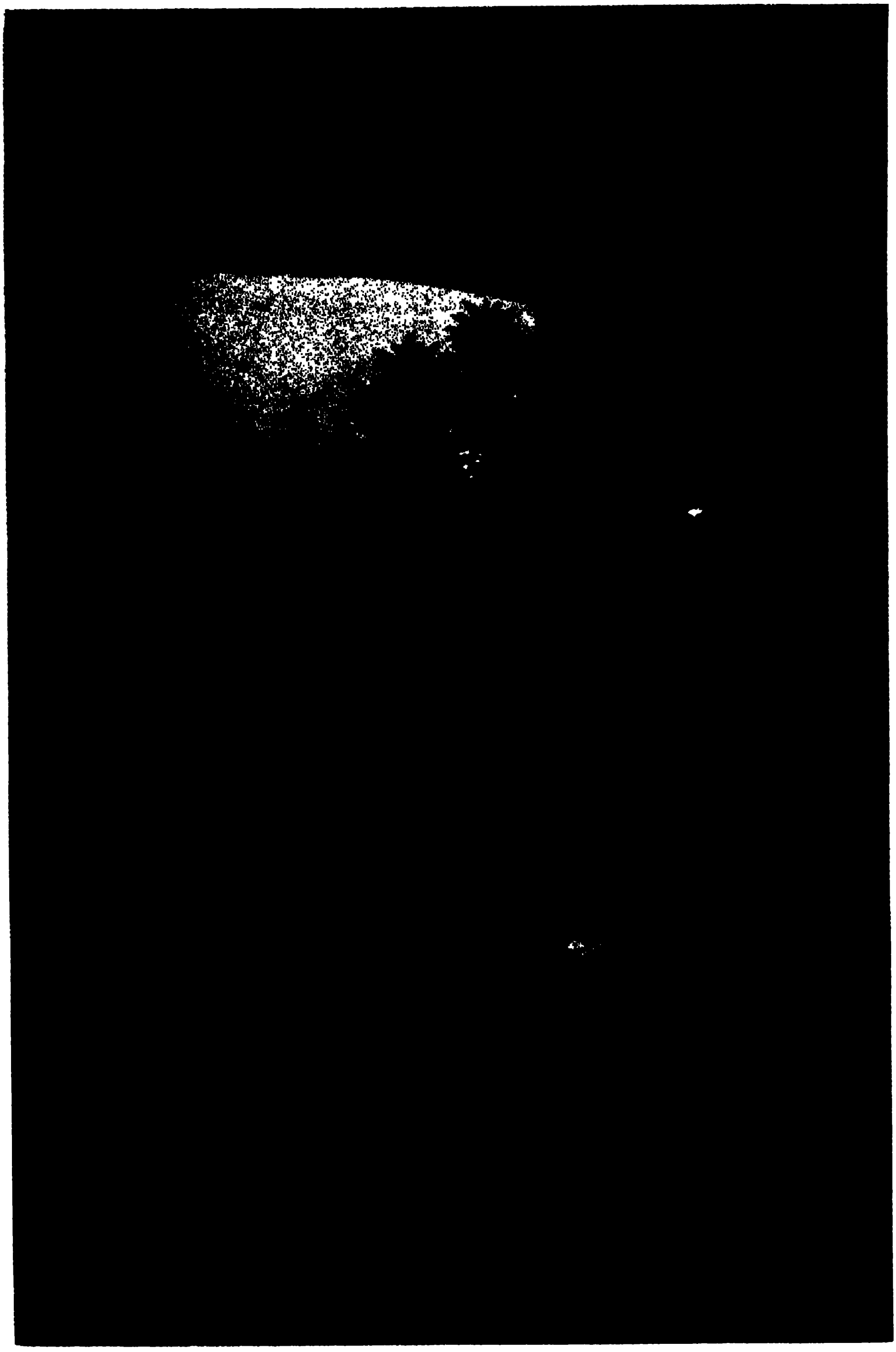
* * *

বিচিত্রার এ সংখ্যায় সাধারণ নিয়মের অতিরিক্ত ২৪ পৃষ্ঠা বেশী দিয়াও আমরা আষাঢ় মাসের জন্য নির্ব্বাচিত সকল প্রবন্ধাদি প্রকাশিত করিতে পারিলাম না। পরে ক্রমশঃ আমরা সেই অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি বাহির করিব।

Printed at The Modern Art Press, 1/2, Durga Pituri Lane, Calcutta,
by Srijut Probodh Lal Mukherjee, and published by him from 51 Pataldanga Street, Calcutta.

রবীন্দ্রনাথের

নূতন উপন্যাস



মায়ের কোল

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতন

বিচিত্রা

প্রথম বর্ষ, ১ম খণ্ড | শ্রাবণ, ১৩৩৪ | দ্বিতীয় সংখ্যা

হাসির পাথেয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হিমালয় গিরিপথে চলেছিনু কবে বাল্যকালে
মনে পড়ে। ধূর্জ্জটীর তাণ্ডবের ডম্বরুর তালে
যেন গিরি পিছে গিরি উঠিছে নামিছে বারেবারে
তমোঘন অরণ্যের তল হতে মেঘের মাঝারে
ধরার ইঙ্গিত যেথা স্তব্ধ রহে শূন্যে অবলীন,
তুষার-নিরুদ্ধ বাণী, বর্ণহীন বর্ণনাবিহীন।

সেদিন বৈশাখমাস; খণ্ড খণ্ড শস্যক্ষেত্রস্তরে
রৌদ্রবর্ণ ফুল;— মেঘের কোমল ছায়া তারি পরে
যেন স্নিগ্ধ আকাশের ক্ষণে ক্ষণে নীচে নেমে এসে
ধরণীর কানে কানে প্রশংসার বাক্য ভালোবেসে।

সেইদিন দেখেছিনু নিবিড় বিস্ময়মুগ্ধ চোখে
চঞ্চল নির্ঝরধারা গুহা হ'তে বাহিরি' আলোকে
আপনাতে আপনি চকিত, যেন কবি বাল্মীকির
উচ্ছ্বসিত অনুষ্টুভ। স্বর্গে যেন সুর-সুন্দরীর
প্রথম যৌবনোল্লাস, নূপুরের প্রথম ঝঙ্কার,
আপনার পরিচয়ে নিঃসীম বিস্ময় আপনার,—

আপনারি রহস্যের পিছে পিছে উৎসুক চরণে
অশ্রান্ত সন্ধান। সেই ছবিখানি রহিল স্মরণে
চিরদিন মনোমাঝে।

সেদিনের যাত্রাপথ হ'তে
আসিয়াছি বহুদূরে; আজি ক্লান্ত জীবনের স্রোতে
নেমেছে সন্ধ্যার নীরবতা। মনে উঠিতেছে ভাসি'
শৈলশিখরের দূর নির্ম্মল শুভ্রতা রাশি রাশি
বিগলিত হয়ে আসে দেবতার আনন্দের মতো
প্রত্যাশী ধরণী যেথা প্রণামে ললাট অবনত।
সেই নিরন্তর হাসি অবলীল গতিচ্ছন্দে বাজে
কঠিন বাধায় কীর্ণ শঙ্কায় সঙ্কুল পথমাঝে
দুর্গমেরে করি অবহেলা। সে হাসি দেখেছি বসি'
শস্যভরা তটচ্ছায়ে কলস্বরে চলেছে উচ্ছ্বসি'
পূর্ণবেগে। দেখেছি অম্লান তা'রে তীব্র রৌদ্রদাহে
শুষ্ক শীর্ণ দৈন্য-দিনে বহি যায় অক্লান্ত প্রবাহে
সৈকতিনী; রক্তচক্ষু বৈশাখেরে নিঃশঙ্ক কৌতুকে
কটাক্ষিয়া—অফুরান্ হাস্যধারা মৃত্যুর সম্মুখে॥

হে হিমাদ্রি, সুগম্ভীর, কঠিন তপস্যা তব গলি'
ধরিত্রীরে করে দান যে-অমৃতবাণীর অঞ্জলি
এই সে হাসির মন্ত্র, গতিপথে নিঃশেষ পাথেয়,
নিঃসীম সাহস বেগ, উল্লসিত অশ্রান্ত অজেয়॥

শান্তিনিকেতন
১লা বৈশাখ
১৩৩৪

সাহিত্য-ধর্ম্ম

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কোটালের পুত্র, সওদাগরের পুত্র, রাজপুত্র এই তিন জনে বাহির হন রাজকন্যার সন্ধানে। বস্তুতঃ রাজকন্যা ব'লে যে একটী সত্য আছে তিন রকমের বুদ্ধি তাকে তিন পথে সন্ধান করে।

কোটালের পুত্রের ডিটেক্‌টিভ্‌-বুদ্ধি, সে কেবল জেরা করে। করতে করতে কন্যার নাড়ীনক্ষত্র ধরা পড়ে; তার রূপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে শরীরতত্ত্ব, গুণের আবরণের ভিতর থেকে মনস্তত্ত্ব। কিন্তু এই তত্ত্বের এলেকায় তিনি পৃথিবীর সকল কন্যারই সমান দরের মানুষ—ঘুঁটেকুড়োনীর সঙ্গে তাঁর প্রভেদ নেই। এখানে বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক তাঁকে যে-চক্ষে দেখেন সে-চক্ষে রসবোধ নেই, আছে কেবল প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা।

আর একদিকে রাজকন্যা কাজের মানুষ। তিনি রাঁধেন বাড়েন, সুতো কাটেন, ফুলকাটা কাপড় বোনেন। এখানে সওদাগরের পুত্র তাঁকে যে চক্ষে দেখেন সে চক্ষে না আছে রস, না আছে প্রশ্ন; আছে অর্থের হিসাব।

রাজপুত্র বৈজ্ঞানিক নন—অর্থশাস্ত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নি—তিনি উত্তীর্ণ হয়েচেন, বোধ করি, চব্বিশ বছর বয়স এবং তেপান্তরের মাঠ। দুর্গম পথ পার হয়েচেন জ্ঞানের জন্যে না, ধনের জন্যে না, রাজকন্যারই জন্যে। এই রাজকন্যার স্থান ল্যাবরেটরিতে নয়, হাটবাজারে নয়, হৃদয়ের সেই নিত্য বসন্তলোকে, যেখানে কাব্যের কল্পলতায় ফুল ধরে। যাকে জানা যায় না, যার সংজ্ঞানির্ণয় করা যায় না, বাস্তব ব্যবহারে যার মূল্য নেই, যাকে কেবল একান্তভাবে বোধ করা যায়, তারি প্রকাশ সাহিত্যকলায়, রসকলায়। এই কলাজগতে যার প্রকাশ, কোনো সমজদার তাকে ঠেলা দিয়ে জিজ্ঞাসা করে না, "তুমি কেন?" সে বলে, "তুমি যে তুমিই, এই আমার যথেষ্ট।" রাজপুত্রও রাজকন্যার কানে-কানে এই কথাই বলেছিলেন। এই কথাটা বল্‌বার জন্যে সাজাহানকে তাজমহল বানাতে হয়েছিল।

যাকে সীমায় বাঁধতে পারি তার সংজ্ঞানির্ণয় চলে; কিন্তু যা সীমার বাইরে, যাকে ধ'রে ছুঁয়ে পাওয়া যায় না, তাকে বুদ্ধি দিয়ে পাইনে, বোধের মধ্যে পাই। উপনিষদ্‌ ব্রহ্মসম্বন্ধে বলেচেন, তাঁকে না পাই মনে, না পাই বচনে, তাঁকে যখন পাই আনন্দবোধে, তখন আর ভাবনা থাকে না। আমাদের এই বোধের ক্ষুধা আত্মার ক্ষুধা। সে এই বোধের দ্বারা আপনাকে জানে। যে-প্রেমে, যে-ধ্যানে, যে-দর্শনে কেবলমাত্র এই বোধের ক্ষুধা মেটে তাই স্থান পায় সাহিত্যে রূপকলায়।

দেয়ালে-বাঁধা খণ্ড আকাশ আমার আপিস-ঘরটার মধ্যে সম্পূর্ণ ধরা প'ড়ে গেছে। কাঠা-বিঘের দরে তার বেচা-কেনা চলে, তার ভাড়াও জোটে। তার বাইরে গ্রহতারার মেলা যে-অখণ্ড আকাশে—তার অসীমতার আনন্দ কেবলমাত্র আমার বোধে। জীব-লীলার পক্ষে ঐ আকাশটা যে নিতান্তই বাহুল্য মাটির নীচেকার কীট তারই প্রমাণ দেয়। সংসারে মানব-কীটও আছে—আকাশের কৃপণতায় তার গায়ে বাজে না। যে-মনটা গরজের সংসারের গরাদের বাইরে পাখা না মেলে বাঁচে না সে-মনটা ওর মরেচে। এই মরা-মনের মানুষটারই ভূতের কীর্ত্তন দেখে ভয় পেয়ে কবি চতুরাননের দোহাই পেড়ে বলেছিলেন :—

অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্‌

শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ।

কিন্তু রূপকথায় রাজকন্যার মন তাজা। তাই নক্ষত্রের নিত্যদীপ-বিভাসিত মহাকাশের মধ্যে যে-অনির্ব্বচনীয়তা তাই সে দেখেছিল ঐ রাজকন্যায়। রাজকন্যার সঙ্গে তার ব্যবহারটা এই বোধেরই অনুসারে। অন্যদের ব্যবহার অন্যরকম। ভালোবাসায় রাজকন্যার হৃৎস্পন্দন কোন্‌ ছন্দের মাত্রায় চলে তার পরিমাপ করবার জন্যে

বৈজ্ঞানিক অভাবপক্ষে একটা টিনের চোঙ ব্যবহার করতে একটুও পীড়া বোধ করেন না। রাজকন্যা নিজের হাতে দুধের থেকে যে নবনী মন্থন ক'রে তোলেন সওদাগরের পুত্র তাকে চৌকো টিনের মধ্যে বন্ধ ক'রে বড়োবাজারে চালান দিয়ে দিব্য মনের তৃপ্তি পান। কিন্তু রাজপুত্র ঐ রাজকন্যার জন্যে টিনের বাজুবন্ধ গড়াবার আভাস স্বপ্নে দেখ্‌লেও নিশ্চয় দম আট্‌কে ঘেমে উঠবেন। ঘুম থেকে উঠেই সোনা যদি নাও জোটে, অন্ততঃ চাঁপাকুঁড়ির সন্ধানে তাঁকে বেরোতেই হবে।

এর থেকেই বোঝা যাবে সাহিত্যতত্ত্বকে অলঙ্কার-শাস্ত্র কেন বলা হয়। সেই ভাব, সেই ভাবনা, সেই আবির্ভাব, যাকে প্রকাশ করতে গেলেই অলঙ্কার আপনি আসে, তর্কে যার প্রকাশ নেই, সেই হ'ল সাহিত্যের।

অলঙ্কার জিনিষটাই চরমের প্রতিরূপ। মা শিশুর মধ্যে পা'ন রসবোধের চরমতা,—তাঁর সেই একান্ত বোধ-টিকে সাজে-সজ্জাতেই শিশুর দেহে অনুপ্রকাশিত ক'রে দেন। ভৃত্যকে দেখি প্রয়োজনের বাঁধা সীমানায়, বাঁধা বেতনেই তার মূল্য শোধ হয়। বন্ধুকে দেখি অসীমে, তাই আপ্‌নি জেগে ওঠে ভাষায় অলঙ্কার, কণ্ঠের সুরে অলঙ্কার, হাসিতে অলঙ্কার, ব্যবহারে অলঙ্কার। সাহিত্যে এই বন্ধুর কথা অলঙ্কৃত বাণীতে। সেই বাণীর সঙ্কেত-ঝঙ্কারে বাজ্‌তে থাকে, "অলম্‌"—অর্থাৎ "বাস্‌, আর কাজ নেই।" এই অলঙ্কৃত বাক্যই হচ্চে রসাত্মক বাক্য।

ইংরেজিতে যাকে real বলে, বাংলায় তাকে বলি যথার্থ, অথবা সার্থক। সাধারণ সত্য হ'ল এক, আর সার্থক সত্য হ'ল আর। সাধারণ সত্যে একেবারে বাছ-বিচার নেই, সার্থক সত্য আমাদের বাছাই-করা। মানুষমাত্রেই সাধারণ সত্যের কোঠায়, কিন্তু যথার্থ মানুষ "লাখে না মিলল এক।" করুণার আবেগে বাল্মীকির মুখে যখন ছন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌ল তখন সেই ছন্দকে ধন্য করবার জন্যে নারদঋষির কাছ থেকে তিনি এক-জন যথার্থ মানুষের সন্ধান করেছিলেন। কেননা ছন্দ অলঙ্কার। যথার্থ সত্য-যে বস্তুতই বিরল তা নয়, কিন্তু আমার মন যার মধ্যে অর্থ পায় না আমার পক্ষে তা অযথার্থ। কবির চিত্তে, রূপকারের চিত্তে এই যথার্থ-বোধের সীমানা বৃহৎ ব'লে সত্যের সার্থকরূপ তিনি অনেক ব্যাপক ক'রে দেখাতে পারেন। যে জিনিষের মধ্যে আমরা সম্পূর্ণকে দেখি সেই জিনিষই সার্থক। এক টুক্‌রো কাঁকর আমার কাছে কিছুই নয়, একটি পদ্ম আমার কাছে সুনিশ্চিত। অথচ কাঁকর পদে পদে ঠেলে ঠেলে নিজেকে স্মরণ করিয়ে দেয়, চোখে পড়্‌লে তাকে ভোলবার জন্যে বৈদ্য ডাক্‌তে হয়, ভাতে পড়্‌লে দাঁত-গুলো আঁৎকে ওঠে; তবু তার সত্যের পূর্ণতা আমার কাছে নেই। পদ্ম কনুই দিয়ে বা কটাক্ষ দিয়ে ঠেলাঠেলির উপদ্রব একটুও করে না, তবু আমার সমস্ত মন তাকে আপনি এগিয়ে গিয়ে স্বীকার করে।

যে-মন বরণীয়কে বরণ করে নেয় তার শুচিবায়ুর পরিচয় দিই। সজ্‌নেফুলে সৌন্দর্য্যের অভাব নেই। তবু ঋতুরাজের রাজ্যাভিষেকের মন্ত্রপাঠে কবিরা সজ্‌নে ফুলের নাম করেন না। ও যে আমাদের খাদ্য. এই খর্ব্বতায় কবির কাছেও সজ্‌নে আপন ফুলের যাথার্থ্য হারাল। বকফুল, বেগুনের ফুল, কুম্‌ড়ো ফুল এই সব রইল কাব্যের বাহির-দরজায় মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে, রান্নাঘর ওদের জাত মেরেচে। কবির কথা ছেড়ে দাও, কবির সীমন্তিনীও অলকে সজ্‌নে-মঞ্জরী পর্‌তে দ্বিধা করেন, বকফুলের মালায় তাঁর বেণী জড়ালে ক্ষতি হ'ত না, কিন্তু সে কথাটা মনেও আমল পায় না। কুন্দ আছে, টগর আছে, তাদেরও গন্ধ নেই, তবু অল-ঙ্কার মহলে তাদের দ্বার খোলা—কেননা পেটের ক্ষুধা তাদের গায়ে হাত দেয়নি। বিম্ব যদি ঝোলে-ডাল্‌নায় লাগ্‌ত তাহ'লে সুন্দরীর অধরের সঙ্গে তার উপমা অগ্রাহ্য হ'ত। তিসিফুল শর্ষেফুলের রূপের ঐশ্বর্য্য প্রচুর, তবু হাটের রাস্তায় তাদের চরম গতি বলেই কবি কল্পনা তাদের নম্র নমস্কারের প্রতিদান দিতে চায় না। শিরীষফুলের সঙ্গে গোলাপজামফুলের রূপে-গুণে ভেদ নেই, তবু কাব্যের পংক্তিতে ওর কৌলীন্য গেল,

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কেননা গোলাপজাম নামটা ভোজন-লোভের দ্বারা লাঞ্ছিত। যে-কবির সাহস আছে সুন্দরের সমাজে তিনি জাত বিচার করেন না। তাই কালিদাসের কাব্যে কদম্ববনের একশ্রেণীতে দাঁড়িয়ে শ্যামজম্বুবনান্তও আষাঢ়ের অভ্যর্থনা-ভার নিল। কাব্যে সৌভাগ্যক্রমে কোনো শুভক্ষণে রসজ্ঞ দেবতাদের বিচারে মদনের তূণে আমের মুকুল স্থান পেয়েছে। বোধ করি অমৃতে অনটন ঘটে না বলেই আমের প্রতি দেবতাদের আহারে লোভ নেই। স্বচ্ছ জলের তলে রুইমাছের সন্তরণলীলা আকাশে পাখী ওড়ার চেয়ে কম সুন্দর নয়, কিন্তু রুইমাছের নাম করবামাত্র পাঠকের রসবোধ পাছে নিঃশেষে রসনার দিকেই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে এই ভয়ে ছন্দোবন্ধনে বেঁধে ওকে কাব্যের তীরে উত্তীর্ণ করা দুঃসাধ্য হ'ল। সকল ব্যবহারের অতীত ব'লেই মকর বেঁচে গেছে—ওকে বাহনভুক্ত ক'রে নিতে দেবী জাহ্নবীর গৌরবহানি হ'ল না, নির্ব্বাচনের সময় রুই কাৎলাটার নাম মুখে বেধে গেল। তার পিঠে স্থানাভাব বা পাপ্‌ড়িতে জোর কম ব'লেই এমনটা ঘটেছে তা'তো মান্‌তে পারিনে। কেননা লক্ষ্মী সরস্বতী যখন পদ্মকে আসন ব'লে বেছে নিলেন তার দৌর্ব্বল্য বা অপ্রশস্ততার কথা চিন্তাও করেন নি।

এইখানে চিত্রকলার সুবিধা আছে। কচুগাছ আঁক্‌তে রূপকারের তুলিতে সঙ্কোচ নেই। কিন্তু বনশোভাসজ্জায় কাব্যে কচুগাছের নাম করা মুস্কিল। আমি নিজে জাত-মানা কবির দলে নই, তবু বাঁশবনের কথা পাড়তে গেলে "বেণুবন" ব'লে সাম্‌লে নিতে হয়। শব্দের সঙ্গে নিত্যব্যবহারগত নানাভাব জড়িয়ে থাকে। তাই কাব্যে "কুর্‌চি" ফুলের নাম করবার বেলা কিছু ইতস্ততঃ করেচি, কিন্তু কুর্‌চিফুল আঁক্‌তে চিত্রকরের তুলির মানহানি হয় না।

এইখানে এ-কথাটা বলা দরকার, য়ুরোপীয় কবিদের মনে শব্দ সম্বন্ধে শুচিতার সংস্কার এত প্রবল নয়। নামের চেয়ে বস্তুটা তাঁদের কাছে অনেক বেশি, তাই কাব্যে নাম-ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁদের লেখনীতে আমাদের চেয়ে বাধা কম।

যা হোক্‌ এটা দেখা গেছে যে, যে-জিনিষটাকে কাজে খাটাই তাকে যথার্থ ক'রে দেখিনে। প্রয়োজনের ছায়াতে সে রাহুগ্রস্ত হয়। রান্নাঘরে ভাঁড়ারঘরে গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজন, কিন্তু বিশ্বজনের কাছে গৃহস্থ ঐ দুটো ঘর গোপন ক'রে রাখে। বৈঠকখানা না হ'লেও চলে, তবু সেই ঘরেই যত সাজসজ্জা, যত মালমস্‌লা; গৃহকর্ত্তা সেই ঘরে ছবি টাঙিয়ে কার্পেট পেতে তার উপরে নিজের সাধ্যমত সর্ব্বকালের ছাপ মেরে দিতে চায়। সেই ঘরটিকে সে বিশেষভাবে বাছাই করেছে, তার দ্বারাই সে সকলের কাছে পরিচিত হতে চায় আপন ব্যক্তিগত মহিমায়। সে যে খায় বা খাদ্যসঞ্চয় করে এটাতে তার ব্যক্তিস্বরূপের সার্থকতা নেই। তার একটি বিশিষ্টতার গৌরব আছে এই কথাটি বৈঠকখানা দিয়েই জানাতে পারে। তাই বৈঠকখানা অলঙ্কৃত।

জীবধর্ম্মে মানুষের সঙ্গে পশুর প্রভেদ নেই। আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষার প্রবৃত্তি তাদের উভয়ের প্রকৃতিতেই প্রবল। এই প্রবৃত্তিতে মনুষ্যত্বের সার্থকতা মানুষ উপলব্ধি করে না। তাই ভোজনের ইচ্ছা ও সুখ যতই প্রবল হোক্‌ ব্যাপক হোক্‌; সাহিত্যে ও অন্য কলায় ব্যঙ্গের ভাবে ছাড়া শ্রদ্ধার ভাবে তাকে স্বীকার করা হয়নি। মানুষের আহারের ইচ্ছা প্রবল সত্য, কিন্তু সার্থক সত্য নয়। পেট-ভরানো ব্যাপারটা মানুষ তার কলালোকের অমরাবতীতে স্থান দেয়নি।

স্ত্রী-পুরুষের মিলন আহার ব্যাপারের উপরের কোঠায়, কেননা ওর সঙ্গে মনের মিলনের নিবিড় যোগ। জীবধর্ম্মের মূল প্রয়োজনের দিক থেকে এটা গৌণ, কিন্তু মানুষের জীবনে তা মুখ্যকে বহুদূরে ছাড়িয়ে গেছে। প্রেমের মিলন আমাদের অন্তর বাহিরকে নিবিড় চৈতন্যের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত ক'রে তোলে। বংশরক্ষার মুখ্য তত্ত্বটুকুতে সেই দীপ্তি নেই। তাই শরীর-বিজ্ঞানের কোঠাতেই তার প্রধান স্থান। স্ত্রী-পুরুষের মনের মিলনকে প্রকৃতির আদিম প্রয়োজন থেকে ছাড়িয়ে ফেলে' তাকে তার নিজের বিশিষ্টতাতেই দেখ্‌তে পাই। তাই কাব্যে ও সকল প্রকার কলায় সে এতটা জায়গা জুড়ে বসেচে।

যৌনমিলনের যে চরম সার্থকতা মানুষের কাছে, তা "প্রজনার্থং" নয়, কেননা সেখানে সে পশু; সার্থকতা তার প্রেমে, এইখানে সে মানুষ। তবু যৌনমিলনের জীবধর্ম্ম ও মানুষের চিত্তধর্ম্ম উভয়ের সীমানা-বিভাগ নিয়ে সহজেই গোলমাল বাধে। সাহিত্যে আপন পুরো খাজ্‌না আদায়ের দাবী ক'রে পশুর হাত মানুষের হাত উভয়ে একসঙ্গেই অগ্রসর হয়ে আসে। আধুনিক সাহিত্যে এই নিয়ে দেওয়ানি ফৌজদারী মাম্‌লা চল্‌চেই।

উপরে যে পশু-শব্দটা ব্যবহার করেচি ওটা নৈতিক ভালমন্দ বিচারের দিক থেকে নয়; মানুষের আত্ম-বোধের বিশেষ সার্থকতার দিক থেকে। বংশরক্ষা-ঘটিত-পশুধর্ম্ম মানুষের মনস্তত্ত্বে ব্যাপক ও গভীর, বৈজ্ঞানিক এমন কথা বলেন। কিন্তু সে হ'ল বিজ্ঞানের কথা—মানুষের জ্ঞানে ও ব্যবহারে এর মূল্য আছে। কিন্তু রসবোধ নিয়ে যে-সাহিত্য ও কলা, সেখানে এর সিদ্ধান্ত স্থান পায় না। অশোকবনে সীতার দুরারোগ্য ম্যালেরিয়া হওয়া উচিত ছিল এ-কথাও বিজ্ঞানের, সংসারে এ-কথার জোর আছে, কিন্তু কাব্যে নেই। সমাজের অনুশাসন সম্বন্ধেও সেই কথা। সাহিত্যে যৌন-মিলন নিয়ে যে-তর্ক উঠেছে সামাজিক হিতবুদ্ধির দিক থেকে তার সমাধান হবে না, তার সমাধান কলারসের দিক থেকে। অর্থাৎ যৌনমিলনের মধ্যে যে দুটি মহল আছে মানুষ তার কোন্‌টিকে অলঙ্কৃত ক'রে নিত্যকালের গৌরব দিতে চায় সেইটিই হ'ল বিচার্য্য।

মাঝে মাঝে এক-একটা যুগে বাহ্যকারণে বিশেষ কোনো উত্তেজনা প্রবল হয়ে ওঠে। সেই উত্তেজনা সাহিত্যের ক্ষেত্র অধিকার ক'রে তার প্রকৃতিকে অভিভূত ক'রে দেয়। য়ুরোপীয় যুদ্ধের সময় সেই যুদ্ধের চঞ্চলতা কাব্যে আন্দোলিত হয়েছিল। সেই সাময়িক আন্দোলনের অনেকটাই সাহিত্যের নিত্যবিষয় হতেই পারে না—দেখ্‌তে দেখ্‌তে তা বিলীন হয়ে যাচ্চে। ইংলণ্ডে পিউরিটান্‌ যুগের পরে যখন চরিত্র-শৈথিল্যের সময় এল তখন সেখানকার সাহিত্য-সূর্য্য তারি কলঙ্কলেখায় আচ্ছন্ন হয়েছিল। কিন্তু সাহিত্যের সৌরকলঙ্ক কালের নয়। যথেষ্ট পরিমাণে সেই কলঙ্ক থাকলেও প্রতিমুহূর্ত্তে সূর্য্যের জ্যোতিস্বরূপ তার প্রতিবাদ করে, সূর্য্যের সত্তায় তার অবস্থিতিসত্ত্বেও তার সার্থকতা নেই। সার্থকতা হচ্চে আলোতে।

মধ্যযুগে এক সময়ে য়ুরোপে শাস্ত্রশাসনের খুব জোর ছিল। তখন বিজ্ঞানকে সেই শাসন অভিভূত করেছে। সূর্য্যের চারিদিকে পৃথিবী ঘোরে একথা বল্‌তে গেলে মুখ চেপে ধরেছিল—ভুলেছিল বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের একাধিপত্য—তার সিংহাসন ধর্ম্মের রাজত্বসীমার বাইরে। আজ্‌কের দিনে তার বিপরীত হ'ল। বিজ্ঞান প্রবল হয়ে উঠে কোথাও আপনার সীমা মান্‌তে চায় না। তার প্রভাব মানব মনের সকল বিভাগেই আপন পেয়াদা পাঠিয়েছে। নূতন ক্ষমতার তক্‌মা প'রে কোথাও সে অনধিকার প্রবেশ করতে কুণ্ঠিত হয় না।

বিজ্ঞান পদার্থটা ব্যক্তিস্বভাববর্জ্জিত—তার ধর্ম্মই হচ্চে সত্য সম্বন্ধে অপক্ষপাত কৌতূহল। এই কৌতূহলের বেড়াজাল এখনকার সাহিত্যকেও ক্রমে ক্রমে ঘিরে ধরচে। অথচ সাহিত্যের বিশেষত্বই হচ্চে তার পক্ষপাত ধর্ম্ম;—সাহিত্যের বাণী স্বয়ম্বরা। বিজ্ঞানের নির্ব্বিচার কৌতূহল সাহিত্যের সেই বরণ-ক'রে-নেবার স্বভাবকে পরাস্ত করতে উদ্যত। আজকালকার য়ুরোপীয় সাহিত্যে যৌনমিলনের দৈহিকতা নিয়ে খুব-যে একটা উপদ্রব চল্‌চে সেটার প্রধান প্রেরণা বৈজ্ঞানিক কৌতূহল, রেস্‌টোরেশন্‌ যুগে সেটা ছিল লালসা। কিন্তু সেই যুগের লালসার উত্তেজনাও যেমন সাহিত্যের রাজটীকা চিরদিনের মতো পায়নি, আজকালকার দিনের বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের ঔৎসুক্যও সাহিত্যে চিরকাল টিঁক্‌তে পারে না।

একদিন আমাদের দেশে নাগরিকতা যখন খুব তপ্ত ছিল তখন ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের যথেষ্ট আদর দেখেছি। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মধ্যেও সে ঝাঁজ ছিল। তখন-কার দিনের নাগরিক-সাহিত্যে এ জিনিষটার ছড়াছড়ি দেখা গেছে। যারা এই নেশার বুঁদ হ'য়ে ছিল তারা মনে করতে পারত না যে, সেদিনকার সাহিত্যের রসা-কাঠের এই ধোঁয়াটাই প্রধান ও স্থায়ী জিনিষ নয়,

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

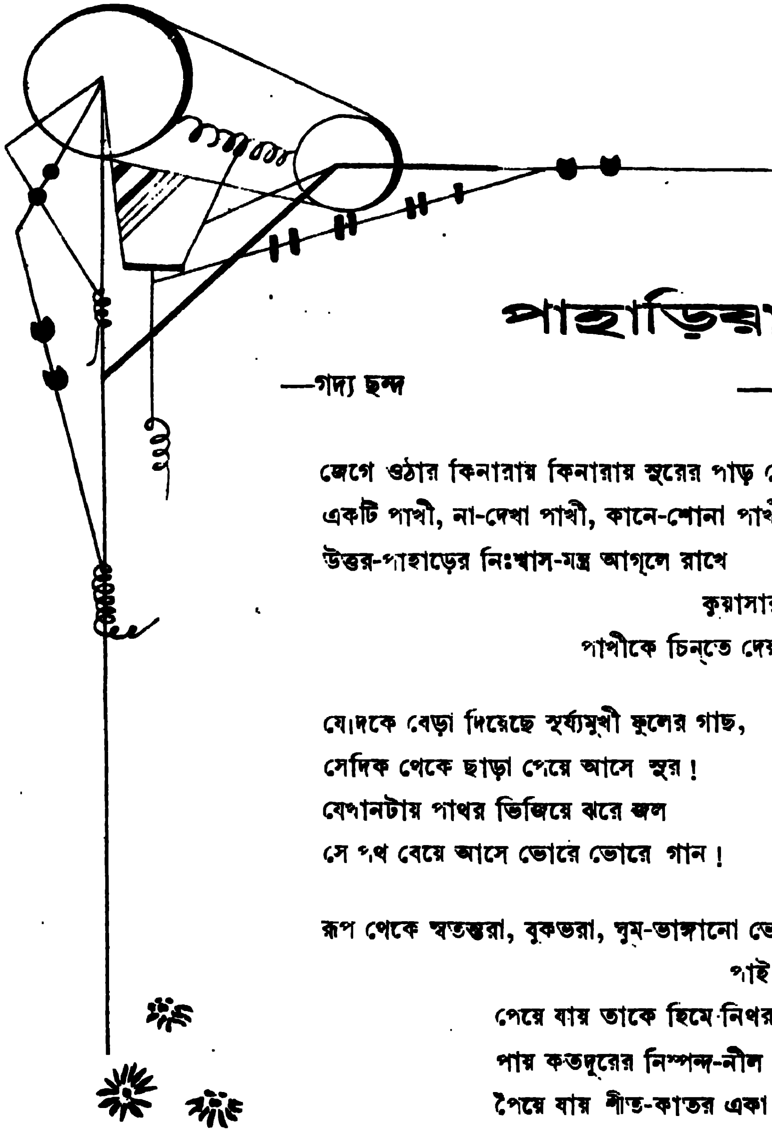
তার আগুনের শিখাটাই আসল। কিন্তু আজ দেখা গেল, সেদিনকার সাহিত্যের গায়ে যে কাদার ছাপ পড়েছিল সেটা তার চামড়ার রং নয়, কালস্রোতের ধারায় আজ তার চিহ্ন নেই। মনে তো আছে, যেদিন ঈশ্বরগুপ্ত পাঁঠার উপর কবিতা লিখেছিলেন সেদিন নূতন ইংরেজরাজের এই হঠাৎ-সহর কল্‌কাতার বাবুমহলে কি রকম তার প্রশংসাধ্বনি উঠেছে। আজ্‌কের দিনে পাঠক তাকে কাব্যের পংক্তিতে স্বভাবতই স্থান দেবে না ;—পেটুকতার নীতিবিরুদ্ধ অসংযম বিচার ক'রে নয়, ভোজনলালসার চরম মূল্য তার কাছে নেই বলেই।

সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে বিদেশের আমদানি যে-একটা বে-আব্রুতা এসেছে সেটাকেও এখানকার কেউ-কেউ মনে করচেন নিত্য পদার্থ ; ভুলে যান, যা নিত্য তা অতীতকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে না। মানুষের রসবোধে যে-আব্রু আছে সেইটেই নিত্য, যে-আভিজাত্য আছে রসের ক্ষেত্রে সেইটেই নিত্য। এখনকার বিজ্ঞান-মদমত্ত ডিমোক্রাসি তাল ঠুকে বল্‌চে, ঐ আব্রুটাই দৌর্ব্বল্য, নির্ব্বিচার অলজ্জতাই আর্টের পৌরুষ।

এই ল্যাঙট্-পরা গুলি-পাকানো ধূলোমাখা আধুনিকতারই একটা স্বদেশী দৃষ্টান্ত দেখেছি হোলিখেলার দিনে চিৎপুর রোডে। সেই খেলায় আবির নেই, গুলাল নেই,—পিচ্‌কারি নেই, গান নেই, লম্বা লম্বা ভিজে কাপড়ের টুক্‌রো দিয়ে রাস্তার ধূলোকে পাঁক ক'রে তুলে তাই চিৎকার শব্দে পরস্পরের গায়ে ছুড়িয়ে ছিটিয়ে পাগ্‌লামি করাকেই জনসাধারণ বসন্ত-উৎসব ব'লে গণ্য করেচে। পরস্পরকে মলিন করাই তার লক্ষ্য, রঙীন্ করা নয়। মাঝে মাঝে এই অবারিত মালিন্যের উন্মত্ততা মানুষের মনস্তত্ত্বে মেলে না এমন কথা বলি নে। অতএব সাইকো-এনালিসিসে এর কার্য্য-কারণ বহুযত্নে বিচার্য্য। কিন্তু মানুষের রসবোধই যে-উৎসবের মূল প্রেরণা সেখানে যদি সাধারণ মলিনতায় সকল মানুষকে কলঙ্কিত করাকেই আনন্দপ্রকাশ বলা হয়, তবে সেই বর্ব্বরতার মনস্তত্ত্বকে এ ক্ষেত্রে অসঙ্গত ব'লেই আপত্তি করব, অসত্য ব'লে নয়।

সাহিত্যে রসের হোলিখেলায় কাদা-মাখামাখির পক্ষ-সমর্থন উপলক্ষে অনেকে প্রশ্ন করেন, সত্যের মধ্যে এর স্থান নেই কি ? এ প্রশ্নটাই অবৈধ। উৎসবের দিনে ভোজপুরীর দল যখন মাৎলামির ভূতে-পাওয়া মাদল-করতালের খচোখচো-খচ্‌কার যোগে একঘেয়ে পদের পুনঃপুনঃ আবর্ত্তিত গর্জ্জনে পীড়িত সুরলোককে আক্রমণ করতে থাকে তখন আর্ত্ত ব্যক্তিকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাই অনাবশ্যক যে এটা সত্য কিনা, যথার্থ প্রশ্ন হচ্চে এটা সঙ্গীত কিনা। মত্ততার আত্মবিস্মৃতিতে এক-রকম উল্লাস হয়, কণ্ঠের অক্লান্ত উত্তেজনায় খুব-একটা জোরও আছে। মাধুর্য্যহীন সেই রূঢ়তাকেই যদি শক্তির লক্ষণ ব'লে মান্‌তে হয় তবে এই পালোয়ানির মাতামাতিকে বাহাদুরী দিতে হবে সে-কথা স্বীকার করি। কিন্তু ততঃ কিম্! এ পৌরুষ চিৎপুর রাস্তার, অমরপুরীর সাহিত্য কলার নয়।

উপসংহারে এ-কথাও বলা দরকার যে, সম্প্রতি যে-দেশে বিজ্ঞানের অপ্রতিহত প্রভাবে অলজ্জ কৌতূহল-বৃত্তি দুঃশাসন-মূর্ত্তি ধ'রে সাহিত্য-লক্ষ্মীর বস্ত্রহরণের অধিকার দাবী করচে, সে-দেশের সাহিত্য অন্ততঃ বিজ্ঞানের দোহাই পেড়ে এই দৌরাত্ম্যের কৈফিয়ৎ দিতে পারে। কিন্তু যে-দেশে অন্তরে-বাহিরে বুদ্ধিতে-ব্যবহারে বিজ্ঞান কোনোখানেই প্রবেশাধিকার পায়নি, সে-দেশের সাহিত্যে ধার-করা নকল নির্লজ্জতাকে কার দোহাই দিয়ে চাপা দেবে ? ভারতসাগরের ওপারে যদি প্রশ্ন করা যায়, "তোমাদের সাহিত্যে এত হট্টগোল কেন ?" উত্তর পাই, "হট্টগোল সাহিত্যের কল্যাণে নয়, হাটেরই কল্যাণে। হাটে যে ঘিরেচে !" ভারতসাগরের এপারে যখন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি তখন জবাব পাই, "হাট ত্রিসীমানায় নেই বটে, কিন্তু হট্টগোল যথেষ্ট আছে। আধুনিক সাহিত্যের ঐটেই বাহাদুরী !"



পাহাড়িয়া

—গদ্য ছন্দ

—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জেগে ওঠার কিনারায় কিনারায় সুরের পাড় বোনে পাখী,—
একটি পাখী, না-দেখা পাখী, কানে-শোনা পাখী !
উত্তর-পাহাড়ের নিঃশ্বাস-মন্ত্র আগ্‌লে রাখে
কুয়াসার জাদু দিয়ে ;
পাখীকে চিন্‌তে দেয় না, দেখ্‌তে দেয় না !

যেদিকে বেড়া দিয়েছে সূর্য্যমুখী ফুলের গাছ,
সেদিক থেকে ছাড়া পেয়ে আসে সুর !
যেখানটায় পাথর ভিজিয়ে ঝরে জল
সে পথ বেয়ে আসে ভোরে ভোরে গান !

রূপ থেকে স্বতন্তরা, বুকভরা, ঘুম-ভাঙ্গানো ভোরাই দিয়ে
পাই আমি পাখীকে ,
পেয়ে যায় তাকে হিমে-নিথর উত্তর আকাশ,
পায় কতদূরের নিস্পন্দ-নীল পর্ব্বত ;
পেয়ে যায় শীত-কাতর একা হরিণ
রাজোদ্যানে ধরা !

আমারি মতো পরদেশী যে,
আর যার মধ্যে কোনো স্বপ্ন, কোনো কবিত্ব নেই,
সেই আমার গোবিন্দ খানসামা—
সে শুনেছে ভোরে উঠে
গয়লা-পাড়ায় নেমে-চলার পথে ;
রোজই শুধোয় সে পাখীর খবর,
ফাঁদ পাতার মৎলব দেয় সূর্য্যমুখী-বেড়ার ফাঁকে !

পাহাড়িয়া

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঝরণা যেখানে সরু একগাছি আলোর মালা দিয়ে
বেড়ে নিয়েছে একখানি পাথর,
উষার এই মনের পাখী উড়ে বসে কি সেইখানে ?
রাত থাকতে পায় কি পায়ের পরশ
তার শিশিরে-মাজা নিকষ পাষাণ ?
বরফ-গলা নতুন নদী—উছ্‌লে পড়ে, উল্‌সে চলে—
সে কি ধ'রে নিয়ে যায় পিয়াসী পাখীর রূপের ছায়া ?

যুগান্তরের শীতের সকাল অকাল-বসন্তের ভোর রাতে
পেয়েছিল যা'ক
সেদিনের ঝরণা-তলায় নতুন ঝাউবনে,—
কোথা হতে এল সে-পাখী কে জানে তা ?
আজ্‌কের ভোরাই ধ'রে যে-পাখি করে আসা-যাওয়া
ঘুম-ভাঙানোর বেলায়
অস্বচ্ছ কাচমোড়া আমার এই খোপ্‌টার বাইরে,
সে কি ঝরণার পাখী, না ঝাউবনের, না উপর পাহাড়ের,
না ওই পাহাড়তলার চা-বাগিচার নীচের জঙ্গলের ?
সে কি থাকে একলা কোনো পাথরের ফাটলে,
না সে বাসা নিয়েছে আমার সঙ্গে কাচমোড়া ঘরেই ?

ঘরের কোণে কাচের বুদ্‌বুদে ধরা নিভন্ত-বাতি
সে কি জেনেছে পাখীকে ?—
কাজল দিয়ে শেষ রাতে কেন লিখেছে সে
দেয়ালের ভিতর-দিক্‌টার
রাত-পোহানো পাখীর কালো পাখ্‌নার
ইসারা একটু ?

কার্সিয়ঙ্‌

মধু-মঞ্জরী *

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রত্যাশী হ'য়ে ছিনু এত কাল ধরি',
বসন্তে আজ দুয়ারে, আ মরি মরি,
ফুল-মাধুরীর অঞ্জলি দিল ভরি'
মধু-মঞ্জরীলতা।

কতদিন আমি দেখিতে এসেছি প্রাতে
কচি ডালগুলি ভরি নিয়ে কচি পাতে
আপন ভাষায় যেন আলোকের সাথে
কহিতে চেয়েছে কথা।

কতদিন আমি দেখেছি গোধূলি কালে
সোনালি ছায়ার পরশ লেগেছে ডালে,
সন্ধ্যাবায়ুর মৃদু-কাঁপনের তালে
কী যেন ছন্দ শোনে।

গহন নিশীথে ঝিল্লি যখন ডাকে,
দেখেছি চাহিয়া জড়িত ডালের ফাঁকে
কাল-পুরুষের ইঙ্গিত যেন কা'কে
দূর দিগন্ত-কোণে॥

শ্রাবণে সঘন ধারা ঝরে ঝরঝর
পাতায় পাতায় কেঁপে ওঠে থরথর,
মনে হয় ওর হিয়া যেন ভর-ভর
বিশ্বের বেদনাতে।

কতবার ওর মর্ম্মে গিয়েছি চলি,'
বুঝিতে পেরেছি কেন উঠে চঞ্চলি,
শরৎ শিশিরে যখন সে ঝলমলি'
শিহরায় পাতে পাতে

* গৃহতোরণের ঊর্দ্ধভাগ বেষ্টনের জন্য এই লতা সাধারণত লাগানো হয়। লাল-শাদা রং-এর অসংখ্য পুষ্পগুচ্ছে ইহার দেহ ভরিয়া থাকে। কবি ইহার নামকরণ করিয়াছেন মধুমঞ্জরী লতা।—বিঃ সঃ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভুবনে ভুবনে যে-প্রাণ সীমানা-হারা
গগনে গগনে সিঞ্চিল গ্রহতারা
পল্লবপুটে ধরি লয় তারি ধারা,
মজ্জায় লহে ভরি।

কী নিবিড় যোগ এই বাতাসের সনে,
যেন সে পরশ পায় জননীর স্তনে,
সে পুলকখানি কত-যে, সে মোর মনে
বুঝিব কেমন করি॥

বাতাসে আকাশে আলোকের মাঝখানে—
ঋতুর হাতের মায়ামন্ত্রের টানে
কী যে বাণী আছে প্রাণে প্রাণে ওই জানে,
মন তা জানিবে কিসে ?

যে-ইন্দ্রজাল দ্যুলোকে ভূলোকে ছাওয়া,
বুকের ভিতর লাগে ওর তারি হাওয়া,—
বুঝিতে যে চাই কেমন সে ওর পাওয়া,
চেয়ে থাকি অনিমিষে॥

ফুলের গুচ্ছে আজি ও উচ্ছ্বসিত,
নিখিল-বাণীর রসের পরশামৃত
গোপনে গোপনে পেয়েছে অপরিমিত
ধরিতে না পারে তারে

ছন্দে গন্ধে রূপ-আনন্দে ভরা,
ধরণীর ধন গগনের মন-হরা,
শ্যামলের বীণা বাজিল মধুস্বরা
ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে

আমার দুয়ারে এসেছিল নাম ভুলি'
পাতা-ঝলমল অঙ্কুরখানি তুলি'
মোর আঁখিপানে চেয়েছিল ঢুলি' ঢুলি'
করুণ প্রশ্নরতা।

তারপরে কবে দাঁড়ালো যে দিন ভোরে
ফুলে ফুলে তার পরিচয়লিপি ধ'রে
নাম দিয়ে আমি নিলাম আপন ক'রে
মধু-মঞ্জরীলতা॥

তারপরে যবে চলে যাবো অবশেষে
সকল ঋতুর অতীত নীরব দেশে,
তখনো জাগাবে বসন্ত ফিরে এসে
ফুল ফোটাবার ব্যথা।

বরষে বরষে সে-দিনো ত বারে বারে
এমনি করিয়া শূন্য ঘরের দ্বারে
এই লতা মোর আনিবে কুসুমভারে
ফাগুনের আকুলতা॥

তব পানে মোর ছিল যে প্রাণের প্রীতি
ওর কিশলয়ে রূপ নেবে সেই স্মৃতি,
মধুর গন্ধে আভাসিবে নিতি নিতি
সে মোর গোপন কথা।

অনেক কাহিনী যাবে যে সেদিন ভুলে,
স্মরণ-চিহ্ন কত যাবে উন্মূলে;
মোর দেওয়া নাম লেখা থাক্ ওর ফুলে
মধু-মঞ্জরীলতা॥

নীলমণি লতা *

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ফাল্গুন-মাধুরী তার চরণের মঞ্জীরে মঞ্জীরে
নীলমণি-মঞ্জরীর গুঞ্জন বাজায়ে দিলো কি রে ?
আকাশ যে-মৌনভার
বহিতে পারে না আর
নীলিমা-বন্যায় শূন্যে উচ্ছলে অনন্ত ব্যাকুলতা,
তারি ধারা পুষ্পপাত্রে ভরি' নিলো নীলমণি লতা।

পৃথ্বীর গভীর মৌন দূর শৈলে ফেলে নীল ছায়া,
মধ্যাহ্ন-মরীচিকায় দিগন্তে খোঁজে সে স্বপ্ন-কায়া।
যে-মৌন নিজেরে চায়
সমুদ্রের নীলিমায়,
অন্তহীন সেই মৌন উচ্ছ্বসিল নীলগুচ্ছ ফুলে,
দুর্গম রহস্য তার উঠিল সহজ ছন্দে দুলে॥

আসন্ন মিলনাশ্বাসে বধূর কম্পিত তনুখানি
নীলাম্বর অঞ্চলের গুণ্ঠনে সঞ্চিত করে বাণী।
মর্ম্মের নির্ব্বাক্ কথা
পায় তার নিঃসীমতা
নিবিড় নির্ম্মল নীলে ; আনন্দের সেই নীল দ্যুতি
নীলমণি-মঞ্জরীর পুঞ্জে পুঞ্জে প্রকাশে আকৃতি॥

* গাঢ় উজ্জ্বল নীল বর্ণের সুদৃশ্য এই নীলমণি পুষ্পের গাছ পরলোকগত পিয়ার্সন্-সাহেব অষ্ট্রেলিয়া হইতে শান্তিনিকেতনে আনেন। ইহার বিদেশী নাম পেট্রিয়া (Petrea)। আমাদের দেশের জন্য কবি ইহার নামকরণ করিয়াছেন নীলমণি লতা।—বিঃ সঃ

অজানা পান্থের মতো ডাক দিলে অতিথির ডাকে,
অপরূপ পুষ্পোচ্ছ্বাসে, হে লতা, চিনালে আপনাকে।
বেল জুঁই শেফালিরে
জানি আমি ফিরে ফিরে,
কত ফাল্গুনের, কত শ্রাবণের, আশ্বিনের ভাষা
তারা তো এনেছে চিত্তে, রঙীন করেছে ভালোবাসা॥

চাঁপার কাঞ্চন আভা সে-যে কার কণ্ঠস্বরে সাধা,
নাগকেশরের গন্ধ সে-যে কোন বেণীবন্ধে বাঁধা।
বাদলের চামেলি যে
কালো আঁখিজলে ভিজে,
করবীর রাঙা রঙ্ কঙ্কণ-ঝঙ্কার সুরে মাখা,
কদম্ব কেশরগুলি নিদ্রাহীন বেদনায় আঁকা॥

তুমি সুদূরের দূতী, নূতন এসেছ নীলমণি,
স্বচ্ছ নীলাম্বরসম নির্ম্মল তোমার কণ্ঠধ্বনি।
যেন ইতিহাসজালে
বাঁধা নহো দেশে কালে,
যেন তুমি দৈববাণী বিচিত্র বিশ্বের মাঝখানে,
পরিচয়হীন তব আবির্ভাব, কেন এ কে জানে

"কেন এ কে জানে" এই মন্ত্র আজি মোর মনে জাগে;
তাই তো ছন্দের মালা গাঁথি অকারণ অনুরাগে।
বসন্তের নানা ফুলে
গন্ধ তরঙ্গিয়া তুলে,
আম্রবনে ছায়া কাঁপে মৌমাছির গুঞ্জরণ-গানে;
মেলে অপরূপ ডানা প্রজাপতি, কেন এ কে জানে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কেন এ কে জানে এত বর্ণগন্ধ রসের উল্লাস,
প্রাণের মহিমাছবি রূপের গৌরবে পরকাশ।
যে-দিন বিতানচ্ছায়ে
মধ্যাহ্নের মন্দবায়ে
ময়ূর আশ্রয় নিলো, তোমারে তাহারে একখানে
দেখিলাম চেয়ে চেয়ে, কহিলাম, "কেন এ কে জানে"॥

অভ্যাসের সীমা-টানা চৈতন্যের সঙ্কীর্ণ সঙ্কোচে
ঔদাস্যের ধূলা ওড়ে, আঁখির বিস্ময়রস ঘোচে।
মন জড়তায় ঠেকে
নিখিলেরে জীর্ণ দেখে,
হেনকালে, হে নবীন, তুমি এসে কি বলিলে কানে;
বিশ্বপানে চাহিলাম, কহিলাম, "কেন এ কে জানে"॥

আমি আজ কোথা আছি, প্রবাসে অতিথিশালা মাঝে।
তব নীল-লাবণ্যের বংশীধ্বনি দূর শূন্যে বাজে।
আসে বৎসরের শেষ,
চৈত্র ধরে ম্লান বেশ,
হয়তো বা রিক্ত তুমি ফুল-ফোটাবার অবসানে,
তবু, হে অপূর্ব্ব রূপ, দেখা দিলে কেন যে কে জানে॥

ভরতপুর,
১৭ই চৈত্র, ১৩৩৩

কুরূচি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[কুষ্টিয়া রেলোয়ে ষ্টেশনে বিকশিত কুরূচি গাছ দেখিয়াছিলাম—তাহারি স্মরণে লিখিত]

ভ্রমর একদা ছিল পদ্মবনপ্রিয়
ছিল প্রীতি কুমুদিনী পানে।
সহসা বিদেশে আসি হায়, আজ কি ও
কুটজেও বহু বলি মানে!
—সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকের অনুবাদ

কুরূচি, তোমার লাগি পদ্মেরে ভুলেছে অন্যমনা
যে-ভ্রমর, শুনি না কি তা'রে কবি করেছে ভর্ৎসনা।
আমি সেই ভ্রমরের দলে। তুমি আভিজাত্যহীনা,
নামের গৌরবহারা; শ্বেতভুজা ভারতীর বীণা
তোমারে করেনি অভ্যর্থনা অলঙ্কার-ঝঙ্কারিত
কাব্যের মন্দিরে। তবু সেথা তব স্থান অবারিত
বিশ্বলক্ষ্মী করেছেন আমন্ত্রণ যে-প্রাঙ্গণতলে
প্রসাদচিহ্নিত তাঁ'র নিত্যকার অতিথির দলে।
আমি কবি লজ্জা পাই কবির অন্যায় অবিচারে
হে সুন্দরী। শাস্ত্রদৃষ্টি দিয়ে তা'রা দেখেছে তোমারে,
রসদৃষ্টি দিয়ে নহে; শুভদৃষ্টি কোনো সুলগনে
ঘটিতে পারেনি তাই, ঔদাস্যের মোহ-আবরণে
রহিলে কুণ্ঠিত হয়ে।
তোমারে দেখেছি সেই কবে
নগরে হাটের ধারে, জনতার নিত্য কলরবে,—
ইটকাঠপাথরের শাসনের সঙ্কীর্ণ আড়ালে,
প্রাচীরের বহিঃপ্রান্তে।—সূর্য্যপানে চাহিয়া দাঁড়ালে
সকরুণ অভিমানে;—সহসা পড়েছে যেন মনে
একদিন ছিলে যবে মহেন্দ্রের নন্দন-কাননে—
পারিজাত-মঞ্জরীর লীলার সঙ্গিনীরূপ ধরি'
চিরবসন্তের স্বর্গে,—ইন্দ্রাণীর সাজাতে কবরী;
অপ্সরীর নৃত্যলোল মণিবন্ধে কঙ্কণবন্ধনে
পেতে দোল তালে তালে; পূর্ণিমার অমল চন্দনে
মাখা হয়ে নিঃশ্বসিতে চন্দ্রমার বক্ষোহার পরে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অদূরে কঙ্কর-রুক্ষ লৌহপথে কঠোর ঘর্ঘরে
চলেছে আগ্নেয়রথ, পণ্যভারে কম্পিত ধরায়
ঔদ্ধত্য বিস্তারি বেগে ; কটাক্ষেও ফিরিয়া না চায়
অর্ঘমূল্যহীন তোমাপানে, হে তুমি দেবের প্রিয়া,
স্বর্গের দুলালী। যবে নাটমন্দিরের পথ দিয়া
বেসুর অসুর চলে, সেইক্ষণে তুমি একাকিনী
দক্ষিণ বায়ুর ছন্দে বাজায়েছ সুগন্ধ কিঙ্কিণী
বসন্তবন্দনানৃত্যে,—অবজ্ঞিয়া অন্ধ অবজ্ঞারে,
ঐশ্বর্য্যের ছদ্মবেশী ধূলির দুঃসহ অহঙ্কারে
হানিয়া মধুর হাস্য ; শাখায় শাখায় উচ্ছ্বসিত
ক্লান্তিহীন সৌন্দর্য্যের আত্মহারা অজস্র অমৃত
করেছ নিঃশব্দ নিবেদন।

মোর মুগ্ধ চিত্তময়
সেইদিন অকস্মাৎ আমার প্রথম পরিচয়
তোমা সাথে। অনাদৃত বসন্তেরে আবাহন গীতে
প্রণমিয়া, উপেক্ষিতা, শুভক্ষণে কৃতজ্ঞ এ চিতে
পদার্পিলে অক্ষয় গৌরবে। সেইক্ষণে জানিলাম,
হে আত্মবিস্মৃত তুমি, ধরাতলে সত্য তব নাম
সকলেই ভুলে গেছে, সে নাম প্রকাশ নাহি পায়
চিকিৎসাশাস্ত্রের গ্রন্থে পণ্ডিতের পুঁথির পাতায় ;
গ্রামের গাথার ছন্দে সে নাম হয়নি আজো লেখা,
গানে পায় নাই সুর।—সে নাম কেবল জানে একা,
আকাশের সূর্য্যদেব, তিনি তাঁর আলোক বীণায়
সে নামে ঝঙ্কার দেন, সেই সুর ধূলিরে চিনায়
অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য তা'র ; সে সুরে গোপন বার্ত্তা জানি'
সন্ধানী বসন্ত হাসে। স্বর্গ হ'তে চুরি ক'রে আনি'
এ ধরা, বেদের মেয়ে, তোরে রাখে কুটীরে কানাচে
কটুনামে লুকাইয়া, হঠাৎ পড়িস্ ধরা পাছে।
পণ্যের কর্কশধ্বনি এ নামে কদর্য্য আবরণ
রচিয়াছে ; তাই তোরে দেবী ভারতীর পদ্মবন
মানেনি স্বজাতি ব'লে, ছন্দ তোরে করে পরিহার,—
তা'বলে হবে কি ক্ষুণ্ণ কিছুমাত্র তোর শুচিতার ?
সূর্য্যের আলোর ভাষা আমি কবি কিছু কিছু চিনি,
কুরচি, পড়েছ ধরা, তুমিই রবির আদরিণী॥

শান্তিনিকেতন
১০ই বৈশাখ
১৩৩৪

মনের দুটি ভাষা

শ্রীধূর্জ্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

চৈত্রের এবং বৈশাখের "বঙ্গবাণী"তে সঙ্গীতবিষয়ক আমার প্রবন্ধ দুটি পড়ে পাঠকের মনে এ ধারণা হতে পারে যে, আমি সুর কিম্বা সঙ্গীতকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে গিয়ে সাহিত্যকে, এমন কি উৎকৃষ্ট কবিতাকেও, অবহেলা করেছি। শ্রীবৎস-চিন্তার দুর্ভাগ্যের ইতিহাস আমার জানা আছে, অতএব সুরকে স্বর্ণ-সিংহাসনে বসিয়ে কবিতাকে অবমাননা করার কুফল ভোগ কোরতে আমি অনিচ্ছুক। রবিবাবুর তাজমহল, অবনীবাবুর মৃত্যুশয্যায় সাজাহান, সাজাহান-রচিত তাজমহলের মতনই আমার ভাল লাগে। তবে যে কারণে আমি পুঁথিগত সাম্যবাদ বিশ্বাস করি না, ঠিক সেই কারণেই আমি প্রত্যেক আর্টের বিশিষ্ট প্রকাশভঙ্গীকে শ্রদ্ধা করি এবং কোন্‌টি বেশী এবং কোন্‌টি কম উপভোগ করি শপথ কোরে বোল্‌তে অক্ষম। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম বজায় থাক্‌তে যেমন সাম্য-বাদের কথাই উঠতে পারে না, তেমনি রসভোগের ক্ষেত্রে সাম্যবাদ শুষ্ক বুদ্ধির কচ্‌কচি ছাড়া অন্য কিছুই নয়। রসরাজ্য হতে বহিষ্কৃত হয়েই তুলাদণ্ড বেণের দোকানে এবং বৈজ্ঞানিকের ল্যাবরেটরীতে আশ্রয় নিয়েছে। সেই তুলাদণ্ডকে উদ্ধার কোরে, তার পুনরাভিষেকে পৌরোহিত্য করবার প্রবৃত্তি আমার নেই।

চল্‌তি কথাবার্ত্তায় ভিন্ন জিনিষের ভিন্ন মূল্য আমরা সকলেই দিয়ে থাকি, যদিও সূক্ষ্ম বিচারের ফলে ও-রকম মূল্যের কোন অর্থ পাওয়া যায় না। আমার মনে হয় ভাল, মন্দ, উন্নতি, অবনতি, শ্রেয়, শ্রেয়তর প্রভৃতি কথাবার্ত্তা মনের অপরিপক্ক অবস্থার চিহ্ন। বালক-বালিকারাই প্রশ্ন করে তাদের মধ্যে কে বেশী লম্বা, কার গায়ে সব চেয়ে বেশী জোর। পরীক্ষায় প্রথম স্থানের ওপর তাদের শ্রদ্ধা নির্ভর করে। কলেজে পড়ার সময়ে প্রশ্নের বিষয় স্বতন্ত্র হলেও ধরণ একই রকমের,— কে সব চেয়ে সুন্দর দেখ্‌তে, কোন্ অধ্যাপক শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, ক্রিকেট খেলায় কার দৌড়-সংখ্যা অধিকতম, কে সব চেয়ে বেশী বার প্রেমে পড়েছে ইত্যাদি। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাইরে এসে 'সভ্য' মানুষ প্রশ্ন করে, ফোর্ড না রক্‌ফেলার বেশী ধনী, লাহারা না ভাগ্যকুলের রায়েরা, কোন্ কোন্ নটের মাসিক আয় লক্ষ মুদ্রারও অধিক, সৌন্দর্য্য-প্রতিযোগিতায় কোন্ নারী প্রথম স্থান অধিকার করেছেন, কোন্ ফিল্‌মে ক্রোর ডলার্ খরচ হয়েছে, কোন্ সহরের বাড়ী সব চেয়ে উঁচু, কোন্ পুস্তক এবং মাসিক-পত্রিকার বিক্রী অধিকতম। এই প্রকার 'রেকর্ড ভাঙ্‌বার' প্রবৃত্তি, superlatives-এর অজস্র ব্যবহার এবং সংখ্যা-তত্ত্বের প্রচুর প্রয়োগ শুধু যে মার্কিণ সভ্যতার নিদর্শন হয়ে উঠেছে তাই নয়, আমেরিকায় বড় বড় অধ্যাপকের লিখিত পুস্তকেও ঐ প্রকার বাল-সুলভ সংখ্যামোহ ধরা পড়ে। কবির ভাষায় বোল্‌তে গেলে, প্রায় সব আমেরিকানই lisps in numbers, for numbers come! ঐ প্রকার ছেলেমানুষী প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য সেখানে অনেক পত্রিকা বের হয়। সংখ্যাই তুলনার সরল মাপকাঠি বোলে গণ্য হবার জন্যই একজন আমেরিকান সমাজতত্ত্ববিদ্ অত্যন্ত গম্ভীরভাবে লিখেছেন যে, চীনের পোর্সিলেন, ছবি, দর্শন, কবিতা সব ছেড়ে দিলেও বোল্‌তে হবে যে যে-কালে চীনের জন্মহার পৃথিবীর মধ্যে অত্যধিক, তখন মৃত্যুহার ইংলণ্ডের মতন কমে গেলেই চীন-সভ্যতা জগৎকে জয় কোরবেই কোরবে। সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধি এবং মূল্য-নির্ব্বাচনের শক্তি না থাকলেও একথা সুনিশ্চিত যে কেবল সংখ্যার ওপর, গণিতের ওপর কোন সমাজতত্ত্ব স্থাপিত করা যায় না। সমাজতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় মানুষেরই কার্য্যাবলী এবং সেই মানুষের মন বোলে একটি পদার্থ আছে—যেটি চিন্তা করে, আকাঙ্ক্ষা করে। চিন্তার ধারা যাই হোক্ না কেন, তার একটি স্বভাব এই যে সে-ধারা সব বাঁধা-ধরা নিয়মকে নিষ্ঠুরভাবে ওলট্‌-পালট্ কোরে দেয়, এমন কি অধ্যাপকের সুবিধা এবং গাম্ভীর্য্যকে যথেষ্ট খাতির না কোরেই। মানুষের আকাঙ্ক্ষার প্রকৃতি

শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

যাই হোক্ না কেন, তার একটি আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে সংখ্যামোহ এবং অঙ্কশাস্ত্রের শাসন থেকে পরিত্রাণ পাওয়া। হিসাব থেকে রেহাই পাবার জন্যই গরীব গৃহস্থ ক্রোরপতি হবার বাসনা পোষণ করেন এবং প্রতিবৎসর ছেলে-মেয়ের জামা না কিনে ডার্ব্বির টিকিট কেনেন। ব্যবহারিক জগতেই যদি মুক্তির আকাঙ্ক্ষা এত প্রবল হয়, তা'হলে রসের ক্ষেত্রে ত কথাই নেই। Moonlight Sonata শুনে যদি কেউ জ্যোৎস্নার candle-power বিচার করতে বসে তা'হলে তাকে আমরা বাতুল বলি। ক্লাশে ব'সে কোন্ কবিতায় সব চেয়ে বেশীসংখ্যক যুক্তাক্ষর কি স্বরবর্ণ আছে, ক'বার 'প্রেম' কথাটির উল্লেখ আছে এই ধরণের বিচার-পদ্ধতি চলতে পারে, কিন্তু ক্লাশের বাইরে, যেখানে রসসৃষ্টি সম্ভব, সেখানে ঐ প্রকার মূল্যনির্দ্ধারণ একেবারেই চলে না। সেইজন্য আমি মনে করি যে, সুর বড় না কবিতা বড় যাচাই করা বেণে-বুদ্ধির কাজ এবং রসভোগের অন্তরায়। সুর সাহিত্যের চেয়ে 'অধিক' পরিমাণে এবং 'উচ্চ' ধরণে আনন্দ দেয় কিনা প্রশ্ন করা যেমন শিশুসুলভ জ্ঞানানুসন্ধিৎসা, তেমনি সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া পিতৃসুলভ স্নেহান্ধতাই বোলে মনে হয়। মানুষের মন অত্যন্ত কুটিল, তার প্রবৃত্তি নিতান্ত জটিল। মানুষের মন কলের মতন অত সোজাসুজি কাজ করে না। সংখ্যাতত্ত্ব কিম্বা গণিত dead forms-কেই নিয়মে গ্রথিত কোরতে পারে এবং মোটামুটি সরল ধারাগুলির দিক্ নির্ণয় কোরতে পারে। মানুষ জীবন্ত জীব; জীবন্ত রূপের নিয়ম Spengler-সাহেব, Pareto-সাহেবও বার কোরতে পারেন নি, কেননা জীবন সর্ব্বদাই উদ্ঘাটিত হচ্ছে। উদ্ঘাটনের উদ্ঘাটিত হওয়া ছাড়া অন্য কিছু তথ্য নেই যে, সংখ্যার সাহায্যে তার প্রকৃতি ধরা পড়বে কিম্বা মূল্য নির্দ্ধারিত হবে।

এ-সব কথার মানে এ নয় যে মূল্যের আপেক্ষিকতা নেই। রবিবাবু যে দেশের অন্য সকল কবির চেয়ে ঢের বড় বেশ বুঝ্‌তে পারি এবং দিলীপকুমার ওস্তাদ না হয়েও যে অনেক ওস্তাদের চেয়ে ভাল গান করেন জোর কোরেই বোল্‌তে ইচ্ছে হয়। মানুষের সাধারণ ব্যবহারে অনেক রসের সঞ্চার হয় দেখা যায়। সাপের বিষ নেই নেই কোরতে উপে যায় শুনেছি, কিন্তু মানুষ যতদিন সোঽহং-জ্ঞানী না হচ্ছে ততদিন সে ভাল, মন্দ, উন্নতি, অবনতি প্রভৃতি কথা কইবেই কইবে। শুধু তাই নয়,— কোন্‌টা উচ্চ, কোন্‌টা উচ্চতর এবং কোনটা উচ্চতম এই প্রকার আপেক্ষিক বিচার মানুষকে সদা-সর্ব্বদাই কোরতে হয়। মূল্যের পর্য্যায় নির্দ্ধারণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ, সে ক্রমের ভিত্তি যাই হোক্ না কেন। 'যাই হোক্ না কেন' বোল্লে অবশ্য মন বোঝে না। বুদ্ধির স্বভাবই হচ্ছে সুবিধা খোঁজা, অর্থাৎ formula কিম্বা মন্ত্রের সাহায্যে নিজেকে অবসর দেওয়া এবং কুঁড়েমি করা। সেইজন্য সর্ব্বপ্রকার অভিজ্ঞতাকে একটি পদ্ধতির মধ্যে আবদ্ধ করার চেষ্টা বরাবরই চলছে, এবং উক্ত কারণেই মূল্যের পর্য্যায় কিসের ওপর প্রতিষ্ঠিত এই প্রশ্ন সকলেরই মনে ওঠে। এই প্রশ্নের সোজা কথায় উত্তর দিতে সব দার্শনিকই চেষ্টা করেন, কিন্তু সব উত্তরই অসম্পূর্ণ থাকে। তার কারণ এই যে, উত্তর দেবার পূর্ব্বেই ঠিক কোরতে হয় যে মূল্য একটি বাহ্য সত্তা যেটি বস্তুর গুণ মাত্র, না আমাদের মানসিক প্রতিক্রিয়ার একটি বিশেষ অবস্থা, না আমাদের মনেরই স্বাধীন সৃষ্টি বস্তু-সাপেক্ষ মোটেই নয়। উত্তর ক্রমেই জটিল হয়ে ওঠে যখন আমরা দেহ ও মনের সম্বন্ধে নিজেদের অসীম অজ্ঞতা বুঝ্‌তে পারি। দেহ-বিজ্ঞান দৈহিক প্রকরণ এবং পরিবর্ত্তন দিয়ে ভাব-প্রকরণকে ব্যাখ্যা করে। কোন কোন দর্শন-শাস্ত্র আবার দেহকে মানেই না। আবার ভিন্ন অভিজ্ঞতার ভিন্ন স্তর রয়েছে; এক স্তরে যে ব্যাখ্যা খাটে, অন্য স্তরে সে ব্যাখ্যা খাটে না। ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত দেশে সকালে চায়ের সঙ্গে কুইনিনের বড়ি উপকারী, সেই তুলনায় বর্ত্তমান সাহিত্যিকবৃন্দকে, বিশেষ কোরে "কল্লোল" "কালি-কলমে"র লেখকদিগকে, চায়ের সঙ্গে রোজ একপাতা কোরে ভূদেববাবুর সামাজিক কিম্বা পারিবারিক প্রবন্ধ জোর কোরে পড়ালে যে বিশেষ উপকার হবে না সে-কথা বলাই বাহুল্য। সন্দেশে কেউ কেউ বেশী চিনি পছন্দ করে, কেনমা চিনি খেলে শক্তি সঞ্চয় হয়। সেই

তুলনায় বাংলা কবিতায় কেবল মধুর ভাবের সমাবেশ, কিম্বা শ্রাদ্ধ-বাসর থেকে আরম্ভ কোরে বিবাহ-বাসর পর্য্যন্ত কীর্ত্তন গাওয়াই প্রশস্ত এ-কথা এক ভক্ত ছাড়া অন্য কেউ বলে না। শৈশবে মিছরী ভাল লাগে, যৌবনে জয়দেবের লালিত্য ভাল লাগে, বৃদ্ধবয়সে রাস-পঞ্চাধ্যায় প্রায় সকলেরই ভাল লাগে, অতএব 'ভাল-লাগা'কে সর্ব্বসময়ে এবং সর্ব্বক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রকার মূল্য নির্দ্ধারণের সর্ব্বসাধারণ গুণনীয়ক বিবেচনা করা গণিতশাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত হলেও সত্য সিদ্ধান্ত নয়। সোজা কারণ এই যে, উক্ত প্রকার সিদ্ধান্ত মান্তে হলে অন্য অভিজ্ঞতা—যা আপাত-মধুর নয়—তাকে বাদ দিতে হয়, এবং সর্ব্বপ্রকার রসভোগকেই এক স্তরে ফেলতে হয়—যা একেবারেই অসম্ভব। ভাল-লাগা না-লাগা সময়-সাপেক্ষ, সময় মুহূর্ত্তের সমষ্টি এবং মুহূর্ত্ত ক্ষণস্থায়ী। সময় একটি বহমান ধারা। শুধু তাই নয়, আমার ভাল-লাগা না-লাগা অনেক সময়েই অন্যের ভাল-লাগার ওপর নির্ভর করে; পরের কি জন্য ভাল লাগ্‌ছে, কি লেগেছিল জানবার সুবিধা আমাদের নেই। এখানে আন্দাজ কোরতে হয়। ঠিক আন্দাজ করবার শক্তি সকলের নেই। অতএব পছন্দ, অ-পছন্দের যখন দেশ, কাল ও পাত্রানুযায়ী ভিন্ন স্তর রয়েছে, তখন সুখ-দুঃখ কিম্বা 'ভাল-লাগা না-লাগা'র কাঠামোতে সব মূল্যকে আবদ্ধ কোরলে হয়ত একটা system তৈরী হতে পারে, কিন্তু কোন প্রকার রসানুভূতির সত্য ব্যাখ্যা সম্ভবপর হয় না।

রসানুভূতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে গোলমেলে ব্যাপার এই যে, কোন্‌টি কার চেয়ে ভাল ঠিক করবার সময়ে আমাদের পূর্ব্বতন সংস্কার, স্মৃতি-শক্তি, ঔচিত্য-জ্ঞান,—অর্থাৎ সামাজিক ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান—বিচার-শক্তিকে খর্ব্ব করে, প্রকাশ্যে না হলেও অলক্ষ্যে। অনেক স্ত্রী-পুরুষের ধারণা এই যে, পারিবারিক জীবনেই তাদের চরম সার্থকতা। অতএব পারিবারিক জীবন-ভঙ্গের বর্ণনা কখনও সাহিত্য হিসাবে ভাল হতে পারে না—অন্ততঃ সে বর্ণনা যখন মাতৃভাষায় লিখিত হয়। সে-জন্য "ঘরে-বাইরে," "নৌকা-ডুবি" অপাঠ্য। আবার অনেক নব্য-নব্যারা মনে করেন যে, বাঙালী সমাজে বিধবা-বিবাহ এবং প্রেমে পড়বার স্বাধীনতা না দিলে, পতিতাদের এবং পতিত চাষীদের উদ্ধার না কোরলে, দেশের কোন আশা-ভরসা নেই, অতএব যে-কেউ ঐ মতগুলির সমর্থন কোরে যা-তা লিখুক না কেন তাই সাহিত্যপদবাচ্য হবে। আমি বৈষ্ণব, রাধা নামে আমি অজ্ঞান হয়ে যাই, ধর্ম্মহিসাবে এই রকম দশা পাওয়া দশ-দশার ওপরেও হতে পারে, কিন্তু উক্ত কারণে কীর্ত্তনের কান্নাই সুরের শ্রেষ্ঠ বিকাশ মনে করাতে সুরজ্ঞ মনের পরিচয় দেওয়া হয় না, বরঞ্চ আমার মাথার মধ্যে একটি বৃহৎ গণ্ডগোলেরই অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। এই জন্যই অন্ততঃ কোন theory of values ধর্ম্মজ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত না কোরে মনোবিজ্ঞানের ওপর, অর্থাৎ মানসিক ক্রিয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত করাই সমীচীন মনে হয়। আমি এখানে কোন ব্যক্তিগত ধর্ম্মের কথা বলছি নে। যাকে রবিবাবু Personality বোলেছেন তারই ওপর শেষকালে সব মূল্যই নির্ভর করে। কিন্তু Personality-র কোন সংজ্ঞা দেওয়া যায় না, নেই বোলেই বোধ হয়। যতক্ষণ না সংজ্ঞা দেওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ মনের তরফ থেকে একটি কাজ-চালানো সংজ্ঞা ঠিক করা দরকার মনে করি। যদি কখনও সরল ভাষায় Personatity-র স্বরূপ বোঝাতে পারি, তখন, আশা করি, প্রমাণ করা শক্ত হবে না যে, বর্ত্তমান সংজ্ঞাটি Personality-র স্বরূপ বোঝ্‌বার অনুকূল। একটি কোন ভাবের বিপত্তি ঘট্‌লে কোন ব্যক্তির কার্য্যের কি ভাবনার যতখানি বিচ্যুতি ঘটে সেই বিচ্যুতির শক্তি এবং পরিমাণের ওপরই মূল্য নির্দ্ধারণ খানিকটা স্থাপিত করা যায়। আপাততঃ আমি এই মনে করি। অন্য সময় অন্য সংজ্ঞা দেবার অধিকার আমার আছে, আশা করি পাঠক-পাঠিকারা তা স্বীকার কোরবেন।

ব্যাপারখানা এই যে, সব গোলমালের কারণ ভাষার অর্থ নিয়ে। সাধারণ কথাবার্ত্তায় যে-কথাটি কিম্বা যে-বাক্যটির যে অর্থ মনে করে ব্যবহার করি, তর্ক কিম্বা বিচারের সময় স্ব-ইচ্ছায় কিম্বা অনিচ্ছায় সেই কথা কিম্বা বাক্যের ওপর অন্য অর্থ প্রয়োগ করি। একই কথার নানা অর্থ রয়েছে।

মনের দুটি ভাষা

শ্রীধূর্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

একই বাক্যে যদি একটি কথার দু'ই বার প্রয়োগ থাকে তা'হলে সাধারণতঃ দেখা যায় যে, দ্বিতীয় প্রয়োগের অর্থ, আমাদের অলক্ষ্যে, প্রথম প্রয়োগের অর্থ হতে ভিন্ন হয়ে গিয়েছে। এই যেমন 'কারণ' কথাটি। গ্রামোফোনে সুরের 'কারণ' রেকর্ডে সূচ লাগান, যুদ্ধের 'কারণ' মানুষের মধ্যে জাত্যাভিমান এবং ভেদজ্ঞান, সৃষ্টির 'কারণ' ভগবানের লীলা—এই তিনটি বাক্যে 'কারণ' কথাটি তিনটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম কারণ কার্য্যের মুখটি উস্কে দিয়েই ক্ষান্ত, এখানে কার্য্য-কারণের সম্বন্ধটি অতি ক্ষীণ; দ্বিতীয় কারণ কার্য্যের background হিসাবে সত্য, এখানে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধটি যোদ্ধার মনে যুদ্ধের সময় সত্য নয়; এবং তৃতীয় কারণটি তর্কবুদ্ধির নিষ্ফলতা এবং পরাজয়ের চিহ্ন বোলেই গণ্য হচ্ছে। সেইজন্যই অন্ততঃ শেষের দুটি বাক্য নিয়ে অত বাজে তর্ক এবং বই লেখা হয়েছে। অতএব প্রথমেই কোন্ কথা কি ভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে তাই বুঝতে হবে।

আজকালকার মনোবিজ্ঞানে বোল্‌ছে যে, মন নিজে হতে জ্ঞান সঞ্চয় করে image অর্থাৎ প্রতিবিম্বের সাহায্যে। যদি কোন দ্বন্দ্ব, সন্দেহ, কি পুরাতন ভাবনা ও অনুভূতি মনে ওঠে, জ্ঞানতই হোক্ আর অজ্ঞানতই হোক্, তখন একটা প্রতিবিম্ব তৈরী হয়। এতদিন ধারণা ছিল যে প্রতিবিম্ব মাত্র দুই প্রকারের—বস্তুগত (concrete) এবং কথাগত (verbal)। এর মধ্যে কোনটি কানের, কোনটি চোখের, কোনটি ত্বকের, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়ে মনে ওঠে। সেইজন্য অনেকে ভাবতেন যে, প্রতিচ্ছবি যার কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশে, সেই সুরজ্ঞ হবে এবং যার চোখের সাহায্যে বেশী ওঠে সেই চিত্রকর হবে; অবশ্য শিক্ষা-দীক্ষার পর। কিন্তু এখন পরীক্ষার দ্বারা স্থিরীকৃত হয়েছে যে, মনের কোন শক্তি কিম্বা বিশিষ্ট ভাবধারার সঙ্গে এইরূপ image-types-এর কোন অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ নেই। তাই যদি হয়, তা'হলে আমাদের জান্‌তে হবে যে এমন কোন মানসিক কার্য্য কিম্বা ঘটনা সম্ভব কিনা, যার নিজের কোন রূপ থাকুক্ আর না থাকুক্, অন্ততঃ যার কথাগত ও বস্তুগত প্রতিবিম্ব মনের মধ্যে ভেসে ওঠে না। যদি সম্ভব হয় তা'হলে সেই প্রতিবিম্ব-বিহীন চিন্তার প্রকৃতি বুঝ্‌তে হবে। আমার বিশ্বাস এই যে কথাগত, বস্তুগত এবং প্রতিবিম্ববিহীন চিন্তার পরস্পর সম্বন্ধ এবং তাদের সঙ্গে আমাদের মনের সম্বন্ধটি খানিকটা বুঝ্‌তে পারলেই, শ্রেয়, শ্রেয়তর, শ্রেষ্ঠ, উন্নতি এবং অবনতি কথাগুলির ভাবার্থ ও উদ্দেশ্য পরিষ্কার হবে; অর্থাৎ কোন্‌টি সুর, কোন্‌টা সুর নয়, কে কার চেয়ে বড় কবি কিম্বা অধিকতর বুদ্ধিমান খানিকটা বুঝ্‌তে পারব। এক কথায় শ্রেয় ও শ্রেয়তর বুঝ্‌তে হলে 'তর' প্রত্যয়টির মানে শ্রেয় কথাটির আগেই বোঝা চাই।

যদি কোন ছেলেকে প্রশ্ন করা যায়, 'কথাগুলির যে রকম উল্টো জবাব বোলে দিচ্ছি সেই রকম অন্য কথার উল্টো জবাব দাও—সুখ-দুঃখ, ঘৃণা-প্রেম, আকাশ —?' তখন দেখা যায় বেশীর ভাগ সময় উত্তর হচ্ছে 'পাতাল'। এই প্রকার বিপরীত-বোধের পিছনে কোন বস্তু-সত্তা নেই। আবার যখন 'কুকুর' কথাটি শুনি কিম্বা উচ্চারণ করি তখন কেলো, ভুলো কিম্বা জ্যাকীকে মনে না কোরেও কুকুরত্বের একটি সাধারণ অর্থ জেগে ওঠে,—চার পা, ঘেউ ঘেউ করছে, মাংস খাচ্ছে, তেড়ে আসছে, ছুটে পালাচ্ছি ধরণের। এখন পরীক্ষা কোরে দেখা গিয়েছে যে কুকুর কথাটি না মনে করেও, কিম্বা কুকুরের ছবি না স্মরণ করেও,—যেমন স্বপ্নে এমন কি দিবাস্বপ্নেও,—কুকুরের প্রকৃতি এবং অর্থ মনের মধ্যে ভেসে উঠ্‌তে পারে। এই প্রকারের অনুভূতি হয় তুলনামূলক বাক্যে—যেমন 'ত্যাগ ভোগের অপেক্ষা বড় জিনিষ' কিম্বা 'যন্ত্র-সঙ্গীত কণ্ঠ-সঙ্গীত অপেক্ষা শুদ্ধ'। যখন কুতব-মিনার দেখেই তাকে অক্টারলনী মনুমেণ্টের চেয়ে বড় বলি তখন অবশ্য মনের মধ্যে শেষটির ছবি এবং তার একটি আন্দাজি মাপ থাকতে বাধ্য। কিন্তু ত্যাগের কিম্বা সুরের তুলনা-মূলক বিচারে এই প্রকার সংখ্যামূলক মাপকাঠি থাকে না। এ ক্ষেত্রে আপেক্ষিকতার মানে নিজেরা খানিকটা বুঝ্‌তে পারলেও সে মানে ভাষার সাহায্যে নিজের কাছে পরিস্ফুট এবং অন্যের কাছে বোধগম্য করবার শক্তি

হয়ত আমাদের সকলের নেই। যে ছবি কিম্বা প্রতিবিম্ব কথা কিম্বা বস্তুর প্রতীক মাত্র, তার অর্থ থাকতে বাধ্য, এবং সে অর্থ প্রকাশ করাও যেতে পারে, কিন্তু যে চিন্তার পিছনে কোন কথা কিম্বা বস্তুগত প্রতিবিম্ব নেই, শুধু বৈপরীত্য কিম্বা আপেক্ষিকতার অনুভূতি আছে, তার অর্থ যদি থাকে, তা'হলে তাকে আমাদের ভাষা এবং বস্তুর সাহায্যে সম্পূর্ণ বোঝান যায় না। এই প্রকার অনুভূতিকে নব্য মনোবিজ্ঞানে awareness বলা হয়।

অবশ্য ব্যবহারিক জগতে কথাগত এবং বস্তুগত ভাব অ-বস্তু এবং এবং অ-বাক্ ভাবের অপেক্ষা সংখ্যায় বেশী। কথার সুবিধা এই যে, মনের অন্যান্য ভাষা অপেক্ষা আমরা কথার দ্বারাই মানসিক ভাবগুলিকে অন্যের নিকট বিশদতর কোরতে পারি। শুধু তাই নয়, কথার সাহায্যে অনেক নতুন ভাবের ও ভাবনার উদ্রেক হয় এবং পুরাতন ভাবের অস্পষ্টতা দূর কোরতে পারি। বস্তুর সাহায্যে অর্থ প্রকাশ করা যায় বটে, কিন্তু সে অর্থ পরিষ্কার নয়, কারণ এক একটি বস্তু অদ্বৈত এবং অপরি-বর্ত্তনীয়। কথাগত প্রতিবিম্বের কাজ হচ্ছে চিন্তাকে স্থায়ী করা, যে বস্তুর প্রতীক তার প্রকৃতি ধার্য্য করা এবং চিন্তাধারার যুক্তি-বিচার করা। শেষে অবশ্য কথা চিন্তা-ধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে স্বাধীন হয়। কথা স্বাধীন হলে অনেক সময়ে ধরতাই বুলিতে পরিণত হয়। কথার আবৃত্তি, সাধারণতঃ, ভাবনার নিবৃত্তিরই পরিচায়ক,—যেমন আমাদের সমাজে মন্ত্রতন্ত্রের অবস্থা হয়েছে এবং স্বরাজ কথাটি খবরের কাগজে এবং গোলদিঘীর বক্তার মুখে যে-অবস্থায় উপনীত হয়েছে। কিন্তু স্বরাজ কথাটি ১৯০৬ সালের নৌরজী-কংগ্রেসে এবং তিলক, চিত্তরঞ্জনের মুখ হতে উচ্চারিত হয়ে অনেক নতুন চিন্তার উদ্রেক কোরেছিল। কথার জন্যই, অর্থাৎ ব্যবহারিক জগতে সুবিধার জন্যই, আমরা অনেক ভাবের শ্রাদ্ধ করি। কে আর পুরাতন মন্ত্রকে নতুন অর্থ দিয়ে সঞ্জীবিত করে! World Phenomenon (প্রপঞ্চ) একটি ধারা সকলেই জানে, কিন্তু ধারা কিম্বা গতি বুঝতে আমাদের কষ্ট হয়। সেইজন্য আমরা সুবিধা অনুসারে প্রপঞ্চকে ভাগ কোরে ফেলেছি, তার গতি রুদ্ধ কোরেছি। ফলে, ধারার প্রথমাংশ শেষাংশের বিপরীত বলে মনে হয়। ঐ সব স্বকৃত বিরোধের মধ্যে সত্য আত্মগোপন করে। এই যেমন, হৃদয়-বৃত্তি এক প্রকারের, বুদ্ধিবৃত্তি অন্য প্রকারের, সেইজন্য হিন্দুস্থানী সঙ্গীত, বিশেষতঃ ধ্রুপদ-খেয়াল বুঝতে মাথা খাটাতে হয়, তাদের আনন্দ intellectual ; এবং রবিবাবুর গান ও কীর্ত্তন উপভোগ কোরতে হয় প্রাণ দিয়ে—তাদের আবেদন ভাবগত বা emotional ;—যদিও খেয়ালে প্রাণ থাকতে পারে এবং কীর্ত্তন কিম্বা রবিবাবুর গান উপভোগ কোরতে হলে মাথায় কিছু ঘি থাকা চাই, এই কথাই সত্য। এই যেমন, বর্ত্তমানে স্বাদেশিকতা প্রয়োজনীয় এবং বিশ্বজনীনতা অ-প্রয়োজনীয়, যদিও সত্য কথা এই যে এ দুটির মধ্যে কোনো সাময়িক বিরোধ নেই ও থাকতে পারে না। যেখানে ঘটনার ধারাটি নিরবচ্ছিন্ন, তখন তাকে ছিন্ন কোরে, তুলনা, উপমা, বিরোধের সাহায্যে, কিম্বা কালচক্রের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ কোরে, আমরা বুঝতে এবং বোঝাতে যাই বটে, কিন্তু আমাদের চেষ্টা সার্থক হয় না, কারণ বিশেষণ দিয়ে বিশেষ্যের সত্তার সম্যক্ উপলব্ধি হয় না। এই বিচ্ছিন্নতার জন্যই গোড়া থেকে এক একটি কথা অসম্পূর্ণ অর্থ বহন করে। কিন্তু এই ভুলের সংশোধন কথার সাহায্যে অসম্ভব। সেইজন্য অন্য ভাবার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, যে ভাষায় দুটি কথার মধ্যে অতখানি অবসর নেই। কথার বাঁধন ঠাস্-বাঁধন নয়।

Ogden এবং Richards-সাহেবদ্বয় দেখিয়েছেন যে পাঁচ রকম ভাবে কথার প্রয়োগ হতে পারে। প্রথমতঃ, বস্তুর নাম হিসাবে—যেমন রাম, শ্যাম, গঙ্গা, লক্ষ্মৌ ইত্যাদি। দ্বিতীয়তঃ, শ্রোতার প্রতি বক্তার মনোভাব প্রকাশের হিসাবে,—যেমন 'মহাশয়' বোলে শ্রদ্ধেয়কে সম্বোধন করি, এবং 'ছোক্‌রা' বলি বয়স্যকে ঠাট্টার ছলে। তৃতীয়তঃ, বস্তুর প্রতি বক্তার মনোভাব দেখান হিসাবে,—যেমন রবিবাবুর গানে 'মনের কামনা' এবং "কল্লোলে"র পাতায় 'মনের কামনা'। চতুর্থতঃ, উচ্চারণের ফলে মনোভাবকে বাড়িয়ে কিম্বা কমিয়ে দেওয়া হিসাবে—

শ্রীধূর্জ্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

যেমন 'যা ইচ্ছা তাই' এবং 'যাচ্ছেতাই'। পঞ্চমতঃ, যখন কোন বস্তু কি ভাবের স্বরূপ ধরতে পারছি না কিম্বা অন্যের নিকট প্রকাশ কোরতে পারছি না তখন বোঝ্‌বার এবং বোঝাবার সাহায্য হিসাবে—যেমন 'এই মনে করুন' 'এই সত্য কথা বোলতে কি' ইত্যাদি। অতএব কথার আদর্শ হচ্ছে সেই ভাষা যেখানে বর্ণনা কোরতে গিয়ে মনের কোন attitude প্রকাশিত হবে না, প্রকাশিত হবে শুধু বস্তু, ঘটনা, সম্বন্ধগুলি। আদর্শ ভাষার একই মানে সকলের কাছে একই হওয়া চাই। কথা যোজনার রীতি-নীতি একই হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই খানেই ভাষার সামাজিকতা প্রমাণিত এবং পরীক্ষিত হয়। ভাষা পুরাতন হলে গোটা কয়েক অভ্যস্ত বুলি সামাজিক ভদ্রতার নিদর্শন বোলে গ্রাহ্য হয়,—যেমন নিমন্ত্রণ পত্রের পাঠ, 'Good morning', 'Fine weather' প্রভৃতি। এক কথায় বোলতে গেলে, নতুন চিন্তার জন্য কথার খানিকটা স্বাধীনতা থাকবে, কথার সঙ্গে কথার সম্বন্ধ, বাক্যের সঙ্গে বাক্যের ন্যায় এবং যুক্তিপূর্ণ (logical) পারম্পর্য্য থাকবে, যে-স্বাধীনতার জন্য ভাবধারা অপেক্ষাকৃত স্থায়ী হবে, যে-সম্বন্ধের জন্য সন্দেহ এবং অস্পষ্টতা দূরীকৃত হবে, এবং যে-পারম্পর্য্যের জন্য সত্তার একত্ব এবং নিরবচ্ছিন্নতা অন্ততঃ আংশিক ভাবে রক্ষিত হবে।

কথায় কিন্তু কতটুকু অংশ রক্ষিত হয়? কথায় যে চিন্তাধারা ধরা পড়ে, তার গতি ও যুক্তি রেখা ধরে চলে,—ছাপার অক্ষরেরই মতন। মনের গতি ও যুক্তি সব সময় ও-ভাবে চলে না। সেইজন্য অন্য ভাষা চাই। সুরও মনের একটি ভাষা, একটি বিশেষ প্রকাশভঙ্গী। সুরের এক একটি স্বর এক একটি অক্ষর, দুই তিনটি বিশিষ্ট স্বরের সমাবেশ যেন একটি কথা, এবং সুরটি যেন বাক্য। সব প্রকার প্রতিবিম্বই সাহিত্যের ভিত্তি, কিন্তু সুরের পিছনে কোন বস্তুগত কিম্বা কথাগত প্রতিবিম্ব নেই, আছে imageless thought। কথায় যুক্তি আছে, প্রয়োজনীয়তা আছে, অর্থ আছে, সুরে নেই। কথায় অবসর আছে, সুর অবিচ্ছিন্ন। এখন কোন্ ভাষায় দ্বারা আমাদের মনের ভাবকে কতখানি বিশদরূপে ব্যক্ত কোরতে পারা যায় এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। আমার মতে এ প্রশ্নের জবাব নেই। কারণগুলি পূর্ব্বেই উল্লেখ কোরেছি। মোদ্দা কথা এই যে প্রশ্নের জবাব দিতে হয় কথার সাহায্যে; কথার পিছনে যে-সব প্রতিবিম্ব, যে-প্রকার সংখ্যার ঘটা এবং সংস্কারের ছটা থাকে, সে-গুলিরও অতিরিক্ত অনেক প্রক্রিয়া উত্তর দিতে গেলে মনের মধ্যে তৈরী হয়। সেই সব প্রক্রিয়াকে বাদ দিলে সত্তা ধরা পড়ে না। সেগুলিকে গ্রহণ কোরলেও যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় তাও নয়। কথা ও সুরের অতিরিক্ত যদি কোন ভাষা থাকে তা'হলে উক্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সে ভাষা একমাত্র যোগীরা জানেন, দুঃখ এই যে আমরা তাঁদের ভাষা জানি না। তা সত্ত্বেও কথা ও সুর এই দুই প্রকার ভাষার সম্বন্ধ নিয়ে গোটা কয়েক মন্তব্য প্রকাশ করা যেতে পারে। মন্তব্য প্রকাশ কোরতে গিয়ে যদি ভালমন্দের রায় দিয়ে ফেলি, তা'হলে প্রথমতঃ সেটি ভাষার দোষ, এবং দ্বিতীয়তঃ আমার ভাষার দোষ। আমার ভাষার দোষ কোথায় আমি ভাল রকমই জানি।

সুরের দিকে সাহিত্যের এক প্রকার প্রকাশ আছে। এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, কবিতার অর্থ সুস্পষ্ট না হলেও, অর্থাৎ গদ্যে পরিণত না কোরতে পারলেও, সুরের দিক দিয়ে কবিতার একটি মূল্য থাকতে পারে। যেমন ইংরাজী সাহিত্যে সুইণ্‌বর্ণের অনেক কবিতা, রবিবাবুর 'সে আসে ধীরে, যায় লাজে ফিরে' প্রভৃতি কবিতা, এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের অনেক ফরাসী কবিতা। মরমী (mystic) কবিগণ এই সুরের রেশ ধরেই অন্য রাজ্যে প্রবেশ করেন, নতুন দর্শনের ল্যাজ ধরে নয়। সেক্‌সপীয়রের Merchant of Venice এবং মেটারলিঙ্কের Peleas and Melisanda নাটক খানিতেও সুরের রেশ রয়েছে। ওয়াল্টার পেটার, হুইস্‌লার, এবং অনেক ফরাসী সমালোচক বোলেছেন যে কবিতার, এমন কি ছবিরও, সুরের দিকে অভিব্যক্তিতেই তাদের চরম সার্থকতা। এই মন্তব্যের মধ্যে সত্য এইটুকু যে যেকালে কবিতার কথা ও ছন্দবিন্যাস চিন্তার ধারাকে অপ্রসন্ন কোরে দেয়, তখন সে ধারা একমাত্র বস্তু ও

বাক্যের অতিরিক্ত প্রতিবিম্ববিহীন রাজ্যের মধ্য দিয়ে বয়ে যাবে, সুরের দিকে। বিজ্ঞানের আশীর্ব্বাদে আমরা জেনেছি যে, সুর শুনে সুরেলা লোকের মনে কোন বস্তু কিম্বা কথার প্রতিবিম্ব ভেসে ওঠে না, স্বর-সংশ্লিষ্ট চিন্তার ধারাই খুলে যায়,—যেমন ইমন-কল্যাণের শুদ্ধ মধ্যম শুনে বেলা-ওলের মধ্যমের কথা মনে পড়ে। বিলাতী সুরে পাখীর কলরব, সমুদ্রের কল্লোল প্রভৃতি শব্দের অনুকরণ আছে, কিন্তু স্বরের সাহায্যে কোথাও পাখীর ডানার, কিম্বা সমুদ্রের বর্ণের নিবিড়-তার উল্লেখ নেই, আছে শুধু দীর্ঘনিঃশ্বাসের আভাস। কীট্‌সের Hyperion-এ ইয়ুরেণসের বক্তৃতায় এই প্রকার মর্ম্মরধ্বনির ইঙ্গিত আছে, কিন্তু সে বর্ণনার বাহাদুরী তুলনায় এবং সুরাত্মক ছন্দে। যদি কখনও কেউ স্যার লাণ্ডন্ রোণাল্ডের মতন রবিবাবুর বলাকা কবিতাটিকে সুরে গ্রথিত কোরতে পারতেন, তাহ'লে দেখা যেত যে সুরের ভাষা কথা হতে কত পৃথক। নন্দলালবাবুর বলাকা নামক ছবিখানি ছবি হিসাবে একখানি উৎকৃষ্ট ছবি। কিন্তু সেটি বলাকা কবিতার তুলির তর্জ্জমা নয়। সে ছবিখানি দেখ্‌লে সুরাত্মক কোন চিন্তার ধারা উন্মুক্ত হয় না, কিন্তু বলাকা কবিতাটি শুনলে সুর ও ছবি দুই মনের পটে ভেসে ওঠে। অবশ্য মনের ওপর হিন্দুস্থানী সুরের কি প্রভাব তা জানি না, সে বিষয়ে কোন পরীক্ষা হয় নি, তবে এটা জানি যে টোড়ী কি আসোয়ারী শুনলে হরিণ ও সাপের ছবি মনে আসে না। সেই জন্য রাগ-রাগিণীর কোন চিত্রগত মূল্য নেই। সেদিন *Illustrated London News*-এ একটি মেয়ে অনেক সুরের ছবি এঁকেছেন দেখ্‌ছিলাম; তিনি নাকি সুরগুলির নাম পর্য্যন্ত জানতেন না। না জেনে যা ছবি এঁকেছেন তার সঙ্গে সুরগুলির বিষয়ের অনেক সাদৃশ্য আছে। এই থেকে প্রমাণ হয় না যে সুরের আত্মা প্রেতাত্মার মতন আকৃতি ধরতে পারে, যে আকৃতি হিষ্টিরিয়া-প্রবণ গায়ক কিম্বা মেয়ে-পটুয়ার মিডিয়মে আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠবে। সুরের রূপ আছে, সেই রূপটি অনুভব কোরে কবি ও চিত্রকর নিজেদের বিশিষ্ট ভাষায় নতুন রূপ সৃষ্টি কোরতে পারেন। এ সৃষ্টির রূপ সুরের রূপ হতে পৃথক, তার প্রতিচ্ছবি মোটেই নয়। সে যাই হোক্ এ কথা সত্য, যে-ভাষা যত অ-প্রকাশিত imageless thought-কে প্রকাশ করবে সে-ভাষা ততই সুরেলা হবে এবং সুরেলা হওয়া ভাষার সম্পদের কথা।

কথা ও সুর সম্বন্ধে দ্বিতীয় মন্তব্য এই হতে পারে যে, যেখানে কথা হার মেনে কাঁদে সেইখানেই সুর আরম্ভ হয়। অর্থাৎ সাহিত্য ও সুর একই মনের ভাষা, তবে ভিন্ন স্তরের। আমি এক স্তরের সঙ্গে অন্য স্তরের সম্বন্ধকে অস্বীকার করছি না। অসভ্য অবস্থার চীৎকার এবং অঙ্গভঙ্গী ছেড়ে দিলে, সভ্য মানুষ সর্ব্বপ্রথমেই নিজের মনোভাব ব্যক্ত করে কথা দিয়ে, তারপর কথায় সুর মিশিয়ে। শেষ অবস্থা অবাঙ্‌মনসগোচরম্। অতদূর না গিয়েও মানুষ বেঁচে থাকতে পারে। ঐ পর্য্যায়টি কেবল সময়-সাপেক্ষ, গুণ-সাপেক্ষ নয়, কেননা কথা যা পারে সুর তা পারে না, এবং সুর যা পারে কথা সে কাজ পারে না, এবং কথা ও সুর দুই-ই সত্তাকে সঠিক ভাবে প্রকাশ কোরতে অক্ষম। যা প্রকাশিত হচ্ছে তাই সৎ, কিন্তু যাই সৎ তাই প্রকাশিত নয়। সময়ের কিম্বা পর্য্যায়ের এমন কোন অন্তর্নিহিত মর্য্যাদা নেই যার বলে যেটি পরে আসে সেটি পূর্ব্বের অপেক্ষা শ্রেয়। (এই হিসাবেই সামাজিক উন্নতির কোন অর্থ নেই।) পরে এলে যদি উদ্দেশ্যসিদ্ধির অধিকতর সুবিধা হত, তা'হলে না হয় সুর কথার চেয়ে বড় হত। কিন্তু বিশেষ্য যখন তার সমস্ত বিশেষণেরও অতিরিক্ত, এবং আদর্শ ভাষা যখন ethical attitude বর্জ্জিত, তখন, সুর বড় না সাহিত্য বড়, এ কথাই ওঠে না। অর্থ এবং যৌক্তিকতার দ্বারা কথা সত্তার রূপ প্রকাশ করে, সুর কিন্তু অর্থের ধার ধারে না, যৌক্তিকতা মানে না। সুর হচ্ছে একটি স্বরে তৈরী symbol মাত্র। সুর প্রতীক সৃষ্টি কোরেই ক্ষান্ত, যে-প্রতীক বস্তুর, কিম্বা কথার আভাস হতে পারে, প্রতিকৃতি কিম্বা প্রতিচ্ছবি মোটেই নয়। যতটুকু আভাস দিয়ে বোঝান যায় সুর ততটুকুই বোঝাতে পারে, বেশীও নয় কমও নয়। এই হিসাবে সুরকে সঙ্গীতেরও অতিরিক্ত বলা যেতে

শ্রীধূর্জ্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

পারে, সত্তার সম্পূর্ণতর প্রকাশ হিসাবে নয়। লোকে যখন 'একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল' কিম্বা পিনাল কোডের সূত্রগুলি এক বাসর-ঘর ছাড়া অন্য কোথাও গায় না, তখন সঙ্গীতে কবিতার আবশ্যকতা আছে এ-কথা বোলতেই হবে। কবিতায় কথা চাই, বাক্য চাই, সব বাক্যের অর্থ থাকা চাই,—সে অর্থ গদ্যে তর্জ্জমা করা যাক্ আর না যাক্, সে অর্থ প্রত্যক্ষ অনুভূতি-সাপেক্ষ হোক্ আর না হোক্। অর্থবিহীন 'তিলানা' সুর হতে পারে, কিন্তু সঙ্গীত নয়। আমরা গানকে যে দুই ভাগে ভাগ কোরেছি—(সুরে বসানো কবিতা এবং সঙ্গীত) তার মধ্যে প্রথমটিতে কবিতার অর্থ, অর্থাৎ কবিতার বিষয়টির সঙ্গে গায়কের মানসিক সম্বন্ধ, কিম্বা সেই বিষয়টির সঙ্গে শ্রোতার মানসিক সম্বন্ধ যতটা গায়ক বুঝেছেন তারই ইঙ্গিত দেওয়া গায়কের কর্ত্তব্য বোলে মনে হয়। সঙ্গীত-গায়কেরও ঐ ধরণের কর্ত্তব্য রয়েছে, কিন্তু সে কর্ত্তব্যপালনের রীতি-নীতি সঙ্গীত-রচয়িতার পদ্ধতির দ্বারা আবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত। প্রথমটির যা উদ্দেশ্য, দ্বিতীয়টির তা নয়, অর্থাৎ রবিবাবু এবং অতুলপ্রসাদের গান ভাল কোরে গাইতে হলে রবিবাবু এবং অতুলপ্রসাদের মনে কবিতার যে-অর্থ যে-সুরের রূপ ধরে উঠেছে সেই রূপেরই প্রকাশ কোরতে হবে। কিন্তু শুদ্ধ সুরে, যেমন যন্ত্র-সঙ্গীতে, এ প্রকার অধীনতা নেই। স্বাধীনতা যেকালে অধীনতার অতিরিক্ত, তখন সুর সঙ্গীতের অতিরিক্ত মানতেই হবে। স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে? সেইজন্যই বোধ হয় দিলীপকুমার কবিতা গেয়ে থাকেন; সঙ্গীত গান না, সঙ্গীতে তাদের স্বাধীনতা নেই বোলেই। কিন্তু এই যুক্তি অনুসারে তাঁর বীণা বাজানোই উচিৎ ছিল।

তা'হলে সুর এবং সাহিত্য নিয়ে কোন মূল্য-পদ্ধতি দাঁড় করান শক্ত বোলেই মনে হয়। আমার বিশ্বাস যে, সাহিত্য সম্বন্ধে যদি বা কিছু তত্ত্ব বার করা যায়, সুরের সম্বন্ধে নীরব থাকাই শ্রেয়ঃ। যে জিনিষের ব্যবহারিক জগতে কোন উপকারিতা নেই, তার মূল্য ব্যবহারিক জীবনের মাপকাঠি দিয়ে নির্দ্ধারণ করা যায় না। সুরের কোন উপকারিতা, প্রয়োজনীয়তা এবং কোন প্রকার অর্থ না থাকার জন্য, এবং সুরের শুধু রূপই আছে এই বিশেষত্বের জন্য আমরা স্বরের শুদ্ধতা এবং অলঙ্কারের ওজন-জ্ঞানই সুর সম্বন্ধে বিচারের একমাত্র ভিত্তি বোলতে বাধ্য হই। সুরের অন্যান্য সাহিত্যিক গুণের কথা আমরা ভাল কোরে জানি না, সেগুলি দেশ, কাল, পাত্র এবং ঐতিহ্যের ওপর নির্ভর করে। সেইজন্যই বিলাতী ঐক্যতান অত্যন্ত খারাপ লাগে, কিন্তু স্বরের শুদ্ধতা এবং ওজন-জ্ঞান দিয়ে বিচার কোরলে কোনো বিদেশী বাদক আর্টিষ্ট কি না অতি সহজেই বোঝা যায়। মনের ওপর সুরের প্রভাব বিশ্লেষণ করা ভারী শক্ত কাজ। আমাদের nervous system-এর প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আমরা এখনও সম্পূর্ণ জ্ঞানী হইনি। এই অজ্ঞানতার ওপর আবার একটি ভুল ধারণা রয়েছে, যার উৎপত্তি হচ্ছে চিন্তাধারার মানসিক ক্রিয়াগুলিকে বিচ্ছিন্ন করবার অভ্যাসে। অনেকে সুরজ্ঞানকে একটি বিশিষ্ট জ্ঞান বলেন, যে জ্ঞান, যে রসবোধ কারুর থাকে, কারুর থাকে না। যে অনুভূতি একান্ত, তার একটি দাম্ভিকতা থাকে। এই প্রকার অনুভূতি সম্বন্ধে আমাদের এই ধারণা যে, তাকে বিশ্লেষণ কোরলে সেটি অদৃশ্য হয়, যেমন ভগবৎপ্রেম, ব্রহ্মজ্ঞান। কিন্তু সুরবোধ কারুর একচেটে নয় আমি দেখেছি, যদিও আমার পূর্ব্বে এই ধারণা ছিল। আমার পরিচিতের মধ্যে এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা ইমন ও কল্যাণের প্রভেদ না জেনেও আমার অপেক্ষা অতি সহজে কে ইমন, কে কল্যাণ ভাল গাইছেন এবং কে গাইছেন না বুঝতে পারেন। শুধু তাই নয়, গুচ্ছ স্বরের একটি বিশিষ্ট তাৎপর্য্য আছে যেটি পর পর স্বর কয়টি গাইলে ধরা পড়ে না। রে, গা, রে, মা, গা গুচ্ছটির সঙ্গে গৌড় সারং-এর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে, যদিও রে, গা, মা স্বর কয়টির কোন স্বাধীন মূল্য নেই, কারণ এই তিনটি স্বর অনেক সুরেই ব্যবহৃত হয়। ঐ তিনটি স্বরের একটি বিশিষ্ট সমাবেশ ও সমন্বয়ের মূল্য প্রত্যেক স্বরের মূল্য যোগ কোরে নয়, তারও অতিরিক্ত একটা কিছু, যেমন

রসায়ন-শাস্ত্রে নূতন, পুরাতনের অতিরিক্ত। এই নূতনত্বের প্রক্রিয়া আমরা জানি না। হয়ত সেটি মীড়ের ওপর কিম্বা আর্টিষ্টের ওপর নির্ভর করে। সে যাই হোক, এই অজ্ঞতার উপর আবার প্রত্যেক স্বরের ভিন্ন ভিন্ন pitch, timbre রয়েছে, যা যন্ত্র অনুসারে, গলার আওয়াজ অনুসারে তফাৎ হয়ে যায়। যেমন একই সুর বীণায় গম্ভীর, এস্রাজে করুণ, মেয়েদের গলায় মধুর হয়ে ওঠে। আবার গমক, মীড়, মূর্চ্ছনা, আশ সুরের যেন রং বদ্‌লে দেয়। সেইজন্য ভাবরাজ্যে সুর এমন বিপ্লব এনে দেয়, এমন অজ্ঞাত উপায়ে রস সঞ্চার করে যে, সুরের কোন মূল্য-তত্ত্ব আবিষ্কার করা আপাততঃ অসম্ভব।

আমার শেষ কথা এই যে, সাহিত্য ও সুরের আদিতে একই জিনিষ বিদ্যমান—আর্টিষ্টের মন এবং সেই মনের চিন্তাধারাকে বিকাশ করবার এবং রূপ দেবার প্রয়াস। এই মন রাম, শ্যাম, যদুর মন নয়, এবং এই প্রয়াস একান্তই স্বতঃপ্রণোদিত। এই প্রেরণাতে কোন নীতি নেই, নিয়তি আছে। এখানে কার্য্য-কারণ-পরম্পরা অবশ্য থাকতে বাধ্য, কিন্তু এখানে কারণের ন্যায়-অন্যায় বিচার,—অর্থাৎ উদ্দেশ্যসাধন ব্যতীত অন্য কোন প্রকার সামাজিক, ব্যবহারিক কিম্বা ধর্ম্মসংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তার বিচার—নেই। শুক্তো রাঁধতে হলে তিক্ত-কষায় দরকারী, তিক্ত কষায় না দিলে শুক্তো হবে না, অন্য কিছু হবে, এর বেশী ঔচিত্যজ্ঞানের আবশ্যক এখানে নেই। অবশ্য সুর কিম্বা সাহিত্যের মূল্য একটি সমগ্র ফলের (gestalt-এর) ওপর নির্ভর করে। প্রত্যেক কার্য্যের পক্ষে সেই কার্য্যের জ্ঞাত কারণগুলিই ন্যায়সঙ্গত কারণ, সে কারণগুলি না ঘটলে কার্য্যটি সমগ্র হত না। অতএব বিশ্লেষণের ফলে একটি সম্বন্ধের যে কারণগুলি আবিষ্কৃত হয় তাদের একমাত্র কার্য্য ও মূল্য, ঘটা ও হওয়া ছাড়া অন্য কিছু নয়। মূল্য নির্দ্ধারিত হয় সমগ্র ও একান্ত কার্য্যের দ্বারা, কিন্তু ব্যবহারিক জগতে একান্তের আশায় বোসে থাক্‌বার ধৈর্য্য আমাদের নেই। সেইজন্য আর্টের জগৎ সৃষ্টিছাড়া জেনেও কথাবার্ত্তায় কে বড়, কে ছোট প্রশ্ন সর্ব্বদাই কোরে থাকি।

সনেট

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

সফল

তুমি বুঝিবেনা তাহা—কত ব্যথা নিয়ে
পূর্ণ পাত্র ফিরে দিনু অধরেতে আনি,
তারি সাথে নিরাশার আধফোটা বাণী
তোমারে শুনানু শুধু কাতরে চাহিয়ে।
কত না অপূর্ণ সাধ—জানিনা কি দিয়ে
প্রাণের মিটাব ক্ষুধা; এই শুধু জানি
রিক্ত করিব না ওই মুগ্ধ হৃদিখানি
সুধার সঞ্চয় তার গোপনেতে পিয়ে।

যদি চোখে জল আসে—সেটুকু জানিও
পিছু ফিরে চাওয়া শুধু মরণের কূলে,
তোমার সরম-বাসে তারে ঢাকি' দিও;

কল্পলোকে একদিন রক্তরাঙা ফুলে
বিকশি' উঠিবে তাহা; অলকে পরিও
সেই দিন সেই ফুল আমারেও ভুলে।

বিফল

সে রাতি ভুলিনি আজো—স্মৃতিপটে লিখা—
তোমার নূপুর-ধ্বনি শুনিবার আশে
জেগে ব'সেছিনু মোর বাতায়ন-পাশে,
যদি এসে ফিরে যাও, হে অভিসারিকা।
বাহিরে চাঁদিনী রাতি, ঘরে দীপ-শিখা,
আকাঙ্ক্ষার কল্পনার নির্লজ্জ বিলাসে
বাসর ভরিয়াছিল; পরশ-তিয়াসে
শিহরি উঠিতেছিল কণ্ঠের মালিকা।

যখন ডুবিল চাঁদ মালাটী শুকালো,
চোখে এল ঘুমঘোর, ক্লান্ত তনুখানি,
তুমি এলে—ভালে দীপ্ত প্রভাতের আলো—

বাসরের দীপ-শিখা কখন্ না জানি
সরমে মরিয়া গেল; কোথায় লুকালো
উদাস ভৈরবী মাঝে কামনার বাণী।

ভানুসিংহের পত্রাবলী

পত্রের পাত্র

১। ভানুসিংহ

২। একটি দশমবর্ষীয়া বালিকা

১

শান্তিনিকেতন

তোমার চিঠির জবাব দেব ব'লে চিঠিখানি যত্নসহকারে রেখেছিলুম, কিন্তু কোথায় রেখেছিলুম সে কথা ভুলে যাওয়াতে এতদিন দেরি হয়ে গেল। আজ হঠাৎ না খুঁজতেই ডেস্কের ভিতর হ'তে আপনিই বেরিয়ে পড়্‌ল।

কবি-শেখরের কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করেচ। রাজকন্যার সঙ্গে নিশ্চয় তার বিয়ে হ'ত, কিন্তু তার পূর্ব্বেই সে মরে গিয়েছিল। মরাটা তার অত্যন্ত ভুল হয়েছিল, কিন্তু সে আর এখন শোধ্‌রাবার উপায় নেই। যে খরচে রাজা তার বিয়ে দিত সেই খরচে খুব ধুম ক'রে তার অন্ত্যেষ্টি সৎকার হয়েছিল।

ক্ষুধিত পাষাণে ইরাণী বাঁদির কথা জান্‌বার জন্যে আমারও খুব ইচ্ছে আছে কিন্তু যে-লোকটা বল্‌তে পারত আজ পর্য্যন্ত তার ঠিকানা পাওয়া গেল না।

তোমার নিমন্ত্রণ আমি ভুল্‌ব না—হয়ত তোমাদের বাড়ীতে একদিন যাব, কিন্তু তার আগে তুমি যদি আর-কোনো বাড়ীতে চলে যাও? সংসারে এই রকম ক'রেই গল্প ঠিক জায়গায় সম্পূর্ণ হয় না।

এই দেখ না কেন, খুব শীঘ্রই তোমার চিঠির জবাব দেব ব'লে ইচ্ছা করেছিলুম, কিন্তু এমন হ'তে পারত তোমার চিঠি আমার ডেস্কের কোণেই লুকিয়ে থাকত, এবং কোনোদিনই তোমার ঠিকানা খুঁজে পেতুম না।

যেদিন বড়ো হ'য়ে তুমি আমার সব বই প'ড়ে বুঝ্‌তে পার্‌বে তার আগেই তোমার নিমন্ত্রণ সেরে আস্‌তে চাই। কেননা যখন সব বুঝ্‌বে তখন হয়ত সব ভাল লাগ্‌বে না—তখন যে-ঘরে তোমার ভাঙা পুতুল থাকে সেই ঘরে রবিবাবুকে স্থান দেবে।

ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। ইতি—৩রা ভাদ্র ১৩২৪।

২

কলিকাতা

আমার একদিন ছিল যখন আমি ছোটো ছিলুম—তখন আমি ঘন ঘন এবং বড়ো বড়ো চিঠি লিখ্‌তুম। তুমি যদি তার আগে জন্মাতে, যদি অনর্থক এত দেরী না করতে, তাহলে আমার চিঠির উত্তরের জন্য একদিনও সবুর কর্‌তে হ'ত না। আজ আর চিঠি লেখ্‌বার সময় পাই নে। তোমার বয়স আমার যখন ছিল তখন নিজের ইচ্ছের চিঠি লিখ্‌তুম, এখন অন্যের ইচ্ছের এত বেশী লিখ্‌তে হয় যে, নিজের ইচ্ছেটা মারাই গেল। তারপরে আবার ভয়ানক কুঁড়ে হয়ে গেছি। যত বেশী কাজ করতে হচ্ছে ততই কুঁড়েমি আরো বেড়ে যাচ্ছে। এখন

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লিখে যাওয়ার চেয়ে ব'কে যাওয়া ঢের বেশী সহজ মনে হয়। যদি তেমন সুবিধে হ'ত তো দেখিয়ে দিতুম বকুনিতে তুমি কখনো আমার সঙ্গে পেরে উঠ্‌তে না। সেটা তোমার ভাল লাগ্‌ত কিনা বল্‌তে পারিনে। কেননা তোমার যতগুলি পুতুল আছে তারা কেউ তোমার কথার জবাব করে না। তুমি যা বলো তাই তারা চুপ ক'রে শুনে যায়। আমার দ্বারা কিন্তু সেটা হবার জো নেই—অন্যের কথা শোনার চেয়ে অন্যকে কথা শোনানো আমার অভ্যেস হ'য়ে গেছে। আমার বড়ো মেয়ে যখন ছোটো ছিল তখন বকুনিতে তার সঙ্গে পারতুম না, কিন্তু এখন সে বড় হয়ে শ্বশুরবাড়ী চ'লে গেছে। তারপর থেকে আমার সমকক্ষ কাউকে পাইনি। তোমাকে পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌তে আমার খুব ইচ্ছা রইল। একদিন হয়ত তোমাদের সহরে যাব। তুমি লিখেচ আমাকে গাড়ীতে ক'রে নিয়ে যাবে। কিন্তু আগে থাক্‌তে ব'লে রাখি আমাকে দেখ্‌তে নারদমুনির মত—মস্ত বড় পাকা দাড়ি। ভয় কোরো না, আমি তার মতই ঝগড়াটেও বটে, কিন্তু ছোটো মেয়েদের সঙ্গে ঝগড়া করা আমার স্বভাব নয়। তোমার কাছে খুব ভাল মানুষটির মতো থাক্‌বার আমি খুব চেষ্টা করব—এমন কি কবিশেখরের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়েতে যদি তোমার মত থাকে আমি স্বয়ং তার ঘটকালি ক'রে দিতে রাজি আছি। ইতি—২১শে ভাদ্র, ১৩২৪।

৩

কলিকাতা

তোমার সঙ্গে চিঠি লিখে জিত্‌তে পারব না এ আমি আগে থাক্‌তে ব'লে রাখ্‌চি। তোমার মতো বাসন্তী রঙের কাগজ আমি খুঁজে পেলুম না। সামান্য শাদা কাগজই সব সময়ে খুঁজে পাইনে। তোমাকে তো আগেই বলেচি, আমি কুঁড়ে। তারপরে, আমি ভারি এলোমেলো, —কোথায় কি রাখি তার কোনো ঠিকানা পাইনে। এমন আমার আরো অনেক দোষ আছে। এই তো গেল চিঠির কাগজের কথা। তারপরে ভেবেছিলুম ছবি এঁকে তোমার সচিত্র চিঠির উপযুক্ত জবাব দেব—চেষ্টা করতে গিয়ে দেখ্‌লুম অহঙ্কার বজায় থাক্‌বে না। এ বয়সে নতুন করে হাঁস আঁক্‌তে বসা আমার পক্ষে [illegible]বে না —অক্ষরের পেটের নীচে খণ্ড ত জুড়েও সুবিধে করতে পারলুম না—সেটা এই রকম বিশ্রী দেখতে হল। অনেক সময় পদ্মার চরে কাটিয়েচি; সেখানে হাঁসের দল ছাড়া আমার আর সঙ্গী ছিল না। তাদের প্রতি আমার মনের কৃতজ্ঞতা থাকাতেই আমাকে আজ থেমে যেতে হ'ল—এবারকার মতো তোমার হাঁসেরই জিৎ রইল। এই তো গেল ছবি, তারপরে সময়। তাতেও তোমার সঙ্গে আমার তুলনাই হয় না। তাই ভয় হচ্চে শেষকালে তুমি রাগ ক'রে আর কোনো গল্প-লিখিয়ে গ্রন্থকারের সঙ্গে ভাব করবে—কিন্তু নিমন্ত্রণ আমার পাকা রইল।

৪

কলিকাতা

তুমি দেরি ক'রে আমার চিঠির উত্তর দিয়েছিলে এতে আমার রাগ করাই উচিত ছিল, কিন্তু রাগ করতে সাহস হয় না—কেননা আমার স্বভাবে অনেক দোষ আছে—দেরী ক'রে উত্তর দেওয়া তার মধ্যে একটি। আমি জানি তুমি লক্ষ্মী মেয়ে, তুমি অনেক সহ্য করতে পারো; আমার কুঁড়েমি, আমার ভোলা-স্বভাব, আমার এই সাতান্ন বছর বয়সের যত রকম শৈথিল্য সব তোমাকে সহ্য করতে হবে। আমার মতো অন্যমনস্ক অকেজো মানুষের সঙ্গে ভাব রাখ্‌তে হলে খুব সহিষ্ণুতা থাকা চাই—চিঠির উত্তর যত পাবে তার চেয়ে বেশী চিঠি লেখ্‌বার মতো শক্তি যদি তোমার না থাকে, দেনা-পাওনা সম্বন্ধে তোমার হিসাব যদি খুব বেশী কড়াক্কড় হয় তাহলে একদিন আমার সঙ্গে হয়ত বা ঝগড়া হ'তেও পারে, সেই কথা মনে ক'রে ভয়ে ভয়ে আছি। কিন্তু একথা আমি জোর ক'রে বল্‌চি যে, ঝগড়া যদি কোনো দিন বাধে তার অপরাধটা আমার দিকে ঘট্‌তে পারে, কিন্তু রাগটা তোমার দিকেই হবে। আর যা'হোক্

আমি রাগী নই। তার কারণ এ নয় যে, আমি খুব ভালোমানুষ, তার কারণ এই যে, আমার স্মরণশক্তি ভারি কম। রাগ করবার কারণ কি ঘটেচে সে আমি কিছুতেই মনে রাখ্‌তে পারিনে। তুমি মনে কোরো না কেবল পরের সম্বন্ধেই আমার এই দশা, নিজের দোষের কথা আমি আরো বেশী ভুলি। চিঠির জবাব দিতে যখন ভুলে যাই তখন মনেও থাকে না যে ভুলে গেছি; কর্ত্তব্য করতে ভুলি, ভুল সংশোধন করতেও ভুলি, সংশোধন করতে ভুলেচি তাও ভুলি। এমন অদ্ভুত মানুষের সঙ্গে যদি বন্ধুত্ব কর এবং সে বন্ধুত্ব যদি স্থায়ী রাখ্‌তে চাও তাহলে তোমাকেও অনেক ভুল্‌তে হবে, বিশেষত চিঠির হিসাবটা।

পদ্মার ধারের হাঁসেদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হ'ল কি ক'রে জিজ্ঞাসা করেচ। বোধ হয় তার কারণ এই যে, বোবার শত্রু নেই। ওরা যখন খুব দল বেঁধে চেঁচামেচি করে আমি চুপ ক'রে শুনি, একটিও জবাব দিইনে। আমি এত বেশী শান্ত হয়ে থাকি যে, ওরা আমাকে মানুষ ব'লে গণ্যই করে না—আমাকে বোধ হয় পাখীর অধম বলেই জানে—কেননা আমার দুই পা আছে বটে কিন্তু ডানা নেই। আর যাই হোক্ ওদের সঙ্গে আমার চিঠিপত্র চলে না—যদি চল্‌ত তাহলে আমাকেই হার মান্‌তে হ'ত—কেননা ওদের ডানা-ভরা কলম আছে, আর ওদের সময়ের টানাটানি খুব কম।

তোমাকে যে এত বড় চিঠি লিখ্‌লুম আমার ভয় হচ্চে পাছে বিশ্বাস না করো যে আমার সময় কম। অনেক কাজ পড়ে আছে—কাজ ফাঁকি দিয়েই তোমাকে চিঠি লিখ্‌চি—কাজ যদি না থাকৃত তা'হলে কাজ ফাঁকি দেওয়াও চল্‌ত না।

বেলা অনেক হয়ে গেচে—অনেক আগে স্নান করতে যাওয়া উচিত ছিল—হাঁসেদের কথায় হঠাৎ স্নানের কথাটা মনে পড়ে গেল—তা'হলে আজ চল্লুম। আজ রাত্রে বোলপুর যেতে হবে। ইতি—৬ই কার্ত্তিক, ১৩২৪।

৫

শান্তিনিকেতন

তোমাদের বইয়ে বোধ হয় প'ড়ে থাকবে, পাখীরা মাঝে মাঝে বাসা ছেড়ে দিয়ে সমুদ্রের ওপারে চ'লে যায়। আমি হচ্চি সেই-জাতের পাখী। মাঝে মাঝে দূর পার থেকে ডাক আসে, আমার পাখা ধড়ফড় ক'রে ওঠে। আমি এই বৈশাখ মাসের শেষ দিকে জাহাজে চ'ড়ে প্রশান্ত মহাসাগরে পাড়ি দেব ব'লে আয়োজন করচি। যদি কোনো বাধা না ঘটে তাহলে বেরিয়ে পড়্‌ব। পশ্চিম দিকের সমুদ্রপথ আজকাল যুদ্ধের দিনে সকল সময়ে পারের দিকে পৌঁছিয়ে দেয় না, তলার দিকেই টানে। পূর্ব্ব দিকের সমুদ্রপথ এখনো খোলা আছে—কোন্‌দিন হয়ত দেখ্‌ব সেখানেও যুদ্ধের ঝড় এসে পৌঁচেছে। যাই হোক্ তোমার কাশীর নিমন্ত্রণ যে ভুলেচি তা মনে কোরো না; তুমি আয়োজন ঠিক ক'রে রেখো, আমি কেবল একবার পথের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া, জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি দুটো চারটে জায়গায় নিমন্ত্রণ চট্‌ ক'রে সেরে নিয়ে তারপরে তোমার ওখানে গিয়ে বেশ আরাম ক'রে বস্‌ব—আমার জন্যে কিন্তু ছাতু কিম্বা রুটি, অড়রের ডাল এবং চাট্‌নির বন্দোবস্ত করলে চল্‌বে না; তোমাদের মহারাজ নিশ্চয়ই খুব ভাল রাঁধে, কিন্তু তুমি যদি নিজে স্বহস্তে শুক্‌তানি থেকে আরম্ভ ক'রে পায়স পর্য্যন্ত রেঁধে না খাওয়াও তা'হলে সেই মুহূর্ত্তেই আমি—কি করব এখনো তা ঠিক করিনি—ভাব্‌ছিলুম না খেয়েই সেই মুহূর্ত্তেই আবার অষ্ট্রেলিয়া চ'লে যাব—কিন্তু প্রতিজ্ঞা রাখ্‌তে পারব কিনা একটু সন্দেহ আছে সেইজন্যেই এখন কিছু বল্লুম না। কিন্তু রান্না অভ্যাস হয়নি বুঝি? তাই বলো। কেবলি পড়া মুখস্থ করেছ? আচ্ছা, অন্ততঃ এক বছর সময় দিলুম—এর মধ্যেই মার কাছে শিখে নিয়ো। তাহলে সেই কথা রইলো, আপাতত আমাকে কল্‌কাতায় যেতে হবে,

বাক্সগুলো গুছিয়ে ফেলা চাই। আমি খুব ভালো গোছাতে পারি। কেবল আমার একটু যৎসামান্য দোষ আছে—প্রধান-প্রধান দরকারী জিনিষগুলো প্যাক ক'র্‌তে প্রায়ই ভুলে যাই—যখন তাদের দরকার হয় ঠিক সেই সময় দেখি তাদের আনা হয়নি। এতে বিষম অসুবিধা হয় বটে কিন্তু গোছাবার ভারি সুবিধে—কেননা বাক্সের মধ্যে যথেষ্ট জায়গা পাওয়া যায়, আর বোঝা কম হওয়াতে রেলভাড়া জাহাজভাড়া অনেক কম লাগে। দরকারী জিনিষ না নিয়ে অদরকারী জিনিষ সঙ্গে নেবার আর-একটা মস্ত সুবিধে হচ্চে এই যে—সেগুলো বার-বার বের-করাকরির দরকার হয় না, বেশ গোছানোই থেকে যায়; আর যদি হারিয়ে যায় কিম্বা চুরি যায় তাহলেও কাজের বিশেষ ব্যাঘাত কিম্বা মনের অশান্তি ঘটে না। আজ আর বেশী লেখ্‌বার সময় নেই, কেননা আজ তিনটের গাড়ীতেই রওনা হ'তে হবে। গাড়ী ফেল করবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা আমার আছে, কিন্তু সে ক্ষমতাটা আজকে আমার পক্ষে সুবিধার হবে না; অতএব তোমাকে নববর্ষের আশীর্ব্বাদ জানিয়ে আমি টিকিট কিন্‌তে দৌড়লুম। ইতি—২রা বৈশাখ, ১৩২৫।

৬

শান্তিনিকেতন

কাল সন্ধ্যাবেলায় স্তরে স্তরে গাঢ় নীল মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল—তখন নীচের সেই পূবদিকের বারান্দায় সাহেবে আমাতে মিলে খাচ্ছিলুম—আমার আর-সব খাওয়া হ'য়ে গিয়ে যখন চিঁড়েভাজা খেতে আরম্ভ করেচি এমন সময় পশ্চিমদিক থেকে সোঁ সোঁ করে হাওয়া এসে সমস্ত কালো মেঘ আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত বিছিয়ে দিলে। কতদিন পরে ঐ সজল মেঘ দেখে আমার চোখ জুড়িয়ে গেল। যদি আমি তোমাদের কাশীর হিন্দুস্থানী মেয়ে হ'তুম তাহলে কাজ্‌রী গাইতে গাইতে শিরীষগাছের দোলাটাতে দুল্‌তে যেতুম। কিন্তু এণ্ড্রুজ্‌ কিম্বা আমি, আমাদের দু'জনের কারো হিন্দুস্থানী মেয়ের মত আকৃতি প্রকৃতি কিম্বা চালচলন নয়, তা ছাড়া সে কাজ্‌রী গান জানে না, আমিও যা জান্‌তুম ভুলে গেচি। তাই দু'জনে মিলে উপরে আমার ছাদের সাম্‌নেকার বারান্দায় এসে বস্‌লুম। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঘনবৃষ্টি নেমে এল—জলে বাতাসে মিলে আকাশময় তোলপাড় ক'রে বেড়াতে লাগ্‌ল। আমার ছাদের সাম্‌নেকার পেঁপে গাছটার লম্বা পাতাগুলোকে ধ'রে ঠিক যেন কানমলা দিতে লাগ্‌ল। শেষকালে বৃষ্টি প্রবল হ'য়ে গায়ে যখন ছাঁট লাগ্‌তে আরম্ভ হ'ল, তখন আমার সেই কোণটাতে এসে আশ্রয় নিলুম। এমন সময় চোখ ধাঁদিয়ে কড়কড় শব্দে প্রকাণ্ড একটা বাজ পড়্‌ল। আমাদের মনে হ'ল বাগানের মধ্যেই কোথাও পড়েচে, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গিয়ে দেখি হরিচরণ পণ্ডিতের বাসার দিকে ছেলেরা ছুটচে। সেই বাড়ীতেই বাজ পড়েছিল। তখন তাঁর বড় মেয়ে উনানে দুধ জ্বাল দিচ্ছিলেন, তিনি অজ্ঞান হ'য়ে পড়লেন। ছেলেরা দূর থেকে দেখ্‌তে পেলে চালের উপর থেকে ধোঁয়া উঠ্‌তে আরম্ভ হয়েচে। তারা ত সব চালের উপর চ'ড়ে 'জল জল' করে চীৎকার ক'র্‌তে লাগ্‌ল। ছেলেরা কুয়ো থেকে জল ভ'রে এনে চালের উপর আগুন নিবিয়ে ফেল্লে। ভাগ্যে, হরিচরণের বাড়ীর কাউকে আঘাত লাগে নি। কেবল হরিচরণের মেয়ের হাত একটু পুড়ে ফোস্‌কা পড়েছিল। কিন্তু সব চেয়ে ভাল লেগেছিল আমার ছেলেদের উদ্যোগ দেখে। তাদের না আছে ভয়, না আছে ক্লান্তি। নির্ভয়ে হাতে ক'রে ক'রে চালের খড় ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিতে লাগ্‌ল। আর দূরের কুয়ো থেকে দৌড়ে দৌড়ে সার বেঁধে জলভরা ঘড়া এনে উপস্থিত ক'র্‌তে লাগল। ওরা যদি না দেখ্‌ত এবং না এসে জুট্‌ত তাহলে মস্ত একটা অগ্নি-কাণ্ড হ'ত। এমনি করে কাল অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ঝড়-বাদল হ'য়ে আজ অনেকটা ঠাণ্ডা আছে। আকাশ এখনো মেঘে লেপে আছে, হয়ত আজও বিকেলে একচোট বৃষ্টি সুরু হবে। ইতি—৫ই শ্রাবণ, ১৩২৫।

৭

শান্তিনিকেতন

তুমি আজকাল খুব পড়ায় লেগে গেছ, কিন্তু আমি যে চুপচাপ ক'রে ব'সে থাকি তা মনে কোরো না। আমার কাজ চল্‌চে। সকালে তুমি ত জানো সেই আমার তিন ক্লাশের পড়ানো আছে। তারপরে স্নান ক'রে খেয়ে, যেদিন চিঠি লেখ্‌বার থাকে চিঠি লিখি। তারপরে বিকেলে খাবার খবর দেবার আগে পর্য্যন্ত ছেলেদের যা পড়াতে হয় তাই তৈরি ক'রে রাখি। তারপরে সন্ধ্যার সময় ছাতে চুপচাপ বসে থাকি—কিন্তু এক-একদিন ছেলেরা আমার কাছে কবিতা শুন্‌তে আসে। তারপরে অন্ধকার হ'য়ে আসে—তারাগুলিতে আকাশ ছেয়ে যায়—দিনুর ঘর থেকে ছেলেদের গলা শুন্‌তে পাই—তারা গান শেখে—তারপরে গান বন্ধ হ'য়ে যায়। তখন আশ্রমবিভাগের ছেলেদের ঘর থেকে হারমোনিয়ম্ এবং বাঁশীর শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গানের ধ্বনি উঠ্‌তে থাকে। ক্রমে রাত্রি আরো গভীর হয়, তখন ছেলেদের ঘরের গানও বন্ধ হয়ে যায়, আর দূরে গ্রামের রাস্তার ভিতর দিয়ে দুই একটা আলো চল্‌চে দেখ্‌তে পাই। তারপরে সে আলোও থাকে না, কেবলমাত্র আকাশ-জোড়া তারার আলো। তারপরে বসে থাক্‌তে থাক্‌তে ঘুম পেয়ে আসে, তখন আস্তে আস্তে উঠে শুতে যাই। তারপরে কখন এক সময়ে আমার পূর্ব্বদিকের দরজার সম্মুখে আকাশের অন্ধকার অল্প অল্প ফিকে হ'য়ে আসে, দুটো-একটা শালিকপাখী উস্‌খুস্ ক'রে উঠে, মেঘের গায়ে গায়ে সোনালি আভা ফোটে, খানিক বাদেই সাড়ে চারটার সময় আশ্রমবিভাগে ঢং ঢং ক'রে ঘণ্টা বাজ্‌তে থাকে, অম্‌নি আমি উঠে পড়ি। মুখ ধুয়ে এসে আমার সেই পূর্ব্বদিকের বারান্দায় পাথরের চৌকির উপর আসন পেতে উপাসনায় বসি। সূর্য্য ধীরে ধীরে উঠে তার আলোকের স্পর্শে আমাকে আশীর্ব্বাদ করে। আজকাল সকাল সকাল খেতে যেতে হয়, কেননা সাড়ে ছ'টার সময় আশ্রমের সকল বালকবৃদ্ধ আমরা বিদ্যালয়ের সাম্‌নের মাঠে একত্র হই, একটি কোনো গান হ'য়ে তার পরে আমাদের স্কুলের কাজ আরম্ভ হয়। ঠিক প্রথম ঘণ্টায় আমার ক্লাশ নেই। কিন্তু সেই সময়ে আমি আমার কোণটাতে এসে একবার আমার পড়াবার বই ও খাতা-পত্র দেখে শুনে ঠিক করে নিই—তারপরে আমার কাজ। এই আমার দিনরাতের হিসাব তোমার কাছে দিলুম। কেমন শান্তিতে দিন চলে যায়। ঐ ছেলেদের কাজ কর্‌তে আমার খুব ভাল লাগে। কেননা ওরা জানে না যে, আমরা ওদের জন্য যে কাজ করি তার কোনো মূল্য আছে। ওরা যেমন অনায়াসে সূর্য্যের কাছ থেকে তার আলো নেয় আমাদের হাত থেকে তেমনি অনায়াসে সেবা নেয়। হাটে দোকানদারদের কাছ থেকে যেমন দরদস্তর ক'রে জিনিষ কিন্‌তে হয় তেমন ক'রে নয়। এরা যখন বড় হবে, যখন সংসারের কাজে প্রবেশ কর্‌বে, তখন হয়ত মনে পড়বে—এই আশ্রমের প্রান্তর, এখানকার শালের বীথিকা, এখানকার আকাশের উদার আলো এবং উন্মুক্ত সমীরণ এবং প্রতিদিন সকালে বিকালে এখানে আকাশতলে নীরবে বসে ঠাকুরকে প্রণাম। ইতি—১২ই শ্রাবণ, ১৩২৫।

৮

শান্তিনিকেতন

দিনগুলো আজকাল শরৎকালের মতো সুন্দর হ'য়ে উঠেচে। আকাশে ছিন্ন মেঘগুলো উদাসীন সন্ন্যাসীর মতো ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে। আমলকীগাছের পাতাগুলিকে ঝরঝরিয়ে দিয়ে বাতাস ব'য়ে যাচ্চে, তার মধ্যে একটা আলস্যের সুর বাজ্‌চে, আর বৃষ্টিতে-ধোওয়া রোদ্দরটি যেন সরস্বতীর বীণার তারগুলি থেকে বেজে ওঠা গানের মতো সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলেচে। আমার ঠিক চোখের উপরেই সন্তোষবাবুর বাড়ীর সাম্‌নেকার সবুজ ক্ষেত রৌদ্রে ঝলমল ক'রে উঠেচে; আর তারই একপাশ দিয়ে বোলপুর যাবার রাঙা রাস্তাটা চ'লে গেছে ঠিক যেন একটি সোনালী সবুজ সাড়ির রাঙা পাড়ের মতো। খুব ছেলে-



মাতৃমূর্ত্তি

শিল্পী—বটিচেলি (১৪৪৪—১৫১০)

"বিচিত্রা," শ্রাবণ, ১৩৩৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বেলা থেকেই এই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আমার গলাগলি ভাব—তাই আমার জীবনের কত কালই নদীর নির্জ্জন চরে কাটিয়েচি। তারপরে কতদিন গেছে এখানকার নির্জ্জন প্রান্তরে। তখন এখানে বিদ্যালয় ছিল না, তখন শান্তিনিকেতনের বাড়ীর গাড়ী-বারান্দায় ব'সে খুব বৃহৎ একটি নিস্তব্ধতার মধ্যে ডুবে যেতে পারতুম;—রাত্রে ঐ বারান্দায় যখন শুয়ে থাক্‌তুম তখন আকাশের সমস্ত তারা যেন আমার পাড়াপড়শির মতো তাদের জান্‌লা থেকে আমার মুখের দিকে চেয়ে কি বল্‌ত, তাদের কথা শোনা যেত না, কিন্তু তাদের মুখ-চোখের হাসি আমাকে এসে স্পর্শ ক'রত। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে ভাব করার একটা মস্ত সুবিধা এই যে, সে আনন্দ দেয়, কিন্তু কিছু দাবী করে না; সে তার বন্ধুত্বকে ফাঁসের মত বেঁধে ফেল্‌তে চেষ্টা করে না, সে মানুষকে মুক্তি দেয়, তাকে দখল ক'রে নিতে চায় না। ১৮ই শ্রাবণ, ১৩২৫।

৯

শান্তিনিকেতন

আজ সকাল থেকে ঘন ঘোর মেঘ ক'রে প্রবল বেগে বর্ষণ চল্‌চে, সকালে কোনো মাষ্টার তাই ক্লাশ নেন্‌নি। কিন্তু থার্ড ক্লাশের ছেলেদের আমি ছুটি দিতে পারলুম না—তাদের পড়া খুব শক্ত, মাঝে মাঝে ফাঁক প'ড়লে সমস্ত আল্‌গা হ'য়ে যাবে, তাই সেই বৃষ্টির মধ্যেও তাদের সংগ্রহ ক'রে আনা গেল। পড়াতে পড়াতে বৃষ্টির বেগ বেড়ে উঠ্‌ল, সঙ্গে সঙ্গে ঝড়। আমার শোবার ঘরে ক্লাশ হয়—ঘরে ছাঁট আস্‌তে লাগল। সার্সি বন্ধ ক'রে দিলুম—পাঠ শেষ হয়ে গেল, কিন্তু বৃষ্টি শেষ হয় না—এই বৃষ্টিতে তাদের ত ছেড়ে দিতে পারিনে। শেষকালে ওরা আমাকে ধ'রে প'ড়ল, মুখে মুখে একটা গল্প বানিয়ে ওদের শোনাতে। কিন্তু ভেবে দেখ আমার বয়স এখন সাতান্ন বছর হয়েচে, এখন কি ইচ্ছা করলেই অনর্গল গল্প বল্‌তে পারি? শেষকালে আমি করলুম কি, একটা গল্পের কেবল গোড়া ধরিয়ে দিয়ে ওদের বল্লুম সেইটে এক সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণ ক'রে লিখে আন্‌তে। ওরা ত উৎসাহের সঙ্গে রাজী হল, কিন্তু ওদের গল্প যে কি রকম হবে তা কল্পনা ক'রে আমার মনে কিছুমাত্র উৎসাহ বোধ হচ্চে না। যাক্‌গে, ওরা ত সেই গল্প মাথায় নিয়ে ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে চেঁচাতে চেঁচাতে ওদের ঘরে চ'লে গেল—আমি গেলুম স্নান করতে। স্নান ক'রে খেয়ে এসে আজ তাকিয়ায় একটু হেলান দিয়ে পড়েছিলুম। কিন্তু সমস্ত দিন ত কুঁড়েমি ক'রে কাটাতে পারিনে। অন্য দিন হ'লে উঠে আমার তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ক্লাশের জন্য পড়ার বই লিখ্‌তে বস্‌তুম, কিন্তু আজ বাদলার দিনে সেটা ভাল লাগল না, তাই "বিদায় অভিশাপ"টা ইংরাজীতে তর্জ্জমা ক'রতে ব'সে গিয়েছিলুম। বেশ ভালই লাগ্‌ছিল; পাতা দুয়েক যখন শেষ হয়ে গেছে এমন সময় চিঠি হাতে ক'রে এক হরকরার প্রবেশ। কাজেই এখন কিছুক্ষণের জন্য দেবযানীকে অপেক্ষা করতে হচ্চে। বৃষ্টি থেমে গেছে কিন্তু জলভারাবনত মেঘে আকাশ ভরা। এতদিন শ্রাবণের দেখা ছিল না, যেই বিশে একুশে হয়েচে অম্‌নি যেন কোনমতে ছুটতে ছুটতে শেষ ট্রেণটা ধ'রে হঠাৎ হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির। কম হাঁপাচ্চে না,—তার হাঁপানির বেগে আমাদের শালবন বিচলিত, আম্রলকিবন কম্পান্বিত, তালবন মর্ম্মরিত, বাঁধের জল কল্লোলিত, কচি ধানের ক্ষেত হিল্লোলিত, আর আমার এই জান্‌লার খড়খড়িগুলো ক্ষণে ক্ষণে খড়খড়ায়িত। ইতি—২১শে শ্রাবণ, ১৩২৫।

১০

শান্তিনিকেতন

তোমার চিঠি আজ এইমাত্র পেলুম। এইমাত্র বল্‌তে কি বোঝায় বলি। দুপুর বেলাকার খাওয়া হ'য়ে গেছে। সেই কোণটাতে তাকিয়া ঠেশান দিয়ে বসেছিলেম। আকাশ ঘন মেঘে অন্ধকার হ'য়ে গেছে—পশ্চিম দিক থেকে মাঝে মাঝে সোঁ সোঁ ক'রে ঝোড়ো বাতাস বইচে। ইন্দ্রের ঐরাবতের বাচ্চাগুলোর মতো মোটা মোটা কালো

মেঘ আকাশময় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে। মাঝে মাঝে গুরু গুরু গর্জ্জন শোনা যায়। সাম্‌নে সবুজ মাঠের উপরে মেঘ্‌লা দিনের ছায়া, নিবিড় স্নিগ্ধতার মধ্যে চোখ ডুবে গেছে। তোমাকে লিখ্‌তে লিখ্‌তে বৃষ্টি নেমে এল—বৃষ্টি একটুমাত্র দেখা দিলেই আমার এই বারান্দায় তার পায়ের শব্দ তখনি শোনা যায়। দূরে ভুবনডাঙার দিকে বাঁধের কাছে যে ঘন বনশ্রেণী দেখা যায় বৃষ্টির ধারায় সেটা একটু ঝাপ্‌সা হয়ে এসেছে—বনলক্ষ্মী যেন তার পাত্‌লা ওড়নাটাকে মুখের উপর ঘোম্‌টা টেনে দিয়েচে। ক'টা বেজেচে ঠিক বল্‌তে পারিনে। আমার সামনের দেয়ালে যে-ঘড়িটা ছিল তাকে নির্ব্বাসিত ক'রে দিয়েচি। ইদানীং তার ব্যবহার এমন হয়ে এসেছিল যে তাকে বিশ্বাস করার জো ছিল না—সে চল্‌তেও ভুল, বল্‌তেও ভুল, তার পরামর্শ মতো খেতে শুতে গিয়ে আমি অনেকবার ঠকেচি। তবু উপযুক্ত উপায়ে তাকে যে সংশোধন করা যেত না তা বল্‌তে পারিনে—কিন্তু সময়ের জন্যই ঘড়ি, ঘড়ির জন্য সময় নষ্ট করা আমার পোষায় না। যাই হোক আন্দাজে মনে হচ্চে একটা দেড়টা হ'য়ে গেচে। আর একটু বাদেই আমাকে একটা ক্লাশ পড়াতে হবে। আজকাল প্রায় জন পনেরো গুজ্‌রাটি ছেলে এসেচে, কি ক'রে তাদের বাংলা পড়াতে হবে সেইটে আজ আমি দেখিয়ে দেব—বৌমা আর শৈল ওদের দুপুর বেলায় একঘণ্টা ক'রে বাংলা পড়াতে রাজি হয়েচেন।

ইতিমধ্যে এণ্ড্রুজ্‌ সাহেবের খুব অসুখ করেছিল। আমাদের ভাবনা হয়েছিল। একদিন ত রাত্রে তাঁর নিজের মনে হল তাঁর ওলাউঠা হয়েচে। সেই রাত্রি একটার সময় বর্দ্ধমানে ডাক্তার ডাকতে লোক পাঠিয়ে দিলুম। কিন্তু ইতিমধ্যে আমার ওষুধ খেয়ে এতটা ভাল হয়ে উঠলেন যে ভোরের বেলায় আবার টেলিগ্রাফ ক'রে ডাক্তার আনা বন্ধ ক'রে দিলুম। তুমি ত জানই আমার হাতের রেখায় লেখা আছে আমি ডাক্তারি কর্‌তে পারি। যাই হোক্ এখন সাহেব আবার সেরে উঠে পূর্ব্বের মতোই চারিদিকে দৌড়ে দৌড়ে বেড়াচ্চেন। কিন্তু তিনি সেই-যে জাপানি ঝোলা কাপড়টা পরতেন সেটা আজকাল আর দেখ্‌তে পাইনে।

বৃষ্টি একটুখানি হ'য়েই থেমে গেল। বাতাসটাও বন্ধ হয়েচে। কিন্তু পূবের দিকে খুব একটা ঘন নীল মেঘ ভ্রূকুটি করে থম্‌কে দাঁড়িয়ে রয়েচে—এখনি বোধ হয় বরুণ-বাণ বর্ষণ কর্‌তে লেগে যাবে। আমরা আশ্রমে অনেক নতুন গাছ লাগিয়েচি, ভাল ক'রে বৃষ্টি হ'লে ভালই হয়। কিন্তু আজকাল শরৎকালের মতো হয়েচে—রৌদ্রে বৃষ্টিতে মিলে ক্ষণে ক্ষণে খেলা সুরু হ'য়ে গেচে। তোমরা গান বাজ্‌না শিখ্‌তে সুরু করেচ শুনে খুব সুখী হলুম। আজ আমার আর সময়ও নেই, কাগজও ফুরোলো, পাড়া জুড়োলো, বর্গি এলো ক্লাসে।

১১

শান্তিনিকেতন

আজ বুধবার। ক'দিন খুব বৃষ্টি-বাদলের পর আজ সকালের আকাশে সূর্য্যের আলো নির্ম্মল হ'য়ে ফুটে উঠেছে। শিশু যেমন দোলায় শুয়ে শুয়ে অকারণ আনন্দে হাত-পা ছুঁড়ে চিৎ হয়ে শুয়ে' কলহাস্য কর্‌তে থাকে, তেমনি ক'রে আশ্রমের গাছপালাগুলি আজ তাদের ডালপালা দুলিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে কেবলি ঝিল্‌মিল্ ক'রে উঠ্‌চে। এখন সকাল বেলা—স্নিগ্ধ বাতাস বইচে, পাখীর ডাকে এখানকার শালবন এবং আমবাগান মুখরিত। আমাদের মন্দিরের উপাসনা হ'য়ে গেছে। তারপরে এতক্ষণ আমার জান্‌লার ধারের সেই কোণ্‌টিতে শুয়েছিলুম। প্রতি বুধবারে উপাসনার পরে এণ্ড্রুজ্‌ একবার এসে, আমি কি বলেচি, আমার কাছে ইংরেজীতে তাই বুঝিয়ে নেন। বুঝিয়ে নিয়ে খুসী হয়ে তিনি চ'লে গেছেন। আমি কি বলেছিলুম জানো? এই সৃষ্টির দিকে প্রথম তাকালে কি দেখ্‌তে পাই? এর আগাগোড়া সমস্ত নিয়মে বাঁধা, এর সমস্ত অণু-পরমাণুর মধ্যে নিয়মের ফাঁক এতটুকুও নেই। কেমন জানো? যেমন একটি সহস্র-তারবাঁধা বীণাযন্ত্র। এই

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বীণার প্রত্যেক তারটি খুব খাঁটি হিসাব ক'রে বাঁধা, অর্থাৎ এই বীণাটির তুম্বী থেকে আরম্ভ ক'রে এর সূক্ষ্মতম তারটি পর্য্যন্ত সমস্তই সত্য। কিন্তু না-হয় সত্যই হ'ল, তাতে আমার কি! বীণার তার বাঁধার খাঁটি নিয়ম নিয়ে আমি কি করব? তেমনি এই জগতে সূর্য্যচন্দ্রগ্রহ অণু-পরমাণু সমস্তই ঠিক সময় রেখে ঠিক নিয়ম রেখে চলচে—এই কথাটা যত বড়ো কথাই হোক্ না, কেবল তাতে আমাদের মন ভরে না। আমরা এই কথা বলি, শুধু বীণার নিয়ম চাইনে, বীণার সঙ্গীত চাই। সঙ্গীতটা যখন শুনতে পাই তখনি ঐ বীণাযন্ত্রের শেষ অর্থটি পাই—তা নইলে ও কেবল খানিকটা কাঠ এবং পিতল। জগতের এই বীণাযন্ত্রে আমরা সঙ্গীতও শুনেছি; শুধু কেবল নিয়ম নয়। সকাল বেলার আলোতে আমরা শুধু কেবল মাটিজল, শুধু কেবল কতকগুলো জিনিষ দেখ্‌তে পাই, তা নয়। সকাল বেলার শান্তি, স্নিগ্ধতা, সৌন্দর্য্য, পবিত্রতা সে ত কেবল বস্তু নয়, সেই হচ্চে সকালের বীণাযন্ত্রের সঙ্গীত। তারই সুরে আমাদের হৃদয় পাখীর সঙ্গে মিলে গান গাইতে চায়। যেখানে বীণা শুধু বীণা, সেখানে সে বস্তুমাত্র—কিন্তু যেখানে বীণায় সঙ্গীত ওঠে সেখানে বীণার পিছনে আমাদের ওস্তাদ্‌জি আছেন। সেই ওস্তাদ্‌জির আনন্দই গানের ভিতর দিয়ে আমাদের আনন্দ দেয়। সৃষ্টির বীণা ত ওস্তাদ্‌জি বাজিয়ে চলেচেন, কিন্তু আমাদের নিজের চিত্তের বীণাও যদি সুরে না বাজে তাহলে আমাদের হৃদয়বীণার ওস্তাদ্‌জিকে চিন্‌ব কি ক'রে? তাঁর আনন্দরূপ দেখ্‌ব কি ক'রে? না যদি দেখি তাহলে কেবল বেসুর, কেবল ঝগড়া-বিবাদ, কেবল ঈর্ষা-বিদ্বেষ, কেবল কৃপণতা, স্বার্থপরতা, কেবল লোভ এবং ভোগের লালসা। আমাদের জীবনের মধ্যে যখন সঙ্গীত বাজে তখন নিজেকে ভুলে যাই। আমাদের জীবনযন্ত্রের ওস্তাদ্‌জিকেই দেখ্‌তে পাই। তখন দুঃখ আমাদের অভিভূত করে না, ক্ষতি আমাদের দরিদ্র ক'রে দেয় না, তখন ওস্তাদ্‌জির আনন্দের মধ্যে আমাদের জীবনের শেষ অর্থটি দেখ্‌তে পাই। সেইটি দেখ্‌তে পাওয়াই মুক্তি। সেইজন্যই ত চিত্তবীণায় সত্যসুরে তার বাঁধ্‌তে চাই, সেইজন্যে কঠিন চেষ্টায় মনকে বশ কর্‌তে চাই, চৈতন্যকে নির্ম্মল ক'রে তুল্‌তে চাই—সেইজন্যে নিজের স্বার্থ নিজের ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষা ভুলে হৃদয়কে স্তব্ধ কর্‌তে চাই—তা'হলেই আমার সুর-বাঁধা যন্ত্র ওস্তাদের হাতে বেজে উঠ্‌বে; আমাদের প্রার্থনা হচ্চে এই:—"তব অমল পরশ-রস অন্তরে দাও।" তাঁর সেই স্পর্শের রসই হচ্চে আমাদের অন্তরের সঙ্গীত। তুমিও জান আমি সন্ধ্যাবেলায় প্রায়ই গান করি—

বীণা বাজাও হে মম অন্তরে।
সজনে বিজনে, বন্ধু, সুখে দুঃখে বিপদে
আনন্দিত তান শুনাও হে মম অন্তরে।

দুপুর বেলা খেতে গিয়ে দেখি খাবার টেবিলে তোমার চিঠি আর সেই হিন্দী খবরের কাগজ রয়েচে। তোমরা আলমোড়ায় যাচ্চ। ওখানে আমি অনেকদিন ছিলুম। তোমাদের ঠিকানা পেলে সেই ঠিকানায় লিখ্‌ব। আমি ভেবেছিলুম তোমাদের স্কুলের ছুটির আগে তোমরা কোথাও যাবে না। কিন্তু দেখ্‌চি আমার ছেলেবেলাকার হাওয়া তোমাদের লেগেচে—তখন আমি কেবলি ইস্কুল পালিয়েচি। কিন্তু সাবধান আমার মতো মূর্খ হ'লে চলবে না—নামতা মনে থাকা চাই, আর সাইবীরিয়ার রাস্তা ভুললে কষ্ট পাবে।

ভাব্‌বার কথা

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

(কথারম্ভ)

শ্রীকণ্ঠ বাবু সেদিন তাঁর বৈঠকখানায় একা ব'সে গালে হাত দিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, এমন সময়ে তাঁর বহুকালের অন্তরঙ্গ বন্ধু আনন্দগোপাল বাবু হঠাৎ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। শ্রীকণ্ঠ বাবু ঘরের ভিতর জুতোর শব্দ শুনে চম্‌কে উঠে সুমুখে আনন্দগোপাল বাবুকে দেখে হাসিমুখে তাঁকে সম্বোধন ক'রে বললেন্—

—কে আনন্দগোপাল ? এ কলকেতায় কবে এলে ? আমি ভেবেছিলুম কে না কে। এস, বসো—খবর কি ?

—ভাল। তোমার খবর কি ?

—ভাল।

—আমি ভেবেছিলুম, তেমন ভাল নয়।

—কিসের জন্য ?

—তোমার মুখ দেখে। গালে হাত দিয়ে কি ভাব্‌ছিলে ?

—কিছুই ভাব্‌ছিলুম না—সুধু অবাক্ হ'য়ে বসেছিলুম।

—কিসে অবাক্ হলে ?

—আমার ছেলেটার কথাবার্ত্তা শুনে, তার ভবিষ্যৎ ভেবে।

—কোন্ ছেলেটির ?

—যে ছেলেটা এবার B. L. পাশ করেছে।

—সে ত তোমার রত্ন ছেলে। দেহ মনে ঠিক ফুলের মত ফুটে উঠেছে। মনে আছে আমরা যখন কলেজে পড়তুম তখন একটা ল্যাটিন বুলি শিখি Mens sana in Corporo sano। সেকালে আমাদের ধারণা ছিল, একাধারে অন্তত এ দেশে ও-দুই গুণের সাক্ষাৎ পাওয়া অসম্ভব। কলেজে তোমার ছিল Mens sana আর আমার Corporo sano—তাই ত আমাদের দুজনের এত বন্ধুত্ব হ'ল। তখন মনে হ'ত, আমার দেহে যদি তোমার মন থাকৃত তাহলে পৃথিবীর কোন নারিকাই আমাকে দেখে স্থির থাক্‌তে পার্‌ত না। এমন কি স্বয়ং ক্লিওপেট্রাও যদি আমাকে রাস্তায় দেখ্‌তে পেত তাহলে সেও তার প্রাসাদ-শিখর থেকে নক্ষত্রের মত খ'সে এসে আমার বুকে সংলগ্ন হয়ে Star of India-র মত জ্বল জ্বল ক'রত। কিন্তু আমার সেই যৌবন-স্বপ্ন সাকার হয়েছে তোমার মধ্যম কুমার প্রফুল্লপ্রসূনে। তুমি যা সৃষ্টি করেছ তা একখানি মহাকাব্য, তোমার এ কুমার—নব কুমার-সম্ভব। আমি মনে করতুম এ যুগে ও-রকম সৃষ্টি অসম্ভব।

—দেখো আনন্দ, তোমার এ সব রসিকতা আজ ভাল লাগছে না।

—আমি যে-সব কথা বল্‌ছি তার ভাষা ঈষৎ রসিকতা-ঘেঁসা হলেও, আসলে সত্য কথা। প্রফুল্ল যে, এক পদাঘাতে বিলিতি চামড়ার ফুটবল বিলেতি সাহেবদের মাথার উপর দিয়ে পাখীর মত উড়িয়ে দেয় এ কথা কে না জানে ? তারপর ইউনিভারসিটির ভিতর যতগুলি বেড়া আছে সব গুলোই সে টপ্ টপ্ করে ডিঙিয়ে গেল। এগজামিনেসনের এতাদৃশ hurdle jump বাঙলার ক'টি ফুটবল-খেলিয়ে করতে পারে ? সুধু তাই নয়, সে কবিতাও লেখে চমৎকার। সেদিন কল্লোল, কি কালিকলম, কি বেণু, কি বীণা, এইরকম একটা কাগজে প্রফুল্লর লেখা "আকাঙ্ক্ষা-প্রসূন" ব'লে একটি কবিতা পড়লুম।

—তুমি ও-সব ছাইপাঁশও পড়ো নাকি ?

—পড়্‌তে বাধ্য হই। থাকি পাড়াগাঁয়ে,—করি জমিদারী। হাতে কাজ নেই, আছে সময়। সেই সময় কাটাবার জন্য ছেলেরা যত বই কেনে কিন্তু পড়ে না, সে সবই আমি পড়ি; নচেৎ টাকাগুলো যে মাঠে মারা যায়। দেখ, এই সূত্রে আমি একটা জিনিষ আবিষ্কার করেছি। এ যুগে ইংরাজীতে যারা বই লেখে তারা একজনও ইংরেজ নয়; সব নরওয়ে, সুইডেন, ফিন্‌ল্যাণ্ড ও আইসল্যাণ্ডের

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

লোক, আর সবাই জাতে বদ্যি, তাদের সবারই উপাধি সেন। যথা ইবসেন, হামসেন, বিয়র্‌নসেন ইত্যাদি। সে যাই হোক্, তোমার ছেলের সে কবিতা প'ড়ে আমারও মনে আকাঙ্ক্ষার ফুল ফুটে উঠ্‌ল। এ ফুলের স্পষ্ট কোনও রূপ নেই, আছে শুধু বর্ণ আর গন্ধ। আর সে গন্ধ এম্‌নি নতুন যে, তা বুকের নাকে ঢুক্‌লে নেশা হয়। সে গন্ধ Chloroform-এর দাদা। ঘুমপাড়ানী মাসিপিসির ছড়ার চাইতে তা নিদ্রাকর্ষক। ও কবিতা দু-চার ছত্র পড়্‌তে না পড়্‌তে যে ঘুমিয়ে না পড়ে সে মানুষ নয়, দেবতা। আর "সবুজ পত্রে" প্রফুল্লর লেখা একটা ছোট গল্পও পড়েছি। এ গল্প আগাগোড়া আর্ট। সে ত গল্প নয়, নায়ক নায়িকার হৃৎপিণ্ড নিয়ে অপূর্ব্ব ping-pong খেলা। সে হৃৎপিণ্ড দুটি এক মুহূর্ত্তের জন্যও পৃথিবী স্পর্শ করেনি, বরাবর শূন্যেই ঝুলে ছিল—সূর্য্য চন্দ্র যেমন আকাশে ঝুলে থাকে পরস্পরের প্রেমের টানে। শেষটা এ প্রেমের খেলার ফল হ'ল draw।

—দেখো আনন্দ, তোমার বয়েস হয়েছে কিন্তু বাজে বক্‌বার অভ্যেস আজও গেল না। বরং তোমার যত বয়েস বাড়্‌ছে তত বেশী বাচাল হচ্ছ।

—তোমার ছেলের প্রশংসা শুন্‌লে তুমি খুসী হবে মনে ক'রেই এত কথা বল্‌লুম। কোন বাপ্ যে ছেলের গুণ-গান শুনে এলে যেতে পারে, এ জ্ঞান আমার ছিল না। আমার ছেলে যখন হারমোনিয়ামে প্যাঁ পোঁ সুরু করে তখন যদি কেউ বলে "কেয়া মীড়" তাহলে ত আমি হাতে স্বর্গ পাই এই ভেবে যে, আমি তানসেনের বাবা।

—তুমি যাকে প্রশংসা বল্‌ছ তার বাঙলা নাম হচ্ছে ঠাট্টা। আর এ ঠাট্টার মানে হচ্ছে, প্রফুল্ল যে কি-চিজ হয়েছে তা আমি বুঝি আর না বুঝি, তুমি ঠিক বুঝেছ। তোমার এ সব রসিকতা আমার গায়ে বেশি করে বিঁধ্‌ছে এই জন্যে যে, আমি সত্যিই ভেবে পাচ্ছিনে যে, প্রফুল্ল fool না genius!

—এ বড় কঠিন সমস্যা। Genius-এর সঙ্গে fool-এর একটা মস্ত মিল আছে; উভয়েই born not made। এ উভয়ের প্রভেদ ধরা বড় শক্ত। তাই সাহিত্য-সমালোচকেরা নিত্য genius-কে fool বলে ভুল করে, আর fool-কে genius ব'লে।

—Genius-এর সঙ্গে insanity-র সম্বন্ধ কি, সে মহা সমস্যা নিয়ে মাথা বকাচ্ছিলুম না।

—তবে কিসের ভাবনা ভাবছিলে? দেখো, লোকে যাকে বলে ভাবনা সেটা হচ্ছে আসলে ভাষার অভাব। Freud প্রমাণ করে দিয়েছেন যে repressed speech থেকেই মানুষের মনে যে-রোগ জন্মায় তারি নাম চিন্তা। মন খুলে সব কথা ব'লে ফেল—তাহলেই ভাবনার হাত থেকে অব্যাহতি পাবে।

—আমি ভাব্‌ছিলুম আমার পুত্ররত্ন যা বল্লেন, তা শুধু তাঁরই মুখের কথা, না এ যুগের যুবকমাত্রেরই মনের কথা।

—প্রফুল্ল কি বল্লে শোনা যাক্; তা হলেই বুঝ্‌তে পার্‌ব তা Vox dei, কি Vox populi।

—ব্যাপার কি হয়েছে বল্‌ছি শোনো। আজ সকালে গীতা পড়ছিলুম; একটা জায়গায় খট্‌কা লাগল, তাই প্রফুল্লকে ডেকে পাঠালুম, শ্লোকটার ঠিক মানে বুঝিয়ে দিতে।

—গীতার অনেক কথায় মনে খট্‌কা লাগে, কিন্তু সে সব কথার তত্ত্ব অপরের মুখে শুনে বোঝবার জো নেই; অপরের কাজ দেখে হৃদয়ঙ্গম করতে হয়। যেমন আমি গীতার একটা বচনের হদিস পেয়েছি রায় ধর্ম্মদাস ঘোষ বাহাদুরের জীবন পর্য্যালোচনা করে।

—ও ভদ্রলোকটি কে?

—তিনি, যিনি পাটের ভিতর-বাজারে ফট্‌কা খেলে ধন-কুবের হয়েছেন।

তিনি কি একজন গীতাপন্থী।

—যা বলছি তা শুনলেই বুঝতে পার্‌বে।

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন" এ বচনটা আমার বরাবরই রসিকতা ব'লে মনে হ'ত। কুলি-গিরি কর্‌ব কিন্তু মজুরি পাব না, আমাদের ইংরাজী-শিক্ষিত মন এ কথায় সায় দেয় না; বরং আমরা চাই মজুরি কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নেব, কিন্তু বস্‌তে পেলে দাঁড়াব না, শুতে পেলে

বসব না। কিন্তু ঘোষ বাহাদুর এই হিসেবে চলেছেন যে, অহর্নিশি দৌড়াদৌড়ি করে পয়সা কামাব অথচ তার এক পয়সাও খরচ করব না। অর্থাৎ টাকা করবার তাঁর অধিকার আছে—মা ফলেষু কদাচন।

—তোমার রসিকতা দেখ্‌ছি আজ বে-পরোয়া হয়ে উঠেছে।

—রসিকতা আমি করছি না তুমি করছ? তুমি ফিলজফিতে M. A. আর প্রফুল্ল Botany-তে। গীতা তুমি বুঝতে পারো না, আর প্রফুল্ল শুধু বুঝবে না—উপরন্তু বোঝাবে। লোকে যে বলে—"মোগল পাঠান হেরে গেল ফার্সি পড়ে তাঁতি"—সে কথাটা রসিকতা, না আর কিছু?

—দেখো, আমরা যে-কালে কলেজে পড়তুম সে-কালে গীতার রেয়াজ ছিল না। আমরা বিলেতি দর্শন পড়েই মানুষ হয়েছি, তাই গীতার অনেক কথায় খট্‌কা লাগে। আর গীতা আজকাল সবাই পড়ছে; সাহেবরা পড়ছে, বাঙালী সাহেবরা পড়ছে, মেয়েরা পড়ছে, মাড়োয়ারীরা পড়ছে। ও দর্শন এখন হাওয়ায় ভাস্‌ছে। এর থেকে অনুমান করেছিলুম যে আমার ছেলে ও দর্শনের ভিতর আমার চাইতে বেশী প্রবেশ করেছে—বিশেষত সে যখন গীতার বিষয় মিটিংয়ে বক্তৃতা করে।

—কি বললে! প্রফুল্ল বাবাজি কি আবার ধর্ম্ম-প্রচার সুরু করেছে না কি? আমি ত জানি সে M. A. B. L., তার উপর সে sportsman, কবি, গল্পলেখক, পলিটিসিয়ান। উপরন্তু সে-যে আবার বুদ্ধদেব ও যীশুখৃষ্টের ব্যবসা ধরেছে তাত জানতুম না। আজকালকার ছেলেরা কি চৌকোস্‌ আর তাদের কি wide Culture! এরা প্রতিজনে একাধারে খেলায় ইংরেজ, পড়ায় জর্ম্মান, বুদ্ধিতে ফরাসী, প্রেমে ইটালিয়ান, পলিটিক্সে রাসিয়ান। ইংরেজরা আমাদের স্বরাজ দিলে তা নেবে কে?—এই ভাবনায় আমার রাত্রিতে ঘুম হ'ত না। এখন সে দুশ্চিন্তা গেল। আজ থেকে ঘুমিয়ে বাঁচ্‌ব।

(কথা মধ্য)

—দেখ, স্বরাজ আমার নিদ্রার ব্যাঘাৎ করে না, বরং আমি ঘুমিয়ে পড়লেই স্বরাজ আমার কাছে আসে, অর্থাৎ স্বরাজের আমি স্বপ্ন দেখি। কিন্তু প্রফুল্লর কথা ভেবে বোধ হয় আমার insomnia হবে। সে তোমার চাইতেও অদ্ভুত কথা বলে।

—এটা অবশ্য ভয়ের কথা।

—তুমি বলো অদ্ভুত বাজে কথা, প্রফুল্ল বলে অদ্ভুত কাজের কথা।

—তার কথা তবে শোন্‌বার মতন।

—তুমি ত কারও কথা শুনবে না, শুধু নিজে বক্‌বে।

—তুমি তোমাদের পরস্পরের কথোপকথন রিপোর্ট করো, আমি তা নীরবে শুনে যাব; যেমন নীরবে আমি খবরের কাগজের রিপোর্ট পড়ি।

—আমি যখন তাকে শ্লোকটার অর্থ আমাকে বুঝিয়ে দিতে বল্‌লুম, তখন সে অম্লানবদনে বললে, "আমি গীতার এক বর্ণও পড়িনি"। আমি জিজ্ঞেস করলুম "তাহলে তুমি সেদিন মিটিংয়ে গীতা সম্বন্ধে অমন চমৎকার বক্তৃতা করলে কি করে, যার রিপোর্ট আমি কাগজে পড়লুম?" প্রফুল্ল উত্তর করলে—"গীতার প্রতি আমার অগাধ ভক্তি আছে ব'লে?" "যার বিন্দুবিসর্গ জান না, তার উপর তোমার অগাধ ভক্তি?" সে উত্তর করলে, "ভক্তি জিনিষটা অজানার প্রতিই হয়।"

—কি রকম?

—আপনি দেশের যত লোককে বড় লোক বলে ভক্তি করেন আপনি কি তাঁদের সবাইকে জানেন? আমি জানি আপনি তাঁদের কখনও চোখে দেখেন নি।

—হাঁ তা ঠিক—কিন্তু আমি তাঁদের বিষয় খবরের কাগজে পড়েছি, লোকের মুখে শুনেছি।

—আমিও গীতার বিষয় কাগজে পড়েছি ও লোকের মুখে শুনেছি।

—তাহলে তোমার বক্তৃতা শুনে ও কাগজে তার রিপোর্ট প'ড়ে আর পাঁচ-জন অজ্ঞ লোকের গীতার উপরে ভক্তি বাড়বে।

—অবশ্য। সেই উদ্দেশ্যেই ত বক্তৃতা করা।

—লোকের মনে ভক্তির এ রকম মূলহীন ফুল ফোটাবার সার্থকতা কি?

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

—ও হচ্ছে nation-building-এর একটা পরীক্ষোত্তীর্ণ উপায়।

—কি হিসেবে ?

General Bernhardi বলেছেন যে জর্ম্মানীর গত যুদ্ধের মূলে ছিল, জর্ম্মাণ ন্যাসনলাজিম, আর সে ন্যাসনালিজমের মূলে আছে Kant আর Goethe। আপনি কি বলতে চান Kant ও Goethe-র লেখার সঙ্গে বার্‌ন্‌হার্ডির বিশেষ পরিচয় ছিল ?

—না। তিনি যখন বলেছেন যে গত যুদ্ধের জন্য দায়ী Kant এবং Goethe, তখন যে তাঁর ও ছুটি ভদ্রলোকের সঙ্গে কোনরূপ পরিচয় নেই তা নিঃসন্দেহ।

—তা হলেও তিনি Kant-এর দর্শনের ও Goethe-র কবিতার সার মর্ম্ম বুঝেছিলেন। Kant-এর সার কথা হচ্ছে agnosticism, আর গেটেরও তাই—গীতারও তাই।

—মানছি যে agnosticism-ই হচ্ছে nation-building-এর ভিৎ। কিন্তু গীতার ধর্ম্ম যে agnosticism এ কথা তোমাকে কে বল্লে।

—এ যুগে যারা গীতা গুলে খেয়েছে সেই সব expert-রা এ বিষয়ে একমত যে, গীতার প্রথম অংশে আছে utilitarianism, আর শেষ অংশে agnosticism, আর তার মধ্যভাগ প্রক্ষিপ্ত।

—তোমার expert বন্ধুরা যে গীতা গুলে খেয়েছেন সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে একাধারে Mill এবং Spencer, এ একটা নূতন আবিষ্কার বটে। তোমার expert গুরুরা আর-একটি সত্য আবিষ্কার করতে ভুলে গিয়েছেন, সেটি হচ্ছে যাঁর নাম বুদ্ধদেব তাঁর নামই Bertrand Russell। যাক্ ও সব কথা। এখন দেখ্‌ছি তোমাদের কালিদাসকেও প্রচার করতে হবে।

—অবশ্য। আমি আসছে হপ্তায় কালিদাস সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করব।

—কোথায় ?

—Youngman's Hindu Association-এ।

—অনুমান করছি গীতার সঙ্গে তোমার পরিচয় যদ্রূপ শকুন্তলার সঙ্গেও তোমার পরিচয় তদ্রূপ।

—আগেই ত বলেছি যে সংস্কৃত সাহিত্য আমরা জানিনে বলেই তার প্রতি আমাদের ভক্তি আছে, জান্‌লে তার প্রতি আমাদের অভক্তি হত।

—নিশ্চয়ই তাই হত। কারণ তখন বুঝ্‌তে পারতে যে, Mill ও Spencer শ্রীকৃষ্ণের অবতার নন্—ন চ পূর্ণ ন চাংশক, এবং Kipling কালিদাসের প্রপৌত্র নন্। এখন আমি জানতে চাই যে পূর্ব্ব পুরুষের নামের দোহাই দিয়ে নতুন নেশান্ আর কি করে গড়্‌বে; ও উপায়ে পুরোনোই আর টিঁকিয়ে রাখা দুষ্কর।

—অর্থাৎ আমাদের নূতন সাহিত্য গড়্‌তে হবে। এ জ্ঞান আমাদের সম্পূর্ণ আছে। আমরা নূতন সাহিত্যই গড়্‌ছি।

—কি সাহিত্য তোমরা গড়্‌ছ ?

—কাব্য সাহিত্য।

—বুঝেছি, তোমরা আগে নব Goethe হয়ে পরে নব Kant হবে। পারম্পর্য্যের ধারাই এই, আগে কালিদাস পরে শঙ্কর। তবে আমার ভয় হয় এই যে, জ্ঞানের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে বড় কবি কি হতে পার্‌বে ?

—দেখ, জ্ঞান মানে ত যা অতীতে হয়ে গিয়েছে তারই জ্ঞান। অতীতের দিকে পিঠ না ফেরালে আমরা ভবিষ্যৎ গড়্‌তে পার্‌ব না।

—আচ্ছা ধরে নেওয়া যাক্ যে, কাব্যের সঙ্গে সরস্বতীর মুখ-দেখাদেখি নেই, কিন্তু তোমরা ত পলিটিক্স জিনিষটাকেও ঠেলে তুলতে চাও। আর তুমি কি বলতে চাও যে জ্ঞানশূন্য না হলে পলিটিসিয়ান হওয়া যায় না ?

—কোন জ্ঞান পলিটিক্সের কাজে লাগে ?

—কিঞ্চিৎ হিষ্টরির আর কিঞ্চিৎ ইকনমিক্সের, অর্থাৎ ইংরাজরা যাকে বলে Facts-এর।

—আমরা যখন নতুন হিষ্টরি ও নতুন ইকনমিক্স গড়্‌তে চাচ্ছি তখন পুরোনো হিষ্টরি ও পুরোনো ইকনমিক্সের জ্ঞান আমাদের উন্নতির পথে শুধু বাধা স্বরূপ। আর Facts-এর জ্ঞান যে, Idealism-এর প্রধান শত্রু তা'ত আপনি মানেন ? আমরা এ ক্ষেত্রে করতে চাই শুধু Idealismএর চর্চ্চা—

—Idealism জিনিষটে যে মস্ত জিনিষ তা আমিও স্বীকার করি, কিন্তু শুধু ততক্ষণ—যতক্ষণ তা কথামাত্র থাকে। তবে কাজে খাটাতে গেলেই তার মানে ধরা পড়ে।

—আচ্ছা, একটা কাজের কথাই বলা যাক্। রামকে কাউন্সিলে পাঠাতে হবে কিম্বা শ্যামকে, হিষ্টরির জ্ঞান তার কি সাহায্য করবে? যার মনে Idealism আছে সে-ই শুধু রামের বদলে শ্যামের জন্য খাটতে প্রস্তুত।

—এই ভোট যোগাড় করার ব্যাপারটার নাম Idealism?

—অবশ্য। এ কাজ করবার জন্য আহার নিদ্রা বাদ দিয়ে দৌড়াদৌড়ি ক'রে শরীর ভাঙতে হয়, Vote for শ্যাম ব'লে চিৎকার ক'রে গলা ভাঙতে হয়। আর যে কাজ করবার জন্য চাই মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন তারই নাম ত Idealism।

—ধর্ম্ম, কাব্য, পলিটিক্স্ সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান যে সমান সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এখন জিজ্ঞাসা করি তোমার আইনের জ্ঞানও কি সমান?

—আপনি কি জিজ্ঞাসা করছেন বুঝতে পারছি না।

—আমি জানতে চাই, আইন কিছু জানো—কি জানো না।

—আইনের কতকগুলো কথা জানি, তার বেশী কিছু জানি নে।

—তবে B. L, পাশ করলে কি ক'রে?

—নোট মুখস্ত ক'রে। বই পড়লে ফেল হতুম।

—আইন কিছু না জেনে University-র পরীক্ষা ত পাশ করলে, কিন্তু ঐ বিদ্যে নিয়ে আদালতের পরীক্ষা পাশ করবে কি ক'রে?

—আদালতে পরীক্ষা করবে কে?

—জজ সাহেবরা।

—আপনি বলতে চান, যারা জজ হয় তারা সবাই আইন জানে? একালে যার পেটে বিদ্যে আছে সে ত আর জজ হতে পারে না। সুতরাং এ-কেলে জজের কাছে প্র্যাকটিস্ করতে বিদ্যের দরকার নেই। পলিটিক্স্ ঠিক থাকলেই প্র্যাকটিস্ ঠিক হবে।

—কি রকম?

—জজিয়তি লাভ করবার জন্য চাই নরম পলিটিক্স্, আর প্র্যাকটিস করবার জন্য গরম।

—আর, যার পলিটিক্স্ নরমও নয় গরমও নয়, তার কি হবে?

—তার ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ।

(কথা শেষ)

শ্রীকণ্ঠ বাবু অতঃপর বললেন যে, এই সব সদালাপের পর আমি প্রফুল্লকে বললুম "এখন এসো"। এ কথা শুনে আনন্দগোপাল হেসে বললেন, তার পরেই বুঝি তুমি দমে গেলে? আমি হ'লে ত উৎফুল্ল হয়ে উঠতুম।

—কেন?

—তোমার ছেলে genius।

—কিসে বুঝলে...?

—তার মতামত শুনে।

—এ-সব মতামতের ভিতর কি পেলে?

—প্রথমত নূতনত্ব, দ্বিতীয়ত বিশ্বাস।

—বিশ্বাস? কিসের উপর?

—নিজের উপর।

—নিজের উপর অগাধ এবং অটল বিশ্বাস ত প্রতি Fool-এরই আছে।

—কিন্তু সে বিশ্বাস শুধু একের, এবং সে এক হচ্ছে স্বয়ং Fool; কিন্তু যার আত্ম বিশ্বাসের নীচে জনগণ ঢেরা সই দেয়, সেই ত Super-man।

—তবে তুমি ভাবো যে প্রফুল্লর মতামত শুধু একা তার নয়, যুবকমাত্রেরই?

—বহুর মনে যা অস্পষ্টভাবে থাকে, তাই যার মনে স্পষ্ট আকার ধারণ করে, সেই ত যুগধর্ম্মের অবতার। জ্ঞান ভক্তির বিরোধী, এ ত পুরোনো কথা। আর, তা যে কর্ম্মেরও প্রতিবন্ধক এই হচ্ছে নবযুগবাণী। এ বাণীর জোর প্রচারক হবে তোমার মধ্যম কুমার।

—কি কর্ম্ম এরা করতে চায়?

—একসঙ্গে সরস্বতী ও ইলেক্‌শানের সেবায় খাটতে।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

—তাতে দেশের কি লাভ ?

—কোনও লোকসান নেই ?

—মূর্খতার চর্চ্চায় কোনও লোক্‌সান নেই ?

—যেমন তোমার আমার মত পাণ্ডিত্যের চর্চ্চায় দেশের কোন উপকার হয়নি, এদের তার অ-চর্চ্চায় কোন অপকার হবে না।

—তাহলে দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিন্ত ?

—দেখো, তোমার আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনও কথা বল্‌বার অধিকার নেই। তুমি আমি যথাসাধ্য যথাশক্তি জ্ঞানের চর্চ্চা করেছি, অর্থাৎ বই পড়েছি। আর প্রফুল্ল ত বলেই দিয়েছে যে জ্ঞান মানে হচ্ছে অতীতের জ্ঞান। অতএব আমাদের মুখে শোভা পায় শুধু অতীতের কথা।

—তুমি দেখছি, প্রফুল্লর একজন শিষ্য হয়ে উঠলে।

—তার কারণ আমি modern.

—এর অর্থ ?

—আমি অতীতেরও ধার ধারি নে, ভবিষ্যতেরও তোয়াক্কা রাখি নে। মনোজগতে দিন আনি দিন খাই—অর্থাৎ যা পাই পেটে পুরি; আমার পেটে সব যায়,—প্রফুল্লরও কথা, গীতারও কথা।

—তুমি দেখছি একজন মুক্ত পুরুষ। শাস্ত্রে বলে যে ব্যক্তি পরলোকে স্বর্গ চায় না সেই মুক্ত। তুমি দেখছি ইহলোকেও স্বর্গরাজ্য চাও না। অতএব পুরো মুক্ত।

—দেখ শ্রীকণ্ঠ, ভবিষ্যতের আলোচনা করতে করতে কলকেটা নিজের ধোঁয়া নিজে ফুঁকেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হল। অতএব ভবিষ্যতের কথা এখন মুল্‌তবি থাক্‌। বর্ত্তমানে আর এক ছিলেম্‌ তামাক ডাক।

এ কথা শুনে শ্রীকণ্ঠ বাবু ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে চাকরকে শিগ্‌গির তামাক দিতে বল্‌লেন। চাকরও ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে শিগ্‌গির কল্‌কে বদলাতে গিয়ে সেটা উল্টে ফেললে, অমনি ফরাসে আগুন ধরে গেল। ধূম যে না-বলা-কওয়া অগ্নিতে পরিণত হবে এ কথা কেউ ভাবে নি। তাই দুই বন্ধুতে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে গাত্রোত্থান করলেন আর তাঁদের আলোচনা বন্ধ হল।

ধরণীদাস

শ্রীঅনাথনাথ বসু

মধ্যযুগে ভারতের ধর্ম্মসাধনার ইতিহাস বিচিত্র। কিন্তু যে-সকল সাধকের সাধনায় এ-যুগের ধর্ম্ম-ইতিহাসের পত্রগুলি বিচিত্র সম্পদে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে তাঁহাদের কয়জনের কথাই বা আমরা জানি? কবীর, নানক, দাদু, মীরা প্রভৃতি কয়েক জনের নাম হয়ত' বর্ত্তমানকালে মনীষিগণের চেষ্টায় আমাদের নিকট পরিচিত হইয়া উঠিয়াছে—কিন্তু আরো-যে কত শত সাধকের নাম ও কীর্ত্তি ইতিহাসের পাতা হইতে একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং আমাদের অনাদরে অবজ্ঞায় দিন দিন যাইতেছে তাহার কাহিনী আমরা জানি না। এই সকল লুপ্তনাম সাধকদের সাধনা জনসমাজের সহজ ধর্ম্মবোধের মধ্যে বিচিত্রভাবে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে; অখ্যাত-নামা পথের ভিখারী ও সাধুসন্ন্যাসীদের কণ্ঠে তাঁহাদের বাণীগুলি গানের আকারে ভাসিয়া বেড়াইতেছে; নগর হইতে সুদূর গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপগুলিতে বসিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে গ্রামবৃদ্ধগণ গৃহের সুখদুঃখের কাহিনীর সহিত এই সকল সাধকগণের বিলীয়মান জনশ্রুতিগুলি মাঝে মাঝে আলোচনা করিয়া তাঁহাদের স্মৃতি মনের পটে সুস্পষ্ট করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছেন। আজ সুদীর্ঘকালের ব্যবধানে তাঁহাদের মাত্র এইটুকু পরিচয়ই রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু নগরের শিক্ষিতসমাজের নিকটে তাঁহাদের কোন পরিচয়ই নাই। এই অখ্যাত অনাদৃত জনশ্রুতিগুলি তাঁহাদের সাধনাদ্বারা জনসমাজের ধর্ম্মবোধকে কত বিচিত্রভাবে প্রভাবিত করিয়াছিলেন তাঁহার কোন ইতিহাসই আমরা

আজ জানি না এবং জানিবার কোন ঔৎসুক্যও আমাদের নাই।

এমনই এক অখ্যাত সাধকের জীবনের কাহিনী ও সাধনার কথা আলোচনা করিবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশেষ ভূমিকার প্রয়োজন নাই, কারণ এই সকল অজ্ঞাত গ্রাম্য সাধক-কবিগণের কথা ভাল করিয়া না জানিলে মধ্যযুগের ভারতের সাধনার মর্ম্মবাণীটি আমাদের কাছে সম্পূর্ণভাবে ধরা দিবে না। ইহাদের ইতিহাস আলোচনার খুব বড় একটা সার্থকতা আছে।

হিন্দী-সন্তকবি ধরণীদাসের সন্ধান আমি প্রথম পাই বিহার বিদ্যাপীঠের একটি ছাত্রের কাছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বিহার বিদ্যাপীঠ দেখিতে গিয়া তথাকার ছাত্রবন্ধুগণকে তাঁহাদের নিজের নিজের জেলার সন্তকবিগণের পরিচয় ও বাণী সংগ্রহ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তাঁহাদেরই একজন আমাকে ধরণীদাসের সন্ধান দেন। তাহার পর কয়েকবার ধরণীদাসের জন্মভূমি ও সাধনক্ষেত্র মাঝিগ্রামে গিয়াছি এবং ধরণীদাসের বাণী ও পরিচয় সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সেই সংগ্রহেরই কিয়দংশ আমি আজ বাঙ্গলার সুধীবর্গের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

হিন্দী-সাহিত্যরসিকগণের নিকট ধরণীদাসের নাম সুপরিচিত নহে। গ্রিয়ার্সন, গার্সিন ট্যাসী, মিশ্রবন্ধু প্রভৃতি হিন্দী সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থে ধরণীদাসের কোন উল্লেখই নাই।

জন্ম-গ্রামেই আজীবন বাস করিয়া, এবং সেই গ্রামেই সরযূ-তীরে দেহত্যাগ করিয়া এই গ্রাম্য সাধক-কবি তাঁহার পরম সাধনার মূর্ত্ত ফলস্বরূপ যে অমূল্য পদগুলি রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতে তিনি হিন্দী-সাহিত্য-মণ্ডপে উচ্চ আসন লাভ করিবার যথেষ্ট দাবীর পরিচয় দিয়া গিয়াছেন এবং আমার বিশ্বাস হিন্দী-সাহিত্যরসিকগণের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইলে তাঁহারা এগুলিকে তাঁহাদের সাহিত্যের রত্ন-স্বরূপ গণ্য করিতে দ্বিধা করিবেন না।

ধরণীদাসের 'প্রেমপরগাস' নামক একটি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে; তাহা ছাড়া "শব্দপ্রকাশ"নামক প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের ছাপরায় ছাপা একটি দুষ্প্রাপ্য জীর্ণগ্রন্থও আমি পাইয়াছি। এলাহাবাদের বেলভেডিয়ার প্রেস হইতে প্রকাশিত "ধরণীদাসজীকী জীবনী ঔর বাণী" নামক গ্রন্থখানিও আমি দেখিয়াছি। এই একটি পুঁথি ও দুইটি মুদ্রিত গ্রন্থ ও স্থানীয় কয়েকজন বৃদ্ধের নিকট হইতে ধরণীদাসের যে পদাবলি সংগ্রহ করিয়াছিলাম সেইগুলিই বর্ত্তমান প্রবন্ধের প্রধান উপজীব্য।

ধরণীদাসের সাধনার ও বাণীর পরিচয় দিবার পূর্ব্বে তাঁহার জীবনের কথা কিছু জানা প্রয়োজন। কিন্তু সে ইতিহাস বিশেষ কিছু আজ পাওয়া যায় না। গ্রাম-বৃদ্ধেরা তাঁহার সাধনার কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন; গ্রাম্য ভিখারী তাঁহার পদাবলি গান করে, তাঁহার স্মরণে মঠ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার স্মৃতি প্রতিদিন পূজা পাইতেছে, অথচ তাঁহার গ্রামের লোক তাঁহার কোন নিশ্চিত পরিচয় আজ দিতে পারিল না। সাধনার আড়ালে সাধক এমনই ভাবে নিজের পরিচয় গোপন করিয়া রাখিয়া গেলেন। কিন্তু ভারতের ইতিহাসে এ কথা বিচিত্র নহে; বুদ্ধভগবান্ হইতে আরম্ভ করিয়া রামানন্দ, রামানুজ, শঙ্কর, কবীর, নানক প্রভৃতি মহাপুরুষগণের জীবনকাহিনীর কতটুকুই আজ আমরা জানি! অথচ তাঁহাদের সাধনার কাহিনী আমাদের একান্ত সুপরিচিত। সত্য-ইতিহাসের অবর্ত্তমানে সম্ভব-অসম্ভব নানা জনশ্রুতি লোকমুখে পল্লবিত হইয়া ইতিহাসকে একেবারেই অস্পষ্ট করিয়া দিয়াছে; জনশ্রুতির সেই পল্লবিত পত্রজালের অবকাশপথ দিয়া জীবনের সত্য ইতিহাসের কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না, যেটুকু পাওয়া যায় সেটুকু একান্তই অনৈতিহাসিক,—প্রাকৃতজন মহাপুরুষকে যেভাবে হৃদয়ে স্থান দিয়াছিল তাহারই কথা; তাহা কল্পনার কাহিনীতে সমাচ্ছন্ন।

ধরণীদাসের সম্বন্ধে নানা কাহিনী আছে; কেমন করিয়া একদিন শুভমুহূর্ত্তে ভাগবতপাঠ শ্রবণ করিয়া তাঁহার অন্তরে বৈরাগ্যের শিখা জ্বলিয়া উঠিল, এবং তিনি গৃহসংসার সকল ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন, কেমন করিয়া তাঁহার ভক্তির পরীক্ষা হইল, অবিশ্বাসী গ্রাম্য জমিদারের নিকট কেমন করিয়া তাঁহাকে

শ্রীঅনাথনাথ বসু

রক্ষা করিবার জন্ত স্বয়ং জগন্নাথ দ্বারীর বেশে প্রহরী হইলেন—এই সকল কাহিনী আজিকার দিনে কেহই বিশ্বাস করিবেন না, সুতরাং সেগুলির এখানে উল্লেখের কোন প্রয়োজন নাই; তাঁহার যে স্বল্প পরিচয় তাঁহার রচনার মধ্যে ও লোকমুখে পাওয়া যায় এইখানে তাহারই উল্লেখ করিব।

প্রেমপরগাসের একস্থানে কবি আত্মপরিচয় দিয়াছেন—তিনি শ্রীবাস্তব্য গোত্রীয় কায়স্থ টিকাইত রায়ের পৌত্র এবং পরশরাম দাসের পুত্র। তাঁহার জন্ম ছাপরার অনতিদূরে সরযূতীরবর্ত্তী মাঝিগ্রামে। স্থানীয় জনৈক ভদ্রলোকের নিকট রক্ষিত একটি প্রাচীন জীর্ণ কুর্সিনামা হইতে ধরণীদাসের শিষ্যপরম্পরা পাওয়া যায়। এখনও মাঝিগ্রামে ধরণীদাস-প্রতিষ্ঠিত মঠ বিদ্যমান।

ধরণীদাস ঠিক কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা আজ নিঃসংশয়ে জানা যায় না। শব্দপ্রকাশের শেষ পৃষ্ঠায় কয়েকটি পদ পাওয়া যায়—

বালমীক তুলসীভয়ো, শুকজী ভয়ো কবীর।
জনক বিদেহী নানকা ছুয়ো স্বর শরীর॥
কবিরা পুনি ধরণী ভয়ো শাহজহাঁকে রাজ।
কিরতিগ্রন্থ কিয়ো বহু বর্ম্মপন্থ কৈ কাজ॥

বাল্মিকী তুলসীদাসের দেহে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন শুকদেব কবীর হইয়াছিলেন, সেই কবীরই আবার ধরণীর দেহে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন সাহজানের রাজ্যকালে। বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি ব্রহ্মলাভের পথ দেখাইয়া গেলেন।

প্রেমপরগাসে এই পদটিও পাওয়া যায়—

শাহজহাঁ তেজি ছনিয়াই।
পিরি ঔরংজেব দোহাই॥

সাহজান ১৬২৮—১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দিল্লীর রাজতক্তে উপবিষ্ট ছিলেন। ইহারই মধ্যে কোন সময়ে ধরণীদাসের জন্ম হইয়াছিল। "ধরণীদাসজীকী জীবনী ঔর বাণী"র সম্পাদক লিখিয়াছেন ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মাঝিগ্রামেই তাঁহার মৃত্যু হয়। জীবনের প্রথমভাগে তিনি স্বগ্রামস্থ জমিদারের সেরেস্তায় চাকরী করিতেন পরে কোন কারণে বিরক্ত হইয়া সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া মাঝিতেই নদীতীরে আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। এবং সেইখানেই জীবনের শেষে রামসীতার অশ্রুপূতা নীল সরযূর তীরে পরমধাম লাভ করিয়াছিলেন। ধরণীদাস বিবাহ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার পুত্রপরিবারের কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না। সংসারাশ্রমে ধরণীদাসের গুরু ছিলেন যোগীন্দ্র গিরি; গৃহ ছাড়িয়া তিনি রামাৎ সাধু বিনোদানন্দের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন।

তাঁহার জীবনের কাহিনী এইটুকুই পাওয়া যায়। আর যে সকল অলৌকিক জনশ্রুতি ধরণীদাস সম্বন্ধে প্রচলিত আছে তাহার ঐতিহাসিক মূল্য কিছুই নাই।

শোনা যায় নাকি ধরণীদাস এক নবীন পন্থার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন কিন্তু এ অঞ্চলে সেরূপ কোন পন্থার অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

ধরণীদাস এক মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার পর আরো আটজন গুরু ছিলেন; বর্ত্তমান গুরুর নাম হরিনন্দন দাস; তিনি ধরণীদাসসম্বন্ধে বিশেষ কিছু সন্ধান দিতে পারিলেন না। মঠসংলগ্ন বিস্তর জমি আছে; সেখানে বিগ্রহসেবা, অতিথিসেবা ইত্যাদি হয়। বিগ্রহটি বংশীবদন কৃষ্ণের, শ্বেতপ্রস্তরে নির্ম্মিত; বিগ্রহের চারিপার্শ্বে বহু শালগ্রাম শিলা আছে। ধরণীদাস কোন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন নাই কারণ তিনি প্রতিমাপূজা অস্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী চতুর্থ অধস্তন শিষ্য মোহন্ত মায়ারাম দাস বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। ততদিনে ধরণীদাসের প্রতিমাপূজাবিরোধের কথা লোকে ভুলিয়াছিল।

শোনা যায় মঠে ধরণীদাসের বহু লেখা সঞ্চিত ছিল কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে যখন মঠসংলগ্ন জমিগুলি লইয়া বেশ বড় রকমের মোকর্দ্দমা হয়, তখন ঐগুলি নষ্ট হইয়া যায়।

মধ্যযুগে রামানন্দ বৈষ্ণবধর্ম্মকে এক নবীন উদার মুক্তধারায় স্নান করাইয়া নবরূপ দান করেন; কবীর প্রভৃতি তাঁহার শিষ্যগণ গুরুপ্রবর্ত্তিত নবীন পথে চলিয়া ধর্ম্মজগতে

যে বিপ্লব আনয়ন করেন তাহার ইতিহাস আজও লেখা হয় নাই; লেখা থাকিলে দেখিতাম মধ্যযুগের ভারতের এই নবজন্ম ইউরোপের মধ্যযুগের renaissance হইতে কোন অংশে ছোট নহে। তখনকার এই নূতন ভাবের বন্যায় ভারতবর্ষ তাহার সমগ্র জীবনকে এক নূতন রূপ দিবার চেষ্টা করিতেছিল। রামানন্দ আসিয়া জাতি-বিচারের কঠিন নাগপাশ হইতে ধর্ম্মকে মুক্তি দিলেন। তাঁহার শিষ্যবৃন্দের মধ্যে মুসলমান জোলা কবীর যে পরম সাধনসম্পদ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা চিরদিন ভারতবর্ষের ইতিহাসে অক্ষয় হইয়া থাকিবে। রামানন্দের শিষ্যের মধ্যে চামার রইদাসের শিষ্য গুজরাত ছাইয়া আছে; সেনা ছিলেন নাপিত, ধনা ছিলেন নীচ নিরক্ষর জাঠ।

কবীরের সাধনার মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের মিলন সাধনের যে অপূর্ব্ব চেষ্টা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা ভারতীয় ধর্ম্মসাধনার ইতিহাসে অতুলনীয়।

তাঁহার দুইশত বৎসর পরে সাধক ধরণীদাস অখ্যাত গ্রামের নিভৃত ছায়ায় বসিয়া ঠিক তেমনি একটা চেষ্টা করিয়াছিলেন; প্রভাবে বা কার্য্যকরিতায় এই প্রচেষ্টা কবীরের চেষ্টার সহিত তুলনীয় না হইতে পারে কিন্তু ভাবের গভীরতায়, সাধনার সম্পদে তাহা যে কবীরের সাধনার পার্শ্বস্থ স্থান লাভ করিবার যোগ্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

মধ্যযুগের অনেক ভক্তই একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়াছিলেন এবং জ্ঞান ও ভক্তির একটি সমন্বয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের বলা হইয়াছে শব্দাভ্যাসী কারণ তাঁহারা শব্দব্রহ্মের উপাসনা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন; রাম বা সদ্‌গুরু বা কর্ত্তা এই সকল বিভিন্ন নামে তাঁহারা পরব্রহ্মকে অভিহিত করিয়াছিলেন। ওঙ্কার তাঁহাদের নিকট পরব্রহ্মের প্রতীক মাত্র। তাঁহাকেই তাঁহারা পরমগুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন; কিন্তু এই সকল সাধকদিগের ব্রহ্মগুরুবাদ পরবর্ত্তীযুগে লৌকিকগুরুবাদে পরিণত হইয়াছিল।

এই নবধর্ম্মের মূলভিত্তি ছিল বৈদান্তিক জ্ঞানবাদে কিন্তু তাহা পরিণতি লাভ করিয়াছিল বৈষ্ণবীয় ভক্তিবাদে; এই পথের সাধক সন্তকবিদের কাহারও রচনায় ভক্তির প্রাধান্য কাহারও রচনায় জ্ঞানের প্রাধান্য দেখা যায়। কিন্তু সমস্তটারই মধ্যে এই দুইটিকে মিলাইবার একটি সুন্দর চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়।

কবীরের রচনার মধ্যে একটি প্রকাম শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়; ধরণীদাসের লেখার মধ্যে কবীরের লেখার তুলনায় একটু বেশী পরিমাণেই ভক্তির ছায়ার সমাবেশ হইয়া তাহার শক্তির উগ্রতা ম্লান করিয়া দিয়াছে সত্য কিন্তু তাহার মাধুর্য্য বেশী করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছে। এই জন্যই কবীরের রচনার তুলনায় ধরণীদাসের রচনা স্থলে স্থলে কাব্যসম্পদে সমৃদ্ধতর। কিন্তু ধরণীদাসেরও সাধনার ভিত্তি ছিল জ্ঞানবাদে; তিনি বলিয়াছেন—

জ্ঞানকো বান লগো ধরণী, জন
সোবত চৌকী অচানক জাগো।
ছুটি গয়ো বিষয়াবিষবংধন,
পূরণ প্রেম সুধারস পাগো।
ভাবত বাদবিবাদ নিখাদ ন
স্বাদ জহাঁলগি সো সব ত্যাগে।
মূঁদি গই অঁখিয়াঁ গর্তে, জব
তেঁ হিয়মেঁ কুছ হেরন লাগে॥

হে ধরণী, গৃহে শয়ন করিয়াছিলে, হঠাৎ জ্ঞানের বাণ আসিয়া তোমাকে আঘাত করিল; এক মুহূর্ত্তে বিষয়ের বিষবন্ধন ছুটিয়া গেল; তুমি পূর্ণ প্রেম-সুধারসের আস্বাদ পাইলে। যখন এই পৃথিবীর নীরস বাদবিবাদ মুগ্ধ করিতে পারিল না তখন সকলই ত্যাগ করিলে; যেদিন অন্তরে দর্শন পাইলে সেদিন হইতে বাহিরের আঁখি তোমার বন্ধ হইয়া গেল।

অন্তরে গুরুর উপদেশ পাইয়া তিনি বলিলেন—

জহিয়া ভঙ্গল গুরু উপদেশ।
অংগ অংগতৈ মিটল কলেস॥
সুনত সজগ ভয়ো জীব।
জনু অগিনী পরৈ ঘীব॥
ঔর উপজল প্রভু প্রেম।
ছুটি গয়ো তব ব্রত নেম॥

শ্রীঅনাথনাথ বসু

জব ঘর ভঈল উঁজোর।
তব মন মানল মোর॥
দেখে সে কহল ন জায়।
কহনে ন জগ পতিয়ায়॥
ধরণী ধনি তিন ভাগ।
জেহিঁ উপজল অনুরাগ॥

যখন গুরুউপদেশ লাভ করিলাম আমার সকল দুঃখ মিটিয়া গেল; জীব জাগ্রত হইয়া উঠিল—যেন আগুনে ঘৃত পড়িল। অন্তরে যখন প্রভুপ্রেম জাগিল, তখন ব্রত-নিয়ম সকলই ভাঙ্গিয়া গেল। গৃহ যখন আলোকিত হইল তখন মন আমার শান্ত হইয়া গেল। সে যে কি অপরূপ রূপ বলিতে পারি না; বলিলেও জগৎ বিশ্বাস করে না। হে ধরণী, বহুভাগ্য তার যার হৃদয়ে অনুরাগ জাগিয়াছে।

জ্ঞানের পরিসমাপ্তি পরম প্রেমে; সেই পরম প্রেম লাভ করিবার জন্যই জীবনের সমস্ত সাধনা।

কিন্তু এ-ধন কি সহজে মেলে?

এক ধনী ধন মোরা হো॥
কাহুক ধন সোনারূপা কাহুক হাথাঘোরা হো॥
কাহুক মণি মাণিক মোতী এক ধনী ধন মোরা হো।
রাজ ন পাহরৈ, জরৈ ন অগিনতেঁ, কৈ সাহ পায় ন চোরা হো।
খরচত খাত সিরাত কবহিঁ নহি ঘাটবাট নহিঁ ছোরা হো॥
নহিঁ সঁদুক নহি ভুঁই খনি গাড়ী, নহি পট ঘানি মরোরা হো॥
নৈনকে ওঝল পলক ন রাখোঁ সঁঝে দিবসনিসি ভোরা হো॥
জব ধন লৈ মণি বেচস চাহে তিনি হাট টকটোরা হো॥
কোঈ বস্তু নাহিঁ তহি জোগে জো মোলউঁ সে ঘোরা হো॥
জা ধনতেঁ ধান ভয়ে ধনী বহু, হিংদু তুরুক করোরা হো॥
সে ধন ধরণী সহজহি পায়ো, কেবল সদ্‌গুরুকে নিহোরা হো॥

কৃপা চাই; তাঁহার কৃপা হইলে সহজেই পাওয়া যায়; কত হিন্দু, কত তুর্কী এই ধনে ধনী হইয়া বহুভাগ্য মানিয়াছে। এই যে প্রেম-ধন, ইহাকে পাওয়া কি সহজ কথা? দেশে তখন ভণ্ড সন্ন্যাসীর রাজত্ব চলিতেছে; মাথা মুড়াইয়া গৈরিক পরিয়া লোকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ভাবিতেছিল মুক্তিতো' পাইলাম; তাহাদের প্রতারণায় লোকে ভুলিতেছিল কিন্তু মুক্তিদাতা বিধাতা কি ভুলিয়াছিলেন?

কুল তজি ভেষ বনাইয়া হিয়ে ন আয়ো সাঁচ।
ধরণী প্রভু রীঝৈ নহীঁ দেখত ঐসো নাচ॥

কুল ত্যাগ করিলে, গৈরিক গ্রহণ করিলে, কিন্তু মনে তুমি সত্যের স্পর্শ পাইলে না; হে ধরণী, প্রভু এ নৃত্য দেখিয়া ভোলেন না।

ধরণীর কাছে হিন্দু-মুসলমান সমান ছিল; তিনি বলিতেন, কতভাবে কতলোক প্রভুর কথা বলিয়াছে কিন্তু অন্ত পায় নাই; তিনিতো' কাহারও নিজস্ব সামগ্রী নহেন —তিনি হিন্দুর রাম, মুসলমানের আল্লা, তাঁহাকে খুঁজিতে বৃথা দেশ-দেশান্তর ঘুরিয়া বেড়াও, আপনার অন্তরের দিকে চাও, তাঁহাকে দেখিতে পাইবে।

প্রভু তু মেরে প্রাণ পিয়ারো॥
পরিহরি তোহি অবর জো জাচৈ তেহি মুখ ছিয় ছারো।
তো পরবারি সকল জগ ডারোঁ জো বসি হোয় হমারো॥
হিন্দুকে রাম অল্লাহ তুরুককে বহুবিধি করত বখানা।
দুহকো সংগম এক জহাঁ তহবাঁ মেরো মন মানা॥
রহত নিরংতর অংতরজামী সব ঘট সমায়া।
জোগী পংডিত দানি দসোদিসি খোজত অংত ন পায়া॥
ভীতর ভবন ভয়ো উঁজিয়ারা ধরণী নিরখি সোহায়া।
জা নিতি দেস দেসংতর ধাবো সে ঘটহীঁ লখি পায়া॥

—হে আমার প্রিয়, কত লোকে কতভাবে তোমাকে বলিতেছে; হিন্দু বলিতেছে রাম, মুসলমান বলিতেছে আল্লা; আমার মন গিয়া পৌঁছিয়াছে যেখানে এই দুই-ই আসিয়া মিলিয়াছে।

তুমি নিরন্তর সর্ব্বঘট ব্যাপিয়া রহিয়াছ; অথচ হে অন্তর্যামী যোগী, পণ্ডিত, দাতা দিক্‌বিদিকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে তোমাকে অন্তরে না পাইয়া। ধরণী দেখিয়া মুগ্ধ হইল; এ দেহভবনের অন্তরে যে জ্যোতি উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে; যাহার জন্য দেশ-দেশান্তর বৃথাই খুঁজিয়া বেড়াও, তাহাকে যে তোমার অন্তরেই দেখিতে পাইবে।

এ পূজার, এ প্রেমসাধনের জন্য কোন আয়োজনেরই প্রয়োজন নাই, পুষ্প নয়, চন্দন নয়, ধূপ নয়, কিছুই নয়।

লোকে বলিল তবে কি দিয়া প্রভুর সেবা করিবে? তোমার আয়োজন কোথায়? ধরণী বলিলেন—

মন বচক্রম মোরে রামকি সেবা।
সকল লোক দেবন কো দেবা॥
বিমু জল জল ভরি ভরি নহৰাবোঁ।
বিনা ধূপকে ধূপ ধূপাবোঁ॥
বিন ঘংটা ঘরী ঘংটা বজাবোঁ।
বিনহি চঁবর সির চঁবর চুরাবোঁ॥
বিন আরতি তঁহ আরতি বারোঁ।
ধরণী তিঁহ তন মন বারোঁ॥

আমার দেহমন সর্ব্বস্ব দিয়া যে তাঁহার সেবা চলিবে; সকল লোকের প্রভু দেবাদিদেব যিনি, তাঁহার জন্য অন্য কোন আয়োজন কি সাজে? আমি তাঁহাকে প্রেমের বারি দিয়া স্নান করাইব; আমার সাধনার ধূপ জ্বালিয়া ধূপ দিব। বাহিরের ঘণ্টায় আমার প্রয়োজন কি? অন্তরে যে উৎসব তাহাই হইবে আমার কাঁসর, তাহাই হইবে আমার ঘণ্টা। চামর আমার চাই না, এই নত মস্তক দিয়া—আমার চামর করিব। অন্তরে আমার যে অনির্ব্বাণ প্রেমের শিখা জ্বলিতেছে তাহাই দিয়া আমি আমার দেবতার আরতি করিব।

এমনই সহজভাবে ধরণীদাসের সাধন-জীবন বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল; সে সাধনায় সমারোহ আড়ম্বর কিছুই ছিল না; তাহা তাঁহার জীবনেরই মত সরল স্বচ্ছ ছিল। তাঁহার সাধনার প্রথম অবস্থার বিরহের পদগুলির মধ্যে এই সরলতা, এই প্রতীক্ষা তীব্রভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই পদগুলির মধ্যে মানবজীবনের আদিম সুরটি অতি সহজ সৌন্দর্য্যে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। হিন্দী সাহিত্যে ইহার একমাত্র তুলনা পাওয়া যায় মীরাবাইয়ের বিরহ পদাবলীতে। নিম্নে এই দুই-একটি পদ দিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

অন্তরে তখনও প্রেম জাগে নাই; আক্ষেপ করিয়া ধরণী বলিতেছেন—

অজহু ন গুরুচরণন চিত দৈহৌ।
নানা জোনি ভটকি ভ্রমি আয়ে
অব কব প্রেম তীরথহিঁ নৈ হৌ।

—হায়রে অবোধ মন এখনও নিজেকে শ্রীচরণে সমর্পণ করিতে পারিলি না? কত জন্মজন্মান্তর বৃথাই কাটিয়া গেল। আর কবে প্রেমতীর্থে স্নান করিবি?—

জীবন যে বৃথাই গেল!

জগমেঁ সোঈ জীবনি জিয়া॥
জাকে উর অনুরাগ উপজো, প্রেম প্যালা পিয়া॥

সেই শুধু ধন্যজীবন লাভ করিল যাহার অন্তরে অনুরাগ জাগিল, প্রেম-পিয়ালার অমৃত-রস যে আস্বাদন করিল।

বহুদিন তোর বৃথাই কাটিল; এইবার বুঝি তোর প্রতীক্ষা শেষ হইবে; এইবার তুই নিজেকে সমর্পণ করিতে পারিয়াছিস্; এইবার অন্তরে তোর প্রেম জাগিয়াছে;—

অব হরিদাসী ভই, তাতেঁ গহী চরণ চিতলায়॥
রহী লজায় লোককী লজ্জা বিসরি গই কুলকামী।
উপজী প্রীতি রতি অতি বঢ়ি বিনুহীঁ মোল বিকামী॥
ছাজন ভোজন কী নহিঁ সংশয়, সহজহিঁ সহজ কমায়ে।
সংগ সহেলরি ছোড়ি কৈ অব নেকু নাহিঁ বিলগায়ে॥
সুখদাঈ দরসৈ নহীঁ হো দসহুদিশি সকল দয়াল।
অপনো প্রভু অপনে গৃহ পায়ো ছটকি পরো জংজাল॥
অব কাহুকে দ্বার ন আবো, নহিঁ কাহুকে জাব।
ধরণী তঁহ সচ পাইয়ো, অব জহঁা ধনীকো নাঁব॥

—এইবার হরির দাসী হইয়াছি; আমার চিত্ত তাঁহার চরণে শরণ লইয়াছে। লোকে লজ্জা পায় কিন্তু আমি লোকলজ্জা সকলই ত্যাগ করিয়াছি; আমার অন্তরে প্রেমের বন্যা নাবিয়াছে; বিনামূল্যেই আমি আজ নিজেকে বিকাইয়া দিয়াছি। আজ আর আমার ছোঁওয়া খাওয়ার কোন সংশয়ই নাই,—সকলই আমার কাছে সহজ হইয়া গিয়াছে। এই সঙ্গ ত্যাগ করিয়া আমি আর কাহারও প্রেমভিক্ষা করিব না।

আজ আমি প্রভুকে আমার গৃহেই পাইয়াছি, সব জঞ্জাল দূর হইয়াছে। এখন আর কাহারো দ্বারে যাইব না, কাহাকেও ডাকিব না। হে ধরণী, আজ প্রিয়তমের নৌকায় তুমি সত্যের সন্ধান পাইলে।

শ্রীঅনাথনাথ বসু

এইবার তাঁহাকে তোমার গৃহে আহ্বান করিয়া লইতে হইবে।

চিত চিত সরিয়ামেঁ লিহলোঁ লিখাই,
হৃদয় কমল ধইলেঁা দিয়সালে সাঈ॥
প্রেম পলংগা তঁহ ধইলেঁা বিছাই
নখসিখ সহজ সিঁগার বনাঈ॥

এইবার চিত্তের চিত্রশালায় তাঁহার ছবি আঁকিয়া লইব। সেখানে প্রেমের পালঙ্ক বিছাইয়া দিব। আমার প্রতি অঙ্গ সহজ সুন্দর বেশে সাজাইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইব।

আজ কি করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিব?

হৃদয় কমল বিচ আসন সারী
লে সরধাজল চরণ খটারী।
হিত কৈ চংদন চরচি চঢ়ায়ো,
প্রীতিকৈ পংখা পবন ডোলায়ো।
ভাবকি ভোজন পরসি জেবায়ো
জো উবরতা সো জুঠন পায়ো।
ধরণী ইত উত চিরহি ন ভোরে,
সম্মুখ রহহি দোউ কর জোরে॥

আমার হৃদয়-কমলে তাঁহার আসন পাতিয়া দিব; শ্রদ্ধার পাদ্য দিয়া তাঁহার চরণ ধুইয়া দিব। কল্যাণের চন্দনে তাঁহাকে চর্চ্চিত করিব, প্রীতির ব্যজনে তাঁহার সেবা করিব। প্রেমের অন্ন তাঁহার সম্মুখে রাখিব, যে উচ্ছিষ্ট থাকিবে তাহাই আমার পরম প্রসাদ হইবে। হে ধরণী তোমার মন যেন আজ ঘুরিয়া না বেড়ায়; তুমি দুই কর জুড়িয়া প্রিয়তমের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাক।

ধরণীদাস এমনই করিয়া তাঁহার সমগ্র জীবন তাঁহার প্রিয়তমের সেবায় উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইয়া নিজেকে অমর করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

শান্তিনিকেতন।

দুই পার

শ্রীসুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য

গাঙের আরেক পারে বাণিয়ার বসতি,
ই পারে বসত করে চাষী;
বাণিয়া বাচারি নায় ভর্য্যা নিয়া কত কি
সফরে বাইরয় বার মাসই।
চাষী খালি খ্যাতে কাম করে,
থাকে সে তিরিশ দিনই ঘরে।

যার যেবা ভাল নিয়া গরিমায় দুইয়েরি
মনের হরিষে দিন যায়,
চাষী তার একমনে কাম করে ভুঁইয়েরি,
বিকি কিনি করে বাণিয়ায়;
চাষী থাকে বার মাসই ঘরে,—
বাণিয়া সফর সদা করে।

বাণিয়ার যত কিছু পুঁজিপাটা বেসাতি
বছরে বছরে বাড়ে আরো;
ভাবে সে, সবার সেরা আমারি এ পেশাটি,—
চাষীর নিজের কাছে, তারো
খ্যাতের কামের মত হেন,
দুনিয়াতে কিছু নাই যেন।

রট্যা গ্যালো আশে পাশে বাণিয়ার খেয়াতি,
মনেরি মতন হৈলো বিয়া;
চাষীর যেখানে যত সগন আর জ্ঞেয়াতি
গ্যালো তারে পরামিশ দিয়া,—
ঘরে তো আনন লাগে রক্ষী,—
চাষীর ঘরেরও আইলো লক্ষী।

আশিন মাসের দিন, রৈদে নাওয়া বিহানে
ফুলে ফুলে হাসে থল জল্,
লতায় পাতায় লাগা ফোটা ফোটা নিয়ারে
তাজা আলো করে ঝলমল্ ;
আকাশে আভের উড়ে পাল,
ভরা গাঙ নিভাজ নিটাল।

পোর্ বাসে বছর ভরা আছিলো যে যেখানে
ঘ্যাশে ফিরে ডগ্‌মগা সুখে,
এহি দিনে ছাড়ে ঘর বাণিয়াই একা যে,
দুগুণা লাভের আশা বুকে ;
তবু, তারো মন আনছান,
ছাড়্যা যাত্যে আইজ ঘর খান।

ঘরের সীমানা থিকা মন যেরে নড়ে না,
অসাধে পশরা তোলে নায়,
পুরা মুনাফার সোমে সফর যে করে না,
হাভাতে জনম তার যায়।
চলে তাই নাও খানি বায়্যা,
ই-পারের দিকে চায়্যা চায়্যা।

চাষীর তামান খ্যাত বোণা শেষ ইপারে ;
অবসরে ভরা দিনগুলা—
রৈদে ভরা আঙিণায় বস্যা এক কিনারে
কাটায় বানায়্যা ডালা কুলা ;
বসা-কামে রৈদ সে পোহায়,
পাশে বউ গাভীটি দোহায়।

বাণিয়ার চোখে আইজ লাগে যেন ছবিটা
চাষীর আঙিনা রৈদে মেলা,
দুনিয়ার সুখ যত ওরা তারি গরবী
মনে মনে ভাবে সারা বেলা ;
সেই দিন সুখ বাণিয়ার
বাসা বান্ধে আস্যা এই পার।

আঘণের খাটো বেলা আকাশের ভাটিতে
দুকর না হত্যে সারা কাইৎ,
খ্যাতের কামের যত ধুলা আর মাটিতে
চেহারাটি বেহাল্ বেধাইৎ ;
খাটুনীতে জরো জরো গায়,
ই-পারের ঘাটে চাষী নায়।

ও-পারের বাঁও কুলে ঝাউবন উজায়্যা
ভাখা যায় বাণিয়ার ঘর,
নিটাল আঙিণা পরে রাঙা রৈদ বিছায়্যা
ঘুম যায় দিনের পহর ;
উসারায় রামায়ণ পাঠে
বাণিয়ার অবসর কাটে।

চাষী থাকে ই-পারের ঘাটে থিকা তাকায়্যা
আইজ খালি ও-পারের পানে,
ভাবে মনে,—সুখ যত মিঠা রৈদে মাখায়্যা
বিধাতা দিছেন ঐখানে—
খোপাটি বানিয়া বউ খুল্যা
যেখানে শুকায় চুল গুলা।

এত যে কালের সেই পুষ্‌মানা সুখ তার
মনেরি খাচার ফাক দিয়া
চোখের পলকে উড়্যা হয়্যা গ্যালো গাঙ পার,
বাসা নিল ঐ পারে গিয়া ;
চাষী সে, এখনে একজায়,
ঐ পারে ফিরা্যা ফিরা্যা চায়।

গেছে ই-পারেরো সুখ সেই থিকা ও-পারে,
রইছে ও-পারের এইখানে ;
দুই পারে দুইয়ো সুখ বস্যা একা একা যে
আপনারে দুখ বল্যা মানে ;
কারু লগে কারু নাই ভাখা
দুইয়ো সুখ থাকে—একা একা।

ইংরাজী কাব্যে বাঙালী

তরু দত্ত

শ্রীলতিকা বসু

স্বর্গীয় কবি মনোমোহন ঘোষের কন্যা শ্রীমতী লতিকা বসুর অক্সফোর্ডে অধ্যয়নকালে ইংরাজী-সাহিত্যে ভারতীয়ের স্থান সম্বন্ধে বিশেষরূপে গবেষণা করিবার সুযোগ ঘটে। এ প্রবন্ধে তিনি ইংরাজী ভাষায় বাঙ্গালী কবিদের শীর্ষস্থানীয়া তরু দত্তের বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। আরও কয়েকটী প্রবন্ধে তিনি অন্যান্য কবিদের পরিচয় দিবেন। এ-পর্য্যায়ে অবশ্য শুধু বাঙ্গালী কবিদেরই বিষয় আলোচিত হইবে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ মিষ্টার ডান্ সঙ্কলিত "The Bengali Book of English Verse" পুস্তকের ভূমিকায় শিক্ষিত বাঙ্গালীর ইংরাজীতে কবিতা লিখিবার প্রবৃত্তির মূলতত্ত্বের সন্ধান দিয়াছেন। কোন্ ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে সেকালের শিক্ষিত বাঙ্গালীর অন্তরে এই প্রবৃত্তি জাগিয়াছিল তাহা তিনি বিশদরূপে আলোচনা করিয়াছেন। এই সূত্রে বিশ্ব-কবির একটী কথা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি বলিয়াছেন—পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত ভারতবর্ষ, বিশেষ করিয়া বঙ্গদেশ, ইংরাজের বাহু-সম্পদে অভিভূত হয় নাই; যে সাহিত্যের ভিতর দিয়া ইংরাজ-জাতির চিন্তাধারা এবং সভ্যতার বাণী মূর্ত্ত হইয়াছিল, সেই সাহিত্যের ঐশ্বর্য্যেই বঙ্গদেশ মুগ্ধ হইয়াছিল। অনুকরণপন্থার লজ্জাকারের মধ্যে এইটুকুই একমাত্র গৌরবের আলো বলিয়া প্রতিভাত হইবে।—বিঃ সঃ

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যে কয়েকটি বাঙ্গালী লেখক ও লেখিকা ইংরাজীতে কবিতা লিখিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন তরু দত্ত তাঁহাদের শীর্ষস্থানীয়া। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ্চ কলিকাতা রামবাগানের দত্ত-বংশে তরু জন্মগ্রহণ করেন।

জীবন কথা

পিতা গোবিন্দচন্দ্রের তিন সন্তানের মধ্যে তরুই সর্ব্বকনিষ্ঠা। শৈশবেই তরুর প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি অতি সহজেই বর্ণমালা আয়ত্ত করিয়া ফেলেন। তরুর মাতা যখন প্রাচীন ভারতের পৌরাণিক কাহিনী বর্ণনা করিয়া যাইতেন তরু তাহা অতিশয় অভিনিবেশসহকারে শ্রবণ করিতেন। ইহার পর শিবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক জনৈক ভদ্রলোকের হস্তে তরুর বিদ্যাশিক্ষার ভারার্পণ করা হয়। তরু তাঁহার শৈশব-স্মৃতিতে বলিয়া গিয়াছেন শিবনারায়ণের নিকট তাঁহাকে মিল্টনের প্যারাডাইস্ লষ্ট্ নামক মহাকাব্যখানি পড়িতে হইত। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তরুর একমাত্র ভ্রাতা অব্জুর মৃত্যু হয়। এই দুর্ঘটনার পর ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দচন্দ্র তরু ও জ্যেষ্ঠা কন্যা অরুকে লইয়া সস্ত্রীক ইংল্যাণ্ডে গমন করেন। পথিমধ্যে কিছুদিনের জন্য Nice নগরীতে তাঁহারা অবস্থান করিতে মনস্থ করেন। এই নগরীতেই দুই ভগিনী একটি ফরাসী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। বিদ্যালয়ে শিক্ষা তাঁহাদের জীবনে ইহাই প্রথম। কিছুদিন এই স্থানে বাস করিবার পর তাঁহারা সকলে প্রথমে প্যারী ও তথা হইতে লণ্ডনে গমন করেন। কয়দিনই বা তরু ফ্রান্সে ছিলেন, কিন্তু ইহার মধ্যেই ফরাসী ভাষা তাঁহার একরূপ আয়ত্ত হইয়া যায়। শুধু আয়ত্ত নয়, ঐ ভাষায় তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে। ফরাসীদেশকেও তরু অত্যন্ত ভালবাসিয়া ফেলেন। তরু জাতিতে ফরাসী রমণী হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেও বোধ হয় ফরাসী দেশকে এত ভালবাসিতে পারিতেন না। বোধ হয় অনেকে জানেন না তরু ফরাসী ভাষায় একখানি উপন্যাস রচনা করেন, এবং তাঁহার জীবদ্দশাতেই তাহা প্রকাশিত হয়।

যাহা হউক, ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে তরুর পিতামাতা কন্যাদ্বয়কে লইয়া লণ্ডনে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। এই সময়ে নানা লোকের সহিত উঁহাদের আলাপ পরিচয় হয়। তরু ও তাঁহার দিদি গান-বাজনা ইত্যাদি শিক্ষা করেন। পিতার নিকট বড় বড় ইংরাজী সাহিত্যিকের প্রবন্ধমালাও ইঁহারা পড়িয়া ফেলেন।

এই সময়ে তরু ইউরোপের রাজনৈতিক ব্যাপারে অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। তখন জার্ম্মাণীর সঙ্গে ফরাসী জাতির যুদ্ধ চলিতেছে। ফ্রান্সের রাজনৈতিক আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন, কখন কি হয় বলা যায় না। এই যুদ্ধে তরুর মনোভাব তাঁহার লিখিত ডায়েরির প্রতি পৃষ্ঠাতেই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। নিম্নে একটি দৃষ্টান্ত দিলাম :—

—"সেদিন ডায়েরি লেখা শেষ হইবার পর হইতে ফ্রান্সের প্যারীতে কি পরিবর্ত্তনই না হইয়াছে। আমরা যে-কয়দিন ছিলাম কি মনোরমই না ছিল তখন সহরটি। বাড়ীগুলি কি সুন্দর; পথঘাটই বা কি সুদৃশ্য! আর কি চমৎকার সেই জাতীয় সৈন্যদল! আর আজ? হায়, আজ প্যারীর সৌন্দর্য্য কোথায়? সব শেষ হইয়া গিয়াছে। সৌধ-কিরীটিনী সুন্দরী ও শ্রেষ্ঠা নগরী আজ মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছে। যুদ্ধের প্রারম্ভেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম ফরাসীরা হারিয়া যাইবে। কিন্তু তবুও ত আমার প্রাণ তাহাদের জন্য কাঁদিতেছিল। যুদ্ধ যখন পূর্ণমাত্রায় চলিতেছিল, তখন একদিন সন্ধ্যাকালে মার নিকটে বাবা যুদ্ধ সম্বন্ধে কি বলিতেছিলেন। বাবার মুখে সম্রাটের নাম উচ্চারিত হইয়া আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। বিদ্যুৎবেগে নীচে নামিয়া আসিলাম। শুনিলাম Sedanএ ফরাসীরা জার্ম্মাণীর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে। মনে পড়ে এই কথা শুনিয়া কিরূপে কোনও মতে উঠিয়া দিদির নিকট কাঁদিয়া আকুল হইয়া এই দুঃসংবাদ প্রদান করিয়াছিলাম।"

ইহা হইতেই বুঝা যাইবে ফরাসী দেশকে তরু দত্ত কত ভালবাসিয়াছিলেন।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দ দত্ত সপরিবারে কেম্ব্রিজে চলিয়া যান। এইখানে তরু ও তাঁহার দিদি মেয়েদের উচ্চ-বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিতে থাকেন। মিস্ অ্যারাবেলা শোর নাম্নী জনৈক ইংরাজ মহিলা দুই ভগিনীর চমৎকার বিশুদ্ধ ইংরাজী উচ্চারণ ও পাশ্চাত্য রীতি-নীতি সম্বন্ধে অসামান্য জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়া পড়েন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে দত্ত-পরিবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। ইহার পরবর্ত্তী চারি বৎসরের কাহিনী মিস্ মার্টিনকে লিখিত তরুর পত্রাবলী হইতে আমরা জানিতে পারি। এই চারি বৎসরের অধিকাংশকালই তরু হয় তাঁহাদের কলিকাতার উপকণ্ঠে অবস্থিত বাগমারির উদ্যান-বাটিকায়, নয়ত তাঁহাদের কলিকাতার বাটীতে কাটাইতেন। বেড়াইবার সময় ভিন্ন অন্য কোনও সময়ে তরু বড়-একটা গৃহের বাহির হইতেন না। তাঁহার জীবন বেশ অনাবিল শান্তিতে কাটিয়া যাইতেছিল। কিন্তু ভগবানের কঠোর বিধানে তরুর ভাগ্যে এই শান্তি বেশী দিন ভোগ করা হইয়া উঠিল না। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে দুরন্ত যক্ষ্মারোগে তাঁহার দিদি অরুর মৃত্যু হইল। এই সময় হইতে তরুর স্বাস্থ্যও ভাঙিয়া পড়ে। কাল ক্ষয়রোগ তাঁহাকেও আক্রমণ করিল। প্রিয়তমা ভগিনীর মৃত্যুতে তরু বড়ই শোকার্ত্ত হইয়া পড়েন। এই সময় হইতে তরুর পিতাই তাঁহার একমাত্র বন্ধু হইয়া পড়িলেন। পিতা ও পুত্রী মিলিয়া একই বই ও একই রচনা পাঠ করিতেন। ছোটখাটো সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়া তাঁহাদের দিনগুলি কাটিয়া যাইতেছিল। কিশোরী তরু সকলকেই সমানভাবে ভালবাসিতেন। ছোট গৃহখানিকে তিনি নন্দনে পরিণত করিয়াছিলেন। পশুপক্ষী ও অন্যান্য জীবজন্তুকে তিনি স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। কি বন্য, কি গৃহ-পালিত কোনও প্রকার জীবজন্তুই তাঁহার ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হইত না। বাগমারির উদ্যানবাটিকা, তথাকার তরুলতা, কুঞ্জবন, ফুলফল, সরোবর এ সমস্তই ছিল তরুর আনন্দের উৎস। তাঁহার লিখিত পত্রাবলী পড়িলে আমরা একদিকে যেমন এই সরলা কিশোরীর নির্ম্মল হৃদয়ের পরিচয় পাই, অন্যদিকে আবার তেমনি তাঁহার পালিত পশুপক্ষীদের সহিতও আমাদের পরিচয় স্থাপিত হয়। কখনও বা তাঁহার সুন্দর বিড়ালছানাটি প্রতিপালিকার সঙ্গে খেলা করিতে করিতে দোয়াত উল্টাইয়া দিতেছে, কখনও বা 'জেণ্টাইন্' ও 'জেনেট্' নামক ঘোটকীদ্বয় তাহাদের কর্ত্রীর সঙ্গে বাগানের চারিদিকে দৌড়াইতেছে। পত্র-লেখিকার হৃদয় দিয়া লেখা এই ছবিগুলি আমাদের মনে প্রতিভাসিত না হইয়াই থাকিতে পারে না। আর এই ছবিগুলির ভিতর দিয়া প্রতিফলিত হইয়া উঠে একখানি তরুণ হৃদয়ের সরল মনোহর মূর্ত্তি।

তরু তাঁহাদের বাগানের পাখীগুলিকে যে-ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা পড়িলেই বুঝা যায় প্রকৃতির সঙ্গে তাঁহার কতটা ঘনিষ্ঠতা ছিল :—"প্রভাতকাল, বাগানের শোভা কি সুন্দর। ভোর তিনটা বাজিতে না বাজিতেই ক্ষুদ্র ভীমরাজ কলকূজন করিতে থাকে। আধঘণ্টা অতীত হইতে না হইতেই লতাগুল্ম ও বৃক্ষরাজি হইতে কি সঙ্গীত-

সুধাই না বর্দ্ধিত হইতে থাকে; কখনও বা কোকিলের কখনও বা বউ-কথা-কও-এর কলধ্বনি প্রাণের মধ্যে এক অপূর্ব্ব আনন্দের সৃষ্টি করে! নানাবর্ণে চিত্রিত কলকণ্ঠ ছোট ছোট পাখীগুলি কাকলি তুলিয়া পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে ছুটিয়া চলিয়াছে। দ্বিপ্রহর হইতে অপরাহ্ণ চারিটা পর্য্যন্ত আবার সমস্ত বাগানে গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে থাকে। শুধু মাঝে মাঝে কাঠ্‌ঠোক্‌রার শব্দ শোনা যায় মাত্র। আবার সন্ধ্যায় সমস্ত পাখীর ঐক্যতান-কাকলিতে কানন ভরপূর হইয়া যায়। তার পর ধীরে ধীরে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিলে বুদ্ধিমানের মতো এই ছোট পাখীর দলও ঘুমাইয়া পড়ে।"

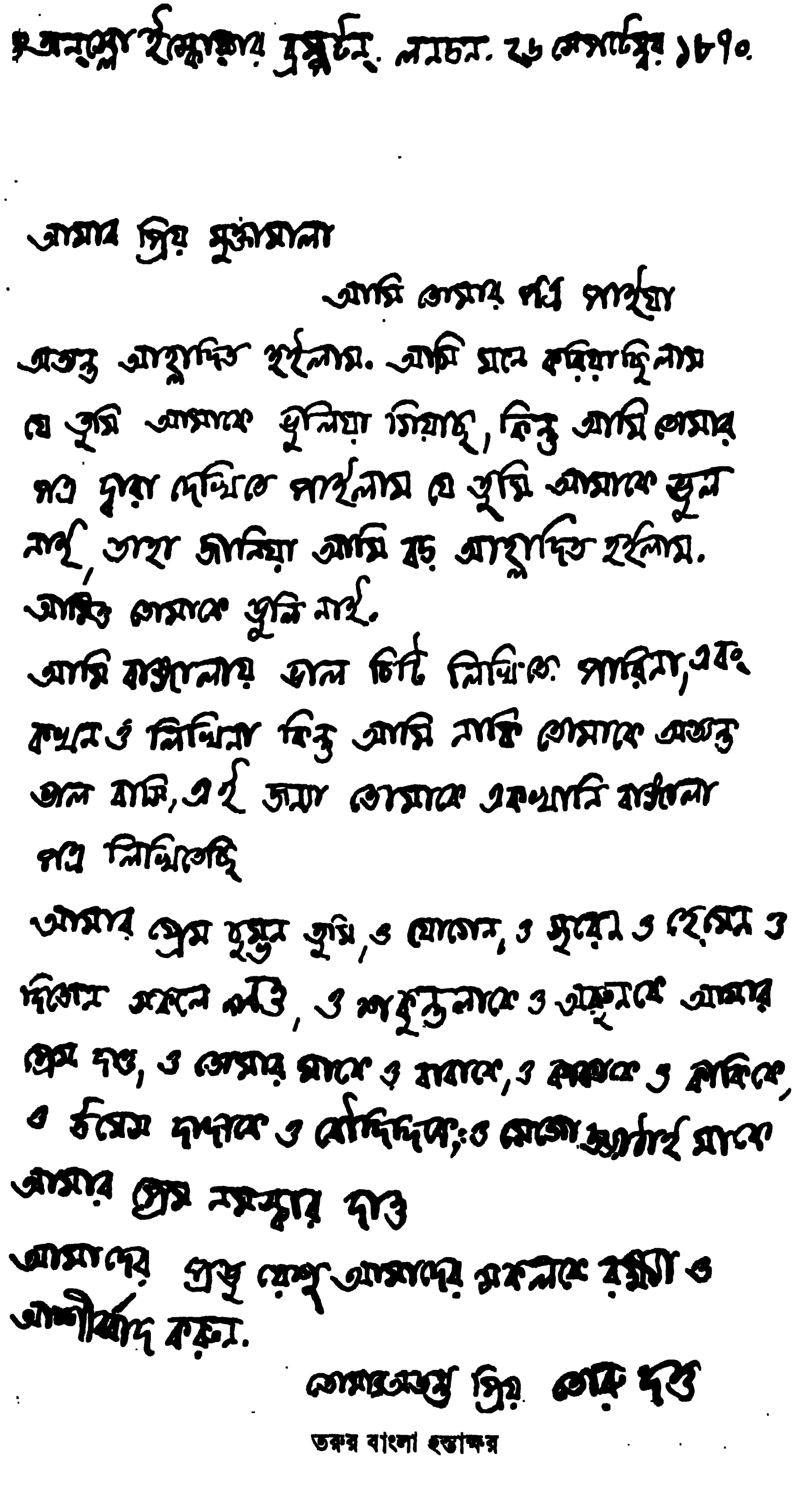
পূর্ব্বেই বলিয়াছি তরু কদাচিৎ বাড়ীর বাহিরে যাইতেন। কিন্তু তাই বলিয়া বহির্জ্জগতের কোনও খবর যে তিনি রাখিতেন না তাহা নহে। বস্তুতঃ তখনকার সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে তাঁহার বেশ পরিচয় ছিল। তাঁহার পত্রাবলীতে তদানীন্তন ঘটনার উল্লেখ বার বার পাওয়া যায়। ঐ পত্রগুলি পড়িলে তরুর জীবনের অনেক ব্যাপারের সঙ্গেই আমাদের পরিচয় ঘটে, আর জানিতে পারি লেখিকা কত বই পড়িতেন, এবং কত জিনিষ লইয়া আলোচনা করিতেন। বস্তুতঃ লেখিকার হৃদয়ে প্রবেশ করিবার পক্ষে এই পত্রগুলি অমূল্য বলিলেই চলে।

ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই তরু সংস্কৃত-সাহিত্য আলোচনা আরম্ভ করেন। ভগ্ন-স্বাস্থ্যেও এই আলোচনার কোনও ব্যাঘাত হয় নাই। আর যে-সব পুস্তক তরু অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে পাঠ করিতেন, তন্মধ্যে অধিকাংশই ফরাসী গ্রন্থ। ফরাসী *Revue de Deux Mondes* নামক মাসিকপত্রিকার উল্লেখ তাঁহার চিঠিতে প্রায়ই দেখা যায়। তরু এই মাসিকপত্রিকাখানির বড় ভক্ত ছিলেন। ইউরোপ হইতে যে-সমস্ত ফরাসী গ্রন্থ আনাইয়া তরু পাঠ করিতেন তাহাদের উল্লেখ অনেক স্থলে পাওয়া যায়। উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে সে-গুলির অল্প-স্বল্প সমালোচনাও বাদ যাইত না। তিনি যে-সমস্ত ইংরাজী বই পড়িতেন তাহাদেরও স্বল্লাধিক সমালোচনা আমরা তাঁহার পত্রাবলীতে পাই। তিনি তাঁহার বন্ধুবর্গকেও ঐ বইগুলি পড়িতে বলিতেন।


তরু দত্ত

পত্রগুলির মাঝে মাঝে কবিত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে:—"নির্ম্মল সুন্দর রজনী, স্নিগ্ধ কৌমুদীধারা জগৎ প্লাবিত করিতেছে। কোথাও বা দুই একটা তারকা মিট্‌ মিট্‌ করিতেছে। আমাদের সম্মুখে প্রশস্ত পথ, তাহার দুই ধারে সারি সারি কাজুয়ারিনা বৃক্ষ, দেখিতে অনেকটা পপ্‌লার সারির মত। অদূরে অস্পষ্ট আলোকে গৃহ-তোরণ দেখা যাইতেছে। আমাদের চারিধারে পল্লবঘন আম্রকুঞ্জ, আবার কোথাও বা শুপারি বৃক্ষ সমুন্নত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, কোথাও বা নারিকেল তরুশাখা মৃদু বায়ুভরে ঈষৎ কম্পিত হইতেছে। সমস্তই যেন কি-এক নিবিড় স্নিগ্ধ শান্তিতে ঘেরা।"

কিন্তু এই প্রফুল্লতা ও আনন্দের মধ্যেও তরুর পত্রাবলীতে আমরা যেন একটি করুণ দীর্ঘশ্বাসের আভাস পাই। মৃত্যু যতই ঘনাইয়া আসিতেছিল তরুর হৃদয়েও এক বিষাদ রাগিনী যেন থাকিয়া থাকিয়া বাজিয়া উঠিতেছিল। কি মর্ম্মস্পর্শী সে সুর! শেষের দিকের চিঠিগুলির মাঝে মাঝে তরু তাঁহার নিজের রোগের উল্লেখ


১ অনস্লো স্কোয়ার ব্রম্পটন্. লণ্ডন. ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৭০.

আমার প্রিয় মুক্তামালা

আমি তোমার পত্র পাইয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম. আমি মনে করিয়াছিলাম যে তুমি আমাকে ভুলিয়া গিয়াছ, কিন্তু আমি তোমার পত্র দ্বারা দেখিতে পাইলাম যে তুমি আমাকে ভুল নাই, তাহা জানিয়া আমি বড় আহ্লাদিত হইলাম. আমিও তোমাকে ভুলি নাই.

আমি বাঙ্গালায় ভাল চিটি লিখিতে পারি না, এবং কখনও লিখিনা কিন্তু আমি নাকি তোমাকে অত্যন্ত ভাল বাসি, এই জন্য তোমাকে একখানি বাঙ্গালা পত্র লিখিতেছি

আমার প্রেম তুমুর তুমি, ও যোগেন, ও সুরেন ও হেমেন ও দিনেন সকলে লও, ও শকুন্তলাকে ও অরুণকে আমার প্রেম দও, ও তোমার মাকে ও বাবাকে, ও [illegible] ও [illegible], ও উমেশ দাদাকে ও বৌদিদিকে; ও মেজো জ্যাঠাই মাকে আমার প্রেম নমস্কার দাও

আমাদের প্রভু যেশু আমাদের সকলকে রক্ষা ও আশীর্বাদ করুন.

তোমার অত্যন্ত প্রিয় তরু দত্ত

তরুর বাংলা হস্তাক্ষর

করিতেছেন—"গেল সপ্তাহে তোমাকে লিখিতে পারি নাই। বড় বেশী রক্ত-বমনে শরীরটা ভাল ছিল না।" এই চিঠিগুলির ভিতরে আর একটী লক্ষ্য করিবার জিনিষ এই যে রোগ-যন্ত্রণা ও দুর্ব্বলতা কাটাইয়া উঠিয়া নিজেকে এবং অপরকে প্রফুল্ল রাখিবার তাঁহার কি অদম্য চেষ্টাই না ছিল। বস্তুতঃ পত্রগুলি যতই পড়া যায় ততই আমাদের মন এই পীড়িতার হৃদয়ের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠে।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ১৩ই অগষ্ট্ তারিখে তরুর পিতা, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, কন্যার বিষয়ে মিস্ মার্টিনকে একখানি চিঠি লিখেন। ঐ চিঠিতে তরুর নিজের লেখা মাত্র দুইটি কথা ছিল—"প্রিয়তমে মেরি, আমার ভালবাসা জানিও। তরু দত্ত।" অধিক লেখার ক্ষমতা ছিল না। তার পর ৩০শে অগষ্ট্ হঠাৎ সব ফুরাইয়া যায়। মাত্র ২১ বৎসর বয়সে এই মাধুর্য্যময়ী, দুঃখ-জরা-পরিকীর্ণ মর্ত্ত্যধাম ত্যাগ করিয়া, জরামৃত্যুর অতীত অনন্ত-ধামে চলিয়া যান। আজ তাঁহার সহিত আমাদের পরিচয়ের সম্বল মাত্র তিনখানি ছোট কবিতার বই ও একতাড়া চিঠি। তরুর অনূদিত একটী ফরাসী কবিতার মর্ম্ম তাঁহার নিজের সম্বন্ধেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে:—

শ্রীলতিকা বসু

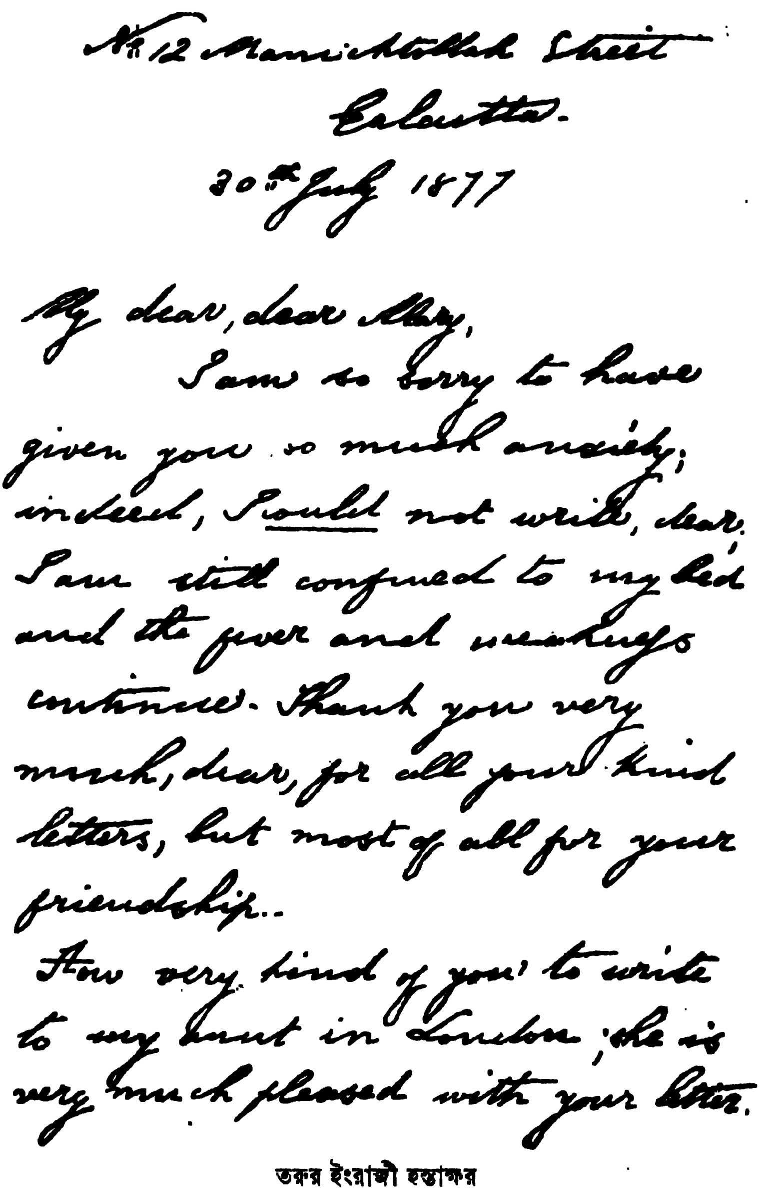
"Thus dies and leaves behind no trace,
A bird's song in the leafy wood;
Thus melts a sweet smile on a face."

"পাখীর কাকলি এই ভাবেই পল্লবের মধ্যে চিরতরে ডুবিয়া যায় ; এই ভাবেই মধুর হাসি মুখেই বিলীন হয়।"

যে কলকণ্ঠ একদিন সুমধুর তানে গাহিয়া উঠিয়াছিল, একুশ বৎসর বয়সেই তাহা চিরতরে বাতাসে মিলাইয়া গেল।

কাব্যকথা

তরুর প্রথম কবিতার বই—"A Sheaf Gleaned in French Fields" (ফরাসী ক্ষেত্র হইতে কুড়ান শস্যগুচ্ছ)। প্রায় ৭০।৮০ জন ফরাসী কবির দুইশত কবিতার ইংরাজী অনুবাদ ইহাতে স্থান পাইয়াছে। অনুবাদ ও টীকায় ফরাসী কবিতা সম্বন্ধে অনুবাদিকার প্রগাঢ় জ্ঞান ও ভক্তি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। এই কবিতার বইখানি প্রথমে ভবানীপুর "সাপ্তাহিক সংবাদ" প্রেস হইতে বাহির হয়। গ্রন্থখানি লেখিকার পিতার চরণে উৎসর্গীকৃত। বইখানি বাহির হওয়ার পর সকলেরই ধারণা হয় যে কোনও প্রবাসী ইংরাজ কবি ছদ্মনামে এই কবিতা-পুস্তক রচনা করিয়াছেন। ছাপা ও কাগজ ভাল না হওয়ায় বিলাতে বইখানির প্রথমে তেমন আদর হয় নাই। সৌভাগ্যক্রমে বইখানি বিখ্যাত সমালোচক এড্‌ম্যণ্ড্ গস্ (Edmund Gosse) ও আঁদ্রে থ্যুরিয়েব্ (André Thurieh) মতো সমজ্‌দার লোকের হাতে পড়ে। মিষ্টার গস্ "এক্‌জামিনার" নামক সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী মাসিক পত্রিকায় ইহার প্রশংসা করিয়া এক সমালোচনা বাহির করেন। ফরাসী কবিদিগের মধ্যে যাঁহারা বেশী ভাবপ্রবণ (idealistic) তরু প্রধানতঃ তাঁহাদেরই কবিতার অনুবাদ করিয়াছিলেন। অবশ্য অন্যান্য কবির লেখাও বাদ যায় নাই। ভিক্‌টর্ হ্যুগোর'ও অনেকগুলি কবিতার অনুবাদ ইহাতে স্থান পাইয়াছিল।


No. 12 Manicktollah Street
Calcutta.
30th July 1877

My dear, dear Mary,
I am so sorry to have given you so much anxiety; indeed, I could not write, dear. I am still confined to my bed and the fever and weakness continue. Thank you very much, dear, for all your kind letters, but most of all for your friendship..
How very kind of you to write to my Aunt in London; she is very much pleased with your letter.

তরুর ইংরাজী হস্তাক্ষর

তরু যে কেন এতগুলি বিরুদ্ধমতাবলম্বী ছোট-বড় কবির রচনা একসঙ্গে অনুবাদ করিয়া ছাপাইয়াছিলেন তাহা অনুমান করা শক্ত। এ শস্যগুচ্ছ সত্যই ইচ্ছামত যত্র খুসী তত্র হইতে লেখিকা চয়ন করিয়াছিলেন। কাজেই ইহাতে কোনও বড় কবির রচনার অনুবাদ বেশী পরিমাণে স্থান পায় নাই। অনেক স্থলে আবার বিশিষ্ট কবিদিগের সুপ্রসিদ্ধ রচনাগুলিই বাদ পড়িয়া গিয়াছে। সে যাহা হউক, সমস্ত কবিতার অনুবাদেই তরু বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। অনুবাদ নিখুঁত, এবং উহাতে মূলের সৌন্দর্য্য আশ্চর্য্যভাবে রক্ষিত হইয়াছে। কিশোরী অনুবাদিকার পক্ষে ইহা কম প্রশংসার কথা নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ De Vigny-র "Moses" এবং Gautier-এর "What The Swallows Say" এই দুইটি কবিতার উল্লেখ করা যাইতে পারে। কবিতা দুইটির অনুবাদে মূলের ভাব ও ছন্দের সৌন্দর্য্য বিশেষভাবেই রক্ষিত হইয়াছে। পড়িতে পড়িতে মনে হয় না যে অনুবাদ পড়িতেছি। শেষোক্ত কবিতার অনুবাদ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। পড়িলেই বুঝা যাইবে কিরূপ সুন্দর ভাষায় মণ্ডিত হইয়া ছন্দধারা ললিত গতিতে বহিয়া যাইতেছে :—

"Leaves not green, but red and gold,
Fall and dot the yellow grass;
Morn and Eve the wind is cold,
Sunny days are gone alas!

Showers lift bubbles in the pool,
Peasants harvest work despatch,
Winter comes apace to rule,
Swallows chatter on the thatch.

Hundreds, hundreds, of the race
Gathered hold a high debate,
One says Athens is my place,
Thither shall I emigrate.

All they say I understand
For the poet is a bird,
Captive, broken-winged, and banned
Struggling still though oft unheard."

তরুর দিদি অরুর অনূদিত আটটি কবিতাও এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। সে-গুলি তরুর মতো অত ভাল না হইলেও উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিখ্যাত সমালোচক এড্‌মণ্ড্‌ গস্‌ উল্লিখিত গ্রন্থের একটি সুদীর্ঘ সমালোচনা বাহির করেন। নানা দোষ ত্রুটি দেখাইয়াও পরিশেষে কিশোরী-কবি তরুকে প্রশংসা না করিয়া তিনি থাকিতে পারেন নাই।

তরুর দ্বিতীয় কবিতার গ্রন্থ "প্রাচীন ভারতের কথা ও কাহিনী" (Ancient Ballads and Legends of Hindusthan)।

এই কাহিনীগুলি আমাদিগকে শৈশব-স্মৃতির রাজ্যে লইয়া যায়।............রক্তিম ছটায় পশ্চিম গগন রঞ্জিত করিয়া শ্রান্তিভরে সবে সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। কয়েকটিমাত্র তারকা আকাশ-গাত্রে হীরক খণ্ডের মতো প্রভা বিকীর্ণ করিতেছে। বড় একখানি রূপার থালার ন্যায় চন্দ্রমা শুভ্র কৌমুদীতে শ্রান্ত ক্লান্ত জগৎকে স্নিগ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে পূর্ব্বাকাশে উদিত হইতেছে। এমন সময়ে পক্ককেশ ঠাকুরদাদা অথবা ঠাকুরমার চারিদিকে ছোট ছেলের দল আসিয়া জড় হইল। ছাদ, বারান্দা অথবা অন্দরমহলের প্রাঙ্গণেই প্রায় এই সভা বসিয়া থাকে। ক্লান্ত বালক বালিকার দল কেহ বসিয়া আছে, কেহ বা শুইয়া পড়িয়াছে, স্নিগ্ধ সমীরণে তাহাদের সিক্ত অলকদাম আন্দোলিত হইতেছে, তাহাদের মুখে কি আগ্রহ, কি উৎসাহ। এখন তাহারা রূপকথা শুনিবে। একটি কিশোর বালক—আর কিছু পরেই তাহাকে গুরুতর মানসিক পরিশ্রম করিতে হইবে—সে চায় খানিকটা সময় মৃদুল মধুর বায়ু সেবন করিয়া শ্রান্তির ভার দূর করিয়া লইতে; সে চায় রূপকথার স্বপ্নরাজ্যে তাহার মনকে টানিয়া লইয়া যাইতে। অদূরে ব্রীড়াবনতা কিশোরী বধূ পান সাজিতে সাজিতে কি আগ্রহভরেই না তাহার সলাজ মধুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বসিয়া আছে। কোন্ স্বপ্নরাজ্যে তাহার মন চলিয়া গিয়াছে কে বলিতে পারে? তারপর বৃদ্ধ পিতামহ ছেলেদের উপযোগী ভাষায় গল্প বলিতে আরম্ভ করিলেন। সেই প্রাচীন কাহিনী, স্মরণাতীত যুগ হইতে যাহা শিশুদের সরল মনে প্রফুল্লতা আনিয়া দিয়া তাহাদের

শ্রীলতিকা বসু

ভাব ও চিন্তার ধারা পরিচালিত করিয়া দিতেছে। কোন্ প্রাচীন যুগে আর্য্য কবিগণ ছন্দোবদ্ধ ভাষায় এইসব অপূর্ব্ব কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন, যুগযুগান্তর ধরিয়া যাহা আমাদিগকে স্বপ্নসৌন্দর্য্য উপভোগ করাইয়া আসিতেছে। এই পুরাতন কথা ও কাহিনীই তরু তাঁহার কবিতায় মর্ম্ম-স্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

কবিদের মধ্যে বোধ হয় তিনিই প্রথমে ভারতের এই অমূল্য কাব্যকাহিনীর সঙ্গে পাশ্চাত্যের পরিচয় ঘটাইয়া দেন। আর কিছুর জন্ত না হইলেও একমাত্র এই কারণেই তরুর এই কাব্যগ্রন্থ অমর হইয়া থাকিবে। তরুর পূর্ব্ববর্ত্তী অকিঞ্চিৎকর কবিদিগের রচনার সহিত তুলনা করিলে ইহা যে কত শ্রেষ্ঠ তাহা বুঝা যাইবে। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবিরা প্রাচীন ভারতের মনগড়া অবাস্তব চিত্র অঙ্কন করিয়া বেমালুম তাহাই আসল বলিয়া চালাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তরু কিন্তু প্রাচীন পথের পথিক না হইয়া ভারতের খাঁটি জিনিষটিকেই, আবরণ উন্মোচন করিয়া, জগতের সমক্ষে বাহির করিয়াছেন। প্রথমে বিষ্ণুপুরাণের দুইটি গল্প অবলম্বনে তরু দুইটি কবিতা প্রকাশ করেন। "ধ্রুবোপাখ্যান" (The Legend of Dhruba) প্রথমে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে "বেঙ্গল ম্যাগাজিনে" প্রকাশিত হয়। পরবৎসর উক্ত পত্রিকাতেই "রাজর্ষি ও হরিণ শিশু" (The Royal Ascetic and Hind) শীর্ষক গল্পটি বাহির হয়। তরুর ইচ্ছা ছিল সংস্কৃত সাহিত্য হইতে চয়ন করিয়া নয়টি মনোরম গাথা রচনা করেন। মোট সাতটি রচনা করিবার পরেই তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে এই কল্পনা বাস্তবে পরিণত হইতে পারে নাই। তৎপরে ঐ সাতটির সঙ্গে ধ্রুবোপাখ্যান ও রাজর্ষি (ভরত) ও হরিণ শিশুর গল্প এক সঙ্গে গ্রথিত করিয়া মোট নয়টি রচনা একত্রে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। শেষ দুইটি গাথা অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। অমিত্রাক্ষর ছন্দের মত দুরূহ রচনাতেও তরু কিরূপ সিদ্ধহস্ত ছিলেন তাহার পরিচয় আমরা এই দুইটি কবিতা হইতে পাই। শিশুদের প্রতি অসীম ভালবাসা তরুকে ধ্রুবের অন্তরের সহিত পরিচিত করাইয়া দিয়াছিল। তাই বোধ হয় তরু বালক ধ্রুবের চরিত্র এমন সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন। এই নয়টি কবিতার মধ্যে সাবিত্রী সম্বন্ধে কবিতাটিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তবে মহাভারতোক্ত সাবিত্রী হইতে তরুর সৃষ্ট সাবিত্রী একটু স্বতন্ত্র ধরণের। মহাভারতের সাবিত্রী সত্যবানগত প্রাণ, তাঁহার যেন একটা স্বতন্ত্র সত্তা বলিয়া কিছু নাই। তরুর সৃষ্ট সাবিত্রী-চরিত্রে কিন্তু সে ভাব নাই। তাহাতে যেন একটা নূতন প্রাণের পরিচয় আমরা পাই। সে প্রাণও মহাভারতের সাবিত্রীর ন্যায় পবিত্র ও মধুর, কিন্তু তবুও তাহাতে এমন একটা নূতনত্ব আছে যাহা ব্যাসের সাবিত্রীতে পাওয়া যায় না। তাই তরুর সাবিত্রী বলিতেছেন :—

"He for his deeds shall get his due,
As I for mine. Thus here each soul
Is its own friend if it pursue
The right, and run straight for the goal,
But its own worst and direst foe
If it chose evil and in tracks
Forbidden for its pleasure go.
Who knows not this true wisdom lacks."

মহাভারতকার সাবিত্রীর মুখ দিয়া এরূপ দার্শনিক তত্ত্বকথা বাহির করান নাই। তরুর অন্যান্য কবিতাতেও মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিজস্ব কথা ও চিন্তাধারা স্থান পাইয়াছে। "রাজর্ষি ও হরিণ শিশু" নামক কবিতাটিতে কবি সংসার-বিরাগী ঋষিদিগের নিন্দা করিতেছেন। এ বিষয়ে তিনি ঠিক ভারতীয় চিন্তাধারার অনুসরণ করেন নাই। তিনি বলিতেছেন :—

"What a sin to love,
A sin to pity! Rather we deem,
Whatever Brahmins wise or monks may hold,
That he had sinned in casting off all love
By his retirement to the forest shade
For that was to abandon duties high,
And like a recreant soldier leave the post,
Where God had placed him as a sentinel."

রবীন্দ্রনাথের "প্রকৃতির প্রতিশোধের" বাণীও এই সুরে বাঁধা।

তরুর কবিতার মাঝে মাঝে প্রকৃতির চমৎকার বর্ণনা দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ "Buttoo" কবিতাটিতে ভারতবর্ষীয় তরুরাজির বর্ণনার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

"সীতা" কবিতাটি কবির শৈশব-স্মৃতির স্বপ্নে রচিত পরম রমণীয় ও উপভোগ্য। পড়িতে পড়িতে বোঝা যায় মায়ের মুখের কথা নিঃসৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে শিশুদিগের মনে স্বপ্নরাজ্যের কি এক সুরম্য ছবি গড়িয়া উঠিতেছে :—

"A dense, dense forest, where no
sunbeam pries,
And in its centre a cleared spot—there blooms
Gigantic flowers on creepers that embrace
Tall trees; there is a quiet lucid lake
The white swans glide; where whirring from
the brake
The peacock springs; there herds of wild deer
race;
There patches gleam with yellow waving
grain;
There blue smoke from strange altars rises
light;
There dwells in peace the poet anchorite."

কিন্তু স্বপ্নরাজ্যের এই সৌন্দর্য্য সৃষ্টি "যোগাদ্যা উমা" (Jogadhya Uma) কবিতাটিতে যেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে অন্যান্য কোনও কবিতাতেই তেমন ফুটিতে পারে নাই। এই গল্পটি রামায়ণ অথবা মহাভারত হইতে লওয়া নয়, পুরাণ হইতে গৃহীত। কবি মোহন তুলিকা দিয়া ইহাতে যে ফিরিওয়ালা, দেবী ভগবতী ও প্রাচীন পুরোহিতের ছবি আঁকিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। দৃশ্যটি ক্ষীরগ্রামের রাঙামাটীর। মাঠে গরুগুলি যেন দাঁড়াইয়া স্বপ্ন দেখিতেছে। মাঝে মাঝে রাস্তায় দুই একজন লোক যাওয়া আসা করিতেছে। কবির তুলিকায় এ-সব পরিষ্কার ফুটিয়া উঠিয়াছে। তারপর কবি ফলভারে আনত বৃক্ষরাজি-মণ্ডিত তালপুকুরের ছবি আঁকিয়াছেন। ইহারই বাঁধা ঘাটের নিকট দেবীর সহিত ফিরিওয়ালার পরিচয় হয়। তারপর কবি গ্রামখানির ও তন্নিকটস্থ দেব-মন্দিরের বর্ণনা করিয়াছেন। কবিতার শেষ দৃশ্যে আবার সেই তালপুকুরের বাঁধা ঘাট। এখন দিবা দ্বিপ্রহর, জগৎ নিস্তব্ধ, শুধু ঘাটের সোপানের উপর বসিয়া সেই ফিরিওয়ালা ও মন্দিরের পুরোহিত—তাহাদের আনন স্বর্গীয় আলোকে উদ্ভাসিত। কবিত্বসম্পদে ইংরাজী সাহিত্যে এই কবিতাটার স্থান অনেক উচ্চ বলিয়া গণ্য হইবে।

গ্রন্থের শেষে গোটাকয়েক নানা জাতীয় ছোট ছোট কবিতা আছে। এগুলি আরও সুন্দর; কারণ এগুলি পড়িয়া তরুর নিজের জীবনের অনেক কথাই আমরা জানিতে পারি। গীতি-কবিতা লেখা তখনই সার্থক হয় যখন মানব মনের মধ্য দিয়া কবি নিজ হৃদয়ের ছবি ফুটাইয়া তুলিতে পারেন। এই গুটিকতক ছোট কবিতায় তরু যেরূপ সুন্দরভাবে নিজের হৃদয়ের কথা প্রাণস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন সেরূপ আর কোনও কবিতাতেই পারেন নাই। .... দুই ভগিনী সমুদ্রের বেলাভূমিতে বসিয়া আছেন, দুইজনেই আজ এক অচেনা দেশের যাত্রী। ভগিনীদ্বয়ের একটি রুগ্না। স্নেহপরায়ণা কোনও মহিলা আসিয়া তাঁহাকে একগুচ্ছ পুষ্প দিয়া গেলেন। সামান্য এই দান, কিন্তু ইহাই উপলক্ষ্য করিয়া কৃতজ্ঞতার সুরে 'হেষ্টিংস্ সহরের ধারে' (Near Hastings) শীর্ষক সুমধুর গীতি-কবিতাটির সৃষ্টি হইয়াছে। পরের দুইটি কবিতা—"France in 1870" এবং "On the Flyleaf of Erckmann-Chatrian's novel entitled Madame Thérèse"—ফরাসী দেশ এবং ফরাসী জাতির উদ্দেশে লিখিত। ছন্দের তেমন লীলায়িত গতি নাই, কিন্তু তবুও কবিতা দুইটি লেখিকার মনোভাবের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটাইয়া দেয়। "জীবনতরু" (The Tree of Life) কবিতাটি একটি জাগ্রত স্বপ্নের ছবি। কবিতাটিতে অপূর্ব্ব ভাবের সমাবেশ চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে।

It was an open plain
Illimitable—stretching, stretching
oh! so far!
And o'er it that strange light—
a glorious light—
Like that the stars shed over fields of snow
In a clean cloudless frosty night,
Only intenser in its brilliance.

"কমল" (Lotus) ও "বাগমারি" (Bagmaree) কবিতা দুইটিতে তরুর সনেট্ লিখিবার ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া

শ্রীলতিকা বসু

যায়। শেষোক্ত কবিতাটির তুলনা নাই। ইহাতে কিশোরী কবি তাঁহাদের উদ্যান-গৃহের ছবিখানি আঁকিয়াছেন। ছবিখানি অতি সুন্দর। সম্পূর্ণ কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

A sea of foliage girds our garden round,
But not a sea of dull unvaried green;
Sharp contrasts of all colours here are seen,
The light green graceful tamarinds abound,
Amid the mango clumps profound
The palms arise like pillars grey between,
And o'er the quiet pools seemuls lean
Red—red and startling like a trumpet's sound,
But nothing can be lovelier than the ranges
Of bamboos to the eastward, when the moon
Looks through the gaps, and the white lotus changes
Into a cup of silver. One might swoon
Drunken with beauty, then; or gaze and gaze
On a primeval Eden in amaze.

সুন্দর বর্ণনা। তেঁতুল, সিমুল, বাঁশঝাড় কিছুই বাদ যায় নাই। ইহাদের সঙ্গে তরুর প্রাণ সত্যই একসুরে গাঁথা ছিল। "আমাদের কাজুয়ারিনা গাছ" (Our Casuarina Tree) কবিতাটিতে ছন্দের উপর কবির কতটা অধিকার ছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। কবিতাটির বর্ণনা এমন সরল যে পড়িলেই স্বভাব-কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কথা মনে পড়ে। ইহাতে কোনও কষ্টকল্পিত উপমা বা ভাব নাই। সমস্ত ভাবটাই যেন ভাষার সহিত এক সুরে মিশিয়া বহিয়া যাইতেছে। প্রথমেই কবি বৃক্ষটির মোহন ছবি কল্পনা করিতেছেন :—

Like a huge python winding round and round,
The rugged trunk indented deep with scars
Up to its very summit near the stars
A creeper climbs in whose embraces bound
No other tree could live. But gallantly
The giant wears the scarf, and flowers are hung
In crimson clusters all the boughs among,
Where on all day are gathered bird and bee;
And oft at night the garden overflows
With one sweet song which seems to have no close,
Sung darkling from our tree while men repose.
When first my casement is wide open thrown
At dawn, my eyes delighted on its rest;
Sometimes and most in winter on its crest
A grey baboon sits statue-like alone,
Watching the sunrise, while on lower boughs
His puny offspring leap about and lay,
And far and near kokilas hail the day,
And to their pastures wend our sleepy cows,
And in the shadow on the broad tank cast,
The water-lilies spring like snow embossed.

কয়েক লাইন পরে কবিতাটিতে ইংরাজী কাব্যের রোম্যান্টিক্ যুগের যে সুর ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা বাস্তবিকই সুন্দর। পড়িলেই কীট্‌সের কবিতার কথা মনে পড়িয়া যায়।

Ah! I have heard that wail, far, far away,
In distant lands by many a sheltered bay
When slumbered in his cave the water wraith
And the waves gently kissed the classic shore
Of France and Italy beneath the moon,
When earth and sky lay tranced in a dreamless swoon.

এইটি এবং "বাগমারি" এই দুইটি কবিতা পড়িলেই তরুর কবি-প্রতিভা যে কত উচ্চ শ্রেণীর তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই দুইটি কবিতার ভাব ও ভাষার সম্মিলন অপূর্ব্ব। পূর্ব্বের লেখা কবিতাগুলির ছন্দের যে দোষ-ত্রুটির উল্লেখ এড্‌ম্যাণ্ড গস্ করিয়াছেন এ দুইটি কবিতা তাহা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। আর কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিলে তরুর প্রতিভা যে কত উচ্চ স্থান অধিকার করিত তাহা অনুমান করিতে পারা যায়। কিন্তু তাহা হইল না। মাত্র একুশ বৎসর বয়সে ফুটিতে না ফুটিতে কাব্যকাননের এই কুসুমটি মুকুলেই ঝরিয়া পড়িল। তবুও, এড্‌ম্যাণ্ড্ গস্ যে বলিয়াছেন

"When the history of the literature of our country comes to be written, there is sure to be a page in it dedicated to this fragile exotic blossom of song."

—ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস যখন লেখা হইবে, তখন বিদেশের এই ক্ষীণপ্রাণা কবি-কুসুমিকার কথা নিশ্চয়ই তাহার একপৃষ্ঠা জুড়িয়া থাকিবে—এইটুকুই সান্ত্বনা।

গঙ্গাস্নানের ফল

—গল্প—

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঘাটের পথে

বরানগরের বুকের মধ্য দিয়া হেজার্ রোড গিয়া দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর খানিক উত্তরে গঙ্গার ঘাটে পৌঁছিয়াছে। দশহরার দিন। বেলা ন'টা বাজিয়া গিয়াছে। পথে স্নানার্থী নর-নারীর ভিড়। এই ভিড়ের মধ্য দিয়া এক বর্ষীয়সী মহিলা, সঙ্গে বারো-তেরো বছর বয়সের একটি মেয়ে, গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিতেছিলেন। বর্ষীয়সীর হাতে ছোট একটি ঘটী, ঘটীতে গঙ্গাজল; বালিকার হাতে গামছায় জড়ানো ভিজা কাপড়।

পথের বাঁ-দিকে একটা পুকুর—জলের রঙ যেন কালি গোলা, তার উপর ময়লা ফেনা। পাড়ের উপর হেলিয়া-পড়া একটা নারিকেল গাছ, তার পরেই ভাঙ্গা ইটের স্তূপ। এই স্তূপের পাশে একটা বাতাবি লেবুর গাছ—অজস্র ফলে ভরা। বাতাবি-গাছের পাশে রাজ্যের জঙ্গল—কালকাসিন্দা আর গাবভ্যারেণ্ডার গাছই বেশী। পাড়ার ক'টী ছেলেমেয়ে জটলা করিয়া কেহ কোনো বন-ফলে থাবড়া মারিয়া সশব্দে তাহা ফাটাইতেছে, কেহ বা গাবভ্যারেণ্ডার ডাল ভাঙ্গিয়া তারি রসে ফেনার বুদ্বুদ ফুটাইয়া ফুঁ দিয়া বাতাসে উড়াইতেছে। এই পড়ো জমির পাশে একখানি সুদৃশ্য বাড়ী, জীর্ণ পড়িয়া ছিল; এখন মিস্ত্রী-মজুর লাগিয়া তার সজ্জা-সংস্কার করিতেছে। বাড়ীর সামনে খানিকটা এলোমেলো জঙ্গল। একজন যুবা হাতে কোদাল লইয়া সেই জঙ্গল সাফ করিতেছিল।

বর্ষীয়সী সেই বাড়ীর সামনে আসিয়া বালিকাকে কহিলেন—এই যে একটা মজুর খাটচে রে, একেই বলি··· বাঙালী দেখচি—খোট্টা নয়।

বর্ষীয়সী বাড়ীর সামনে দাঁড়াইলেন। যে যুবা জঙ্গল কাটিতেছিল, তাকে কহিলেন—ওরে বাছা, শুনতে পাচ্ছিস্?

যুবা তখন কোদাল রাখিয়া ফিরিয়া চাহিল। বর্ষীয়সী কহিলেন—আমাদের বাড়ী এই কাছেই। বড্ড জঙ্গল হয়েছে, তা লোক পাই না। তুই আসবি? জঙ্গলটা কেটে পরিষ্কার করে দিবি? পয়সা দেবো।

যুবা ক্ষণেকের জন্ত অবাক হইয়া বর্ষীয়সীর পানে চাহিয়া রহিল, মনে মনে ভাবিল, বাঃ! আমায় ইনি মজুর ঠাওরাইয়াছেন। এ যে অদ্ভুত ভুল দেখছি! তবে এ ভুলের নজীর আছে! অত-বড় পণ্ডিত হাইকোর্টের জজ যে সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়···তিনি এক দিন গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিতেছিলেন, পথে কে তাঁকে পূজারী-ব্রাহ্মণ ভাবিয়া নিজের বাড়ী ডাকিয়া লইয়া গিয়া তাঁকে দিয়া যে ইতু পূজা করাইয়া দক্ষিণা দিয়া ছাড়িয়াছিল! আমি সার গুরুদাস নই, সামান্ত লোক। হাতে কোদাল, জঙ্গল কাটিতেছি! আমাকে মজুর ভাবা আর বিচিত্র কি! তা বেশ, উনি যখন মজুর ভাবিয়াছেন, তখন নয় মজুরী করিয়াই দেখা যাক! মন্দ কি! মজা তো আছে! হাসিয়া সে কহিল—কেন করবো না, মা? আমার তো এই কাজ।

বর্ষীয়সী কহিলেন—তা'হলে আসবি বাছা? আমার লোকজন নেই, কেই বা ডাকতে আসবে। আমার সঙ্গে এখন এসে যদি বাড়ী দেখে যাস্······

যুবা কহিল—বেশ তো মা, চলুন।

কোঁচার খুঁটে কপালের ঘাম মুছিয়া যুবা বাহিরে আসিল। তার পরণে মোটা কাপড়, গায়ে একটা ফতুয়া, মাথার চুল খুব ছোট করিয়া ছাঁটা, গোঁফ-দাড়ি কামানো, মুখের ও দেহের বর্ণ যেটুকু দেখা যাইতেছে, তাতে ময়লা বলিলে অন্তায় হয় না। তবে কুলির কাজ করিলেও তাকে নোংরা বলা চলে না। সাধারণ ধাঙড়ের মত তার বেশভূষাও নয়।

গঙ্গাস্নানের ফল

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

বর্ষীয়সী কহিলেন—কত করে রোজ নিবি ?

যুবা কহিল—আগে জঙ্গল দেখি, মা ! তারপর বলবো।

কথাগুলি বেশ নম্র আর বলার ভঙ্গীতে কেমন একটু মাধুর্য্য আছে ! বর্ষীয়সী কহিলেন—এখানে মাস দুয়েক আমরা এসেচি। তা, বড় জঙ্গল, বাছা। সামনে বর্ষা,—শেষে কি ম্যালেরিয়ায় ভুগবো ! লোকজন তো আর নেই—কেই বা ধাঙড়-মজুর ডেকে দেয় ! আজ তোকে পেলুম…

বর্ষীয়সী সধবা। তাঁর পরণে চওড়া লাল-পাড় শাড়ী, অঙ্গে সেমিজ নাই। মুখে-চোখে দারিদ্র্যের ছোপ লাগিয়া থাকিলেও তাঁকে দেখিলে সম্ভ্রম হয়।

কথায় কথায় বর্ষীয়সী বাড়ী আসিয়া পৌছিলেন। লোণা-ধরা ইটের প্রাচীর ; মাঝে মাঝে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। প্রাচীরের মাঝখানে কাঠের দরজা। দরজার কাঠে কবে কোন্ সেই মান্ধাতার আমলে কি রঙ পড়িয়াছিল, এখন তার কোনো চিহ্নও নাই ! রৌদ্র, জল, আর ধূলা খাইয়া কাঠের অঙ্গে এক বিচিত্র বর্ণ বাহির হইয়াছে—গা স্থানে স্থানে ফাটিয়াও গিয়াছে। দ্বার খুলিলে সামনেই জঙ্গল—এত রকমেরও গাছ বাহির হইয়াছে। সেই জঙ্গল মাড়াইয়া গিয়া সিঁড়ি। সিঁড়ির পর রোয়াক। রোয়াকের সীমেণ্ট ফাটা—মাঝে মাঝে সীমেণ্ট উঠিয়া খানা-ডোবা হইয়াছে। এই রোয়াকের উপর জীর্ণ একতলা বাড়ী। রোয়াকের নীচে বাঁশের মাচায় কুমড়া শাক—তার কাছাকাছি কয়েকটা ঢ্যাঁড়স-গাছ। এক কোণে লাল করবীর ঝাড়।

বর্ষীয়সী কহিলেন—কি রকম জঙ্গল, দেখছিস্ ! সাপখোপ যে কত আছে, সংখ্যে নেই ! ভয়েই মরি ! এখন সামনের এই জঙ্গল সাফ করতে হবে। কুমড়ো শাকগুলো না মরে, ঢ্যাঁড়স গাছগুলোও কাটবিনে, আর তুলসীগাছ যে ক'টা পাবি, সেগুলো বাঁচিয়ে সাফ করবি, বুঝলি ? কি নিবি, এখন বল্ দিকিনি……

যুবা কহিল—আপনিই বলে দিন্, মা—

বর্ষীয়সী কহিলেন—ছ' আনা দেবো। আর বলিস্ তো জলপানির জন্তে ছ' পয়সা…কাজ শেষ হয়ে গেলে।

নগদ দশ পয়সা ! যুবা মনে মনে হাসিল ; তারপর কহিল—বেশ, আপনার যা খুসী, তাই দেবেন, মা। কাজ তো তেমন পাই না—দিন-কাল যা পড়েচে ! যুবা বালিকার পানে চাহিল। বালিকা রোয়াকের উপর দাঁড়াইয়াছিল—পুতুলের মত নিস্পন্দ ! এই জঙ্গল সাফ করিতে মোটে দশ পয়সা ! মার কথা বালিকার কানে বুঝি বাজিল ! সে ডাকিল,—মা—

মা মেয়ের পানে চাহিলেন। মেয়ে সরিয়া আসিয়া চুপিচুপি মাকে কি বলিল। মা বলিলেন— এ যেন ফাও ! ঐ তো বড় লোকের বাড়ী পয়সার কাজ করচে ! —এ নয় গরীবের একটা কাজ সুবিধে করেই করে দিলে। তা ত্যাখ্ বাছা, দশ পয়সায় পারবি তো ?

যুবা হাসিয়া কহিল—কেন পারবো না, মা ? একটা পয়সা কে দেয়, তার ঠিক নেই ! এ তো খেটে দশ পয়সা তবু পাবো।

বর্ষীয়সী কহিলেন—তা'হলে কখন আসবি, বল্ বাছা ? বাবুদের বাড়ীর কাজ…ও তো একদিনে হবার নয়।……

যুবা কহিল—তাছাড়া ও কাজ দু'দিন হাতে রেখে করবো'খন। বলেন তো, আজ থেকেই এখানে কাজে লাগি—তবে এ'ও এক দিনে হবে না।

বর্ষীয়সী কহিলেন—তা তো দেখচি, বাছা। আমার তেমন তাড়া নেই ! এ কাজ নয় একটু সময় ক'রে করিস্—তবে দশ পয়সার বেশী পাবি নে……কুরোন হলো তোর সঙ্গে…কেমন ?

যুবা হাসিয়া কহিল—তাই হবে মা ! তা'হলে আমি বিকেলের দিকে আসবো'খন‥ এই তিনটে-চারটের সময়।

বর্ষীয়সী কহিলেন—ঠিক আসিস্, বাছা। না হলে আমার আবার অন্ত লোক ঠিক করতে হবে।

যুবা কহিল—আসবো বৈ কি মা……

যুবা চলিয়া আসিতেছিল ; দ্বার-প্রান্তে আসিয়া আর একবার ফিরিয়া চাহিল। বালিকা তখন দেওয়ালে-খাটানো দড়িতে ভিজা শাড়ী মেলিয়া দিতেছিল।

পথে আসিয়া যুবা প্রাণ খুলিয়া একবার হাসিল। সুশ্রী পুরুষ সে নয়, এ কথা সে ভালো করিয়াই জানে। তা হোক......তাই বলিয়া লোকে তাকে ধাঙড় বুঝিবে, নিজের চেহারার সম্বন্ধে এমন বদ ধারণাও তার কোনো কালে ছিল না। ফিজিক্সের এম-এ শিবনাথ মিত্র......কলিকাতা কলেজের ছাত্রমহল যার নামে পাগল...সে ধাঙড়ের কাজ করিয়া নগদ দশ পয়সা রোজগার করিতে চলিয়াছে, এ কথা যে কোনো আজগুবি গল্পের লেখকও কল্পনা করিতে সাহস পাইত না! আর এত-বড় আজগুবি কাণ্ড আজ সত্যই ঘটিতে বসিল! এখানকার এই বাড়ীখানা তার পিতার কাছে বন্ধক ছিল। ঋণী টাকা শোধ দিতে পারে নাই, বাড়ীখানা তাই কোবালা করিয়া তাকে লিখিয়া দিয়াছে। কলিকাতার কাছে বাড়ী, সহরের কোনো কোলাহল নাই। গ্রীষ্মে কলেজের ছুটী হইলে এ বাড়ী সে মেরামত করাইতেছে, নিজে থাকিয়া সব তদ্বির করিতেছে। এইখানে আসিয়া মুক্ত প্রকৃতির বুকের উপর বাস করিবে, ষ্টীমারে করিয়া কলেজ যাইবে—দু'বেলা গঙ্গার হাওয়া,...তাছাড়া এই খোলা বাতাস, পাখীর গান আর ফুল-ফল! তাছাড়া তরি-তরকারী সব নিজের হাতে ফলানো, এ তার আজন্মের সাধ! তাই এখানে আসা! কিন্তু আজিকার প্রভাতে এ কি বিচিত্র অসম্ভব কাণ্ড ঘটিয়া বসিল!

শিবনাথ ভাবিল, দেখা যাক, ঘটনাচক্র কোথায় গিয়া দাঁড়ায়! কিন্তু খুব হুঁশিয়ার—ধরা না পড়িয়া যাই!

শিবনাথ ধীরে ধীরে গৃহে আসিয়া ভৃত্যকে ডাকিল—বেচু...

ভৃত্য আসিলে শিবনাথ কহিল—কোদালটা তুলে রাখ্। আর তেল এনে দে ...ছাতাটাও আনিস্। গঙ্গায় দুটো ডুব দিয়ে আসিগে, চ। আজ দশহরা রে। বেলা হতে চল্‌লো। তুইও আজ আর পুকুরে নাস্ নে—গঙ্গায় নাইবি। দশহরায় গঙ্গাস্নান করলে দশবিধ পাপ ক্ষয় হবে, বুঝলি? গঙ্গাস্নানের ফল তো জানিস্ না......সহস্র অশ্বমেধের ফল......অশ্বমেধ জানিস্?—যজ্ঞ, যজ্ঞ, মস্ত ভারী যজ্ঞ রে!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বন কাটা

কলেজে গ্যালভানিক ব্যাটারী আর ওম্‌স্ ল'র চর্চ্চায় মত্ত থাকিয়া যে-শিবনাথ দুনিয়ার আর কোনদিকে এত কাল চাহিবার অবসর পায় নাই এবং সময়কে যে অত্যন্ত দ্রুত-গতিশীল বলিয়াই জানিয়া আসিয়াছে, আজ দুপুরে তার কেবলি মনে হইতেছিল, সময় যেন আর কাটিতে চায় না! টম্‌সনের বিজ্ঞানের বহিখানা ঘরের কোণে পড়িয়া আছে। স্প্রীংয়ের ছোট খাটখানার উপর হইতে রাজ্যের ইংরাজী বৈজ্ঞানিক পত্রিকাগুলাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া শিবনাথ সেই খাটে পড়িয়া প্রহর গণিতেছিল। একধারে দেওয়ালে-সংলগ্ন ঘড়ি...তার পেণ্ডুলামটা দুলিয়া দুলিয়া কিছুতেই আর বড় কাঁটাটাকে আগাইয়া লইয়া যাইতে পারিতেছে না! বাহিরে মিস্ত্রীদের কর্ণিক মারিয়া ইট্ ভাঙ্গার শব্দ হইতেছিল...আর মাঝে মাঝে তাদেরি চীৎকার—এ সোমালি, ইট্টা লে আও, ইট্টা......বহু-দূর গগন পথে দু' একটা উড়ন্ত চিলের নৈরাশ্যের আর্ত্ত রবও সেই সঙ্গে ধ্বনিয়া উঠিতেছে। শিবনাথ বিরক্ত হইল। দশ পয়সা রোজগারের বিলম্ব? না। প্রাণের মধ্যে যে চব্বিশ বৎসর বয়সটা এতদিন বইয়ের আড়ালে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, সহসা সে যেন আজ জাগিয়া উঠিয়াছে! এবং জাগিয়াই বুঝিয়াছে, এ পৃথিবী শুধু জড় পঞ্চভূতের সমষ্টিমাত্র নয়! এখানে গান আছে, গন্ধ আছে, আলো আছে, বর্ণ আছে, মাধুরী আছে, শোভা আছে! এই ইট-কাঠ-চূণ-সুরকীর বন্ধন কাটিয়া ওই ছায়ায় ঢাকা পথে বাহির হইলেই যেন সে আলো, সে বর্ণ, সে গান, সে গন্ধের খানিকটা পরিচয় অনায়াসে পাওয়া যায়! প্রাণ তাহা পাইবার জন্ম আকুল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কি করিয়া পাইবে, তা সে জানে না। তবু মনে হইতেছিল, বাঁধা রুটিনের মধ্যে এই দেওয়ালের আড়ালে আর পড়িয়া থাকা যায় না! বাহির হইবার জন্ম পা দুইটা মুহুর্মুহু চঞ্চল হইয়া

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

উঠিতেছে! কিন্তু বাহির হইয়া কোথায় যাইবে?… ও-বাড়ীতে? কিন্তু তাঁদের সময় দেওয়া হইয়াছে, বেলা তিনটা। তার পূর্ব্বে যাওয়া খারাপ দেখায়! এখন একটা বাজিয়াছে—কাজেই এ দীর্ঘ দু' ঘণ্টা কাল…… শিবনাথ ভাবিল, মিস্ত্রীদের কাজ-কর্ম্ম দেখিয়া কাটানো ছাড়া উপায় কি!…

ঢং-ঢং-ঢং। মিস্ত্রীদের কাজ-কর্ম্মের ফাঁক দিয়া শিবনাথের মন ছিল ঐ ঘড়ির পানে। যেমন তিনটা বাজা, অমনি সে সকালের সেই ছোট কাপড় পরিয়া, ফতুয়া গায়ে দিয়া খালি পায়ে পথে বাহির হইয়া পড়িল—হাতে সেই কোদাল। যৌবনের দিগ্বিজয়-যাত্রার পক্ষে অস্ত্রখানা অত্যন্ত হাস্যকর, সন্দেহ নাই! কিন্তু কোদাল ফেলিয়াও যাওয়া চলে না!

আকাশে মেঘ জমিয়া রৌদ্রের তেজটুকুকে ঢাকিয়া দিয়াছিল। পথের ধারে মস্ত জামরুল গাছ—গাছে সাদা সাদা অজস্র জামরুল। কোথায় কোন্ একটা ঝোপে বসিয়া কি একটা পাখী ডাকিতেছিল। শিবনাথ ভাবিল, পাখীর গলায় সত্যই মধু ঝরে! কবিদের কল্পনা তাহা হইলে নিছক মিথ্যা নয়!

সেই বাড়ী। দ্বার ভেজানো ছিল। দ্বার খুলিয়া ভিতরে ঢুকিতেই দেখে, রোয়াকের উপর মাদুর বিছানো। মাদুরে বসিয়া এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। তাঁর সামনে ক'খানা পুরানো ইংরাজী বই—ছ'পেনি সংস্করণ বলিয়া মনে হইল—একটা দোয়াত, কলম ও মোটা খাতা। শিবনাথ ভিতরে প্রবেশ করিতেই প্রৌঢ় চাহিয়া দেখিলেন, কহিলেন—ও! তুই এসেছিস্! তোরি সঙ্গে গিন্নী-ঠাকরুণের কথা হয়েছিল বুঝি, আজ?…এই জঙ্গল সাফ করার জন্য…?

শিবনাথ কহিল—আজ্ঞে, কর্ত্তা।

প্রৌঢ় ডাকিলেন—টঁ্যাপা—

ভিতর হইতে উত্তর আসিল,—যাই বাবা! এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই বালিকার প্রবেশ। মাথার চুল খোলা, পিঠ বহিয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে, যেন শ্রাবণের এক রাশ মেঘ! বালিকার পরণে একখানি তালি-দেওয়া বহু পুরানো চাঁদের-আলো রঙের শাড়ী। কালের স্পর্শে কাপড়ের হলুদ রঙের উপর সাদা সাদা আঁশ ফুটিয়াছে। শিবনাথের পানে চাহিতেই দু'জনে চোখোচোখি হইল; এবং টঁ্যাপা চকিতে চোখ ফিরাইল। প্রৌঢ় কহিলেন—ওঁকে বল্‌গে যা, সেই মজুর এসেচে। আর আগে কোন্ ধারটা সাফ করবে, জিজ্ঞাসা কর্। বালিকা এক পাক ঘুরিয়া চলিয়া গেল। তার আঁচলে বাঁধা ছোট চাবির রিংটা সশব্দে দুলিয়া উঠিল।

প্রৌঢ় কহিলেন—আমার একটু ফুলের সখও আছে… বুঝলি? তা এ জঙ্গল সাফ হয়ে গেলে ওখানে কিছু ফুলের চারাও লাগাতে চাই। গাছের যোগাড় করে দিতে পারবি? তোরা ত এখানকার বাসিন্দে…আমি নতুন এসেচি…তবে দাম শস্তা হওয়া চাই।……তা হবে না কেন? এ তো আর কলকাতা সহর নয়…কি বলিস্, পারবি?

এ প্রস্তাব মন্দ নয়! জঙ্গল সাফ হইলেও কাজ ফুরাইবে না, গাছের চারা লাগানো কাজ জুটিয়া যাইবে! শিবনাথ কহিল—আজ্ঞে, তা পারবো না কেন? ভালো ভালো বেল, যুঁই, রজনীগন্ধা, মল্লিকা, টগর—তা আমি খুব শস্তায় এনে দেবো, কর্ত্তা।

ইতিমধ্যে বর্ষীয়সী আসিয়া দেখা দিলেন—একা। প্রৌঢ় কহিলেন—তোমার লোক তো এসেচে গিন্নী—তা কোন্ দিকটা আগে সাফ করবে, বলে দাও। আমি ওকে বলছিলুম, ফুলগাছের চারা লাগাবার কথা… ও চারা এনে দেবে, দামেও শস্তা হবে, বলচে।

গৃহিণী কহিলেন—বেশ তো। তোমার অত সখ বলেই না! তা ছাড়া এখানে বাস করতেই হবে যখন…

বর্ষীয়সী জায়গা দেখাইয়া দিলেন,—এইদিকটা আগে। শিবনাথ যে-আজ্ঞে বলিয়া কোদাল লইয়া কাজে নামিল।

কতকগুলা কাটিতেই তার হাত ভারী হইয়া উঠিল। অনভ্যস্ত হাত! তার উপর আনাড়ি! গাছ কাটিতে পা না কাটিয়া বসে! কোদাল রাখিয়া শিবনাথ দাঁড়াইল। প্রৌঢ় নামিয়া আসিয়া তার সামনে দাঁড়াইলেন, কহিলেন—একটা ঝুড়ি চাই? না?

শিবনাথ কহিল—আজ্ঞে, হঁ্যা।

প্রৌঢ় ডাকিলেন—ট্যাঁপা……

আবার সেই বালিকা আসিয়া রোয়াকে দাঁড়াইল। ট্যাঁপাই এ-বাড়ীর সব! অর্থাৎ কর্ম্মচক্র ঘুরাইতে হইলেই এই ট্যাঁপার ডাক পড়ে! প্রৌঢ় কহিলেন—একটা ভাঙ্গা ঝুড়ি-টুড়ি দিয়ে যা দিকি—এগুলো ফেলতে হবে তো।

বালিকা চলিয়া গেল। প্রৌঢ় কহিলেন—তোমায় বাঙালী দেখচি। ভালো। খোট্টাদের জ্বালায় জন-মজুরী করেও বাঙালীর আর খাবার জো নেই।

শিবনাথ কহিল—আজ্ঞে, না।

প্রৌঢ় কহিলেন—তোমার নাম কি?

শিবনাথ মুহূর্ত্ত ভাবিল, তারপর সতর্কতা সত্বেও ফস্ করিয়া তার মুখ দিয়া সত্য কথাই বাহির হইল। সে কহিল—শিবু।

প্রৌঢ় কহিলেন—শিবু! বাঃ, বেশ নাম। তা তুমি অন্ত কাজ্‌কর্ম্মের চেষ্টা ছাখো না কেন! এই যেমন, লোকের বাড়ী চাকরি-বাকরি! জোয়ান আছো! শিবনাথের চেহারার মধ্যে এমন কিছু বুঝি প্রৌঢ় লক্ষ্য করিলেন, তাই সহসা 'তুই' না বলিয়া তাকে এবার এই 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন!

শিবনাথ কহিল—আজ্ঞে, পাই কৈ! তা'ছাড়া……

তার মাথায় বুদ্ধি জোগাইল। সে কহিল,—জাতে কায়স্থ…তা'ছাড়া গাছপালার সখ একটু আছে…

প্রৌঢ় কহিলেন—বটে! কিন্তু কায়েতের ছেলে হয়ে লেখাপড়া কিছু শেখোনি, বাপু! এই ধাঙড়ের কাজ…

শিবনাথ কি ভাবিয়া কহিল,—আজ্ঞে, একটু-আধটু শিখেছিলুম। ইংরিজীতে নামটা সই করতে জানি।

প্রৌঢ় কহিলেন—তাই তো! দেশের কি দুরবস্থা হয়েছে।…কায়েতের ছেলে হয়ে…তা তোমার বাপ-মা আছে?

শিবনাথ কহিল—আজ্ঞে না, কেউ নেই!

—আহা! প্রৌঢ় একটু সমবেদনার দৃষ্টিতে শিবনাথের পানে চাহিলেন। ট্যাঁপা ইতিমধ্যে একটা ঝুড়ি আনিয়া দিল; তলায় প্রকাণ্ড ছিদ্র। প্রৌঢ় কহিলেন—এর তলা যে একেবারে নেই রে! তিনি হাসিলেন; শিশুর মত সরল হাসি! হাসিয়া তিনি কহিলেন,—তা তলায় একখানা কলাপাতা দিয়ে নাও……

শিবনাথ কহিল—আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই নেবো।

ট্যাঁপা চলিয়া যাইতেছিল, প্রৌঢ় কহিলেন—আমার দোয়াত-কলম-কাগজপত্তরগুলো আপাতত তুলে রাখ্ তো মা…আজ আর লেখা হলো না। একবার কলকাতা যাবার কথা আছে…এই বেলা যাই।

ট্যাঁপা কহিল—সকাল-সকাল ফিরো বাবা, রাত করো না। মেঘ করে রয়েছে, যদি বৃষ্টি নামে!

প্রৌঢ় কহিলেন—তাই হবে! বেশী ঘুরবো না, আহিরীটোলায় যাব শুধু…

ট্যাঁপা কহিল—তোমার কাপড়-জামা ঠিক করে দি..

প্রৌঢ় কহিলেন—হ্যাঁ।

ট্যাঁপা চলিয়া গেল। প্রৌঢ় শিবনাথের দিকে চাহিয়া কহিলেন—তুমি তা'হলে দেখে-শুনে কাজ কর, বাবা… কায়স্থ তুমি,…ফাঁকি দিয়ো না যেন…ঘরের ছেলের মতন—এবেলায় নয় এখানেই কিছু খেয়ো, গিন্নীকে আমি বলে যাচ্ছি।

শিবনাথ কহিল—আপনার দয়া, কর্ত্তা।

প্রৌঢ় চলিয়া গেলেন। শিবনাথ কোদাল হাতে জঙ্গল কাটিতে লাগিল।

বেলা ক্রমে পড়িয়া আসিল। জঙ্গল কাটার তবু বিরাম নাই। রোয়াকের ঠিক নীচে খানিকটা জায়গা সাফ হইয়া গেল। সন্ধ্যা হয়-হয়, বর্ষীয়সী আসিয়া কহিলেন; —কিছু খেয়ে নে বাছা…

শিবনাথ তাঁর পানে চাহিল—কাঁসীতে ভরিয়া তিনি মুড়ি আনিয়াছেন। কিসে লইবে, শিবনাথ বুঝিতে পারিল না; সে হাত বাড়াইল। বর্ষীয়সী কহিলেন—কাঁসিতেই? তাই নে।

শিবনাথ কাঁসি লইয়া হাতের পানে চাহিয়া দেখে, নোঙরা হাত।

সে কহিল—একটু জল দেবেন? হাতটা ধোবো।

বর্ষীয়সী ডাকিলেন—ট্যাঁপা, একটু জল নিয়ে আয় তো মা…

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

ট্যাঁপা জল লইয়া আসিল। শিবনাথের হাতে সে জল দিল। হাত ধুইয়া শিবনাথ সিঁড়িতে বসিয়া মুড়ি খাইতে সুরু করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চাল বাড়ন্ত

পরের দিন বিকালবেলা। রোয়াকে মাদুর বিছাইয়া কর্ত্তা সেই খাতায় কি লিখিতেছিলেন, আর শিবনাথ জঙ্গল কাটিতেছিল; মাঝে মাঝে কর্ত্তার পানেও চাহিয়া দেখিতেছিল। কর্ত্তা খানিকক্ষণ লেখেন, আবার আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকেন। কি লিখিতেছেন? হিসাব? এত ভাবিয়া কত বৎসরের পুরানো হিসাব লিখিতেছেন? শিবনাথের বারবার কৌতূহল হইতেছিল, কর্ত্তা কি লিখিতেছেন, জানিবার জন্য। কিন্তু মনকে সে পুনঃপুনঃ শাসাইয়া স্থির রাখিতেছিল, খবর্দ্দার, সে ধাঙড়, তার এ কৌতূহল অত্যন্ত অনুচিত, বেমানান্! তা'ছাড়া ধরা পড়িবার আশঙ্কা তাহাতে বিলক্ষণ! অবশ্য ধরা পড়িলে এমন কিছু ক্ষতি নাই! তবে এই বিচিত্র রোমান্স আর এক লাইন অগ্রসর হইবে না!

একজন, দুইজন, তিনজন লোক আসিয়া টাকার তাগাদা করিল। পাওনাদার! কর্ত্তা অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে সকলকেই আশ্বাস দিয়া বলিলেন,...এই শনিবারটা! তারপর রবিবার সকালে কাহাকেও শুধু হাতে ফিরাইবেন না! আশ্বাস পাইয়া তারা বিদায় লইল, কিন্তু মুখে অপ্রসন্নতার বোঝা লইয়া!

শিবনাথ ভাবিল, কর্ত্তা কি করেন! আপিস তো নাই। শনিবারে টাকা আসিবে, বলিলেন! বাড়ী ভাড়া? কলিকাতার বাড়ী ভাড়া দিয়া এখানে বাস করিতে আসিয়াছেন, বুঝি! কিন্তু যাই হোক, তার এত মাথাব্যথা কেন?

মাথাব্যথার একটু কারণ ছিল। এই পরিবারটির প্রতি তার কেমন একটু মমতা জাগিয়াছিল। আর ঐ মেয়েটি! আহা, বড় শান্ত! যেটুকু তাকে সে দেখে, শুধু ফাই-ফরমাস খাটিতেছে! তাও, নির্ব্বিবাদে, প্রসন্ন চিত্তে! নিজের যেন কোনো অস্তিত্ব নাই! এই ছোট্ট সংসারটুকুর মধ্যে সে যেন কেবলি শৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে! যার যেখানে বাধিতেছে, সেইখানেই সে আসিয়া হাতখানি বাড়াইয়া বাধা সরাইয়া লইতেছে! তাছাড়া ট্যাঁপার বর্ণ এমন-কিছু নয় যে, তার পানে কারো নজর পড়িবে! তবে তার চোখ দুটি! এমন চোখ যে একবার দেখিলে বারবার দেখিতে ইচ্ছা হয়! ঘনকৃষ্ণ পল্লব, তার নীচে ডাগর টানা চোখ...তাহাতে ঐ যে কেমন একটা উদাস, অসহায় ভাব! কলেজে যখন সংস্কৃত কাব্য পড়িত, তখন একটা কথা সে পড়িয়াছিল, মৃগাক্ষি! মৃগের অক্ষি তেমন করিয়া দেখার সৌভাগ্য তার কখনো হইয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না! তবে এ দুটি চোখ দেখিয়া কবেকার সেই কলেজে-পড়া মৃগাক্ষি কথাটা তার বার-বার মনে পড়িতেছিল!

গৃহিণী আসিয়া কহিলেন—ওগো, চাল যে বাড়ন্ত—কাল সকালেই চাই! না হলে...

কর্ত্তা কলম ফেলিয়া গৃহিণীর পানে চাহিলেন; কহিলেন—কিন্তু শনিবারের আগে...তাইতো, মুদি এইমাত্র এসেছিল টাকার জন্য। কিছু না পেলে দেবে কি?

গৃহিণী দুশ্চিন্তায় অত্যন্ত কাতর হইয়া উঠিলেন। তিনি কহিলেন—উপায়...?

কর্ত্তা কহিলেন,—কারো বাড়ী থেকে চেয়ে-চিন্তে...

গৃহিণী কহিলেন,—ট্যাঁপাকে বলেছিলুম, তা ও আর পারে না। বলে, নিত্যিই তো এটা-সেটা...ওর ভারী লজ্জা করে!

কর্ত্তা ও গৃহিণীর মুখে নিরুপায়তার এমন বেদনা ফুটিয়া উঠিল!...তাঁদের কথাগুলা শিবনাথের কানে গেল। তার বুকখানা দরদে ফাটিয়া পড়িবার মত হইল! ওখানে বিলাস-ভূষণে সে জলের মত পয়সা ব্যয় করিতেছে, আর ঠিক তার বাড়ীর পাশেই এই বিপন্ন পরিবার...এমন বিপন্ন যে কাল মুখে অন্ন দিবে কি করিয়া, তার কোনো সংস্থান নাই!...তাইতো, এখন এই বিপন্ন পরিবারটিকে এই দারুণ দুশ্চিন্তার হাত হইতে কি করিয়া সে রক্ষা করিবে!

সহসা বুদ্ধি জোগাইল। সে আসিয়া কহিল,—একটা কথা বলছিলুম, কর্ত্তা...

কর্ত্তা কহিলেন—কি ?

শিবনাথ কহিল—আপনারা দয়া করে আমায় কাজ দিয়েছেন বলেই সাহস পাচ্ছি—তা'ছাড়া আপনাকে দেখে —শিবনাথ গৃহিণীর পানে চাহিল ; চাহিয়া কহিল—আমার নিজের মার কথা মনে পড়ে! ছেলেবেলায় তাঁকে হারিয়েচি·· ভালো মনে পড়ে না, তবু যেটুকু পড়ে, তাই থেকে মনে হয়, তিনি অনেকটা যেন আপনার মতই দেখতে ছিলেন···

মমতায় গৃহিণীর বুক দুলিয়া উঠিল। মার বুক! তিনি কহিলেন,—কি, বল···

শিবনাথ একটা ঢোঁক গিলিয়া কহিল—আমি যেখানে রেঁধে খাচ্ছিলুম, সেখানটায় চূণ-সুরকী এনে ফেলেচে—তাই রান্নার অসুবিধে হবে,···তা মা, আমায় দুটি খেতে দেন যদি আজ! কোথায় বা রাঁধি!···

এই কথাটুকু তার মুখে ফুটিবামাত্র গৃহিণীর মুখ এমন বিবর্ণ হইয়া উঠিল···শিবনাথ তাহা লক্ষ্য করিল ; লক্ষ্য করিয়া কহিল—পাঁচ সের চাল আমার কেনা আছে মা, সেই চালগুলি নিয়ে আসবো। দয়া করে যদি দুটো রেঁধে দেন!

গৃহিণীর দুই চোখ বাষ্পে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। তিনি একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—বেশ, বাবা···তার আর কি! দুটো রেঁধে দেওয়া···তা···

দুঃখে-ক্ষোভে গৃহিণীর স্বর রুদ্ধ হইল, কথাটা তিনি আর শেষ করিতে পারিলেন না।

শিবনাথ কোদাল রাখিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। কর্ত্তা কহিলেন—ওরি চালে নয় চালিয়ে দাও ক'টা দিন গো! শনিবারে বসাকের হাতে-পায়ে ধরে কিছু টাকা আনবোই। বইয়ের জন্তও না দেয় তো ভিক্ষে করেও ··

গৃহিণী নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—কিন্তু এমনি করে ক'দিন চলবে ? তার উপর মেয়েটা বড় হয়ে উঠেচে!

কর্ত্তা কহিলেন—ও কথা বলো না। আমায় কোনো কথা মনে করিয়ে দিয়ো না। আমার সব মনে জেগে আছে, অষ্ট প্রহর! তবে ভেবে ফল নেই! তাই ভাবি না। অদৃষ্টের উপর সব ভার দিয়ে আমি বসে আছি। না হলে পাগল হয়ে যাবো!

গৃহের পথে শিবনাথের চিন্তার আর অন্ত ছিল না। সে কেবলি ভাবিতেছিল, কি করিয়া কয় সের চাউল কোনো দোকান হইতে কিনিয়া ইঁহাদের গৃহে পৌঁছাইয়া দেওয়া যায়! সে তো এঁদের পরিচয় জানে না! কর্ত্তার নামটাও জিজ্ঞাসা করিয়া জানিবার তার সাহস হয় নাই! যদি ধরা পড়ে ? ধাঙড়ে জঙ্গল সাফ করিতে আসিয়া কবে আর গৃহকর্ত্তার নাম-ধাম-পরিচয় জিজ্ঞাসা করে! সারা পথ ভাবিয়াও সে কোনো উপায় স্থির করিতে পারিল না। কি করিয়া পারিবে? জীবনে মানুষের কোনো পরিচয়, মানুষের সুখ-দুঃখ বা হাসি-অশ্রুর কোনো সংবাদ কোনো দিন সে রাখিয়াছে কি ? ক্ষিতি, অপ্, তেজ ইহাদের স্থিতি-গতি··এই সব লইয়াই চিরদিন মাথা ঘামাইয়া আসিয়াছে! মানুষের রাজ্যে বাস করিয়া মানুষকে না জানিয়া তেজ, মরুৎ, ব্যোম ·· এই সবের তদ্বির করিয়া তো ভারী লাভ! জীবনে তারা কি সার্থকতাই বা আনিয়া দিবে! এই যে সামনেই এক মস্ত সমস্তার উদয় হইয়াছে—ক্ষিত্যপ্‌তেজের পায়ে মাথা খুঁড়িয়া মরিলে কিম্বা গালভ্যানিক ব্যাটারি ঘুরাইলেও যে তার সমাধান হইবে না!

গৃহে পৌঁছিয়া ভৃত্যকে ডাকিয়া শিবনাথ কহিল—একটা থলেয় সের আষ্টেক চাল বার করে দে দিকিন্...

ভৃত্য অবাক হইয়া মনিবের পানে চাহিল। শিবনাথ কহিল—হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি যে! চট্‌-পট্ দে ..

তাড়া খাইয়া ভৃত্য থলিতে চাল ভরিয়া লইয়া আসিল ; আসিয়া কহিল—কোথায় নিয়ে যাবো ?

শিবনাথ কহিল—তোকে নিয়ে যেতে হবে না। আমিই নিয়ে যাচ্ছি।

—আপনি! ভৃত্যের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। বিস্ময়ে তার দুই চোখ ঠেলিয়া বাহির হইবার জো!

শিবনাথ কহিল—হ্যাঁ, আমিই নিয়ে যাব। তুই নিজের কাজ কর্ গে। দোতলার বারান্দায় মিস্ত্রীরা-আজ বিলিতি মাটী দিয়েচে তো ?

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

বেচু কহিল—হ্যাঁ।

শিবনাথ চালের থলি লইল। বেশ ভারী! তা হউক! বেচুকে বলিল—ছাখ্, আজ রাত্রে আমি বাড়ীতে খাবো না। নেমন্তন্ন আছে, বুঝলি!

কথাটা বলিয়া ভৃত্যের পানে না চাহিয়া চাউলের থলি বহিয়া সে আবার পথে বাহির হইল।

চাউলের থলি রোয়াকের উপর রাখিয়া সে ডাকিল—মা-ঠাকরুণ...

গৃহিণী বাহিরে আসিলেন, কহিলেন—এত চাল ..!

শিবনাথ কহিল—কোথায় বা রাখি? তাই যা ছিল, সব নিয়ে এলুম।

তারপর? এ চালে নিজেদেরও আপাতত চলিবে। দাম নয় দিব, কিন্তু সে কথা কি করিয়া তোলা যায়? কর্ত্তা বসিয়াছেন, নাই বলিলে! শেষে টাকা পাইলে যত চাল লওয়া হইবে, কিনিয়া পুরাইয়া দিলেই চলিবে! কিন্তু না বলিয়া চাল লওয়া—এ তো চুরি! তা'ও যা-তা চুরি নয়, চাল চুরি! চাল লক্ষ্মী!...গৃহিণী শিহরিয়া উঠিলেন।

শিবনাথ কহিল—ছটো চালে ছ'বার নাই বা রাঁধলেন, মা। এই চালেই সকলের হয় যদি...চাল খুব খারাপ হবে না, বোধ হয়!

আঃ! গৃহিণী নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন; কহিলেন—বেশ বাবা, তাই করবো। শিবনাথও বুঝিয়াছিল। সহসা এমন বুদ্ধি জোগাইয়াছে দেখিয়া নিজের উপর সে ভারী খুসী হইয়া গেল।

সন্ধ্যার পর পা-হাত ধুইয়া শিবনাথ রোয়াকের এক ধারে আসিয়া বসিল। কর্ত্তা মাছর পাতিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন,—এই দরিদ্র মজুরের মহত্বে তিনি বিচলিত হইয়াছিলেন। তার মহত্ব? না, এ ভগবানের দয়া? যিনি মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, তার অন্ন তিনিই সংগ্রহ করিয়া দেন! নহিলে মজুর তো অনেক গৃহে খাটে, ঘটনাচক্র তা বলিয়া কি এমন কখনো দাঁড়ায়!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বজ্র ও বিদ্যুৎ

তার পরের দিন শিবনাথ আসিলে গৃহিণী বলিলেন—এ দিকটা হয়ে গেছে। এবারে বাবা বাড়ীর মধ্যে উঠোনটা আজ সাফ করে দে। বড্ড দরকার। কি হয়ে যে আছে... সাপে কেন কামড়ায় না, তাই ভাবি।

শিবনাথ কোদাল হাতে ভিতরের উঠানে গিয়া দাঁড়াইল। উঠানের এক ধারে ছোট একটা ঘর, ছাদ পড়িয়া গিয়াছে। সেই জীর্ণ ঘরের পাশে দরজা। টঁ্যাপা একখানা কড়া মাজিয়া সেই দ্বার দিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। ওদিকে বুঝি একটা ছোট ডোবা আছে? তাই। শিবনাথ টঁ্যাপার পানে চাহিল। টঁ্যাপার করুণ মুখ আজ যেন আরো করুণ দেখাইতেছে! কেন?

আধ ঘণ্টা। টঁ্যাপা কড়া রাখিয়া আসিয়া ধীরে ধীরে সেই ঘরে প্রবেশ করিল। শিবনাথ ভাবিল, ও-ঘরে গোরু আছে? না। সে ঐ ঘরের দিকে চাহিয়া রহিল, কোদালটা পায়ের নীচে পড়িয়া। পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট—টঁ্যাপা তবু বাহির হয় না! কি করিতেছে? শিবনাথের পা ছইটা চঞ্চল হইয়া উঠিল। গিয়া দেখিবে? না। গৃহের দিকে চাহিল,...কোথাও কাহারো সাড়া নাই! বাড়ীটায় কেমন যেন নিঝুম ভাব!

সহসা...ও কি!...ফুঁপাইয়া কে যেন কাঁদিতেছে! কোথায়? শিবনাথ চারিদিকে চাহিল। ঠিক, ঐ ঘরে। ...টঁ্যাপা? কিন্তু কেন কাঁদে?

শিবনাথ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। সে ভুলিয়া গেল, সে খাওড়, এখানে মজুরী করিতে আসিয়াছে! টঁ্যাপার ম্লান অসহায় চোখ ছুটির কথা শুধু মনে জাগিতেছিল। কাল সে বুঝিয়াছে, কি দারিদ্র্যের মধ্যে এঁরা বাস করিতেছেন! সে একা—অভাব সে জানে না। অভাব কি! তার যা আছে, তাহাতে বিশজনের অভাব সে অনায়াসে ঘুচাইতে পারে! বেচারী টঁ্যাপা! বেচারী গৃহিণী! কর্ত্তা এ দারিদ্র্যের সঙ্গে অহরহ যুদ্ধ করিতেছেন! মনে সর্ব্বক্ষণ দারুণ অস্বস্তি! আর সঙ্গে সঙ্গে এ ছ'জন নারীও...

শিবনাথ দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দ্বারের একখানা কপাট নাই, বাকীখানা জীর্ণ দেহে কোনমতে ঝুলিয়া আছে! ঘরের মধ্যে মাটী আর ভাঙ্গা ইটের বোঝাই স্তূপ! সেই স্তূপের উপর একধারে বসিয়া কাপড়ে মুখ ঢাকিয়া টঁ্যাপা ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে! জীর্ণ শাড়ীর ফাঁক দিয়া বিকসিত অঙ্গের লাবণ্যটুকু…যেন খানিকটা ম্লান জ্যোৎস্না! শিবনাথ ডাকিল—শুনচো?

কোন উত্তর নাই। শিবনাথ একেবারে আরো কাছে ঘেঁসিয়া আসিল। নাম ধরিয়া ডাকিবে? ক্ষতি কি! একটু সম্ভ্রম মিশাইয়া সে ডাকিল—টেঁপু…

টঁ্যাপা চমকিয়া চাহিয়া দেখিল। ধাঙড়টা?…তার এমন স্পর্দ্ধা, এখানে তার সামনে আসিয়া দাঁড়ায়!—শুধু দাঁড়ানো নয়, দাঁড়াইয়া নাম ধরিয়া ডাকে! সে রাগে জ্বলিয়া উঠিল, কহিল—তুই এখানে?

শিবনাথ সে স্বরে চমকিয়া উঠিল। নিমেষে সে বুঝিল, ঠিক কথা! সে তো ফিজিক্সের প্রোফেসর নয়—ধাঙড়! তবু সঙ্কোচে মৃদু-স্বরে কহিল—কান্নার শব্দ পেলুম কি না!

টঁ্যাপা রাগিয়া কহিল—আমি কাঁদি কি যা করি, তোর কি? চলে যা…

শিবনাথ কহিল—চলে যাচ্ছি। কিন্তু তা‥ তা…কেন কাঁদচো তুমি?

বাধা দিয়া টঁ্যাপা কহিল—এত বড় আস্পর্দ্ধা তোর! তবু দাঁড়িয়ে রইলি? যা চলে, নয়তো মাকে এখনি ডাকবো আমি!

শিবনাথ কহিল—আমি সামান্য মজুর, তা আমি জানি… তবু একজনকে কাঁদতে দেখলে…

টঁ্যাপা ঝঙ্কার দিয়া কহিল—আমি কাঁদিনি। কে বললে, আমি কাঁদচি?

শিবনাথ কহিল,—তোমার চোখ!…তা'ছাড়া কান্নার শব্দ পেলুম কি না!

টঁ্যাপা কহিল—যদিই কাঁদি, তোর কি? টঁ্যাপা শিবনাথের পানে চাহিল। কি কুণ্ঠিত বিশুষ্ক মুখ শিবনাথের। টঁ্যাপার চট্ করিয়া মনে পড়িল, হোক ধাঙড়, আগের দিন দয়া করিয়া এই ধাঙড়ই চাউল আনিয়া দিয়া তাদের মান বাঁচাইয়াছে, প্রাণ বাঁচাইয়াছে! সে চুপ করিল, আর কোনো কথা কহিল না।

শিবনাথ কহিল—আমার একটা অপরাধ হয়েছে… আমায় তোমরা মাপ করো, ‥মানে, আমি সত্যি-সত্যি মজুর নই!

টঁ্যাপা যেন আকাশ হইতে পড়িল! অতি বিস্ময়ে তার অশ্রু কোথায় উবিয়া গেল! সে শিবনাথের পানে ফিরিয়া চাহিল।

শিবনাথ কহিল—আমার নাম শিবনাথ মিত্র। প্রেসিডেন্সি কলেজের নাম শুনেচো? কলকাতার সব-চেয়ে বড় কলেজ…প্রেসিডেন্সি কলেজ…?

টঁ্যাপার বিস্ময় আরো বাড়িল। সে কহিল—নাম শুনেচি।

শিবনাথ হাসিল; হাসিয়া কহিল—সেই কলেজের আমি প্রোফেসর।

প্রোফেসর কথার অর্থ কি, টঁ্যাপা জানে। শিবনাথের কথায় সমস্ত পৃথিবীখানা চকিতে যেন তার পায়ের তলা হইতে সরিয়া গেল! সে যেন শূন্যে ঝুলিতেছে!

শিবনাথ কহিল—নিজের বাড়ীর সামনে এমনি নিজে সখ করে কোদাল নিয়ে বাগানের জঙ্গল সাফ করছিলুম। তোমার মা মজুর মনে করে যখন এ বাড়ীর জঙ্গল সাফ করতে ডাকলেন, তখন শুধু মজার লোভেই এসেছিলুম। কিন্তু এসে তোমার বাবাকে-মাকে এমন ভালো লাগলো‥ আর…

টঁ্যাপা শিবনাথের পানে চাহিয়া ছিল; শিবনাথ হাসিয়া কহিল—আর তোমার ঐ অক্লান্ত পরিশ্রম, ম্লান চোখ…

টঁ্যাপা মুখ নত করিল। কোথা হইতে রাজ্যের লজ্জা আসিয়া তাকে ঘিরিয়া ধরিল! সে চলিয়া যাইতেছিল। বাধা দিয়া শিবনাথ কহিল—যেয়ো। কিন্তু দয়া করে বল, কেন তুমি কাঁদছিলে? কোনো বিপদ? বল। যদি আমি কোনো উপায় করতে পারি…?

টঁ্যাপা কি বলিবে? সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

কুমার-সম্ভবের কবি লিখিয়া গিয়াছেন, ন যযৌ, ন তস্থৌ। তার ভাবখানা ঠিক তেমনি!

শিবনাথ কহিল—তোমার বাবার পরিচয় জানবার জন্য এমন ইচ্ছা জেগে আছে! বসে বসে কি উনি লেখেন···কিন্তু মজুরী করতে এসেচি, তাই কাকেও জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয়নি।

ট্যাঁপা একটা নিশ্বাস ফেলিল। পিতার প্রসঙ্গে কঠিন পৃথিবীখানা আবার তার পায়ে ঠেকিল। সে কহিল—আমার বাবার নাম শ্রীযুক্ত জয়গোপাল দত্ত। বাবার নাম শোনোনি··· ?

কথাটা বলিয়াই সে জিভ কাটিল। তুমি বলিয়া কথা কহিতেছে! ইনি তো মজুর নন্—বড় লোক, কলেজের প্রোফেসর। সে মুখ নীচু করিল, পরক্ষণে কহিল—বাবার নাম শোনেন-নি? বাবার লেখা বাঙলা বই আছে, অনেক।

শিবনাথ কহিল—উনি অথর? ও!···তা কি বই আছে? অর্থাৎ আমি বাঙলা বই বড় একটা পড়িনি, পড়বার অবসর পাইনি কখনো।

ট্যাঁপা কহিল,—নারী-রাক্ষসী, নরণে খুন, জাল জহর-লাল, শান্তলালের শয়তানী···

শিবনাথ কহিল—নাম শুনে·· অর্থাৎ ডিটেক্‌টিভ নভেল বুঝি?

ট্যাঁপা কহিল—হ্যাঁ। বই লিখেই বাবা সংসার চালান। আহিরীটোলার জনার্দ্দন বসাক বাবার বই নেয়, নিয়ে টাকা দেয়, আর সেই বই সে ছেপে বিক্রী করে।

শিবনাথ কহিল—তাতে তো অনেক টাকা হয়। শুনেচি, পাব্লিশাররা লেখকদের অনেক টাকা দেয়।

ট্যাঁপা কহিল—না। বই-পিছু একশো টাকা। তা মানুষ কত লিখবে! তা'ছাড়া দেনা আছে। আমার দিদির বিয়ে দিতে আমাদের বাড়ী বাঁধা পড়ে। সে ধার শোধ তো হচ্ছে না। তার সুদ দিতেই মাসে ষাট-সত্তর টাকা বেরিয়ে যায়। তা সেই ধার বেড়ে চলেছে। তারা শাসাচ্ছে, বাড়ী বেচে নেবে। বাড়ী গেলেও তাদের পুরো টাকা আদায় হবে না।

শিবনাথ কহিল—সবশুদ্ধ কত টাকা ধার?

ট্যাঁপা কহিল—প্রায় চার-পাঁচ হাজার। বাবা বলেচেন, বাড়ী তো রাখা যাবেই না—আর তারা যে-রকম লোক, বাকী টাকাও যেমন করে পারে আদায় করে নেবে!

শিবনাথ কহিল—তোমার ভগ্নীপতি এ-সব জেনেও চুপ করে আছেন?

ট্যাঁপা একটা নিশ্বাস ফেলিল, কহিল—দিদি তো নেই।···বিয়ের এক-বছর পরে মারা গেছে!

বাহিরে সহসা কড়কড় শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিল। বিদ্যুতের লেলিহান শিখা ভাঙ্গা ঘরের ফাটলে ফাটলে দৈত্যের রক্ত জিহ্বার মতই লক্‌লক্ করিয়া ছুটিয়া গেল! দু'জনে শিহরিয়া উঠিল। শিবনাথ স্তম্ভিত, নির্ব্বাক! সারা পৃথিবীখানা যেন তার চোখের সাম্‌নে আগুনের গোলায় রূপান্তরিত হইয়া ঘুরিতে লাগিল! হায় রে, যার জন্য এ ঋণ, এই দারিদ্র্য, সে······

সহসা বাতাস বহিল। সারা পৃথিবী যেন এ দারুণ হিংসা দেখিয়া শিহরিয়া নিশ্বাস ফেলিল! শিবনাথ কহিল—তোমরা কায়স্থ?

ট্যাঁপা কহিল—হ্যাঁ।

তারপর দু'জনেই নীরব। ট্যাঁপা ভাবিতেছিল, এই দরদী লোককে না বুঝিয়া কি ভৎর্সনাই সে করিয়াছে! আর শিবনাথ···? আগুনের গোলাটা যে কখন্ হঠাৎ চোখের সাম্‌নে নিবিয়া গিয়া···আলো, আলো, রঙীন আলোর চারিধার ভরপুর! আর সেই রঙীন আলোর ঝাড়ের মাঝখানে ট্যাঁপা···

শিবনাথ কহিল—বুঝেচি। বেশ, তোমার বাবাকে বলো, তোমার বিয়ের জন্য তিনি যেন কোন ভাবনা না ভাবেন! সে ভাবনা আমার রইলো।

এ কথায় ট্যাঁপার চোখে হু-হু করিয়া জল ঝরিল। শ্রাবণের মেঘেও বুঝি এত জল ধরে না! কাপড়ে মুখ লুকাইয়া সে সেই ভাঙ্গা ইটগুলার উপর ধনুকের মত বাঁকিয়া বসিয়া পড়িল; বসিয়া···

তার মাথায় হাত রাখিয়া শিবনাথ সস্নেহে কহিল—কেঁদো না টেঁপু। আমি সত্যি করচি···

প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া টঁ্যাপা কহিল—তা হয় না, হয় না, হবে না তা…

শিবনাথ বিস্মিত হইল। হয় না? কি? কি হয় না? কেন হয় না? কেন?

শিবনাথের মনে হইল, তার পায়ের তলায় পৃথিবীখানা ঠিক আছে তো! সরিয়া যায় নাই? তবে তার পা এমন দোলে কেন? মাধ্যাকর্ষণের আইন-কানুন সব উল্টাইয়া গেল নাকি!

শিবনাথ কহিল—কেন হয় না টেঁপু?

অতি-কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিয়া টঁ্যাপা কহিল—বাড়ী যার কাছে বাঁধা আছে, হাটখোলার বিরিঞ্চি বোস… টঁ্যাপা আর বলিতে পারিল না, কাপড়ে মুখ লুকাইল।

শিবনাথ কহিল—কি করেচে বিরিঞ্চি বোস?

টঁ্যাপা কহিল—বাবাকে বলেচে…আবার তার কথা বাধিয়া গেল!

ব্যাপার কি? শিবনাথ কহিল—বল, কি বলেচে তোমার বাবাকে…বল টেঁপু। যে কথাই সে বলুক, আমি তারো কিনারা করবো। যদি তা আমার অসাধ্য না হয়! কি সে কথা…?

টঁ্যাপা কহিল—তার স্ত্রী মরে গেছে, …

শিবনাথের সারা অঙ্গে কে যেন কাঁটার চাবুক মারিল! সে কহিল—বুঝেচি, তোমায় সে বিয়ে করতে চায়…না?

টঁ্যাপা কোন জবাব দিল না। শিবনাথ কহিল—তোমার পায়ের তলায় দাঁড়াবার যোগ্যতা যার নেই, একটা সুদখোর ছুঁচো…আমি বেঁচে থাকতে তা হবে না, টেঁপু। এ স্থির জেনো। পাঁচ হাজার টাকা আমার ব্যাঙ্কে আছে। পাঁচ হাজার কেন, দরকার হয়তো সেই ছুঁচো বেটার হাত থেকে তোমায় উদ্ধার করতে দশ হাজারও অনায়াসে আমি…

এত করুণা, এমন মমতা! চোখের জল তার পাশে টিঁকিতে পারে না! টঁ্যাপা কহিল—বাবাকে এক খুব কড়া চিঠি লিখেচে…মামলা করে ডিক্রী পেয়েচে। সে ডিক্রী জারি করে বাকী টাকার জন্যে জেলের ওয়ারেণ্টও বার করবে। বাবা বিয়েয় না রাজী হলে, দু'একদিনের মধ্যেই…বাবা তাকে তাই হাতে পায়ে ধরে আনবার জন্য গেছেন!

শিবনাথের মনের মধ্যে পিশাচের ফৌজ অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। এই তো চাই! বাঃ, খাসা হইয়াছে! শিবনাথ কহিল—সে ব্যাটা আজ এখানে আসচে?

টঁ্যাপা কহিল—হঁ্যা। পাকা কথা কইতে…

বটে! রাজ্যের ক্রোধ আর হিংসা শিবনাথের মনের মধ্যে হাজার ফণা ধরিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল! সে কহিল—আচ্ছা। তাই হবে। কথা পাকা করেই সে ফিরবে। ব্যাটা শাইলক! সুদখোর চামুণ্ডী! এখানে তার যমও এই রইলো!

শিবনাথের কণ্ঠের স্বরে ভড়কাইয়া টঁ্যাপা তার পানে চাহিল। ডাগর চোখের সেই অসহায় দৃষ্টির মাঝখানে…ও কিসের আলো! শিবনাথ নিমেষের জন্য যেন পাগল হইল। ঝাঁপ দিয়া সে টঁ্যাপাকে বুকের মধ্যে টানিয়া আবেগ-কম্পিত স্বরে কহিল—তুমি আমার, আমার, আমার, টেঁপু,…এই বুকে তোমায় আশ্রয় দেবো, অবশ্য যদি তোমার আপত্তি না থাকে!

টঁ্যাপাও বড় অসহায়তার মাঝখানে যেন একটু আশ্রয় পাইয়া সব ভুলিয়া গিয়াছিল! সে মুহূর্ত্তের বিহ্বলতা! তখনি তার চেতনা ফিরিল। চেতনা ফিরিবামাত্র টঁ্যাপা শিবনাথের কাছ হইতে নিজেকে ছিনাইয়া লইল। শিবনাথও শিহরিয়া সরিয়া আসিল, এবং দীন ক্ষমাপ্রার্থীর ভঙ্গীতে কহিল, —আমায় মাপ করো টেঁপু…আমি পাগল হয়েছিলুম…

টঁ্যাপা নির্ব্বাক! যেন কাঠের পুতুল! শিবনাথ কহিল—যাক, আমার পরিচয়ের কথা কাকেও এখন বলো না, তোমার মাকেও না…

ঝম্ ঝম্ ঝম্! বাঁধন-হারা এ কি বৃষ্টি-ধারা! আকাশ তার সঞ্চিত স্তম্ভিত জল-ভার যেন আর ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না! এত জল! হিংসার তাপে সারা দুনিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বুকগুলাও যে সে তাপে জলিয়া যায়! আঃ! এ বৃষ্টিধারায় তপ্ত ধরণী শীতল হোক, স্নিগ্ধ হোক!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পাপক্ষয়

প্রচণ্ড বৃষ্টি। এ বৃষ্টিতে কাজ করা চলে না! কর্ত্তার ঘরের দ্বারপ্রান্তে আসিয়া তাই শিবনাথ চুপ করিয়া বসিয়াছিল। বুঝি সে ভাবিতেছিল, ও বৃষ্টি নয়,... আকাশের অশ্রু! ট্যাপার চোখের জলে আজ আকাশের মন গলিয়াছে, তাই এ দুনিয়ার প্রাণ-গলানো, বুক-ভাসানো বৃষ্টি-ধারা! সে আরও ভাবিতেছিল, কত তুচ্ছ কারণের পিছনে কত বড় কাজ এ পৃথিবীতে ঘটিতে পারে! গাছের একটা ফল কবে কোন্ এক ক্ষণে মাটিতে পড়িয়াছিল,...এমন তো নিত্য পড়ে! কিন্তু নিউটন সেই ফল পড়া দেখিল, অমনি তার ফলে দুনিয়া পাইল কত বড় বৈজ্ঞানিক সত্য! কবে কোথায় একটি ছেলে ঘুড়ি উড়াইতেছিল;—ঘুড়ি তো ছেলেরা নিত্য উড়ায়,—কিন্তু একদিনের সেই ঘুড়ি ওড়ানোর ফলে মানুষ বিদ্যুৎকে চিরদিনের জন্য দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধিয়াছে! তেমনি দু'দিন পূর্ব্বে কোদাল লইয়া খেয়ালের বশে সে জঙ্গল সাফ করিতেছিল, এ-বাড়ীর গৃহিণী গিয়াছিলেন গঙ্গাস্নানে, কি বলিয়া তাকে তাঁর মজুর বলিয়া মনে হইল! এবং যেমন মনে হওয়া অমনি তাকে ডাকিয়া কাজের ভার দেওয়া! শিবনাথ অনায়াসে বলিতে পারিত, সে মজুর নয়, ফিজিক্সের প্রোফেসর—তা না বলিয়া সে চুপ করিয়া গেল! তার ফলে আজ সে এই দরিদ্র পরিবারের কতখানি কাজে লাগিতে পারিবে!

গৃহিণী আসিয়া বলিলেন—দরজাটা ভেজিয়ে বসো বাবা, গায়ে জল না লাগে!

শিবনাথ কহিল—না মা, জল লাগবে না।

গৃহিণী চলিয়া যাইতেছিলেন, শিবনাথ কহিল—এই বৃষ্টিতে কর্ত্তাবাবু কোথায় বেরুলেন মা?

গৃহিণী কহিলেন—তিনি কলকাতায় গেছেন বাবা,—কাজ আছে!

গৃহিণী চলিয়া গেলেন। তাঁর স্বর ভার-ভার। শিবনাথের তাহা লক্ষ্য এড়াইল না।......

বৃষ্টির বেগ ক্রমে কমিয়া আসিল। শিবনাথ ভাবিল, এমন চুপচাপ তো আর বসিয়া থাকা যায় না! ঘরের দেওয়ালের গায়ে সেল্ফ। সেল্ফের উপর এক-রাশ বই। ভাবিল, টানিয়া পড়িবে কি! কিন্তু না, সে মজুর, এখনো মজুর,... এরি মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া কাজ কি! যখন সময় আসিবে...আজ, না হয়, কাল!

একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ী আসিয়া বাড়ার সামনে থামিল। শিবনাথ খাড়া দাঁড়াইয়া উঠিল। বাড়ীর দ্বার খোলা হইল। শিবনাথ লণ্ঠনটা তুলিয়া ধরিল। গৃহে প্রবেশ করিলেন কর্ত্তা জয়গোপাল দত্ত, তাঁর সঙ্গে আর একটি লোক। বেঁটে, কালো, ত্রিবক্রের মত আকৃতি! এ-ই তাহা হইলে সেই বিরিঞ্চি বোস! মর্কটই বটে—শুধু আচারে নয়, আকারেও!

জয়গোপাল দত্ত কহিলেন—আলোটা আর একটু তুলে ধর তো বাবা শিবু...

শিবনাথ আলো তুলিয়া ধরিল। সামনেকার জঙ্গল সাফ হইলে কি হইবে, নিকাশের পথ নাই, কাজেই জল জমিয়া ক্ষুদ্র পুকুরের সৃষ্টি করিয়াছে। জুতা খুলিয়া সেই জলের উপর দিয়া ছপ্‌ছপ্ করিতে করিতে দুইজনে আসিয়া ঘরে উঠিলেন। শিবু ঘরের কোণে কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল। মজুর, মজুরের মতই চুপচাপ্!

দু'জনে নানা কথা চলিল—টাকার সম্বন্ধে, ডিক্রীর সম্বন্ধে,...জয়গোপালের কত অনুনয়, কি বিনীত কাতর অনুরোধ, আর বিরিঞ্চির সদর্প ভঙ্গীতে অভিযোগ আর আস্ফালন! তার বাঁকা মন কিছুতেই আর সিধা হইতে চায় না! অবশেষে জয়গোপাল উঠিলেন, উঠিয়া ভিতরে গেলেন।

শিবনাথের বুঝিতে বাকী রহিল না,—আসরে এইবার ট্যাপাকে আনা হইবে। তার অসহ্য বোধ হইল! সে উঠিল; উঠিয়া একেবারে তীক্ষ্ণ স্বরেই কহিল—তুমি মহাজন?

ঘরের মধ্যে দুম্ করিয়া যদি একটা পিস্তলের আওয়াজ হইত, তাহা হইলেও বুঝি হাটখোলার বিরিঞ্চি বোস ততখানি চমকিয়া উঠিত না! সে হাঁ করিয়া শিবনাথের

পানে তাকাইল—একটা ছোটলোক কুলি, না, ভৃত্য… তার এমন স্পর্দ্ধা!

কিন্তু তার চমক ভাঙ্গিবার পূর্ব্বেই শিবনাথ কহিল—টাকা পাবে তো তুমি?

শিবনাথের ভঙ্গী দেখিয়া বিরিঞ্চি অবাক! সে একটু ভড়কাইয়া গেল; কহিল—হ্যাঁ…

শিবনাথ কহিল—আর সে টাকা তুমি পাবে কর্ত্তা জয়গোপাল দত্তর কাছ থেকে? জয়গোপাল দত্ত তোমার খাতক…?

বিরিঞ্চি আরো অবাক! অবাক হইয়াই কহিল—হ্যাঁ।

শিবনাথ ভ্রূকুটি করিয়া কহিল—জয়গোপাল দত্তর ঐ এক ফোঁটা মেয়ে তোমার খাতক নয়…?

বিরিঞ্চি এবারো তেমনি যন্ত্র-চালিতের মত কহিল,—না।

শিবনাথ কহিল—তবে তাকে এখানে আনা হচ্ছে কেন?

শিবনাথের মুখের ভাব এমন ছিল না, যা দেখিলে মানুষের প্রাণ শীতল বা সুস্থির হয়! তবু হাটখোলার মহাজন বিরিঞ্চি বোস…ভয় পাইলেও বুঝিতে সে কাতর নয়! সে কহিল,—এই কন্যাটিকে আমি বিবাহ করবো কি না…

শিবনাথ হাসিয়া উঠিল। পাগলের অট্টহাসি! শিবনাথ কহিল—তুমি বিয়ে করবে ঐ একফোঁটা মেয়েকে..? বুড়ো ষাঁড়…একটা বৃষকাঠ…

শিবনাথ আগাইয়া আসিল। শিবনাথের ভঙ্গী দেখিয়া বিরিঞ্চি বোস্ দাঁড়াইয়া উঠিল। শিবনাথ কহিল—সরে পড়ো। বিয়ে করা হচ্ছে না। ডিক্রী পেয়েচো, ডিক্রী জারি করো। জয়গোপাল দত্ত টাকা ধার করেচে; তাঁর সঙ্গে তার বোঝাপড়া করগে, তাঁর মেয়ের ত্রিসীমা মাড়িয়ো না—খবর্দার! আমি থাকতে এ বিয়ে হচ্ছে না, চাঁদ!…দোরে গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে, এই বেলা মানে মানে সরে পড়ো ..

এক কথায় হঠিবে, বিরিঞ্চি সে মানুষই নয়! তবু তার ভয় হইতেছিল, ছোকরা পাগল, না, কি? যদি মারে? বিরিঞ্চি ডাকিল—ওগো জয়গোপাল বাবু…

কি ভীত আর্ত্ত আহ্বান! সে আহ্বানে জয়গোপাল বাবু ছুটিয়া আসিলেন—আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁর চক্ষুস্থির! শিবু মজুর বিরিঞ্চি বোসের একখানি হাত বাগাইয়া ধরিয়াছে!

ভয়ে জয়গোপাল দত্তর চোখ দুইটা যেন ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিল! কম্পিত ভগ্নস্বরে তিনি কহিলেন—এ কি!

শিবনাথ কহিল—ওঁর ডিক্রী জারি করতে পেয়াদা নিয়ে উনি আসবেন—আর তার বোঝাপড়া হবে আপনার সঙ্গে! আপনার মেয়ের সঙ্গে ওঁর কিসের সম্পর্ক মশায় যে তাকে এখানে এনে…

জয়গোপালের বুকটা ভয়ে ধড়াশ করিয়া নামিয়া গেল। কত সাধিয়া, হাতে পায়ে ধরিয়া কন্যাদানের অঙ্গীকারে বশীভূত করিয়া অত বড় মহাজনকে যদি-বা কৃপাপরবশ করিয়া তুলিয়াছেন, এক ক্ষ্যাপা মজুরের অতিরিক্ত স্পর্দ্ধায় শেষে……

তিনি কহিলেন—ছি বাবা শিবু, ভদ্রলোকের হাত ধরে কি অমন করে…?

শিবনাথ কহিল—ভদ্রলোকের হাত ধরে না, তা জানি। কিন্তু এ কি ভদ্রলোক?

বিড়ম্বনা! ভগবান কপালে কি যে লিখিয়াছেন…! এ ব্যাপারের পর…নাঃ। জয়গোপাল দত্ত বিমূঢ়ের মত হইলেন। তাঁর চিন্তা করিবার বা কথা কহিবার শক্তি বিলুপ্ত হইয়া গেল!

বিরিঞ্চির হাত ধরিয়া টানিয়া শিবনাথ কহিল—কেউ তোমায় রক্ষা করতে পারবে না!…ছুঁচো কোথাকার! তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেচে, তবু এসেচ বিয়ে করতে! তাও, বাপের গলায় পা দিয়ে তার মেয়েকে বিয়ে করবে! অসীম দয়া!…বেরো, বেরো, বলচি……

একটি হ্যাঁচকা-টান্। সে টানে বিরিঞ্চি বোস ঘর ছাড়িয়া একেবারে রোয়াকের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িলেন! সেখান হইতে আর একটি ধাক্কা দিলে…পড়িয়া পা'খানাই ভাঙ্গে বুঝি! শিবনাথ কিন্তু সে ধাক্কা দিল না; তার ঘাড় ধরিয়া নামাইয়া দিল, কহিল—বেরো, বেরো বলচি শীগ্‌গির! ব্যাটা মহাজন, আস্পর্দ্ধার সীমা নেই! কাবলীর অধম,

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

পিশাচ! ডিক্রী নিয়ে চোখ রাঙিয়ে বিয়ে করতে এসেচ! —বেহায়া, নির্লজ্জ কোথাকার!

বিরিঞ্চি বোস রাগে-অপমানে কাঁপিতেছিল; কাঁপিতে-কাঁপিতেই কহিল—তবে রে ছোটলোক, ভূত...বলিয়া শিবনাথের দিকে আগাইয়া গেল! কিন্তু ছোটলোক ভূতটা এমন হাত পাকাইয়া দাঁড়াইয়া আছে...বিরিঞ্চি বোস নিরুপায় হতাশ স্বরে ডাকিল—জয়গোপাল বাবু...

জয়গোপাল বাবু হতভম্ব! বিরিঞ্চি বোস্ কহিল—এ অপমান আমি ভুলবো না, এর কড়ায়-গণ্ডায় উসুল হবে! মনে থাকে যেন! আমার দোষ নেই...

শিবনাথ হুঙ্কার দিয়া নামিয়া আসিল—তবু দাঁড়িয়ে রইলি! ছোটলোক, মর্কট, অষ্টাবক্র ব্যাটা...

ঠাস করিয়া বিরিঞ্চির গালে শিবনাথ এক চড় কষাইয়া দিল।

বিরিঞ্চির মাথা বোঁ করিয়া ঘুরিয়া গেল। তবু সে হাটখোলার মহাজন, তেজারতী তার পেশা! এ চড়ে সে নির্ব্বাক্ হইল না! সগর্জ্জনে বিরিঞ্চি কহিল—আবার মার! আচ্ছা, আদালত আছে, দেখে নেবো। তোর মনিবকে শুদ্ধু এর ফলভোগ করতে হবে।

শিবনাথ কহিল—যা, যা, আদালতে যা। আমিও রাজী। সেখানে গিয়ে আমি বলবো, হাঁ, এ উল্লুককে মেরেচি—মার স্বীকার করে দশ টাকা জরিমানা ফেলে দিয়ে আসবো...তাতে আমার গৌরব বাড়বে,—ভাববো, সে জরিমানা দিলাম না, তোর কানমলে দিলাম...

এ কথার পর আর টিঁকিয়া থাকা যায় না! যে গোঁয়ার, পাষণ্ড...! বিরিঞ্চি দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিল, দ্বারের কাছে গিয়া কহিল—জয়গোপাল বাবু, বাড়ীতে ডেকে এনে অপমান করলে! ডালকুত্তো লেলিয়ে দিলে! আচ্ছা, কাল পেয়াদাকে কি করে ঠেকাও, দেখে নেবো।

শিবনাথ কহিল—চোখ যদি কাল থাকে, তাহলে দেখে নিস্!

বিরিঞ্চি বাড়ীর বাহির হইয়া গেল; নিমেষ-পরে আবার ঢুকিল; কহিল—আমার ছাতাটা...

শিবনাথ কোণে দাঁড়-করানো ছাতাটা লইয়া ছুড়িয়া দ্বারপ্রান্তে নিক্ষেপ করিল।

বিরিঞ্চি বোস্ ছাতা কুড়াইয়া গিয়া গাড়ীতে উঠিল। গাড়ী চলিয়া গেল!

অত ঝড়...মুহূর্ত্তে সব শান্ত! ঘরে ঢুকিয়া শিবনাথ দেখে, এ যেন রূপকথার কোন্ প্রাণহীন ঘুমন্ত পুরী! এক-ধারে জয়গোপাল দত্ত কাঠ হইয়া বসিয়া আছেন, আর দ্বারের চৌকাঠে গৃহিণী নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া! ..বায়োস্কোপের ছবিতে ফিল্মের স্পুল আটকাইয়া গেলে ছবির যেমন নড়াচড়া একেবারে রহিত হয় তেমনি ভাব!

শিবনাথ কহিল—কি ভাবচেন বসে? কোনো ভাবনা নেই! যান, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করুন গে...

প্রথমে গৃহিণীর চেতনা ফিরিল। তিনি কহিলেন—কি করলি বাবা? কিছু না জেনে-শুনে পাগলের মত কি যে করলি...! এর ফলে কাল কি সর্ব্বনাশ হবে..গৃহিণী কাঁদিয়া ফেলিলেন।

শিবনাথ কহিল—বলচি তো মা-ঠাকরুণ, কোনো ভাবনা নেই! আপনার টেঁপুর বিয়ের জন্যে তো বলচেন...?

গৃহিণী কহিলেন—বিয়ের ভাবনা ভাবনাই নয়, বাবা...

শিবনাথ কহিল—বুঝেচি, মহাজন কাল ডিক্রী জারি করতে আসবে..

গৃহিণী কোন জবাব দিলেন না। পরের দিন বাড়ীর মধ্যে দানবের যে তাণ্ডব নৃত্য চলিবে, ভয়াতুর নেত্রে তিনি যেন তারি ছবি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন!

শিবনাথ কহিল—ওর ডিক্রীর টাকার জন্ম ভাববেন না...কত টাকার ডিক্রী? ..ও ছুঁচোর সাধ্যও হবে না আপনাদের কোনো বিপদে ফেলে!

গৃহিণী অবাক হইয়া শিবনাথের পানে চাহিলেন। এ পাগলা মজুরটা বলে কি!

শিবনাথ কহিল—শুনুন কর্ত্তা, আমার হাতে মেয়ে দেবেন...? আশ্চর্য্য হচ্ছেন! আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই!... শুনুন, আমি সত্যিই মজুর নই। ওই যে নতুন বাড়ী হচ্ছে, ও আমারি বাড়ী। আমার নাম শিবনাথ মিত্তির, প্রেসিডেন্সি

কলেজের ফিজিক্সের প্রোফেসর আমি···তা'ছাড়া ব্যাঙ্কে আমার নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা আছে, তার উপর কলকাতায় দু'খানা বাড়ী···

এ কি স্বপ্ন···কি এ!

আকাশে ইতিমধ্যে মেঘ কখন কাটিয়া গিয়াছিল। চাঁদ উঠিয়াছিল। জলে-ধোওয়া নির্ম্মল আকাশে ত্রয়োদশীর চাঁদ। তারি এক ঝলক জ্যোৎস্না আনন্দের হাসির মত খোলা জানলার ফাঁক দিয়া ঘরে ঢুকিয়া যেন নৃত্য করিতেছিল!

শিবনাথ কহিল—আমি মিছে কথা বল্‌চি নে, মা। খবর নেবেন আপনারা। কাল যদি ডিক্রী জারি করতে আসে ও ছুঁচো···তা, কত টাকা চাই? আমার কাছে এইখানেই নগদ হাজারখানেক আছে। বলেন, ভোরে গিয়ে আরো টাকা নিয়ে আসি···তিন হাজার···না, চার?···কত?

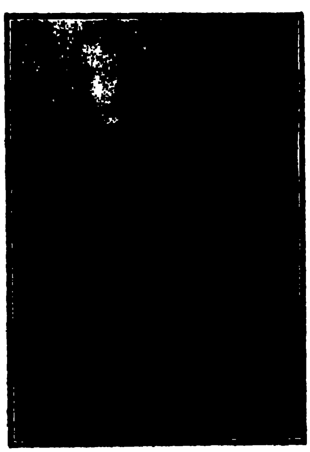
এ-সব টাকাকড়ির কথা গৃহিণীর কানেও গেল না। গৃহিণী ডাকিলেন—ট্যাঁপা···

দ্বারের পিছনেই ট্যাঁপা দাঁড়াইয়া ছিল। বিরিঞ্চির লাঞ্ছনায় সে একেবারে হাসিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছিল! মার আহ্বানে দ্রুত পলাইয়া যাইতেছিল, ছুটিতে গিয়া চাবির রিঙে সেই রাগিণীর ঝঙ্কার! মা তাকে ধরিয়া ফেলিলেন; ধরিয়া টানিয়া তাকে ঘরের মধ্যে আনিয়া কহিলেন—তোর ভাগ্য এমন হবে, এ কখনো ভাবিনি যে মা!···প্রণাম কর্‌···মজুর নয় রে, তোর ভগবান!

গৃহিণী আপনার মনেই বকিয়া চলিলেন,—সেদিন গঙ্গা নাইতে গিয়ে মার কাছে প্রাণের বড় কাতর কান্না কেঁদেছিলুম! মিনতি জানিয়েছিলুম যে, মা গঙ্গা, সুদিন দাও মা! আর কিছু চাই না, শুধু মেয়েটার পানে মুখ তুলে চাও···তা, মা মুখ তুলে সত্যিই চেয়েছেন! গঙ্গাস্নানের এমন ফল কে কবে পেয়েচে!···

গৃহিণীর দুই চোখে অশ্রু ঝরিতেছিল। আনন্দের অশ্রু! শিবনাথ কাঠ হইয়া তাই দেখিতেছিল! কর্ত্তা সহসা দাঁড়াইয়া উঠিয়া শিবনাথকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইলেন, আবেগ-বিহ্বল স্বরে কহিলেন,—বাবা···বাবা···

তাঁর মুখে আর কথা ফুটিল না! পায়ের নীচে সারা পৃথিবীখানা এমন দোলে দুলিতেছিল···পা টলিয়া উঠিল! শিবনাথের বুকে তাঁর মাথা লুটাইয়া পড়িল।





কাঁথা-শেলাই
শ্রীমতী কিরণবালা সেন অঙ্কিত
শান্তিনিকেতন

বাঙলার প্রাচীন চিত্র ও পট *

শ্রীরমেশ বসু

'পট' বল্‌তে বাঙ্‌লাদেশে প্রাচীন ধরণের রঙীন চিত্র ও রেখাঙ্কন দুই-ই বোঝায়। বহুকাল থেকেই এই সব ছবি চ'লে আস্‌ছে, সেজন্য এ-গুলি আমাদের জাতীয় জীবনের সঙ্গে বরাবর একসুরে বাঁধা এ-কথা বলা যেতে পারে। কিন্তু এখনকার লোকে এদের একেবারেই ভুলে বসেছে। দেশের প্রাচীন ভাবধারা থেকে এদের সৃষ্টি, তাই এগুলি আগে কেবল ধর্ম্মবিষয়ে নিবদ্ধ ছিল, তার পরে ক্রমশঃ লৌকিক শিল্পের মধ্যে গণ্য হ'য়ে পড়ে। অনেক শতাব্দী ধ'রে চ'লে এসেছিল ব'লে দেশের কাল্‌চারের উপর এই শিল্পের প্রভাব সুস্পষ্ট ছিল। অন্য যে-কোনো ধরণের লোক-শিল্পের সঙ্গে তুলনা করলে আমরা দেখ্‌তে পাই যে এ-গুলি তাদের কোনটির চেয়ে কোনো অংশে খাটো নয়।

অতি পুরাতন সংস্কৃত 'পট' শব্দটি বাংলা ভাষায় চলে গেছে। দুই অর্থে এর ব্যবহার হয়—প্রথম, সুদৃশ্য কাপড়, আর দ্বিতীয়, কাপড়ের উপরে অঙ্কিত চিত্র। সংস্কৃত সাহিত্যে শেষোক্ত অর্থেই শব্দটির বহুল ব্যবহার পাওয়া যায়। সম্ভবত এই অর্থই আদিম অর্থ; চিত্রিত বা রঞ্জিত কাপড় দেখ্‌তে সুন্দর হয় ব'লেই সুন্দর কাপড় অর্থে ও-শব্দটি ব্যবহার করা হ'ত।

'পটকার' শব্দটি 'পট' থেকে হয়েছে। 'পটকার' মানে অবশ্য চিত্রকর, কিন্তু যে 'পট' আঁকে বাঙ্‌লায় তাকে পটুয়া বলা হয়। হিন্দু হোক্, মুসলমান হোক্, চিত্রকর অর্থে 'পটুয়া' নামে একটা পৃথক শ্রেণী হ'য়ে গেছে। এখন পটুয়া বল্‌লে যে-সব কারিকর মৃৎপাত্রের গায়ে নানা রকমের চিত্র আঁকে তাদেরই বোঝায়।

চিত্রবিদ্যার মত এ বিদ্যাটিও এখন এ-দেশে লুপ্ত হয়ে এসেছে। এমন সময় ছিল যখন কোনো-কোনো পাড়ায় পটকারদের সংখ্যা এত বেশী থাকৃত যে, তাদের নাম থেকেই সেই সব পাড়ার নামকরণ হ'ত। ঢাকায় পটুয়াদের এক পাড়া ছিল, তার নাম এখনও পটুয়াটুলী রয়ে গিয়েছে। কল্‌কাতায় যদিও এখন পটুয়াদের কোনো চিহ্নই নেই, তবুও একটি রাস্তার নাম এদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পটুয়ারা দেব-দেবীর প্রতিমা ও চিত্র কর্‌ত এবং সাজাত, কিন্তু লোক-শিল্পী ব'লেই এদের নাম থেকে যাবে। পটুয়াদের সংশ্লিষ্ট আর এক শ্রেণীর লোক-শিল্পী সূত্রধর নামে পরিচিত। এরা নীচ শ্রেণীর হিন্দু, আগে কাঠের কাজ কর্‌ত, পরে পুরুষানুক্রমে প্রতিমা গ'ড়ে ও ছবি এঁকে আস্‌ছে। সমস্ত বাঙ্‌লা দেশেই এদের দেখ্‌তে পাওয়া যায়; তবে বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, বীরভূম জেলাতেই বোধ হয় এদের সংখ্যা সব চেয়ে বেশী। মুর্শিদাবাদ জেলায় এদেরি এক দল শুধু চিত্র এঁকে থাকে বলে 'চিত্রকর' নামে পরিচিত। অন্যান্য সূত্রধরদের সঙ্গে এদের বিবাহ চলে না। 'কুম্ভর' নামে আর একটি জাত আছে, যারা প্রতিমা গড়ে, রঙ্‌ দেয় আর সাজায়; এরা কিন্তু ছবি আঁকে না, এবং কোন কালে আঁকৃত ব'লে শোনাও যায় না।

এ পর্য্যন্ত এ-দেশে চিত্র-রচনার আঙ্গিকতা (technique) সম্বন্ধে যে-সব বই পাওয়া গেছে, তার মধ্যে সম্ভবত গুপ্তরাজাদের সময়ে লিখিত "বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরম্‌" সব চেয়ে প্রাচীন। এই বইয়ে কাপড়, দেয়াল, কাঠ, এমন কি লোহার উপরে ছবি আঁক্‌বার কথা পর্য্যন্ত আছে; কিন্তু কাগজ বা রেশম ব্যবহারের কোন কথাই নেই। সে যুগে কাগজের চলন ছিল না, তখন কাপড়ের উপরে যে-চিত্র আঁকা হ'ত তাকেই লোকে 'পট' বল্‌ত। এখন কিন্তু সাধারণ চল্‌তি ভাষায় কাপড়ে বা কাগজে আঁকা উভয় প্রকারের ছবিকেই নির্ব্বিচারে 'পট' বলে। এই রকম ব্যাপক অর্থেই শব্দটির ব্যবহার হয় বটে, কিন্তু আজকাল শুধু পুরাণো ধরণের লৌকিক চিত্র-শিল্প অর্থেই এর ব্যব-

---

* শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ কর্তৃক ইংরাজীতে লিখিত এই প্রবন্ধ লণ্ডনের India Society-তে ২০শে অক্টোবরে ১৯২৬ অব্দে E. B. Havell-সাহেব কর্তৃক পঠিত হয়। ঐ Society-র পত্রিকা "Indian Art and Letters" Vol. No 2-তে ইহা Old Bengal Paintings: Pat Drawings নামে প্রথম প্রকাশিত হয়।

হার নিবদ্ধ হয়ে আসছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই অনুসারে কথাটি ব্যবহার করা হবে।

সব চেয়ে পুরাণো যে-সব পট পাওয়া গিয়েছে সে-গুলি দেব-দেবীর ছবি। দেখা গিয়েছে মূর্ত্তির বদলে এই পট-গুলিকেই পূজা করা হ'ত। এখনও বাঙলার কোনো কোনো পল্লীগ্রামে এরূপ ব্যবহার আছে। সুতরাং ধর্ম্মের তাগিদেই পটের জন্ম হয়েছিল এ-কথা বলা যেতে পারে। যদিও দেব-দেবীর ছবি আঁকাই এই চিত্রকলার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, তবু লৌকিক বিষয়, এমন কি নরনারীর আকৃতি কাপড়ের উপরে আঁক্‌বার রীতিও যে ছিল না এমন নয়। সব চেয়ে প্রাচীন যে-সব পট এখনও পাওয়া যায়, সে-গুলি নিশ্চয়ই বহুকালের চিত্র-চর্চ্চার ফল ব'লে ধর্‌তে হবে। "বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরম্", "শিল্পরত্নম্" প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ ও ভিত্তিচিত্র (frescoe) রচনা সম্বন্ধে বেশ বিস্তৃত উপদেশ দেওয়া আছে। লোকপরম্পরায় এই সব শাস্ত্রীয় উপদেশ সাধারণের মধ্যে চ'লে এসেছে, ও পটুয়ারা পুরুষানুক্রমে এ-গুলি মেনে চলেছে। ভিত্তিচিত্রের বেলায় যেখানে ভূমি (Ground) রচনার বহু বিস্তৃত উপায় অবলম্বন কর্‌তে হ'ত, সেখানে কাপড়ের উপর ছবি আঁক্‌তে হ'লে অতি সহজেই 'জমি' তৈরি হয়ে যেত। বেশ সমান বুনট্ মিহি জমি দেখে কাপড় বেছে নিয়ে তার উপরে নরম বালুহীন মাটি দিয়ে পাত্‌লা ক'রে প্রলেপ দেওয়া হ'ত। মাটি খুব চূর্ণ ক'রে নিয়ে তার সঙ্গে গোবর মিশিয়ে, পরে জল দিয়ে মণ্ড বানিয়ে এই প্রলেপ তৈরি করার প্রথা ছিল। কাপড়ের উপরে এই প্রলেপ শুকিয়ে উঠ্‌লে তার উপর-ভাগটাকে



দশভুজা

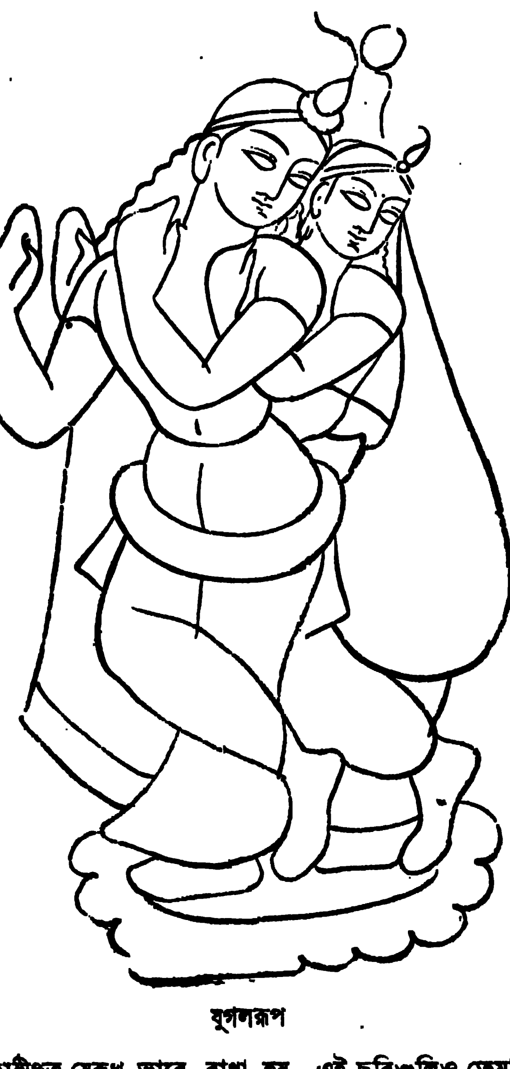
ঘ'সে ঘ'সে মসৃণ ক'রে তুল্‌লেই ছবি আঁক্‌বার উপযুক্ত 'জমি' হয়ে উঠ্‌ত। কাপড়ের উপর মণ্ড মাখিয়ে এই-রূপে যে ছবি আঁকা হ'ত তার খুব বেশী নমুনা এখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এ-গুলি প্রায়ই দুর্গা বা অপর দেব-দেবীর ছবি। দুর্গার এই ধরণের একখানা বেশ ভাল ছবি শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষের সংগ্রহে আছে। এই ছবিখানাকে পূজা করা হ'ত। এই ছবির আদ্‌রাটি লাল রঙে টানা, আর ছবিটিতে যে-সব রঙ্‌ ফলানো আছে সেগুলি খনিজ ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ থেকে তৈরি। এই সব রঙ্‌ শিল্পী নিজেই তৈরি কর্‌ত। এর বাহাদুরী এই যে রঙের গভীরতা ও উজ্জ্বলতা এখনও বেশ বজায় রয়েছে। পরাজিত শত্রুর উপরে বিজয়িনী দশভুজা দেবীর অলৌকিক মূর্ত্তিতে শিল্পী যে মহিমা ও লাবণ্য ফুটিয়ে তুল্‌তে সক্ষম হয়েছেন তাতে এই চিত্রটি খুব মনোজ্ঞ হয়েছে। এই ছবিটিতে সত্যই সজীবতার একটি ভঙ্গি ফুটে উঠেছে। বাঁ-দিকে খুব স্বাভাবিক ভাবে দেখানো হয়েছে যে, আক্রমণ কর্‌বামাত্রই মহিষের বিপুল মাথাটা এক প্রচণ্ড আঘাতে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে খানিকটা দূরে ছিট্‌কে পড়েছে, আর একটা শিয়াল সেটাকে নিয়ে ছেঁড়াছেঁড়ি আরম্ভ করেছে। মাঝ-খানের জায়গাতে একটা অদ্ভুত রকমের সিংহ পদানত অসুরকে আক্রমণ কর্‌ছে। অসুরের সুদীর্ঘ বর্শা তার হাতেই ভেঙ্গে রয়েছে, সে ভয়ে ও ক্ষোভে উপরের দিকে চেয়ে আছে, আর সকলের উপরে দণ্ডায়মানা দেবীর হাতের ত্রিশূলের ডগাটি তার বুকে এসে বিঁধেছে। নিতান্ত দুঃখের কথা এই যে, ছবিখানা বড় নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ছবিতে দেখ্‌তে পাই, দেবী একটি মন্দিরের মধ্যে রয়েছেন। এই মন্দিরের কুলুঙ্গিতে ও চূড়ায় দেবীর সঙ্গী দেব-দেবীদের দেখানো হয়েছে। সকলের উপরে রয়েছেন শিব, সঙ্গে তাঁর অনুচর নন্দী ও ভৃঙ্গী। শিবের ছবির উপরের দিকটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। দেবীর ডান দিকে, লক্ষ্মী ও গণেশ; বাঁ-দিকে সরস্বতী ও কার্ত্তিক। এই ছবির 'জমি'টি নীল-রঙা, তাতে সমস্ত ছবিটির ব্যঞ্জনা বেড়ে গিয়েছে। দেবীর বহুমূল্য পোষাক ও অলঙ্কার লক্ষ্য করবার মত। এক শ' বছরের বেশী হল এ ছবিখানা বিষ্ণুপুরের রাজবংশের কোন একটি লোকের জন্য ঈশ্বর সূত্রধর কর্ত্তৃক অঙ্কিত হয়েছিল।



সঙ্কীর্ত্তন

আরও কিছু পূর্ব্বের আর একজন প্রসিদ্ধ পটুয়ার নাম ছিল দুর্গাদাস, তার বাড়ী মহাদেবপুরে। তার আঁকা একখানি দুর্গা-চিত্র দীঘাপাতিয়ার রাজপরিবারে আছে বলে শুনতে পাওয়া যায়। মালদহ জেলার রাম-কেলী গ্রামের গম্ভীরা উৎসবের মত অন্যান্য লৌকিক উৎসবেও নানা রকমের পটে মণ্ডপ সাজানো হ'ত। পরিকল্পনার নূতনত্বে ও দেব-দেবীর চিত্র রচনায় অন্যান্য স্থান অপেক্ষা রামকেলীর পটুয়ারাই বেশী দক্ষ ছিল ব'লে শোনা যায়। এদের কাজ 'রামকেলী তস্‌বির' নামে পরিচিত।

লৌকিক-ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যে-সব ছবি কাপড়ের উপরে আঁকা হ'ত, চিত্রিত বিষয়ের প্রকৃতি অনুরোধে তাদের রচনা-প্রণালী স্বভাবতই একঘেয়ে হ'য়ে পড়ত। এই ধরণের ছবি বাদ দিলে সব চেয়ে পুরাণো যে-সব পট আমরা দেখতে পাই, সে-সমস্তই রামায়ণের কাহিনী নিয়ে অঙ্কিত। আমাদের দেশে



যুগলরূপ

কোষ্ঠীপত্র যেরূপ ভাবে রাখা হয়, এই ছবিগুলিও তেমনি পাকিয়ে পাকিয়ে রাখা হ'ত। সাধারণত রামায়ণ থেকে সাত-আটটি ঘটনার চিত্র একটার নীচে আরেকটা করে আঁকা হত। এ-গুলি প্রায়ই কাগজের উপরে আঁকা দেখা যায়। এই ছবিগুলির দু-দিকে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে এক রকমের ফ্রেম্ বাঁধা হ'ত, তার সাহায্যে সমস্ত কাগজখানা খুলে ধরা যেত আর মাটিতে বিছিয়ে রাখার সুবিধাও হ'ত। এই রকম করে রেখে শিল্পীরা গ্রামের সাধারণ লোকদের কাছে ছবিগুলির ব্যাখ্যা করত—আবার এর সঙ্গে গান ক'রে ক'রে তারা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াত। কৃষ্ণচরিত্র নিয়ে এই ধরণের ছবি একেবারে যে নেই তা নয়, তবে তা খুবই কম দেখতে পাওয়া যায়। এই সব ছবির ইতিহাস পর্য্যায়ক্রমে খুঁজে বার করা এক অসম্ভব ব্যাপার, কারণ তাদের খুব প্রাচীন নিদর্শন বড় একটা দেখাই যায় না, আর তাদের সম্বন্ধে কোন লিখিত বিবরণও পাওয়া যায় না।

পালরাজাদের সময়কার অতি সুন্দরভাবে পরিচিত্রিত বৌদ্ধধর্ম্মসম্বন্ধীয় পুঁথিগুলির কথা স্বতন্ত্র। তার পর পুঁথির পাটার কথা বলতে হয়। এগুলির মধ্যে যা সব চেয়ে বেশী প্রাচীন তা খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর। এই 'পাটা' শব্দটি 'তক্তা' অর্থে সংস্কৃতে যে 'পট্ট' শব্দ ব্যবহার হয় তা থেকেই বাঙলায় চলে গেছে। 'পাটা' ও রামায়ণ-চিত্রাবলীর মধ্যে বড় একটা সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। তবুও প্রাচীন বাঙলার যে-সব শিল্পী শেষোক্ত ছবিগুলি এঁকেছে, তাদের হাতের কাজ দেখে মনে হয় যে, তাদের বহুপূর্ব্ববর্ত্তী পালরাজাদের সময়কার শিল্পীরা রেখাঙ্কনে যেরূপ সুদক্ষ ছিল এরা বহু শতাব্দী পরেও সে নিপুণতা একেবারে হারিয়ে ফেলে নি। শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষের সংগ্রহে রক্ষিত প্রাচীন রামায়ণ-চিত্রাবলী আখ্যান-চিত্রের বেশ ভাল নিদর্শন। এই চিত্র-পর্য্যায়ের প্রথম খানিতে দেখানো হয়েছে যে, সূর্পনখা সুন্দরী নারীর রূপ ধরে এসে পঞ্চবটী বনে (লতা আর তালি গাছ এঁকে বনের সূচনা করা হয়েছে) লক্ষ্মণকে ভোলাবার চেষ্টা করছে আর লক্ষ্মণ তাকে উপেক্ষা করছেন। অবশেষে দেখতে পাই, লক্ষ্মণ তার নাক কেটে তাড়িয়ে দিচ্ছেন। এই সব রামায়ণী ছবির প্রাচীন ও সাদাসিধে ধরণ, মূর্ত্তি অঙ্কনের শক্তি ও নৈপুণ্য, আর এ-গুলি থেকে যে একটা বিশালতার আভাস পাওয়া যায় এ-সমস্ত দেখে এই সিদ্ধান্তই আমাদের মনের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, আগে দেয়ালের

শ্রীরমেশ বসু

উপরে যে-সব ছবি আঁকা হ'ত এখন তাই সরাসরিভাবে কাগজের উপরে চালান করা হয়েছে। চিত্র-রচনায় এই বিশালতার ভাব তখনই আসে যখন শিল্পী তার সহজবুদ্ধি (instinct) থেকে বেশ বুঝ্‌তে পারে যে, যে-সব বিবরণ বাদ দেওয়া সম্ভব তার সবগুলিকে বাদ দিয়ে মূল ব্যাপারটির পক্ষে যা নিতান্তই আবশ্যক সুধু সেই মূর্ত্তি-গুলিকেই প্রাধান্য দান কর্‌লে চিত্রিত বিষয়টির মধ্যে গতি ও সজীবতার ইঙ্গিত বেশ ভাল ক'রেই ফুটে উঠ্‌তে পারে। চিত্রিত পুঁথির পাটায় মূর্ত্তি-সমাবেশের দিকে যেরূপ ঝোঁক আছে এখানে তার কোন চেষ্টাই নেই, কিন্তু তার জায়গায় একটা দৃঢ়তা ও স্বতঃস্ফূর্ত্তির ভাব থাকাতে চিত্রের প্রকাশ-ক্ষমতা মোটেই কম হয় নি, বরং তাতে ক'রে আমাদের মনের মধ্যে খুব সহজে ও স্পষ্টভাবেই সাড়া জাগিয়ে তুল্‌তে পারে। প্রাচীন কালে নগরের দেবমন্দির ও আবাসভবনের দেয়ালের গায়ে ছবি আঁক্‌বার প্রথা ছিল বটে, কিন্তু পল্লীগ্রামের কুটীর-বাসীরা গৃহলক্ষ্মী-দের নিপুণ হাতের অপূর্ব্ব আল্‌পনা ছাড়া অন্য যা কিছু ছবি দেখ্‌তে পেত, তা এই শ্রেণীর কুণ্ডলী-করে-জড়িয়ে-রাখা ও মাটীর-উপরে-ছড়িয়ে-দেখানো চিত্রাবলী। সরল রেখাবন্ধনের মধ্যে একঘেয়ে রঙ্‌ মাখিয়ে যে-ছবি আঁকা হ'ত তাতে দরকার মত রঙ্‌কে গাঢ় বা ফিকে দেখাবার কোন ব্যবস্থা ছিল না, কিন্তু এদের আঁকার ধরণটি একটু অদ্ভুত গোছের হ'লেও দেখ্‌তে পাই যে, শিল্পী তার অঙ্কিত মূর্ত্তিগুলিকে জীবন্ত ক'রে তুল্‌তে পেরেছে—অর্থাৎ তাদের দেহের গতির ভঙ্গি ও মুখের ভাব বেশ ফুটে উঠেছে। আজকাল আমাদের মনে ছবি সম্বন্ধে কতকগুলি ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে, সেজন্য সেকালের এই সব ছবি আমাদের চোখে অদ্ভুত ঠেকে ও নিছক হাসি-তামাসার জিনিষ ব'লেই মনে হয়। এদের অঙ্কন-প্রণালী আদিম ধরণের হলেও এদের মধ্যে একটি-যে জীবন্ত ভাব আছে তার থেকেই খাঁটি শিল্পী-মনের পরিচয় পাওয়া যায়। বাস্তবিক পক্ষে এদের কারু-কৌশলের মধ্যে চিত্রবিদ্যায় শিক্ষিত মনের কোন ছাপ পড়ে নি। আলো ও ছায়ার তফাৎ দেখাবার কোন উপায় এদের জানা ছিল না। পারিপার্শ্বিকের কোন ইঙ্গিত বা পারিপ্রেক্ষিকের কোন চেষ্টাই এরা করত না। কিন্তু তবুও কেবলমাত্র বর্ণ-বিন্যাস দ্বারাই শিল্পী তার অঙ্কিত মানুষগুলির বিবিধ ও বিচিত্র দেহ ভঙ্গী ফোটাতে পেরেছে, আর তার দ্বারাই শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখা-বারও কোন ত্রুটি হয় নি। চিত্রিত মূর্ত্তিগুলি দেখ্‌লেই মনে হয় যেন সে-গুলি ঠিক কোন ব্যক্তি বিশেষের ছবি, কারণ প্রত্যেক দৃশ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির শরীরের বিশিষ্ট ধাঁজটি রক্ষা করা হয়েছে। নরনারীর ছবিতে চলা-ফেরা,



ঘুমন্ত-শ্রী

কাজকর্ম্ম করা যা দেখানো হয়েছে তা সবই আলোকিত স্থানে; কেবল একটি দৃশ্যে সীতার শূন্য ঘরের অন্ধকার বোঝাবার জন্য সেই ঘরের ভিতরের দিক্‌টাতে কালো রঙের পোছ্‌ড়া দেওয়া আছে। রঙ্‌ ফলানোর



গোদোহনে যশোদা ও বালগোপাল

ধরণও খুব সাদাসিধে। প্রয়োগ-কৌশলের নানা দোষ ও ত্রুটি সত্ত্বেও এ-সব চিত্রের ব্যঞ্জনাশক্তি বড় কম নয়। অল্প কিছু এঁকে বেশী কিছু বোঝাবার চেষ্টাই তার মধ্যে প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রকৃতির নানা জায়গায় যে-সব রূপ-বৈশিষ্ট্য আছে—যেমন, নদী, পাহাড়, গাছ, ঘর, ইত্যাদি—সেগুলো চিত্রিত ভূমিভাগের মধ্যে মোটেই প্রকাশ পায় নি, দেখাতে হ'লে ধরা-বাঁধা রকমেই দেখানো হয়েছে। পশ্চাৎ-ভূমিতে (background) দু'একটা গাছ দিয়েই বন আঁকাটা ইঙ্গিতে সারা হয়েছে। সীতার কুটীরের সাম্‌নে খুব নিপুণভাবে তিনটি লম্বা বাঁশ এঁকে দিয়েই চিত্রকর সীতার চলাফেরার গণ্ডীটি বোঝাতে চেয়েছেন। রামায়ণে দেখ্‌তে পাওয়া যায়, লক্ষ্মণ মাটীতে তিনটি রেখা টেনে একটি মায়া-গণ্ডী রচনা করেছিলেন, এই শিল্পীটি কিন্তু চিত্রকলার দিক্‌ থেকে গণ্ডীর রহস্য ভাল ক'রেই বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন। শিল্পী তেমন ওস্তাদ না হলে ঠিক রামায়ণের কথা মত এখানে তিনটি রেখা বা একটা বেড়া এঁকে বসত। এই সব চিত্রের পশ্চাৎ-ভূমি (background) সিঁদুর দিয়ে রাঙাবার দিকে একটা-যে ঝোঁক দেখা যায়, তার উদ্দেশ্য বোধ হয় সুধু চিত্র সাজানো নয়, গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের রোদের আলাও এই রঙেই ফুটে ওঠে।

আগেই বলা হয়েছে, রামায়ণের কুণ্ডলী-ক'রে-জড়িয়ে-রাখা ছবিগুলি খুব প্রাচীন ধরণের। ক্রীট্‌ দ্বীপের ভিত্তি-চিত্রাবলীর (frescoes) সঙ্গে এদের যথেষ্ট মিল আছে। খ্রীষ্ট-জন্মের ছয়শ' বছর আগেকার গ্রীসদেশের কোরিন্থিয়ান্‌ পাত্রের উপর অঙ্কিত চিত্রাবলীর সঙ্গে, কিম্বা ষষ্ঠ শতাব্দীর সারভেট্রিতে প্রাপ্ত ইটুরিয়া অঞ্চলের কবরের গায়ের চিত্রাবলীর সঙ্গেও এদের মিল দেখা যায়, তবে অতটা নয়। এগুলো দেখে মিশরদেশের চিত্রের কথাও মনে পড়ে। এদের সেকেলে ধরণ দেখেই মনে হয় এগুলি অতি প্রাচীন শিল্প-প্রথাকে ব'য়ে নিয়ে চ'লে এসেছে।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের এক স্থানে রামায়ণ-চিত্রাবলীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ভবভূতির "উত্তররামচরিতে" রামের জীবনের নানা ঘটনা অবলম্বনে অঙ্কিত যে-সকল

শ্রীরমেশ বসু

চিত্রের বর্ণনা আছে, সে-সব ছবি দেখে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা খুব আনন্দিত হয়েই আলোচনা করেছিলেন।

সংস্কৃত মহাকাব্য ও তার নানা বাঙ্‌লা অনুবাদগুলিকে দেশের সর্ব্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার কাজে আমাদের এই রামায়ণ-চিত্রাবলীর প্রভাব বড় কম ছিল না। মানুষের জীবনকে উন্নত ও সুষমামণ্ডিত করতেও এরা যথেষ্ট সহায়তা করেছিল।

এই সব ভ্রাম্যমান গায়ক-চিত্রকরদের একটা-যে সহজ কাব্যানুরাগ ছিল, তাদের দো-তরফা ব্যবসা এবং ধর্ম্ম ও শিল্পসম্বন্ধীয় পরম্পরাগত যে ভাবধারা তাদের মধ্য দিয়ে চ'লে এসেছে, তারি ভিতর তার কারণ নিহিত রয়েছে ব'লে মনে হয়। সেইজন্য অবনতির যুগেও তাদের মধ্যে কবিত্ব-শক্তি কিছু অবশিষ্ট ছিল দেখা যায়। রাম যেন তাঁর বীরত্বব্যঞ্জক কাজগুলি আবার ফিরে করছেন—তারা যেন চোখের সাম্‌নে স্পষ্ট দেখ্‌তে পেত। সীতা-হরণের পর তাঁদের কুটীরের শূন্যতা রাম ও লক্ষ্মণের মতই এরা অনুভব করতে পার্‌ত। এমন কি, রামের দেবশ্রী ও মাহাত্ম্য বোঝ্‌বার ক্ষমতাও এদের যথেষ্ট ছিল। তাদের কবি-মানসের নানা কল্পনা ও অনুভূতি চিত্রের মধ্য দিয়ে তারা প্রকাশ করতে পেরেছে, তাই যখন তারা কোনও ঘটনা চিত্র ও গানের সাহায্যে গ্রাম্য লোকেদের সাম্‌নে ফুটিয়ে তুল্‌ত, সেই সব লোকেদের মনের মধ্যেও তখন অনুরূপ ভাব জেগে উঠ্‌ত। যে-ছবিতে রাম ও লক্ষ্মণকে সীতার শূন্য কুটীরের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখানো হয়েছে, তাতে দর্শকেরাও ঐ দুটি বীরপুরুষের হৃদয়ের শূন্যতা বেশ অনুভব করতে পারেন—ঐ ফাঁকা জায়গাটুকু কত কথাই না ব্যক্ত করেছে! ছবিতে একটা হরিণ আছে—তাকে সেখানে আনাতে কুটীরের শূন্যতা যেন আরও বেশী করে ধরা পড়েছে; সুধু তাই নয়, তার দ্বারা দুই ভায়ের মনে সোণার হরিণের কথা জাগিয়ে দিয়ে শূন্যতার আসল কারণটিরও সন্ধান দিয়েছে। আর একটি ছবিতে রাম শিবকে যুদ্ধে আহ্বান করছেন; এতে বিশালতার ভাব যেমন আছে, তেমনি আদি যুগের অনাড়ম্বর সরলতাও দেখতে পাওয়া যায়। যোদ্ধৃদ্বয়ের সুদীর্ঘ ও সুগঠিত দেহ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিবের বিশাল তেজ ও



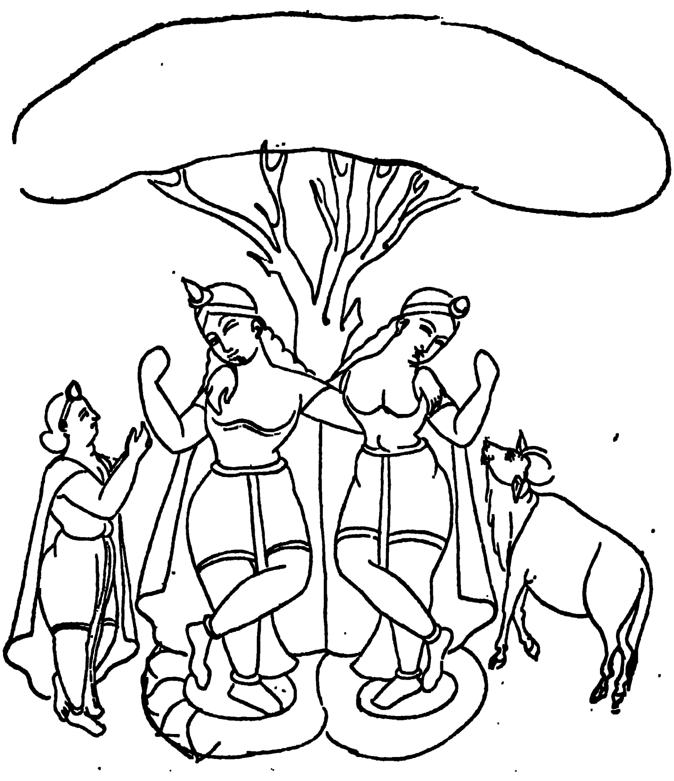
নৃত্য

শক্তি প্রখরভাবে প্রকাশ পেয়েছে, মানব-প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্য তাঁর একটুখানি কৃপার লেশও যেন ফুটে উঠেছে। আবার রামও বড় কম নন, কেবল মহাদেবের সঙ্গে তুলনাতেই তাঁর ব্যক্তিত্ব একটু খাটো বলে মনে হচ্ছে। পার্ব্বতী যে-ভাবে তাঁর মহাশক্তিমান দেব-স্বামী ও মানব-বীরের মাঝ-খানে দাঁড়িয়ে আছেন তা' বেশ জীবন্তভাবেই চিত্রিত হয়েছে।

রামায়ণের ঘটনাবলী বাদ দিলেও, ধর্ম্ম ও ইতিহাস-বিষয়ক ব্যাপার অবলম্বন ক'রে কাগজের উপরে বহুবর্ণে চিত্রিত পট আঁকা হ'ত। তাদের মধ্যে সপ্তদশ শতাব্দীর কয়েকখানি ও অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেকগুলি আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে।* এখনও যে-সব পট পাওয়া যায় তা থেকে মনে হয় অষ্টাদশ শতাব্দী ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এ-গুলি খুব বেশীই আঁকা হ'ত। এ-গুলির প্রধান বিষয় ছিল কৃষ্ণলীলার ঘটনাবলী ও বৈষ্ণব-দের সঙ্কীর্ত্তনের দৃশ্য। দশ অবতারের ও তান্ত্রিক দেবদেবীদের ছবিও সংখ্যায় বড় কম নয়, তবে এদের মধ্যে ভাল ছবি পাওয়া খুবই মুস্কিল। শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষের সংগ্রহে বরাহ-অবতারের একটি অতি চমৎকার ছবি আছে। এর রঙের কাজটি যেমন চমৎকার, এর চার পাশের আল্‌পনার ধরণের কাজটিও তেম্‌নি অসাধারণ নৈপুণ্য প্রকাশ কর্‌ছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রূপ সূত্রধর এই ছবিখানা এঁকেছিল; সে বিষ্ণুপুরের রাজাদের কাছে কাজ কর্‌ত। এর চেয়ে সামান্য পরবর্ত্তীকালের একখানি সঙ্কীর্ত্তন-দৃশ্যের ছবি এইখানে দেওয়া গেল।

উনবিংশ শতাব্দীতে, পাশ্চাত্য চিত্র-শিল্পের প্রভাবের ফলে, যে-সব চিত্রকরেরা বংশানুক্রমে 'পট' এঁকে এসেছে, তারা বড় সহরগুলিতে, ধনীদের তাগিদে ও প্ররোচনায়, তাদের গৃহসজ্জার জন্য ক্যাম্বিসের উপরে পৌরাণিক বিষয় নিয়ে তৈলচিত্র আঁকতে সুরু ক'রে দিয়েছিল। বিশেষ ক'রে কল্‌কাতার বনেদী ঘরে এর কিছু কিছু এখনও দেখা যায়,—এমন কি এই-গুলিই অধিকাংশ লোকের কাছে 'পট' ব'লে পরিচিত। এগুলি প্রায় সবই শিল্প-সৌষ্ঠব বর্জ্জিত, সেই কারণে 'পট' কথাটা শুন্‌লেই লোকে নাসিকা কুঞ্চন ক'রে থাকে; কিন্তু সত্য কথা বল্‌তে গেলে, 'পট' বল্‌তে বাঙ্‌লার যে বিশুদ্ধ লোক-শিল্প বোঝায় এগুলি তার নিদর্শন মোটেই নয়।

পাশ্চাত্য চিত্রের অনুকরণে যে-সময়ে একদল পটুয়া ক্যাম্বি-



কৃষ্ণ ও বলরাম

* মুর্শিদাবাদের কুঞ্জঘাটা রাজবাড়ীতে রক্ষিত কাপড়ের উপরে অঙ্কিত চৈতন্য ও প্রতাপরুদ্র দেবের চিত্রটি ডক্টর কুমার-স্বামীর মতে পরবর্ত্তী কালের. ("রাজপুত চিত্রাবলী" ১ম ভাগ ভূমিকা পৃঃ ১১ পাদটীকা)। কিন্তু ঐ চিত্রটি হয়ত প্রাচীন কোন চিত্রের সুসংস্কৃত প্রতিলিপি মাত্র। শিল্পসৌন্দর্য্যের দিক থেকে দেখতে গেলে মেদিনীপুরের নিকটবর্ত্তী গোপীবল্লভপুরের শ্যামানন্দ ও রসিকানন্দের চিত্রটি এর চেয়ে অনেকটা ভাল।

শ্রীরমেশ বসু

সের উপরে অতি বিশ্রী ছবি আঁকৃত, সেই সময়েই আর একদল পটুয়া অতি দীনভাবে থেকেও প্রাচীন প্রথায় কাগজের উপরে আঁকা রেখাচিত্র-শিল্পকে কোন রকমে বাঁচিয়ে রেখেছিল। তাদের কাজ চিত্র-শিল্প হিসাবে উঁচু দরের হ'লেও লোকে এখন তাদের কথা একরকম ভুলেই গিয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর 'পট'-শিল্পে প্রধানত ব্যঙ্গচিত্রই আমরা দেখ্‌তে পাই। পৌরাণিক চিত্র বাদে, তখনকার সামাজিক ও সাময়িক নানা ব্যাপার নিয়ে বেশ সরস ভাবে ব্যঙ্গ করা হয়েছে—যৌবন-বিভ্রম, সতীনের ঝগড়া, সমসাময়িক সামাজিক কেলেঙ্কারি, কোন কোন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতি আরোপিত নানা গলদ ও ভণ্ডামি—কিছুই বাদ যায় নি।

এই সব 'পট' কালি-কলমে-টানা ছবি নয়, তুলি দিয়ে রেখার সাহায্যে এগুলি আঁকা হ'ত। এই প্রাচীন তুলির রেখার মধ্যে একটা চমৎকার সরসতার ছাপ আছে; আর এদের পরিকল্পনা ও অঙ্কন এই দুই ব্যাপারেই একটা স্বতঃস্ফূর্ত্তির আনন্দ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। মোগল মূর্ত্তিচিত্র অশেষ পরিশ্রমের ফলে যে পারদর্শিতা লাভ ক'রে বৈশিষ্ট্য



শিব ও পার্ব্বতী

অর্জ্জন করেছিল তা এতে পাবার উপায় নেই। এ-গুলির সমসাময়িক কাংড়ার শেষ যুগের রেখা-চিত্রগুলিতে সৌকুমার্য্য সাধনের যে-চেষ্টা ও লোকের মনে প্রভাব বিস্তারের যে-আকাঙ্ক্ষা আছে এদের মধ্যে তা খুঁজে পাওয়া যায় না। ভারতীয় চিত্রের মধ্যে একমাত্র এক অজানা পাহাড়ী শিল্পীর হাতের আঁকা লঙ্কা-আক্রমণ বিষয়ক বৃহৎ চিত্রপর্য্যায়ের সঙ্গেই এদের তুলনা চলতে পারে—এই চিত্র পর্য্যায়ের কতকগুলি নিদর্শন শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষের সংগ্রহে আছে। কিন্তু এদের সঙ্গে জয়পুরের শিল্পীর অঙ্কিত পৌরাণিক চিত্রের (যাকে আমরা 'পট' বললেও বলতে পারি) খুব ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। ডক্টর কুমারস্বামীর "ভারতীয় রেখা-চিত্র" নামক পুস্তকের প্রথম ভাগের ১৬ ও ১৭ সংখ্যক চিত্র দুটিকে আমরা আদর্শস্বরূপ ধরতে পারি। প্রথম চিত্রটি লক্ষ্মী-দেবীর, যিনি বাঙালীর গৃহে গৃহে পূজা পান, ও যাঁর চিত্র বাঙালী শিল্পীর অতি প্রিয়। দ্বিতীয় চিত্রে দেখ্‌তে পাই শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী বাজাচ্ছেন; এই দৃশ্যটিও বাঙালীর অতি প্রিয়, ও এই চিত্রটিকে বাঙ্‌লার 'পটের' সঙ্গে স্বচ্ছন্দে তুলনা

করা যেতে পারে। বাঙ্‌লা 'পটের' তুলি-রেখার টানে অবলীলার ভঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গেই এমন একটা দৃঢ়তার ভাব আছে যা চীনদেশের লেখ-শিল্পকে মনে করিয়ে দেয়। এই ধরণের পটগুলির মধ্যে একখানিতে (যুগলরূপ) অতি পরিষ্কার ঝর্‌-ঝরে রেখা, কুঁদে-গড়া মুখের ভাব, শরীরের গড়ন ও কাপড় পরার চমৎকার ভঙ্গী, চিত্রিত মূর্ত্তিগুলির পরিপূর্ণ সুসঙ্গতি ও স্বচ্ছন্দতা—সমস্ত মিলে মিশে ছবিখানিকে যেন অনন্ত যৌবন ও অনন্ত প্রেমের মিলনের একটি রূপ-কাব্য ক'রে তুলেছে।* এই চিত্রটি তুলির এমন একটা লম্বা ও দম্‌কা টানে এঁকে ফেলা হয়েছে যে, এতে হাতের এতটুকু দ্বিধা বা এতটুকু কাঁপুনির চিহ্নমাত্র নেই। প্রায়ই দেখ্‌তে পাই গোটা মূর্ত্তিটাকে এমন ক'রে একটি একটানা রেখার বন্ধনে গ'ড়ে তোলা হয়েছে যে, বলাই শক্ত কোথায় শিল্পীর তুলি কাজ সুরু ক'রেছিল আর কোথায় তার কাজ শেষ হয়েছে। এই সব শিল্পী অশিক্ষিত গ্রাম্য লোক ছিল, একথা সত্য। তারা হাজার ভুল করেছে, কিন্তু তারা বর্ত্তমানের শিল্পীদের ধরণে ছবি আঁক্‌ত না, ছোট ছোট রেখা এঁকে এঁকে একটু একটু ক'রে তারা ছবিকে পূর্ণ করে তুল্‌ত না। পরিপূর্ণ স্বচ্ছন্দতার সঙ্গে তারা অতি সাদাসিধে রেখা টেনে যেত, তাতে রূপের বৈশিষ্ট্য বেশ ফুটে উঠ্‌ত। অনেক সময়ে পেন্সিল দিয়ে আগে রেখা টেনে আদ্‌রা তৈরি করা হ'ত, কিন্তু ছবি শেষ করার সময় তুলি দিয়ে তাড়াতাড়ি আঁক্‌বার ঝোঁকে শিল্পীরা সেই পেন্সিলের রেখার ওপর দিয়ে প্রায়ই যেত না। প্রাচীন পটের রেখাঙ্কন এত চমৎকার যে, মনেই হয় না সে জিনিষ আরও ভাল হ'তে পারে। এই রেখাগুলি অতি দৃঢ়তার সঙ্গে আঁকা হ'লেও এদের টানের মধ্যে নমনীয়তার কোনো অভাব নেই।

এই সব 'পট' কোন জীবন্ত মানুষকে আদর্শ মনে ক'রে সাম্‌নে বসিয়ে রেখে আঁকা হ'ত না; দৈনন্দিন জীবন থেকেই যা কিছু মাল-মশলা সংগ্রহ করে স্মৃতির সাহায্যে সেগুলিকে মিলিয়ে মিশিয়ে পটুয়ারা নব-নব রূপ সৃষ্টি কর্‌ত। মোটামুটি বল্‌তে গেলে এই রেখাচিত্রগুলিতে মানবদেহের নানাপ্রকার ভঙ্গী প্রকাশ কর্‌বার বেশ একটা প্রয়াস দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে কোনও কোনও ছবিতে খুঁটিনাটির এমন চমৎকার সমাবেশ আছে যে, দেখ্‌লেই মনে হয় কেবলমাত্র কল্পনার উপর নির্ভর ক'রে এমনভাবে আঁকা চলে না; এই সব ছোটো-খাটো ব্যাপার ভুলে যাওয়াই শিল্পীর পক্ষে স্বাভাবিক। তাই, আমরা যদি একথা সত্যই সত্যই না জান্‌তুম যে, পটুয়ারা কখনও জীবন্ত মানুষকে সাম্‌নে রেখে ছবি আঁকে নি, তা হলে তাদের 'পট' দেখে এমন কথা স্বীকার করা আমাদের পক্ষে শক্ত হত। তার পর, "ঘুমন্ত-শ্রী"র মতো একখানা রেখা-চিত্রে রূপ ও ভঙ্গি ফুটিয়ে তোলার আশ্চর্য্য দক্ষতার সঙ্গে নিখুঁত শিল্পকৌশলের এমনি সুন্দর যোগ রয়েছে যে, বিস্ময়পুলকে এই প্রশ্নই আমাদের মনের মধ্যে জেগে ওঠে যে, সত্য সত্যই এটা কোন গ্রাম্য শিল্পীর হাতের জিনিষ কিনা। "ঘুমন্ত-শ্রী" ছবিখানা খুবই একটা বড় সৃষ্টি; তার রেখার ভঙ্গী সুসংযত অঙ্কনের মধ্যে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। এটা নিশ্চয়ই কোন প্রতিভাবান পটুয়ার কাজ। খুব অদ্ভুত মনে হলেও এ-কথা স্বীকার কর্‌তেই হবে যে, আধুনিক শিল্পের কোন কোন অতি-আধুনিক পদ্ধতি ভারতীয় শিল্পীরা আগে থেকেই নিজেদের মনে আঁচ্‌তে পেরেছিল। শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষের সংগ্রহে পটুয়াদের আঁকা এমন কতকগুলি আশ্চর্য্য রকমের ছবি আছে যা থেকে বেশ বুঝ্‌তে পারা যায় আধুনিক শিল্পে Cubism বা Impressionism আস্‌বার একশ' বছর বা তারও আগে আমাদের দেশে ঐ ধরণের ছবি আঁকা হয়েছে। প্রাচীন বাঙ্‌লার ঐ ধরণের একখানা চমৎকার রঙ্‌করা ছবি, যা এ-দেশ থেকে কাংড়া অঞ্চলে চলে গিয়েছিল, এখন শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষের সংগ্রহে স্থান পেয়েছে।

বিগত শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধভাগে পটুয়াদের কাজ উন্নতির চরম সীমায় পৌঁছেছিল। সে সময়ে বাঙ্‌লাদেশের সর্ব্বত্রই এদের দেখ্‌তে পাওয়া যেত। পূর্ব্ব-বঙ্গের ঢাকা, নোয়াখালী এবং ময়মনসিংহ, উত্তর-বঙ্গের মালদহ, রাজসাহী এবং পাবনা, এবং পশ্চিম-বঙ্গের বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্দ্ধমান, নদীয়া,

* পটুয়া বলরাম দাস বৃদ্ধ বয়সে এই 'পটরচনা' করেছিল। গৃহত্যাগ ক'রে নদীয়ায় এসে সে সাধুর মত জীবন যাপন করত।

বাঙ্‌লার প্রাচীন চিত্র ও পট

শ্রীরমেশ বসু

হুগ্‌লী এবং কলিকাতা পটের জন্য বিখ্যাত ছিল ; কিন্তু সব, চেয়ে বেশী নাম ছিল কালীঘাটের পটের। কালীঘাটের এই পটগুলি যারা এঁকে গেছে, তাদের মৌলিকতা, সাধারণের পছন্দসই নানা বিষয় অবলম্বন করে ছবি আঁক্‌বার অসাধারণ ক্ষমতা ও রেখাঙ্কনের অপূর্ব্ব কৌশল আমাদের মনে বিস্ময় উৎপাদন করে। এই ধরণের একটি মনোহর চিত্র— "গো-দোহনে যশোদা ও বালগোপাল"। এটা খুবই স্বাভাবিক হয়েছে, অথচ সাধারণ গোছের কিছু হয় নি। এতে শুধু আঁকার চাতুরী আছে এ-কথা বল্‌লে খুব কমই বলা হয় ; একে সত্য সত্যই একখানি জ্বলজ্বলে ছবি বলা যেতে পারে। ছবিখানি দেখ্‌তে দেখ্‌তে দর্শকও যেন যশোদার মত কৃষ্ণের আধ-আধ কথা শুন্‌তে পান, কৃষ্ণের দুষ্টামিও যেন তাঁর কাছে কিছুমাত্র লুকানো থাকে না। কৃষ্ণলীলার এই ধরণের ছবি আঁকাতেই পটুয়াদের শিল্প-সৃষ্টির ক্ষমতা বিশেষভাবে সার্থকতা লাভ কর্‌ত।*

এ এক বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার যে, গত শতাব্দীর মাঝা-মাঝি 'পট'-শিল্পের উন্নতি এতটা বেশী হ'য়ে হঠাৎ একেবারেই থেমে গেল। এর কারণ সে সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের দরুণ লোকের মনোভাব ও রুচির একটা পরিবর্ত্তন এসে পড়েছিল, যার ফলে যে-জিনিষকে উৎসাহ দেওয়া উচিত ছিল তার দিকে লোকে ফিরেও তাকালে না। এ-দেশে সস্তা বিদেশী 'লিথো'-করা ছবির আমদানিই এই লোক-শিল্পের মৃত্যুর কারণ হ'য়ে দাঁড়াল। ভাল জিনিষের চাহিদার অভাব হওয়াতেই চিত্রকরদের প্রেরণাও লোপ পেয়ে গেল। পরবর্ত্তী কালের শিল্পীরা বড় কিছু সৃষ্টি কর্‌তে পার্‌লে না, তারা কেবল নকলনবীশ হ'য়েই খুসী রইল। পুরাণো 'পট' থেকে নতুন পট তৈরি হ'তে থাক্‌ল, পুরাণো ছবির ঠিক প্রতিলিপি তোলা হ'ল না, ইচ্ছামত সেই সব ছবি বিকৃত ক'রে নকল করা চল্‌তে লাগ্‌ল। পরবর্ত্তী 'পট' গুলিতে শুধু যে মৌলিকতার অভাব আছে তা নয়, রেখাঙ্কনের দিক থেকে সেগুলি একেবারেই কাঁচা, তাদের কোনো বিশিষ্টতাই নেই। আধুনিক 'পট' গুলি রুচিবিকারেরই পরিচয় দেয়, সেকেলে পটের প্রকাশক্ষমতা কোথায় অন্তর্দ্ধান হয়েছে। তারপর সর্ব্বনাশের যা-কিছু বাকী ছিল, তা পূরণ কর্‌বার জন্যই বোধ হয় বিদেশ থেকে আমদানী করা সস্তা রঙের ব্যবহার চল্‌তে লাগ্‌ল। আজকালকার 'পট' গুলি কেবল যে অঙ্কন-কৌশলের দিক থেকেই নিকৃষ্ট তা নয়, তাদের পরি-কল্পনাও একেবারে মোটা ধরণের। সেকালের ব্যঙ্গচিত্রগুলি লোক হাসাবার জন্যই আঁকা হয়েছিল। সেই ধরণের আধু-নিক ছবিগুলি প্রায়ই এমন সব সামাজিক ব্যাপার নিয়ে আঁকা যা' মোটেই কৌতুকজনক নয়।

বাঙ্‌লার প্রাচীন চিত্রশিল্পের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ এই যে, কোনকালেই তার উপর মোগলশিল্প প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি—তা সে বাদশাহী দরবারের খাঁটি মোগল শিল্পই হোক্ কিম্বা পাটনা ও মুর্শিদাবাদের নবাবী দরবারের নিকৃষ্ট মোগলশিল্পই হোক্। চিত্রের বিষয় ও ভাবের দিক থেকে বাঙ্‌লার প্রাচীন চিত্রশিল্পের সঙ্গে রাজপুত শিল্পের সাদৃশ্য আছে, যদিও এদের মধ্যে একের অন্যের উপর প্রভাব বিস্তারের বিশেষ কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। এই দুই ধরণের ছবির মধ্যে চিত্রিত নরনারীর পোষাকের একটা মিল দেখতে পাওয়া যায় এইমাত্র। অন্যদিকে আবার বাঙ্‌লার এই প্রাচীন চিত্রকলা উড়িষ্যার চিত্রশিল্পের উপরে বড় কম প্রভাব বিস্তার করে নি।

বাঙ্‌লার চিত্র ও পট সম্বন্ধে এই প্রাথমিক অনুসন্ধান অনেকটা অসম্পূর্ণ হলেও এ থেকে বেশ বুঝ্‌তে পারা যাবে যে, বাঙ্‌লার প্রাচীন শিল্প-কলা একটা বিশিষ্ট পদ্ধতির ফল ; তাই একে বাদ দিলে ভারতীয় শিল্পের কোন বিবরণ

* বিগত শতাব্দীর কালীঘাটের পট-শিল্পীদের মধ্যে নীলমণি দাস, বলরাম দাস ও গোপাল দাস এই তিন জনের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে নীলমণি দাস খুব মৌলিকতা দেখিয়েছে, আর এঁকেওছে খুব বেশী। "ধুমন্ত-শ্রী" পটখানি তারই আঁকা বলে সবাই মনে করে। বলরাম দাসের ভাল ছবিগুলির মধ্যে "যুগলরূপ" পটখানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে সম্বন্ধে আগেই বলা হয়েছে। "গো-দোহনে যশোদা ও বালগোপাল" পটখানি গোপাল দাসের খুব ভাল কাজের নমুনা ব'লে ধরা যেতে পারে। শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষের সংগ্রহে যে-সব কালীঘাটের পট আছে তাদের মধ্যে যেগুলি সব চেয়ে ভাল তা' এই তিনজনেরই কাজ।

বা ইতিহাস অসম্পূর্ণই থেকে যায়। বাঙ্‌লার চিত্রকলার প্রাচীন রূপ একাদশ শতাব্দীতে, পালরাজাদের সময়ে, বৌদ্ধদিগের তালপাতার পুঁথিতে প্রথমে দেখ্‌তে পাওয়া গেছে। এই পুঁথিগুলিতে যে-সব ছবি আঁকা রয়েছে, সেগুলিতে অজণ্টার চিত্র-ভঙ্গীই খুব ছোট আকারে প্রকাশ পেয়েছে। শিল্পের এই ভাবধারা পঞ্চদশ ও তৎপরবর্ত্তী শতাব্দীগুলিতে পেল্‌বার তাদের ছবিতে ও চিত্রিত পুঁথির পাটায় চ'লে এসেছে। এই সময়ে জাতীয় জীবনের প্রভাবও উক্ত শিল্পের উপর ক্রমেই বেশী পরিমাণে পরিস্ফুট দেখা যায়। তার পর কুণ্ডলী-ক'রে-জড়িয়ে-রাখা রামায়ণের চিত্রগুলি এবং কাগজ ও কাপড়ের উপরে আঁকা নানা রকমের ছবি বাঙ্‌লা দেশে প্রচলিত হয়। শেষে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ব্যঙ্গচিত্র পর্য্যন্ত পৌঁছে প্রাচীন শিল্পধারাটি একেবারে শুকিয়ে যায়। বাঙ্‌লার এই চিত্রশিল্পের আবির্ভাব হয় বৌদ্ধপ্রভাবের ফলে, বৈষ্ণবেরা পাঁচ শতাব্দী ধ'রে চর্চ্চা ক'রে একে খাঁটি হিন্দু ও জাতীয় শিল্পে পরিণত করেন, তার পর বিজাতীয় ভাবের প্রাণ-নাশক বিষ-বাষ্পে এর জীবনশেষের কালটি ঘনিয়ে আসে।

প্রতিবিধান

—গল্প—

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

১

দুগ্ধপানে অনিচ্ছুক মন্তুর প্রতি তার মায়ের নিত্য-ব্যবহৃত সস্নেহ ভৎর্সনার কথা ও সুরটুকু যথাসম্ভব অনুকরণ ক'রে মন্তুও বল্লে—'খা, খা—না খেলে মাল্‌বো'। কিন্তু ঘাসাহারবিরত ছাগশিশুর অবাধ্যতা তাতেও দূর হল না। তখন মন্তু গম্ভীরতর অভিভাবকতার সঙ্গে বলে উঠ্‌লো—'না খেলে একানলেকে ডাক্‌বো। ওই—ওই আসচে তালগাছ থেকে নেবে।'

এত বড় নিকটবর্ত্তী বিভীষিকাও ছাগশিশুর উপর ব্যর্থ হয়ে গেল। তার ক্ষুদ্র উদরটিতে আর কত খাদ্যের স্থান সংকুলান হবে? সে আজ ক'দিন হতে মন্তুর খিদ্‌মতগারীতে প'ড়ে অবিশ্রান্ত নব নব দুর্ব্বাদল চর্ব্বণ করেচে।

অপরাহ্নের পীত রৌদ্র একটুকরো সোনার আঁচলের মত গোময়লিপ্ত আঙিনার উপর লুটিয়ে পড়েচে। ছাগ-শিশু প্রচ্ছায়-শীতল পর্‌ছাত্রীর নীচে সারাটা দুপুর দাঁড়িয়ে থেকে এখন বোধ হয় ঐ কবোষ্ণ রৌদ্রটুকুর লোভনীয় আমন্ত্রণে ঈষৎ চঞ্চল হয়ে উঠ্‌লো। মন্তু সজোরে তার গলরজ্জু আকর্ষণ করে ললিতকঠোর স্বরে বল্লে—'দুৎতু পাঁতা—বদ্‌দাত্‌ পাঁতা—আবাল্‌ পালানো হচ্চে—খা বল্‌চি, নৈলে ওগা হয়ে যাবি' এবং তারপরই পাঁঠার শৃঙ্গাঙ্কুর শোভিত কচি মাথাটিকে সেই তৃণপুঞ্জের উপর চেপে ধরলে যা মন্তুর অনেক কষ্টের আহরণ। একটা তীব্র বিকম্পিত 'বে-এ-এ' শব্দে পাঁঠা তার ধর্ষণকারীকে যুগপৎ বিদ্রোহ ও মুক্তিভিক্ষার আবেদন জানালে। উপচিত-ক্রোধ মন্তু 'তবে যা, মল্‌ গে' ব'লে পাঁঠাকে একটি মৃদু ধাক্কার সঙ্গে পর্‌ছাত্রী হতে নাবিয়ে দিলে।

গা ঝাড়া দিয়ে এবং নাসারন্ধ্র হতে একটা 'ফক্‌র্‌' ধ্বনি নির্গত ক'রে পাঁঠা তার ক্ষিপ্র চরণচতুষ্টয় নিয়ে আঙিনার ঠিক মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালো। ছল ছল বিস্ফারিত চোখে মন্তু সেই নির্ম্মম পলাতককে লক্ষ্য করে বল্লে—'আল্‌ কিছু খেতে দোব না—কোলেও কল্‌বো না—ঘুমও পালাবো না'।

পাশের নাকারিবর হ'তে মাঝে-মাঝেই 'মারি সে পাঞ্জা' 'কচ্‌চে বারো' 'দোছক গোহাড়' প্রভৃতি সোৎসাহ চীৎকার

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

উঠ্ছিল। সহসা তার পরিবর্ত্তে একটা মিশ্র কলরব উঠ্লো 'পিরতিমে আস্চে' এবং সঙ্গে সঙ্গেই চার পাঁচ জন প্রায়-বিকচ্ছ লোক নাকারিবর হতে আঙিনায় নেবে পড়লেন।

জনৈক গলদ্ঘর্ম্ম বাহক একটি ডাকের-সাজ-পরা কালীমূর্ত্তি নিয়ে আঙিনার কোণে দেখা দিলে। প্রতিমার পশ্চাদ্দিকস্থ ভুষো-ছোপানো পাটের চুল দেখেই জয়শঙ্কর-বাবু যুক্তকর মাথায় ঠেকিয়ে গদ্‌গদস্বরে বল্লেন—'আহা মায়ের কি উলাঙ্গিণী রূপ' এবং তারপরই উচ্চকণ্ঠে বলে উঠ্লেন—'বাজারে বেটারা বাজা।'

বোধন-বৃক্ষের তলায় তিনটি লোক দড়মা-শয্যায় চাকোপাধানে নিদ্রা যাচ্ছিল। জয়শঙ্করবাবুর শাব্দিক খোঁচায় আহত হয়ে তারা ত্রস্ত ধড়মড় দেহে উঠে বস্‌লো এবং ঢাকের মুখ খুলে নিয়েই একটা বিকট চড়বড়াবড় শব্দে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুললে।

দেখ্তে দেখ্তে দালান-বাড়ীর অন্তঃপুর হতে শঙ্খ ও হুলুধ্বনি তুমুল নিনাদে বেজে উঠ্লো এবং ছাদের উপর হতে সপ্রতিম বাহকের শীর্ষে অজস্র লাজাঞ্জলি বর্ষিত হতে লাগ্‌লো।

এ আর-এক কালীমূর্ত্তি! শুভ্র নিস্তব্ধতার প্রশান্ত বুকের উপর আকস্মিক উৎসবের করাল-কৃষ্ণ তাণ্ডব। প্রথমে বিস্ময়চকিত ও পরে শঙ্কাতঙ্কিত হ'য়ে ছাগশিশু তিন লাফে মন্তুর গা ঘেঁসে গিয়ে দাঁড়ালো। প্রফুল্ল হাস্যমুখে মন্তু বলে উঠ্লো—'কেমন—আল্ যাবি?' একটি ক্ষুদ্র 'উঁ হুঁ হুঁ' শব্দে পাঁঠা যেন তার ভয়ার্ত্ত অনুতাপ জ্ঞাপন করলে। তখন মন্তু তার গলা জড়িয়ে ধ'রে এবং পিঠের উপর সান্ত্বনার হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বল্‌লে 'ভয় কি লে? ও মা কালী। ওল্ পূজো হবে—আমি দেখ্‌বো, তুই দেখ্‌বি।' বেচারী তখ্‌নো জানে না যে পূজার পরিসমাপ্তি দেখা পাঁঠার ভাগ্যে লেখা ছিল না।

উত্তর পোতার চণ্ডীমণ্ডপে প্রতিমা যথারীতি সংস্থাপিত হবার পর বৈদ্যনাথবাবুর দৃষ্টি ইতস্তত ঘুরতে ঘুরতে ছাগশিশুর উপরে গিয়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়ালো। বিকট দশন পংক্তিকে ঈষৎ বিকসিত ক'রে তিনি জয়শঙ্করবাবুকে বল্লেন—'দিব্যি পাঁঠা মুখুজ্জে—দিব্যি পাঁঠা—একটা ফুলখাসী বল্লেও চলে।'

তারাপদবাবু এগিয়ে গিয়ে পাঁঠার মেরুদণ্ড টিপে দেখে হৃষ্টচিত্তে বৈদ্যনাথবাবুর কথার সমর্থন করলেন।

বৈদ্যনাথবাবু আবার বল্লেন—'নাঃ দিব্যি পাঁঠা দিয়েচে। কাজেমের আক্কেলে পছন্দ আছে। আর দেবেই বা না কেন? বছরে ঐ একটা জিনিষ মনিবকে নজর দেয়, তা কি আর ফাঁকি দিতে পারে? যাক্—কি বলে—আর বার ত মুখুয্যে কুলোতেই পারনি—যোদ্দা এবার যেন মহাপ্রসাদটা বুঝলে কিনা—'

উদ্বিগ্নভাবে তারাপদবাবু উক্ত কথার জের টেনে বল্লেন—'হ্যাঁ, শুদ্ধ এই আমরা বামুন যে ক'ঘর আছি—একটু দেখা বৈ ত নয়।'

জয়শঙ্করবাবু—'তারিণী!—পারলে কি আর আমার অসাধ—ঐ ত একরত্তি জিনিষ' বলে একটি লম্বা হাই তুললেন।

'পার্ব্বে, পার্ব্বে, এবার খুব পার্ব্বে—ইচ্ছার অসাধ্য কাজ নেই। আর ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছায়—বুঝলে কিনা—হাড়ে-মাসে স্বচ্ছন্দে সাত আট সের হবে—কেননা—বাঃ. দিব্যি নধর যাকে বলে।'

বৈদ্যনাথবাবুর এই এক উচ্ছ্বাসে উচ্চারিত সর্ব্ব-সংশয়নিবারক বাক্যের উত্তরে জয়শঙ্করবাবু একটু মাথা চুলকে নিয়ে বল্‌লে—'ঐ ত তোমাদের ভুল। যা দেখা যায় তা নয়। যদি দেখ্‌তে কাজেম যা দিয়ে গিয়েছিল—আরে ছ্যাঃ—একটা বেরালছানা। আজ সাত দিন ধ'রে আমার ঐ ছেলেটা ওর পিছনে লেগে আছে—নাওয়া নেই, খাওয়া নেই—তবে-না একটু হাড়-গোড় ঢেকেছে।'

'কে—আমাদের এই মন্তু খোকন! বাঃ বাঃ বাবাজীর বাহাদুরী আছে।'

'বাহাদুরী ত আছে, কিন্তু দেখনা ছেলেটার চেহারা—কণ্ঠার হাড় ঠেলে উঠেচে, চোখের কোলে কালি পড়েচে। বেটার সব বিশ্রী। দিবি ত দিবি দিনের দিন দে, তা না সাত দিন আগে থাক্‌তে এনে হাজির—কে দেখে,

কে সামলায়? আর এ ছেলেটাও এমন পাঁঠা-ন্যাচড়া যে, বক্‌লেও শুন্‌বে না। এখন কালকের দিনটা কেটে গেলে রক্ষে পাই।'

তারাপদবাবু পাঁঠার অঙ্গসৌষ্ঠব নিরীক্ষণেই ব্যস্ত ছিলেন। তিনি হঠাৎ বলে উঠ্‌লেন 'দেখুন জয়বাবু, পাঁঠাটার সব লক্ষণই সুলক্ষণ ছিল, কেবল ল্যাজের ডগায় দু'একগাছা—তা সে ধরবার মত নয়।'

জয়শঙ্করবাবু চম্‌কে উঠে বল্লেন—'এঁ্যা! সাদা লোম নাকি? তাইত! বেটাকে এত ক'রে বল্লুম যে নিকালী হওয়া চাই—নৈলে এ যে-সে ঠাকুর নয়—একেবারে ঝাড়ে বংশে যেতে হবে—তা তবুও যদি বেটার একটু ইয়ে থাকে।'

এমন সময় কে যেন পিছন হতে বলে উঠ্‌লো—'স্যালাম হই কত্তা'। সকলে চেয়ে দেখ্‌লে কাজেম শেখ।

জয়শঙ্করবাবু গর্জ্জন ক'রে ব'লে উঠ্‌লেন—হ্যাঁরে, এই কাজেম, এই বুঝি তোর নিকালী? চেয়ে দেখ্ দিকি ল্যাজটার দিকে! তুই কি মনে করেছিস্ কাঁচি দিয়ে ল্যাজটাকে কেটে ফেলে নিকালী করতে হবে?

মৃদুহাস্যের সঙ্গে কাজেম বল্লে—'দু'একগাছ সাদা লোম্ আর কার না থাকে কত্তা? তা ক'ন ত নিড়িয়ে সাফ করে দিই।'

'আরে ধুত্তোর নিড়োনো। এ পাঁঠায় কখনো চলে? যা এক্ষুণি আর একটা এনে দে।'

'আজ্ঞে তা বদল দেবার ক'ন ত আছে একটা এর চেয়েও মিস্কালী—যারে দেখে ফেলেহাঁড়িও ক'ন্ আমি ফর্সা; তয় কিনা সেটা যেনি এর আর্দ্ধেকও হবেন না—তা কন্ ত সেইটেই—'

পুরোহিত লম্বোদর ভট্টাচার্য্য এতক্ষণ কোন কথাই বলেন নি—কেবল লুব্ধনেত্রে পাঁঠার রূপসুধা পান করছিলেন। তিনি সুপ্তোত্থিতের মত গা ঝাঁড়া দিয়ে বলে উঠলেন—'থাক্, থাক্ কিছু দরকার নেই—এই পাঁঠাতেই চলবে। বুঝলেন জয়বাবু, কালিকাতন্ত্রে বলে যে; যে অজার সমস্ত শুক্ল কেশ উৎপাটিত হয়েছে, তাকে কৃষ্ণ অজাই বলতে হবে—সেও দেবী-পূজায় প্রশস্ত—তবে তার মুণ্ডটি পুরোহিতের প্রাপ্য।'

লম্বোদরের সাময়িক শাস্ত্রজ্ঞানে সকলেই কিছু চমকিত হলেন বটে, কিন্তু বদল অপেক্ষা মুণ্ডহীনতাও শ্রেয়স্কর বিবেচনা ক'রে কেউ আর প্রতিবাদ করলেন না। জয়শঙ্করবাবু—'তবে থাক্—সবই অদৃষ্ট' ব'লে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বাড়ীর ভিতর চলে গেলেন।

উৎকর্ণ হয়ে মন্তু উপরোক্ত সুদীর্ঘ কথোপকথন শুন্‌ছিল। সে বুঝতে পেরেছিল আলোচনা পাঁঠাসংক্রান্তই—কিন্তু পাঁঠার দিবিত্ব, নিকালিত্ব এবং সাত-আট-সেরত্ব যে কি জন্য আলোচনার বিষয় হ'তে পারে, তা তার সরল শিশু-বুদ্ধির কাছে একটা দুর্জ্ঞেয় রহস্যই থেকে গেল। মুণ্ড এবং মহাপ্রসাদ এই দুটো আভিধানিক শব্দের সঙ্গে তার যদি কিছুমাত্রও পরিচয় থাক্‌তো, তা'হলে সে নিশ্চয়ই তার জবরদস্ত পিতাকেও রোরুদ্যমান তিরস্কার দিয়ে ব্যতিব্যস্ত করে তুল্‌তো। কিন্তু সে পরিচয়ের অভাবে সে কেবল একটা অবাচ্য আশঙ্কার আব্‌ছায়া দৌর্ম্মনস্যে ব্যথিত হয়ে উঠ্‌লো। সে তার পরম স্নেহাস্পদ জীবটীকে কোমল বাহুবন্ধে বেষ্টন ক'রে তার পিতৃবন্ধুগণের ভয়ঙ্কর সান্নিধ্য হ'তে যথাসম্ভব দূরে অর্থাৎ আঙিনার প্রায় শেষপ্রান্তে গিয়ে দাঁড়াল। সেই সময়ে একটি বৃন্তচ্যুত বিল্বপত্র উড়তে উড়তে এসে পাঁঠার চরণোপান্তে পতিত হলো। ভোজন সম্বন্ধে বীতস্পৃহতা সত্ত্বেও পাঠা ঐ টাট্‌কা সবুজ পাতাটিকে সংস্কারবশত দু'একবার আঘ্রাণ না করে পারলে না। 'পাতা খাবি? খা, খা পাতাই খা,' বলে মন্তু তাকে আরো দু'চারটে বাতাসে-খসা বেলপাতা কুড়িয়ে এনে দিলে। কিন্তু এবারও তার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধের উপযুক্ত সম্মান রক্ষা করতে পাঁঠার কোন আগ্রহ দেখা গেল না। কাজেম শেখ দূরে দাঁড়িয়ে এই সুমধুর দৃশ্যটুকু উপভোগ করছিল। সে স্মিতহাস্যের সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে বল্লে—'কি খোকাবাবু—খাচ্চে না বুঝি?' ক্ষুব্ধ অভিমানের সঙ্গে মন্তু বল্লে—'না, ওকে পাছ্‌লে ধলো—খাইয়ে দিই।' কাজেম আর একটু অর্দ্ধ-

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

পূর্ণ হাস্তের সঙ্গে বল্লে—'আর খাইয়ে কি হবে খোকা-বাবু? ওর খাওয়া ত ফুরিয়ে এসেচে।' মন্তু বিস্মিতভাবে কাজেমের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। কাজেম আবার বল্লে—'আজ ত খোকাবাবু ওকে খাওয়াচ্চো—কালও না হয় খাওয়াবে—পরশু?' কি রহস্যময় প্রহেলিকা! এ প্রহেলিকার অর্থভেদ করতে না পেরে মন্তু বিমূঢ় বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে—'পলশু খাবে না কাদেম?' কাজেম সংক্ষিপ্ত ভাষায় উত্তর দিলে—'উঁহুঁ'।

'হ্যাঁ খাবে—তুমি জানোনা—ও খাবোনা খাবোনা কলে, আবাল্ খায়—ভালি দুত্তু হয়েচে কি না।'

কাজেমের কঠিন চোখদুটিও অশ্রুসিক্ত হ'য়ে উঠ্‌লো। সে গাঢ়স্বরে বল্লে—'বেলপাতা ত খাবে না খোকাবাবু—যদি খায় ত এক কুলপাতা।'

'কুলপাতা! কুলপাতা বুঝি ও ভালবাসে?'

'বড্ড ভালবাসে। যখন সব পাতায় অরুচি হয়, ঐ পাতা আমরা দিই।'

উৎসাহের সঙ্গে লাফিয়ে উঠে মন্তু বল্লে—'কুলপাতা তো কুলগাছে হয়? আমি জানি কোথায় আছে। আমাদেল্ পুকুল্‌ধালে একতা মস্ত কুলগাছ আছে। চলো পেলে দেবে চলো।' এক হাতে পাঁঠার দড়ি ও অপর হাতে কাজেমের কোঁচার কাপড় টানতে টানতে মন্তু তাদের পুকুরধারে চল্‌লো।

২

অমাবস্যার ঘনান্ধকার রাত। বস্তুহীন গাঢ় অন্ধকারে বিশ্বজগৎ আচ্ছন্ন। এ অন্ধকারে বড় ছোটর সঙ্গে মিশে গেছে—দূর নিকটের কাছে ধরা দিয়েচে। আকাশের লক্ষ জ্যোতির্বিন্দুর সঙ্গে মাঠের জোনাকীপুঞ্জের মিলন-মহোৎসব—স্তিমিত ছায়াপথের সঙ্গে নদীর প্রচ্ছন্ন দেহের গোপন কোলাকুলি। ঝিঁঝিঁর অবিচ্ছেদ সঙ্গীতধ্বনি কি এক সরব নীরবতার যাদুমন্ত্রে অন্ধকারের উপর অন্ধকারের পর্দ্দা টেনে দিচ্চে।

রাত এক প্রহরেরও বেশী হয়েচে। জয়শঙ্করবাবুর চণ্ডীমণ্ডপে পুরোহিতকণ্ঠনিঃসৃত বেদমন্ত্রোচ্চার। আঙিনার তিনটি প্রদীপ্ত মশাল—মধ্যস্থলে হাড়িকাঠ। মন্তুর পাঁঠা সদ্যস্নাত কম্পমান দেহে পুরোহিতের যজ্ঞোপবীতবেষ্টিত কর-পল্লবের নীচে মাথা পেতে দিলে। তার সিন্দুরচর্চ্চিত ললাটের উপর একটি জবাফুলও স্থাপিত হলো। মালকোঁচাপরা বৈদ্যনাথবাবু খড়্গাধারী জহ্লাদের বেশে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। সহসা 'ছ্যাডাড্যাং ড্যাডাং' শব্দে বলিদানের বাজনা বেজে উঠ্‌লো।

দালানের ঘেরা বারান্দায় শ্রমক্লান্ত মন্তু অঘোর নিদ্রায় অভিভূত। তার মা দরজার চৌকাঠে ব'সে নিজের প্রাণটিকে দু'ভাগ করে দু'দিকে পাঠিয়ে দিচ্ছিলেন—এক ভাগ ভক্তিমাখা চণ্ডীমণ্ডপে, অপর ভাগ মমতামাখা মন্তুর বিছানায়। ঢাকের বিকট নিনাদে সুদূর মাঠের কুকুরগুলি পর্য্যন্ত প্রবুদ্ধ হয়ে ঘেউ ঘেউ শব্দে নিজেদের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করলে, কিন্তু মন্তুর ঘুম তাতেও ভাঙলো না। সে আজ তার পাঁঠার পরিচর্য্যায় অন্যদিনের চেয়েও বেশী মেহনৎ করেচে। বোধ হয় সে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিল যে, তার পাঁঠা কুলপাতা খেয়ে এতই মোটা-সোটা হয়েচে যে তাকে ঘোঁড়া করে তার পিঠের উপর চড়া দরকার।

'ব্যা—এ্যা—এ্যা'—ঢাকের বাজনা ভেদ করে একটা ক্ষীণ আর্ত্ত চীৎকার ধ্বনিত হলো। ধড়মড় ক'রে জেগে উঠেই মন্তু নিদ্রাজড়িত চোখে টল্‌তে টল্‌তে চৌকাঠ ডিঙিয়ে আঙিনায় বেরিয়ে পড়লো। 'কোথা যাস্ মন্তা—কোথা যাস্?' বলে তার মা প্রসারিত হস্তে তাকে ধরে ফেল্‌লেন, কিন্তু সে 'আমাল্ পাঁতা' ব'লে সজোরে হাত ছিনিয়ে নিয়ে হাড়িকাঠের দিকে দৌড়াল।

'ঘ্যাচাং' ক'রে একটি ছোট্ট শব্দ হলো। মন্তু প্রাণপণ শক্তিতে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো,'আমাল্ পাঁতা'—একটা উষ্ণ রক্তের ধারা তার গায়ের উপর ফিন্‌কি দিয়ে পড়লো। 'ধর, ধর, গিয়েছিল আর কি' বলে জয়শঙ্করবাবু চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন, কিন্তু তার পূর্ব্বেই মন্তুর মা তাকে জাপ্‌টে ধ'রে কোলে তুলে নিয়েচেন। হৃদয়বিদারক আকুলকণ্ঠে মন্তু 'আমাল্ পাঁতা' বলে কেঁদে উঠ্‌লো। তার মা 'চুপ, ও-কথা বল্‌তে নেই—ও মা কালীর পাঁঠা' ব'লে তাকে ক্ষিপ্রপদে বারান্দায় নিয়ে গেলেন।

'না, মা কালীর না আমাল্ পাঁতা' বলে মন্তু তার অসংযত কান্নাকে গগনস্পর্শী ক'রে তুল্লে। 'ফের্ ঐ কথা পাজী ছেলে' ব'লে মন্তুর মা মন্তুর মুখের উপর হাত চাপা দিলেন। দুর্দ্দমনীয় রুদ্ধ বেদনায় ফোঁপাতে ফোঁপাতে মন্তুর শ্বাসরোধের উপক্রম হলো।

রাত দুই প্রহরের পর যখন সমস্ত বাড়ী নিশুতি হ'য়ে গেছে, তখন মন্তুর মা তাঁর পার্শ্বশায়িত শিশুকে ধীরে ধীরে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে তার নবনীতুল্য কপোলে অধর স্পর্শ করলেন। 'আহা বাবা আমার—কত বকেচি, কত কেঁদেচ' মৃদুস্বরে এই কথাগুলি তাঁর স্নেহার্ত্ত মাতৃহৃদয়ের নিগূঢ় মর্ম্মস্থল হতে নিঃসৃত হলো। ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ নদীবক্ষের শেষ তরঙ্গের মত মন্তুর কচি বুকখানির উপর দিয়ে একটি স্ফীত উচ্ছ্বাস বয়ে গেল। ত্রস্ত বিস্ময়ে মন্তুর মা বল্লেন—'কি বাবা, এখনো ঘুমোওনি—এখনো জুলচো?' নিরুত্তর মন্তুর বুকখানি এবার দুটি ঘন আন্দোলনে উদ্বেলিত হয়ে উঠ্‌লো—কিন্তু ঐ দুটী আন্দোলনেই যেন দুই সহস্র ভাষায় ব'লে উঠ্‌লো—'আমাল্ পাঁতা—আমাল্ পাঁতা'।

পরদিন প্রত্যুষ হতেই আবার বাড়ীময় কর্ম্মকোলাহল জেগে উঠ্‌লো। সকলেই যে যার তালে ব্যস্ত। মন্তুর মা প্রাতঃস্নান সেরে নিয়ে সেই যে রন্ধনশালায় ব্যাপৃত হয়েচেন আর একবারও বাইরে বেরোবার অবকাশ পান্‌নি।

মধ্যাহ্নসূর্য্যের খর উত্তাপে কয়েকজন নিমন্ত্রিত ব্যক্তি বহির্ব্বাটীতে ব'সে গাত্রোত্থানের প্রতীক্ষা করচেন। দূরস্থ নারিকেল গাছের মাথা হ'তে একটা ক্ষুধার্ত্ত চীলের ঘন ঘন তীক্ষ্ণ চীৎকার দিক্‌দিগন্তে ছড়িয়ে পড়চে। জয়শঙ্করবাবু হুঁকোহস্তে রন্ধনশালার কানাচে গিয়ে মাঝে মাঝে সংবাদ নিচ্চেন 'আর কতদূর বাকি'। মন্তুর মা'র অর্দ্ধসিক্ত আলুলায়িত কুন্তল কোন্‌কালে শুকিয়ে কড়কড়ে হয়ে গিয়েচে। তিনি বারবার তাঁর তৈলহরিদ্রারঞ্জিত বসনাঞ্চল দিয়ে কপোলসঞ্জাত মুক্তাবিন্দুগুলিকে অপসারিত করচেন। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেল যে সকাল হতে মন্তুকে একবারও দুধ খাওয়ানো হয়নি। রন্ধনশালার ভার জনৈকা প্রতিবেশিনীর হাতে সমর্পণ ক'রে তিনি দুধের বাটী নিয়ে মন্তুর খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন—কিন্তু কোথায় মন্তু? কেউ আজ তাকে দেখেনি—কেউ আজ তার সন্ধান রাখে না। বিবৃদ্ধ উদ্বেগে অধীর হ'য়ে তিনি বাড়ীর চতুর্দ্দিকে ছুটে বেড়াতে লাগলেন। শেষে পুকুরধারে গিয়ে দেখেন যে, মন্তু বিষণ্ণ-গম্ভীর মুখে কুলগাছের তলায় বসে আছে—তার কোলের উপর একটি অর্দ্ধভুক্ত কুলের ডাল। 'ও মা গো—এইখানে ব'সে আছিস্? আর আমি সাত রাজ্যি তোকে খুঁজে বেড়াচ্চি। তোর পেটে কি ক্ষিদে লাগে না?' এই ব'লে তিনি মন্তুর রক্তিম গণ্ডস্থলে ঠাস্ করে একটি চড় বসিয়ে দিলেন কিন্তু বসিয়ে দিয়েই চম্‌কে উঠ্‌লেন। তাঁর হাত ছ্যাঁক্ ক'রে উঠ্‌লো কেন? কপালে হাত দিয়ে দেখেন কপালখানা আগুনের মালসার মত ধাঁ ধাঁ করচে। তাড়াতাড়ি পুত্রকে বুকে তুলে নিয়ে তিনি বাড়ী চলে এলেন এবং বিছানায় শুইয়ে দিয়ে তার মাথার উপর সজোরে পাখার বাতাস করতে লাগ্‌লেন।

সারাদিনটা মন্তু নিঝুম হয়ে পড়ে রইলো কিন্তু সন্ধ্যার ঝোঁকে সে মাঝে মাঝে বিছানার উপর উঠে বসতে লাগ্‌লো—এবং আপন মনে বল্‌তে লাগলো—'আমাল্ পাঁতা'। মন্তুর মা কাঁদ-কাঁদস্বরে বল্লেন 'কি বাবা মন্তু'? মন্তু আপন মনেই বলতে লাগ্‌লো—'মা কালীল পাঁতা না, আমাল্ পাঁতা'। জয়শঙ্করবাবু মুখ বিকৃত ক'রে বল্লেন 'হায় হায়, মজালে দেখচি। এখনো বলে আমার পাঁঠা।' মন্তুর মা উৎকণ্ঠা-বিহ্বল ব্যস্ততার সঙ্গে বল্লেন—'ওগো তারিণী কবিরাজকে ডেকে আনো।' অসহিষ্ণুর মত মাথা নেড়ে জয়শঙ্করবাবু বল্লেন 'তারিণী কবিরাজের বাবাও কিছু করতে পার্ব্বে না। এ ত সে জ্বর নয়—এ সাক্ষাৎ মায়ের কোপ।' 'তবে কি হবে?' ব'লে মন্তুর মা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। জয়শঙ্করবাবুও কোঁচার কাপড়ে নেত্রমার্জ্জনা করে বল্লেন—'আর কি হবে? এসো মানসিক ক'রে দেখি।' তখন সেই প্রৌঢ় দম্পতি একত্রে গলায় কাপড় দিয়ে ঊর্দ্ধকরপুটে এই মানসিক করতে লাগ্‌লেন—'মা, বজ্জাত ছেলের অপরাধ মার্জ্জনা করো; আসচে আমাবস্যার দিন আবার জোড়া পাঁঠা দিয়ে তোমার পুজো দোব।'

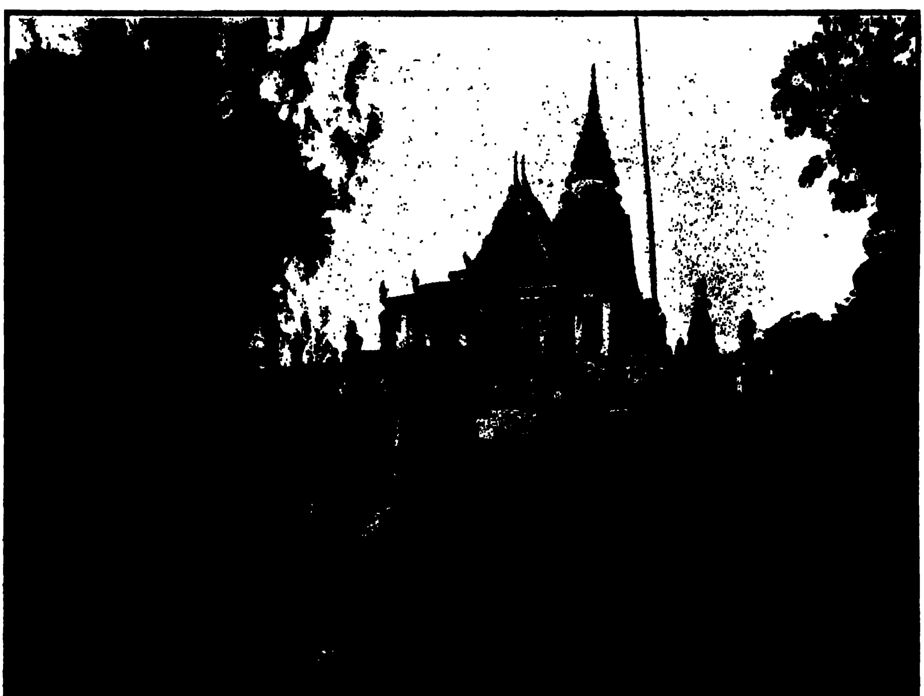


(২)

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী

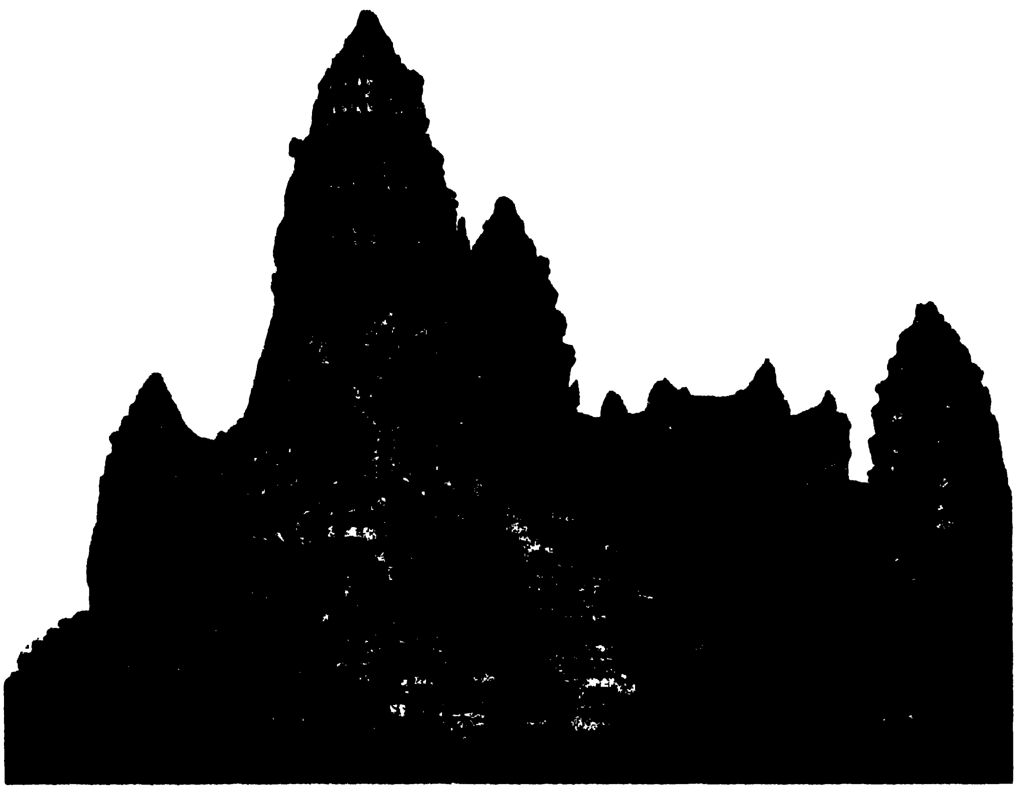
সাইগন্‌ থেকে কম্বোজে যাওয়া নদীপথেই প্রশস্ত। অবশ্য খানিকটা পথ রেলে যাওয়া চলে, কিন্তু তার পর আবার ষ্টীমারেই উঠ্‌তে হয়। এক দিন ভোরে আমরা সাইগন্‌ থেকে বেরিয়ে পড়লাম। ষ্টীমারে বরাবর কম্বোজ পর্য্যন্ত যাওয়া চল্‌বে। তিন দিনের পথ। মে-কং নদী বেয়ে আমরা চলেছি। অনেকে মনে করেন 'মে-কং' —'মাতা-গঙ্গা'রই অপভ্রংশ। হিন্দু ঔপনিবেশিকগণ মাতৃ-ভূমির স্মৃতি জাগিয়ে রাখ্‌বার জন্য নূতন দেশের নদ-নদীর এই সব নূতন নামকরণ করেছিলেন।

কোচীন-চীন ও কম্বোজ নদীমাতৃক বঙ্গদেশের কথা মনে করিয়ে দেয়। কানায় কানায় ভরা নদীগুলি তাদের শাখা উপশাখা ছড়িয়ে প্রদেশটাকে এমন সবুজ ও সজীব ক'রে রেখেছে যে, দেখ্‌লে চোখ তৃপ্ত হয়,—প্রবাসী বাঙ্গালীর মন আনন্দে উচ্ছ্বল হয়ে উঠে। নদীর তটভূমি পর্য্যন্ত



প্নোম্‌-পেন্‌—বৌদ্ধ মন্দির

জল ছাপিয়ে উঠেছে; দু'ধারে ধানের ক্ষেত হাওয়ায় দুয়ে পড়ছে; অদূরে ছোট ছোট গ্রামগুলি চালাঘর নিয়ে নারিকেলবনের ভিতর দিয়ে উঁকি মারছে। অধিবাসীরা প্রধানত নৌকায় চলাফেরা করে, কারণ প্রায়ই জোয়ারের জলে তাদের গ্রামপথগুলি খালে পরিণত হয়। অনেকেই মৎস্যজীবী। তাদের মাছধরার জালগুলির সঙ্গে বাংলার জেলেদের জালের এমন সাদৃশ্য



কম্বোজ—এঙ্কোর-ভাটের ধ্বংসস্তূপ—সম্মুখের দৃশ্য

আছে যে, দেখ্‌লে আশ্চর্য্য হতে হয়। উভয়ের আকৃতির ভিতরও অনেকটা সাদৃশ্য আছে—মনে হয় যেন এক জাতি। অবশ্য আমাদের দেশের 'মালো'-রা যে মালয় মহাজাতিরই একটা শাখামাত্র তা'তে কোনই সন্দেহ নেই। বহু প্রাচীনকাল থেকে এরাই বাংলার সুদক্ষ নাবিক।

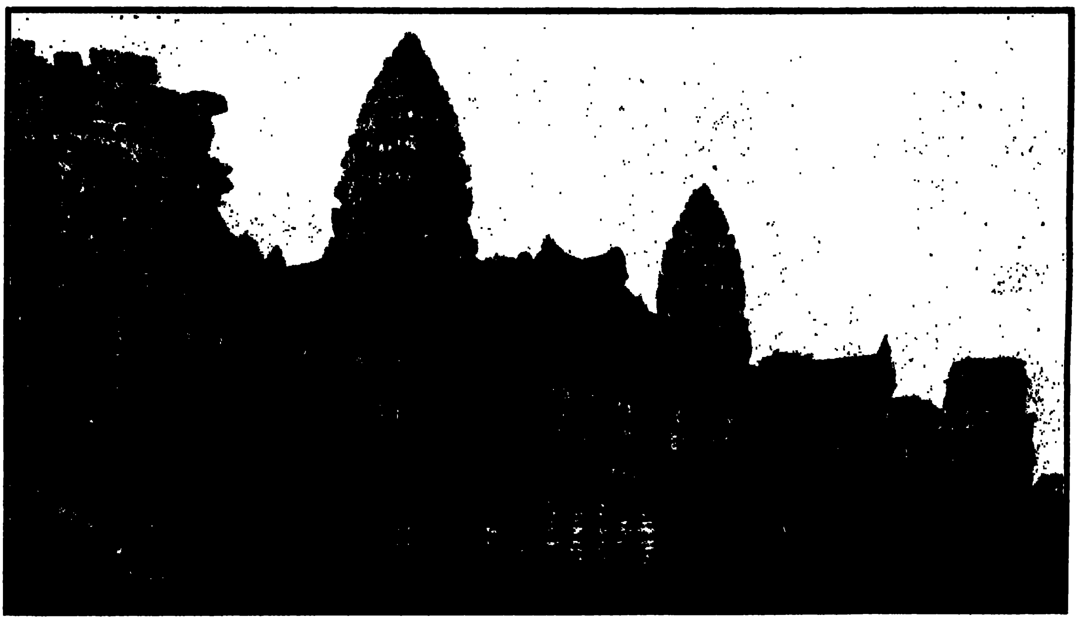
সোণার বাংলার "স্মৃতি-জাগানিয়া" এই নদীপথ দিয়ে দু'দিন চল্‌বার পর আমরা প্নোম্‌-পেনে (Pnom-Penh) উপস্থিত হ'লাম। প্নোম্‌-পেন্‌ বর্ত্তমান কম্বোজের রাজধানী, প্রাচ্যজগতের নানাজাতির বাসস্থান। এখানে ফরাসীদেরও একটা ছোটখাটো উপনিবেশ আছে। আচার্য্য সিলভ্যাঁ লেভির এক ছাত্র এই সহরে থাকেন। ইনি ইন্দোচীনের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনায় বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছেন। এঁর নাম—জর্জ্জ গ্রোলিয়ে (Georges Groslier)। এঁর গৃহেই আমরা সেদিনকার মত অতিথি হ'লাম। এঁর কাজ দেখেও আমাদের খুব শ্রদ্ধা হ'ল। ইনি প্নোম্‌-পেনে একটা আদর্শ মুাজিয়ম্‌ (museum) গড়ে তুলেছেন। কম্বোজের প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনসমূহই এখানে সংগ্রহ ক'রে রাখা

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

হয়েছে। সেই সব আদর্শ নিয়ে নূতন শিল্পীদের কাজ করতে দেওয়া হয়েছে, যাতে পুরাণো শিল্পের আবার নূতন ক'রে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হতে পারে।

প্নোম্-পেন্ সম্ভবতঃ খুব প্রাচীনকাল থেকেই কম্বোজের একটা কেন্দ্রে পরিণত হয়। "প্নোম্" কথার অর্থ 'উচ্চ ভূমিভাগ' বা 'পাহাড়'। প্নোম্-পেনের যে অংশে ফরাসীদের বাস সেটা পাহাড়ের মতই উঁচু। কম্বোজের প্রাচীন ইতিহাসের কথা যখন উঠ্‌বে তখন প্নোম্-পেনের কথাও পুনরায় তুল্‌বো। কম্বোজের রাজপ্রাসাদ প্নোম্-পেনেই অবস্থিত। সেটা প্রদক্ষিণ ক'রে নেওয়া গেল—কারণ প্রদক্ষিণ ছাড়া আর বেশী কিছু করবার উপায় ছিল না। সময় সংক্ষেপ। অধ্যাপক লুই ফিনোর (Louis Finot) চেষ্টায় এখানে একটা পালি বিদ্যাপীঠ (E'cole de l'ali—School of Pali) স্থাপিত হয়েছে। প্রায় শতাধিক ছাত্র এখানে প'ড়ছে। পালিই হচ্ছে বর্ত্তমান কম্বোজে দেবভাষা। কারণ এরা কয়েক শতাব্দী থেকে হীনযান বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ ক'রেছে। এখানে দেখ্‌বার মত একটা বৌদ্ধ-মন্দিরও আছে। মন্দিরটার গঠন একটু নূতন রকমের। কম্বোজের হিন্দু ভাস্করদের প্রভাব এতে পরিলক্ষিত হয়। তা'ছাড়া সবটা পাগোদার (Pagoda) মত ক'রে একটা উঁচু জায়গায় নির্ম্মাণ করা হয়েছে। এর পাশেই একটা ভিক্ষুসংঘের আবাস।

প্নোম্-পেন্ এমনি করে ঘুরে দেখে নিয়ে সেইদিন রাত্রেই আমরা এঙ্কোর রওনা হ'লাম। এঙ্কোর (Angkor—'নগর' কথার রূপান্তর) কম্বোজের প্রাচীন রাজধানী। এখানেই হিন্দুরাজত্বের ধ্বংসাবশেষ—যা দেখ্‌বার জন্য দেশবিদেশ থেকে মানুষ আসে। প্নোম্-পেন্ থেকে রওনা হ'য়ে পরদিন সকালে আমরা একটা বড় হ্রদে এসে প'ড়লাম্। এই হ্রদটার নাম টোন্‌লে সাপ্ (Tonle Sap)। এইখানে মে-কংএর উপধারা এসে প'ড়েছে। অন্যান্য শাখানদীও এখানে জল বহন ক'রে নিয়ে এসেছে।

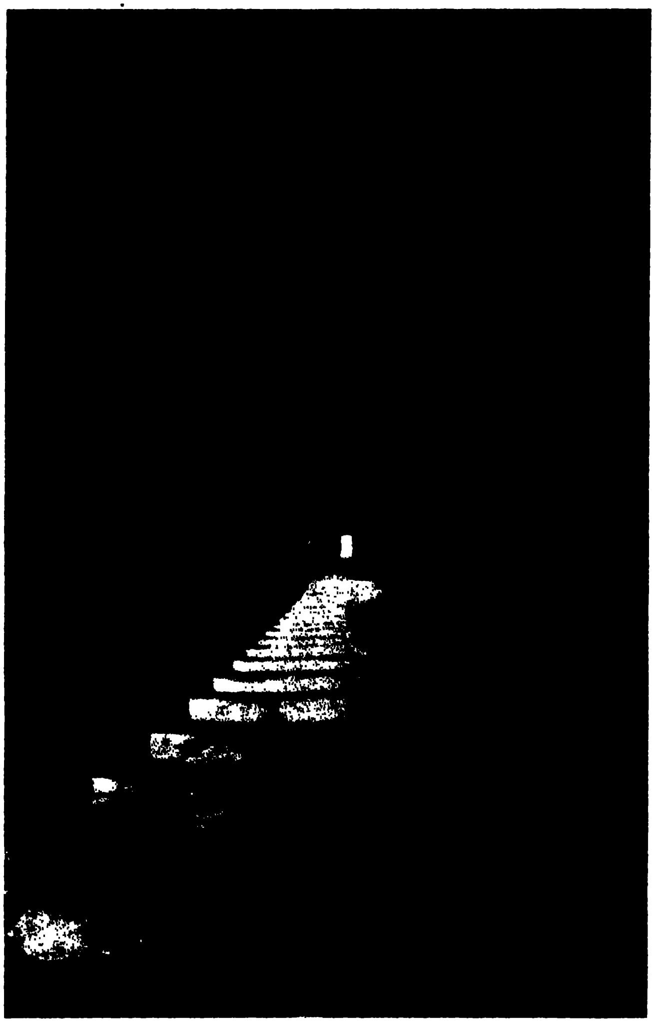


কম্বোজ—এঙ্কোর-ভাটের ধ্বংসস্তূপ—পশ্চাতের দৃশ্য

হ্রদ অতিক্রম ক'রে আমরা সিয়েম্ রীপ্ (Siem Reap) নামক স্থানে গিয়ে পৌছলাম্। এখান থেকে এঙ্কোর যেতে মোটরে প্রায় এক ঘণ্টা লাগে। এঙ্কোরের সব চেয়ে বড় মন্দির এঙ্কোর-ভাটের (Ang-

kor Vat) সামনেই একটী ফরাসী ভদ্রলোকের হোটেল বা বাংলো। এইখানেই এঙ্কোরের যাত্রীরা ওঠেন। এঙ্কোর এখন ধ্বংসে পরিণত। দুর্ভেদ্য বনরাজির ভিতর পুরাণো রাজধানীর রাজপথ ফরাসী পণ্ডিতেরা খুঁজে বের ক'রেছেন ও পরিষ্কার ক'রে সুগম ক'রে দিয়েছেন। মন্দিরের ভিতরকার আগাছা নষ্ট ক'রে মন্দিরগুলিকে সম্পূর্ণ ধ্বংসের মুখ থেকে তাঁরা রক্ষা ক'রেছেন। স্তূপাকার ধ্বংসের মাঝ থেকে এঙ্কোর-ভাটকে বাঁচান হয়েছে। এটী হচ্ছে বিষ্ণুর মন্দির। তা'ছাড়া পুরাণো রাজপ্রাসাদ—এঙ্কোর টোম্‌কে (Angkor Thom) বন পরিষ্কার ক'রে উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাচীন ভাস্কর্য্যের যেটুকুর সন্ধান মেলে সেটুকু ম্যুজিয়মে সংরক্ষিত হয়েছে। বস্তুতঃ ফরাসী পণ্ডিতেরা ভারতের ও কম্বোজের এই লুপ্ত গৌরব উদ্ধারের জন্য গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ যে কাজ ক'রছেন—তা' বিশেষরূপে প্রশংসনীয়। তাঁদের উদ্দেশ্য ও উদ্যম সর্ব্ব জাতির আদর্শ হওয়া উচিৎ।

বর্ত্তমান কম্বোজের কথা বিশেষ ক'রে বলা শক্ত। তবে যেটুকু দেখেছি তা'তে আমার মনে হয়েছে—প্রাচ্যজগতের অন্যান্য দেশ (চীন, আনাম, শ্যাম ইত্যাদি) পাশ্চাত্য সভ্যতার হাওয়ায় যেমন ওলট্‌-পালট্ হচ্ছে ও নূতন আদর্শ গ্রহণ করার জন্য ছুটে চলেছে—কম্বোজের এখনো সে অবস্থা আসেনি। এটা ভাল কি মন্দ তা' জানি না। তবে এর ফলে কম্বোজের ভবিষ্যৎ উন্নতি হয়ত অনেকটা সুদূর-পরাহত হয়ে দাঁড়াবে। ইউরোপের যেখানেই গিয়েছি চীনের, শ্যাম-দেশের ও আনামের ছাত্রদের সঙ্গে দেখা হয়েছে, কিন্তু কম্বোজীয় একটীও দেখিনি। ইউরোপ থেকে যেটুকু গ্রহণ করা দরকার সেটুকু নিতেও কম্বোজীয়দের আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায় না।



এঙ্কোর-ভাটের অলিন্দ

* * *

সিয়েম্ রীপ্ থেকে আমরা যে দিন এঙ্কোরে পৌঁছলাম্ সে দিনটা বিশ্রাম ক'রতেই কেটে গেল। তিন দিন ধরে ষ্টীমারে থেকে আমরা ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলাম—ঘুরে বেড়াবার আর সামর্থ্য ছিল না। এঙ্কোরে আমাদের মোট ছ' দিন থাকবার কথা। ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এঙ্কোরের স্তূপাকার ধ্বংসটা দেখে নিতে হ'বে। অবশ্য তন্ন তন্ন ক'রে দেখ্‌তে গেলে অনেক সময়ের দরকার। ততটা অবসর আমাদের ছিল না। কারণ সমস্ত ইন্দোচীনে মাত্র দু'মাস থাক্‌বার কথা।

ইন্দোচীন ভ্রমণ

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী

এঙ্কোরে আমাদের পথপ্রদর্শক হ'লেন অঁারি মার্শাল (Henri Marchal)। হ্যানয়ের (Hanoi) প্রাচ্য বিদ্যাপীঠের পক্ষ থেকে এঙ্কোরের প্রাচীন কীর্ত্তি সংরক্ষণের ভার নিয়ে ইনি (Conservator) এখানে আছেন। কয়েক বৎসর ধরে অনেক কাজ করেছেন। ভাস্কর্য্যের অনেক লুপ্ত গৌরব এখান থেকে উদ্ধার ও ধ্বংসোন্মুখ মন্দিরগুলিকে দাঁড় করিয়ে রাখ্‌বার মত ব্যবস্থা ইনিই ক'রেছেন। খুব অমায়িক লোক, বেশ দিল-খুস্‌,—যেমন সত্যকার ফরাসীরা হ'য়ে থাকেন। এঙ্কোরে আমরা যে ছ'দিন ছিলাম তা'র ভিতর তিন দিনই এঁর বাড়ীতে চর্ব্ব্য-চোষ্য ক'রে ভূরিভোজন হ'য়েছিল।



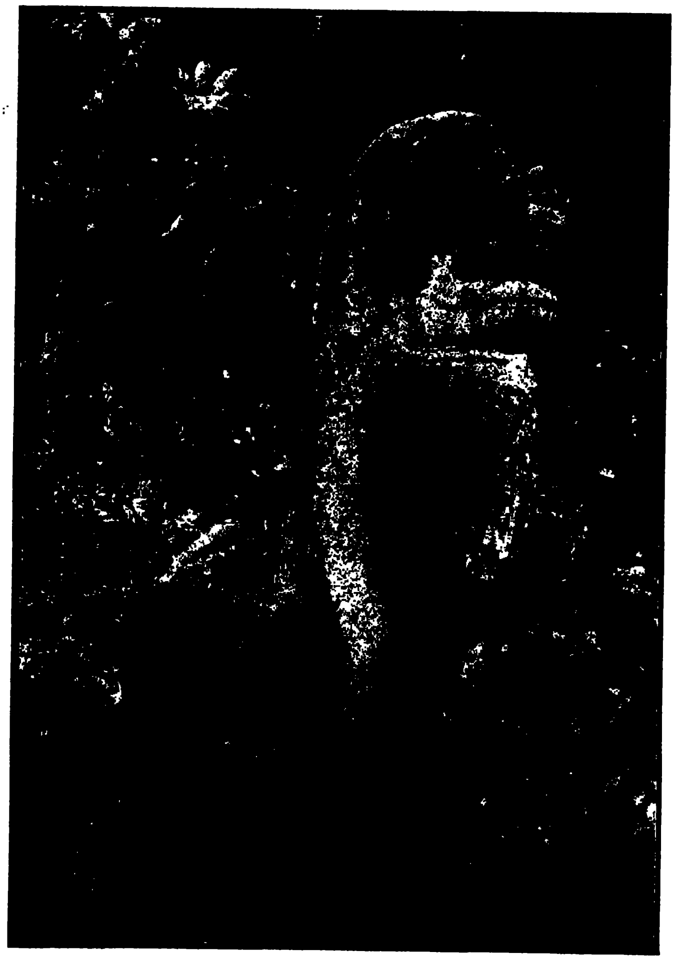
এঙ্কোর-ভাটের ভিত্তিগাত্রে নৃত্যশীলা অপ্সরী

আমাদের হোটেলটা ঠিক এঙ্কোর-ভাটের সাম্‌নেই ছিল। সেখান থেকে এঙ্কোর-ভাটের গগনস্পর্শী মন্দির-চূড়া স্পষ্ট দেখা যায়। মন্দিরের সাম্‌নেটা বেশ চোখে পড়ে। চারিদিকে নারিকেল ও গুবাকের বন মন্দিরটাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। তা'রাই তা'র চিরন্তন সাথী। সাত্‌শো' বছরের উপর এখানে জনমানবের বিশেষ কোলাহল শোনা যায়নি। শ্যামের (Siam) সামরিক অভিযান এখান দিয়ে অনেকবার গিয়েছে। এই বিরাট মন্দির দেখে যে তা'দের মনে কোন ভাবের সঞ্চার হয়েছিল তা'র কোন প্রমাণই পাওয়া যায় না। কারণ ফরাসীদের অধিকারে আস্‌বার পূর্ব্বে এঙ্কোর যখন অনেক দিন ধ'রে শ্যামরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল তখন তা'র ধ্বংসোন্মুখ মন্দিরগুলির কোনো সংস্কার করবার চেষ্টা হয়নি। লোকের বসবাস এখান থেকে একপ্রকার উঠে গেছে। এঙ্কোর-ভাটের পাশেই কিছুদিন হ'তে একটী বৌদ্ধবিহার স্থাপিত হয়েছে। সেখানে কয়েকজন ভিক্ষু বাস করেন। তা'রাই সকাল-সন্ধ্যায় এঙ্কোরের এই বিশাল ধ্বংসরাশির নিস্তব্ধতা দূর করবার বৃথা প্রয়াস করে থাকেন। কিন্তু যে-নগর এক দিন সহস্র সহস্র নাগরিকের কলরবে মুখরিত হয়ে থাকৃত তা'র এই সাত্‌শো' বছরের নিস্তব্ধতা আর ভাঙ্‌বার নয়। দশজন ভিক্ষুর মুখনিঃসৃত বুদ্ধবাণী এঙ্কোরের দুর্ভেদ্য বন-রাজির মধ্যে কোথায় মিলিয়ে যায় কেউ জানে না। পুরাণো রাজপ্রাসাদের প্রাচীর পর্য্যন্তও তা' পৌছায় না। সমস্ত ধ্বংসাবশেষ যেন এক অভিশপ্তপুরীর নিদর্শনের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে।

* * * * * *

এইখানে কম্বোজের প্রাচীন হিন্দুরাজত্বের কথা কিছু বলা আবশ্যক। হিন্দু ঔপনিবেশিকেরা এ-দিকে কোন্‌ সময়ে এসেছিলেন তা' ঠিক জানা না গেলেও অন্যান্য ঐতিহাসিক প্রমাণের সাহায্যে বলা চলে যে, খৃষ্টীয় অব্দের প্রারম্ভেই হিন্দুরা মে-কংএর ধারা বেয়ে কম্বোজ পর্য্যন্ত এসে পৌছান। চীনাদের ইতিহাসে যে-সব তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তা'তে দেখা যায় যে ঐ সময় কৌণ্ডিণ্য নামে এক ব্রাহ্মণ কম্বোজে হিন্দুরাজ্যের ভিত্তিস্থাপনা করেন। 'কম্বোজ' নামের তখনও উৎপত্তি হয়নি। প্রথমে সে-রাজ্যের নাম ছিল 'ফু-নান্‌'। ফু-নান্‌ হচ্ছে "ভ্নোম্‌" বা "প্নোম্‌" কথার চীনা রূপান্তর। কম্বোজের বর্ত্তমান রাজধানী প্নোম্‌-পেনের প্রসঙ্গেই আমরা বলেছি যে 'প্নোম্‌' কথার অর্থ হচ্ছে—"উঁচু স্থান"। 'ফু-নানে'র প্রথম রাজধানী কোথায় ছিল

তা' অনুমান করবার উপায় নেই। তবে মে-কং-এর উপত্যকাতেই যে এই প্রাচীন উপনিবেশের সংস্থাপনা হয়েছিল তা'তে কোন সন্দেহ নেই। এই প্রথম উপনিবেশ স্থাপনের কয়েক শতাব্দী পরেই আর এক দল হিন্দু ঔপনিবেশিক কম্বোজ (বা কম্বুজ) রাজ্যের সৃষ্টি করেন। কম্বোজ প্রথমে 'ফু-নানে'র আধিপত্য স্বীকার ক'রে নিয়েছিল। তার পর খৃষ্টীয় ষষ্ঠ-শতাব্দীর শেষভাগে কম্বোজের রাজা চিত্রসেন মহেন্দ্রবর্ম্মণ 'ফু-নান্' জয় ক'রে কম্বোজের শক্তিবৃদ্ধি করেন। মহেন্দ্রবর্ম্মণের শাসনকালের যে সংস্কৃত লেখ পাওয়া গিয়েছে (৬০৪ খৃঃ অঃ) সেইটাই হচ্ছে কম্বোজের সব চেয়ে প্রাচীন লেখ। এই সময় থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত হিন্দুরাজারা অব্যাহত ভাবে কম্বোজ শাসন করেন। এই সাত্‌শো' বছরের ইতিহাসই হচ্ছে কম্বোজের গৌরবের যুগ। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগেই উত্তরদিক থেকে থাই (Thai) দিগের আক্রমণে কম্বোজের হিন্দুরাজত্বের অবসান হয়। কিছু অন্তর্বিপ্লবও বোধ হয় এই সময় দেখা দেয়। সেই থেকে বর্ত্তমান কম্বোজের সৃষ্টি। থাই (Thai) রাজারাই সেই সময় থেকে তাঁদের উপনিবেশ বিস্তার করেন। 'থাই'দের উৎপত্তি হচ্ছে



এঙ্কোর-টোম্—দ্বারের সম্মুখবর্ত্তী সিংহ

—তিব্বতী ও চীনাদের থেকে। এরা অনেক দিন ধ'রে দক্ষিণ চীনে ও ইন্দোচীনের উত্তর দিকের প্রত্যন্তদেশে বাস ক'রতে থাকে। তারপর খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমেই নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। সেই সময়েই এদের বিভিন্ন শাখা কম্বোজ, শ্যাম, বর্ম্মা, ও আসাম প্রভৃতি দেশ জয় ক'রে নূতন রাজ্যসমূহের স্থাপনা করে। এই সময় থেকে ঐ সব দেশের প্রাচীন হিন্দুকীর্ত্তির ধ্বংস সুরু হয়। কারণ থাইরা (Thai) তখনও তা'দের অসভ্য অবস্থা কাটিয়ে উঠ্‌তে পারে নি। হিন্দু ঔপনিবেশিক বা হিন্দু সভ্যতায় দীক্ষিত কম্বোজীয় ও মালয়দের থেকে তা'রা সভ্যতার সমস্ত উপাদান গ্রহণ ক'রলেও তাদের শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের যথাযথ মূল্য বুঝ্‌তে পারা এই বর্ব্বর বিজেতাদের পক্ষে শক্ত ছিল। সুতরাং এই পুরাতন কীর্ত্তির যথাযোগ্য সম্মান তা'রা কোন দিনই করেনি।

প্রাচীন কম্বোজের রাজধানী অনেকবার স্থানান্তরিত হয়েছিল। সেই সব রাজপুরীর ভগ্নাবশেষ উত্তর কম্বোজের নানাস্থানে দেখা যায়। এ ছাড়া বহু প্রাচীন হিন্দুমন্দিরের নিদর্শনও পাওয়া যায়। সমস্ত ভগ্নাবশেষের মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—কম্পোং চ্যাম্ (Kompong Cham),

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী

খাস্ মে-কংএর তীরে অবস্থিত; বাটি (Bati) ও প্নোম্ চিসর (Ponm-Chisor)—বর্ত্তমান কম্বোজের টা-কিও (Ta-keo) বিভাগে;—এ ছাড়া কম্পোং-টোম্ (Kompong-Thom), প্রা-খান্ (Prah-khan) ও বেং মেলিয়া (Beng Mealea)। কম্পোং-টোমের বাইরের প্রাচীর প্রায় দু'মাইল বিস্তৃত। এ-সব ধ্বংসাবশেষ উত্তর কম্বোজে—বিশাল হ্রদের (Tonle-Sap) নিকটবর্ত্তী প্রদেশেই দেখা যায়। এর ভিতর যেগুলি সব চেয়ে বড় তা' দেখ্‌বার এখনও কোন ব্যবস্থা হয়নি। ধ্বংসাবশেষের ভিতরও এই এঙ্কোর-ভাট্ এখনও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সুতরাং সেইটী ভাল ক'রে দেখ্‌লে প্রাচীন কম্বোজের কীর্ত্তির কিছু ধারণা হয়।

এঙ্কোর কোন্ সময়ে রাজধানীতে পরিণত হয় তা' ঠিক জানা যায় না। তবে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথমেই (৮০২ খৃঃ অঃ) কম্বোজের রাজা জয়বর্ম্মণ বর্ত্তমান এঙ্কোরের অনতি-দূরে প্রা-খান (Prah-khan) নামক স্থানে তাঁর রাজ-পুরী নির্ম্মাণ ও বসবাস আরম্ভ করেন। তাঁর অধস্তন চার পুরুষ পরে, রাজা যশোবর্ম্মণের (৮৮৯ খৃঃ অঃ)



এঙ্কোর-টোম্—ভিত্তিগাত্রে ভাস্কর্য্য—শোভাযাত্রা

চারিদিকে এমন দুর্গম বন উঠেছে যে সেগুলিকে সুগম করতে অনেক পরিশ্রম ও সময়ের দরকার।

* * *

কম্বোজের প্রাচীন কীর্ত্তির ভিতর সব চেয়ে যা প্রসিদ্ধ—এঙ্কোর—সেটি নিয়ে এ পর্য্যন্ত বেশী কাজ হয়েছে এবং তা'র পথঘাটগুলি সুগম করা হয়েছে। কম্বোজের পুরাতন কীর্ত্তি যাঁরা দেখ্‌তে আসেন তাঁদের সব চেয়ে প্রধান আকর্ষণ হ'ল—এঙ্কোর-ভাট্। শুধু কম্বোজ কেন, সমস্ত জগত খুঁজ্‌লেও তার তুলনা মিল্‌বে না। কম্বোজের সমস্ত ধ্বংসের সময়, এঙ্কোরে রাজধানী স্থাপিত হয়। এই রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ হচ্ছে বর্ত্তমান এঙ্কোর-টোম্ (Angkor-Thom)। এই নূতন রাজধানীর নামকরণ হয় যশোধর-পুর। যশোধরপুর যখন এঙ্কোরের প্রথম সূচনা, তখন তা'র ধ্বংসাবশেষের কথাই আগে বল্‌ব।

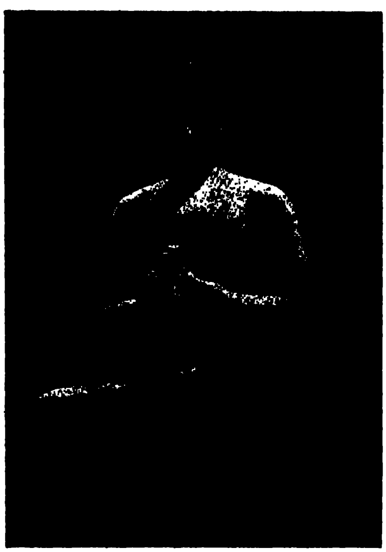
এই অভিশপ্ত যশোধরপুরের ধ্বংসের অবস্থাই হচ্ছে সব চেয়ে শোচনীয়। একদিন রাজপুরী ছিল ব'লে অনেক ঝড় এর বুকের উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে। বিজেতার আক্রোশ এই রাজপুরীর উপর বহুবার পড়েছিল। লুঠ্‌তরাজের ত কথাই

ছিল না। হাতীর সাহায্যে প্রাসাদের স্তম্ভশিখর ও চারু-শিল্পকার্য্য বিজেতারা যে ইচ্ছা ক'রে নষ্ট ক'রেছিল তা'র যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এ'ছাড়া সাত্‌শো' বছর ধ'রে এর ভিতর দস্যুর গুপ্তধনের তল্লাস তো আছেই। বিগত শতাব্দীতে যখন শ্যামের সঙ্গে কম্বোজের যুদ্ধ হয়, তখন শ্যামদেশের অভিযানের প্রধান আস্তানা এখানেই করা হয়, কারণ এমন সুরক্ষিত স্থান আর পাওয়া যায়নি।

এই যশোধরপুরের (Angkor-Thom) নগরপ্রাকারের চারিধার দিয়ে একটী সুপ্রশস্ত খাত্‌ গিয়েছে। এখন তা'র অনেক স্থানে ভরাট হয়েছে, কিন্তু পূর্ব্বে এই খাত্‌ প্রায় বারো হাতেরও বেশী গভীর ছিল। এই খাত্‌ পার হ'তে হ'ত সেতুর উপর দিয়ে। সেতুর দু'ধারের বেদিকা (Railing) পরিশোভিত হ'য়েছিল সাগরমন্থনের চিত্র দিয়ে। নাগরাজকে অবলম্বন ক'রে বিশালকায় দেবাসুরগণের মূর্ত্তি দু'দিকে গড়ে তোলা হ'য়েছিল। এই সব মূর্ত্তির অনেকগুলিই এখন ধ্বংস পেয়েছে, দেবতাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত হ'য়ে রয়েছে। নাগরাজের লেজ খ'সে গিয়েছে—ফণা বিগতশ্রী হয়েছে। সংস্কারের অভাবে সেতু ধ্বংসোন্মুখ।

* * *

এই সেতু পার হ'য়ে আমরা নগর-প্রাচীরের তোরণে একদিন সকাল বেলা এসে অবাক হয়ে দাঁড়ালাম। বিশাল প্রাকার—প্রায় ৯ মাইল ধ'রে চতুষ্কোণ যশোধরপুরকে বেষ্টন ক'রে রয়েছে। পাঁচটী দ্বার দিয়ে এই নগরে প্রবেশ করা যেত। পূর্ব্বদিকের দুইটী দ্বার—প্রায় পাশাপাশি।



একটী সিংহদ্বার বরাবর রাজপ্রাসাদের সাম্‌নের চত্বরে পৌঁছাবার জন্য, অন্যটী নগরের ঠিক মধ্যবর্ত্তী দেবমন্দির বায়নে (Bayon) পৌঁছাবার জন্য। এ'ছাড়া অন্য তিন দিকে সমান্তরালভাবে তিনটী দ্বার আছে। তার কোনটাই সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়নি। আংশিকভাবে নষ্ট হ'লেও তা'কে সংস্কার ক'রে কোনমতে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। পাঁচটি দ্বারই এক মাপে নির্ম্মিত হয়েছিল। দরজার উভয় পার্শ্বে শান্ত্রীদের ঘর ছিল—দেখ্‌লে স্পষ্টই বোঝা যায়। দরজার উপরটা দেখ্‌লে আশ্চর্য্য হ'তে হয়। পাথরে ক্ষোদিত বিশাল চতুর্ম্মুখমূর্ত্তি। তার উপর তোরণের চূড়া তোলা হয়েছে। এ মূর্ত্তি দেব-পিতামহ ব্রহ্মার বলেই মনে হয়। কিন্তু পিতামহের ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটেছে। যে-নগরতোরণের তিনি শোভাবর্দ্ধন করতেন সেখান দিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী আর কোন শোভাযাত্রা যায়নি। যে-নগরের চার দিকে তাকিয়ে তিনি নাগরিকগণের শুভকামনা করতেন ও তাদের ইষ্টলাভের সহায় হতেন, সে-নগরের রাজপুরী বিজাতীয় শত্রুর আক্রমণে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। বায়নের (Bayon) মন্দিরচূড়া মাটীর উপর লুটিয়ে প'ড়েছে। অনেক শতাব্দী ধ'রে সেখানে আর মঙ্গলঘণ্টা বাজেনি। চতুর্ম্মুখের চারিটি মুখও হতশ্রী হয়েছে। মাথার মুকুট প্রাচীর-দ্বারে প'ড়ে বর্ব্বর বিজেতার পদতলে চুরমার হয়ে গেছে। তাই লতাগুল্ম এসে সে-মুখকে ঢেকে ফেলেছে, দু'পাশ থেকে গাছ এসে তা'র ডালপালা নিয়ে সে-মুখকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছে—লোকলজ্জা থেকে সে-মুখকে অন্তরাল ক'রে রাখ্‌বে বলে

(ক্রমশঃ)

সতী

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

২

সুরমার শরীরের অবস্থা বড়ই খারাপ হইয়া পড়িল দেখিয়া ডাক্তারের পরামর্শে ভূপতি তাহাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিল। এদিকে দুই ভাইয়ে তরলার সন্ধান করিতে লাগিল।

ভূপতির এক সহপাঠী বন্ধু ছিল—বিনায়ক। বিনায়ক অসাধারণ প্রতিভাবান, কিন্তু পরীক্ষা পাশ করিবার জন্য তার বিন্দুমাত্র চেষ্টা বা উৎসাহ ছিল না। তাই সে সবগুলি পরীক্ষায় পাশ করিয়া গেলেও কোনটাতেই বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। কলেজের পাঠ শেষ করিয়া সে সমস্ত বন্ধুকে অবাক করিয়া দিয়া ঢুকিল থিয়েটারে—অভিনেতা হইয়া।

বিনায়কের স্বভাবচরিত্র কলেজে থাকিতে খুব ভাল ছিল; কিন্তু ভূপতির জানা ছিল, সে একটি বিবাহিতা মেয়েকে ভালবাসে। তার বিবাহে মন নাই দেখিয়া তার আত্মীয়-স্বজনেরা চঞ্চল হইয়া একটা ভালরকম বিবাহ দিবার উদ্যোগ করিলেন। বিনায়ক বাড়ীর সকলের সঙ্গে ভয়ানক চটাচটি করিয়া শেষে একদিন হঠাৎ গৃহত্যাগ করিয়া গেল। মাসখানেক বাদে দেখা গেল, সে একটা প্রসিদ্ধ থিয়েটারে একজন প্রধান অভিনেতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ ক্ষেত্রে সে অসাধারণ সুখ্যাতি অর্জ্জন করিল, কিন্তু সে বিবাহ করিল না।

বিনায়ক থিয়েটারে যাওয়ার সময় ভূপতি দেশে ছিল। সে বিনায়ককে তিরস্কার করিয়া একখানা চিঠি দিয়াছিল। তার উত্তরে বিনায়ক লিখিয়াছিল, "তুমি তোমার নীতিশাস্ত্রের ছোট মাপকাটি সম্বল করিয়া যে সব বিষয়ে কিছুই জান না সে সম্বন্ধে কোনও মত প্রকাশ করিতে সাহসী হইও না। আমি তোমার বা তোমাদের কারও চেয়ে ছোট নই।"

তখন হইতে বিনায়কের সঙ্গে ভূপতির ছাড়াছাড়ি। কলিকাতায় ফিরিয়া ভূপতি ঘৃণায় তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নাই।

এখন বিপন্ন হইয়া ভূপতি বিনায়কের শরণাপন্ন হইল। সকলেই বলিতে লাগিল যে তরলাকে বোধ হয় কেহ চুরি করিয়া কুস্থানে বিক্রয় করিয়াছে; এমন ব্যাপার কলিকাতায় প্রায়ই ঘটে। পুলিসকে দিয়া ভূপতি বহু বারবনিতার বাড়ীতে খানাতল্লাসি করাইয়াছিল, কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। তখন তার মনে হইল, গোপনে সন্ধান করিলে হয় তো তরলার খোঁজ পাওয়া যাইতে পারে। তাই ভূপতি বিনায়কের শরণাপন্ন হইল।

বিনায়ক এখন আর শুধু অভিনেতা নয়, সে নিজেই একটা থিয়েটারের কর্ত্তা। দিন রাত সে থিয়েটার লইয়া মাতিয়া আছে। থিয়েটারে ছাড়া তার সঙ্গে দেখা হওয়া অসম্ভব; তাই ভূপতি 'অলকা থিয়েটারে' গিয়া বিনায়কের সঙ্গে দেখা করিল।

ভূপতি যখন থিয়েটারে পৌঁছিল তখন একটা নূতন নাটকের মহলা চলিতেছে। ষ্টেজের উপর রিহার্সাল হইতেছে, বিনায়ক হাত-পা নাড়িয়া বক্তৃতা করিয়া অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের তোতা পাখীর মত করিয়া শিখাইতেছে। যারা অভিনয় করিতেছে তাদের চারিপাশে

অন্যান্য স্ত্রী-পুরুষেরা দাঁড়াইয়া নিজ নিজ অবসরের প্রতীক্ষায় আছে।

এতগুলি পতিতা নারীর সান্নিধ্যে আসিয়া ভূপতির মনটা কেমন কাঁপিয়া উঠিল। সে অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিল, অগ্রসর হইতে সাহস করিল না। সে লক্ষ্য করিল, উইঙ্গের আড়ালে দাঁড়াইয়া দুইটি নারী পরস্পরকে ইঙ্গিত করিয়া হাসিয়া লুটোপুটি খাইতেছে—সে আন্দাজ করিল তারা তাকে লক্ষ্য করিয়াই হাসিতেছে। ইহাতে সে আরও অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। বিনায়ক তখন ব্যস্ত ছিল, সে কিছুক্ষণ ভূপতির দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারিল না। সেই কয়েক মিনিট যেন ভূপতির কাছে কয়েক যুগ বলিয়া মনে হইল।

বিনায়কের অবসর হইলে সে ভূপতিকে লইয়া তার ঘরে গেল। ভূপতি অবরুদ্ধকণ্ঠে তার কাহিনী বলিয়া গেল। বিনায়ক শুনিয়া দুঃখিত হইল, তবু এই অবসরে ভূপতিকে একটা খোঁচা দিতেও ছাড়িল না।

সে বলিল, "After all, থিয়েটারওয়ালাদের দিয়েও কাজ হয়, কি বল? যাক্ গে, আমি যথাসাধ্য তোমাকে সাহায্য ক'রতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তুমি আমার কাছে যতটা আশা করছো ততটা পারবো না। তুমি হয়তো মনে করো যে যত কুস্থানে আমি ঘুরে বেড়াই। অবশ্য আমি যে তোমার মত নির্ম্মলচরিত্র একথা ব'লতে পারি না। কিন্তু ততটা ঠিক নয়। যা হোক আমি তোমাকে ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।"

বলিয়া সে এককড়ি নামে একটি লোককে ডাকিল। এই এককড়ি বিনায়কের থিয়েটারে অভিনেত্রী এবং নর্ত্তকী জোগাড় করে। সেই উপলক্ষে তার সকল অভিনেত্রী-পল্লীতে গতিবিধি এবং ঐরূপ প্রায় সকল গৃহেই আত্মীয়তা আছে। লোকটির চেহারা শুষ্ক কাষ্ঠবৎ, অনেক রকমের নেশা ও অত্যাচারের ফলে যৌবন অতিক্রান্ত হইবার পূর্ব্বেই এ দশা হইয়াছে। তার পরণে ময়লা একখানা কাপড় এবং গায়ে ছিটের কোট।

এককড়ি আসিলে বিনায়ক তাহাকে ভূপতির কাহিনী বলিয়া বলিল, "তোমাকে এর একটা হিল্লে ক'রে দিতে হ'বে, এককড়ি। তুমি সন্ধান ক'রে যদি কোনও খানে একটি নূতন আট-নয় বছরের মেয়ে দেখতে পাও তবে একদিন এই ভদ্রলোককে নিয়ে গিয়ে দেখাবে। বক্শিসের ত্রুটি হ'বে না—ভূপতিবাবু লক্ষপতি, টাকা খরচ ক'রতে কুণ্ঠিত নন।"

"দেখুন বাবা," বলিয়া সেই সময়ে সেই ঘরে একটি মেয়ে ঢুকিয়াই ভূপতিকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।

বিনায়ক বলিল, "কিরে বিলাস, কি চাই?"

বিলাসিনী ওরফে বিলাস বিবির বয়স বছর কুড়ি, অল্পদিন হইল থিয়েটারে নামিয়াছে, কিন্তু ইহারই মধ্যে তার বেশ নাম হইয়াছে। বিনায়ক ইহার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট কেননা সে দেখিয়াছে যে বিলাস মরুভূমির মধ্যে ওয়েশিস সদৃশ। যে সব মেয়েরা থিয়েটারে অভিনয় করে তাদের অধিকাংশেরই শিক্ষাদীক্ষা অথবা স্বাভাবিক অভিনয়-শক্তি মোটেই নাই, তোতাপাখীর মত 'পার্ট' শিখিয়া অভিনয় করে মাত্র। ইহাদিগকে শিখাইতে শিক্ষকদের গলদঘর্ম্ম হইতে হয়, আর প্রথম কয়েক রাত্রি যতক্ষণ ইহারা ষ্টেজের উপর থাকে ততক্ষণ ম্যানেজার প্রভৃতি সকলে কণ্টক-শয্যায় শুইয়া থাকে, না জানি ইহারা কখন কি করিয়া ফেলে। কিন্তু বিলাস বুদ্ধিমতী, তার লেখাপড়া বেশ জানা আছে, আর আছে স্বাভাবিক অভিনয়-চাতুর্য্য। কোনও একটা 'পার্ট' পাইলে সে তার অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে এবং অল্প শিক্ষায় অনায়াসে সুনিপুণ অভিনয় করিতে পারে। উপরন্তু তার রং খুব ফরসা না হইলেও দেখিতে সে সুন্দর। তার মুখশ্রী ও সমস্ত দেহের মধ্যে এমন একটা লাবণ্য আছে যাহাতে চট্ করিয়া দর্শকের মন তার প্রতি অনুকূল করিয়া তোলে। তাই বিনায়ক বিলাসকে তার নূতন নাটকের শ্রেষ্ঠ অংশের অভিনয়ের জন্য মনোনীত করিয়াছিল।

বিলাস বলিল, "না, ঐ নদীর সীনে ড্রেসের কথা ব'লতে এসেছিলাম, তা এখন থাক্।"

বলিয়া বিলাস চলিয়া গেল। ভূপতি নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে তার দিকে মুগ্ধ হইয়া চাহিয়াছিল। ভূপতি দেখিল বারাঙ্গনা বলিতে যে লজ্জাহীনা নারীর সে কল্পনা

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

করিয়াছিল, বিলাসের মূর্ত্তি বা বাহ্য ব্যবহারে তার চিহ্নমাত্রও নাই। তার মুখশ্রীতে একটা কমনীয়তা আছে যা' ভদ্র ঘরের মেয়ের মুখেই দেখিতে পাওয়া যায়। তা' ছাড়া হঠাৎ অপরিচিত পুরুষের কাছে আসিয়া সে যে সলজ্জ কুণ্ঠার সহিত চিত্রার্পিতবৎ দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহা এই শ্রেণীর নারীর ভিতর সম্ভব বলিয়া এতদিন ভূপতি কল্পনাও করিতে পারে নাই। তাই সে মুগ্ধ হইয়া চাহিয়াছিল!—কিন্তু পরক্ষণেই সম্পূর্ণরূপে আত্মসংবরণ করিয়া লইল। তার মনে হইল যে ইহার দিকে এক মুহূর্ত্তের জন্য দৃষ্টি দিয়াও সে দারুণ অপরাধ করিয়াছে।

বিনায়ক বলিল, "তুমি তা' হ'লে এককড়ির সঙ্গে কথা কও, আমি যাই। আজকে বড় ব্যস্ত আছি।" বলিয়া সে উঠিয়া চেয়ে গেল।

বিলাসের প্রতি ভূপতির মুগ্ধ দৃষ্টি এককড়ির চক্ষু এড়ায় নাই। তা ছাড়া সে শুনিল ভূপতি বড়লোক। তার মনে হইল এ একটা মনের মত শিকার বটে।

বিনায়ক চলিয়া গেলে এককড়ি ভূপতিকে তার ভগ্নীর চেহারা, চুল, চোখ ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রশ্ন করিল। তারপর বলিল, "আমার যেন মনে হচ্ছে একটি স্ত্রীলোকের কাছে ঠিক এমনি একটি মেয়ে দেখেছি। আগে তাকে কোনও দিন দেখিনি, সে দিন হঠাৎ গিয়ে তাকে দেখি।"

ব্যগ্রভাবে ভূপতি বলিল, "কোথায় দেখেছ বল! আমাকে নিয়ে চল সেখানে।"

এককড়ি তাহাকে থামাইয়া বলিল, "অত ব্যস্ত হবেন না বাবু, এ তাড়াতাড়ির কর্ম্ম নয়। সেই মেয়েই যদি হয় তা'হলে বের করা ভারি শক্ত হবে। খুব সমঝে না চল্‌লে তাকে কোথায় যে লুকোবে তা খুঁজেও পাবেন না।"

তারপরে সে ক্রমে ক্রমে তার প্রস্তাব প্রকাশ করিল। সে বলিল সে ভূপতিকে প্রেমাকাঙ্ক্ষীরূপে সেই স্ত্রীলোকের কাছে লইয়া যাইবে। সেখানে গেলে ভূপতিকে কি ভাবে ব্যবহার করিতে হইবে সে সম্বন্ধে তাহাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উপদেশ দিল। তারপর প্রসঙ্গক্রমে এককড়ি তার মেয়ের গান শুনাইবার প্রস্তাব করিবে, তাহা হইলেই সব ঠিক হইয়া যাইবে। যদি এই মেয়েই সে হয় তাহা হইলে ভূপতি সে মেয়ের জন্য একটা উপহার লইয়া যাইবে, দুয়ারে পুলিস প্রস্তুত থাকিবে—আর কোনও গোল হইবে না।

ভূপতি সম্মত হইল এবং সেই স্ত্রীলোকটির সঙ্গে বন্দোবস্ত করিবার জন্য এককড়ির প্রস্তাব অনুযায়ী তাহাকে একশত টাকা দিয়া গেল।

উঠিবার সময় ভূপতি দেখিতে পাইল বিলাস দ্বারের বাহিরে দূরে দাঁড়াইয়া অতি সন্তর্পণে তাহাকে দেখিতেছে। চোখোচোখি হইতেই বিলাস লজ্জিত হইয়া পলায়ন করিল।

ভূপতি চলিয়া গেলে বিলাস সেই ঘরে ছুটিয়া আসিয়া এককড়িকে বলিল, "এ বাবুটি কে এককড়ি দা' ?"

"কর্ত্তার বন্ধু, ভারী বড়লোক। চাও একে ?"

"মন্দ কি।"

"কি দেবে বল ? কাল রাত্তিরেই পৌঁছে দিচ্ছি।"

"কালই ?"

"হাঁ, কালই। তোমাকে চোখে লেগেছে ও বাবুর; তা'ছাড়া আমি যে ফাঁদ পেতেছি তা' থেকে আর ওর ছাড়ান নেই। আমায় কিন্তু তিন দিন ভরপেট খাওয়াতে হ'বে বিলাস বিবি,—বাজে মাল নয়, হোয়াইটহর্স।"

"আচ্ছা, তাই হ'বে।"

পরদিন রাত্রি আটটার সময় ভূপতি এককড়ির সঙ্গে বিলাসের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। বাড়াটি একটা নামজাদা কু-পল্লীর ভিতর। সে বাড়ী বিলাসের মায়ের; নীচের তলায় কতকগুলি বারাঙ্গনা-ভাড়াটিয়া থাকে, উপরে থাকে বিলাস একা।

সে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে ভূপতির বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল, চৌকাটের উপর পা বাড়াইতে সে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। এককড়ি পাশে দাঁড়াইয়া তাহাকে চাপাগলায় সর্ব্বদা উৎসাহিত করিতেছিল। এমনি করিয়া সে বিলাসের ঘরে গিয়া পৌঁছিল।

একজন ওস্তাদ তখন বিলাসকে গান শিখাইতেছিল।

ভূপতিকে বাহিরে দাঁড় করাইয়া এককড়ি তাহাকে খবর দিতেই বিলাস ওস্তাদকে বিদায় করিয়া দিয়া দুয়ারে আসিয়া মধুরকণ্ঠে ডাকিল, "আসুন!" সেই কণ্ঠস্বর এবং সেই কমনীয় মূর্ত্তি ভূপতির মাথা একেবারে ঘুরাইয়া দিল। ভূপতি আসিয়াছিল প্রেমিকের অভিনয় করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া—তাহাতেই সে ভয়ে মরিতেছিল, এখন বিলাসকে সম্মুখে দেখিয়া বুক একটা অনির্ব্বচনীয় ভয়ে ও পুলকে ভীষণভাবে কাঁপিয়া উঠিল। তার মনে হইল বুঝি বা তার সর্ব্বনাশ উপস্থিত!

সে অত্যন্ত সন্ত্রস্ত ও সঙ্কুচিত হইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। ঘরখানি খুব বড় নয়। সমস্ত ঘর-জোড়া একটা ধপ্‌ধপে ফরাস পাতা আর তার চার ধারে মোটা মোটা তাকিয়া। ফরাসের উপর কয়েকটা বাদ্যযন্ত্র অযত্নবিন্যস্ত হইয়া পড়িয়া আছে।

বিলাস ভূপতিকে হাত ধরিয়া আনিয়া বসাইল, ভূপতির সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। একটা তাকিয়া তার পিঠের দিকে ঠেলিয়া দিয়া, পানের বাটা বাড়াইয়া গড়গড়ার নলটা তার হাতে দিয়া, বিলাস একটু দূরে সন্ত্রস্তভাবে বসিয়া রহিল। ভূপতিকে এককড়ি যতকিছু শিখাইয়াছিল সব সে ভুলিয়া গেল, বহুচেষ্টা করিয়াও একটা কথাও বলিতে পারিল না। বিলাসও কোনও কথা বলিল না, শুধু চক্ষু নত করিয়া বসিয়া রহিল।

এককড়ি তখন বলিল, "বিলাস বিবি, একখানা গান শোনাও বাবুকে।"

তখন বিলাস মৃদু হাসিয়া তার সম্মোহন কটাক্ষ হানিয়া বলিল, "গান শুনবেন? কি গাইব?"

ভূপতি এতক্ষণে বলিবার মত একটা কথা পাইয়া অতিরিক্ত উত্তেজনার সহিত বলিল, "যা' আপনার ইচ্ছা।"

এককড়ি একটা অসঙ্গত গানের ফরমায়েস করিল; বিলাস লজ্জিতভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "ও-গান আমি জানি না।" বলিয়া সে হারমোনিয়ম সংযোগে গাহিল,

"যদি এসেছ, এসেছ, এসেছ বঁধু হে
দয়া ক'রে কুটীরে আমারি,
কি দিয়ে তুষিব তুষিব তোমারে
বুঝিতে না পারি।" ইত্যাদি

বিলাসের কণ্ঠ ছিল অতি মধুর, আর ভূপতির মন ছিল অত্যন্ত নরম। কাজেই এ সঙ্গীতে ভূপতির অন্তরের ভিতর একটা প্রচণ্ড আলোড়ন লাগিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে তার গলা শুকাইয়া আসিল। সে অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বসিয়া গড়গড়া টানিতে লাগিল; গান শেষ হইলে অস্ফুটকণ্ঠে বলিল, "বাঃ বেশ।"

এককড়ি তখন বলিল, "কিছু মালটাল আন্‌তে দেব?"

ভূপতি শিক্ষামত বলিল, "দাও," বলিয়া কুড়িটা টাকা ফেলিয়া দিল, এককড়ি তাহা লইয়া বাহিরে গেল।

তখন দু'জনে একলা পড়িয়া বড় বিপদে পড়িল। নানারকম ভয় মোহ উদ্বেগ আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদির আলোড়নে ভূপতির চিত্ত বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল। তা'ছাড়া এ অবস্থায় সে অনভ্যস্ত। তাই তার মুখ দিয়া কোনও কথা বাহির হইল না। বিলাসও কি জানি কেন, কোনও কথা খুঁজিয়া পাইল না। গণিকা হইলেও সে ইতর নয়; তার বেশ সম্ভ্রমজ্ঞান আছে, বিদ্যাবুদ্ধিও আছে। আমোদপ্রমোদ হিসাবে সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকের গায় পড়িয়া ভাব করিবার মত মেয়ে সে নয়। তাই সেও এ অবস্থায় কিছু বলিতে পারিল না।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর বিলাস ভূপতির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল।

তখন ভূপতি ধীরে ধীরে নিজের পরিচয় দিল। তারপর ভাইয়ের পরিচয়ও দিল। এমনি দুই-চারিটা প্রশ্নোত্তর হইতেই এককড়ি দুই বোতল মদ ও সোডা লেমনেড লইয়া আসিল। সে নিজহাতে মদ ঢালিয়া ভূপতিকে দিল, বিলাসকেও দিল। বিলাস বলিল, "আমাকে আর কেন দিচ্ছ এককড়ি-দা" তুমি খাও।"

এককড়ি তাহাকে ইসারা করিল, চোখ ঠারিল, কিন্তু বিলাস কিছুতেই মদ ছুঁইল না। তখন এককড়ির অনুরোধে ভূপতি তাকে খাইতে বলিল। অনেক সাধ্য-সাধনায় সে গেলাসটা মুখের কাছে লইয়া সামান্য একটু ওষ্ঠাগ্রে স্পর্শ করিয়া রাখিয়া দিল; বলিল, "আপনার অসম্মান করবো না তাই একটু ছুঁলাম, নইলে

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

মদ আমি খাই না।—আপনি বোধ হয় বিশ্বাস ক'রছেন না—কিন্তু সত্যি খাই না।"

ভূপতি ইতিমধ্যে নির্ব্বিবাদে সমস্ত গেলাস খাইয়া ফেলিয়াছিল। তার খাইতে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইল কিন্তু তবু কর্ত্তব্যবোধে সে খাইয়া ফেলিল।

এককড়ি ভূপতিকে বলিয়াছিল যে মদ খাওয়ার অভিনয় না করিলে কাজ হাসিল হইবে না, এবং সে তাহাকে আশ্বাস দিয়াছিল যে মাত্র এক আউন্স পোর্ট লেমনেড দিয়া সে প্রস্তুত করিয়া দিবে—তাহাতে নেশাটেশা কিছু হইবে না। সে গেলাসে যাহা ঢালিয়াছিল তাহা দুই আউন্সের কিছু বেশী হইবে, ভূপতি সে সব লক্ষ্য করে নাই—সে অন্য ভাবনায় ব্যস্ত ছিল। এবং যে মদ সে ঢালিয়াছিল তাহা খাঁটি পোর্ট নয়, এককড়ির স্বহস্ত-প্রস্তুত একটি তীব্র 'পাঞ্চ'।

এক গেলাস মদ খাওয়ার পর ভূপতির মনের অস্বস্তি কাটিয়া গেল, সে বেশ স্ফূর্ত্তি বোধ করিতে লাগিল। তখন সে বিলাসের সঙ্গে রহস্যালাপ করিতে আরম্ভ করিয়া দিল এবং ক্রমে তার কথাগুলি একটু জড়াইয়া আসিল।

ইতিমধ্যে এককড়ি আর এক গেলাস মদ প্রস্তুত করিয়া তাহার সম্মুখে ধরিল। বিলাসের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে সম্পূর্ণ অন্যমনস্কভাবে তাহাও নিঃশেষ করিয়া ফেলিল। তারপর আর কোনও পরদা রহিল না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ভূপতি ভয়ানক মত্ত হইয়া গুরুতর রূপে অসুস্থ হইয়া পড়িল। বিলাস একটু ভয় পাইয়া গেল। সে এককড়িকে বলিল, "তুমি বড় নচ্ছার, এককড়ি। মদ খাওয়া এঁর অভ্যাস নেই, এঁকে মিছামিছি খাওয়াতে গেলে কেন বল দেখি?"

তারপর এককড়ির সহায়তায় সে ভূপতির মাথায় জল ঢালিয়া তাকে বিছানায় শোয়াইয়া দিল। ভূপতি কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলে বিলাস এককড়িকে বিদায় করিয়া দিয়া, নিজে বসিয়া ভূপতিকে বাতাস করিতে লাগিল। ক্রমে ভূপতি ঘুমাইয়া পড়িল।

যখন তার ঘুম ভাঙ্গিল তখন প্রভাত হইয়াছে। বিলাস তখনও তার শিয়রে বসিয়া বাতাস করিতেছে। তার সেই সেবারত মূর্ত্তি দেখিয়া ভূপতি মুগ্ধ হইল। কিন্তু রাত্রির কথা মনে করিয়া সে অতিশয় লজ্জা বোধ করিল। কোনও কথা না বলিয়া ভূপতি গম্ভীর হইয়া উঠিয়া বসিল।

বিলাস বলিল, "এখন ভাল আছেন বেশ?"

ভূপতি মাথা নীচু করিয়া কহিল, "হঁ।"

"যাক, আমার বড্ড ভয় হ'য়েছিল। কেন ও ছাই খেতে গেলেন বলুন দেখি? আর খাবেন না।"

পতিতার কাছে এই তিরস্কার লাভ করিয়া ভূপতি মর্ম্মে মরিয়া গেল।

৩

ইহার পর এক সপ্তাহ ভূপতি এককড়ি বা বিলাসের আর কোনও খোঁজ করিল না। সেদিনকার কথা ভাবিয়া সে লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল। কিন্তু বিলাসের প্রতি একটা অদম্য আকর্ষণ তাহার সমস্ত শরীর-মনকে প্রবল ভাবে টানিতেছিল। বিলাসের মূর্ত্তি, তার কথাবার্ত্তা, তার প্রত্যেকটি মুখভঙ্গী, প্রত্যেক অঙ্গসঞ্চালন নিরন্তর তার চক্ষের সম্মুখে নৃত্য করিতেছিল।

সাতদিন পরে সে একখানা চিঠি পাইল। মোড়ক খুলিয়া দেখিল বিলাসের লেখা। সে তাড়াতাড়ি চিঠিখানা তার পকেটের ভিতর লুকাইল। তারপর দুয়ার বন্ধ করিয়া পড়িল। বিলাস লিখিয়াছে:—

প্রিয়তমেষু,

সেদিন আপনি অসুস্থ শরীরে চলিয়া গেলেন, তারপর আপনার কোনও সংবাদ পাই নাই। সেজন্য মন বড় উতলা আছে। দয়া করিয়া পত্রোত্তরে আপনার শরীর কেমন আছে জানাইয়া উদ্বেগ দূর করিবেন। ইতি

চরণাশ্রিতা

বিলাস।

পুনশ্চ:—যদি শরীর ভাল থাকে আর অবসর হয় তো আর একবার দেখা দিবেন কি?

পত্রখানা ভূপতি বারবার পড়িল। তার শরীরের প্রত্যেক ধমনীর ভিতর রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। অনেকক্ষণ পরে সে চিঠিখানা পকেটে রাখিয়া আহারাদি করিয়া সুস্থির হইয়া অফিসে গেল। শেষ পর্য্যন্ত তার সুবুদ্ধিই জয়ী হইল।

সন্ধ্যার সময় এককড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া ভূপতির বুক কাঁপিয়া উঠিল।

অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে বসিয়া হাত কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে এককড়ি বলিল, "বাবু আর একদিন যাবেন না—"

সজোরে ভূপতি বলিল, "না, না, এককড়ি, আমি আর যাব না।"

এককড়ি বলিল, "তা যাক্‌গে, ও সবের মধ্যে না যাওয়াই ভাল। আমি ভুক্তভোগী মানুষ, জানি ও পথে পা দিলেই মরণ। আমিও আর আপনাকে ওর ভিতর যেতে দিতে চাই না। তবে বিলাস বিবি বড় কান্নাকাটি করে, রোজ রোজ আমার সাধ্যসাধনা করে, তাই আসতে হ'ল। তা'ছাড়া ভাবলাম সেদিন মেয়েটাকে তো দেখা হয়নি, আপনি হয়তো গেলেও যেতে পারেন তাই। নইলে ভদ্রলোকের ছেলেকে ও পথ মাড়াতে আমি কখনও বল্‌বো না।"

'বিলাস বড় কান্নাকাটি করে'—এ কথাটায় ভূপতির মনটা ভারি নরম হইয়া গেল। বিলাসের সেদিনকার সেবাপরায়ণমূর্ত্তি স্মরণ করিয়া তার মনে হইল বিলাসকে সাধারণ গণিকার মত বিবেচনা করা অন্যায়। তারপর যখন এককড়ি সেই মেয়েটার কথা পাড়িল তখন অতি সহজেই মনে হইল যে তরলার সন্ধানের জন্য আর এক দিন বিলাসের কাছে যাওয়া তার একান্ত কর্ত্তব্য। তার প্রচ্ছন্ন প্রবৃত্তি তাকে টানিয়া নামাইল। সে অল্প সময়ের মধ্যেই এককড়ির সঙ্গে বিলাসের গৃহে গিয়া হাজির হইল।

পথে এককড়ি বলিল যে সে আরও তিনটি মেয়ের সন্ধান পাইয়াছে, তাদের দেখিতেও এক একদিন যাইতে হইবে।

বিলাস একটু কৌতুকপূর্ণ হাসি হাসিয়া ভূপতিকে সাদরে সম্বর্দ্ধনা করিয়া লইল। তার হাসির ভিতর কৌতুকের আভাসটা ভূপতিকে ভয়ানক লজ্জিত করিয়া দিল।

বিলাস আজ বেশ স্বচ্ছন্দভাবে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিল, প্রথম পরিচয়ের জড়তা তার আজ ছিল না। তাই ভূপতিরও সঙ্কোচ কিছুক্ষণের মধ্যে কাটিয়া গেল, সে স্বচ্ছন্দচিত্তে হাস্যপরিহাসে যোগ দিল।

এককড়ি মদ আনিবার প্রস্তাব করিলে বিলাস দৃঢ়স্বরে বলিল, "না ও সব হবে না। আপনি আমার এখানে আর মদ খেতে পাবেন না; তাহ'লে আমি ভারি রাগ ক'রবো।"

ভূপতির অল্প একটু মদ খাইতে ইচ্ছা হইতেছিল। একটু বাধা, সামান্য একটু বিহ্বলতা সে কিছুতেই কাটাইতে পারিতেছিল না, তার মনে হইল একটু মদ খাইলে সে সুস্থ বোধ করিবে। বিলাস কিন্তু কিছুতেই রাজী হইল না।

এককড়ি চটিয়া বলিল, "এ যে বড় বেয়াড়া আবদার বাপু তোমার! এমন নির্জ্জলা নিরামিষ ইয়ারকী ভাল লাগে?—দুত্তোর।" বলিয়া সে উঠিয়া চলিয়া গেল।

ভূপতি তখন কর্ত্তব্য পালনের কথা স্মরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাকি একটা মেয়ে আছে, বিলাস?"

বিলাস বলিল, "হঁা, কে বল্লে? ওই এককড়ি বুঝি?

"হঁা, ও বলছিল সে নাকি ভারি সুন্দর গায়। ডাক না তাকে একবার।"

"সে ত এখানে নেই, তাকে মাসির বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছি। সে ইস্কুলে পড়ে কিনা—আমার এখানে থাকলে যদি ইস্কুলে না নেয় তাই মাসির বাড়ী থেকে লেখাপড়া করে।"

"তা বেশ ত, একদিন নিয়ে এসো না তাকে, আমি একবার দেখবো।"

"আচ্ছা, আবার যেদিন আসবে বোলো, আনিয়ে রাখ্‌বো।"

"তাহ'লে কালই সন্ধ্যাবেলায়।—কেমন?"

সহাস্যমুখে বিলাস বলিল, "বেশ, তাই হবে।"

রাত্রি বারটায় সময় ভূপতি বাড়ী ফিরিল। পথে ঘৃণায় ও অনুশোচনায় সে পীড়িত হইতেছিল। কিন্তু পরদিন প্রত্যূষে বিলাসের স্মৃতি তীব্র সুরার মত তার সমস্ত অন্তর তপ্ত ও উত্তেজিত করিয়া তুলিল; এবং সমস্ত দিন ধরিয়া অনুশোচনা ক্রমশঃ নরম হইয়া আসিল।

সেদিন বিলাসের মেয়েকে দেখিবার কথা ছিল, সুতরাং কর্ত্তব্যের ছলে সন্ধ্যার পর ভূপতি বিলাসের গৃহে উপস্থিত

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

হইল। সেদিন মেয়ে আসিতে পারে নাই বলিয়া সে চতুর্থ দিন আবার গেল। সে দিন বিলাসের মেয়েকে সে দেখিল ; বলা বাহুল্য সে তরলা নয়। পঞ্চম দিনে আর তার কোনও ওজুহাতের প্রয়োজন হইল না। ষষ্ঠদিনে বিলাসের জন্ত গহনা লইয়া যাইতে হইল। তারপর তার ঘরের আসবাব, তার পরদিন একখানা সাড়ী তার পরদিন অন্ত একটা কিছু।

ভূপতি ডুবিল।

প্রথমে কিছুদিন তার বড় ভয় ছিল পাছে জ্যোতি জানিতে পারে। কিন্তু সে দেখিল যে, জ্যোতির জানিবার কোনও সম্ভাবনা নাই। জ্যোতি কলেজে যায়-আসে, বাড়ীতে খায় ; তা ছাড়া সারাদিন কোথায় যে থাকে তার কোনও সন্ধানই নাই। রাত্রে বাড়ী ফিরিতেও তাহার চেয়ে জ্যোতিরই বেশী দেরী হয়। সুতরাং জ্যোতির বিষয়ে ভয় করিবার কোনও হেতুই রহিল না। ভূপতি মনের আনন্দে গভীরতর পঙ্কে ডুবিতে লাগিল। ক্রমশঃ তার ভয়-ডর-লজ্জার কিছু অবশিষ্ট রহিল না। সে নিয়মিত থিয়েটারে যাইতে আরম্ভ করিল এবং অভিনয়ান্তে সেখান হইতে প্রকাশ্যভাবে বিলাসকে লইয়া তার গৃহে যাইত।

প্রথম যখন ভূপতি আবিষ্কার করিল যে জ্যোতি অনেক সময়ই বাড়ী থাকে না, রাত্রেও ফিরিতে বিলম্ব করে, তখন তার অত্যন্ত রাগ হইয়াছিল। তরুণ যুবকের এ আচরণ অতিশয় অসঙ্গত মনে হইলেও নিজের দুর্বলতা স্মরণ করিয়া সে এ বিষয়ে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে সাহস করে নাই ; কিন্তু একদিন সকালে উঠিয়া যখন সে শুনিল যে, জ্যোতি পূর্ব্বরাত্রে মোটেই বাড়ী ফিরে নাই তখন সে চটিয়া অগ্নিশর্ম্মা হইল। স্থির করিল, এ বিষয়ে জ্যোতির সঙ্গে সে নিশ্চয় একটা কিছু বোঝাপড়া করিবে। সেদিন সে সকাল সকাল অফিস হইতে ফিরিল এবং বাড়ী হইতে বাহির হইল না। কিন্তু গভীর রাত্রেও জ্যোতি যখন বাড়ী ফিরিল না তখন জ্যোতির জন্ত তার মনে অতিশয় ভয় হইল।

অস্থিরচিত্তে সারারাত্রি কাটাইয়া সকালে সে মুখ-হাত ধুইতে ধুইতে ভাবিতে লাগিল, কোথায়—কি করিয়া জ্যোতির সন্ধান করিবে, এমন সময় এককড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। কাল রাত্রে ভূপতি না যাওয়ায় বিলাস ব্যস্ত হইয়া তাহাকে সন্ধান লইতে পাঠাইয়াছে ভূপতির কোনো অসুখ করিয়াছে কিনা। একথা শুনিয়া একটা স্বপ্নের মোহ ভূপতির চিত্তকে অধিকার করিয়া বসিল। সে এককড়িকে সমাদরের সহিত চা খাওয়াইল, অবশেষে একটা বোতলও খোলা হইল। এমন সময় বাড়ীর সম্মুখে একখানা ভাড়া গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া ভূপতি দেখিল জ্যোতি সুরমাকে হাত ধরিয়া নামাইতেছে।

নিরতিশয় ব্যস্ত হইয়া সদ্যখোলা বোতলটার ছিপি আঁটিয়া এককড়ির কাপড়ের তলায় গুঁজিয়া দিয়া সে বলিল, "পালাও শিগ্‌গির!"

অকস্মাৎ রসভঙ্গ হওয়ায় এককড়ি একটু ইতস্ততঃ করিতেছিল, ভূপতি বলিল, "পালাও, পালাও! আজ সন্ধ্যাবেলায় যাব'খন বিলাসকে বোলো। এখন যাও।"

এককড়িকে তাড়াইয়া দিয়া সে অনেকটা আশ্বস্ত হইল। ভাগ্যে মদটা খাওয়া হয় নাই! তাহা হইলে তো সুরমার কাছে একেবারে ধরা পড়িয়া যাইতে হইত! তারপর সুরমার এই আকস্মিক প্রত্যাবর্ত্তনের কথা মনে করিয়া সে অস্থির হইয়া উঠিল। কোনও খোঁজ নাই খবর নাই হঠাৎ জ্যোতি গিয়া সুরমাকে লইয়া আসে কেন? তবে কি জ্যোতি সব কথা জানিয়া তাকে সংশোধন করিবার উদ্দেশ্যে এই কাজ করিয়াছে? তবে তো সুরমাও সব শুনিয়াছে। এখন উপায়? সুরমাকে সে কেমন করিয়া মুখ দেখাইবে?

ভূপতি নামিয়া গিয়া সুরমাকে সম্ভাষণ করিতে পারিল না। সুরমা যখন তার কাছে আসিয়া স্নিগ্ধ হাস্যে মুখ উদ্ভাসিত করিয়া তাহাকে প্রণাম করিল তখন সে অত্যন্ত অপ্রস্তুতভাবে জোর করিয়া একটু হাসিল, মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

সুরমা হাসিয়া বলিল, "তোমাকে না জানিয়ে হঠাৎ চলে এলাম তাতে তোমার বোধ হয় খুব রাগ হ'চ্ছে—না?"

ভূপতি এ কথায় আবার বিবর্ণ হইয়া উঠিল। তবে সুরমা সব কথা শুনিয়াছে নাকি!

শঙ্কিতমনে অপ্রতিভভাবে সে বলিল, "না, সে কি কথা! রাগ হবে কেন? তবে হঠাৎ এলে যে?" জিজ্ঞাসা করিয়াই কিন্তু তার বুক কাঁপিয়া উঠিল। ইহার উত্তরে সুরমা যদি ফস্ করিয়া বলিয়া বসে, "এলাম তোমার কীর্ত্তির কথা শুনে!"

সুরমা কিন্তু সে রকম কিছুই বলিল না; শুধু বলিল, "এসেছি কি আর সাধে? ঠাকুরপো গিয়ে বল্লে, আমি না এলে ভাল লাগচে না, বাড়ী খাঁ খাঁ ক'রছে, সংসারে লক্ষ্মীশ্রী নেই—এম্‌নি কত কি। তাই এলাম। সেধে আন্‌তে হ'য়েছে, যেচে আসিনি।"

শুনিয়া ভূপতির মন অনেকটা শান্ত হইল। তবে বোধ হয় সুরমা এখনও কিছু জানে না। কিন্তু জ্যোতি? কথা নাই বার্ত্তা নাই সে হঠাৎ গিয়া বৌদিদিকে আনিতে যায় কেন? সে হয়ত সব জানে।

যাক্, উপস্থিত বিপদ কাটিয়া যাওয়ায় ভূপতি সুস্থির হইয়া সুরমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিল; তারপর যথাসময়ে খাইয়া-দাইয়া অফিসে গেল। মনে মনে সে স্থির করিল যা হইবার হইয়া গিয়াছে, আর ও পথে নয়।

[ক্রমশঃ]

বউ-চণ্ডীর মাঠ

—গল্প—

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রামের খাঁওড়ের মধ্যে নৌকা ঢুকেই জল-ঝাঁঝির দামে আট্‌কে গেল।

কাল্লুন-গো হেমেন বাবু বল্লেন—বাব্‌লা গাছটার গায়ে কাছি জড়িয়ে বেঁধে নেও—

বাইরের নদীতে ভাঁটার টান ধরেচে, চাঁদা-কাটার ঝোপের নীচের জল স'রে গিয়ে একটু একটু ক'রে কাদা বা'র হচ্চে।

হেমেন বাবু বল্লেন—একটু পানি নেমে দেখ্‌বেন না কোথায় পিন্ ফেলা হয়েচে? যত শীগ্‌গির খানাপুরীটা শেষ হয়ে যায়—

এমন সুন্দর বিকালটাতে আর কাজ কর্ত্তে ইচ্ছে হোল না। পিছনের নৌকা থেকে লোকজনেরা নেমে জায়গা ঠিক ক'রে সেখানে তাঁবু ফেলবে। জরিপের বড় সাহেবের শীগ্‌গির সদর থেকে আস্‌বার কথা আছে, কাজেই যত তাড়াতাড়ি কাজ আরম্ভ হয়, সকলেরই সেই দিকে ঝোঁক। সাব্-ডেপুটী নৃপেন বাবু কাজ শিখ্‌বার জন্যে এইবার প্রথম খানাপুরীর কাজে এসেছিলেন। বয়স বেশী না, ছোক্‌রা—কিন্তু মাঝ-নদীতে নৌকা দুল্‌লেই তাঁর অত্যন্ত ভয় হচ্ছিল। বোধ হয় ভয়কে ফাঁকি দেবার জন্যেই তিনি এতক্ষণ ছই-এর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়বার ভাণ করে শুয়েছিলেন—এবার ডাঙ্গায় নৌকা লাগাতে তিনি ছই-এর ভিতর থেকে বা'র হয়ে এলেন এবং একটু পরে হেমেন বাবুর সঙ্গে কথায় কথায় কি নিয়ে বেশ একটু তর্ক সুরু করলেন।

নৃপেন বাবুকে বল্লুম—Tenancy Act-এর কচ্‌কচিতে দরকার নেই, তার চেয়ে বরং চলুন নেমে তাঁবুর জায়গাটা ঠিক করা যাক্—কাল সকালেই যাতে কাজ আরম্ভ করা যায়—

চৈত্র মাস যায় যায়। গ্রাম্য নদীটির দুপাড় ভ'রে সবুজ সবুজ লতানে গাছে নীল-পাপ্‌ড়ি বন-অপরাজিতা ফুল ফুটে আছে। বাঁশঝাড় কোথাও জলের ধারে নত হয়ে পড়েচে, তলায় আকন্দ বৈঁচিফুলের বন ফুলের ডালি মাথায় নিয়ে ঝিরঝিরে বাতাসে মাথা দোলাচ্চে। দুধারের

রোদ-পোড়া কটা ঘাস-ওয়ালা মাঠের মাঝে মাঝে পত্র-বিরল বাব্‌লাগাছে গাঙ্‌-শালিকের ঝাঁক কিচ্‌কিচ্ কচ্চে—নদীর বাঁ-পাড়ের গায়ে গর্ত্তের মধ্যে তাদের বাসা। মাকাল-লতার ঝোপের তলায় জলের ধারে কোথাও উঁচু উঁচু বনমূলার ঝাড়, তাদের কুচো কুচো হল্‌দে ফুল থেকে জায়ফলের মত একটা ঘন গন্ধ উঠ্‌চে।

বেলা আর একটু পড়্‌লে আমরা সে বাঁওড়ের ধারের মাঠে তাঁবুর জায়গা কোথায় ঠিক হবে দেখ্‌তে গেলুম। নদীর ধার থেকে গ্রাম একটু দূর হলেও গ্রামের মেয়েরা নদীতেই জল নিতে আসে, আমাদের যেখানে নৌকাখানা বাঁধা হয়েছিল, তার বাঁ-ধারে খানিকটা দূরে মাটীতে ধাপ-কাটা কাঁচা ঘাট। গ্রামের একজন বৃদ্ধ বোধ হয় নদীতে গ্রীষ্মের দিনের বৈকালে স্নান করতে আস্‌ছিলেন, তাঁকে আমরা জিজ্ঞাসা করলুম—রসুলপুর কোন্ গাঁ-খানার নাম মশাই,—সামনে এটা—না ওই পাশে?

তিনি বল্লেন—আজ্ঞে না, এটা হোল কুমুরে, পাশের ওটা আমডাঙ্গা—রসুলপুর হোল এ গাঁ-গুলোর পিছনে—কোশ দুই তফাৎ—আপনারা?

আমাদের পরিচয় শুনে বৃদ্ধ বল্‌লেন—এই মাঠ-টাতেই আপনারা তাঁবু ফেল্‌বেন?—আপনাদের জরিপের কাজ শেষ হতেও তো পাঁচ ছয় মাস—

আমরা বল্লুম—তা তো হবেই—তার বরং বেশী—

বৃদ্ধ বল্লেন—এখানটা একটা ঠাকুরের স্থান, গাঁয়ের মেয়ে-ছেলেরা পুজো দিতে আসে—বরং আর একটু সরে গিয়ে নদীর মুখের দিকে তাঁবু ফেলুন—নৈলে মেয়েদের একটু অসুবিধে—

বৃদ্ধের নাম ভুবন চক্রবর্ত্তী। জরিপ আরম্ভ হয়ে গেলে নিজের দরকারে চক্রবর্ত্তী মশায় দলিল-পত্র বগলে অনেকবার তাঁবুতে যাতায়াত সুরু করে দিলেন, সকলের সঙ্গে তাঁর বেশ মেশা-মেশি ও আলাপ হয়ে গেল। তাঁর পৈতৃক জমাজমি অনেকে নাকি ফাঁকি দিয়ে দখল করচে, আমাদের সাহায্যে এবার যদি সেগুলোর একটা গতি হয়—এই সব প্রসঙ্গের কথা তিনি আমাদের প্রায়ই শোনাতেন।

আমি সেখানে বেশীদিন ছিলুম না। খানাপুরীর কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েচে, আমি সেদিনই বেলায় ফির্‌বো—জোয়ারের অপেক্ষায় নৌকা ছাড়্‌তে দেরী হোতে লাগ্‌লো। চক্রবর্ত্তী মশায়ও সেদিন উপস্থিত ছিলেন। কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলুম—এটাকে বউ-চণ্ডীর মাঠ বলে কেন চক্কত্তি মশায়?—আপনাদের কি কোনো—

নৃপেন বাবুও বল্লেন—তালো কথা, বলুন তো চক্কত্তি মশাই—বউ-চণ্ডী আবার কি কথা—শুনিনি তো কখনো!

আমাদের প্রশ্নের উত্তরে চক্রবর্ত্তী মশায়ের মুখে একটা অদ্ভুত গল্প শুন্‌লুম। তিনি বল্‌তে লাগ্‌লেন—শুনুন তবে; এটা সেকালের গল্প। ছেলেবেলায় আমার ঠাকুরমার কাছ থেকে শোনা। এ অঞ্চলের অনেক প্রাচীন লোকে এ গল্প জানে।

সেকালে এ গ্রামে একঘর সম্পন্ন গৃহস্থ বাস কর্‌তেন। এখন আর তাঁদের কেউ নেই, তবে আমি যে সময়ের কথা বল্‌চি সে সময় তাঁদের বড় শরিক পতিতপাবন চৌধুরী মশায়ের খুব নামডাক ছিল।

এই পতিতপাবন চৌধুরী মশায় যখন তৃতীয় পক্ষের বিয়ে করে বউ ঘরে আন্‌লেন, তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশ প্রায় হয়ে গিয়েচে। এমন যে বিশেষ বয়স তা নয়, বিশেষতঃ ভোগের শরীর,—পঞ্চাশ বছর বয়স হলেও চৌধুরী মশায়কে বয়সের তুলনায় অনেক ছোট দেখাতো। বউ দেখে বাড়ীর সকলেই খুব সন্তুষ্ট হোল। তৃতীয় পক্ষের বিয়ে বলে চৌধুরী মশায় একটু ডাগর মেয়ে দেখেই বিয়ে করেছিলেন, নতুন বউয়ের বয়েস ছিল প্রায় সতেরোর কাছাকাছি। বউয়ের মুখের গড়নটী বড় সুন্দর, মুখের ছাঁচ যেন হরতনের টেক্কাটির মত। চোখ দুটী বেশ ডাগর, ভাসাভাসা। মুখে চোখে ভারি একটা শান্ত ভাব। নতুন বউয়ের কাজ-কর্ম্ম আর ধীর শান্ত ভাব দেখে পাড়ার লোকে বল্লে এ রকম বউ এ গাঁয়ে আর আসে নি। সে মাটির দিকে চোখ রেখে ছাড়া কথা বলে না, অল্পবয়সের খুড়্‌শাশুড়ী দলের সাম্‌নেও ঘোম্‌টা দেয়; সকলে বলে যেমন লক্ষ্মীর মত রূপ তেমনই গুণ।

মাস দুই তিন পরে কিন্তু একটা বড় বিপদ ঘট্‌লো। সকলে দেখ্‌লে বৌটীর আর সব ভালো বটে, একটা কিন্তু বড় দোষ। সে কিছুতেই স্বামীর ঘেঁসে নিতে চায় না, প্রাণপণে এড়িয়ে চল্‌তে চায়। প্রথম প্রথম সকলে ভেবেছিল, নতুন বিয়ে হয়েচে, ছেলে-মানুষ, বোধ হয় সেই জন্যেই এ-রকম করে। ক্রমে কিন্তু দেখা গেল, স্বামী কেন, যে-কোনো পুরুষ মানুষ দেখ্‌লেই সে কেমন যেন ভয়ে কাঁপে। বাড়ীতে যে দিন যজ্ঞি কি কোনো বড় কাজ-কর্ম্মে বাইরের লোকের ভিড় হয়, সে দিন সে ঘর থেকে আর বারই হয় না। স্বামীর ঘরে কিছুতেই তো যেতে রাজী হয় না, মাসে দুদিন কি একদিন সকলে আদর ক'রে, গায়ে হাত বুলিয়ে পাঠাতে যায়—সে জনে জনের পায়ে পড়ে, এর ওর কাছে কাকুতি-মিনতি করে, কিছুতেই বুঝ্ মানে না। পুরুষ মানুষের গলার স্বর শুন্‌লে কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে পড়ে।

অনেক ক'রে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সকলে তাকে একদিন স্বামীর ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে দোরে শিকল বন্ধ ক'রে দিলে। চৌধুরী মশায় অনেক রাত্রে ঘরে ঢুকে দেখেন তাঁর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী ঘরের এক কোণে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে ভয়ে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপ্‌চে। এর পর আর কিছুতেই কোনো দিন সে স্বামীর ঘরে যেতে চাইত না, বাড়ীশুদ্ধ লোকের হাতে পায়ে প'ড়ে বেড়াতে লাগ্‌ল—সকলকে বলে—আমার বড্ড ভয় করে, আমায় ওরকম করে আর পাঠিও না—তোমাদের পায়ে পড়ি। বোঝাতে বোঝাতে বাড়ীর লোকে হয়রান হয়ে গেল।

দিনকতক গেল, আর একদিন তাকে সকলে মিলে জোর করে স্বামীর ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বা'র থেকে দোর বন্ধ ক'রে দিলে। তারা ঠিক করলে এই রকম দিতে দিতে ক্রমে লজ্জা ভাঙ্‌বে—নৈলে কতদিন আর এ ন্যাকামি ভাল লাগে? ভোরে উঠে সকলে দেখ্‌লে ঘরের মধ্যে বউ নেই, বাড়ীর কোথাও নেই। নিকটেই বাপের বাড়ীর গাঁ, সেখানে পালিয়ে গিয়েচে ভেবে লোক পাঠানো গেল। লোক ফিরে এল, সে সেখানে যায় নি। তখন সকলে ভাবলে পুকুরে ডুবে মরেচে—পুকুরে জাল ফেলা হোল, কোনো সন্ধান মিল্‌ল না। বউয়ের কচি মুখের ও নিরীহ চোখের ভাব মনে হয়ে লোকের মনে অন্য কোনো সন্দেহ জাগবার অবকাশ পেলে না। কত দিকে কত সন্ধান ক'রে যখন কোনো খোঁজই মিল্‌ল না, চৌধুরী মশায় মানসিক শোক নিবারণ করবার জন্যে চতুর্থ পক্ষের স্ত্রী ঘরে আন্‌লেন।

অজ পাড়া-গাঁ, নতুন কিছু একটা বড় ঘটে না, অনেকদিন এটা নিয়ে নাড়াচাড়া চল্‌ল। তারপর ক্রমে সেটা কেটে গিয়ে গ্রাম ঠাণ্ডা হোল। এই মাঠের পূব ধারে গ্রামের মধ্যেই চৌধুরীদের বাড়ী ছিল। তখন এইখান দিয়েই নদীর স্রোত বইতো,—ম'জে বাঁওড় হয়ে গিয়েচে তো সেদিন, আমরা ছেলেবেলাতেও ধান বোঝাই নৌকা চলাচল হতে দেখেচি। ক্রমে চৌধুরীদের সব মরে হেজে গেল, শেষ পর্য্যন্ত বংশে একজন কে ছিল—উঠে গিয়ে অন্য কোথাও বাস কর্‌লে। এ সব অনেক বছর আগেকার কথা—সত্তর আশী বছর খুব হবে। সেই থেকে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এই সব মাঠে বড় এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে শোনা যায়।

এই ফাল্গুন চৈত্র মাসে যখন বড় গরম প'ড়ে, তখন রাখাল ছেলেরা গরু চরাতে এসে দূর থেকে কতদিন দেখেছে, মাঠের ধারের বনের মধ্যে নিস্তব্ধ দুপুরে বাঁশবনের ছায়ায় কে যেন শুয়ে আছে, কাছে গেলে কেউ কখনো দেখতে পায় নি। কতদিন সন্ধ্যার সময় তারা গরুর দল নিয়ে গ্রামের মধ্যে যেতে যেতে শুনেচে, অন্ধকার ঝোপের মধ্যে যেন একটা চাপা কান্নার রব উঠ্‌চে। সুমুখ জ্যোৎস্না রাত্রে অনেকে নদীর ঘাট থেকে ফিরবার পথে ছাতিম গাছের নীচু ডালের তলা দিয়ে যেতে যেতে দেখেচে দূর মাঠে সন্ধ্যার আবছায়া জ্যোৎস্নার মধ্য দিয়ে সাদা কাপড় পরে কে যেন ক্রমেই দূরে চলে যাচ্চে, তার সমস্ত গায়ের সাদা কাপড়ে জ্যোৎস্না পড়ে চিক্ চিক্ কর্‌তে থাকে। মাঠে যখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, তখন ফুলে-ভরা নাগকেশর গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ভাল করে দেখ্‌লে মনে হয়, কে খানিকটা আগে এইখানে দাঁড়িয়ে ডাল নীচু করে ফুল পেড়ে নিয়ে গিয়েচে, তার ছোট ছোট পায়ের দাগ ঝোপ যেখানে বড় ঘন, সেদিকে চলে গিয়েচে।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মাঠের ধারে এই ছাতিম গাছের তলায় উল-চণ্ডী তলা। চৈত্র সংক্রান্তিতে গ্রামবধূরা পিঠে, কাঁচাদুধ আর নতুন আখের গুড় নিয়ে বউ-চণ্ডীর পূজো দিতে আসে। বউ-চণ্ডী সকলের মঙ্গল করেন, অসুখ হলে সারিয়ে দেন, নতুন প্রসূতীর স্তনে দুধ শুকিয়ে গেলে, ওঁর কাছে পূজো দিলে আবার দুধ হয়। কচি ছেলের সর্দ্দি সারে, ছেলে বিদেশে থাক্‌বার সময় চিঠি আস্‌তে দেরী হলে পূজা মানত কর্‌বার পরই শীগ্‌গির সুসংবাদ আসে। মেয়েদের বিপদে আপদে তিনিই সকলকে বিপদ আপদ থেকে উদ্ধার করে থাকেন।

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের গল্প শেষ হোল। তারপর আরও নানা কথাবার্ত্তার পর তিনি ও আর আর সকলে উঠে চ'লে গেলেন।

বেলা বেশ পড়ে এসেচে। সন্ধ্যার বাতাসে ছাতিম বনে সুর্ সুর্ শব্দ হচ্চে। গ্রামের মাঠটা অনেকদূর পর্য্যন্ত উঁচু নীচু ঢিবি আর ঘেঁটু ফুলের বনে একেবারে ভরা। বাঁদিকে খানিক দূরে একটা পুরোনো ইটের পাঁজার খানিকটা ঘন ঝিউলি গাছের সারির মধ্য দিয়ে চোখে পড়ে।

নৌকার গলুই-এ ব'সে ব'সে আসন্ন সন্ধ্যায় আশী বছর আগেকার পলাতকা গ্রামবধূর ইতিহাসটা ভাব্‌তে লাগ্‌লুম। মাঠের মাঝের উঁচু ঢিবির ওপরকার ঘেঁটুফুলের ঘন বনের দিকে চেয়ে মনে হল যে, সারা দিনমান সে হয়তো ওর মধ্যে লুকিয়ে বসে থাকে; কেবল গভীর রাত্রে তার লুকানো জায়গা থেকে বেরিয়ে আসে; মাঠের মধ্যের বট-গাছের তলায় চুপ্ করে বসে আকাশের তারার দিকে চায়। পাশের ঝোপের ফুটন্ত বন-অপরাজিতা ফুলের রং-এর সঙ্গে রং মিলিয়ে নদী বয়ে যায়, ছাতিম বনে পাখীরা ঘুমের ঘোরে গান গেয়ে ওঠে, ওপার থেকে হু হু করে হাওয়া বয়'—সে ভয়ে ভয়ে মাঝে মাঝে পূবদিকে চেয়ে দেখে ভোরের আলো ফুট্‌বার দেরী কত।

সন্ধ্যা হয়ে গেল। বনের ওপর নবমীর চাঁদ উঠ্‌ল। একটু পরেই জোয়ার পেয়ে আমাদের নৌকা ছাড়া হোল। জলের ধারের আঁধার-ভরা নিভৃত ঝোপের মধ্যে থেকে সত্যিই যেন একটা চাপা কান্নার রব পাওয়া যাচ্ছিল—সেটা অবিশ্যি কোনো রাত-জাগা বনের পাখীর, কি কোনো পতঙ্গের ডাক।

বাঁওড়ের মুখ পার হয়ে যখন আমরা বাইরের নদীতে এসে পড়েচি, তখন পিছন ফিরে চেয়ে দেখি নির্জ্জন গ্রামের মাঠে সাদা কুয়াসায় ঘোমটা-দেওয়া ঝাপ্‌সা জ্যোৎস্না-রাত্রি অল্পে অল্পে লুকিয়ে চোরের মত আত্মপ্রকাশ কর্‌চে—অনেক কাল আগেকার সেই লজ্জাকুণ্ঠিতা ভীরু পল্লী-বধূটীর মত।



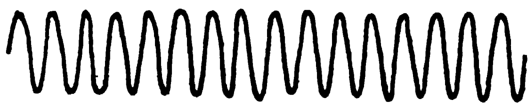
আমরা গত বারে বেতার-বার্ত্তা সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা করিয়াছি। এই বারে কিরূপে ছোট গ্রাহক-যন্ত্র তৈয়ার করা যায় তাহার আলোচনা করিব। এই যন্ত্র অতি সহজেই প্রস্তুত হয়—দামও অল্প—আর শোনাও খুব পরিষ্কার যায়। অসুবিধা এই যে, একসঙ্গে একজনের বেশী শুনিতে পারেন না।

যন্ত্রটীর বিশদ বিবরণ দিবার আগে বেতার-বার্ত্তা কি উপায়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করা যায়, তাহার একটু আলোচনা করিলে যন্ত্রটীর কার্য্য-প্রণালী বুঝিবার সুবিধা হইবে।

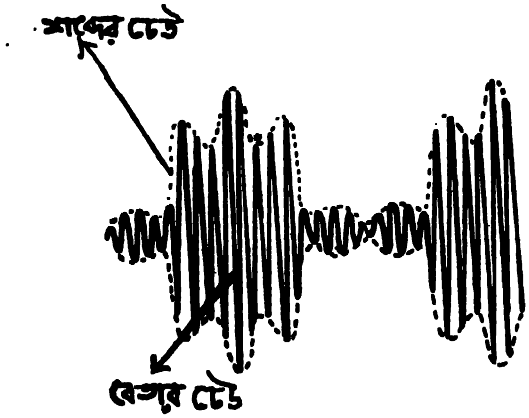
আমরা গত বারে বলিয়াছি যে, বেতার প্রেরক-যন্ত্র হইতে ইথরে লম্বা লম্বা ঢেউ তোলা হয়। এই ঢেউ পাহাড়-পর্ব্বত না মানিয়া ভীমবেগে ছুটিয়া চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই সব ঢেউ-এর প্রকৃতি এই যে, তাহাদের চলিবার পথে যদি অপরিচালক বস্তু পড়ে, তবে ঢেউ সেই অপরিচালক বস্তুর মধ্য দিয়া (ঠিক আলো যেমন কাচের মধ্য দিয়া) চলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু ঢেউ যদি পরিচালক বস্তুর (যেমন ধাতব-দ্রব্য) উপর পড়ে, তবে ঢেউ-এর গতি প্রতিহত হয়, ঢেউ-এর মধ্যে যে শক্তিটুকু সঞ্চিত ছিল তাহাতে পরিচালক পদার্থে তাড়িৎ-প্রবাহ সৃষ্ট হয়। অর্থাৎ ঢেউ আটকাইতে হইলে ঢেউ চলিবার পথে একটা পরিচালক বস্তু ধরিতে হইবে। ঢেউ ধরিবার জন্য এই পরিচালক বস্তুটি কি আকারের হইবে,—লম্বা কি চওড়া, গোল কি চৌকা, উঁচু কি খাটো,—তাহা বৈজ্ঞানিকেরা হিসাব করিয়া বাহির করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন (ও কাজেও দেখা যায়) যে, যদি মাটি হইতে একটা তামার তার খাড়া সোজা ও খুব উঁচু করিয়া তোলা যায়, তবে সেই তামার তারে বেতার ঢেউ পড়িলে সহজেই তাহাতে বিদ্যুৎ-প্রবাহ সৃজন করিতে পারে। এই যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ, ইহা একমুখী নয়। বিদ্যুৎ-প্রবাহ ঢেউ-এর তালে তালে—ঢেউ-এর মাথার পর পেট, পেটের পর মাথা যেমন যেমন আসিয়া পড়িতে থাকে—সেই তালে তারে উঠা নামা করিতে থাকে। এই তালের গতি খুব দ্রুত। ইহা ঢেউ-এর দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে। আমাদের বিজ্ঞান-কলেজের প্রেরক-যন্ত্র হইতে যে ঢেউ পাঠান হয়, তাহার তালের গতি সেকেণ্ডে প্রায় ১০ লক্ষ। অর্থাৎ গ্রাহক-যন্ত্রের তারে এই ঢেউ পড়িলে তাহাতে বিদ্যুৎ-প্রবাহ সেকেণ্ডে প্রায় ১০ লক্ষ বার উঠা নামা করিতে থাকে। আচ্ছা, এখন উঁচু তার দিয়া বিদ্যুৎ-তরঙ্গ না হয় ধরা হইল, কিন্তু তাহাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করা যায় কিরূপে? শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করিলেই চলিবে না—কর্ণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য করিতে হইবে। বেতার ঢেউ যে শব্দের ঢেউ বহন করিয়া আনিতেছে তাহাকে কানে শুনিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বেতার ঢেউ শব্দের ঢেউ কিরূপে বহন করিয়া আনে তাহা পরপৃষ্ঠার ছবি হইতে বোঝা যাইবে। ১ নং চিত্র ইথরে অবিরাম ঢেউ-এর। প্রেরক-যন্ত্রের কাছে যে Microphone থাকে (সাধারণ টেলিফোনে কথা বলিবার যে যন্ত্র, তাহারই একটু উন্নত সংস্করণ), তাহার সামনে কথা বলিলে শব্দের ঢেউ অপর একটি যন্ত্রের সাহায্যে কৌশলক্রমে বেতার ঢেউকে ঠিক শব্দের ঢেউ-এর অনুযায়ী করিয়া পরিবর্ত্তিত করে। বেতার ঢেউ-এর সঙ্গে শব্দের ঢেউ জুড়িলে কিরূপ হয় তাহার একটা (২ নং চিত্র) চিত্র দেওয়া গেল। বেতার ঢেউ হইতে

শ্রীশিশির কুমার মিত্র

শব্দের ঢেউটুকু ছাঁকিয়া বাহির করিয়া একটা সাধারণ টেলিফোনে চালাইয়া দিলে, প্রেরক-যন্ত্রের কাছে যে শব্দ হইতেছে ঠিক সেই শব্দের অনুযায়ী শব্দ গ্রাহক তাঁহার



১ নং চিত্র—অবিরাম ঢেউ



২ নং চিত্র—শব্দবাহী ঢেউ

১নং চিত্রে অবিরাম বেতার ঢেউ দেখান হইয়াছে। সেই ঢেউ যখন শব্দের ঢেউ বহন করিয়া আনে, তখন তাহাদের মাথা ঠিক এক সমান উঁচু না হইয়া শব্দের ঢেউ-এর কাঁপুনির অনুযায়ী কোথাও উঁচু কোথাও নীচু (modulated) হইয়া যায়। ২নং চিত্রে ইহাই দেখান হইয়াছে।

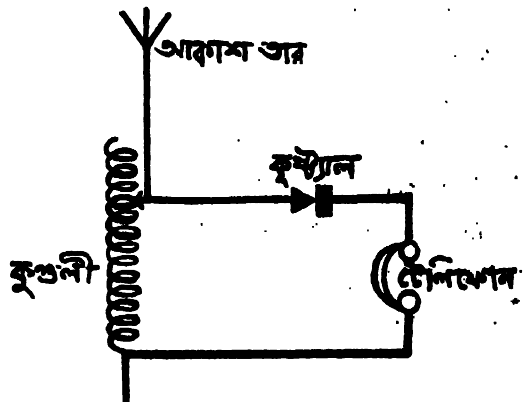
টেলিফোনে শুনিতে পাইবেন। এই ঢেউ অনেক রকম উপায়ে ছাঁকিয়া বাহির করা যায়। সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও সস্তা উপায় হইতেছে Crystal দ্বারা। Crystalগুলি নানারূপ দানাবাঁধা খনিজ পদার্থ। খুব প্রচলিত Crystal-এর নাম Galena (রাসায়নিক নাম Lead Sulphide $P_b S_2$)। গ্যালেনার এই ঢেউ-ছাঁকা গুণ প্রথম আবিষ্কার করেন—আমাদের দেশের জগদীশ বসু মহাশয়।

বেতার-বার্ত্তা শুনিতে হইলে আমাদের মোটামুটি এই ক'টি জিনিষ চাই। (১) আকাশ-তার বা Aerial (উঁচু তামার তার), (২) বেতার ঢেউএর ছাঁকনি বা Crystal, (৩) টেলিফোন, (৪) ইহা ছাড়া একটা তারের কুণ্ডলী বা Coil চাই। এই কুণ্ডলীর উদ্দেশ্য আমাদের আকাশ-তারকে প্রেরক-যন্ত্রের ঢেউ-এর সুরে বাঁধিবার বা tune করিবার জন্য। আকাশ-তারকে কুণ্ডলীর সাহায্যে বেতার ঢেউ-এর সুরের সঙ্গে বাঁধিলে বা tune করিলে, যখন তাহাতে বেতার-ঢেউ পড়ে, তখন তাহাতে বিদ্যুৎ-প্রবাহ খুব সহজেই ও খুব জোরে হয়। ঠিক যেমন ধরুন, যদি দুইটা বেহালা ঠিক এক সুরে বাঁধা থাকে, তবে একটা বেহালা বাজাইলে অপরটা আপনা হইতেই সঙ্গে সঙ্গে বাজিয়া উঠে। গ্রাহক-যন্ত্রের একটা নক্সা নীচে (৩নং চিত্র) দেওয়া গেল।

এইবার যন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশের কথা একটু বিস্তারিত ভাবে বলিব।

আকাশ-তার (Aerial)

আকাশ-তার বা Aerial বাড়ীর ছাদে কি ভাবে টাঙাইতে হয়, তাহা দুইটি (৪নং ও ৫নং) চিত্র হইতে বেশ বুঝা যাইবে।



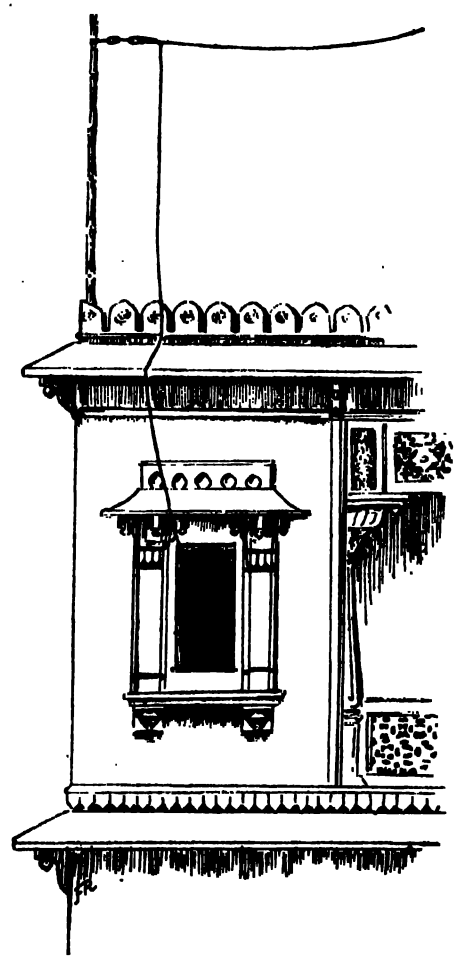
৩ নং চিত্র—গ্রাহক-যন্ত্রের নক্সা—ক

আকাশ-তারে বেতার ঢেউ পড়িলে বিদ্যুৎ-প্রবাহ জমি হইতে কুণ্ডলী ও আকাশ-তারের ভিতর দিয়া অতি দ্রুত তালে উঠানামা করিতে থাকে। এই বিদ্যুৎ-প্রবাহের কতকাংশ ক্রিষ্ট্যালের ভিতর দিয়া টেলিফোনে গিয়া, প্রেরকযন্ত্রের কাছে যে শব্দ হইতেছে, সেই শব্দের অনুযায়ী শব্দ উৎপাদন করে।

দুইটা বাঁশ (যত লম্বা ও মজবুত হয় ততই ভাল) ছাদে লাগাইতে হইবে। দুইটার মধ্যে দূরত্ব ২০ ফুট হইতে ৫০।৬০ ফুট হইতে পারে। এই দুই বাঁশের ডগায় Insulator দিয়া horizontal ভাবে তার লাগাইবে। ইহার এক প্রান্ত হইতে তার বরাবর নীচে নামিয়া যে-ঘরে গ্রাহক-যন্ত্র আছে সেই ঘরে প্রবেশ করিবে। নীচে নামিবার সময় দেখিতে হইবে যে তার যেন দেওয়ালে না ঠেকে। তার নীচে নামার সময় যদি কার্ণিসে বা দেওয়ালে লাগার সম্ভাবনা থাকে তবে ৪।৫ হাত লম্বা একটা বাঁখারীর মাথায় একটা insulator লাগাইয়া সেটি আলিসার উপর হইতে বাহিরের দিকে আগাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। তার নীচে নামার সময় insulator-এর মধ্য দিয়া যাইবে ও দেওয়াল হইতে দূরে থাকিবে। ঘরের ভিতর তার আনিবার জন্ত জানালার চৌকাঠে একটা ছিদ্র করিতে পারা যায়। এই তার সর্ব্বসমেত (উপরের ও নীচে-নামা অংশ লইয়া) ১০০ ফুট আন্দাজ করিতে পারিলে ভাল হয়। যদি দুইটা বাঁশের মধ্যে দূরত্ব কম থাকে (মাত্র ২০।২৫ ফুট), তবে একটার বদলে দুইটা তার সমানান্তরাল ভাবে লাগাইতে পারা যায়। তামার তার সাধারণত ৭/২২ নং ব্যবহার করা হয় (7/22 bare Copper wire)। গ্রাহক-যন্ত্র হইতে আর একটা তার মাটিতে যাইবে। তাহার কথা পরে বলা হইতেছে।

গ্রাহক-যন্ত্র

তারের কুণ্ডলী বা Tuning Coil গোড়ায় তৈয়ার করিতে হইবে। আন্দাজ ৩।০ ইঞ্চি ব্যাসের একটা বাঁশের অথবা একটা পেষ্ট্-বোর্ডের চোঙা লইয়া উহার উপর ২০ নং D. C. C. তামার তার ৬০ পাক জড়াও। প্রথম ৩০ পাক সাধারণভাবে জড়াইয়া শেষের দিকে এক একটা পাক জড়াইবার সময় এক এক জায়গায় তারটা উঁচু করিয়া একটা মোচড় দিয়া জড়াইতে হইবে। এই রকম মোচড় দুই পাক অন্তর দিয়া শেষের ৩০ পাক জড়াও। জড়ান শেষ হইলে মোচ্ড়ান তারটুকুর উপর হইতে রেশমের আবরণটা ছুরি দিয়া চাঁচিয়া ফেলিবে। কুণ্ডলী বা ছাঁকনি holder-সমেত বাজারে পাওয়া যায়। আর চাই এক টুকরা যে কোন কাঠের তক্তা ১২"×৮" (কেরোসিনের বাক্সের হইলেও আপত্তি নাই), কয়েকটা Binding Screw ও খানিকটা flexible তার (বিজ্লী বাতি ঝুলাইবার জন্য যেমন তার ব্যবহার হয়, সেই রকম তার)।

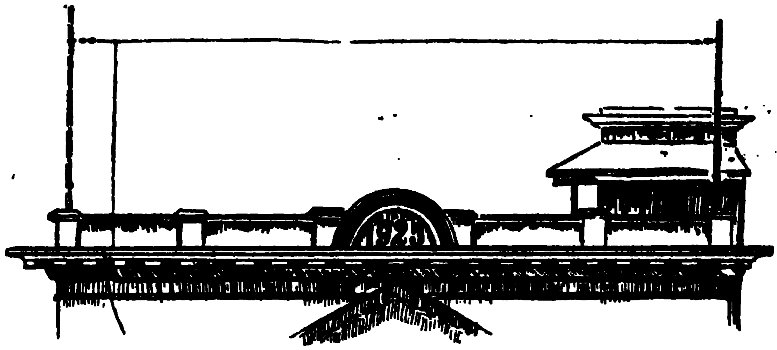


৪ নং চিত্র—আকাশ-তার

আকাশ-তার ছাদে দুইটা উঁচু বাঁশের মাথায় insulator সাহায্যে টাঙাইতে হয়। এক দিক হইতে একটা তার নীচে নামিয়া ঘরে গ্রাহক-যন্ত্রে যাইবে। সাবধান যেন নীচে নামার সময় তার দেওয়ালে বা কার্ণিসে না ঠেকে। ছবিতে কার্ণিসে লাগা আছে মনে হয়—কিন্তু ঠেকিয়া থাকিলে চলিবে না।

বেতার গ্রাহক-যন্ত্র

শিশির কুমার মিত্র



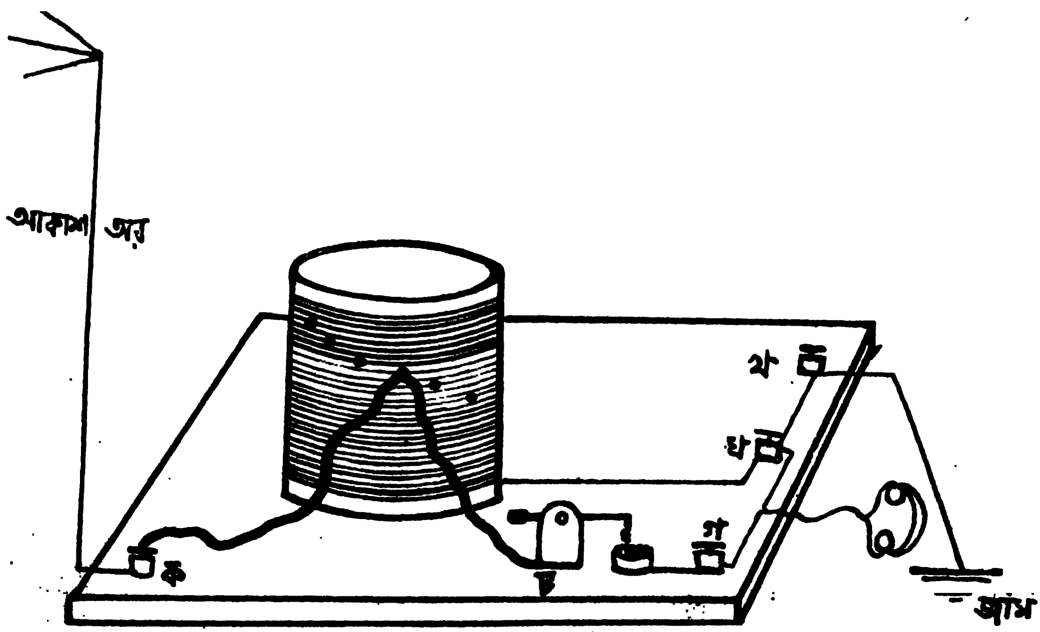
৫নং চিত্র—আকাশ-তার

ছাদে আকাশ-তার টাঙ্গাইবার প্রণালী। নীচে নামার তার যেন কার্ণিসে বা দেওয়ালে না ঠেকে।

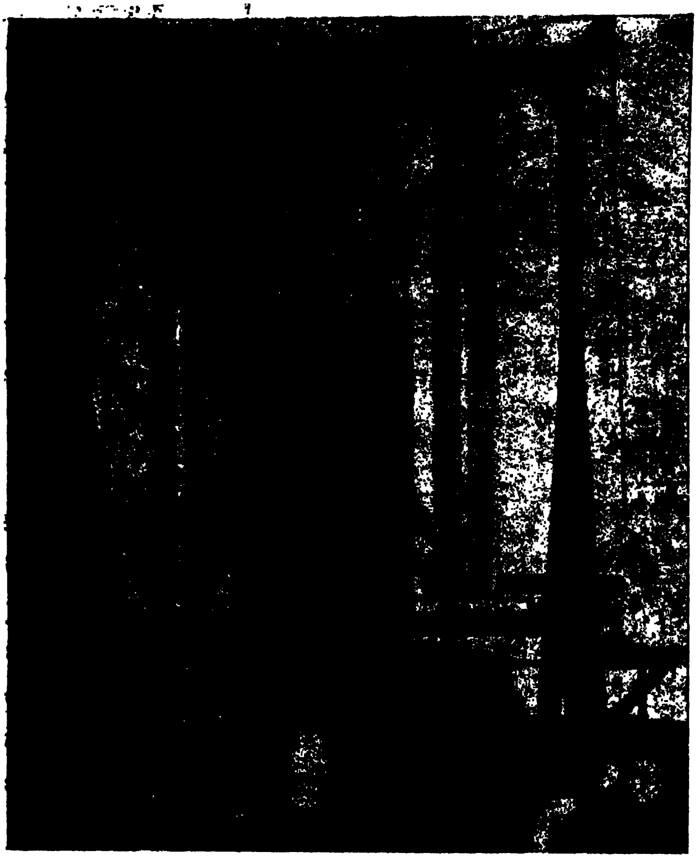
গ্রাহক - যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ কাঠের উপর কেমনভাবে সাজাইয়া বসাইতে হইবে তাহা ছবি ও নক্সা হইতে বেশ বুঝা যাইবে। তারের কুণ্ডলী ও কৃষ্ট্যাল্ বসান হইলে Binding Screwগুলি ছবি দেখিয়া ঠিক জায়গায় বসাও। একটা স্ক্রু (ক) আকাশ-তারের জন্য, একটা (খ) মাটীর তারের জন্য আর দুইটা (গ ও ঘ) টেলিফোনের জন্য। এইবার একটু তার দিয়া খ-কে ঘ-এর সঙ্গে ও কৃষ্ট্যালটি গ-এর সঙ্গে যোগ করিয়া দাও। কৃষ্ট্যালের আর এক অংশ চ ও Binding Screw ক হইতে দুইটা flexible তার লইয়া তাহাদের মুখে দুইটা ক্লিপ্ লাগাইতে হইবে (কাগজ আট্কাইবার যেমন clip সেই রকম হইলেই চলিবে)। এই দুইটা মুখ কুণ্ডলীর গা হইতে যে ছেড়ান তার বাহির হইয়াছে সেইখানে সুবিধা-মত জায়গায় লাগাইতে হইবে। এইবার কুণ্ডলীর নীচের দিকের তার ঘ-এর সঙ্গে যোগ করিয়া দাও।

জমির তার

গ্রাহক-যন্ত্র হইতে যে তার মাটিতে যাইবে তাহা পূর্ব্বোক্ত আকাশ-তারের মত ৭/২২ নং হইলেই চলিবে। একটা বিস্কুটের টিনে দুইটা ছিদ্র করিয়া তারটা তাহাতে আট্কাইয়া টিনটা মাটীর তলায় হাত দুই নীচে পুঁতিলে বেশ ভাল ফল পাওয়া যায়। জমি অনেক নীচে হইলে—যেমন গ্রাহক-যন্ত্র যদি দুই তলায় অথবা তিন তলায় থাকে—তবে কাছাকাছি জলের কল থাকিলে



৬নং চিত্র—গ্রাহক-যন্ত্রের নক্সা—খ



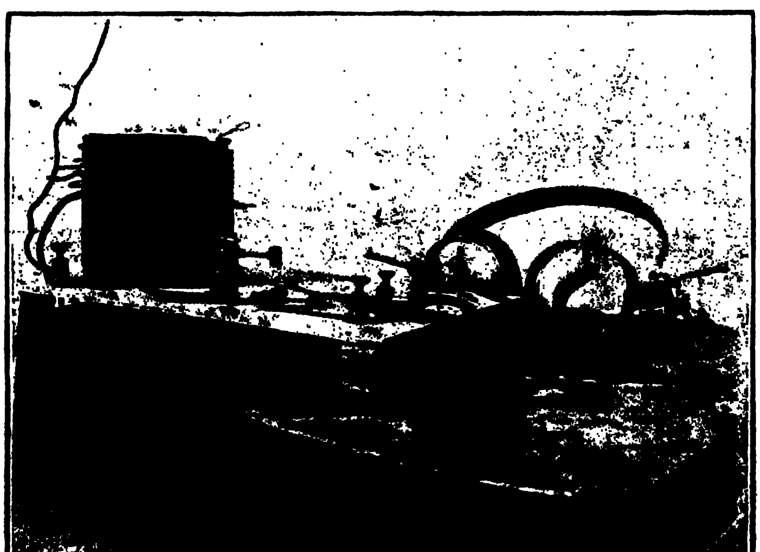
৭নং চিত্র—নৈসর্গিক বৈদ্যুতিক উৎপাত ধরিবার যন্ত্র

নৈসর্গিক বৈদ্যুতিক উৎপাৎ (Atmospherics) কখন কোন্ সময় কোন দিক হইতে আসে, কখন ইহার হ্রাস বৃদ্ধি হয়, ইত্যাদি খবর জানা অত্যন্ত দরকার। বিজ্ঞান কলেজে প্রস্তুত এই যন্ত্র অহোরাত্র ২৪ ঘণ্টা যখন যেদিক হইতে যেরকম Atmospherics আসুক না কেন তাহা ধরিয়া নীচে ড্রামে জড়ান কাগজের উপর তাহাদের সাড়া আঁকিয়া লয়

তাহার পাইপের গায়ে তারটিকে বেশ ভাল করিয়া জড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। একটা বিষয়ে খুব সাবধান। যখন গ্রাহক-যন্ত্র ব্যবহার হইতেছে না, সে-সময়ে সর্ব্বদা আকাশ-তার মাটীর তারের সঙ্গে এক সঙ্গে জড়াইয়া রাখিবে। এরূপ না করিলে আকাশ-তারে বজ্রপাতের সম্ভাবনা থাকে।

কার্য্যপ্রণালী

এইবার গান শুনিতে হইলে যখন বেতার broad-casting হইতেছে সেই সময়ে যন্ত্রটা নক্সামাফিক ঠিক লাগান হইয়াছে কি না দেখিয়া Crystal-এর উপরের তারটা Crystalএ ঠেকাইয়া রাখ। এইবার টেলিফোন কানে লাগাইয়া ক ও চ দুই-এর flexible তার একত্র করিয়া এক-সঙ্গে কুণ্ডলীর বিভিন্ন অংশে ঠেকাইয়া দেখ যে কোন্ জায়গায় আওয়াজ বেশী জোর হইতেছে। ক্রিষ্ট্যালের উপরের তার একটু নাড়া চাড়া করিলে হয়ত দেখা যাইবে যে, একটি জায়গায় বেশ ভাল শুনা যাইতেছে,



৮নং চিত্র—গ্রাহক-যন্ত্রের ফটো গ্রাফ; প্রবন্ধে বর্ণিত প্রণালীমত প্রস্তুত

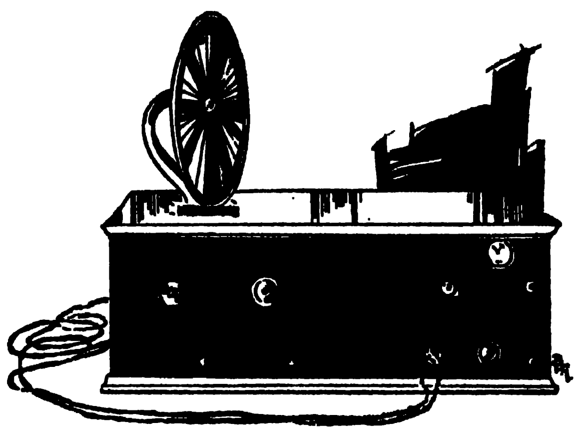
শ্রীশিশির কুমার মিত্র

ক্রিষ্ট্যালের সব জায়গা সমানভাবে বেতার-বার্ত্তার সাড়া দেয় না। একটু অভ্যাসেই সমস্ত কাজটা বেশ সহজ হইয়া আসিবে। অনেক সময় ক ও চ কুণ্ডলীর বিভিন্ন জায়গায় লাগাইলে আওয়াজ জোর ও ভাল শুনা যাইবে। একটু অভ্যাসের পর এই সব পরীক্ষা করা যাইতে পারে।

জিনিষের তালিকা

(১) ১২"×৮" এক টুকরা কাঠ, (২) আন্দাজ ৩॥০ ইঞ্চি ব্যাস ও ৬ ইঞ্চি লম্বা বাঁশের অথবা পেষ্ট বোর্ডের চোঙা, (৩) holder সমেত একটি ক্রিষ্ট্যাল, Galena (৪) টেলিফোন, (৫) ৩০ গজ বিশ নম্বরের D. C. C. তামার তার, (৬) ১০০ ফুট 7/22 bare copper wire, (৭) ৪টা বাইণ্ডিং স্ক্রু. (৮) ২টা কাগজ আঁটিবার clip, (৯) চারটা insulator।

ইহার মধ্যে টেলিফোনের একটু বেশী দাম—১৩৲।১৪৲—টাকা হইতে পারে। বাকি সব জিনিষ ১০৲ টাকার মধ্যে কিনিতে পাওয়া যায়।





২

দ্বিপ্রহরে দ্বিজনাথের আহারের সময়ে কমলা আপত্তি তুলিল। বলিল, "বাবা, তখন তুমি ফস্ ক'রে ছবি আঁকানোর কথা স্থির ক'রে ফেল্‌লে, আমি বিনয়বাবুর সামনে বিশেষ কিছু আপত্তি করতে পারলাম না, কিন্তু এ ঠিক হ'ল না বাবা!"

কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া ঔৎসুক্যের সহিত দ্বিজনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?—ঠিক হ'ল না কেন? কি তোমার আপত্তি?"

মৃদু হাসিয়া মাথা নাড়িয়া কমলা বলিল, "না বাবা! বড্ড হাঙ্গামের ব্যাপার! চোদ্দ-পনের দিন ধ'রে রোজ দু-ঘণ্টা কাঠের পুতুলের মত ব'সে থাক্‌তে হবে—আর একজন দেখে দেখে ছবি আঁক্‌বে! উঃ! এ কিছুতেই পারব না! ফটো তোলাতে পাঁচ মিনিটে প্রাণান্ত হয়—আর এ দু-ঘণ্টা!"

কমলার কথা শুনিয়া দ্বিজনাথ হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন, "ফটো তোলানোর সামান্য ব্যাপারে পাঁচ মিনিটে যে-শাস্তি ভোগ করতে হয় এ-তে তোমার দু-ঘণ্টাতেও তা হবে না। ছোটো জিনিষের শাসনের যন্ত্রণাই আলাদা,—তা সে মানুষই হ'ক, আর যন্ত্রই হ'ক। একার দু-ঘণ্টা চড়লে যা কষ্ট হয়, এরোপ্লেনে দু-দিনে বোধ হয় তা হয় না। ফটো তোলানোর মত তোমাকে ত' নিঃশ্বাস রোধ ক'রে ব'সে থাক্‌তে হবে না। সামান্য নড়া-চড়ায় কোনো ক্ষতি হবে না তা'ত তুমি নিজেই তখন শুন্‌লে।"

"কিন্তু দু-ঘণ্টা এক জায়গায় ব'সে থাক্‌তে হবে ত চুপ ক'রে?"

দ্বিজনাথ কহিলেন, "তাতে ক্ষতি কি? সে ত বরং একটা ছোট-খাটো যোগাভ্যাসেরই মতো হবে। ছেলেবেলায় পড়বার ঘরে আমি দশমিনিট একসঙ্গে বস্‌তে পারতাম না—বই ফেলে রেখে বেরিয়ে পড়তাম। তারপর ধরা পড়লে অভিভাবকদের শাসনে আবার গিয়ে বস্‌তে হ'ত। কিন্তু সে কতক্ষণের জন্য? একটু ফাঁক পেলেই আবার বেরিয়ে পড়তাম। আমার পায়ে যেন এমন কোনো কল লাগানো ছিল যা দশ-পনেরো মিনিটের বেশী ব্রেক্ মান্‌তো না। তারপর একদিন গাছ থেকে প'ড়ে পা ভাঙলাম। তার ফলে কি হ'ল জান?—তিন মাস স্প্লিণ্ট্ দিয়ে আমার পা বাঁধা ছিল—নড়বার উপায় ছিল না। সকালে আমাকে পড়বার ঘরে টেবিল চেয়ারের সাম্‌নে বসিয়ে দিত; বাধ্য হ'য়ে দু-তিন ঘণ্টা বই-খাতাপত্র নিয়ে স্থির হ'য়ে ব'সে থাক্‌তে হ'ত—যা'র ক'রে না আন্‌লে আর বেরোবার উপায় ছিল না। দিনের পর দিন এই অভ্যাসের ফলে তিনমাস পরে যখন আমার পা সচল হ'ল তখন দেখা গেল, মন আর আগের মত চঞ্চল নেই; তখন থেকে পড়বার ঘরে আমার পা মনের অধীনতায় স্থির হ'য়ে লেখাপড়া ক'রত।" বলিয়া দ্বিজনাথ হাসিতে লাগিলেন।

কমলা সহাস্যমুখে বলিল, "কিন্তু বাবা, পড়বার ঘরের বাইরে যদি আমাকে স্থির হ'য়ে ব'সে থাক্‌বার যোগাভ্যাস

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

কর্‌তে হয় তাহ'লে হয়ত তার ফলে পড়্‌বার ঘরে ঢোক্‌বার ইচ্ছেটাই কমে যাবে।"

দ্বিজনাথ কহিলেন, "সে ইচ্ছে তোমার এত বেশী পরিমাণে আছে যে, একটু ক'মে গেলেই বোধ হয় ভাল হয়। তা ছাড়া এর উপস্থিত ফল এই হবে যে, তোমার একখানি ছবি পাওয়া যাবে আর আর্টিষ্ট্‌ কিছু টাকা পাবেন।"

কমলা বলিল, "তা বেশ ত; তোমার কিম্বা পদ্ম-ঠাক্‌মার ছবি হ'ক না—আর্টিষ্ট্‌ও টাকা পান্‌।"

নিকটে দাঁড়াইয়া একটি প্রৌঢ়া বিধবা দ্বিজনাথের আহারের তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন; ইঁহারই নাম পদ্মমুখী। সম্পর্কে ইনি দ্বিজনাথের দূরসম্পর্কীয়া পিসি—নিঃসন্তান অবস্থায় বিধবা হইবার পর দ্বিজনাথের সংসারে আশ্রয় পান। নিষ্ফল নিরবলম্ব জড় জীবনকে কর্ম্ম-স্রোতে ফেলিয়া যথাসম্ভব সচল করিবার উদ্দেশ্যে দ্বিজনাথের মাতা পদ্মমুখীর উপর সংসার পরিচালনার ভারার্পণ করেন। তদবধি পদ্মমুখী সংসারের কর্ত্রীস্বরূপ আছেন। কমলার কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "রক্ষে কর্‌ ভাই! পদ্মঠাক্‌মার আর ছবিতে কাজ নেই। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে—এখন তোদের আশ্রয় ছেড়ে কোনো রকমে মা গঙ্গার আশ্রয়ে যেতে পারলেই বাঁচি!"

শেষোক্ত কামনাটি পদ্মমুখী কথায়-বার্ত্তায় সুবিধা পাইলেই ব্যক্ত করিতেন, সুতরাং নির্ব্বিচারে বহু ব্যবহারের ফলে কথাটি সকলের কাছে এমন সহজ হইয়া গিয়াছিল যে, তাহা লইয়া কৌতুক-পরিহাস করিতেও কাহারো বাধিত না—বিশেষত কমলার।

কমলা হাসিয়া বলিল, "তাহ'লে ত' তোমারই ছবি আঁকানো সকলের চেয়ে বেশী দরকার পদ্ম-ঠাক্‌মা?"

পদ্মমুখী কহিলেন, "কিছু দরকার নেই ভাই। যম যে-দিন নিতে আসবে সে-দিন আমাকে একবারেই ছুটি দিস্‌। তারপরো আমাকে দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখ্‌বার ব্যবস্থা করিস্‌নে!"

কমলা বলিল, "কিন্তু ছবি না আঁকা হ'লেও ত' তোমার সে ফাঁড়া কাট্‌ছে না পদ্ম-ঠাক্‌মা!—ফটো ত' তোমার অনেকগুলিই আছে—তা থেকে এন্‌লার্জ্জমেণ্ট করিয়ে অনায়াসেই দেওয়ালে টাঙানো যেতে পারবে!"

এ কথায় অবশ্য পদ্মমুখীর মুখে বেদনা অথবা বিহ্বলতার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। মৃত্যুর পরেই এই বাসনা-কামনা-মোহ-মমতার জালে জড়িত জীবনের সমস্ত স্মৃতি নিঃশেষে বিলুপ্ত না হইয়া কোনো একটা উপায় অবলম্বনে কিছুকাল বাঁচিয়া থাকিবে, এ লোভ হইতে পদ্মমুখীর মত মানুষও মুক্ত নয়। জীবন যে নশ্বর, এই মহাদুঃখের এইটুকু সান্ত্বনার জন্য সাধারণ মানবচিত্ত লুব্ধ।

কথায় কথায় কথাটা এমন গতি লইল যে, মিনিট পাঁচেক পরে কাহারো মনে রহিল না, কথাটার উৎপত্তি কেমন করিয়া কোথায় হইয়াছিল।

৩

পরদিন প্রাতঃকালে যথাসময়ে আর্টিষ্ট্‌ বিনয়ভূষণ দ্বিজনাথের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। চিত্রাঙ্কনের সমস্ত সরঞ্জাম সে লইয়া আসিয়াছিল।

দ্বিজনাথ তখন গৃহ সম্মুখে পুষ্পোদ্যানে বেড়াইতেছিলেন। বিনয় নিকটে আসিয়া অভিবাদন করিয়া স্মিতমুখে বলিল, "আমি কি একটু আগেই এসেছি?"

দ্বিজনাথ সহাস্যমুখে বলিলেন, "আগে আসেন নি, ঠিকই এসেছেন। আর যদিই বা একটু আগে এসে থাকেন তাতে কোনো ক্ষতি হয়নি। চলুন, বসবেন চলুন। কমলারও তৈরী হ'তে বোধ হয় একটু দেরী আছে।"

ব্যস্ত হইয়া বিনয় বলিল, "তা থাক্‌—তার জন্যে তাড়াতাড়ি করবার কোনো দরকার নেই। জিনিষগুলো গুছিয়ে নিতেও ত' আমার সময় লাগ্‌বে। তাছাড়া কোথায় ব'সে ছবি আঁকা সুবিধা হবে—তাও ঠিক ক'রতে হবে।"

"বেশ, প্রথমে তাহ'লে সেইটেই ঠিক করুন।" বলিয়া দ্বিজনাথ বিনয়কে লইয়া বারাণ্ডায় উপস্থিত হইলেন এবং গৃহের তিন দিকের বারাণ্ডা, ড্রয়িংরুম এবং অপরাপর স্থান দেখাইলেন। সমস্ত ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া বিনয় পূর্ব্বদিন দক্ষিণের বারাণ্ডায় যেখানটায় আসিয়া বসিয়াছিল সেইখানটাই পছন্দ করিল। আলো-ছায়ার সমন্বয়, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের আবেষ্টন—এ সব সুবিধা সেখানে ত' ছিলই, তাহা ছাড়া আর যে সেখানে এমন-কি জিনিষ ছিল যাহার জন্য অপর কোনো জায়গাই তাহার

পছন্দ হইল না সে হিসাব সে একেবারেই করিল না। মনে করিল, এই রকম অকারণ পক্ষপাত মানবচিত্তের একটা সাধারণ ধর্ম্ম,—এবং মনের এই স্বাভাবিক গতিকে নির্ব্বিবাদে অনুসরণ করিলে সফলতার পথ সুগম হয়।

দ্বিজনাথকে সে বলিল, "এই জায়গাটাই আমি পছন্দ করছি, অবশ্য যদি-না আপনাদের কোনো রকম অসুবিধা হয়।"

দ্বিজনাথ বলিলেন, "আমাদের আবার অসুবিধা কি হবে? আপনি দরকার মতো আপনার সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করে নিন্।"

দ্বিজনাথের আহ্বানে একজন ভৃত্য আসিয়া উপস্থিত হইল। দ্বিজনাথ তাহাকে বলিলেন, "বাবু যেমন-যেমন বল্‌বেন সব ঠিক্ ক'রে দে। আর বাবুর কাছে তুই বরাবর থাক্‌বি।"

আলো ও ছায়ার সমাবেশ হিসাব করিয়া বিনয় তাহার ইজেল্ এবং কমলার বসিবার জন্য একটি চেয়ার স্থাপন করাইল। তাহার পর ইজেলের সম্মুখে নিজের বসিবার চেয়ার রাখিয়া পাশে একটা ছোট টেবিলে ছবি আঁকিবার সমস্ত সরঞ্জামগুলি সযত্নে সাজাইয়া লইল।

একজন ভৃত্য কিছুপূর্ব্বে বিনয়ের জন্য খাবার ও এক পেয়ালা চা রাখিয়া গিয়াছিল, দ্বিজনাথ বলিলেন, "চা-টা খেয়ে নিন্ বিনয়বাবু। কমলার আস্‌তে এখনও পাঁচ-সাত মিনিট দেরী আছে।"

বিনয় বলিল, "তা থাক্; কিন্তু অনর্থক এ-সব হাঙ্গামা কেন করলেন?—আমি ত' বাসা থেকে চা খেয়ে বেরিয়েছি।"

দ্বিজনাথ বলিলেন, "সে ত' অনেকক্ষণ হ'ল। কাজ করতে বস্‌বার আগে এক পেয়ালা গরম চা মন্দ লাগবে না। তা'ছাড়া খাবারই বা এমন কি দিয়েছে?—নিন্, ও-টুকু খেয়ে ফেলুন।"

আর আপত্তি না করিয়া বিনয় চায়ের পেয়ালা তুলিয়া লইল, এবং সেই অবসরে দ্বিজনাথ বিনয়ের পরিচয় গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলেন।

বিনয়ের মুখে তাহার পরিচয়ের বিচিত্র কাহিনী শুনিয়া দ্বিজনাথের সহানুভূতি এবং করুণার পরিসীমা রহিল না! অতি শৈশবে বিনয়ের পিতামাতার মৃত্যু হয়। মাতার মৃত্যু সময়ে তাহার বয়ক্রম মাত্র পাঁচ বৎসর। জননীর স্নেহোদ্ভাসিত সুন্দর মুখখানি তাহার বেশ মনে পড়ে। মৃত্যুকালে সে মুখে বিনয় যে নিদারুণ বেদনার চিহ্ন দেখিয়াছিল জীবনে কখনো সে তাহা ভুলিবে না। মাতার মৃত্যুর কিছুকাল পরেই পিতার দুরারোগ্য পীড়া জন্মে। পীড়িত অবস্থায় মৃত্যুর কিছুপূর্ব্বে পিতা তাহার সহায়হীন ভবিষ্যৎ জীবনের কথা ভাবিয়া সামান্য কিছু অর্থের সহিত তাহাকে ইংরেজ মিশনারীদের এক অনাথ-আশ্রমে স্থাপন করেন। মিশনারীদের অভিভাবকতায় বিনয় স্কুল ও কলেজের পড়া শেষ করে। বাল্যকাল হইতে চিত্রবিদ্যায় তাহার অনুরাগ এবং নৈপুণ্যের জন্য মিশনারী কর্ত্তৃপক্ষ চিত্রবিদ্যা শিখাইবার জন্য তাহাকে ইউ-রোপে প্রেরণ করেন। পাঁচ বৎসর তথায় বিভিন্ন দেশে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়া অসামান্য খ্যাতি লইয়া সে দেশে ফিরিয়া আসে। পিতৃদত্ত অর্থ বহুপূর্ব্বে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে—এখন সে স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জন করিতেছে। পিতার নাম ছিল প্রিয়কান্ত রায়। তাহাদের বাড়ী কোন্ জেলার কোন্ গ্রামে ছিল তাহা সে কিছুই জানে না।

আসন্ন শরতের নির্ম্মল আকাশ দিয়া মাল্যের মত সুসংবদ্ধ বৃহৎ একদল বনহাঁস উড়িয়া যাইতেছিল—তাহাদের ক্রমবিলীয়মান ঐক্যতানিক কণ্ঠস্বর বায়ুমণ্ডলে একটা যেন অনৈসর্গিক হতাশার কাকুক্তি জাগাইয়া তুলিয়া-ছিল। দূরে ডিগ্‌রিয়া পাহাড়ের তলদেশে গোচরভূমিতে গো-মহিষের দল চরিয়া বেড়াইতেছিল—তাহাদের কণ্ঠলগ্ন ঘণ্টার বিচিত্র ঢং ঢং ধ্বনি স্পষ্ট শুনা যাইতেছিল।

দ্বিজনাথ বলিলেন, "আপনার ভবিষ্যৎ জীবনে একটা অসাধারণ পরিণতি অপেক্ষা ক'রছে বিনয়বাবু। সহজ মানুষের সাধারণ জীবন আপনার হবে না।"

মৃদু হাসিয়া বিনয় বলিল, "তার কোনো লক্ষণ ত' এ পর্য্যন্ত দেখ্‌তে পাচ্ছিনে!"

দ্বিজনাথ বলিলেন, "লক্ষণ সে-ই দেখ্‌তে পায়, যে দূর থেকে হঠাৎ এক-সময়ে দেখে। খুব কাছ থেকে সব লক্ষণ দেখা যায় না।"

অন্তরাগ

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

পর্দা ঠেলিয়া কমলা প্রবেশ করিল,—সুসজ্জিতা সুন্দরী কমলা। গণ্ডে তাহার বালার্কের আভা, মুখে সকুণ্ঠ মধুর হাস্য।

যুক্তকরে বিনয়কে নমস্কার করিয়া সে অনুতপ্ত স্বরে বলিল, "ক্ষমা করবেন বিনয়বাবু, আজ আপনার অনেকখানি সময় আমি নষ্ট করেছি। কাল থেকে আর তা হবে না। কাল থেকে আমি আপনি আসবার অনেক আগে তৈরী হয়ে থাক্‌ব।"

বিনয় নম্রকণ্ঠে বলিল, "না, আপনি তা কখনো করবেন না। সহজভাবে প্রস্তুত হ'তে আপনার যতখানি সময় লাগে তা' লাগাবেন। আপনাকে বিব্রত বিরক্ত ক'রে রাখলে আমার কোনো লাভ হবে না। আপনি যে-সময়ে স্বেচ্ছায় সহজভাবে প্রস্তুত হবেন, জানবেন আমার পক্ষে সেইটেই সু-সময়।"

নিঃশব্দ মৃদুহাস্যে এ-কথার উত্তর দিয়া কমলা বলিল, "ঐ চেয়ারটায় আমি বসব কি?"

"বসুন, চেয়ারটা আগে আমি একটু ঠিক ক'রে দিই।" বলিয়া চেয়ারটা একটু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বিনয় বলিল, "এবার বসুন।"

কমলা চেয়ারে উপবেশন করিলে দ্বিজনাথ বলিলেন, "বসবার ভঙ্গী আপনি কিছু ঠিক ক'রে দেবেন কি?—না, এই ঠিক্ হয়েছে?"

বিনয় বলিল, "কিছু ঠিক্ করবার দরকার নেই—এই ঠিক্ হয়েছে। দেখুন, আমি ত' শুধু ওঁর আকৃতি আঁক্‌ব না—ওঁর প্রকৃতিও আঁক্‌ব; কাজেই ওঁর ভঙ্গীর মধ্যে আমার অভিরুচি খাটালে চল্‌বে কেন?"

অনেক শিল্পীকে পোর্ট্রেট আঁকিতে দ্বিজনাথ দেখিয়াছেন কিন্তু কাহারো মুখে এ ধরণের কথা তিনি কখনো শোনেন নাই। বিনয়ের কথায় মনে মনে প্রসন্ন হইয়া তিনি বলিলেন, "ঠিক বলেছেন বিনয়বাবু,—আপনি দেখ্‌ছি একজন প্রকৃত আর্টিষ্ট্।"

মৃদু হাসিয়া বিনয় বলিল, "আর্টিষ্ট্ এত কম যে, প্রকৃত আর্টিষ্ট্ নেই বল্‌লেই চলে।" তাহার পর কমলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "দেখুন, বল্‌ছিলেন আমার সময় আপনি নষ্ট করেছেন। তা যদি সত্যি হয় তাহ'লে আমি আপনার সে ঋণ পরিশোধ করব আপনারও সময় একটু নষ্ট করে। আজ আঁকার চেয়ে আপনার সঙ্গে কথাবার্ত্তায় আমি একটু বেশী সময় দিতে চাই; আপনার তা'তে আপত্তি হবে না ত'?"

মৃদু হাসিয়া কমলা বলিল, "আপত্তি? আমি বরং তা'তে খুসী হব! কথাবার্ত্তার চেয়ে আঁকাতেই আমার বেশী আপত্তি।"

দ্বিজনাথ কহিলেন, "দেখুন বিনয়বাবু, আমাদের বি, এ একজামিনের ফিজিক্সের পেপারে প্রশ্নের আগে একটা মন্তব্য লেখা ছিল,—'*Spend more time in thinking than in writing*'—আপনারও দেখছি সেই প্রণালী।"



মৃদু হাসিয়া বিনয় বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক সেই প্রণালী।"

(ক্রমশঃ)

সহযোগী-সাহিত্য

আমেরিকায় বাঙালী লেখক—ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বিদেশী ভাষায় রচনা করিয়া ভারতবর্ষের যে-সব কবি খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই বাঙালী—ইহা আমাদের গৌরবের কথা সন্দেহ নাই। তরু দত্ত, মনোমোহন ঘোষ, সরোজিনী নাইডু, রবি দত্ত বা হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের রচনার সহিত শিক্ষিত বাঙালীর অল্পবিস্তর পরিচয় আছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে যাঁহার কথা বলিব, তিনিও বাঙালী। ইংরেজিতে গ্রন্থরচনা করিয়া তিনি পাশ্চাত্য দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।

আঠারো বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় যেদিন জাপানের তোকিও শহরে পদার্পণ করিলেন, তাঁহার সেদিনের রূপটি বেশ মনে পড়ে। শ্যামবর্ণ, একহারা চেহারা, পরণে নীল সার্জ্জের বেমানান ইংরেজি পোষাক, বয়সে যুবক অথচ আকৃতি ও প্রকৃতি বালকের মত! স্নিগ্ধ সরল মুখখানিতে বুদ্ধির ছাপ এমনি পরিষ্কার, যে তাহা চোখে পড়িবেই! ভাসা-ভাসা টানা-টানা দুই চোখে স্বপ্নের ছায়া, বেশে-বেশে পারিপাট্যের চিহ্নমাত্র নাই!

কথায় কথায় বুঝিলাম, কি যে করিবেন তাহার স্থিরতা নাই। বাহিরের ডাক মনের মাঝে পৌঁছিতেই অকস্মাৎ ঘরের বাঁধন কাটিয়া অজানার উদ্দেশে পাড়ি জমাইয়াছেন শুনিয়া সেই গৃহ-পলাতক নিঃসম্বল মানুষটির প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইলাম।

ক্রমে তাঁহার সাংসারিক কথা কিছু কিছু শুনিতে লাগিলাম। বাপ নাই, প্রথম দুটি ভাইও পরলোকে। দ্বিতীয় ভাইটি সাহিত্যিক ও কবি ছিলেন; তাঁহার কথা ধনগোপালের মুখে অনেকবার শুনিয়াছি।

দিনে দিনে আমাদের পরিচয় নিবিড় হইয়া উঠিল। বয়সে আমার কনিষ্ঠ হইলেও তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধিকে শ্রদ্ধা না করিয়া পারিলাম না। অল্পে তুষ্ট সেই সদানন্দ লোকটির মুখে নিত্য নূতন কথা শুনিতে লাগিলাম।

সংস্কৃত কাব্য ও নাটকের অল্পস্বল্প আলোচনা চলিতে লাগিল। দেখিলাম, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, শকুন্তলা, তাঁহার অপরিচিত নয়। রবিবাবুর "গোরা" তখন 'প্রবাসী'তে বাহির হইতেছিল। মনে পড়ে, 'প্রবাসী'র আসার আশায় দিন কাটাইতাম, কাগজ পৌঁছিলেই অধীর আগ্রহে দুজনে পড়িতে বসিতাম। একজন হইত পাঠক, অপরজন শ্রোতা।

সত্যেন্দ্রনাথের "তীর্থ-সলিল" একদিন হস্তগত হইল। সে এক স্মরণীয় ঘটনা। দুর্ভিক্ষপীড়িত ক্ষুধিতের সম্মুখে স্তরে স্তরে সুখাদ্য-সম্ভার সাজাইয়া দিলে তাহার যেমন অবস্থা হয় আমাদেরও তেমনি হইল—একেবারে দিশাহারা হইয়া গেলাম, সবই চমৎকার, কোন্‌টি ফেলিয়া কোন্‌টি পড়ি! মনে হইল, সেই 'শত-তীর্থের-জলে'-ভরা সোনার কুম্ভ একেবারে গ্রাস করিতে পারিলে যেন তৃপ্তি হয়!

দু'জনে দিবাস্বপ্ন দেখিতাম। ফরাসী-বিপ্লবের নাম শুনিয়াছিলাম মাত্র, ইতিহাস জানিতাম না। বন্ধু বলিলেন, তিনি কিছুকিছু জানেন। তাঁহারই কল্যাণে মারাত্, দাঁত, রব্‌স্‌পিয়েরের সঙ্গে পরিচয় হইল; নির্ম্মমতার প্রতীক বাস্তিলের পাষাণপুরী মনশ্চক্ষে দেখিয়া লইলাম! ফরাসীর জাতীয় জীবনের শতেক দুর্গতি, অধীনতার লাঞ্ছনা ও অত্যাচারের বিভীষিকা বিপ্লবের আগুনে কেমন করিয়া ভস্মসাৎ হইল; রক্তস্রোতের মাঝে, অসীম বেদনার ভিতর দিয়া কিরূপে একটা জাতির নবজন্ম হইল; কত স্বার্থের, ভাবের, মতের সংঘাত—তাহারই ফলে এক দিকে হিংসাদ্বেষের বিষবাষ্প, অপর দিকে ত্যাগের, ধৈর্য্যের, বীর্য্যের অম্লান মহিমা দেখিয়া বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না।

বছর না ঘুরিতেই বন্ধু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, আমেরিকায় যাইব। শূন্যহাতে কিরূপে তা' সম্ভব জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, ব্রাহ্মণের ছেলে, ভিক্ষা করিব! করিলেনও

তাই, ভিক্ষার ঝুলিই ধরিলেন—অবশ্য তাঁহার দেশ-বাসীরই কাছে। তা'র পর একদিন জাহাজের ডেকে চড়িয়া প্রসন্ন-মনে তিনি নূতন দেশে যাত্রা করিলেন। একটিমাত্র নীল সার্জে'র পোষাকে জাপানে আসিয়াছিলেন, উহাই সম্বল করিয়া জাপান ছাড়িলেন।

আমার স্বপ্ন-দেখার সাথী চলিয়া গেল—কিন্তু তাঁহার মুখে শোনা বিপ্লব-কাহিনীর নেশা টুটিলনা। তাই ক্রমে ক্রমে লোমার্তিন্, কার্লাইল্, ক্রপট্কিন্ সকলকেই আমার নির্জ্জন আসরে ডাকিয়া আনিলাম—সেই অসম্পূর্ণ কাহিনী শেষ করিবার জন্ম।

দেশে ফিরিলাম। ঘরে-বাহিরে সংগ্রাম করিতে করিতে লেখাপড়ার নেশায় মাতিয়া উঠিলাম—কোথা দিয়া বছর-সাতেক কাটিয়া গেল জানিতেও পারি নাই। বন্ধুর কথা যে মাঝেমাঝে মনে না পড়িত তাহা নয়, তবে ঐ পর্য্যন্ত। যে-পথে চলিয়াছিলাম সে-পথে তাঁহার আর সাক্ষাৎ পাইব আশা ছিল না! কিন্তু হঠাৎ একদা পথের বাঁকে তাঁহার দেখা পাইয়া ভুল ভাঙিয়া গেল। একদিন আমেরিকার ছাপ-মারা একটি পার্শেল হস্তগত হইল। খুলিয়া দেখি বন্ধুর লেখা দু'খানি ইংরেজি বই—একখানি গীতিনাট্য, অপর খানি কাব্যগ্রন্থ।* কাব্যখানি খুলিয়া পড়িতে পড়িতে বর্ষারাত্রির এই ছবিটি চোখে পড়িল—

Like tears shed over a dream,
Like sighs that stream
In an unseen nameless way
Into the heart of our lay.

It seemed hour on hours,
Years like fading flowers
Scattered their petals and bloom
In a half-lit forest of gloom.

The softness of its sounds,
Like the coursing of a million hounds
Of dream over the glade of sleep
Where tortured silences creep.
Exquisite, pain-laden, peaceful,
This night most beautiful,
What love forsaken by loving
Sets his heart a' singing?

No torment in it, but tenderness;
A liquid star-music of sadness
Pours into my soul half asleep;
While the willows at my window weep.

তা'র পর দেখিলাম সূর্য্যাস্তকালের ছবি—

Two shadows fell, tremulous and frail,
From the upland over the lake-surface pale,
While the shivering reeds shook at sunset,
As the swans sailed into a sea of jet.

The rippling waters, and the breeze,
And the shadows that fall from the trees,
Mingled and melted with the twain,
A song of white washed away by its black refrain.

Only words remained, palpitating and few,
Falling through the gloom and night's dew
Like jewelled fancies rising out of a dream
That live for a moment and die ere they gleam.

২

জীবনে সকলের এক পথ নহে, হইতেও পারে না। কিন্তু যেটি যা'র পথ, প্রায়ই দেখা যায়, মানুষ দৈব-বিড়ম্বনায় সে পথে পদার্পণ করে না। হয়ত যা'র কবি উচিত ছিল, সে হইতে যায় উকীল, যা'র দালালি করার কথা, সে হইতে চায় কবি! ফলে দু'জনেরই অবস্থা

* 1. Layla-Majnu—A Musical Play in Three Acts, 1906.
2. Sandhya—Songs of Twilight. 1917.

শোচনীয় হইয়া উঠে, এবং কাব্যামোদী পাঠকের দুর্গতির আর অন্ত থাকে না।

অদৃষ্ট ধনগোপালের সহিত পরিহাস করে নাই দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। প্রবাসের পথে শূন্যহাতে যিনি পা দিয়াছিলেন, রসসৃষ্টির পথে সে-অবস্থায় তিনি নামেন নাই—এটুকু বেশ বুঝিতে পারিলাম। আশা করিলাম, তাঁহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইবে। কিন্তু তখন ভাবিতেই পারি নাই, সে আশা অচিরকালের মধ্যে আশাতীতরূপে পূর্ণ হইবে।



ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়

কাব্য ও নাট্যরচনার পর তিনি গল্পরচনায় মন দিলেন। অক্লান্ত সাধনার ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁহার *Kari the Elephant, Caste and Outcast, Jungle Beasts & Men, My Brother's Face* প্রভৃতি গ্রন্থ পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশিত হইল।

আমাদের দেশের অরণ্যে অসংখ্য জন্তু-জানোয়ারের বাস। সেখানে যেমন বাঘ, ভালুক, বরাহ, হাতী, হরিণ, বাঁদর, ছোট-বড় মাঝারি কত রঙের কত রকমের বিষাক্ত ও অজগর সাপ আছে, তেমনি তাহাদের প্রতিবেশী অরণ্যচারী মানুষও আছে। তাহারা ঐ সমস্ত জন্তু-জানোয়ারের আবাসস্থল, আকৃতি ও প্রকৃতির সহিত বিশেষরূপে পরিচিত। ধনুর্ব্বাণ ও বর্শা লইয়া তাহারা উহাদিগকে শীকার করিয়া ফেরে; ভদ্র শিকারীকে হিংস্র জন্তুর সন্ধান বলিয়া দেয়। আরো আছে সাপুড়ে,—সাপ ধরা, সাপ খেলানো যাহাদের ব্যবসা; যাদুকর,—যাহারা তন্ত্রমন্ত্র জানে, ভোজবাজি দেখাইয়া ফিরে, চোখের সম্মুখে আমের আঁটি হইতে আমগাছ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে আম ফলাইয়া দর্শকদের মধ্যে বিতরণ করে, ধূলামুঠি যাহারা স্বর্ণমুঠিতে পরিণত করে। ইহাদেরি অবলম্বন করিয়া *Kari the Elephant* ও *Jungle Beasts and Men* রচিত হইয়াছে।

* * *

রাত্রে নির্জ্জন পাহাড়ের সানুদেশে করিযূথ সারি দিয়া চলিয়াছে চলমান অরণ্যের মত! সম্মুখে যুবকেরা, পশ্চাতে

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

যুবতীরা, মধ্যে আছে দুর্ব্বল শিশু ও স্থবিরের দল! সম্মুখ ও পশ্চাতের দল প্রহরীর কাজ করে,—তাহাদের সতর্কতার অন্ত নাই! বিপদের আশঙ্কা হইলেই থমকিয়া দাঁড়ায়, শুঁড় দিয়া বৃহদাকার প্রস্তরখণ্ড চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিতে থাকে! বিপদের আসান হইলে আবার তাহাদের যাত্রা সুরু হয়!

* * *

অরণ্যের মাঝে হস্তিনীর স্বয়ম্বরসভায় দুই হস্তী-যুবক দ্বন্দ্বযুদ্ধে মাতিয়াছে। অদূরে দাঁড়াইয়া হস্তিনী তাহাই দেখিতেছে। শুণ্ডে-শুণ্ডে, দন্তে-দন্তে, দেহে-দেহে ক্ষণে ক্ষণে সংঘর্ষ হইতেছে, আশপাশের গাছপালা ভাঙিয়া পড়িতেছে, তাহাদের বৃংহনে অরণ্য কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে! বৃক্ষচূড়ায় পাখীর এবং বৃক্ষশাখায় শাখামৃগের কলরবের আর অন্ত নাই! দীর্ঘকাল যুদ্ধ চলিতে লাগিল। যোদ্ধৃদ্বয়ের পায়ের চাপে ভূমিতল খনিত হইয়া খাদে পরিণত হইল, কাহারো দাঁত ভাঙিল, কাহারো দেহ রক্তাক্ত হইয়া উঠিল, শেষে মরণাহত পরাজিত করী আর্ত্তনাদ করিতে করিতে বনমধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল! বিজয়ী বীর তখন অগ্রসর হইয়া গিয়া সানুরাগে প্রেয়সীকে শুণ্ডপাশে বদ্ধ করিল!

* * *

অজগর হরিণকে অর্দ্ধগ্রাস করিয়াছে। মৃত্যু-কবলিত অসহায় জীব উদ্ধারলাভের ব্যর্থ প্রয়াসে ছটফট করিতেছে। অদূরবর্ত্তী ঝোপের মধ্যে বাঘ বসিয়াছিল, সে সাপটাকে দেখিতে পাইল না, দেখিল কেবল হরিণের উপরার্দ্ধটা। শীকার মিলিয়াছে ভাবিয়া সে লাফ দিয়া হরিণটার উপর গিয়া পড়িল। অমনি অজগর লেজ দিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। বিস্মিত বাঘ তখন হরিণকে ছাড়িয়া নাগপাশ মোচন করিবার চেষ্টায় অজগরকে থাবার ঘা'য়ে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া তুলিল। পরস্পরের বন্ধনে তিনটি জীব ক্রমশঃ মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল! *

এমনি কত অপরূপ কাহিনীতে বইখানি কেবল অল্প বয়স্ক নহে, বয়স্ক পাঠকেরও চিত্ত অধিকার করিয়া বসে। এ শ্রেণীর সাহিত্য রচনায় এক কিপ্‌লিং ব্যতীত আর কেহ বোধ করি এত কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই।

৩

Caste and Outcast ও *My Brother's Face*

ধনগোপালের শ্রেষ্ঠ রচনা। প্রথমোক্ত গ্রন্থখানি দুই অংশে বিভক্ত। 'Caste' অংশে ভারতবর্ষের কথা এবং 'Outcast' অংশে আমেরিকার কথা আছে। সেখানে পদার্পণ হইতে সুরু করিয়া গ্রাসাচ্ছাদন ও বিদ্যালাভের জন্য অক্লান্ত সংগ্রাম, দারিদ্র্যের দুঃখ, নৈরাশ্যের পীড়ন, জীবনের নানা পর্য্যায়ে বিভিন্ন প্রকৃতির নরনারীর সহিত পরিচয় প্রভৃতি বিবিধ তথ্য লেখকের অনবদ্য ভাষার মহিমায় উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে। পড়িতে পড়িতে চিত্ত মুগ্ধ মোহিত হইয়া যায়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অধুনালুপ্ত 'মহিলা' পত্রিকায় ইহার বঙ্গানুবাদ 'তরুণের অভিসার' নামে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

My Brother's Face পুস্তকাকারে মুদ্রণের পূর্ব্বে "Atlantic Monthly"-নামক আমেরিকার প্রসিদ্ধ মাসিক-পত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, ১৯২৫ সালে ইংলণ্ডে সর্ব্বাপেক্ষা-অধিক-বিক্রীত গ্রন্থাবলীর মধ্যে উহা স্থান পাইয়াছিল। রাজবন্দী ডাক্তার যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় গ্রন্থকারের অগ্রজ। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াই আলোচ্য পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে—গ্রন্থের উক্তবিধ নামকরণের ইহাই হেতু।

Caste and Outcast পুস্তকের Caste অংশের মতো *My Brother's Face* পুস্তকখানিতেও গ্রন্থকার ভারতবর্ষকে আঁকিয়াছেন। উভয় গ্রন্থেরই কাঠামো এক। প্রায় সমস্ত পরিচ্ছেদগুলিই স্ব-তন্ত্র, অথচ তাহাদের মধ্যে একটি নিগূঢ় যোগ-সূত্র যে নাই, এমন কথাও বলা যায় না।

বম্বাই-বন্দরে জাহাজ জেটিতে আসিয়া লাগিলেই তীর-ভূমির জনতা সম্মিলিত কণ্ঠে মহাত্মা গান্ধীর জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। তাহার পর লেখকের দৃষ্টিপথে পড়িল তাঁর অগ্রজের মুখখানি—*My Brother's Face!*

বম্বাইয়ের সহিত পরিচয় সুরু হইল। রাত্রে দু'জনে য়ুরোপীয় থিয়েটারে হাজির হইলেন। দেখিলেন, হাওয়াই-দ্বীপের একদল নর্ত্তক ও নর্ত্তকী চুলে হলুদ রঙের ফুল গুঁজিয়া, খড়ের ঘাঘ্‌রা পরিয়া নাচিতেছে, গাহিতেছে,

বাজাইতেছে! আর সাহেবী পোষাক-পরা কালিদাসের বংশধরেরা তাহা দেখিয়া বাহবা দিতেছে!

রণে ভঙ্গ দিয়া তাঁহারা চুলিয়ায় কলের শ্রমিকদের থিয়েটারে হাজির হইলেন। ষ্টেজ দেখিয়া চক্ষু স্থির হইল! দৃশ্যপটটি পাশ্চাত্য পরিকল্পনার নিকৃষ্ট অনুকরণ। ক্যাম্বিসের উপর এক-থ্যাব্ড়া সবুজ রং দিয়া তৃণভূমি বুঝানো হইয়াছে, তাহারই পাশে বীভৎস সাদা রঙের পোঁচ দিয়া হ্রদ দেখানো হইয়াছে, আর এহেন 'সীন্'টির গা ঘেঁষিয়া বিগত-প্রাণ পতির পাশে দাঁড়াইয়া যমরাজের সহিত কথা কহিতেছেন, সাবিত্রী! যমরাজ বসিয়া আছেন একখানি বিলাতি গদি-আঁটা চেয়ারের উপর!

কলের মজুরেরা সে-সময় ধর্ম্মঘট করিয়াছিল, পরদিন তাঁহারা মজুর-পাড়ায় গিয়া উপস্থিত। স্থানটি এত নোংরা, লেখক বর্ণনার ভাষা খুঁজিয়া পান নাই। ফিরিবার পথে এক ব্রাহ্মণ-মহিলার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি ও তাঁহার কয়েকজন বন্ধু শ্রমিকদের উন্নতির জন্য কাজ করেন। শ্রমিকেরা কাজে যাওয়ার পর, তাহাদের শিশুগুলির হেপাজতি হয় এমন একটি আশ্রম স্থাপনা করিয়াছেন। সেখানে প্রায় পঞ্চাশটি শিশু থাকিতে পারে। শ্রমিকদের শিক্ষার জন্য একটি নাইট্-স্কুলও তাঁহারা খুলিয়াছেন। স্বাস্থ্যরক্ষা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তত্ত্ব সেখানে শিখানো হয়। উক্ত বিধবা মহিলাটির নির্দ্দেশ-অনুযায়ী তাঁহারা পুণা সেবা-সদন, নারী-বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য নারী-প্রতিষ্ঠানের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন।

বম্বাই হইতে দুই ভাইয়ে কাশী যাত্রা করিলেন। ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় নানা প্রদেশের যাত্রী। একজন গান সুরু করিল; সে যে কোথাকার লোক লেখকের অগ্রজ বলিয়া দিলেন। ইংরেজ-কর্ত্তৃপক্ষের অনুগ্রহে ছদ্মবেশে ভারত-ময় ঘুরিয়া ফিরিয়া দেশের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপনের তিনি সুযোগ পাইয়াছিলেন। কামরার ভিতর বিভিন্ন আরোহীদের মধ্যে বাদ-প্রতিবাদ ও আলোচনায় ফাঁকে ফাঁকে আমাদের দেশের চিন্তাধারা ধনগোপালের ভাষায় চমৎকার ফুটিয়াছে।

পুলের উপর হইতে কাশী দৃষ্টিগোচর হইল। খররৌদ্র-তলে গঙ্গার বাঁকটি তলোয়ারের মত ঝলসিয়া উঠিল! পাথরের উপর পাথর, বাড়ির উপর বাড়ি, স্তরে স্তরে উঠিয়াছে—কোনটিতে নীলবর্ণের দ্বার ও জানালা, কোথাও বা রক্তবর্ণের! বেণী-মাধবের ধ্বজা, অসংখ্য মন্দির-চূড়া—রঙের উপর রঙ চোখে পড়িতে লাগিল বহুরূপী সাগরের মত! তা'র পর, শহরের পাথর-বাঁধানো পথে মানুষ আর পশুর ভিড়—যাত্রিদল চলিয়াছে কত রঙের, কত রকমের পোষাকে! তাহাদেরি গা ঘেঁষিয়া পেশীপুষ্ট অতিকায় ষাঁড়গুলি চলিয়াছে নিদ্রালু মন্থর-গমনে!

কাশীর রামকৃষ্ণ-মঠে দু'জনে অতিথি হইলেন। মঠের প্রাচীন অধ্যক্ষ পৃষ্ঠব্রণ রোগে ভুগিতেছিলেন। তাঁহার সহিত লেখকের বহুবিধ আলোচনা হইতে লাগিল। মঠের হাঁসপাতাল সম্বন্ধে কথা উঠিলে স্বামীজি কহিলেন,—"ভালো ক'রতে যাওয়ার সাজা পেয়েছি! এগারো বছর আগে অপর এক সঙ্গীর সঙ্গে প্রকাণ্ড একটা গাছের তলায় ব'সে ভগবানকে স্মরণ ক'রছিলুম। খবর এল, পথের ধারে এক জীর্ণ শীর্ণ পীড়িত মাড়োয়ারি প'ড়ে আছে। শুনে তা'কে তুলে এনে সেবা-শুশ্রূষা ক'রে সারিয়ে তুলুম। সে দেশে ফিরে যাবার সময় খুব উপকার ক'রে গেল! রটনা ক'রে দিলে, যদি কেউ আমার বড় গাছের তলায় পীড়িত হ'য়ে পড়ে, তবে তা'দের সেবার ভার আমি গ্রহণ ক'রে থাকি! এর ফলে অনতিকাল পরে আরো দু'জন লোক ঠিক সেই গাছটির তলায় এসে পীড়িত হ'য়ে প'ড়লো! কি আর ক'রি, তা'দের ত আর ফেল্‌তে পারি না। তা'দেরও সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা হ'ল। তা'রা সুস্থ হবার পর ব্যাপার ক্রমশঃ সজীন হয়ে উঠ্‌লো, পীড়িত লোকেরা আস্‌তে লাগলো একেবারে ধারাবর্ষণের মত। তারই ফলে এই হাঁসপাতালের সৃষ্টি"।

আর একদিন তিনি বলিলেন,—"ভালো ক'রবো ব'লে কখনো চেষ্টা কোরো না। এমনভাবে জীবন যাপন ক'রো যাতে তোমার ত্রিসীমানায় মন্দ পা বাড়াবার সাহস না করে, ভালো যেন আপনা থেকেই ঘট্‌তে থাকে। ঝাড়ুদার যেমন নোংরা ঝাঁটাতে ঝাঁটাতে কেবলই ভাবে এই বুঝি তা'কে রোগে ধ'রলো, তেমনি যে ভালো ক'রে বেড়ায় তা'র কেবলই ভয় হয়, জীবনের আবর্জ্জনা ঝাঁট দেবার

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সময় পাছে তা'র আত্মাও কলুষিত হ'য়ে ওঠে। শেষ পর্য্যন্ত, পরকে-উন্নত-করার মড়কেই তা'র আত্মার মৃত্যু ঘটা কিছু বিচিত্র নয়। তাই বলি, নিরাপদ পথটাই অনুসরণ ক'রো—এমন জীবন যাপন ক'রো যাতে ক'রে ভালো কাজ, তোমার অগোচরেই, আপ্‌না-আপ্‌নি হ'তে থাক্‌বে!"

কাশীর পর কলিকাতার রূপ লেখকের চোখে কুৎসিৎ ঠেকিল। তার কুশ্রী ঘরবাড়ি, ট্রাম ট্যাক্সি মোটরের উৎপাত, গঙ্গার ধারের কলকারখানা ও রেলের লাইন, স্নানের ঘাটের লোহার সিঁড়ি, ফেরিঘাটের জেটি—সমস্তই অসহনীয়। ভালোর মধ্যে ময়দান আর গুটিকয়েক মন্দির। যদিও বাগানের (ইডেন গার্ডেন) ব্যাণ্ড লেখকের কর্ণপীড়ার হেতু হইল তবুও তিনি কলিকাতা ভালবাসেন, এ যে তাঁর নিজের শহর! এ যে স্বদেশ! এখানকার ভাষা যে ঠাকুর-কবির ভাষা! এমন চমৎকার চোস্ত রসের বুলি আর কোন্ ভাষায় আছে?

লেখকের গৃহ-প্রবেশের চিত্রটি বড়ই করুণ! বাড়ি যেন শূন্য—মা নাই। ধনগোপালের প্রবাস-যাত্রার পর তাঁ'র মৃত্যু হয়। বিধবা দিদি আছেন, তাঁ'র ছেলেপুলেরা আছে, দাদা আছেন, তবুও যেন মায়ের বিহনে সব খাঁ খাঁ করিতেছে! সবই মায়ের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে! ধব্‌ধবে শাদা দেয়ালে তাঁহারি টাঙানো বিষ্ণু আর শিবের ছবি, লাল টালি-বসানো শূন্য মেঝে তেমনি পরিষ্কার তক্‌তকে—সম্মুখে উঠানের প্রাচীন পরিচিত গাছটি এখনো দাঁড়াইয়া আছে, পিছনের উঠানটি তেমনি শূন্য! সবই ঠিক আছে, কেবল মা নাই! দাদা আর দিদি বলিলেন, দেবী বিদায় লইয়াছেন, কেবল ভক্তেরা পড়িয়া আছে!

আত্মীয় বন্ধু যুবকদের সঙ্গে লেখকের ভারতবর্ষ ও পাশ্চাত্য দেশের সভ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা চলিতে লাগিল। তিনি লক্ষ্য করিলেন, ছেলেদের কথাবার্ত্তা আর পূর্ব্বের মত সুন্দর কবিত্বময় নাই! কেজো লোকের মত তাহারা কথা কয়, পদে পদে ইতিহাসের নজির দেখায়, বক্তব্য বিষয় পরিস্ফুট করিবার জন্ত এখন আর তাহারা গল্প রচনা করে না, কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করে। তাহাদের কল্পনার প্রবাহে ভাঁটা পড়িয়াছে।

লেখকের অগ্রজ রাজবন্দী যাদুগোপালের জীবন-কথা My Brother's Face-গ্রন্থখানির ছয়টি পরিচ্ছেদে বিবৃত হইয়াছে। মিশনারী স্কুলে শিশু-শিক্ষা হইতে সুরু করিয়া বিপ্লববাদী-রূপে নানা বাধা, বিঘ্ন ও বিপদের মধ্য দিয়া ছদ্মবেশে কাশী, আগ্রা, দিল্লী, ঝাঁসি, রামপুর, অমৃতশর, মথুরা এমন কি পেশোয়ার পর্য্যন্ত ভ্রমণ; যুদ্ধের দ্বারা দেশ স্বাধীন করিবার প্রচেষ্টা কিরূপে ব্যর্থ হইয়া গেল তাহার বিবরণ, পাঞ্জাবে ডায়ারী কাণ্ড, মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ ও তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ—সমস্তই তাঁহার মুখ দিয়া লেখক চমৎকার প্রকাশ করিয়াছেন। প্রসঙ্গত, ভারতের রেশম-পশম, শাল-দোশালা, জরির কাজ, হাতীর দাঁতের খোদাই, বিদ্‌রী প্রভৃতি বিবিধ শিল্প-কলা; অসহযোগ আন্দোলন, শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার শিষ্য হরিদাসের কাহিনী, শিখেদের ইতিহাস, গীতা ও মহাভারতের নানা উপাখ্যান,—যেমন ধ্রুব, জটায়ু, দধীচির কথা, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ, ইত্যাদির ভিতর দিয়া পাঠকের মনে ভারতবর্ষ জীবন্ত হইয়া উঠে।

ইহার পর দেখিতে পাই লেখক ধনী বাঙালী-সাহেবদের সহিত ইংরেজি পোষাকে ইংরেজি খানা খাইতেছেন, বাঙালী মেয়েরা 'বল' নাচিতেছে, সিগারেট খাইতেছে! তাহার পর দার্জ্জিলিং। হিমালয়ে অপরূপ সূর্য্যোদয়। কবি, ঔপ-ন্যাসিক, ও বস্তুতান্ত্রিক কারবারী ভারতবাসীর সহিত লেখকের বিবিধ আলোচনা। তথা হইতে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তনের পর প্রসিদ্ধ শিল্প-সমালোচক অর্দ্ধেন্দু গাঙ্গুলীর সহিত সাক্ষাৎ। এই প্রসঙ্গে মাড়ওয়ারিদের প্রতি শ্লেষের ইঙ্গিত আছে। উঁহাদের প্রতি গ্রন্থকার প্রসন্ন নহেন। আলোচ্য পুস্তকের একাধিক স্থানে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

শান্তিনিকেতনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনকথা ও বিশ্বভারতীর বিবরণ, পরে কাশীর মঠে তুরীয়ানন্দের তিরোভাবের বর্ণনায় গ্রন্থখানির সমাপ্তি। লেখকের মতে পাশ্চাত্য বস্তু-তন্ত্র সভ্যতার সহিত ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক সভ্যতার বিরোধ বাধিয়াছে এবং মহাত্মার প্রভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতা নাকি কতকটা পিছু হটিয়াছে।

৪

ভারত-ভ্রমণের সময় ধনগোপাল রামকৃষ্ণ-সম্প্রদায়ের বেলুড় ও কাশীর মঠে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে-সময় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান সহচর ও শিষ্যবৃন্দের সহিত আলাপ আলোচনার ফলে তিনি উক্ত মহাপুরুষের জীবন ও সাধনার নানা তথ্য সংগ্রহ করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন কাহিনী-সম্বলিত নানা পুস্তক-পুস্তিকা, ও সাময়িক পত্র, তাঁহার সম্বন্ধে প্রচলিত কিম্বদন্তী পর্য্যন্ত তিনি তন্ন তন্ন করিয়া বিচার বিশ্লেষণ ও যথার্থ শিল্পীর অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা শোধনান্তে অসামান্য শ্রদ্ধা ও সংযমের সহিত যে মনোজ্ঞ রচনা প্রকাশ করিয়াছেন তাহার নাম *The Face of Silence*। ইহাই ধনগোপালের আধুনিকতম গ্রন্থ।

শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যজীবন হইতে সুরু করিয়া সাধনা, সিদ্ধি ও মহাপ্রস্থান পর্য্যন্ত সমস্ত কথাই এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। তাঁহার সহিত কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী নানা জাতীয় পণ্ডিত, তত্ত্বান্বেষী, সমাজ-সংস্কারক প্রভৃতির সাক্ষাৎ ও তর্কযুদ্ধ; নরেন্দ্রনাথের (বিবেকানন্দ) মন্ত্রগ্রহণ, সাধনা ও সিদ্ধি; বিবেকানন্দের ভারতবর্ষ, আমেরিকা ও য়ুরোপ ভ্রমণ; শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে নাট্যকার গিরীশচন্দ্রের সুরার শাসন হইতে মুক্তিলাভ ও তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার প্রভৃতি নানা ব্যাপার সুমার্জ্জিত সরল ভাষায় লেখক ব্যক্ত করিয়াছেন। রচনার অনাড়ম্বর ভঙ্গিমার সহিত আলোচ্য জীবনের ভারি একটি সঙ্গতি আছে। মনে হয় অন্যরূপে প্রকাশ করিলে এই শিশুর মত সরল বাঙালী সাধকের সত্য মূর্ত্তিটি ফুটিত না।

তাঁহার প্রধান শিষ্যবৃন্দের মধ্যে ব্রহ্মানন্দ, তুরীয়ানন্দ, বিবেকানন্দ, প্রেমানন্দ ও লাটু-মহারাজের অল্প-বিস্তর বিবরণ এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত পরিচয়ের পূর্ব্বে নরেন্দ্রনাথ (বিবেকানন্দ) ছিলেন—"A sort of agnostic bull in the China-shop of religion!"

নরেন্দ্রনাথ কেশব-বাবুর সহিত সর্ব্বপ্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শনে গিয়াছিলেন। বহু মানসিক বিধাদ্বন্দ্ব অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয়বার একাকী গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে নিঃসঙ্গ বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি আশ্বস্ত হইলেন। প্রথমবার একঘর লোকের সম্মুখে তিনি নরেন্দ্রনাথের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বর্ণনা করিয়া তাঁহাকে বড়ই লজ্জা দিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, 'বড় খুসী হলুম, এসেছ! তোমার জন্তে অনেক বছর থেকে অপেক্ষা ক'রছিলুম'!

তাঁহার কথা শুনিয়া নরেন্দ্রনাথের বিরক্তি ধরিল। তাঁহার মুখভাব কঠিন ও উদ্ধত হইয়া উঠিল। তক্তপোষের প্রান্ত ঘেঁষিয়া তিনি বসিলেন। কিছুকাল কাহারো মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না। পরস্পরের-দিকে-ফিরানো মুখ দুইখানি কল্পনা করা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রাচীন দেখাইতেছে, তাঁহার বয়সের চেয়ে বেশী। আর তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট যুবকের মুখখানি ধাতুময় বৌদ্ধমূর্ত্তির মুখের মত প্রকাণ্ড ও শক্তিমান।

একজন যৌবন ও লাবণ্যে ভূষিত; অপরজন রিক্ত, সর্ব্বহারা, অদৃশ্য ভগবান ছাড়া তাঁহার কিছু নাই। বসিয়া বসিয়া দু'জনে পরস্পরকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। সহসা নির্ব্বাকভাবে নিঃশব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁ'র ডান পা'খানি তুলিলেন, ধীরে ধীরে সম্মুখে বাড়াইলেন, তাহার পর নরেন্দ্রনাথের দেহ স্পর্শ করিলেন।

"তৎক্ষণাৎ [বিবেকানন্দের কথা] আমার খোলা চোখের সুমুখে ঘরের দেয়ালগুলা টলিতে টলিতে পড়িয়া গেল। ঘরের আসবাব-পত্র যেন কোন্ আসুরিক শক্তির প্রভাবে মেঝের উপর আছড়াইয়া পড়িল, তাহার পর শূন্যে ডুবিয়া গেল। আমার চারিদিকে শূন্য, কেবল শূন্য! সহসা জগৎ যেন হাঁ করিয়া আমার 'আমিত্ব' গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। ভাবিলাম, 'আমিত্ব' লোপ পাওয়া মানেই ত মৃত্যু! মনে হইল মৃত্যুকে যেন ছুঁইতে পারি, এতই নিকটে! এই ভয়ঙ্কর কথা মনে হইতেই আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম, 'শুনুন, শুনুন, এ কি করছেন? আমি বাঁচতে চাই। আমার মা-বাপ বেঁচে রয়েছেন, এরই মধ্যে আমায় মারবেন না!' শুনিয়া উন্মাদ সশব্দে হাসিয়া উঠিলেন, ধীরে ধীরে আমার বুকের উপর হাত ঘষিতে ঘষিতে বলিলেন, 'আচ্ছা, এবার থামা যাক্!

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

একেবারেই সমস্ত দেখার দরকার নেই! বাকিটা পরে জান্‌তে পারবে!' এই কথার পর, যেন ইন্দ্রজালে আসবাব্-পত্র দেওয়াল, ঘর, আমি—পূর্ব্বে যেখানে যেটি যেমন ছিল সবই তেমনি হইয়া গেল।"

৫

ধনগোপাল ও তাঁহার রচনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমেরিকায় অন্যান্য ভারতীয় লেখকও আছেন যাঁহারা তথাকার সাময়িক পত্রাদিতে লিখিয়া অর্থ-উপার্জ্জন করেন। দু'একজন গ্রন্থ রচনাও করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ধনগোপাল সেই সাধারণ লেখক-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নহেন। তাঁহার রচনা আমেরিকা ও ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পত্রিকায় সমাদরে গৃহীত ও প্রকাশিত হইয়া থাকে। অর্থ বা যশ কিছুরই তাঁহার অভাব নাই, জার্ম্মান ও ফরাসী ভাষায় তাঁর রচনা অনুবাদের আয়োজন চলিতেছে।

ধনগোপাল তাঁহার মার্কিণ পত্নী ও একমাত্র পুত্র নব-গোপালের সহিত আমেরিকার নিউ-ইয়র্ক শহরে বাস করেন। বহুকাল বিদেশে বাস করিলেও স্বদেশের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ—মনেপ্রাণে তিনি খাঁটী বাঙালীই আছেন। মাতৃভাষায় রচনা না করিলেও আধুনিক বাঙ্‌লা সাহিত্যের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র, গল্প-লেখক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও কবি মোহিতলাল মজুমদারের রচনায় তিনি বিশেষ অনুরাগী। আমায় কাছে একাধিকবার অনুযোগ করিয়াছেন—শরৎবাবু কিছুকাল য়ুরোপে আসিয়া বাস করেন না কেন? আসিলে তাঁহার অভিজ্ঞতার প্রসার বাড়ে, জীবনকে একটা নূতন দিক দিয়া দেখিবার সুবিধা হয়। ফলে বাংলা সাহিত্যের বিশেষ উপকার হইবারই সম্ভাবনা।

স্বরলিপি

কথা ও সুর—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | স্বরলিপি—শ্রীসাহানা দেবী

আমায় ক্ষম হে ক্ষম, নমো হে নমো !
তোমায় স্মরি' হে নিরুপম—
নৃত্য-রসে চিত্ত মম উছল হয়ে বাজে।

আমার সকল দেহের আকুল রবে
মন্ত্রহারা তোমার স্তবে
ডাইনে বামে ছন্দ নামে নব জনমের মাঝে,
বন্দনা মোর ভঙ্গীতে আজ সঙ্গীতে বিরাজে !

একি পরম ব্যথায় পরাণ কাঁপায়, কাঁপন বক্ষে লাগে,
শান্তি সাগরে ঢেউ খেলে যায়, সুন্দর তায় জাগে !
আমার সব বেদনা সব চেতনা
রচিল এ যে কি আরাধনা !
তোমার পায়ে মোর সাধনা মরে না যেন লাজে,
বন্দনা মোর ভঙ্গীতে আজ সঙ্গীতে বিরাজে !

কানন হ'তে তুলিনি ফুল, মেলেনি মোরে ফল,
কলস মম শূন্য সম ভরেনি তীর্থ জল !
আমার তনু তনুতে বাঁধন হারা
হৃদয় ঢালে অধরা ধারা ;
তোমার চরণে হোক্ না সারা পূজার পুণ্য কাজে,
বন্দনা মোর ভঙ্গীতে আজ সঙ্গীতে বিরাজে।

[নটীর পূজা—শেষ গান]

। সা সা -ণ্দ্‌া I
আ মা র

II দ্‌া দ্‌া ণ্‌া । ণ্‌া সা -া I দ্‌া দ্‌া ণ্‌া । ণ্‌া সা -া I
ক্ষ ম হে ক্ষ ম • ন মো হে ন মো •

I সজ্ঞা জ্ঞা -া । জ্ঞরা জ্ঞা -া I রা রা জ্ঞা । জ্ঞরা জ্ঞা মজ্ঞা I
তো মা র স্ম রি • হে নি রু প ম ••

I রজ্ঞা -া -া । ঋা সা -া I
•• • • • • •

শ্রীসাহানা দেবী

I সা -া ঋা । ঋা ঋা -জ্ঞা I জসা -া জ্ঞঋা । সা ণ্দা -ণা I
নৃ • ত্য র সে • চি • ত্ত ম ম •

I সা সজ্ঞা জ্ঞা । জ্ঞা ঋা -জ্ঞা I ঋা -া সা । -া -া -া I
উ ছ ল হ য়ে • বা • জে • • •

I সা দা -া । মা পা -া I জ্ঞা মা -া । রা জ্ঞা -া I
বা • • • • • • • • • • •

I সা ঋা সা । -ণ্দা জ্ঞা ঋা I সা -া -া । সা সা ণ্দা I ইত্যাদি
• • • • • • জে • • আ মা য়

I -া -া -া । সা সা -া I
• • • আ মা র

I সা সা -া । সা সা দা I দা পা পা । পা পা র্সা I
স ক ল দে হে র আ কু ল র বে •

I র্সণা -া ণা । ণপা ণদা -া I পা মা পদা । পা মা -া I
ম • ন্ত্র হা রা • তো মা র্ স্ত বে •

I -া -া -া । সা সা -া I
• • • আ মা র

I সা সা -া । সা সা দা I দা পা পা । পা পা র্সা I
স ক ল দে হে র আ কু ল র বে •

I র্সণা -া ণা । ণপা ণদা -া I পা মা পদা । পা মা -া I
ম • ন্ত্র হা রা • তো মা র্ স্ত বে •

I জ্ঞরা -া জ্ঞা । রা জ্ঞা -া I রা -া জ্ঞা । রা জ্ঞা -া I
ডা ই নে বা মে • ছ • ন্দ না মে •

I রা জ্ঞা মা । জ্ঞা ঋসা ণা I সা -া রা । জ্ঞা -া ঋসা I
ন ব জ ন মে র মা • • ঝে • ••

I সা -া ঋা । ঋা ঋা জ্ঞা I জ্ঞসা -া জ্ঞঋা । সা ণ্দা ণা I
ব • ন্দ না মো র ভ • ঙ্গা তে আ জ

I সা -া জ্ঞা । ঋা -া জ্ঞা I জ্ঞঋা -া সা । -া -া -া I
স • ঙ্গী তে বি • রা • জে • • •

I সা দা -া । মা পা -া I জ্ঞা মা -া । রা জ্ঞা -া I
আ • • • • • • • • • • •

I সা ঋা সা । ণা সা জ্ঞঋা I সা -া -া । সা সা ণ্দা I ইত্যাদি
• • • • • জ্‌ এ • • আ মা র

I -া -া -া । া দা ণা I
• • • • এ কি

I ণা সা র্সা । সা সা -ণা I সা সা জ্ঞা । জ্ঞরা মজ্ঞা -া I
প র ম ব্য থা য় প রা ণ কাঁ পা •

I -া -া -া । -া -া ঋসা I

I সা ঋা ঋা । ঋা -া সা I ণা -সঋা সা । -া -া -া I
কাঁ প ন ব • ক্ষে লা • গে • • •

I সা -া দা । পা পা পদপা I মা পা মা । জ্ঞরা মজ্ঞা -া I
শা • ন্তি সা গ রে ঢে উ খে লে যা •

I -া -া জ্ঞা । জ্ঞরা মজ্ঞা -া I -া -া দা । দা দা ণা I
• য়্‌ খে লে যা • • য়্‌ খে লে যা র

I সা জ্ঞা জ্ঞা । জ্ঞা ঋা জ্ঞা I ঋজ্ঞঋা -া সা । -া ঋা ণা I
সু • ন্দ র তা র জা • গে • • •

I সা জ্ঞা জ্ঞরা । মজ্ঞা -া -া I -া -া -া । া দা ণা I
সু • ন্দ র • • • • • • এ কি

শ্রীসাহানা দেবী

I ণ্া সা সা । সা সা ণ্া I সা সা জ্ঞা । জ্ঞরা মজ্ঞা -া I
প র ম ব্য থা য় প রা ণ কাঁ পা •

I -া -া -া । -া -া ঋসা I
• • • • • য়্

I সা ঋা ঋা । ঋা -া সা I ণ্া সঋা সা । -া -া -া I
কাঁ প ন ব • ক্ষে লা • গে • • •

I সা -া দা । পা পা দপা I মা পা মা । জ্ঞরা মজ্ঞা -া I
শা • ন্তি সা গ রে ঢে উ খে লে যা •

I -া -া জ্ঞা । জ্ঞরা মজ্ঞা -া I -া -া দ্া । দ্া দ্া ণ্া I
• য়্ খে লে যা • • য়্ খে লে যা য়

I সা জ্ঞা জ্ঞা । জ্ঞা ঋা জ্ঞা I ঋজ্ঞঋা -া সা । -া ঋা ণ্া I
সু • ন্দ র তা য় জা • গে • • •

I সা জ্ঞা জ্ঞরা । মজ্ঞা -া -া I -া -া -া । সা সা -া I
সু • ন্দ র • • • • • আ মা র

I সা সা -া । সা সা দা I দা পা পা । পা পা র্সা I
স ব্ বে দ না • স ব্ চে ত না •

I সণা ণা ণা । ণপা ণদা -া I পা মা পদা । পা মা -া I
র চি ল এ যে • কি আ রা ধ না •

I -া -া -া । সা সা -া I
• • • আ মা র

I সা সা -া । সা সা দা I দা পা পা । পা পা র্সা I
স ব বে দ না • স ব্ চে ত না •

I র্সণা ণা ণা । ণপা ণদা -া I পা মা পদা । পা মা -া I
র চি ল এ যে • কি আ রা ধ না •

I জ্ঞরা রা জ্ঞা। রা জ্ঞা -া I রা রা জ্ঞা। রা জ্ঞা -া I
তো মা র পা য়ে ০ মো র সা ধ না ০

I রা জ্ঞা মা। জ্ঞা ঋসা ণ্‌া I সা -া রা। জ্ঞা -া ঋসা I
ম রে না যে ন ০ লা ০ ০ জে ০ ০০

I সা -া ঋা। ঋা ঋা -জ্ঞা I ঋসা -া ঋঋা। সা ণ্‌দ্‌া ণ্‌া I
ব ০ ন্দ না মো র ভ ০ ঙ্গী তে আ জ

I সা -া জ্ঞা। ঋা -া জ্ঞা I ঋঋা -া সা। -া -া -া I
স ০ ঙ্গী তে ০ বি রা ০ জে ০ ০ ০

I সা দা -া। মা পা -া I জ্ঞা মা -া। রা জ্ঞা -া I
আ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I সা ঋা সা। ণ্‌া সা জ্ঞঋা I সা -া -া। সা সা ণ্‌দ্‌া I ইত্যাদি
০ ০ ০ ০ ০ জ্‌ এ ০ ০ আ মা য়

I দ্‌া ণ্‌া সা। সা সা -ণ্‌া I সা জ্ঞা জ্ঞরা। মজ্ঞা -া ঋসা I
কা ন ন হ তে ০ তু লি নি ফু ০ ল

I সা ঋা ঋা। ঋা ঋা সণ্‌া I সা -া -া। -া -া -া I
মে লে নি মো রে ০ ফ ০ ০ ০ ০ ল্‌

I সা সা দা। পা পদা পমা I মা পা মা। জ্ঞরা জ্ঞা -া I
ক ল স ম ম ০ শূ ০ ণ্য স ম ০

I রা রমা জ্ঞা। ঋা সা ণ্‌া I সা রা জ্ঞা। -া -া -া I
ভ রে নি তী ০ র্থ জ ০ ল্‌ ০ ০ ০

I দ্‌া ণ্‌া সা। সা সা -ণ্‌া I সা জ্ঞা জ্ঞরা। মজ্ঞা -া ঋসা I
কা ন ন হ তে ০ তু লি নি ফু ০ ল

I সা ঋা ঋা। ঋা ঋা সণ্‌া I সা -া -া। -া -া -া I
মে লে নি মো রে ০ ফ ০ ০ ০ ০ ল্‌

শ্রীসাহানা দেবী

I সা সা দা । পা পদা পমা I মা পা মা । জ্ঞরা জ্ঞা -া I
ক ল স ম ম • শূ • ণ্য স ম •

I রা সমা জ্ঞা । ঋা সা ণ্া I সা রা জ্ঞা । সা সা -া I
ভ রে নি তী • র্থ জ • ল্ আ মা র

I সা সা সা । সা সা_দা I দা পা পা । পা পা_র্সা I
ত নু ত নু তে • বাঁ ধ ন হা রা •

I সণা ণা ণা । পপা ণদা -া I পা মা পদা । পা মা -া I
হৃ দ য় ঢা লে • অ ধ রা ধা রা •

I -া -া -া । সা সা -া I
• • • আ মা র

I সা সা সা । সা সা_দা I দা পা পা । পা পা_র্সা I
ত নু ত নু তে • বাঁ ধ ন হা রা •

I সণা ণা ণা । পপা ণদা -া I পা মা পদা । পা মা -া I
হৃ দ য় ঢা লে • অ ধ রা ধা রা •

I মণা পদা পা । মা জ্ঞরা জ্ঞা I রা -া জ্ঞা । রা জ্ঞা -া I
তো মা র চ র ণে হো ক্ না সা রা •

I রা জ্ঞা মা । জ্ঞা ঋসা ণ্া I সা -া রা । জ্ঞা -া ঋসা I
পূ জা র পু • ণ্য কা • • জে • ••

I সা -া ঋা । ঋা ঋা -জ্ঞা I জসা -া জঋা । সা ণ্দা ণ্া I
ব • ন্দ না মো র ভ • ঙ্গী তে আ জ

I সা -া জ্ঞা । ঋা -া জ্ঞা I জঋা -া সা । -া -া -া I
স • ঙ্গী তে • বি রা • জে • • •

I সা_দা -া । মা পা -া I জ্ঞা মা -া । রা জ্ঞা -া I
আ · · · · · · · · · · ·

I সা ঋা সা । ণ্ া সা জ্ঋা I সা -া -া । সা সা ণ্দা I ইত্যাদি
· · · · · জ্ এ · · আ মা য়

নিবেদন—মাসিক পত্রিকায় এবং স্বরলিপির পুস্তকে সাধারণত একটানা ভাবে স্বরলিপি ছাপা হয়। অর্থাৎ তাল কিম্বা ছন্দের অনুবর্ত্তনে ছাপা হয় না। ইহাতে কাহারও কিছু বাঁচ বাট, কিন্তু শিক্ষার্থী, বিশেষত নূতন শিক্ষার্থী, ছন্দ-গতির ধারণা সহজে করিতে না পারিয়া বিরক্ত হইয়া স্বরলিপি পরিত্যাগ করেন। আমরা আশা করি আমাদের বর্ত্তমান সংখ্যার স্বরলিপি মুদ্রণ-প্রথা সে অসুবিধা বিশেষরূপে দূর করিবে।

গানের কোন অংশ পুনরাবৃত্তি করিতে হইলে প্রচলিত প্রথায় বন্ধনীর দ্বারা তাহা নির্দ্দেশ করা হয়। পুনরাবৃত্তির অংশে স্বর-বৈচিত্র্য থাকিলে নূতন স্বরগুলি স্বর-পংক্তির মাথার উপর ছাপিয়া প্রথম-বারের স্বরগুলিকে ভিন্ন প্রকার বন্ধনীর সাহায্যে বাদ দেওয়া হয়। ইহাতে ব্যাপারটা জটিল হইয়া উঠে। আমরা পুনরাবৃত্তির স্থলগুলি স্বতন্ত্র ভাবে ছাপিয়া এ অসুবিধা দূর করিয়াছি।

কোন গানে একাধিক অন্তরা থাকিলে একটি মাত্র স্বরলিপি দিয়া তাহার নীচে পরে পরে সকল অন্তরার বাক্যগুলি ছাপা হয়। দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় অন্তরা সাধনের সময়ে যুগপৎ স্বরলিপি দেখা এবং পূর্ব্ববর্ত্তী অন্তরার বাক্যগুলি অতিক্রম করিয়া অভীষ্ট পংক্তির উপর দৃষ্টি রাখা, প্রচলিত স্বরলিপি প্রথার একটি বিশেষ বিরক্তিকর ব্যাপার। প্রত্যেক অন্তরা স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত করিয়া আমরা এ অসুবিধারও প্রতিবিধান করিলাম।

স্বরলিপি মুদ্রণের এই নব পদ্ধতি সম্বন্ধে পাঠক-পাঠিকাগণের মতামত জানিতে পারিলে আমরা বিশেষ সুখী হইব।

আষাঢ়-সংখ্যায় "গগনে গগনে" গানটির স্বরলিপিতে দুর্ভাগ্যক্রমে কিছু ভ্রমপ্রমাদ ঘটিয়াছে। শিক্ষার্থীগণ অনুগ্রহ করিয়া নিম্নলিখিত প্রকারে সংশোধন করিয়া লইবেন। বিঃ সঃ।

১৪৭ পৃষ্ঠা ৫ম পংক্তি— ৭পা মজ্ঞা -রসা। স্থলে ৭পা মজ্ঞরা সরা হইবে।
ন ব · · ন ব · ·

" " ৬ষ্ঠ পংক্তি— সা_-র্সা র্সা স্থলে রা_-র্সা র্সা হইবে।
কী · খে কী · খে

[না]
" " ৭ম পংক্তি— {পনা না না / জ টা য়} স্থলে {পনা না না / জ টা য়} হইবে।

১৪৮ পৃষ্ঠা ১ম পংক্তি— -না -পা -না স্থলে -না_-পা_-না হইবে
· · · · · ·

(সংশোধন)

১৪৮ পৃষ্ঠা ২য় পংক্তি—র্ণর্সা র্সণা -া স্থলে র্ণর্সা র্সণা -া হইবে।
এ কো এ কো ন্

" " ৩য় পংক্তি— -া -া (না) } স্থলে -া -া (না) } হইবে।
• • • • • • •

" " শেষ পংক্তি— ন্া -া ন্া স্থলে সা -া -া হইবে।
ড়ে • সে ড়ে • •

১৪৯ পৃষ্ঠা, ১ম পংক্তি— ন্া ন্া -সা স্থলে া া া হইবে।
দি নে র • • •

" " " " — সা -া -া। -া -া -া। বাদ যাইবে।
সেই • • • • •

" " ৫ম পংক্তি— র্ণর্সা র্সণা -া স্থলে র্ধর্সা র্সণা -া হইবে।
কি বৈ • কি বৈ •

বিবিধ সংগ্রহ

জার্ম্মাণীর যৌবনাভিযান

যৌবন প্রাণবান্। প্রাণের প্রাচুর্য্যে, শোণিতের মাদকতায়, যৌবন চিরব্যাকুল, অধীর, অস্থির, চঞ্চল। রবীন্দ্রনাথ তাই ব্যাকুলতাকেই যৌবনের স্বরূপ বলিয়াছেন।

সর্ব্বপ্রকার সাহসিকতার কাজমাত্রই যৌবনধর্ম্মপ্রসূত। মল্লক্রীড়া, মল্লযুদ্ধ, সন্তরণ, পদব্রজন-প্রতিযোগিতা, সকল প্রকার খেলা-ধূলাই এই যৌবন-ব্যাকুলতার বহিঃপ্রকাশ। ভাবের ও কর্ম্মের রাজ্যেও যৌবনই অগ্রদূত। শিল্পে, সাহিত্যে, দর্শনে ও বিজ্ঞানে নব নব উদ্ভাবনীশক্তির পরিচয় যৌবনেই দেখা দেয়। রাজনীতিক্ষেত্রে, সমাজ-সংস্কারে, জনশিক্ষায় যুবকেরাই অগ্রণী। আমাদের দেশে ভাবী রাজাকে 'যুবরাজ' বলা হয়। এদেশে যৌবনের অভিষেক চিরকালই হইয়া আসিয়াছে। কবি বলিয়াছেন, "যৌবনে দাও রাজটীকা।"

আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র যৌবনের জয়; যৌবনের অভিযানে, যৌবনের বিজয়গানে ছনিয়া টল্‌মল্, গগন-পবন মুখর। য়ুরোপের প্রায় সকল দেশেই, গত মহাযুদ্ধের পর, যুবাশক্তি সকল বাধাকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া অবাধ গতিতে নানাদিকে, নানাভাবে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে। জার্ম্মাণীতে এই যৌবনের অভিযান বিশেষ ব্যাপক ও শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। এই অভিযানের স্বরূপ কি, কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ইহার ক্রিয়াকর্ম্ম, তাহা বাঙ্গালী যুবকদের শিক্ষাপ্রদ হইবে। জার্ম্মাণীর যুবকগণ যাহা করিতেছেন বা করিতে পারেন বাঙ্গালার যুবকগণও তাহাই করিবেন বা এখনই করিতে পারিবেন এমন কথা নয়। কিন্তু যৌবনধর্ম্ম সর্ব্বত্রই একপ্রকার; কেননা, ভারতবর্ষের 'যুবন্' (juvan), ল্যাটীনের 'য়ুবেনিস্' (juvenis), অ্যাংলো-স্যাক্সনের 'জিওং' (geong) এবং জার্ম্মাণীর 'য়ুগেন্ড' (jugend) এ একই কুলধর্ম্মান্তর্গত, সুতরাং জার্ম্মাণীর যুবক-আন্দোলন অন্য সকল দেশের যুবকদের প্রণিধানযোগ্য।

গত মহাযুদ্ধের সময় প্রায় দশ সহস্র জার্ম্মাণ বালক পতাকাহস্তে কাইজারের প্রাসাদের জানালার নীচে উপস্থিত হইয়া তারস্বরে চীৎকার করিয়া বলিয়াছিল—"আর যুদ্ধ চাই না" (Nie Wieder Krieg)। এই বালকদের বয়স বারো হইতে ষোল বৎসরের বেশী ছিল না। বড় বড় মহারথী সেনাপতিগণের মুখের উপর এই অজাতশ্মশ্রু বালকগণ বলিয়া উঠিয়াছিল, "আমরা কখনো তোমাদের সৈন্য হইব না।"

এই হইল জার্ম্মাণীর বর্ত্তমান যৌবনাভিযানের সূত্রপাত। এখন এই অভিযানের নিদর্শন জার্ম্মাণীর সর্ব্বত্র, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, সুদূর সীমান্তে পর্য্যন্ত যুবকসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠায় মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল সঙ্ঘ এক কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত নয়; একই আদর্শে অনুপ্রাণিত নয়; একই নেতার অধীনও নয়। কিন্তু বিখ্যাত সাংবাদিক চার্লস্ মার্জের মতে, জার্ম্মাণীতে যৌবনাভিযান সত্য বস্তু; ইহার জীবনীশক্তি ও সৃজনীশক্তি অতুলনীয়; ইহার জোড়া পৃথিবীর অন্য কোন দেশে নাই। কাহারও কাহারও মতে এই যৌবনশক্তির সংগঠনে জার্ম্মাণীর নবজীবনের আরম্ভ। যদিও যুবকসঙ্ঘগুলি আজ বিক্ষিপ্ত ও অপূর্ণ, তবু ইহা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সূচনা করিতেছে; হয়ত অচিরে এমন একজন নেতার আবির্ভাব হইবে যিনি এই নবজাগ্রত বিক্ষিপ্ত কর্ম্মসঙ্ঘগুলিকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করিয়া একই আদর্শে অনুপ্রাণিত করিবেন।

এই যৌবনান্দোলন একেবারে নূতন বস্তুও নহে। মহাযুদ্ধের পূর্ব্বেও ইহার অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু অন্য আকারে। যুদ্ধের প্রায় পনের বৎসর পূর্ব্বে একটী যুবকসঙ্ঘ গঠিত হয়; তাহার নাম ছিল "উড়ো পাখীর দল" (Wander-

vogel)। এই 'ওয়াণ্ডারফোগেলে'র প্রধান কার্য্য ছিল ব্যায়াম-চর্চ্চা ও অনুশীলন। অনেকটা 'বয়-স্কাউটে'র অনুরূপ; কিন্তু 'বয়-স্কাউট্'দের যেমন ড্রিল্ করিতে হয়, একই রকমের পোষাক পরিতে হয় এবং "উত্তম নাগরিক" (Good Citizen) হওয়াকেই জীবনের আদর্শ বলিয়া মানিতে হয়, "উড়ো পাখীর দল" তেমন কিছু করিত না। ইহারা মুক্ত বাতাস, শুভ্র আলো এবং অবকাশ, এই তিন বস্তু পাইলেই জীবনকে সার্থক মনে করিত—প্রকৃতির কোলে ছুটিয়া যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িত, ঠিক যেন—

"লক্ষীছাড়ার দল,
পদ্মপত্রে জল
করছে টলমল্।"

শনিবারে ও রবিবারে সহরের বাহিরে, বনের ধারে, নদীর কিনারায়, পাহাড়ের গভীর বনে, ছেলেমেয়ে একত্র দল বাঁধিয়া ইহারা চলিয়া যাইত—শুধু প্রাণের প্রাচুর্য্যে ছুটাছুটি করিয়া, হাসিয়া-খেলিয়া দিন কাটাইবার জন্য। কখনো কখনো ইহারা প্রাচীন জার্ম্মাণীর পোষাক পরিয়া, ধ্বংস-মাত্রাবশিষ্ট কোন প্রাচীন জার্ম্মাণ সহর খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্যও বিদ্যালয়ের অবকাশের মধ্যে বাহির হইয়া পড়িত এবং গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে হাসিয়া-খেলিয়া, নাচিয়া-গাহিয়া বেড়াইত। প্রাচীনপন্থীদের কেহ কেহ দুঃখ করিয়া বলিতেন,—"উঃ, আজকালকার ছেলেরা কী উচ্ছৃঙ্খল; পিতামাতার কী অবাধ্য!" বস্তুতঃ, "উড়ো পাখীর দল" উচ্ছৃঙ্খল বা উদ্দাম ছিল না—প্রাণের প্রাচুর্য্যে মুক্তির স্বাদ গ্রহণ করিত মাত্র।

যুদ্ধের সময় ওয়াণ্ডারফোগেল্ বা "উড়ো পাখীর দল" দেখিল, দেশের ও জাতির ঘোর বিপদের দিনে আর হাসিয়া-খেলিয়া, ঘুরিয়া-ফিরিয়া বেড়াইলে চলে না; যুদ্ধ চালানো উচিত কিম্বা শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করা উচিত। প্রাচীন রাষ্ট্র-ব্যবস্থাই থাকিবে কিম্বা নূতন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে,এই সকল প্রশ্ন তাহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়াই বর্ত্তমানের Jugend Movement বা যৌবনাভিযানের উৎপত্তি। লক্ষ লক্ষ পূর্ণযুবক যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছে; যাহারা দেশে থাকিয়া যুদ্ধনীতির পাণ্ডাগিরি করিতেছিলেন তাঁহাদের উপর জনসাধারণের আর আস্থা নাই। এই সময়ে যুবকগণ বলিতে লাগিল, "কর্ত্তারা তো দেশের ভাগ্য লইয়া জগা-খিচুড়ি পাকাইলেন; দেখি যুবকশক্তি কিছু করিতে পারে কিনা।" তখন কোথাও বা কোন যুবকেরই নেতৃত্বে, কোথাও বা কোন শিক্ষক বা মন্ত্রীর প্রেরণায়, সর্ব্বত্র যুবকসমিতি গড়িয়া উঠিতে লাগিল। কোন দল হইল প্রাচীনপন্থী, কোন দল হইল নবীনপন্থী। এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িবার একটু মজার ইতিহাস আছে। একদিন, রবিবারে, এক "উড়ো পাখীর দল" গ্রাম্য রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে তাহাদের মধ্যে তর্ক উঠিল, ছেলেদের সঙ্গে একই রাস্তা দিয়া মেয়েদের বেড়ানো সঙ্গত কিনা। এক পক্ষ বলিল, "আলবৎ, সঙ্গত।" অপর পক্ষ বলিল, "না, কখনই না।" ব্যস্, আর কি! "উড়ো পাখীর দল" দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল। মহাযুদ্ধ বন্ধ হইবার কিছুদিন পরে উদারপন্থীরা সংরক্ষণপন্থী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ সমিতি গড়িতে লাগিল। এখন পুরাতন ওয়াণ্ডারফোগেল্ আর বড় দেখা যায় না—এখন সর্ব্বত্র যুগেণ্ডবুণ্ড্ (Jugendbund) বা 'যুবকসমিতি'।

বর্ত্তমানে অন্ততঃ চল্লিশটী 'যুবকসমিতি' জার্ম্মাণীতে দেখা যায়। দেশের সর্ব্বত্র ইহাদের সভ্য আছে। এই সঙ্ঘগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহা ছাড়া ছোট বড় আরো প্রায় পাঁচশত সমিতি আছে। নিত্য আরও নূতন নূতন সমিতিও গড়িয়া উঠিতেছে।

কতকগুলি সমিতি আছে যাহা প্রাচীন "উড়ো পাখীর দল"-এর নামান্তর মাত্র। ইহারা বর্ত্তমান যুগের কলকজা-ময়ী সভ্যতার বিরোধী; সরল জীবনযাপনেই ইহারা আপনাদের সার্থকতা খোঁজে; ইহাদের কোন স্পষ্ট আদর্শ নাই। কতকগুলি সমিতি আছে যাহারা ধর্ম্মের আদর্শে অনুপ্রাণিত। রোমান ক্যাথলিক্ সম্প্রদায়ের এক যুবক-সমিতির সাপ্তাহিক মুখপত্রের পাঠকপাঠিকার সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ।

আমাদের দেশের স্কুল-কলেজের ছাত্রদের রাজনীতিচর্চ্চা 'হারাম'। অধুনা স্বদেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতগণ বর্ত্ত-

মান যুগে "ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ" এই নীতির দোহাই দিয়া থাকেন। তাঁহারা "Pure atmosphere of study" এই কথাটার কদর্থ করিয়া যুবকদের মনে কুয়াসার সৃষ্টি করেন। কিন্তু স্বাধীন জার্ম্মাণীতে বহু যুবকসমিতি গড়িয়া উঠিয়াছে যাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্যই হইল বর্ত্তমান রাজনীতির চর্চ্চা। সুতরাং দেখিতে পাওয়া যায়, জার্ম্মাণীতে আজকাল যতগুলি রাজনৈতিক দল বা 'পার্টি' আছে, সেই সমস্ত 'পার্টির' সমর্থক ভিন্ন ভিন্ন যুবকসমিতিও আছে।

কিন্তু রাজনীতিচর্চ্চাই এই যৌবনাভিযানের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। রাজনীতিটা একটা বহিরঙ্গ মাত্র। ইহার প্রধান অঙ্গ হইল বঙ্কিমচন্দ্র যাহাকে বলিয়াছেন "অনুশীলন" বা culture। এই অভিযানকে কেন্দ্র করিয়া বিরাট 'যুবক'-সাহিত্যের সৃষ্টি হইতেছে। যুবকেরাই লেখক ও যুবকেরাই পাঠক। এই সাহিত্যে সমাজ ও রাষ্ট্রের সংস্কার ও পুর্ণগঠনের কথা আলোচিত হইয়া থাকে। দেশের বুকের উপর দিয়া যে নুতন ভাবের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে, সেই ভাবের ভাবুক বহু ঔপন্যাসিক ও কবির সৃষ্টি হইয়াছে। কোথাও কোথাও যুবকসমিতি সাহিত্যচর্চ্চাকেই মুখ্য করিয়াছে, আবার কোথাও কোথাও সাহিত্য গৌণভাবে আলোচিত হইতেছে। গ্রামে কিম্বা সহরে, কোথাও একটা পুস্তকাগার দেখিলেই মনে করিতে হইবে যে ঐখানে যুবকসমিতি আছে। বস্তুতঃ অনেক পুস্তকালয়ও স্থাপিত হইতেছে।

"যুগেণ্ড বুণ্ডে"র সঙ্গে সঙ্গে ললিত-কলাও বিকাশলাভ করিতেছে। যুবক চিত্রকর ও ভাস্করদের সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। তাহারা জার্ম্মাণীতে ললিত-কলার যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে বলিয়া স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে। শিক্ষাক্ষেত্রে যুবকদের মন গিয়াছে। তাহারা বৃদ্ধ বা প্রৌঢ়দের উপর নির্ব্বিচারে শিক্ষার সমস্ত তত্ত্বকথা ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া থাকে নাই। কতকগুলি যুবকসমিতি গড়িয়া উঠিয়াছে যাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য দেশের শিক্ষার সংস্কার-সাধন। দেখিতে দেখিতে, কয়েক বৎসরের মধ্যেই, জার্ম্মাণীর বিত্তালয়গুলিতে যুবকদের আন্দোলনের ফলে, পাঠ্য বিষয়ের আমুল পরিবর্ত্তন সাধিত এবং নূতন শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কোন কোন বিশ্ববিত্তালয়ে ছাত্রদের পার্লামেণ্ট স্থাপিত হইয়াছে। ইহাকে "Studenten-Parliament" বলে। ছাত্রজীবনের সকল বিষয় ইহাতে আলোচিত হয়।

আসল কথা, সমগ্র জার্ম্মাণীর যুবকদের মধ্যে এক অভূতপুর্ব্ব সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। এই চেতনা, এই জাগরণ, এই যৌবনাভিযানের সৃজনীশক্তি দেখিয়া দেশের চিন্তাশীলেরা আশান্বিত হইয়াছেন। তাঁহারা বুঝিয়াছেন, দেশে এক নবশক্তি বিকাশলাভ করিতেছে। দেশের রাষ্ট্রশক্তিও যুবকদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন। রাষ্ট্র যুবকদের সম্বন্ধে বিধি করিয়াছেন,—"যুবকদিগকে অন্যায় ও অবিচার হইতে রক্ষা করিতে হইবে; তাহাদের জন্য স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে; যাহাদের সম্যক্ শিক্ষালাভ করিবার মত অবস্থা নাই, তাহাদের জন্য সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে; এবং বিত্তালয়গুলির মূল নীতি হইবে এই যে, কোন বালককে স্কুলে ভর্ত্তি করিতে হইলে তাহার পিতামাতার আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা কিম্বা তাহারা কোন্ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোক সেই বিচার না করিয়া বিচার করিতে হইবে—ছেলেটী কোন্ কাজটি করিতে বেশী ভালবাসে,—তাহার কোন্ দিকে ঝোঁক।" শেষ কথাটি এই, জার্ম্মাণীর রাষ্ট্রব্যবস্থাও আজ যৌবনের ভালে রাজটীকা পরাইয়া দিয়াছে।

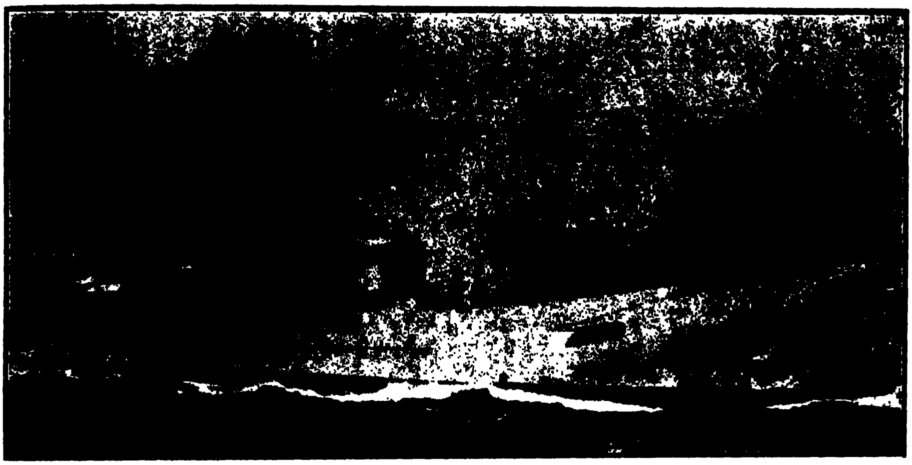
শ্রীরমেশচন্দ্র রায়

সংগ্রাম-সাজে য়ুরোপ, আমেরিকা ও জাপান

রণশ্রান্ত য়ুরোপ ক্লান্তিবশে একবার স্বপ্ন দেখিয়াছিল যে তাহার যুদ্ধবাসনা চিরতরে অন্তর্হিত হইয়াছে। সেই সুপ্তি-ঘোরে সে যুদ্ধোপকরণের সঙ্কোচ-সাধনের জন্য "নিরস্ত্রীকরণ বৈঠক" (Disarmament Conference) বসাইয়াছিল এবং তাহার অবসন্ন চিত্ত মুহূর্ত্তের জন্য ভাবী বিশ্রামের আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তাহার এ ক্ষণিক সুখস্বপ্ন ভাঙিয়া গিয়াছে; য়ুরোপ আপনার স্বরূপ

সংগ্রাম-সাজে য়ুরোপ, আমেরিকা ও জাপান

আপনি দেখিয়া আবার আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়াছে। অস্ত্রশস্ত্রের গুরুভারে নিষ্পেষিত হইয়াও শস্ত্রভার লাঘব করিবার সাহস বর্ত্তমান-জগতের কোন রাষ্ট্র-শক্তিরই নাই; রাখিবার জন্য বিরাট ব্যবস্থাও করিতে হইতেছে। আকাশে-বাতাসে, জলে-স্থলে, সমুদ্রতলে, সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইবার উপযুক্ত নানারূপ মারাত্মক অস্ত্র নিত্যই উদ্ভাবিত হইতেছে, এবং পুরাতন অস্ত্র-গুলিকেও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ও কার্য্যক্ষম করিবার প্রয়াস চলিতেছে। সমুদ্রের উপরে যে নৌযুদ্ধ সম্ভবপর তাহাকে ভীষণতর করিবার যে বিরাট আয়োজন চলিয়াছে বলিয়া প্রকাশ তাহার মধ্যে

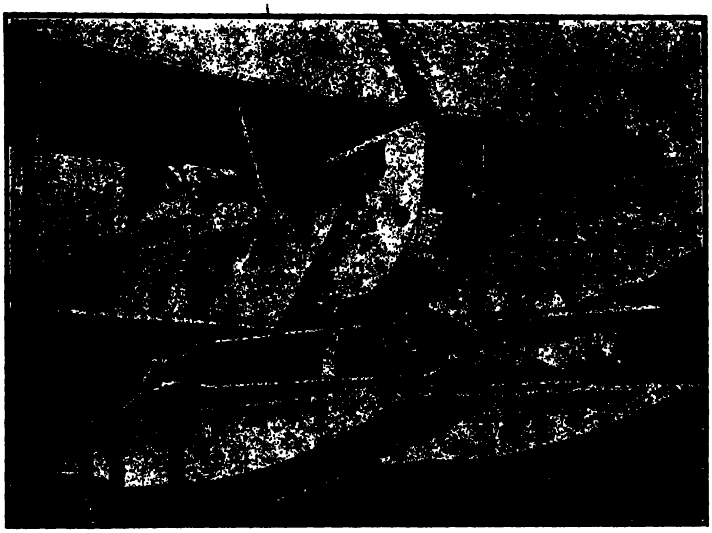


ব্রিটিশ্ 'ডুবো-জাহাজ'—"এক্স্-ওয়ান্"
বর্ত্তমানে পৃথিবীর মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ 'সাব্-মেরিণ্'

বরং অন্য শক্তিকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার আশঙ্কায় প্রত্যেকেই আরও অধিক বলসঞ্চয়ের জন্য উদ্‌গ্রীব। প্রত্যেকেই যুদ্ধসজ্জা হ্রাস করিবার জন্য অন্য সকলকে আহ্বান করিতেছেন, কিন্তু আত্মরক্ষার অছিলায় নিজের সমরসজ্জা বৃদ্ধি করিবার জন্য শত সহস্র যুক্তি দেখাইতেও ছাড়িতেছেন না। ফলে, যুদ্ধের আয়োজন বাড়িয়াই চলিয়াছে এবং যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত করার ব্যবসায় আজ পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কারবার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোটি কোটি টাকা এই ব্যবসায়ের মূলধন এবং লক্ষ লক্ষ লোক তাহাতে নিযুক্ত। গত মহাযুদ্ধে সম্পূর্ণ নূতন ধরণের অস্ত্রশস্ত্রদ্বারা অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হইয়া য়ুরোপের প্রায় সকল রাষ্ট্রশক্তিকেই যে ক্ষতি-স্বীকার করিতে হইয়াছিল, তাহাতে চেতনালাভ করিয়া তাঁহাদের অনেকেই আজ যে কেবল আত্মরক্ষার জন্য নিত্য নূতন নূতন উপায়োদ্ভাবন করিতেছেন এমন নহে; প্রতিপক্ষকে সম্পূর্ণ অজানা উপায়ে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিবার চেষ্টাও সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে এবং তাহা গোপন তিনটির কথাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইংরেজই এ-বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কীর্ত্তিমান। "নেল্‌সন্" ও "রোড্‌নী" নামে তাহারা দুইটি অত্যদ্ভুত শক্তিশালী জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়াছে। ইহাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিসম্পন্ন যুদ্ধ-জাহাজ আর কাহারও আছে বলিয়া জানা যায় নাই। এই জাহাজ দুইখানি প্রত্যেকটি ৩৫,০০০ টন; ১০৫ ফুট প্রশস্ত; প্রত্যেকেরই ৯টি করিয়া ১৬-ইঞ্চি ব্যাসের কামান আছে; এই কামান-গুলির এক-একটি ১০৩ টন ভারী। এক-একখানি জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে খরচ পড়িয়াছে ১২ কোটি টাকা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাৎসরিক ব্যয় আনুমানিক ৮০ লক্ষ টাকা। কামানের লক্ষ্যভেদ শিক্ষা দিবার জন্য বাৎসরিক ব্যয় হইবে প্রায় ৮ লক্ষ টাকা। "নেল্‌সন্"-জাহাজের নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্প্রতি শেষ হইয়াছে।

শুধু য়ুরোপ, আমেরিকা নয়, জাপানও সমরায়োজনে বড় পশ্চাৎপদ নহে। "নাগাটো" ও "মাৎসু" নামে

দুইখানি নূতন জাপানী জাহাজ রণশক্তিতে ইংরেজদের পূর্ব্বোক্ত জাহাজ দুইটির প্রায় সমকক্ষ। ইহাদের প্রত্যেকটি ৩৩,৮০০ টন এবং প্রত্যেক জাহাজে ৮টি করিয়া ১৬-ইঞ্চি ব্যাসের কামান আছে। মার্কিন যুক্তরাজ্যের "কলোরেডো", "ভার্জ্জিনিয়া" ও "মেরিল্যাণ্ড" নামক জাহাজ তিনটি নৌবলে ইংল্যাণ্ড ও জাপানের উক্ত জাহাজগুলির ঠিক নীচেই। ইহারাও প্রত্যেকে ৩২,৬০০ টন ও প্রত্যেক জাহাজের ৮টি ১৬-ইঞ্চি ব্যাসের কামান আছে।



ব্রিটিশ 'সী-প্লেন'

এই 'সীপ্লেন'-খানি ঘণ্টায় ১২০ মাইল পর্য্যন্ত উড়িয়া যাইতে পারে

বর্ত্তমান সময়ে নৌবলে মার্কিন যুক্তরাজ্য ইংল্যাণ্ডের সমান, এবং জাপান অপেক্ষা অধিক বলবান্। যুক্তরাজ্যের "টেনেসি" ও "ক্যালিফোর্নিয়া" নামক দুইটি যুদ্ধ-জাহাজ গোলা-নিক্ষেপ করিবার ক্ষমতায় ইংরেজের "নেল্‌সন্" এবং "রোড্‌নী"কেও হার মানাইয়াছে। "টেনেসি" হইতে নিক্ষিপ্ত গোলা ৩১,৫০০ গজ দূরে পড়ে। কিন্তু ইংরেজরা এমন একপ্রকার গোলা নির্ম্মাণ করিয়াছেন যাহা যে-কোন জাহাজের ধাতু-নির্ম্মিত সকলপ্রকার বর্ম্ম ভেদ করিতে পারে।

ইংল্যাণ্ড, জাপান ও আমেরিকার এই কয়েকটি নূতন জাহাজ নির্ম্মাণকৌশলে, কার্য্যকারিতায় ও ধ্বংস-শক্তিতে বিগত যুদ্ধে ব্যবহৃত সমস্ত জাহাজ হইতে বহুল পরিমাণে শ্রেষ্ঠ।

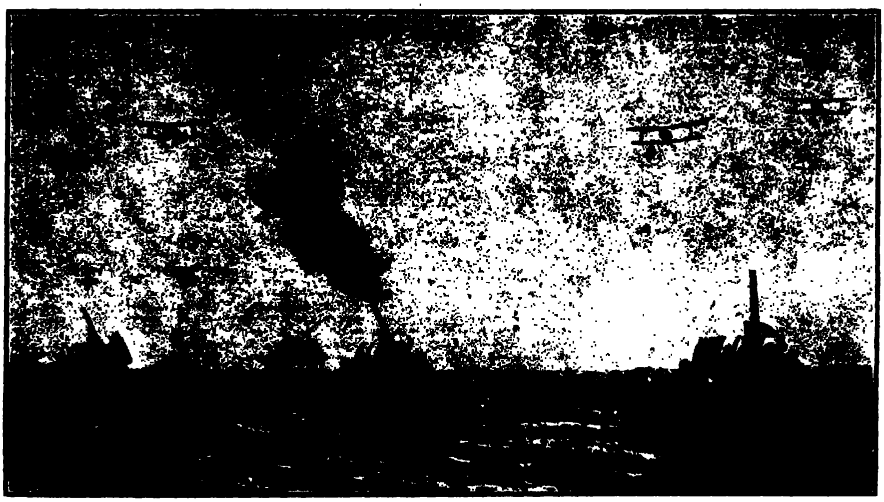
নৌবহরনির্ম্মাণ স্থগিত রাখার প্রস্তাবের ফলে অবশ্য নূতন বড় জাহাজনির্ম্মাণ এখন একপ্রকার বন্ধই রহিয়াছে। কেবলমাত্র যুদ্ধের সময়ে যে-সমুদয় নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল তাহা সমাপ্ত করা হইয়াছে। কিন্তু "নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকে" "ক্রুজার"-শ্রেণীর জাহাজ নির্ম্মাণ স্থগিত রাখার কোন প্রস্তাব না থাকায় ঐ শ্রেণীর জাহাজ গঠন দ্রুতগতিতে চলিতেছে। ইংল্যাণ্ড ৫খানি, জাপান ৪খানি, ইটালি ২খানি 'ক্রুজার'-নির্ম্মাণে রত আছে।

"ডুবো-জাহাজ" (সব্‌মেরিন্)নির্ম্মাণে প্রতিযোগিতা আরও ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। যুদ্ধের সময়ে যে-সমস্ত চমকপ্রদ বৃহৎ ডুবো-জাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছিল বর্ত্তমান কালের তুলনায় তাহাদের নিতান্তই সামান্য বলিয়া মনে হয়। ইংরেজ এবিষয়েও সকল জাতিকেই হার মানাইয়াছে। ইংরেজের X-1 (এক্স-ওয়ান্) শ্রেণীর ডুবো-জাহাজগুলির প্রত্যেকটি ২৭৮০ টন, দৈর্ঘ্য ৩৫১ ফুট এবং গতি ২২ নট। ইহাতে ৪ খানি ৪ ইঞ্চি ব্যাসের কামান আছে এবং ২১ ইঞ্চি পরিধির টর্পেডো ছুঁড়িবার ব্যবস্থা আছে। ইহারা একাদিক্রমে আড়াই দিন জলে ডুবিয়া থাকিতে পারে। মার্কিন যুক্তরাজ্য, ইহাপেক্ষা আরও শক্তিশালী ডুবোজাহাজ নির্ম্মাণের চেষ্টায় আছেন। ফ্রান্স, ইটালী এবং জাপানও নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া নাই। যে-ভাবে তাহারা এখন যুদ্ধজাহাজ নির্ম্মাণে ব্যাপৃত তাহাতে কিছু দিন পরে কে কাহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইবে তাহা নিশ্চিত বলা সুকঠিন। ভেরসাইয়ের সন্ধি-সর্ত্তানুসারে জার্ম্মাণী "ডুবো-জাহাজ" নির্ম্মাণ করিতে পারে না বটে, কিন্তু জাহাজ নির্ম্মাণের

সংগ্রাম-সাজে য়ুরোপ, আমেরিকা ও জাপান

কৌশল চিন্তা করিবার ক্ষমতা তাহার কেহ হরণ করিয়া লইতে পারে নাই। জার্ম্মাণী নূতন প্রবল শক্তিশালী জাহাজ নির্ম্মাণের নক্সা প্রস্তুত করিয়া সম্পূর্ণ গোপনে রাখিয়াছে।

অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ নির্ম্মাণ ও গোলা ছুঁড়িবার কৌশল প্রভৃতিরও প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। কাজে কাজেই, ভবিষ্যতে যুদ্ধ বাধিলে যে কি ভীষণ লোকক্ষয় ও অর্থব্যয় হইবে তাহা কল্পনা করাও সম্ভবপর নহে। বিগত মহাযুদ্ধের শেষ দিকে বিষাক্ত গ্যাসের ব্যবহার আরম্ভ হয়। এই সাংঘাতিক আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য নানাপ্রকার গ্যাস্-বিষহর-উপায় উদ্ভাবন করিবার প্রয়াসও তখন কিছুকিছু হইয়াছিল। বর্ত্তমানে এইরূপ আক্রমণ এবং তাহা হইতে আত্মরক্ষার নানাপ্রকার নূতন উপায় য়ুরোপে ও আমেরিকায় নিত্যই আবিষ্কৃত হইতেছে। ফরাসীরা বিষাক্ত গ্যাসের প্রতিষেধক-ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত। গত মহাযুদ্ধের পর হইতে তাহারা সৈন্যদিগকে গ্যাস্-বিষহর-উপায় ব্যবহার করিতে শিক্ষা দিয়া আসিতেছে। ভবিষ্যতে যুদ্ধ লাগিলে ফরাসীরা আর বিষাক্ত গ্যাস্ ব্যবহার করিবে না বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে; কিন্তু অপরদিকে তাঁহারা ১৫০ফুট দূরে তরল-অগ্নি (Liquid Fire) ছুঁড়িবার কৌশল সৈন্যদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। জার্ম্মাণরা যে আজ-কাল কি করিতেছে তাহা জানা যায় নাই—তবে তাহারা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া নাই। হামবুর্গে তাহাদের সুবৃহৎ গ্যাসকারখানা আছে; ইহার কার্য্যকলাপ লোকচক্ষুর অন্তরালেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। সম্প্রতি জার্ম্মাণরা এক-প্রকার গ্যাস্ আবিষ্কার করিয়াছে যাহা কুয়াসাকারে রণপোত বা সৈন্যবাহিনীর গতি-বিধি, অবস্থান ও ব্যূহরচনা শত্রুশক্তির দৃষ্টি হইতে লুক্কায়িত রাখিতে সমর্থ। ইহার নামকরণ হইয়াছে কুয়াসা-বাষ্প বা Fog Gas। জাপান এবিষয়ে জার্ম্মাণীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে এবং কয়েকজন অভিজ্ঞ জার্ম্মাণ রাসায়-নিককে এই গ্যাস্ প্রস্তুতের কাজে নিযুক্ত করিয়াছে।



"এরোপ্লেন"-ধ্বংসকারী কামান

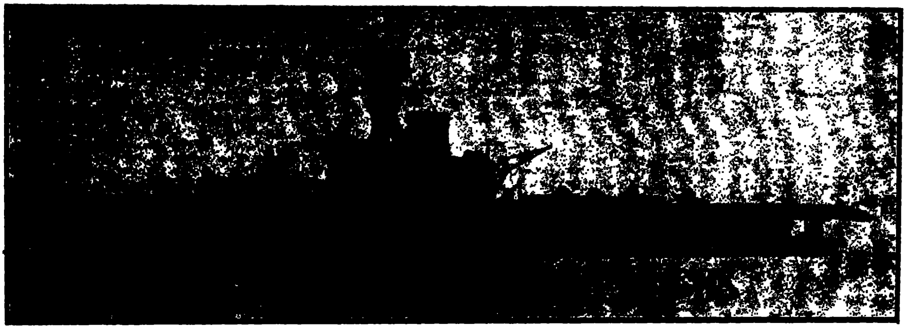
উড্ডীয়মান এরোপ্লেন ধ্বংস করিবার জন্য ইংল্যাণ্ডে এইরূপ বহু কামান নির্ম্মাণ করিয়াছে

রাশিয়া বিষাক্ত-গ্যাস্-প্রস্তুত করণে সকল দেশ অপেক্ষা অধিক অর্থ ব্যয় করিতেছে বলিয়া প্রকাশ। ইটালী এবং য়ুরোপের অন্যান্য ছোট-বড় সকল দেশেই ভবিষ্যৎ যুদ্ধে ইহার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়াছে।

আকাশেও কে কাহার চেয়ে বেশী শক্তিশালী হইয়া উঠিতে পারে, সেই চেষ্টা সকল জাতির মধ্যেই অবিরাম চলিতেছে। গুরুভারবাহী, নিঃশব্দগামী উড়োজাহাজের সৃষ্টি হইতেছে। এই সব বিমানপোতে গত যুদ্ধে যে-সমস্ত বোমা ব্যবহৃত হইত তাহার ছয়গুণ বড় বোমা বহন করার ব্যবস্থা

আছে। ইহাদের গতিও অভূতপূর্ব্ব; ১২০ মাইল হইতে ২৫০ মাইল পর্য্যন্ত প্রতি ঘণ্টায়। ইহাতে বহু সৈন্য ও কামান বহন করিয়া লইয়া যাইবারও বন্দোবস্ত হইয়াছে। ইহারা বর্ম্মাবৃত এবং দেখিলে মনে হয় যেন উড্ডীয়মান "ক্রুজার"।

মার্কিণ যুক্তরাজ্য "স্যারাটোগা" এবং "লেক্সিং-টন্" নামে দুখানি সুবৃহৎ জাহাজ নির্ম্মাণ করিতেছে। ইহারা ৩৩,০০০ টন এবং ৮৮০ ফুট লম্বা। ইহাদের এক-খানিতে ১২১ খানি এবং আর একখানিতে ১১০ খানি জলচারী প্লেন (Sea-plane) লইবার ব্যবস্থা আছে। "সী-প্লেন্"-সহ ইহাদের নির্ম্মাণ-ব্যয় পড়িবে প্রায় ২১ কোটী টাকা। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, এবং জাপানও এই প্রকার জাহাজনির্ম্মাণে নিযুক্ত। তবে তাঁহারা আমেরিকার মত এত বড় জাহাজ নির্ম্মাণ করিতেছেন না।



এরোপ্লেন-বাহী জাহাজ

সমুদ্রপথে এরোপ্লেন বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য ইংরেজরা এইরূপ আট খানি দ্রুতগামী পোত প্রস্তুত করিয়াছেন

বিমান-বিহার বিষয়ে (aviation) যুক্তরাজ্য শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছে। রাত্রিতে বোমা ফেলিবার জন্য একটি সুবৃহৎ বিমানপোত নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা কয়েক টন দ্রব্য বহন করিতে সমর্থ এবং ইহার গতি প্রতি ঘণ্টায় ১০৫ মাইল। ইহার মধ্যে মেশিন-গান্‌ও রাখা হইয়াছে। শুনা যায় যে ইহার চেয়েও বড় বিমানপোত-নির্ম্মাণের জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। ইহার নাম "সুপার-বম্বার" (Super-bomber)। আমেরিকা বিমানবিহারী টর্পেডোর-ও সৃষ্টি করিয়াছে; ইহা ১০০ মাইল দূর হইতে লক্ষ্যভেদ করিতে সমর্থ। ইহা ছাড়া সম্প্রতি ৭০ খানি যুদ্ধে ব্যবহার করার উপযোগী 'উড়োকল' (Aero-plane) যুক্তরাজ্যে নির্ম্মিত হইয়াছে; শীঘ্রই ২৫ খানি বোমা ছাড়িবার উপযোগী 'উড়োকল' নির্ম্মাণ শেষ হইবে।

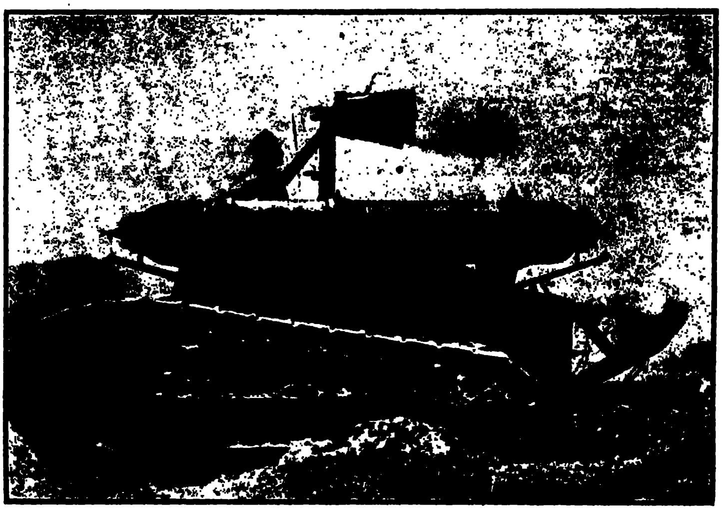
ইংল্যাণ্ড্ প্রতি বৎসর ন্যূনাধিক ১১২॥ কোটি টাকা সামরিক বিমান বিভাগে ব্যয় করিতেছে। শীঘ্রই তাহার ৬টি 'উড়োকল'বাহী জাহাজ প্রস্তুত হইবে। ইংরাজের বোমা-নিক্ষেপকারী উড়োকল যে কত তাহার সীমা-সংখ্যা নাই। ধাতুঘটিত বর্ম্মাবৃত এরোপ্লেন যে কত তাহারও ইয়ত্তা নাই। ইংরেজ এই কয় বৎসর ধরিয়া তাহার বিমানশক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়া লাগিয়াছে।

ফরাসীরা বিমানশক্তিতে সকলের উপরে। তাহাদের পৃথিবীর যে কোন জাতির অপেক্ষা অধিক সংখ্যক যুদ্ধোপ-যোগী এরোপ্লেন আছে; প্রায় দুই হাজার। তাহারা সম্প্রতি নূতন ধরণের টর্পেডো-প্লেনের পরীক্ষা শেষ করিয়াছে। ৩০০০ হাজার ফিট উচ্চে ঘণ্টায় ১৭০ মাইল গতিতে উড়িতে সমর্থ এমন 'প্লেন্' তাহাদের আছে। বোমা-নিক্ষেপকারী 'প্লেন'ও অনেক আছে। বস্তুতঃ ফরাসীরা আকাশে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী শক্তিশালী; কেননা যুদ্ধের পর হইতে তাহারা অবিরাম এদিকে শক্তি বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছে। ইটালী এবং জাপানও অন্যান্য রাষ্ট্রশক্তির মতই বিমান-শক্তি বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছে। শীঘ্রই ইটালীর ১,৬০০ এরো-প্লেন নির্ম্মিত হইবে। বর্ত্তমানে তাহার ৫টি বিমানবিদ্যালয় আছে। জাপানও প্রত্যেকটি ২৭,০০০ টনের এমন ২টি এরোপ্লেনবাহী জাহাজ নির্ম্মাণ করিতেছে।

সংগ্রাম-সাজে য়ুরোপ, আমেরিকা ও জাপান

কর্ণধারহীন বিমানপোতকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে চালাইবার চেষ্টাও চলিতেছে। এই প্রকার স্বয়ংক্রিয় 'প্লেন' হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বোমা, বিষাক্ত-রাসায়নিকপূর্ণ টিন ও টর্পেডো নিক্ষিপ্ত হইয়া ধ্বংসলীলার পরাকাষ্ঠা দেখাইবে। সকল জাতিই এই ভাবটি মনে পোষণ করিয়া র‍্যাডিও-শক্তিকে কাজে লাগাইবার চেষ্টায় আছে।

স্থলযুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রাদির ধ্বংসশক্তিও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। সকল দেশেই নানা প্রকারের 'ট্যাঙ্ক' (Tank) প্রস্তুত হইতেছে। এই 'ট্যাঙ্ক'গুলি দৃঢ়বর্ম্মাবৃত এবং ইহার চাকাগুলি এমন-ভাবে নির্ম্মিত যে ইহারা বন্ধুর ভূমিতে দ্রুত চলিতে পারে। ইহার ভিতরে বসিয়া সৈন্যগণ 'মেশিনগান্' হইতে গুলি ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে অগ্রসর হয়। বর্ম্মদ্বারা ঢাকা থাকে বলিয়া ইহাদের অভ্যন্তরস্থিত সৈন্যগণ নিরাপদ থাকে। ইংরাজদের বৃহৎ বৃহৎ 'ট্যাঙ্ক' আছে। একপ্রকার 'ট্যাঙ্ক' আছে যাহা ঘণ্টায় ১৮ মাইল, আর একপ্রকার ঘণ্টায় ৩০ মাইল পথ চলিতে পারে। মার্কিণ যুক্তরাজ্যের ২৩-টন 'ট্যাঙ্ক্' আছে। ইহার গতি প্রতি ঘণ্টায় ১২ মাইল। ইহা সুদৃঢ়বর্ম্মে আবৃত এবং শক্তিশালী কামানদ্বারা সুসজ্জিত। ৪০ হইতে ৬০ টনের 'ট্যাঙ্কও' আছে। ফরাসীরাও ছোট ছোট দ্রুতগামী বহু 'ট্যাঙ্ক' নির্ম্মাণ করিতেছে।



বিষ-বাষ্পবাহ 'ট্যাঙ্ক্'

যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষকে বিষ-বাষ্প দ্বারা অভিভূত করিবার জন্য য়ুরোপের অনেক দেশই এইরূপ 'ট্যাঙ্ক' প্রস্তুত করাইতেছেন।

বন্দুক ও কামানের শক্তিরও উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাজ্যে পূর্ব্বে যে কামান ৫০ সের ওজনের একটি গোলা প্রায় ১০ মাইল দূরে নিক্ষেপ করিতে পারিত এখন সেই প্রকারের কামান প্রায় ১৫ মাইল দূরে সেই গোলা নিক্ষেপ করিতে পারে। এমন নূতন 'মেশিনগান্' নির্ম্মিত হইয়াছে যাহা দুই তিন মাইল দূর হইতে প্রতি মিনিটে ৫০০ গুলি ছুড়িতে পারে। সমুদ্রোপকূল রক্ষা করিবার জন্য এমন কামান নির্ম্মিত হইয়াছে যাহা রেলগাড়ী হইতে ২০ মাইল দূরে প্রায় ৯ মন ওজনের গোলা নিক্ষেপ করিতে পারে। এক প্রকার 'রাইফ্‌ল্' আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহা মহাযুদ্ধে ব্যবহৃত 'রাইফ্‌ল্' হইতে শতগুণ শ্রেষ্ঠ। ফরাসীরা এক নূতন 'মেশিনগান্' আবিষ্কার করিয়াছে যাহা 'রাইফ্‌ল্'-এর পরিবর্ত্তে পদাতিক সৈন্যগণ দ্বারা ব্যবহৃত হইবে। ফরাসীরা নাকি পরিখা বিধ্বস্ত করিবারও এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। কোনো কোনো দেশে সাংঘাতিক রোগের বীজাণুকে যুদ্ধের অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিবার জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। যুদ্ধশেষের একবৎসরের মধ্যে একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, রোগের বীজাণু ছড়াইবার ও কূয়ার জল বিষাক্ত করিবার উপায়গুলি যুদ্ধের অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। ভবিষ্যৎ-যুদ্ধে পরাজয়োন্মুখ পক্ষ নিশ্চয়ই এই সুলভ অথচ আশু ও অবশ্য ফলপ্রদ অস্ত্র ব্যবহার করিতে সম্ভবত দ্বিধা বোধ করিবে না।

এই যে বিরাট সমরসজ্জার আয়োজন চলিতেছে তাহা কেবল বড় বড় জাতিতেই আবদ্ধ নহে। দক্ষিণ আমেরিকায়

চিলিতে রাষ্ট্রবিধি অনুসারে প্রত্যেক সমর্থ পুরুষ যুদ্ধ করিতে বাধ্য এবং ঐ দেশ জার্ম্মানীর আদর্শে সমরশিক্ষায় শিক্ষিত চারি লক্ষ সৈন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিতে সমর্থ। আর্জ্জেন্টিনা ও চারি লক্ষ সৈন্ত দিতে সমর্থ এবং সম্প্রতি ৯ কোটি টাকা ব্যয়ে সমরপোত নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিয়াছে। পেরু, ব্রাজিল, উরুগ্যয়ে, ইকোয়েডর্ প্রভৃতি দক্ষিণ আমেরিকার সকল রাজ্যগুলিই কেহ বা জার্ম্মাণীর, কেহ বা ইটালীর কেহ বা ফ্রান্সের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া উক্ত দেশসমূহের অভিজ্ঞ শিক্ষকের নিকট সামরিক শিক্ষা লাভ করিতেছে ও সমরসজ্জায় সজ্জিত হইতেছে।



হারকিউলেনিয়ুম্—লুপ্ত নগরীর পুনরুদ্ধার

ধূমহীন বারুদ, পরিখা বেড়া দিবার জন্ত কাঁটাযুক্ত নূতন এবং অধিকতর কার্য্যকরী তার, নূতন নূতন গোলাগুলিও আবিষ্কৃত হইয়াছে। জার্ম্মাণীতে এক প্রকার 'ডবল মেশিন-গান' আবিষ্কৃত হইয়াছে। যাহা প্রতি মিনিটে ২৪০০ গুলি নিক্ষেপ করিতে পারে। একজন রুমানিয়াবাসী হাত-বোমা (Hand-bomb) নিক্ষেপ করার এমন এক নূতন কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছেন যাহাতে অর্দ্ধ মাইল দূরে তাহা নিক্ষেপ করিতে পারা যায়। এই প্রকারে নানা দিকে স্থলযুদ্ধের উপকরণের উৎকর্ষ সাধন দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে।

এই যে চারিদিকে "সাজ-সাজ" ভাব, ইহার পরিণতি কোথায়? ইহা কি ভবিষ্যতে এক বিরাট মহাযুদ্ধের সূচনা করিতেছে? সকল জাতিই আত্মরক্ষার দোহাই দিয়া যুদ্ধোপকরণ বৃদ্ধি ও তাহার উৎকর্ষ সাধন করিতেছেন। কিন্তু আত্মরক্ষার ভাবটাই কি শেষে আত্ম-ধ্বংসের হেতু হইয়া পড়িবে? এই সমুদয় প্রশ্নই আজ য়ুরোপের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জিজ্ঞাস্য হইয়া পড়িয়াছে।

—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

পম্পিয়াই-র দোসর

ইটালীর অতীত ও বিস্মৃত ইতিহাসের আর এক অধ্যায় সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে। বিসুবিয়াসের আগ্নেয়োদ্গারের নিস্রবে চাপা পড়িয়া যে হারকিউলেনিয়ুম্নগরী প্রায় দুই সহস্র বৎসর বিস্মৃতির আড়ালে আত্মগোপন করিয়া ছিল, ইটালীর ভাগ্যবিধাতা মুসোলিনীর কল্যাণে সে আজ ধীরে ধীরে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিতেছে। ইহার কয়েক মাইল দূরেই প্রসিদ্ধ পম্পিয়াই নগরী। বহুকাল হইল তাহার লুপ্ত শিল্প ও ঐতিহাসিক ঐশ্বর্য্য ধ্বংসের ও বিস্মৃতির কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছে; কিন্তু বহুবর্ষলুপ্ত হারকিউলেনিয়ুম্ আজও তাহার প্রাচীন দিনের কত সম্পদ, কত ঐশ্বর্য্য ভূমিগর্ভে গোপন করিয়া রাখিয়াছে!

প্রাচীন দিনে পম্পিয়াই অথবা নিয়াপোলিস্ যাইবার পথে পড়িত হারকিউলেনিয়ুম্। বিসুবিয়াসের নীচেই দুইটী নদীর সঙ্গমস্থলে বাণিজ্য-সমৃদ্ধির এক বিরাট কেন্দ্র ছিল এই নগরী। সুদৃশ্য নাট্যশালায়, বিচিত্র মন্দিরে, অপরূপ পণ্যবিপণিতে, বিরাট বক্তৃতামঞ্চে হারকিউলেনিয়ুম্ অন্য যে কোন ইটালীর নগরীর সহিত সমগর্ব্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিত। রোমক-সাম্রাজ্যের উত্থান-

পম্পিয়াই-র দোসর

পতনের ইতিহাসের সঙ্গে হারকিউলেনিয়ুমের ইতিহাসও অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত—অবরোধ ও আক্রমণের নিষ্ঠুর ও কুৎসিত অভিনয় এই নগরীর বুকের উপরও সমভাবেই অভিনীত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, প্রকৃতির উন্মত্ত ধ্বংসলীলাও ইহাকে ক্ষমা করে নাই; ৬৩ খ্রীষ্টাব্দের বিরাট ভূমিকম্পে পম্পিয়াই নগরীর সঙ্গে সঙ্গে হারকিউলেনিয়ুমেরও যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল। ৮৯ খৃষ্টাব্দে তাহার সংস্কার শেষ হইতে না হইতেই বিসুবিয়াসের ভীষণ অগ্ন্যুদগার তাহার গলিত গিরিনিস্রবের চাপে সমস্ত হারকিউলেনিয়ুম্ নগরীকে একেবারে ঢাকিয়া ফেলিল। এই গলিত গিরিনিস্রব জমিয়া এত কঠিন প্রস্তরে পরিণত হইয়া গিয়াছিল যে বহুকাল পর্য্যন্ত এই নগরীর কোনো চিহ্নও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।

গত দুইশত বৎসর ধরিয়া এই ধরণী-কুক্ষিগত নগরী কৌতূহলী দর্শকের কাছে ধীরে ধীরে তাহার অস্তিত্বের পরিচয় দিতেছে। মাঝে মাঝে একটু আধটু খনন কার্য্যও হইয়াছে—এদিক সেদিক দুই চারিটি প্রস্তরমূর্ত্তি, দুই একটি প্রাচীন প্রাসাদের অংশবিশেষ প্রস্তরগর্ভ হইতে উদ্ধার লাভও করিয়াছে; কিন্তু সুনির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে, এখন যে খননকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে এমন আর কখনো হয় নাই।

য়ুরোপের মধ্যযুগেই মৃত্তিকাপ্রোথিত এই নগরীর প্রথম একটা নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। ফরাসী প্রিন্স এলব্যুফ্ একবার স্পেনীয় এক সৈন্যদলের নায়ক হইয়া ইটালী প্রেরিত হন। পর্টিচির ধারে তাঁহার একটি ছোট্ট বাড়ী তৈরী করবার ইচ্ছা হয়। সেই বাড়ী তৈরী করিতে গিয়া শ্বেত-পাথর খুঁজিতে খুঁজিতে এই লুপ্ত নগরীর কিছু কিছু অংশ এবং কয়েকটি প্রস্তরমূর্ত্তিও বাহির হইয়া পড়ে, কিন্তু এই নগরীই যে হারকিউলেনিয়ুম্ একথা তখনও জানা যায় নাই। তাহার পর, আবার বহুকাল পরে, ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনীয় পণ্ডিত ও প্রত্নতত্ত্ববিদেরা স্থির করেন, প্রিন্স এলব্যুফ্ যে মন্দিরকোণের সন্ধান পাইয়াছিলেন তাহা সত্যসত্যই মন্দির নয়, কোন নাট্যশালার ধ্বংসাবশেষ। য়ুরোপের পণ্ডিত-সমাজ এ খবর পাইয়া উৎসুক ও উৎসাহিত হইয়া উঠেন, এবং সকলের সমবেত চেষ্টায় সমস্ত রঙ্গগৃহটি মৃত্তিকাগর্ভ হইতে উদ্ধার লাভ করে। এই রঙ্গগৃহের শিলালিপিপাঠে এবং অন্যান্য পুরাতন দলিল-পত্র ঘাঁটিয়া স্থির হয় যে এই নবাবিষ্কৃত মৃত্তিকা-প্রোথিত নগরীই হারকিউলেনিয়ুম্। কিন্তু এই রহস্যাবিষ্কার সত্ত্বেও ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের পর আর কোনো খনন কার্য্য এখানে হয় নাই। আজ এতকাল পরে আবার খনন আরম্ভ হওয়ায় এবং এই প্রাচীন নগরীর কিয়দংশ লোকচক্ষুর গোচর হইয়াছে। অতি যত্নে, অতি কৌশলে, দশ বৎসর খননকার্য্য ও সংরক্ষণ-ক্রিয়া প্রভৃতি করিলে তবে এই অপূর্ব্ব নগরীর সমস্ত রহস্যটি সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।



হারকিউলেনিয়ুম্—একটি বাসভবনের ধ্বংসাবশেষ

পম্পিয়াই ও হারকিউলেনিয়ুমের বুকের উপর মানুষ ও প্রকৃতির যে ধ্বংসলীলা অভিনীত হইয়াছে, তাহার তুলনা নাই। যুগে যুগে মানুষের ভাবনা ও কল্পনাকে তাহা ব্যথিত করিয়াছে এবং রোমক সাম্রা-

জ্যের ঐশ্বর্য্য ও সমৃদ্ধির ইতিহাসটিকে এই দুই নগরীই ক্ষুব্ধ অশ্রুপাতে সজল করিয়া রাখিয়াছে। মুসোলিনীর গবর্ণমেণ্ট তাই অতি মমতায়, অতি যত্নে হারকিউলেনিয়ুমের নষ্ট ঐশ্বর্য্য পুনরুদ্ধারে অজস্র অর্থ ব্যয় করিতেছেন।

পম্পিয়াইয়ের ধ্বংসাবশেষ হইতে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের যে অপূর্ব্ব ও অপরূপ নিদর্শন সমূহ আবিষ্কৃত হইয়াছে, পণ্ডিতেরা আশা করিতেছেন হারকিউলেনিয়ুমের ধ্বংসাবশেষ হইতেও তেমনি অপূর্ব্ব ও অপরূপ নিদর্শন আবিষ্কার লাভ করিবে। ইতিমধ্যেই যে-সমস্ত মূর্ত্তি ইত্যাদি ভাস্কর্য্যের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহার সংখ্যা খুব অল্প নয় এবং প্রায় সবগুলিই রোমীয় ভাস্কর-শিল্পের চরম বিকাশের যুগেই নির্ম্মিত। গ্রীক-ভাস্কর্য্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলির সঙ্গে তুলনায় হারকিউলেনিয়ুমের মূর্ত্তিগুলি তুচ্ছ বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দীতে ভাস্কর-শিল্পের চরম উন্নতি এই পম্পিয়াই এবং হারকিউলেনিয়ুম্ নগরীতেই সম্ভব হইয়াছিল। রাজকীয় ও নাগরিক কর্ম্মচারীদের কয়েকটি অতি সুন্দর ব্রোঞ্জমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে; এগুলি নাট্যশালায়, হট্টমন্দিরে, সভাগৃহে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান জিনিষ পাওয়া গিয়াছে সহরতলীর এক বাগান বাড়ীতে। এই বাড়ী ছিল এক প্রভূত বিত্তশালী পণ্ডিত শিল্পসৌখীন রোম নাগরিকের। এইখানে একটি আবক্ষ মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে—পণ্ডিতেরা বলেন এ মূর্ত্তিটি গ্রীক-বীর এরিস্টাইডিসের। আর দুইটি মূর্ত্তির শুধু মাথা পাওয়া গিয়াছে—তাহার একটি নাকি প্লেটোর এবং আর একটি সেনেকার। কিন্তু এ গৃহের সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ আবিষ্কার একটি সুবৃহৎ লাইব্রেরী। তাহার সবগুলি পুঁথি তালপত্র জাতীয় এক প্রকার পাতার উপরে লেখা; এইরকম ১৮০৩ খানি বই পাওয়া গিয়াছে। অনেকগুলি: জীর্ণ ও কীটদষ্ট; বাকী যেগুলি অক্ষত



জাপানের নূতন সম্রাট

অবস্থায় আছে, যেগুলি পণ্ডিতেরা খুবই মূল্যবান মনে করেন। এই বইগুলির মধ্যে ডেমিট্রিয়স্, পলিষ্ট্রেটাস্, কার্ণিস্কাস্, ফিলোডেমাস্ প্রভৃতি গ্রীক্ দার্শনিকদের নাম পাওয়া গিয়াছে—ইঁহারা সকলেই গ্রীক্ চিন্তাবীর এপিকিউরাসের মতাবলম্বী; খুব সম্ভব এই আবিষ্কারের মধ্যে এপিকিউরাসের নিজের বইও আছে।

এই লাইব্রেরীগৃহের আবিষ্কার হইতে মনে হয়, অতীত দিনের এই সুবৃহৎ নগরীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আরও কত অপূর্ব্ব শিল্প ও জ্ঞানের নিদর্শনসমূহ আত্মগোপন করিয়া আছে। যেদিন তাহারা সমস্ত আত্মপ্রকাশ করিবে সেদিন মানুষের শিল্প ও জ্ঞানের রাজ্যের পরিসর বিস্তৃত ও প্রসারিত হইবে এবং প্রাচীন দিনের জ্ঞান ও সভ্যতার কাছে বর্ত্তমান মানব শ্রদ্ধায় ও সম্ভ্রমে মস্তক অবনত করিবে।

জাপানের নূতন সম্রাট

জাপানের ইতিহাসে ১২৩ জন সম্রাট এ-পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন। সম্প্রতি আর এক নূতন সম্রাট জাপানের রাজদণ্ড পরিচালনের ভার পাইয়াছেন। ১২৩ জন সম্রাট শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া যে-সংস্কার মানিয়া চলিয়াছেন এই নূতন তরুণ সম্রাট সে-সংস্কারের বেড়াজাল কাটিয়াছেন, বহুদিনের জীর্ণ প্রাচীর ভাঙিয়া মাটির ধূলায় মিশাইয়া দিয়াছেন। জাপানে আজ জনগণের বাণী রাজার প্রাসাদের ভিতরে পৌঁছিয়াছে এবং জনগণ রাজকার্য্যে মতপরিচালনার অধিকার লাভ করিয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগরের বুকের উপর নবীন যৌবনের চঞ্চল নৃত্য আরম্ভ হইয়াছে।



জাপানের নূতন সাম্রাজ্ঞী

আজ হিরোহিতো জাপানে যে নবযুগের উদ্বোধন করিলেন, সে যুগ তাঁহার পিতার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। তাঁহার পিতা যোশিহিতো সিংহাসন আরোহণ করেন ১৯১২ খৃষ্টাব্দে। তখন জাপানের অন্তরাত্মা কয়েকজন বৃদ্ধ 'পরম পাকা' বিজ্ঞের শাসনে ও মন্ত্রণায় ক্ষুব্ধ ও জর্জ্জরিত। সে সময় কয়েকজন তরুণ নেতার নেতৃত্বে জাপানে যে জনগণের সাড়া স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহাকে টুঁটি চিপিয়া মারিতে বৃদ্ধের দলের বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। সে যুগ ছিল সামরিক প্রভুত্বের যুগ, সে যুগ ছিল গোষ্ঠী-রাজনীতির যুগ। সামাজিক ও রাজনৈতিক স্তরভেদ জাপানের সমস্ত চিহ্নকে তখন বিপর্য্যস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। রুষ-জাপান-যুদ্ধের জয় মদগর্ব্বিত জাপান তখন কর ভারে প্রপীড়িত এবং নির্ব্বিশেষ অত্যাচারে লাঞ্ছিত। কিন্তু আজ ধীরে ধীরে প্রাচীনের দল জাপানের বুক হইতে অপসৃত হইয়াছেন এবং রাজপরিবারের অশন-বসন পর্য্যন্ত জনগণের মত-চালনায় নিয়মিত হইয়াছে। রাজকার্য্যপরিচালনায় আগে যেখানে ৩,০০০,০০০ লোক মতামত প্রদান করিতে পারিত, সেখানে আজ ১২,০০০,০০০ লোকে মত-চালনা করিতেছে।

পঁচিশ বৎসর বয়সে যুবক হিরোহিতো জাপানের রাজদণ্ড ধারণ করিলেন। জাপানের বাহিরে যে বিরাট বিশ্বের প্রাণ স্পন্দিত হইতেছে, হিরোহিতো ইতিমধ্যেই সে প্রাণের পরিচয় লাভ করিয়া জাপানকে তাহার স্পন্দন অনুভব করাইয়াছেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রথম য়ুরোপ

যাত্রা করেন ও তিনমাসের মধ্যেই তিনি পাশ্চাত্য-জগতের সাধনা ও সভ্যতা সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনে যে সৎসাহস ও দূরদর্শিতা দেখাইয়াছেন, জাপানের ইতিহাসকে তাহা নূতন রূপ দান করিয়াছে। 'কুনি' পরিবারের রাজকুমারী নাগাকোর সঙ্গে হিরোহিতোর বিবাহ, জাপানের রাজপরিবারে প্রেমের আদান প্রদানে প্রথম বিবাহ। ব্যক্তিগত রুচি বা ইচ্ছানুযায়ী অথবা 'প্রেমে পড়িয়া' বিবাহ কাহাকে বলে, জাপানের ইতিহাসে তাহার কোনো পরিচয় নাই। পারিবারিক ও সামাজিক স্বার্থ বজার রাখিয়াই এ-পর্য্যন্ত সকল বিবাহ নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। কাজেই হিরোহিতোর পক্ষে এ বিবাহ সংঘটন কিছুতেই সহজ হয় নাই। বিশেষ করিয়া বৃদ্ধ মন্ত্রীদলের প্রিন্স ইয়ামাগাটা এই মিলনের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন।

১৯২১ খৃষ্টাব্দের কথা; হিরোহিতোর বয়স তখন মোটে কুড়ি বৎসর। সমস্ত বৃদ্ধ মন্ত্রিদলের বিরুদ্ধে বিশবৎসর বয়সের রাজকুমারের এই বিদ্রোহের ধ্বজাউত্তোলন জনসাধারণের চিত্তকে উৎসাহে উন্মাদনায় নাচাইয়া তুলিল। ১৫,০০০ যুবক টোকিও সহরে মন্দিরে সমবেত হইয়া এই প্রেম-মিলনের উদ্দেশ্যে মিলিত জাতীয় প্রার্থনা উচ্চারণ করিল। জনগণের বাণী এই সর্ব্ব প্রথম পরিপূর্ণ মূর্ত্তি লাভ করিল। 'কমু'-দলের সমবেত বিরুদ্ধাচরণও এই যৌবন-জল-তরঙ্গকে রোধ করিতে পারিল না। রাজপরিবারের মন্ত্রী নাকামুরা কমু পদত্যাগ করিলেন এবং সমস্ত রাজসম্মান ফিরাইয়া দিলেন; যুবক হিরোহিতোর জয় হইল।

এই নূতন সম্রাট বাস্তবিকই জনগণের প্রতিনিধি। য়ুরোপ-ভ্রমণকালে তিনি রাস্তায় হাটে-মাঠে সাধারণ লোকদের সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন, নিজেই নিজের সমস্ত জিনিষ ক্রয় করিতেন, এবং সকলের সঙ্গে নিতান্ত সাধারণ লোকের মতো কথাবার্ত্তা বলিতেন। জাপানে যখন এই খবর পৌঁছিল তখন প্রাচীনদলের চক্ষু কপালে উঠিল—এমন কথা তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই। লণ্ডনে একদিন তিনি টিউব-রেলে চড়িতে গিয়া চালককে টিকিট দেখাইতে না পারায় ভর্ৎসিত হইয়াছিলেন—চালক তাঁহার পরিচয় জানিত না। সঙ্গে যাহারা কর্ম্মচারী ও পরিচারক ছিল তাঁহারা প্রমাদ গণিল, এমন অপরাধ তাহারা কখনও প্রত্যক্ষ করে নাই। কিন্তু হিরোহিতোর একটুও ভাবের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা গেল না—অত্যন্ত বিনয়ের সহিত তিনি চালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। সে বেচারী একেবারে এতটুকু হইয়া গেল।

নাট্যমন্দিরে অভিনয় দেখা জাপানী অভিজাতবর্গ এক শতাব্দী আগেও অত্যন্ত নীচ আমোদ বলিয়া মনে করিতেন। রাজপরিবারে হিরোহিতোই সর্ব্বপ্রথম সাধারণ নাট্যশালায় অভিনয় দর্শন করেন। হিরোহিতো খেলাধূলা খুব ভালবাসেন, সাঁতারে খুব পটু এবং কুস্তিতে ও গল্‌ফ্‌ খেলায় তাঁহার জুড়ি খুব কম।

তাঁহার অভিষেকোৎসব কখন হইবে এখনও জানা যায় নাই। শরৎকালে যখন জাপানের ঘরে ঘরে নবান্ন উৎসব হয় তখনই সাধারণত জাপান-সম্রাটের অভিষেক উৎসব সম্পন্ন হয়। রাজা ও রাণী টোকিও রাজপ্রাসাদের মন্দিরে গিয়া উপাসনায় যোগদান করেন। উপাসনার পর কিয়োটো রাজপ্রাসাদে গমন করেন—সেখানে সকালে ও তাঁহারা বিকালে দুইবার বিশেষ অভিষেকোৎসব সম্পন্ন হয়। রাজা ও রাণী একটি সুদৃশ্য অলঙ্কৃত যবনিকার আড়ালে সিংহাসনে উপবেশন করেন—অভিষেকের পর ধীরে ধীরে সেই যবনিকা উত্তোলিত হয় এবং রাজা রাণী রাজপরিবার-বর্গের ও মন্ত্রী, সেনাপতি, আইন-সভার সদস্য প্রভৃতি সকলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অভিভাষণ পাঠ করেন। প্রধান মন্ত্রী তখন অগ্রসর হইয়া তাহার উত্তর প্রদান করেন এবং জাতির পক্ষ হইতে সম্রাটকে অভিনন্দিত করেন; সমবেত সকলে জয়ধ্বনি করিয়া উঠে।

নবান্ন উৎসব পর্য্যন্ত রাজা ও রাণী কিয়োটো রাজ-প্রাসাদেই বাস করেন; তাহার পর টোকিওতে ফিরিয়া আসেন। এই ভাবে অভিষেকোৎসব সম্পন্ন হয়।

জাপানের নবজাগ্রত যৌবন হিরোহিতোর অভিষেকোৎসবে নবমন্ত্রে দীক্ষিত হইবার প্রতীক্ষায় রহিয়াছে।

শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

সঙ্কলন

প্লেটো ও ভারতের প্রগতি

Progress, প্রগতি, অগ্রগতি বা আগাইয়া চলা। মানুষ অগ্রসর হয় কেন? কোন্ ভাব, কোন্ প্রেরণা তাহাকে পিছন হইতে ক্রমশঃ সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া লইয়া যায়? অথবা, কোন্ সুদূরের সুন্দর মহতী চুম্বকশক্তি তাহাকে সম্মুখের দিকে আকর্ষণ করিয়া তাহার মধ্যে গতি সঞ্চার করে? আবার, কিসের অভাবেই বা তাহার প্রগতি একেবারে রুদ্ধও হইয়া যায়? ব্যক্তির পক্ষে যদি এ প্রশ্ন খাটে, তবে একটা দেশ, একটা মহাজাতির পক্ষেও তাহা খাটে না কি?

ইতিহাসে দেখা যায় এককালে ভারত সভ্যতার উচ্চ-শিখরে উঠিয়াছিল, তাহার কালে ভারতে অগণিত বীর, রাজনীতিবিদ্ ও ধর্মগুরুর আবির্ভাব হইয়াছিল। সাহিত্যে, শিল্পে, ধর্ম্মে, নীতিতে, গতিশীল জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে ভারতবাসী অলোকসামান্য উন্নতিলাভ করিয়াছিল। রাজর্ষি অশোকের যুগ পর্য্যন্ত ভারতের সত্যযুগই ছিল।

ইহার পরেই ভারতের অগ্রগতি সহসা থামিয়া গেল, প্রগতি রুদ্ধ হইয়া গেল; তাহাকে অমানিশার ঘোর অন্ধকার ঘেরিয়া ফেলিল। তবে যে এই অন্ধকারের যুগেও বহু বীর, রাজনীতিক, ও ধর্মগুরুর আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা ব্যতিক্রম মাত্র। তাঁহারা সমগ্র জাতির মুক্তি ও প্রগতির অবিচ্ছিন্ন ধারার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে আবির্ভূত হন নাই; তাঁহারা কয়েকটি উজ্জ্বল উল্কার মত ভারতের অমানিশার আকাশে উঠিয়াই নিভিয়া গেলেন; সমস্ত জাতিটাকে, সমগ্র দেশটাকে তাঁহাদের ভাবধারায় স্নাত করাইয়া সম্মুখের দিকে বরাবর অপ্রতিহতভাবে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে পারিলেন না; সমগ্র জাতি তাঁহাদের ভাবে সাড়া দিল না, তাঁহাদের সাহচর্য্য করিতে পারিল না।

এমনটা কেন হইল? ভারতের প্রগতি রুদ্ধ হইল কেন? ভারত তাহার অগ্রগতির কারণভূতা শক্তি হারাইল কিরূপে? অথবা কোন কালে তাহার এমন কোন চিরন্তনী শক্তি ছিল কি যাহার উৎসরণে তাহার প্রগতি অপ্রতিহতভাবে চিরকাল চলিতে পারিত? সেই শক্তিবীজ কোথায়? বর্ত্তমান যুগে ভারতের প্রগতির জন্য কি প্রকারে শক্তিসঞ্চার করা যাইতে পারে? সে শক্তির উৎস কোথায়?

এই প্রকারের কয়েকটি প্রশ্নের পূর্ব্বাভাস পাইয়াই যেন উত্তরচ্ছলে নাগপুরের অধ্যাপক জন্-এস্-হল্যাণ্ড-সাহেব "নাইন্‌টিন্‌থ্ সেঞ্চুরী" পত্রিকায় "Plato, The Idea of Progress, and India"-শীর্ষক একটি সুদীর্ঘ সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। বলা বাহুল্য, প্রবন্ধটি খৃষ্টান মিশনারীদের উদ্দেশে লিখিত এবং মিশনারীরা কি উপায়ে ভারতের প্রগতির সাহায্য করিতে পারেন, উপসংহারটি সেই উপদেশে পূর্ণ। তৎসত্ত্বেও, প্রবন্ধটিতে ভাবিবার বিষয় প্রচুর রহিয়াছে।

ভারতে শক্তিসঞ্চার করার জন্য ভারত-ইতিহাসে সেই শক্তির উৎস না খুঁজিয়া লেখক য়ুরোপের ইতিহাসে ইহার অনুসন্ধান লইয়াছেন; কেননা, তাঁহার মতে ভারত-ইতিহাসে প্রগতির প্রেরণা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, প্রগতির ভাব, প্রগতির আদর্শ ও ক্রিয়া এদেশে কখনও ছিল না। কিন্তু য়ুরোপের ইতিহাসের পাতায় পাতায় প্রগতির সাক্ষ্য বিদ্যমান, প্রগতির ভাব ও ক্রিয়া পরিলক্ষিত। য়ুরোপে যে অমানিশার যুগ কখনও আসে নাই, এমন নহে; কিন্তু য়ুরোপের প্রাণে এমন একটা শক্তি আছে যে, সে সেই শক্তির তাড়নায় অমানিশার যুগ অতি সহজে কাটাইয়া উঠিয়া প্রগতির পথে অবিরাম চলিয়াছে। য়ুরোপের বর্ত্তমান ইহলোক-সর্ব্বস্বতা তাহার একটা খুব বড় কলঙ্ক সন্দেহ নাই; এই জড়বাদপ্রধান ও যন্ত্রসর্ব্বস্ব (Industrial) সভ্যতা য়ুরোপকে প্রাচ্যের, বিশেষত ভারতের, চক্ষে হীন প্রতিপন্ন করিয়াছে সত্য; কিন্তু প্রাণবান্ য়ুরোপ এই সভ্যতার প্রভাব হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়া অচিরেই ইহাকে ছাড়াইয়া উঠিবে, লেখকের সেই বিশ্বাস আছে। অধুনা য়ুরোপের মনীষিগণ য়ুরোপকে এই জড়প্রধান সভ্যতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে মহতী চেষ্টা করিতেছেন, তাহার ফলে এখনই সেই সভ্যতা চৈতন্য বা আত্মার ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। অপর পক্ষে

ভারত যেন অথর্ব্ব, স্থিতিশীল, স্থাণু, অচল পাথরের মত একই ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। ভারতের এমন শক্তি নাই যে, সে দুর্য্যোগের দিন সহজে কাটাইয়া উঠিতে পারে। তাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রায় দ্বিসহস্র বৎসরের মধ্যে তাহার কোন প্রাণস্পন্দন হইল না, তাহার প্রাণশক্তি দিকে দিকে বিদ্যুৎ ছুরিল না, জীবন সহস্র ধারায় প্রসৃত হইল না, কল্পবৃক্ষে অগণিত ফল ফলিল না। সে হিমাচলেরই মতন অচল, অটল,—তাহার গতিবেগ রুদ্ধ। ইহাই হইল ভারত ও য়ুরোপের ইতিহাসের তুলনামূলক পর্য্যালোচনা হইতে উপজাত লেখকের দৃঢ় বিশ্বাস।

তাই তিনি য়ুরোপের ইতিহাস হইতে য়ুরোপের প্রগতির প্রেরণা সংগ্রহ করিয়া; সেই প্রেরণাদ্বারা ভারতকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে চান। কেননা, লেখক বিশ্বাস করেন, প্রাচ্য সভ্যতা ও সাধনা যদি য়ুরোপের সাধনা ও প্রগতির গুপ্তরহস্যটুকু উদ্ধার করিয়া লইতে না পারে এবং যে শক্তিতে য়ুরোপ শক্তিমান, সেই শক্তিতে যদি নিজে উজ্জীবিত হইতে না পারে, তবে তাহা ক্রমশ ম্রিয়মাণ হইয়া নিশ্চিহ্ন হইতে লোপ পাইতেই পাইবে।

সেই গুপ্ত রহস্যটি কি? য়ুরোপ কোন্ শক্তিবলে জীবনপথে আগাইয়া চলিতে সমর্থ হইতেছে? লেখকের মতে প্লেটোর আদর্শবাদ ও সেন্ট্ পল্ ও সেন্ট্ জন্ কর্ত্তৃক খৃষ্টধর্ম্মের নূতন ব্যাখ্যানের (Interpretation of Christianity-র) সংমিশ্রণই য়ুরোপকে নববলে বলীয়ান করিয়াছে। চারিশত বৎসর ধরিয়া প্লেটোর শিক্ষা ও আদর্শবাদ (Idealism) গ্রীকজাতির মনকে নব খৃষ্টধর্ম্মের গতি-প্রদায়িনী শক্তিকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত করিয়া আসিতেছিল। সেন্ট্ পল্ ও সেন্ট্ জন্ নিজেরাও প্লেটোর ভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন; পরে, অতি অসাধারণ প্রতিভাবলে গ্রীকদের মানসটিকে তাঁহাদের নূতন ধর্ম্ম এমনভাবে ধরিয়া দিলেন যে, তাহার ফলে এমন একটি ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল, যাহা প্লেটোর শিক্ষার সনাতন সত্যকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়া তাহাকে আরও দুর্দ্ধর্ষ করিয়া তুলিল। প্লেটোর আদর্শবাদ ও ঋষি পল্ ও ঋষি জনের খৃষ্টধর্ম্মের নূতন ব্যাখ্যানের সংমিশ্রণেই য়ুরোপের উত্তর-সাধনার ও প্রগতির গোড়া পত্তন হইল, ইহাই হইল হল্যাণ্ড-সাহেবের মত।

প্লেটো দেখিলেন, এই অনিত্য, দৃশ্য (Phenomenal) জগতের পিছনে যে অপরিবর্ত্তনশীল নিত্য বস্তু রহিয়াছে তাহা শিব ও সুন্দরের এক মানস সত্তা (Idea of Goodness and Beauty)। এই সত্তাই হইলেন ভগবান, যিনি অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার বা জ্ঞানস্বরূপ, চিরসুন্দর ও চির শিব বা মঙ্গল। দার্শনিক, কবি, ঋষি ও দ্রষ্টা প্লেটো দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলেন, যাহা সত্য, তাহাই শিব, তাহাই সুন্দর। সত্যং শিবং সুন্দরম্। তিনে এক, একে তিন—অভেদ্য, অচ্ছেদ্য। তিনি নবপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া দিব্যশক্তিতে মানুষের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিলেন যে মানবের অন্তরের মধ্যে শিবের পূজা করিবার অর্থাৎ মঙ্গলসাধনার ঐকান্তিক ক্ষুধা চিরকাল রহিয়াছে। সেই ক্ষুধা মিটাইতে দিয়া অনাগত জনেরা সত্য ও সুন্দরকে লাভ করিতে পারিবে। শিব-সাধনায় (অর্থাৎ জগতের হিতসাধনায়?) জীবনের আরম্ভ, সেই শিব-সাধনাই সত্য ও সুন্দরকে ধরাইয়া দিবে। তিনি আরও দেখিলেন যে এই শিবরূপ ভাবসত্তা ব্যক্তিত্বগুণোপেত (personal) এবং তাহাই ইষ্টদেবতা। মানুষ যদি পূর্ণতা লাভ করিতে চায়, তবে এই ইষ্টদেবতাকে তাহার জানিতে হইবে, বুঝিতে হইবে, তাহার প্রেমে মুগ্ধ হইতে হইবে; নিজের ইচ্ছাকে ঐশী ইচ্ছার মধ্যে হারাইয়া ফেলিয়া ভগবানের সারূপ্য (Divine likeness) লাভ করিতে হইবে; এক কথায় দেবতা হইয়া উঠিতে হইবে।

প্লেটো আরও বলেন, এই দৃশ্য জগৎ নিত্য বস্তু নহে, ইহা সত্য জগৎ নহে। এই জগতের অতীত আর একটা জগৎ আছে—তাহা নিত্য ভাবলোক। এই জগৎপ্রপঞ্চ সেই চরম সত্য ভাবলোকেরই বহিঃপ্রকাশ বা বাহ্যরূপ মাত্র। ইহা সেই নিত্যলোকের বাহ্য রূপ হইলেও ইহার ক্রম-বিকাশের ধারার মধ্যে, নানা ভাবে ও নানা আকারে, সেই সত্য সনাতন ভাব (Ideas) অন্তর্নিহিত (immanent) রহিয়াছে এবং সেই ভাবরূপ শাশ্বত সত্য যে পরিমাণে বাহ্যজগতে অন্তর্প্রবিষ্ট, যে পরিমাণে ইহা ভগবৎসত্তায় অনুপ্রাণিত, যে পরিমাণে ইহা সেই শাশ্বত অরূপের নিগূঢ় প্রতীক, ঠিক সেই পরিমাণে এই দৃশ্য জগৎ অনিত্য হইয়াও সত্য বস্তু। ইহা একেবারে মায়াময় মিথ্যা নহে। ইহা মিথ্যা বটে; কিন্তু শাশ্বত অরূপের রূপ বলিয়া সত্যও বটে। প্লেটোর মানস-সত্তা বা ভাব (Ideas) শুধু দার্শনিক মতবাদের সত্য নহে, পরন্তু তাহা আত্মময় চৈতন্যস্বরূপ; শিব ও সুন্দর এই সত্তার অপরূপ প্রকাশ। সুতরাং সত্যং শিবং সুন্দরম্ এক ও অভেদ্য। একমেবাদ্বিতীয়ম্। তিনিই ঈশ্বর; সত্যম্ শিবম্ তাঁহার নিত্যস্বভাব; তাঁহারই সত্তায় অনুপ্রাণিত হইয়া এই জগৎ শিব ও সুন্দর হইয়া প্রকাশ পায়। সুতরাং জগৎ ভগবদিচ্ছার পূর্ণ সার্থকতারই জন্য সৃষ্ট; ভগবান্ ইহার মধ্য দিয়া তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিতেছেন। এই জগৎ তাঁহারই রূপে রূপায়িত হইয়া ফুটিয়া উঠুক, ইহাই ভগবানের চির-ইচ্ছা (will)।

"নাইন্টিন্থ্-সেঞ্চুরী"র প্রবন্ধ-লেখকের মতে প্লেটোর এই ভাবের মধ্যেই প্রগতির সূক্ষ্ম বীজ উপ্ত রহিয়াছে। য়ুরোপের অগ্রগতির এখানেই ভিত্তি। মানুষ ক্রমশ ভগবানের স্বরূপ লাভ করুক, তাঁহারই মত শিব ও সুন্দর হইয়া ফুটিয়া উঠুক, সেও ভগবানের একটি সত্য প্রতীক হইয়া

উঠুক; ইহা যদি ভগবানের ইচ্ছা হইয়া থাকে, আর ইহা যে একটা মস্ত সত্য, তাহা যদি মানুষ বুঝিতে পারে, তবে সেই ভগবৎস্বরূপ লাভ করিবার প্রচেষ্টাতেই মানুষ গতিশীল হইয়া উঠিতে বাধ্য হইবে; তখন সে দেখিবে, যে মানুষ আদর্শ সে একাধারে দার্শনিক, রাজনীতিক, ভক্ত, কবি ও দ্রষ্টা। এবং সেই আদর্শ মানবের কল্পনাই এই রূপরসময়ী পৃথিবীকে শিব ও সুন্দরের প্রতীক করিয়া তুলিতে ব্যক্তিকে অনুপ্রাণিত করিবে, ভগবানেরই অনুরূপ সুন্দর চরিত্রের সৃষ্টি করিবে। গ্রীকেরা এই ভাবটি লইয়া জীবনক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল।

প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্র গঠন করিবার কল্পনাও য়ুরোপের প্রগতির অনেকখানি সাহায্য করিয়াছিল। প্লেটো শিক্ষা দিলেন আদর্শলোক গঠিত করিতে হইলে আদর্শ মানবের সৃষ্টি করিতে হইবে, তাহাকে শিব ও সুন্দর করিয়া তুলিতে হইবে, তাহাকে সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে চলিবে না, নিঃসঙ্গ একক আত্মগত জীবন যাপন করিলে চলিবে না—তাহাকে সমাজের মধ্যে, সামাজিক জীবরূপে, দশজনের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া চলিতে হইবে। সামাজিক জীবনেই ভগবদিচ্ছা সার্থকতা লাভ করে। প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্র বা Ideal State এই সামাজিক জীবনের প্রসারক্ষেত্র। প্রতি মানবকে এই আদর্শ 'ষ্টেট্' গড়িবার জন্য কর্ম করিতে হইবে, সুতরাং প্রগতির পথে চলিতেই হইবে।

এই গেল প্লেটোর কথা। এখন দেখা যাক, খৃষ্টীয় সাধনা প্লেটোর চিন্তাকে উত্তরকালে কি ভাবে শক্তিদান করিল ও য়ুরোপের প্রগতিকে অপ্রতিহত করিয়া তুলিল।

গ্রীকেরা প্লেটোর ভাব বেশী দিন ধরিয়া রাখিতে পারিল না। তত জোর উহাদের হইল না। "অপূর্ণ মানব, অপূর্ণ আধার লইয়া দুর্বল ইচ্ছাশক্তিসহকারে প্লেটোর উচ্চ ভাবকে জীবনে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে পারিল না। "ধর্ম্মের গ্লানি" দেখা দিল। এমন সময় সেণ্ট্ পল্ ও সেণ্ট্ জন্ আবির্ভূত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন প্লেটোর ঈশ্বর ও খৃষ্টীয় ঈশ্বর স্বরূপত ভিন্ন নহেন; দু'এর মধ্যে এইমাত্র প্রভেদ যে খৃষ্টভক্তরা ভগবানের প্রেমময় রূপকে খুব বড় করিয়া দেখেন, প্লেটো তাঁহাকে তত বড় করিয়া দেখেন নাই। সত্যং শিবং সুন্দরম্‌ যে রসস্বরূপ তাহা প্লেটো খুব জোরের সহিত বলেন নাই। কিন্তু খৃষ্টভক্তরা মনে করেন, ভগবানের অবতার যীশু তাঁহার অপার প্রেমেরই পূর্ণ পরিণতি—ভগবান প্রেমের জোরেই মানবের কল্যাণের জন্য যীশুকে পাঠাইলেন। তারপর, প্লেটোর মত খৃষ্টানরাও মনে করেন যে পূর্ণতা লাভ করিতে হইলে প্রত্যেক মানুষকে তাহার নিজ ইচ্ছাকে প্রভু ইচ্ছার মধ্যে ডুবাইতে হইবে, শিব-সুন্দরের মত নিজেও শিব-সুন্দর হইয়া উঠিতে হইবে এবং আদর্শ রাষ্ট্র অর্থাৎ স্বর্গ রাজ্য স্থাপনের জন্য সমাজে থাকিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে। কিন্তু একটি বিষয়ে তাঁহারা প্লেটোকে ছাড়াইয়া গেলেন; তাঁহারা প্লেটোর আদর্শবাদকে একটি শক্তিকেন্দ্রে পরিণত করিয়া জগতের মধ্যে একটা মহাপরিবর্ত্তন আনয়ন করিলেন—সেণ্ট্ পল্ ও সেণ্ট্ জন্ প্লেটোর আদর্শবাদকে খৃষ্টানের ভক্তিরসে রসায়িত করিলেন, ফলে তাহাতে একটা নূতন প্রাণ আসিল। প্লেটোর জ্ঞান ও খৃষ্টানের ভক্তির সমন্বয়ে একটা প্রবল শক্তির সৃষ্টি হইল। এই ভক্তিরসে রসায়িত হইয়া শুষ্ক আদর্শবাদের সত্যং শিবং সুন্দরম্‌ নূতন কর্ম্মপ্রেরণা জাগাইয়া দিল, মানুষ ভগবানের স্বরূপ্য লাভ করিবার জন্য সকল সাধনায় তৎপর হইল, য়ুরোপে প্রগতির নবযুগ দেখা দিল।

ইহাই হইল অধ্যাপক হল্যাণ্ডের মতে য়ুরোপের প্রগতির মূল কারণ ও ভিত্তি। এক্ষণে প্লেটোর আদর্শবাদ ও খৃষ্টীয় সাধনার সংমিশ্রণে যে অপূর্ব শক্তি উদ্ভূত হইল তাহা ভারতে কি প্রকারে সংক্রামিত করা যাইতে পারে? অধ্যাপক হল্যাণ্ড্ বলেন, প্লেটোর মতে, শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্য দিয়াই এ ভাব জনগণের মধ্যে ছড়াইতে হইবে। বিদ্যালয়গুলিকে খৃষ্টীয় ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিতে হইবে। ভারতকে যে প্রচলিত খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই; কিন্তু খৃষ্টানের কল্যাণসাধনার ভাবটি বিদ্যালয়গুলিতে সংক্রামিত করিতেই হবে। সর্ব্বোপরি, প্লেটোর আদর্শ মত, ভারতের বালকরূপী ভাবী নেতৃগণকে এমন শিক্ষা দিতে হইবে যাহাতে তাহার আত্মার সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশ লাভ হয় ও সুচরিত্র গঠিত হইয়া উঠে।

হল্যাণ্ড সাহেব কর্ত্তৃক ব্যক্ত মতামতের সহিত সায় দেওয়া অনেক স্থানেই কঠিন হইলেও স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহার প্রবন্ধে চিন্তা ও বিচার করিবার মত অনেক কথা আছে এবং সে সম্বন্ধে আলোচনারও যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে।

—'গুপ্ত'

চীন-বিপ্লবের মূলনীতি।

বর্ত্তমান চীনে যে বিপ্লব চলিতেছে, তাহার স্বরূপটি ঠিক উপলব্ধি করিতে হইলে......পরলোকগত সন্-ইয়াৎ সেনের ত্রয়ী বা ত্রিনীতি বুঝিতে হয়। ফরাসী-বিপ্লবের স্বরূপ বুঝিতে হইলে যেমন সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতা মানবের প্রকৃতিগত এই তিন অধিকারের আলোচনা করিতে হয়, তেমনি চীনের বিপ্লবের স্বরূপটি বুঝিতে হইলে বিপ্লবকর্ত্তা সন্-ইয়াৎ সেনের প্রবর্ত্তিত, "স্বদেশাত্মবোধ, গণতন্ত্র ও প্রজার উপজীবিকা" (Nationalism, Democracy and People's Livelihood) এই

ত্রি-নীতিরকথা আলোচনা করিতেছেন। চীনের বিপ্লব এই ত্রয়ীর উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ত্রয়ী হইল চীনের বিপ্লববাদ। "নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি" পত্রে ইহার আলোচনা ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতেছে। এই পত্র হইতে ডেমোক্রেসি সম্বন্ধে সন্‌-ইয়াট্‌-সেনের গোটাকয়েক কথা "বিচিত্রা"র পাঠকপাঠিকাকে দেওয়া গেল।

"দ্বি-সহস্র বৎসর পূর্ব্বে চীন গণতন্ত্রতার আদর্শ কি তাহা ঋষি কন্‌ফুসিয়সের ও মেন্‌সিয়সের অনুশাসন হইতে শিক্ষা করিয়াছিল। এই ঋষিদ্বয় বলিয়াছেন অত্যাচারী শাসককে দমন করার, প্রয়োজন হইলে হত্যা করার পর্য্যন্ত, প্রজার অধিকার রহিয়াছে। ফলে, দেশ প্রজার হিতার্থে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ সম্রাটের উদ্ভব হইয়াছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য-দেশে মাত্র দেড়শত বৎসর হইল ডেমোক্রেসির আদর্শ দেখা দিয়াছে।

"পাশ্চাত্যের ডেমোক্রেসি-মন্ত্রের ঋষি রুশো বলিয়াছেন ভগবান মানবকে সমান স্বাধীনতা ও অধিকার দিয়া সৃষ্ট করিয়াছেন; রাজতন্ত্র-শাসনের জন্য যেমন ধর্ম্মের দোহাই (Divine right of Kings) দেওয়া হইত, তেমনি রুশো ডেমোক্রেসির সম্বন্ধে ভগবানের দোহাই দিয়াছেন। ইহা মস্ত ভুল। ডেমোক্রেসিকে ক্রমবিকাশের উপর দাঁড় করাইতে হইবে—অর্থাৎ কোন্ যুগে কোন্ শাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহা যুগধর্ম্ম ও যুগপ্রয়োজনের উপর নির্ভর করিবে।

"পাশ্চাত্য দেশে আজিও আদর্শ ডেমোক্রেসি সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই।—পাশ্চাত্য ডেমোক্রেসি-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সম্যক্ ফলবতী না হইলেও এবং চীনেও তাহার প্রয়াস আজ পর্য্যন্ত বিফল হইলেও, বর্ত্তমান যুগে ডেমোক্রেসিই আদর্শ শাসনপ্রণালী এবং ইহা চীনে প্রতিষ্ঠিত হইবেই হইবে। চীনে আর একটি মাত্র সম্রাট্ থাকিবে না, ৪০ কোটি সম্রাটের সৃষ্টি হইবে।

"পাশ্চাত্যের দেশসমূহ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা (individual freedom) লাভের চেষ্টা করিতে গিয়া ডেমোক্রেসির সাক্ষাৎলাভ করিয়াছে; কিন্তু চীনে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বরাবরই রহিয়াছে। সুতরাং পাশ্চাত্যে ডেমোক্রেসি বলিতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বোঝায়, কিন্তু চীনে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এতই বেশী যে ডেমোক্রেসি-প্রতিষ্ঠা-কল্পে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কিছুটা খর্ব্ব করা আবশ্যক।

"বর্ত্তমানে চীনের দুঃখ ইহা নহে যে তাহার গবর্ণমেণ্ট অত্যাচারী। গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব পাইলেই সন্তুষ্ট; প্রজার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন না। চীনের স্বাধীনতা নাই ইহা ঠিক নহে; পরন্তু দারিদ্র্যই তাহার মহাদুঃখ। এই দারিদ্র্যের কারণ বিদেশীদের শোষণনীতি।

"চীনের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এতই বেশী যে বিদেশীরা চীনজাতিকে "বালির বস্তা"র সঙ্গে তুলনা করেন। বালিকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতীক বলা যাইতে পারে। একটি ধূলিকণা যেমন আর একটি ধূলিকণার সঙ্গে মিশে না, তেমনি এক চীনা আর এক চীনার সহিত মিশে না। কিন্তু সিমেণ্ট দিয়া যেমন ধূলিকণার সমষ্টিকে দৃঢ় বস্তুতে পরিণত করা যাইতে পারে, তেমনি বিপ্লব দ্বারা চীনাদের এক সজ্ঞবদ্ধ জাতিতে পরিণত করা যাইতে পারে।

"ফরাসী-বিপ্লবের মূল কথা ছিল সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা, কিন্তু চীন-বিপ্লবের মূল কথা হইবে স্বাদেশিকতা, গণতন্ত্রতা ও প্রজার উপজীবিকা (livelihood)।

"পাশ্চাত্যের বিপ্লববাদীরা সাম্য বলিতে এই বুঝেন যে প্রকৃতি সকল মানুষকেই সমান করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু ইহা ভুল। প্রকৃতিতে সাম্যের স্থান নাই। যেমন দুটি পুষ্প বা দুটি পত্র এক রকম হয় না, তেমনি মানুষও চরিত্রে, বুদ্ধিতে ও শারীরিক বলে এক রকম হয় না। পাপ-পুণ্য, বুদ্ধিমত্তা ও নির্বুদ্ধিতা ইত্যাদি গুণের মধ্যে পার্থক্য না দেখিলে, সমাজের উন্নতি অসম্ভব।

"কিন্তু মনুষ্যকৃত অসাম্য যে নাই তাহা নহে। বর্ণগত ও অর্থগত শ্রেণী-বিভাগ মনুষ্যকৃত, অতএব তাহা ধ্বংসযোগ্য। এই কৃত্রিম অসাম্যকে সমাজ হইতে দূর করাই ডেমোক্রেসির উদ্দেশ্য। উচ্চ শ্রেণীর লোকেই শাসক হয়; শাসনযন্ত্রে নিম্ন শ্রেণীর লোকের কোন হাত নাই। ইহাই অসাম্য। রাষ্ট্রীয় সাম্য স্থাপন করা অর্থাৎ শাসনযন্ত্রে সকল প্রজার সমান অধিকার, ইহা কার্য্যতঃ স্বীকার করাই ডেমোক্রেসির উদ্দেশ্য।

"মানবসমাজকে তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) নেতৃত্ব করিবার যোগ্য লোক—ইহারা চিন্তারাজ্যে বিচরণ করিয়া নূতন ভাব জাতিকে দিবেন, নানা বিষয়ের উদ্ভাবন করিবেন, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিবেন, ও নূতন নীতি প্রবর্ত্তিত করিবেন; (২) অনুচরবর্গ—ইহারা নেতৃগণের চিন্তারাশি বুঝিবেন এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিবেন; এবং (৩) শ্রমিকদল। এই তিন শ্রেণীর লোক দিয়া জাতি সংগঠিত হয়। [ভারতের চাতুর্ব্বর্ণ্যের সঙ্গে সন্‌-ইয়াট্‌-সেনের ত্রৈবর্ণের সামঞ্জস্য আছে—বিঃ সঃ] প্রথম শ্রেণী হইতে রাজনীতিক নেতার উদ্ভব হইবে। তাঁহারা এমন লোক হইবেন যাঁহারা জাতির বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতে সমর্থ—তাঁহারা জাতির সেবক মাত্র হইবেন,—নিজেদের প্রভু মনে করিবেন না। গণতন্ত্রশাসনের রাষ্ট্রপতিকে কোন কোম্পানীর ম্যানেজারস্বরূপ মনে করিতে হইবে; মোটরচালক, পাচক, ডাক্তার, দর্জ্জী, সূত্রধর—ইহাদের মতন রাষ্ট্রপতি জাতির একজন সেবক মাত্র।

"চীনের দারিদ্র্যের প্রধান কারণ এই যে, সে রপ্তানী অপেক্ষা অনেক বেশী মাল আমদানী করে। তাহার শাসনযন্ত্র দুর্ব্বল বলিয়াই এমনটা হয়। শ্রমিকেরা যদি বুঝিতে পারিত, যে চীনের শাসনযন্ত্রকে

শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইবে, তবে দারিদ্র্যসমস্যার মীমাংসা অচিরে হইয়া যাইত। চীনা শ্রমিকের জীবিকা রাজনীতি ও অর্থনীতির সঙ্গে ওতোপ্রোতঃ ভাবে জড়িত। অজ্ঞ বলিয়াই এ কথাটা তাহারা বুঝিয়া উঠে না।

"সত্যকার ডেমোক্রেসিতে অন্য সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে রাজনীতি-বিষয়ে শ্রমিকদের সমান অধিকার। এই কথার অর্থ ইহা নয় যে তাহারা সকলের সঙ্গে সর্ব্ব বিষয়েই সমান। সমাজে কেহ নেতা, কেহ অনুচর, কেহ ভাবুক ও কেহ শ্রমিক এমন বিভাগ থাকিবেই। তবে, প্রত্যেকেই যদি নিঃস্বার্থভাবে সমাজ সেবা করেন, তবে সাম্যের শাসন অটুট থাকিবে।

"শাসন-যন্ত্র ও প্রজার মধ্যে একটা বিরোধভাব সর্ব্বত্র ও সর্ব্বসময় থাকে। সাধারণতঃ ডেমোক্রেসি শক্তিশালী হইলে, শাসনযন্ত্র ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। কোন বিপ্লবের পরে, যে অরাজকতা দেখা দেয়, তাহার একমাত্র কারণ এই-যে, যে শাসনযন্ত্র দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। কিন্তু শক্তিশালী শাসনযন্ত্র ডেমোক্রেসিকে আয়ত্ত করিয়া ফেলে। আদর্শ ডেমোক্রেসি তাহাই, যাহার অমিতশক্তি শাসনযন্ত্র প্রজার ইচ্ছাকে মুক্তিদান করে।

"ডেমোক্রেসিতে শাসনযন্ত্র প্রবল হইয়া পড়িলে প্রজার মনে ভয়ের সঞ্চার হয়; কেননা যে-শাসনযন্ত্র প্রজার শক্তিতে শক্তিমান হইল, সেই শাসনযন্ত্রের শক্তি কাড়িয়া লইবার ক্ষমতা প্রজার থাকে না। সুতরাং প্রজাকে শাসনযন্ত্রের উপর অধিকতর ক্ষমতা দিতে হইবে। শাসনযন্ত্রকে যেমন চালাইবার শক্তি প্রজার থাকিবে, তেমনি সেই যন্ত্রকে বন্ধ করিয়া দিবার শক্তিও তাহারই থাকিবে।

"শাসনযন্ত্রের উপর প্রজার সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, শাসন-যন্ত্রকে প্রজার ইচ্ছার পূর্ণমূর্ত্তি করিয়া তুলিতে হইলে, প্রজার চারিটি অধিকার থাকা আবশ্যক। (১) নির্ব্বাচন করার অধিকার (২) শাসন-কর্ম্মচারীকে পদচ্যুত করার অধিকার (৩) ব্যবস্থা বা আইন প্রণয়নের অধিকার এবং (৪) প্রণীত ব্যবস্থা বা আইন পরিবর্ত্তন বা নাকচ করার অধিকার এই চারিটি অধিকার থাকিলে, শাসনযন্ত্র সম্পূর্ণরূপে প্রজার বশে থাকিবে।

"শাসনযন্ত্র অর্থাৎ গবর্ণমেন্টের পাঁচটি প্রধান কাজ বা functions :—(১) শাসনকার্য্য (Executive), (২) ব্যবস্থা বা আইন প্রণয়ন কার্য্য (Legislative), (৩) বিচারকার্য্য (Judicial) (৪) প্রজার মঙ্গল সাধনের জন্য অনুসন্ধানপূর্ব্বক তথ্য নিরূপণ (যেমন ইংলণ্ডে Royal Commission নিযুক্ত হইয়া থাকে) এবং (৫) রাজকর্ম্মচারী নিয়োগের পরীক্ষাগ্রহণ।

"পৃথিবীতে এমন কোন প্রজাতন্ত্রশাসন আজ পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, যাহাতে প্রজাগণ উক্ত চারিটি অধিকারই পাইয়াছে এবং তাহার গবর্ণমেন্ট উক্ত পাঁচটি কার্য্যই সম্পূর্ণরূপে সমাধা করিয়া থাকে। সুইট্জারল্যাণ্ডই পূর্ণ গণতন্ত্র শাসনের জন্য বিখ্যাত। কিন্তু সেখানেও প্রজার রাজকর্ম্মচারীকে পদচ্যুত করার অধিকার নাই।

"চীনের জনসংখ্যা পৃথিবীর সকল দেশের অপেক্ষা বেশী। তাহার ৪০ কোটী লোক যদি সাম্য ও স্বাধীনতা লাভ করিয়া উক্ত চারিটি অধিকার ভোগ করিতে পারে এবং এমন এক শাসনযন্ত্র বা গবর্ণমেন্ট গড়িয়া তুলিতে পারে যাহার শক্তি উক্ত পঞ্চপ্রকার কর্ম্মধারার মধ্য দিয়া প্রজার ইচ্ছাকে মুক্তিদান করিতে থাকিবে, তবে চীনে যে অচিরেই এক মহা পরাক্রমশালী ও সমৃদ্ধিশালী ডেমোক্রেসি গড়িয়া উঠিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই ডেমোক্রেসির তুলনা পৃথিবীতে অন্য কোথাও মিলিবে না।"

হুজুগে আমেরিকা

হুজুগপ্রিয় আমেরিকা নিত্য নূতন উত্তেজনাপূর্ণ খবরের নেশায় কেমন করিয়া বিষম অনর্থের সৃষ্টি করে, বিখ্যাত মার্কিণ মাসিক "অ্যাট্লাণ্টিক্ মন্থলী" কাগজে তাঁহার "East to West প্রবন্ধ-প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-মহাশয় আপনার অভিজ্ঞতা হইতে তাহার কিছু আভাস দিয়াছেন। কয়েকবৎসর পূর্ব্বে তিনি যখন মার্কিণ যুক্তরাজ্যে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন কয়েকজন গোয়েন্দা আসিয়া তাঁহাকে জানাইল যে স্যান্-ফ্রান্সিস্কোর ভারতীয় বিপ্লববাদীরা ঠিক করিয়াছেন যে তাঁহাকে হত্যা করিবে, কেননা, রাজনৈতিক বিষয়ে বিপ্লববাদীদের সহিত তাঁহার মতের ঐক্য নাই। কথাটা রবীন্দ্রনাথ একেবারেই বিশ্বাস করেন নাই। কিন্তু তবুও সংবাদ পত্র হইতে সংবাদপত্রে কথাটা কতকদিন ঘুরিয়া বেড়াইল; তাহার পর, একদিন যখন রবীন্দ্রনাথ খবরের কাগজে এই মিথ্যা কথাটির প্রতিবাদ-পত্র পাঠাইলেন, কাগজওয়ালারা তখন সেই চিঠি ছাপাইলেন না। সে-সময় আমেরিকায়, আমেরিকা-প্রবাসী ভারতীয়দের বিরুদ্ধে মার্কিণদের মনে ঘৃণার ভাব উদ্রেক করিবার জন্য প্রবল আন্দোলন চলিতেছিল এবং এসিয়াবাসীরা যাহাতে আমেরিকায় সহজে প্রবেশ না করিতে পারে সেইরূপ নিষেধব্যবস্থার নাগপাশ রচিত হইতেছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদটি ছাপিলে পাছে হিন্দুদের কলঙ্কমোচন হয়, সেই ভয়েই এবং রাজনৈতিক প্রয়োজনেই তাঁহার প্রতিবাদ কাগজওয়ালারা প্রকাশিত করেন নাই। তাঁহাদের আর একটা আশঙ্কাও যে ছিল না এমন নয়—প্রতিবাদটি প্রকাশিত করিলে পাছে এমন 'চমৎকার' খবরটি নষ্ট হইয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার উল্লিখিত প্রবন্ধে এই ঘটনাপ্রসঙ্গে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সারমর্ম এই যে, মার্কিণদের অন্তর্নিহিত

তাহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য। নেশাখোরের যেমন উত্তেজক নেশা না হইলে চলে না, তেমনি ব্যবসায়ীশ মার্কিনদের উত্তেজক খবর না হইলে মনের ক্ষুধা মিটে না। কোন উত্তেজক নেশা যেমন সুস্থ মানুষের নিদ্রার স্বাদ ও পুষ্টিকর খাদ্যের প্রতি আগ্রহ নষ্ট করিয়া দেয়, তেমনি সর্বদা উত্তেজনাপূর্ণ সংবাদ পড়িয়া পড়িয়া মানুষ মনের সুপ্রবৃত্তি ও স্বাস্থ্য হারাইয়া ফেলে। মার্কিনদেরও তাহাই ঘটিয়াছে। তাহাদের এই অস্বাভাবিক ক্ষুধা মিটাইবার জন্য নানা জেয়াল জিনিসের সৃষ্টি হইয়া থাকে। তাহাদের মনের এই দুষ্ট ক্ষুধা দূর করিবার জন্য অগণিত সাংবাদিক জগতময় ঘুরিয়া বেড়ায় এবং সত্যমিথ্যায় খিচুড়ী পাকাইয়া আজগুবী খবরের সৃষ্টি করে। এই সমস্ত অবিবেকী, হীন সাংবাদিকের হাত হইতে বর্তমান যুগে রক্ষা পাওয়া সুকঠিন। রবীন্দ্রনাথ বলেন, এই যুগটা যেন একটি অকালপক্ক বালক, একটা 'মেগাফোন্' বা বাক্‌সম্প্রসারণ যন্ত্র লইয়া খেলা করিতেছে, ছুঁ শব্দটিকে টাঁ-শব্দে, কাণাঘুষাকে হাটের হট্টগোলে পরিণত করিয়া জগতময় ছড়াইয়া দিতেছে।

আমেরিকা হইতে স্বদেশে ফিরিয়া আসার কিছুকাল পরে মার্কিনী সংবাদপত্রে রবীন্দ্রনাথ দেখিতে পাইলেন যে স্যান্ ফ্রান্সিস্কোর উক্ত ভারতীয় বিপ্লববাদীর দলের বিরুদ্ধে, ভারতে ব্রিটিশ-শাসন ধ্বংস করিবার উদ্দেশে গুপ্ত প্রচেষ্টার অভিযোগে, আদালতে এক মামলা রুজু করা হইয়াছে। সেই মামলায় রবীন্দ্রনাথের নামটিকেও টানিয়া আনা হইয়াছে; তিনি নাকি আমেরিকায় জার্মানীর উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ও ভারতে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র চালাইবার অভিপ্রায়ে জার্মানীদের নিকট হইতে অর্থগ্রহণ করিয়াছেন! এই জঘন্য অপবাদ রটিত হইবার পরে, আমেরিকার নানাস্থান হইতে তাঁহার নিকট তিরস্কার-পূর্ণ নানারকম চিঠিপত্র আসিতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথ অবশেষে নিরুপায় হইয়া রাষ্ট্রপতি উইল্‌সনের নিকট সমস্ত কথা জানাইয়া একটি টেলিগ্রাম প্রেরণ করিলেন। রাষ্ট্রপতি উইল্‌সন্ কিন্তু সেই তারের প্রাপ্তিস্বীকার পর্যন্তও করিলেন না! এই ঘটনাটির সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন যে এই সময়ে মার্কিনদের মনে সম্ভবতঃ একথা জাগিয়া উঠিল যে ইংরেজ তাহাদের জ্ঞাতি-ভাই। তাহারা ভুলিয়া গেল যে তাহারাই সর্বপ্রথমে ইংরেজ জাতির সহিত রাজনীতিক সম্বন্ধ ছেদন করিয়া লইয়াছিল।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ জাপানে যান। প্রথমে জাপানীরা তাঁহাকে খুব উৎসাহসহকারে সম্বর্ধনা করিল। কিন্তু টোকিও সহরে 'ভারতবর্ষের বাণী' বা 'মেসেজ অব ইণ্ডিয়া' সম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতা দেওয়ার পর দেখা গেল যে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করার উৎসাহাদি একেবারে নিভিয়া গিয়াছে। অতঃপর তিনি আমেরিকায় গিয়া সেই বিষয়েই বক্তৃতা দিলেন। তিনি বক্তৃতায় বলিলেন, পাশ্চাত্যের ক্ষমতাশালী জাতিপুঞ্জ জগতের অধিকাংশ জাতিকে শোষণে রক্তহীন ও অপমানে লাঞ্ছিত করিয়া তুলিয়াছে, অথচ সেই উৎপীড়িত জাতিসমূহ মাথা তুলিতে চেষ্টা করিতেছে এমন সন্দেহ-মাত্রে তাহাদের প্রতি সেই সব জাতিপুঞ্জই রোষকষায়িত-নেত্রে চাহিতেছে। এই সব জাতিপুঞ্জ জাতিতে জাতিতে যে ঘৃণা ও হিংসার অনল প্রধূমিত করিতেছে, তাহা কি করিয়া চিরতরে নিভাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, ইহাই হইল বর্তমান যুগের সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যা। জাপান এই বক্তৃতার ভাব সহ্য করিতে পারিল না। আমেরিকা ধৈর্যসহকারে তাহা শুনিল বটে; কিন্তু তাহাদের এই ধৈর্যগুণের অর্থ ইহা নয় যে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার সর্বকথাটি তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিল। কবির স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, মার্কিণেরা বাহিরে তাঁহাকে যতই সম্মান দেখাক না কেন, অন্তরে অন্তরে তাহারা বেশ বুঝে যে তাহাদের মত কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন কৃতকর্মা জাতি দুনিয়ায় আর নাই; সুতরাং, সেই গর্বে স্ফীত হইয়া তাহারা ব্যবহারিক বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মতো প্রাচ্যের একটা আদর্শবাদী কল্পনাচারী জীবের অতিশয়োক্তিকে অনায়াসে ক্ষমা করিয়া যাইতে পারে। কিন্তু, আর একটি বড় মজার ব্যাপার, রবীন্দ্রনাথ দেখিতে পাইলেন। সেটি এই:—মার্কিণেরা তাঁহার বিশ্বমৈত্রীর বাণী শুনিয়া তাঁহার সম্বন্ধে যে-ভাবই পোষণ করুক না কেন, তিনি যে অলৌকিক শক্তিধারী তাহাদের মধ্যে অনেকেই তাহা বিশ্বাস করিয়া বসিয়া আছে। একদিন বক্তৃতা দেওয়ার পর, এক মার্কিন শ্রোতা তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহাকে বলিল, "মহাশয়, অমুকের কতকগুলি গোপনীয় বিষয় আমার জানা আবশ্যক, আপনি তাহা আমাকে বলিয়া দিবেন কি?" বলা বাহুল্য যে রবীন্দ্রনাথ উক্ত "অমুক"কে কস্মিনকালেও দেখেন নাই। ইহা জানিয়া-শুনিয়াও লোকটি এমন প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথকে কেন করিল? আসল কথা এই যে, তাঁহার বাক্তিবিষয়ের মর্মার্থ লোকটি যে কিছুই গ্রহণ করিতে পারে নাই সেই লজ্জা, তাঁহার অলৌকিক শক্তিতে যে লোকটির পূর্ণ শ্রদ্ধা আছে তাহা দ্বারা সে ঢাকিয়া রাখিতে প্রয়াস পাইল।

উক্ত ঘটনার কিছুকাল পরেই ইউরোপের মহাযুদ্ধ থামিয়া গেল। তখন রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট অনুভব করিলেন যে ভবিষ্যতে ও যে আবার এইরূপ মহাসমর বাধিতে পারে; সুতরাং এমন একটা কিছু করা যাইতে পারে না কি যাহা দ্বারা বর্তমান যুগের আন্তর্জাতিক অবিশ্বাস ও বিদ্বেষ দূর হইয়া বিশ্বমৈত্রী স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করিয়া লওয়া যায়? কে এই সুবৃহৎ কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে? রাজনীতিক

পণ্ডিতগণ তাঁহাদের অন্ধ স্বজাতিবাৎসল্য ও স্বজাতিপূজার ভাব দ্বারা বিশ্বসমস্যা সমাধান করিবার ব্যর্থ প্রয়াস করুন, তাহাতে অন্ত দশ জনের কর্ত্তব্যবোধে বাধা জন্মাইবে না। কিন্তু দেশ ও জাতিনির্ব্বিশেষে, মানবের প্রতি মানবের শ্রদ্ধাসমন্বিত ব্যবহারকে ভিত্তি করিয়া অন্ত কাহারও কি কিছু ভাবিবার বা করিবার নাই? এই চিন্তা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া রবীন্দ্রনাথ বোলপুরে "বিশ্বভারতী-"র সৃষ্টি করিলেন এবং ভাবিলেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে যে আপাতঃদুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধানটি রহিয়াছে, সেই ব্যবধানটি বোলপুরের এই নূতন প্রতিষ্ঠানটি দ্বারা দূরীভূত হইবে, জাতিনির্ব্বিশেষে মানুষ মানুষকে শ্রদ্ধা করিতে, ভালবাসিতে শিখিবে, "বিশ্বভারতী" এই বিশ্বাসের অপূর্ব্ব মূর্ত্তিরূপে গড়িয়া উঠিবে। তারপর, ১৯২১ সালে, এই বিশ্বাস লইয়া আবার তিনি আমেরিকায় গেলেন, যে যুক্তরাজ্যের অধিবাসীরা তাঁহার এ-কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিতে তাঁহার ডাকে সাড়া দিবে।

কিন্তু তাঁহার বিশ্বমৈত্রীর আহ্বানে মার্কিণরা সাড়া তো দিলেই না, পরন্তু নিতান্ত অভদ্রভাবে তাঁহার সম্বন্ধে একথা রটনা করিয়া দেওয়া হইল যে তিনি একজন রাজনীতিক চালবাজ, রাজনীতিক প্রয়োজনে সহজে বিশ্বাসপ্রবণ মার্কিণদের ঠকাইয়া অর্থসংগ্রহ করিতেছেন। তারপর, তাঁহার বন্ধুদের নিকট তিনি জানিতে পারিলেন যে, জালিয়ানওয়ালা হত্যাকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ করার জন্ত একদল লোক উঠিয়া-পড়িয়া তাঁহার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করিয়া বেড়াইতেছে। রবীন্দ্রনাথ না বলিলেও ইহার ভিতর কাহাদের কারসাজি ছিল পাঠক তাহা বুঝিয়া লইবেন।

পূর্ব্বোক্ত "অ্যাটল্যান্টিক্ মন্থ্‌লী" পত্রিকায় এই সকল ঘটনার উল্লেখ করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিতে চান যে মার্কিণেরা সাধারণতঃ কোন কিছু তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করে না; সংবাদপত্রওয়ালারা তাহাদের মনের মধ্যে যাহা ঢুকাইয়া দেয় তাহাই বেদবাক্যস্বরূপে গ্রহণ করিয়া বসে। হুজুগপ্রিয় মার্কিণদের মনোবৃত্তিই এমন হইয়া পড়িয়াছে যে, যে কোন সুচতুর মনস্তত্ত্ববিদ্ ইহাদিগকে যেভাবে খুসি সেইভাবে নাচাইয়া চালাইতে পারে।

—"মু"

"ভারতবর্ষের পরাধীনতার স্বরূপ"

ভারতবর্ষ কেন অতি দীর্ঘকাল ধরিয়া পরাধীন রহিল, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া ভারতের সমগ্র ইতিহাসের ধারাটি পর্য্যালোচনা করিয়া শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন "প্রবাসী"র জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় যে তত্ত্বে উপনীত হইয়াছেন তাহার সারমর্ম এখানে দেওয়া হইল।

মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্বেও বৈদেশিক অস্ত্রশক্তির নিকট ভারতের রাজশক্তি বহুবার পরাভূত হইয়াছিল। ভারতের পরাধীনতা মুসলমানদের আগমন হইতেই আরম্ভ নয়। সুতরাং প্রবোধবাবু ভারতের পরাধীনতার ইতিহাসকে প্রাক্-মোসলেম যুগ ও প্রত্যক্-মোস্‌লেম যুগ এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এই দুই যুগের পরাধীনতার স্বরূপ সম্পূর্ণ বিপরীত এবং তাহা কি, একটু পরে দেখান হইতেছে।

কিন্তু কি প্রাক্-মোস্‌লেম যুগে, কি প্রত্যক্-মোস্‌লেম যুগে, ভারতীয় রাজশক্তি বৈদেশিক অস্ত্রশক্তির নিকট কেন বার বার পরাভূত হইল তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া প্রবোধবাবু বলেন যে ভারতের রাজশক্তির "বহির্বিমুখতা" বা "গৃহপরায়ণতা"ই ছিল তাহার মূল কারণ। অর্থাৎ ভারতের ক্ষাত্রশক্তির অতুল শৌর্য্যবীর্য্য, বিজয়গৌরবলাভের লিপ্সা, "রাজচক্রবর্ত্তী" বা "সার্ব্বভৌম" বা "একরাট্" হইবার তীব্র বাসনা এবং দিগ্বিজয়ী হওয়ার অনন্তসাধারণ যশোলিপ্সা প্রাচীন ভারতের ক্ষাত্রশক্তির চরম আদর্শ থাকা সত্ত্বেও, ভারতের রাজশক্তির বৈদেশিকের হাতে পরাভূত হওয়ার কারণ, এই রাজশক্তি কখনও বিদেশজয়ের উদ্যম করে নাই, "তাহার বীরত্ব ভারতবর্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ", "ইহা কখনই বিশ্বজগতকে চমকিত করিয়া দেয় নাই।" ভারতের ক্ষত্রিয় রাজারা পরস্পরের সহিত যুদ্ধবিগ্রহ ও জয়পরাজয় লইয়াই শত শত বৎসর কাটাইয়া দিলেন; অথচ একজন ক্ষত্রিয় বীরও আপনার বিজয়-বাহিনী লইয়া বহির্ভারতে বিশ্ববিজয়ে বাহির হওয়া দূরে থাকুক, ভারতের সীমা রেখাটি পর্য্যন্ত অতিক্রম করিলেন না" "ভারতবর্ষের বাহিরেও যে দেশ আছে, সেখানেও যে দিগ্বিজয়, রাজ্যবিস্তার, সমরগৌরব লাভ করা যাইতে পারে, একথাই কখনও এদেশের নরপতিগণের মনে উদিত হয় নাই; এই আকাঙ্ক্ষাই কখনও তাহাদের প্রাণে জাগে নাই।" কেন এই আকাঙ্ক্ষা তাহাদের প্রাণে জাগে নাই, এই প্রশ্নের উত্তরে লেখক পাঁচটি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (১) ভারতবর্ষের বিশালতা। "স্বদেশেই যখন বিজয়গৌরবলিপ্সা চরিতার্থ করিবার যথেষ্ট অবকাশ থাকে, তখন স্বভাবতঃই বিদেশবিজয়ে প্রেরণা থাকে না।" (২) ভারতবর্ষের অতুল ঐশ্বর্য্য। "দেশের সম্পদরাশিই বৈদেশিক রত্নগর্ভা ভারতভূমির রাজকীয় বিজয়লিপ্সা যে কখনও বিদেশের প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই।" (৩) ভারতবর্ষের সীমারক্ষক দুর্গম পর্ব্বতশ্রেণী। এই আসমুদ্র সুবিস্তীর্ণ অভ্রভেদী দুর্লঙ্ঘ্য গিরিশ্রেণী যেমন ভারতের দ্বাররক্ষকের কার্য্য করিয়াছে, তেমনি "বিজয়কামী ক্ষাত্রশক্তিকে বহির্দেশ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া ভারতবর্ষের মধ্যেই সংহত করিয়া রাখিয়াছে।"

(৪) "ভারতের রাষ্ট্রীয় ভারকেন্দ্র অতি প্রাচীন কাল হইতেই দেশের পূর্ব্বভাগে নিবদ্ধ ছিল।" অর্থাৎ পাটলিপুত্র বা কান্তকুব্জ হইতে ভারতের বহির্ভাগে সাম্রাজ্য বিস্তার করা আয়াসসাধ্য ছিল না। সর্ব্বোপরি (৫) "যে দুর্দ্ধর্ষতা ও অমিত পরাক্রম মানুষকে সাগর-গিরি লঙ্ঘন করাইয়া লইয়া যায় এবং মরুভূমি অতিক্রম করিতেও অনুপ্রাণিত করিয়া তোলে, সেই দুর্দ্ধর্ষতা ও সেই পরাক্রম সুখসম্পদের লীলানিকেতন ভারতবর্ষের মাটিতে কখনও উদ্ভূত হয় নাই। ......সাম্রাজ্য গড়িবার প্রতিভা ও আলেক্‌জাণ্ডার, হানিবল, নেপোলিয়নের মত অসাধারণ বীরত্ব ও পরাক্রম ভারতবর্ষের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল না।"

কারণ যাহাই হউক্, ভারতবর্ষের ক্ষাত্রশক্তি কখনও বহির্ভারতে দিগ্বিজয়ে অভিযান করে নাই। ফলে, তাহার মধ্যে এক প্রকার নিশ্চেষ্টতা দেখা দিয়াছিল। এই নিশ্চেষ্টতার মধ্যে বৈদেশিক অস্ত্র-শক্তির "বন্যাস্রোতের মুখে খাইবার, বোলান প্রভৃতি গিরিসঙ্কট বহুবার ভারতবর্ষের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দিয়াছিল এবং শক-যবন-পহ্লব, হুন-গুর্জ্জর ও তুর্কী-মোগলের আবিল স্রোতে ভারতের শ্যামল ক্ষেত্র প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল।"

একণে, প্রাক্-মোস্‌লেম যুগের পরাধীনতা ও প্রত্যক্-মোস্‌লেম যুগের পরাধীনতার স্বরূপ কি তাহা দেখিতে হইবে। প্রবোধবাবু বলেন, প্রাক্-মোস্‌লেম যুগের পরাধীনতায় ভারতবর্ষ তাহার আত্মার শক্তিকে হারায় নাই; সে কখনও দুঃখকে একান্ত করিয়া স্বীকার করে নাই; ভারতবর্ষ চিরকালই আত্মাকে দুঃখের উপর জয়ী বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। সে পরাজয়ের মধ্যে তাহার কল্যাণধর্ম্মকে ত্যাগ করে নাই: "নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি" এই মহাবাণী তাহার জীবনে তখন সার্থকতা লাভ করিয়াছিল। ভারত-বর্ষে "সে কল্যাণসাধনাদ্বারা রাষ্ট্রীয় পরাজয়কেও অকল্যাণের গ্লানি হইতে মুক্ত রাখিতে পারিয়াছিল"। শুধু তাহাই নয়, "অস্ত্রনিপুণ দুর্দ্ধর্ষ শত্রুকেও ভারতবর্ষ কল্যাণধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া একান্ত আপনার করিয়া লইতে পারিয়াছিল। যবন ধর্ম্মদেব, শক ঋষভদত্ত, কুষণ বাসুদেব ভারতবর্ষের কল্যাণধর্ম্মকে স্বীকার করিয়া লইয়া ভারতবর্ষেরই সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিল।" "এইরূপেই ভারতবর্ষ ধর্ম্মবিজয়ের দ্বারা অস্ত্রবিজয়ের গৌরবকে ম্লান করিয়া দিয়া বিজেতাকেও জয় করিয়া লইয়াছিল।" আবার, ঐ যুগেই রাজসম্রাট্ প্রিয়দর্শী অশোক জয়স্কন্ধাবার পরিত্যাগ করিয়া ভগবান্ শাক্যমুনির ধর্ম্মসঙ্ঘে আশ্রয় লইয়া বজ্রকণ্ঠে দিকে দিকে ঘোষণা করিলেন, "অস্ত্রের দ্বারা যে বিজয়লাভ তাহা অতি তুচ্ছ, ধর্ম্মের দ্বারা যে বিজয় সেই বিজয়ই শ্রেষ্ঠ বিজয়।......"সেইদিন হইতে ভারতের দূতগণ ছুটিয়া চলিল দেশে বিদেশে, সমরঘোষণা লইয়া নহে, ধর্ম্মের বাণী, শান্তির বাণী লইয়া।"

এই ছিল প্রাক্-মোস্‌লেম যুগের পরাধীনতার স্বরূপ। তখন ভারত আত্মার শক্তিতে বলীয়ান ছিল; তাই বৈদেশিক অস্ত্রশক্তি কোন সময়ে তাহার রাষ্ট্রশক্তি কাড়িয়া লইলেও কখনও তাহার আত্মাকে পরাভূত করিতে পারে নাই। আত্মবলে বলীয়ান্ ভারতবর্ষ তখন পরাজয়কে জয়ে পরিণত করিতে পারিয়াছিল।

কিন্তু প্রত্যক্-মোসলেম যুগে ভারত তাহার আত্মাকে হারাইল কল্যাণসাধনা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িল। "যে আত্মার শক্তিতে ভারতবর্ষ একদিন দুঃখ দুর্ভাগ্যকেও কল্যাণপ্রদ করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিল ভারতবর্ষ সেই শক্তিকে হারাইয়া বসিল।"..."তাই মহম্মদ বিন্ কাশিম্, সুলতান মামুদ, মহম্মদ ঘোরী, মহম্মদ খিলিজী প্রভৃতির ভারতবিজয়কাহিনী আমাদের জন্য এত লজ্জা, এত অপমান ও এত লাঞ্ছনা সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে।"

বর্ত্তমান পরাধীনতা সম্বন্ধে লেখক আরও বলেন, "ভারতবর্ষ যে বৈদেশিকের পশুশক্তি বা অস্ত্রশক্তির নিকট পরাভূত হইয়াছে ইহাই দুঃখের বিষয় নহে। ভারতবর্ষ যে অস্ত্রশক্তির উপরও আত্মার শক্তিকে জয়ী রাখিবার অপূর্ব্ব ক্ষমতা হারাইয়া ফেলিয়াছে তাহাই দুঃখের বিষয়। বাহির হইতে যে অধীনতা আমাদের উপর চাপিয়া বসিয়াছে তাহাই আমাদের অন্তরকে ব্যথিত করিতেছে না। আমাদের বেদনার মূল কারণ, আমরা আর আমাদের চিত্তের স্বাধীনতা দ্বারা বাহিরের গ্লানিকে মুছিয়া ফেলিতে পারিতেছি না, বাহিরের অধীনতাকে চিত্তের প্রবল অস্বীকারের দ্বারা বিলুপ্ত করিয়া দিতে পারিতেছি না। আজ আমরা আমাদের মহামুক্তির বাণীকেই বিস্মৃত হইয়া গিয়াছি।"

—"ম"

বাঙ্গালীর পরিচ্ছদ

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ের 'সবুজপত্রে' প্রসিদ্ধ কলাশাস্ত্র-বিশারদ শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সেনের 'পরিচ্ছদ-কলা' সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ বেরিয়েচে, তার মধ্যে বর্ত্তমান বাঙ্গালীর পরিচ্ছদ সম্বন্ধে তাঁর মতামত প্রণিধান-যোগ্য বলে প্রতীয়মান হবে। তিনি লিখ্‌চেন্ :—

"শোনা গেছে যখন য়ুরোপের পরিচ্ছদ Polynesia-য় গেল, তখন আদিম আধিবাসীরা অকুতোভয়ে কোটকে প্যান্টের জায়গায়, এবং প্যান্টকে কোটের জায়গায় ব্যবহার করত। এই সাহস সুসভ্য বাঙালীরও আছে দেখ্‌তে পাওয়া যায়; বল্‌তে কি, আমাদের পরিচ্ছদকলায় এত অসামঞ্জস্য ও বৈপরীত্য রয়েছে যে, নিপুণ দ্রষ্টার তা'তে তাক্ লেগে যাবার কথা। বাংলা দেশের ভাবুকগণ, বিলাতের যেটা underwear, সেটাকে স্বচ্ছন্দে বাইরে ব্যবহার

করতে লজ্জিত হয় না। সার্ট পরে ভদ্রলোকেরা সর্ব্বদাই চলাফেরা করে, কিন্তু তা'তে যে কৌতুকের সৃষ্টি হতে পারে, তা কেউ ভাবে না। সার্টের ছাঁট তার উপরের একটা কোটের অপরিহার্য্যতা স্বীকার করে রচিত হয়েছে—হাতের কাফ্ বা গলার band-এ তা বোঝা যায়; ওরকম অসমাপ্ত অবস্থায় সার্ট ব্যবহার চলে না। অথচ সে সম্বন্ধে কারও হুঁস নেই—অম্লানবদন যুবকেরা পলিনেসীয় জাতির ন্যায় এই অসংলগ্নতায় ব্যথিত হচ্ছে না। সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে সামান্য সংস্কারও এই অসঙ্গতির দিকে মনকে আকৃষ্ট করবে। Dressing-gown পরে' ময়দানে বেড়ানো বা Sleeping-suit-এর উপরকার অংশ পরে' নির্ভয়ে চলাফেরার দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

"এই ত গেল একটা দিক্; আবার অনেকে ওদের সার্ট ইত্যাদির ল্যাঠা চুকিয়ে কোটটি নিয়ে ধুতির উপর পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই শ্রেণীর লোকও প্রচুর। অথচ ধুতির সঙ্গে কোটের একটুও সামঞ্জস্য হ'তে পারে না—ধুতির flowing line-এর পুষ্পিত প্রাচুর্য্যের সঙ্গে কোটের কঠিন লাইনের আড়ষ্ট রেখা খাপ খায় না। কোটের লাইনের সঙ্গে প্যাণ্টের লাইন মেলে। ধুতি এবং কোটের সঙ্গম অদ্ভুত—তা'তে মানুষের ওপরকার hemisphereকে hydraulic press-এ চাপা এবং নীচের দিকটা বেলুনের মত ফাঁপানো মনে হয়। মানুষের সুগঠিত শরীরকে এমন দুর্দ্দশাগ্রস্ত করে' কি লাভ, বোঝা যায় না। কাঠের পুতুলকেও কাপড়চোপড় দিয়ে সুন্দর করা যায়, আর মানুষকে এমনি সঙ্ করে তোলার প্রবৃত্তি কি করে' হয়? আসল কথা আমাদের ভিতরেই বিরোধ এসেছে, আমাদের ভিতরে কোন সামঞ্জস্য নেই; তাই বাইরেও এই সব বৈপরীত্য এসে পড়েছে। যাঁরা সংস্কার কর্ছেন তাঁরাও কেউ মাদ্রাজী চটি নিচ্ছেন, যদিও তা মাদ্রাজীদের লাল পাগ্ড়ী ও চওড়া লাল পাড়ের চাদর ও ধুতির সঙ্গে মানায়; আমাদের সাদা ধুতিচাদরের সঙ্গে তার যোগ হয় না। তেমনি এদেশের ছড়ি, ওদেশের টুপি, কারও পায়জামা, কারও উষ্ণীষ দিয়ে পঞ্চগব্য তৈরী হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে। সকল দেশের বসন ভূষণের সঙ্গে তার চারিদিকের সাজসজ্জার একটা সহজ সঙ্গতি থাকে, এমন্য সব জায়গায়ই একটা সুসঙ্গত শোভনতা ফুটে ওঠে। আমরা সভায় গেলুম ধুতিচাদর পরে', বসতে হ'ল চেয়ারে—এটা হচ্ছে বাইরের আম্দানি; চেয়ারের লাইনের সঙ্গে ধুতিচাদরের লীলায়িত লাইনের সঙ্গে মিল হয় না,—এ একটা উৎকট বিরোধ। ধুতিচাদর নিয়ে ফরাসে বসা চমৎকার, তা' বর্ণে, ছন্দে ও গতিতে সুসমাপ্ত হয়; কিন্তু চেয়ারে বস্লেই মনে হয় দুটি বিপরীত ব্যঞ্জনার সংগ্রাম হচ্ছে। এ সব এতই সহজ ও স্পষ্ট যে, আমাদের উৎকট আত্মপ্রীতি কেন যে ব্যথিত হয় না, তা' বুঝিনে।

"শীতকালে আমাদের সজ্জার অবস্থা আরও কৌতুকজনক হয়। ইডেন গার্ডেনে মাঝে মাঝে দেখা যায়, সমস্ত শরীরকে যতরকম উপায়ে হতে পারে প্যাক্ করে', অনেকে হাওয়া খেতে আসে। বিলেত হ'তে সদ্যপ্রত্যাগত এক সাহেব আমার একজন বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—এরকম সজ্জার মানে কি? Russia-তে যে-রকম শীত, এখানে ত সে-রকম নেই! পরিচ্ছদসম্পর্কে এরকম দৃষ্টান্ত এদেশে খুব সুলভ।

"হয়ত আমরা ভাবিনে,—ভাবনার সব ল্যাঠা পরের ঘাড়ে চাপিয়ে বসে আছি। নিপুণ দ্রষ্টার চোখে এসব যে পড়েনা, তা' নয়। সুতরাং গাছের নীচে যে মজুর শুয়ে' আছে—তার চেহারায় Rothenstein আনন্দ পেয়েছে; কাশীর স্নানের ঘাটে জন সমারোহের সহজ গতিতে আশ্বস্ত হ'য়েছে; Albert Hall-এর চৌকির উপর সে ভারতবাসীকে খোঁজেনি।

"সকল দিকেই এই রকম একটা tragedy-র ভিতর আমরা চলাফেরা করি। Renaissance কি আমাদের জন্য আকাশ হ'তে ঝরে' পড়্বে? দু'চারখানি ছবির ফ্রেমের ভিতর কি Renaissance খোঁজ হবে, না জাতির বহুমুখী জীবনের প্রতি পল্লবে তা'কে পেতে হবে—realise করতে হবে?"

—"কা"

নানা কথা

সম্প্রতি যশস্বী নাট্যকার পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের মৃত্যু ঘটিয়াছে। তাঁহার রচিত নাটকগুলি বাংলা রঙ্গমঞ্চে বিশেষ সমাদরে অভিনীত হইত। স্বদেশী আন্দোলনের প্রারম্ভে তাঁহার "প্রতাপাদিত্য" দেশাত্মবোধ জাগাইবার কাজে সহায়তা করিয়াছিল। এই নাটকখানি ও "পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত" কর্তৃপক্ষের বিরাগ উৎপাদন করাতে তাহাদের অভিনয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। দীর্ঘকাল পর, বিশেষ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জনের পর, "প্রতাপাদিত্য"-অভিনয়ের অনুমতি পাওয়া যায়, কিন্তু "পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত" রচনার প্রায়শ্চিত্ত বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাঁহার জীবিতকালের মধ্যে করিতে পারেন নাই। ক্ষীরোদ বাবুর শেষ রচনা "নর-নারায়ণ" অল্পদিন পূর্ব্বে

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী কর্তৃক নাট্যমন্দিরে অভিনীত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার কয়েকখানি উপন্যাসও আছে। ঐকান্তিক ও একাগ্র নিষ্ঠার সহিত বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বাংলা সাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন ; সেই সেবাই তাঁহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

* * *

গত ২৮শে আষাঢ় পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় জাভা যাত্রা করিয়াছেন। তিনি প্রথমে মালয়-উপদ্বীপে যাইবেন। সেখানে তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য বিশেষ আয়োজন হইতেছে। পরে তিনি যবদ্বীপ ও বলিতে প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতার কীর্ত্তি-নিদর্শনগুলি দেখিবার জন্য তথায় অনুসন্ধান ও আবিষ্কারের কার্য্যে নিযুক্ত ফরাসী ও ডাচ্ প্রাচ্যবিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট হইতে যে নিমন্ত্রণ পাইয়াছেন তাহা রক্ষা করিবেন। এই অনুসন্ধানের কার্য্য দেখিবার ও তাহার তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য কবিবর, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী কলাভবনের সহযোগী অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর ও চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র দেব-বর্ম্মা এই তিনজনকে তাঁহার সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন। তাহা ছাড়া ইতিপূর্ব্বেই বিশ্বভারতীর সহিত সংশ্লিষ্ট ডক্টর বাকে নামে জনৈক ডাচ্ প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ জাভা যাত্রা করিয়াছেন। জাভা হইতে ফিরিবার পথে সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথ শ্যাম ও কম্বোজেও যাইবেন। "বিচিত্রায়" প্রকাশিত শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী লিখিত "ইন্দোচীন ভ্রমণ" যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার বিরাট চিহ্ন শ্যাম ও কম্বোজের বুকে কত আঁকা রহিয়াছে। বলিদ্বীপে এখনও বহু হিন্দুর বাস ; তাহাদের ক্রিয়াকর্ম্ম, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা আজও ভারতের সভ্যতার আদর্শ প্রচার করিতেছে। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতের যে অমৃত-মন্ত্র আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের কণ্ঠে শ্যামে, কম্বোজে, যবদ্বীপে, বলিতে প্রচারিত হইয়াছিল, আজ আবার সেই অমৃত-মন্ত্র ভারতের কবি-শ্রেষ্ঠের কণ্ঠে সেই সব দেশে উচ্চারিত হইবে। ইহাই আমাদের গৌরব ও আনন্দ। আর আশা এই যে, একদিন ভারতবর্ষের সহিত এই দেশগুলির যে যোগ স্থাপিত হইয়াছিল, কবিবর ও তাঁহার সঙ্গীদের সাহায্যে সে যোগটি কিয়ৎপরিমাণেও পুনঃস্থাপিত হইবে।

* * *

কলিকাতার দুইটি রঙ্গমঞ্চে শীঘ্রই রবীন্দ্রনাথের দুইখানি নাটক অভিনীত হইবে এই সংবাদে নাট্যামোদী ও সাহিত্যরসিক মাত্রেই আনন্দিত ও আশান্বিত হইয়াছেন। নাটক দুইখানির নাম "পরিত্রাণ" ও "শেষ-রক্ষা"। প্রথমখানি বহুদিন পূর্ব্বে "বৌঠাকুরাণীর হাট" উপন্যাস অবলম্বনে রচিত "প্রায়শ্চিত্ত"-নামক নাটকের পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত রূপ ; দ্বিতীয়খানি "গোড়ায় গলদ" নামে কবির অপূর্ব্ব রঙ্গনাট্যের নব কলেবর। এই রূপান্তরিত নাটক দুইখানি কবির দ্বারা তাঁহার জোড়াসাঁকোস্থ বিচিত্রা-ভবনে পঠিত হইবার সময় শুনিবার সৌভাগ্য যাঁহাদের ঘটিয়াছিল, তাঁহারা জানেন, "পরিত্রাণ" ও "শেষরক্ষা" বাংলা নাটকের এই শোচনীয় দুর্ভিক্ষের দিনে নাট্যরসপিপাসুদিগের তৃষ্ণা মিটাইবে।

* * *

হাইদ্রাবাদের নিজামবাহাদুর রবীন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত "বিশ্বভারতী"তে ইসলামধর্ম্ম ও সভ্যতার ইতিহাস পঠন-পাঠনের ব্যবস্থার জন্য লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন, এ সংবাদ 'বিচিত্রা'র পাঠকগণ নিশ্চয়ই অবগত আছেন। এই সঙ্গে মিশর-পতি ফুয়াদ-কর্তৃক বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে আরবী ভাষায় রচিত সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম্মতত্ত্ব-বিষয়ক বহু মূল্যবান পুস্তক-সংগ্রহ দানের সংবাদও প্রকাশিত হইয়াছে। নিজাম বাহাদুর ও রাজা ফুয়াদ দুইজনেই তাঁহাদের স্বধর্ম্মনিষ্ঠা ও বিদ্যোৎসাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। ভারতবর্ষে বহু স্বাধীন ও সামন্ত হিন্দু রাজা আছেন। তাঁহাদের কাহারো পক্ষেই লক্ষ বা ততোধিক মুদ্রা "বিশ্বভারতী"তে হিন্দুধর্ম্ম বা সভ্যতার যে কোনো দিক চর্চ্চার জন্য দান করা বিন্দুমাত্র কঠিন নহে, অথচ আজ পর্য্যন্ত এক জামনগরের জাম-সাহেব্ ব্যতীত পঞ্চাশ হাজার টাকাও কেহ শান্তিনিকেতনস্থিত এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে দান করেন নাই। আশা করা যায় নিজাম ও রাজা ফুয়াদের এই দান তাঁহাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগ্রত করিবে।

Printed at the Modern Art Press, 1/2, Durga Pituri Lane, Calcutta,
by Srijut Probodh Lal Mukherjee, and published by him from 51 Pataldanga Street, Calcutta.



অন্ধ ভিখারী

শিল্পী—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীমতী উমা দেবীর সৌজন্যে

বিচিত্রা

প্রথম বর্ষ, ১ম খণ্ড	ভাদ্র, ১৩৩৪	তৃতীয় সংখ্যা

খেলা-ঘর

আপন মনে গোপন কোণে
লেখা-জোখার কারখানাতে
দুয়ার রুধে বচন কুঁদে
খেল্‌না আমায় হয় বানাতে।

এই জগতে সকাল সাঁজে
ছুটি আমার সকল কাজে
মিলে মিলে মিলিয়ে কথা
রঙে রঙে হয় মানাতে ॥

কে গো আছে ভুবনমাঝে
নিত্যশিশু আনন্দেতে ?
ডাকে আমায় বিশ্বখেলায়
খেলা-ঘরের জোগান্ দিতে।
বনের হাওয়ায় সকাল বেলা
ভাসায় সে তার গানের ভেলা,
সেই তো কাঁপায় সুরের কাঁপন
মৌমাছিদের নীল ডানাতে ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন
৬ই চৈত্র, ১৩৩৩ *

* শ্রীমতী বীণা বসুর 'অটোগ্রাফ্'-খাতায় লিখিত

ভানুসিংহের পত্রাবলী

পত্রের পাত্র

১। ভানুসিংহ

২। একটি দশমবর্ষীয়া বালিকা

১২

শান্তিনিকেতন

তুমি বোধ হয় এই প্রথম হিমালয়ে যাচ্চ। আমিও প্রায় তোমার বয়সে আমার পিতৃদেবের সঙ্গে হিমালয়ে গিয়েছিলুম। তা'র আগে ভূগোলে পড়েছিলুম পৃথিবীতে হিমালয়ের চেয়ে উঁচু জিনিষ আর কিছু নেই, তাই হিমালয় সম্বন্ধে মনে মনে কত কি যে কল্পনা ক'রেছিলুম তা'র ঠিক নেই। বাড়ী থেকে বেরবার সময় মনটা একেবারে তোলপাড় ক'রেছিল। অমৃতসর হ'য়ে ডাকের গাড়ি চ'ড়ে প্রথমে পাঠানকোটে গিয়ে প'ড়লুম। সেখানে পাহাড়ের বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ। তুমি কাঠগোদাম দিয়ে উপরে উঠেচ,—পাঠানকোট সেই রকম কাঠগোদামের মত। সেখানকার ছোট ছোট পাহাড়গুলো, "কর, খল" "জল পড়ে, পাতা নড়ে",—এর বেশি আর নয়। তা'র পরে ক্রমে ক্রমে যখন উপরে উঠ্‌তে লাগ্‌লুম, তখন কেবল এই কথাই মনে হ'তে লাগ্‌ল, হিমালয় যত বড়ই হোক্ না, আমার কল্পনা তা'র চেয়ে তা'কে অনেক দূর ছাড়িয়ে গিয়েছে; মানুষের প্রত্যাশার কাছে হিমালয় পাহাড়ই বা লাগে কোথায়? আসল কথা, পাহাড়টা থাকে-থাকে উপরে উঠেচে ব'লে, ভাঙি ক'রে চ'ড়তে চ'ড়তে, পর্ব্বতরাজের রাজমহিমা ক্রমে ক্রমে মনের মধ্যে সয়ে আসে। যে-জিনিষটা খুব বড় আমরা একেবারে তা'র সমস্তটা ত দেখ্‌তে পাইনে—পর্ব্বত ক্রমে ক্রমে দেখি, সমুদ্র ক্রমে ক্রমে দেখি—এমন কি, যে-মানুষ আমার চেয়ে বয়সে অনেক বেশি তা'র সেই বড় বয়সের সুদীর্ঘ বিস্তারটা এক সঙ্গে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। এই জন্যে তফাৎ জিনিষটা কল্পনায় যত বড়, প্রত্যক্ষে তত বড় নয়। অর্থাৎ বড় হ'লেও বড় দেখা যায় না। আমাদের যে-ঠাকুরকে আমরা প্রণাম ক'রি, তিনি যত বড় তা'র সমস্তটা যদি সম্পূর্ণ আমাদের সাম্‌নে আস্‌ত, তা' হ'লে সে আমরা সইতেই পারতুম না। কিন্তু হিমালয় পাহাড়ের মত আমরা তাঁ'র বুকের উপর দিয়ে ক্রমে ক্রমে উঠি। যতই উঠি না কেন, তিনি আমাদের একেবারে ছাড়িয়ে যান না,—বরাবর আমাদের সঙ্গী হ'য়ে তিনি আমাদের আপনি উঠিয়ে নিতে থাকেন; বুদ্ধিতে বুঝ্‌তে পারি তিনি আমাদের ছাড়িয়ে আছেন, কিন্তু ব্যবহারে বরাবর তাঁ'র সঙ্গে আমাদের সহজ আনাগোনা চল্‌তে থাকে। তাইত তাঁ'কে বন্ধু ব'ল্‌তে আমাদের কিছু ঠেকে না—তিনিও তাঁ'র উপরের থেকে হেসে আমাদের বন্ধু বলেন। এত উপরে চ'ড়ে যান না যে, তাঁ'র সঙ্গে কথা কওয়া দায় হ'য়ে ওঠে। তুমি যত জোরের সঙ্গে আমাকে সাতাশ বছরের ক'রে নিয়েছ, আমরা তাঁ'র চেয়ে ঢের বেশি জোরে তাঁ'কে সাতও ক'রতে পারি সাতাশও ক'রতে পারি—আবার সাতাশ কোটি ক'রলেও চলে; তিনি যে আমাদের জন্য সবই হ'তে পারেন, তা' নইলে তাঁ'কে

দিয়ে আমাদের চ'ল্‌তই না। তোমার পাহাড় কেমন লাগ্‌ল আমাকে লিখো। হিমালয়ে আলমোড়া-পাহাড়ের চেয়ে ভাল পাহাড় ঢের আছে, আলমোড়া ভারি নেড়া পাহাড়; ওর গাছপালা নেই আর ওখানে থেকে হিমালয়ের তুষার-দৃশ্য তেমন ভাল ক'রে দেখা যায় না। ইতি ২লা ভাদ্র, ১৩২৫।

১৩

শান্তিনিকেতন

আজ সকালে তোমার চিঠি পেলুম। তখন ত আমার সময় থাকে না, তাই এখন খাওয়ার পরে লিখ্‌তে বসেচি। আর খানিক পরে ম্যাট্রিক্‌-ক্লাশের ছেলেরা দল বেঁধে খাতাপত্র নিয়ে হাজির হবে। তুমি যে নিয়ম ক'রে দিয়ে গিয়েছিলে, আজকাল সে আর পালন করা হ'য়ে ওঠে না; খাওয়ার পরে দুপুর-বেলায় শোওয়া একেবারে ছেড়ে দিয়েচি—সেই ডেস্কের সাম্‌নে সেই চৌকি নিয়ে আমার দিন কাটে। সে জন্যে আমার নালিশ নেই, কাজের দরকার প'ড়লেই কাজ ক'রতে হবে। পৃথিবীতে ঢের লোক আমার চেয়ে ঢের বেশি কাজ করে—সেও আবার অফিসের কাজ—অর্থাৎ সে-কাজ পেটের দায়ে, মনের আনন্দে নয়। আমি যে ছেলেদের পড়াই সে ত দায়ে প'ড়ে নয়, সে নিজের ইচ্ছায়—অতএব এ-রকম কাজ ক'রতে পারা ত সৌভাগ্য। কিন্তু তবু এক একবার দরজার ফাঁকের ভিতর দিয়ে এই সবুজ পৃথিবীর একটা আভাস যখন দেখ্‌তে পাই তখন মনটা উতলা হ'য়ে ওঠে। আমি যে জন্মকুঁড়ে। যেমন বাঁশির ফাঁকের ভিতর দিয়ে সুর বেরোয়, তেমনি আমার কুঁড়েমির ভিতর থেকেই আমার যেটি আসল কাজ সেইটি জেগে ওঠে। আমার সেই আসল কাজই হ'চ্চে বাণীর কাজ। সময়টাকে কর্ত্তব্য দিয়ে ভরাট ক'রে একেবারে নিরেট ক'রে দিলে বাণী চাপা প'ড়ে যায়। সেই জন্যই আমাকে কেবল কাজ থেকে নয়, সংসারের নানা জটিল বন্ধন থেকে যথাসম্ভব মুক্ত থাকতে হয়। কাজই হোক্, আর মানুষই হোক্, আমাকে একেবারে চাপা দিলে বা বেঁধে ফেল্লে আমার জীবন ব্যর্থ হ'তে থাকে। আমার মন ওড়্‌বার জন্যে শূন্যকে চায়। তা'কে খাঁচায় বাঁধ্‌বার আয়োজন যতবার হ'য়েচে, সেই আয়োজনের শিকল ছিন্ন হ'য়ে প'ড়ে গেছে। হঠাৎ একদিন দেখ্‌তে পাবে আমার কাজকর্ম্মের দাঁড়খানা তা'র শিকল নিয়ে কোথায় প'ড়ে আছে, আর আমি অত্যুচ্চ অবকাশের আগ্‌ডালের উপর অসীম ফাঁকার মধ্যে একলা বসে গান জুড়ে দিয়েচি। তাই বল্‌চি—দরজা-জান্‌লার আড়াল থেকে ঐ নীলে সবুজে সোনালিতে মেশানো ফাঁকার একটা অংশ যেম্‌নি দেখ্‌তে পাই, অম্‌নি আমার মন এই ডেস্কের ধার থেকে ব'লে ওঠে—ঐখানেইত আমার জায়গা, ঐ ফাঁকাটাকে যে আমার আনন্দ দিয়ে, গান দিয়ে ভ'রে তুল্‌তে হবে। পুকুর আছে মাটির বাঁধ দিয়ে ঘেরা—সেইখানেই তা'র কাজ, কেউবা স্নান ক'রচে, কেউবা জল তুলচে, কেউবা বাসন মাজ্‌চে। কিন্তু আমি হ'চ্চি মেঘের মত; আমাকে ত তটের ঘের দিলে চ'ল্‌বে না, আমাকে বাঁধ্‌তে গেলে ত বাঁধা প'ড়ব না—আমাকে যে ঐ শূন্যের ভিতর দিয়ে বর্ষণ ক'রতে হবে। সব সময়েই যে বৃষ্টি ভ'রে আসে তা' নয়, অনেক সময়ে অলস-স্বপ্নের মত সূর্য্যের আলোতে রঙিয়ে উঠে কিছুই না ক'রে ঘুরে বেড়াই, কিন্তু এই কুঁড়েমিটুকু উপর থেকে আমার জন্যে বরাদ্দ হ'য়ে গেছে, এজন্যে আমি কারো কাছে দায়িক নই। সবই ত বুঝ্‌লুম, কিন্তু কুঁড়েমি ক'রি কখন বল ত? তুমি ত দেখেই গেছ কাজের আর অন্ত নেই। ঘোড়াকে বিধাতা বাতাসের মত দ্রুতগামী এবং মুক্ত ক'রে সৃষ্টি ক'রেছিলেন, কিন্তু সেই ঘোড়াকেই মানুষ জিনে-লাগামে আষ্টে-পৃষ্টে বেঁধে ফেলে। আমারও সেই দশা। বিধাতার ইচ্ছা ছিল আমি ভরপুর কুঁড়েমি ক'রে কাটাই, কিন্তু যে-গ্রহের হাতে প'ড়েছি সে আমাকে ক'ষে খাটিয়ে নিচ্চে। বয়স যখন অল্প ছিল, তখন খাটুনি এড়িয়ে, ইস্কুল পালিয়ে পদ্মার নির্জ্জন চরে বোটের মধ্যে লুকিয়ে বেশ চালাচ্ছিলুম—কিন্তু যখন থেকে তোমার পঞ্জিকা অনুসারে আমার 'সাতাশ' বছর বয়স হয়েচে, তখন থেকেই কাজের টানে আপনি ধরা দিয়ে কেটে বেরবার আর পথ পাইনে।

নইলে আগেকার মত হ'লে আমার পক্ষে আলমোড়ায় যেতে কতক্ষণ লাগ্‌ত বল? তবু তোমরা সেই পাহাড়ের উপরে মুক্ত হাওয়ায় স্বাস্থ্য এবং আনন্দ ভোগ ক'রচ একথা মনে ক'রে ভাল লাগ্‌চে; তোমার চিঠি সেখানকার লাল ফুলের পাপ্‌ড়িতে রাগ-রক্ত হ'য়ে আমার হাতে এসে পৌঁচচ্ছে। সেখানকার ফুলে যে রক্তিমা দেখ্‌তে পাচ্চি, তোমার গালে সেই রক্তিমা সংগ্রহ ক'রে আন্‌বে এই আশা ক'রে আছি। আজ আর সময় নেই—অতএব ইতি। ১১ই ভাদ্র, ১৩২৫।

১৪

শান্তিনিকেতন

আমাদের এখানে প্রায়ই খুব বৃষ্টি হ'চ্ছে। এক এক-দিন বিষম জোরে বাতাস দেয় আর বৃষ্টির ধারাগুলো বেঁকে একেবারে তীরের মত সিধে ঘরের মধ্যে চ'লে আসে। এখানে গরম নেই বল্লেই হয়—আর চারিদিকের মাঠ একেবারে ঘন সবুজ হ'য়ে উঠেচে। বোলপুরকে এত সবুজ আমি আর কখনোই দেখিনি। গাছগুলো নিবিড় পাতার ভারে থাকে-থাকে ফুলে উঠেচে—ঠিক যেন সবুজ মেঘের ঘটার মত। আমাদের বিদ্যালয়ের কুয়োগুলো প্রায় কানায় কানায় ভরা। এবারে চারিদিকে অনেক গাছ পুঁতে দিয়েচি। সেগুলো যখন বড় হ'য়ে উঠ্‌বে, তখন আমাদের আশ্রম আরও সুন্দর হ'য়ে উঠ্‌বে। কিন্তু এখানকার শুক্‌নো বেলেমাটিতে গাছপালা ভারি দেরিতে বেড়ে ওঠে—আমি আটাশ বছরে পড়বার আগে এসব গাছে ফুলধরা দেখ্‌তে পাব না। তুমি যদি নবেম্বরে আমাদের আশ্রমে আস, তা' হ'লে ততদিনে এখানে অনেক বদল দেখ্‌তে পাবে। এ বৎসরটা আমাদের আশ্রমের পক্ষে খুব তেজের বৎসর;—যেমন ঘন ঘন বৃষ্টিতে গাছ-পালা দেখ্‌তে দেখ্‌তে পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌চে, তেমনি এখান-কার কাজের দিকেও খুব একটা উৎসাহ প'ড়ে গেছে। পড়া-শুনো কাজকর্ম্ম যেন নতুন জোর পেয়েচে; সেই জন্যে ছেলেদের মধ্যেও খুব একটা আনন্দ জেগে উঠেচে। আমি যে আমেরিকায় যাবার টিকিট কিনেও গেলুম না, এখানে থেকে গেলুম, তা'র পুরস্কার পেয়েছি। আমাদের আশ্রমলক্ষ্মী বোধ হয় আমার অদৃষ্টের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে আমার বিদেশে যাওয়া কাটিয়ে দিয়েছেন। খুব ভালই হ'য়েচে। আমি "লক্ষ্মীর পরীক্ষা" ইংরেজীতে তর্জ্জমা করেছি তা' জান; এণ্ড্‌রুজ্‌ সেটা প'ড়ে খুব হেসেচেন, আর খুব লাফালাফি ক'রেচেন। ইতি ১৬ই ভাদ্র, ১৩২৫।

১৫

শান্তিনিকেতন

কাল রাত্রি থেকে আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন—মাঝে মাঝে প্রবল জোরে বর্ষণ নেমে আস্‌চে—অম্‌নি দেখ্‌তে দেখ্‌তে সমস্ত মাঠ জলে ছল্‌ ছল্‌ ক'রে উঠ্‌চে—থেকে থেকে অশান্ত বাতাস সোঁ সোঁ ক'রে হুহু ক'রে আমাদের শালবনের ডালাপালাগুলোর মধ্যে আছ্‌ড়ে আছ্‌ড়ে লুটিয়ে প'ড়্‌চে—ঠিক যেন আকাশের অনেক দিনের একটা চাপা বেদনা কিছুতেই আর চাপা থাক্‌চে না। ওদিকে দিগন্তের কোণে কোণে রাগী-রকমের ভ্রূকুটি দেখা দিয়েছে—আর তার মধ্য দিয়ে একটা ফ্যাকাশে আলো দারুণ হাসির মত। সবশুদ্ধ জলে-স্থলে একটা ক্ষ্যাপাটে রকমের ভাব। মনে হ'চ্চে যেন ছুটন্ত উচ্চৈশ্রবার উপরে চ'ড়ে ইন্দ্রদেব একটা ঘূর্ণাঝড়ের চক্র পৃথিবীর দিকে ছুঁড়ে মেরেচেন। বাতাসের আর্ত্তনাদ আর তা'র বেগ ক্রমেই বেড়ে উঠ্‌চে—একটা রীতিমত ঝড়ের আয়োজন ব'লেই বোধ হচ্চে। আমার এই দোতালার কোণটি ঝড়ের পক্ষে খুব যে ভাল আশ্রয় তা' নয়। আধুনিক কালের যুদ্ধ-ক্ষেত্রের trench-এর মত যথেষ্ট প্রকাশ্যও নয়, যথেষ্ট প্রচ্ছন্নও নয়—ভাল ক'রে ঝড়টা দেখ্‌তে পাচ্চিনে, অথচ ঝড়ের ঝাপট থেকে ভাল ক'রে রক্ষাও পাচ্চিনে। সিঁড়ির সাম্‌নের দরজাটা বন্ধ ক'রতে হ'য়েচে, ঘরের দরজাও সব বন্ধ—অন্ধকার, কোথা থেকে বেঁকেচুরে একটু বৃষ্টির ঝাপটও আস্‌চে। রুদ্রদেবের তাণ্ডবনৃত্যের এই ডমরুধ্বনির মধ্যে ব'সে তোমাকে চিঠি লিখ্‌চি।

সেদিন তুমি আমাকে লিখেছিলে, যে তুমি আমার অনেক নতুন নতুন নাম ঠিক ক'রে রেখেছ। ক্রমে একে একে বোধ হয় শুনতে পাব, কিন্তু আমার আসল নামটা যেন একেবারে চাপা না প'ড়ে যায়,—কেননা ঐ নামটা নিয়ে এতদিন একরকম কাজ চালিয়ে এসেচি। তা' ছাড়া ওর একটা মস্ত সুবিধা এই যে, কবির সঙ্গে রবির একটা মিল আছে;—এর পরে যা'রা আমার নামে কবিতা লিখ্‌বে, তা'দের অনেকটা কষ্ট বাঁচ্‌বে। ইতি ২০শে ভাদ্র, ১৩২৫।

১৬

শান্তিনিকেতন

আজ সকালে তোমার চিঠি এইমাত্র পেলুম। আজ আমার চতুর্থ এবং পঞ্চম বর্গের পুরাতন পড়ার দিন, আজ সন্তোষের হাতে তা'দের ভার; এইজন্যে আমার সকালের কাজের প্রথম দুই ভাগ আমার ছুটি, তাই এখনি তোমার চিঠির জবাব দিতে বস্‌বার সময় পেলুম। সেদিন যখন তোমাকে লিখ্‌ছিলুম, তখন আকাশ জুড়ে মেঘের হাঁকডাক্‌ এবং মাঠেবনে পাগ্‌লা হাওয়ার দৌরাত্ম্য চ'ল্‌ছিল; আজ সকালে তা'র আর কোনো চিহ্ন নেই, আজ শরৎকালের প্রসন্ন মূর্ত্তি প্রকাশ পেয়েছে—শিবের জটা ছাপিয়ে যেন গঙ্গা ঝ'রে প'ড়চে,—আকাশে তেমনি আজ আলোকের নির্ম্মল ধারা ঢেলে দিয়েচে, পৃথিবী আজ মাথা নত ক'রে তা'র অশ্রু-আর্দ্র হৃদয়খানি মেলে দিয়েচে, আর আকাশের কোন্‌ তরুণ দেবতা হাসিমুখে তা'র উপরে এসে দাঁড়িয়েচেন। জলস্থল শূন্যতল আজ একটি জ্যোতির্ম্ময় মহিমায় পূর্ণ হ'য়ে উঠেচে। সেই পরিপূর্ণতায় চারিদিক শান্ত স্তব্ধ, অথচ গোলমাল যে কিছু নেই তা' নয়। জাগ্রত প্রভাতের কাজকর্ম্মের কলধ্বনি উঠেচে। আমার ঠিক সাম্‌নেই 'দিনুবাবুর' ঘরের দোতালায় রাজমিস্ত্রী ও মজুরের দল নানারকম ডাক্‌হাঁক্‌ এবং ঠুক্‌ঠাক্‌ লাগিয়ে দিয়েচে। দূরে থেকে ছেলেদের কণ্ঠস্বরও শোনা যাচ্চে, পূবদিকের সদর রাস্তা দিয়ে সার-বাঁধা গোরুর গাড়ি ইটের বোঝা নিয়ে আস্‌চে, তা'রই অনিচ্ছুক চাকার আর্ত্তনাদ এবং গাড়োয়ানের তর্জ্জনধ্বনির বিরাম নেই, তা'র উপরে ঠিক আমার পিছনের জানালার বাইরে সুধাকান্তর ঘরের চালের উপরে ব'সে একদল চড়ুইপাখী কিচিমিচি ক'রে কি যে বিষম তর্ক বাধিয়ে দিয়েচে, তা'র একবর্ণ বোঝ্‌বার জো নেই,—প্রায় ন্যায়শাস্ত্রেরই তর্কের মত। কিন্তু তবু আজ আলোকে অভিষিক্ত আকাশের এই অন্তরতর স্তব্ধতা কিছুতেই যেন ভাঙ্‌তে পারচে না। গায়ের উপর দিয়ে হাজার হাজার যে-সব ঝরণা ঝ'রে প'ড়চে, তা'তে যেমন হিমালয়ের অভ্রভেদী স্তব্ধতাকে বিচলিত করে না, এও ঠিক সেই রকম। একটি তপঃপ্রদীপ্ত অপরিমেয় মৌনকে বেষ্টন ক'রে এই সমস্ত ছোট ছোট শব্দের দল খেলা ক'রে চলেচে—তা'তে তপস্যার গভীরতা আরো বড় হ'য়ে প্রকাশ পাচ্চে, নষ্ট হ'চ্চে না। শরতের বনতল যেমন নিঃশব্দে-ঝ'রে-পড়া শিউলিফুলে আকীর্ণ হ'য়ে ওঠে, তেমনি ক'রেই আমার মনের মধ্যে আজ শরৎ-আকাশের এই আলো শুভ্র শান্তি বর্ষণ ক'রচে। ইতি ২৮শে ভাদ্র, ১৩২৫।

১৭

শান্তিনিকেতন

গেল বুধবারে সকালে আমি মন্দিরে কি বলেছিলুম শুনবে? আমি বলেছিলুম, মানুষের ছোট আর বড়, দুই-ই আছে। সেই ছোট মানুষটি জন্ম আর মৃত্যুর মাঝখানে কয়দিনের জন্যে আপনার একটি ছোট সংসার পেতেছে—সেইখানে তা'র যত খেলার পুতুল সাজানো—সেইখানে তা'র প্রতিদিনের আহরণ জমা হ'চ্চে আর ক্ষয় হ'চ্চে। কিন্তু মানুষের ভিতরকার বড়টি জন্ম-মৃত্যুর বেড়া ডিঙিয়ে চিরদিনের পথে চ'লেছে, এই চল্‌বার পথে তা'র কত সুখ-দুঃখ, কত লাভ-ক্ষতি ঝ'রে প'ড়ে মিলিয়ে যাচ্চে। পৃথিবীর দুটি আবর্ত্তন আছে,—একটি আহ্নিক, একটি বার্ষিক। একটি আবর্ত্তনে সে আপনাকেই ঘুরচে, আর একটিতে সে নিজের চিরপথের কেন্দ্রস্থিত আলো-

কের উৎসকে প্রদক্ষিণ ক'রচে। নিজেকে ঘোরবার সময় সূর্য্যের দিকে পিঠ ফেরাতেই দেখ্‌তে পায় যে, তা'র নিজের কোনো আলো নেই, তা'র নিজের দিকে অন্ধতা, ভয়, জড়তা,—কিন্তু নিজের সেই অন্ধকারটুকুকে না জান্‌লে সূর্য্যের সঙ্গে তা'র সম্বন্ধের পূর্ণ পরিচয় সে পেত না। আমরাও আমাদের ছোট আবর্ত্তনে নিজেকে ঘুরি; এ ঘোরাতেই জান্‌তে পারি, আমার দিকে অন্ধকার, বিভীষিকা, মোহ, আমার দিকে ক্ষুদ্রতা; কিন্তু সেই জানার সঙ্গে সঙ্গেই যখন সেই অমৃতের উৎসকে জানি, তখন অসত্য থেকে সত্যে, অন্ধকার থেকে আলোকে, মৃত্যু থেকে অমৃতে আমরা যেতে থাকি। এইজন্যে আপনাকে আর তাঁ'কে দুইকেই একসঙ্গে জান্‌তে থাক্‌লে তবেই আমরা আমাদের বন্ধনকে নিয়ত অতিক্রম ক'রতে ক'রতে, মুক্তির স্বাদ পেতে পেতে, অমৃতের পাথেয় সংগ্রহ ক'রতে ক'রতে চিরদিনের পথে চ'ল্‌তে পারি। আমাদের ক্ষুদ্র প্রতিদিন আমাদের বৃহৎ চিরদিনকে প্রণাম ক'রতে ক'রতে চ'ল্‌তে থাক্‌বে, আমাদের ক্ষুদ্র প্রতিদিন তা'র সমস্ত আহরণগুলিকে বৃহৎ চিরদিনের চরণে সমর্পণ ক'রতে ক'রতে চ'ল্‌বে। কিন্তু ক্ষুদ্র প্রতিদিন যদি এমন কথা ব'লে বসে যে, আমি যা পাই, যা আনি, সব আমি নিজে জমাব, তা' হ'লেই বিপদ বাধে, কেননা, তা'র জমাবার জায়গা কোথায়? তা'র মধ্যে এত ধরে কোথায়? তা'র এমন অক্ষয় পাত্র আছে কোন্‌খানে? পৃথিবী যেমন তা'র সোনায়-ভরা সকালটিকে এবং সোনায়-ভরা সন্ধ্যাটিকে নিজে জমিয়ে রেখে দেয় না, পূজার স্বর্ণকমলের মত আপন সূর্য্য-প্রদক্ষিণের পথে প্রত্যহ প্রণাম ক'রে উৎসর্গ ক'রতে ক'রতে চ'লেচে, আমাদেরও তেম্‌নি এই ক্ষুদ্র জীবনের সমস্ত সুখদুঃখ ভালবাসাকে চিরদিনের চ'ল্‌বার পথে চিরদিনের দেবতাকে উৎসর্গ ক'রতে ক'রতে যেতে হবে;—তা' হ'লেই ছোট-আমির সঙ্গে বড়-আমির মিল হবে, তা' হ'লেই আমাদের ক্ষুদ্র জীবন সার্থক হবে; আপনার দিকে সমস্ত টান্‌তে গেলেই সে টান টেকে না, সেই বিদ্রোহে ছোট-আমিকে একদিন পরাস্ত হ'তেই হয়। এই জন্য ছোট-আমি জোড়হাতে প্রার্থনা ক'রচে নমস্তেঽস্তু,—বড়কে আমার নমস্কার সত্য হোক্, নিজের ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্তি পাই। ইতি ২৯শে ভাদ্র, ১৩২৫।

১৮

শান্তিনিকেতন

আজ সকালে তোমার চিঠি পেয়েছিলুম, কিন্তু তখনি তা'র জবাব দেবার সময় পাইনি। দুপুর বেলাতেও খাবার পরে কিছু কাজ ছিল, তাই এখন বিকেলে তোমাকে তাড়াতাড়ি লিখ্‌তে ব'সেছি—ডাক যাবার আগে শেষ ক'রে ফেল্‌তে হবে। আজকাল আর বৃষ্টির কোন লক্ষণ নেই—আকাশ পরিষ্কার হ'য়ে গেছে। আমার সেই লেখ্‌বার কোণটা ত তুমি জান—সেটা হ'চ্চে পশ্চিমের বারান্দা; সেখানে বিকেলের দিকে হেলে-পড়া সূর্য্যের সমস্ত কিরণ বন্ধ-দরজার উপরে ঘা দিতে থাকে—সশরীরে ঢুক্‌তে পায় না বটে, কিন্তু তা'র প্রতাপ অনুভব ক'রতে পারি। তুমি এখন যেখানে আছ সেখান থেকে আমার পিঠের দিকের বর্ত্তমান অবস্থা ঠিক আন্দাজ ক'রতে পারবে না। কিন্তু আমার আকাশের মিতাটি আমার সঙ্গে যেম্‌নি ব্যবহার করুন, তাঁ'র সঙ্গে আমার কখনই বন্ধুত্বের বিচ্ছেদ হয়নি। আমি চিরদিন আলো ভালবাসি। গাজিপুরে, পশ্চিমের গরমেও, আমি দুপুর বেলায় আমার ঘরের দরজা বন্ধ করিনি। অনেক দিন বর্ষার আচ্ছাদনের পর সেই আলো পেয়েছি,—সেই আলো আজ আমার দেহের মধ্যে, মগজের মধ্যে, মনের মধ্যে প্রবেশ ক'রচে। আমার সাম্‌নে পূর্ব্বদিকের ঐ খোলা দরজা দিয়ে ঐ আলো নীল আকাশ থেকে আমার ললাটে এসে প'ড়েচে, আর সবুজ ক্ষেতের উপর দিয়ে এসে আমার দুই চোখের সঙ্গে সঙ্গে যেন কানে-কানে কথা ব'ল্‌চে। পৃথিবীর ইতিহাসে কত হানাহানি কাটাকাটি হ'য়ে গেল, মানুষের ঘরে-ঘরে কত সুখ-দুঃখ, কত মিলন-বিচ্ছেদ, কত যাওয়া-আসার বিচিত্র লীলা প্রতিদিন বিস্মৃতির মধ্যে মিলিয়ে গেল, কিন্তু এই শরতের সবুজটি পৃথিবীর প্রসারিত অঞ্চলের উপরে যুগে-যুগে বর্ষে-বর্ষে আপন আসন অধিকার ক'রেছে,—কিছুতেই এই সুগভীর

শান্তি সৌন্দর্য্যের পরে, এই রসপরিপূর্ণ নির্ম্মলতার উপরে, কোনো আঘাত ক'রতে পারেনি। সেই কথা যখন মনে ক'রি, তখন সাম্‌নের ঐ আকাশের দিকে চেয়ে যুগযুগান্তরের সেই শান্তি আমার ব্যক্তিগত জীবনের সমস্ত ক্ষোভকে আপন অসীমতার মধ্যে মিশিয়ে নেয়।

আমি বুধবারে কি বলি তাই তুমি শুন্‌তে চেয়েচ। যা' বলি তা' আমার ভাল মনে থাকে না। এণ্ড্রুজ্‌ উপাসনার পরেই আমার কাছে এসে একবার ইংরেজীতে তা'র ভাবখানা শুনে নেন, তাই খানিকটা মনে পড়ে। এবারে ব'লেছিলুম, জগতে একটা খুব বড় শক্তি হচ্চে প্রাণ, অথচ সেই শক্তি বাইরের দিক থেকে কত ছোট, কত সুকুমার, একটু আঘাতেই ম্লান হ'য়ে যায়। এমন জিনিষটা প্রতি মুহূর্ত্তে বিপুল জড়-বিশ্বের ভারাকর্ষণের সঙ্গে প্রতি মুহূর্ত্তে লড়াই ক'রে দাঁড়িয়ে আছে, বেড়িয়ে বেড়াচ্চে।

বালক অভিমন্যু যেমন সপ্তরথীর ব্যূহে ঢুকে লড়াই ক'রেছিল, আমাদের সুকুমার প্রাণ তেম্‌নি অসংখ্য মৃত্যুর সৈন্যদলের মধ্যে দিয়ে অহর্নিশি লড়াই ক'রে চ'লেচে। বস্তুর দিক থেকে দেখ্‌লে দেখা যায়, এই প্রাণের উপকরণ অতি তুচ্ছ,—খানিকটা জল, খানিকটা কয়লা, খানিকটা ছাই, খানিকটা ঐ রকম সামান্য কিছু, অথচ প্রাণ আপনার ঐ বস্তুর পরিমাণকে বহু পরিমাণে অতিক্রম ক'রে আছে। মৃত-দেহে সজীব-দেহে বস্তুপিণ্ডের পরিমাণের তফাৎ নেই, অথচ উভয়ের মধ্যকার তফাৎ অপরিসীম। শুধু তাই নয়, সজীবে বীজের বর্ত্তমান আবরণের মধ্যে মহারণ্য লুকিয়ে আছে। ছোটর মধ্যে এই-যে বড়-র প্রকাশ এই হ'চ্চে আশ্চর্য্য। আরেক শক্তি হ'চ্চে, মনের শক্তি। এই মনটি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় নিয়ে এই অসীম জগতের রহস্য আবিষ্কার ক'রতে বেরিয়েচে। সেই ইন্দ্রিয়গুলি নিতান্ত দুর্ব্বল। চোখ কতটুকুই দেখে, কান কতটুকুই শোনে, স্পর্শ কতটুকুই বোধ করে। কিন্তু মন এই আপন ক্ষুদ্রতাকে কেবলি ছাড়িয়ে যাচ্চে—অর্থাৎ সে যা', সে তা'র চেয়ে অনেক বড়। তা'র উপকরণ সামান্য হ'লেও সে অতি-ক্ষুদ্র এবং অতি-বৃহৎ, অতি-নিকট এবং অতি-দূরকে কেবলি অধিকার ক'রচে। তা' ছাড়া, তা'র মধ্যে যে-ভবিষ্যৎ প্রচ্ছন্ন, সেও অপরিমেয়। একটি ছোট শিশুর মনের মধ্যেই নিউটনের, সেক্‌স্‌পীয়ারের মন লুকিয়ে ছিল। বর্ব্বরতার যে-মন পাঁচের বেশী গণনা ক'রতে পারত না, তা'রি মধ্যে আজ্‌কের সভ্যতার মন জ্ঞানের সাধনায় অভাবনীয় সিদ্ধিলাভ ক'রেচে। শুধু তাই নয়, আরো ভবিষ্যতে সে যে আরো কি আশ্চর্য্য চরিতার্থতা লাভ ক'রবে, আজ আমরা তা' কোনোমতেই কল্পনা ক'রতে পারিনে। তা' হ'লেই দেখা যাচ্চে, আমাদের এই যে মন, যা' এক দিকে খুব ছোট, খুব দুর্ব্বল দেখ্‌তে, আর একদিকে তা'র মধ্যে যে ভূমা আছে, হিমালয়-পর্ব্বতের প্রকাণ্ড আয়তনের মধ্যে তা' নেই। তেমনি আমাদের আত্মা ছোট-দেহ, ছোট-মন, ছোট-সব প্রবৃত্তি দিয়ে ঘেরা, অনেক সময় তা'কে যেন দেখ্‌তেই পাওয়া যায় না। কিন্তু তবু তা'র মধ্যে সেই ভূমা আছেন। সেইজন্যেই ত এক দিকে আমাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা, আমাদের রাগ-বিরাগ যখন আমাদের কাছে অন্ন-বস্ত্র ও অন্য হাজার-রকম বাসনার জিনিষের জন্যে দরবার ক'রচে, সেই মুহূর্ত্তেই এই প্রবৃত্তির দাস, এই বাসনার বন্দী, বিশ্বের সমস্ত সম্পদ পায়ের নীচে ফেলে, উঠে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা ক'রেচে,—অসত্য থেকে আমাকে সত্যে নিয়ে যাও, যা অসীম একেবারে তা'কেই চাই। এত বড় চাওয়ার জোর এত টুকুর মধ্যে আছে কোথায়? সে জোর যদি না থাক্‌ত, তবে এত বড় কথা তা'র মুখ দিয়ে বেরোতো কেমন ক'রে? এ-কথার কোনো মানে সে বুঝ্‌ত কি ক'রে? আশ্চর্য্য ব্যাপার হচ্চে এই যে, মানবের আত্মা যা' নিয়ে দেখ্‌চে শুন্‌চে ছুঁচ্চে খাওয়া-পরা ক'রচে, তা'কেই চরম সত্য ব'ল্‌তে চাচ্চে না;—যা'কে চোখে দেখ্‌ল না, হাতে পেল না, তা'কেই বলছে সত্য। তা'র একটি মাত্র কারণ, ছোটর মধ্যেই বড় আছেন, সেই বড়ই ছোটর ভিতর থেকে মানুষের আত্মাকে কেবলি মুক্তির দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্চেন—তাই মানুষের আশার অন্ত নেই। এখন, প্রত্যেক মানুষের কাজ হচ্চে কি? নিজের কথায়, চিন্তায়, ব্যবহারে এইটেই যেন প্রকাশ করি যে,

আমাদের মধ্যে সেই বড়ই সত্য। তা' না ক'রে যদি মানুষের ছোটটার উপরেই ঝোঁক দিই,—যে-সব বাসনা তা'র শিকল, তা'র গণ্ডী, যাতে তা'কে খর্ব্ব করে, আচ্ছন্ন করে, তা'কেই যদি কেবল প্রশ্রয় দিই,—তা' হ'লে মানুষকে তা'র সত্যপরিচয় থেকে ভোলাই। আত্মা যে অমর, আত্মা যে অভয়, আত্মা যে সমস্ত সুখ-দুঃখ, ক্ষতি-লাভের চেয়ে বড়, অসীমের মধ্যেই যে আত্মার আনন্দনিকেতন, এই কথাটি প্রকাশ করাই হ'চ্চে মানুষের সমস্ত জীবনের অর্থ; এই জন্যেই আমরা এত শক্তি নিয়ে এত বড় জগতে জন্মেছি,—আমরা ছোটখাটো এটা-ওটা-সেটা নিয়ে ভেবে কেঁদে ম'রতে আসিনি। ইতি, ৪ঠা আশ্বিন, ১৩২৫।

১৯

শান্তিনিকেতন

তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রেছ, "রবিদাদা" না ব'লে আমাকে আর একটা কোনো নামে সম্ভাষণ ক'রতে পার কিনা? মহাভারতের সময়ে মানুষের এক একজনের দশ-বিশটা ক'রে নাম থাকৃত, যা'র যেটা পছন্দ বেছে নিতে পার্‌ত। কিম্বা যে ছন্দে যেটা মেলাবার সুবিধে, লাগিয়ে দিত। অর্জ্জুনের কত নাম যে ছিল, তা' অর্জ্জুনকে রোজ বোধ হয় নামতা মুখস্থ করার মত মুখস্থ ক'রতে হ'ত। আমার যে আকাশের মিতাটি আছেন, তাঁ'রও নামের অভাব নেই। যদি তাঁ'র দুটো-একটা নাম ধার ক'রে নিতে চাও, তা' হ'লে বোধ হয় তাঁ'র বিশেষ কিছু লোকসান হবে না। কিন্তু যখন নামকরণ ক'রবে, তখন আমার সম্মতি নিলে ভাল হয়। প্রথম যখন আমার নামকরণ হয়, তখন কেউ আমার সম্মতি নেয়নি, তবু দেখ্‌তে পাচ্চি নামটা মন্দ হয়নি,—কিন্তু হঠাৎ যদি তোমার মার্ত্তণ্ড নামটাই পছন্দ হয় তা' হ'লে কিন্তু আমি আপত্তি ক'রব। 'ভানু' নামটা যদিচ খুব সুশ্রাব্য নয়, তবু ওটা আমি একবার নিজেই গ্রহণ ক'রেছিলুম। আর এক হ'তে পারে, যদি "কবিদাদা" বল। নামটা ঠিক সঙ্গত হোক্, বা না হোক্ ওটা আমার নিজের কাজের সঙ্গে মেলে—

এক যে ছিল রবি
সে গুণের মধ্যে কবি।

কিন্তু একটা কথা তোমাকে ব'লে রাখি, "প্রিয় কবি-দাদা" ব'ল্লে চল্‌বে না। প্রথম কারণ হ'চ্চে এই যে, তোমার প্রিয় কবি যে কে তা আমি ঠিক জানিনে। খুব সম্ভব যে-লোকটা সেই আশ্চর্য্য হিন্দী দোঁহা লিখেছিল সেই হবে। তা'র সঙ্গে ছ-অক্ষরের অনুপ্রাসে আমি যে কোনোদিন পাল্লা দিতে পারব, এমন শক্তি বা আশা আমার নেই। দ্বিতীয় কারণ হ'চ্চে এই যে, ইংরাজিতে 'প্রিয়' বলে না এমন মানুষই নেই—সে অমানুষ হ'লেও তা'কে বলে,—এমন কি সে যদি দোঁহা না লিখ্‌তে পারে তবুও। আমার মত হ'চ্চে এই যে, রাস্তা-ঘাটের সবাইকেই যদি 'প্রিয়' বল্‌তে হবে এমন নিয়ম থাকে, তবে দুই এক জায়গায় সে নিয়মটা বাদ দেওয়া দরকার। অতএব আমাকে যদি শুধু "রবিদাদা" বল, তা' হ'লে আমি বারণ ক'রব না। এমন কি, যদি তোমার মার্ত্তণ্ড নামটাই পছন্দ হয়, তা' হ'লে "প্রিয় মার্ত্তণ্ডদাদা" লিখো না। তা' হ'লে বরঞ্চ লিখো, "মার্ত্তণ্ডদাদা, প্রচণ্ড প্রতাপেষু"। যদি কোনোদিন তোমার সঙ্গে রাগারাগি ক'রি তা' হ'লে ঐ নামে ডাক্‌লেই হবে।

আমাদের আশ্রমের আকাশে শারদোৎসব আরম্ভ হ'য়েছে—শিউলিবন সাড়া দিয়েছে, মালতীলতার পাতায় পাতায় শুভ্রফুলের অসংখ্য অনুপ্রাস, কিন্তু রাত্রে চাঁদের আলোর আকাশ-জোড়া একখানি মাত্র শুভ্রতা। আমাদের লাল রাস্তার দুইধারে কাশের গুচ্ছ সার বেঁধে দাঁড়িয়ে বাতাসে মাথা নত ক'রে ক'রে পথিকদের শারদ-সঙ্গীত শুনিয়ে দিচ্চে। সমস্ত সবুজ মাঠে, সমস্ত শিশির-সিক্ত বাতাসে উৎসবের আনন্দ-হিল্লোল ব'য়ে যাচ্চে। অন্তরে বাইরে ছুটি, ছুটি, ছুটি—এই রব উঠেচে। ছুটিরও আর কেবল দুই সপ্তাহ বাকি আছে। আমাদের যখন ছুটি

আরম্ভ, তখন তোমাদের শৈলপ্রবাস বোধ হয় সাঙ্গ হবে। পার্ব্বতী যখন হিমালয়ে তাঁ'র পিতৃভবনে যাবেন, তখন তোমরা তাঁ'কে অভ্যর্থনা করবার জন্যে সেখানে থাকবে না। কিন্তু হিমালয়ের খবর আমরা রাখিনে, কৈলাসের ত নয়ই; আমরা ত এই স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্চি স্বর্ণকিরণচ্ছটায় শারদা আমাদেরই ঘর উজ্জ্বল ক'রে দাঁড়িয়েচেন। গোটাকতক মেঘ দিগন্তের কোণে মাঝে মাঝে জটলা করে; কিন্তু তাদের নন্দীভৃঙ্গীর মত কালো চেহারা নয়, তা'রাও শ্বেত-কিরণের মালা প'রেছে, শ্বেত-চন্দনের ছাপ লাগিয়েছে—ললাটে ভ্রূকুটির লেশ নেই। ইতি, ৬ই আশ্বিন, ১৩২৫।

২০

শান্তিনিকেতন

প্রথম যখন তোমার চিঠি পেয়েছিলুম, তোমার চিঠিতে "প্রিয় রবিবাবু" প'ড়ে ভারি মজা লেগেছিল। ভাবলুম রবিবাবু আবার "প্রিয়" হবে কেমন ক'রে? যদি হ'ত "প্রিয় মিষ্টার ট্যাগোর", তা' হ'লে তেমন বেমানান হ'ত না; কেননা, রবিবাবু প্রিয়ও হতে পারে, অপ্রিয়ও হ'তে পারে, এবং প্রিয় অপ্রিয় দুইয়ের বাহিরও হ'তে পারে। তুমি যখন চিঠি লিখেছিলে, তখন রবিবাবু প্রিয়ও ছিল না, অপ্রিয়ও ছিল না, নিতান্ত কেবলমাত্র রবিবাবুই ছিল। কিন্তু চিঠির ভাষায় মিষ্টার ট্যাগোরের 'প্রিয়' ছাড়া আর কিছু হবার জো নেই, তা' আমার সঙ্গে তোমার ঝগ্‌ড়াই থাক্ আর ভাবই থাক্। আজকাল রবিবাবু পরীক্ষায় একেবারে দু'-তিন ক্লাশ উঠে "রবিদাদা" হয়েচে, কিন্তু যদি "প্রিয় রবিদাদা" লেখ, তবে তোমার সঙ্গে আমার ঝগ্‌ড়া হবে। আর যদি বিশুদ্ধ বাংলা মতে 'প্রিয়' লেখা হয়, তা' হ'লে আপত্তি নেই বটে, তবু যখন আমি "রবিদাদা" তখন ওটা বাদ দিলেও চলে—ও যেন সকালবেলায় বাতি জ্বালানো, যেন, যার ফাঁসি হয়েচে, তা'কে কুড়ি বৎসর দ্বীপান্তর দেওয়া। অতএব আমি যেন থানধুতি-পরা ঠাকুরদাদা, আমার কোনো পাড় নেই, আমি নিতান্তই যেন সাদা "রবিদাদা," কি বল?

তোমরা মুক্তেশ্বরে গেছ শুনে সুখী হলুম। আমি ভ্রমণ ক'রতে ভালবাসি, কিন্তু ভ্রমণের কল্পনা ক'রতে আমার আরো ভাল লাগে। কেননা, কল্পনার বেলায় রেলগাড়ি ঘটর ঘটর করে না, বেরেলিতে তিন চার ঘণ্টা ব'সে থাক্‌তে হয় না, ডাণ্ডি অতি অনায়াসে এবং ঠিক্ সময়েই মেলে। তুমি তোমার নবীন দৃষ্টি নিয়ে নতুন নতুন দৃশ্য দেখ্‌চ, তোমার সেই আনন্দ আমি মনে মনে অনুভব ক'র্‌চি। আমি আমার এই খোলা ছাদে লম্বা কেদারায় শুয়ে শুয়ে, গিরিতটে তোমার দেবদারুবনে ভ্রমণের সুখ মনে মনে সঞ্চয় ক'রি। আমিও প্রায় তোমার বয়সেই হিমালয়ে গিয়েছিলুম,—ড্যাল্‌হৌসীতে বক্রোটা শিখরের উপরে থাক্‌তুম। এক একদিন আমাদের বাড়ির খানিক নীচে এক দেবদারুবনে সকালে একলা বেড়াতে যেতুম। আমি ছিলুম ছোট্ট (তখন লম্বায় ছ' ফুট ছিলাম না), তাই গাছগুলোকে এত প্রকাণ্ড বড় মনে হ'ত—সে আর কি ব'লব? সেই সব গাছের সুদীর্ঘ ছায়ার মধ্যে নিজেকে দৈত্যলোকের অতি ক্ষুদ্র এক অতিথি ব'লে মনে হ'ত। কিন্তু সেই আমার ছেলেবেলাকার পর্ব্বত, ছেলে-বেলাকার বন এখন আর পাব কোথায়? এখন আমার মনটা এই জগতের পথে এত নিজের সাঙ্গোপাঙ্গো [illegible] চলে যে, নিজের চলার ধুলোয় এবং নিজের [illegible] ছায়ায় জগৎটা বারো আনা ঢাকা প'ড়ে যায়—বাজে ভাবনার ঝোঁকের মধ্য দিয়ে জগৎটাকে আর তেমন ক'রে দেখা যায় না। তাই আজ তুমি যে-পাহাড়ের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চ, মনে হ'চ্চে সে আমার সেই অল্প বয়সের পৃথিবীর পাহাড়, আমার সেই ৪৫।৪৬ বৎসরের আগেকার। আমরা পুরাণো হ'য়ে উঠে, নিজের হাজার রকম চিন্তায় এই পৃথিবীটাকে যতই জীর্ণ ক'রে দিই না কেন, মানুষ আবার ছেলেমানুষ হ'য়ে, নূতন হ'য়ে, চিরনূতন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। শুধু একদল মানুষ যদি চির-কালই বৃদ্ধ হ'তে হ'তে পৃথিবীতে বাস ক'রত, তা' হ'লে বিধাতার এই পৃথিবী তা'দের নস্যে, তামাকের ধোঁয়ায়, তা'দের পাকা বুদ্ধির আওতায়, একেবারে আচ্ছন্ন হ'য়ে যেত, স্বয়ং বিধাতা তাঁ'র নিজের সৃষ্টি ঐ পৃথিবীকে

চিন্‌তে পারতেন না। কিন্তু জগতে শিশুর ধারা কেবলি আস্‌চে। নবীন চোখ, নবীন স্পর্শ, নবীন আনন্দ ফিরে ফিরে মানুষের ঘরে অবতীর্ণ হ'চ্চে। তাই প্রাচীনদের অসাড়তার আবর্জ্জনা দিনে-দিনে, বারে-বারে, ধুয়ে-মুছে পৃথিবীর চিররহস্যময় নবীন রূপকে উজ্জ্বল ক'রে রাখ্‌চে। অন্য মানুষের সঙ্গে কবিদের তফাৎটা কি জান? বিধাতার নিজের হাতে তৈরী শৈশব কবিদের মন থেকে কিছুতে ঘোচে না। কোনোদিন তা'দের চোখ বুড়ো হয় না, মন বুড়ো হয় না। তাই চিরনবীন এই পৃথিবীর সঙ্গে তা'দের চিরদিনের বন্ধুত্ব থেকে যায়, তাই চিরদিনই তা'রা ছোটদের সমবয়সী হ'য়ে থাকে। সংসারে বিষয়ের মধ্যে যা'রা বুড়ো হ'য়ে গেছে, তা'রা চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহ-তারার চেয়ে বয়সে বড় হ'য়ে ওঠে, তা'রা হিমালয়ের চেয়ে বড় বয়সের। কিন্তু কবিরা সূর্য্য চন্দ্র তারার ন্যায় চিরদিনই কাঁচাবয়সী—হিমালয়ের মতই তা'রা সবুজ থাকে, ছেলেমানুষীর ঝরণা-ধারা কোনোদিনই তা'দের শুকোয় না; লোকালয়ে বিশ্ব-জগতের নবীনতার বার্ত্তা এবং সঙ্গীত চিরদিন তাজা রাখ্‌বার জন্যেই কবিদের দরকার—নইলে তা'রা আর সকল বিষয়েই অদরকারী।

উচ্চ-হাসে সকৌতুকে চির-প্রাচীন গিরির বুকে
ঝ'রে পড়ে চির-নূতন ঝর্‌ণা;
নৃত্য করে তালে তালে প্রাচীন বটের ডালে ডালে
নবীন পাতা ঘন-শ্যামল-বর্ণা।
পুরাণো সেই শিবের প্রেমে নূতন হয়ে এল নেমে
দক্ষসুতা ধরি উমার অঙ্গ
এম্‌নি ক'রে সারা বেলা চল্‌চে লুকোচুরি খেলা
নূতন-পুরাতনের চিররঙ্গ।

ইতি, ১৪ই আশ্বিন, ১৩২৫।

পাহাড়িয়া



রং-মহল

—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—গদ্য ছন্দ—



হাল্-ফেশানের শিষ্-মহল,
শুধু কাচ্ আর কাঠ্ আর টিন্ ;—
যেন একটা কাফুন্,
দু'চার দিনের হঠাৎ-নবাবীর ফুল্‌কি-কাচের কাফুন্—
উই-ধরা, মরচে-পড়া,
পাহাড় জুড়ে প'ড়ে আছে দেবদারু-বনে।
দেবদারু এ, বাদল্-ছোঁওয়া,
প্রথম-যুগের সবুজ দাবানল,
কইচে পুরোনো দিনের বিজ্‌লি-পাখীর কথা ;
এরা কি রাখে কোনো খবর এই শিষ্-মহলের ?
ভাঙা বাগানে দেবদারু রয় রয়, আচম্‌কা জ্বলে ওঠে,
পাহাড় সে রঙের নেশায় মেতে ওঠে যেন।

মাতন্ মেঘে-মেঘে,
মাতামাতি পাথরে-পাথরে,
তুফান্ তুলে রৌদ্র-ছায়ায়
মাতামাতি মহাবনে।

পাহাড়িয়া-বাসিন্দা, দুর্ম্মদ এরা,
নীল্-মদে মত্ত আছে দিন্-রাতই !
প্রচণ্ড উল্লাস এদের,—
আকাশ ছাড়িয়ে উঠ্‌তে চায়,
ঝর্ণা দিয়ে ব'হে চলে
সাপ্-খেলানো ছন্দে রসাতলের দিকে,
বিদ্যুৎ আর বাজ ধ'রে ধ'রে!
জলে ঝড়ে মেতেই আছে এরা,
গিরি অরণ্য সবাই ;—
অশেষ মাতনে মেতেই আছে—
কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা ;
বসন্তের ক্ষণিক্ স্বপ্ন
দেখে কি দেখে না এরা নিমেষের মতো।



বরফ-ঢালা উত্তর-বাতাস এ—
ইন্দ্রধনুর রঙে রাঙানো,
কুয়াসাতে ভারি ;
এরি তলায় এ কাচ্-মহল্—
ঠুন্‌কো, ভারি পল্‌কা,
একেবারেই হাল্কা—
যেন পরীস্তানের ময়ূর-পঙ্খী পাল্কিটি !—
সায়র-নীল্ ছায়ার ঘেরে ধরা
বুদ্বুদ্ একটি যেন সাত-রঙা !
পল-তোলা কাচের ঢাক্‌নি-দেওয়া রঙ্‌মহল্—
রঞ্জন-ফুলের রেণু-মাখা, কাচ্‌পাখ্‌না মৌমাছির
ছেড়ে-যাওয়া মৌচাক্‌টির প্রায়
শূন্য প'ড়ে আছে ভাঙা বাগানে।

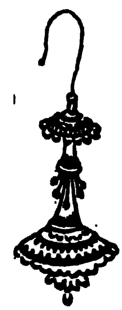
এক পলকের নির্ম্মিতি—
চিকন্-কারি কাচের ঢালাই শিষ্‌মহল,—
চিকন্ গাঁথ্‌নি এমন,—

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যে আলোর ভারে ভাঙ্‌লো বুঝি,
মিলিয়ে গেল বা হাওয়ায় হাওয়ায় !

ফুল্‌-বাগান্‌ কাচ্‌মহল ঘিরে,
ভাঙা ফুলদান্‌ ঘিরে উজাড় বাগানটা ;—
মালাকরের বোনা ফুলের গহনা যেন ছিঁড়ে-পড়া,
এ যেন ধ্বসে-যাওয়া সরু লহর, মিঠে জলের !

মায়াতে ঘেরা বেজান্‌ সহরের বাগান্‌ এখানা,—
খোয়াব্‌ জাগায় দিক্‌-ভোলানো।
সুন্দর-বুনন্‌ সুজ্‌নীর মতো আর এক বাগান্‌—
মন-মাতিয়ে রূপেতে রঙেতে
পৌঁছে যায় চোখের সাম্‌নে।
দেখি আর-এক দিনের রঙ্‌মহল্‌ ঘিরে
খুসির জলুস্‌ সাত্‌রঙা
দিচ্ছে ঝলক্‌ ফুল্‌-বাসরে ;
মহলে মহলে দিচ্ছে ঝিলিক্‌—
দেওয়ালে আর্‌সিতে,
কাচের ফুল্‌দানে, স্ফটিক-ঝালর সামাদানে,
মণি-কাটা পেয়ালাতে, সোনাতে রূপোতে মণিমাণিক্যে বিল্লোরে।



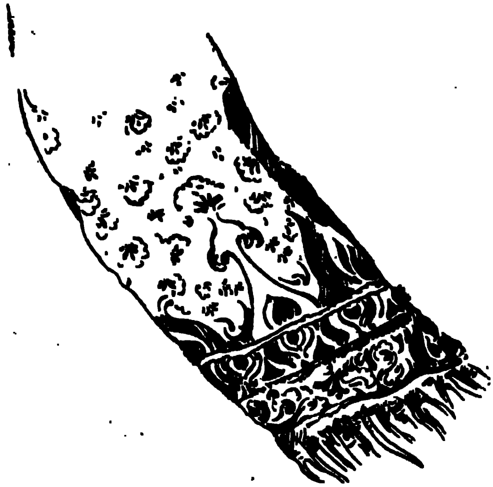
হিল্লোল্‌ দিচ্ছে রঙ—
পহলদার্‌ কানের দুলে, মোতির কর্ণফুলে,
কালো চুলে হীরের ঝাপ্‌টায়,
হাতের পঁহুছায়, কণ্ঠ-মালায়,
নূপুরে গুঞ্জরী-পঞ্চমে, পায়ের তলায় হেনার রঙে
দিচ্ছে ঝলক, ধ'র্‌চে জলুস্‌ জল্‌সার বাতি।



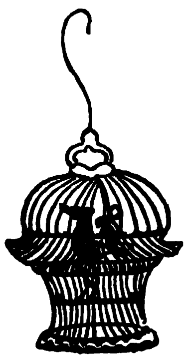
পরীস্তানের খোস্‌বু হাওয়ায়
একটুখানি ছোঁয়াচ্‌ পেয়ে
গুল্‌জার্‌ যেন বাগিচা এখনো—
বুল্‌বুলির গানে-গানে, ফুলে-ফুলে [illegible]

সকালে সন্ধ্যায় এখনো মনে হয়
বনের তলায় ব'সে যায় সবুজ দরবার,—
ফুলে ফুলে ফুল-বিছানো মস্‌নদ্‌ জুড়ে ;

ফুলের বাহার লাগে রোজই—
ফুল্‌দানির ফুলের, তোর্‌রা বাঁধা ফুলের,
হিমে ফুটন্ত গোলাপফুলের।



বুল্‌বুলের মন-লোভানো মালঞ্চে এইখানে
সময়ে অসময়ে বসন্তের স্বপ্ন দিয়ে বয় যেন
গুলরুঃ বাতাস পরীস্তানের ;
হঠাৎ খোলে যেন দক্ষিণ-দুয়ার শীতের রাত্রে,
ফুলবোনা কিংখাবের পর্দার ভাঁজ সরিয়ে
এসে পৌঁছয় বাতাস—
সোনার পিঁজ্‌রাতে মাণিকে-গড়া খেল্‌না বুল্‌বুলির কাছে।—



—পরীস্তানের বুল্‌বুল্‌ সে
ঘুম জানে না, নেচেই চলে ;
বলে অবিরত—পিও পিও পিও !

দেখি ফোয়ারা উঠ্‌ছে গোলাপ-বাগে—
উঠ্‌ছে প'ড়্‌ছে তালে তালে,—
মণি-মঞ্জীরের ছন্দ ধ'রে ;
উল্‌সে উঠ্‌ছে গোলাপ-জল ঝুর্‌ঝুরী দিয়ে,
ঝর্ণা বইছে উপবনে—
আবীরে চন্দনে মদে আর মেহ্‌ন্দিতে রাঙানো।



সন্ধ্যাতারার আলো-ছোঁয়ানো সাহানা সুরে
বেজেই চ'লেছে সারঙ্গী ;—
সুরে সুরে আল্‌সে-টোলে
বিভোল ছন্দে চ'লেছে
রাগ-রাগিনী—গলাগলি বাঁধি আর ভোরাই ;—
আস্‌ছে যাচ্ছে জোয়ারে নেশার ভরপুর !

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নর্ত্তকীর নূপুরের ঝিল্লীর-পরানো
স্বর্ণমৃগী তারা যেন—
ঘুরছে ফিরছে বিহ্বল উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি ;
ভেবেই পায় না রঙ্‌মহলে হ'ল রাত্রি শেষ,
না হচ্ছে রাত্রির আরম্ভ !

সকাল সন্ধ্যার ভ্রম জাগিয়ে
চমক্ ধরে কাচ্-কাফুনের ঠুন্‌কো দেওয়াল ;
আগুন-হানা রোদে, হিম-ছোঁয়ানো চাঁদ্‌নীতে
দেখা দেয় একই সঙ্গে—
সেদিনেরও রঙ্‌মহল,—
ভাঙা বাগান এদিনের-ও !



কাঁটায় কাঁটায় কাঁটা-ফুলে ভর্ত্তি
মালঞ্চ এখন শুকিয়ে-যাওয়া ;
এখানে ওখানে দেখ্‌ছি শুধুই
মালঞ্চের মালিকের মৎলবটাই ;—
শেওলা-সবুজ সানে-বাঁধানো চৌরাস্তা—
একটু দেখা যায় এখনো ;
একটি ধারে পাতা ঝরানো পারিজাত—
আছে উদয়-অস্ত আবোর-ঘেরা একলাটি ;



শ্বেত-পাথরের আতস-ঘড়ি—
ফাট্-ধরা তার চক্রটা—
আঙুরী-সরাপের ছোপ্ লাগানো ;
পাথরে-গাঁথা নক্সা-কাটা চবুতরা—
জাল দিয়ে ঘেরা—
হেলে প'ড়েছে অতল একটা ভাজনের বুকে
রোদ হেলে এদিক্‌টায় এ-বেলা ও-বেলা ;
চাঁদ ঝলে এ-পহর ও-পহর ।

সাত্‌রঙা আগুনের রূপ্‌টানে মাজা
চিকন্ কাচের পর্দ্দাখানি,
তারি ও-পারে রঙ্‌মহলের অন্দর ;—
আঙুর-লতার আড়াল-করা ছোট্ট মহল—
সুন্দর ছোট্ট আপনি-ফোটা বন-ফুলটি ;

বাতাস-চালা বে-দাগ কাচের ঝারি একটি—
নিরালাতে ঝাউতলায় ঝিক্‌মিক্ করে !

হেনার বেড়ায় আগ্‌লে-রাখা খিড়্‌কি,
তারি মাঝে ভাঙা ফোয়ারা,—
মোতিয়া-ফুলের পাপ্‌ড়ি-মেলানো ছোট্ট ফোয়ারা—
মক্‌রী-সাদা বিল্লোরে ঝলমল্—
শিশিরের ভারে নুয়ে-পড়া ফুলই যেন পরীস্তানের !

গোলাপ-জল ছিটিয়ে-ছিটিয়ে
খেলাই ছিল এই ফোয়ারার,
শিলের ঘায়ে, কি শিশিরের ভারে, না সে রোদের স্পর্শে
ফেটে হয়েছে চুরমার—
ঝড়ে পড়েছে ভেঙ্গে !



রূপের ঝিক্‌মিক্ ফোয়ারার—
ধুলোতে কাঁকরে আজও রয়েছে ছিটোনো—
ঘাসের উপর শিল-গালানো শিশির-বিন্দু—বিন্দু বিন্দু !

কাঁটা-বনে লুটিয়ে-পড়া ফোয়ারার
অবশেষ-টুকু, জ'ড়িয়ে-জ'ড়িয়ে শত-পাকে,
প'ড়ে আছে—
নীল-ডোরা সোনালী কাচের সাপিনীটা—
ফোয়ারার তলাকার মন্ত্রে মুগ্ধ যেন !

পাহাড়িয়া

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

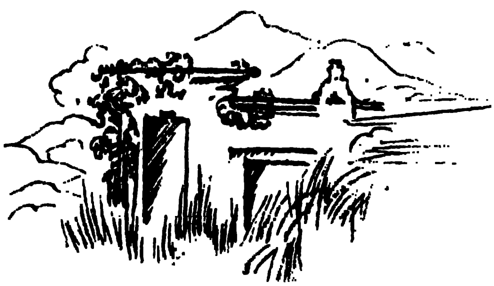


বাগানের এই কোণে একটি ঝর্ণা—
নেচে চলেছে, ব'ল্‌ছে কথা কতই!
আলো-ছায়ার মায়া দিয়ে ঘেরা এই কোণে বাগানের
উড়ে এসেছে ভ্রমর একটা,
পেয়েছে হয় তো মধুর সন্ধান এইখানেই;
পাহাড়ি ঘাসের সোনালি দোলায়
দুল্‌ছে আন্‌মনে ছোট্ট একটা প্রজাপতি,—
হাল্‌কা দুটি পাখ্‌না তা'র—
কাচ্‌-মহলের খিল্‌-খসা ঝরোকার মতো
খুল্‌ছে আর বন্ধ হচ্ছে আপ্‌না-আপ্‌নি!

ফুল-বাগিচার রঙ্‌মহলের কাফুন্‌টা থেকে
ছাড়া-পাওয়া স্বপ্ন
রঙে-রঙে ঢেউ খেলিয়ে অস্ত যাচ্ছে এই দিক্‌টাতে;
এইখানটায় বাসা বেঁধেছে
বনবাসী সাহা বুল্‌বুল্‌,—
পারদ-সাদা পাখ্‌না তা'র,
নিশা-কালো দু'টি চোখ!
ভাঙা-বাগানের প্রাণ-পাখী সে—
ক'রছেই উহুঃ উহুঃ উহুঃ!

নিবাসিন্দা-দেশের মানুষ—
কে সে বে-খবরী একজন,
নিয়ে এল ডেকে দলে-দলে
খাম-খেয়ালি উল্লাসীর দল;
পাহাড়ে এসে বাসা বাঁধ্‌লো তারা—
কাচে-ঘেরা,
ফুসঝরির ফুল-কাটা ফুল্‌কি-লাগানো
কাচের বাসা,—
ফুল-ফোটানো ফুল-ঝরানো ফুলবাগানে,—
ভ্রমর আর বুল্‌বুলির মনোমতো উপবনে
বসিয়ে দিলে রঙের মেলা খেলাচ্ছলে!

ক্ষণিক রঙের রঙ্গী কেই বা সে ?
উল্লাসীর দল কে বা তা'রা ?
ক্ষণিকের উল্লাসে-বিলাসে
বেপরোয়া খেলে গেছে—
উদয়-অস্ত আকাশের তীরে বনে পাহাড়ে !
মেঘে-বাসা-বাঁধা বিদ্যুতের খেলা খেলে গেছে,—
হাউইয়ের হল্‌কা-লাগা সাত্‌-তারার খেলা—
খেলেই মিলিয়ে গেছে অন্ধকারে !



গঙ্গাজলী-ঘন কুয়াসাতে
তলিয়ে যায় থেকে-থেকে ভাঙা বাগান ;—
বোঝাই যায় না কোথায় গেল,
আছে না আছে মহল-ঘেরা ফুল-বাগান ;
জানাই যায় না কোথায় শেষ কোথায় বা আরম্ভ
ঠুন্‌কো এই বুদ্‌বুদ্‌টির !

ফটকের বাইরে এসে প'ড়ি—
দিনের আলোতে চশ্‌মা-চোখে
দেখি লিখন—"শীষ্‌-মহল্‌ টু লেট্‌!"
এখানে ভুটিয়া-মালী ফুলের চান্‌কায় ক্ষেত দিচ্ছে—
শাক-সব্‌জী তরি-তরকারির ক্ষেতই খুঁড়ছে মালী ;
সাম্‌নেই রয়েছে তারও কাফুন্‌টা ধরা—
মস্ত একটা তালা-বন্ধ কাচ্‌মহল্‌—
শেওলাতে সবুজ !



—"রংমহল" চিত্রভূষণে অলঙ্কৃত করিয়াছেন শ্রীযুক্ত ব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বিঃ সঃ

রূপতত্ত্ব ও রূপসৃষ্টি

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

অনেকেরই একটা ধারণা আছে যে, ললিত-কলার রূপধারার বিচিত্র প্রকাশের ভিতর অভিব্যক্তি বা ক্রমবাদের একটা সুগুপ্ত ক্রিয়া নিভৃতে কাজ ক'রে থাকে,—অর্থাৎ চিত্র ও মূর্ত্তি-কলা জাতির একটা ক্রমপরিণতির ভিতর প্রসার ও সুষমা লাভ করে; কাজেই সুসভ্য দেশের বা যুগের সুকুমার কলার রূপলিপি যতটা মনোহর, অপেক্ষাকৃত অসভ্য দেশের তা' নয়। এ-রকমের একটা বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হ'য়ে বহুকাল সৌন্দর্য্যতাত্ত্বিকগণ আর্টের বর্ণ ও রেখাবিন্যাসের প্রতি স্তরে, রূপাবর্ত্তের প্রতি ধারার ভিতর বিবর্ত্তন-বাদের (Theory of Evolution) প্রভাব খুঁজে বেড়িয়েছেন।

এ-জন্যই প্রাচীন পানপাত্র ও ধাতব পুষ্পাধার প্রভৃতির উপরকার নানা বিচিত্র নক্‌সা ও কারু অলঙ্করণের মাঝে নানা পরিচিত বস্তুর রূপকল্পনা করা হয়েছে। হ্যাডন্ বোঝাতে চেষ্টা ক'রেছেন যে, দেশ-বিদেশের অনেক নক্সার ছন্দগত সুষমা অনেক সময় সে-দেশের পাখীর রূপরেখা ও প্রতিকৃতিকে অনুসরণ ক'রে থাকে—অনেক সময় মাছ ধরার হুক্ হ'তে হয়তো ঘণ্টার নমুনা আবিষ্কৃত হ'য়েছে। এ-রকম একটা উদ্ভট কল্পনার আশ্রয় নিয়ে হেন্‌রি ব্যালফোর তাঁ'র বইতে, কোন কোন চৈনিক অলঙ্কারকে চৈনিক বাদুড়ের চেহারারই একটা ক্রমপরিণতি রূপ ধ'রে নিয়ে, ললিতকলার প্রকাশের পর্য্যায় যে বিবর্ত্তনের (Evolution) উপরই নির্ভর ক'রে এমন কথা ব'লেছেন। *

এ-সব দেখেই Alois Riegal ব'লেছেন যে, এই ধরণের সমালোচকেরা 'থিওরী' দাঁড় করাতে গিয়ে এমন দৃঢ়তার সঙ্গে কথা ব'লতে সুরু করেন, যে অনেক সময় মনে হয়, বুঝি সব দেশের ও সব কালের সকল শিল্পী ও সৌন্দর্য্যসাধকগণ তাঁ'দের সঙ্গে পরামর্শ ক'রেই কাজ ক'রতে সুরু ক'রেছিলেন!

সৌন্দর্য্যের ও কলালীলার এ-রকমের পাকাপাকি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রথম সুরু হয়, যখন দর্শনতত্ত্বক্ষেত্রে Determinism ও ক্রমবিকাশতত্ত্ব (Evolution) সিন্ধবাদের মত য়ুরোপের ঘাড়ে চেপে ব'সেছিলো। সে ভাবের ক্ষণিক জোয়ার এসে আবার চ'লে গেছে। Determinism-তত্ত্ব আর্টে এসে চিত্র ও মূর্ত্তিকলাকে আড়ষ্ট ও দারুভূত ক'রে তুলেছিলো। সে-বিপদ হ'তে মুক্তির জন্য পশ্চিমে বড় সামান্য সাধনা হয়নি। তত্ত্বালোচনা-ক্ষেত্রে যে নাগপাশবন্ধন জড়তা ও প্রাণবস্তুকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দুনিয়াকে বন্দীরূপে (Block Universe) কল্পনা ক'রেছিল, তা'কে যেমন পরবর্ত্তী তাত্ত্বিকরা টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলেন, তেমনি আর্টেও "বস্তুবাদ" "স্বভাববাদ" প্রভৃতি তত্ত্বের শিথিল ভিত্তির উপর যে কলালোক প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল, তা'কেও আজ বিধ্বস্ত ও চূর্ণীকৃত ক'রে পশ্চিম পরিতৃপ্ত হ'য়েছে।

অন্ততঃ আজ পশ্চিমের কোনো কোনো সৌন্দর্য্যতাত্ত্বিক বল্‌ছেন, সৌন্দর্য্যসৃষ্টি চিরকালই পরিপূর্ণ পর্য্যাপ্তির শতদল-আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে থাকে, তা'র ভিতর ক্রমপরিণতির ভ্রান্তি ও হেরফের নেই, তা' দেশ কালকে উপেক্ষা ক'রেই মুঞ্জরিত হয়ে থাকে,—কারণ তা' সৃষ্ট হয় মানবের অফুরন্ত জীবনধারার অসীমতা হ'তে, মানবের ভিতরকার অনবদ্য অনাদিত্বের প্রেরণা হ'তে—অর্থাৎ তা' *a priori* আর্ট, ঠিক বুদ্ধির পরিধিগত ব্যাপার নয়, তা'র পশ্চাতে একটা স্বাভাবিক সংস্কার কাজ ক'রে থাকে। কাজেই, দু'হাজার বছর আগে যা' হয়েছে—যেমন "Cave

---

* The Evolution of Decorative Art by H. J. Balfour.

Drawings" প্রভৃতি—তা' আর্টের দিক্ হ'তে অপূর্ণ ও অসংলগ্ন, বা মধ্যযুগে যা' হয়েছিল, এবং আজ যা' হচ্ছে তাই আর্টের একটা তাজ্জব ব্যাপার—এ-রকম একটা কথা সৌন্দর্য্যতত্ত্ব বিচারের দিক থেকে গ্রাহ্য হ'তে পারে না।

এ-সমস্ত কারণে পশ্চিমে শিল্পকলালোচনা-ক্ষেত্রে একটা নূতন সাড়া প'ড়ে গেছে। যা' দেখে পশ্চিম এক সময় ব্যঙ্গ 'ক'রেছে, যা'র কুৎসা রটিত হ'তে কোনো কালে এক মুহূর্ত্ত দেরী হয়নি, তা' আজ ভাল ক'রে সেখানকার রসজ্ঞেরা বুঝ্‌তে চেষ্টা ক'রছেন, তা' উপেক্ষা ক'রতে কা'রও সাহস হচ্ছে না। এই শ্রদ্ধার ফলে সমস্ত অবান্তর সংস্কারবিচ্যুত হ'য়ে পশ্চিমের চোখে বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্যের দিক্‌টা হঠাৎ খুলে গেছে এবং তা'তে অপরিচিত ও অজ্ঞাত নানা দেশের অফুরন্ত কলারসধারা পান ক'রে সেখানকার রসার্থীরা তৃপ্ত হচ্ছেন।

এ-সব খবর এ-দেশে অতি অল্পই পৌঁছিয়েচে। আফ্রিকার নিগ্রো-শিল্পের উদ্দাম ব্যঞ্জনার ভিতর কি নিবিড় ও আশ্চর্য্য রসসম্পুট আবিষ্কৃত হ'য়েছে, তা' খুব কম লোকেই এখানে জানে। এক সময় এ-দেশে 'আর্ট' বল্‌লে আর্ট-ষ্টুডিওর ছাপা ছবি বোঝাতো। এখনও এ-বিষয়ে জ্ঞান বিশেষ কিছু বেড়েছে এমন মনে হয় না—যদিও বিলাতী দোকানের রাশি রাশি ছবি, রবিবর্ম্মার চিত্রপর্য্যায় কিম্বা এ-দেশের আধুনিক ভারতীয় ও জাপানী ধরণের ছবির সম্বন্ধে দু'চারটি মুখস্থ-করা সস্তা বুলি আওড়ানো অনেকের পক্ষেই খুব একটা 'ফ্যাশন্' হ'য়ে প'ড়েছে। কিন্তু এখনও এ-দেশে যা' দেখে লোকে চিত্র বা মূর্ত্তিকে বাহবা দিতে যায় তা' Æsthetic ব্যাপারই নয়।

ইতিমধ্যে ইংলণ্ডে রোজার ফ্রাই-প্রমুখ কলাবিদ্‌গণ ফরাসী আলোচকগণের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে আর্টের নূতন প্রশ্নগুলি উত্থাপিত ক'রেছেন। কিছুকাল আগে আফ্রিকার আর্ট সম্বন্ধে *Burlington Magazine*-এ একটা আলোচনা বের হয়। যাঁরা লঘুভাবে আর্ট আলোচনার ধৃষ্টতা সম্বরণ ক'রতে পারেন না, তাঁদের এ-রকম একটা আলোচনা দেখে বোঝা উচিত বিষয়টি কত বিচিত্র ও গভীর।

ললিত-কলার ভিতর যা' মুখ্যবস্তু তা'কে প্রবহমান ক'রতে, রস-ছন্দের ভিতর তা'কে দীপ্যমান ক'রতে, একটা আশ্রয় বা উপলক্ষ্যের প্রয়োজন হয়। সেইটাকেই বড় ক'রে তুলে বাহবা দিতে তরলমতি অজ্ঞ সমালোচকের বিশেষ উৎসাহ। এ-দেশে কলা-সমালোচনা এই শীর্ণতা ও অন্ধকূপগত জর্জ্জরতা হ'তে আত্মরক্ষা ক'রতে মোটেই পারছে না। তা'র কারণ যাঁ'রা এখানে সমজ্‌দার ব'লে খ্যাত, তাঁ'রা গৌণ ব্যাপারকে মুখ্য সাব্যস্ত ক'রে অসঙ্কোচে নিজের সমস্ত উদ্ভট মতামত প্রকাশ ক'রতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন না। মানুষের ছবি, পশুপক্ষীর প্রতিকৃতি বা ফুলফলের চেহারা এ-সব হচ্ছে শিল্পীর রসবিন্যাসের আধার ও উপলক্ষ্য; এ-সবের ভিতর দিয়ে রসব্যঞ্জনা লীলায়িত হয় ব'লে তাদের আকারগত ঐক্যকে দৃঢ়মুষ্টিতে ধ'রে রাখার উৎসাহ অরসিকের পক্ষেই সম্ভব। এই আধার বা উপলক্ষ্যকে আশ্রয় ক'রে অসীম রূপাবর্ত্ত হিল্লোলিত করা হ'য়ে থাকে, নানা শিল্পী রূপের নানা বিশিষ্টতার ভিতর সৌন্দর্য্যের সোনার হরিণকে ধ'রতে চেষ্টা করেন। গোড়াকার এ-কথাটি মনে রাখ্‌লে নানা দেশের কাব্য ও কলার রসভোগ-চেষ্টা সহজ হ'য়ে আস্‌বে। একজন রসবেত্তা তাই চিত্রকলার ভিতর এ-সমস্ত উপলক্ষ্যগত আবর্জ্জনা লক্ষ্য ক'রে বলেছেন—"Painting has been a bastard Art—an agglomeration of literature religion, photography and decoration".

এ-সব রসসম্পর্ককে তলিয়ে দেখ্‌বার ধৈর্য্য-শক্তি এ-দেশে অল্পই পাওয়া যায়। এ-দেশের প্রাচীন কলা-সমালোচকেরা এই সমস্ত গূঢ় তথ্য যে অনুধাবন করেননি তা' নয়, তবে সে-সব দুর্ব্যাখ্যার পঙ্কে মজ্জিত হ'য়েছে এ-কালের ধৃষ্ট তার্কিকের হাতে। এ-দেশের কাব্যসমালোচকেরাই এক সময়ে ব'লেছেন—"রসাত্মক বাক্যই কাব্য" —অর্থাৎ বাক্যটি কাব্য নয়—সেটা একটা অবান্তর উপলক্ষ্য মাত্র। বাক্য ছাড়া কবিতায় এমন কিছু আছে, এমন কোন রসলীলা আছে, যা' কাব্যকে সার্থক ক'রে তোলে। চিত্রকলা-সম্পর্কেও এ-রকমের একটা অন্তর্নিহিত নিবিড় জ্ঞান আমাদের প্রাচীন কলাবিদ্‌গণের ছিল। চিত্রকলা-প্রসঙ্গে

রূপতত্ত্ব ও রূপসৃষ্টি

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

যা'কে 'রূপভেদ' বলা হয়, তা'র ভিতরেও যে এই তথ্যটি আছে, তা' কেউ এখনো ভাল ক'রে ধ'রতে পারেনি। রূপের সংজ্ঞায় বলা হ'য়েছে, ভূষণের সাহায্য ছাড়াও যা'তে অঙ্গাদি অলঙ্কৃত হয় তা' হচ্ছে রূপ। তা' হ'লে এটা হচ্ছে শিল্পীর একটা রসাত্মক লীলারোপ যা' বিভিন্ন শিল্পীর হাতে নিত্য নূতন হিল্লোলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে।

সব দেশ সব সময়ে আর্টকে এ চোখে দেখ্‌তে পারে নি। আমাদের দেশে সম্প্রতি শিল্পকলা সম্বন্ধে যে যৎসামান্য আলোচনা চ'ল্‌ছে তা'র মূলে একটা বিভ্রান্তি কাজ ক'রছে—যে ভুলের জন্য আলোচকদের সমস্ত চেষ্টা পণ্ড হচ্ছে ব'লে আমার বিশ্বাস। আর্ট জিনিষটা বিজ্ঞানের ফরমায়েস নয়, তা'তে জ্যামিতিক বা গণিত সম্পর্কীয় 'ফরমুলার' শাসন খাটে না। এই গোড়াকার কথাটি সকলের ভাল ক'রে হৃদয়ঙ্গম করা দরকার। ব্যবসা-বাণিজ্যের খাতিরে এক রকমের যন্ত্রগত আর্ট আধুনিক অর্থনীতির আনুকূল্যে জন্মলাভ ক'রছে; কলে-বাঁধা গানের মতো, তেলের বিজ্ঞাপন বা চায়ের জয়ডঙ্কা বাজান হ'তে আরম্ভ ক'রে ড্রইং রুমের শোভা বৃদ্ধির জন্য কেমিক্যাল আয়োজনের প্রাচুর্য্যতাকে এ-যুগে অনিবার্য্য ক'রে তুলেছে! এ-সবের রুদ্ধ অন্ধকূপের ভিতর কলালীলার প্রত্যাশা কেউ করে না। অথচ এ-সবের প্রগল্‌ভতা দেখে কেউ কেউ ভুল ক'রে বসেন যে, বাঁধা নিয়মে যেমন এ-সব হচ্ছে সেকালের আর্টও নিশ্চয়ই সেই রকম বিধিবদ্ধ নিয়মের সাহায্যেই হ'য়েছে। মনে রাখ্‌তে হবে কলাসম্পৃক্ত যে-সমস্ত বিধি-নিষেধ (Canon) হয়েছে—সে সব Canon দিয়ে আর্ট হয়নি, ব্যাকরণ বা ছন্দের পরিমিত বন্ধনেও কবিতা হয়নি। ব্যাকরণ ও কলা-লক্ষণ বুঝ্‌তে হ'লে কাব্য ও চিত্রের মূলধর্ম্ম, বা Philosophy of Art বুঝ্‌তে হবে। সৌন্দর্য্যের একটা স্বকীয় ধর্ম্ম আছে, কিন্তু সেটা বাইরের বিধানের তরঙ্গকে অনেক সময় তুচ্ছ করে,—কারণ ধর্ম্ম ও বিধান 'দু'টি স্বতন্ত্র জিনিষ।

ভুল বিধানও নানা জায়গায় অনেকে দিয়ে গেছে,—কারণ যা'রা বিধান দিয়েছে, অনেক সময় তা'রা নিজেরাও সৌন্দর্য্যের গূঢ়তত্ত্ব জান্‌ত না। এ-রকমের বাইরের ক্ষুদ্র বিধানকে যে-সব জাতি পরমার্থ মনে ক'রে দুর্ব্বার ও অপরিহার্য্য ক'রে তুলেছিল, তা'রা আজ শাপগ্রস্ত হ'য়ে সৌন্দর্য্যলোকচ্যুত হ'য়েছে, জীবনের ছন্দ-ছিন্ন হ'য়ে তা'রা জাতিহিসাবে পৃথিবীর ইতিহাসে লুপ্ত হয়ে গেছে। গ্রীক জাতি হচ্ছে এ-রকমঅবস্থার একটা উৎকট নমুনা। Canon of Polycletes হ'ল তাদের মৃত্যুপাশ—ঐ 'ক্যাননে' আট্‌কে গিয়ে গ্রীক-হৃদয় শুকিয়ে মারা গেল।

এ-যুগেও এ-রকমের একটা মস্ত ভুল পশ্চিমের ঘাড়ে চেপে ব'সেছিল—সিন্ধবাদের মত। পশ্চিম তা'তে শীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল; সে বোঝা যদি তা'র স্কন্ধ থেকে না নাম্‌তো, তবে রসক্ষুধা-জর্জ্জরিত হ'য়ে এতদিনে পশ্চিম কঙ্কালসার হ'য়ে প'ড়্‌ত! সৌভাগ্যের বিষয় য়ুরোপ এ-যুগে এসিয়ার শিল্পসম্পদের সঙ্গে নবজাত ঘনিষ্ঠতার ভিতর এমন নূতন দীক্ষা পেয়েছে, যা'র ফলে তা'র সমস্ত শিল্পরচনা ক্রমশঃ সমগ্র বিধি ও বিধানকে ধূলিসাৎ ক'রে একটা নূতন জীবন ও রূপমাল্য লাভ ক'রেছে। হিরোসিগে ও হোকুসাই হ'তে যে সম্পদ য়ুরোপ লাভ ক'রেছে, তা' বিস্তৃত ও ব্যাপক হ'য়ে, এ-যুগের Neo-Romantic আর্টকে জন্মদান ক'রেছে—যা'র ভিতর গ্রীক্ ও রেনেসাঁস্ আর্টের মারাত্মক আদর্শের সংস্পর্শ মোটেই পাওয়া যাবে না। শিল্পসৌন্দর্য্যের স্বধর্ম্মের খাতিরেই য়ুরোপের প্রিয়তম গ্রীক বিধান এ-যুগে পঞ্চত্ব লাভ ক'রেছে! ভারতবর্ষে নানা যুগের ভাস্কর্য্য এবং বৃহত্তর ভারতবর্ষের কলাসম্পদ আলোচনা ক'র্‌লে দেখা যাবে Canon of Polycletes-এর মত অমন কঠিন নাগপাশ এ দেশে ছিল না। যা' কিছু ছিল, তা'র ভিতর স্বাধীনতার প্রচুর অবসর ছিল; এজন্য বৌদ্ধযুগ, গুপ্তযুগ, জৈনযুগ বা তান্ত্রিকযুগের মূর্ত্তিপর্য্যায় অপরূপ বৈচিত্র্য লাভ ক'রেছে!

সৌন্দর্য্যতত্ত্বপ্রসঙ্গে একটা গভীর একাত্মকতা লক্ষ্য না কর্‌লেও আর্টের আলোচনা নিষ্ফল হবে। সৌন্দর্য্যের প্রকাশগত (Expression) বৈচিত্র্যের ভিতর একটা মস্ত বড় ঐক্য হ'চ্ছে যে, তা' মানুষের বুদ্ধিমূলক সভ্যতাকে জন্মদান করে না; এজন্য তা' একান্তভাবে ঐশ ব্যাপার।

কাজেই কোনো দেশেই সৌন্দর্য্যরচনার প্রেরণা সম্বন্ধে বাহাদুরী করা চলে না। সমগ্র কলালীলাই এক অখণ্ড অব্যক্তের রূপদীপালি। তা'তে উচ্চ নীচ ভেদ করা চলে না। আর্টের ভিতর "মিশরত্ব", "ইটালীয়ত্ব" "জাপানীত্ব" বা "ভারতীয়ত্ব" মুখ্য ব্যাপার নয়, কারণ আর্ট এক এবং অদ্বৈত। এ-কথা ভুলে গেলে চল্‌বে না যে, যে-কারণে মিশরের মূর্ত্তিশিল্প চমৎকার, জাপানী কলা পেলব ও মনোহর, ভারতীয় রচনা অনবদ্য ও রোমাঞ্চকর, সে-সব কারণ এক এবং অখণ্ড। বৈচিত্র্য সত্ত্বেও এ-সবের মূলতত্ত্ব একই। ললিত-কলার আসল যা' আকর্ষণ, তা' দেশকালের বস্তু ও বুদ্ধিগত আবর্জ্জনাকে ছাড়িয়ে চলে। আর্ট অখণ্ড হ'লেও দেশগত যে আখ্যা তা'কে দেওয়া হয়, তা' ঠিক সৌন্দর্য্যমূলক নয়, তা' অনেকটা ইতিহাসগত বা ভৌগলিক।

ললিত-কলা জিনিসটি কোনো বিশেষ দেশের বা কালের একচেটিয়া ব্যাপার নয়, কাজেই সমস্ত দেশ ও কালের শিল্পরচনার ভিতর যে সমান ধর্ম্মটি আছে, বস্তুর দিক হ'তে (objective) সেটিকেই শিল্পরচনার প্রাণ মনে ক'রতে হবে।

মিশর-শিল্পে Lady Nophreh-এর একটা সুপরিচিত মূর্ত্তি আছে। ফার্গুসন এ-মূর্ত্তি সম্বন্ধে বলেন "Nothing more wonderfully truthful and realistic has been done since that time till the invention of Photography"। অথচ এই মূর্ত্তির চতুঃসীমার ভিতর মিশর নিজেকে আটকে রাখেনি। যাঁরা সম্রাট খাফ্রাঁর মূর্ত্তি দেখেছেন, তাঁরা জানেন, শিল্পীর লীলা শিল্পশাস্ত্রের সমস্ত বিধিবিধানকে কোথায় সহজে ও স্বচ্ছন্দে ছাড়িয়ে যায় এবং কেন যায়। শিল্পহিসাবে প্রথম মূর্ত্তিটির মূল্য সামান্য, তা' কবরের ভিতর রাখ্‌বার জন্য নকল মূর্ত্তি হিসাবে রচিত হ'য়েছিল, আর্টের খাতিরে বাইরে রাখ্‌বার জন্য নয়। খাফ্রাঁর মূর্ত্তি একটা নূতন form, তা' মিশর-হৃদয়ের নিবিড় ব্যাকুলতা ও স্বপ্নকে জমাট ক'রে বিশ্বসভায় সাক্ষ্য দিচ্ছে প্রাচীন মিশরের সৌন্দর্য্যবোধের।

যে চৈনিক শিল্পীরা আশ্চর্য্যভাবে সৃষ্টির নকল-করা ভূচিত্র রচনা ক'রেছে, তা'রা যে কত অসম্ভব জন্তু জানোয়ারকে রেখার অখণ্ড লালিত্যের ভিতর জন্মদান ক'রেছে, তা'র আর ইয়ত্তা নেই। Dragon, Phœnix প্রভৃতি কত অবাস্তব প্রাণীকে যে তা'রা বর্ণ ও নিয়ন্ত্রিত রেখার হিল্লোলে বিকশিত ক'রেছে, তার ঠিকানা নেই এবং এ-যুগেও সে-সব কল্পিত জীবকে উপলক্ষ্য ক'রে যে অনির্ব্বচনীয় সুষমা সঞ্চার করা হ'য়েছে তা' আমরা উপভোগ ক'রছি। যে চীন জাতি একেবারে চূড়ান্ত Realistic ভূচিত্র এঁকেছে সে জাতিরই শিল্পী Kuo-Hsi যে ভূচিত্র এঁকেছেন—তা'ত একেবারেই নকলনবিশী realism নয়। Sung Dynasty-র সময় যে আশ্চর্য্য মরাল অঙ্কিত হ'য়েছে তা' একেবারে realistic। অথচ চৈনিক চিত্তই Lu-Tan-Wei-র অনুকরণে যে' সিংহ ও বর্ব্বর' এঁকেছে তা' একেবারে অন্য রকম। বাস্তব সিংহের সঙ্গে তা'র বিন্দুমাত্র মিল নেই—তা' একেবারে decorative বা আলঙ্কারিক।

যে জাপানী চিত্ত কোনো কোনো বিষয়ে অনুকরণপ্রিয় —ললিত-কলায় সেই চিত্তই বার বার স্বাধীন স্বপ্নকে রচনা ক'রেছে। তা'র শিল্পরচনায় সে-কথার ভূরিভূরি প্রমাণ রয়েছে। মানসলীলার এই প্রচুর স্বাধীনতাই জাপানকে বাঁচিয়ে রেখেছে এবং জাপানী আর্টের নব নব রূপরচনাকে জগতের সৌন্দর্য্যমেলায় বিশিষ্ট স্থান দিয়েছে।

ভারতবর্ষের ললিত-কলার কথাও প্রসঙ্গক্রমে এসে প'ড়্‌ছে। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতশিল্প সম্বন্ধে অতি সামান্য আলোচনাই হয়েছে। যাঁ'রা ভারতবর্ষের হৃদয়ের কথা অতি অল্পই জানেন তাঁ'রাই হঠাৎ একদিন প্রশংসার ডমরু বাজিয়ে উঠ্‌লেন। ধ্যানী বুদ্ধের মূর্ত্তিকে সে-দিন মাত্র Sir George Birdwood "Suet-pudding"-এর সঙ্গে তুলনা ক'রেছেন। আবার অপর দিকে একদল সমালোচক মূর্ত্তিটির ভিতর একটা অপূর্ব্ব অধ্যাত্ম-শ্রী আবিষ্কার ক'রে ব'সেছেন। এক সময় এ রকম 'আধ্যাত্মিক সমালোচনা'র খুব দাম ছিল, কিন্তু কলাকে একটা আধ্যাত্মিকতার কূট-জালে ফেলে কা'কেও চমৎকৃত করা এ-যুগে সম্ভব হচ্ছে

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

না। Art হচ্ছে সৌন্দর্য্যের স্বপ্রকাশ স্বরূপ ; যে পরিমাণে তা' ধর্ম্মগত ভাবের গূঢ় ব্যঞ্জনা বা রূপকাত্মক, সে পরিমাণে তা' আর্টের বাইরের জিনিষ—এই হচ্ছে আর্টের ক—খ—গ। কাজেই আদিকালের এ-সব ব্যাখ্যা সম্প্রতি পদ্মপত্রে জলের মত অনিশ্চয়তার উপর দুল্‌ছে।

মোট কথা, এখনো ভারতীয় আর্টের একটা স্বরূপগত ব্যাখ্যাই কেউ দিতে পারেনি। এজন্যই কোন জর্ম্মণ পণ্ডিত ব'লেছেন :—"Indian Art is the most rich in riddles among the arts of many nations"।

ভারতীয় আর্টের নানা যুগের নানা স্তরে অনেক কিছু অনুধাবন কর্‌বার আছে। যাঁরা এ-পর্য্যন্ত তা'র ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা ক'রেছেন, তাঁ'দের বেহুঁস ভ্রান্তি ব্যাপারটিকে আরও জটিল ক'রে তুলেছে। যাঁরা সৌন্দর্য্যতত্ত্ব জিনিষটা কি তাই জানেন না,—তাঁরাই এত কাল ভারতীয় আর্টের গুরুগিরি করবার প্রগল্‌ভতা ক'রেছেন। দুঃখের বিষয় নিন্দা অপেক্ষা প্রশংসা করা অনেক সময় কঠিন। রাস্‌কিন্ টার্ণার-এর চিত্রকলাকে বাড়িয়ে তুলে পাঁচ ভ'লুম বই লিখে ফেল্লেন। শেষে যখন দেখা গেল যে, প্রশংসাটি অবান্তর ও ভ্রান্ত ভিত্তির উপর নিহিত, তখন টার্ণার-এর আর্টে বাস্তবিক যে বহুমূল্য সম্পদ আছে সে সম্বন্ধেও সকলে এমন অন্ধ হ'য়ে প'ড়লো যে, টার্ণারের দাম একেবারে ক'মে গেল।

ভারতীয় আর্টের যথার্থ সম্পদ কোন্ ভিত্তির উপর স্থাপিত তা' দেখ্‌তে হবে। সৌভাগ্যক্রমে সকলেই এখন স্বীকার ক'রছেন, যে ভারতীয় আর্টের আলোচনার 'ক'-'খ'-'গ'-ও বাস্তবিক সূচিত হয় নি। পণ্ডিতেরা ব'লেছেন যে প্রায় প্রত্যেক সন্ধিস্থলে বিপরীত ও প্রতিরোধী মতামত উপস্থাপিত করা হ'য়েছে। এ অবস্থায় ভারতীয় আর্ট সম্বন্ধে একটু পরিষ্কার আলোচনা হওয়া নিতান্ত দরকার।

"ইণ্ডিয়ান আর্ট" নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রতে গিয়ে পশ্চিমের পণ্ডিতেরা অনেক জায়গায় বেশ একটু ঠেকেছেন,——যেমন ভারতীয় মূর্ত্তির বহুসংখ্যক মুখ ও হস্তের প্রাচুর্য্য দেখে। এইখানে এসে নানা মুনি নানা মত দিয়েছেন—অথচ কোন মতের উপরই কারুর আস্থা নেই। হ্যাভেল্ সাহেব হ'তে আরম্ভ করে বৈদিক পণ্ডিত ম্যাক্‌ডোনেল, কুমারস্বামী পর্য্যন্ত এবং আধুনিক অনেক চুণোপুঁটি ঐখানে এসে বিষম খট্‌কায় প'ড়েছেন। অথচ এই বহুবাহুত্ব, বহুশীর্ষত্ব ভারতীয় আর্টের একটি corner-stone ; ওটাকে উপেক্ষা করা বা উড়িয়ে দেওয়া সহজ নয়। অথচ য়ুরোপ ওটাকে এবং আরও অনেক কিছুকে কোনরকমেই গ্রহণ ক'রতে পারেনি।

সে যাই হোক্, এই ভারতীয় আর্টের ভিতর নানা স্তর ও পর্য্যায় দেখ্‌তে পাওয়া যায়। ভারতের বিচিত্র মনস্তত্ত্ব তা'তে প্রতিফলিত হ'য়েছে। এত বিচিত্র রূপমাল্য কোন শিল্পই মানব জাতিকে দিতে পারেনি। সৌন্দর্য্যের বিশুদ্ধ প্রকাশের দিক্ হ'তে ব্যাপারটি বিস্ময়জনক ব'লতে হবে। ভাস্কর্য্যে ও চিত্রকলায় নানারকমের বিপরীত পদ্ধতিও দেখ্‌তে পাওয়া যায়। স্বভাববাদের দিক্ হতে সাঁচিতে প্রাপ্ত যক্ষিণী-মূর্ত্তি চমৎকার, কিন্তু যক্ষ-মূর্ত্তিতে হয়ত সে-রকম রীতি রক্ষিত হয়নি। চমৎকার স্বভাবানুগ হস্তী-মূর্ত্তি যেমন রয়েছে, তেমন কল্পিত অনেক জান্তব-মূর্ত্তিও ভারতীয় শিল্পে পাওয়া যাবে। যে-সব সাহেবেরা সেকেলে গ্রীকভঙ্গী ছাড়া আর কিছুই সহ্য করতে পারেন না, তাঁরাও ময়ূরভঞ্জে নবাবিষ্কৃত ভারত-শিল্পের নমুনা দেখে স্তব্ধ হ'য়ে যাবেন। অজন্তার শিল্পী একটা মনোহর মধ্যপথ রক্ষা ক'রে রেখাভঙ্গীর উল্লসিত লীলায় আত্মহারা হ'য়েছেন। পরিচিত জগৎকে অমন decorative দিক্ হ'তে রচনা করা কোন শিল্পেই পাওয়া যাবে না।

শিল্পের ইতিহাসে কোথাও সহজে শিল্পী নিজের কলালীলাকে কোনো বিশেষ মার্গে আবদ্ধ করেননি। য়ুরোপ এক সময় একটা কঠোর 'ক্যাননকে' fetish ক'রে তুলে নিজের কলালালিত্যকে ধ্বংস ক'রতে উদ্যত হ'য়েছিল। বৈজ্ঞানিক যুগের নিয়মতন্ত্রতায় প্রলুব্ধ হ'য়ে রাস্‌কিন্‌প্রমুখ ভাবুকগণ সৌন্দর্য্যের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে সুরু ক'রেন এবং সৌন্দর্য্য-রচনার বিধি উপস্থাপিত ক'রতে প্রয়াস পান। য়ুরোপে তখন Classic ও High Renaissance আদর্শকে একমাত্র মানদণ্ড ক'রে জগতের যাবতীয় শিল্পসম্ভারকে পরিমাপ করা হয়। সে-

দিন আজ চ'লে গেছে,—এখন সে বাতিক দু'চার জন প্রত্নতাত্ত্বিক ছাড়া আর ক'ারও নেই। এখন য়ুরোপে স্বীকৃত হয়েছে—"Criticism of European Art suffers from the exaggerated position given to the Classical and High Renaissance ideal as universally authenticated standard of Art".

য়ুরোপ যা' ছেড়ে ছেঁড়া কাগজের চুব্‌ড়িতে ফেলে দিয়েছে, মধ্য-ভিক্টোরীয় যুগের আরও নানা ভাবগত আবর্জ্জনার সঙ্গে তা' এ-দেশের প্রায় সকলকেই পেয়ে বসেছে। এ-রোগ ছাড়ানো দুঃসাধ্য হয়েছে। এমন কি কেউ কেউ এ-দেশের প্রাচীন সৌন্দর্য্যতত্ত্বাদিও এই আদর্শের সঙ্গে একাত্মক ব'লে কূটব্যাখ্যা দিতে সুরু ক'রেছেন। তত্ত্বের ও ব্যবহারের দিক হ'তে যা য়ুরোপে বর্জ্জিত হয়েছে, য়ুরোপের সে-সব মতকে পরমার্থ জ্ঞান ক'রে প্রাচীন কলাশাস্ত্রকে ব্যাখ্যা ক'রতে যাওয়ার ভিতর যে পরম পরিহাস লুক্কায়িত আছে তা' তাঁ'রা খেয়াল ক'রে দেখ্‌ছেন না। য়ুরোপের আম্‌দানী রাজনীতির ও ধর্ম্ম-নীতির অনেক প্রাচীন ভূত এ-দেশের ঘাড়ে চেপেছে— যদিও পশ্চিমে সে-সব সম্প্রতি অনেক রূপান্তর লাভ ক'রেছে— কিন্তু কলাতত্ত্বের এ ভূত সহজে যে এ-দেশকে ছাড়বে তা' মনে হয় না। একটা কথা চলিত আছে, যে জর্ম্মণীতে যা' আবিষ্কৃত হয় ইংলণ্ডে পৌঁছতে তা' নাকি পঞ্চাশ বছর লাগে এবং ইংলণ্ডে যা' আলোচনা হয় তা'র খবর এ-দেশে পৌঁছতে নাকি আরো পঞ্চাশ বছরের প্রয়োজন হয়। কলা-আলোচনার দশাও তাই হ'য়ে প'ড়েছে। এ-রকম অবস্থায় ভারতের বা অন্য কোন দেশের আর্ট-অনুধ্যানের দুশ্চেষ্টা যে শিল্পরহস্য-সন্ধানের পথ কণ্টকিত ক'রে তুল্‌বে তা' আর বিচিত্র কি?

একটা সহজ কথা হ'চ্ছে—পারস্য, মিশর, জাপানী, চৈনিক ও ভারতশিল্প প্রভৃতির ভিতর শিল্পাত্মক একটা সমধর্ম্মতা আছে—যা' না থাক্‌লে এ সমস্ত আর্টই হ'ত না। এ-টুকু মেনে নিলে দেখা যাবে আর্টে ফটো-গ্রাফিক হুবহুত্ব একটা neutral point মাত্র—ওটাকে অতিক্রম ক'রেই সব জায়গায় শিল্পীর কলালীলা হিল্লোলিত হ'য়েছে। দুনিয়ার যে রূপটাকে প্রাকৃতিক বলা হয়, সেটা বাঁধা গৎ-এর মত রসহীন ও হিল্লোলবর্জ্জিত; তা' কঙ্কালের মত সুদৃঢ়, মাংসপেশীর তরঙ্গায়িত বেপথু তা'তে আশা করা বৃথা। মানুষের সৌন্দর্য্যসাধনা এ-রকমের বাঁধা রূপকেও সহ্য ক'রছে, কারণ সে রূপও মানুষের মনের ভিতর দিয়ে ফলিত হ'য়ে বাঁধন হারায়,—"লাখ লাখ যুগের" স্পর্শ তা'র ভিতর দিয়ে সংক্রামিত হ'য়ে ওঠে। বন্ধনের রুদ্ধ অর্গলের ভিতর সীমাহীন রন্ধ্র আবিষ্কার ক'রে মানুষ জগৎকে অসীমভাবে নবীন ক'রতে পারে,—তাই মানুষ ও-রকমের সংস্পর্শকে হৃদয়ের পরশ-পাথরে ওলট্‌-পালট্‌ ক'রে তৃপ্তি পেয়েছে। সৌন্দর্য্যের শত ছন্দে আশ্রিত হ'য়েই মানুষের হৃদয়-বেপথু বাইরের বিচিত্র রূপরেখাকে জন্মদান ক'রে লীলায়িত হয়, কোথাও আট্‌কে থাক্‌তে চায় না।

সংক্ষেপে ব'ল্‌তে হয়—মানুষ যা' মুহূর্ত্তের জন্য পাচ্ছে তা'তে ডুবে সে তৃপ্তি পায় না, অসীম সংসারে বর্ণ, গন্ধ, ছন্দ তা'র ভিতর পুলকিত ছায়া ফেল্‌ছে অহরহ, সে-সব তা'কে সীমার বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। মানুষ যেমন সসীম, তেমন অসীমও। এই অসীমতার সম্পর্কে মানুষ যা' সৃষ্টি ক'রে তাই হচ্ছে Aesthetic—তা' অখণ্ড এবং এই সংস্কারের প্রেরণা দেশ ও কালের বাইরের জিনিস।

সৌন্দর্য্যের এই সংস্কারগত প্রকাশ বা expression—শুধু জীবনের বন্ধনের দিক নয়, তা মুক্তির দিক্‌কেও এমনিভাবে উদ্ঘাটিত করে।

এ সত্য সকল আর্টেই প্রমাণিত হবে। তত্ত্বের দিক্ হ'তে নূতন সৃষ্টির কর্ত্তৃত্ব মানুষের আছে স্বীকার ক'র্‌তে হবে এবং প্রকাশের দিক্ থেকে শিল্পীর নিরঙ্কুশ প্রয়াণ লক্ষ্য ক'রে নিজকে আশ্বস্ত ক'র্‌তে হবে।

"রক্তকরবী"র তিন জন

শ্রী অন্নদাশঙ্কর রায়

"রক্তকরবী"র নন্দিনীকে সবার চেয়ে কে বেশি ভালোবাস্ত? রঞ্জন, না কিশোর, না বিশু-পাগল? বলা যায় না,—কিন্তু নন্দিনী কা'কে সব চেয়ে ভালোবাস্ত তা' বলা যায়। রঞ্জনকে।

রঞ্জনের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় নেই। তা'কে আমরা দূর থেকে চিনি, নন্দিনীর প্রেমের ভিতর দিয়ে, সর্দ্দারদের সশ্রদ্ধ আতঙ্কের আড়াল থেকে। এই রঞ্জন কাব্যবিধাতার এক অপরূপ সৃষ্টি;—না আছে তা'র ভয়, না আছে সংকোচ। "দুই হাতে দুই দাঁড় ধ'রে সে তুফানের নদী পার ক'রে দেয়, বুনো ঘোড়ার কেশর ধ'রে বনের ভিতর দিয়ে ছুটিয়ে নিয়ে যায়; লাফ-দেওয়া বাঘের দুই ভুরুর মাঝখানে তীর মেরে তা'কে উড়িয়ে নিয়ে যায়।" সে যেন জমে-জমে-ওঠা ফুলে-ফুলে-ওঠা প্রাণ, বন্যার নদীর মতো উদ্বেলিত, ঝড়ের আগে বাতাসের আবেগের মতো উচ্ছ্বসিত। রাজার সর্দ্দারেরা তা'কে যক্ষপুরীর প্রাচীরের মধ্যে ধ'রে আন্‌ল, নিয়োগ ক'রল সুড়ঙ্গ খোদাই করার কাজে, আপন খেয়ালে ছুটে-চলা প্রাণকে তা'রা পুরল নিয়মের গণ্ডীতে, সুবিধা উৎপাদনের শৃঙ্খলায়। কিন্তু রঞ্জনের স্বভাবই স্বতন্ত্র। ছাঁট-কাট ক'রে সুবিধার উপযোগী-করা, যন্ত্রের ভিতর দিয়ে সমান ছাঁচে ঢালাই-করা, নম্বর লেবেল-আঁটা ক্লিষ্ট কৃপণ সংকীর্ণ প্রাণের মাঝখানে সে এল—তা'র বিচিত্র ব্যক্তিত্ব নিয়ে, শৃঙ্খলা-না-মানা, শাসন-তুচ্ছ-করা দুরন্ত সাহস নিয়ে, নদীকূলভাঙা বন্যাস্রোতের মতো বেপরোয়া বেহিসাবী অকারণ হাসির হিল্লোল নিয়ে। "ওদের মাঝখানে বিধাতা যদি খুব একটা হাসি হেসে ওঠেন, তা' হ'লেই ওদের চটক ভেঙে যায়। রঞ্জন বিধাতার সেই হাসি।" খোদাইকরদের মমির মতো প্রাণ সে এক নিমেষেই মাতিয়ে তুল্‌ল। সে ধ'রল গান, আর সেই গানের তালে প'ড়তে লাগ্‌ল হাজার হাজার কোদাল। হুকুম মেনে কাজ করা তা'র ধাতে সয় না, সে কাজ ক'রে চলে নিজের ভরপুর আনন্দের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেরণায়। তা'তে হয়তো শৃঙ্খলা থাকে না, কাজ কিন্তু এগিয়ে চলে বেশ। যক্ষপুরীর ইতিহাসে এ-হেন অঘটন এর আগে ঘটেনি। কাজেই লাল-ফিতের দল তা'কে শিকল দিয়ে ক'ষে বাঁধ্‌ল। কিন্তু প্রাণকে ধ'রে রাখ্‌বে কে? সে পিছ্‌লে বেরিয়ে এল। কথায় কথায় সাজ বদ্‌লে, চেহারা বদ্‌লে, লোক ক্ষেপিয়ে সে যখন সর্দ্দার-সম্প্রদায়কে নাস্তানাবুদ্‌ ক'রে তুল্‌ল, তখন রাজার সঙ্গে তা'র বলপরীক্ষা হ'য়ে গেল। প্রকাণ্ড একটা মেশিনের ঘায় মানুষ যেমন ক'রে গুঁড়িয়ে যায়—অনেক যুগের পুঞ্জীভূত শাসনশক্তির সংঘাতে প্রাণের হাসি তেমনি ক'রেই মিলিয়ে গেল।

কিশোর ছিল ছোট্ট একটি প্রাণ; যক্ষপুরীর প্রাচীর-ফাটলে চোখ-মেলে-চাওয়া তরুণ অশ্বত্থতরু;—বড় কচি, বড় কাঁচা। বসন্তের কোকিলটির মতো শুধু নামের নেশায় সে বার বার নন্দিনীকে ডাকে—"নন্দিনী, নন্দিনী, নন্দিনী!" সে কাজে ফাঁকি দিয়ে নন্দিনীর জন্য ফুল তুলে আনে; তা'র একটিমাত্র গোপন কথার মতো তা'র এই ফুল তুলে আনা অভ্যাসটি। নন্দিনী ভালোবাসে ব'লে সে দুর্গম ঠাঁই থেকে কষ্ট ক'রে খুঁজে-পেতে রক্ত-করবী ফুল এনে দেয়, নন্দিনীর জন্য যত বেশি দুঃখ পায় তত তা'র সুখ উথ্‌লে ওঠে! একদিন তা'র জন্যে প্রাণ দিয়ে দেবে এই ছিল তার সাধ,—একদিন দিলেও।

আর বিশু পাগল। সেও এক অপরূপ সৃষ্টি। দুঃখের আনন্দে সে গান গেয়ে বেড়ায়, কেউ জানে না কোথায় তা'র সত্যিকার ব্যথা। তা'র স্ত্রী তা'কে ছেড়ে দিয়েছিল তা'র দশার ফের দেখে, তাই লোকে ভাবে লোকটা স্ত্রীর অকৃতজ্ঞতায় বৈরাগী হ'য়ে উঠেছে। বিশুর ব্যথা কিন্তু

অন্য রকম। সে ভালোবাস্‌ত একজনকে, বিয়ে ক'রল অন্যকে। যে-দিন সে নন্দিনী-রঞ্জনদের খেলা ছেড়ে এক্‌লা বেরিয়ে গেল, সে-দিন যাবার সময় কেমন ক'রে নন্দিনীর মুখের দিকে তাকাল, নন্দিনী বুঝ্‌তে পারল না। তার-পর কতকাল খোঁজ পায়নি, শেষে যক্ষপুরীতে দেখা। হঠাৎ তার খেয়ে উড়ন্ত পাখী যেমন মাটিতে প'ড়ে যায়, একজন মেয়ে তা'কে তেমনি ক'রে যক্ষপুরীর ধূলোর মধ্যে এনে ফেল্‌ল। সে নিজেকে ভুলেছিল। "তৃষ্ণার জল যখন আশার অতীত হয় মরীচিকা তখন সহজে ভোলায়। তার পরে দিক্‌হারা নিজেকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না।" একদিন পশ্চিমের জানালা দিয়ে বিশু দেখ্‌ছিল মেঘের স্বর্ণপুরী, আর সে দেখ্‌ছিল সর্দ্দারের সোনার চুড়ো। বিশুকে বল্‌লে, "ঐখানে আমাকে নিয়ে যাও, দেখি তোমার সামর্থ্য।" বিশু স্পর্দ্ধা ক'রে ব'ল্‌লে, "যাবো নিয়ে।" আন্‌লে তা'কে ঐ সোনার চুড়োর নীচে। তখন বিশুর ঘোর ভাঙ্‌ল! আবার হ'ল নন্দিনীর সঙ্গে দেখা। এবার সেই পুরাণো প্রেম তা'র ঘুম ভাঙিয়ে দুঃখ জাগিয়ে দিল। নন্দিনী তা'কে "পাগল ভাই" ব'লে ডাকে, সাথী মনে করে। এইটুকু তা'র একটিমাত্র সুখ। নন্দিনীকে সে গান শুনিয়ে বেড়ায়। নন্দিনী বলে, "পাগল, তুমি যখন গান কর তখন কেবল আমার মনে হয়, অনেক তোমার পাওনা ছিল, কিন্তু কিছু তোমাকে দিতে পারিনি।" বিশু উত্তর দেয়, "তোর সেই কিছু না দেওয়া আমি ললাটে প'রে চ'লে যাব। অল্প কিছু দেওয়ার দামে আমার গান বিক্রী ক'রব না।"

এরা তিন জনেই নন্দিনীকে ভালোবাস্‌ত, আর নন্দিনীও ভালোবাস্‌ত তিন জনকেই। কিন্তু ভালোবাসার রকমফের থাকে। এদের ভালোবাসারও ছিল।

নন্দিনী যা'কে সত্যিকার ভালোবাসা দিয়েছিল, সর্ব্বস্ব দিয়েছিল,—সে রঞ্জন। তা'র দুরন্ত সাহস আর ফুলন্ত প্রাণের দ্বারা রঞ্জন তা'কে জয় ক'রেছিল, তা'দের "নাগাই নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়া স্রোতটাকে যেমন সে তোল-পাড় করে, নন্দিনীকে নিয়ে তেমনি সে তোলপাড় ক'রতে থাকে। প্রাণ দিয়ে সর্ব্বস্ব পণ ক'রে সে হার-জিতের খেলা খেলে।" সেই খেলাতেই সে নন্দিনীকে জিতে নিয়েছিল; অসাধারণ তা'র তেজ, তাইতেই সে নারীর হৃদয় জিতে নেয়। রঞ্জন যেন খানিকটা সন্দীপের মতো; কিন্তু সন্দীপের মধ্যে কামনা ছিল, পাবার ইচ্ছা ছিল, আর ছিল কামনার জোর, ক্ষুধার প্রচণ্ডতা। রঞ্জনের মধ্যে জোরটুকুই দেখি, কামনার আভাস পাইনে; প্রচণ্ডতা দেখি, ক্ষুধার সত্তা দেখিনে, তাই সে শেষ পর্য্যন্ত নারীকে পেল, আর সন্দীপ লোভের আতিশয্যে হারাল। তা' ছাড়া সন্দীপের পৌরুষে একটা ফাঁকি ছিল, তা' অসাধ্য-সাধনাকে ডরাত। সে ফলে বিশ্বাস ক'রত, তা'র কাজ করার মূলে থাকৃত ফলাকাঙ্ক্ষা। রঞ্জনের কাজ করা প্রাণের তাড়নায়,—সে ছিল তা'র লীলা!

তফাৎ যতই থাক্‌, রঞ্জন আর সন্দীপ সেই শ্রেণীর পুরুষ যা'রা স্বভাবত জেতা। নারীকে এরা জয় করে জয় করার আনন্দে। বাঘ যেমন শিকার নিয়ে খেলা করে প্রাণে মারবার আগে, এরাও তেম্‌নি হৃদয় নিয়ে ছিনিমিনি খেলে,—হয়ত পরমুহূর্ত্তেই তা'কে পায়ের তলায় গুঁড়িয়ে দিয়ে যাবে। এরা প্রচণ্ড সুন্দর, এরা আগুন, এদের বুকে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে পুড়ে মরা পতঙ্গের গৌরব, নারীর সৌভাগ্য। প্রাণের ওপর এদের দরদ নেই। হারাতেও যেমন দ্বিধা নেই, হার্‌তেও তেমনি দয়া নেই। ঝড়ের সঙ্গে এদের তুলনা করা চলে; বিরাট একটা নিশ্বাসের মতো এরা সমস্ত শক্তি নিয়ে আসে, ভাঙে, দোলায়, আঘাত করে, আর আপনাতে আপনি নিরুদ্দেশ হ'য়ে যায়। ঝড়ের পাখীরা এদের ভীষণতাকে ভালোবাসে; তাদের বুক কাঁপে পুলকে আর ভয়ে; আনন্দে আর আতঙ্কে তা'রা ম'রতে এগিয়ে আসে। আমাদের রঞ্জন ঠিক্‌ ঝড় নয়, আমাদের নন্দিনীও ঝড়ের পাখী নয়। সেও প্রাণের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে-চলা প্রাণ; সে কানায় কানায় ভরা প্রাণবতী স্রোতস্বিনী; সে ঝড়ের মেঘের বিদ্যুৎ।

পৌরুষ ব'ল্‌তে নন্দিনীরা যা' বোঝে তা' রঞ্জনদের মধ্যেই তারা পায়,—একটা প্রবল আকর্ষণ। যুগ-যুগান্তকাল পুরুষ নারীকে প্রবলভাবে চেয়েছে, প্রাবল্য

দিয়ে পেয়েছে, প্রাবল্যের দ্বারা রক্ষা ক'রেছে, নিজের ইচ্ছার প্রবলতা দিয়ে গ'ড়ে তুলেছে। তাই সে অভিভূত হয় এই অনেক-কালের-চেনা, বহুবার-চোখে-চাওয়া, প্রাণতরাসী প্রাণদোলানো পৌরুষ দেখে,—যে পৌরুষ প্রাণের মমতা রাখে না, প্রাণের মূল্য জানে না, প্রাণ দুই মুঠো ক'রে ধ'রে, দুই পা দিয়ে দলে। নারী তাই মালা হ'য়ে তা'র কণ্ঠে লতায়, ছিন্ন হ'লে পায়ে লোটায়। তা'র স্বার্থ প্রাণকে ঘর-বাঁধানো, মাঠ-চষানো, বশ-মানানো,—তা' সে ক'রেও এসেছে। তবু তা'র রক্তে রক্তে মিশে আছে প্রলয়-মেঘের সিঁদুরে-আভা দেখে আতঙ্কে আনন্দে শিহরণ।

রঞ্জন স্বভাবজয়ী, সে না চাইতে পেয়েছে, কিম্বা চাওয়ার ঢের বেশি পেয়েছে। কিশোর কিছুই চায়নি; শুধু দিয়ে ফেলেই তা'র সুখ। কিশোর কিছুই পায়নি; কিছু না পাওয়াতেই তা'র আনন্দ। নন্দিনীকে সে ভালোবাসে। তাই সর্ব্বস্ব দিয়ে ঐ ভালোবাসার মান রাখে। তা'র প্রেমের মধ্যে এমন একটু ছেলেমানুষী আছে যা' নন্দিনীকে কৌতুক দেয়—সঙ্গে সঙ্গে সে এই কচি প্রাণটির কল্যাণ-কামনায় উৎকণ্ঠিত হ'য়ে ওঠে। নন্দিনী তা'কে তেমন ক'রে ভালোবাস্‌তে পারে না, যেমন রঞ্জনকে ভালোবাসে। কিশোর শুধু একটুখানি স্নেহশঙ্কিত কল্যাণ-কামনায় আশীর্ব্বাদ উৎকণ্ঠাই পায়,—দিদির হাতের ভাই-ফোঁটার ফোঁটাটির মতো,—"ঘরে বাইরে"'র অমূল্য যা' পেয়েছিল। যেটুকু পায় সেটুকুও তা'র প্রাপ্যের অধিক, প্রাপ্য যে তা'র কিছুই নেই, সে শুধু নাম ধ'রে ডেকে সুখ পায়, প্রাণ দিয়ে আনন্দ পায়, ক্লেশ পেয়ে তৃপ্তি পায়।

জগতের চিরন্তন প্রেমিক এরা,—এই কিশোরের দল। প্রেমের মধ্যে নিহিত আছে এক প্রকার কৈশোর, এক প্রকার শ্যামলতা। তাই শ্রীকৃষ্ণ কিশোর, শ্রীরাধা কিশোরী। যে-প্রেম এদের মধ্যে মূর্ত্ত, এদের মধ্যে স্ফূর্ত্ত, সে-প্রেম সবুজ, সে-প্রেম কাঁচা। এদেরও প্রাণের ভয় নেই, এদেরও সাহস অসামান্য। কিন্তু এদের মধ্যে চোখ ধাঁধিয়ে দেবার সেই দীপ্তি নেই, প্রাণ ভুলিয়ে দেবার সেই নেশা নেই,—যা' রঞ্জনদের শতধা-উদ্ভিন্ন প্রস্ফুট যৌবন-শতদলের লোহিত-রাগের মধ্যে আছে। এদের ঐশ্বর্য্য নেই, আনন্দ আছে। রঞ্জনের প্রেমের রঙ্ রাঙা, রক্তকরবী যা'র প্রতিরূপক। কিশোরের প্রেমের রঙ্ সবুজ।

একটি মানুষ নন্দিনীকে গান শোনাবার আনন্দটুকু চেয়েছিল ও পেয়েছিল। সে বিশু-পাগল। সে দুখ্-বিলাসী, সে বিরহরসিক। তা'র দুঃখ কাছের পাওনাকে নিয়ে বাসনার দুঃখ নয়, দূরের পাওনাকে নিয়ে আকাঙ্ক্ষার দুঃখ। সে নন্দিনীকে ভালোবাসে ব'লেই তা'কে চায়নি। না, চেয়েছে বৈ কি! কিন্তু অন্তরের অন্তরালে। কিন্তু সে চাওয়া পরম চাওয়া, সবখানি চাওয়া। নন্দিনী কিন্তু তা' রঞ্জনকে দিয়ে রেখেছিল। বিশুর ভাগে তাই জ্যেষ্ঠের প্রতি কনিষ্ঠের প্রীতি। বিশু যে ব'লেছিল—"অল্প কিছু দেওয়ার দামে আমার গান বিক্রী ক'রব না",—সে কেবল আর একজন ব'ল্‌তে পারত, সে নিখিলেশ। বিশুর সঙ্গে নিখিলেশের মিল আছে। এরা পুরো পাওয়াটাকেই পছন্দ করে, তা' না হ'লে পুরো না পাওয়া-টাকে। নিখিলেশ তবু বিমলাকে পাবার জন্যে সাধনা ক'রেছিল, অপেক্ষা ক'রেছিল, আশা রেখেছিল। বিশুর তাও ছিল না, সে শুধু গোপনেই চাইত, প্রতিদানের প্রত্যাশা রাখ্‌বার মতো ধৃষ্টতা তা'র ছিল না, তাই তা'র দুঃখ নিখিলেশের চেয়েও বেশি। নন্দিনীর যে-রূপটি তা'র ভালো লেগেছিল—সে "দুখ্-জাগানিয়া"।

বিশু অনেক দুঃখ পেয়ে প্রেমের উদাসরূপ দেখেছিল। তা'র সুর ফসলকাটার সুর। তা'র ভালোবাসায় না আছে—কৈশোরের ভাবপ্রবণতা, দিয়ে-ফেলার উপ্‌চে-পড়া রস, নাম ধ'রে ডাকার স্বপ্নমদির নেশা, ক্লেশস্বীকারের অহেতুক ঝ'রে যাওয়া; না আছে যৌবনের প্রাণোচ্ছল বলদৃপ্ত সহজ-জয়ের কাছে-আনা, দূরে-ছুঁড়ে-ফেলা, বুকে-দোলানো, পায়ে-দলার ভাব। যৌবনের শেষ সোপানে দাঁড়িয়ে সে ত্যাগের অঙ্গে নেশা লাগায় না, ভোগের রাজ্যে বাহু বাড়ায় না। তা'র প্রেমে কিশোরের আবেশ বা রঞ্জনের স্বাচ্ছন্দ্য নেই, আছে একটি তপঃকরুণ উদাসমধুর ভাব। প্রেম পাবার ভরসা নেই, তাই জানাবারও সাহস নেই। সে যে

কত বেশি চায় তা' কেউ বুঝ্‌বে না, তাই নিষ্ফল আকাঙ্ক্ষার সুগভীর দুঃখ গানে গানে গালিয়ে ঝ'রিয়ে ছ'ড়িয়ে দেয়।

রবীন্দ্রনাথের মনের একটি কোণে যে উদাসীটি আছে সে তাঁর নানা রচনায় বিশুর মতো রূপ নিয়েছে,—সে এক নিত্যকালের ক্ষ্যাপা। তা'র "দশা দেখে হাসি পায়, আর কিছু নাহি চায়, একেবারে পেতে চায় পরশপাথর!" ব্যথার আনন্দে আপন-ভোলা, শুধু আনন্দ বেঁটে বেড়ায় সে, কোথাও ঠাকুরদাদা, কোথাও দাদাঠাকুর। সে "মুক্তধারা"র বৈরাগী, "ফাল্গুনী"র অন্ধ-বাউল; শান্ত-সমাহিত অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ, আপনাকে সে লুকিয়ে রাখে নিজের চারিপাশে গানের বায়ুমণ্ডল সৃষ্টি ক'রে। ধরা তো সে দেয় না, তাকে কেই বা বুঝ্‌বে, কেই জান্‌বে? তা'র গোপনতম কামনা, "তোরা যে যা বলিস্‌ ভাই, আমার সোনার হরিণ চাই।" তাই জ্ঞানীর কাছে সে সাজে সাধারণ, সাধারণের কাছে সমদরদী, সকলের কাছে পাগল। ফাগু-চন্দ্রার দল তা'র গানটুকুই নেয়, বাকীটুকু যা'র জন্যে সে তা'র খোঁজ রাখে না। তাই বিশুর মতো নিঃসঙ্গ আর কেউ নয়। সে সেই প্রেম, যা ধরা দেয় না, অপেক্ষা করে, ধ'রতে চায় না, ছাড়া দেয়। এর রঙ সবুজ নয়, রাঙা নয়, গৈরিক। কেননা, এর বোঁটা আল্‌গা হ'য়ে এসেছে।

নন্দিনী ভালোবাসে প্রাণের রঙ্‌,—সে রঙ্‌ সবুজে সবে উন্মেষিত হ'চ্ছে, গৈরিকে নিঃশেষ হ'তে চ'লেছে, রক্তেই তা'র পরিপূর্ণ প্রকাশ। গৈরিক ফসলকাটার রঙ্‌, পাকা ধানের রঙ্‌; সবুজ গজিয়ে ওঠার রঙ্‌, কাঁচা ধানের রঙ্‌। আর লোহিত আমাদের বক্ষের শোণিত,—যৌবন যা'কে নাচিয়ে ফেনিয়ে উথ্‌লিয়ে উপ্‌চিয়ে চলে। 'রক্তকরবী সেই রঙের নেশার রংমশাল। রঞ্জন তা'কে ভালোবাসে, নন্দিনী তা'কে সিঁথিতে পরে, কিশোর তা'কে আহরণ ক'রে এনে দেয়।

নন্দিনী কা'কে সব চেয়ে ভালোবাসে তা তো জান্‌লাম। কিন্তু নন্দিনীকে সব চেয়ে ভালোবাসে কে? রঞ্জন নয়। সে আপনাকেই ভালোবাসে, প্রাণের নেশায় প্রাণকেই বিলিয়ে বিলিয়ে যায়, হারিয়ে হারিয়ে পায়। বিশু নয়। তা'র চাওয়া অসামান্য চাওয়া, এই চাওয়াকেই সে ভালোবাসে, এরই মর্য্যাদা রাখ্‌বে ব'লে সে যেটুকু পায় নেয় না।

নন্দিনীকে সবার চেয়ে ভালোবাসে কিশোর। তা'রই প্রেমে পথে-চলার সুরটি বাজে, সে সুর চিরকালের চির-নূতন সুর। সে ডাকে, "নন্দিনী.. নন্দিনী...নন্দিনী...!" এই ডাকাই চরম। এ যে অকারণে ডাকা, নামের নেশায় ডাকা, সব-চাওয়া সব-পাওয়া ডাকার আনন্দে গ'লিয়ে দিয়ে ডাকা। বাঁশি কোন্‌ সুরে কাঁদে? সে কি "আমি চাই, আমি পাই"? এর আসল কথাই যে আমি! না, বাঁশি বলে—"তুমি! তুমি! তুমি"! শুধু নাম ধ'রে ডেকেই তা'র আনন্দ। চেয়েও নয়, পেয়েও নয়, শুধু ভালোবেসেই তা'র তৃপ্তি।



লেখন

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার লিখন ফুটে পথধারে
ক্ষণিক কালের ফুলে,
চলিতে চলিতে দেখে যারা তা'রে
চলিতে চলিতে ভুলে ॥

* * *

স্বপ্ন আমার জোনাকি,
দীপ্ত প্রাণের মণিকা,
স্তব্ধ আঁধার নিশীথে
উড়িছে আলোর কণিকা ॥

* * *

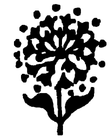
দিনের আলোক যবে রাত্রির অতলে
হ'য়ে যায় হারা
আঁধারের ধ্যাননেত্রে দীপ্ত হ'য়ে জ্বলে
শত লক্ষ তারা।
আলোহীন বাহিরের আশাহীন দয়াহীন ক্ষতি
পূর্ণ ক'রে দেয় যেন অন্তরের অন্তহীন জ্যোতি ॥

* * *

জীবন-খাতার অনেক পাতাই
এম্‌নিতরো শূন্য থাকে।
আপন মনের ধেয়ান দিয়ে
পূর্ণ ক'রে লওনা তা'কে।

"লেখন"

এই "লেখন"-গুলি কবি সুরু ক'রেছিলেন চীনে জাপানে। পাখায়, কাগজে, রুমালে তাঁকে কিছু লিখে দেবার জন্যে লোকের অনুরোধে এদের উৎপত্তি। তা'র পর দেশে ফিরেও এ-রকম লেখা তাঁ'কে অনেক লিখ্‌তে হ'য়েছে। এম্‌নি ক'রে এই টুক্‌রো লেখা-গুলি জ'মে ওঠে। এদের প্রধান মূল্য হাতের অক্ষরে ব্যক্তিগত পরিচয়ের, তাই জর্ম্মণীতে হাতের অক্ষর ছাপ্‌বার উপায় আছে খবর পেয়ে, কবিতাগুলি সব সংগ্রহ ক'রে, সেখান থেকে ছাপিয়ে আনা হ'য়েছে। শীঘ্রই এই কবিতা-সংগ্রহখানি পুস্তকাকারে বের হবে। আমরা কবির অনুগ্রহে তারি থেকে কতকগুলি কবিতা ছাপ্‌বার অনুমতি পেয়েছি। ছাপার অক্ষরে যে ব্যক্তিগত সংস্রবটি নষ্ট হয়, কবির হাতের লেখায় শুধু সেই সংস্রবটি নয়, তাঁ'র অন্যমনস্কতায় যে-সব কাটাকুটি ভুলচুক ঘটেছে, তা'র মধ্যেও ব্যক্তিগত পরিচয়ের যে আভাস রয়েছে, তাও পাওয়া যাবে "লেখন" প্রকাশিত হ'লে। কবিতাগুলির ইংরেজী তর্জ্জমাও বইখানিতে কবির হাতের লেখাতেই দেওয়া থাক্‌বে। খবরটা এখানে দিয়ে রাখ্‌লে বোধ হয় নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না, যে এই হাতের অক্ষর ছাপ্‌বার কল সম্প্রতি কল্‌কাতায় এসেছে ও তা'তে হাতের লেখা ও আঁকা ছবি অতি পরিপাটি ছাপা হ'চ্ছে। ভবিষ্যতে "বিচিত্রার" পাঠক-দের এই যন্ত্রে মুদ্রিত কবির হাতের-লেখা কবিতা চিত্র-পরিশোভিত ক'রে উপহার দেবার অভিপ্রায় রইলো আমাদের—
"বিচিত্রা"-সম্পাদক।



সেথায় তোমার গোপন-কবি
রচুক্ আপন স্বর্গছবি,
পরশ ক'রুক্ দৈববাণী
সেথায় তোমার কল্পনাকে ॥

* * *



দেবতা যে চায় পরিতে গলায়
মানুষের গাঁথা মালা,
মাটির কোলেতে তাই রেখে যায়
আপন ফুলের ডালা ॥

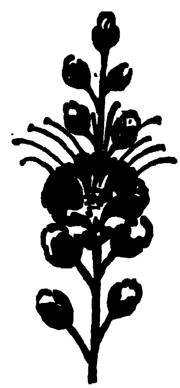
* * *

কুয়াশা যদি বা ফেলে পরাভবে ঘিরি
তবু নিজ মহিমায় অবিচল গিরি ॥

* * *

পর্ব্বতমালা আকাশের পানে চাহিয়া না কহে কথা,
অগমের লাগি ওরা ধরণীর স্তম্ভিত ব্যাকুলতা ॥

* * *



একদিন ফুল দিয়েছিলে, হায়,
কাঁটা বিঁধে গেছে তা'র।
তবু, সুন্দর, হাসিয়া তোমায়
ক'রিনু নমস্কার ॥

* * *



বসন্ত, তুমি এসেছ হেথায়
বুঝি হ'ল পথ ভুল।
এলে যদি তবে জীর্ণ শাখায়
একটি ফুটাও ফুল ॥

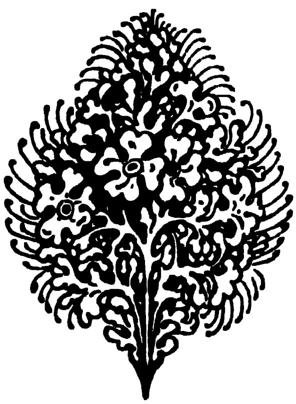
* * *

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



চলিতে চলিতে খেলার পুতুল খেলার বেগের সাথে
একে একে কত ভেঙে প'ড়ে যায়, প'ড়ে থাকে পশ্চাতে॥

* * *



শিখারে কহিল
হাওয়া,
"তোমারে তো চাই
পাওয়া।"
যেমনি জিনিতে চাহিল ছিনিতে,
নিবে গেল দাবী-
দাওয়া॥

* * *

দাঁড়ায়ে গিরি, শির
মেঘে তুলে,
দেখে না সরসীর
বিনতি।
অচল উদাসীর
পদমূলে
ব্যাকুল রূপসীর
মিনতি॥

* *

ভীরু মোর দান ভরসা না পায়
মনে সে যে র'বে কা'রো,
হয় তো বা তাই তব করুণায়
মনে রাখিতেও পারো॥



* * *

দেবমন্দির-আঙিনাতলে শিশুরা ক'রেছে মেলা,
দেবতা ভোলেন পূজারীদলে, দেখেন শিশুর খেলা।



সুন্দরী ছায়ার পানে তরু চেয়ে থাকে,
সে তা'র আপন, তবু পায় না তাহাকে

* * *

ওগো অনন্ত কালো,
ভীরু এ দীপের আলো,
তারি ছোটো ভয় ক'রিবারে জয় অগণ্য তারা জ্বালো ॥

* * *



আঁধার সে যেন বিরহিণী বধূ
অঞ্চলে ঢাকা মুখ,
পথিক-আলোর ফিরিবার আশে
ব'সে আছে উৎসুক ॥

* * *

হে মহাসাগর বিপদের লোভ দিয়া
ভুলায়ে বাহির ক'রেছ মানব-হিয়া।
নিত্য তোমার ভয়ের ভীষণ বাণী
দুঃসাহসের পথে তা'রে আনে টানি ॥

* * *



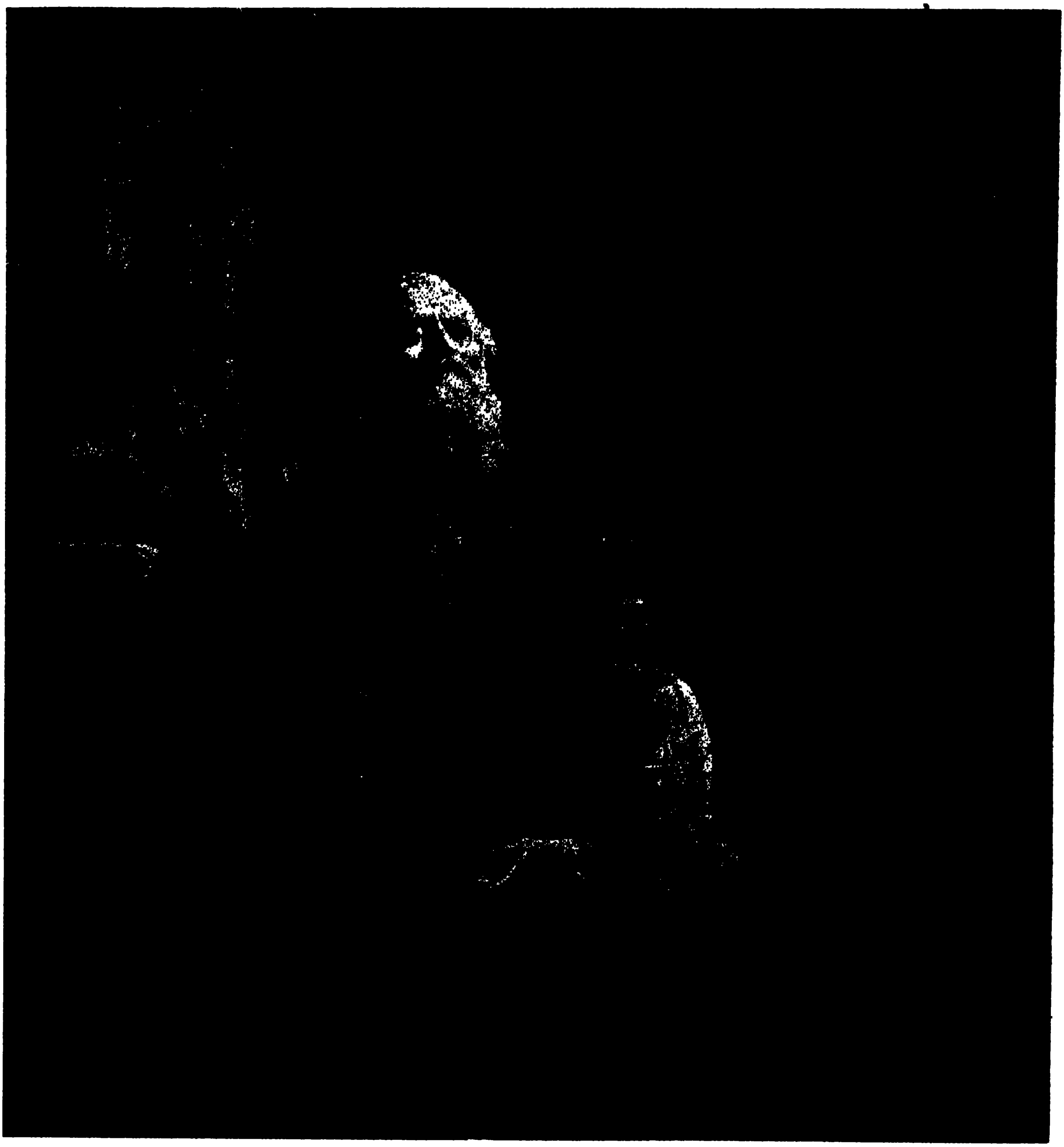
আকাশের তারায় তারায়
বিধাতার যে হাসিটি জ্বলে
ক্ষণজীবী জোনাকি এনেছে
সেই হাসি এ ধরণীতলে ॥

* * *



ধরার মাটির তলে বন্দী হ'য়ে যে-আনন্দ আছে
কচি পাতা হ'য়ে এলো দলে দলে অশথের গাছে।
বাতাসে মুক্তির দোলে ছুটি পেলো ক্ষণিক বাঁচিতে,
নিস্তব্ধ অন্ধের স্বপ্ন দেহ নিলো আলোয় নাচিতে ॥

* * *



অন্ধ ভিখারী

শিল্পী—জন্ লরেন্স্ ডিকম্যান্স

ন্যাশনাল গ্যালারী, লণ্ডন

লেখন

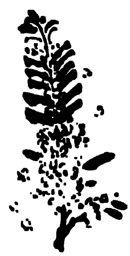
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওগো হংসের পাঁতি,
শীত-পবনের সাথী,
ওড়ার মদিরা পাখায় ক'রিছ পান।
দূরের স্বপনে মেশা
নভো নীলিমার নেশা,
বলো, সেই রসে কেমনে ভ'রিব গান॥



* * *

শিশিরের মালা গাঁথা শরতের তৃণাগ্র-সূচিতে
নিমেষে মিলায়,—তবু নিখিলের মাধুর্য্য-রুচিতে
স্থান তা'র চিরস্থির ; মণিমালা রাজেন্দ্রের গলে
আছে, তবু নাই সে যে, নিত্য নষ্ট প্রতি পলে পলে।



হে অচেনা, তব আঁখিতে আমার
আঁখি কা'রে পায় খুঁজি।
যুগান্তরের চেনা চাহনিটি
আঁধারে লুকানো বুঝি॥

* * *

কাঁটাতে আমার অপরাধ আছে
দোষ নাহি মোর ফুলে।
কাঁটা, ওগো প্রিয়, থাক্ মোর কাছে,
ফুল তুমি নিয়ো তুলে॥



* * *

দিন হ'য়ে গেল গত।
শুনিতেছি ব'সে নীরব আঁধারে
আঘাত ক'রিছে হৃদয়-দুয়ারে
দূর প্রভাতের ঘরে-ফিরে-আসা
পথিক দুরাশা যত॥

* * *

নিমেষকালের অতিথি যাহারা পথে আনাগোনা করে,
আমার গাছের ছায়া তাহাদেরি তরে।
যে জনার লাগি চিরদিন মোর আঁখি পথ চেয়ে থাকে
আমার গাছের ফল তারি তরে থাকে॥

The shade of my tree is for passers by,
its fruit for the one for whom I wait.

বহ্নি যবে বাঁধা থাকে তরুর মর্মের মাঝখানে
ফলে ফুলে পল্লবে বিরাজে।
যখন উদ্দাম শিখা লজ্জাহীন বন্ধন না মানে
মরে যায় ব্যর্থ ভস্মমাঝে॥

The fire restrained in the tree fashions flowers.
Released from bonds, the shameless flame
dies in barren ashes.

নাহিক কুসুম-উপহার দেয় চাঁদে
সাগর আপন শূন্যতা দিয়ে কাঁদে॥

The sea smites his own barren breast
because he has no flowers to offer to the moon.

লেখনী জানে না কোন্ অঙ্গুলি লিখিছে
লেখে যাহা তাও তার কাছে সবি মিছে।
To the blind pen the hand that writes is unreal,
its writing unmeaning.

“লেখন”-এর একখানি পাতা

লেখন

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রঙের খেয়ালে আপনা খোয়ালে
হে মেঘ, ক'রিলে খেলা।
চাঁদের আসরে যবে ডাকে তোরে
ফুরালো যে তোর বেলা॥

* * *

সাগরের কানে জোয়ার-বেলায়
ধীরে কয় তটভূমি ;
"তরঙ্গ তব যা' বলিতে চায়
তাই লিখে দাও তুমি।"
সাগর ব্যাকুল ফেণ-অক্ষরে
যতবার লেখে লেখা
চির-চঞ্চল অতৃপ্তিভরে
ততবার মোছে রেখা॥

* * *

ঊষা একা একা আঁধারের দ্বারে ঝঙ্কারে বীণাখানি
যেমনি সূর্য্য বাহিরিয়া আসে মিলায় ঘোম্‌টা টানি॥

* * *

কুন্দকলি ক্ষুদ্র বলি নাই দুঃখ, নাই তা'র লাজ,
পূর্ণতা অন্তরে তা'র অগোচরে ক'রিছে বিরাজ।
বসন্তের বাণীখানি আবরণে পড়িয়াছে বাঁধা,
সুন্দর হাসিয়া বহে প্রকাশের সুন্দর এ বাধা॥

* * *

ফুলে ফুলে যবে ফাগুন আত্মহারা
প্রেম যে তখন মোহন মদের ধারা।
কুসুম-কোটার দিন হ'লে অবসান
তখন সে প্রেম প্রাণের অন্নপান॥

* * *

শুধু এইটুকু সুখ, অতি সুকুমার,
তারি তরে কী আগ্রহ, কত হাহাকার।
স্থির হয়ে সহ্য করো পরিপূর্ণ ক্ষতি,
শেষটুকু নিয়ে যাক্ নিষ্ঠুর নিয়তি॥

* * *

যাবার যা' সে যাবেই তা'রে
না দিলে খুলে দ্বার
ক্ষতির সাথে মিলায়ে বাধা
ক'রিবে একাকার ॥





নটরাজ নৃত্য করে নব নব সুন্দরের নাটে,
বসন্তের পুষ্পরঙ্গে শস্যের তরঙ্গে মাঠে মাঠে।
তাঁহারি অক্ষয় নৃত্য, হে গৌরী, তোমার অঙ্গে মনে,
চিত্তের মাধুর্য্যে তব, ধ্যানে তব, তোমার লিখনে ॥

মেঘের দল বিলাপ করে
আঁধার হ'লো দেখে।
ভুলেছে বুঝি নিজেই তা'রা
সূর্য্য দিলো ঢেকে ॥



* * *

বিরহ-প্রদীপে জ্বলুক দিবস রাতি
মিলন-স্মৃতির নির্ব্বাণহীন বাতি ॥



আকাশে গহন মেঘে গভীর গর্জ্জন,
শ্রাবণের ধারাপাতে প্লাবিত ভুবন।
কেন এতটুকু নামে সোহাগের ভরে
ডাকিলে আমারে তুমি? পূর্ণ নাম ধ'রে
আজি ডাকিবার দিন,—এ হেন সময়
সরম সোহাগহাসি কৌতুকের নয়।
আঁধার অম্বর, পৃথ্বী পথচিহ্নহীন,
এলো চিরজীবনের পরিচয়-দিন ॥

বর্ষার দিন

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

(১)

আজ ঘুম থেকে উঠে চোখ চেয়ে দেখি আকাশে আলো নেই। আকাশের চেহারা দেখে অর্দ্ধ-সুপ্ত লোক ঠিক বুঝ্‌তে পারে না যে, সময়টা সকাল না সন্ধ্যে। এ-ভুল হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক, কারণ সকাল বিকাল দুই কালই হচ্ছে রাত্রি দিনের সন্ধিস্থল। তার পর যখন দেখা যায় যে, উপর থেকে যা নিঃশব্দে ঝ'রে পড়ছে, তা সূর্য্যের মৃদু কিরণ নয়, জলের সূক্ষ্ম ধারা, তখন জ্ঞান হয় যে এটা দিন বটে, কিন্তু বর্ষার দিন।

এমন দিনে কাব্য-ব্যসনী লোকদের মনে নানারকম পূর্ব্ব-স্মৃতি জেগে ওঠে। বর্ষার যে-রূপ ও যে-গুণের কথা পূর্ব্ব কবিরা আমাদের জাতীয়-স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত ক'রে রেখে গিয়েছেন, তা আবার মনশ্চক্ষে আবির্ভূত হয়।

অনেকে বলেন যে কবির উক্তি, আমাদের বস্তুজ্ঞানের বাধা-স্বরূপ। যা চোখে দেখ্‌বার জিনিষ, শোনা কথা নাকি সে জিনিষের ও চোখের ভিতর একটা পর্দ্দা ফেলে দেয়। এ-পৃথিবীতে সব-জিনিষকেই নিজের চোখ দিয়ে দেখ্‌বার সংকল্পটা অতি সাধু। কিন্তু স্মৃতি যে প্রত্যক্ষের অন্তরায় এ কথাটা সত্য নয়। আমরা যা-কিছু প্রত্যক্ষ করি তার ভিতর অনেকখানি স্মৃতি আছে—এতখানি যে, প্রত্যক্ষ কর্‌বার ভিতর চোখই কম ও মনই বেশী। এ-কথা যাঁরা মান্‌তে রাজী নন্‌ তাঁরা Bergson-এর "Matter and Memory"-নামক গ্রন্থখানি প'ড়ে দেখলেই ইন্দ্রিয়-গোচর বিষয়ের সঙ্গে স্মৃতি-গত বিষয়ের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধটা স্পষ্ট দেখ্‌তে পাবেন। সে যাই হোক্, কবির হ'য়ে শুধু এই কথাটা আমি ব'ল্‌তে চাই, যে কবির উক্তি আমাদের অনেকেরই বোজা চোখকে খুলে দেয়, কারও খোলা চোখকে বুজিয়ে দেয় না। কবিতা প'ড়্‌তে প'ড়্‌তে অনেকের অবশ্য চোখ ঢ'লে আসে, কিন্তু তার কারণ স্বতন্ত্র।

(২)

সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে যার কিছুমাত্র পরিচয় আছে তিনিই জানেন যে ও সাহিত্য বর্ষার কথায় মুখরিত। বর্ষা যে পূর্ব্ব কবিদের এতদূর প্রিয় ছিল তার কারণ সেকালেও বর্ষা দেখা দিত গ্রীষ্মের পিঠ পিঠ। ইংরাজ কবিরা যে শতমুখে বসন্তের গুণগান করেন তার কারণ সে-দেশে বসন্ত আসে শীতের পিঠ পিঠ। ফলে সে দেশে শীতে ম্রিয়মান প্রকৃতি, বসন্তে আবার নবজীবন লাভ করে। বিলেতি শীতের কঠোরতা যিনি রক্তমাংসে অনুভব ক'রেছেন, যেমন আমি করেছি, তিনিই সে দেশে বসন্ত ঋতুস্পর্শে প্রকৃতি কি আনন্দে নেচে ওঠে তা মর্ম্মে চর্ম্মে অনুভব ক'রেছেন। সে দেশ ও ঋতু প্রকৃতির ফুলসজ্জা।

সংস্কৃত কবিরা যে-দেশের লোক সে-দেশের গ্রীষ্ম বিলেতি শীতের চাইতেও ভীষণ ও মারাত্মক। বাণভট্টের শ্রীহর্ষচরিতে গ্রীষ্মের একটি লম্বা বর্ণনা আছে। সে বর্ণনা প'ড়লেও আমাদের গায়ে জর আসে। এ বর্ণনা প্রকৃতির ঘরে আগুন লাগ্‌বার বর্ণনা। যে ঋতুতে বাতাস আসে আগুনের হল্‌কার মত, যে ঋতুতে আলোক অগ্নির রূপ ধারণ করে, যে ঋতুতে পত্র পুষ্প সব জ্বলে পুড়ে ছাই হ'য়ে যায়, আর বৃক্ষলতা সব কঙ্কালসার হ'য়ে ওঠে, সে ঋতুর অন্তে বর্ষার আগমন, প্রকৃতির ঘরে নবজীবনের আগমন। কালিদাস একটি শ্লোকে সেকালের কবিদের মনের আসল কথা ব'লে দিয়েছেন।

"বহুগুণরমনীয়ঃ কামিনীচিত্তহারী
তরুবিটপলতানাং বান্ধবো নির্ব্বিকারঃ
জলদসময় এষ প্রাণিনাং প্রাণভূতো
দিশতু তব হিতানি প্রায়শো বাঞ্ছিতানি"

পৃথিবীতে যে বস্তুই 'প্রাণিনাং প্রাণভূতো' সেই বস্তুই শুধু কামিনীচিত্তহারী নয় কবিচিত্তহারীও। আর কালিদাস যে ব'লেছেন 'কামিনীচিত্তহারী', তার অর্থ—যা সর্ব্ব মানবের

চিত্তহারী তা স্ত্রীজাতিরও চিত্তহারী হবার কথা, কেননা স্ত্রীলোকও মানুষ। উপরন্তু স্ত্রীজাতির সঙ্গে প্রকৃতির সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। এত ঘনিষ্ঠ যে অনেকের ধারণা নারী ও প্রকৃতি একই বস্তু ও দুয়ের মধ্যে পুরুষ সুধু প্রক্ষিপ্ত।

(৩)

আমাদের দেশে গ্রীষ্মের পরে বর্ষার আবির্ভাব প্রকৃতির একটা অপরূপ এবং অদ্ভুত বদল। গ্রীষ্ম অন্তত এ দেশে ধীরে ধীরে অলক্ষিতে বর্ষায় পরিণত হয় না। এ পরিবর্ত্তন হ্রাসও নয়, বৃদ্ধিও নয় একেবারে বিপর্য্যয়। বর্ষা গ্রীষ্মের evolution নয়—আমূল revolution। সুতরাং বর্ষার আগমন কাণারও চোখে প'ড়ে, কালারও কাণে বাজে। কালিদাস বর্ষাঋতুর বর্ণনা এই ব'লে আরম্ভ ক'রেছেন

সশীকরাম্ভোধরমত্তকুঞ্জর
স্তড়িৎপতাকোঽশনিশব্দমর্দলঃ।
সমাগতো রাজবদুদ্ধতদ্যুতি
র্ঘনাগমঃ কামিজনপ্রিয়ঃ প্রিয়ে॥

বর্ষার এতাদৃশ রূপবর্ণনা ইউরোপীয় সাহিত্যে নেই। কারণ এ ঋতু ও-দেশে সে-দেশে প্রবেশ করে না। ইংলণ্ডে দেখেছি, সেখানে বৃষ্টি আছে কিন্তু বর্ষা নেই। বিলিতী প্রকৃতি সদাসর্ব্বদা মুখ ভার ক'রে থাকেন এবং যখন তখন কাঁদতে সুরু করেন, আর সে কান্না হচ্চে নাকে কান্না; তা দেখে প্রকৃতির উপর মায়া হয় না, রাগ ধরে। সে দেশে বিদ্যুৎ রণপতাকা নয়—পিদিমের সলতে, তার মুখের আলো প্রকৃতির অট্টহাস্য নয়—রোগার মুখের কষ্ট হাসি। আর সে দেশের মেঘের ডাক 'অশনিশব্দমর্দল' নয়, গাবচটা বাঁয়ার বুকচাপা গ্যাঙ্রানি। এক কথায় বিলেতের বর্ষা থিয়েটারের বর্ষা। ও গোলাপপাশের বৃষ্টিতে কারও গা ভেজে না, ও টিনের বজ্রধ্বনিতে কারও কাণ কালা হয় না, ও মেকি বিদ্যুতের আলোতে কারও চোক ধাঁধা হয় না। বিলেতের বর্ষার ভিতর চমকও নেই চটকও নেই। ওরকম ঘ্যানঘেনে প্যানপেনে জিনিষ কবির মনকে স্পর্শ করে না, তাই বিলেতি সাহিত্যে বর্ষার কোনও রূপ-বর্ণনা নেই। যার রূপ নেই তার রূপ-বর্ণনা, কতকটা যার মাথা নেই তার মাথাব্যথার মত। Shelley-র মন অবশ্য পর্ব্বত শৃঙ্গে মেঘলোকে বিচরণ ক'রত। কিন্তু সে মেঘ হচ্ছে কুয়াশা, তার কোনও পরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তি নেই। সুতরাং তাঁর আঁকা প্রকৃতির ছবি কোনও ফ্রেমে আঁটা যায় না—যেমন West Wind-কে বাঁশির ভিতর পোরা যায় না। "ফ্রেম" কথাটা শুনে সেই সব লোক চমকে উঠ্‌বেন, যাঁরা বলেন যে, অসীমকে নিয়েই কবির কারবার। অবশ্য তাই। জ্ঞানের অসীম সীমার বাইরে, কিন্তু আর্টের অসীম সীমার ভিতর।

(৪)

বর্ষা যে রাজার মত হাতিতে চ'ড়ে, ঢাক ঢোল বাজিয়ে, নিশান উড়িয়ে, ধুম-ধড়কা ক'রে আসে, এ-ঘটনা এ-দেশে চির পুরাতন ও চিরনবীন। সুতরাং যুগ যুগ ধ'রে কবিরা বর্ষার এই দিগ্বিজয়ী রাজরূপ দেখে এসেছে এবং সে-রূপ ভাষায় অঙ্কিত ক'রে অপরের চোখের সুমুখে ধ'রে দিয়েছে। আমাদের দেশে বর্ষার রূপের মতো আমাদের কাব্য-সাহিত্যে তার বর্ণনাও চিরপুরাতন ও চিরনবীন। মানুষের পুনরুক্তি প্রকৃতির পুনরুক্তির অনুবাদ মাত্র।

কালিদাসের বহু পরবর্ত্তী কবি বর্ষাঋতুর ঐ রাজরূপ দর্শন ক'রেছেন, সুতরাং সেই রূপেরই বর্ণনা ক'রেছেন। এমন কি হিন্দি কবিরা ও-ছবি তাদের গানে আজও ফুর্ত্তি করে আঁক্‌ছে। "যোধন বেশে বাদর আওয়ল" এ-পদটি মল্লার রাগের একটি প্রসিদ্ধ ধ্রুপদের প্রথম পদ। ও গান যখন প্রথম শুনি তখন আমার চোখের সুমুখে বিদ্যুৎ ঝল্‌কে উঠেছিল, কাণের কাছে মৃদঙ্গের গুরুগম্ভীর অবিরল পরং বেজে উঠেছিল।

এ-গান শুনে যদি কেউ বলেন, যে উক্ত হিন্দি গানের রচয়িতা কালিদাসের কবিতা চুরি ক'রেছেন, তা হ'লে ব'লতে হয় যে, রবীন্দ্রনাথ যে ব'লেছেন—"বাদল মেঘে মাদল বাজে" সে কথাও অশনিশব্দমর্দলের বাঙ্‌লা কথায় অনুবাদ। সাহিত্যে এরূপ চুরিধরা বিদ্যে বাতুলতার না হোক, বালি-

শতার পরিচায়ক। কারণ এ-বিস্তার বলে এও প্রমাণ করা যায় যে, কালিদাস তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদের বর্ণনা বেমালুম আত্মসাৎ ক'রেছিলেন। মৃচ্ছকটিক প্রকরণে বিট বসন্তসেনাকে সম্বোধন ক'রে বলেছিলেন

পশ্য পশ্য। অয়মপরঃ—

পবনচপলবেগঃ স্থূলধারাশরৌঘঃ।
স্তনিতপটহনাদঃ স্পষ্টবিদ্যুৎপতাকঃ।
হরতি করসমূহং খে শশাঙ্কস্য মেঘো
নৃপ ইব পুরমধ্যে মন্দবীর্য্যস্য শত্রোঃ॥

উক্ত শ্লোকের ভিতর স্পষ্ট বিদ্যুৎপতাকা আছে, পটহনিনাদ আছে, নৃপ আছে। অর্থাৎ কালিদাসের শ্লোকের মাল-মসলা সবই আছে। আর মৃচ্ছকটিক হ'চ্চে দরিদ্র চারুদত্তের রাজ-সংস্করণ, কারণ তা হ'চ্ছে রাজা শূদ্রকের সংস্করণ। দরিদ্র চারুদত্ত ভাসের লেখা, আর ভাস যে কালিদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি, তা স্বয়ং কালিদাস নিজমুখেই স্বীকার ক'রেছেন।

এর থেকে প্রমাণ হয় শুধু এইমাত্র, যে বর্ষার রূপ এদেশে সনাতন, তাই তার বর্ণনাও সনাতন। আর শাস্ত্রে বলে—যা সনাতন তাই অপৌরুষেয়।

(৫)

স্মৃতি প্রত্যক্ষের পরিপন্থী নয়, কিন্তু শ্রুতি অনেক ক্ষেত্রে দর্শনের প্রতিবন্ধক। অনেকের দেহে কান, চোখের প্রতিযোগী। শাস্ত্রের ভাষায় ব'লতে হলে নাম, রূপের প্রতিদ্বন্দ্বী। আমরা যদি কোন বিষয়ের কথা শুনে নিশ্চিন্ত থাকি, তা হ'লে সে বিষয়ের দিকে চোখ চেয়ে দেখবার আমাদের প্রবৃত্তি থাকে না। কথা যখন কিম্বদন্তী হ'য়ে ওঠে তখন অনেকের কাছে তা বেদবাক্য হিসেবে গ্রাহ্য হয়। একটা সর্ব্বলোকবিদিত উদাহরণ নেওয়া যাক।

বহুকাল থেকে শুনে এসেছি যে অনেকে বিশ্বাস করেন, যে পয়লা আষাঢ়ে বৃষ্টি নামতে বাধ্য, কেননা কালিদাস ব'লেছেন, "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে" দেশের মাথার আকাশ ভেঙ্গে পড়ে।

কালিদাস শুধু বড় কবি ন'ন, সেই সঙ্গে তিনি যে বড় Geographer এবং বড় Ornithologist তা জানি, কিন্তু উপরন্তু তিনি যে একজন অভ্রান্ত Meteorologist, তা বিশ্বাস করা কঠিন। মেঘদূতকে Meteorological Office-এর report হিসেবে গ্রাহ্য ক'রতে আমি কুণ্ঠিত। কারণ মেঘদূত আর যাই হোক, মেঘলোক সম্বন্ধে ছেলেভোলানো সংবাদের প্রচারক নয়। মেঘকে দূত ক'রতে হ'লে তাকে বর্ষাঋতুতেই যাত্রা করাতে হয়। আর কোন্ পথ দিয়ে উড়ে অলকায় যেতে হবে সে বিষয়েও কালিদাস উক্ত দূতকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উপদেশ দিয়েছেন। কালিদাস খুব স্পষ্ট ক'রেই ব'লেছেন যে—

মার্গং তাবচ্ছৃণু কথয়তস্ত্বৎপ্রয়াণানুরূপং
সংদেশং মে তদনু জলদ শ্রোষ্যসি শ্রোত্রপেয়ম্।

অর্থাৎ আগে পথের কথা শোনো, তার পর অলকায় গিয়ে কার কাছে কি বলতে হবে সে-কথা পরে শুনো। এ-কারণ পূর্ব্বমেঘ আগাগোড়াই পথের কথা।

(৬)

এ পথ ভারতবর্ষের উত্তরাপথ। বাঙ্লা থেকে অন্তত দেড় হাজার মাইল দূরে। সুতরাং সে-দেশে কখন বৃষ্টি পড়্তে সুরু হয়, তার থেকে বাঙ্লায় কোন্দিন বৃষ্টি নামবে তা বলা যায় না, অন্ততঃ ন্যায়শাস্ত্রের এমন কোনও নিয়ম নেই যার বলে রামগিরি থেকে এক লম্ফে কল্কাতায় অবতীর্ণ হওয়া যায়।

কিন্তু আসল কথা এই যে, কালিদাস এমন কথা বলেননি যে পয়লা আষাঢ়ে বৃষ্টি নামে। তাঁর কথা এই যে :—

তস্মিন্নদ্রৌ কতিচিদবলা বিপ্রযুক্তঃ স কামী
নীত্বা মাসান্ কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ।
আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুং
বপ্রক্রীড়াপরিণতগজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ॥

সমস্ত শ্লোকটা উদ্ধৃত ক'রে দিলুম এই জন্যে যে, সকলেই দেখ্তে পাবেন যে, এর ভিতর বৃষ্টির নামগন্ধও নেই। যক্ষ যা দেখেছিলেন, তা হ'চ্ছে 'মেঘমাশ্লিষ্ট সানুং' অর্থাৎ পাহা-

ড়ের গায়ে লেপ্‌টে-লাগা মেঘ। এ-রকম মেঘ বাঙলাদেশে কখনো চোখে প'ড়ে না, দেখা যায় শুধু পাহাড়ে পর্ব্বতে। যক্ষ যে তা দেখেছিলেন তাও অবিশ্বাস করবার কোনও কারণ নেই, কেননা তিনি বাস ক'রতেন—তস্মিন্নদ্রৌ—সেই পাহাড়ে। সুতরাং বাঙ্‌লাদেশে যাঁরা পয়লা আষাঢ়ে সেই রকম উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠেন—যথা চাতকিনী কুতুকিনী ঘন দরশনে—তাঁরা সেই শ্রেণীর লোক যাঁরা কথার মোহে ইন্দ্রিয়ের মাথা খেয়ে ব'সে আছেন। শুনতে পাই বৈজ্ঞানিকরা আবিষ্কার ক'রেছেন যে কথার অর্থ ভুল বোঝা থেকেই myth-এর জন্ম হয়। বৈজ্ঞানিকদের এ-মতের সত্যতার প্রমাণ ত হাতে হাতেই পাওয়া গেল।

(৭)

আষাঢ় সম্বন্ধে বাঙ্‌লাদেশে আর একটি কিম্বদন্তী আছে, যা আমার কাছে অদ্ভুত লাগে এবং চিরকাল লেগেছে। কথায় বলে "আষাঢ়ে গল্প", কিন্তু গল্পের সঙ্গে আষাঢ়ের কি নৈসর্গিক যোগাযোগ আছে, তা আমি ভেবে পাই নে।

আমার বিশ্বাস গল্পের অনুকূল ঋতু হ'চ্ছে শীত, বর্ষা নয়। কেননা গল্প লোকে রাত্তিরেই বলে। তাই পৃথিবীর অফুরন্ত গল্পরাশি একাধিক সহস্র রজনীতেই বলা হ'য়েছিল। শীতকাল যে গল্প বলার ও গল্প শোনার উপযুক্ত সময়, তার কারণ শীতকালে রাত বড়, দিন ছোট। অপর পক্ষে আষাঢ়ের দিন রাতের হিসেব শীতের ঠিক উল্টো; এ কালের দিন বড়, রাত ছোট। দিনের আলোতে গল্পের আলাদিনের প্রদীপ জ্বালানো যায় না।

তবে-যে লোকে মনে করে যে, আষাঢ়ের দিন গল্পের পক্ষে প্রশস্ত দিন, তার একমাত্র কারণ আষাঢ়ের দিন প্রশস্ত। কোনও বস্তুর পরিমাণ থেকে তার গুণ নির্ণয় করবার প্রবৃত্তি মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। কারণ, পরিমাণ জিনিসটে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, আর গুণ মনোগ্রাহ্য। আর সাধারণত আমাদের পক্ষে মনকে খাটানোর চাইতে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করা ঢের সহজ। তবে একদল লোক, অর্থাৎ হেগেলের শিষ্যরা, আমার কথা শুনে হাসবেন। তাঁদের গুরু ব'লেছেন যে Quantity বাড়্‌লেই তা Quality হ'য়ে ওঠে। এই কারণেই সমাজ হ'চ্ছে গুণনিধি আর ব্যক্তি নির্গুণ; আর সেই জাতিই অতি-মানুষের জাত, যে-জাত অর্দ্ধেক পৃথিবীর মাটির মালিক।

এ দার্শনিক মতের প্রতিবাদ করবার আমার সাহসও নেই, ইচ্ছেও নেই। কেননা দেখতে পাই এ দেশেও বেশীর ভাগ লোক হেগেল না প'ড়েও হেগেলের মতাবলম্বী হ'য়েছেন। ভিড়ে মিশে যাওয়ার নামই যে পরম পুরুষার্থ, এ জ্ঞান এখন সর্ব্বসাধারণ হ'য়েছে। গোলে হরিবোল দেওয়াই যে দেশ-উদ্ধারের একমাত্র উপায়, এই হ'চ্ছে বর্ত্তমান হট্টমত। এ জর্ম্মাণ-মত সম্বন্ধে যাঁর মনে দ্বিধা আছে তাঁকে আগে একটি মহাসমস্যার মীমাংসা ক'রে পরে মুখ খুল্‌তে হবে। সে সমস্যা এই। Quantity, Quality-র অবনতি, না Quality, Quantity-র পরিণতি? এ বিচারের উপযুক্ত সময় হ'চ্ছে নিদাঘ, বর্ষা. নয়। কারণ উক্ত সমস্যার মীমাংসার জন্য তার উপর প্রচণ্ড আলো ফেল্‌তে হবে, যে আলো এই মেঘ্‌লা দিনে আকাশেও নেই, মনেও নেই। আজকের দিনে এই গা-ঢাকা আলোর ভিতর বাজে কথা বলাই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। কালিদাস ব'লেছেন—"মেঘালোকে ভবতি সুখিনোপ্যন্যথা বৃত্তি চেতঃ"—সুতরাং আমার মনও যে অন্যথাবৃত্তি অর্থাৎ অদার্শনিক হ'য়ে প'ড়েছে—সে কথা বলাই বাহুল্য।

(৮)

এখন পুরোণো কথায় ফিরে যাওয়া যাক্। "আষাঢ়ে গল্প" কথাটার সৃষ্টি হ'ল কি সূত্রে তারই এখন অনুসন্ধান করা যাক্। কিন্তু সে-সূত্র খুঁজ্‌তে হ'লে আমাকে আর এক শাস্ত্রের দ্বারস্থ হ'তে হবে, যে-শাস্ত্রের ভিতর প্রবেশ করবার অধিকার আমার নেই—সে-শাস্ত্রের নাম শব্দতত্ত্ব। অপর পক্ষে, এই বর্ষার দিনে স্বাধিকারপ্রমত্ত হবার অধিকার সকলেরই আছে, এই বিশ্বাসের বলেই আমি অনধিকার-চর্চ্চা ক'রতে ব্রতী হচ্চি।

আমি পূর্ব্বে বলেছি যে নিরুক্তকারদের মতে যে-কথার মানে আমরা জানি নে অথচ বলি, সেই কথা থেকেই

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

কিম্বদন্তী জন্ম লাভ করে। আমার বিশ্বাস "আষাঢ়ে গল্প"-রূপ কিম্বদন্তীর জন্মকথাও তাই।

আমাদের বাঙাল দেশে লোকে "আষাঢ়ে গল্প" বলে না, বলে "আজাড়ে গল্প"। এখন এই আজাড়ে শব্দটি কি "আষাঢ়ে"র অপভ্রংশ? "আজাড়" শব্দের সাক্ষাৎ সংস্কৃত কোষের ভিতর পাওয়া যায় না। এর থেকে অনুমান ক'র্‌ছি যে এটি হয় ফার্সি, নয় আরবি শব্দ। আর ও-কথার মানে আমরা সবাই জানি, অন্য সূত্রে। আমরা যখন বলি "মাঠ উজাড়" ক'রে দিলে তখন আমরা বুঝি যে উজাড় মানে নির্ম্মূল। কারণ "জড়" মানে যে মূল, তা বাঙলার চাষীরাও জানে। সুতরাং "আজাড়ে গল্পের" অর্থ যে অমূলক গল্প এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয়। এই "আজাড়" কথাটার শুদ্ধি ক'রে নিয়ে আমরা তাকে "আষাঢ়" বানিয়েছি। এ-কারণ আরব্য উপন্যাসের সব গল্পই আজাড়ে গল্প, হিন্দু জবানে "আষাঢ়ে গল্প",—যদিও আরব দেশে আষাঢ়ও নেই, শ্রাবণও নেই।

সুতরাং এ কিম্বদন্তীর অলীকতা ধ'র্‌তে পারলেই আমরা বুঝতে পার্‌ব যে, বৃষ্টির জল পেয়ে গল্প গজায় না, জন্মায় শুধু কবিতা। বর্ষাকাল কবির স্বদেশ, ঔপন্যাসিকের বিদেশ।

(৯)

বর্ষা যে গল্পের ঋতু নয়, গানের ঋতু, তার প্রমাণ বাঙলা সাহিত্যে আষাঢ়ে গল্প নেই—কিন্তু মেঘরাগের অগণ্য গান আছে।

বাঙলার আদি-কবি জয়দেবের আদি-শ্লোক কার মনে নেই? সকলেরই মনে আছে; এই কারণ যে, "মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবশ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ"—এ-পদ যার একবার কর্ণগোচর হ'য়েছে, তাঁ'র কানে তা চিরদিন লেগে থাক্‌বার কথা। চিরদিন যে লেগে থাকে তা'র কারণ "A thing of beauty is a joy for ever"। এর সৌন্দর্য্য কোথায়? এ-প্রশ্নের কোনও স্পষ্ট জবাব দেবার জো নেই। Poetry অথবা beauty যে-ভাষায় আমাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করে, তা অপর কোন ভাষায় অনুবাদ করা অসম্ভব। আর আমরা যা'কে ভাষা বলি, সে ত হয় কর্ম্মের, নয় জ্ঞানের ভাষা। তবে ঐ ক'টি কথায় জয়দেব আমাদের চোখের সুমুখে যে-রূপ ধ'রে দিয়েছেন—তা একটু নিরীক্ষণ ক'রে দেখা যাক্। কবিতামাত্রেরই ভিতর ছবি থাকে; অতএব দেখা যাক্ কবি এ-স্থলে কি ছবি এঁকেছেন। বর্ষার যে-ছবি কালিদাস এঁকেছেন এ সে-ছবি নয়। এর ভিতর বজ্র নেই, বিদ্যুৎ নেই, বৃষ্টি নেই—অর্থাৎ যে-সব জিনিস মানুষের ইন্দ্রিয়ের উপর হঠাৎ চড়াও হয় এবং মানুষের মনকে চমকিত করে, সে-সব জিনিসের বিন্দুবিসর্গও উক্ত পদে নেই। কবি শুধু দু'টি কথা ব'লেছেন—"আকাশ মেঘে কোমল ও বনতমালে শ্যাম"; তিনি তুলির দু'টি টানে একসঙ্গে আকাশের ও পৃথিবীর চেহারা এঁকেছেন। এ-চিত্রের ভিতরে কোনও রেখা নেই, আছে শুধু রঙ,—আর সে রঙ নানাজাতীয় নয়—একই রঙ—শ্যাম; উপরে একটু ফিঁকে, নীচে একটু গাঢ়। এ বর্ণনা হচ্ছে—চিত্রকররা যা'কে ব'লে—landscape painting। তুলির দু'টানে জয়দেব বর্ষার নির্জ্জনতার, নীরবতার, তার নিবিড় শ্যামশ্রীর কি সমগ্র, কি সুন্দর ছবি এঁকেছেন। এ-ছবি যা'র চোখে একবার প'ড়েছে তার মনে এ-ছবির দাগ চিরদিনের মত থেকে যায়। বাইরে যা ক্ষণিকের, মনে তা চিরস্থায়ী হয়। যা অনিত্য তা'কে নিত্য করাই ত কবির ধর্ম্ম।

(১০)

এর থেকে মনে প'ড়ে গেল যে কবিতা বস্তু কি? এ-প্রশ্ন মানুষে আবহমানকাল জিজ্ঞাসা ক'রে এসেছে,—আর যথাশক্তি তা'র উত্তর দিতে চেষ্টা ক'রেছে। এ-সমস্যার মীমাংসায় ইউরোপীয় সাহিত্য ভরপুর। আরিষ্টটলের যুগ থেকে এ-আলোচনা সুরু হ'য়েছে, আর আজও থামেনি, বরং সটান চ'ল্‌ছে। এর চূড়ান্ত মীমাংসা যে আজ পর্য্যন্ত হয়নি তা'র কারণ যুগে যুগে

মানুষের মন বদ্‌লায় এবং তা'র ফলে পুরাণো মীমাংসা সব নতুন সমস্যা হ'য়ে ওঠে। যখন মানুষের মনে কোনো সমস্যা থাক্‌বে না, তখনই তা'র চূড়ান্ত মীমাংসা হবে। যাক্‌ বিদেশের কথা। "কাব্য-জিজ্ঞাসা" যে এ-দেশের লোকের মনেও উদয় হয়েছিল, তা'র পরিচয় যিনি পেতে চান্‌, তিনি "কাব্য-জিজ্ঞাসা" সম্বন্ধে আমার বন্ধু শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্তের বিস্তৃত আলোচনা প'ড়ে দেখুন। আমাদের দেশের দার্শনিকরা "ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা"র যে উত্তর দিয়েছেন "কাব্য-জিজ্ঞাসা"রও সেই একই উত্তর দিয়েছেন; সে উত্তর হচ্ছে—"নেতি নেতি"—অর্থাৎ কাব্যের প্রাণ রীতিও নয়, নীতিও নয়, ভাষাও নয়, ভাবও নয়। এক কথায় কাব্যের প্রাণ হ'চ্ছে একটি mystery। প্রাণ জিনিষটা mystery, এ-সত্য জেনেও মানুষে দেহের ভিতর প্রাণের সন্ধান ক'রেছে আর তা' কতকটা পেয়েওছে। সুতরাং কবিতার দেহতত্ত্বের আলোচনা ক'রলে আমরা তা'র প্রাণের সন্ধান পেতে পারি। দার্শনিকের সঙ্গে কবির প্রভেদই এই যে, দার্শনিকের কাছে দেহ ও মন, ভাষা আর ভাব দু'টি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু, কিন্তু কবির কাছে ও-দুই এক। তাঁর কাছে ভাষাই ভাব আর ভাবই ভাষা। কাব্য-বস্তু যে ভাষার অতিরিক্ত, তা'র কারণ ভাষার প্রতি পরমাণুর ভিতর ভাব আছে, এবং তা যে ভাবের অতিরিক্ত, তা'র কারণ প্রতি ভাবকণার ভিতর ভাষা আছে। এই কারণে ব'ল্‌তে সাহসী হ'চ্ছি যে 'জয়দেবের' উক্ত পদ যে আমাদের মুগ্ধ করে তা'র একটি কারণ, তা'র music, আর এ music-এর মূলে আছে অনুপ্রাস। অনুপ্রাস জিনিসটে কতদূর বিরক্তিকর হ'তে পারে, তার পরিচয় বাঙ্‌লার অনেক যাত্রাওয়ালা ও কবিওয়ালার গানে পাওয়া যায়। কিন্তু কবির হাতে প'ড়লে অনুপ্রাস যে কবিতাতে প্রাণ সঞ্চার করে, তার পরিচয় অপর ভাষার অপর কবিদের মুখেও পাওয়া যায়। সেক্স্‌পিয়রের 'full fathom five thy father lies,' এবং কোল্‌রিজের 'five miles meandering with a mazy motion'—এ-দুটি পদ যে মনের দুয়ারে ঘা দেয় এ-কথা কোন্‌ সহৃদয় লোক অস্বীকার ক'রবে? এ-দুটি লাইনের সৌন্দর্য্য যে অনুপ্রাস-নিরপেক্ষ নয় সে ত প্রত্যক্ষ সত্য। জয়দেবের বর্ষার রূপ-বর্ণনা অনুপ্রাসের গুণে ভাবঘন হয়ে উঠেছে, আর এই একই কবির বসন্ত বর্ণনা অনুপ্রাসের দোষে নিরর্থক হ'য়েছে। "ললিতলবঙ্গলতা পরিশীলনকোমলমলয়সমীরে"—শুধু শব্দঘটা মাত্র, ছবিও নয় গানও নয়। ও-পদের ভিতর সে ধ্বনিও নেই সে আলোকও নেই, যা আমাদের ভিতরের বাইরের রূপলোককে আলোকিত ও প্রতিধ্বনিত করে।

(১১)

কাব্যবস্তুর স্বরূপ বর্ণনা ক'রতে হলে যে "নেতি নেতি" ব'ল্‌তে হয়—এ কথা আমিও জানি, আমিও মানি। কিন্তু এ "নেতি নেতির" অর্থ এই যে, রচনার যে-গুণকে অথবা রূপকে আমরা কাব্য বলি, তা শব্দালঙ্কার, অর্থালঙ্কার প্রভৃতি সব রকম অলঙ্কারের অতিরিক্ত। তবে কাব্য অলঙ্কার-অতিরিক্ত ব'লে অলঙ্কার-রিক্ত নয়। কাব্যের সর্ব্বপ্রকার অলঙ্কারের মধ্যে যে-অলঙ্কার সব চেয়ে সস্তা, সেই অলঙ্কার অর্থাৎ অনুপ্রাসও যে আমাদের মনে কাব্যের সুর সঞ্চার ক'রতে পারে, এ-কথা মেনে নিলে বহু কবিতার রস উপভোগ করা আমাদের পক্ষে সহজ হ'য়ে আসে; কারণ এ-বিষয়ে আমাদের মন অনেক ভুল idea-র বাধামুক্ত হয়। ভাল কথা,—ভাবেরও কি অনুপ্রাস নেই? সেই অনুপ্রাসই কানের ভিতর দিয়ে মর্ম্মে প্রবেশ করে না, যে-অনুপ্রাসের ভিতর অনুভাব নেই, যেমন সে-সঙ্গীত মানুষের মনের দুয়োর খুল্‌তে পারে না, যে-সঙ্গীতের অন্তরে অনুরণন্‌ নেই।

অনুপ্রাস সম্বন্ধে এত কথা বল্‌লুম এই জন্যে যে, আজ্‌কের দিনে যে-সব বাঙ্‌লা গান মনের ভিতর গুন্‌গুন্‌ ক'রছে—তারা সবই অনুপ্রাসে প্রাণবন্ত। বাঙ্‌লার পুরোণো কবিদের দুটি পুরোণো গান রবীন্দ্রনাথ আমাদের নূতন ক'রে শুনিয়েছেন। বিদ্যাপতি কোন্‌ অতীত বর্ষার দিনে গেয়ে উঠেছিলেন—

"এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর"

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

কিন্তু তার পরেই তিনি যা ব'লেছেন তার ভিতর কাব্য-রস এক ফোঁটাও নেই।

"কুলিশ শত শত পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া"

এ হ'চ্চে সংস্কৃত কবিদের বাঁধিগৎ। তাই ও-কবিতা থেকে ঐ প্রথম ছটি পদ বাদ দিলে বিদ্যাপতির বাদবাকী কথা কাব্য হ'ত না। বরং সত্য কথা ব'লতে গেলে "এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর" এই কথা-ক'টিই সমগ্র কবিতাটিকে রূপ দিয়েছে, প্রাণ দিয়েছে। "ভরা বাদর মাহভাদরের" সুর যার কানে বেজেছে, সেই মুহূর্ত্তে সে অনুভব ক'রেছে যে "শূন্য মন্দির মোর"। যে মুহূর্ত্তে আমরা শূন্যতার রূপ প্রত্যক্ষ করি, সে মুহূর্ত্তে যে ভাব আমাদের মনকে পেয়ে বসে—তার নাম মুক্তির আনন্দ। কাব্যজ আনন্দকেও আলঙ্কারিকরা মুক্তির আনন্দ ব'লেছেন। আলঙ্কারিকদের এ কথা মিছে নয়।

(১২)

অপর কবিতাটি এই :—

রজনী শাঙন ঘন, ঘন দেয়া গরজন
রিম্‌ঝিম্‌ শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ্‌ যাই মনের হরিষে ॥

এ কবিতা যাঁর কানে ও প্রাণে একসঙ্গে না বাজে তাঁর কাছে কবিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা ক'রে কোন ফল নেই। আলঙ্কারিকরা বলেন

"তয়া কবিতয়া কিংবা তয়া বনিতয়া চ কিম্‌।
পদবিন্যাস মাত্রেন যয়া নাপহৃতং মনঃ ॥

উক্ত কবিতা পদবিন্যাস মাত্র যাঁর মন হরণ করে, তিনিই যথার্থ কাব্যরসিক। আর যাঁদের করে না, ভগবান তাঁদের মঙ্গল করুন।

উপরে যে দু'চারিটি নমুনা দিলুম তার থেকেই দেখা যায় যে, বাঙালী কবির বর্ষা-বর্ণনা ছবি-প্রধান নয়, গান-প্রধান। বাঙালী কবিরা বর্ষার বাহ্যরূপের তেমন খুঁটিয়ে বর্ণনা করেন না—যেমন প্রকাশ করেন বর্ষাগমে নিজেদের মনের রূপান্তরের। শব্দ দিয়ে ছবি আঁকার চাইতে, শব্দ দিয়ে সঙ্গীত রচনা করবার দিকেই বাঙালী কবির ঝোঁক বেশি। তাই তাঁদের কবিতায় উপমার চাইতে অনুপ্রাস প্রবল।

সংস্কৃত কবির চোখ আর বাঙালী কবির কান এ দুইই তাদের পূর্ণ অভিব্যক্তি লাভ ক'রেছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে। সকলেই জানেন যে রবীন্দ্রনাথ বর্ষার বিষয়ে অসংখ্য কবিতা লিখেছেন। ফলে ও-ঋতুর বিচিত্র রূপের প্রতি রূপের চিত্র তাঁর কাব্যে ছন্দোবন্ধে আবদ্ধ হ'য়েছে। এ ঋতু সম্বন্ধে তাঁর কবিতাবলীকে একটি বিচিত্র picture-gallery বললে অসঙ্গত কথা ব'লা হয় না। অপর পক্ষে বর্ষার সুরে মনের ভিতর যে সুর বেজে ওঠে সেই অপার্থিব সুরের দিব্যরূপ পূর্ণ মাত্রায় পরিস্ফুট হ'য়েছে রবীন্দ্রনাথের একটি বর্ষার কবিতায়। সে কবিতার প্রথম পদ হচ্ছে :—

"এমন দিনে তারে বলা যায়
এমন ঘনঘোর বরিষায়"।

যে-কবিতার ভাষা ও ভাব মিলে এক হ'য়ে যায় সেই কবিতাই যদি perfect কবিতা হয়, তা'হ'লে আমি জোর ক'রে ব'লতে পারি এর তুল্য perfect কবিতা বাঙ্‌লাতেও নেই, সংস্কৃতেও নেই। ও-কবিতা শুনে "সমাজ সংসার মিছে সব মিছে জীবনের কলরব" এ-কথা যিনি ক্ষণিকের জন্যও হৃদয়ঙ্গম না করেন, তাঁর এই বর্ষার দেশে জন্ম গ্রহণ করাটা কর্ম্মভোগ মাত্র।

টম্সনের "রবীন্দ্রনাথ"

শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

সকল দেশের সাহিত্যের মতো বাঙ্‌লা সাহিত্যেরও একটা বিশিষ্ট আবেষ্টন আছে, একটা বিশেষ আব্‌হাওয়া আছে। প্রত্যেক দেশের, প্রত্যেক জাতির সাহিত্যের এই বিশিষ্টতা উপলব্ধি করিতে না পারিলে কখনও তাহার মর্ম্মমূলে প্রবেশ করা সম্ভব হয় না। ইংরেজী সাহিত্য সম্বন্ধে বাঙালী যত বড় পণ্ডিতই হউক্ না কেন, তাহার পক্ষে সেই সাহিত্যের আব্‌-হাওয়ার সঙ্গে পরিচিত হওয়া নিশ্চয়ই খুব কঠিন, অথচ উহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে না পারিলে কোনো সাহিত্যেরই রস ও প্রাণের সন্ধান পাওয়া যায় না। ইংরেজী-সাহিত্যের এই আবেষ্টনের সহিত নিবিড় পরিচয় না ঘটিলে, যতই না কেন বাঙালী পাঠক সেক্স্‌পীয়র, মিল্‌টন্‌, শেলি, ব্রাউনিঙ্‌, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ্‌ টেনিসনের কেতাব লইয়া নাড়া-চাড়া করুক্‌, তাহার নিকট কখনই কাব্যের রস ও প্রাণ ধরা দেয় না। যেমন ইংরেজী সাহিত্য সম্বন্ধে, তেমনি বাঙ্‌লা সাহিত্য সম্বন্ধে এ-কথা সত্য। কোনো বিশিষ্ট সাহিত্যের অন্তরের রহস্য-চাবিটি খুঁজিতে হইলে এই কথাটি ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে।

প্রতিভাবান কবি ও লেখকের দানে যখন কোনো সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়, তখন তাহার প্রতি বিদেশীর দৃষ্টি পড়ে; বিশেষ করিয়া সে-সাহিত্য যদি একটা স্বাধীন দেশ ও জাতির সাহিত্য হয়। বাঙ্‌লা সাহিত্য তেমন দেশ ও জাতির সাহিত্য না হইলেও আজ তাহার প্রতি বিদেশীর দৃষ্টি পড়িয়াছে। বাঙ্‌লা স্বরস্বতীর কণ্ঠে এই গৌরবের মালা পরাইয়াছেন কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথ। সতেরো বৎসর বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া আজ সপ্তষষ্ঠি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কত বিচিত্র ভাব, রূপ ও রসের কবিতায়, নাট্যে, গানে, গল্পে বাঙ্‌লা সাহিত্যকে তিনি সমৃদ্ধ করিতেছেন;—শুধু তাঁহাকেই ভাল করিয়া বুঝিবার ও জানিবার জন্ম আমাদের সাহিত্যের অনুশীলনে পশ্চিম ধীরে ধীরে আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিতেছে। তাঁহার জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে য়ুরোপ ও আমেরিকায় ইতিমধ্যেই বহু আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে। ভারতবর্ষের একটি প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের ভিতর দিয়া প্রাচ্যের ভাব ও সাধনাকে বুঝিবার জন্ম পশ্চিমের এই প্রয়াস শুভলক্ষণের সূচনা করিতেছে সন্দেহ নাই।

রবীন্দ্রনাথ বাঙালী কবি—ভারতবর্ষের কবি। বাঙ্‌লার ভাষা ও সাহিত্য, ভাব ও সাধনা, স্মৃতি ও সংস্কার, পুরাণ ও ইতিহাসের সঙ্গে তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টি অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। এই আবেষ্টনের মধ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে কবি রবীন্দ্রনাথকে বুঝা কিছুতেই সম্ভব হইবে না। রবীন্দ্রনাথের ভাব ও সাহিত্য লইয়া বিদেশী যাঁহারা আলোচনা করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তাঁহার ইংরেজী তর্জ্জমা অবলম্বন করিয়া এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। কিন্তু কিছুদিন হইল তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার মূল রচনার সহিত পরিচয়ের দাবী লইয়া তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্যের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই সব সমালোচকদিগের নিকটে আমাদের এটুকু আশা করা নিশ্চয়ই অন্যায় হইবে না যে, তাঁহারা, বাঙ্‌লা ভাষা ও সাহিত্যকে ভাল করিয়া আয়ত্ত করিয়া, বাঙালী জীবনের সকল বিকাশের মর্ম্মমূলে দরদী হৃদয় ও সূক্ষ্ম অনুপ্রবেশের শক্তি লইয়া পৌঁছিতে পারিয়াছেন। এইটুকু না পারিলে রবীন্দ্র-সাহিত্যের—এবং যে কোনো সাহিত্যের—রস ও রহস্যকে উপলব্ধি করা অসম্ভব। বাঙ্‌লা ভাষা ও সাহিত্যের ভাব ও সাধনার স্বল্প জ্ঞান লইয়া, ইংরেজী অনুবাদ এবং বাঙালী সাহিত্য-রসিক বা অরসিক বন্ধুদের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর একটা সুদীর্ঘ তালিকা ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া কোনো বিদেশী লেখকের পক্ষে খুব কঠিন কাজ না হইতে

টম্‌সনের "রবীন্দ্রনাথ"

শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

পারে, কিন্তু তাহাতে রবীন্দ্রনাথকে বুঝা কিছুতেই সম্ভব হইবে না। কবিজীবনের ইতিহাস ও পরিচয় শুধু কতকগুলি ঘটনার সন তারিখের তালিকা কিংবা লিখন-বচনের সমষ্টিও নয়—কবির সমগ্র জীবন একটা ভাবপ্রবাহ; প্রকৃতির বিচিত্র লীলার মত সে প্রবাহের ধারা আপন খাতে আপনি বহিয়া চলে। সে ভাবপ্রবাহের সহিত পরিচিত হইতে না পারিলে, তাহার রসরহস্যটি খুঁজিয়া না পাইলে, কবিজীবনের ইতিহাস লিখিতে যাওয়া শুধু স্পর্দ্ধা নয়, বিড়ম্বনা!

এই স্পর্দ্ধার পরিচয় দিতে গিয়া বিড়ম্বিত হইয়াছেন বাঁকুড়া কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ও বর্ত্তমানে অক্স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্‌লা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত এডোয়ার্ড্‌ টম্‌সন্‌, পি, এইচ্‌, ডি (লণ্ডন)*। টম্‌সন্‌-সাহেব (তাঁহার নিজের কথায়) রবীন্দ্রনাথকে পশ্চিম-জগতে ঘনিষ্ঠতর ভাবে পরিচিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন; সে-জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সাহিত্য এবং তাঁহার কবিজীবনকে পশ্চিমের পাঠকসাধারণের নিকট পরিচিত করিবার ইহাই প্রথম বিশিষ্ট প্রয়াস; কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, সে-প্রয়াস একেবারেই ব্যর্থ হইয়াছে; এবং সমস্ত পুস্তকখানি জুড়িয়া যে ঔদ্ধত্য সর্ব্বত্র মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে বিজিত জাতির প্রতি বিজেতার মনোভাবের পরিচয় অনেক স্থলেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। টম্‌সন্‌-সাহেবের বই পড়িয়া যিনি রবীন্দ্রনাথকে বুঝিতে চাহিবেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাছে দূর চক্রবালরেখার মতো চিরকাল দুরধিগম্য হইয়াই থাকিবেন।

টম্‌সন্‌-সাহেব খৃষ্টানধর্ম্মের প্রচারক ও বাঁকুড়া কলেজের শিক্ষকরূপে বহু কাল বাঙ্‌লা দেশে বাস করিয়াছেন এবং পণ্ডিত-মহাশয়দের সাহায্যে বাঙ্‌লা ভাষা ও সাহিত্য পাঠ ও আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু যে অন্তর্দৃষ্টি থাকিলে, কোনো বিদেশী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবির কাব্য ও রচনার রহস্যের সন্ধান পাইতে ও দিতে পারা যায়, সে-দৃষ্টি লইয়া টম্‌সন্‌ রবীন্দ্র-সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। নানা কারণেই তাহা সম্ভব হয় নাই—প্রথম ও প্রধানতম কারণ, রবীন্দ্র-সাহিত্যকে বুঝিতে ও বুঝাইতে হইলে বাঙ্‌লা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে যতটুকু জ্ঞান থাকা দরকার টম্‌সন্‌-সাহেবের তাহার নিতান্ত অভাব, অথচ এই দৈন্য কোথাও তিনি স্বীকার পর্য্যন্ত করেন নাই। গ্রন্থকার যাহা খুব অল্পই জানেন এবং যে-সম্বন্ধে তিনি একেবারে কিছুই জানেন না, তাহাই খুব ভাল জানি বলিয়া প্রকাশ করিবার এবং যাহা খুশী তাহাই নির্ব্বিচারে বলিবার দুঃসাহস তাঁহার গ্রন্থের সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইয়াছে। এই গ্রন্থের বিরুদ্ধে ইহাই আমাদের প্রধান অভিযোগ। এ-কথা বোধ হয় টম্‌সন্‌-সাহেব নিজেও স্বীকার করিবেন যে, তিনি যে-পরিমাণে বাঙ্‌লা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত, যে-কোনো ইংরেজী সাহিত্যরসিক বাঙালী লেখক ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের সহিত তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী পরিচিত; কিন্তু এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে, টম্‌সন্‌-সাহেব যেমন অবিনয়ে নিজের অজ্ঞতা স্বীকার না করিয়া বাঙ্‌লার শ্রেষ্ঠ কবি ও তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে সুদীর্ঘ গ্রন্থরচনায় সাহসী হইয়াছেন, তাঁহার অপেক্ষা ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের চতুর্গুণ জ্ঞান লইয়াও তেমন আত্মপ্রত্যয়ে শেলি বা ব্রাউনিঙ্‌ সম্বন্ধে এমন গ্রন্থ লিখিতে কোনো বাঙালী লেখকই সাহসী হইতেন না। তাই মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ বাঙালী কবি এবং বাঙ্‌লাদেশ-বাসীমাত্রেই ইংলণ্ডের ভিটেবাড়ীর প্রজা বলিয়াই ইংরেজ টম্‌সন্‌ এই স্পর্দ্ধার পরিচয় দিতে সাহসী হইয়াছেন। এ-গ্রন্থের দৌলতে তিনি নিজের দেশে সম্মান লাভ করিতে পারেন এবং করিয়াছেনও, তাঁহার গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নাকি একমাত্র প্রামাণ্যগ্রন্থ বলিয়াই গৃহীত ও স্বীকৃত হইয়াছে; কিন্তু এতদিন বাঙ্‌লা দেশে বাস করিয়া তাঁহার এ-কথা বোঝা উচিত ছিল যে, বাঙালী পাঠক তাহাদের কবিকে সম্যক্‌ না বুঝুক, টম্‌সন্‌-সাহেবের

* Rabindranath Tagore—Poet and Dramatist: by Edward Thompson, Lecturer in Bengali—University of Oxford. Oxford University Press. 1926. Pp. 327 (with four photo illustrations).

অপেক্ষা অনেক ভাল করিয়াই পড়িতে ও বুঝিতে শিখিয়াছে, সুতরাং তাহারা তাঁহার এই অনধিকার চর্চ্চা নীরবে সহ্য করিবে কেন? রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁহার ছোট পুস্তকখানি * বাহির হইলে "প্রবাসী"তে তাহার যে সুদীর্ঘ ও সুলিখিত সমালোচনা বাহির হইয়াছিল তাহা বাঙালী পাঠকমাত্রেরই মনের কথা। সেই সময়েই বাঙালী পাঠক টম্‌সনের রবীন্দ্রনাথ-আলোচনার ভঙ্গী সম্বন্ধে সবিশেষ আপত্তি জানাইয়াছিল। আমরা জানি টম্‌সন্-সাহেব তখন এ-দেশেই ছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই সমালোচনা, সেই আপত্তিকে তিনি বেমালুম হজম করিয়া এবং একটুও নিরুৎসাহ না হইয়া রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সেই ধরণেরই আর একখানি সুবৃহৎ পুস্তক প্রচার করিতে এতটুকুও দ্বিধা বোধ করিলেন না!

টম্‌সন্-সাহেবের বই-এর ভুল-চুক্ নির্দ্দেশ করিতে হইলে তেমনই আর একখানা কেতাব রচনার প্রয়োজন হইবে, কারণ রবীন্দ্রনাথকে যেমন করিয়া তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কবিগুরুর ভাব ও আদর্শকে তিনি যেমন করিয়া তাঁহার মনগড়া ছাঁচের মধ্যে ফেলিয়া বুঝিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, এবং তাঁহার গল্প, কবিতা ও নাটক সম্বন্ধে যে-সব মারাত্মক রকমের ভুলে তাঁহার পুস্তকখানি কণ্টকিত, তাহার বিচার বিশ্লেষণ করিবার স্থান ইহা নয়। কিন্তু তাঁহাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়। কোন্ বই-এর পর কোন্ বই রচিত হইয়াছিল, কবে কোন্ বই-এর ইংরেজী তর্জ্জমা হইয়াছিল, বাঙ্‌লার সঙ্গে ইংরেজী তর্জ্জমার তফাৎ কতটুকু এবং-কোন্ কবিতা, কোন্ কাব্যরস বা আদর্শ সম্বন্ধে অন্যান্য লেখকেরা কে কি বলিয়াছেন, তাহার এক সুদীর্ঘ তালিকা দেওয়াই কি টম্‌সন্-সাহেব রবীন্দ্রপ্রতিভাপরিচয়ের শ্রেষ্ঠতম উপায় বলিয়া মনে করিয়াছেন? অথচ মুরুব্বিয়ানারও কোন অভাব নাই—পরের বচন, পরের মতামত, পরের সংগ্রহেই ত সমস্ত পুস্তকখানি ভরাট হইয়া আছে, তবু খোদার উপর খোদ্‌কারীর ত্রুটি কোথাও নাই। বইখানিতে তথ্যের ভুল যাহা আছে তাহা খুব মারাত্মক বলিয়া বিবেচিত না-ও হইতে পারে, কিন্তু অনভিজ্ঞ এই ইংরেজ লেখকের মুরুব্বিয়ানা বাঙালী পাঠককে পদে পদে পীড়িত করে। কোনো কবিতার ইংরেজী তর্জ্জমা তুলিয়া দিয়া হয় ত বলিয়াছেন, 'আহা কি মধুর', 'কি সুন্দর'! অথবা 'আমার কাছে ইহা ভাল লাগে নাই',—যেন ইহাই সমালোচনা বা রসোপলব্ধির শেষ কথা! "চোখের বালি" ও "নৌকাডুবি"কে "incredibly bad" * বলিয়া সমালোচনা শেষ করিয়াছেন; কেন যে "incredibly bad" তাহা আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। "I suppose", "To me it seems" ইত্যাদি ধরণের মন্তব্যের অভাব কোথাও নাই। বইটির পাতায় পাতায় এই সব টিপ্‌পনী নিতান্তই কানে বাজে। এক জায়গায় তিনি বলিয়াছেন, যে বাঙালী পাঠক রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি পছন্দ করে না এবং বাঙালী চিত্তে তাহা কোনো রস জোগাইতে পারে নাই। এবং তাহার পরেই অত্যন্ত মুরুব্বিয়ানা করিয়া বলিয়াছেন—"কিন্তু আমি নিজে বাঙালী সমালোচকদের অপেক্ষা কবির নাটক সম্বন্ধে উচ্চতর মত পোষণ করি।"† এ-কথা তাঁহাকে বলিবার অধিকার কে দিয়াছে যে, বাঙালী পাঠকসমাজ কবিবরের নাটকগুলি ভালবাসে না? আমাদের নাট্যশালাগুলি যে তাহাদের গ্রহণ করিতে পারে নাই, তাহার কারণ এ নয় যে, রবীন্দ্র-নাট্য বাঙালীর চিত্তে রস জোগাইতে পারে নাই—আসল কারণ হইতেছে রবীন্দ্রনাট্য অভিনয় করিবার মতন কলানৈপুণ্য এখনও ইহাদের আয়ত্ত হয় নাই।

ভারতবর্ষের ভাব এবং সাধনা টম্‌সন্-সাহেবের কাছে তাহার অন্তর-রহস্য উদ্‌ঘাটন করে নাই, তাই ভারতবর্ষের কাব্যে-পুরাণে প্রেমের মধ্যে যে সংযম ও তপস্যার মাধুরী ফুটিয়া উঠিয়াছে, টম্‌সনের য়ুরোপীয় চিত্ত তাহাকে একেবারেই গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাই তিনি কচের প্রেমকে 'Selfish' আখ্যা দিয়া এবং কচকে 'Satisfied young god' বলিয়া বিদ্রূপ করিয়া তাঁহার পাশ্চাত্য প্রেমোপভোগের সংস্কারকেই শুদ্ধ ও সম্পূর্ণ জ্ঞানে আত্মপরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন।‡ "উৎসর্গে"

. Rabindranath Tagore—By E. J. Thomson—The Heritage of India Series, 1921.

* ২০২ পৃষ্ঠা † ২৮৯ পৃষ্ঠা ‡ ১৩৫ পৃষ্ঠা

শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

হিমালয় সম্বন্ধে যে দুইটী সনেট্ আছে তাহার প্রশংসায় লেখক উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছেন 'for the splendid use of Modern Science', কিন্তু সেই সনেট্ দুটিতেই শিব ও পার্ব্বতীর প্রেম, তপস্যা ও মিলন সম্বন্ধে যে অপূর্ব্ব কল্পনা ও অদ্ভুত সৌন্দর্য্য রহিয়াছে এবং সে সৌন্দর্য্য যে Modern Science-এর 'splendid use-'এর অপেক্ষা অনেক বেশী 'splendid', তাহা তাঁহার চোখে ধরা পড়ে নাই; সেই হেতু তিনি তাহাদের কবিত্বরসও উপলব্ধি করিতে পারেন নাই—তাঁহার কাছে বড় হইয়া উঠিয়াছে 'Modern Science'! রবীন্দ্রনাথের "জীবনদেবতা" ব্যাখ্যা করিতে বসিয়া তাহার উপর তিনি যে তাঁহার খৃষ্টীয় চিত্তের মনগড়া তত্ত্ব আরোপ করিয়াছেন তাহাতে কবিজীবনের একটি সহজ সরল সুমধুর অভিজ্ঞতা একেবারেই দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে।

টম্‌সন্-সাহেব যে ইংরেজ এবং খৃষ্টানধর্ম্মের প্রচারক একথাও তিনি ভুলিতে পারেন নাই, এবং তাঁহার এই খৃষ্টীয় মনোবৃত্তি যেখানে সুযোগ পাইয়াছে সেইখানেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইংরেজ জাতির বাঙ্‌লা দেশ অধিকার ও ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার প্রচারের ফলেই যে বাঙ্‌লা সাহিত্য ও বাঙালীর জাতীয় জীবনের প্রেরণা উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, এ-কথার আভাস তিনি প্রথমেই দিয়াছেন। রিচার্ড্‌সন্, ডিরোজিও, মেকলে-প্রমুখ মহাত্মাদের কাছে বাঙ্‌লাদেশ প্রভৃত ঋণী; ম্যার্শ্‌ম্যান্, কেরী, ডাফ্, ডেভিড্ হেয়ার, ইঁহাদের ঋণও বাঙ্‌লাদেশ কখনও অস্বীকার করে নাই, কিন্তু এ-কথা কিছুতেই সত্য নয়, যে শুধু ইঁহাদের প্রেরণার ফলেই বাঙ্‌লা দেশে নবজাগরণ সম্ভব হইয়াছিল। এই ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার প্রচার, খ্রীষ্টানধর্ম্মের প্রচার ত ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও হইয়াছিল, তবে সেখানে এই নবজাগরণ সম্ভব হইল না কেন? বাঙ্‌লা দেশের বিশিষ্টতাই যে এই নবজাগরণকে সম্ভব করিয়াছিল এ-কথা স্বীকার করিলে ইংরেজ প্রেষ্টিজের কোনো হানি হইত না। তরুণ বয়সে রবীন্দ্রনাথের মনে যে-সমুদয় সমসাময়িক ভাবপ্রবাহ নানা প্রকার তরঙ্গ তুলিয়া তাঁহার চিন্তাধারাকে একটি বিশিষ্ট গতি দান করিতেছিল, তাহার কথা বলিতে গিয়া কেশবচন্দ্রের প্রভাব সম্বন্ধে টম্‌সন্-সাহেব যাহা বলিয়াছেন তাহার কোন পরিচয়ই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কেশবচন্দ্রের প্রতি টম্‌সন্-সাহেবের এই পক্ষপাত* তাঁহার রাজপ্রীতি ও খৃষ্ট-প্রীতির জন্যই কি? মাইকেল মধুসূদন দত্ত টম্‌সনের নিকট বড় হইয়াছেন, তিনি বাঙালী কবি বলিয়া ততটা নয়, যতটা তিনি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী কবি বলিয়া! মাইকেলের খৃষ্টধর্ম্মগ্রহণ যে একটা accident মাত্র, এ-কথা একবারও টম্‌সন্-সাহেবের মনে হয় নাই। "জীবনদেবতা" রহস্যের মধ্যেও টম্‌সন্ দেখিয়াছেন "the influence of Western thought," অথচ ইহা শুধু রবীন্দ্রনাথেরই নিজস্ব নহে—বাঙালীর তথা ভারতবাসীরই অন্তরের কথা! "Western thought"-এর কোনো প্রশ্নই তাহাতে উঠিতে পারে না। টম্‌সন্ সাহেব আবিষ্কার করিয়াছেন যে "নৈবেদ্য"-কাব্যের অনেক কবিতাতেই New Testament-এর প্রভাব রহিয়াছে, এবং "তুমি সর্ব্বাশ্রয়, একি শুধু শূন্য কথা" সনেট্‌টিতে যীশুখৃষ্টের একটি উপদেশ-বাণীরই কাব্যরূপ নাকি বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। "নৈবেদ্য" ও "গীতাঞ্জলি"র ভাবধারার মধ্যে খৃষ্টধর্ম্মের একটি ফল্গুস্রোতের সন্ধান পাইয়া টম্‌সন্-সাহেব পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা নাকি "অচলায়তন"-এর মধ্যে খৃষ্টীয় তত্ত্ব সমধিকভাবে আত্মগোপন করিয়া আছে! কিন্তু কোথায়, কি ভাবে, সে কথা তিনি নির্দ্দেশ করা প্রয়োজন বোধ করেন নাই!

কিন্তু শুধু এই খৃষ্টপ্রীতিই টম্‌সন্-সাহেবকে অভিভূত করে নাই—তাঁহার পশ্চিম-প্রীতি, বিশেষ করিয়া ইংরেজ প্রীতিও, তাঁহার বিচার-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের নাট্যে, কাব্যে বা প্রবন্ধে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি যেখানেই কোন কটাক্ষ প্রকাশ পাইয়াছে, গ্রন্থকার সেইখানেই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছেন।

* "Without him (Keshab) the poet must have been born into a far poorer heritage of thought and emotion."—১৯ পৃষ্ঠা

"য়ুরোপের পত্র" তাঁহার মনঃপূত হয় নাই; "Nationalism", "Personality", "Creative Unity" প্রভৃতি পুস্তকগুলিতে পশ্চিমের দম্ভর সভ্যতা ও জাতিপ্রেমের জিঘাংসার প্রতি রবীন্দ্রনাথের চিত্তের যে বিতৃষ্ণা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাও গ্রন্থকারের ভাল লাগে নাই। "নৈবেদ্য"-এর কতকগুলি সনেটের মধ্যে পশ্চিমের শিক্ষা ও সভ্যতার প্রতি যে বিরূপ ইঙ্গিত আছে সে সম্বন্ধেও টম্‌সন্ নিজের আপত্তি গোপন করিতে পারেন নাই। স্বজাতির সভ্যতার প্রতি টম্‌সন্-সাহেবের এই মমত্ববুদ্ধি অবশ্যই মার্জ্জনীয়। কিন্তু যিনি "The Other side of the Medal"-পুস্তকের লেখক, তিনি জালিয়ানওয়ালাবাগের যে নৃশংস অত্যাচারকে উপলক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'স্যর' উপাধি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই জালিয়ানওয়ালাবাগের নায়ক ডায়ারকে প্রকারান্তরে সমর্থন করিতে লজ্জা বা কুণ্ঠা বোধ করেন নাই ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয়।* তিনি গবেষণা করিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন যে, জালিয়ানওয়ালাবাগে সমবেত জনতা মোটেই নিরস্ত্র ছিল না, কারণ, "they carried lathis, the traditional and very effective weapon of Indian peasants",—যাহাকে বাধা দিবার জন্য ডায়ারের প্রয়োজন হইয়াছিল কামান ও মেশিন্-গানের! ব্রিটীশ-চরিত্র ও ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অসীম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে এ-কথা প্রমাণ করিবার জন্য টম্‌সন্-সাহেব চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই, এবং পাঞ্জাব-অত্যাচারকে উপলক্ষ্য করিয়া ভারতবর্ষে ব্রিটীশ-প্রভুত্বের প্রতি কবির যে আন্তরিক বিরাগ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাকে টম্‌সন্-সাহেব একটা সাময়িক "exasperation" মাত্র বলিয়া আত্মপরিতৃপ্তি পাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। "বলাকা"র 'তাজমহল' কবিতাটির আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, "The Mogul Empire always touches his (Rabindranath's) imagination. * * * His admiration wins from him the greatest tribute he could give when he calls Taj the Emperor-poet's 'new *Meghaduta*'"। তাহার পরেই গ্রন্থকার বলিতেছেন: "A Britisher might wish that his own Empire could touch his mind with similar fire, but it never does!"* কেন যে করে না তাহা কি টম্‌সন্-সাহেব জানেন না? বাঙলার জাতীয় আন্দোলনের প্রতি তাঁহার ইংরেজ-চিত্তের বিদ্বেষও তিনি গোপন করিতে পারেন নাই—ব্যুরোক্র্যাটিক মনোবৃত্তি যে সাহিত্যসমালোচককেও কতখানি অভিভূত করিতে পারে, টম্‌সন্-সাহেব তাহার খুব ভাল পরিচয় দিয়াছেন!

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ও নাটকে দেখা যায়, রাজা যিনি, তিনি জনসাধারণের সমভূমিতে নামিয়া আসিয়াই তাঁহার জীবনের সুখ ও আনন্দকে লাভ করেন। তাঁহার অনেক রচনায় মানবতার এই আদর্শটি ভাবরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। তাঁহার এই "Republicanism" (টম্‌সন্-সাহেবের ভাষা) রাজভক্ত ইংরেজ টম্‌সনের মজ্জাগত সংস্কারকে আঘাত করিয়াছে। "রাজা"-নাটকে "The King refuses to exercise any of the ordinary prerogatives of kingship, to punish treason or resent insult!" রাজা তাঁহার ক্ষমতা পরিচালনা করেন না, বিদ্রোহের শাস্তি বিধান করেন না, অপমানের প্রতিশোধ নেন না—কী ভয়ানক কথা! "His plays have plenty of kings but they are usually abdicating or wanting to abdicate!"† এ কি কখনও ইংরেজের সহ্য হয়? রাজভক্তি যে ইংরেজ জাতির মজ্জার সঙ্গে জড়িত!

"কথা ও কাহিনী"তে "বন্দীবীর" কবিতাটি শিখবীরদের আত্মোৎসর্গের, ধর্ম্মের জন্য বন্দীর প্রাণদানের, কিশোর বীরের মৃত্যুবরণের একটি করুণ অথচ বীরত্বপূর্ণ কাহিনী। কী সুন্দর হইয়া ফুটিয়াছে এই কবিতাটিতে শিখশৌর্য্যের গরিমাদৃপ্ত ছবি! 'অলখ নিরঞ্জন' কথাটির

* "The angriest of his enemies should admit that General Dyer was in a position which the ablest and most humane men would have found terribly difficult"—২৭৪ পৃষ্ঠা

* ২৪৭ পৃষ্ঠা

† ২২১ পৃষ্ঠা

শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

মধ্যে যে আছ এবং কবিতাটির ছন্দের মধ্যে যে তেজদৃপ্ত মাধুর্য্য আছে তাহা অনির্ব্বচনীয়—অথচ টম্‌সন্-সাহেবের কাছে ইহা কোন মূল্যই বহন করিল না। এই কবিতাটির সমালোচনায় তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে শুধু তাঁহার কাব্যরস-উপলব্ধির অক্ষমতাই সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই, কবির প্রতি তাঁহার অশ্রদ্ধাও প্রকাশ পাইয়াছে। "In * * 'Captive Heroes', which tells how the Mussalmans butchered the Sikh prisoners, he shows that he can rant like any other 'patriotic' poet in the world." ইহা কি সাহিত্য-সমালোচনা, না আর কিছু ?

টম্‌সন্ "মুক্তধারা"কে কবিগুরুর শ্রেষ্ঠ নাটক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে। "রক্তকরবী"র উল্লেখ করিয়া তিনি এক কথায় তাহার সমালোচনা শেষ করিয়াছেন ;—"*Red Oleanders*" has been published in England as well as in India but made no impression" ।* বিলাতের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু টম্‌সন্ এ-দেশের কথা যাহা বলিয়াছেন, আমরা জানি, সে কথা সত্য নয়, কারণ "মুক্তধারা" অপেক্ষা "রক্তকরবী" আমাদের কাছে কম প্রিয় একথা কোনো বাঙালী পাঠকই বলিবেন না। নন্দিনীর স্নিগ্ধ মাধুর্য্য, কিশোরের আত্মদান, বন্ধখরের রাজার চিত্তের ক্ষুধা "রক্তকরবী"র সকল দুঃখ ও অবিচারের উপর একটি অপরূপ আলোক বিকীর্ণ করিয়া আছে —নন্দিনী ও কিশোরের বুকের রক্তে "রক্তকরবী"র বাঙালী পাঠকের চিত্ত রাঙিয়া উঠে। কিন্তু এই "রক্তকরবী"কে ইংলণ্ডের ভাল না লাগিবার কারণ আছে—ইহার মধ্যে ইংরেজ তাহার সাম্রাজ্যলিপ্সার প্রতি কবির বিদ্বেষের গন্ধ আবিষ্কার করিয়াছে ; *Poetry Review* নামে একখানি কাগজে কোনো ইংরেজ সমালোচক স্পষ্টই বলিয়াছেন—"It is a public denunciation of British Government in India !" টম্‌সন্-সাহেব এ-কথা মুখ ফুটিয়া বলেন নাই বটে, কিন্তু বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, "রক্তকরবী"তে ইম্পিরিয়ালিজ্‌ম্ ও ক্যাপিটালিজ্‌ম্-এর প্রতি যে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রহিয়াছে, তাহা তাঁহার বুকে বাজিয়াছে। আমরা অবাক হই, সাহিত্য-পরিচয় যিনি দিতে বসিয়াছেন, একজন শ্রেষ্ঠ কবির রস ও রহস্যের সহিত পাশ্চাত্য পাঠকের পরিচয় সাধন করিবার ভার যিনি লইয়াছেন, তাঁহার কাছে "রক্তকরবী"র রস ও সৌন্দর্য্য কোনো মূল্যই লাভ করিল না, আর তাঁহার সাহিত্যদৃষ্টিকে অন্ধ করিয়া দিল তাহার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত—যাহা কবির কাছে অন্ততঃ কোনো মূল্যই বহন করে না ? পুষ্পিত লতাটির উপর দৃষ্টি পড়িয়া চোখ পরিতৃপ্তি লাভ করিল না, আর যে কণ্টকিত খুঁটিটি বাহিয়া গাছটি লতাইয়া উঠিয়াছে তাহাকে দেখিয়া চোখ টাটাইয়া উঠিল ? ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদীর আঁতে ঘা লাগিয়াছে বলিয়াই "রক্তকরবী"র সাহিত্য সৌন্দর্য্য উপেক্ষিত হইয়া গেল ?

কি প্রাচীনকালে, কি বর্ত্তমানে, ভারতবর্ষের সাধনা ও সভ্যতা যে পশ্চিমের শ্রেষ্ঠতর সাধনা ও সভ্যতার কাছে ঋণী এবং তাহারই দৌলতে ভারতবর্ষ আপন সমৃদ্ধি খুঁজিয়া পাইয়াছে, এ-কথা কল্পনা করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা আত্মপরিতৃপ্তি অনুভব করিয়া থাকেন এবং প্রাণপণে তাহা প্রমাণ করিতেও প্রয়াস পান। প্রাচীন ভারতের শিল্পে ও সাহিত্যে, নাট্যে ও নীতিতে তাঁহারা সর্ব্বত্রই পাশ্চাত্য প্রভাব আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং অসভ্য ভারতবাসীরা যে পশ্চিমের দানে ও দয়াতেই সভ্য ও সমৃদ্ধ হইয়াছে, কোমর বাঁধিয়া সে কথা প্রমাণ করিবার চেষ্টাও তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই করিয়াছেন। টম্‌সন্-সাহেবও এই মনোভাবের হাত এড়াইতে পারেন নাই—ইংরেজ জাতির ও ইংরেজী সাহিত্যের বিজয়পতাকা তিনি সর্ব্বত্র উড্ডীন করিতে চাহিয়াছেন ! তিনি বোধ হয় আফ্‌শোষ করেন, রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া ইংরেজ কবি হইলেন না কেন ? সুযোগ পাইলেই তিনি দেখাইতে চাহিয়াছেন রবীন্দ্র-সাহিত্যের মধ্যে যাহা কিছু শ্রেয় ও সুন্দর, তাহা ইংরেজী শিক্ষার ও ইংরেজী সাহিত্যেরই কল্যাণে ! বাঙ্‌লা

* ২৮৫ পৃষ্ঠা।

দেশের 'রাজনীতি-কুণ্ডলায়িত আব্‌হাওয়া'র এবং তাহার সংকীর্ণ সমাজ ও পারিবারিক জীবনের মধ্যে বাস করিয়াও রবীন্দ্রনাথ যে কি করিয়া একজন বিশ্বকবি হইয়া উঠিতে পারিলেন, এ-কথা ভাবিয়া টম্‌সন্‌ অবাক হইয়া গিয়াছেন, কিন্তু কারণ খুঁজিয়া পাইতে তাঁহাকে বেগ পাইতে হয় নাই,—রবীন্দ্রনাথ উদ্ধার পাইয়া গিয়াছেন শুধু ইংরেজী সাহিত্যের কৃপায় ! তাঁহার মতে রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রথম উন্মেষই হইয়াছিল ইংরেজী সাহিত্যের আব্‌হাওয়ায়। যখন তাঁহার বয়স আঠারো তখনই নাকি "His considerable acquaintance with English poetry was a great gain"। কবিগুরুর চৌদ্দ বৎসর বয়সে লেখা অধুনা-দুষ্প্রাপ্য "বনফুল"-কাব্যে টম্‌সন্‌-সাহেব সেক্‌স্‌পীয়রের "Tempest" ও ওয়ার্ডস্‌ওয়র্থের "Ruth" কবিতার প্রভাব আবিষ্কার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ সেই বয়সে "Tempest" ও "Ruth" পড়িয়াছিলেন কিনা সেই বিষয়েই আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে,—যতদূর জানি পড়েন নাই। যেখানে ইংরেজী প্রভাব আবিষ্কার করা সম্ভব হয় নাই, গ্রন্থকার সেখানে পাশ্চাত্য প্রভাব নির্দ্দেশ করিয়াই আংশিক পরিতৃপ্তি লাভের প্রয়াস পাইয়াছেন। "রাজা ও রাণী" নাটক লিখিবার আগে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই ইব্‌সেনের "Doll's House" পড়িয়াছিলেন, নহিলে সুমিত্রার সঙ্গে 'নোরা'র চরিত্রের এমন মিল কি করিয়া সম্ভব হইল? সাহিত্যসমালোচকের কাছে এই যুক্তি শুনিয়া হাসি পায়। বিংশ শতাব্দীতেও সাহিত্যসমালোচনায় এ-সব কথা চলিতে পারে এ-কথা বিশ্বাস করিতে সহজে প্রবৃত্তি হয় না। ঊনবিংশ শতাব্দীর পণ্ডিতমহলে একবার এমন একটা কথা প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল যে, হোমারের কাব্য ইলিয়ড্‌ ও ওডিসি পাঠ করিয়াই বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন; যুক্তি ছিল সীতা-চরিত্রের সঙ্গে হেলেন্‌-চরিত্রের মিল, সীতাহরণ ও হেলেনের পলায়ন, সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ-চরিত্রের সঙ্গে হোমার-মহাকাব্যের কোনো কোনো চরিত্রের অদ্ভুত ঐক্য। কিন্তু এখনকার পণ্ডিত-মহল এই রকম পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইলে শুধু হাসিয়াই ক্ষান্ত হন্‌ না, খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন। কিন্তু আজ বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের শেষে টম্‌সন্‌-সাহেব সমালোচনার সেই মাপকাঠিকেই ধরিয়া আছেন—শুধু স্বাজাত্য-গর্ব্বের অভিমানে। তুলনামূলক সমালোচনা, বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন দেশের কবি ও লেখকদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের বিচার ও বিশ্লেষণ নিশ্চয়ই সমালোচকের কর্ত্তব্য, কিন্তু টম্‌সন্‌ যাহা করিয়াছেন তাহা সাহিত্য-সমালোচনা নয়, স্বাজাত্য-প্রীতির প্রচার। কতগুলি চরিত্রের আপাত-মিলের উপর নির্ভর করিয়া ভাবপ্রভাবের কোনো বিচার-বিশ্লেষণ চলিতে পারে না। "রাজা ও রাণী" রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ ইব্‌সেন মোটেই পড়েন নাই, যেমন তিনি স্পেন্‌সারের "Fairie Queen" এ পর্য্যন্ত পড়েন নাই। অথচ টম্‌সন্‌-সাহেব মনে করেন যে এই বইখানি পড়িয়াই "অচলায়তন"-নাটকের গল্পভাগ কবির মনে জাগিয়াছিল! এই কথা না বলিলে ইংরেজী সাহিত্যের গৌরবের কোনই হানি হইত না। ইংরেজী সাহিত্যের স্মৃতি ও সংস্কার, যে কারণেই হউক্‌, রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তকে অভিভূত করিতে পারে নাই; রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিসিজ্‌মের মধ্যে শেলি, কীট্‌সের প্রভাব আছে এ-কথা সত্য, কিন্তু তাহার শতগুণ বেশী প্রভাব আছে বাঙ্‌লা বৈষ্ণব সাহিত্যের। যাহার কোলে-পিঠে তিনি মানুষ হইয়াছেন, সেই সংস্কৃত সাহিত্যই রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তের ভাবমাতা।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কবিজীবন একটা নিরবচ্ছিন্ন ভাবপ্রবাহ। তাহাকে খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন করিয়া, বিচার বিশ্লেষণ করিয়া কখনও তাহার সমগ্র সৌন্দর্য্যের সন্ধান পাওয়া যায় না—তাহাতে অনেক জিনিষই বিকৃত হইয়া দৃষ্টি ও বুদ্ধিকে পীড়িত করে। কবিপ্রতিভার প্রথম উন্মেষ হইতে আরম্ভ করিয়া কবিজীবনের ভাব-ধারা নানা স্তরে নানা বিকাশের ভিতর দিয়া আপনাকে কি করিয়া নিয়ন্ত্রিত করিয়া চলে তাহার সন্ধান না পাইলে কখনও কাব্য-পরিচয় ও কবিজীবনীর কোনো সার্থকতা থাকিতে পারে না। খণ্ড বিশ্লেষণের দোষে ক্ষুদ্র যাহা, তুচ্ছ যাহা, তাহাই অনেক সময় বড় হইয়া দেখা দেয়, আর যাহা সত্যই সুন্দর ও মহৎ তাহাই আবার দৃষ্টির

শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

আড়ালে পড়িয়া যায়—এবং এই দু'য়ের দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়িয়া কবিজীবনের যাহা সত্য-বস্তু, সেই সমগ্র জীবনের মধ্যে যে বাণী চিরন্তন রূপ গ্রহণ করিয়াছে, তাহা একেবারেই লেখক ও পাঠকের দৃষ্টিপথে পড়িবার অবসর পায় না। টম্‌সন্-সাহেবের বই-এর ইহা আর একটি প্রধান ত্রুটি। রবীন্দ্রনাথ যে তাঁহার কবিজীবনে একটা সুমহান সত্যকে চিরকালের জন্য সার্থক করিয়াছেন,—আজিকার বর্ত্তমানের কোনো সমস্যা নহে, অতীতের কোনো ইতিহাসের কথা নহে,—ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানের অতীত এই সৃষ্টিজগতের এক বিচিত্র রহস্যকে যে তিনি তাঁহার কাব্যে রূপান্তরিত করিয়া তুলিয়াছেন এবং প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার কবিজীবনের শেষ পর্য্যন্ত যে একটি নিরবিচ্ছিন্ন ভাবস্রোত বহিয়া গিয়াছে, টম্‌সন্-সাহেবের বই পড়িলে তাহার কোনো আভাসই পাওয়া যায় না, অথচ ঐখানেই কবিজীবনী ও কাব্য-আলোচনার সার্থকতা। রবীন্দ্র-কাব্যের এবং জীবনের এমন অনেক তুচ্ছ জিনিসকে তিনি এতটা বড় করিয়া তুলিয়াছেন এবং অনেক বড় জিনিস তাঁহার কাছে এমন স্বল্প সমাদর পাইয়াছে যে মনে হয়, রবীন্দ্র-কবি জীবনের বিকাশের ইতিহাসে কোথায় যে কা'র স্থান তাহা তিনি বুঝিতেই পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সুদীর্ঘ জীবন ব্যাপিয়া যে-সমস্ত কাব্য, নাটক, উপন্যাস রচনা করিয়াছেন টম্‌সন্-সাহেব যথাসম্ভব নির্ভুলভাবে তারিখ অনুযায়ী একটির পর আর একটি করিয়া সেগুলি সাজাইয়া দিয়াছেন এবং প্রত্যেকটির সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য বলিয়াছেন, কিন্তু একটির সঙ্গে আর একটির অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, কবিবরের সমগ্র কাব্য-সৃষ্টির মর্ম্মকথা কিংবা তাঁহার সৌন্দর্য্যরস ও ভাবরহস্য কিছুই তিনি নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। আমাদের দেশে বাউলদের এক প্রকার পোষাক অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন,—নানান্ বিচিত্র রঙের ছোট ছোট অসংখ্য কাপড়ের টুকুরো একটির সঙ্গে একটি সেলাই করিয়া জুড়িয়া পোষাকটি তৈরী,—সমগ্র পোষাকের ঐক্যের কোনো সম্বন্ধও তাহাতে নাই; টম্‌সন্-সাহেবের বই পড়িয়া মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সৃষ্ট সাহিত্য বুঝি এই রকম একটি বাউলের পোষাক!

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর কল্পনা ও আদর্শ শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য্য-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার দিন হইতেই তাঁহার চিত্ত ও চিন্তার মধ্যে রূপ গ্রহণ করিতেছিল; কবিগুরুর জীবনে ইহা কোনো কল্পনার বিলাস নহে, পৃথিবীর লোককে চমৎকৃত করিবার ইহা কোনো কূট-কৌশল নহে; বিশ্বভারতীর সুমহান্ আদর্শ রবীন্দ্রনাথ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন; কোনো সাময়িক উত্তেজনায়, কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের উৎসাহে অথবা প্রেরণায় ইহার জন্ম হয় নাই,—রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও কবিজীবনের আদর্শের সঙ্গে যিনি পরিচিত তিনিই এ-কথার সাক্ষ্য দিবেন। অথচ টম্‌সন্-সাহেব বলিতেছেন, রবীন্দ্রনাথ ১৯২০—২১ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপে, বিশেষ করিয়া জার্ম্মাণী ও ফরাসীদেশে, যে বিপুল সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, সেই "European success encouraged the poet to formulate his dreams of an Asiatic University of Santiniketan". বিশ্বভারতীর জন্মকথার এমন অবমাননা আর কেহ করিতে সাহস করিয়াছে কিনা জানি না! দেশে ফিরিয়া আসিয়া রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী গড়িবার উৎসাহে নাকি ভাঁটা পড়িয়াছিল, কারণ বিদেশে একদল উৎসাহী তরুণচিত্তের মত্ত উৎসাহ ও উত্তেজনার মধ্যে পড়িয়া রবীন্দ্রনাথের বিচারবুদ্ধি একেবারে চাপা পড়িয়া গিয়াছিল! "Clear thinking is not easy when you are surrounded by a mob of eager young faces; and away from India he had forgotten the difficulties of the situation" *। শুধুই কি তাহাই? রবীন্দ্রনাথ সেইবার য়ুরোপ-প্রবাসকালে তাঁহার কোনো ইংরেজ বন্ধুকে লিখিত একখানি পত্রে ইংরেজের জাতীয় চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার যে ব্যক্তিগত মতামত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহার উপর টিপ্পনী কাটিয়া টম্‌সন্-সাহেব লিখিয়াছেন—"আমরা ভারতবর্ষে আছি শাসক-জাতিরূপে, অতিথিরূপে নয়; যে-দিন ইংরেজ ভারতবর্ষের আদরআতিথ্যে বাস

* ২৭৯ পৃষ্ঠা

করিবে সে-দিন হয়ত "an Indian poet, writing exultant letters from the midst of a superb European success, will say something worthier of himself than this patronising summary (of English character)"* টম্‌সন্-সাহেবের অনুমান হয়ত কতকটা সত্য, কিন্তু 'exultant letters', 'worthier of himself' ইত্যাদি কথা নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের প্রতি খুব শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে না এবং তাঁহার উদ্দেশ্যকে বুঝিবার প্রয়াসও তাহাতে প্রকাশ পায় না!

টম্‌সন্-সাহেব তাঁহার এই বিরাট পুস্তকটিতে যে-সকল অদ্ভুত তথ্য ও মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার দুই চারিটির নমুনা উল্লেখ করিতেছি। "রাজা ও রাণী" সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "It had a political reference which helps to explain its very considerable measure of popularity on the stage"। "রাজা ও রাণী"র সাহিত্যসৌন্দর্য্য নয়, বিক্রমের চরিত্র নয়, সুমিত্রার আত্মত্যাগ নয়, সাহিত্যরসিককে ইহার কিছুই তৃপ্তি দিতে পারিল না, চোখে পড়িল তাহার 'political significance', যাহার জন্ম নাকি অভিনয়ে "রাজা ও রাণী" উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে! আবার তাহার কিছু পরেই টম্‌সন্-সাহেব তাঁহার সাহিত্য রসজ্ঞানের পরিচয় দিতেছেন—"Non-co-operation is here in the germ, a generation before Mr. Gandhi launched it"। এই অপূর্ব্ব তথ্য টম্‌সন্-সাহেব কোথায় পাইলেন জানিতে ইচ্ছা হয়। আর একটি হাস্যোদ্দীপক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করি। রবীন্দ্রনাথের গানগুলি বাঙালীর খুব প্রিয়; টম্‌সন্-সাহেবের মতে তাহার একটি প্রধান কারণ, "because vendors of patent medicines have annexed them to advertise their wares"। ‡ কার্য্যকারণের কি অপূর্ব্ব সম্বন্ধই না টম্‌সন্-সাহেব আবিষ্কার করিয়াছেন? এ-কথা টম্‌সন্-সাহেবের একবারও মনে হইল না যে, কবির গানগুলি প্রিয় বলিয়াই, তাঁহার কবিতার অনেক 'লাইন' বাঙ্‌লার লোকের মুখে মুখে ফিরে বলিয়াই, বিজ্ঞাপনদাতারা সেই সব গান ও 'কবিতার' লাইন উদ্ধার করিয়া ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করে,—বিজ্ঞাপনদাতারা গান ও কবিতার লাইন উদ্ধার করে বলিয়াই লোকের নিকট সেই সব গান ও কবিতা প্রিয় হইয়া উঠে নাই!! "রাজা"-নাটকের পথিক-বালকদের গান টম্‌সন্-সাহেবের মতে "imbecile revelry"; রবীন্দ্রনাথের 'ঠাকুর্দ্দা'-চরিত্র "is just a nuisance", 'রাজা'র সুরঙ্গমা "annoying person"। বাঙ্‌লার পল্লীজীবনে ভবঘুরে পথিক-ছেলেদের উদ্দাম সঙ্গীতের মাধুর্য্য যে ব্যক্তি কবির হৃদয় লইয়া অনুভব করে নাই, আমাদের দেশের যাত্রায়, কথকতায়, পল্লী-উৎসবে, বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় 'বাউল' এবং 'ঠাকুর্দ্দা' যে মায়াজাল বিস্তার করিয়া আছে, তাহার মর্ম্ম যে হৃদয়ে গ্রহণ করিতে পারে নাই, শুধু তাহার মুখেই এমন অদ্ভুত উক্তি শোভা পায়।

টম্‌সন্-সাহেব এক জায়গায় বলিতেছেন, "The same folk who to-day are sneering at his (Rabindranath's) fame, and treating him as an exposed charlatan, in 1913 were finding his work 'of supreme beauty', 'a rare and wondrous thing', and of 'trance-like beauty'" † ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে যে-সমস্ত ইংরেজ সাহিত্য-রসিক রবীন্দ্র-কাব্যের মধ্যে অসীম সৌন্দর্য্যের সন্ধান লাভ করিয়াছিলেন আজ যে সেই সমঝ্‌দারের দলই অভদ্র ভাষায় রবীন্দ্রনাথের নিন্দা সুরু করিয়াছেন এমন তথ্য টম্‌সন্-সাহেব কোথা হইতে আবিষ্কার করিলেন জানি না, কিন্তু যদি তাহা ঘটিয়াই থাকে, তবে তাঁহাদের এই মত-পরিবর্ত্তনের কারণ টম্‌সন্-সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? আমরা বলি সাহিত্যরসবিচারের ফলে এই মত পরিবর্ত্তন হয় নাই; একথা গোপন করিয়া লাভ নাই যে রবীন্দ্রনাথ, রাজদত্ত উপাধি বর্জ্জন করিয়া ইংরেজ জাতির প্রতি যে অপমানাঘাত করিয়াছেন,

* ২৭৮ পৃষ্ঠা

‡ ১৪৮ পৃষ্ঠা।

† ২৪৯ পৃষ্ঠা

শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

তাহার ফলেই টম্‌সন্-সাহেবের দেশে এই রবীন্দ্র-নিন্দা সুরু হইয়াছে। টম্‌সন্-সাহেবকে আর একটি প্রশ্ন করিতে পারি কি? রবীন্দ্রনাথের উপাধি-পরিত্যাগের চিঠির ভাব, ভাষা ও ভঙ্গিমা সম্বন্ধে টম্‌সন্-সাহেবের ছোট বইটিতে যে একটু ভাল কথা ছিল ("A classic utterance"),—তাঁহার বড় বই-এর ভিতর তাহার কোনো উল্লেখই নাই কেন? টম্‌সন্-সাহেবের "The Other Side of the Medal"-নামক পুস্তক প্রকাশিত হইবার পর, তাঁহার স্বদেশী সমালোচকদের সুতীব্র কশাঘাতই কি তাঁহার এই শুভবুদ্ধিকে জাগাইয়া তুলিয়াছে?

সকলেই জানেন নন্-কো-অপারেশন্ আন্দোলন হইতে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে দূরে রাখিয়াছিলেন, কিন্তু এ-খবর টম্‌সন্-সাহেবকে কে দিয়াছে যে, "Mr. C. R. Das used to close each busy day with a full dress commination of Rabindranath"? * অসহযোগ আন্দোলনের যুগে নাকি "There was a great campaign of detraction of Ram Mohon Ray"। রামমোহনের বিরুদ্ধে "campaign of detraction" কিছুই হয় নাই; যাহা হইয়াছিল তাহা এই—মহাত্মা গান্ধী কটকে একদিন কথাপ্রসঙ্গে চৈতন্য, নানকের তুলনায় তিলক ও রামমোহনকে 'pigmy' বলিয়াছিলেন; মহাত্মার এই কথার বিরুদ্ধে তখন যথেষ্ট প্রতিবাদও হইয়াছিল। মহাত্মার এই হঠাৎ-বলা একটা কথাকে "campaign of detraction" বলিব কি করিয়া?

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে টম্‌সন্-সাহেব আবিষ্কার করিয়াছেন "endless references to the first night of nuptials" ‡ এবং তাহা টম্‌সন্-সাহেবের রুচিকর হয় নাই। কি করিয়াই বা হইবে? বাঙালী জীবনে বিবাহের রাত্রি যে কি রহস্যময় ও তাহার মাধুর্য্য যে কতখানি টম্‌সন্-সাহেবের ইংরেজী কোর্টশিপ্ ও 'মধু-চন্দ্র'-সংস্কারগ্রস্ত মন কি করিয়া তাহা উপলব্ধি করিবে? দুরু-দুরু-বক্ষ নববধূর লজ্জা ও ভয় বাঙালী কবিচিত্তকে কি বিচিত্র দোলায় দোলা দেয়, তাহা টম্‌সন্-সাহেব কি করিয়া বুঝিবেন? "সোনার তরী"-কাব্যখানি নাকি বাসর-ঘরের বর্ণনায় ভারাক্রান্ত ("Marriage-chamber obsession") এবং এ-কাব্যখানি টম্‌সন্-সাহেবের মতে—"A book from which I am glad to escape into an 'ampler ether and diviner air"! "সোনার তরী"র কাব্যরস যিনি উপলব্ধি করিতে পারিলেন না, এবং বাসর-ঘরের বর্ণনাই যাঁহাকে উত্যক্ত করিয়া তুলিল, তাঁহার রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচনার প্রয়াস শুধু যে হাস্যকর তাহা নহে, কাব্যরসিকের পক্ষে বিরক্তির কারণও বটে।

কিন্তু কবিকে বুঝিবার ও কাব্যরস উপলব্ধি করিবার ক্ষমতার চূড়ান্ত পরিচয় টম্‌সন্-সাহেব দিয়াছেন তাঁহার নিম্নোল্লিখিত কথাটিতে—"If he (Rabindranath) had been able to study such work as (say) Dr. Bradley's discussion of the reasons for the failure of the long poem in Wordsworth's age or Dr. Bridges' careful appraisement of Keats' Odes relatively among themselves, I think he (Rabindranath) might have been an even greater poet" † শিল্পশাস্ত্র পড়িয়া শিল্পী হয়, কাব্য-সমালোচনা পড়িয়া কবি হয় এমন কথা সাহিত্যক্ষেত্রে টম্‌সন্-সাহেবই বোধ হয় প্রথম উচ্চারণ করিলেন। Bradley ও Bridges-এর সমালোচনা পাঠ করিলে রবীন্দ্রনাথ আরো বড় কবি হইতে পারিতেন এমন কথা বাতুলেও বলিবে কিনা সন্দেহ! যত বড় সাহিত্য-সমালোচকই হউন, কবি সৃষ্টি করিবার, কবিত্বশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিবার ক্ষমতা তাঁহার কোথায়? সমালোচক কবির কাব্যরস ও কবিজীবনের ভাবধারাকে সহজ ও সরস উপায়ে পাঠকের কাছে উপস্থিত করেন মাত্র, হয়ত সময় সময় কবির সঙ্গে একাসনে বসিয়া তাঁহাকেও কবি হইয়া যাইতে হয়, কিন্তু তাই বলিয়া

* ২৭৫ পৃষ্ঠা

‡ ২৭৬ পৃষ্ঠা

† ২২৮ পৃষ্ঠা

কাব্য সৃষ্টি করিবার, কবিত্বকে জাগ্রত করিবার এবং কবির ভাবধারাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে কি ?

তিনশো পঁচিশ পৃষ্ঠার এই সুবৃহৎ কেতাবখানিতে শ্রীযুক্ত টম্‌সন্-সাহেব রবীন্দ্রপ্রতিভার সকল দিকেরই পরিচয় দিতে ও আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন—রবীন্দ্রনাথের শৈশবজীবন, তাঁহার কৈশোরে ও যৌবনে কবিজীবনের বিকাশ, তাঁহার নাটক ও গীতি-নাট্য, তাঁহার উপন্যাস, তাঁহার প্রবন্ধ, তাঁহার "জীবন-দেবতা"-রহস্য, তাঁহার শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী ও তাহাদের উদ্দেশ্য ও আদর্শ, তাঁহার বর্ত্তমান কবিজীবন, সমস্তই তাঁহার পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে এবং তাহাদের প্রত্যেকটি সম্বন্ধে তাঁহার মতামত তিনি নিঃসংশয়ে প্রচার করিয়াছেন। তাহার সত্যতা যাচাই ও সমালোচনা করিতে গেলে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কবি-জীবনের ধারাটির আলোচনা করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে এবং তাহাতে টম্‌সনের বর্ত্তমান বইখানির মতো আর একখানি বড় বই লিখিতে হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আবার বলিতে চাই—কোনো দেশের শ্রেষ্ঠতম কবি এবং পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে, পাঠককে তাঁহার কাব্যের রস ও রূপ, রহস্য ও সৌন্দর্য্যের সন্ধান দিতে হইলে, সেই দেশের ভাষা ও সাহিত্যের সহিত, পুরাণ ও ইতিহাসের সহিত, স্মৃতি ও সংস্কারের সহিত যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা দরকার, টম্‌সন্-সাহেবের তাহা নাই, যাহা আছে তাহা একেবারেই যথেষ্ট নহে। তাঁহার বাঙ্‌লা জ্ঞান যে কিরূপ অল্প, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-মহাশয় "প্রবাসী" ও "মডার্ণ রিভিউ" কাগজে তাহা ইতিমধ্যে খুব ভাল করিয়াই দেখাইয়াছেন। তাহার পুনরুল্লেখের কোনো প্রয়োজন নাই। "অরূপ-রতন"-এর ইংরেজী অনুবাদ যিনি করেন "Ugly gem", 'অরূপ' ও 'কুৎসিতের' তফাৎ যিনি বুঝিতে পারেন না, সেই ব্যক্তির রবীন্দ্রসাহিত্য আলোচনা যে কত বড় বিড়ম্বনা তাহা কি করিয়া বুঝাইব ?

সাহিত্য-সমালোচনা-প্রসঙ্গে এ-কথা স্বীকার করিতেই হইবে, যে সমালোচক যদি স্বদেশ স্বধর্ম্ম স্বসমাজ এবং স্বজাতি-অভিমানের ঊর্দ্ধে উঠিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহার সেই সমালোচনা কখনও সাহিত্য-পদবীতে উন্নীত হইতে পারে না। পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ কবির কাব্য-সৃষ্টি সমালোচনা করিতে বসিয়া টম্‌সন্-সাহেব সেই সুমহান্ ঊর্দ্ধে উঠিতে পারা দূরে থাকুক, তাহার প্রান্তসীমাতেও পৌছিতে পারেন নাই। তাঁহার স্বধর্ম্ম, স্বরাষ্ট্র, স্বজাতি এবং স্ব-সাহিত্য-প্রীতিই বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ কতটুকু খৃষ্টান, কতটুকু নহেন, ইংরেজ জাতি ও রাষ্ট্রের কতটুকু নিন্দা কতটুকু প্রশংসা তিনি করিয়াছেন, ইংরেজী সাহিত্যের কাছে তিনি কতটুকু ঋণী এবং কতটুকু তাঁহার নিজস্ব, এই সমস্ত কথাই টম্‌সন্-সাহেবের আলোচনাকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে। এবং ঠিক এই কারণেই তাঁহার সমালোচনা কদাচিৎ সাহিত্য-পদবী দাবী করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছে।

টম্‌সন্-সাহেব বলিয়াছেন, বাঙ্‌লা-দেশে 'literary criticism'—'সাহিত্য-সমালোচনা' নাই,—"Politics overshadow all thought, and the national sensitiveness is so quick that a book is judged not by its honesty or the help it brings, but solely according as it flatters patriotic vanity".*। এ-কথা সত্য কি না সে বিচারের আপাততঃ প্রয়োজন নাই, কিন্তু টম্‌সন্-সাহেব তাঁহার কেতাবে 'সাহিত্য-সমালোচনার' যে নমুনা দেখাইয়াছেন, তাহাতে মনে হয় না যে তিনি তাঁহার বর্ণিত বাঙ্‌লা দেশের 'সাহিত্য-সমালোচনার' খুব ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিয়াছেন। আমরা স্বচ্ছন্দে তাঁহার ভাষার অনুকরণ করিয়া বলিতে পারি যে, "He too has judged Rabindranath solely according as his works have flattered his English and Christian vanity !" আর লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়

* ২৯৭

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

'সাহিত্য-সমালোচনার' যে আদর্শকে Ph. D. উপাধি দ্বারা সম্মানিত করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় না যে 'লণ্ডনী' 'সাহিত্য-সমালোচনার' আদর্শ খুব উন্নত এবং লণ্ডনের পি-এইচ্-ডি উপাধির মূল্যও খুব বেশী!

ভয়

[প্রাচীন আসামী হইতে অনুবাদ]

নির্ব্বাপিত অগ্নিগিরি, তবু তা'রে সখি
ক'রো না বিশ্বাস কভু পলকেরো তরে—
অন্তরে কি ব্যথা তা'র উঠিছে ঝলকি
বাহির হইতে তাহা কে বলিবে ওরে!
নিশিত-অস্ত্রের মত এ মোর যৌবন
রাখিয়াছি বিস্মৃতির কালো কোষে ভরি;
এসো না এসো না কাছে, কি জানি কখন্
তোমারে আঘাত করে সেই ভয়ে মরি!

মাঠ-শালিখেরা কাঁপে ধূসর-ডানায়
দধি-পাণ্ডু শশী দোলে আকাশের কোল—
স্বপ্নে-পাওয়া বায়ু ফেরে শাল-বনে হায়
প্রবালের রসে ভেজা পূবের অঞ্চল।
নিজ মনে ভয়, তাই এমন নিশীথে
তোমারে বলিতে নারি নিকটে আসিতে।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

বর্ণমালাতত্ত্ব

পরলোকগত সুকুমার রায়

পরলোকগত সুকুমার রায়ের পরিচয় "বিচিত্রা"র পাঠকদিগের নিকট দিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই বোধ হয়। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী-মহাশয়ের ন্যায় তিনিও বাংলা-সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত। পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সুকুমার বাংলা শিশুসাহিত্যকে "আবোল্-তাবোল্" ও "হ-য-ব-র-ল" নামে যে দুইখানি অত্যুৎকৃষ্ট পুস্তক উপহার দিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবে। "আবোল্-তাবোল্" শুধু শিশু-সাহিত্যে নয়, কবিত্বসম্পদে, কল্পনার বৈচিত্র্যে, ছন্দের লালিত্যে, হাস্যরসের অভিনবত্বে বাংলা কাব্যগ্রন্থের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবার দাবী রাখে। অপূর্ব্ব হাসির গল্প "হ-য-ব-র-ল" সম্বন্ধেও এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, তাহা যে-কোনো দেশের শিশু-সাহিত্যে গৌরবের বস্তু বলিয়া বিবেচিত হইবে।

এই সব রচনায় ও শিশুপাঠ্য "সন্দেশ" সম্পাদনে সুকুমার যে-শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, সে-শক্তি সেইখানেই আপনার পরিচয় সীমাবদ্ধ করিয়া রাখে নাই, নানা দিকে, নানা ভাবে তাহা আপনাকে প্রকাশ করিয়া গিয়াছে। তাঁহার "দৈবেন দেয়ম্", "ক্যাবলের পত্র", "ভাষার অত্যাচার" প্রভৃতি যে-সমুদয় প্রবন্ধ মাসিকপত্রিকার পৃষ্ঠায় ইতঃস্তত: বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, যদি কোনো দিন তাহা সংগৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়, তবে পাণ্ডিত্য, চিন্তাশীলতা ও সহজ সুন্দর লিখন-ভঙ্গীর একত্র সমাবেশ কত হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

অনাবিল হাস্যরসরচনায় তিনি যে কতদূর সিদ্ধিলাভ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার সাক্ষ্য রহিয়াছে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে "প্রবাসী"তে প্রকাশিত "ভাবুকসভা" নামধেয় ক্ষুদ্র কৌতুকনাট্যখানিতে ও তাঁহার অপ্রকাশিত "চলচিত্তচঞ্চরী" ও "শব্দকল্পদ্রুম" নাটিকাদ্বয়ে। এই দুইখানি নাটিকাই আমরা "বিচিত্রা"র পাঠকদিগকে উপহার দিবার ইচ্ছা রাখি। সুকুমারের অকালমৃত্যুতে বাংলা-সাহিত্যের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে।

মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব্বে তিনি "বর্ণমালাতত্ত্ব" লেখা আরম্ভ করেন। কিন্তু নিতান্ত পরিতাপের বিষয় তাঁহার এ-রচনা তিনি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। যদি পারিতেন, তবে ইহা যে একটি অপূর্ব্ব বস্তু হইত, তাহা এই অসমাপ্ত রচনা হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। লেখাটি অসম্পূর্ণ বটে, কিন্তু 'কাঠামো'টি থাকায় অসংলগ্ন অংশগুলি খাপছাড়া মনে হয় না ;—সেজন্য মধ্যে মধ্যে দু'একটি বর্ণ বাদ থাকা সত্ত্বেও রচনার অংশগুলি সবই দেওয়া হইল। ইহা বর্ণমালা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণামূলক রচনা নহে; বিশ্বছন্দের একটি ছন্দের আভাষ মাত্র—

"শুন শুন শুন তত্ত্ব নূতন, কে যেন স্বপন দিলা,
ভাষা-প্রাঙ্গনে স্বরে-ব্যঞ্জনে ছন্দ করেন লীলা!"

—"বিচিত্রা"-সম্পাদক

পড়' বিজ্ঞান, হবে দিক্‌জ্ঞান, ঘুচিবে পথের ধাঁধা,
দেখিবে গুণিয়া, এ দীন্ দুনিয়া, নিয়ম-নিগড়ে বাঁধা।
কহে পণ্ডিতে, জড়-সন্ধিতে, বস্তু-পিণ্ড-ফাঁকে,
অণু-অবকাশে, রন্ধ্রে-রন্ধ্রে, আকাশ লুকায়ে থাকে।
হেথা হোথা সেথা জড়ের পিণ্ড, আকাশ-প্রলেপে ঢাকা,
নয়কো কেবল নীরেট গাঁথন, নয়কো কেবলি ফাঁকা।
জড়ের বাঁধন বদ্ধ আকাশে, আকাশ-বাঁধন জড়ে—
পৃথিবী জুড়িয়া সাগর যেমন, প্রাণটি যেমন ধড়ে।
'ইথার'-পাথারে, তড়িত-বিকারে, জড়ের জীবন দোলে,
বিশ্ব-মোহের সুপ্তি ভাঙিছে সৃষ্টির কলরোলে॥

বর্ণমালাতত্ত্ব

পরলোকগত সুকুমার রায়

শুন শুন শুন তত্ত্ব নূতন, কে যেন স্বপন দিলা,
ভাষা-প্রাঙ্গণে স্বরে-ব্যঞ্জনে ছন্দ করেন লীলা !
স্বর-ব্যঞ্জন যেন দেহ-মন, জড়েতে চেতন বাণী,
এক বিনা আরে থাকিতে না পারে, প্রাণ-হারা যেন প্রাণী।
দোঁহে ছাড়ি দোঁহে, মূক রহে মোহে, ভাষার বারতা ভুলি'
স্বরের নিশাসে, 'আহা' 'উহু' ভাষে, ব্যঞ্জনে নাহি বুলি।
স্তিমিত-চেতন জগত যখন, মগন আদিম ঘুমে,
অঘোর-তিমির, স্তব্ধ বধির, স্বপ্ন-মদির ঘুমে ;
আকুলগন্ধে আকাশ-কুসুম উদাসে সকল দিশি,
অন্ধ জড়ের বিজন আড়ালে কি যেন রয়েছে মিশি !
জাগে হাহুতাশ. স্বরের বাতাস, জড়ের বাঁধন ছিঁড়ি
ফিরে দিশাহারা, কোথা ধ্রুবতারা, কোথা স্বর্গের সিঁড়ি !
অ আ ই ঈ উ ঊ, হা হা হি হি হু হু, হাল্কা শীতের হাওয়া,
অলখচরণ প্রেতের চলন, নিঃশ্বাসে আসা যাওয়া ;
খেলে কি না খেলে, ছায়ার আঙুলে, বাতাসে বাজায় বীণা,
আলস-বিভোর, আফিঙের ঘোর, বস্তুতন্ত্রহীনা।
ভাবে কূল নাই, শুধু ভেসে যাই, যুগে যুগে চিরদিন,
কাল হ'তে কালে, আপনার তালে, অনাহত বাধাহীন॥

অকূল অতলে, অন্ধ অচলে, অস্ফুট অমানিশি,
অরূপ আঁধারে, আঁখি-অগোচরে, অদ্ভুতে অদ্ভুতে মিশি।
আসে যায় আসে, অবশ আয়াসে, আবেগে আকুল প্রাণে,
অতি আনমনা, করে আনাগোনা, অচেনা অজানা টানে,
আধোআধো ভাষা, আলেয়ার আসা, আপনি আপন-হারা
আদিম আলোতে, আব্‌ছায়াপথে, আকাশ-গঙ্গা-ধারা।

ইচ্ছা-বিকল ইন্দ্রিয়দল, জড়িত ইন্দ্রজালে,
ইসারা আভাষে, ঈঙ্গিতে ভাষে, রহ রহ ইহকালে।
কেন ইতিউতি, উতলা আকুতি, উস্‌খুস্ উঁকিঝুঁকি,
উড়ে উচাটন, উড়ু উড়ু মন, উদাসে ঊর্দ্ধমুখী।

হের একবার, সবি একাকার, একেরি এলাকা মাঝে
ঐ ওঠে শুনি, ওঙ্কার-ধ্বনি, একূলে ওকূলে বাজে॥

ওরে মিথ্যা এ আকাশ-চারণ, মিথ্যা তোদের খোঁজা,
স্বর্গ তোদের বস্তু সাধনে, বহিতে জড়ের বোঝা।
আকাশ-বিহনে বস্তু অচল, চলে না জড়ের চাকা,
আইল আকাশে ফোক্‌লা বাতাস, কেবলি আওয়াজ ফাঁকা।
সৃষ্টিতত্ত্ব বিচার করনি, শাস্ত্র পড়নি দাদা—
জড়ের পিণ্ড আকাশে গুলিয়া, ঠাসিবে ভাষার কাদা !
শাস্ত্রবিধান কর প্রণিধান, ওরে উদাসীন অন্ধ,
ব্যঞ্জন-স্বরে, যেন হরি-হরে, কোথাও রবে না দ্বন্দ্ব।
মরমে মরমে সরম পরশে বাতাস লাগিলে হাড়ে,
ভাষার প্রবাহে, পুলক-কম্পে, জড়ের জড়তা ছাড়ে॥

(তবে) আয় নেমে আয়, জড়ের সভায়, জীবন-মরণ-দোলে,
আয় নেমে আয়, ধরণীধূলায় কীর্ত্তন কলরোলে।
আয় নেমে আয় কণ্ঠ্যবর্ণে, কাকুতি করিছে সবে,
আয় নেমে আয় কর্কশ ডাকে, প্রভাতে কাকের রবে॥

নমো-নমো নমঃ, সৃষ্টি প্রথম, কারণ-জলধি জলে
স্তব্ধ তিমিরে প্রথম কাকলী, প্রথম কৌতূহলে ;
আদিম তমসে প্রথম বর্ণ, কনক-কিরণ-মালা ;
প্রথম-ক্ষুধিত বিশ্ব-জঠরে প্রথম প্রশ্ন-জ্বালা।

কহে "কই, কেগো, কোথায় কবেগো, কেন বা কাহারে ডাকি"
কহে "কহ কহ, কেন অহরহ, কালের কবলে থাকি" ?
কহে কানে কানে, করুণ কূজনে, কল কল কত ভাষে,
কহে কোলাহলে, কলহ-কুহরে, কাষ্ঠ-কঠোর-হাসে।
কহে কটমট, কথা কাটাকাটা—"কেও-কেটা কহ কা'রে ?
কাহার কদর কোকিল-কণ্ঠে, কুন্দ-কুসুম-হারে ?
কবি কল্পনে, কাব্যে-কলায়, কাহারে করিছ সেবা ?
কুবের-কেতনে, কুঞ্জ-কাননে, কাঙাল কুটিরে কেবা ?
কায়দা-কানুনে, কার্য্যে-কারণে, কীর্ত্তিকলাপমূলে,
কেতাবে কোরাণে, কাগজে-কলমে, কাঁদায়ে কেরানীকুলে ?
কথা কাড়ি কাঁড়ি, কত কাণা কড়ি, কাজে কচু কাঁচ্‌কলা,
কভু কাছাকোছা, কোর্ত্তা কলার, কভু কৌপীন খোলা।
কুটিল কৃপণে, কুৎসা-কথনে, কুলীন কন্যাদায়ে,
কর্ম্মক্লান্ত, কালিমা-কান্ত, ক্লিষ্ট কাতর কায়ে।
কলে কৌশলে, কপট কোঁদলে, কঠিনে কোমলে মিঠে—
ক্লেদ-কুৎসিত, কুষ্ঠ-কলুষ, কিল্‌বিল্ কৃমি কীটে"।
'ক'-এর কাঁদনে, কাংস্য-ক্বণনে, বস্তু-চেতন জাগে,

অকাল-ক্ষুধিত-খাই-খাই-রবে, বিশ্বে তরাস লাগে।
আকাশ অবধি ঠেকিল জলধি, খেয়াল জেগেছে খ্যাপা!
কারে খেতে চায়, খুঁজে নাহি পায়, দেখ কি বিষম হ্যাঁপা!
(খালি) কর্ত্তালে কভু কীর্ত্তন খোলে? খোলে দাও চাঁটিপেটা!
নামাও আসরে 'ক'-এর দোসরে, 'গেঁদেলো গেঁদেলো খেটা'!

এখনো খোলেনি মুখের খোলস, এখনো খোলেনি আঁখি,
ক্ষণিক খেয়ালে পেখম ধরিয়া, কি খেলা খেলিল পাখী!
খোল খরতালে, খোলসা খেয়ালে, "খোল খোল খোল" ব'লে,
সখের খাঁচার খিড়কী খুলিয়া, খঞ্জ খেয়াল চলে।
প্রখর-ক্ষুধিত তোখড় খেয়াল, ক্ষেপিয়া রুখিল ত্বরা,
চাখিয়া দেখিল, খাসা এ অখিল, খেয়াল-খচিত ধরা।
খুঁজি সুখে দুখে, খেয়ালের ভুলে, খেয়ালে নিরখি সবি,
খেলার খেয়ালে, নিখিল-খেয়াল লিখিল খেয়াল-ছবি।
খেয়ালের লীলা খদ্যোত-শিখা, খেয়াল খধূপ-ধূপে,
শিখী পাখা' পরে, নিখুঁত আঁখরে, খচিত খেয়ালরূপে।

* * *

খোদার উপরে খোদ্‌কারী ক'রে ওরে ও ক্ষিপ্ত-মতি,
কীলিয়ে অকালে কাঁঠাল পাকালে, আখেরে কি হবে গতি?
খেয়ে খুরো চাঁটি, খোল কহে খাঁটি, "খাবি খাব, ক্ষতি নাই."
খেয়ালের বাণী করে কাণাকানি –"গতি নাই, গতি নাই"।

গতি কিসে হবে, চিন্তিয়া তবে, বচন শুনিনু খাসা,
পঞ্চ-কোষের প্রথম খোসাতে, অন্ন রয়েছে ঠাসা!
আত্মার মুখে আদিম-অন্ন, তাহে ব্যঞ্জন গুলি',
অনুরাগে লাগি, ক'রে ভাগাভাগি, মুখে মুখে দাও তুলি'।
এত বলি ঠেলি' আত্মারে তুলি, তত্ত্বের লগী ধরি',
খেয়ালের প্রাণী রহে চুপ্ মানি, বিস্ময়ে পেট ভরি'॥

কবে কেবা জানে, গতির গড়ানে, গোপন গোমুখী হ'তে,
কোন্ ভগীরথে গলা'ল জগতে গতির গঙ্গা-স্রোতে।
দেখ আগাগোড়া, গণিতের গড়া, নিগূঢ় গণন সবি
গতির আবেগে, আগুয়ান বেগে, অগণিত গ্রহরবি।
গগনে গগনে, গোধূলি-লগনে, মগন গভীর গানে,
করে গম্‌গম্, আগম নিগম, গুরুগম্ভীর ধ্যানে।
গিরি-গহ্বরে, অগাধ-সাগরে, গঞ্জে-নগরে-গ্রামে,
গাঁজার গাজনে, গোষ্ঠে গহনে, গোকুলে গোলোকধামে।

* * *

বিকল অঙ্গ, ভগ্ন জঙ্ঘ, এ কোন্ পঙ্গু মুনি?
কেন ভাঙা ঠ্যাঙে ডাঙায় নামিল, বাঙালা মুলুকে শুনি?

* * *

রাঙা আঁখি জলে, চাঙা হয়ে বসে, ডিঙাব সাগর গিরি,
কেন ঢঙ্ ধরি, ব্যাঙাচির মত, লাঙুল জুড়িয়া ফিরি?

* * *

টলিল দুয়ার চিত্ত-গুহার, চকিতে চিচিংফাঁক,
শুনি কলকল ছুটে কোলাহল, শুনি চল চল ডাক।
চলে চটুপটু চকিত চরণ, চোচা চম্পট নৃত্যে,
চলচিত্রিত চিরচিন্তন, চলে চঞ্চল চিত্তে।
চলে চঞ্চলা চপল চমকে, চারু চৌচির বক্রে,
চলে চন্দ্রমা, চলে চরাচর, চড়ি চড়কের চক্রে।
চলে চক্‌মকি চোখের চাহনে, চঞ্চরী-চল-ছন্দ,
চলে চীৎকার চাবুক চালনে, চপেট চাপড়ে চণ্ড।
চলে চুপি চুপি চতুর চৌর, চৌদিকে চাহে ত্রস্ত,
চলে চূড়ামণি চর্ব্বে চোষ্যে, চটি চৈতনে চোস্ত।
চিকন চাদর চিকুর চাঁচর, চোখা চালিয়াৎ চ্যাংড়া,
চলে চ্যাংব্যাং, চিতল কাতল, চলে চুনোপুঁটি ট্যাংরা॥

সাহিত্যধর্ম্মের সীমানা

শ্রীনরেশচন্দ্র সেন-গুপ্ত

বাঙ্‌লা সাহিত্যে কিছুকাল হইল একটা নূতন ধারা বহিয়া চলিয়াছে ইহা সকলেরই নজরে পড়িয়াছে। অনেকের মতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-মহাশয় এ ভাবগঙ্গার ভগীরথ। ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে, এই ধারাপন্থীরা রসোদ্বোধনের সাবেক মামুলী ক্ষেত্র ছাড়িয়া নূতন অনাসংশিতরসমূর্ত্তি বিষয়ের ভিতর রসের উৎস খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। ফলে অনেক সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে, যাহার রসের স্বরূপ ও উৎস পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্য হইতে অনেক অংশে ভিন্ন।

নূতনের সাড়া পাইলেই স্থিতি-স্থাপক জনসমাজে একটা প্রচণ্ড কোলাহলের আবির্ভাব হয়। এ-ক্ষেত্রেও তাহা হইয়াছে। অনেক আঘাত এই নূতন সাহিত্যকে সহিতে হইয়াছে। উন্মত্তের মত সাবেক সমাজ এই সাহিত্যের দিকে ইট-পাটকেল যা' খুসী ছুঁড়িয়া মারিয়াছেন। উন্মত্তের নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্ররাশির মত তার অনেকগুলিই ঠিক জায়গায় পৌছায় নাই, লক্ষ্য-বস্তুর চারিদিকে কেবল নিরর্থক আবর্জ্জনা হইয়া জমিয়া উঠিয়াছে। আর আঘাতের লক্ষ্য-নির্ণয়েও এই সব ক্ষাত্রধর্ম্মী সাহিত্য-সমালোচক তাঁদের লক্ষ্য নিশ্চয় করিতে গিয়া বাছ-বিচার করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন—কে শত্রু, কে মিত্র, কে বা নূতন, কে বা পুরাতন, কে লক্ষ্য, কে অলক্ষ্য তাহা বাছাই করিবার চেষ্টা না করিয়া এলোমেলোভাবে তাঁরা গোলাগুলি বর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। যাঁরা এতদিন এই ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন, রসসৃষ্টি ও রসের নির্ম্মল আনন্দ উপভোগের বিধিদত্ত অধিকারে তাঁরা বঞ্চিত। তাই নূতন ধারার সাহিত্য তাহাতে বিচলিত হয় নাই। কিন্তু হঠাৎ এই আক্রমণকারীদের রথের উপর আজ এমন একজন আসিয়া আসন গ্রহণ করিয়াছেন যাঁহাকে দেখিয়া নব-সাহিত্য চমকিত হইয়া চক্ষু বারবার মাজিয়া অবাক্‌-বিস্ময়ে চাহিতেছে। আজকার সংগ্রামে যিনি রথী তিনি রথীশ্রেষ্ঠ, রসসাহিত্যে তাঁর অবিসম্বাদী অধিকার। তা'ছাড়া তিনিই তো এতদিন সমালোচক-জগতের কষাঘাতের পোনেরো আনা নিজের বিশালপৃষ্ঠে বহন করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্র-সমরে দ্রোণাচার্য্যকে আপনা বিরুদ্ধে রথারূঢ় দেখিয়া গাণ্ডীবীর ক্লৈব্যের উদয় হইয়া ছিল। যাঁকে নিত্য নূতন রসের পূজারী, নূতন ধারা মন্ত্রগুরু ও অগ্রদূত বলিয়া নবসাহিত্য এতদিন পূজ করিয়া আসিয়াছে, আজ তাঁহার হাতে আঘাত খাইয় সে যদি হঠাৎ বিভ্রান্ত ও বিচলিত হইয়া উঠে তবে তাহা বিচিত্র নয়।

এতদিন নূতন সাহিত্য সম্বন্ধে যে-সব নিন্দা শোন গিয়াছে, তার প্রধান কথা এই যে, ইহা সমাজনীতি বিরুদ্ধ। তা'ছাড়া আর একটা কথা শোনা গিয়াছি যে, ইহা বিলাতী, এ-দেশের আব্‌হাওয়া বা জীবনের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্কই নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "সাহিত্যধর্ম্ম"-প্রবন্ধে যে সমালোচনা করিয়াছেন তার তলায় তলায় যে এই কথাগুলিই তাঁকেও অনবরত খোঁচা মারিতেছে, তাহা স্পষ্ট দেখা যায়। তবু সাহিত্যের প্রকৃতি বিচারে যে এই সব কথা একেবারে অবান্তর, রসজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ সে কথাটা নিজের কাছে একেবারে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তাই তিনি বলিতে বাধ্য হইয়াছেন—"সাহিত্যে যৌন-সমস্যা নিয়ে তর্ক উঠেছে, সামাজিক হিতবুদ্ধির দিক দিয়ে তার সমাধান হবে না, তার সমাধান কলারসের দিক থেকে।" এই প্রথম স্বীকার্য্য ধরিয়া লইয়া তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, "সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে বিদেশের আমদানী যে একটা বে-আব্রুতা এসেছে" তাহা কলারস-বিরুদ্ধ। কবিবরের এই সিদ্ধান্ত শ্রদ্ধার সহিত আলোচনার যোগ্য।

বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, শ্রদ্ধেয় লেখক তাঁর এ-সিদ্ধান্ত যুক্তির উপর নিয়মিতভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা না করিয়া কেবলমাত্র একটা শ্রেণীবদ্ধ কাব্যস্তূপের উপর বসাইয়া দিয়াছেন এমনভাবে, যে পড়িয়া মনে হয় তাঁর পূর্ব্বের কথাগুলি যুক্তি, কিন্তু হাত্‌ড়াইয়া দেখিতে গেলে ধরিবার ছুঁইবার মত কিছুই পাওয়া যায় না। যুক্তির একটা পাকা জবাব যুক্তি দিয়া দেওয়া যায়,

কিন্তু কাব্যের উত্তরে যুক্তির বাণ কেবলি একটা ধোঁয়ার মধ্যে ঘুরিয়া মরে, কোনও কঠিন লক্ষ্যের সন্ধান পায় না। তা'ছাড়া সমগ্র আধুনিক সাহিত্য বেষ্টন করিয়া কবিবর এই যে সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন তাহার বিষয়-বস্তু ঠিক নির্দ্দিষ্ট করিবার কোনও চেষ্টা তিনি করেন নাই। "সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে বিদেশের আম্‌দানী যে বে-আব্রুতা এসেছে" তাহা কোথায় পাওয়া যাইবে? সমস্ত আধুনিক সাহিত্য ইহার লক্ষ্য বস্তু হইতেই পারে না, কেননা যে-সাহিত্যের ভিতর শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর মতন খড়্গহস্ত শুচিধর্ম্মী সাহিত্যিকও আছেন, তাহা আদ্যোপান্ত এই অভিযোগের বিষয় হইতে পারে না। "বিদেশের আম্‌দানী" কথাটায়ও কিছু পরিচয় পাওয়া যায় না, কেননা কেবল কয়েকখানি অনুবাদগ্রন্থ ছাড়া কোনও গ্রন্থের লেখকই তাঁদের বই বিদেশের আম্‌দানী বলিয়া প্রচার করেন নাই, এবং এমন অনেকে আছেন যাঁরা তাঁদের লেখা সম্পূর্ণরূপে এই দেশের জল-মাটির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া দাবী করেন,—যাঁদের হয়তো কবি এই সমালোচনার বহির্ভূত বলিয়া মনে করেন না। তা'ছাড়া "বিদেশের আম্‌দানী" কথাটা পরিচয়হিসাবে কোনও নির্দ্দেশই দেয় না,—কেননা এক হিসাবে রাজা রামমোহনের পরবর্ত্তী সমস্ত সাহিত্যই অল্পবিস্তর বিলাতের আম্‌দানী। বিদেশী কবিতার রসাস্বাদে যারা অভ্যস্ত নয়, তাদের কাছে রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতার রসাস্বাদই অসম্ভব, এ-কথা হয়তো কবির কোনো ভক্তই অস্বীকার করিবেন না।

"বে-আব্রুতা" এবং যৌন-সম্বন্ধের উল্লেখ করিয়াও কবি বিষয়-নির্ণয় সুরু করেন নাই। কেননা যৌন-সম্বন্ধের আলোচনা বঙ্কিমচন্দ্রের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত সকল সাহিত্যেই অল্পবিস্তর হইয়াছে—হয়তো সব চেয়ে বেশী হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের নিজের বিরাট গ্রন্থাবলীতে। সেই আলোচনার ভিতর কতটা যে আব্রু-যুক্ত আর কোনটা যে বে-আব্রু এ-সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে। বে-আব্রু কাহাকে বলে এ-সম্বন্ধে মত ও রুচির ভেদ, ভিন্ন ভিন্ন দেশে এবং ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ভিতর তো আছেই, একই যুগে ও দেশে বিভিন্ন মানুষের ভিতরও আছে। মুসলমানদের কাছে যে-নারী একেবারে বে-আব্রু, বিলাতে সে অত্যধিক আবৃত বলিয়া পরিগণিত হইবে। আর আমাদের দেশে যাঁরা সেমিজবিহীন সূক্ষ্ম-সাড়ী-পরিহিতা নারীর দিকে চাহিতে কোনও সঙ্কোচ বোধ করেন না, তেমন অনেক পুরুষকে আধুনিক ইংরাজমহিলার পরিচ্ছদের বে-আব্রুতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে শুনিয়াছি।

সাহিত্যের বে-আব্রুতার সম্বন্ধেও তেমনি কোনও নিত্য বা সনাতন মাপকাটি নাই, এমন কিছুই নাই যাহার দ্বারা আব্রুতার ও বে-আব্রুর মধ্যে একটা খুব সুনির্দ্দিষ্ট সীমানা টানিয়া দেওয়া যাইতে পারে। "চোখের বালি"র অনেকগুলি দৃশ্য অনেকের মতে অতিরিক্ত বে-আব্রু। "ঘরে-বাইরে"র অনেকটা তো বটেই। অথচ আমরা তা' মনে করি না এবং সম্ভবতঃ কবীন্দ্রও তাহা মনে করেন না। শরৎচন্দ্রের "শ্রীকান্ত" কিম্বা "চরিত্রহীন" কি এই বে-আব্রুর অন্তর্ভুক্ত? এ-বিষয়ে কবিবর আমাদিগকে কোনও অভ্রান্ত নির্দ্দেশ দেন নাই। কবির কতক কথায় মনে হয় যে, যতক্ষণ লেখক কেবল মনের অভিসার লইয়া আলোচনা করেন, ততক্ষণ তিনি শালতার সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকেন, যখন তিনি মন ছাড়িয়া দেহ লইয়া টানাটানি করেন তখনই তিনি বে-আব্রু। কিন্তু তাহাতেও কথাটা স্পষ্ট হয় না। শারীর-ব্যাপার মাত্রই তো অপাংক্তেয় নয়, কেননা চুম্বনের স্থান সাহিত্যে পাকা করিয়া দিয়াছেন বঙ্কিমচন্দ্র হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সকল সাহিত্যসম্রাট। আলিঙ্গনও চলিয়া গিয়াছে। তা'ছাড়া "হৃদয়-যমুনা", "স্তন", "বিজয়িনী", "চিত্রাঙ্গদা" প্রভৃতি বহু কবিতায় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং দৈহিক ব্যাপার লইয়া অপূর্ব্ব রস উদ্বোধন করিয়াছেন। সুতরাং এখানেও একটা সীমারেখা আছে, যাহা অতিক্রম করিলেই সাহিত্য বে-আব্রু পদবাচ্য হইতে পারে। সে সীমারেখা কবি কোথায় টানিয়াছেন, তার বাহিরে কোন বই, ভিতরেই বা কোন বই,—তাহা নির্ণয় করিবার কোনও নির্দ্দেশই কবি দেন নাই।

কাজেই কবির এই সিদ্ধান্ত আলোচনা করা অত্যন্ত দুরূহ। বর্ত্তমান বাঙ্‌লা-সাহিত্যে এমন কতকগুলি বই অবশ্যই জন্মিয়াছে যার সম্বন্ধে অসঙ্কোচে বলা যায় যে, তাহা একটা শারীর-ব্যাপার লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া মানুষের একটা নিকৃষ্ট বৃত্তির সেবা করিয়াছে মাত্র, তাহা লইয়া কোনও রস উদ্বোধন করে নাই। কেবল সেই গ্রন্থগুলি সম্বন্ধেই কবির এই উক্তি প্রযুজ্য এ-কথা যদি নিঃসংশয়ে ধরিয়া লওয়া যাইত তবে তাঁহার এ-সিদ্ধান্তের সম্বন্ধে কোনও আপত্তিই উঠিতে পারিত না। কিন্তু সাহিত্যের এই অকিঞ্চিৎকর আবর্জ্জনা দূর করিবার জন্ম কবিবর তাঁর অপরিমেয় শক্তি নিযুক্ত করিয়াছেন এ-কথা মনে করা কঠিন,—কেননা এই সব বইয়ের সংখ্যা হয়তো খুব বেশী নয় এবং সেগুলি সাহিত্যের বাজারে রদী-মাল বলিয়া সুপরিচিত। তা'ছাড়া কবির লিখনভঙ্গী ও তাঁর যুক্তিতর্কের স্বরূপ হইতে মনে হয় যে তাঁর লক্ষিত বস্তু ইহার চেয়ে অধিক ব্যাপক।

রবীন্দ্রনাথ যৌন-মিলন ব্যাপারটার দুইটি স্বতন্ত্র দিকের উল্লেখ করিয়াছেন—প্রথম প্রজননার্থ মিলন, দ্বিতীয় প্রেম। এক দিক ইহার দৈহিক ব্যাপার, অপর ভাগ মানসিক বা আধ্যাত্মিক—এইরূপে তাঁর বক্তব্যের অনুবাদ করিলে বোধ হয় ভুল করা হইবে না। দৈহিক সম্বন্ধের দিকটার বিষয়ে তাঁর মত এই যে, "রসবোধ নিয়ে যে সাহিত্য ও কলা, সেখানে এর (বিজ্ঞানের) সিদ্ধান্ত স্থান পায় না।" এই কথাটা পরবর্ত্তী কথার সঙ্গে সমন্বয় করিলে তাঁর সিদ্ধান্তটা এই বলিয়া মনে হয় যে, যৌন-মিলনের এই দিকটা লইয়া যে-সাহিত্য আলোচনা করে সেইটাই 'বিদেশের আমদানী বে-আব্রুতা' এবং তার উপরই তিনি কশাঘাত করিয়াছেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি রবীন্দ্রনাথের লেখার ভিতর খুব একটা সুনির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্ত কোনও খানেই সাদা কথায় লেখা হয় নাই—সাদা কথাটা কাব্যরস ও বাক্যালঙ্কারের নিপুণ রমণীয় অরণ্যের মাঝখানে যত্নে সংগুপ্ত আছে—কেবল অলঙ্কারের ইঙ্গিত দিয়া তাহা নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। কাজেই ঠিক তাঁর কি অভিপ্রায় তাহা তাঁর কোনও বিশিষ্ট উক্তির দ্বারা নিশ্চয়রূপে নিরূপণ অসম্ভব। কিন্তু আমি যতদূর বুঝিয়া[illegible] তাহাতে কবিবর তাঁর ভাষা ও অলঙ্কারের ইঙ্গি[illegible] এই তথ্যই লক্ষিত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

এই তথ্য কবিবর কোনও সুনিবদ্ধ যুক্তিমালার দ্[illegible] প্রতিষ্ঠিত করেন নাই, কেবল যুক্তির ইঙ্গিত করিয়া[illegible] কতকগুলি রূপক দ্বারা। সেই রূপকমালা যে যুক্তি[illegible] স্থান লইতে পারে না তাহা দুই একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাই[illegible] তিনি সত্য ও সার্থকের মধ্যে যে ভেদ অভ্রান্তভা[illegible] নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ম বলি[illegible] ছেন,—"যে জিনিষের মধ্যে আমরা সম্পূর্ণকে দেখি [illegible] জিনিষই সার্থক। এক টুক্‌রো কাঁকর আমার কা[illegible] কিছুই নয়, একটি পদ্ম আমার কাছে সুনিশ্চিত (ই[illegible] কি 'সার্থকে'র সঙ্গে একার্থবোধক?) অথচ কাঁকর প[illegible] পদে ঠেলে ঠেলে নিজেকে স্মরণ করিয়ে দেয়, চো[illegible] প'ড়লে তাকে ভোল্‌বার জন্যে বৈদ্য ডাক্‌তে হয়, ভা[illegible] প'ড়লে দাঁতগুলো আঁৎকে ওঠে; তবু তা'র সত্যের পূর্ণ[illegible] আমার কাছে নেই। পদ্ম কনুই দিয়ে বা কটাক্ষ দি[illegible] ঠেলাঠেলির উপদ্রব একটুও করে না, তবু আমার সম[illegible] মন তাকে আপনি এগিয়ে গিয়ে স্বীকার করে।"

পদ্ম ও কাঁকরের এ দৃষ্টান্ত যুক্তিও নয়, নৈয়ায়িকে[illegible] দৃষ্টান্তও নয়। সে মাপে ওজন করিতে গেলে ইহা[illegible] ভিতর এতগুলি ফাঁক ধরা যায় যে নৈয়ায়িক এ-দৃষ্টা[illegible] বা যুক্তিকে কোনও মতেই স্বীকার করিতে পারে না[illegible] কিন্তু এ তো যুক্তি নয়, এ একটা রসচিত্র। যে-সত্যটা ক[illegible] প্রথমে প্রস্তাব করিয়াছেন ঠিক সেইটাই এই রসচিত্র দি[illegible] প্রকট করিয়াছেন। সত্য ইহার মধ্যে লজিকের সূত্রে নাই[illegible] আছে কবির অনুভূতিতে।

প্রথমতঃ, পদ্মের সার্থকতা ও কাঁকরের অসার্থকতা য[illegible] স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তবু একের মধ্যে আমর[illegible] সম্পূর্ণকে দেখি অপরের মধ্যে তাকে দেখি না ইহাই [illegible] তাদের মধ্যে প্রকৃত সার্থক প্রভেদ, তার কোনও হেতু[illegible] আমরা পাই না। এ-কথা খুব যুক্তির সঙ্গে বলা যাইতে[illegible] পারে যে, ইহাদের প্রকৃত প্রভেদ এই যে, পদ্ম আমাদের[illegible] আনন্দ দেয়—আমাদের রূপবোধকে পরিতৃপ্ত করিয়া, আর[illegible]

কাঁকর আমাদের পীড়া দেয়; সম্পূর্ণের প্রকাশ বা অপ্রকাশ এ-বিষয়ে একেবারে অপ্রাসঙ্গিক। তা'ছাড়া পদ্মের মধ্যেই যে সম্পূর্ণের প্রকাশ আছে, কাঁকরের মধ্যে তা' কখনই থাকিতে পারে না, এ-কথাও তো চিরন্তন সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। সমস্ত বিশ্বকে যে-দৃষ্টিতে আয়ত্ত করা যায়, সে-দৃষ্টির সম্মুখে কাঁকরও নিরর্থক নয়, তার স্থানে সে সার্থক,—আর সেই সার্থকতায় তার রসরূপের কল্পনা একেবারেই অসম্ভব নয়। যে ব্যক্তি এই বিশ্বব্যাপী দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র কাঁকরকে—sub-specie aeternitatis—দেখিতে পারিয়াছে সে তার সার্থকতা লইয়া রসরচনা অনায়াসে করিতে পারে—তার কাছে তো কাঁকর অসার্থক নয়, তার কাছে কাঁকরের সত্যের পূর্ণতা প্রকাশ হইয়াছে। সুতরাং নৈয়ায়িকের কথায় বলিতে গেলে, এ-দৃষ্টান্ত এক দিকে অব্যাপ্তি, আর একদিকে অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট।

আর একটা দৃষ্টান্ত দিই। সজ্‌নে ফুল তার সৌন্দর্য্য সত্ত্বেও, কবির কথায়,—"ও যে আমাদের খাদ্য এই খর্ব্বতায় কবির কাছেও আপনার যাথার্থ্য হারাল।" তেমনি বকফুল প্রভৃতি সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন—"রান্নাঘর ওদের জাত মেরেছে।" পক্ষান্তরে, "সকল ব্যবহারের অতীত ব'লে মকর বেঁচে গেছে।" এই সব দৃষ্টান্তদ্বারা কবি এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছেন যে,—"যে জিনিষটা কাজে খাটাই তাকে যথার্থ ক'রে দেখিনে। প্রয়োজনের ছায়াতে সে রাহুগ্রস্ত হয়।"

এ-সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আপত্তি করিবার বহু হেতু আছে। কিন্তু এ সিদ্ধান্তের সঙ্গে দৃষ্টান্তের সম্বন্ধ যদি আমরা ন্যায়ের মাপকাঠি দিয়া যাচাই করিতে যাই তবে ইহা একদণ্ডও টিকিবে না। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে দৃষ্টান্তগুলি অনিন্দনীয়, তবু, ন্যায়ের বিধানে, কেবল পাঁচটা অনুকূল দৃষ্টান্ত দিলেই কোনও সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয় না; দৃষ্টান্তগুলি সমস্ত অভিজ্ঞতার ব্যাপক হওয়া চাই—আর একশত অনুকূল দৃষ্টান্ত একটা বিরুদ্ধ দৃষ্টান্তে বিপর্য্যস্ত হয়। অথচ এখানে বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত যে অনেকগুলি আছে তাহা কবি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন;—তিনি মানিয়াছেন যে "যে-কবির সাহস আছে, সুন্দরের সমাজে তিনি জাত বিচার করেন না।" যে সজ্‌নেফুলের দৃষ্টান্ত তিনি দিয়াছেন তাহাই অন্ততঃ তাঁর নিজের কাছে সার্থক হইয়া উঠিয়া তাঁর কাব্যে স্থান পাইয়াছে, আর "বিচিত্রার" শ্রাবণের সংখ্যাতেই তেমনি কুরুচি ফুল তাঁর কাছে সার্থক হইয়াছে। পক্ষান্তরে যে বিম্বফল কবির কাছে পরম সার্থক, কবি হয় তো জানেন না, তাহাও লোকে কাজে লাগাইয়া থাকে, এবং কোথাও কোথাও তাহার তরকারীও খাইয়া থাকে। তাঁর মত সাহসিক কবি ছাড়া অন্যেও, মানুষের কাজে খুব বেশী খাটে যে গরু ঘোড়া, তাহা লইয়া কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। মকর যদি দেবীর বাহন হইয়া সার্থক হইয়া থাকে, তবে গরু কি দেবী হইয়াও সার্থক হয় নাই?—অথচ ছেলেবেলায় গরুর রচনায় কে না প্রথমেই লিখিয়াছে 'গরু অতি উপকারী জন্তু'?

তেমনি পুরুষের জীবনে পত্নীকে অকেজো বলিয়া কেউ উপেক্ষা করিবেন না—অথচ সেই যে কাজের মানুষ পত্নী, তিনিও অনেক কবির কাছে কাব্যহিসাবে সার্থক হইয়া উঠিয়াছেন।

যাহা প্রয়োজনে লাগে তাই যে কাব্য-হিসাবে অসার্থক, আর যাহা নিষ্প্রয়োজন তাই সার্থক নয়, এ কথা সত্য নহে, আর ইহার পক্ষে প্রকৃত কোনও যুক্তি নাই। কবির কাছে কোন্ জিনিষটা সার্থক, কোন্‌টা অসার্থক তার একমাত্র নির্ণায়ক সেই বিশিষ্ট কবির রস-বোধ। যাহা সেই রস-বোধকে উদ্বুদ্ধ করে তাহাই সার্থক, যাহা তা' করে না তাহা অসার্থক। এই যে রস-বোধের উপর ঘা দেওয়া, সেটা কতকটা নির্ভর করে বস্তুর স্বরূপের উপর, আর কতকটা নির্ভর করে সেই বিশিষ্ট কবির বিচিত্র চিত্তগঠনের উপর। এ কথা সত্য যে, যে-জিনিষের সঙ্গে আমাদের হামেষা পরিচয় হয় এবং যাহা আমাদের চিত্তে অন্য বিশিষ্ট প্রয়োজনদ্বারে নিয়ত প্রবেশ করে, তার প্রতি অনেক সময় আমাদের রসবোধ সাড়াহীন হইয়া পড়ে, আর যে-জিনিষ সদাসর্ব্বদা আমাদের ঘিরিয়া থাকে না, তফাৎ হইয়া কেবলমাত্র রস-বোধের দ্বারপথেই প্রবেশ লাভ করে, তাহার আঘাতে মনটা চট্ করিয়া সাড়া দেয়। এই প্রভেদের কারণ ইহা নয় যে, একটা প্রয়োজন ও আর

সাহিত্যধর্ম্মের সীমানা

শ্রীনরেশচন্দ্র সেন-গুপ্ত

একটা অপ্রয়োজন,—ইহার প্রকৃত কারণ এই যে, একটা অতিপরিচিত ও আর একটা অনতিপরিচিত। অনতি-পরিচিতের একটা প্রবল আকর্ষণ মানুষের চিত্তের সব দিকেই দেখা যায়।

অতএব কবিবরের রসাবৃত যুক্তির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের চেষ্টা না করিয়া তাঁর প্রতিপাদ্যটিকে মোটামুটি আলোচনা করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিব। তাঁর মতে যাহা সত্য তাই সার্থক নয়, আর কাব্যের প্রকৃত প্রয়োজন সত্যমাত্র লইয়া নয়, যাহা রসের দিক হইতে সার্থক তাহাই লইয়া। যাহা আমাদের প্রয়োজন, সাধারণতঃ তাহা রসের দিক হইতে সম্পূর্ণ অসার্থক।

স্ত্রীপুরুষের মিলনের দুইটি দিক আছে—একটি পশুভাবে, আর একটি মানুষভাবে,—প্রেমের ভাবে। প্রথমটির প্রয়োজন যথেষ্ট আছে, তাহার সত্যতাও অবিসম্বাদিত, কিন্তু তাহা রসহিসাবে অসার্থক। শুধু প্রেম—অর্থাৎ যৌন-সম্বন্ধের মানসিক স্বরূপটাই—রসবিচারে সার্থক হয় বা হইতে পারে। প্রেমের ভিতর একটা আব্রু আছে, কাজেই সেই আব্রুটা ভেদ করিয়া যৌনমিলনের পশুভাবের আলোচনা সাহিত্যে নিত্যবস্তু হইতে পারে না, ঠিক যেমন ভোজন-ব্যাপার লইয়া রসোদ্বোধনের চেষ্টা ক্ষণিক আমোদ সৃষ্টি করিলেও কোনও নিত্যবস্তু হইতে পারে না। সুতরাং কবিবরের সিদ্ধান্ত এই যে, বিদেশের আম্‌দানী যে বে-আব্রুতা আজকাল সাহিত্যে দেখা দিয়াছে তাহা নিত্য নয়, নিত্য হইতে পারে না।

এই যুক্তির ধারার মধ্যে অনেকগুলি ফাঁক আছে। প্রথমতঃ প্রয়োজন অপ্রয়োজন দিয়া কাব্যহিসাবে সার্থকতা অসার্থকতার নির্ণয় হয় না—একথা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ যৌনসম্বন্ধের যে দিকটা পশুধর্ম্ম বলিয়া তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা যে রসের বিচারে চিরকালই অসার্থক এ-কথা ঠিক নয়। কবির কাব্য চিরদিনই কেবল মানসিক প্রেম লইয়া সীমাবদ্ধ না থাকিয়া দৈহিক ব্যাপারে আপনার সার্থকতা খুঁজিয়াছে; চুম্বন আলিঙ্গন ছাড়িয়া খুব কম কাব্যই প্রেমের চিত্ররচনায় সার্থকতা লাভ করিয়াছে। তা' ছাড়া কালিদাস তাঁর মেঘদূতে বা ঋতুস বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস তাঁদের পদাবলীতে সম্ভোগের যে রসচিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা কোনও কাব্যামোদীই বাতিল করিতে প্রস্তুত হইবেন না।

কাব্যের মধ্যে দেহের গন্ধ থাকিলেই তাহা ব "নিত্য"-রসে বঞ্চিত হইবে একথা যে সত্য নহে পরিচয় রবীন্দ্রনাথের বহু রচনায় আছে। অথচ কেব যৌনসম্বন্ধের শারীর ব্যাপার লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি পাঠকের চিত্তের রিরংসার উপর বাণিজ্য করা যে অনিত্য কোনও রূপ রসই নয় তাহাও অস্বীকার ব পারি না। সুতরাং আসল কথা—এই দু ভিতর সীমা-নির্দ্দেশ। রবীন্দ্রনাথ যে কোথায় সীমা টানিতে চান তাহা ঠিক বুঝা গেল না। কিন্তু এ নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, এই যৌনসম্বন্ধের দৈ ও মানসিক গোটা স্বরূপটা লইয়া ইহার কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানেই অভ্রান্তভাবে চিরকালের তরে সীমা টানিয়া দেওয়া যায় না। যে ব্যাপারটার রসহিসাবে সার্থকতা নাই বলিয়া এক কবি তাহাকে অপাংক্তেয় ক রাখিয়াছেন, আর এক কবি তাহা লইয়াই অপূর্ব্ব রচনা করিয়াছেন। যৌনমিলনের যে ভাগটা রসহি অসার্থক বলিয়া রবীন্দ্রনাথ নামঞ্জুর করিয়াছেন, Theo Gautier ও Maxim Gorky সেই ব্যাপার লইয়া লিখিয়াছেন তাহাকে সামাজিক শীলতার দিক যাহাই বলিবার থাকুক, রসহিসাবে তার ঐশ্বর্য্য অস্বীকার করিবেন না। কালিদাস ও বৈষ্ণব ক কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং এ-কথা যদি সত্য যে, "সাহিত্যে যৌনমিলন নিয়ে যে তর্ক উঠেছে, সামা হিতবুদ্ধির দিক থেকে তার সমাধান হবে না, তার সম কলারসের দিক থেকে,"—তবে এই সব যে রসো ব্যাপারে একেবারে চিরকাল অপাংক্তেয় থাকিবেই এ সত্য নয়।

যাহা রসরচনা এবং যাহা কেবলমাত্র কদর্য্য ইন্দ্রি বিলাস তার মধ্যে প্রকৃত সীমা নির্দ্দেশ যৌন-মি ব্যাপারটার অঙ্গ বিশ্লেষণ করিয়া তাহার ভিতর এ

লাইন টানিয়া করা যায় না। প্রভেদটা বাহিরের নয় ভিতরের। নগ্ন নারী-মূর্ত্তি মনোহর রসমূর্ত্তি হইতে পারে, আবার কদর্য্য অশ্লীলতা হইতে পারে। Venus of Milo দেখিয়া অশ্লীলতার কথা বলিবে এমন মূঢ় কম আছে। অথচ ইহা অপেক্ষা অধিক আবৃত নারীমূর্ত্তিও কদর্য্য বলিয়া হেয় হইতে পারে। দুই-এর মধ্যে কার ভিতর আবরণ কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত তাহা ইহাদের ভেদের কারণ নয়, ইহাদের ভেদ ভাবের ভেদ। যাহা আমাদের রসবোধে সাড়া জাগায় সেটা আবৃত হউক, অনাবৃত হউক, তাহা আর্ট, আর যাহা রসবোধে সাড়া দেয় না, দিতে চায়ও না, কেবল মানুষের পশু-প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করে, তাহা আর্ট নয়। কি চিত্রে, কি গল্পে, কি কবিতায় আর্ট-হিসাবে ভাল মন্দের ইহা ছাড়া অন্য কোনও মান নাই। এই যে প্রভেদ ইহা একটা গভীর আধ্যাত্মিক প্রভেদ, যাহার স্বরূপ প্রত্যেক রসজ্ঞ স্বীকার করিবেন, কিন্তু অরসিককে অন্য কোনও বাহ্য লক্ষণ দিয়া বুঝাইবার কোনও উপায়ই নাই।

এই কথা রবীন্দ্রনাথ নিজে বহুবার বলিয়া থাকিবেন, এবং আজও যে তিনি ইহা ছাড়া অন্য কিছু বলিতে চান তাহা আমি মনে করি না। কিন্তু ইহাই যদি সত্য হয়, তবে তিনি আব্রু ও বে-আব্রুর ভিতর যে বাহ্য ভেদ স্বীকার করিয়া একের রসের নিত্যতা ও অপরের রসবিচারে অসার্থকতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছেন, সে চেষ্টা একেবারেই অসার্থক।

ইংলণ্ডের সাহিত্য ভিক্টোরীয়-যুগে চারিদিকে সম্ভ্রম বাঁচাইয়া আব্রু রক্ষা করিয়া রস-রচনার আয়োজন হইয়াছিল। সে সাহিত্য শ্লীলতার একটা বাহ্য সীমা স্বীকার করিয়া তার বাহিরের সব বস্তুকে রসরাজ্যের অধিকার হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিল। সে সীমা লঙ্ঘন করিয়া ফরাসী ও পরে ইউরোপের অন্যান্য দেশের সাহিত্যিকগণ এই অপাংক্তেয় বিষয়গুলি হইতে অপূর্ব্ব রসসৃষ্টি করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, রস-সাহিত্যের এমন কোনও বাহ্য সীমা বাঁধিয়া দেওয়া একেবারে অসম্ভব। ইঁহাদের মধ্যে যাঁরা প্রকৃত রসস্রষ্টা তাঁরা যে সত্য সত্যই এই সব বিষয়ে উচ্চ অঙ্গের রস-সৃষ্টির যথার্থ উপাদান আবিষ্কার ও সম্যক নিয়োগ করিয়াছেন অতি বড় শ্লীলতাবাদীও তাহা অস্বীকার করিবেন না। পক্ষান্তরে তাঁদের বিকৃত পদাঙ্কের অনুসরণে যে ইউরোপে বর্ত্তমান যুগে অনেক স্থলে একটা নিদারুণ উচ্ছৃঙ্খলতা, সাহিত্যের নামে বীভৎস অশ্লীলতা ও ব্যভিচার গজাইয়া উঠিয়াছে তাহাও কেহ অস্বীকার করিবেন না। এই সব অপসৃষ্টি ও প্রকৃত রসসৃষ্টির মধ্যে প্রভেদ কোনও বাহ্য সীমার নয়, প্রভেদ অন্তরের রসমূর্ত্তির।

বঙ্গ-সাহিত্যেও এই নূতন প্রেরণার একটা প্রতিঘাত দেখা দিয়াছে এ-কথা সত্য। উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গ-সাহিত্যে যে-প্রদেশ শিষ্ট-সাহিত্যের সীমাবহির্ভূত বলিয়া বর্জ্জিত ছিল, তার ভিতর প্রবেশ করিয়া একাধিক সাহিত্যিক নূতন রসসৃষ্টির আয়োজন করিয়াছেন। তা'র মধ্যে কতকটা যৌন-সম্বন্ধের পূর্ব্ব-নিষিদ্ধ দেশ হইতে সংগৃহীত। যাঁরা এ-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া প্রকৃত রসসৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছেন তাঁদের সকল সৃষ্টিকে যদি রবীন্দ্রনাথ এই বাহ্য সীমানির্দ্দেশের দোহাই দিয়া অনিত্য বলিয়া ভাসাইয়া দিতে চান, তবে বিনীতভাবে নিবেদন করিতে হয় যে, তাঁর অশেষ প্রতিভা ও অতুলনীয় শক্তি সত্ত্বেও তাঁর এই নিষ্পত্তি চরম বলিয়া মানিয়া লইতে আমি অসমর্থ। চলিত যুগের সাহিত্য সম্বন্ধে এমন বিচার কোনও কালেই কেহ ষোল আনা অভ্রান্তভাবে করিতে পারেন নাই, রবীন্দ্রনাথের এ-সিদ্ধান্তও অভ্রান্ত না হইতে পারে। আজ সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের যে স্থান, ইংরাজী সাহিত্যে একদিন জনসন্ সেই স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সাময়িক সাহিত্য সম্বন্ধে জনসনের মতামত ইতিহাস অভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণ করে নাই। রবীন্দ্রনাথের এ-মতও তেমনই একটা প্রকাণ্ড প্রতিভার একটা ব্যর্থ চেষ্টার পরিচয়রূপে ইতিহাসে স্থান পাওয়া অসম্ভব নয়।

রসসৃষ্টির মধ্যে কোন্‌টা নিত্য কোন্‌টা অনিত্য তাহা তার বিষয় লইয়া বা অন্য কোনও উপায়েই অভ্রান্তভাবে নির্দ্দেশ করা যায় না। ঈশ্বরগুপ্তের পাঁটা ও তপ্‌সী মাছের কবিতা আজ আর চলে না, বিদ্যাসুন্দরের অশ্লীল স্থান-গুলিও অচল হইয়াছে,—সে যে তা'দের বিষয় নির্ব্বাচনের

শ্রীনরেশচন্দ্র সেন-গুপ্ত

দোষে এ-কথা বলিলে অন্যায় হইবে। Lamb-এর Roast Pig সাহিত্যের একটা স্থায়ী সম্পদ, কালিদাসের মেঘদূত বা ঋতুসংহারে কিম্বা বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাসে যদি কোনও রুচিবাগীশ অশ্লীল স্থান ছাঁটিয়া ফেলিতে চান, তা'তে রস-জগতের একটা স্থায়ী ক্ষতি হইবে। একটা জিনিষ যে চলে নাই মরিয়া গিয়াছে তাহাতেই তার বিষয়-বস্তুর অসার্থকতা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হয় না। রবীন্দ্রনাথের যৌবনের অনেক কবিতাই এখন চল্‌তির বাহিরে চলিয়া গিয়াছে, যদিও আমাদের যৌবনকালে সেইগুলির চল্‌তি সব চেয়ে বেশী ছিল। তাহা হইতে এ সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, তার বিষয়বস্তু রস-হিসাবে অচল—ইহাও বলা যায় না যে, সে-কবিতা বা গানগুলিও সত্য সত্যই সার্থক রসরচনা নয়।

আর দুইটা কথা বলিয়া আমার বক্তব্যের উপসংহার করিব। নূতন সাহিত্যকে "বিদেশের আম্‌দানী" বলিয়া কবিবর কটাক্ষ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে এ-কথা লইয়া কটাক্ষপাতের প্রত্যাশা করি নাই। আলো যদি আমার অন্তরে আসিয়া থাকে, তাহা কোন জানালা দিয়া আসিয়াছে তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না, যদি সে আলো সত্য সত্যই আমার অন্তরের ভিতরকার মণিরত্ন উদ্ভাসিত করিয়া থাকে। আকাশের আলো আরসী হইতে শুধু প্রতিফলিত হয়—এখানে আলোর যে প্রকাশ তার ভিতর আরসীর কোনও কৃতিত্ব নাই। কিন্তু সেই আলোয় যখন সরোবরে পদ্ম ফুটিয়া ওঠে তখন কেহ পদ্মকে এ-কথা বলিয়া নিগ্রহ করে না যে, তোমার ফোটাটা ধার করা। রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে অনেকটারই উদ্দীপনা আসিয়াছে পশ্চিমের সাহিত্য ও সমাজ হইতে। টম্‌সন্-সাহেব এই সত্য কথাটা বলিতে গিয়া একটা বাজে ও অসত্য বলিয়া ফেলিয়াছেন যে, "রাজা ও রাণী" Doll's House-এর ছায়ায় রচিত। ইহাতে শ্রীযুক্ত বাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকে তাঁকে বিদ্রূপ করিয়াছেন। কিন্তু সমগ্রভাবে Ibsen বা Maeterlinck-এর প্রভাব যে তাঁর লেখায় আসিয়াছে সে-বিষয়ে শ্রীযুক্ত বাণীবিনোদ কি বলিবেন জানি না, অন্ততঃ কবি স্বয়ং তাহা অস্বীকার করিবেন না। তেমনি আরও অনেক লেখকের লেখাই তাঁর অন্তরের পদ্মকোরককে আঘাত করিয়াছে; তবে তিনি তাঁর গৃহীত আলোক শুধু ফিরাইয়া দেন নাই, আলো গিয়া তাঁর অন্তরে রূপের সৃষ্টি করিয়াছে। তাই বিলাতী বা অন্য যে প্রভাবই তাঁর ভিতর থাকুক, তা'তে তাঁর গৌরবহানি হয় নাই।

যে সাহিত্যকে লাঞ্ছিত করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথের এই সমরাভিযান, তাহাকে তিনি কেবল এক কথায় বিলাতের আম্‌দানী বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন। বিলাতী আধুনিক সাহিত্যের প্রভাব তার উপর আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা যে আগাগোড়া শুধু বিলাতীর পুনরুদ্গীরণ এমন কথা কিছুতেই সত্য বলিয়া মানা যায় না। এই সাহিত্যের মধ্যে এমন অনেক লেখাই আছে যাহা নিঃশেষে দেশের জীবন ও সমাজের সত্য স্বরূপের রসমূর্ত্তি—যা'কে বিলাতের আম্‌দানী বলা একটা নিষ্ঠুর পরিহাস। যদি রবীন্দ্রনাথ নাম গোত্র দিয়া তাঁর লক্ষিত বিষয়ের পরিচয় দিবার চেষ্টা করিতেন ,তবে তাঁর এ-কথার ভিতর যে অবিচার আছে তাহা দেখান যাইতে পারিত।

তা' ছাড়া এ-সাহিত্যের সম্বন্ধে তিনি এমন কথা বলিয়াছেন যাহা হইতে অনুমান হয় যে, এ-সাহিত্য কতক-গুলি বিজ্ঞানপ্রতিষ্ঠিত সত্যকে আশ্রয় করিয়া, কোনও রূপরসের বিচার না করিয়া, বিজ্ঞানের সত্যকে সাহিত্যে চালাইবার চেষ্টা করিয়াছে। এ-কথা আমরা আগে অন্য লোকের মুখে শুনিয়াছি। এবং যখনই শুনিয়াছি তখনই বক্তাকে জেরা করিয়া জানিয়াছি যে, এ-কথা বলিবার কোনও উপযুক্ত ভিত্তি নাই।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলি যে, একটি বক্তা আমার উপন্যাসগুলি Criminology-র উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাঁর কথাটার ভিত্তি শুধু এইটুকু যে, আমার একখানি উপন্যাসে Criminology-র নামটা উল্লেখ আছে, এবং সেই উপন্যাসে একটি নারীর চরিত্র সম্বন্ধে Criminology-ঘটিত একটু আলোচনা আছে। বলা বাহুল্য যে আমার বইখানার নায়িকা সে-নারী নয়—সে কেবল নায়কের চরিত্র-বিকাশের একটা উপায় মাত্র—অন্যথা

সম্পূর্ণ অবান্তর, এবং সেই নারীর চিত্তের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া প্রকাশ করিবার কোনও চেষ্টাই আমি সে-গ্রন্থে করি নাই। সুতরাং আমার সে-বই যে Criminology-র দোহাই দিয়া উক্ত বিজ্ঞানের নিরূপিত সত্যের ভিত্তির উপর লেখা এ-কথার কোনও ভিত্তিই নাই। এবং বলা বাহুল্য আমার অপর কোনও লেখাতেই Criminology-র গন্ধ মাত্রও নাই। তবু সেই বক্তা সাধারণভাবে আমার লেখার উপর এই রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন যে আমার বইগুলি প্রধানতঃ Criminology-র উপর প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথ যে-উক্তি করিয়াছেন তাহা ব্যাপকতা হিসাবে ইহা অপেক্ষাও বিস্তৃত। ইহার যদি নামরূপ সম্বন্ধে পরিচয় তিনি দিতেন, তবে বোধ হয় ইহা প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব হইত না যে, এ-কথারও ভিত্তি অতি ক্ষীণ ও অনিশ্চিত।

বাস্তবিক বর্ত্তমান বাঙ্‌লা সাহিত্যে যে-সব অসাধারণ চরিত্রের অসাধারণ কার্য্য-কলাপ লইয়া কথা লেখা হইয়াছে, তাদের কোনও এক-আধটা সম্বন্ধে হয় তো একথা বলা চলিলেও, সাধারণভাবে তাদের সম্বন্ধে এ-কথা বলা চলে না যে, সেগুলি কোনও বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত কতকগুলি সত্যের উপাদান লইয়া লেখা। যে-সব লেখা সাহিত্যপদবাচ্য, তার সম্বন্ধে সাধারণভাবে এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, সেগুলি বিজ্ঞানের বই হইতে উপাদান কুড়াইয়া লেখা নয়, জীবনের প্রত্যক্ষ দর্শন ও আলোচনার উপর প্রতিষ্ঠিত। এ-কথা যিনি অস্বীকার করিতে চান, নির্দ্দিষ্ট বিষয় হইতে দৃষ্টান্ত দিয়া যদি তিনি তাঁর কথা প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করেন, তবে তার সম্যক উত্তর দিতে আমি প্রস্তুত।

তা' ছাড়া হট্টগোলের তলায় এ-দেশে হাটের যে একেবারে কোনও চিহ্নই নাই—এ-কথা কবি যেরূপ নিশ্চয়তার সহিত বলিয়াছেন, আমি সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি, তাঁর সে নিশ্চয়তার কোনও হেতু নাই। হইতে পারে হাটের খবর তাঁর দীর্ঘ প্রবাস ও নির্জ্জন-নিবাসের আবরণ ভেদ করিয়া তাঁহার কাছে পৌঁছায় নাই, এবং হাটে এমন গণ্ডগোল এখনও জম্মায় নাই যা'তে তাঁর বিদেশের হাটে অভ্যস্ত কর্ণে কোনও সাড়া দিতে পারে, কিন্তু হাট জমিবার একটু চেষ্টা না হইতেছে এমন নয়।

তা' ছাড়া হাট জমিবার আগে হট্টগোল সাহিত্যের ইতিহাসে অনেক বার শোনা গিয়াছে। রুশো ও ভল্‌টেয়ার লিখিয়াছিলেন বলিয়াই ফরাসী-বিপ্লবের হাট জমিয়াছিল। এবং আজ বিশ্বব্যাপী ভাব-বিনিময়ের দিনে বিলাতে যেটা ঘটিয়াছে, সে সম্বন্ধে আমরা নিরপেক্ষ থাকিতে পারি কি? যে-হাট আজ পশ্চিমে বসিয়াছে তাতে আমার সওদা করিবার অধিকার কোনও প্রতীচ্যবাদীর চেয়ে কম নয়।



রূপান্তর

—গল্প—

—শ্রীসুনীতি দেবী

গত রাত্রের জড়ান খোঁপাটি কখন আল্‌গা হয়ে পিঠের উপর দীর্ঘ বেণী হ'য়ে ঝুল্‌ছিল কল্যাণী তা' টের পায়নি। তেম্‌নি ভাবেই শিউলিতলায় ফুল কুড়োচ্ছিল। জুতার শব্দে মুখ তুলে দেখে—বেড়ার ধার দিয়ে কে এক অপরিচিত তা'র দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে চ'লে গেল। একটু বিস্ময় ও একটু লজ্জায় সে সরে গেল বটে, কিন্তু প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোয় তা'র পুষ্পকোমল মুখের ছাপ অনিলের মন থেকে সরাতে পারল না।

সহুরে ছেলে অনিল এসেছিল পল্লীতে তা'র এক বন্ধুর বাড়ীতে ছুটি কাটাতে। সেখানে যখন বাঙ্গালী প্রেমের দেবতা জাতকুল মিলিয়েই প্রেমে প'ড়িয়ে দিলেন, তখন সে কল্‌কাতায় ফিরে বন্ধুদের দিয়ে বাপের কাছে মনের কথাটা জানাতে দেরী ক'রল না। তা'র পিতা জীবন-ধারণ ও ছেলের পড়ার খরচের জন্যই বোধ হয় ডাক্তারি একেবারে ছাড়েন নি, নয় ত বিপত্নীক হয়ে পর্য্যন্ত সংসার-ত্যাগীর মতই থাক্‌তেন। তিনি উদাসীন ভাবেই মত দিলেন। পিতৃমাতৃহীনা, মামাদের অন্নে পালিতা কল্যাণীর জীবনে অঘটন ঘট্‌ল। বিনা চেষ্টায়, বিনা পণে তা'র বিবাহ হ'য়ে গেল। মামারা খুসী হ'লেন, মামীরা টিপ্পুনি কেটে ব'ল্‌লেন—"বুড়ো মেয়ের কত নভেলি রঙ্গ জানা ছিল। কই আমাদের একটা মেয়ে পুরুষমানুষের সাম্‌নে অমন ফাঁদ পাতুক দেখি! ছি, ছি লজ্জায় মরি!"—

যাক্‌, "চতুর্দ্দশ বসন্তের মালাগাছি" গলায় প'রে অনিল ক'ল্‌কাতায় ফিরল। কল্যাণী মামা-বাড়ী থেকে চিরদিনের মতই বিদায় হ'ল।

লক্ষ্মীকে ঘরে তুলে সরস্বতীর পূজার উপকরণগুলি অনিল অবহেলায় ছড়িয়ে ফেল্‌ল। ঝি আর ঠাকুরে মিলে এতদিন যেমন করে সংসার চালাচ্ছিল, তা'র কোন ব্যতিক্রম হ'ল না। অনিল কল্যাণীকে কোন কাজ ক'রতে দিত না। কল্যাণীর জীবন এখানে স্বাধীন, মুক্ত; শ্বশুর সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে থাকেন, আর কেউ নেই যা'র জন্য তা'কে আড়ষ্ট হ'য়ে থাক্‌তে হবে। ছুটি নবীন জীবন প্রেমের স্রোতে গা ঢেলে দিল। কল্যাণীর কাছে এ একেবারে নূতন জগৎ। শুধু তা'রই জন্য এত আয়োজন, এত আদর,—একজন লোকের সে সর্ব্বস্ব,—এ যেন স্বপ্নাতীত সুখ! অনিলের সোহাগ বাধা-বন্ধন-সীমাহারা হ'য়ে কল্যাণীকে ঘিরে যেন এক নিমেষে নিঃশেষ হ'তে চায়। কি সে আবেগচঞ্চল দিবস ও রাত্রিগুলি!

বন্ধুরা দু'চারদিন সবুর ক'রে অনিলকে আক্রমণ ক'রল। ব'ল্‌ল,—"বউ কি আর কা'রও হয় না নাকি? সব প্রেম এক-সঙ্গে শেষ ক'রলে চ'ল্‌বে কেন? দেউলে হ'য়ে যাবি যে!"—

অনিল তাদের সঙ্গে পেরে উঠ্‌ত না, কাজেই এক একদিন সন্ধ্যায় বেরিয়ে যেত। কল্যাণীর সে-দিন সারা সন্ধ্যা যেন কাট্‌তে চাইত না।

একদিন এমনি এক সন্ধ্যায় কল্যাণী গালে হাত দিয়ে জানালার ধারে পথ চেয়ে ব'সে আছে,—হঠাৎ পিছন থেকে ঝরণার কলহাস্যে ঘর ভরিয়ে কে যেন বলে উঠ্‌ল, —"বলি ও নতুন বৌ, একা বসে হ'চ্ছে কি?"

কল্যাণী চ'ম্‌কে চেয়ে দেখে রাজ্যের রূপ দিয়ে গড়া একখানি প্রতিমা, ঘর আলো ক'রে দাঁড়িয়ে। এবারে সে একেবারে কল্যাণীর কাছে এসে ব'সে প'ড়ল। ব'ল্‌ল, —"পাশের বাড়ীতে একা একা থাকি। তোমার আস্‌তে দেখে ভাব্‌লাম যাহোক্‌ সঙ্গী জুট্‌ল। ওমা! তা তোমার নজরই নেই। আমিই কি আস্‌তে ফুরসুৎ পাই? তোমার কর্ত্তাটি ত নড়বার নাম করে না। কি তুক্‌ ক'রেছ ভাই? আমায় একটু শিখিয়ে দেবে?"

কল্যাণী হেসে ফেল্‌ল। তা'রপর আর কি,—নিমেষে দু'জনের মধ্যে নিবিড় প্রণয় জমে গেল। খানিক গল্পের পর কল্যাণী ব'ল্‌ল—"আমি তোমায় তা'হলে স্বর্ণ-দি বলেই ডাক্‌ব, কেমন"?

স্বর্ণ মুখখানা ভার ক'রে ব'ল্ল,—"তা ত ব'ল্বেই। না হয় আমার সাত বছর বিয়ে হ'য়ে গেছে, না হয় আমি তোমার চেয়ে দু'তিন বছরের বড়, তোমার নয় সবে বিয়ে হ'য়েছে, তুমি না হয় কচি খুকী, তাই বলে 'দিদি' ব'লে আমায় বুড়ো ক'রে দেবে? সে হবে না। এস আমরা সই পাতাই।"

বাস্ অমনি তাই ঠিক্ হ'য়ে গেল। আর দুই সইতে মনের কথা বলাবলির আর শেষ রইল না। ঘুরে ফিরে সেই স্বামী-সৌভাগ্যের কথা। কল্যাণী ব'ল্ল—"তুমি ভাই কি সুন্দর দেখ্‌তে, তোমার বর তোমায় খুব ভাল-বাসে, না?"

স্বর্ণ অম্‌নি ব'ল্ল,—"ও আমার পোড়া কপাল, আমি নাকি সুন্দর! তোমার বরকেই জিজ্ঞাসা করো না কে বেশি সুন্দর, তুমি না আমি?"

কল্যাণী লজ্জায় লাল হ'য়ে ব'ল্ল,—"যাও, তুমি ভারি দুষ্টু।"

স্বর্ণর হাসিতে আবার ঘরের অন্ধকার কোণগুলিও যেন হেসে উঠ্‌তে লাগ্‌ল।

এমন সময় অনিলের গলার স্বর বাইরে শোনা যেতেই স্বর্ণ পালাল। ব'লে গেল,—"আর জানালা খুলে প্রেম ক'রো না। আমি সব দেখ্‌তে পাই কিন্তু।"

অনিল ঘরে ঢুকে ব'ল্ল,—"বেশ, বেশ, আমি ভাব্‌ছি তুমি একা কষ্ট পাচ্ছ, তাই তাড়াতাড়ি ফিরছি, আর তুমি এদিকে এমন বন্ধুত্বে মগ্ন যে কখন্ ফিরেছি টেরই পাওনি। নীচে ঠাকুরের সঙ্গে কত চেঁচামিচি ক'রে তোমাদের হুঁস আন্‌তে হ'ল।"

তার'পর দু'দিন অনিল বেরুল না। শেষে বন্ধুরা এক-দিন বাইরে থেকে ডেকে ব'ল্ল,—"ও বৌদি, দড়িটা একটু লম্বা করে দিন্, ওকে চরিয়ে আনি। আবার ফিরিয়ে দেব ঠিক্।"

এ-সব শুনে কল্যাণী লজ্জায় ম'রে যেত, জোর ক'রে অনিলকে বাইরে পাঠিয়ে দিত।

একদিন কথায় কথায় স্বর্ণ ব'ল্ল,—"তুমি ভাই কেমন রোজ সেজেগুজে থাক, বেশ লাগে দেখ্‌তে।"

কল্যাণী ব'ল্ল,—"তুমি সাজ্‌লে পার।"

স্বর্ণ হতাশভাব দেখিয়ে ব'ল্ল,—"সে কথা বল কেন? সাজ্‌তে কি আমার অসাধ? বিয়ে হ'য়ে পর্য্যন্ত ভাব্‌লাম এইবার দু'খানা গয়না কাপড় প'রব, ভালমন্দ পাঁচরকম খাব-দাব, তা'র জন্যই ত বিয়ে। নয়ত বাপ্‌মা কি শুধু শুধু অম্বলরুগী মাষ্টারের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে? বয়সকালে একটু সখ্ মেটাবার জন্যই ত বিয়ে। তাও আমার কপালে হ'ল কই?"

কল্যাণী বিবাহ সম্বন্ধে সইর এমন হীন আদর্শের কথা শুনে দুঃখিতভাবে ব'ল্ল,—"ছি, ভাই, স্বামীর কথা অমন ক'রে বল্‌তে আছে? বিয়ে বুঝি শুধু সাজগোজ করা? —আর তোমার সাজ্‌তে সখ্ হ'লে কি আর তিনি বারণ ক'রবেন?"

স্বর্ণ ব'ল্ল,—"তবে শোন। তোমার দেখাদেখি কাল বিকেলে দিব্যি রঙ্গীন সাড়ীখানি প'রে, টিপ্‌টি কেটে, মুখে একটু পাউডার ঘ'সে ব'সে আছি। ওমা! এসে বলে কিনা—'থিয়েটারে যাবার উদ্যোগ হ'চ্ছে বুঝি, ও-সব আমি পারব-টারব না।'—বলেই চোখ বুঁজে ধপাস্ ক'রে বিছানায় শুয়ে প'ড়ল! তবেই বোঝ কা'র জন্যই বা সাজা। দেখ্‌বে না, তারিফ্ ক'রবে না, শেষে উল্টো চাপ কিনা থিয়েটারে যাবার জন্য সেজেছি। টান্ মেরে সব খুলে ফেলে, এমন বকুনিটাই দিলাম। আমার চেঁচানিতে বাড়ীতে কাক-চিল বসতে পেল না, কিন্তু তা'র কানে কি কিছু গেল?"

বিস্মিত হ'য়ে কল্যাণী ব'ল্ল,—"স্বামীকে বক?"

স্বর্ণ ব'ল্ল,—"বকি না? একশ'বার বকি! শুধু বকি! পারলে মারি। সে ছেলে ঠেঙ্গিয়ে খায়, আমি তা'কে ঠেঙ্গিয়ে খাই।"

কল্যাণী জিভ্ কেটে ব'ল্ল,—"ছি, ছি।"

স্বর্ণ আড়চোখে কল্যাণীর মুখের ভাব দেখে কোন-মতে হাসি চেপে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কাঁদ-কাঁদ সুরে ব'ল্ল, —"আমায় যদি ভালবাসে তবে কি আর বকিঝকি? তোমাদের দৃষ্টান্ত দেখাই, বলি অনিলবাবুর মত হও, তা' কোন গ্রাহ্য নেই। আমি যা' শক্ত মেয়ে, নয় ত কবে

শ্রীসুনীতি দেবী

হাত-ছাড়া হ'য়ে যেত। তোমরা সুখী লোক, আমার দুঃখ কি বুঝবে বল।"

কল্যাণীর মন স্বর্ণর প্রতি করুণায় ভ'রে উঠ্‌ল। সে ব'ল্‌ল,—"আহা সই, তোমায় কেমন ক'রে না ভালবেসে থাকে?"

স্বর্ণ এবার হাসিতে মাটিতে লুটিয়ে প'ড়ে ব'ল্‌ল,—"নাঃ তোর সঙ্গে দুষ্টমি ক'রেও সুখ নেই। ঠাট্টাও বুঝিস্ না!"

২

স্বচ্ছন্দ জীবনগতির মাঝখানে হঠাৎ বাধা প'ড়ে গেল। অনিলের বাবা দু'দিনের জ্বরে মারা গেলেন। ছেলের জন্য এমন কিছু রেখে গেলেন না যা'তে দিনের পর দিন ব'সে খাওয়া যায়। নবপরিণীত দম্পতি এক চমকে স্বপ্নরাজ্য থেকে কঠিন পৃথিবীর সংস্পর্শে এসে প'ড়ল। অনিল বি, এ পরীক্ষা দিতে ছুটল। বইগুলি ঝেড়ে মুছে কল্যাণী বারবার তা'তে মাথা ঠেকিয়ে ব'ল্‌ল,—"মা ওঁকে পাশ করিয়ে দাও।" কিন্তু সরস্বতীর কৃপা হ'ল না। অনিল ফেল্ হ'ল, আর সঙ্গে সঙ্গে বহু কষ্টে এক সদাগরী আপিসে সামান্য মাইনের একটা কেরাণীগিরি জুটিয়ে নিল। অনিলের কবি-কল্পনার সঙ্গে এ জীবন খাপ্ না খেলেও, পেটের দায়ে তা'কে এটা মাথা পেতে নিতে হ'ল।

ঝি, ঠাকুর বিদায় হ'ল। এ বাড়ীতেও আর চলে না। অনিল অল্প ভাড়ায় একখানা ঘর খুঁজ্‌ছে শুনে স্বর্ণ ব'ল্‌ল—"আমাদের একতলার একটা ঘর অম্‌নি প'ড়ে থাকে, তোমরা সেইখানে এসো। কল্যাণী খুব খুসী হ'য়ে অনিলকে রাজি করাল। অত অল্প ভাড়ায় অন্য জায়গায় ঘর পাওয়াও যেত না। ঘরের জানালার ধারে একটা শিউলিগাছ ছিল। সেটা দেখে অনিল ব'লে উঠ্‌ল,—"বাঃ, কি মজা! ফুল ফুটলে আবার তুমি তেমনি ক'রে কুড়োবে, আর আমি চেয়ে দেখ্‌ব। তোমায় দেখাবে যেন মূর্ত্তিমতী শারদলক্ষ্মী!"—এমনি ক'রে পরিবর্ত্তিত জীবনের কষ্টটুকু তা'রা আনন্দ দিয়ে বরণ ক'রে নিল।

অনভ্যস্ত দুঃখের মধ্যে অনিলের সুখ—কল্যাণীর তন্ময় সেবা। সে যে এমন সুনিপুণা গৃহিণী তা' অনিলের জানা ছিল না। অনিল মুগ্ধ হ'য়ে প্রশংসা ক'রলে কল্যাণী হেসে ব'ল্‌ত,—"বিয়ের আগে পর্য্যন্ত ঘরের কাজইত ক'রে এসেছি, এতে আর বাহাদুরী কি?"

অনিল ব'ল্‌ত,—"তোমার হাতের সেবা বড় মিষ্টি লাগে, তবু ক'রতে দিতে কষ্ট হয়। আমার হাতে প'ড়ে তুমি একটু বিশ্রাম ক'রতে পাও না।"

কল্যাণী ছলছল্ চোখে অনিলের মুখ চেপে ধ'রত,—তা'র এই সুমিষ্ট প্রতিবাদটুকু অনিল প্রাণ ভরে উপভোগ ক'রত।

* * * *

কল্যাণী ভারি হিসাবী হ'য়েছে। অধিকাংশ দিন নিজের ভাগের তরকারিটুকু ও-বেলার জন্য রেখে, ঝাল, টক্ যা হয় দিয়ে পাতের ভাতগুলি শেষ করে। অনিল তাড়াতাড়ি খেয়ে চলে যায়, কিছু টের পায় না। নিজের কোন্ ভাগ কতটুকু কমিয়ে অনিলের ভাগ বাড়ান যায়, এই তা'র চিন্তা। একদিন স্বর্ণ দুটো পান দিয়েছিল, কল্যাণী কি ছুতায় নীচে এসে সে দুটো তুলে রাখ্‌ল। বাজে খরচ কমাতে গিয়ে পান আনা তাদের বন্ধ ছিল। অথচ অনিল পান খেতে কি ভালবাসে! বিকেলে অনিল পান পেয়ে কত খুসী! ব'ল্‌ল,—"আপিসে মাঝে মাঝে বাবুরা পান দেন, তোমার খাওয়া হয় না ভাব্‌তাম। যাক্, তোমার সই থাক্‌তে ভাবনা নেই দেখ্‌ছি।—বলেই চোখ প'ড়ল কল্যাণীর তাম্বূলরাগলেশহীন ঠোঁটের উপর। অনিল ব'লে উঠ্‌ল—"তুমি বুঝি খাওনি? পানের দাগ দেখ্‌ছি না যে!"

কল্যাণী ব'ল্‌ল,—"সে ধুয়ে ফেলেছি, কখন্ দিয়েছিল।"—মিথ্যা বলতে গিয়ে হেসে ফেল্‌তেই অনিল তা'কে বাহুপাশে বন্দী ক'রে ব'ল্‌ল—"ও দুষ্টু! অন্যায় ক'রে আবার মিথ্যা কথা!"

কল্যাণী ব'ল্‌ল—"দোষের এ-রকম শাস্তি পেলে দোষ যে রোজই ক'রব।"

স্বামীর জন্য এইটুকু ক'রতে পারলে এত খুসী করা যায় ভেবে কল্যাণীর আনন্দ আর ধরে না। এমনি ক'রে দারিদ্র্যের মধুরতাটুকু তা'রা ভোগ ক'রত, বিষটুকু গায়ে মাখ্‌ত না।

কল্যাণীর নিপুণ হাত দু'খানি অভাবের মধ্যেও লক্ষ্মীশ্রী ফুটিয়ে রাখ্‌ত। অনিল একদিন ব'ল্‌ল,—"আমার মত সৌভাগ্য কারুর নেই। আমার পরিষ্কার কাপড়-চোপড় আর চেহারার চাকচিক্য দেখে আপিসের বাবুরা হিংসায় মরে। বৌয়ের মুখঝামটা খেয়ে অর্দ্ধেকের দিন কাটে। তা'র ওপর আমাদের মত গরীব কেরাণীরাও কত জনে বৌয়ের গয়না গড়াবার ভাব্‌নায় পাগলপারা। আর তুমি ত একখানা কাপড়ও চাও না।"

কল্যাণী উত্তর দিল,—"অভাব থাক্‌লে ত!"

অনিল ব'ল্‌ল,—"নাঃ, অভাব আর কিসের? রাজার হালে তোমায় রেখেছি!"

কল্যাণী ব'ল্‌ল,—"না ত কি!"

অনিল একটু চুপ ক'রে থেকে ব'ল্‌ল,—"সত্যি যাই বল, পৃথিবীতে তোমার মত কেউ নেই।"

কল্যাণী মনে মনে জান্‌ত তা'র মত কেন, তা'র চেয়ে শ্রেষ্ঠ নারী জগতে শতসহস্র আছে। তবু এই কথাটা তা'র অন্তর মধুতে ভ'রে দিল। প্রিয়তমের কাছে সে অতুলনীয়া, এর চেয়ে সুখ তা'র কল্পনারও অতীত।

অনিল আবার ব'ল্‌ল,—"তোমার কোন সাধ নেই কল্যাণী?"

কল্যাণী মাথা নীচু ক'রে ব'ল্‌ল,—"তোমার পায়ে মাথা রেখে ম'র্‌তে পারলেই আমার সব সাধ মিট্‌বে।"

জানি না একথা শুনে অদৃষ্টদেবতা অলক্ষ্যে হেসেছিলেন কিনা।

৩

প্রথম যখন আপিসে ঢোকে, তখন অনিলের বিশ্বাস ছিল, সে শীঘ্রই এই যাঁতাকল থেকে বেরিয়ে আস্‌তে পারবে, কিন্তু অন্ন জোটাবার মত কাজ আর কোথাও জুট্‌ল না। শেষে অনিল কেমন ক'রে তা'র চিরঅবজ্ঞাত কেরাণী জীবনে বেশ অভ্যস্ত হ'য়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্ত কেরাণীকুলের সর্ব্বনেশে নেশা রেস্‌-খেলাও তা'কে পেয়ে ব'স্‌ল। কল্যাণী প্রথম প্রথম কত বোঝাত, শেষে কান্নারূপ অমোঘ অস্ত্র প্রয়োগ ক'রল; অনিল তখনও কখনও অনুতপ্ত হ'য়ে ব'ল্‌ত,—"আচ্ছা এই শেষ।" কখনও জিতে, কখনও হেরে কতবার যে প্রতিজ্ঞা ক'র্‌ত আর এ-সবে সে যাবে না, কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'র্‌তেও বিন্দুমাত্র বিলম্ব হ'ত না।

এই সময় কল্যাণীর জগতে আবার নূতন রং ধ'র্‌ল। সে নাকি মা হবে। অনিল যখন আনন্দ ক'র্‌তে গিয়েও ব'ল্‌ল,—"খরচপত্র বড্ড বাড়বে, তাইত!"—তখন কল্যাণী অনাগত সন্তানের পক্ষ নিয়ে অনিলের উপর ভারি অভিমান ক'রল, ও মনে মনে অজাত শিশুটিকে আদরে ডুবিয়ে ফেল্‌ল।

এই সময়টা তা'র সখীর সঙ্গ তা'কে যথেষ্ট তৃপ্তি দিত না, অনিলকে কাছে পাবার ও তা'র আগেকার আদর-যত্ন পাবার তৃষ্ণায় তা'র মন ভ'রে উঠ্‌ত। আবার অনিল শিশুর কথায় তেমন উৎসাহ দেখায় না ব'লে অভিমানে সে আলোচনা বন্ধ ক'রে ফেল্‌ত। অনিল আজকাল ক্রমশঃ যেন অন্যমনস্ক হ'য়ে প'ড়েছে,—শুধু খাওয়া আর শোওয়া বাড়ীতে হয়; অধিকাংশ সময় ছুটির দিনটাও বাইরে কাটায়। যে-সময় মনের শান্তি সব চেয়ে প্রয়োজন, সেই সময়টা কল্যাণীর কেবল উদ্বেগের মধ্যেই কাটতে লাগ্‌ল। আর এতদিন এই শান্তকোমল মেয়েটির স্বভাবে যা' মোটেই ছিল না, সেই খিট্‌খিটে ভাব দেখা দিল।

কল্যাণীর প্রাণপণ প্রয়াস ছিল স্বর্ণ যেন এ-সব জান্‌তে না পারে। কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি স্বর্ণর চোখে অনিলের পরিবর্ত্তন ধরা প'ড়তে কি দেরী হয়? স্বর্ণর বুকটা বেদনায় ভ'রে উঠ্‌ত। স্বামীর অনন্যনিষ্ঠ প্রেমের অধিকারিণী স্বর্ণ সইয়ের সৌভাগ্যে কতই সুখী ছিল। সে প্রথম প্রথম অতটা অনিলের আঁচল-ধরা-ভাব পছন্দ ক'র্‌ত না, কিন্তু তাও যে এ অবহেলার চেয়ে ভাল ছিল। কেমন ক'রে অনিল এত বদ্‌লাতে পা'রল তা' সে ভেবেই পেত না। অনিলের মন ভোলাবার জন্য সন্ধ্যা হ'লেই সে নানা ছুতায় কল্যাণীকে একটু সাজিয়ে-গুজিয়ে দিত। দু'একদিন আপত্তি ক'রে কল্যাণী আর কিছু ব'ল্‌ত না, কিন্তু সুযোগ পেলেই অনিল ফিরবার আগেই সব খুলে ফেল্‌ত। অমন ক'রে ফাঁদ পেতে স্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণ ক'র্‌তে তার যেন মাথা কাটা যেত।

শ্রীসুনীতি দেবী

চুপ্ ক'রে থেকে থেকে একদিন কল্যাণী অনিলকে বেশ দু'কথা শোনাবে ঠিক্ ক'রল। অনিল তাসের আড্ডায় বেরুবার উদ্যোগ ক'রতেই কল্যাণী বিরক্তভাবে কি ব'ল্ল। অনিল পাল্টা জবাব দিল,—"তুমি কেবল পেঁচার মত মুখ ক'রে থাক্‌বে, তাই যতক্ষণ পারি বাইরে কাটাই।"

কল্যাণী আহত পক্ষীর মত বিছানায় লুটিয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল। অনিলও ভয়ানক লজ্জিত হ'য়ে প'ড়ল। তা'র পর বোঝাপড়ার ধুম। কল্যাণী ব'ল্ল,—"তুমি আর আগের মত নেই, মোটেই আমায় দেখ্‌তে পার না" ইত্যাদি।

অনিলও অনেক যুক্তি দেখিয়ে স্বপক্ষ সমর্থন ক'রল,—তার সময় কই দু'দণ্ড বাজে কথা বল্‌বার, তা' ছাড়া কল্যাণীও কি বদ্‌লায় নি, তা' ছাড়া বয়সও ত বেড়েছে, তা' ছাড়া আরও কত কি! শেষে কল্যাণীর যুক্তি—দুঃখদারিদ্র্য লাঘব করবার জন্যই ত প্রেম ও তার প্রকাশ নিতান্ত দরকার,—একথা মেনে নিলেও অনিল কার্য্যতঃ খুব বদ্‌লাল না।

নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল জগতে মানুষের মন যদি বদ্‌লায় তা'তে দোষ কি? একদিন যে অফুরন্ত প্রেম কপালে জুটেছিল তা'র জন্য কৃতজ্ঞ হওয়াই ত উচিত, তা' কেন চিরদিন থাক্‌বে না ব'লে আবদার করা কি বিজ্ঞের কাজ? দর্শনশাস্ত্রের এত কথা কল্যাণীর জানা ছিল না, জানা থাক্‌লেও তা' কাজে আস্‌ত কিনা বলা যায় না। জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবার বয়সও তা'র তখন হয়নি, বিজ্ঞতার বালাইও ছিল না। কাজেই কল্যাণী নিজের অদৃষ্টের ওপর রাগ ক'রল, তা'তে অদৃষ্টের ক্ষতি হ'ল না, তা'র নিজের বুকটাই ভেঙে-চুরে শত খান্ হ'তে লাগ্‌ল।

যে-দিন কল্যাণীর মেয়েটি ভূমিষ্ঠ হ'ল, সে-দিন স্বর্ণকেই সব ব্যবস্থা ক'রতে হ'য়েছিল। সারাদিনে অনিলের দেখা পাওয়া যায়নি, রেসে হেরে রাত্রে যখন ফিরল, তখন সংবাদ পেল কিনা মেয়ে হ'য়েছে। বাঙ্গালী পিতৃপিতামহের কাছে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত মনের সংস্কারটি যে মেয়ে হওয়ার খবরে খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌ল না, তা' বলাই বাহুল্য। টাকাও সেদিন অনেক হেরেছিল। যে কারণেই হোক্ শ্রান্ত কল্যাণীকে দুটো মিষ্ট কথা ব'ল্‌বার অবকাশ আজকার দিনেও তা'র হ'ল না।

এমনি ক'রেই ধীরে ধীরে একটি বছর ঘুরে গেল। শেফালি আপন মনে ফুটে ঝ'রে গেল, কেউ খোঁজ নিল না। কল্যাণীর শারীরিক দুর্ব্বলতার উপর মানসিক অশান্তি জুটে তা'কে যেন আর সেরে উঠ্‌তে দিল না। এখন ঝগড়া না ক'রে যখন-তখন কেঁদে-কেটে সে অনিলকে উত্যক্ত ক'রে তুল্‌ত। বুঝ্‌ত না, আগে এক ফোঁটা চোখের জল দেখ্‌লে যে অধীর হ'ত, সে আজকাল এত বুক-ভাঙা-কান্নায় কেমন ক'রে উদাসীন থাকে। আগে অত না পেলে, না-পাওয়ার ব্যথা কি এমন ক'রে বাজ্‌ত? রাণী কখনও ভিখারিণী হ'য়ে বাঁচে? এই রকম নানা চিন্তায়, নিরর্থক অভিমানে, আপনাকে সে আপনি কষ্ট দিত। আহা, অনিল তবু যদি মেয়েটার পানেও ফিরে তাকায় তা'হলেও বুঝি কল্যাণী শান্তি পায়।

তার পর আকাঙ্ক্ষাও রইল না, অভিমানও রইল না,—রইল শুধু বিরাট শুষ্কতা ও শূন্যতা,—মরুভূমির জ্বালাও বুঝি তা'র মত উগ্র নয়।

কল্যাণীর অবহেলায় অনিল আরও দূরে গেল। সইয়ের কাছেও কল্যাণী মনের দ্বার রুদ্ধ ক'রল। তা'র একান্ত আপনার রইল শুধু মেয়েটি। লুকিয়ে তা'কে বুকে চেপে কত কথা ব'ল্‌ত, আর শিশু তা'র কোমল হাতখানি মায়ের মুখের উপর বুলিয়ে ডাক্‌ত—"মাম্মা"।

কল্যাণী যখন শয্যা নিল, তখন অনিল ত দূরের কথা, স্বর্ণও ভাবেনি—প্রদীপ এত শীঘ্র নিভ্‌বে। তাই চিকিৎসার ব্যবস্থাও কিছু হয়নি। যে-দিন স্বর্ণ অবস্থা সঙ্কট বুঝ্‌তে পারল সে-দিন ব্যাকুল হ'য়ে স্বামীর বুকে ঝাঁপিয়ে ব'ল্ল,—"আমার সইকে বাঁচাও।" তিনি ডাক্তার ডেকে আন্‌লেন,—ডাক্তার জবাব দিয়ে গেল।

উদ্বেলিত অশ্রু চোখে চেপে স্বর্ণ কল্যাণীর মুখের উপর ঝুঁকে জিজ্ঞাসা ক'রল—"সই, বড় কষ্ট হ'চ্ছে কি? অনিলবাবুর আপিসে খবর পাঠাব?"

অতি শ্রান্তকণ্ঠে কল্যাণী উত্তর করিল,—"না ভাই, স্বামীর কোলে মাথা রেখে ম'রে সতীর স্বর্গে যাবার ইচ্ছা নাই। ভগবানের কোন দয়ার ভিখারী আমি নই"।—

স্বর্ণর চোখের জল বাধা না মেনে উছ্‌লে উঠ্‌ল।

চোখ দুটি ঈষৎ খুলে কল্যাণী ব'ল্‌ল,—"না, না, ভগবানের দয়া আছে বই কি। না হ'লে কি তোমায় পেতাম? মেয়েটাকে দেখো ভাই"।

তা'র পর শেফালি-বনের অশরীরী কামনা যেন শেষ নিঃশ্বাস ফেলে বাতাসে মিলিয়ে গেল।

লোকেরা কল্যাণীকে যখন পথে বার ক'রে 'হরিবোল' দিল, তখন দুটি নারী বলাবলি ক'রে গেল,—"আহা, সৌভাগ্যবতী সতী, নোয়া সিঁদুর নিয়ে চ'ল্‌ল।

কথাটা শুনেই স্বর্ণ শিউরে উঠে দুই কান ঢেকে মেঝেয় লুটিয়ে প'ড়্‌ল।

দূর

[প্রাচীন আসামী হইতে অনুবাদ]

দূরে যেতে দাও সখি, এতদিন তোরে
রাখিয়াছি চোখে চোখে—দেখেছি তোমার
কি ইঙ্গিত কি আভাস অব্যক্ত অধরে
সহসা ঝলকি ওঠে; দেখিয়াছি আর
মুক্তা-স্বচ্ছ কপোলের অন্তরে অন্তরে
রক্তের বরণ-ছটা কর্ণ-অলঙ্কার
কেমনে মলিন করে; তব নেত্রপরে
সহস্র বর্ণের ছায়া ভাব-বলাকার।

দূরে যেতে দাও সখি; বুকের ধরারে
সূর্য্য আজি কত ভাবে ঘুরায়ে ঘুরায়ে
চেয়ে দেখে তৃপ্তিহীন; বিচ্ছেদ দোঁহার
মেঘে মেঘে অপ্সরীরা আলিম্পন-ভারে
আঁকি দেয় ক্ষণে ক্ষণে; অনন্তের গায়ে
সুপ্ত ছায়াপথ সেতু গাঁথে বারম্বার।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী



মিলন-রজনী

শ্রীযুক্ত চঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-অঙ্কিত

ইংরাজী কাব্যে বাঙালী

২

মনোমোহন ঘোষ

—শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

সাঁইত্রিশ বৎসর আগেকার কথা।

অক্‌স্‌ফোর্ডের চারজন অপ্রাপ্ত-ডিগ্রী যুবকে মিলে একখানি ছোট কবিতার বই প্রকাশ করেন। নাম "প্রাইমাভেরা" (*Primavera*)। যুবক চার জনের নাম—ষ্টিফেন্ ফিলিপ্‌স্ (Stephen Phillips), লরেন্‌স্ বিনিয়ন্ (Laurence Binyon), আর্থার ক্রিপ্‌স্ (Arthur Cripps) ও মনোমোহন ঘোষ। এর মধ্যে যদিও শেষোক্তই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়, তবু আর তিন জনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

উত্তরকালে এঁরা চার জনেই যে মানস-দেবতার শ্রীত্যর্থে নিজেদের উৎসর্গ ক'রবেন, তা'র পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল তাঁ'দের প্রথম-গ্রথিত মালা এই "প্রাইমাভেরায়।"

ষ্টিফেন্ ফিলিপ্‌স্ এখন মৃত। তাঁ'র নাম এখন ইংরাজী সাহিত্যের গ্রন্থকীটগণের মস্তিষ্কেই নিহিত। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর আরম্ভে তাঁ'র যশ ইংরাজী সাহিত্যাকাশের উপর এক বার বিদ্যুতের মতো ঝলক্ দিয়ে উঠে একেবারে নিবে যায়। এ-যুগের পাঠকরা তাঁ'র নাম একেবারেই জানেন না ব'ল্‌লেও অত্যুক্তি হবে না। তিনি কেন যে ইংরাজী সাহিত্যে চিরন্তন-কিছু দিয়ে যেতে পারেননি, সে বিষয়ের বিশদ আলোচনা এখানে সম্ভবপর নয়। তবে এইটুকু বলা যেতে পারে যে, তাঁ'র কাব্যে ও নাটকে তিনি যে বস্তুতন্ত্রের অবতারণা ক'রেছিলেন তা' ছিল একেবারে কৃত্রিমতার ভরা। জীবনের অভিজ্ঞতার ছাপ যে তা'তে ছিল না, তা' তিনি পাঠকসাধারণের নজর থেকে বেশী দিন লুকিয়ে রাখ্‌তে পারেন্‌নি।

তিন জনের মধ্যে লরেন্‌স্ বিনিয়নই ছিলেন মনোমোহন ঘোষের অন্তরঙ্গ বন্ধু। তিনি এখনও জীবিত এবং ব্রিটীশ ম্যুসিয়মের প্রাচ্য-কলা-বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা। প্রাচ্য-কলায় তাঁ'র মতো বিশারদ পণ্ডিত ইংলণ্ডে এখন খুব কমই আছেন। এ-বিষয়ে তাঁ'র অনেকগুলি গ্রন্থ আছে, এবং তাঁ'র কবিতার চেয়ে এই বইগুলির ভিতর দিয়েই তিনি এখন বেশী পরিচিত। এঁ'র কথা প্রসঙ্গক্রমে আরও কিছু-কিছু এসে প'ড়বে, অতএব এখানে বেশী-কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

আর্থার ক্রিপ্‌স্ মধ্যযৌবনেই—কেন বলা যায় না—কলাচর্চ্চা থেকে অবসর গ্রহণ ক'রে, আফ্রিকার কৃষ্ণবর্ণ অধিবাসীদিগের মধ্যে গিয়ে বাস ক'রতে আরম্ভ ক'রলেন। সেই থেকে তা'দের দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর ক'রবার জন্য তিনি একান্ত মনে নিজেকে নিয়োজিত ক'রেছেন, এবং সেই কারণে তাঁ'কে প্রতি পদে স্বার্থান্বেষী শক্তিপুঞ্জের বিরুদ্ধে নিজের শক্তি প্রয়োগ ক'রতে হ'য়েছে। কিন্তু তিনি তা'তে এযাবৎ পশ্চাৎপদ হন্‌নি এবং ভবিষ্যতে কখনো হবেন ব'লে মনে হয় না। সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক এখন তাঁ'র কিছুই নেই ব'ল্‌লেই হয় এবং দেশের সঙ্গেও সম্পর্ক অতি ক্ষীণ। তবে মনোমোহনের স্মৃতি যে এখনও তিনি মন থেকে মুছে ফেলেন নি, তা'র পরিচয় মাঝে মাঝে পাওয়া যায়।

এই ক'জনের মধ্যে মনোমোহন যে কবি-প্রতিভায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন সে-বিষয়ে এমন-কি সে-যুগের সমঝ্‌দারদের মধ্যেও মতভেদ ছিল না।

"প্রাইমাভেরা" বইখানি ছোট হ'লেও বড় সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রতে সমর্থ হ'য়েছিল। সে-যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক জহুরী ছিলেন অস্কার্ ওয়াইল্‌ড্ (Oscar Wilde) ও অ্যাডিংটন্ সাইমন্‌স্ (Addington Symonds)। এঁ'রা দু'জনেই বইখানির প্রশংসায় শতমুখ হ'য়েছিলেন। বিশেষ ক'রে অস্কার্ ওয়াইল্‌ড।

দেবীর একখানি চিঠিতে দেখা যায় যে, ক'ল্‌কাতায় মনোমোহনের কাব্যামোদী বন্ধুবর্গের অভাব হয়নি। চিঠিখানি ১৮৯৮ সালে লেখা,—মনোমোহন তখন ঢাকায় বদ্‌লি হ'য়েছেন। চিঠিখানিতে শ্রীমতী সরলা দেবী মনোমোহনের বন্ধু লরেন্‌স্‌ বিনিয়ন্‌ ও ষ্টিফেন্‌ ফিলিপ্‌সের উল্লেখ ক'রে লিখ্‌ছেন—"Friends of a countryman of mine who have become living realities to me instead of being simply names in print"। সমগ্র চিঠিখানা প'ড়লে বোঝা যায় যে, অন্ততঃ ক'ল্‌কাতার শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজে মনোমোহনের কবি-প্রতিভার আদর হ'তে আরম্ভ হ'য়েছিল। এ-থেকে আরও বোঝা যায় যে, পরিণত বয়সে নানা কারণে তিনি একটু অসামাজিক হ'য়ে উঠ্‌লেও, আগাগোড়াই তিনি তা' ছিলেন না। চিঠিখানা থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত ক'রে দেওয়া যেতে পারে :—

" . . . . . Are you never coming back to Calcutta? We miss you ever so much. You were like a bit of the English poetical world for us. Before I met you English poetry was with me English first and poetry afterwards, but since you came in our midst it has become all so easy to feel and breathe in English. . . . . I believe you have heard that we have given over the editorship of the *Bharati* to my uncle.* There is joy in life now. When a genius like him takes the lead in the literary field, all the rank and file are filled and stirred with new life, new activity. I envy you your retreat, your want of social cravings, your absorbing devotion to your life's object. You are *one*, delightfully and beautifully *one*. I am *many*—too, too many, and so a grand, sorry failure".

এই বৎসরেই মনোমোহন বিবাহ করেন।

বিবাহের কিছুদিন পূর্ব্বে মনোমোহনের *Songs and Elegies* প্রকাশিত হয়।

এ-বইখানিতে ছোট-বড় মিলিয়ে সবশুদ্ধ ষোলটি কবিতা আছে। একজন ইংরাজ সমালোচকের মতে, মনোমোহন যদি আর-কিছু না-ও লিখ্‌তেন, তা'হ'লেও এই ক'টি কবিতাই তাঁ'কে ইংরাজী সাহিত্যে অমর ক'রে রাখ্‌ত। এ-ক'টি কবিতাতেও রূপ ও আঙ্গিকতার সৌষ্ঠব পূর্ণ মাত্রায় বজায় আছে, লেখনীর পরিপক্কতারও পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু কল্পনা-লীলার মধ্যে জীবনের সঙ্গে নিগূঢ় পরিচয়ের আভাষ মোটেই পাওয়া যায় না। বইখানি প'ড়লে বুঝ্‌তে পারা যায় যে, এর লেখকের মধ্যে যে প্রতিভাবীজ উপ্ত আছে, তা' একদিন মহীরুহে পরিণত হওয়া আশ্চর্য্য নয়, এর কবি একদিন একজন বড় কবি ব'লেই গণ্য হবেন। ভাগ্যদেবী যদি মধ্যপথে বাধা না দিতেন, তা' হ'লে তিনি তা' হ'তেনও। *Songs and Elegies*-এর কতকগুলি কবিতা,--বিশেষ ক'রে 'The Kiss of Cupid', 'Myvanwy', 'The Orchard', 'Whispering Sleep' গীতি-কবিতার আদর্শ ব'লে গণ্য হ'তে পারে।

পর বৎসর *The Garland* নামক কাব্যসংগ্রহে মনোমোহনের আরও কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হয়। তা'র মধ্যে একটি সনেট্‌ তুলে দেওয়ার লোভ সম্বরণ ক'রতে পারা গেল না :—

Augustest! dearest! whom no thought can trace,
Name murmuring out of birth's infinity,
Mother! like heaven's great face is thy sweet face,
Stupendous with the mystery of me.
Eyes, elder than the light; cheek, that no flower
Remembers; brow at which my infant care
Gazed weeping up, and saw the skies enshower
With tender rain of vast mysterious hair!
Thou, at whose breast the sunbeams sucked, whose arm
Cradled the lisping ocean, art thou she,
Goddess! at whose dim heart the world's deep charm,
Tears, terrors, sobbing things, were yet to be?
She, from whose tearing pangs in glory first
I and the infinite wide heavens burst.

মনোমোহন এই সময়টায় ইংরাজী সাহিত্যজগতে বিশেষভাবে পরিচিত হ'য়ে উঠেছিলেন। শব্দচয়ন এবং ছন্দোভঙ্গীর বিশেষত্বে তিনি তাঁ'র সমসাময়িকগণের মধ্যে কারুর চাইতে ন্যূন ছিলেন না। বরং এ-বিষয়ে তিনি একটু বেশী পরিমাণে সজাগ ছিলেন। এমন-কি ইংরাজ পাঠকসাধারণের রুচি যখন এ-বিষয়ে বদল হ'তে আরম্ভ

* শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

হ'ল, তখনও তিনি নিজের ভাব নিজের ধরণেই প্রকাশ ক'রে গেছেন। তাঁ'র পরিচয় তাঁ'র মৃত্যুর পর প্রকাশিত *Songs of Love and Death*-এ পাওয়া যায়। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তাঁ'র সমসাময়িকদের মধ্যে অনেকেই



অক্স্‌ফোর্ডে অধ্যয়নকালে মনোমোহন

নরেন্দ্‌ বিনিয়ন্‌-কর্তৃক অঙ্কিত রেখাচিত্র হইতে   শ্রীমতী লতিকা বসুর সৌজন্যে

তথাকথিত বস্তুতান্ত্রিকতায় আকৃষ্ট হ'য়েছিলেন। কিন্তু সে বস্তুতান্ত্রিকতা টেনিসনের "কাল্পনিকতা"র বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা ছাড়া আর কিছুই নয়, তা'তে আসল জীবনের সাড়া কিছুই ছিল না, এবং রূপ ও আঙ্গিকতার সৌষ্ঠবের অভাবে তাঁ'দের রচনায় প্রাণহীনতা আরো বেশী ক'রেই ফুটে উঠ্‌তো। ব্রাউনিং-এর প্রতিভায় তাঁ'রা আকৃষ্ট হয়েছিলেন বটে, কিন্তু ব্রাউনিং-এর শক্তি সম্বন্ধে তাঁ'দের ধারণা সঠিক ছিল না। মনোমোহন নিজে কোনদিনই ব্রাউনিং-এর ভক্ত ছিলেন না, এবং তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে রূপ-সৌষ্ঠবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-অভিযান তাঁ'কে পীড়িত ক'রত :,—"How we have sacrificed form and expression in our devotion for modern thought and for contemporary subject matter, and the idea that a poet should have something new to say"! এলিসাবেথীয়-যুগের কবিরা ভাবের অনন্যতন্ত্রতা নিয়ে খুব বেশী মাথা ঘামাননি; তাঁদের সমস্ত শক্তি প্রযুক্ত হ'য়েছিল rhythm ও expression-এর উপর। মনোমোহন বরাবরই এলিসাবেথীয় যুগের এই আদর্শ অনুসরণ ক'রে এসেছিলেন। দেশে ফিরে এসে অনেক রকম ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে তিনি যদি ইংরাজী সাহিত্য-জগতের সহিত সংস্পর্শরহিত না হ'তেন, তা'হলে এ-আদর্শের বন্ধন থেকে তিনি নিজেকে মুক্ত ক'রতে পারতেন কি না—সে আলোচনা এখন নিষ্ফল। তবে এ-বিষয়ে তাঁ'র সঙ্গে বর্ত্তমান যুগের কবিদের মতের মিল হবে কি না, সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তাঁ'র জীবিত বন্ধু এবং সমসাময়িক কবিদের মধ্যে ইয়েট্‌স্‌ (Yeats) এবং ষ্টার্জ্‌ মূর (Sturge Moore)-এর লেখা প'ড়লেই তা' বোঝা যায়।

Songs and Elegies-এর অনেক কবিতায় যে বিষাদের সুর বেজে উঠেছে, তা' আপাত-দৃষ্টিতে সৌখীন

ব'লেই মনে হয়। অন্য দিক দিয়ে, তা' প্রতিভার মুকুরে আসন্ন বিপদের প্রতিফলিত ছায়া ব'লেও নিতে পারা যায়; কেননা এটা প্রকাশের বৎসর-কয়েকের মধ্যেই জীবনের অন্ধকার দিকটার সঙ্গে কবির নিগূঢ় পরিচয় আরম্ভ হ'য়েছিল। কিন্তু সে-পরিচয়ের পূর্ব্বে কবির জীবন সাংসারিক হিসাবে সুখেরই জীবন ছিল। মনোরমা ভার্য্যা, শিশুদের কলহাস্য-মুখরিত ভবন, অর্থ-স্বাচ্ছল্য, অনবদ্য স্বাস্থ্য, বন্ধুপ্রীতি, যশোভাগ্য—এক কথায় সংসারে সুখী হবার জন্যে মানুষ যা' কিছু প্রার্থনা করে, তা' তিনি সবই পেয়েছিলেন। বিবাহের প্রথম কয়েক বৎসর এইরূপ ভাবেই কেটেছিল। কিন্তু এ কয় বৎসর কবিত্বক্ষেত্রে তিনি বিশেষ কিছু সৃষ্টি ক'রতে পারেননি, যদিও তাঁ'র সাহিত্য-সাধনার বিরাম ছিল না। এ-সময়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন, এবং লরেন্‌স্ বিনিয়নের সঙ্গে নিয়মিত পত্র-বিনিময় ক'রতেন। নিজের লেখা চিঠির নকল তিনি রাখ্‌তেন না, কিন্তু লরেন্‌স্ বিনিয়নের চিঠি থেকে অনেক কথা জানতে পারা যায়। এই সময়েরই মধ্যে তিনি সাবিত্রী ও নলদময়ন্তীর উপাখ্যান অবলম্বন ক'রে কিছু লিখ্‌তে চেষ্টা করেন, কিন্তু শেষে ব্যর্থকাম হ'য়ে ছেড়ে দেন। ভারতীয় পুরাণের চিত্রে তিনি ঠিক রং ফলাতে পারেননি। তাঁ'র কবিতাতে imagery জিনিসটা আগাগোড়াই বিদেশী ছিল। সেটাকে ভারতীয় রূপ দেবার জন্য তিনি বিশেষ কিছু চেষ্টা ক'রেছিলেন ব'লে মনেও হয় না। শিক্ষাদীক্ষা এক হ'লেও, মানসিক গঠনে তিনি এডুইন্ আর্নল্‌ড্ (Edwin Arnold), অ্যালফ্রেড্ লায়াল্ (Alfred Lyall) এবং কিপ্‌লিং (Kipling) থেকে স্বতন্ত্র ছিলেন। এঁদের কবিতায় প্রাচ্যের যে আলো-ছায়ার খেলা ফুটে উঠেছে মনোমোহনের তা' মোটেই রুচিকর ছিল না। যাকে 'Oriental atmosphere' বলা যায়, মনোমোহনের পক্ষে তা' সৃষ্টি করা অসম্ভব



গগনেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ মনোমোহন

১৯১৫-সালে দার্জ্জিলিংয়ে গৃহীত ফোটোগ্রাফ শ্রীমতী লতিকা বসুর সৌজন্যে

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

ছিল, কেননা, তিনি প্রাচ্য ঐতিহ্যের সঙ্গে মোটেই পরিচিত ছিলেন না, এবং পরিচিত হবার জন্ত তাঁ'র কোন ঔৎসুক্যও ছিল না। তাঁ'র মাতৃভূমি ছিল ইংল্যাণ্ড, এবং তীর্থভূমি ছিল পুরাতন গ্রীস—এইটে মনে রেখে মনোমোহনের প্রতিভার বিচার ক'রলে, তবেই তাঁ'র প্রতি সুবিচার করা হবে।

লরেন্স্ বিনিয়নের চিঠিগুলো থেকে জানতে পারা যায়, মনোমোহন চিত্রকলার কিরূপ অনুরাগী ছিলেন। বিনিয়নের সংস্পর্শে য়ুরোপীয় চিত্রকলার সঙ্গে তাঁ'র ঘনিষ্ঠ পরিচয় হ'য়েছিল এবং প্রাচ্য চিত্রকলাও তাঁ'র কাছে যথেষ্ট সমাদর পেত। অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল-প্রমুখ অনেক শিল্পীর চিত্র তিনি সংগ্রহ ক'রেছিলেন। এক জাপানী চিত্রকরের অঙ্কিত ছ'খানি সুন্দর স্ক্রীনও (screen) তাঁর সংগ্রহের মধ্যে ছিল।

বিনিয়নের চিঠিগুলোর মধ্যে মনোমোহনের রচনা-প্রণালীরও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি প্রথমে বিষয় নির্ব্বাচন ক'রতেন, তার পর কি ছন্দে সেটাকে প্রকাশ ক'রবেন তাই নিয়ে দুই বন্ধুতে অনেক দিন ধ'রে আলোচনা চ'লত। এই রূপ-গঠনের ব্যাপারটাকে তিনি খুব বড় ক'রে দেখ্তেন এবং শব্দচয়ন বিষয়েও অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। তিনি প্রকৃত কবি ছিলেন ব'লেই কবিতা-রচনায় এ-দুটো জিনিষের সঠিক মূল্য বুঝ্তেন। ছন্দের অঙ্গহানি সত্ত্বেও ব্রাউনিং বড় কবি ব'লে গণ্য হ'য়েছেন, কিন্তু এ-বিষয়ে একটু অবহিত হ'লে ব্রাউনিং যে কম চিত্তাকর্ষক হ'তেন, তা' মনে হয় না। দোষ যা', তা' দোষ, অসাধারণ প্রতিভায় ঢাকা প'ড়লেও সেটা দোষ ছাড়া আর কিছুই নয়। অপর পক্ষে ভাবের দৈন্ত ছন্দচাতুর্য্যে ঢেকে দেওয়া যে-কোনো কবির পক্ষে অসম্ভব নয়। কিন্তু মনোমোহনের লেখায় এ দৈন্তের পরিচয় পাওয়া যায় না। ভাবের গভীরতা তাঁর লেখায় যথেষ্ট ছিল। উচ্চ দরের প্রতিভার অধিকারী হ'লেও রবীন্দ্রনাথ অথবা ব্রাউনিং-এর শক্তি নিয়ে তিনি জন্মাননি, তবু বিশ্বসাহিত্যে তিনি যতটুকু দিয়ে গেছেন ততটুকু নিগূঢ় শ্রদ্ধার দান এবং সেই হিসাবে তা' অমূল্য।



মনোমোহন ও তাঁহার দুই কন্যা

শ্রীমতী লতিকা বসু (উপবিষ্টা) শ্রীমতী মৃণালিনী দত্ত (দণ্ডায়মান)

শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষের সৌজন্যে

ইতিমধ্যে দুঃখের দিন ঘনিয়ে আস্ছিল। ভাগ্যদেবীর বিমুখতার সঙ্গে সঙ্গে মনোমোহনের প্রকৃতিতেও একটা পরিবর্ত্তন এসে গেল। কিন্তু তাঁর কর্ত্তব্য থেকে তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্ত বিচ্যুত হননি। অধ্যাপনাকার্য্যে কিছুমাত্র শৈথিল্য ছিল না, দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত পত্নীর শুশ্রূষায় এতটুকু ক্লান্তি ছিল না, কন্যাদ্বয়ের শিক্ষাকার্য্যে একটুও অমনোযোগী হননি। কিন্তু মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, স্নায়ুরোগগ্রস্তা পত্নীর সেবায় তাঁ'র নিজের স্নায়ুযন্ত্র একেবারে বিকল হ'য়ে আস্ছিল। সে-সেবার তুলনা নাই। তাঁ'র মধ্যে কর্ত্তব্যবোধ ছিল, কিন্তু আরও ছিল তাঁ'র কবি হৃদয়ের গভীর প্রেমের প্রেরণা। তাঁ'র দুর্ভাগ্যের

সময় তিনি একেবারে বন্ধুহীন হ'য়ে প'ড়েছিলেন। তবে সেটা কতকটা ইচ্ছাকৃত। তাঁ'র নিজের স্বাস্থ্যভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে তাঁ'র মনটা সংসারের উপর বিরক্ত হ'য়ে গিয়েছিল। প্রায় কারুর সঙ্গেই দেখা ক'রতেন না, চিঠিপত্র লেখা, এমন কি বিনিয়নের সঙ্গেও পত্র-ব্যবহার বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন। স্ত্রীর মৃত্যুর অনেক দিন পরে তিনি প্রকৃতিস্থ হ'তে পেরেছিলেন। এই সময়ে তাঁ'র লেখনী থেকে স্বর্গীয়া পত্নীর স্মরণে যে-সব কবিতা বেরিয়েছিল তা' গীতিকাব্যজগতে চিরকাল শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার ক'রে থাক্‌বে।

এ-সময়ে তাঁ'কে জান্‌বার যাঁদের সুযোগ হ'য়েছিল তাঁ'রা জানেন তিনি সামাজিক কৌলীন্যে কতটা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তেমন অমায়িকতা, তেমন সৌজন্য, বন্ধুপ্রীতি, স্নেহসিঞ্চিত সহিষ্ণুতা আজকালকার দিনে বড় একটা দেখা যায় না। কত উদীয়মান কবিকে তিনি উৎসাহবাণী শুনিয়েছেন, মান্দ্রাজের জেম্‌স্ কাসিন্‌স্-এর (Dr. James Cousins) মতো কবির কবিতাও ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনে গেছেন, অন্যান্য অতিথিরা চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লেও তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও ধৈর্য্যচ্যুত হন্‌নি; এমন কি উদ্ধত যুবকের শাস্ত্রীয় ও সাহিত্যিক তর্কও তাঁ'কে এতটুকু বিচলিত ক'রতে পারত না। নিজের বিশ্বাস তিনি জোর ক'রে কারুর উপর প্রয়োগ ক'রতেন না। কোন এক কলেজের অধ্যাপক কে-এক ভট্টাচার্য্য, তাঁ'র বাংলাভাষার অনভিজ্ঞতার সুযোগে, তাঁ'কে বুঝিয়েছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথের ইদানীংকার কবিতা বৈষ্ণব কবিতার প্রতিধ্বনি মাত্র— তা'তে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব কিছুই নেই এবং সমস্ত বাঙালীই তা' জানে, শুধু ইংরাজের কাছে স্বীকার করে না। মনোমোহন বৈষ্ণব কবিদের কোন লেখারই সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না, এবং বাংলা ভাষায় জ্ঞানও ছিল সীমাবদ্ধ, তাই তাঁ'র কাছে এরূপ মতামত ব্যক্ত করা খুব নিরাপদ ছিল। কিন্তু সংস্কৃতের অধ্যাপক ছাড়া অন্য লোকেরও এ-বিষয়ে মতামত তিনি আগ্রহসহকারে শুন্‌তেন এবং নিজের ভুল স্বীকার ক'রবার মত মহত্ব তাঁ'র ছিল।

শেষ দু'তিন বৎসর তাঁ'র দৃষ্টিশক্তি একেবারে নষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল। পেন্সনের ব্যবস্থা ক'রে তিনি কন্যাদ্বয়কে নিয়ে বিলাতে গিয়ে বসবাস ক'রবার সংকল্প ক'রেছিলেন। তা'র বন্দোবস্তও প্রায় সবই ঠিক হ'য়ে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে এ্যালায়েন্‌স্ ব্যাঙ্ক্ দেউলিয়া হ'য়ে যেতে তাঁ'র চিরজীবনের সঞ্চয়ের অর্দ্ধেক নষ্ট হ'য়ে গেল। ভাগ্যদেবীর এই শেষ পরিহাসের নিষ্ঠুরতাও তিনি অম্লানবদনে সহ্য ক'রেছিলেন। কেউ তাঁ'কে এতটুকু বিচলিত হ'তে দেখেনি। দার্জ্জিলিং-এ যে-দিন খবর এল, সে-দিন তাঁ'র কথাবার্ত্তা থেকে কেউই বুঝ্‌তে পারেনি যে তিনি কত বড় আঘাত পেয়েছেন। ক'ল্‌কাতায় ফিরে য়ুরোপ যাবার জন্য প্রস্তুত হ'চ্ছিলেন এমন সময় অন্তিম ব্যাধি তাঁ'কে আক্রমণ ক'রলে। মৃত্যুর ছায়া যখন ঘনিয়ে আস্‌ছিল তখন তাঁ'র মুখে পরলোকগতা পত্নীর নাম কয়েক বার উচ্চারিত হ'য়েছিল। ১৯২৪-সালের জানুয়ারী মাসে তাঁ'র মৃত্যু হয়।

মনোমোহনের জীবন যেরূপভাবে আরম্ভ হ'য়েছিল যদি সেরূপভাবেই চ'ল্‌ত, তা' হ'লে বোধ হয় তাঁ'র প্রতিভা সম্যকভাবে ফুটে ওঠ্‌বার অবসর পেত। ভারতীয় আওতায় তা' অনেকটা খর্ব্ব হ'য়ে গিয়েছিল। ভারতকে তিনি প্রতীচ্যের কাছে বোঝাতে পারেননি, কিন্তু প্রতীচ্যের যা' কিছু ভাল, যা' কিছু মহান্, তা' তিনি নিজের জীবন এবং নিজের রচনার মধ্য দিয়ে ভারতের চোখের সাম্‌নে ধ'রেছেন। এ-কাজটাও যে কত বড় তা' আজ না হ'লেও ভারতবাসী একদিন বুঝ্‌বে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

মৃত্যুর এক বৎসর পরে *Songs of Love and Death*—মনোমোহনের শেষ গ্রন্থ—বিলেতে প্রকাশিত হয়—তাঁ'র কন্যা শ্রীমতী লতিকা এবং বন্ধু লরেন্‌স্ বিনিয়নের চেষ্টায়। এর অধিকাংশ কবিতাই তাঁ'র স্বর্গীয়া পত্নীর উদ্দেশে রচিত। এ-গুলির ভিতর দিয়ে যেন মরণের পরপার থেকে কবিপ্রিয়ার আহ্বানধ্বনি শোনা যায়। "Immortal Eve"—চিরন্তনী নারী—এবং "Orphic Mysteries"-শীর্ষক কবিতাগুলি যে-কোনো

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

সাহিত্যে গীতিকবিতার আদর্শ ব'লে অমর হ'য়ে থাকৃতে পারে। প্রতিভার ছাপের সঙ্গে "হৃদয়-ছ্যাঁচা শোণিত ছাপ"ও এ-গুলির উপর মুদ্রিত আছে। কত বিনিদ্র রজনীর ইতিহাস, মিলনের নিবিড়তা, আসন্ন বিরহের ভয়, চিরবিচ্ছেদের মর্ম্মন্তুদ হাহাকার, জীবনের ধৈর্য্যপ্রতীক্ষা, মরণের পরপারে পুনর্মিলনের ব্যাকুল আশা—এ-গুলির ছত্রে ছত্রে গাঁথা আছে। সমালোচনার কষ্টিপাথরে এদের মূল্য নির্দ্ধারণ করবার সময় এখনো আসেনি, কিন্তু যখন তা' আস্‌বে, তখন মুগ্ধ পাঠকের শ্রবণে বেজে উঠ্‌বে অমরকবির ছন্দে গাঁথা উর্ব্বশীর বিরহে পুরূরবার আক্ষেপবাণী—একমাত্র যা'র সঙ্গে মনোমোহনের এই কবিতাগুলির তুলনা হ'তে পারে।

বাহুল্যভয়ে এ-গুলির বিশদ পরিচয় দিতে পারা গেল না। শুধু "Orphic Mysteries"-এর একটি কবিতা তুলে দিয়ে এ-প্রবন্ধের উপসংহার করা গেল।

THE RIDER ON THE WHITE HORSE.

How did I lose you, sweet?
I hardly know.
Roughly the storm did beat,
Wild winds did blow.
I with my loving arm
Folded you safe from harm,
Cloaked from the weather.
How could your dear foot drag?
Or did my courage sag?
Heavy our way did lag,
Pacing together.

I looked in your eyes afraid,
Pale, pale, my dear!
The stones hurt you, I said,
To hide my fear.
You smiled up in my face,
You smothered every trace
Of pain and languor.
Fondly my hand you took,
But all your frail form shook;
And the wild storm it struck
At us in anger.

The wild beast woke anew;
Closely you clung to me.
Whiter and whiter grew
Your cheek and hung to me.
Drooping and faint you laid
Upon my breast your head,—
Footsore and laggard.
Look up, dear love, I cried:
But my heart almost died,
As you looked up and sighed,—
Dead—weary, staggered.

There came a rider by;
Gentle his look.
I shuddered, for his eye
I could not brook.
Muffled and cloaked he rode,
And a white horse bestrode
With noiseless gallop.
His hat was mystery,
His cloak was history;
Pluto's consistory
Or Charon's shallop

Could not the dusky hue
Of his robe match,
His face was hard to view,
His tone to catch.
"She is sick, tired. Your load,
A few miles of the road,
Give me to weather."
He took as 'twere a corse
Her fainting form perforce.
In the rain rider, horse,
Vanished together.

Come back, dear love, come back!
Hoarsely I cry;
After that rider black
I peer and sigh:
After that phantom steed
I strain with anxious heed,
Heartsick and lonely.
Into the storm I peer
Through wet woods moaning drear.
Only the wind I hear,
The rain see only.

বিপরীত

—গল্প—

—শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১

বিয়ের মাস ছুই পরে পাকা-ভাবে স্বামীর ঘর ক'রতে এসে লতিকা দেখ্‌লে বিয়ের সময়ে যে-সব আত্মীয়-স্বজন-কুটুম্বে তা'র স্বামীর সুবৃহৎ পুরী পূর্ণ ছিল, শরৎকালের ক্ষণস্থায়ী মেঘের মত তা'রা অন্তর্হিত হয়েছে; আছে কেবল একুশ-বাইশ বছরের একটি মেয়ে—প্রয়োজন-কালে যাকে তা'র স্বামী নিশীথ তারা ব'লে ডাকে। বাড়ীতে মানদা নামে একজন পুরাণো পরিচারিকা ছিল; সংসার পরিচালনার স্থূল দিক্‌টা তা'র হাতে থাকৃত। মানদার কাছ থেকে লতিকা কথায় কথায় জেনে নিলে, তারা তা'র স্বামীর সংসার-আকাশে সকাল-সাঁঝের শুকতারা নয়, সে সর্ব্বক্ষণের ধ্রুবতারা; কারণ তা'র অনিমিষ দৃষ্টির স্নিগ্ধ কিরণ কোনো দিন কোনো আত্মীয়ের গৃহে অস্তমিত হয় না। এ কথাও সে জান্‌তে পারলে যে তারা তা'র স্বামীর এমন কোনো আত্মীয় নয় যাতে এই নিরন্তর অবস্থিতির একটা ভাল রকম যুক্তি থাক্‌তে পারে।

লতিকার মনে প'ড়ল তা'র বাপের বাড়ীর আমবাগানে একটা কলমের আমগাছকে একটা বুনো লতা এমন আচ্ছন্ন ক'রে ধরেছে যে, আমগাছের কোনো অস্তিত্বই চোখে পড়ে না। ফুলের সময়ে বসন্তকালে লতার দেহ অজস্র নীল ফুলে ফুলে ভরে যায়, কিন্তু ফলের সময়ে গ্রীষ্মকালে গাছ থেকে একটাও আম পাওয়া যায় না। বাপের বাড়ীর আমগাছের অবস্থার শ্বশুরবাড়ীর স্বামীকে দেখে সে বেশ বুঝ্‌তে পারলে তা'র স্বামী-বৃক্ষ থেকে কোনোদিন কোনো সুফলের সম্ভাবনা নেই।

তা'র যে-আকাশে তারা ধ্রুবতারার মত কিরণ বর্ষণ ক'রত, সেখানে লতিকা একটা ঘন কালো মেঘের মত হ'য়ে উঠ্‌ল।

২

সকালে চা-পান ক'রে নিশীথ দক্ষিণদিকের বারাণ্ডায় একটা ইজি-চেয়ারে শুয়ে মেঘদূতের উত্তর-মেঘে নিমগ্ন ছিল। তারা পূবদিকের ফুলবাগানে মালীকে নিয়ে বৃক্ষ-পরিচর্য্যা ক'রছিল।

লতিকা নিশীথের কাছে এসে মুখ ভার ক'রে ব'ল্‌লে, "একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব ?"

কাব্যের বইখানা ধীরে ধীরে মুড়ে পাশের ছোট টেবিলে রেখে নিশীথ ব'ল্‌লে, "কোরো; কিন্তু তা'র আগে আর একটা কাজ কর না ?"

"কি ?"

অদূরে একখানা চেয়ার দেখিয়ে নিশীথ ব'ল্‌লে, "ওই চেয়ারটা টেনে নিয়ে এসে কাছে বোস।"

নিশীথের টেবিলের উপর ডান হাতখানা রেখে লতিকা ব'ল্‌লে, "থাক্‌, বস্‌তে হ'বে না। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তারা তোমার কে ?"

লতিকার দিকে মুখ তুলে চেয়ে সহজভাবে নিশীথ ব'ল্‌লে, "তারা ?—তারা আর কে আমার ?—তারা আমার সঙ্গিনী।"

"সঙ্গিনী !"—বিস্ময়ে, ক্রোধে, লজ্জায়, বিরক্তিতে লতিকার মুখ লাল হ'য়ে উঠ্‌ল। "স্ত্রীলোক সঙ্গিনী তোমার ?"

মৃদু হেসে নিশীথ ব'ল্‌লে, "স্ত্রীলোক বলেই ত সঙ্গিনী। তারা স্ত্রীলোক না হ'য়ে পুরুষ হ'লে আমার সঙ্গী হোত।"

"তবে আবার বিয়ে ক'রলে কেন ?"

"আবার ত' ক'রিনি, একবারই ক'রেছি।"

তীক্ষ্ণকণ্ঠে লতিকা ব'ল্‌লে, "সে কথা বলছিনে। তারা থাক্‌তে বিয়ে ক'রলে কেন ?"

"বিয়ের পথে তারাকে বাধা ব'লে মনে হয়নি ব'লে।"

এ উত্তরে মনে মনে জ্বলে উঠে লতিকা ব'ল্‌লে, "আমি

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

যদি ব'লতাম আমার একজন পুরুষ সঙ্গী আছে ?"

কাব্য বইখানা ধীরে ধীরে খুলতে খুলতে নিশীথ বললে, "তা' হ'লে তোমার কাছ থেকে তা'র ঠিকানা জেনে নিয়ে মাঝে মাঝে তা'কে নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়াতাম।"

আর কোনো কথা বলা নিষ্প্রয়োজন মনে ক'রে লতিকা সরোষে চ'লে গেল।

৩

এর পর থেকে লতিকা কেবলই ভাবতে লাগ্ল কি ক'রে লতাপাশ থেকে বৃক্ষকে মুক্ত করা যায়। সে লক্ষ্য ক'রতে লাগ্ল কোন্ কোন্ জায়গায় লতা শিকড় ফেলেছে যেখানে নির্ম্মম হয়ে ছুরি চালাতে হবে।

নিশীথ ফুল ভালবাসে,—তারা বাগানে ফুল ফোটাবার ব্যবস্থা করে। একদিন নর্সারীর মালীকে ডাকিয়ে তারা নূতন নূতন ফুলগাছের ফরমাস দিচ্ছে—নিশীথ একখানা কাগজে সেগুলো লিখে নিচ্ছে—এমন সময় সেখানে লতিকা এসে দাঁড়ালো। একটু অপেক্ষা ক'রে সে বল্লে, "এ সব ফুলগাছ কোথায় লাগাবে ?"

তারা লতিকার দিকে চেয়ে হাসিমুখে ব'ল্লে, "কেন, তোমার উত্তর দিকের বস্‌বার ঘরের পুব দিকে যে জমিটা তৈরী হ'য়েছে সেখানে।"

মুখ ভার ক'রে লতিকা ব'ল্লে, "ও মা! সেখানে গুচ্ছার বাজে ফুলগাছ লাগাবে ? আমি যে মনে মনে ঠিক ক'রেছি সেখানটায় আলু লাগাব। আমার বাপের বাড়ী এ-সময়ে—

বাপের বাড়ীর উদাহরণ শেষ হবার আগেই নিশীথ ব'ল্লে, "কিন্তু আলু ত' বাজারে কিন্‌তে পাওয়া যায় লতি ?"

চোখ কুঁচ্‌কে লতিকা ব'ল্লে, "ফুলও ত' বাজারে কিন্‌তে পাওয়া যায়!"

এ অকাট্য যুক্তিতে হার মেনে নিশীথ গাছের ফর্দ্দখানার দিকে চেয়ে চুপ ক'রে বসে রইল।

লতিকা বললে, "এত সব বাজে জিনিসেও তোমরা সময় আর পয়সা নষ্ট ক'রতে পার! যাতে সংসারে দু'পয়সা সাশ্রয় হয় তাতে ত' কারো দৃষ্টি দেখতে পাই নে!"

নিশীথ তারার দিকে চেয়ে মৃদুস্বরে ব'ল্লে, "আমাদের মতে ত' সংসার এতদিন চলেছে—এবার লতির মতে কিছু দিন চলুক না তারা ?"

তারা হেসে ব'ল্লে, "বেশ ত।"

সে-দিন থেকে ফুলগাছ কেনা বন্ধ হয়ে গেল। ক্রমশঃ তরকারীর ক্ষেত এত বাড়তে লাগ্ল আর ফুলগাছের জমি এত ক'মতে লাগ্ল যে, পুরোণো মালী এসে তারাকে বললে, "আমি ফুলেরি পাট জানি, ফলের পাট জানিনে। আমি অন্য জায়গায় চাকরী পেয়েছি।"

তারা ব'ল্লে, "যে-ক'টা ফুলের গাছ আছে সেগুলোর তা'হলে কি দশা হবে নিতাই ?"

চক্ষু রক্তবর্ণ ক'রে নিতাই বললে, "যে ভাবে লাউ আর কুমড়োর গাছ বেড়ে আসছে মা, আর দিন দশেক পরে তাদের ভাবনা ভাব্‌তে হবে না।"

মালী প্রণাম ক'রে চ'লে গেল। নিশীথের বস্‌বার ঘরের ফুলদানীতে শেষ ফুলের তোড়া শুকিয়ে উঠ্‌তে লাগ্ল!

* * * *

নিশীথ ছবি ভালবাসে। সহরে চিত্রপ্রদর্শনী দেখ্‌তে গিয়ে তারা আর নিশীথ দু'জনে মিলে কয়েকটা ভাল ভাল ছবির নাম লিখে নিয়ে এল—কিন্‌তে হবে।

মুখভার ক'রে লতিকা জিজ্ঞাসা ক'রলে, "দাম প'ড়বে কত ?"

নিশীথ বললে, "হাজার দুই টাকা।"

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে লতিকা বললে, "কী সর্ব্বনাশ! কতকগুলো নেকড়ার টুক্‌রো কিনে দু'হাজার টাকা জলে ফেলতে হবে! তারপর সেগুলো নিয়ে এখন কিছুদিন ধ'রে নাওয়া-খাওয়া ত্যাগ ক'রে যত বাজে আলোচনা চলবে ত ? তা'র চেয়ে হাজার খানেক টাকায় রূপোর বাসন গড়াও যা কাজে-কর্ম্মে উপকার দেবে।"

নিশীথ মৃদুকণ্ঠে ব'ল্লে, "রূপোর বাসন ত' এক সিন্দুক আছে লতি।"

ভ্রু-কুঞ্চিত ক'রে লতিকা ব'ল্লে, "আর ছবিই কি এক-বাড়ী নেই ?"

তাও ত' বটে। তারার দিকে নিরুপায় দৃষ্টি ফেলে নিশীথ বললে, "তা' হ'লে রূপোর বাসনই হ'ক তারা?"

তারা হাসিমুখে বললে, "বেশ ত! তাই হোক্।"

পরদিন বাসন গড়াবার জন্যে সেকরা ডাকা হ'ল।

* * * *

প্রতিদিন সন্ধ্যার পর তারা নিশীথকে গান শোনায়—নিশীথ গান বড় ভালবাসে। সেদিন তারা বীণ্ বাজিয়ে গাচ্ছিল,—

"হৃদয় মাঝে, কে আসিলে হে সুমধুর সাজে!
ঝিনিকি ঝিনিকি ঝিনি ঝিনি নিনি হৃদয়-বীণা বাজে!'

পাশে একটা সোফার অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় ডান হাত দিয়ে দুই চোখ ঢেকে স্তব্ধ হ'য়ে নিশীথ গান শুনছিল। সমস্ত ঘরটা ফিকে রঙীন আলোর ক্ষীণ প্রভায় সপ্তসুরকে আশ্রয় ক'রে কাঁপ্‌ছিল।

লতিকা এসে একটা চকচকে সাদা আলো জেলে দিয়ে তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে ব'ললে, "আচ্ছা, প্রতিদিন সন্ধ্যাগুলো এ-রকম গান-বাজ্‌নায় নষ্ট ক'রে কি হয়? তাও যদি ঠাকুর-দেবতাদের ভাল গান হোত।—যত সব বাজে গান!"

গান থেমে গেল। নিশীথ চেয়ে দেখ্‌লে; চোখে তা'র হতাশার করুণতা ছলছল ক'রছে!

বিস্ময়ের সুরে লতিকা ব'ললে, "আচ্ছা, এতে তোমরা সুখ পাও?"

নিশীথ বললে, "আমি ত পাই। তুমি পাও তারা?"

তারা ব'ললে, "আমিও পাই।"

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে লতিকা ব'ললে, "আশ্চর্য্য!—সন্ধ্যার সময়ে আমার বাপের বাড়ীতে কি হয় জান?"

ভীত হয়ে নিশীথ ব'ললে, "কি হয়?"

সজোরে লতিকা ব'ললে, "গীতা পাঠ হয়। আমার বাবা আফিস্ থেকে এসে জল খেয়ে সকলকে নিয়ে গীতা পড়তে বসেন। তোমরা গীতা প'ড়েছ?"

নিশীথ অপ্রতিভ হ'য়ে ব'ললে, "আমি ত পড়িনি। তুমি প'ড়েছ তারা?"

তারা বললে, "আমিও প'ড়িনি।"

স্বর্ণায় লতিকার নাক কুঁচ্‌কে উঠ্‌ল। "এখনো গীতা পড়নি! জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বই গীতা তা' পড়নি—অথচ বাজে বই মেঘদূত তা' পাঁচ বার প'ড়েছ! কাল থেকে গীতা পড়া হবে। রাজী ত?"

তারার দিকে করুণ চক্ষে চেয়ে নিশীথ বললে, "কিছু দিন না হয় গীতা পড়াই হোক, তারা?"

হাসিমুখে ঘাড় নেড়ে তারা বললে, "হোক্।"

পরদিন থেকে গীত বন্ধ হয়ে গীতা আরম্ভ হল।

৪

ফুল ফোটে না, গান হয় না, নূতন ছবির আমদানি নেই—যে-সময় এতদিন লঘু-ছন্দে চ'লছিল তা'র পায়ে যেন লোহার শিকল প'ড়েছে! এই অভূতপূর্ব্ব বিপদের মধ্যে প'ড়ে নিশীথ আর তারা সর্ব্বদা পরস্পরের কাছে কাছে থাকে; একের দুঃখ লঘু করবার জন্যে অপরে নিরতিশয় ব্যগ্র! মুখে কারো কথা নেই—কিন্তু চোখে-চোখে সমবেদনা ব্যাকুল গতিতে ছুটোছুটি করে! সুখের দিনে কাজ-কর্ম্মের নিরবসরে অনেক সময়ে তারা দূরে দূরে থাকত—দুঃখের দিনে কেউ কাউকে ছাড়তে চায় না।

ওষুধে রোগ বেড়ে গেল দেখে লতিকা রোষে ক্ষোভে পাগল হ'য়ে উঠ্‌ল! তারাকে নির্জ্জনে ডেকে সে চোখ লাল করে ব'ললে, "এ-রকম কাছে কাছে থাক্‌তে তোমার লজ্জা করে না?"

আকাশের দিকে তাকিয়ে সহজ সুরে তারা ব'ললে, "কই, না।"

তর্জ্জন ক'রে লতিকা ব'ললে, "করা উচিত! এখন থেকে দূরে দূরে থেকো। থাক্‌বে ত?"

মৃদু হেসে তারা ব'ললে, "থাক্‌ব।"

নিশীথকে নির্জ্জনে ডেকে লতিকা ব'ললে, "তুমি সর্ব্বদা তারার কাছে কাছে থাক কেন?"

নিশীথ ব'ললে, "কোনো কাজ নেই ব'লে।"

"কাজ নেই?—কাজের কি অভাব?—পুরুষ মানুষ কাজ নেই ব'লতে লজ্জা করে না?"

মাথা নত ক'রে নিশীথ বললে, "কি কাজ ক'রব বল?"

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

একটু ভেবে লতিকা ব'ল্‌লে, "জমীদারি দেখ।"

"সে জন্যে ম্যানেজার ত' রয়েছে।"

"ম্যানেজার ত' অন্য সকলকে দেখে—কিন্তু ম্যানেজারকে দেখে কে? সে যদি চুরি করে?"

নিশীথ বল্‌লে, "সে যদি চুরি ক'রে ত' আমি দেখ্‌তে আরম্ভ ক'রলে জোচ্চুরী ক'র্‌বে।"

কঠিন স্বরে লতিকা ব'ল্‌লে, "তা' হ'লে তুমি দেখ্‌বে না?"

একটু ভেবে নিশীথ ব'ল্‌লে, "দিনকতক না হয় দেখি।"

সে-দিন থেকে তারা তরকারী ক্ষেতের পাশে কড়াই-শুঁটি ঝোপের পিছনে দিন কাটাবার মত একটা আশ্রয় ক'রে নিলে। নিশীথ তা'র জমীদারি-সেরেস্তার কাছে একটা ঘর বেছে নিয়ে অফিস খুল্‌লে। জমাবন্দী, রোকড়, খতিয়ান, জমা-ওয়াশীল-বাকির মধ্যে সে নিজেকে একেবারে ডুবিয়ে দিলে।

লতিকা দূর থেকে দু'জনের মুখের ভাব লক্ষ্য ক'রে ক'রে অস্থির হয়ে উঠ্‌ল। যেটা সে মনে-মনে আশা ক'রেছিল সেই বেদনার ছাপ দু'জনের মধ্যে কারো মুখে দেখ্‌তে না পেয়ে সন্দেহের চেয়েও একটা কষ্টদায়ক জিনিসে সে পীড়িত হ'তে লাগ্‌ল। তা'র মনে হ'ল যে-যোগগুলো সে এতদিন ধ'রে ছিঁড়েছে সে-গুলো তেমন কিছুই নয়; সকলের চেয়ে বড় কোনো যোগ এখনও তা'দের মধ্যে রয়েছে—যা' চোখে ধরা প'ড়ছে না। এই অজানা বিপদ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে সে স্থির ক'রলে যে, লতাকে শুধু গাছ থেকে ছিন্ন ক'রলেই হবে না,—একেবারে মাটি থেকে সমূলে উপড়ে ফেল্‌তে হবে।

কয়েকদিন পরে সে তারাকে ব'ল্‌লে, "তোমার ত' এখানে আর কিছু করবার নেই?"

তারা হেসে ব'ল্‌লে, "না, তা' নেই।"

"তবে তুমি অন্য জায়গায় যাও না?"

"কোথায় যাব? আমার ত' যাবার কোনো জায়গা নেই।"

দৃঢ়স্বরে লতিকা ব'ল্‌লে, "না, তবু যাও।"

"কোথায়?"

"যেখানে হোক্‌।"

একটু ভেবে তারা ব'ল্‌লে, "তা' হ'লে সে-কাজটা তোমাকেই ক'রতে হয়; কারণ যেখানে হোক্ যাওয়ার চেয়ে যেখানে হোক্ পাঠানো সহজ। তুমি আমাকে জোর ক'রে পাঠিয়ে দাও।"

"কি রকম জোর ক'রে?"

তারা হেসে বল্‌লে, "জোরের কি আর রকম আছে? হাত-পা বেঁধে, টেনে হিঁচ্‌ড়ে—ইচ্ছে যদি হয়, চুলের মুঠি ধরে—"

একটা কি কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে অন্যমনস্ক হয়ে লতিকা বল্‌লে, "আচ্ছা দেখি—"

লতিকার মনে প'ড়ল তার বাপের বাড়ীর পাড়ায় কেশব নামে একজন যুবক আছে—যার কাজ করবার সাহস আর শক্তির অন্ত নেই। কাজে এক বার নাম্‌লে তখন আর তার শ্রেয়-হেয়র বিচার থাকে না। কাজ যত শক্ত হয়, শক্তি তা'র তত বেড়ে ওঠে।

সন্ধ্যার পর সে নিশীথকে ব'ল্‌লে, "একদিন কথায় কথায় তোমাকে ব'লেছিলাম "আমার যদি একজন পুরুষ সঙ্গী থাক্‌ত?'—সে তোমার মনে আছে?"

নিশীথ ব'ল্‌লে, "খুব মনে আছে।"

"তা'র উত্তরে তুমি কি ব'লেছিলে মনে আছে?"

নিশীথ ব'ল্‌লে, "তাও আছে।"

মুখ নীচু করে নখ দিয়ে মাটি খুঁড়্‌তে খুঁড়্‌তে লতিকা ব'ল্‌লে, "আমার একজন পুরুষ সঙ্গী আছে!"

"আছে?" নিশীথের মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল! "এত দিন ব'ল্‌তে ইতস্ততঃ ক'রছিলে কেন? কি নাম তা'র?"

মুখ লাল ক'রে লতিকা নাম ব'ল্‌লে।

"ঠিকানা?"

লতিকা ঠিকানা ব'ল্লে।

নিশীথ উৎসাহের সঙ্গে ব'ল্‌লে, "দেখ দেখি এমন একটা বড় কথা লজ্জা ক'রে চেপে রেখেছিলে! আমি কালই তা'কে নিমন্ত্রণ ক'রব;—কি বল?"

লতিকা ঘাড় নেড়ে নিঃশব্দে সম্মতি জানালে।

৫

দু-তিন দিন পরে নিশীথের নিমন্ত্রণ পেয়ে কেশব এসে হাজির হ'ল। নিশীথ তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে কেশবের হাত ধ'রে আদর ক'রে লতিকার কাছে নিয়ে গেল।

লজ্জায় আর ভয়ে লতিকার মুখ সন্ধ্যাকাশের মত কতকটা লাল আর কতকটা কালো হ'য়ে উঠ্‌ল। কম্পিত স্বরে সে শুধু ব'ল্‌লে, "এসো।"

হাসিমুখে নিশীথ বল্‌লে, "আমি এখন সেরেস্তায় গেলাম। তোমরা দু'জনে কথাবার্ত্তা কও। দেখো লতি, কেশবের যেন অযত্ন না হয়।" তারপর কেশবের দিকে তাকিয়ে ব'ল্‌লে, "বন্ধু, দয়া ক'রে যখন এসেছ, তখন সহজে ছাড়চি নে। দু'দিন পরেই যে কাজ আছে ব'লে ফিরে যাবার ফন্দী ক'রবে তা' হবে না।" নিশীথ চ'লে গেল।

কেশবের মনে বিস্ময় ছাড়া আর কোনো জিনিসের স্থান হ'চ্ছিল না। বাপের বাড়ীতে যে তা'কে একদিনও চেয়ে দেখেনি, শ্বশুর বাড়ীতে সে তা'কে ডেকে আন্‌লে কেন, এই নিরতিশয় বিস্ময় থেকে প্রথমে মুক্তিলাভ করবার জন্যে সে লতিকাকে জিজ্ঞাসা ক'রলে, "আমাকে আনিয়েছ কেন?"

লজ্জায় লতিকার মুখ টক্‌টকে হ'য়ে উঠ্‌ল। ধীরে ধীরে ব'ল্লে, "কাজ আছে।"

"কাজ আছে?" উৎসাহভরে কেশব জিজ্ঞাসা ক'রলে, "কি কাজ?"

"শক্ত কাজ।"

কেশব হাস্‌তে লাগ্‌ল। "শক্ত ত' পাথর হয়; কাজ আবার শক্ত হয় না-কি?—আমি জিজ্ঞাসা ক'রছি কি ক'রতে হবে?"

কতকটা নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে লতিকা ধীরে ধীরে তার অভিসন্ধি ব্যক্ত ক'রলে। ব'ল্‌লে, "যেমন ক'রেই হ'ক সরাতে হবে। এ আমার অসহ্য হ'য়েছে!"

এক মুহূর্ত্ত চিন্তা ক'রে কেশব জিজ্ঞাসা ক'রলে, "ওদেরো কি তোমাকে অসহ্য হ'য়েছে?"

কেশবের প্রশ্নে আশঙ্কায় লতিকার মুখ কালো হ'য়ে উঠ্‌ল; ব'ল্‌লে, "তা'ত ঠিক বুঝ্‌তে পারিনে। কিন্তু সে যাই হ'ক এ কাজ তোমাকে যেমন করেই হ'ক ক'রতে হবে।"

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে কেশব ব'ল্‌লে, "ক'রতে ত' হবেই; কিন্তু কেমন ক'রে ক'রতে হবে সে-টা দু-দিন লক্ষ্য না ক'রলে বুঝ্‌তে পারব না।"

কেশবের দিকে একটু এগিয়ে এসে ব্যগ্রস্বরে লতিকা ব'ল্‌লে, "দু-দিন কেন?" দশদিন হ'লেও কোনো ক্ষতি নেই, শুধু শেষ পর্য্যন্ত ক'রতে পারলেই হ'ল। তিন জনের এ-বাড়ীতে বাস অসম্ভব হ'য়ে উঠেছে।"

কেশবের মুখে এমন একটা অদ্ভুত রকম নিঃশব্দ হাসি ফুটে উঠ্‌ল,—যেমন লতিকা কোনো দিন কারো মুখে দেখেনি। চাপা-গলায় কেশব ব'ল্‌লে, "বুঝ্‌তে পারছি তোমাদের তিনজনের একসঙ্গে এ বাস ঠিক যেন ত্র্যহস্পর্শ হ'য়েছে। ত্র্যহস্পর্শ তিথির পক্ষেও যেমন অশুভ, সাথীর পক্ষেও তেম্‌নি অশুভ!"

উৎসাহভরে লতিকা ব'ল্‌লে, "ঠিক ব'লেছ!"

কেশব ব'ল্‌লে, "একটা কথা—যা'কে নিয়ে যাব সে থাক্‌বে কোথায়?"

"কেন, তোমার কাছে?"

৬

পাঁচ দিন পরে সন্ধ্যার সময়ে কেশব লতিকাকে ডেকে ব'ল্‌লে, "আজ রাত্রে কাজ শেষ ক'রতে হবে; প্রস্তুত থেকো।"

শুনে লতিকা শিউরে উঠ্‌ল। "এত শীঘ্র!"

কেশবের মুখে সেই প্রথম দেখার দিনের মত হাসি ফুটে উঠ্‌ল; ব'ল্‌লে, "শুভস্য শীঘ্রং!"

পাংশুমুখে লতিকা ব'ল্‌লে, "আমাকে প্রস্তুত থাক্‌তে বল্‌ছ কেন? কি কর্ত্তে হবে আমাকে?"

"তুমি রাত বারোটার সময়ে বাড়ীর পশ্চিমদিকের খিড়কীর দোরের কাছে একবার এসে দাঁড়াবে।"

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

চঞ্চল হ'য়ে উঠে লতিকা ব'ল্‌লে, "কেন, তা'তে কি হবে? আমাকে ডাক্‌বার ছল ক'রে তাকে সেখানে ডেকে নিয়ে যাবে নাকি?"

মাথা নেড়ে হাস্‌তে হাস্‌তে কেশব বল্‌লে, "তুমি আমাকে বিশ্বাস ক'রে কাজের ভার দিয়েছ ব'লেই যে আমি তোমাকে বিশ্বাস ক'রে কাজের কৌশল ব'ল্‌ব আমি তেমন কাজ ক'রিনে। আমাকে দিয়ে যদি কাজ নিতে চাও তা' হ'লে জেরা ক'রো না।"

ব্যস্ত হ'য়ে লতিকা ব'ল্‌লে, "না, না, আমি জেরা ক'রছি নে। আমি তোমাকে আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা ক'রব না —শুধু একটা ছাড়া।"

"কি?"

"সফল হবে ত?"

"নিশ্চয়! আজ তোমাদের ত্র্যহস্পর্শ কেটে যাবে— তিন জনের সঙ্গে এক মিশে দুইয়ে দুইয়ে ভাগ হবে। আজ তিথি কি জানো?"

"না। কি?"

"অমাবস্যা।"

ভীতস্বরে লতিকা ব'ল্‌লে, "বড্ড অন্ধকার হবে যে!"

"অন্ধকারেই ত' এ-সব কাজের সুবিধে হয়। তুমি যে দেখ্‌ছি কোন তন্ত্রেরি কিছু জানো না। আচ্ছা এখন যাও - যা' বল্‌লাম তা' যেন মনে থাকে।"

লতিকা এগিয়ে এসে তর্জ্জনী আর মধ্যমা দিয়ে কেশবের কাঁধের কাছে স্পর্শ ক'রে বল্‌লে, "আর আমি যা' বলেছি তা-ও যেন মনে থাকে। যদি জোর ক'রতে যায়, টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাবে;—এমন কি দরকার হ'লে চুলের মুঠি ধ'রেও। সে তাই ব'লেছিল।"

কেশব হাস্‌তে লাগ্‌ল; ব'ল্‌লে, "ছেলেমানুষ তুমি! টেনে-হিঁচ্‌ড়ে কি নিয়ে যাওয়া যায়! তা'তে আরো জোর বাড়িয়ে দেওয়া হয়।"

"তবে কি ক'রে নিয়ে যাবে?"

"সহজভাবে হাত ধরে। যদি জোর করে, তা'হলে দু-হাতে বুকের কাছে তুলে ধরে।"

লতিকা হেসে ব'ল্‌লে, "তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে পারবে তুমি। দেখ, আর একটা কথা আছে—সঙ্গে একটা বড় রুমাল রেখো—যদি চেঁচাতে যায় মুখ বেঁধে ফেলো। কিছুতে চেঁচাতে দিয়ো না।"

কেশব ব'ল্‌লে, "না, তা দেবো না। কিন্তু বড় রুমাল ত' আমার নেই—তুমি না হয় একটা এনে দাও।"

তেমন বড় রুমাল খুঁজে না পেয়ে লতিকা তাড়াতাড়ি নিশীথের একটা রেশমী গলাবন্ধ নিয়ে এল। "এতে হবে?"

গলাবন্ধটা খুলে দেখে কেশব ব'ল্‌লে, "চমৎকার হবে। এ কা'র গলাবন্ধ? তোমার স্বামীর?

"হুঁ্যা।"

কেশব হেসে ব'ল্‌লে, "এর চেয়ে ভালো আর অন্য কোনো জিনিস হ'তে পারে না। এ দিয়ে মুখ বাঁধ্‌লে, মুখ দিয়ে একটি কথা বেরোনো উচিত নয়।"

চিন্তিতমুখে লতিকা ব'ল্‌লে, "দেখ একটা কথা খালি আমার মনে হচ্ছে। ওদের দু-জনকে পৃথক করবার জন্যে এ পর্য্যন্ত যা কিছু আমি করেছি সব তাতেই যেন উল্টো ফল হয়েছে! ওদের মধ্যে যোগটা যেন বেড়েই গেছে! তুমি আজ যা ক'রছ তা'তে আরো বেশী ক'রে তাই হবে না ত?"

কেশবের মুখে আবার সেই অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠ্‌ল। লতিকা আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা ক'রতে সাহস ক'রলে না।

৭

রাত্রি বারোটার সময়ে লতিকা এসে খিড়্‌কীর দোরের কাছে দাঁড়াল। উত্তেজনায় তার বুকের মধ্যে যেন কোনো কল চ'ল্‌ছিল! দোরটা খুলে রেখে কাছেই কেশব লুকিয়ে ছিল। লতিকাকে দেখ্‌তে পেয়ে সে কাছে এল। হাতে সেই গলাবন্ধ।

রুদ্ধশ্বাসে লতিকা ব'ল্‌লে, "সব ঠিক ত?"

লতিকার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কেশব ব'ল্‌লে, "সব ঠিক।" তার পর নিমেষের মধ্যে বাঁ-হাত দিয়ে লতিকার গলা চেপে ধ'রে, ডান হাত দিয়ে তা'র মুখ বেঁধে ফেল্‌লে। একটু ধস্তাধস্তি হ'ল, কিন্তু কোনো ফল হ'ল না।

মুখ দিয়ে লতিকা কোনো কথা ব'ল্‌তে পারলে না। চোখ তা'র খোলা ছিল, কিন্তু চোখ দিয়ে সে কি-ভাব প্রকাশ

করবার চেষ্টা ক'রছিল নিবিড় অন্ধকারে তা' কিছুমাত্র বোঝা গেল না।

লতিকার হাত ধ'রে টান দিয়ে কেশব ব'ল্‌লে, "চল।"

লতিকা মাটিতে ব'সে পড়বার চেষ্টা ক'রলে। তখন কেশব তা'র দুই বাহুর মধ্যে লতিকার দেহ তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে অন্ধকার ভেদ ক'রে এগিয়ে চল্‌ল।

কিছুদূরে এসে লতিকাকে নামিয়ে দিয়ে কেশব তা'র মুখের বাঁধন খুলে দিয়ে ব'ল্‌লে, "তখন চেঁচাবার কোনো উপায় ছিল না—এখন চেঁচালে কোনো উপায় হবে না—বৃথা চেঁচাতে চেষ্টা ক'রো না।"

রোষে ক্ষোভে কম্পিতস্বরে লতিকা ব'ল্‌লে, "এ তুমি কি ভুল করলে? তাকে না এনে আমাকে আন্‌লে কেন?"

কেশব হেসে ব'ল্‌লে, "একটুও ভুল ক'রিনি। যে-কাজ যেমন ক'রে ক'রলে পণ্ড হয় সে-কাজ তেমন ক'রে করাই ভুল। তাকে এনে ব্রাহ্মস্পর্শ ভাঙ্গা যেত না।"

কেশব লতিকার হাত ধ'রে অন্ধকারে মিশিয়ে গেল।

সহর-কেন্দ্র

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

(৺ ডি এল্ রায়ের "একি, মধুর ছন্দ, মধুর গন্ধ, পবন মন্দ মন্থর"—
গানের প্যারডি)

একি মধুর মন্দ, ড্রেণের গন্ধ, ভবন অন্ধ কন্দর—
একি মধুর কুজ্ঝটিত শ্রীসূর্য্য, চক্রতূর্য্য-ঘর্ঘর।
একি ধরিল নিত্য কাশি,—
একি ধূলি-বিমিশ্র খবিরো কৃচ্ছ কু-ধূম রাশি রাশি—
একি ফ্যান চলিত ঘর-বিজলিত, পর-বিষয়ক জল্পন—
একি হরিৎ-বর্ণ না হেরি পর্ণ, রৌপ্য স্বর্ণ ঈশ্বর।
কভু ভোঁ দিল চিম্‌ণীতে,
উঠে হাঁকি মস্ত ব্যতিব্যস্ত তপ্‌সে মাছ নিশীথে—
উঠে 'রাম নাম সত্য' তান করি পরাণ কম্পিত—
ঘন অবিশ্রান্ত ঠিকানা-ভ্রান্ত খুঁজে পান্থ নম্বর।
একি খাঁটি দুগ্ধ-ধারা!—
একি গরুর দুগ্ধ চাবি-রুদ্ধ চাল-ধোয়া জল পারা,
একি সূক্ষ্ম বসন কিন্তু অশন শুক্‌নো কচু ও বর্ব্বটী—
পথে বাহুভগ্ন কুব্জ নগ্ন দুঃস্থ অন্ধ বিস্তর।



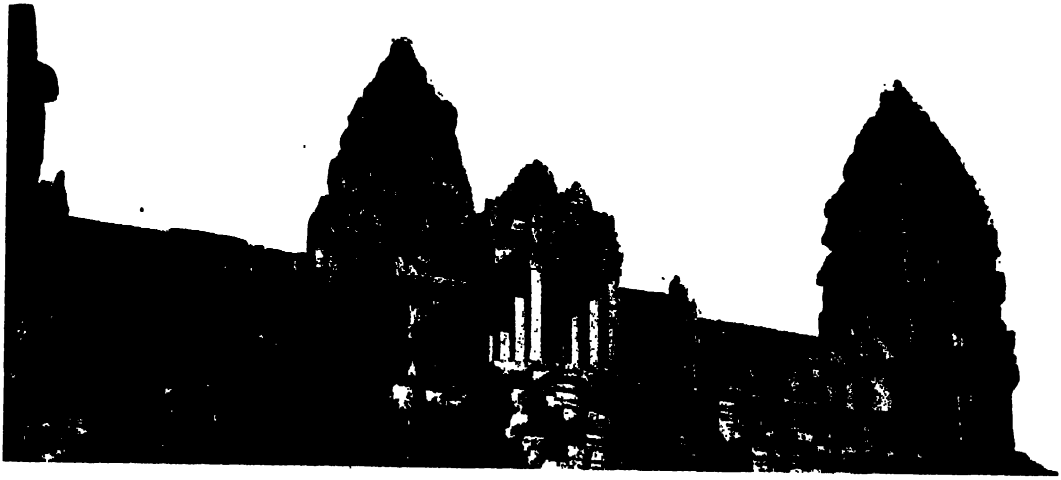
(৩) শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী

দক্ষিণের দ্বার দিয়ে আমরা বিগতশ্রী যশোধরপুরে প্রবেশ ক'রলাম। নগরের পুরাণো রাজপথকেই আবার সংস্কার ক'রে নূতন ক'রে তোলা হ'য়েছে। তা'র দুই ধার দিয়ে নূতন গাছ লাগিয়ে রাজপথের শোভা ফিরিয়ে আন্‌বার চেষ্টা হ'য়েছে। প্রকৃতির স্নিগ্ধতা তা'কে ঘিরে র'য়েছে বটে, কিন্তু রাজার ঐশ্বর্য্য ফিরিয়ে এনে কে আর তা'কে দেবে? শোভা-যাত্রার সঙ্গীতে যে-রাজপথ ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠ্‌তো, কালের অট্টহাসির স্রোত সে-পথের ওপর দিয়ে ব'য়ে গেছে,—শোভা-যাত্রা সে-পথ দিয়ে আর যায়নি—শোভাও তা'র আর কেউ ফিরিয়ে আন্‌তে পারেনি। এই শোভাহীন পথ বেয়ে চ'লেছি। যে-দিকে তাকাই ইষ্টক-চূর্ণ ও প্রস্তর-খণ্ড পুঞ্জীভূত হ'য়ে র'য়েছে। প্রাচীন গৃহভিত্তি ধূলিসাৎ



এঙ্কোর-ভাট — অলিন্দ-গাত্রে ভাস্কর-কার্য্য — বালিবধ

১২



এঙ্কোর-ভাট—বহির্দৃশ্য

হ'য়েছে। গৃহপ্রাঙ্গণ বনে পরিণত হ'য়েছে। সুনিপুণ ভাস্কর্য্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হ'য়ে র'য়েছে। সাত্‌শো বছর ধ'রে সে-গুলির উপর কেউ দৃকপাতও করেনি। যে যশোগরিমা ঐ প্রস্তরস্তূপের নীচে চাপা প'ড়ে গেছে, ত'ার জন্ত এই সুদীর্ঘকাল ধ'রে কারো প্রাণ কেঁদে ওঠেনি।

এই পথ বেয়ে আমরা বায়ন (Bayon) মন্দির-প্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হ'লাম। নগরের ঠিক কেন্দ্রস্থানে বায়ন নির্ম্মিত হ'য়েছিল। চারিদিক থেকে চারটী সুপ্রশস্ত রাজপথ বায়নের এই প্রাঙ্গণে এসে মিশেছে।

এই প্রাঙ্গণ ছাড়িয়ে গিয়ে একটু উত্তর দিকেই রাজ-প্রাসাদের বিশাল ধ্বংসাবশেষ। কম্বোজের আর কোনো মন্দির বায়নের মত এমন ভীষণ-ভাবে ধ্বংশে পরিণত হয়নি। মন্দিরের চূড়াগুলি মাটীতে প'ড়ে গেছে—তার প্রতি অংশ স্থানচ্যুত হ'য়েছে। চতুর্দ্দিকের প্রাচীর ভেঙে প'ড়েছে। স্তম্ভগুলির প্রায় সবই ভগ্নাবশেষে পরিণত। অনুমান হয় যে, সে-গুলিকে বর্ব্বর বিজেতারা হস্তীর সাহায্যে নষ্ট ক'রেছে। নইলে এই সুদৃঢ় স্তম্ভগুলির ধূলিসাৎ হবার জন্ত কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। কম্বোজের কোনো কোনো মন্দিরের প্রাচীর-গাত্রের খোদিত চিত্র (bas-relief) থেকে বোঝা যায় যে, অনেক সময় ঐরূপ কাজে হস্তী নিযুক্ত করা হ'ত। বায়নের বাইরের দিকটা সম্পূর্ণ নষ্ট হ'য়ে গেছে—তবে মন্দিরের ভিতরকার অংশটা এখনও অনেকটা দাঁড়িয়ে আছে। তাতে স্থাপত্য-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সব দিক্‌টা দেখ্‌লে মনে হয় যে, বায়ন-নির্ম্মাণেই কম্বোজের স্থপতিদের নৈপুণ্যের চরম পরিণতি। বায়ন পিরামিডের (Pyramid) ভাবে তিনটী স্তরে নির্ম্মিত। সর্ব্বোচ্চ স্তরের উপর মুকুটের মতো ক'রে মন্দিরের উচ্চ চূড়া স্থাপিত। ব্রহ্মার চতুর্মুখ দিয়ে তোরণ-চূড়ার শোভা বৃদ্ধি করা হ'য়েছিল। প্রতি তোরণে অদ্ভুত কারু-নৈপুণ্য পরিলক্ষিত হয়।

যশোধরপুরের মন্দিরগুলির ভিতর বায়ন যে সব চেয়ে প্রাচীন তা'তে কোন সন্দেহ নাই। এর নির্ম্মাণের ধারা দেখে অনুমান হয় যে, যশোবর্ম্মণের পিতা ইন্দ্রবর্ম্মণের রাজত্বকালে (৮৭৭—৮৮৯ খৃঃ অঃ) এর নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হয় ও যশোবর্ম্মণের সিংহাসন-আরোহণের পর (৮৯০ খৃঃ অঃ) এই মন্দিরের কার্য্য শেষ হয়। এর কয়েক বৎসর পর (৯২০ খৃঃ অঃ) যশোবর্ম্মণ এই নূতন রাজ-ধানীতে বসবাস আরম্ভ করেন। বায়নেও সেই সময় দেবতার প্রতিষ্ঠা হয়।

বায়নে কোনো লেখা পাওয়া যায়নি। কোন্ দেবতার এখানে প্রতিষ্ঠা হ'য়েছিল তা'ও বোঝা যায় না। অনেকে অনুমান করেন যে, এটী শিব-মন্দির ছিল ও রাজা ইন্দ্রবর্ম্মণ

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী

ও যশোবর্ম্মণ শৈব ছিলেন। বায়নের প্রস্তর-প্রাচীরে খোদিত-চিত্রে (bas-relief) হিন্দুধর্ম্মের পুরাণ কথা পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ও অন্যান্য দেব-দেবীর কীর্ত্তিকলাপ অঙ্কিত হ'য়েছে। অপ্সরীদের নৃত্য, দেব-সেনাপতি স্কন্দের অভিযান, সাগর-মন্থন প্রভৃতি আখ্যানও চিত্রিত র'য়েছে। এ-ছাড়া যশোধরপুরের নাগরিকদের সাধারণ কার্য্যকলাপের পরিচয়ও এই খোদিত পাষাণের ভিতর পাওয়া যায়। বায়নের প্রস্তর-প্রাচীরগাত্রে, কম্বোজের শিল্পীদের নেহনীতে, হিন্দুধর্ম্মের এই পুরাণ-কথা এমনি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট র'য়েছে, যে তা' দেখে মুগ্ধ হ'তে হয়।

বায়নের ধ্বংসাবশেষকে খাড়া রাখ্‌বার জন্য ফরাসী পণ্ডিতেরা খুব খেটেছেন। হ্যানয়ের (Hanoi) প্রাচ্য-বিদ্যাপীঠের কর্ত্তৃপক্ষরা যখন এঙ্কোরের প্রাচীন স্মৃতি-সংরক্ষণের ভার নিজেদের হাতে নেন্, তখন বায়নের অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল। বায়নের ধ্বংসাবশেষকে দুর্ভেদ্য বনে ঘিরে ধ'রেছিল; তা'র প্রাচীর ভেদ ক'রে অশ্বত্থ গাছ বেরিয়েছিল; ভগ্ন মন্দির-চূড়া লতাগুল্মে আবৃত হ'য়ে প'ড়েছিল ও মন্দিরের ভাস্কর্য্য দিনের পর দিন নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছিল। গত বিশ বৎসরের কার্য্যে বায়নের যা' অবশিষ্ট ছিল এখন নিরাপদ হ'য়েছে, তা'র প্রাঙ্গণ সুগম হ'য়েছে, তা'র ভাস্কর্য্য মিউজিয়মে (Museum) সুরক্ষিত হ'য়েছে।



এঙ্কোর-ভাট—ভিত্তিগাত্রের ভাস্কর-কার্য্য—নৃত্যশীলা অপ্সরী

কিন্তু সে ভগ্ন-মন্দিরের নিস্তব্ধতা আর ভাঙেনি। সে মন্দির-দ্বারে পূজার ঘণ্টা আর কেউ বাজায় নি, আরতি দেবার লোক আর মেলেনি। হাজার বছর আগে যেমনি ক'রে তার প্রাঙ্গণ ভক্তের কলরবে মুখরিত হ'ত তেমনি ক'রে দেবতার পূজা কর্‌বার জন্য আর ভক্তের সমাগম হয় নি। সে-মন্দিরে দেবতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা কর্‌বার বাসনা নিয়ে সে-পথ দিয়ে আর কোনো পথিক এই সাত্‌শো বছর ধ'রে আসেনি।

* * *

বায়ন থেকে সোজা পথ বেয়ে অল্প উত্তরে গেলেই পুরাণো রাজ-প্রাসাদের চত্বরে এসে পৌঁছান যায়। প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দেখ্‌বার আগে আর একটা মন্দির দেখে যাওয়াই সমীচীন, কারণ সেটা পথে পড়ে। বায়নের উত্তর-পশ্চিমে বনের ভিতর এর অবস্থান। রাজ-প্রাসাদের পাশে এটা নির্ম্মিত হ'য়েছিল—রাজা ও তাঁ'র অন্তঃ-পুরবাসিনীদের দৈনন্দিন পূজার সুবিধার জন্য। এই মন্দিরে যা'বার পুরাণো পথ ভগ্ন প্রাচীরের প্রস্তরের নীচে চাপা প'ড়েছে। তাই কোন সোজা পথ দিয়ে এ'তে পৌঁছান যায় না।

মন্দিরের পুরাণো নাম লোপ পেয়েছে। বর্ত্তমানে একে বাফুয়ন (Baphuon) বলা হয়। এই নামও কোনো পুরাণো নামেরই রূপান্তর। দুর্গম বনপথ দিয়ে আমরা এই মন্দির-দ্বারে উপস্থিত হ'লাম। যশোধরপুরের মন্দিরগুলির ভিতর বায়নের পরেই এর স্থান। অনুমান করা যায় যে, রাজা


এঙ্কোর-ভাট—মন্দির-দ্বার-চূড়ায় ভাস্কর-কার্য্য

জয়বর্ম্মণের রাজত্বকালে (৯৬৮ খৃঃ অঃ) এই মন্দির নির্ম্মিত হয়। বনানীর অত্যাচারে বাফুয়ন প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হ'য়েছে। এর যে-টুকু অবশিষ্ট, সে-টুকু রক্ষার জন্ত কাজ এখনও আরম্ভ হয়নি। বাফুয়নের প্রাচীর-গাত্রে যে-সব চিত্র (bas-relief) খোদিত হ'য়েছে, সে-গুলি প্রায়ই রামায়ণ থেকে নেওয়া। এর কারু-নৈপুণ্য বায়নের মতো সুন্দর না হ'লেও প্রসংশনীয়।

বাফুয়ন থেকে বেরিয়ে রাজপ্রাসাদের প্রাচীরের পাশ দিয়ে বনপথ বেয়ে আমরা রাজপথে এসে প'ড়্লাম। বায়ন থেকে এই পথটা রাজপ্রাসাদের চত্বরে এসে প'ড়েছে। এই পথ ধ'রে আমরা রাজ-প্রাসাদের বিশাল ধ্বংসাবশেষের সাম্নে এসে দাঁড়ালাম। রাজপ্রাসাদকে ফিমিয়ে-নক(শ্) (Phimeanakas) বলে। প্রাচীন নাম ছিল "বিমানোকস্" অর্থাৎ "স্বর্গপুরী"। ফিমিয়েনক্ পুরাণো সংস্কৃত কথাটিরই কম্বোজীয় রূপান্তর। এই "বিমানোকস্" প্রাসাদ প্রাচীরে সুরক্ষিত ও নানা ভাগে বিভক্ত ছিল। ভিতরের দিকে ছিল অন্তঃপুর—সেখান থেকে বাফুয়নের মন্দিরে সহজেই যাওয়া চ'লত। অন্তঃপুরের অংশটা এমনিভাবে ধূলিসাৎ হ'য়েছে ও তা'র ভগ্নাবশেষকে এমন ভাবে বনে ঘিরে ধ'রেছে যে, সে-দিকটায় সহজে প্রবেশ করা যায় না। প্রাচীর বেয়ে, বন অতিক্রম ক'রে ও লতাগুল্ম সরিয়ে প্রবেশ ক'রতে পারলেও, স্তূপাকার প্রস্তর ব্যতীত আর কিছুই চোখে পড়ে না। সুতরাং রাজপ্রাসাদের বাইরের দিকটার কথাই আমরা ব'ল্বো। সে-দিকটা এখনো সম্পূর্ণ নষ্ট হয়নি; বন থেকে সেটাকে বাঁচান হ'য়েছে।

পূর্ব্বেই ব'লেছি যে, যশোধরপুরের প্রতিষ্ঠাতা যশোবর্ম্মণ এ-পুরীতে নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে (৮২০ খৃঃ অঃ) বসবাস আরম্ভ করেন। সেই সময় থেকেই "বিমানোকসের" গৌরবের সূচনা। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত, প্রায় চারশো বছর ধ'রে এই প্রাসাদে কম্বোজের রাজবংশ অধিষ্ঠিত ছিলেন। তা'র পরই ভাগ্যলক্ষ্মী অপ্রসন্ন হ'ন ও যশোধরপুরের গৌরবরবি অস্তমিত হয়। রাজপ্রাসাদ ব'লে এর উপর বর্ব্বরের অত্যাচার সব চেয়ে বেশী হ'য়েছিল।

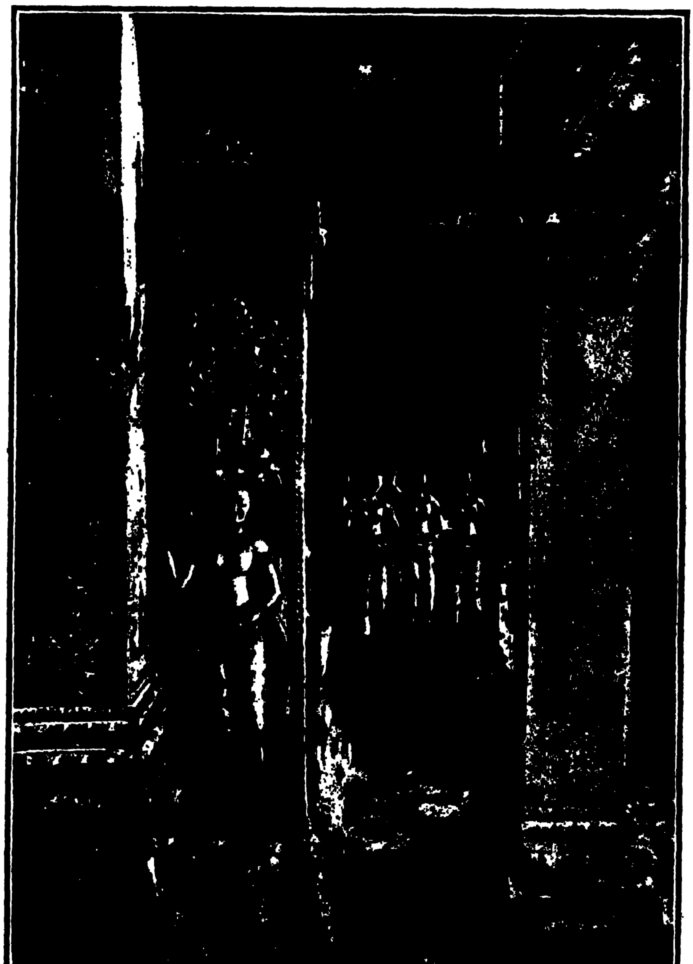
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী

রাজপ্রাসাদের চত্বর থেকে বরাবর একটী পথ পূর্ব্ব দিকে গিয়েছে। এই পথ দিয়ে নগরের প্রাচীরদ্বারে পৌঁছতে পারা যায়। পূর্ব্বেই ব'লেছি নগরের এই দিকটায় দু'টো দরজা। যে-দরজা দিয়ে চত্বরের পথে উঠ্‌তে হয় সেটাকে "বিজয়-দ্বার" বা সিংহদ্বার বলা হয়। রাজবাটীতে প্রবেশ করবার এইটী ছিল সদর দরজা। চত্বরের সম্মুখে "বিমানোকসে"র বিশাল অলিন্দ এখনো দাঁড়িয়ে আছে। তা'র অল্পই নষ্ট হ'য়েছে। এইটী প্রাচীনকালে ফোরামের (Forum) কাজ ক'রত। চত্বরে যে-সব ক্রীড়া-কৌতুক বা মল্লযুদ্ধ দেখান হ'ত, তা' রাজা ও তাঁর পারিষদেরা এই অলিন্দ থেকে পরিদর্শন ক'রতেন। বিস্তৃত সোপান দিয়ে এই অলিন্দে উঠ্‌তে হয়। সোপানের দু'দিকে বৃহৎ গরুড় মূর্ত্তি দিয়ে অলিন্দ-স্তম্ভের শোভা বৃদ্ধি করা হ'য়েছে। অলিন্দ অতিক্রম ক'রে প্রাসাদের বিভিন্ন প্রাঙ্গণে পৌঁছান যায়। নানা প্রাঙ্গণ ও ভগ্নস্তূপের ভিতর দিয়ে অন্তঃপুরের পথ। এই সব প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে যে-সব গৃহের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়, সে-গুলির কোন্‌টা কোন্ কাজে লাগ্‌ত তা' এখনো ভাল ক'রে বোঝা যায় না, তবে তা'র প্রত্যেক প্রস্তর-খণ্ডে অদ্ভুত শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

অলিন্দে দাঁড়িয়ে এই শূন্য পুরীর চারদিকটায় একবার তাকিয়ে দেখ্‌লাম। নগর-প্রাচীর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে। রাজ-পথের দুইপাশে নাগরিকদের গৃহের ভগ্নাবশেষ লতাগুল্মে আচ্ছাদিত হ'য়ে র'য়েছে। কোথাও বা বৃদ্ধ অশ্বত্থ গাছ সে-ভগ্নাবশেষের ভিতর দিয়ে সগর্ব্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে; শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে সে কালের এই তাণ্ডব-নৃত্য দেখেছে, তাই যেন তা'র কোন ভ্রূক্ষেপ নেই—উদাসীন ভাব অবলম্বন ক'রেছে। তা'র সাম্‌নে বিজয়ী বর্ব্বরের হস্তীর পদতলে এই "বিমানোকসে"র গগনস্পর্শী চূড়া চুরমার হ'য়েছে, পুরবাসীদের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হ'য়েছে, বায়ন-মন্দিরের শঙ্খঘণ্টার ধ্বনি শত্রুর কোলাহলে মিশিয়ে গেছে। এখন সেখানে শুধু বিষাদভরা নিস্তব্ধতা।

* * *

"বিমানোকসে"র প্রাচীরের পাশ দিয়ে বনপথ বে'য়ে আমরা রাজপ্রাসাদের পশ্চিম দিক্‌টায় উপস্থিত হ'লাম। পূর্ব্বে, বোধ হয়, অন্তঃপুর থেকে এখানে যাতায়াত চ'ল্‌তো।



এঙ্কোর-ভাট—ভিত্তিগাত্রের ভাস্কর্য্য

এখানে একটি 'পুরাণো স্রস্ (Sras, সংস্কৃত সরস্—অর্থাৎ সরোবর—কথার রূপান্তর) বিদ্যমান। অনেক ভরাট হ'য়ে গেছে। কিন্তু এখনো বর্ষায় জল হয়। এ ছাড়া প্রায় প্রতি মন্দির-প্রাঙ্গণেই ছোট ছোট সরস্ ছিল। সেগুলি একেবারে ভরাট হ'য়ে গেছে। রিমানোকসের পশ্চিম দিক্‌টার এই সরোবরকে খুব সুন্দর ক'রে খনন করা হ'য়েছিল। চারিদিকের পাড়ই প্রস্তরে বাঁধা, তা' ছাড়া মনোরম তীর্থিকা। সে-গুলি প্রায় ধ্বংস হ'য়ে গেছে; কিন্তু রাজার ও পুরবাসিনীদের সুরুচির পরিচয় এখনো তা'তে পাওয়া যায়। তীর্থিকার শিল্প-নৈপুণ্য দেখ্‌লেই মনে হয় যে, এই সরোবরের তটভূমি একদিন অন্তঃপুরবাসিনীদের নূপুর ঝঙ্কারে মুখরিত হ'য়ে উঠ্‌তো,—তাঁদের বেণীমুক্ত কেশপাশের সৌরভে একদিন এই সরোবরতীরের বায়ু সুগন্ধময় হ'য়ে উঠ্‌তো,—তাঁদের চরণস্পর্শে জল আনন্দে নেচে উঠ্‌তো।

যশোধরপুরের প্রাচীরের ভিতর আর যে-সব ভগ্নাবশেষ আছে, সে-গুলি দেখা শেষ ক'রে আমরা পূর্ব্বদিক্‌কার "বিজয়-দ্বার" দিয়ে বের হ'লাম। এর বাইরে যে-সব প্রাচীন কীর্ত্তি আছে তা'র ভিতর প্রা-খান্ (Prah Khan) এবং টা-প্রোম্ (Ta Prohm) না দেখ্‌লে সব দেখা শেষ হয় না। প্রা-খান্ নগর-প্রাচীরের নৈঋত কোণে এবং টা-প্রোম্ পূর্ব্বে। বিজয়দ্বার দিয়ে যে বর্ত্তমান সড়ক বেরিয়েছে, সেটী পুরাতন রাজবর্ত্মের রেখাই অনুসরণ ক'রেছে। সেই সড়ক বেয়ে সহজেই টা-প্রোম্ ও প্রা-খান্ যাওয়া যায়। সেই সড়কে পড়বার আগে আমরা নগরপ্রাচীরের অবস্থা দেখে নেব মনস্থ ক'রে 'বিজয়দ্বার' দিয়ে বেরিয়ে প্রাচীরের পাশ দিয়ে চ'ল্‌লাম। এখানে কোন পথ নেই, বনে ঘিরে র'য়েছে। হাত দিয়ে লতাগুল্ম স'রিয়ে, কোথাও প্রাচীর বেয়ে উঠে আমাদের পথ ক'রে নিতে হ'ল। প্রাচীর অনেক স্থানে সম্পূর্ণভাবেই দাঁড়িয়ে আছে, কোথাও বা আংশিকভাবে নষ্ট হ'য়েছে, কোথাও বা একেবারে ধূলিসাৎ হ'য়েছে। প্রাচীরের পাশে মাঝে মাঝে ছোট সুরক্ষিত গৃহের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। এ-গুলি নগর-রক্ষক শাস্ত্রীদের আবাসস্থল ছিল—দেখ্‌লেই বোঝা যায়। যে-পথে আমরা চল্‌ছিলাম সে-পথ ক্রমে এতই দুর্গম হ'য়ে উঠ্‌লো যে, আমরা আর বেশী অগ্রসর হ'তে না পেরে হতাশ হ'য়ে 'বিজয়-দ্বারে' ফিরে এলাম ও টা-প্রোমের উদ্দেশ্যে প্রধান সড়কে বেরিয়ে প'ড়লাম।



এঙ্কোর-ভাট—ভিত্তিগাত্রের ভাস্কর্য্য—মহিষাসুর (?)

(ক্রমশঃ)

ক্রমশঃ-প্রকাশ্য উপন্যাস

সতী

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

(৪)

আফিসে বসিয়া ভূপতি মনে মনে অনেক বার বলিল, সুরমা ফিরিয়াছে, এখন আর ও পথে নয়। কিন্তু দ্বিপ্রহরে লাঞ্চ্ খাইবার সময়ে একটা 'পেগ্' খাইবার তৃষ্ণা সে কিছুতেই দমন করিতে পারিল না। সেটা শেষ হইয়া গেলে খানসামা যখন আর এক 'পেগ্' ঢালিয়া দিল তখনও সে অস্বীকার করিল না। ইহাতে তার মনে অনেকটা স্ফূর্ত্তি হইল, কারণ এখন আর সে দুই-এক পেগ্ খাইয়া বে-চাল হইয়া পড়ে না; কিন্তু ভয়ও একটু হইল, বাড়ী ফিরিলে সুরমা হয়তো গন্ধ টের পাইবে। তাহার প্রতিকারের জন্য সে মনে মনে কয়েকটি উপায় উদ্ভাবন করিল।

দিন যতই গড়াইয়া পড়িতে লাগিল ততই কিন্তু তার সঙ্কল্পের বাঁধ শিথিল হইয়া আসিল। আজ সন্ধ্যাবেলায় বিলাসের কাছে যাইবে এককড়িকে এ-কথা বলিয়া দিয়াছে। না গেলে বিলাস বড় নিরাশ হইবে; সে যে সত্যই ভূপতিকে অতিশয় ভালবাসে! তবু মনে হইল উপায় নাই; ও-পথে যাওয়া আর হইতেই পারে না!

কিন্তু আজ না গেলে হয়তো বিলাস এককড়িকে আবার তাহার নিকট পাঠাইবে। তখন সে তাহাকে ঠেকাইবে কি বলিয়া? এমন বিপদেও মানুষে পড়ে! হাতের কাজ ঠেলিয়া দিয়া একান্ত বিরক্তিভরে সে মুখ বিকৃত করিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল!

* * * *

মুখে নানা রকম মশলা পুরিয়া, দেহময় ল্যাভেণ্ডার মাখিয়া, ভূপতি বাড়ী ফিরিল। রাস্তায় কয়েকগাছা বেলফুলের মালাও কিনিয়া লইল। এবং এত সাবধানতা সত্ত্বেও সে ভয়ে ভয়ে সুরমার সন্নিধান হইতে বরাবর তফাতেই রহিল।

ফুলের মালা দেখিয়া সুরমা হাসিয়া বলিল, "বুড়ো বয়সে এ-কি রঙ্গ!"

ভূপতি বলিল, "আজ যে আমাদের আবার নূতন ক'রে ফুলশয্যা হবে!"

খাবার খাইতে খাইতে তার মনে হইল, "না, আজ একবার না গেলেই নয়! আজ গিয়া একেবারে বিলাসের সঙ্গে রোকশোধ করিয়া আসিলেই ভাল হইবে।"

তীব্র আকর্ষণে তাহাকে টানিতেছিল, কাজেই যাওয়ার স্বপক্ষে যুক্তির অভাব হইল না। জল খাইয়াই সে তাড়াতাড়ি বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

সুরমা ক্ষুণ্ণভাবে বলিল, "আজ কি না বেরুলেই নয়?"

ভূপতি বলিল, "না, বড় জরুরী কাজ আছে।" তার পর একটু ভাবিয়া বলিল, "একটা সন্ধান পেয়েছি; দেখি তরুর কোনও খবর পাওয়া যায় কি না।" বলিয়া তড়-বড় করিয়া চলিয়া গেল।

সুরমা কেবল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

ভূপতির আজকালকার কাহিনী সুরমা কিছুই জানে না; এ-বিষয়ে তার মনে এক ফোঁটা সন্দেহও নাই। জ্যোতি সব কথা জানিতে পারিয়াছিল এবং জানিয়াই অবিলম্বে গিয়া সুরমাকে লইয়া আসিয়াছে। কিন্তু সুরমাকে সে এ-সম্বন্ধে কিছুই বলে নাই। তার মনে ভরসা ছিল, সুরমা আসিলে ভূপতি সহজেই শুধ্‌রাইয়া যাইবে। একান্ত

যদি তেমন না হয়, তখন সকল কথা সুরমাকে খুলিয়া বলিলেই হইবে; মিছামিছি সে সুরমাকে দুঃখ দিতে চায় না। তাই সুরমা সম্পূর্ণ নিঃশঙ্কচিত্তেই আসিয়াছিল। আজ তার দুঃখ হইল, স্বামীর প্রতি কোনও সন্দেহে নয়, এতদিন পরে স্বামীর কাছে আসিয়া দু'দণ্ডের জন্য তাকে কাছে পাইল না বলিয়া।

পথে ভূপতি সমস্তক্ষণ নানারকম মুসাবিদা করিতে করিতে চলিল কেমন করিয়া বিলাসের সঙ্গে তার সম্বন্ধ একেবারে ছিন্ন করিয়া আসিবে। কিন্তু যখন সে বিলাসের নিকট পৌঁছিল তখন আর সে-কথা মনে করিবার অবসর রহিল না।

বিলাসের বাড়ীর এখন শ্রী ফিরিয়াছে। বাড়ীতে অন্য ভাড়াটিয়া স্ত্রীলোক যাহারা ছিল, সকলকে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আদ্যোপান্ত ভিতর-বাহির সংস্কার করিয়া ঘরে ঘরে রঙ্‌-করা ও আস্‌বাব্‌ সাজান হইয়াছে; কেরোসিন ল্যাম্পের স্থলে বিজ্‌লী বাতি জ্বলিতেছে ও তালপাতার হাত-পাখার পরিবর্ত্তে ইলেক্‌ট্রিক্‌ পাখা চলিতেছে; দরজায় দ্বারবান বসিয়া; চতুর্দ্দিকে দাস-দাসী কাজ করিয়া বেড়াইতেছে; বলা বাহুল্য এ সবই ভূপতির অর্থে। ভূপতির নিজের ঘরে যে-সব সৌষ্ঠব নাই এখানে তার ছড়াছড়ি।

ভূপতি আসিবামাত্র বিলাস তাহাকে সাদর সম্ভাষণ করিয়াই দু'হাত পিছাইয়া গিয়া বলিল, "আবার আজ খেয়েছ? ও ছাই কেন খাও শুনি। একেবারে জাহান্নমে না গিয়ে আর ছাড়বে না?"

এ-রকম তিরস্কার ভূপতির অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। বিলাস তাহার বাড়ীতে মদ আনিতে দিত না, কিন্তু ভূপতি প্রায়ই বাহির হইতে মদ খাইয়া আসিত। বিলাসের তিরস্কারের কোনো উত্তর না দিয়া হাসিমুখে ভূপতি বসিয়া পড়িল।

তার পর গীতবাদ্য হাস্য-পরিহাসের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া ঘণ্টাগুলি কাটিয়া গিয়া যে দশটা বাজিয়া গেল ভূপতি তাহা বুঝিতেই পারিল না। দশটা বাজিয়াছে দেখিয়া সে চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল;—বলিল, "ইস্‌, বড্ড দেরী হ'য়ে গেছে! ভারী জরুরী কাজ আছে আমার, এখন যাই।"

বিলাস মুখখানা ভার করিয়া বলিল, "তবে আর আস্‌বার দরকার কি ছিল?"

বিপন্ন হইয়া ভূপতি নানারকম অনুনয় করিয়া বিলাসকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিল। শেষে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই অঙ্গীকার করিল যে, পরদিন একছড়া প্ল্যাটিনামের হীরা-বসান হার আনিয়া সে সে-দিনের অবহেলার প্রায়শ্চিত্ত করিবে। অবশেষে সেই কড়ারে বিলাস তাহাকে ছাড়িয়া দিল।

সে-দিন ত ছাড়াছাড়ির কথা বলা হইলই না, অধিকন্তু পরের দিন আসিবার একটা নিমন্ত্রণ রহিয়া গেল।

বাড়ী ফিরিবার পথে ভূপতির মন অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। সুরমার সান্নিধ্য যতই বাড়িতে লাগিল ততই তার মনে হইতে লাগিল কাজটা ভাল হয় নাই। প্রথমতঃ বিলাসের কাছে পুনরায় গেলে সুরমা হয়ত টের পাইবে। তা'ছাড়া প্ল্যাটিনামের হারটার দাম প্রায় ছয়-সাত হাজার টাকা। সে টাকা এখন পাইবে কোথায়? তার নিজের কাছে কোনও দিনই টাকাকড়ি থাকিত না, থাকিত সুরমার কাছে। এতদিন নিজের হাতে ছিল, স্বচ্ছন্দে খরচ করিয়াছে, এখন তো আর তাহা চলিবে না। এখন প্ল্যাটিনামের হারের দাম দেওয়া দূরের কথা, তার যে দেনা হইয়াছে তাই দেওয়াই তার পক্ষে অসম্ভব! কারণ সুরমা সুগৃহিণী, প্রত্যেকটি পয়সার হিসাব সে রাখে। তার কাছে ফাঁকি দিয়া পোনেরো হাজার টাকা বাহির করা সম্ভব হইবে না। বলা বাহুল্য, ইতি-মধ্যে যে খরচপত্র সে করিয়াছে, তাহা তার আয় হইতে কুলায় নাই। বিনায়ক এককড়িকে বলিয়াছিল, ভূপতি লক্ষপতি। এককড়ি ও বিলাস তাহাকে লক্ষপতি ভাবিয়াই ফরমায়েস করিয়াছে ও খরচ করাইয়াছে। তার বড়মানুষীর এ খাতিরটা ক্ষুণ্ণ করিতে ভূপতি কুণ্ঠিত হইত; কাজেই দেনা করিতে হইয়াছে। সে দেনা কোথা হইতে শোধ হইবে তাহা ভূপতি ভাবিয়া পাইল না। তার উপর আবার হীরার হারের এই নূতন সমস্যা!

ভাবিতে ভাবিতে রাত্রি এগারটার সময় সে বাড়ী ফিরিল।

শ্রীনরেশচন্দ্র সেন-গুপ্ত

তখন সুরমা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; তার ঘরে ভূপতির ভাত ঢাকা রহিয়াছে। সে নিজে খায় নাই; ভূপতির খাওয়া হইলে সেই পাতে খাইবে।

সুরমা যে না খাইয়া ঘুমাইয়াছে সে-কথা ভূপতির খেয়াল হইল না। সুরমা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া সে যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে নিঃশব্দে আহার করিয়া বিছানার একপাশে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

(৫)

বেলা বারটা বাজে, এমন সময় রোদে পুড়িয়া বাড়ী ফিরিয়া জ্যোতি পথের দিকে দোতলার বারান্দার উপর একখানা ইজি চেয়ারে হাত-পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িল।

ব্যগ্রকণ্ঠে সুরমা বলিল, "ঠাকুরপো, লক্ষী ভাই আমার, এমনি ক'রে ঘুরে ঘুরে তুমি শরীরখানাকে নষ্ট ক'রো না। সে যে গেছে, তাকে আর পাওয়া যাবে না; যাবার হ'লে এতদিন পাওয়া যেত।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া জ্যোতি বলিল, "সে আমি জানি বউদি; তরুর আশা আমি প্রায় ছেড়ে দিয়েছি;---এখন আমি তার কথা ভাব্‌ছি না।"

"তবে কি ভাব্‌ছো? আর কিসের জন্যেই বা এমন ক'রে শরীরখানার এ দশা ক'রছো?"

জ্যোতি উঠিয়া বসিল; বলিল, 'কি ভাব্‌ছি শুনবে বউদি? তরুর জন্য ঘুরে ঘুরে আমি ক'ল্‌কাতার কত জঘন্য জায়গায় যে গিয়েছি তা' তুমি একেবারেই জান না। আর সেখানে যা দেখেছি তা' তুমি কল্পনায়ও আন্‌তে পার না। ওঃ বউদি, এত দুঃখ, এত কষ্ট, এত ক্লেদ যে জগতে আছে তা' আমি কখনও জান্‌তাম না।"

"তা' সে কথা ভেবে তুমি কষ্ট ক'রে কি ক'রবে বল। ভগবান যাদের দুঃখ দেন সে যে কেন দেন তা' তিনিই জানেন। পূর্ব্ব-জন্মে যে যেমন কাজ ক'রেছে তার ফলভোগ ক'রতে তো হবে।"

"বউদি, তুমি জান না, তাই কেবল ভগবানের ঘাড়ে সব বোঝা চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হ'চ্ছ। আমি কি দেখেছি জান? এই সহরের এত বিলাসের পাশে আমি স্বচক্ষে দেখেছি ক্ষুধার জ্বালায় লোকে আঁস্তাকুড় থেকে খাবার কুড়িয়ে খাচ্ছে।"

"সে আমিও একদিন দেখেছি। মাগো ঘেন্না করে না ওদের! অসুখও করে না!"

"অসুখ করে বউদি; তবে অসুখ ক'রলে আমাদের মত তাদের দেখ্‌তে দশটা ডাক্তার আসে না। অসুখ তাদের করে, রাস্তার পাশে ম'রে প'ড়েও থাকে, তার পর মুদ্দোফরাস এসে তাদের ফেলে দেয়। আর সেই মড়ার পাশ দিয়ে আমরা মোটর হাঁকিয়ে হাওয়া খেতে যাই।"

তার পর কয়েক মাস ঘুরিয়া ঘুরিয়া যে-অভিজ্ঞতা সে সঞ্চয় করিয়াছিল তাহা সুরমার কাছে বলিয়া গেল। কলিকাতায় অনেক কাণা, খোঁড়া, কুষ্ঠী ভিখারী পথের ধারে দেখিতে পাওয়া যায়। জ্যোতি খুঁজিয়া খুঁজিয়া ইহাদের বাড়ী দেখিয়া আসিয়াছে। ইহারা থাকে অতি জঘন্য স্থানে। কতকগুলি লোক আছে তাহারা ইহাদের খাইতে দেয়, দিনের বেলায় পথের ধারে ইহাদের বসাইয়া রাখে, সন্ধ্যাবেলায় লইয়া যায়। বিনিময়ে যাহা কিছু ইহারা রোজগার করে তাহা এই সব লোক আত্মসাৎ করে। কি কষ্টে যে এই সব ভিখারী জীবনধারণ করে তাহা বর্ণনা করিতে জ্যোতির চক্ষে জল আসিল। একদিন একটা কুষ্ঠী দুই আনা পয়সা লুকাইয়া রাখিয়াছিল; তাহাতে ইহার মুনিব তার সেই গলিত দেহের উপর যে নির্ম্মম প্রহার করিয়াছিল তাহা জ্যোতি স্বচক্ষে দেখিয়াছে। তাহাকে নিবারণ করিতে যাইয়া জ্যোতিকেও কিছু লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল।

তারপর সে বলিল পতিতা নারীদের কথা। ইহাদের মধ্যে অনেকে খাইয়া পরিয়া এক রকম আনন্দে থাকে। কিন্তু খুব বেশী দিন নয়। বৃদ্ধ বয়সে ইহাদের অনেকেরই দুর্গতির অন্ত থাকে না। তাদের জন্য জ্যোতির দুঃখ হইয়াছিল, কিন্তু তার চেয়ে বেশী দুঃখ হইয়াছিল তাদের জন্য, যারা উপস্থিত বিলাস-বৈভবের ভিতর ডুবিয়া আছে।

"আমি এদের সঙ্গে কথা ক'য়ে দেখেছি বউদি। কথা কইলেই দেখা যায়, এদের মধ্যে প্রায় অনেকেরই

দয়া-মায়া আছে, ন্যায়-অন্যায় বোধ আছে—এরাও মানুষ। কিন্তু তবু এরা এদের মনুষ্যত্বকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে দিন দিন তিল তিল ক'রে আত্মাকে বধ ক'রছে,—একটিবার মনে ভাব্‌ছে না, কি তুচ্ছ সুখের জন্য জীবনের কত বড় সম্পদকে তারা অবজ্ঞা ক'রছে। এই যে এদের নিজেদের অবস্থায় তুষ্টি, এইটেই বোধ হয় এদের জীবনের সব চেয়ে বড় অভিশাপ।"

ইহা ছাড়া কলিকাতার পথে-ঘাটে গৃহহীন অনেক নারী আছে—কুৎসিৎ, কদাকার, অন্নহীন, বস্ত্রহীন,—ইহারা ভিক্ষা করে, চুরি করে, যে কোনও অপকার্য্য অনায়াসে করিতে দ্বিধা বোধ করে না,—শুধু উদরান্নের জন্য, তাও তাদের জোটে না। ইহাদের দুঃখের কথা বলিবার নয়।

কিন্তু সব চেয়ে বেশী দুঃখের কথা এই যে, কেবল অন্ন-কষ্ট ছাড়া তাদের যে আর কোনও দুঃখ আছে, তাহা ইহারা একবারও মনে করে না। নারায়ণ ইহাদেরও ভিতর আছেন, কিন্তু তিনি অনন্তশয্যায় সুপ্ত।

এই ভিখারীর দলের নির্ম্মমতার পরিচয় দিতে গিয়া জ্যোতি বলিল,—এরা নিজের পেটের ছেলেমেয়েকে পর্য্যন্ত মায়া করে না। বেশী রোজগার হইবে বলিয়া ছোট ছোট কচি শিশুদিগকে রৌদ্রবৃষ্টিতে লইয়া ভোগাইয়া বেড়ায়। লোকের সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার জন্য তাদের ইচ্ছা করিয়া বেশী কষ্ট দেয়।

"ব'ল্‌বো কি বউদি, এই কয়মাস তরুকে খুঁজ্‌তে গিয়ে আমি যা' দেখেছি তাতে তরুর কথা ভুলে গেছি। জগতজোড়া এত দুঃখ—আর আমি কেবল হাত-পা গুটিয়ে ব'সে আছি, নিজের সুখের সন্ধান ক'রছি! ওঃ!"

বলিয়া জ্যোতি হাতের ভিতর মুখ গুঁজিয়া বসিয়া রহিল। সুরমা তার মুখ তুলিয়া ধরিয়া সস্নেহে বলিলেন, "কি ক'রবে ভাই, উপায় তো নেই। তাই ব'লে কি পুরুষ মানুষের অত মুশ্‌ড়ে' যেতে আছে!"

"পুরুষ মানুষ! কে পুরুষ বউদি? বাঙ্‌লা দেশে পুরুষ নেই। যদি পুরুষ থাক্‌তো তবে কি এত দুঃখ কষ্ট দেশে থাক্‌তে তারা দিব্যি আরাম ক'রে নিজের সুখ খুঁজে বেড়াতে পারতো! পুরুষ ছিলেন একজন—স্বামী বিবেকানন্দ,— যিনি স্পর্দ্ধার সঙ্গে ব'লেছিলেন,—'পৃথিবীর দীনতম হীনতম জীবের মুক্তি না হ'লে তাঁর মুক্তি নেই।'

হাত জোড় করিয়া, মাথায় ঠেকাইয়া সুরমা বলিল, "আহা তিনি ছিলেন মহাপুরুষ, দেবতা। তাঁদের দিয়ে কি সাধারণ মানুষের বিচার করা চলে? আর তিনিই বা কি ক'রতে পারলেন? বুদ্ধ থেকে আরম্ভ ক'রে বিবেকানন্দ পর্য্যন্ত কত মহাপুরুষই তো মানুষের দুঃখে কেঁদে গেলেন, কিন্তু দুঃখ তো গেল না!"

"গেল না, সে কেবল আমরা মানুষ নই ব'লে। মহাপুরুষেরা আসেন; তাঁদের কথা আমরা শুনেও শুনি না; তাঁদের কাজ করবার এক ফোঁটাও চেষ্টা আমাদের নেই। কেবল ওই তোমার মত আমরা তাঁদের পায়ে মাথা ঠুকে' তাঁদের দেবতা ব'লে নিশ্চিন্ত। জান বউদি! যে-দেশে মানুষ আছে, সে-দেশে এ-সব দুঃখ তারা দূর ক'রেছে। গরীবকে তারা খেতে দিয়েছে, রোগীর শুশ্রূষা ক'রছে, অনাথ শিশুকে মানুষ ক'রছে। সেখানে রাজা প্রজা সবাই মিলে সব মানুষকে মনুষ্যত্বের অধিকার দেবার চেষ্টা ক'রছে। ইউরোপ, আমেরিকা দুঃখ দৈন্যকে দৈববিধান ব'লে মেনে নিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে নেই, তাই সে-সব দেশে আমাদের দেশের মত এত দুঃখও নেই।"

ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া বারটা বাজিল। সুরমা বলিলেন, "বারটা বেজে গেল। এখন ওঠো, স্নান ক'রে মুখে দুটো দাও। আর আজ এত রোদে ঘুরে' এসেছ, আজ না হয় কলেজে নাই গেলে।"

জ্যোতি চট্ করিয়া উঠিয়া পড়িল। একটার সময় তার আজ ক্লাশ, তাই সে ব্যস্ত হইয়া বলিল, "কলেজ যাবনা কি বউদি, যেতেই হ'বে।"

"কেন? একদিন কলেজ না গেলে কি হয়?"

"কিছুই হয় না। কিন্তু রোজ কলেজ যাওয়া যে আমার কর্ত্তব্য বউদি। যেটা কর্ত্তব্য ব'লে গ্রহণ ক'রেছি সেখানে ফাঁকি দেওয়া পাপ।"

স্নানাহার করিয়া জ্যোতি কলেজে চলিল। বই খাতা লইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইতেই তার বন্ধু অমলের সঙ্গে

শ্রীনরেশচন্দ্র সেন-গুপ্ত

দেখা হইল। সদর রাস্তা পৌঁছিয়া উভয়ে ট্রামের জন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিল।

অমল ও জ্যোতি এক সঙ্গে পড়ে। অমল কলিকাতার একটা ব'নেদি বড়লোকের ঘরের ছেলে। সে নিরভিমান এবং প্রতিভাবান। লেখাপড়ায় তার বেশ সুনাম আছে।

জ্যোতিরা তখন Sociology পড়িতেছিল। পথে দাঁড়াইয়া তাহারা Sociology-র একটা সমস্তা লইয়া আলোচনা করিতে লাগিল। এক-সমাজের লোকেদের চিত্তের সাম্য বিষয়ে Giddings-এর মত লইয়া তাহারা কিছু পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছিল।

অমল বলিল, "তুমি যে community of consciousness"-এর কথা ব'ল্‌ছিলে সে কথাটা আমার বেশ মনে ধ'রছে। প্রত্যেকের মনের একটা বৈশিষ্ট্য আছে, সেইটিই হ'চ্ছে তার ব্যক্তিত্ব। কিন্তু সমস্ত consciousness-এর অনুপাতে সেই বৈশিষ্ট্যটুকুর পরিমাণ খুব বেশী নয়। সমগ্র চেতনার বেশীর ভাগটাই আমাদের সমসাময়িক সমাজের লোকের সঙ্গে এক। আর এই ঐক্য আছে ব'লেই সমাজ-বন্ধন সম্ভব হ'য়েছে এ-কথা ঠিক।"

জ্যোতি বলিল, "কিন্তু আমি যতই ভেবে দেখ্‌ছি, ততই মনে হ'চ্ছে যে, বিজ্ঞানসাম্য বা community of consciousness"-টাকেই শেষ কথা ব'লে মেনে নেওয়া যায় না। এ ব্যাপারটারও একটা হেতু আছে, সেটা কি? স্বামী বিবেকানন্দের লেখা প'ড়তে প'ড়তে সেদিন আমার হঠাৎ মনে হ'ল—বেদান্তের মতের ভিতরই এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। বিজ্ঞানসাম্যের মূল হ'চ্ছে এই যে, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বাস্তবিক ভিন্ন নয়, তারা সবাই এক ব্রহ্মেরই প্রকাশ, প্রত্যেকের ভিতরকার মূলবস্তু হ'চ্ছেন ব্রহ্ম, সেই এক ব্রহ্ম নানা উপাধির ভিতর দিয়ে নানা ভাবে প্রকাশ হ'চ্ছেন, তাই আস্‌ছে এই সাম্য।"

ট্রামের জন্ত অপেক্ষা করিতে করিতে জনবহুল পথের ভিতর দাঁড়াইয়া এই দুইটি তরুণ যুবক নিবিষ্টভাবে এই সব গভীর তত্ত্বের আলোচনা করিতে লাগিল। তাহাদিগকে দেখিয়া এক কুষ্ঠী ভূমিতে বসিয়াই ঘস্‌টাইয়া ঘস্‌টাইতে অগ্রসর হইয়া আসিল। অমল তাহাকে দেখিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

জ্যোতিকে দেখিয়া কুষ্ঠী বলিল, "বাবুজী, আপনি আমাকে কোথায় পাঠিয়ে দিতে চেয়েছিলেন দিন,—আমি আর এখানে থাক্‌বো না।"

জ্যোতি তাহাকে দেখিয়া চিনিল। এই হতভাগ্যকে প্রহার হইতে রক্ষা করিতে গিয়াই সে লাঞ্ছিত হইয়াছিল। তাহার পর একদিন জ্যোতি ইহাকে বলিয়াছিল যে সে কুষ্ঠাশ্রমে যায় না কেন? তখন এ-লোকটাকে সে কিছুতেই সম্মত করিতে পারে নাই। হাঁসপাতাল, আশ্রম প্রভৃতি বিষয়ে এই সব লোকের একটা অহেতুক ভীতি আছে। যে-অবস্থায় সে এখন আছে, তাহা সুখের না হইলেও এখানে সে একরকম খাইয়া বাঁচিয়া আছে। এখানে আসিবার পূর্ব্বে তার যে দুর্দ্দশা ছিল তাহা স্মরণ করিয়া এ-ব্যক্তি তার বর্ত্তমান আশ্রয় ছাড়িতে সম্মত হয় নাই।

জ্যোতি বলিল, "কেন বাপু, হঠাৎ তোমার মত বদ্‌লে গেল কেন?"

কুষ্ঠী বলিল, তাহার মুনিব তার উপর বড় নির্য্যাতন আরম্ভ করিয়াছে, আর সহ্য হয় না। পূর্ব্বদিন তাহার খাবার আসিতে বিলম্ব হইয়াছিল বলিয়া এক পয়সার ছোলাভাজা কিনিয়া খাইয়াছিল; মুনিব তাহা দেখিয়া তাহাকে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিয়াছে। তাহা ছাড়া আরও নানাবিধ অত্যাচারের কথা সে বলিল।

জ্যোতি বলিল, "আচ্ছা কাল সকালে তুমি এসো, তোমার ব্যবস্থা ক'রে দেবো।"

কুষ্ঠী বলিল, "তা' হ'লে আজ আমি থাক্‌বো কোথায়? আমি যে রাগ ক'রে সে-ঘর থেকে চ'লে এসেছি। আজ তো আমার আর আশ্রয় নেই।"

জ্যোতি বলিল, "ভারি অন্যায় ক'রেছ। আগে আমাকে না ব'লে ক'য়ে একেবারে এসে পড়েছ। এ তো দু'এক দিনের কথা নয়। দু' জায়গায় চিঠি লিখ্‌তে হ'বে; সেখানে তোমার জায়গা হ'বে কি-না জেনে শুনে তবে তো পাঠাব। এখন কি উপায় করি বল?"

"সে আমি কি জানি বাবু? আপনি দয়াময়, আপনি যা' হয় করুন।"

জ্যোতি বলিল, "আচ্ছা তুমি এইখানে ব'স। আমি কলেজ থেকে আসি, তার পর যা' হয় ব্যবস্থা ক'রবো।"

কুষ্ঠী তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া একটা ছায়ায় গিয়া বসিল।

একটা ট্রাম আসিতে দেখা গেল। ঠিক সেই সময় একটী দরিদ্র নারী ছুটিয়া আসিয়া জ্যোতিকে বলিল, "এই যে বাবু, হাঁসপাতালে তো নিলে না আমার মেয়েকে। ব'ল্লে জায়গা নেই; সেই চাঁপাতলার হাঁসপাতালে যেতে ব'ল্লে।"

অমল বিস্মিত হইয়া বলিল, "এ আবার কে?"

জ্যোতি বলিল, "এ একটা ভিখারী মেয়ে। এর মেয়ে আসন্ন-প্রসবা। তাকে আমি কিছুক্ষণ হ'ল হাঁস-পাতালে পাঠিয়ে দিয়ে এসেছিলাম।" দরিদ্র রমণীর দিকে ফিরিয়া বলিল, "তা' যাও না বাছা চাঁপাতলার হাঁসপাতালে নিয়ে।"

"আর তো সে ন'ড়তে পারে না বাবু, এখন যে একেবারে ধড়ফড়াচ্ছে!"

ট্রাম আসিয়া পড়ে দেখিয়া অমল বলিল, "তা' বাবু কি ক'রবে? যা' না তোর জামাইয়ের কাছে।"

জ্যোতি বলিল, "তুমি সংসারের কোনও খবর রাখ না অমল। জামাই কোথায়? এর মেয়ের কি বিয়ে হ'য়েছে যে জামাই আছে!" তার পর পকেট হইতে পাঁচটা টাকা বাহির করিয়া জ্যোতি বলিল, "তবে তাড়াতাড়ি একটা ঘর ঠিক ক'রে দাই ডেকে প্রসব করাও গিয়ে। আমি চারটের সময় ফির্‌বো—তখন আমাকে খবর দিও।" বলিয়া ট্রামের রাস্তার দিকে অগ্রসর হইল।

মেয়েটি জ্যোতির পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "দোহাই বাবু, তুমি একবার এসে যা' হয় ক'রে দিয়ে যাও। গরীব ভিখারীর কথা কে শুনবে বল। আমি টাকা দিলেও কেউ আমায় বিশ্বাস ক'রবে না, হয় তো পুলিস ডেকে ধরিয়ে দেবে।"

অমল বলিল, "মর্ মাগী, ছাড়্ না, বাবুর কলেজের সময় হ'য়ে গেছে। টাকা পেয়েছিস্, যা' হয় কর্‌গে।"

জ্যোতি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। অমল তার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, "চল চল, ট্রামখানা যায় যে!"

জ্যোতি স্থির হইয়া বলিল, "না ভাই, আমি যাব না, তুমি যাও। আমার কলেজ যাওয়া শেষ হ'য়েছে। আমার অন্য কাজের ডাক এসেছে।"

অবাক হইয়া অমল বলিল, "পাগল! কি বল্‌ছো? আর চার মাস বাদে এক্‌জামিন্, তুমি হবে ফার্ষ্ট! তোমার কলেজ যাওয়া শেষ হ'ল কি রকম? ও ডাক্ ফাক্ চার মাস বাদে হবে।"

ট্রাম ছাড়িয়া দিল, বিস্ময়-স্তব্ধ অমল তাহা ধরিবার কোনও চেষ্টা করিল না।

জ্যোতি বলিল, "দেখ ভাই, এতদিন লোকহিতৈষী সেজে বেড়িয়েছি, পথে-ঘাটে দীন দুঃখীদের উপদেশের বীচি ছড়িয়েছি। আজ সে বীজ গজিয়ে গাছ হ'য়েছে। এখন ভগবান আমায় ডেকে ব'ল্‌ছেন, 'বাপু হে, লোকহিত অত সহজ বস্তু নয়!' এই মেয়েটির কাজের তো তর সইবে না। ওই যে কুষ্ঠী ওরও তো তর সইবে না। এখন আমার সেই উপদেশের ঝুড়ি কাজের বোঝা হ'য়ে ঘাড়ে চেপেছে। এ বোঝা আমি ফেল্‌তে পারবো না। রইল প'ড়ে তোমার কলেজ আর এক্‌জামিন্। আমি কাজে চ'ল্লাম।"

বলিয়া বই খাতা সেইখানে ফেলিয়া দিয়া জ্যোতি সেই মেয়েটার সঙ্গে চলিয়া গেল। অমল কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া জ্যোতির বই খাতা কুড়াইয়া লইল। তার বুক ঠেলিয়া কান্না আসিতেছিল।

[ক্রমশঃ]

সম্পাদক ও বন্ধু

—গল্প—

—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

—দেখো স্থরনাথ, তোমার কাগজের এ-সংখ্যাটি তেমন স্থবিধে হয় নি।

—কেন বল দেখি?

—নিজেই ভেবে দেখো, তা' হ'লেই বুঝ্তে পারবে। যখন সম্পাদকী ক'র্‌ছ, তখন কোন লেখাটা ভাল, আর কোনটা ভাল নয়—তা' নিশ্চয়ই বুঝ্তে পারো।

—অবশ্য লেখা বেছে নিতে না জানলে, সম্পাদকী করি কোন সাহসে? এ সংখ্যায় কি আছে বল্‌ছি। শাস্ত্রী-মহাশয়ের "কালিদাস, মুণ্ড না জটিল", পি, সি, রায়ের "খদ্দর-রসায়ন", বিনয় সরকারের "নয়া টঙ্কা", স্থনীতি চাটুয্যের "হারাপ্‌পার ভাষাতত্ত্ব", রাখাল বাঁড়ুয্যের "বঙ্গদেশের প্রাক্-ভৌগোলিক ইতিহাস", বীরবলের "অন্নচিন্তা", শরৎ চাটুয্যের "বেদের মেয়ে", প্রমথ চৌধুরীর "উত্তর দক্ষিণ", ধূর্জ্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'সঙ্গীতের X-Ray.", অতুলচন্দ্র গুপ্তের "ইস্‌লামের রসপিপাসা"—এ-সব লেখার কোনটিরই কি মূল্য নেই!

—আমি ও-সব দর্শন-বিজ্ঞান, হিষ্ট্রি-জিওগ্রাফী, ধর্ম্ম ও আর্ট প্রভৃতি বিষয়ের পণ্ডিতি প্রবন্ধের কথা বল্‌ছি নে। আর "বেদের-মেয়ে"র সঙ্গে ত আমি ভালবাসায় প'ড়ে গিয়েছি। আর বীরবলের "অন্নচিন্তা" প'ড়ে আমার চোখে জল এসেছিল।

—তবে কোন্‌টিতে তোমার আপত্তি?

—এবার কাগজে যে কবিতাটি বেরিয়েছে সেটি কি?

—"পিয়া ও পাপিয়ার" কথা ব'ল্‌ছ? ও কবিতার ত্রিপদী কি চতুষ্পদী হয়ে গিয়েছে? ওতে কবিতার মাল মস্‌লা কি নেই?

—সবই আছে, নেই শুধু মস্তিষ্ক।

—মস্তিষ্ক না থাক্, হৃদয় ত আছে?

—হৃদয়ের মানে যদি হয় "ছাই ফেল্‌তে ভাঙ্গা কুলো" তা' হ'লে অবশ্য ও-ছাইয়ের সে আধার আছে। ও-কবিতার পিয়া পাপিয়ার কথোপকথন কার সাধ্য বোঝে। বিশেষত যখন ওর ভিতর পিয়াও নেই পাপিয়াও নেই।

—ও-দুটির কোনটির থাক্‌বার ত কোনও কথা নেই। কবির আজও বিয়ে হয়নি—তা তা'র প্রিয়া আস্‌বে কোথ্‌থেকে? আর ছেলেটি অতি সচ্চরিত্র—তাই কোনও অবিবাহিতা পিয়া তার কল্পনার ভিতরও নেই। আর সে জ্ঞান হ'য়ে অবধি বাস ক'র্‌ছে হ্যারিসন্ রোডে,—দিবা-রাত্র শুনে আস্‌ছে শুধু ট্রামের ঘড়ঘড়ানি,—পাপিয়ার ডাক সে জন্মে শোনেনি। ও পাড়ার কৃষ্ণদাস পালের ও দ্বারবঙ্গের মহারাজার প্রস্তরমূর্ত্তি ত আর পাপিয়ার তান ছাড়ে না।

—দেখো, এ-সব রসিকতা ছেড়ে দাও। যেমন কবিতার নাম তেম্‌নি কবির নাম। উক্ত মূর্ত্তি-যুগলও এ-দু'টি নাম একসঙ্গে শুনলে হেসে উঠ্‌ত, যদিচ হাস্যরসিক ব'লে তাদের কোনও খ্যাতি নেই।

—কবির নাম ত অতুলানন্দ। এ-নাম শুনে তোমার এত হাসি পাচ্ছে কেন?

—এই ভেবে যে ও-রকম কবিতা সেই লিখ্‌তে পারে যার অন্তরে আনন্দ অতুল। যার অন্তরে আনন্দের একটা মাত্রা আছে, সে আর ছাপার অক্ষরে ও ভাবে পিউ পিউ ক'রতে পারে না।—

—ও নামে তোমার আপত্তি ত শুধু ঐ 'অ' উপসর্গে।

—হাঁ তাই।

—দেখো ছোক্‌রার বয়েস এখন আঠারো বছর।—ওর অন্নপ্রাশন হয়, নন্-কোঅপারেশনের বহু পূর্ব্বে, তখন যদি ওর বাপ মা ঐ উপসর্গটি ছেঁটে দিয়ে ওর নাম রাখ্‌তেন "তুলানন্দ"—তা' হ'লে দেশ-শুদ্ধ লোকও হেসে উঠ্‌ত। এমন কি যমুনালাল বাজাজও হাসি সম্বরণ ক'র্‌তে পারতেন না।

—তোমার এ-কথা আমি মানি। কিন্তু আমি জান্‌তে চাই এ-কবিতা তুমি ছাপ্‌লে কেন। তুমি ত জান—

ও রচনা হচ্ছে সেই জাতের, যা' না লিখ্‌লে কারও কোন ক্ষতি ছিল না।

—অতুলানন্দ যে রবীন্দ্রনাথ নয় সে জ্ঞান আমার আছে। সুতরাং ও-কবিতাটি না ছাপ্‌লে কোনও ক্ষতি ছিল না।

—তবে একপাতা কালি নষ্ট ক'র্‌লে কেন? কবিতার মত ছাপার কালি ত সস্তা নয়।

—কেন ছেপেছি তা' সত্যি বল্‌ব?

—সত্যি কথা ব'ল্‌তে ভয় পাচ্ছ কেন?

—পাছে সে-কথা শুনে তুমি হেসে ওঠ।

—কথা যদি হাস্যকর হয়, অবশ্য হাস্‌ব।

—ব্যাপারটা এক হিসেবে হাস্যকর।

—অত গম্ভীর হ'য়ে গেলে কেন? ব্যাপার কি?

—অতুলের কবিতা না ছাপ্‌লে তা'র মা দুঃখিত হবে বলে।

—আমি ত জানি, বিশ্ববিদ্যালয়ের সহৃদয় পরীক্ষকেরা যে ছেলে গোল্লা পেয়েছে, বাপ মা'র খাতিরে তা'র কাগজে শূন্যের আগে একটা ৯ বসিয়ে দেন। সাহিত্যেও কি মার্ক দেবার সেই পদ্ধতি?

—না। সেইজন্যেই ত বল্‌তে ইতস্তত ক'র্‌ছি।

—এ ব্যাপারের ভিতর গোপনীয় কিছু আছে নাকি?

—কিছুই না; তবে যা' নিত্য ঘটে না, সে-ঘটনাকে মানুষে সহজভাবে নিতে পারে না। এই কারণেই সামাজিক লোকে এমন অনেক জিনিষের সাক্ষাৎ নিজের ও অপরের মনের ভিতর পায়, যে জিনিষের নাম তা'রা মুখে আন্‌তে চায় না, পাছে লোকে তা' শুনে হাসে। আমরা কেউ চাইনে যে, আর পাঁচজনে আমাদের মন্দ লোক মনে করুক, আর সেই সঙ্গে আমরা এও চাইনে যে, আর পাঁচজনে আমাদের অদ্ভুত লোক মনে করুক। প্রত্যেকে যে সকলের মত, আমরা সকলে তাই প্রমাণ ক'রতেই ব্যস্ত।

—যা নিত্য ঘটে না, আর ঘট্‌লেও সকলের চোখে পড়ে না, সেই ঘটনার নামই ত অপূর্ব্ব, অদ্ভুত ইত্যাদি। অপূর্ব্ব মানে মিথ্যে নয়, কিন্তু সেই সত্য যা' আমাদের পূর্ব্বজ্ঞানের সঙ্গে খাপ খায় না। ফলে আমরা প্রথমেই মনে করি যে তা' ঘটেনি, কেননা তা' ঘটা উচিত হয়নি। আমাদের ঔচিত্য জ্ঞানই আমাদের সত্যজ্ঞানের প্রতিবন্ধক। ধরো তুমি যদি বলো যে, তুমি ভূত দেখেছ, তা' হ'লে আমি তোমার কথা অবিশ্বাস ক'র্‌ব, আর যদি তা' না করি ত মনে ক'র্‌ব তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।

—তা' ত ঠিক। যে যা বলে তাই বিশ্বাস করবার জন্য নিজের উপর অগাধ অবিশ্বাস চাই। আর নিজেকে পরের কথার খেলার পুতুল মনে ক'র্‌তে পারে শুধু জড় পদার্থ, অবশ্য জড়-পদার্থের যদি মন ব'লে কোনও জিনিষ থাকে।

—তুমি যে-রকম ভণিতা করছ তা'র থেকে আন্দাজ ক'র্‌ছি "পিয়া ও পাপিয়ার" আবির্ভাবের পিছনে একটা মস্ত romance আছে।

—Romance এক বিন্দুও নেই। যদি থাকত তা' হ'লে তা বল্‌তে ইতস্তত ক'রব কেন? নিজেকে romance-এর নায়ক মনে করতে কার না ভাল লাগে বিশেষত তা'র, যা'র প্রকৃতিতে romanticism-এর লেশমাত্রও নেই। ও-প্রকৃতির লোক যখন একটা romantic গল্প গ'ড়ে তোলে তখন অসংখ্য লোক তা' প'ড়ে মুগ্ধ হয়—কারণ বেশির ভাগ লোকের গায়ে romanticism-এর গন্ধ পর্য্যন্ত নেই। মানুষের জীবনে যা' নেই কল্পনায় সে তাই পেতে চায়। আর তা'র সেই ক্ষিদের খোরাক জোগায় রোমাণ্টিক সাহিত্য। যে-গল্পের ভিতর মনের আগুন নেই, চোখের জল নেই, বাসনার উনপঞ্চাশ বায়ু নেই, আর যার অন্তে খুন নেই, জখম নেই, আত্মহত্যা নেই, তা' কি কখনো রোমাণ্টিক্ হয়। "পিয়া ও পাপিয়ার" পিছনে যা' আছে সে হচ্ছে Psychology-র একটি ঈষৎ বাঁকা রেখা। আর সে-বাঁক্ এত সামান্য, যে সকলের তা' চোখে পড়ে না, বিশেষতঃ ও-রেখার গায়ে যখন কোনও ডগ্‌ডগে রঙ নেই। এই জন্যই ত ব্যাপারটি তোমাকে ব'ল্‌তে আমার সঙ্কোচ হ'চ্ছে। এ-ব্যাপারের ভিতর যদি কোনও নারীর হরণ কিম্বা বরণ থাকত তা' হ'লে ত সে বীরত্বের কাহিনী তোমাকে ফর্ত্তি ক'রে ব'লতুম।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

—তোমার মুখ থেকে যে কখনো রোমাণ্টিক্ গল্প বেরুবে, বিশেষত তোমার নিজের সম্বন্ধে, এ-দুরাশা কখনো করিনি। তোমাকে ত কলেজের ফার্ষ্ট্‌ইয়ার থেকে জানি। তুমি যে সেণ্টিমেণ্টের কতটা ধার ধারো তা ত আমার জান্‌তে বাকী নেই। তুমি মুখ খুল্‌লেই যে মনের চুল চিরতে আরম্ভ ক'রবে, এতদিনে কি তাও বুঝি নি! মানুষের মন জিনিষটিকে তুমি এক জিনিষ বলে কখনই মানোনি। তোমার বিশ্বাস ও এক হচ্ছে বহুর সমষ্টি। তোমার ধারণা যে, মনের ঐক্য মানে ত'ার গড়নের ঐক্য। মনের ভিতরকার সব রেখা মিলে তা'কে একটা ধরবার ছোঁবার মত আকার দিয়েছে। আর এ-সব রেখাই সরল রেখা। তুমিও যে মানসিক বঙ্কিম রেখারও সাক্ষাৎ পেয়েছ, এ অবশ্য তোমার পক্ষে একটা নতুন আবিষ্কার। এ-আবিষ্কারকাহিনী শোন্‌বার জন্য আমার কৌতূহল হচ্ছে, অবশ্য সে কৌতূহল scientific কৌতূহল। মনে ক'রো না তোমার মনের গোপন কথা শোন্‌বার জন্য আমি উৎসুক।

—ব্যাপারটা তোমাকে সংক্ষেপে ব'ল্‌ছি। শুন্‌লেই বুঝ্‌তে পারবে যে, এর ভিতর আমার নিজের মনের কোনো কথাই নেই—সরলও নয়, কুটিলও নয়। এখন শোন।

ব্যাপারটা অতি সামান্য। আমি যখন কলেজ থেকে M. A. পাস করে বেরুই তখন অতুলের মা'র সঙ্গে আমার বিয়ের কথা হ'য়েছিল। প্রস্তাবটি অবশ্য কন্যাপক্ষ থেকেই এসেছিল। আমার আত্মীয়রা তা'তে সম্মত হ'য়েছিলেন। তাঁদের আপত্তির কোনও কারণ ছিল না, কারণ ও-পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিবারের বহুকাল থেকে চেনা-শোনা ছিল। ও-পক্ষের কুলশীলের কোনও খুঁৎ ছিল না উপরন্তু মেয়েটি দেখ্‌তে পরমা সুন্দরী না হ'লেও সচরাচর বাঙালী মেয়ে যে-রকম হয়ে থাকে তার চেয়ে নিরেস নয়, এবং সরেস, কারণ তার স্বাস্থ্য ছিল, যা সকলের থাকে না। আমার গুরুজনেরা এ-প্রস্তাবে আমার মতের অপেক্ষা না রেখেই তাঁ'দের মত দিয়েছিলেন। তাঁরা যে আমার মত জানতে চাননি, তা'র একটি কারণ তাঁরা জানতেন যে, মেয়েটি আমার পূর্ব্বপরিচিত। "ওর চেয়ে ভাল মেয়ে পাবে কোথায়?" এই ছিল তাঁদের মুখের ও মনের কথা। আমার মত জান্‌তে চাইলে তাঁরা একটু মুস্কিলে প'ড়্‌তেন। কারণ আমি তখন কোন বিয়ের প্রস্তাবে সহজে রাজী হতুম না, সুতরাং ও প্রস্তাবেও নয়। হড়কো মেয়ে যেমন স্বামী দেখ্‌লেই পালাই-পালাই করে, আমার মন সেকালে তেমনি স্ত্রী নামক জীবকে কল্পনার চোখে দেখ্‌লেও পালাই-পালাই ক'রত। তা' ছাড়া সেকালে আমার বিবাহ করা আর জেলে যাওয়া দুই এক মনে হ'ত। ও-কথা মনে ক'রতেও আমি ভয় পেতুম। তুমি মনে ভাব্‌ছ যে, আমার এ-কথা সুধু কথার কথা; একটা সাহিত্যিক খেয়াল মাত্র। আমি যে ঠিক আর পাঁচজনের মত নই তাই প্রমাণ করবার জন্য এ-সব মনের কথা বানিয়ে ব'ল্‌ছি; সাহিত্যিকদের পূর্ব্ব স্মৃতির মত এ পূর্ব্বস্মৃতিও কল্পনা-প্রসূত। কেননা আমিও গুরুগৃহ থেকে প্রত্যাবর্ত্তনের কিছুকাল পরেই গৃহস্থ হ'য়েছি। কিন্তু একটু ভেবে দেখ্‌লেই বুঝতে পার্‌বে যে, মানুষের মৃত্যুভয় আছে ব'লে মানুষে মৃত্যু এড়াতে পারে না, পারে সুধু কষ্টে সৃষ্টে মৃত্যুর দিন একটু পিছিয়ে দিতে। আর মজা এই যে, যার মৃত্যুভয় অতিরিক্ত সে যে ও-ভয় থেকে মুক্তি পাবার জন্য আত্মহত্যা করে এর প্রমাণও দুর্লভ নয়। অজানা জিনিষের ভয়, জান্‌লে দেখা যায় ভূয়ো।

সে যাই হোক, এ-বিয়ে ভেঙ্গে গেল। আমিও বাঁচলুম। কেন ভেঙ্গে গেল শুন্‌বে? মেয়ের আত্মীয়রা খোঁজ খবর ক'রে জানতে পেলেন যে, আমি নিঃস্ব অর্থাৎ আমাদের পরিবারের বা'রচটক্ দেখে লোকে যে মনে করে যে, সে-চটক্ রূপোর জলুস, সেটা সম্পূর্ণ ভুল। কথাটা ঠিক। আমার বাপ খুড়োরা কেউ পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চিত ধনের উত্তরাধিকারের প্রসাদে বাবুগিরি করেননি, আর তাঁরা বাবুগিরি ক'রতেন বলেই ছেলেদের জন্যও ধন সঞ্চয় ক'রতে পারেন নি। আমাদের ছিল যত্র আয় তত্র ব্যয়ের পরিবার। কন্যাপক্ষের মতে এ-রকম পরিবারে মেয়ে দেওয়া আর তা'কে সাগরে ভাসিয়ে দেওয়া দুই সমান।

আমাদের আর্থিক অবস্থার আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে লতিকার আত্মীয় স্বজন আমার চরিত্রের নানা রকম ত্রুটিরও

আবিষ্কার ক'রলেন। আমি নাকি গানবাজনার মজ্‌লিসে আড্ডা দিই, গাইয়ে-বাজিয়ে প্রভৃতি চরিত্রহীন লোকদের সোহবৎ করি; পান খাই, তামাক খাই, নস্যি নিই এমন কি Blue Ribbon Society-র নাম-লেখানো মেম্বর নই। এক কথায় আমিও চরিত্রহীন।

আমার নামে লতিকার পরিবার এই সব অপবাদ রটাচ্ছে শুনে আমার গুরুজনেরাও মহা চটে গেলেন। কারণ তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে আমাকে ভালমন্দ বল্‌বার অধিকার শুধু তাঁদেরই আছে, অপর কারও নেই, বিশেষত আমার ভাবী শ্বশুরকুলের ত মোটেই নেই। ছোটকাকা ওদের স্পষ্টই বললেন যে, "শ্যাম্পেন ত আর গরুর জন্য তৈরী হয়নি, হয়েছে মানুষের জন্য, আর আমাদের ছেলেরা সব মানুষ, গরু নয়"। ভাঙা প্রস্তাব জোড়া লাগ্‌বার যদি কোনও সম্ভাবনা থাকৃত ত ছোটকাকার এক উক্তিতেই তা চুরমার হ'য়ে গেল। আমি আগেই ব'লেছি যে এ-বিয়ে ভাঙাতে আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। সেই সঙ্গে সব পক্ষই মনে ক'রলেন যে আপদ শান্তি। তবে শুনতে পেলুম যে একমাত্র লতিকাই এতে প্রসন্ন হয়নি। কোন মেয়েই তার মুখের গ্রাস কেউ কেড়ে নিলে খুসী হয় না। উপরন্তু আমার নিন্দাবাদটা তার কানে মোটেই সত্যি কথার মত শোনায় নি। যখন বিয়ের প্রস্তাব এগুচ্ছিল তখন বাড়ীতে আমার অনেক গুণগান সে শুনেছে। দুদিন আগে যে দেবতা ছিল—দু'দিন পরে সে কি ক'রে অপদেবতা হ'ল, তা' সে কিছুতেই বুঝ্‌তে পারল না। কারণ তখন তা'র বয়েস মাত্র ষোলো—আর সংসারের তা'র কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না। আমার সঙ্গে বিয়ে হ'ল না ব'লে সে দুঃখিত হয়নি, কিন্তু আমার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করা হয়েছে মনে ক'রে সে বিরক্ত হ'য়েছিল।

লতিকার আত্মীয়রা আমার চরিত্রহীনতার আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই আর একটি সচ্চরিত্র যুবককে আবিষ্কার ক'রলেন। আমার সঙ্গে বিয়ে ভাঙ্‌বার এক মাস পরেই সরোজরঞ্জনের সঙ্গে লতিকার বিয়ে হ'য়ে গেল। এতে আমি মহা খুসী হলুম। সরোজকে আমি অনেক দিন থাক্‌তে জানতুম। আমার চাইতে সে ছিল সব বিষয়েই বেশি সৎপাত্র। সে ছিল অতি বলিষ্ঠ, অতি সুপুরুষ, আর এগ্‌জামিনে সে বরাবর আমার উপরেই হত। সরোজের মত ভদ্র আর ভাল ছেলে আমাদের দলের মধ্যে আর দ্বিতীয় ছিল না। উপরন্ত তার বাপ রেখে গিয়েছিলেন যথেষ্ট পয়সা। আমার যদি কোন ভগ্নী থাকৃত তা' হ'লে সরোজকে আমার ভগ্নীপতি করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা ক'রতুম। বিধাতা তা'কে আদর্শ জামাই ক'রে গ'ড়েছিলেন।

আমি যা' মনে ভেবেছিলুম হ'লোও তাই। সরোজ তা'র স্ত্রীকে অতি সুখে রেখেছিল। আদর-যত্ন অন্নবস্ত্রের অভাব লতিকা একদিনের জন্যও বোধ করেনি। এক কথায় আদর্শ স্বামীর শরীরে যে-সব গুণ থাকা দরকার সরোজের শরীরে সে-সব গুণই ছিল। দাম্পত্যজীবন যত দূর মসৃণ ও যত দূর নিষ্কণ্টক হ'তে পারে এ-দম্পতির তা' হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিবাহের দশ বৎসর পরেই লতিকা বিধবা হ'ল। সরোজ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে সরকারী চাকরি করতো। অল্পদিনের মধ্যেই চাকরিতে সে খুব উন্নতি ক'রেছিল। ইংরেজী সে নিখুঁতভাবে লিখ্‌তে পারত, তা'র হাতের ইংরেজীর ভিতর একটিও বানান-ভুল থাকৃত না, একটিও আর্ষ প্রয়োগ থাকৃত না। এক হিসেবে তা'র ইংরেজী কলমই ছিল তা'র দ্রুত উন্নতির মূলে। যদি সে বেঁচে থাকৃত তা' হ'লে এতদিনে সে বড় কর্ত্তাদের দলে ঢুকে যেত! বুদ্ধি-বিদ্যার সঙ্গে যা'র দেহে অসাধারণ পরিশ্রম-শক্তি থাকে, সে যাতে হাত দেবে তাতেই কৃতকার্য্য হতে বাধ্য। কিন্তু সরোজ একদিন হঠাৎ প্লেগে মারা গেল। লতিকা একটি আট বছরের ছেলে নিয়ে দেশে ফিরে এল।

এর পর থেকেই তা'র অন্তরে যত স্নেহ ছিল সব গিয়ে প'ড়ল তার ঐ একমাত্র সন্তানের উপর। ঐ ছেলে হ'ল তা'র ধ্যান ও তা'র জ্ঞান। ঐ ছেলেটিকে মানুষ ক'রে তোলাই হ'ল তা'র জীবনের ব্রত।

এ-পর্য্যন্ত যা' বললুম তা'র ভিতর কিছুই নূতনত্ব নেই। এ-দেশে এবং আমার বিশ্বাস অপর দেশেও বহু মায়ের ও-অবস্থায় একই মনোভাব হ'য়ে থাকে। তবে লতিকা

তা'র ছেলেকে শুধু মানুষ করে তু'লতে চায় না, চায় অতি-মানুষ করতে। আর এ অতি-মানুষের আদর্শ কে জানো? শ্রীসুরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে আমি। এ কথা শুনে হেসো না। সে তা'র ছেলেকে পান তামাক খেতে শেখাতে চায় না, সেই শিক্ষা দিতে চায় যা'তে সে আমার মত সাহিত্যিক হ'য়ে উঠতে পারে। লতিকাকে তা'র স্বামী কিছু লেখা-পড়া শিখিয়েছিল, আর সেই সঙ্গে তা'কে বুঝিয়েছিল যে "সুরনাথ যা লিখেছে তার চাইতে সে যা লেখেনি তার মূল্য ঢের বেশি", অর্থাৎ আমি যদি আলসে না হ'তুম ত দশভলুম হিষ্ট্রি লিখতে পারতুম, আর না হয়ত পাঁচ ভলুম দর্শন। আমার ভিতর নাকি যে-শক্তি ছিল তা'র আমি সদ্ব্যবহার করিনি। এই কারণে সে মনে করে আমিই হচ্ছি ওস্তাদ সাহিত্যিক। ফলে তা'র ছেলের সাহিত্যিক শিক্ষার ভার আমার উপরেই ন্যস্ত হ'য়েছে। আর এই ছেলেটিরই নাম অতুলানন্দ। আমি জানি সে কখনো সাহিত্যিক হবে না, অন্তত আমার জাতের বাজে সাহিত্যিক হবে না। কারণ ছেলেটি হচ্ছে হুবহু সরোজের দ্বিতীয় সংস্করণ। সেই নাক, সেই চোক, সেই মন, সেই প্রাণ। এ ছোক্‌রা কর্ম্মক্ষেত্রে বড় লোক হ'তে পারে, কিন্তু কাব্য-জগতে এর বিশেষ কোন স্থান নেই। সরোজের মত এরও মন বাঁধা ও সোজা পথ ছাড়া গলি ঘুঁজিতে চ'লতে চায় না। এর চরিত্রে ও মনে বেতালা ব'লে কোনও জিনিষ নেই। আমার ভয় হয় এই যে, এর মনের ছন্দকে আমি শেষটা মুক্ত-ছন্দ না ক'রে দিই। কারণ তা হ'লে অতুল আর সে-মুক্তির তাল সাম্‌লাতে পারবে না। হাঁটা এক কথা আর বাঁশবাজী করা আলাদা। কিন্তু অতুলকে এক ধাক্কায়, সাহিত্য-জগৎ থেকে কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়ে দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। কারণ তা' ক'রতে গেলে লতিকার মস্ত একটা Illusion ভেঙে দিতে হবে, আর সঙ্গে সঙ্গে নিজের ঘরেও অশান্তির সৃষ্টি হবে। আমার স্ত্রী হ'চ্ছেন লতিকার বাল্য-বন্ধু ও প্রিয় সখী। অতুলকে সরস্বতী ছেড়ে লক্ষ্মীর সেবা ক'রতে ব'ললে আমাকে দুবেলা এই কথা শুনতে হবে যে—পরের জন্যে কিছু করা আমার ধাতে নেই। তাই নানাদিক ভেবে চিন্তে আমি তাকে কবিতা রচনায় লাগিয়ে দিলুম। জানতুম ও বাঁধা ছন্দে, বাঁধি গতে যা-হয় একটা-কিছু খাড়া ক'রে তুলবে। এই হ'চ্ছে "পিয়া ও পাপিয়ার" জন্ম-কথা। এ-কবিতা ছাপার অক্ষরে ওঠ্‌বার ফলে লতিকা ওকে পাঁচ-শ' টাকা দিয়ে এক সেট সেক্‌স্‌পিয়ার কিনে দিয়েছে। মনে ভেবো না যে, অতুলের মায়ের খাতিরে আমি তা'র মাথা খাচ্ছি। ও-ছেলের মাথা কেউ খেতে পারবে না। অতুলের ভিতর কবিত্ব না থাক্‌ মনুষ্যত্ব আছে, আর সে-মনুষ্যত্বের পরিচয় ও জীবনের নানা ক্ষেত্রে দেবে। ও যখন জীবনে নিজের পথ খুঁজে পাবে, তখন কবিতা লেখ্‌বার বাজে সখ ওর মিটে যাবে। আর তখনও যদি ওর কলম চালাবার ঝোঁক থাকে ত আমি যা লিখিনি, কেননা লিখতে পারিনি, ও তাই লিখ্‌বে অর্থাৎ হয় দশ ভলুম ইতিহাস নয় পাঁচ ভলুম দর্শন। পদ্য লেখার মেহন্নতে ও-র গদ্যের হাত তৈরী হবে।

ও-র অন্তরে যে কবিত্ব নেই তা'র কারণ ও-র বাপের অন্তরেও তা' ছিল না, ওর মা'র অন্তরেও তা নেই—অবশ্য কবিত্ব মানে যদি sentimentalism হয়।

এখন যে-কথা থেকে সুরু ক'রেছিলুম, সেই কথায় ফিরে যাওয়া যাক্‌। আমার প্রতি লতিকার এই অদ্ভুত অবস্থার মূলে কি আছে? এ মনোভাবের রূপই বা কি, নামই বা কি? একে ঠিক ভক্তিও বলা যায় না, প্রীতিও বলা যায় না। সুতরাং এ হচ্ছে ভক্তি ও প্রীতিরূপ মনের দুটি সুপরিচিত মনোভাবের মাঝামাঝি Psychology-র একটি বাঁকা রেখা।

আর এ যদি ভক্তিমূলক প্রীতি অথবা প্রীতিমূলক ভক্তি হয় তা' হ'লেও সে ভক্তি-প্রীতি কোনও রক্ত মাংসে গড়া ব্যক্তির প্রতি নয়, অর্থাৎ ও-মনোভাব আমার প্রতি নয় কিন্তু লতিকার মগ্ন-চৈতন্যে ধীরে ধীরে অলক্ষিতে যে কাল্পনিক সুরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গড়ে উঠেছে, তা'রই প্রতি, অর্থাৎ একটা ছায়ার প্রতি, যে ছায়ার এ পৃথিবীতে কোনও কায়া নেই। আমি সুধু তা'র উপলক্ষ্য মাত্র। আমার অনেক সময়ে মনে হয় যে, তা'র মনের আমার প্রতি এই অমূলক ভক্তির মূলে আছে আমার প্রতি তা'র আত্মীয়স্বজনের সেকালের সেই অযথা অভক্তি।

এ হচ্ছে সেই অপবাদের প্রতিবাদ মাত্র। এ প্রতিবাদ তা'র মনে তা'র অজ্ঞাতসারে আস্তে আস্তে গ'ড়ে উঠেছে। দেখ্‌ছ এর ভিতর কোনও রোমান্স নেই, কেননা এর ভিতর যা আছে, সে মনোভাব অস্পষ্ট—অতুলের মধ্যস্থতাই একমাত্র স্পষ্ট জিনিষ।

—রোমান্স নেই সত্য, কিন্তু এই একই ব্যাপারের ভিতর ট্র্যাজেডি থাকৃতে পারে।

—কি রকম?

—আমি এই-রকম আর একটি ব্যাপার জানি যা, শেষটা ট্র্যাজেডিতে পরিণত হয়েছিল। আজ থাক্, সে গল্প আর একদিন ব'লব। কত ক্ষুদ্র ঘটনা মানুষের মনে যে কত বড় অশান্তির সৃষ্টি ক'রতে পারে, তা সে গল্প শুন্‌লেই বুঝ্‌তে পারবে।

স্বরলিপি

"নটরাজ"

নৃত্য—"নৃত্যের তালে তালে"

কথা ও সুর—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মধ্য লয়

I পা -া পর্সা। ণা ধা পা I পা পা -া। -পা -ধা -ণা I
নৃ • ত্যে র তা লে তা লে • এ • •

I -ণপা -সা সণা। ধা পা -ধা I
• • ন ট রা জ্‌

I ধপা -া পর্সা। র্সণা ধা পা I পা পা -া। -া -া -গা I
নৃ • ত্যে র তা লে তা লে • • • •

I মা ধা -া। ণা র্সা -া I ধা র্সণা -া। ধা পা পা I
ঘু চা ও ঘু চা ও ঘু চা ও স ক ল

I পগা -া মা। গা -মা -পা I -ধা -ণা -র্সা। -া -া -া I
ব ন্‌ ধ হে • • এ • • • • •

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

I পা -া পর্সা। ণা ধা পা I পা পা -া। -া -া -া I
নৃ • ত্যে র তা লে তা লে • • • •

I পা -না না। না না -া I না -া র্সা। র্সনা র্সা -া I
সু প্ তি ভা ঙ্গা ও চি • ত্তে জা গা •

I -ণা -র্সা -র্সণা। -ধা -পা -মা I
• • • • • ও

I পা -না না। না না -া I না -া র্সা। র্সনা র্সা -া I
সু প্ তি ভা ঙ্গা ও চি • ত্তে জা গা •

I -ণা -র্সা -র্সণা। -ধা -পা -মা I
• • • • • ও

I মগা -া মা। গা মা -া I মপা -া পা। গা -মা -পা I
মু ক্ ত সু রে র্ ছ ন্ দ ে • •

I -ধা -ণা -র্সা। -া -া -া I
এ • • • • •

I পা -া পর্সা। ণা ধা পা I পা পা -া। -া -া -া I
নৃ • ত্যে র তা লে তা লে • • • •

I পমা -া -ণা। পধা -া -না I না না না। নর্সা র্সা র্রর্সা I
তো • • মা • র্ চ র ণ প ব ন

I র্সনা না র্সা। -া -া -া I
প র শে • • •

I পনা না -া। না র্সা -া I র্সনা নর্রা র্রর্সা। ণা ধা ধপা I
স র • স্ব তী র্ মা ন স স র সে

I পমা -া -ণা। পধা -া -না I না না না। নর্সা র্সা র্রর্সা I
তো • • মা • র্ চ র ণ প ব ন

I সর্না মা র্সা । -া -া -া I
প র শে • • •

I প্সনা না -া । না র্সা -া I র্সনা নর্রা র্সা । ণা ধা ধপা I
স র • স্ব তী র্ মা ন স স র সে

I মগা মা -া । গা মা -া I মগা মা -া । গা মা -া I
যু গে • যু গে • কা লে • কা লে •

I গা মা -া । পা পা -া I পগা মা -া । পা ধা -া I
সু রে • সু রে • তা লে • তা লে •

I ধর্া -া র্মা । র্মগা র্মা -র্গা I র্গর্রা র্জ্ঞা র্জ্ঞর্রা । র্সনা র্সা -া I
ঢে উ তু লে দা ও মা তি য়ে জা গা ও

I র্সনা নর্রা র্সা । ণা ধা পা I পগা -া মা । গা -মা -পা I
অ ম ল ক ম ল গ ন্ ধ হে • •

I -ধা -ণা -র্সা । -া -া -া I
এ • • • • •

I পা -া পর্সা । সণা ধা পা I পা পা -া । -া -া -া II
নৃ • ত্যে র তা লে তা লে • • • •

দ্রুত লয়

II মা -া । ধা -া ণা -া I ণর্সা -া । -া -া -া -ণধা I
নৃ • ত্যে • ত্যে • মা • • • • র্

I ধা -া । ধর্সা -া ণা -ধা I ধপা -া । -া -া -া -া I
মু ক্ তি • র • রূ • • • • প্

I পা -া । পা -পা পধা -া I মপা -া । -মা গা -া -মা I
নৃ • ত্যে • ত্যে • মা • রূ মা • •

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

I পা -া | -া -া -া -া I
য়া • • • • •

I পা -না | না -া না -া I না -া | না -পা না -া I
বি • শ্ব • ভ • মু • তে • অ •

I না -া | নর্সা -া র্সা -া I র্সা -া | -না র্সা -া -া I
ণু • তে • অ • ণু • • তে • •

I পা -ধা | ণা -র্রা র্সা -া I সণা -া | -ধা র্সণা -া -ধা I
কাঁ • পে • নৃ • ত্যে • • র • •

I পধা -ণা | -ধা পা -া -া I
ছা • • য়া • •

I পা -া | পা -র্সা সণা -া I পধা -া | -পা মগা -া -া I
নৃ • ত্যে • তো • মা • র্ মা • •

I পা -া | -া -া -া -া I
য়া • • • • •

I মা -া | মা -পা পধা -া I ধা -া | ধা -া ধা -না I
তো • মা র্ বি • শ্ব • না • চে র্

I না -া | র্সা -র্রর্সা সনা -া I র্সা -া | -া -া -া -া I
দো • লা য় দো • লা • • • • য়্

I পা -ধা | না -া না -া I নর্সা -া | -া -া -া -া I
বাঁ • ধ ন্ প • রা • • • • য়্

I র্সা -না | র্সা -র্রা র্সা -া I ণা -ধা | ধা -পা মা -পা I
বাঁ • ধ ন্ খো • লা য়্ যু • গে •

I গমা -া | -া মা -া -া I -া -া | পা -ধা ধপা -া I
যু • • গে • • • • কা • লে •

I মগা -া । -া মা -া -া I -া -া । মগা -া মা -া I
কা • • লে • • • • স্ব • রে

I মপা -া । -া পা -া -া I -া -া । পা -া ধা -ণা I
সু • • রে • • • • তা • লে •

I পপা -া । -ধণা পধা -া -া I
তা • •• লে • •

I র্সা -া । র্সা -মা র্মা -র্গা I র্গা -া । -া -া -া -া I
অ ন্ ত • কে • তা • • • • র্

I র্গা -া । র্গর্মা -া র্মা -র্গা I র্র্সা -া । -না -র্সা -া -া I
স ন্ ধা • ন • পা • • • • য়্

I র্সা -না । র্সা -র্রা র্র্সা -া I ণা -া । -ধা পা -া -া I
ভা • বি • তে • লা • • গা • য়্

I পগা -া । -া মা -া -া I গা -মা । -পা -ধা -ণা -র্সা I
ধ ন্ • দ • • হে • এ • • •

মধ্য লয়

I পা -া পর্সা । র্সণা ধা পা I পা পা -া । -পা -ধা -ণা I
নৃ • ত্যে র তা লে তা লে • • • •

I পপা -র্সা র্সণা । ধা পা -ধা I
• • ন ট রা জ্

I পপা -া পর্সা । ণা ধা পা I পা পা -া । -া -া -া II
নৃ • ত্যে র তা লে তা লে • • • •

দ্রুত লয়

II সমা -া মা মা । মা -া মা -া I মা -পা পা পা । পা -া মা -পা I
নৃ • ত্যে র ব • শে • সু ন্ দ র • হ • ল •

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

I মা -ধা ধা ধা । ধা -া ধা -ণা I পপাঃ-ধণঃ ধা -া । -া -া -া -া I
বি ০ দ্রো হী প ০ র ০ মা ০০ ণূ ০ ০ ০ ০ ০

I ণা ণা ণা ণা । ণা -া ণা -া I ণা র্সা র্সা -া । র্সা -না র্সা -া I
প দ যু গ ঘি ০ রে ০ জ্যো তি ম ন্ জী ০ রে ০

I ণা র্রা র্রা -র্জ্রা । জ্ঞর্রা -া র্সা -র্রর্সা I র্সনা -া র্সা -া । -া -া -া -া I
বা জি ল ০ চ ন্ দ্র ০০ ভা ০ নু ০ ০ ০ ০ ০

I মা ধা ধা -া । ধা -া ধা -না I না র্সা র্রর্সা র্সনা । নর্সা -া -া -া I
ত ব নৃ ০ ত্যে ০ র ০ প্রা ণ বে দ না ০ ০ য়্

I ণা ণর্রা র্রা -র্জ্রা । জ্ঞর্রা -া র্সা -া I র্সনা র্রা র্সা ণা । ধা -া -া -পা I
বি ব শ ০ চি ০ ত্ত ০ জা গে চে ত না ০ ০ য়্

I মগা -া মা -া । মগা -া মা -া I মগা -া মা -া । গা -া মা -া I
যু ০ গে ০ যু ০ গে ০ কা ০ লে ০ কা ০ লে ০

I মগা মা পা পা । পা ধা ণা র্সা I
সু রে সু রে তা লে তা লে

I র্সা সর্গা র্গা র্গা । র্গা -া র্গা -া I র্গা -র্মা র্মা -র্গা । র্রর্সা -না -সা -া I
সু খে দু খে হ য়্ ত ০ র ঙ্ গ ০ ম ০ ০ য়্

I র্সনা -র্রা র্রর্সা -া । র্সণা ধা পা -া I মগা -া মা -া । গা -মা -পা -ধা I
তো ০ মা র প র মা ০ ন ন্ দ ০ হে ০ ০ ০

মধ্য লয়

I ধপা -া পর্সা । র্সণা ধা পা I পা পা -া । -পা -ধা -ণা I
নৃ ০ ত্যে র তা লে তা লে ০ ০ ০ ০

I ণপা -র্সা র্সণা । ধা পা -ধা I
এ ০ ন ট রা জ্

ধপা -া পর্সা । র্সণা ধা পা I পা পা -া । -া -া -া II
ন্ ০ ত্যে র তা লে তা লে ০ ০ ০ ০

দ্রুত লয়

II মা -ধা । ধা -া -া । ধা -া । ধা -া -া I ধা -ণা । ণা -া -ণা । ণা :-া । ণা -া -া I
মো র্ স ০ ঙ্ সা ০ রে ০ ০ তা ণ্ ড ০ ব ত ০ ব ০ ০

I ণধা -সা । সা -া র্সা । র্সণা -ধা । র্সণা -া ধা I ধপা -ণা । ধা -া -া । -া -া । -া -া -া I
ক ম্ পি ০ ত জ ০ টা ০ ০ জা ০ লে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I ধনা -া । না -া না । না -া । না -পা না I না -া । র্সা -া রসা । র্সণা -া । র্সা -া -া I
লো ০ কে ০ লো কে ০ ঘু ০ রে এ ০ সে ০ ছি তো ০ মা ০ র্

I র্সনা -র্রা । র্রসা -া সা । ণা -ধা । র্সণা -া -ধা I ধপাঃ-ধণঃ । ধা -া -া । -া -া । ধা -া ণা I
না ০ চে ০ র ঘূ র্ ণি ০ ০ তা ০০ লে ০ ০ ০ ০ ০ ও ০ গো

I র্সা -র্মা । র্মজ্ঞা -া জ্ঞা । -া -া । জ্ঞা -া জ্ঞা I জ্ঞা -র্মা । র্মা -জ্ঞা জ্ঞা । -া -র্রা । র্রা -া র্সা I
স ন্ ন্যা ০ সী ০ ০ ও ০ গো সু ন্ দ ০ র ০ ০ ও ০ গো

I র্সনা -া । নর্রা -া সা । -া -া । সা -া র্সা I র্সণা -র্সা । র্সণা -া ধা । -ণা -ধা । ধা -পা মা I
শ ঙ্ ক ০ র ০ ০ হে ০ ভ য় ঙ্ ক ০ র ০ ০ যু ০ গে

I মগা -া । মা -া -া । -া -া । পা -ধা ধপা I মগা -া । মা -া -া । -া -া । মগা -া মা I
যু ০ গে ০ ০ ০ ০ কা ০ লে কা ০ লে ০ ০ ০ ০ সু ০ রে

I পা -া । পা -া -া । -া -া । পা -া ধা I ধপাঃ-ধণঃ । ণধা -া -া । -া -া । -া -া -ণা I
সু ০ রে ০ ০ ০ ০ তা ০ লে তা ০০ লে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I র্সা -া । র্সা -র্মা র্মা । র্মগা -া । র্মা -া র্গা I র্গর্রা -া । র্রা -জ্ঞা র্জর্রা । র্সা -না । রা -া র্সা I
জী ০ ব ০ ন ম ০ র ০ ণ না ০ চে ০ র ড ০ ম ০ রু

I র্সা -না । না -র্রা র্রসা । র্সা -না । র্সা -া র্সা I র্সপা -া । মা -া -া । পা -মা । -পা -ধা -পা I
বা ০ জা ০ ও জ ০ ল ০ দ ম ন্ দ্র ০ ০ হে ০ এ ০ ০

মধ্যলয়

I পপা -া পদা। সর্ণা ধা পা I পা পা -া। -পা -ধা -ণা I
নৃ • ত্যে র তা লে তা লে • এ • •

I -পপা -সা সর্ণা। ধা পা -ধা I
এ • ন ট রা জ্

I ধপা -া পদা। সর্ণা ধা পা I পা পা -া। -া -া -া II II
নৃ • ত্যে র তা লে তা লে • • • •

আলোচনা

বাঙ্‌লার প্রাচীন চিত্র ও পট

বিচিত্রার শ্রাবণ সংখ্যায় "বাঙ্‌লার প্রাচীন চিত্র ও পট" প্রবন্ধ পাঠ করিয়া শ্রীযুক্ত পঞ্চানন রায় আমাদিগকে একখানি পত্র লিখিয়াছেন। নিম্নে সে পত্র খানি উদ্ধৃত হইল :—

"আপনাদের সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় বাঙলার চিত্রকর ও পট বিষয়ক সুচিন্তিত প্রবন্ধে লেখক বঙ্গীয় চিত্রাবলীর স্বাধীন ধারা ও ক্রম-বিবর্ত্তন অতি সুন্দর ভাবে দেখাইয়াছেন। কিন্তু এই সূত্রে আমি কয়েকটা কথা বলা আবশ্যক বিবেচনা করি। লেখক মহাশয় প্রবন্ধের বিষয় সম্পর্কে মেদিনীপুর জেলার কোন উল্লেখই করেন নাই। মেদিনীপুর জেলার কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে ঐ জেলায় এখনও এমন অনেক স্থান আছে যাহা পাশ্চাত্য সভ্যতার ছাপ হইতে অনেকটা মুক্ত, সুতরাং ঐ সকল স্থানে এখনও প্রাচীন বঙ্গীয় সমাজের কিছু কিছু অবিকৃত নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়।

"দাসপুর থানার অন্তর্গত বাসুদেবপুর গ্রাম ঐরূপ একটী প্রাচীন সামাজিক স্থান। এখানে "পটিদার" নামক এক শ্রেণীর চিত্রকর জাতির বসবাস দেখা যায়; কাপড়ের উপর মৃত্তিকার প্রলেপ দিয়া উহারা ইহাতে পৌরাণিক চিত্রাবলী অঙ্কিত করে। উক্ত চিত্রাবলীর আধারের নাম পট; উহার উভয় অগ্রভাগ দুইটী বংশদণ্ডের সহিত সংযুক্ত—দেখিতে কতকটা মানচিত্রের ন্যায়। ঐরূপ নানাবিধ পট লইয়া উহারা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ভিক্ষায় বহির্গত হয় এবং ঐ সকল চিত্রের উদ্দেশ্যে বংশানুক্রমিক প্রচলিত পালাগান করিয়া লোকের চিত্ত-বিনোদন করে। ভিক্ষাদাতার গুণ-বর্ণনা করিয়া উপস্থিতমত কবিতা বাঁধিয়া ফেলিবার অদ্ভুত ক্ষমতা ইহারা আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। উহাদের ভিক্ষার একটা বৈশিষ্ট্য এই যে উহারা পুরাতন কাপড় ভিক্ষা লইবার অধিক পক্ষপাতী। উহাদের স্ত্রীলোকেরা মৃত্তিকার সাহায্যে নানাবিধ পুতুল নির্ম্মাণ করিয়া বিভিন্ন মেলায় যাইয়া তাহা বিক্রয় করে। ঐ পুতুলগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে কাঁচা মৃত্তিকায় ঐগুলি নির্ম্মাণ করিবার পর অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া নানাবিধ বর্ণে উহাদিগকে রঞ্জিত করা হয়। এই জাতি হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্ম্মকেই আপনার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। উহারা মুসলমানের ন্যায় মুরগী পালন করে ও নমাজ পড়ে অধিকন্তু হিন্দু দেব-দেবীগণকেও মানিয়া লইয়া যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করে। ইহারা হিন্দুদিগের নামানুযায়ী আপনাদের নামকরণ করে, কিন্তু বিবাহাদি ব্যাপারে মুসলমান পদ্ধতি মানিয়া চলে। সম্প্রতি ধ্বংসোন্মুখ এই জাতি একাধারে বংশগত কবি, চিত্রকর ও মূর্ত্তি-নির্ম্মাণ-কারক। ইহাদের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে প্রাচীন বাঙলার চিত্র বিষয়ক অনেক রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে। লেখকমহাশয় প্রাচীনকালে এই জাতীয় গায়ক-চিত্রকরের অস্তিত্বের আভাস দিয়াছেন কিন্তু তাহাদের বর্ত্তমান অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই।

"এই পটিদার জাতি ছাড়া পূর্ব্বোক্ত গ্রাম হইতে কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী কলমিযোড় গ্রামে এক শ্রেণীর "সুতার" বাস করে। উহারা একাধারে চিত্রকর, দেবমূর্ত্তি-নির্ম্মাতা, কাষ্ঠ-খোদনকারী ও দেবমন্দির প্রস্তুতকারক। উহাদের প্রস্তুত মন্দিরসমূহ খিলানে নির্ম্মিত। ঐ মন্দিরগুলি সুদৃঢ়, সুগঠিত, কারুকার্য্যমণ্ডিত এবং উহাদের গাত্রস্থিতি অবলেপ (Plaster) এরূপ মজবুত যে আপাতদৃষ্টিতে মর্ম্মর গঠিত বলিয়া মনে হয়। উহাদের স্ত্রীলোকেরা চিঁড়া কুটিয়া বাজারে বিক্রয় করে। এই জাতি এতদ্দেশে অলচল নয়। অপর-দেশীয় কুম্ভকারের ন্যায় এই জাতি দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে। কুম্ভকার এ অঞ্চলে কেবল গৃহস্থের ব্যবহারোপযোগী মৃন্ময় পাত্রাদি ছাড়া অন্য কিছু নির্ম্মাণ করে না। বঙ্গদেশের অন্যত্র এই দুইজাতির অস্তিত্বের বিষয় জ্ঞাত নহি। এই জাতিদ্বয়ের অতীত ইতিহাস আলোচনায় প্রাচীন চিত্র শিল্প বিষয়ক অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে—আশা করা যায়।"



৪

কমলার সম্মুখে ইতস্ততঃ একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া বিনয় নিজের বসিবার আসন স্থির করিয়া লইয়া বসিল; তাহার পর ক্ষণকাল ধরিয়া গভীর অভিনিবেশের সহিত সে কমলাকে দেখিতে লাগিল। বিবিধ বর্ণে অনুরঞ্জিত আলোক-রেখার মধ্যে পড়িয়া কোনো জিনিসের যে অবস্থা হয়, বিনয়ের একাগ্র স্থির দৃষ্টির সম্মুখে কমলার কতকটা সেই অবস্থা হইল। লজ্জা-দ্বিধা-সঙ্কোচের বিচিত্র প্রভায় বারম্বার উদ্ভাসিত হইয়া অবশেষে যখন তাহার আকৃতি সহজ ভাব ধারণ করিল, তখন বিনয় এক খণ্ড চারকোল্ লইয়া নিবিড় মনোযোগের সহিত সম্মুখস্থ ক্যান্‌ভাসের উপরে রেখা টানিতে আরম্ভ করিল।

অদূরে একটা ইজি চেয়ারে অর্দ্ধ-শায়িত অবস্থায় বসিয়া অলস-মন্থর চিত্তে একটা সুবৃহৎ সিগার টানিতে টানিতে বিজনাথ কমলার দিকে চাহিয়া ছিলেন। সহসা তন্দ্রামুক্ত হইয়া একান্ত ঔৎসুক্যের সহিত তিনি কমলাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। মনে হইল কমলার এমন সুপরিস্ফুট মূর্ত্তি তিনি কোনো দিনই দেখেন নাই। ধ্যানাবিষ্ট কন্যার প্রশান্ত মুখমণ্ডলের রেখাগুলি যেন যাদুকরের মন্ত্র-প্রভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। চিবুক-প্রান্তের বক্রতা, ওষ্ঠাধরের আকুঞ্চন, কর্ণ-মূলের রেখা-গতি,—সমস্তই যেন স্বেচ্ছায়-সহজে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য ধারণ করিয়াছে। সিন্ধুপারবাসিনী বিমলাকে বিজনাথের মনে পড়িল। পত্নীর নাসিকা-গঠনের সহিত কন্যার নাসিকা-গঠনের সৌসাদৃশ্য দেখিয়া তিনি চমৎকৃত হইলেন;—ততোধিক বিস্মিত হইলেন এই কথা ভাবিয়া যে এ-পর্য্যন্ত একদিনও এ সাদৃশ্য তাঁহার চোখে পড়ে নাই।

চারকোল্ রাখিয়া বিনয় বলিল, "মিস্ মিত্র, আশা করি আপনার খুব অসুবিধা বোধ হচ্ছে না?"

মৃদু হাসিয়া কমলা বলিল, "না।"

"বিরক্তি বোধ হ'লেই আমাকে জানাবেন, আমি তখনি আঁকা বন্ধ করব।"

কমলা বলিল, "আচ্ছা।" তাহার পর ঈষৎ ব্যগ্রভাবে বলিল, "তাই ব'লে আপনি যেন কেবল আমার বিরক্তি-অবিরক্তির উপরই নির্ভর করবেন না। আপনার নিজের বিরক্তি অথবা সময় হ'লেও বন্ধ করবেন।"

কমলার কথা শুনিয়া বিনয় হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "সে ভয় করবেন না। বিরক্তি হবার আগেই আমার বন্ধ করবার সময় হবে।" বলিয়া চারকোল্ তুলিয়া লইয়া পুনরায় আঁকিতে উদ্যত হইল।

বিজনাথ বলিলেন, "আমাদের ফিজিক্সের পেপারে যে নির্দ্দেশ ছিল আপনি কিন্তু ঠিক তা' অনুসরণ করছেন না, বিনয় বাবু। কথা ছিল, আঁকার চেয়ে কথায় আপনি অনেক বেশী সময় নেবেন।"

সহাস্যমুখে বিনয় বলিল, "নিশ্চয়ই নিতাম, যদি-না সন্দুত্তর এত সহজে এসে উপস্থিত হ'ত।"

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

আগ্রহভরে দ্বিজনাথ বলিলেন, "সন্থত্তর যে এসে উপস্থিত হয়েছে তা' আমার মত অনভিজ্ঞ লোকও বুঝ্‌তে পেরেছে। কমলাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনার চার্‌কোল্‌ আর ক্যান্‌ভাস্‌টা পেলে আমিও বোধ হয় তার একটা ছবি এঁকে দিতে পারি। আমার মনে হচ্ছে আপনি যেন কোনো যোগ-শক্তি বলে তা'কে ছবি আঁকবার উপযোগী ক'রে নিয়েছেন।"

চারকোল্‌টা তুলিয়া লইয়া বিনয় আঁকিতে যাইতেছিল, কমলার আরক্ত-স্মিত মুখের দিকে চাহিয়া সে পাশের তিপাইয়ের উপর পুনরায় চারকোল্‌টা স্থাপন করিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "যোগ-শক্তি অত্যন্ত বড় কথা; তবে মনের মধ্যে একান্ত আগ্রহ উপস্থিত হ'লে অপর পক্ষ থেকে সহানুভূতি পাওয়া যায়, এ আমি বিশ্বাস করি।"

দগ্ধাবশিষ্ট চুরুট্‌টা অ্যাশ্‌-ট্রের ভিতর নিক্ষেপ করিয়া দ্বিজনাথ বলিলেন, "সেই একান্ত আগ্রহ,—যার দ্বারা অপর পক্ষের মনে সহানুভূতি উৎপন্ন হয়—যোগ-শক্তি ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। অপর বাহ্য-বিষয় থেকে মনকে সম্পূর্ণভাবে প্রতিনিবৃত্ত ক'রে একটি মাত্র বিষয়ে একান্ত ভাবে প্রয়োগ করাকে যোগ-সাধনের মধ্যে নিশ্চয়ই ধরা যেতে পারে।"

বিনয় বলিল, "কিন্তু বাহ্য-বিষয় থেকে মনকে সম্পূর্ণভাবে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারা ত' সহজ কথা নয় মিষ্টার মিটার্‌। তার জন্য বহুকালব্যাপী নিরলস সাধনা চাই; সে ক'জন পারে বলুন?"

দ্বিজনাথ বলিলেন, "সহজ কথা নিশ্চয়ই নয়,—সেই জন্যে বেশী লোকে পারে না। কিন্তু যাঁরা বড় দরের কবি কিম্বা শিল্পী, তাঁরা পারেন। বড় আর্টিষ্টদের আমি যোগী বল্‌তে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিনে।" কথাটা বলিবার সময়ে, আঁকিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে কমলাকে দেখিয়া লইবার জন্য বিনয়ের একাগ্র দৃষ্টির কথা, দ্বিজনাথের বারম্বার মনে পড়িতেছিল।

বনতরু-নিবদ্ধ দিগন্ত-প্রসারিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের উপর দৃষ্টি আরোপিত করিয়া বিনয় ক্ষণকাল কি ভাবিল;—তাহার পর ধীরে ধীরে কতকটা নিজ মনে মনে বলিল, "তেমন আর্টিষ্টের ত' এ পর্য্যন্ত দর্শন পেলাম না!"

কতকটা স্বগতোক্তি হইলেও দ্বিজনাথ এ-কথার উত্তরে বলিলেন, "আমি আশা করি বিনয় বাবু, আপনার সঙ্গে যাদের সাক্ষাৎ হবে তাদের এ-ক্ষোভ করবার কোনো কারণ থাক্‌বে না—তারা অন্ততঃ একজন তেমন আর্টিষ্টের দর্শন পাবে।"

বিস্ময়-বিমূঢ় ভাবে ক্ষণকাল দ্বিজনাথের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বিনয় বলিল, "না না, মিষ্টার মিটার্‌, এ-কথা আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন, আমি মাথায় পেতে নে'ব, কিন্তু এত বড় কথা আশা ক'রবার কোনো কারণ নেই। ক্ষমতার তুলনায় আমার অক্ষমতার পরিমাণ আপনি জানেন না, তাই এ-কথা বল্‌ছেন।"

দ্বিজনাথ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, আমি সে জন্যে বল্‌ছি নে। ক্ষমতার তুলনায় অক্ষমতার বিপুলতা সেই দেখ্‌তে পায় যার ক্ষমতার পরিমাণ অল্প নয়। বসুন্ধরাকে লোকে রত্নগর্ভা বলে; কিন্তু অন্য জিনিসের তুলনায় বসুন্ধরার গর্ভে রত্ন কতটুকু থাকে তা'ত জানেন?"

দ্বিজনাথের কথা শুনিয়া কমলা মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। সে তাহার পিতার স্বভাব বিলক্ষণ চিনিত। প্রথম পরিচয়েই বিনয়ের প্রতি তাঁহার উচ্চ ধারণা জন্মিয়াছে, যাহা সহজে অপনেয় নহে, বিশেষতঃ বিনয়ের নিজের দ্বারা, তাহা উপলব্ধি করিয়া এবং তদ্বিষয়ে এই নিরর্থক বাদানুবাদ শুনিয়া সে মনে মনে প্রচুর কৌতুক উপভোগ করিতেছিল।

দ্বিজনাথের কথার আর কোনো প্রতিবাদ না করিয়া তিপাই হইতে সহসা চারকোল্‌ তুলিয়া লইয়া নিরতিশয় ব্যগ্রতার সহিত বিনয় ছবি আঁকিতে ব্যাপৃত হইল। দেখিতে দেখিতে রেখায় রেখায় ক্যান্‌ভাস্‌ খানি ভরিয়া আসিল এবং সেই নিঃশব্দ কার্য্য-তৎপরতাকে অবলম্বন করিয়া এমন একটা নিবিড় ভাব জমিয়া উঠিল যে, তাহার মধ্যে অবস্থান করিয়া দ্বিজনাথের মুখে একটি বাক্য সরিল না, এবং কমলা সুনিপুণ ভাস্কর্য্যের অনবদ্য মর্ম্মর-প্রতিমার মত স্তব্ধ অভিভূতিতে বসিয়া রহিল। মনে হইতেছিল খানিকটা স্থান জুড়িয়া একটা মন্ত্র-শক্তির বায়ু-মণ্ডল উৎপন্ন হইয়া যেন সকলকে মোহাবিষ্ট করিয়াছে।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল এইরূপে আঁকিবার পর চারকোল্ পরিত্যাগ করিয়া বিনয় বলিল, "আচ্ছা মিস্ মিত্র, অশেষ ধন্যবাদ। আজ আর আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি নে।"

যতটা সময় লাগিবে মনে করিয়াছিল তাহার বহু পূর্ব্বে অব্যাহতি পাইয়া কমলা সবিস্ময়ে বলিল, "আজকের মত শেষ না কি ?"

সহাস্যমুখে বিনয় বলিল, "আজকের মত শেষ।"

আসন পরিত্যাগ করিয়া কমলা বলিল, "ধন্যবাদ। কিন্তু কালকের সময়ে আজকের বাকি সময়টা যোগ হবেনা ত ?"

"তা হবে না।"

"কালও এই রকম অল্প সময় নেবেন ?"

"খুব সম্ভব।"

"কিন্তু প্রত্যহ সময় অল্প নেওয়ার জন্যে ও-দিকে দিনে বেড়ে যাবে না ত ?"

কমলার ব্যগ্রতা দেখিয়া বিনয় হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "সময় অল্প নেওয়ার দরকার হলে, দিনও কম হয়ে যায়। তুলি যখন আপনি চলে তখন অল্প সময়ে বেশী কাজ হয়,—আর তুলিকে যখন জোর ক'রে চালাবার দরকার হয় তখন বেশী সময়ে অল্প কাজ হয়। আমার মনে হয় চোদ্দ পনেরো দিনের জায়গায় নয় দশ দিনেই আপনার ছবি শেষ হয়ে যাবে।"

এ-কথার পর আর জানিবার প্রয়োজন রহিল না যে, তাহার ক্ষেত্রে তুলি আপনি চলিতেছে, না জোর করিয়া চালাইতে হইতেছে। ঈষৎ আরক্ত-মুখে ইজেলের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া নিজের প্রতিকৃতি দেখিয়া বিস্ময়ে ও কৌতূহলে কমলা ভ্রূ-কুঞ্চিত করিল। অদূরে দাঁড়াইয়া তন্ময় হইয়া দ্বিজনাথ কমলার রেখা-চিত্র দেখিতেছিলেন।

ক্ষণকাল নিঃশব্দে নিরীক্ষণ করিয়া কমলা বলিল, "এই কি আমার কঙ্কাল ?"

"এই আপনার কাঠামো।"

কোনো কথা না বলিয়া একবার নিমেষের জন্য কমলা বিনয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল।

৫

তৃতীয় দিনে ছবিতে রঙ্ ও তুলির লীলা আরম্ভ হইল। ঘন-কুঞ্চিত কেশদাম সুসম্বদ্ধ হইয়া পিঠের উপর ঝুলিয়া পড়িল—তাহার মধ্যস্থলে একটি উজ্জ্বল নীল বর্ণের অর্দ্ধ-বিকশিত পুষ্প-কলি। সুগঠিত ললাটের উপর ঈষৎ পীতাভ-শুভ্র রঙ্ পড়িল, তাহার উপরে সামান্য একটু চূর্ণ কুন্তল আসিয়া পড়িয়াছে। তাহার পর প্যালেটে আইভরি ব্ল্যাক্ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় রঙ্ প্রস্তুত করিয়া বিনয় কমলার চক্ষের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল।

"মিস্ মিত্র ?"

কমলা বিনয়ের দিকে চাহিয়া বলিল, "বলুন।"

"আপনি কাব্যকে উচ্চ স্থান দেন, না চিত্রকে ?"

একটু ভাবিয়া কমলা বলিল, "নিকৃষ্ট কাব্যের চেয়ে উৎকৃষ্ট চিত্রকে উচ্চ স্থান দিই, আর উৎকৃষ্ট কাব্যের চেয়ে নিকৃষ্ট চিত্রকে নিম্ন স্থান দিই।"

অ্যাশ্-ট্রের উপর চুরুট রাখিয়া দ্বিজনাথ বলিলেন, "এ সেই রকম হ'ল না ত' ?—হয় তুমি ঠাকুর-পুজো কর আমি নেমন্তন্নে যাই, নয় আমি নেমন্তন্নে যাই তুমি ঠাকুর-পুজো কর ?"

দ্বিজনাথের কথা শুনিয়া বিনয় ও কমলা উভয়ে উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল। সকৌতূহলে কমলা বলিল, "তা-ই বলেছি না কি আমি ?"

বিনয় বলিল, "না, আপনি তা' বলেন নি; কিন্তু যা বলেছেন আমার প্রশ্নের তা উত্তর হয় নি। আমার প্রশ্নকে অতিশয় সহজ ক'রে নিয়ে আপনি নির্ভুল উত্তর দিয়েছেন।"

সহাস্যমুখে কমলা বলিল, "কিন্তু আপনার প্রশ্নকে সহজ ক'রে না নিলে তা' যে অত্যন্ত কঠিন হ'য়ে ওঠে।"

বিনয় বলিল, "আচ্ছা, সহজে উত্তর পাবার একটা প্রণালী আপনাকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। একটা কোনো কবিতা, যা আপনার অত্যন্ত ভাল লাগে, মনে করুন।"

একটু চিন্তা করিয়া কমলা বলিল, "করেছি।"

"আচ্ছা, এবার এমন একটা ছবি, যা আপনার খুব পছন্দ হয়, মনে করুন।"

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

পুনরায় ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কমলা বলিল, "করেছি।"

"এবার বলুন, এই দুটো জিনিসের মধ্যে একটাকে যদি একেবারে চিরদিনের জন্য বর্জ্জন করতে হয়,—এমন কি তার স্মৃতি পর্য্যন্ত, তা হ'লে আপনি কোনটাকে বর্জ্জন ক'রবেন?—চিত্রকে, না কবিতাকে?"

চিন্তিত-স্মিত মুখে ঘাড় নীচু করিয়া কমলা ভাবিতে লাগিল, এবং তদবসরে বিনয় ধীরে ধীরে চিত্রের দক্ষিণ নেত্রের ভ্রূর স্থানে দুই একবার তুলি চালাইয়া লইল।

মুখ হইতে চুরুট বিমুক্ত করিয়া দ্বিজনাথ বলিলেন, "যদি আপনার কোন রকমে ব্যাঘাত না হয়, তা' হ'লে আমি একটা কথা বলি বিনয় বাবু।"

ব্যগ্রকণ্ঠে বিনয় বলিল, "নিশ্চয় বলুন। আমি ত বলেছি কথাবার্ত্তা ক'রবার পক্ষে কিছুমাত্র বাধা নেই। কথাবার্ত্তা ক'রবার প্রধান উদ্দেশ্য হ'চ্ছে ছবি আঁকার জন্যে মিস্ মিত্রের যেটুকু কষ্ট হবার সম্ভাবনা তা যথাসম্ভব লাঘব করা।"

দ্বিজনাথ বলিলেন, "একটি ছোট ছেলেকে তার অঙ্কের শিক্ষক জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন, 'দেখ বাপু, তোমার ডান হাতে পাঁচটা সন্দেশ আর বাঁ হাতে চারটে সন্দেশ দিয়ে যদি ডান হাত থেকে দুটো সন্দেশ নিয়ে নিই তা হ'লে সব শুদ্ধ তোমার কাছে ক'টা সন্দেশ থাকে?' উত্তরে ছেলেটি বলেছিল, 'আমি একটাও দোবো না—আমার সব থাক্‌বে।' সন্দেশের বিষয়ে ছোট ছেলের এ-উত্তর যদি নির্ভুল হয়, তা হ'লে কবিতা আর চিত্রের বিষয়ে কমলার এই রকম একটা কোনো উত্তর বোধহয় বিশেষ ভুল হবে না।"

বিনয় ও কমলা উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল।

বিনয় বলিল, "আচ্ছা মিস্ মিত্র, আপনি সেই রকম একটা-কিছু উত্তর দেবেন মনে ক'রে আমি নিরস্ত হ'লাম; ছবি আর কবিতা, দু-ই আপনার থাক্‌ল। এবার তাহ'লে আমি একটু নিজের কাজ করি।" বলিয়া তুলি লইয়া আঁকিতে আরম্ভ করিল।

মিনিট দুই-তিন আঁকিয়া সে বলিল, মিস্ মিত্র, আপনি কখনো ভূত দেখেছেন?"

চকিত-নেত্রে কমলা বলিল, "কখনো না।"

"ভূত বিশ্বাস করেন?"

একটু ভাবিয়া কমলা বলিল, "ঠিক করিনে।"

"ভূতের ভয় করেন?"

"খুব করি!"

দ্বিজনাথ হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "এ-বিষয়ে ভূতের সঙ্গে ভগবানের সমান অবস্থা! লোকে ভগবানকে ভক্তি করে, কিন্তু বিশ্বাস করে না।"

স্মিতমুখে বিনয় বলিল, "সে-কথা ঠিক। প্রেতাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার এ-ব্যাপারে কোনো পার্থক্য নেই।" তাহার পর কমলার দিকে চাহিয়া বলিল, "মিস্ মিত্র, আপনি বাঘকে নিশ্চয়ই ভয় করেন?"

কমলা মৃদু হাসিয়া বলিল, "করি; তবে চিড়িয়াখানার বাঘকে নয়।"

দ্বিজনাথ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

সহাস্যমুখে বিনয় বলিল, "হ্যাঁ সে কথাটা মনে ছিল না বটে। আমি অবশ্য বল্‌ছি জঙ্গলের ছাড়া বাঘের কথা।"

"তা করি।"

"আচ্ছা, আপনাকে যদি বলা যায় যে, গভীর রাত্রে হয় এমন কোনো শ্মশানে যেখানকার বিষয়ে খুব ভয়াবহ ভূতের কাহিনী বহু লোকের জানা আছে, নয় এমন কোনো জঙ্গলে যেখানে বাঘের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই,—এই দুই জায়গার মধ্যে এক জায়গায় নিশ্চয় যেতে হবে, আপনি কোথায় যান?—শ্মশানে, না জঙ্গলে?"

একমুহূর্ত্ত ভাবিয়া কমলা বলিল, "আমি শ্মশানে যাই।"

বিনয় বলিল, "আমিও শ্মশানে যাই।"

শূন্যে চুরুটের ধূমে কুণ্ডলী রচনা করিয়া দ্বিজনাথ বলিলেন, "আমিও শ্মশানে যাই।"

এই সর্ব্ববাদী সম্মতির কৌতুকে একটা উচ্ছ্বসিত হাস্য ধ্বনি উঠিল। তৎপরে পুনরায় কিছুক্ষণ ধরিয়া নিঃশব্দে ছবি আঁকা চলিল।

দূরে রেল ষ্টেশনে পশ্চিম-যাত্রী এক্সপ্রেস্ গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার বৃহৎ সবল এঞ্জিনের নিঃশ্বাস-

ধ্বনি এত দূর হইতেও শুনা যাইতেছে। কিছু পরে ঘণ্টা পড়িল, বাঁশী বাজিল, তিন চারবার সজোরে ভস্ ভস্ শব্দে উৎসাহোচ্ছ্বাস করিয়া গাড়ী ছুটিয়া চলিল। অবশেষে ব্র্যাঞ্চ্ লাইনের গাড়ীর ঘণ্টা পড়িল। গাড়ী ছাড়িয়া গৃহ সম্মুখস্থ পথের পাশ দিয়া চলিয়া গেল। কক্ষে কক্ষে বাতায়নে বাতায়নে কৌতূহলী যাত্রীর দল মুখ বাড়াইয়া দেখিতেছে। স্ত্রী-কামরার ফুটন্ত ফুলের মত দুই তিনটি সুন্দর মুখ নিমিষের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

"মিস্ মিত্র, দয়া করে একটু খানি মুখ ফেরাবেন কি?"

চাহিয়া দেখিয়া কমলা জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ দিকে?"

"ডান দিকে সামান্য একটু;—গেটের পাশে ওই যে স্থল পদ্মের গাছ— ওই ফুলগুলোই দেখুন না।"

কমলা স্থলপদ্ম গাছ দেখিতে লাগিল।

"আচ্ছা আপনার লাল স্থলপদ্ম বেশী ভাল লাগে, না শাদা?"

কমলার অধর-প্রান্তে ক্ষীণ হাস্য-রেখা ফুটিয়া উঠিল; বলিল, "লাল।"

"সত্যি কি চমৎকার রঙ্! আর, কত ফুলই না গাছটায় ফুটেছে! বাগানের ও-দিক্‌টা যেন আলো ক'রে রয়েছে! আমারও লাল স্থলপদ্ম ভাল লাগে।"

কমলার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

সাগ্রহে তুলি ধরিয়া দুই তিন টান দিয়া বিনয় বলিল, "ধন্যবাদ মিস্ মিত্র। আজ এই পর্য্যন্ত।"

নিঃশব্দে উঠিয়া আসিয়া কমলা ছবির সম্মুখে দাঁড়াইল। ছবি দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল। কয়লার কাঠামো অবলম্বন করিয়া এ কি দেবী-প্রতিমা গড়িয়া উঠিতেছে! এ কি তাহার নিজের প্রতিকৃতি?—সে কি সত্যই এমন সুন্দর?—না ইহার মধ্যে শিল্পীর মানস-প্রতিমার ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে? কতটুকুই বা আঁকা হইয়াছে!—কেশ, ললাট আর চক্ষু!—অথচ ঠিক যেন মনে হইতেছে রাহুর আবরণ ভেদ করিয়া গ্রহণের চাঁদ অল্প একটু দেখা দিয়াছে!

কমলা নিমেষের জন্য অপাঙ্গে বিনয়ের প্রতি দৃষ্টি-পাত করিল। দেখিল বিনয় নিঃশব্দে মৃদু মৃদু হাসিতেছে।

বিনয় বলিল, "এখন দেখে কিন্তু হতাশ হবেন না। এখনো অনেক বাকি রয়েছে।"

কমলা মুখে কিছু বলিল না; মনে মনে বলিল, 'তা হলে দেখ্‌ছি পরে এর মধ্যে আমার আর কিছুই বাকি থাকবে না!'

(ক্রমশঃ)

সহযোগী-সাহিত্য

শিব-তাণ্ডব

শ্রীরমেশচন্দ্র রায়

(১)

"পাদস্যাবির্ভবন্তীমবনতিমবনে রক্ষতঃ স্বৈরপাতৈঃ
সংকোচেনৈব দোষ্ণাং মুহুরভিনয়তঃ সর্ব্বলোকাতিগানাম্।
দৃষ্টিং লক্ষ্যেষু নোগ্রজ্বলনকণমুচং বধ্নতো দাহভীতে-
রিত্যাধারানুরোধাৎ ত্রিপুরবিজয়িনঃ পাতু বো দুঃখ-নৃত্তম্॥"

ত্রিপুরবিজয়ী মহাদেবের তাণ্ডব চলিতেছে। কি জানি সে নৃত্যের আবর্ত্তে পড়িয়া পৃথিবী ধ্বংস হইয়া যায়, এই ভয়ে তিনি মন্দ-মন্দ পাদবিক্ষেপ করিতেছেন; নৃত্যের মত্ততার মধ্যে বিশাল বাহুসমূহ সর্ব্বলোক অতিক্রম করিতে চায় দেখিয়া, বাহুসকলকে সংকোচন করিয়া লইতেছেন; ত্রিলোচন হইতে অত্যুগ্রবহ্নিকণা নিক্ষিপ্ত হইয়া সৃষ্টি দগ্ধ করিয়া ফেলিবে ভয়ে, তিনি কোন দিকে তাকাইতেছেন না। বিশ্বের ধ্বংস-ভয়ে তাঁহার চিত্তে করুণা উপস্থিত, তাই তাঁহার এ-নৃত্য দুঃখময়। মহাদেবের এই দুঃখ-তাণ্ডব তোমাদিগকে রক্ষা করুক।

কবি বিশাখদত্তের এই আশীর্বচনে শিবের নৃত্যের যে রূপটি ধরা দিয়াছে, তাহার বিশালতায় চিত্তে পুলক জাগে। স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল জুড়িয়া, ভূলোক-দ্যুলোক ব্যাপিয়া এ-তাণ্ডব চলিতেছে,—রুদ্রের প্রতি পদক্ষেপে ধ্বংস হইতেছে, করুণার প্রতি স্পন্দনে নবসৃষ্টি জাগিতেছে। তাণ্ডবের মত্ততার মধ্যে রুদ্রের বাহু-সঞ্চালনে অন্তরীক্ষের গ্রহ-নক্ষত্র কক্ষচ্যুত হইতে উপক্রম করিয়াছে; কিন্তু শিবের করুণা ইহাদের কক্ষচ্যুতিকে বন্ধ করিয়া দিতেছে। রুদ্র মুক্ত, তিনি স্বাধীনভাবে পদবিক্ষেপ, হস্তসঞ্চালন ও অনলদৃষ্টিক্ষেপ করিতে চান, কিন্তু চিত্তে করুণা জাগিয়া তাঁহার মুক্ত তাণ্ডবে বাধা দিতেছে। তাই যিনি রুদ্র, তিনিই শিব বা মঙ্গল। প্রলয় ও সৃষ্টি, সৃষ্টি ও প্রলয়; রুদ্র ও শিব, শিব ও রুদ্র, একই 'সুন্দরের' দুটি অভেদ রূপ। তাই তিনি সত্য-শিব-সুন্দর। এই সত্য-শিব-সুন্দর অখণ্ড, অদ্বৈত।

(২)

অনাদি, অনন্ত কাল। এই একটি বর্ত্তমান ক্ষুদ্র মুহূর্ত্ত—তাহার পিছনে আর একটি মুহূর্ত্ত, তাহার পিছনে আর একটি, তাহার পিছনে আর একটি, তাহারও পিছনে আরও একটি—এমনি করিয়া কত মুহূর্ত্ত ভীমবেগে ছুটিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহার সীমা নাই, সংখ্যা নাই; সম্মুখে আর একটি মুহূর্ত্ত, তাহার সম্মুখে আর একটি, তাহার সম্মুখে আর একটি, তাহারও সম্মুখে আর একটি, এমনি করিয়া কত অনাগত মুহূর্ত্ত আগত হইবে, তাহারও সীমা নাই, সংখ্যা নাই। সম্মুখের ও পিছনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অনন্ত কালের কূল-কিনারা না পাইয়া মন ক্লান্ত হইয়া ফিরিয়া আসে, বর্ত্তমান মুহূর্ত্তটির বুকের কাছে মুখ রাখিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে। ইহা অনাদ্যন্ত কাল, মহাকাল (Time)।

অনাদি, অনন্ত দেশ। এই একটি ক্ষুদ্র বিন্দুর দক্ষিণে-বামে, সম্মুখে-পিছনে, ঊর্দ্ধে-অধোভাগে, দশ দিকে মানসী দৃষ্টিকে প্রলম্বিত করিয়া এই দেশের কোন কূল-কিনারা পাওয়া যায় না। এই অসীম নীলাকাশে, প্রস্ফুটিত কুসুমরাশির মত বিচিত্র সজ্জায় সজ্জিত গ্রহ-নক্ষত্র আমাদের বাহ্য-দৃষ্টির সীমারেখা টানিয়া দিয়াছে—ইহাদের পিছনে আরও কত গ্রহ-নক্ষত্র, তাহাদেরও পিছনে আরও কত, তাহাদেরও পিছনে আরও কত!—না, আর কল্পনাও করা যায় না; মানসী দৃষ্টি ক্লান্ত হইয়া ফিরিয়া আসে। এই একটি ধূলি-কণা; কল্পনার ছুরি দিয়া তাহাকে কাটিয়া অণুতে পরিণত কর, এই অণুকে কাটিয়া পরমাণুতে পরিণত কর, পরমাণুকে কাটিয়া অচিন্ত্য অংশে পরিণত কর—

এদিকেও শেষ নাই, সীমারেখা টানিয়া দিবার উপায় নাই। একটি ক্ষুদ্র বিন্দুকে ঘিরিয়া তাহার কোটি হস্ত বিস্তার করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে অনাদ্যন্ত দেশ—মহাদেশ (Space)।

এই মহাদেশের বুকের উপর মহাকালের তাণ্ডব অবিরাম চলিতেছে—দোদুল ছন্দে। এই মহানন্দময় মহা-নৃত্যের প্রতি পদক্ষেপে বর্ত্তমান অতীতে বিলীন হইতেছে, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানে রূপান্তরিত হইতেছে,—গ্রীষ্ম শরতে, শরৎ শীতে, শীত বসন্তে পরিণত হইতেছে, চলচ্চিত্রের চিত্রখণ্ডেরই মত। প্রতি মুহূর্ত্ত নটরাজের প্রতি চরণাঘাত সূচনা করিতেছে,—প্রতি বিন্দু সেই চরণপাতে লয় পাইয়া নবজীবনের সূত্রপাত করিতেছে; এই নৃত্যচ্ছন্দের তালে তালে সৃষ্টি প্রলয়ে ও প্রলয় সৃষ্টিতে সার্থকতা লাভ করিতেছে; জীবন মরণকে, মরণ জীবনকে, বরণ করিয়া লইতেছে। আলো আঁধারকে, আঁধার আলোককে; যৌবন বার্দ্ধক্যকে, বার্দ্ধক্য যৌবনকে; নর নারীকে, নারী নরকে; পুরুষ প্রকৃতিকে, প্রকৃতি পুরুষকে; জড় চেতনকে, চেতন জড়কে; খণ্ড পূর্ণতাকে, পূর্ণতা খণ্ডকে; অসীম সীমাকে, সীমা অসীমকে; অচলতা গতিকে, গতি অচলতাকে; কেন্দ্রানুগ গতি কেন্দ্রাতিগ গতিকে, কেন্দ্রাতিগ গতি কেন্দ্রানুগ গতিকে; সুখ দুঃখকে, দুঃখ সুখকে; প্রেম বিরহকে, বিরহ প্রেমকে; হাসি কান্নাকে, কান্না হাসিকে; মেঘ রৌদ্রকে, রৌদ্র মেঘকে আলিঙ্গন করিয়া সেই মহাকালের মহানৃত্যের ছন্দাবর্ত্তে পড়িয়া চক্রাকারে ঘুরিয়া স্ব স্ব সার্থকতা খুঁজিতেছে। মহাকাশের বুকে মহাকালের তাণ্ডবে এই এক অপূর্ব্ব দ্বৈতলোকের (World of Duality-র) সৃষ্টি হইয়াছে;—এই দ্বৈত-লোকও অনাদি অনন্ত প্রবাহাকারে চলিতেছে,—কে জানে কোন্ অজানা অনন্ত সাগরের পানে!

নটরাজের চরণপাতের দোদুল ছন্দে এই যে দ্বৈত-লোকের সৃষ্টি ও স্পন্দন হইতেছে, তাহার অপরূপ রূপে মুগ্ধ হইয়া কবি গাহিলেন—

"মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।
তারি সঙ্গে কি মৃদঙ্গে সদা বাজে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।
হাসি কান্না হীরা পান্না দোলে ভালে,
কাঁপে ছন্দে ভালমন্দ তালে তালে,
নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে
তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ।
কি আনন্দ, কি আনন্দ, কি আনন্দ,
দিবা-রাত্রি নাচে মুক্তি, নাচে বন্ধ,
সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে,
তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ॥"

এই যে অনন্ত বিশ্বের বুকের উপরে মহাকালের নৃত্য চলিতেছে, সেই তাণ্ডবের রুদ্রভাব লক্ষ্য করিয়া ভক্ত ভীত-চিত্তে মনে করেন, প্রতি চরণ-পাতে, বুঝি বিশ্ব চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়; নৃত্যের মধ্য দিয়া যে ধ্বংসলীলা চলিতেছে, ভীতিবিহ্বল চিত্তে সেই ধ্বংসকে খুব বড় করিয়া দেখিয়া, সৃষ্টি-লীলার রসাস্বাদ গ্রহণ করিতে অক্ষম ভক্ত, কিঞ্চিৎ পরেই চিত্ত শান্ত হইলে, ধ্বংসের সঙ্গে সৃষ্টির অন্তরঙ্গভাবটি লক্ষ্য করিয়া আনন্দে বলিয়া উঠেন,—হে রুদ্র, তোমার নৃত্য বিশ্বের রক্ষার্থই। তাই ভক্তরাজ গন্ধর্ব্ব পুষ্পদন্ত গাহিয়া উঠিলেন,

মহী পাদাঘাতাদ্‌ব্রজতি সহসা সংশয়পদম্,
পদং বিষ্ণোর্ভ্রাম্যদ্ভুজপরিঘরুগ্নগ্রহগণম্।
মুহুর্দ্যৌর্দৌস্থ্যং যাত্যনিভৃতজটাতাড়িততটা
জগদ্রক্ষায়ৈ ত্বং নটসি ননু বামৈব বিভুতা॥

হে ঈশ! তোমার চরণপাতে পৃথিবী ক্লেশ প্রাপ্ত হয়; তোমার দীর্ঘ বিশাল বাহুর সঞ্চালনে নিপীড়িত গ্রহ-কুলের সহিত অন্তরীক্ষও ক্লেশ প্রাপ্ত হয়; চপলজটাগ্রভাগ দ্বারা বিতাড়িত হইয়া, স্বর্গের প্রান্তদেশ অত্যন্ত প্রপীড়িত হয়। (কিন্তু, ইহা সত্ত্বেও) তুমি জগৎ-রক্ষার্থই নৃত্য করিয়া থাক। তোমার অনুকূল আচরণও আপাত-প্রতি-কূল বলিয়াই মনে হয়।

এখানেও কবি সৃষ্টির সঙ্গে ধ্বংস, ধ্বংসের সঙ্গে সৃষ্টি যে শিব-তাণ্ডবের তালে তালে চলিতেছে, তাহার আভাষ দিয়াছেন।

এই বৈচিত্র্যময় দ্বৈতলোকই আবার এক অদ্বৈত লোকেরও সূচনা করিতেছে। মণিহারের সূত্রের মত,

শ্রীরমেশচন্দ্র রায়

ঐক্যতানের কেন্দ্রগত মূল সুরটির মত, অদ্বৈত সেই বৈচিত্র্যময় দ্বৈতলোকের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়া ভেদের মধ্যে ঐক্য আনিয়াছে। ঐক্যতান বাজিতেছে, একটি মূল সুরকে আশ্রয় করিয়া কত রং-বেরং-এর সুরের ঢেউ তাহার উপর দিয়া খেলিয়া যাইতেছে; একটি স্বর্ণসূত্র অগণিত মুক্তামালাকে গ্রথিত করিয়া সুন্দর মণিহারে পরিণত করিয়াছে; অকম্পিত অতল জলরাশির বুকের উপর অসংখ্য তরঙ্গ-ভঙ্গ হইতেছে; নর্ত্তকের ভিন্ন ও খণ্ডিত চরণপাত ছন্দের আবর্ত্তে পড়িয়া এক অখণ্ড ভঙ্গিমার সৃষ্টি করিতেছে। তেমনি দ্বৈতভাবাপন্ন সৃষ্টি-প্রবাহ জন্ম-মরণকে, সৃষ্টি-প্রলয়কে, জড়-চৈতন্যকে, পুরুষ-প্রকৃতিকে, নর-নারীকে, প্রেম-বিরহকে, হাসি-কান্নাকে, পরস্পর-বিরোধী সকল ভাব, সকল বস্তু, সকল অবস্থাকে কোলে করিয়া এক অখণ্ডের বুকের উপর নানা তরঙ্গভঙ্গে লীলা করিতেছে; সেই লীলাও আর এক অপূর্ব্ব নূতন অখণ্ড লোকের আভাষ দিতেছে। এই যে সৃষ্টি ও ধ্বংস, ধ্বংস ও সৃষ্টি; জন্ম ও মৃত্যু, মৃত্যু ও জন্ম; ভাল ও মন্দ, মন্দ ও ভাল নটরাজের চরণপাতের তালে তালে চক্রাকারে ঘুরিতেছে, সেই আবর্ত্তনের ফলে এক অখণ্ড অসীম শিবলোক সূচিত হইতেছে; সেই শিবলোকের অধীশ্বর মহাকাল স্বয়ং, তাই তিনি স্বয়ং শিব বা চিরমঙ্গল। এই দ্বৈতভাবময় সৃষ্টি-প্রবাহ অখণ্ড চিরমঙ্গলের দিকে ধাবিত, চির-মঙ্গল তাহার গতি, পরিণতি, সুতরাং সে প্রবাহও অনন্ত, অখণ্ড। নৃত্যের চরণভঙ্গে যে খণ্ডতা আছে, তাহা অখণ্ডেরই অংশ, অখণ্ডেরই সঙ্গে সে খণ্ডতা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। সেই খণ্ডতা লীলায়িত হইয়া অপূর্ব্ব অখণ্ড ভঙ্গিমার সৃষ্টি করে লতানো লতিকার মত। তাই নটরাজের নৃত্যও অখণ্ডের, ঐক্যের প্রতীক; ভেদের মধ্যে অভেদের, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের (multiple unity-র) দ্যোতক।

(৫)

একখানা ইংরেজী পুস্তক হাতে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার নাম "The Dance of Siva", "শিবের তাণ্ডব"। লেখকের নাম হইল "Collum"। তাঁহার নামটি যে কল্পিত তাহাতে সন্দেহ নাই। এই ছদ্ম-নামের আড়ালে লেখক তাঁহার বাহ্য রূপটিকে ঢাকা দিয়াছেন মাত্র; কিন্তু পুস্তকের পাতায় পাতায় তিনি তাঁহার মনের যে রূপটি দিয়াছেন, তাহা পাঠকের চিত্তকে না ভুলাইয়া ছাড়ে না। লেখক পণ্ডিত, মেধাবী ও মানবপ্রেমিক। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের স্বল্পপরিসরের মধ্যে ইতিহাস, রাজনীতি, দর্শন, নৃতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, উদ্ভিজ্জবিজ্ঞান, আয়ুর্বিজ্ঞান ইত্যাদি নানা বিদ্যার অতি আধুনিকতম সিদ্ধান্তের আলোকে তাঁহার বক্তব্য বিষয়টি তিনি এমন প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে তাহা পড়িলে বিস্মিত হইতে হয়।

বিলাতের "To-day and To-morrow" গ্রন্থমালার পুস্তকগুলি, যাঁহারা প্রতীচ্যের নবচিন্তাধারার সহিত পরিচয় লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা হয়ত পাঠ করিয়া থাকিবেন। পুস্তকগুলি আকারে ছোট; কিন্তু ইহাদের মধ্যে যে মনটি লুকায়িত রহিয়াছে, তাহা খুব বড়; শুধু তাহাই নহে, ক্ষুরধারও বটে। বর্ত্তমান য়ুরোপের বিখ্যাত দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক, সমালোচক, শিল্পী প্রভৃতি মনীষিগণ-কর্ত্তৃক এই গ্রন্থগুলি রচিত। কতকগুলি পুস্তিকা মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ গতি ও পরিণতি সম্বন্ধে, আর কতকগুলি, নারী, যুদ্ধ, পৃথিবীর লোক-সংখ্যা, বিজ্ঞান, ধর্ম্মনীতি, কাব্য, নাটক, চিত্রশিল্প, সঙ্গীত-বিদ্যা প্রভৃতি বিশিষ্ট ও খণ্ড বিষয়ের ভবিষ্যৎ কি, এই সম্বন্ধে লিখিত। ইহাদের চিন্তোদ্দীপনী শক্তি পাঠকচিত্তকে নাড়া দেয়, সেখানে সাড়া জাগাইয়া তোলে। Bertrand Russel-এর "Icarus or The Future of Science", এবং "What I Believe" বোধ হয় অনেকেই পড়িয়া থাকিবেন; Schiller-এর "Tantalus or The Future of Man"; Liddel Hart-এর "Paris or the Future of War"; Ludovici-র "Lysistrata, or Woman's Future"; Blacker-এর "Birth-Control and the State"; Turner-এর "Orpheus, or the Future of Music" প্রভৃতি পুস্তিকায় চিন্তোন্মাদনী শক্তি অতুলনীয়।

"The Dance of Siva" অর্থাৎ "শিবের তাণ্ডব" নামক এই প্রবন্ধের আলোচ্য পুস্তিকাও উক্ত-পর্য্যায়ভুক্ত।

"কোলাম্" ছনিয়ায় আর নাম খুঁজিয়া পাইলেন না; তাঁহার গ্রন্থিকার নাম রাখিলেন "শিবের তাণ্ডব"। এই নামের একটা সার্থকতা নিশ্চয়ই আছে। গ্রন্থখানা পড়িয়া মনে হইল লেখক একজন বিশ্বমৈত্র্য-স্থাপনের স্বপন-বিহারী ভাবুক।

"কোলাম্" যাহা বলেন তাহার ভাবার্থ এই যে, জীবন-প্রবাহ সমগ্র সৃষ্টি-প্রবাহেরই মত এক ও অব্যাহত; তাহার মধ্যে আছে তরঙ্গ ও ছন্দ, আছে তাহাতে তাল ও নৃত্য— শিবের তাণ্ডবের মত—সুতরাং তাহা অখণ্ড ও নিরবচ্ছিন্ন। মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে, কৃষ্টিতে কৃষ্টিতে অর্থাৎ কাল্‌চারে কাল্‌চারে, সভ্যতায় সভ্যতায়, কিম্বা জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও চিন্তার বিচিত্র ধারায় সীমারেখা টানা অসম্ভব, এ-সকলই জলের তরঙ্গের মত অব্যাহত ও অখণ্ড সত্তার অবিচ্ছিন্ন অংশ। খণ্ড-তরঙ্গের যেমন চূড়া (crest) আছে এবং জল-তরঙ্গরূপ প্রবহমান অখণ্ড বস্তুটির সৃষ্টির জন্য তাহার প্রয়োজন আছে, তেমনি তাহার খাদও (trough) আছে, এবং সেই অখণ্ড বস্তুটির অস্তিত্বের জন্ম তাহারও প্রয়োজন আছে; এই তরঙ্গ-ভঙ্গ একই অখণ্ড জলপ্রবাহের অংশ; ঠিক তেমনি, সৃষ্টিতে ও মানবের সকল অবস্থায় ও চিন্তার ধারায়, কিম্বা সভ্যতা ও কাল্‌চারে, যে বৈশিষ্ট্য আপাত-দৃষ্টিতে পৃথক ও ভিন্ন সত্তা বলিয়া ধরা দেয়, তাহা বস্তুত ভিন্ন নহে; পরন্তু, তরঙ্গেরই মত একই অখণ্ড, অভিন্ন প্রবহমান সত্তার অংশ মাত্র। তরঙ্গের চূড়া ও খাদেরই মত সভ্যতার উচ্চতা-নীচতাও আছে, যুগ-যুগান্তর ধরিয়া তরঙ্গায়িত-ভাবে প্রবহমান মানব-সভ্যতার অস্তিত্বের জন্য সেই উচ্চতা-নীচতার প্রয়োজনও আছে; "পূর্ব্ব" যদি আজ উন্নত, "পশ্চিম" তবে অনুন্নত; "পশ্চিম" যদি আজ উন্নত, "পূর্ব্ব" তবে অনুন্নত; ঠিক একই মানব-সভ্যতারূপ সাগরের তরঙ্গ-ভঙ্গের মত। সৃষ্টির মধ্যে যেমন ধ্বংস ও সৃষ্টি, সৃষ্টি ও ধ্বংস, এই পরস্পর-বিরোধী দুই-ভাব লইয়া এক দ্বৈতলোকের (Polarity-র) আবির্ভাব হইয়াছে, ঠিক তেমনি মানব-সভ্যতাতেও এই দ্বৈতভাব তরঙ্গ-ভঙ্গের নৃত্যের ছন্দে চলিয়াছে। কিন্তু শিবের তাণ্ডবে উদ্ভূত ধ্বংস-সৃষ্টি-মূলক দ্বৈতলোক যেমন এক অদ্বৈত-লোকের আভাষ দেয়, ঠিক তেমনি মানব-সভ্যতার নানা ভেদ-বৈশিষ্ট্য, উত্থান-পতন, আবির্ভাব-অন্তর্ধানও এক অখণ্ড সত্তারই আভাষ দেয়।

কালের স্রোতে কত জাতি আসিল, গেল; কত সভ্যতা মাথা তুলিল, চলিয়া গেল। প্রাচীন গ্রীস উঠিল, ডুবিল; রোমও উঠিল, ডুবিল। কিন্তু তাহাতে আক্ষেপ করিবার কি আছে? রোম গ্রীস-দেশ জয় করিল, কিন্তু গ্রীস রোমের মনোরাজ্য জয় করিল—"Conquered Greece conquered Rome"। তাহার পর গ্রীসও গেল, রোমও গেল; কিন্তু সমস্ত য়ুরোপ জুড়িয়া রহিয়া গেল গ্রীকো-রোমান সভ্যতার অখণ্ড প্রভাব। তাহার উপর আবার ছাপ পড়িল খৃষ্টের ভাবের। ইহাই হইল বর্ত্তমান খৃষ্টভাব-সমৃদ্ধ গ্রীকোরোমান সভ্যতা। কালের বুকে এক বৈশিষ্ট্য লয় পাইয়া আর এক বৈশিষ্ট্যের স্থান করিয়া দিল। এক pattern নষ্ট হইল, আর এক pattern তাহার স্থান অধিকার করিল। খৃষ্টভাব-সমৃদ্ধ গ্রীকোরোমান সভ্যতাই আবার য়ুরোপের "নবযুগ" (Renaissance) ও 'ধর্ম্মসংস্কারে'র (Reformation) মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়া, পরে আবার বিজ্ঞানের যুগের ছাপ বুকে লইয়া, বর্ত্তমান যুগের বিশিষ্ট বিজ্ঞান-পুষ্ট সভ্যতায় পরিণত হইল। এইরকমেই যুগে যুগে সভ্যতা রূপ বদলাইয়া নূতন রূপ গ্রহণ করিয়াছে, বহুরূপীর অপরূপ ঢং-এ; শিবের তাণ্ডবের তালে তালে সৃষ্টি আসিয়া ধ্বংসকে গ্রাস করিয়াছে।

সভ্যতা ও কাল্‌চার জীবনেরই মত, স্রোতেরই মত, কালের ও দেশের বক্ষে সদা প্রবহমান; তাহার একটা অব্যাহত গতি আছে; ইহা কালের ভিন্ন ভিন্ন মুহূর্ত্তে দেশে দেশে প্রবেশ করিয়া মানবকুলকে এক গোষ্ঠীতে পরিণত করিবার প্রয়াস পাইয়াছে; "বর্ব্বরতা" ও "সভ্যতা"র মধ্যে সীমারেখা নষ্ট করিয়াছে; অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত সমাজের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিয়া নানা দেশের নানা জাতিকে নূতন রঙে রাঙাইয়া নূতন বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

শ্রীরমেশচন্দ্র রায়

একটা কথা উঠিয়াছে, এবং পণ্ডিতেরা তাহা বিশ্বাস করেন যে, রোমই "পশ্চিম য়ুরোপকে" তাহার সভ্যতা ও কাল্‌চার দিয়া মানুষ করিয়াছে; "কোলাম্‌" বলেন, এ-কথার কোন তাৎপর্য্য নাই। বাস্তবিক, "পশ্চিম বর্ব্বর য়ুরোপ" ও "সভ্য রোম", এই রকম সীমারেখান্বিত নামরূপ তো কল্পিত মাত্র। যাহাকে রোমের ভাব বলা হয় তাহা দেশের ঠিক কোন্‌ স্থানে এবং কালের কোন্‌ মুহূর্ত্তে সীমাবদ্ধ ছিল, তাহা কেহ নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারিবে কি? আসল কথা এই যে, একটি ভাব ও কৃষ্টির স্রোত পূর্ব্বদিক্‌ হইতে মন্দ গতিতে বহিতেছিল, সেই স্রোত রোমে কেন্দ্রীভূত হইয়া শক্তি সঞ্চয় করিয়া, পরে কূল ছাপাইয়া দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল; সেই স্রোতে যাহাকে "পশ্চিম য়ুরোপ" বলা যায়, তাহা "গঙ্গাস্নান" করিয়াছিল মাত্র। বস্তুত, 'বর্ব্বরতা' ও 'সভ্যতার' মধ্যে কোন বিশিষ্ট সীমা-রেখা টানিয়া দেওয়া চলে না, ঠিক যেমন তরঙ্গের চূড়া ও খাদের মধ্যে ভেদ-রেখাটি, শীত ও বসন্তের মধ্যে ভেদ-মুহূর্ত্তটি, সকাল ও দুপুরের মধ্যে ছেদ-পলটি নির্দ্দেশ করা যায় না। বস্তুত, কোথায় ও কোন্‌ মুহূর্ত্তে 'বর্ব্বরতা' লয় পাইল ও "পশ্চিম য়ুরোপ" রোমের 'সভ্যতা' গ্রহণ করিল, তাহার সীমা-রেখা টানিয়া দেওয়া একেবারেই অসম্ভব।

"কোলাম-"এর মতে আসল সত্যটি হইল এই যে, পশ্চিম য়ুরোপের বর্ত্তমান বা মধ্য-যুগের সভ্যতা স্বয়ম্ভূত হয় নাই। "Western civilization did not spring up spontaneously in Western Europe"; ঠিক তেমনি রোমের সভ্যতাও এক স্বয়ম্ভূত বস্তু নহে; ইহাও নানান্‌ সভ্যতা ও কাল্‌চারের সংস্পর্শে উদ্ভূত। এখানে গ্রীসের ও খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাবের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঠিক তেমনি, বর্ত্তমানে যাহাকে পশ্চিম য়ুরোপের সভ্যতা বলা যায়, তাহা রোমীয় সভ্যতার গর্ভে ও গ্রীসের ঔরসে জাত; গ্রীসীয় সভ্যতা মাইনোয়ান সভ্যতার গর্ভে ও অনির্দ্দিষ্ট "উত্তর" দেশের ঔরসে জাত; মাইনোয়ান সভ্যতা আবার অ্যানাটোলিয়ান সভ্যতার গর্ভে ও মিশরের ঔরসে জাত; অ্যানাটোলিয়ান সভ্যতা ইন্দো-সুমেরিয়ান সভ্যতার গর্ভে ও উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলের কোন অজানা দেশের ঔরসে উৎপন্ন। সুতরাং সভ্যতার গোষ্ঠী-গোত্রের আলোচনায় ইহাই দেখা যায় যে, যুগে যুগে প্রাচ্য হইতে প্রতীচ্যে কৃষ্টি-তরঙ্গ চলিয়াছে, নূতন জমিতে প্রবেশ লাভ করিয়া (infiltrate and penetrate করিয়া), তাহার উর্ব্বরতা-শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে, নূতন জমিতে আরও শক্তিমতী সভ্যতার জন্ম দিয়াছে। মূল কথাটি হইল এই যে, সভ্যতার স্রোত স্মরণাতীত কাল হইতে বহিয়া চলিতেছে, দেশে দেশে ঘুরিয়া ফিরিতেছে; নানা অবস্থার, নানা আবহাওয়ায়, নূতন পরিবেষ্টনীতে তাহার রূপ বদলাইতেছে মাত্র।

কিন্তু য়ুরোপ কি এই অভেদ ও অদ্বৈতের অখণ্ড লীলা জীবনক্ষেত্রে স্বীকার করিয়া লইল? "কোলাম্‌" বলেন, না তাহা নয়।

"পশ্চিম" বা য়ুরোপ খণ্ডতাকে বড় করিয়া দেখে, নামরূপের বেড়া দিয়া শ্রেণীবিভাগ করে, তাহার ফলে কৃত্রিম ভেদের (Phantom barriers-এর) সৃষ্টি হয়। একটি এরোপ্লেনে চড়িয়া যদি কেহ এই কলিকাতার আকাশে ঘুরিতে ঘুরিতে নীচের দিকে চাহিয়া কেবল খণ্ডভাবে ইমারতগুলি গোনে, তবে যেমন সমগ্র কলিকাতার অখণ্ড মনোরম দৃশ্যটি তাহার দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া পড়িবে; অথবা, কাননে গিয়া যদি কেহ প্রতি বৃক্ষটির ডাল-পালা, পাতা গুণিতে থাকে, তবে যেমন সমগ্র কাননটির সুন্দর দৃশ্য দেখার সুযোগ তাহার ঘটিয়া উঠিবে না; ঠিক তেমনি, য়ুরোপীয় মন বিরোধাত্মক তর্কের (Dialectic-এর) প্রবর্ত্তক সক্রেটিসের মন্ত্রশিষ্য গ্রীক্‌-মনের ছায়ায় আসিয়া বিশ্বের যাবতীয় ঘটনা, চিন্তার যাবতীয় বিষয় ও জীবনের নানা ক্ষেত্রকে কাটিয়া ছাঁটিয়া, বিশ্লেষণ করিয়া, শ্রেণীবিভাগ করিয়া দেখিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ায়, এই সকল ঘটনা, বিষয় ও ক্ষেত্র যে একই অখণ্ড সত্তার আভাষ দেয় তাহা ধরিতে পারে নাই। সে-মন সমগ্রকে, ভূমাকে দেখায়, ভেদের মধ্যে অভেদকে উপলব্ধি করার শিক্ষাই পায় নাই। এই ভেদজ্ঞানকে সম্বল করিয়া চলিলে জীবনের

খণ্ড ক্ষেত্রে খুব দ্রুত অগ্রসর হওয়া যায়, প্রগতি দুর্বার হইয়া উঠে; খণ্ড বিষয় লইয়া মজিয়া থাকিলে যে একাগ্রতা জাগে, সেই একাগ্রতা নানা বিদ্যার উৎকর্ষ সাধন ও সৃষ্টি করে,—Logic ও Science-এর গতি অপ্রতিহত হয়; লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বরপুত্র হওয়া যায়, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু শুধু ভেদকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া বসিয়া থাকিলে অখণ্ড মানবের সমূহ অকল্যাণ হয়; তাই, এই ক্ষীণ সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির ফলে "পূর্ব্ব" ও "পশ্চিম", এই ভেদ-ভাব দেখা দিল; "পশ্চিম" বড়, "পূর্ব্ব" ছোট; "পশ্চিম" জীবন-ক্ষেত্রে উন্নত, "পূর্ব্ব" অনুন্নত; "পশ্চিমে"র শিল্প-বিজ্ঞান, আচার-ব্যবহার, চালচরিত্র, সভ্যতা-ভব্যতা, এক কথায় কাল্‌চার "পূর্ব্বে"র চাইতে শ্রেষ্ঠ। পাশ্চাত্য মনে এইরকম অহং-ভাব দেখা দিল, ভেদজ্ঞানে আচ্ছন্ন সেই মন মদগর্ব্বে স্ফীত হইয়া "পূর্ব্ব"কে গ্রাস করিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিল,—ইহার ফলে প্রাচ্যে হিংসাবহ্নি প্রজ্বলিত হইল, প্রাচ্য "পশ্চিমে"র গ্রাস হইতে নিজকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

যুরোপের এই খণ্ডজ্ঞান-বুদ্ধি কি শুধু "পূর্ব্ব ও পশ্চিম" এই বিভেদই দেখিল? এই বিভেদজ্ঞান কি পৃথিবীকে পশ্চিমখণ্ড ও পূর্ব্বখণ্ড এই রকম বিভাগ করিয়াই ক্ষান্ত হইল? নিজেকেও কি নানা ভাগে বিভক্ত করিয়া লয় নাই? আজ যে ফরাসী কাল্‌চার, জর্ম্মান্ কালচার, ল্যাত্‌ কাল্‌চার, বৃটীশ কাল্‌চার প্রভৃতি নানা বিশিষ্ট (Characterised) কাল্‌চারের কথা শোনা যায়, তাহা কি সেই বিভেদ-বুদ্ধির ফল নহে? এই যে ন্যাশন্যালিজ্‌মের তরঙ্গ যুরোপের বুকের উপর দিয়া বহিয়া গিয়া তাহাকে বিধ্বস্ত করিয়া দিতেছে, দেশে দেশে হিংসার বহ্নি জ্বালাইতেছে, যাহার ফলে মহাযুদ্ধরূপ একটা প্রলয়কাণ্ড হইয়া গেল, সেই ন্যাশন্যালিজম্ কি ভেদবুদ্ধির উৎকটলীলাপ্রসূত নহে? তাহার-পর, রাজনীতির ক্ষেত্রে, কর্ম্মজীবনে, সমাজ-বিভাগেও যুরোপ জীবনকে নানাভাগে বিভক্ত করিয়া দেখিতেছে এই ভেদবুদ্ধিরই ফলে। তাই আজ মনার্কিজ্‌ম্, এনার্কিজ্‌ম্, ক্যাপিট্যালিজ্‌ম্, সোশ্যালিজ্‌ম্, কমিউনিজ্‌ম্, সোভিজ্‌ম্, ফ্যাসিজ্‌ম্ প্রভৃতি পরস্পর-বিরোধী নানা 'ইজ্‌ম্'-এর আবির্ভাব ও প্রাদুর্ভাব যুরোপে জীবন-যাত্রাকে জটিল করিয়া তুলিতেছে, মানব-জীবনকে অখণ্ডভাবে দেখিতে দিতেছে না; রাজা-প্রজায়, ধনিক-বনিক্-শ্রমিকে বিরোধ জাগাইতেছে। জীবনকে অখণ্ডভাবে দেখিতে শিক্ষা পাইলে যুরোপীয় মন এমনটা করিতে পারিত কি না সন্দেহ। এই খণ্ডজ্ঞান-বুদ্ধি ভারতবর্ষকেও আক্রমণ করিয়াছে; তাই আজ কথায় কথায় শুনিতে পাওয়া যায় "বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্য", "Behar for the Beharees", "Andhra for the Andhras" ইত্যাদি চীৎকারধ্বনি। বাঙ্‌লা আজ তাহার কাল্‌চারের গর্ব্ব করে, বেহারী বাঙালীকে হিংসা করে, পাঞ্জাবী তাহার বাহুবলের গর্ব্বেই মরে এবং মনে মনে অন্য প্রদেশবাসীকে অকারণে ঘৃণা করে, ভাটিয়া তাহার নিজের গণ্ডীকে বড় করিয়া দেখে, মাদ্রাজীও তাহার বৈশিষ্ট্য খুঁজিতেই ব্যস্ত। এই যে দেশের বুকের উপর দিয়া প্রাদেশিকাত্মবোধের এক স্রোত বহিয়া যাইতেছে, ইহা ভেদবুদ্ধির উৎকট লীলা হইতেই উদ্ভূত। "বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্য"! "বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্য !!' —মাসিকে, সাপ্তাহিকে, নেতৃগণের বক্তৃতায় এই বৈশিষ্ট্যের কথা শুনিয়া শুনিয়া কান ঝালাপালা হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু এমনটা ছিল না প্রাচীনকালে;—এদেশেও নয়, যুরোপেও নয়। যুরোপের মধ্যযুগে ল্যাটিনভাষার পণ্ডিত মনীষিগণ, দেশ হইতে দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। পশ্চিম যুরোপ হইতে পূর্ব্ব যুরোপ, পূর্ব্ব যুরোপ হইতে পশ্চিম যুরোপে পণ্ডিতগণের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান চলিত; এমন কি, ক্রুসেডের সময়েও তাঁহারা ভূমধ্য-সাগরের পূর্ব্বকূলবর্ত্তী দেশসমূহ হইতে প্রাচ্যের ভাব-সংগ্রহে পরাঙ্মুখ ছিলেন না; তখন ন্যাশন্যালিজ্‌মের মদগর্ব্ব তাঁহাদের মনকে আবিল করিয়া তুলে নাই, জাতিতে জাতিতে ভেদজ্ঞান পুষ্টিলাভ করে নাই—কোনো প্রকার অভিমান সত্যকে গ্রহণ করিতে বাধা দেয় নাই। তখন, রাজায় রাজায় রাজ্য লইয়া বিবাদ হইত, যুদ্ধ হইত; কিন্তু মানুষে মানুষে ভেদ-জ্ঞান স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই, মানুষে মানুষে মৈত্রীর ভাব অজ্ঞাতসারে মনের মধ্যে ক্রীড়া করিত। এই ভারতবর্ষেও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ দিগ্বিজয়ে বাহির হইতেন,

শ্রীরমেশচন্দ্র রায়

প্রাদেশিক সীমা মানিয়া চলিতেন না, সমগ্র ভারত তাঁহাদের নিকট একটি দেশই ছিল; এমন কি, মুসলমান রাজত্বের সময়ও প্রাদেশিকাত্মবোধ বড় হইয়া দেখা দেয় নাই। সমগ্র ভারতকে অখণ্ড পুণ্যভূমি বলিয়া প্রাচীনেরা মনে করিতেন; এই জন্যই হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত, আরব-সাগর হইতে আসামের সীমা পর্য্যন্ত, শঙ্করাদি যুগাবতার আচার্য্যগণের ভাব ছড়াইয়া পড়িতে পারিয়াছিল এবং বহুসংখ্যক মঠাদির প্রতিষ্ঠান সম্ভবপর হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে, এই বিজ্ঞানের যুগে, জলে স্থলে আকাশে মানুষের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও, দেশ-দেশান্তরের দূরত্ব অন্তর্হিত হইয়া গেলেও, মনোরাজ্যে মানুষ কূপমণ্ডূক হইয়া পড়িতেছে,—স্বদেশাত্মবোধের উৎকট লীলার ফলে, প্রাদেশিকাত্মতার অপ্রতিহত প্রভাবে ও তাহারি অত্যুপাসনায়। এই ভেদবুদ্ধি য়ুরোপের বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম।

প্রাচ্য-মনের স্বভাব কিন্তু খণ্ডকে বড় করিয়া দেখিতে পারে না; সে কাননে গিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাছপালা, তাহাদের ডাল-পাতা গুণিয়া অযথা সময়ক্ষেপ করে না; সমগ্র কাননটির মনোমুগ্ধকর দৃশ্যটি দেখিয়া লইয়া সার্থক হয়। সে বিরাটকে, অখণ্ডকে, ভেদের মধ্যে ঐক্যসূত্রকে দেখিয়া লইতেই অভ্যস্ত। "পূর্ব্ব"-"পশ্চিম"-আদি দশদিক্ স্বরূপতঃ ভিন্ন নহে, ভিন্নভাবে সত্য নহে; ইহারা ব্যবহারিক সত্য মাত্র,—ব্যবহারিক জীবনে সুবিধার জন্য এই বিভাগ করা হইয়াছে। তেমনি, শীত-বসন্ত, গ্রীষ্ম-বর্ষা, শরৎ-হেমন্ত ষড়ঋতুর মধ্যে স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই, কালের অংশবিশেষের বিশেষ ধর্ম্মকে লইয়া ব্যবহারিক জীবনে সুবিধার জন্য এই কালবিভাগ গ্রহণ করা হইয়াছে। বস্তুত, পূর্ব্ব-পশ্চিমাদিতে দেশবিভাগ ও ষড়ঋতুতে কালবিভাগ ভিন্ন ভিন্ন সত্তারূপে চরম সত্য নহে,—ইহারা একই দেশ ও কালের ঐক্যসূত্রে গ্রথিত "মণিমালা" মাত্র। ঠিক তেমনি, প্রাচ্য-মন দেশাদিবিভাগানুসারে ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে চরম সত্যরূপে স্বীকার করিয়া লয় নাই; পরন্তু এই সকল জাতি, এই সকল শ্রেণী এক বিরাট মহামানবেরই ক্ষুদ্র অংশ, একথা একান্তভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। শুধু তাহাই নহে; আজ ভেদবুদ্ধি যে "আর্য্য" সভ্যতাকে 'দ্রাবিড়ী' সভ্যতা হইতে পৃথক করিতেছে, সেই আর্য্য সভ্যতা বা দ্রাবিড়ী সভ্যতা নিছক শুদ্ধ নহে,—বর্ত্তমান কালে ভারতে যে-সভ্যতা আছে, তাহা দ্রাবিড়ী, আর্য্য ও অনার্য্য ভাবের আদান-প্রদানের, সংমিশ্রণের অবশ্যম্ভাবী ফল। ঠিক তেমনি, ইংরেজ, ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইতালীয় জাতিদের মধ্যেও গ্রীক্, রোমান ও খৃষ্ট ভাবের সংমিশ্রণের ফলে তৎতৎ জাতির মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা ঐ ঐ জাতির নিরবলম্ব ও নিজস্ব সাধনার ফল নহে, পরন্তু নানা জাতির শোণিত ও ভাবের সংমিশ্রণের ফল। সুতরাং ঐতিহাসিক সত্য হিসাবেও জাতিতে জাতিতে ভেদবিভাগ কৃত্রিম ও কাল্পনিক মাত্র। শুদ্ধ জাতি এ যুগে কুত্রাপি নাই। বিদ্যার (Science এর) ক্ষেত্রেও, প্রাচ্য-মন জ্ঞানের বিষয়ের নানা ভাগে বিভক্ত বিদ্যাগুলিকে একান্তভাবে ভিন্ন বলিয়া স্বীকার করিয়া না লইয়া, এই সকল বিদ্যা যে একই ব্রহ্মবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত তাহা গ্রহণ করিয়া লইয়াছে। প্রাচ্য-মনের স্বভাবই এই যে, ইহা ভেদকে বড় করিয়া দেখিতে পারে না,—ভেদকে বড় করিয়া দেখা ইহার পরধর্ম্ম, কিন্তু ভেদের মধ্যে ঐক্যকে দেখাই ইহার স্বধর্ম্ম। এই ভেদ সমুদ্রবক্ষে বীচিমালার মত, জলের বুদ্বুদের মত, একই বস্তুর স্পন্দনে উদ্ভ্রান্ত—একমেবাদ্বিতীয়ের লীলার ইচ্ছায়। প্রাচ্য-মন এই এককে ধরিতে পারিয়াছে বলিয়াই তাহার মন প্রেম-প্রবণ, বিশ্বপ্রেমমুখ। এই মনোভাবের আব্‌হাওয়া ছিল বলিয়াই প্রাচ্যখণ্ডে বুদ্ধ, মহাবীর, কনফুসিয়ুস্, লাওট্‌সে ও খৃষ্টের মত মহাপ্রেমী মানবের উদ্ভব সম্ভব হইয়াছিল; দিকে দিকে সর্ব্বমানবের উপর তাঁহাদের প্রেমের জ্যোতি পতিত হইয়া অপূর্ব্ব সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছিল। এই প্রেম-প্রবণ মন দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিতে পারে না, মদগর্ব্বে স্ফীত হইয়া পরকে গ্রাস করিতে চায় না—কেননা তাহার যে বসুধৈব কুটুম্বকম্।

"The Dance of Siva" গ্রন্থের লেখক বলেন, এই "পূর্ব্ব" ও পশ্চিমে"র পরস্পর-বিরোধী দুইটি মন যে-দিন এক হইবে, পরস্পরের সহযোগিতা করিবে; কিম্বা

যে-দিন পাশ্চাত্য-মন প্রাচ্য-মনের স্বভাব গ্রহণ করিবে, সে-দিন জগতে এক যুগান্তর আসিবে—নূতন সভ্যতার সৃষ্টি হইবে। সেই নব সভ্যতা আরও কত যুগযুগান্তর ধরিয়া বাঁচিয়া থাকিয়া জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া লইবে,—পরে স্বধর্ম্মের গ্লানি যখন আসিবে, তখন আবার আর এক সভ্যতার পথ করিয়া দিয়া নিজে মরিয়া যাইবে। পাশ্চাত্য তাহার বিশ্লেষণী প্রতিভার বলে বিশ্বকে খণ্ড খণ্ড করিয়া, শ্রেণীবিভাগ করিয়া, নানা ভাগে বিভক্ত করিয়া লইয়া, সেই সকল কল্পিত বিভাগ ও শ্রেণীর মধ্যে কৃত্রিম বেড়া দিয়া ভেদকে দুরতিক্রম্য করিয়া তুলিয়াছে; সেই কৃত্রিম বেড়ার জন্যই বিভাগগুলির মধ্যে যে বিরাট ঐক্যসূত্র রহিয়াছে, তাহা পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে পড়ে না—সে ভূমাকে দেখিতে সমর্থ নয়। প্রাচ্য কিন্তু তাহার সংশ্লেষণী বা একীকরণী (synthetic) প্রতিভার বলে সর্ব্বাগ্রেই ভূমাকে দেখিয়া লয়, পরে ব্যবহারিক জীবনের সুবিধার জন্য খণ্ডকে ভূমার অচ্ছেদ্য অংশরূপে স্বীকার করে মাত্র। সুতরাং বর্ত্তমানে, যাহাকে "পশ্চিম" বলা যায়, সেই "পশ্চিম"-এর বিশ্লেষণী (analytic) প্রতিভা যে-দিন,—যাহাকে প্রাচ্য বলা যায়, তাহার একীকরণী (synthetic) প্রতিভায় লয় পাইবে, অথবা দুই প্রতিভার সংমিশ্রণ হইবে, সে-দিন মানবের অখণ্ড কল্যাণের পথ খুলিয়া যাইবে—জাতিতে জাতিতে প্রেম সংস্থাপিত হইয়া এক মহামানবের মহাসভ্যতার বিকাশ হইবে।

লেখকের ইঙ্গিতে বুঝা যায় আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কারই সেই নবযুগের সূচনা করিতেছে। কেম্ব্রিজে শিক্ষাপ্রাপ্ত আচার্য্য বসুর মনের বিশ্লেষণী প্রতিভা এমন বিকাশ লাভ করিয়াছে যে, সেই প্রতিভার বলে তিনি অসম্ভাবিতরূপে অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রাদি আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এবং তাঁহার প্রাচ্যদেশসুলভ একীকরণী প্রতিভা সেই যন্ত্রসাহায্যে,—পদার্থবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানের মধ্যে পাশ্চাত্য-মন যে সীমারেখা টানিয়া দিয়াছিল,—সেই সীমারেখার লয় করিয়া দেখাইয়া দিয়াছে যে, এই দুই বিদ্যার মধ্যে মূলতঃ ভেদ নাই। এই আবিষ্কারের ফলে ভেদবুদ্ধিপিষ্ট সক্রেটিসের শিষ্য পাশ্চাত্য-মন এমন এক ধাক্কা খাইয়াছিল যে, ইহা সেই আবিষ্ক্রিয়াকে প্রাচ্যের ইন্দ্রজাল বলিয়া আখ্যা দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। বস্তুত, আচার্য্য বসু, সত্যদর্শী ঋষিগণের মত, দেখাইয়া দিলেন যে, জড় ও চেতনের মধ্যে উত্তেজনায় (stimulus-এ) সাড়া দিবার ক্ষেত্রে স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই,—এই দুই বস্তু একই বস্তুর স্পন্দন হইতে উদ্ভূত তরঙ্গরেখা মাত্র, নটরাজের নৃত্যচ্ছন্দে উপজাত ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ প্রভৃতি একসূত্রে গ্রথিত কাল-কণার মালার মত। আচার্য্য বসুর অভেদবুদ্ধি ও একীকরণী প্রতিভা দেখাইয়া দিল, আপাত-প্রতীয়মান "জড়" ও "চেতন"-এর মধ্যে এক অখণ্ড জীবনস্পন্দন চলিয়াছে, নৃত্য-চ্ছন্দে, তালে তালে; সেই নৃত্যের চরণভঙ্গে সর্ব্বসীমারেখা ভাঙ্গিয়া, চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে,—ভেদের মধ্যে ঐক্যের প্রতিষ্ঠা হইতেছে। ঋষিতুল্য বসু-মহাশয়ের মনে পাশ্চাত্যের বিশ্লেষণী প্রতিভা ও ভেদবুদ্ধির সহিত প্রাচ্যের অভেদ বুদ্ধি ও একীকরণী প্রতিভার অপূর্ব্ব সমন্বয়ের ফলেই "জড়" ও "চেতন"-এর মধ্যে যে কোন কোন অংশে নিগূঢ় ঐক্য রহিয়াছে, তাহা বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রমাণিত করিতে পারা গিয়াছে। তাই "The Dance of Siva"-নামক গ্রন্থের লেখক আচার্য্য বসুকেই নব চিন্তাধারার প্রবর্ত্তক বলিয়াছেন।

"পূর্ব্ব" ও "পশ্চিম"-এর মিলনের সূচনাই এই গ্রন্থের (The Dance of Siva-র) প্রতিপাদ্য বিষয়। খৃষ্টের ভাব-সমৃদ্ধ, গ্রীকো-রোমান্ চিন্তাধারার ফলস্বরূপ এই যে এক বিশিষ্ট (characterized) পাশ্চাত্য সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার বিশিষ্ট রূপ কালপ্রভাবে ও নানা কাল্‌চারের সংস্পর্শে আসিয়া ধসিয়া পড়িতেছে; ঠিক তেমনি, প্রাচ্য সভ্যতারও যুগ-যুগান্তরগত বিশিষ্ট রূপ ও বর্ণ কালপ্রভাবে ও নানা কাল্‌চারের সংস্পর্শে আসিয়া লয় পাইতেছে; বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও বিদ্যাগুলির (Science-এর) মধ্যে সীমারেখা অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে; বিশিষ্ট জ্ঞান বা খণ্ড জ্ঞান এক অখণ্ড জ্ঞানে রূপান্তরিত হইতেছে; খণ্ডতার লয় ও ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে নূতনের সৃষ্টিও সূচিত হইতেছে।

শ্রীরমেশচন্দ্র রায়

এই যে মানব-সভ্যতার সর্ব্বক্ষেত্রে ধ্বংস ও সৃষ্টি অবিরাম চলিতেছে, তাহা একই অখণ্ড সত্যের অঙ্গরূপে, শিবের তাণ্ডবের তালে তালে, নৃত্য-দোদুলছন্দে, সর্পের গতির মত লীলায়িত অঙ্গভঙ্গে, এক অখণ্ড আবর্ত্তনে; কেননা জীবনপ্রবাহ অভেদ্য, তাহার ছন্দও অচ্ছেদ্য। এই জীবনপ্রবাহের গতি ও ছন্দ শিবেরই তাণ্ডবের মত। "পূর্ব্ব" শিবের এক পদ ও "পশ্চিম" তাঁহার আর এক পদ; এই দুই পদের ছন্দোময় বিক্ষেপে এক অখণ্ড লীলা সঞ্জাত হইতেছে; তাহা সুন্দর, অভিনব। "পূর্ব্ব" যদি হয় Thesis, "পশ্চিম" তবে Anti-thesis; এই দু-এর মিলন হইবে Synthesis বা Synthetic unity। এই Synthetic unity বা মিলন,—তথা ঐক্য,—শিবের নৃত্যের দ্বি-চরণপাতে উদ্ভূত এক অখণ্ড ছন্দ। নৃত্যচ্ছন্দে প্রবহমান সেই অখণ্ডের ভাবটি গ্রহণ করিয়াই গ্রন্থকার (Collum) তাঁহার গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছেন, "The Dance of Siva" বা শিবের তাণ্ডব। এই নৃত্য "পূর্ব্ব" ও "পশ্চিম"-এর মধ্যে ঐক্যস্থাপনের দ্যোতক ও প্রতীক। সে ঐক্য এক ছন্দোময়ী মহাগতি, অচ্ছিন্ন, অবিরাম।

য়ুরোপীয় মন যে-দিন শিবের তাণ্ডবের এই নিগূঢ় ভাবটি গ্রহণ করিতে পারিবে, অর্থাৎ 'অন্ত-কল্য', 'শীত-বসন্ত' প্রভৃতি কাল-বিভাগকে ও "পূর্ব্ব-পশ্চিম", "উত্তর-দক্ষিণ" প্রভৃতি দেশ-বিভাগকে যেদিন এক অখণ্ড সত্যের অংশরূপে গ্রহণ করিতে পারিবে, সে-দিন তাহার ভেদ-বুদ্ধি লুপ্ত হইবে, তাহার বৈশিষ্ট্যকে সে জোঁকের মত মরণ-কামড়ে ধরিয়া বসিয়া থাকিবে না; এই বৈশিষ্ট্যকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকার ফলে যে মদ-গর্ব্ব উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা দূর হইয়া য়ুরোপে এমন এক মনোভাবের সৃষ্টি হইবে যাহাতে সর্ব্বজাতির ভাবের ও আচার-সভ্যতার সংমিশ্রণে আর এক অখণ্ড নূতন সভ্যতার সৃষ্টি হয়। তখন পুরাতন নাম-রূপের ধ্বংসে দুঃখ হইবে না; নূতনের সৃষ্টিতে আনন্দ হইবে। "পূর্ব্ব" ও "পশ্চিম"-এর মধ্যে যে হিংসাবহ্নি জ্বলিতেছে, তাহা অন্তর্হিত হইবে।

(৪)

"কোলাম্" এই "The Dance of Siva" গ্রন্থে প্রাচ্য-মনের সম্বন্ধে তাঁহার একটু অজ্ঞতার পরিচয়ও দিয়াছেন। তিনি বলেন, প্রাচ্যে শুধু সংশ্লেষণী বা একীকরণী প্রতিভাই বিকাশলাভ করিয়াছে, বিশ্লেষণী প্রতিভা বিকাশ-লাভ করে নাই। লেখকের এই ধারণা ভুল। চৈনিক মনের সহিত কিম্বা ভারতীয় মনের সহিত যাঁহাদের কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে, তাঁহাদের স্বীকার করিতেই হইবে যে, চীনে ও ভারতে বিশ্লেষণী ও সংশ্লেষণী প্রতিভা এক সঙ্গেই বিকাশ-লাভ করিয়াছিল। ভারতের কথাই ধরা যাক্। বিশ্লেষণী প্রতিভা যদি এ-দেশের না থাকিত, তবে গ্যালেলিওর জন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব্বেই এদেশের লোক "চলা পৃথ্বী স্থিরা ভাতি" এ-কথা বলিতে পারিত না, অথবা পৃথিবীকে কদম্ব-ফুলের সঙ্গে তুলনা করিতে পারিত না—ভারতের জ্যোতির্বিদ্যা, বীজগণিত, আয়ুর্ব্বিজ্ঞান ও ষড়্দর্শনের বিকাশ-লাভ হইত না। মনস্তত্ত্বে ভারত যে বিশ্লেষণ-শক্তির পরিচয় দিয়াছে, তাহা এই বিজ্ঞানের যুগকেও অবাক্ করিয়া দিয়াছে। বিশ্বকে চতুর্বিংশতিতত্ত্বে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে কপিল যে বিশ্লেষণী প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা আধুনিক কালের কয়জন বৈজ্ঞানিক পারিয়াছেন? শঙ্কর যে আত্মার বাহ্য পর্দাগুলিকে ছাড়াইয়া নেতি নেতি করিয়া এক শুদ্ধ আনন্দময় লোকে পৌছিয়াছেন, তাহা প্রতীচ্যের কয়জন বিশ্লেষণী-শক্তিতে প্রতিভাবান মনীষী পারিয়াছেন? বিশ্লেষণী-শক্তি ও সংশ্লেষণী-শক্তির একসঙ্গে ক্রিয়া না হইলে পানিনি কি জগতের আদি ভাষাতত্ত্ব বা ব্যাকরণ-গ্রন্থ সৃষ্টি করিতে পারিতেন? বৌদ্ধদর্শনে যে বিশ্লেষণী-প্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা "The Dance of Siva"-র গ্রন্থকার জানেন কি? নাগার্জ্জুনের রসায়ন-শাস্ত্র কি গ্রীকেরা আসিয়া রচনা করিয়া দিয়া গিয়াছিল? মনুর সংহিতা, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, শুক্রের শুক্রনীতি কি গ্রীসের দান? লেখক পণ্ডিত, অথচ এত বড় একটা ভুল ধারণা কি করিয়া মনে স্থান দিলেন যে প্রাচ্যের শুধু সংশ্লেষণী-প্রতিভাই

আছে, বিশ্লেষণী-প্রতিভা ছিল না? বিশ্লেষণী-শক্তি না থাকিলে, সংশ্লেষণী-শক্তি থাকিতেই পারে না। ভেদ করিয়া, বিভাগ করিয়া কাটিয়া-ছাঁটিয়া না দেখিতে পারিলে, শ্রেণী-বন্ধন (classification) সম্ভবপর নহে; সামান্য তত্ত্বে (general principle-এ) উপনীত হওয়া অসম্ভব। এই সত্যটা তাঁহার মনে ধরা পড়িল না, ইহাই আশ্চর্য্য। তাই তিনি লিখিতে পারিলেন,—

"It is a European idea to sub-divide the human being into two categories of "body" and "mind". ....In the same way the notion of "free-will," as we envisage it, is peculiar to the West. Neither Indian nor Chinese thought knows anything of it. They do not divide up mental activity into categories and compartments." (pp. 19—20)

ইহার মত ভুল ধারণা আর কি হইতে পারে? এই অবস্থায় "কোলাম্"কে পাতঞ্জল পড়িতে অনুরোধ করি।

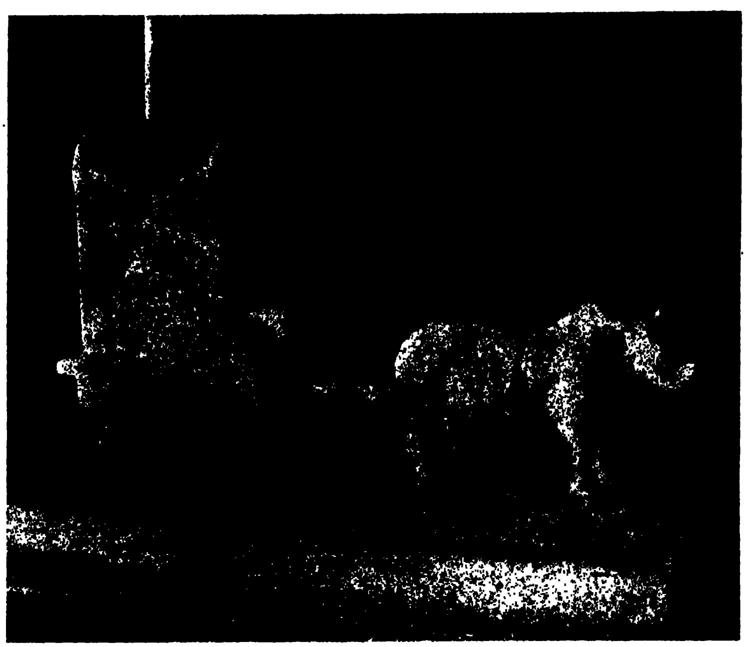
সে যাহা হউক্, আসল সত্যটি হইল এই যে, প্রাচ্য, তথা ভারত, ভেদকে স্বীকার করে, কিন্তু ভেদের মধ্যে ঐক্যকেও স্বীকার করে। কিন্তু প্রতীচ্য-মন শুধু ভেদকে লইয়াই বসিয়া আছে। এই ভেদ-বুদ্ধির আদি-গুরু হইলেন সক্রেটিস্। সক্রেটিসের ভাবই পরে প্লেটো ও এরিষ্টট্লের মধ্য দিয়া সমগ্র প্রতীচ্যখণ্ডে 'লজিক' ও বিজ্ঞানের সৃষ্টি করিয়াছে। গ্রীকের ভাব হইল কাটিয়া-ছাঁটিয়া, বিশ্লেষণ করিয়া শ্রেণী-বিভাগ করা, তাহার সংজ্ঞা দেওয়া—"আমি" ও "তুমি" এবম্প্রকার বিরোধের সৃষ্টি করা—ঐক্যের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া—"to the complete obscuration of any underlying rhythmic one-ness"। প্রাচ্যের প্রতি এই সামান্য অবিচার করা সত্ত্বেও "The Dance of Siva" পুস্তকের নাম সার্থক হইয়াছে, এবং যাঁহারা মনকে নূতন চিন্তাধারায় সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে চাহেন, তাঁহারা পুস্তিকাখানা পাঠ করিবেন। পাশ্চাত্য-মন তাহার ভেদবুদ্ধিরূপ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ঐক্য-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে সহসা এত ব্যস্ত হইয়া উঠিল কেন, তাহাও "To-day and To-morrow" গ্রন্থমালার পুস্তিকাগুলি পাঠ করিলে জানা যাইতে পারিবে আশা করি।

বিবিধ সংগ্রহ

লাইব্রেরীর জন্ম-কথা

পৃথিবীতে বই ছিল না, এমন দিনের কল্পনা আমরা করিতে পারি কি? কল্পনা হয়ত করিতে পারি কিন্তু অতি প্রাচীনতম কাল হইতেই কোনো না কোনো প্রকারের পুঁথির প্রচলন ছিলই। বড় বড় পাথরের উপর খোদাই করিয়া লেখা পুঁথি খুব প্রাচীন কালে মিশরে ছিল। মিশরেই বোধ হয় প্রথম লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়; সে-সময়কার কয়েকখানি প্রস্তর-পুঁথিও পাওয়া গিয়াছে। পাথরের টালির একটি লাইব্রেরী মিশরে মাটীর অনেক নীচে পাওয়া গিয়াছে, পাথরগুলিতে শুধু ছবি আঁকা। ইহার ভিতর একটি লাইব্রেরীতে যত বই ছিল, পাঠাগারের দেয়ালে তাহার একটা তালিকাও পাওয়া গিয়াছে।

বাবিলনে যে বেশ সমৃদ্ধ পুস্তকালয় ছিল তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। বাবিলন এক সময়ে প্রাচীন জগতে শিক্ষা ও সভ্যতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল। বাবিলনের প্রত্যেক মন্দিরে এক একটা লাইব্রেরী থাকিত; নিপ্পুরে যে লাইব্রেরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে দেখা গিয়াছে, বইগুলি সব আগুনে পোড়ানো মাটির টালি, একটির পর একটি অতি সযত্নে সাজানো, যেন পুঁথির এক একটি পাতা। এই নিপ্পুরেই খৃষ্ট পূর্ব্ব ১৭৮২ অব্দে বেল্'র মন্দির (Temple of Bel) ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়। নিনেভো নগরীতে সম্রাট অসুরবানিপালের অন্যূন দশ হাজার পুঁথির যে বিরাট লাইব্রেরী ছিল তাহা প্রাচীন বাবিলনের নিপ্পুর-লাইব্রেরীর পুঁথি-সংগ্রহ হইতেই নকল করিয়া লেখা হইয়াছিল। মেসোপটেমিয়ার এক প্রাচীন লাইব্রেরীতে সুমের ভাষার এক সুবৃহৎ অভিধান ও "ইস্তার ও ইস্‌দুবাল্" নামে একখানি অতি সুন্দর সরস মহাকাব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। গ্রীক্‌দের আলেক্‌জান্দ্রিয়া লাইব্রেরীও সুপ্রসিদ্ধ। দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দারের সেনাপতি টলেমি মিশরদেশ দখল করেন। এই টলেমিই আলেক্‌জান্দ্রিয়া



প্রাচীন চীনের পুস্তকবাহী গোযান। এক হাজার বৎসর পূর্ব্বে চীনদেশে এই রকম বলদের গাড়ীতে এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় পুস্তক প্রেরিত হইত।

গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং ইহাদের সংগ্রহের মধ্যে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-গ্রন্থরাজিই স্থান পাইতেছিল। সেণ্ট্ জেরোমের নিজের লাইব্রেরী এবং সম্রাট কন্‌ষ্ট্যান্‌টাইনের কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল লাইব্রেরী এই জাতীয় গ্রন্থ-সংগ্রহের জন্যই সুপ্রসিদ্ধ ছিল।

ভারতবর্ষে খুব প্রাচীনকালে লাইব্রেরীর অস্তিত্বের কোনো প্রমাণ আমাদের জানা নাই। বৈদিক যুগে বেদই ছিল যাঁহাদের একমাত্র গ্রন্থ তাঁহাদের লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার কোনো প্রয়োজন ছিল না। গুরুগৃহ হইতে শিষ্য যে-দিন ফিরিয়া আসিতেন, সে-দিন সমস্ত বেদ তাঁহার কণ্ঠে ও ওষ্ঠে বিরাজ করিত --তিনি নিজেই তখন একটি লাইব্রেরী! সেই বেদ আবার কেহ লিখিয়া রাখিতে পারিত না, তাহা হইলে ঘোর পাতকগ্রস্ত হইতে হইত! ইহাই ছিল প্রাচীন ভারতে নিয়ম, বৌদ্ধযুগেও তাই। খৃষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে চীনা পণ্ডিতেরা বৌদ্ধ-শাস্ত্র পাঠের জন্য যখন এদেশে আসেন তখন তাঁহারাও পুঁথি সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারেন নাই; ভিক্ষুদের নিকট হইতে শুনিয়া শুনিয়া লিখিয়া লইতে হইয়াছিল।



য়ুরোপের মধ্য-যুগের মঠ-লাইব্রেরী
এক সংঘ-ভিক্ষু মঠের লাইব্রেরী-গৃহে বসিয়া গ্রন্থ-রচনায় রত

লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা। এই লাইব্রেরীতে নাকি সাত লক্ষ পুঁথির সংগ্রহ ছিল। কোনো কোনো পণ্ডিত বলেন খলিফা ওমর, আলেক্‌জান্দ্রিয়া দখলের সময়, লাইব্রেরীটি পুড়াইয়া দেন। আবার কেহ বলেন সিজার যখন আলেক্‌জান্দ্রিয়ার নৌ-বহরে আগুন লাগাইয়া দেন, সেই আগুনেই নাকি লাইব্রেরীটিও পুড়িয়া যায়। ইহা ছাড়া গ্রীসে এরিষ্টট্‌ল-এর এক প্রকাণ্ড লাইব্রেরী ছিল; এথেন্সে ইউক্লিড্ এবং পেসিসট্রেটসেরও সুবৃহৎ লাইব্রেরী ছিল।

রোমে বিদ্যানুশীলন ও জ্ঞানচর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছিল গ্রীসদেশ হইতে লুণ্ঠিত পুঁথিপত্রের সংগ্রহ লইয়া। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে এক রোমেই আটাশটি লাইব্রেরী ছিল— ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও য়ুরোপ কিংবা এশিয়ার কোথাও বিদ্যানুশীলনের এত সুবিধা ছিল না। এদিকে খৃষ্টীয় সংঘাশ্রমগুলিতেও ধীরে ধীরে ছোট ছোট লাইব্রেরী

কিন্তু পরবর্ত্তী যুগে মানুষ আর এই শাস্ত্র-নির্দ্দেশ মানিয়া চলিত না। প্রত্যেক পণ্ডিত ব্রাহ্মণের গৃহেই এক একটি করিয়া লাইব্রেরী থাকিত। বৌদ্ধদের বিহারে বিহারে লাইব্রেরী রাখা ত একটা নিয়ম হইয়া দাঁড়াইয়াছিল— অনেকটা য়ুরোপের মধ্যযুগের Monastery-র মত। মুসলমানেরা যখন ভারতবর্ষ অধিকার করিতে আরম্ভ করে তখন পর্য্যন্তও বৌদ্ধদের অনেক বিহারে অনেক বড় বড় লাইব্রেরী ছিল। মুসলমানেরা অনেক বৌদ্ধ-বিহারের লাইব্রেরী পুড়াইয়া ফেলেন। ওদন্তপুরী-বিহারের লাইব্রেরীটি বক্তিয়ার পুড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন; নালন্দা ও বিক্রমশিলার লাইব্রেরী এবং বাঙলার জগদ্দল-বিহারের লাইব্রেরীও

শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

এই ভাবেই যায়। এই সময়ে অনেক বৌদ্ধ পুঁথি লইয়া প্রায় সমগ্র লাইব্রেরী কাঁধে ফেলিয়া নেপালে ও তিব্বতে পলায়ন করেন। তাই আজ পর্য্যন্তও নেপালে বহু পুরাতন সংস্কৃত পুঁথি পাওয়া যায়। আমাদের বাঙলার সেন-রাজাদেরও বোধ হয় একটা লাইব্রেরী ছিল, অন্তত বল্লাল সেনের ত ছিলই। আর নেপালের লাইব্রেরী ত প্রসিদ্ধ; সেখানে একটু চেষ্টা করিলে ১৪০০।১৫০০ বৎসরের পুরাতন পুস্তকও পাওয়া যায়।

রাজপুতানার প্রত্যেক রাজার কেল্লাতেই এক একটি লাইব্রেরী থাকিত। আলাউদ্দিনের আক্রমণের সময় গুজরাটের জৈনেরা সমস্ত পুঁথি লইয়া জয়সলমীরে পলাইয়া যায়। এখনও সেখানে সেই সব পুঁথি রক্ষিত আছে। তাঞ্জোরে এক সময়ে খুব বড় একটা লাইব্রেরী ছিল। শিবাজীর পিতা সাহজী ঐ-দেশ জয় করিয়া সেখানে রাজধানী স্থাপন করার পর সে-লাইব্রেরীর খুব উন্নতি হয়।

মুসলমান সম্রাট্ ও ওমরাহদেরও লাইব্রেরী থাকিত। মোগল সম্রাটদের অনেকেই যে লাইব্রেরীতে বসিয়া পড়া-শুনা করিতেন তাহার প্রমাণ আছে। সম্রাট হুমায়ুন্ তো লাইব্রেরীর সিঁড়িতে পা পিছ্লাইয়া পড়িয়াই মারা যান্।

মধ্যযুগে সমগ্র য়ুরোপ যখন অজ্ঞানতার অন্ধ তিমিরে আচ্ছন্ন তখন শুধু তাহার সংঘাশ্রমগুলিতেই জ্ঞানের বর্ত্তিকা মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিত—এই সংঘাশ্রমগুলিই মধ্যযুগের লাইব্রেরীর কাজ করিত। সংঘের সভ্যেরা প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে পড়াশুনা করিতে বাধ্য হইতেন—ইহাই ছিল সংঘের নিয়ম। মূল্যবান ধর্ম্মগ্রন্থগুলি লিখিয়া নকল করিয়া সংঘের পুস্তকসম্পদ সমৃদ্ধ করাও ইঁহাদের অন্যতম কর্ত্তব্য ছিল; ইহাতে আশ্রম-জীবনের কঠোরতারও কতকটা লাঘব হইত। এই হাতে-লেখা পুঁথিগুলিকে ইঁহারা এত মূল্যবান মনে করিতেন যে সকলে তাহা ব্যবহারের অনুমতি পাইত না—সে-সৌভাগ্য যাঁহাদের ছিল, তাঁহাদেরও অনেক কঠোর নিয়ম মানিয়া চলিতে হইত। কোনো কোনো পুস্তকের প্রথমেই লেখা থাকিত—

"যে-কেহ এই পুস্তক পাঠ করিবে, অত্যন্ত যত্নে ও সাবধানে সে ইহার পাতা উল্টাইবে এবং ভগবান ঈশা যাহা করিতেন শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে তাহাই অনুকরণ করিবে। তিনি অতি সাবধানে গ্রন্থখানি খুলিয়া মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতেন এবং পাঠ শেষ হইলে শ্রদ্ধায় তাহা ধীরে ধীরে জড়াইয়া সংঘ-কর্ত্তার হাতে প্রদান করিতেন।

"তোমার আঙুলগুলি কখনও আমার লেখার উপর রাখিও না। এক একটি করিয়া প্রত্যেকটি অক্ষর ধরিয়া ধরিয়া লিখিতে যে কত কষ্ট ও ধৈর্য্যের প্রয়োজন, তাহা



সেণ্ট্ জেরোম-এর লাইব্রেরী।
খৃষ্টীয় সাধু জেরোম তাঁহার লাইব্রেরীতে বসিয়া পুঁথি নকল এবং হিব্রুভাষা অধ্যয়ন করিয়া দিন কাটাইতেন।

তুমি বুঝিবে না। লিখিতে লিখিতে পিঠ ধরিয়া যায়, দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া আসে, বুকের ছাতি ও পাকস্থলী বেদনায় পীড়িত হইয়া পড়ে।"



ষোড়শ শতাব্দীর চর্চ্চ্‌-লাইব্রেরী
জার্ম্মাণীর জাটফেন সহরের সেন্ট-পীটার
গির্জ্জার লাইব্রেরী

মানুষের দানে, ভক্তের অর্থে এবং নিজেদের কঠোর পরিশ্রমে মধ্যযুগের য়ুরোপে এক একটা লাইব্রেরী গড়িয়া উঠিত; কোথাও কোথাও সংগ্রহ এত অধিক হইত যে, সংঘাশ্রমে তাহার স্থান হইত না, পৃথক গৃহ নির্ম্মাণের প্রয়োজন হইত। মধ্যযুগের অবসানে নবোদ্বোধন যুগের প্রারম্ভে বিশ্ববিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা ক্রমেই প্রসার লাভ করিতে লাগিল এবং যে-দিন মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কৃত হইল সে-দিন লাইব্রেরীর জীবন-কথার এক নবযুগ আরম্ভ হইল। সে-কথার বিবৃতি এ-প্রবন্ধে নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

সাহিত্যিক জালিয়াতি

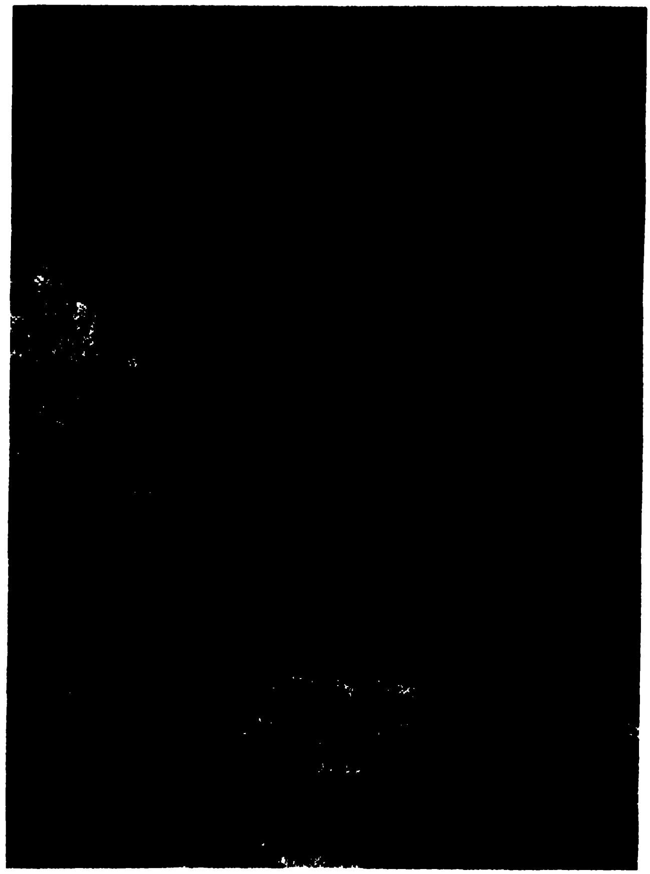
সাহিত্যক্ষেত্রে ছদ্মনাম অনেকেই গ্রহণ করিয়া থাকেন নিজের সত্য-পরিচয় গোপন রাখিবার জন্য। অনেক সময় হয়ত ছদ্মনামের আড়ালেই তাঁহারা পাঠকসমাজে সমধিক আদৃত ও পরিচিত হন,—আমাদের আধুনিক বাঙ্‌লা সাহিত্যে যেমন "বীরবল"। প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের অপেক্ষাও "বীরবল" যে অধিক পরিচিত এ কথা বাঙালী পাঠকমাত্রেই স্বীকার করিবেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও এক সময় "ভানুসিংহ" নামক কল্পিত বৈষ্ণব-কবির ছদ্মনামের আশ্রয় লইয়াছিলেন,—সেই নামের আড়ালেই "ভানুসিংহের পদাবলী"র সৃষ্টি। ভানুসিংহ যে রবীন্দ্রনাথ এ-খবর অনেকদিন পর্য্যন্ত এতটা অজ্ঞাত ছিল যে, হাইড্রাবাদের ডক্টর নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে ভানুসিংহকে শ্রেষ্ঠতম বলিয়া ধরিয়া লইয়া যে-প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন তাহা কোনো জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ সমাদর লাভ করে। এগুলি অবশ্য সাহিত্যিক জালিয়াতি নহে—ধাঁধা মাত্র।

কিন্তু আজ যদি কেহ এ-কথা প্রচার করে যে, আমি মাইকেলের একখানি অপ্রকাশিত মহাকাব্য কিংবা বঙ্কিমচন্দ্রের একখানি অপ্রকাশিত উপন্যাস আবিষ্কার করিয়াছি, এবং এই বলিয়া নিজের লেখাই চালাইয়া দিতে প্রয়াসী হন, তাহা হইলে লোকে প্রথম বিস্ময়ের আগ্রহাতিশয্যে সেই নবাবিষ্কৃত কাব্যের এবং উপন্যাসের জন্য খুব একটা অসম্ভব রকমের মূল্য দিতেও কুণ্ঠিত হইবে না। অর্থ বা সাময়িক খ্যাতির লোভে সাহিত্যে এই রকম ব্যাপার আমাদের দেশে না হইলেও পাশ্চাত্য দেশে খুব বিরল নহে। এই সাহিত্যিক জালিয়াৎদের কুহকে ও কৌশলে পড়িয়া মানুষ যে কি রকম বোকা বনিয়া যায় এবং আপন বুদ্ধি ও অর্থকে লইয়া ছিনিমিনি খেলে তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়।

১৭৯৬ খৃষ্টাব্দের কথা। বিখ্যাত ইংরেজ বাগ্মী শেরিডান্ একদিন তাঁহার এক বক্তৃতায় সেক্স্‌পীয়রের একখানা অজ্ঞাত অপ্রকাশিত নাটক আবিষ্কারের সংবাদ জ্ঞাপন

করিলেন এবং ইতিমধ্যেই যে আবিষ্কর্তা ও পুস্তকবিক্রেতা স্যামুয়েল আয়র্‌ওকে তাহার মূল্য বাবদ আটশত পাউণ্ড দেওয়া হইয়া গিয়াছে তাহাও বলিলেন। সমস্ত লণ্ডন এই খবর শুনিয়া ক্ষেপিয়া উঠিল। স্থির হইল যে নূতন আবিষ্কৃত নাটকখানি (Vortigern and Rowene) অভিনীত হইবে এবং প্রথম ষাট রজনীর লাভের অর্দ্ধাংশ স্যামুয়েলকে দেওয়া হইবে। কিন্তু একজন অভিনেত্রী প্রথম হইতেই এ-নাটক যে কখনো সেক্স্‌-পীয়রের লেখা হইতে পারে না এমন সন্দেহ করিয়া অভিনয় করিতে অস্বীকৃত হন এবং আর একজন প্রধান অভিনেতা প্রকাশ্যে তাঁহার সন্দেহ জ্ঞাপন করেন, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহাকে প্রধান নায়কের ভূমিকাতেই রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতে হয়। লেখার ধরণ দেখিয়া শেরিডানেরও সন্দেহ হইয়াছিল, কিন্তু হস্তলিপির আকৃতি ও পাণ্ডুলিপির কাগজের পুরাতন হল্‌দে রঙ্‌ দেখিয়া তিনি নাটকখানিকে সত্য সত্যই সেক্স্‌পীয়রের লেখা বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন। অভিনয় যখন সুরু হইল, উৎসুক জনসাধারণ প্রথম খুব মন দিয়াই শুনিল, কিন্তু ফাঁকি বেশীক্ষণ চলিল না। সেক্স্‌পীয়রের নাটকাভিনয়দর্শনে অভ্যস্ত, তাঁহার লেখার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত দর্শকদল শীঘ্রই ভুল বুঝিতে পারিল এবং উন্মত্ত বিদ্রূপ ও কোলাহলে নাট্যশালা মুখরিত করিয়া তুলিল। শেরিডান্‌ বুঝিলেন একটা পুস্তকবিক্রেতা তাঁহাকে ভীষণ প্রতারণা করিয়াছে। কিন্তু সেই পুস্তক-বিক্রেতারও বিশেষ কিছু অপরাধ ছিল না। বড় বড় মহারথীরাই তাঁহার আগে এই রকম একটা মস্ত ফাঁকিকে সত্য বলিয়া চালাইয়া দিয়াছিলেন। কিছুদিন আগে কতকগুলি জাল চিঠিপত্র ও দলিল সেক্স্‌পীয়রের লেখা ও রচনা বলিয়া য়ুরোপের সর্ব্বত্রই অত্যন্ত সমাদরে পঠিত ও গৃহীত হইয়াছিল এবং সে-গুলির সত্যতা সম্বন্ধে পণ্ডিতসমাজ এত নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, পণ্ডিত বস্‌ওয়েল্‌, ডক্টর ভ্যার্লি, ডক্টর পার্‌, হারকোর্ট ক্রফ্‌ট্‌ এবং রাজকবি প্যাই স্মিথ্‌ সকলে মিলিয়া ঐ চিঠিপত্র ও দলিলগুলির সত্যতা ও যাথার্থ্য সম্বন্ধে তাঁহাদের বিশ্বাস জ্ঞাপন করিয়া এক বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছিলেন।

যদি বলি শেরিডান্‌ কিংবা পণ্ডিত বস্‌ওয়েল্‌ ও তাঁহার বন্ধুবর্গ অত্যন্ত অদ্ভুত রকমে বোকা বনিয়া গিয়াছিলেন, তাহা হইলে মাইকেল চেস্‌লেস্‌কে যে কি বলিব ভাবিয়া পাই না। এই ফরাসী পণ্ডিত ও বিজ্ঞানবীর এবং ফরাসী বিজ্ঞান-সভার সদস্য ছ'হাজার পাউণ্ড খরচ করিয়া প্রায়



আধুনিক চীনা লাইব্রেরী
হ্যাংচৌ সহরে এই লাইব্রেরী হইতে চীনা কেতাব পাঠককে পড়িবার জন্য ধার দেওয়া হয়

২৭৩৪০ খানি জাল চিঠি ক্রয় করিয়াছিলেন। চেস্‌লেস্ একবার বিজ্ঞান-সভায় একটি মৌলিক প্রবন্ধ পাঠ করিবার সঙ্কল্প করেন—তাঁহার বক্তব্য বিষয় ছিল যে "মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির"র সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কারক নিউটন নহেন; তাঁহার আগে বৈজ্ঞানিক প্যাস্‌ক্যাল্ প্রথম এই আবিষ্কার করেন। ভ্রেইন্ ল্যুকাস্ নামে একব্যক্তি পূর্ব্বাহ্নেই চেস্‌লেস্-এর এই বক্তব্যের খবর পায় এবং চেস্‌লেস্‌কে আসিয়া বলে যে, তাহার কাছে রবার্ট বয়েলকে লেখা প্যাস্‌ক্যাল-এর অনেক চিঠি আছে এবং সেই চিঠিগুলি চেস্‌লেস্-এর আবিষ্কারের সমর্থন করে। চেস্‌লেস্ আহ্লাদে আটখানা হইয়া সবগুলি চিঠিই অসম্ভব মূল্যে ক্রয় করেন এবং ফরাসী বিজ্ঞান-সভাও সেই চিঠিগুলি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাহার পর হইতে চেস্‌লেস্ ল্যুকাসের নিকট হইতে ক্রমাগত চিঠির পর চিঠি কিনিতেই লাগিলেন,—এরিস্‌টাইডিস্‌কে লেখা দিগ্বিজয়ী আলেক্‌জান্দারের চিঠি, হুনবীর য়্যাটিল্লার চিঠি, গ্যয়টের চিঠি, দান্তের চিঠি, রাবেল্যের চিঠি, সেক্স্‌পীয়রের চিঠি, চতুর্দ্দশ লুইয়ের চিঠি—চিঠির যেন স্রোত। ল্যুকাসের জালিয়াতি অবিশ্রান্ত চলিতে চলিতে অবশেষে একদিন সব ধরা পড়িয়া গেল। ল্যুকাস্ কি করিয়া চিঠিপত্র জাল করিতেন তাহা জানাজানি হইয়া গেল। ফ্লরেন্স হইতে গ্যালিলিও-র লেখা চিঠি জাল বলিয়া প্রমাণিত হইল; এবং ল্যুকাসের দিনও ফুরাইল—পারীর কারাকক্ষে তাহার জীবনের শেষ দিনগুলি কাটিল। কিন্তু পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ (?) সাহিত্যিক-জালিয়াৎ বলিয়া আজও তাহার নাম বাঁচিয়া আছে।



কায়্‌রোর এক লাইব্রেরী

ল্যুকাস্ শুধু অর্থের লোভে এত বড় প্রতারণার ফাঁদ পাতিয়া বসিয়াছিল এবং কারাকক্ষে সে তাহারই শাস্তি লাভ করিয়াছিল, কিন্তু তরুণ কবি হতভাগ্য চ্যাটার্‌টন্ যেমন করিয়া আপন জীবনের অবসান করিলেন তাহা ভাবিয়া সত্যই অন্তর ব্যথিত হয়। চ্যাটার্‌টন্ খুব অল্পবয়সেই সুন্দর কবিতা লিখিতে পারিতেন, কিন্তু কবিতা লিখিয়া কিছুতেই নিজের নামে প্রকাশ করিতেন না—করিতেন পঞ্চদশ শতাব্দীর রাউলে (Rowley) নামক এক কল্পিত সংঘভিক্ষু'র নামে। সকলেই জানিত পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি রাউলের লেখা আজ এতদিন পরে পাঠক- সমাজের গোচর হইতেছে। চ্যাটার্‌টন্ তখনও সতেরো বৎসর অতিক্রম করেন নাই; ইতিমধ্যেই তাঁহার 'রাউলে' কবিতার খ্যাতি নানান্ দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। কিন্তু ইহাতেও তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। ইহার কয়েক দিন পরে চ্যাটার্‌টন্ হরেস্ ওয়াল্‌পোলের কাছে

তাঁহার কল্পিত কাব্য Rowley'র "Anecdotes of Painting in England" বইয়ের পাণ্ডুলিপি পাঠাইয়া দিয়া বলিলেন যে, তাঁহার কাছে রাউলের আরও অনেক লেখা ও কবিতা এখনও আছে। কৌতূহলী ওয়াল্‌পোল্ তাহা সব চাহিয়া পাঠাইলেন এবং চ্যাটার্‌টন্‌ও আপত্তি করিলেন না। কিন্তু ওয়াল্‌পোলের সন্দেহ সজাগ হইয়া উঠিল—পরীক্ষার জন্য তিনি কবি ম্যাশন্ ও গ্রে-কে ডাকিয়া পাঠাইলেন; তাঁহারা কবিতাগুলি জাল বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। ওয়াল্‌পোল্ ক্রুদ্ধ হইয়া অত্যন্ত গালাগালি বর্ষণ করিয়া পাণ্ডুলিপিখানি চ্যাটার্‌টন্‌কে ফেরৎ পাঠাইলেন। তাহার কয়েক মাস পরেই নিজের জীবনের উপর বিতৃষ্ণায় ১৮ বৎসর বয়সের পূর্ব্বেই চ্যাটার্‌টন্ সে-জীবন নিঃশেষ করেন। মৃত্যুর পর তাঁহার অমর গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। আজ কবিসমাজ মুক্তকণ্ঠে এই কথা বলিয়া থাকেন, যে হতভাগ্য চ্যাটার্‌টনের মতো স্বচ্ছ ও সরস কবিপ্রতিভা তাঁহার সমসাময়িক কবিদিগের মধ্যে আর কাহারও ছিল না; নিজের নামে লেখা কবিতা হয়ত আদৃত না হইতে পারে এই ভয়েই তিনি প্রাচীন একটা ছদ্মনামের আড়ালে আশ্রয় লইয়াছিলেন, কিন্তু সে-প্রয়োজন তাঁহার কিছুমাত্র ছিল না, আপন গরিমায় তিনি আপনি উজ্জ্বল হইয়া ফুটিতে পারিতেন।

শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

কাইজার শিল্প-মন্দির

জর্ম্মণ-প্রজাতন্ত্র জার্ম্মাণীর শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী রাজবংশকে উচ্ছেদপূর্ব্বক, তাহার সর্ব্বশেষ সম্রাটের একরাটত্বের অবসান করিয়া, হোহেন্‌জোলারেন্ (Hohenzollern) বংশের একচ্ছত্রাধিপত্যের শেষ স্মৃতিটুকুও মাটীর ধূলায় মিশাইয়া দিয়াছে। কিন্তু বার্লিন সহরে যে প্রাসাদের সঙ্গে এই রাজবংশের বহুদিনের ইতিহাস বিজড়িত, যাহার মধ্যে তাহার ও জর্ম্মণীর শ্রেষ্ঠ বিলাস ও ঐশ্বর্য্যের লীলা বহুদিন অভিনীত হইয়া আসিয়াছে, জর্ম্মণ-প্রজাতন্ত্র আজ সেই রাজ-প্রাসাদকেই তীর্থ-দেবতার মন্দিরের মত সযত্নে ও সমাদরে সকল অবহেলার ও ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। ভূতপূর্ব্ব কাইজারের রাজ-প্রাসাদ আজও জর্ম্মণীর, তথা সমগ্র য়ুরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্প-মন্দির হইয়া উঠিয়াছে। যাহা কিছু প্রাচীন,

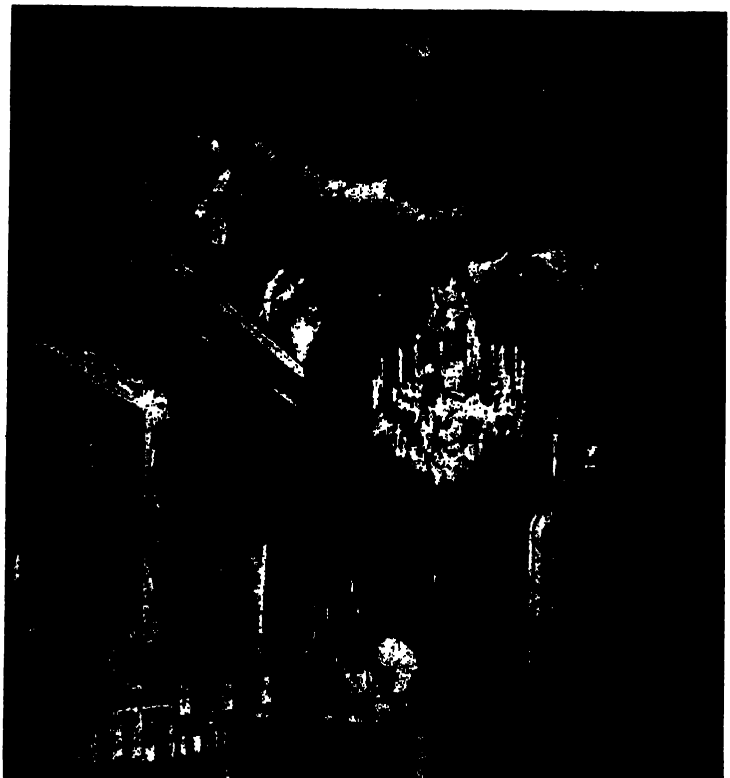


পোপের ভ্যাটিকান্-প্রাসাদের লাইব্রেরী।

১৪৪৭ খৃষ্টাব্দে পোপ নিকোলাস নয় হাজার হস্তলিখিত পুঁথি লইয়া এই লাইব্রেরীর পত্তন করেন। বর্ত্তমানে এখানে একত্রিশ হাজার হস্তলিখিত লাটিন পুঁথি, আট হাজার গ্রীক ও প্রাচ্য ভাষায় লিখিত পুঁথি ও চারি লক্ষ বহু-মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ আছে।

যাহা কিছু রাজকীয় ঐশ্বর্য্যের পরিচায়ক, যে-সৌন্দর্য্যকে রাজৈশ্বর্য্য পরম সমাদরে লালন করিয়াছে, জর্ম্মণ-প্রজাতন্ত্র আজ তাহাকেই শিল্প ও ইতিহাসের সামগ্রী করিয়া তুলিতে চাহিতেছে। বার্লিন্ রাজ-প্রাসাদের এক একটি কক্ষ আজ জর্ম্মণ-ইতিহাসের এক একটি পৃষ্ঠা।

বিদ্রোহে, বিপ্লবে, যুদ্ধ-ঝঞ্ঝাঘাতে জর্ম্মণীর অনেক প্রাসাদ, সুবৃহৎ প্রাচীন অট্টালিকা লয় পাইয়াছে; কিন্তু বার্লিনের এই বিরাট রাজ-প্রাসাদ পাঁচ পাঁচটি শতাব্দীর নানা শিল্প-সম্ভারে আপনাকে সমৃদ্ধ করিয়া আজও দাঁড়াইয়া আছে। ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় ফ্রেড্রিকের রাজত্ব কালে ইহার প্রথম প্রতিষ্ঠা। তখন উহা যুবরাজের আবাস মাত্র ছিল। রাজ-প্রাসাদের সম্মান লাভ ইহার ঘটিল অনেক পরে, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে,—দ্বিতীয় উইলিয়ম্ যখন কাইজার হইয়া জর্ম্মণীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহার ঐশ্বর্য্য-বিলাসী চিত্ত বহু শতাব্দীর গৌরবমণ্ডিত এই প্রাসাদের অভ্যন্তরটিকে অপরূপ শিল্প-সুষমা ও সৌন্দর্য্যে সজ্জিত ও অলঙ্কৃত করিল।



রাজ্যচ্যুত কাইজারের পাঠাগার—ঘরের মধ্যস্থিত প্রকাণ্ড টেবিলটি নেলসনের যুদ্ধজাহাজ "ভিক্টরীর" কাঠ হইতে প্রস্তুত

কত শিল্পী পুরুষানুক্রমে যে, এই রাজ-প্রাসাদের দেয়ালে ও দরজায়, ছাতে ও কক্ষে তাহাদের শিল্প-প্রতিভার বিভিন্ন রূপ ও ধারার অনপনেয় চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহার সারি সারি কক্ষ, সুদূরবিসর্পী অলিন্দ-শ্রেণীর ভিতর দিয়া একবার পাদচারণা করিলে কত বিভিন্ন যুগের ইতিহাস, কত স্থপতির বিভিন্ন শিল্পরূপের নিদর্শন যে মন ও চক্ষুকে অভিভূত করে, তাহার কোন সীমা নাই।

কাইজারের হল্যাণ্ড-নির্ব্বাসনের পর হইতেই এই বিরাট রাজ-প্রাসাদের এক অংশ একটি সুদৃশ্য ও সুবৃহৎ ম্যুজিয়মে রূপান্তরিত করা হইয়াছে। তাহার পরিচালনার ভার লইয়াছেন অধ্যাপক হারম্যান্ স্মিট্। আজ জর্ম্মণীর প্রজাতন্ত্র গবর্ণমেণ্ট জর্ম্মণীর বর্ত্তমান, অদূর ও সুদূর ভবিষ্যতের হাতে এই বিরাট ঐতিহাসিক ঐশ্বর্য্য ও শিল্প-সম্পদ জাতির নামে শ্রদ্ধার ও ভালবাসায় উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন। বহু পুরাণো পুঁথি ও দলিল, চিত্র ও ভাস্কর্য্য ইঁহারা আবর্জ্জনার স্তূপ হইতে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন; বিভিন্ন সম্রাটের খামখেয়ালিতে এখানে

সেখানে কোনো কক্ষের যে-বিভাগ ঘটিয়াছিল, সে-গুলিকে দূর করা হইয়াছে, যে-চিত্র ধূলায় মলিন ও অযত্নে অনাদরে হৃতসৌন্দর্য্য হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদিগের নষ্ট সৌন্দর্য্যের পুনরুদ্ধার করা হইয়াছে, যাহা পরহস্তগত হইয়াছিল, যতদূর সম্ভব তাহার পুনরুদ্ধার হইয়াছে। উনিশটি কক্ষকে তাহাদের মূল ও প্রাচীন রূপ দান করিয়া শিল্প ও ইতিহাসের লুপ্ত স্মৃতি ও সৌন্দর্য্য আবার ফিরিয়া পাওয়া গিয়াছে।

গথিক্-স্থাপত্যের সুষ্ঠু নিদর্শন "ইরেস্‌মাস্ চ্যাপেল" (Erasmus Chapel—১৫৫০ খৃষ্টাব্দে প্রথম নির্ম্মিত) কত সম্রাটের কত খেয়ালে কত রূপে রূপান্তরিত হইয়া আজ তাহার পূর্ব্বরূপ ফিরিয়া পাইয়াছে। গ্রীক-স্থাপত্যের নিদর্শন আর একটি গৃহ, সেটিও কাইজারের খেয়ালে তাহার গ্রীক ছাঁচ হারাইয়া ফেলিয়া একটা কিম্ভূতকিমাকার রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। আজ সেও তাহার আদিম কলেবর পুনরায় ধারণ করিয়াছে। কাইজার যে-ঘরে বসিয়া লেখা পড়া করিতেন, সে-ঘরটি বাইজেণ্টীয় স্থাপত্যের রীতি অনুযায়ী নির্ম্মিত। এই ঘরের মধ্যস্থলে একটি সুদৃশ্য লিখিবার টেবিল। এই টেবিলটি বিজয়ী বীর নেল্‌সনের "ভিক্‌ট্রী" জাহাজের মাস্তুলের কাঠে তৈরী এবং লণ্ডনের "হ্যারিঙ্‌ য়্যাণ্ড্‌ গিলো" (Warring and Gillow) কোম্পানী কর্ত্তৃক কাইজারকে উপহৃত হয়।

এমনি করিয়া হোহেন্‌জোলার্নের রাজ-প্রাসাদ আজ সমগ্র জর্ম্মণ-জাতির শিল্প-মন্দিরে পরিণত হইয়াছে। যে-গৃহে ক্ষমতার অধীশ্বর, প্রবল প্রতাপী কাইজার বাস করিতেন, যে-গৃহ তাঁহার দর্পিত পদবিক্ষেপে কম্পিত হইত, যে-গৃহ তাঁহার বিলাস ও ঐশ্বর্য্যের লীলাভূমি ছিল, সে-গৃহ আজ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধায় নহে, শিল্প ও ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধায় ও অনুরাগে সমগ্র জর্ম্মণ জাতির তীর্থ-মন্দির হইয়া উঠিয়াছে; সেখানে অতি দীনতম প্রজারও আজ অবারিত দ্বার,—এক জনের ঐশ্বর্য্য ও ভালবাসার আলিঙ্গনে নয়, সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধা ও প্রীতির পুষ্পাঞ্জলিতে সে-মন্দির আজ পূত ও পবিত্র।

শ্রীনীহার রঞ্জন রায়



কাইজার-মহিষীর চা-পানের কক্ষ।

চীন-ভাষার মুক্তিদাতা

পঁচিশ বৎসর বয়সের এক তরুণ যুবক আমেরিকা হইতে পাঠ সমাপন করিয়া যখন জন্মভূমি চীনে ফিরিয়া আসিল—তখন ইংরেজী ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ। দুই বৎসর পর, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে, সাংঘাই-এর শ্রেষ্ঠ সাপ্তাহিক *(Millard's Weekly Review)* চীনের শ্রেষ্ঠ বারোজন মনীষির নাম করিবার জন্য সমস্ত গ্রাহক ও পাঠকবর্গকে আহ্বান করিল। হু-সি (Hu-Shih) এই শ্রেষ্ঠ বারোজন মনীষির মধ্যে অন্যতম বলিয়া উল্লিখিত হইলেন—তখন তাঁহার বয়স মাত্র ২৭ বৎসর এবং তাহার আগে তিনি সুদীর্ঘ সাত বৎসর স্বদেশ হইতে সুদূর আমেরিকায় কাটাইয়া আসিয়াছেন। ত্রিশ বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতেই নবীন চীন তাঁহাকে মন্ত্রগুরুর আসনে বসাইয়া দিল এবং পঁয়ত্রিশ বৎসরের পূর্ব্বেই দুইবার তাঁহাকে শিক্ষা-মন্ত্রীর আসনে আহ্বান করিল, যদিও দুইবারই তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। গত কয়েক বৎসরের

মধ্যে তিনি বার বার আমেরিকার হার্ভার্ড, পেন্‌সিল্‌ভেনিয়া, কলম্বিয়া প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করিবার জন্য আহূত হইয়া গিয়াছেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের মাঞ্চু রাষ্ট্রবিপ্লব কিংবা আজিকার চীনের রাষ্ট্রীয় জাগরণ চৈনিক ইতিহাসের অপূর্ব্ব তথ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু তরুণ যুবক 'হু-সি' বহুদিনের পুঞ্জীভূত জড়তার জঞ্জালে অগ্নিসংযোগ করিয়া চীন ভাষা ও সাহিত্যে যে বিপ্লব আনয়ন করিয়াছেন এবং সুদীর্ঘ কালের অক্লান্ত পরিশ্রমে তাহাকে জয়যুক্ত করিয়াছেন, তাহা চীনের নব অভ্যুদয়ের ইতিহাসে কোনো রাষ্ট্রীয় তথ্য বা ঘটনার অপেক্ষাই কম মূল্যবান্ নহে।

দশ বৎসর আগেও চীনের বিদ্যার্থীরা এমন একটা ভাষা শিখিত, এমন একটা ভাষাকে আশ্রয় করিয়া চীনের বিরাট্ সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, দুই হাজার বৎসর ধরিয়া যে-ভাষায় লোকে কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। তাহার কোনো প্রাণ ছিল না, প্রাচীন প্রবীণ চীনের দুই হাজার বৎসরের পুরাতন ভাষা নবীন চীনের মন ও চিত্তকে আর তৃপ্তি দিতে পারিতেছিল না। যে ভাষা নবীন চীনের মুখের ভাষা, বুকের ভাষা ছিল তাহাকে আশ্রয় করিয়া অনেক গাথা, অনেক গল্প, অনেক নাটকই রচিত হইতেছিল, কিন্তু শিক্ষিত সমাজে তাহাদের



হু-সি—চীনা ভাষার মুক্তিদাতা

কোনো সমাদর বা প্রতিপত্তিই ছিল না। এই জড়তার ও সংস্কারের সুকঠিন প্রাচীরকে ধ্বংসের ধূলায় লুটাইয়া দিলেন 'হু-সি' ও তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায়। নবীন চীনের মুখপত্রের ভিতর দিয়া তিনি তাঁহার বিদ্রোহের বাণী ঘোষণা করিলেন—"প্রাচীনের অনুকরণ ও অনুবর্ত্তন তোমরা কেহ কখনো করিও না। যাহা কিছু লিখিবে, তাহার প্রত্যেকটি কথায়, প্রত্যেকটি ভাবে এমন জিনিস থাকা চাই যাহা কেহ কখনো লেখে নাই, বলে নাই, ভাবে নাই; তাহার কথা হইবে নূতন, ভঙ্গিমাও হইবে নূতন। প্রাচীন ভাষায়, প্রাচীন ভঙ্গিমায় যাহারা সাহিত্য সৃষ্টি করে তাহারা নূতন করিয়া কিছু ভাবিতে বা বলিতে জানে না, তাহারা জড়, তাহারা অথর্ব্ব, দুর্ব্বল ও চিন্তাবিমুখ।"

হু-সির কবি-চিত্ত, কবি-ভাষা নবীন চীনের চিত্তকে সহজেই স্পন্দিত করিল, তাঁহার আহ্বান তরুণ চিত্তকে একেবারে আপনার কাছে টানিয়া আনিল। শিক্ষিত পরিবারে তাঁহার জন্ম, ভবিষ্যৎ সাহিত্য-সাধনার স্বপ্নে তাঁহার চিত্ত বিভোর—আবেষ্টনের এই সংস্কার ও বাল্যের এই স্বপ্ন শৈশবেই তাঁহার ভবিষ্যৎকে নানান্ রঙিমায় রাঙাইয়া তুলিয়াছিল। পনেরো বৎসর বয়স হইতেই

শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

তিনি সাংঘাই-এর মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় লিখিতে সুরু করেন, কিন্তু ধীরে ধীরে তিনি চীনের প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি এত বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতেছিলেন যে, সাহিত্যের ভিতর দিয়া চীনের নব অভ্যুদয়ের আশা ক্রমেই তাঁহার হৃদয় হইতে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল। শেষে তিনি যখন আমেরিকায় কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতে গেলেন তখন তাঁহার পাঠ্যবিষয় হইতে সাহিত্য নির্ব্বাসন লাভ করিল এবং তিনি কৃষিবিদ্যা শিখিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু সাহিত্য তাঁহার চিত্তকে এমন করিয়া অভিভূত করিয়াছিল যে, তিনি তাহার মায়া একেবারে কাটাইয়া উঠিতে পারিলেন না। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে চীনের সাধারণের কথ্য ভাষায় কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিলেন, চীনা ছাত্রদের পরিচালিত মাসিকের সম্পাদক হইলেন, এবং প্রাচীন চীনের ধর্ম্ম ও দর্শন ঘাঁটিয়া সর্ব্বজীবে প্রীতি ও প্রেমই যে জাতিতে জাতিতে সংগ্রাম ও সংঘাতের একমাত্র প্রতিকার তাহা প্রমাণ করিয়া এক অপূর্ব্ব প্রবন্ধ রচনা করিলেন—আমেরিকার সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিযোগিতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার তাঁহাকে প্রদত্ত হইল। এবং সর্ব্বশেষে "Role of Logic in Chinese Philosophy" সম্বন্ধে মৌলিক এক প্রবন্ধ রচনা করিয়া তিনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডক্টর' উপাধি লাভ করিলেন।

পিকিঙ্ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ম্ম ও দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক হইয়া হু-সি দেশে ফিরিলেন। ইহার পর হইতেই পঁচিশ বৎসর ধরিয়া, আজ পর্য্যন্ত পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় চীনের নব জাতীয় জাগরণের কেন্দ্র হইয়া আছে। 'হু-সি' নব উৎসাহে তাঁহার ভাষা ও সাহিত্যের আন্দোলন চালাইতে আরম্ভ করিলেন—আগুনের মত তাহা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। সাংঘাই ও পিকিঙ-এর সমস্ত সাময়িক পত্র এই নূতন ভাষা ও সাহিত্যের নব স্রোতে আপনাদের গা' ভাসাইয়া দিল, নূতন কথ্য ভাষায় (পাই-হুয়া) বিদেশের সাহিত্য অনূদিত হইতে লাগিল, ছোট ছোট সাময়িক পত্র এই ভাষায় লিখিত ও মুদ্রিত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে চীনের জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ প্রাথমিক শিক্ষার এই ভাষার প্রবর্ত্তন করিলেন এবং ১৯২০ খৃষ্টাব্দে শিক্ষামন্ত্রীর আদেশে সমস্ত পাঠ্যপুস্তক এই 'পাই-হুয়া'তে লেখা সুরু হইল। হু-সি'র চীনে প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে-আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল, তিন বৎসর যাইতে না যাইতেই সে আন্দোলন বিজয়লক্ষ্মীর বরমাল্যে আপন কণ্ঠ অলঙ্কৃত করিল।

সঙ্গে সঙ্গে চীন ভাষা ও সাহিত্যের এক নূতন উৎস খুলিয়া গেল। সাধারণের অবোধ্য চীনা ভাষা ও সাহিত্য দিনমজুর ও রাস্তার ভিখারীর পক্ষেও সহজ এবং সুখপাঠ্য হইয়া উঠিল। যে-ভাষার হাজার হাজার বর্ণমালা শিখিতে শিক্ষার্থীর প্রাণান্ত হইত, আজ অতি সহজে একটুমাত্র নির্দ্দেশে সে-ভাষাকে সে আয়ত্ত করিতে শিখিল। ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই যে বিপ্লব, এই বিপ্লবই ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ছাত্র-বিদ্রোহে রূপান্তর লাভ করিয়া এক চীনা মন্ত্রী-সভাকে উল্টাইয়া দিয়াছিল এবং প্যারীতে চীন প্রতিনিধিদিগকে ভার্সাই সন্ধিপত্রের স্বাক্ষরে অসম্মতি জানাইতে বাধ্য করিয়াছিল। ইহার মূলে ছিলেন 'হু-সি'।

হু-সি নবীন চীনের অগ্রদূত, কিন্তু অতীত চীনের জ্ঞান বিজ্ঞানকে অতি শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা করিয়াছেন এবং তাহার বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও অনুসন্ধানের পথ সর্ব্বপ্রথম তিনিই দেখাইয়াছেন। সেই জন্যই প্রাচীন চীনের যাহারা মুখপাত্র, তাহারা সকলেই হু-সিকে শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখিয়া থাকেন।

আজ নবীন চীন রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। হু-সি তাহা হইতে দূরে সরিয়া আছেন—রাষ্ট্রীয় আন্দোলন তাঁহার চিত্তকে কখনও উদ্বুদ্ধ করে নাই। কিন্তু চীনের নবীন চিত্ত শ্রদ্ধায় তাঁহার নাম উচ্চারণ করে এবং রাষ্ট্রীয় কোলাহলের মধ্যেও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতার পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতে ভুলে না। হু-সি এই বিশ্বাসে আজ দুই বৎসর যাবৎ নীরবে সাধনায় রত আছেন, যে, প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে আজিকার এই সংঘাত কিছুতেই চিরকালের সামগ্রী হইয়া থাকিবে না, একদিন উভয়কেই 'মহামানবের সাগর তীরে' দাঁড়াইয়া মিলনমন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইবে।

শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

সঙ্কলন

ফরাসী সাহিত্য

জ্যৈষ্ঠের "মাসিক বসুমতী"তে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় ফরাসী সাহিত্য সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন; ইহাতে তিনি বাঙালীকে ফরাসী সাহিত্যের সম্যক্ চর্চ্চা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। প্রমথবাবু বলেন, "বাংলা ভাষার সঙ্গে ফরাসী ভাষার আকৃতিগত একটা মিল আছে। উভয় সরস্বতীই কৃশাঙ্গী। উক্ত কারণে ইংরাজদের ধারণা যে style-এর ঐশ্বর্য্য, শব্দের প্রাচুর্য্যের উপর নির্ভর করে। আমরা ইংরাজের শিষ্য, তাই আমরা যখন বাংলা ভাষার দারিদ্র্যের জন্য দুঃখ করি, তখন আমরা ইংরাজী ভাষার শব্দসম্ভারের দিকে নজর দিয়েই মাতৃভাষার দৈন্যের কথা ভেবে নিরাশ হই। এখন যে ভাষার অসংখ্য কথা আছে, সে ভাষার সাহিত্য অমিতভাষী হয়ে উঠে। অপর পক্ষে যার হাতে সে ঐশ্বর্য্য নেই সে মিতভাষী হতে বাধ্য। "ফরাসী-গদ্যের প্রধান গুণ এই যে, সে গদ্য সংযতভাষী"। ... "ফরাসী সাহিত্য শব্দাড়ম্বরে ভারাক্রান্ত নয় বলে অনেকে মনে করেন, ইংরাজী সাহিত্যের তুল্য এ সাহিত্যের গৌরব নেই। গৌরবের অর্থ যদি হয় গুরুভারাক্রান্ত, তা'হলে অবশ্য ফরাসী সাহিত্য ইংরাজী সাহিত্যের তুলনায় লঘু, অসি যেমন লগুড়ের চাইতে লঘু। আমি চাই যে বাংলা গদ্য এই হিসেবে লঘু হয়। তাতে তার ক্ষিপ্রতা ও তীক্ষ্ণতা বাড়বে, এ সাহিত্য-সাধনার উপযুক্ত উত্তর-সাধক হচ্ছে ফরাসী সাহিত্য।"

প্রমথবাবুর মতে ফরাসী সাহিত্যের আর একটি প্রধান গুণ হইল প্রসাদ-গুণ। এ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "ফরাসী গদ্য শুধু জলবত্তরল নয়, জলবৎ স্বচ্ছ। এ স্বচ্ছতা আসলে ভাষার গুণ নয়, মনের গুণ। মানুষের মনোভাব যদি পরিষ্কার হয়, তা'হলে তার প্রকাশও পরিষ্কার হতে বাধ্য। মনোভাবকে সাকার ক'রবার কৌশল ফরাসী জাত যুগ যুগ ধ'রে সাধনার ফলে লাভ ক'রেছে। আমি এ গুণকে সাহিত্যের মহাগুণ মনে করি। আমরা মনোভাবকে কখনই স্পষ্ট করে ব্যক্ত ক'রতে পারিনে, যদি না সে ভাব আগে আমাদের মনে স্পষ্ট হয়। আমাদের মনোভাব যদি নিরাকার হয়, ত তাকে কথায় সাকার করা অসম্ভব। মনের ভিতর ভাবগুলো সব এলোমেলো ভাবে আসে, সেই এলোমেলো ভাবগুলোকে মনে মনে গুছিয়ে না নিতে পারলে, তা'দের আমরা অপরের কাছে ধ'রে দিতে পারিনে। মনোভাবকে প্রকাশ ক'রবার কৌশল হচ্ছে, আসলে সে ভাবকে মনে মূর্ত্ত ক'রবার কৌশল; তা'কে ভাষার কাপড় পরাবার ওস্তাদী নয়; মনের কথা গুছিয়ে ব'লবার আর্ট ফরাসী লেখকদের তুল্য আর কোনও দেশের লেখকের আয়ত্ত নয়। এ-কে এক হিসেবে লেখার logical গুণ বলা যায়, কিন্তু সেই সঙ্গে আমি এ গুণকে aesthetical গুণ ব'লতে কুণ্ঠিত নই। ফরাসী সাহিত্যের এই প্রসাদ গুণ পাঠকের মনকে বিশেষ ক'রে আনন্দ দেয়। অনেকের মতে এই গুণই ফরাসী সাহিত্যের দোষ। তাঁরা বলেন, ফরাসী সাহিত্যে আছে শুধু আলোক আর নেই তাতে ছায়া। ও একটা কৃত্রিম সৃষ্টি, কেননা, যা প্রকৃত তা আলোছায়ার মিশ্রিত। ফরাসী সাহিত্যে যে সবই ব্যক্ত—তার অন্তরে যে অব্যক্ত ব'লে কোনও পদার্থ নেই—এ কথা আমি মানতে প্রস্তুত নই। কারণ, এই ভগবানের সৃষ্টি কতক ব্যক্ত, আর অনেকখানি অব্যক্ত। ফরাসী সাহিত্যিকেরা যে, ভগবানের চাইতেও বড় গুণী, ও-মত আমি গ্রাহ্য ক'রতে পারিনে। সে যাই হোক, মনোরাজ্যে শুধু ছায়ার চাইতে, শুধু আলোক ঢের বেশী কাম্য। কাব্য বাদ দিয়ে সাহিত্যের অপরাপর প্রদেশে এই প্রসাদ গুণ যে মহাগুণ, তা কোন মানসিক ছায়াপ্রিয় লোকও অস্বীকার ক'রতে পারবেন না। ইতিহাস বলো, আইন বলো, দর্শন বলো, বিজ্ঞান বলো, সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রেই ফরাসী প্রতিভা উজ্জ্বল ক'রে রেখেছে।... যিনি কখনও শাস্ত্রের চর্চ্চা ক'রেছেন, তিনিই স্বীকার ক'রতে বাধ্য যে, Bergson-এর লেখায় যাদু আছে। এ দর্শনকে কাব্য ব'লতে আমি দ্বিধা করিনে। এমন প্রসন্ন, এমন উজ্জ্বল,

এমন মনোমুগ্ধকর রচনা কাব্যজগতেও বিরল। Bergson-এর লেখার ভিতর জড়তার লেশমাত্র নাই। এমন মুক্ত স্বচ্ছন্দসলিল ভাষায় আর কেউ কখনো দর্শন লিখেছেন বলে আমি জানিনে। Plato-র দর্শন আমি গ্রীক ভাষায় পড়িনি। আর শঙ্করের রচনার লেখাগুলি যেমন পরিস্ফুট তেমনি পরিচ্ছন্ন আর তেমনি সুশ্লিষ্ট। ও একরকম সাহিত্যিক ইউক্লিড। ওতে বিন্দুমাত্র রঙ নেই। আমরা যাকে সত্ত্বগুণ বলি, এই ফরাসী দার্শনিকের রচনায় তার পূর্ণ প্রকাশ দেখা যায়। যে গুণ ফরাসী গদ্যের নিজস্ব গুণ, সেই গুণেরই চরম বিকাশ Bergson-এর রচনায় পাওয়া যায়। সুতরাং Bergson-এর মোহ ফরাসী গদ্য সাহিত্যের মোহ। আমরা লেখকই হই, আর পাঠকই হই—ফরাসী সাহিত্যের প্রভাব আমাদের মনকে অনেকটা জড়তামুক্ত করিবে। এই বিশ্বাস বশতঃই আমি স্বজাতিকে ফরাসী সাহিত্যের চর্চ্চা করিতে অনুরোধ করি।"

"ফরাসী সাহিত্যের আর এক মহাগুণ এই যে, তা সার্ব্বজনীন বাণী, ইংরাজীতে যাকে বলে universal। এ সাহিত্য দোষে-গুণে বিশ্বমানবের মনের জিনিষ। আমি কল্পনা ক'রতে পারি নে যে, পৃথিবীতে এমন কোন জাত থাকতে পারে, যাদের কাছে Moliere কিম্বা Voltaire-এর লেখা বিদেশী মনোভাবের পরিচায়ক ব'লে মনে হ'তে পারে। তাঁদের ভাষাও যেমন সহজবোধ্য, তাঁদের মনোভাবও তেমনি সর্ব্বমানবগ্রাহ্য।"

—'র'

অবনীন্দ্রনাথের "আপন কথা"

কয়েক মাস হইল "বঙ্গবাণী"তে শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবন-স্মৃতি "আপন কথা" নাম দিয়া প্রকাশ করিতেছেন। তিনি কেবলমাত্র চিত্র-শিল্পী নহেন, কথার মধ্য দিয়া পাঠকের মনে ছবি জাগাইয়া তুলিবার তাঁহার যে অসাধারণ ক্ষমতা, এ-কথা বাঙালী পাঠককে নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহার শৈশবের চিত্র, তাঁহার সে সময়কার মনোভাব তাঁহার নিপুণ লেখনীতে পরম রমণীয়ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই বিচিত্র চিত্র-পরম্পরা বাঙ্‌লাভাষার একটি বিশেষ সম্পদ বলিয়া গণ্য হইবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। "বঙ্গবাণী"র আষাঢ়-সংখ্যায় শিশু অবনীন্দ্রনাথের চক্ষে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যে-ভাবে প্রতিভাত হইয়াছিলেন, তাহারি সুন্দর স্মৃতি-চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। "কর্ত্তা মশায়" যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এ-কথা পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

—"কর্ত্তা মশায় সব সময়ে বাড়িতে থাকেন না, বোলপুরে যান, সিমলার পাহাড়ে যান, আবার হঠাৎ একদিন কাউকে কিছু না ব'লে ফিরে আসেন, হঠাৎ নামেন কর্ত্তা গাড়ি থেকে তোরে, দরোয়ানগুলো ধড়মড় ক'রে খাটিয়া ছেড়ে উঠে পড়ে, এবাড়ি ওবাড়ি সাড়া পড়ে যায়,—কর্ত্তা এসেছেন! এই সময়টাও দেখ্‌তেম, আমাদের বৈঠকখানায় দুবেলা গানের মজলিস খুব আস্তে চ'লেছে, কাছারী বস্‌ছে নিয়মিত দশটা চারটে, দক্ষিণের বাগানে বৈকালে বিশেশ্বর হুকোবর্দ্দার বড় বড় রূপোর আর কাঁচের সট্‌কাগুলো বা'র করে দেয় না, বিলিয়ার্ড রুমে আমাদের কেদার দাদার হাঁকডাক একেবারে বন্ধ, যত সব গম্ভীর লোক তাঁরা পুরোণো বাড়িতে সকাল-সন্ধ্যা আসা-যাওয়া করেন—কেউ গাড়িতে কেউ বা হেঁটে, আমাদের উপর হুকুম আসে গোলমাল না হয়—কর্ত্তা শুন্‌তে পাবেন, চাকরগুলো কড়া নজর রাখে—খালি পা কি ময়লা কাপড়ে আছি কি না, পাঠান কুস্তিগীর ক'জন খুব ক'সে মাটি মেখে নিয়মিত কস্‌রৎ ক'রতে লেগে যায়, বুড়ো খানসামা গোবিন্দ—সেও ভোরে ভোরে উঠে কর্ত্তার জন্য দুধ আন্‌তে গোয়াল ঘরে গিয়ে ঢোকে। এই গোবিন্দ ছিল কর্ত্তার চাকর,—এর একটা মজার কাহিনী মনে প'ড়ছে; ভোরে উঠে গোবিন্দ কর্ত্তার জন্যে দুধ নিয়ে ফিরছে, ঠিক সেই সময় পথ আগলে পাঠান সর্দ্দার দু'টো কুস্তি লাগিয়েছে, গোবিন্দ যত বলে পথ ছাড়তে পাঠান তারা কানই দেয় না, পাঠান মড়েনা দেখে গোবিন্দ একটু চটে ওঠে, অথচ গলার সুর খুব নরম ক'রে ব'লে—"পাঠান ভাই রাস্তা ছাড়ো, শুন্‌তা ও পাঠান ভাই, দেখ পাঠান ভাই, কাঁদের ওপোর ছাপোল নাপাকা হ্যায়, হাতে দুধের ঘটে হ্যায়, দুধটা প'ড়ে যাবেতো জবাবদিহি ক'রবে কে?" কর্ত্তা বাড়ি এলে বাড়ি দুটো ঢিলে ঢালা ঝিমন্ত ভাব ছেড়ে বেশ যেন সজাগ হয়ে উঠ্‌তো, আবার একদিন দেখ্‌তেম কর্ত্তা কখন চলে গেছেন, বাড়ির সেই আগেকার ভাবটা ফি'র এসেছে, দরোয়ান হাঁকাহাঁকি সুরু করেছে, আমাদের চীরে মেথরে আর বুড়ো জমাদারে বিষম তকরার বেধেছে, জমাদার লাঠি নিয়ে যত বেঁকে ওঠে চীরে মেথর ততই নরম হয়, জমাদারের দুই পা জড়িয়ে ধ'রবে এমনি ভাবটা দেখায়, তখন জমাদারজী রণে ভঙ্গ দিয়ে তফাতে সরেন, চীরেও বুক ফুলিয়ে বাসায় গিয়ে ঢুকে তার বৌটাকে প্রহার আরম্ভ করে, আরো চেঁচাচেঁচি বেধে যায়, ওদিকে দাসীতে দাসীতে ঝগড়া—তাও সুরু হয় অন্দরে, বৈঠকখানাতে গানের মজলীস জাঁকিয়ে অক্ষয়বাবু গলা ছাড়েন, আমাদেরও ছুটোপাটি আরম্ভ হ'য়ে যায়। কর্ত্তা না থাকলে বাঁধা চালচোল্ এমনি আল্‌গা হয়ে পড়ে যে, মনে হয় ঘড়িতে হাতুড়ি পিটিয়ে চলেও

দরোয়ান কিছু বলবে না। কর্ত্তার গাড়ি—কাটক পেরিয়ে যাওয়া মাত্র, ইস্কুল থেকে ছুটি পাওয়া গোছের হয়ে পড়তো বাড়ির, এবং বাড়ির সকলের ভাবটা।

"শীতকালে যেবারে কর্ত্তাদাদামশায় বাড়ি থাকতেন, সেবারে মাঘোৎসব খুব জাঁকিয়ে হ'তো। একটা উৎসবের কথা মনে আছে একটু। সেবারে সঙ্গীতের আয়োজন বিশেষভাবে করা হ'য়েছিল। হায়দ্রাবাদ থেকে মৌলাবক্স সেবারে জলতরঙ্গ বাজনা এবং গান ক'রতে আমন্ত্রিত হন্। সকাল থেকে বাড়িটা গাঁদা ফুল, দেবদারু পাতা, লাল বনাত, ঝাড়লণ্ঠন, লোকজন, গাড়িঘোড়াতে গিস্‌গিস্ করছে। আমাদের সবার মুখে এক কথা, "মৌলাবাক্‌সোর বাজনা হবে।" সকাল থেকেই খানিক সিন্দুক খানিক বাক্সো মিলিয়ে একটা অদ্ভুত গোছের মানুষের চেহারা যেন চোখে দেখ্‌তে থাক্‌লেম। এখনকার মতো তখন টিকিট হতো না, নিমন্ত্রণ-পত্র চল্‌তো বোধ হয়। ছেলেদের পক্ষে উৎসব সভাতে হঠাৎ যাওয়া হুকুম না পেলেও অসম্ভব ছিল, অথচ মৌলাবাক্সোর গান না শুনলেও নয়, কাজেই হুকুমের জন্যে দরবার ক'রতে ছোটা গেল সকালে উঠেই। আমাদের ছোট্টখাটো দরবার শোনাতে এবং শুনে তার একটা বিহিত ক'রতে, ছিলেন ওবাড়ির বড় পিসেমশায়, কিন্তু তাঁর কাছ থেকে সাফ জবাব পাওয়া মুস্কিল হ'ল সেদিন, দেখ্‌বো দেখ্‌বো ব'লে তিনি আমাদের বিদায় দিলেন, তারপর সারাদিন তাঁর আর উচ্চবাচ্য নেই, উৎসবে যাওয়া কি না যাওয়ার বিষয়ে যখন না যাওয়াই স্থির হয়ে গেছে নিজের মনে, তখন রামলাল চাকর এসে বল্লে—হুকুম হয়েছে, চটপট্ কাপড় ছেড়ে নাও! এখনো টিকিটের দরবারে ছোকরাদের ওবাড়ির দরজায় যখন ঘুর ঘুর ক'রতে দেখি, তখন আমার সেই দিনটার কথাই মনে আসে। মৌলাবক্সকে একটা অদ্ভুতকর্ম্মা গোছের কিছু ভেবেছিলাম, জলতরঙ্গ আর কালোয়াতী গানের ভালমন্দ-বিচারশক্তি ছিলই না তখন, কিন্তু মৌলাবাক্সো দেখে হতাশ হয়েছিলেম মনে আছে, তার গান বাজনা লোকের ভিড় ঝাড়লণ্ঠন সবার উপরে, তিনতলার ঘরে কর্ত্তাদিদিমার দেওয়া গরম গরম লুচি ছোকা সন্দেশ মেঠাই দানা, ঢের ভালো লেগেছিল আমার মনে আছে। প্রায় পনেরো আনা শ্রোতাই তখন মাঘোৎসবের ভোজ আর পোলাও-মেঠাই খেতেই আস্‌তো আমারি মতো,—মস্ত মস্ত মেঠাই ছোটখাটো কামানের গোলার মতো নিঃশেষ হ'তো দেখ্‌তে দেখ্‌তে, পরদিনেও আবার কর্ত্তাদিদিমার লোক এসে এক থালা মেঠাই দিয়ে যেতো ছেলেদের খাবার জন্যে। কর্ত্তাদিদিমা আর বড়মা—শাশুড়ি আর বৌ; দুজনেই সমান চওড়া লাল পেড়ে সাড়ি পরে আছেন, বড়মার মাথায় প্রায় আধহাত ঘোমটা, কিন্তু কর্ত্তাদিদিমার মাথা অনেকখানি খোলা, সিঁদুর জ্বল্‌জ্বল্ করছে দেখে ভারি নতুন ঠেকেছিল। এই মাঘোৎসবে ভোজের বিরাট রকম আয়োজন হ'তো তিনতলা থেকে একতলা, সকাল থেকে রাত একটা দুটো পর্য্যন্ত খাওয়ানো চ'লতো, লোকের পর লোক, চেনা অচেনা, আত্মপর যে আস্‌ছে খেতে বসে যাচ্ছে, আহারের পর বেশ করে হাত মুখ ধুয়ে পান্ কটা পকেটে লুকিয়ে নিয়ে মুখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে সরে পড়্‌চে—পাছে ধরা প'ড়ে অন্যের কাছে; এরা সবাই, মাঘোৎসবের ভোজ আর মেঠাই অনেকেই খেয়ে বাইরে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেও চ'লেছে, এও আমি স্বকর্ণে শুনেছি, তখনকার লোকের মুখেও শুনতেম। মাঘোৎসবের লোকারণ্যের মাঝখানে কর্ত্তাকে পরিষ্কার ক'রে দেখে নেওয়া মুস্কিল ছিল আমার পক্ষে। অনেকদিন পরে একবার কর্ত্তাদাদামহাশয়কে সাম্‌নাসামনি দেখে ফেল্লেম। সকাল বেলায় উত্তরের ফটকের রেলিংগুলোতে পা রেখে ঝুল দিচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ কর্ত্তার গাড়ি এসে দাঁড়ালো, লম্বা চাপ্‌কান জোব্বা পাগড়ি পরে কর্ত্তা নামচেন্ দেখেই দৌড়ে গিয়ে প্রণাম ক'রে ফেল্লেম, ভারি নরম একখানা হাতে মাথাটাকে আমার ছুঁয়েই কর্ত্তা উপরে উঠে গেলেন। বাড়িতে তখন খবর হ'য়ে গেছে, কর্ত্তামশায় চীন দেশ থেকে ফিরেচেন, আমি যে কর্ত্তাকে দেখে ফেলেছি প্রণামও করেছি সব আগেই সেটা মায়ের কানে গেল, ময়লা কাপড়ে কর্ত্তার সামনে গিয়ে অন্যায় করেছি বলে একটু ধমকও খেলেম, আর তখনি রামলাল এসে আমাকে ধ'রে পরিষ্কার কাপড় পরিয়ে ছেড়ে দিলে। এই হঠাৎ-দেখার কিছুক্ষণ পরে, কর্ত্তার কাছ থেকে আমাদের সবার জন্যে একটা একটা চীনের বার্ণিস করা চমৎকার কৌটো এসে পড়লো, তার সঙ্গে গোটাকতক বীরভূমের গালার খেলনা,—আমার বাক্সটা ছিল কহীতনের আকার, তার উপরে একটা উড়ন্ত পাখী আঁকা, আর গালার খেলানাটা ছিল একটা মস্ত গোলাকার কচ্ছপ। এর পরেই, মা আর আমার দুই পিসির জন্যে, হাতীর দাঁতের নৌকো আর সাততলা চীনদেশের মন্দির কর্ত্তার কাছ থেকে বাবামশায় নিয়ে এলেন। চীনের সাততলা মন্দিরটার কি চমৎকার কারিগরিই ছিল, ছোট্ট ছোট্ট ঘণ্টা ঝুলছে, হাতীর দাঁতের টবে হাতীর দাঁতেরই গাছ, মানুষ সব দাঁতে তৈরি, এক একতলায় গম্ভীরভাবে যেন ওঠানাবা করছে, সেই মন্দিরের একটা একটা তলা দেখে চল্‌তে একটা একটা বেলা কেটে যেতো আমার, তার পর একটু বড় হ'য়ে সেটাকে টুকরো টুকরো ক'রে ভেঙ্গে দেখ্‌তে লেগে গেলেম,—সেদিনও মন্দিরের দু-একটা টুকরো ছিল বাক্সে। এর পরে কর্ত্তাকে দেখেছিলেম ছেলেবেলাতে আর একবার—ওবাড়ি থেকে পোতাযাত্রা

ক'রে বর বা'র হ'ল,—এখনকার মতো বরযাত্রা নয়,—বর চল্লো খড়খড়ি দেওয়া মস্ত পাল্কিতে,—আগে ঢাক ঢোল, পিছনে কর্ত্তাকে ঘিরে আত্মীয় বন্ধুবান্ধব, সঙ্গে অনেকগুলো হাতলণ্ঠন, আর নতুন রং করা কাপড় পোরে চাকর দরোয়ান পাইক; সদর ফটক পর্য্যন্ত কর্ত্তা সঙ্গে গেলেন, তার পর বরের পাল্কি চলে গেলে কর্ত্তা উপরে চলে গেলেন—গায়ে লাল জরীর জামেওয়ার, পরণে গরদের ধুতি।"

"জীবন-দেবতা"

কয়েক বৎসর হইল রেভারেণ্ড টম্‌সন্ সাহেব রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে "The Heritage of India Series"-এ একটি ছোট বই লেখেন। রবীন্দ্রনাথের বাঙ্‌লা রচনা অবলম্বন করিয়াই লেখক তাঁহাকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে-সময় এই পুস্তিকার একটি সুদীর্ঘ সমালোচনা "প্রবাসী"তে বাহির হইয়াছিল। সম্প্রতি টম্‌সন্-সাহেবের রবীন্দ্রনাথ-সম্বন্ধে একটি বড় বই প্রকাশিত হইয়াছে। বিদেশীর পক্ষে রবীন্দ্রনাথকে ভাল করিয়া বুঝিবার ও বুঝাইবার ইহাই প্রথম ও বিশিষ্ট প্রয়াস, এই জন্যই বোধ হয় এই পুস্তকখানি বাঙ্‌লা মাসিক-পত্রিকায় বিশেষভাবে আলোচিত হইতেছে। "প্রবাসী"র আষাঢ়-সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রেভারেণ্ড টম্‌সনের বহি" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। টম্‌সন্-সাহেব যে অনেক স্থলেই কবিকে ঠিক বুঝিতে পারেন নাই বা ভুল বুঝিয়াছেন লেখক এই প্রবন্ধে তাহারি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের যে-সকল কবিতায় "জীবন-দেবতা"র "আইডিয়া" রূপগ্রহণ করিয়াছে, সে-সকল কবিতা টম্‌সন্-সাহেব বুঝিতে পারেন নাই এবং তাহাদের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তিনি অনেক অবান্তর কথা বলিয়া বসিয়াছেন। পরলোকগত মোহিতচন্দ্র সেন মহাশয় সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথের "কাব্যগ্রন্থে" এই কবিতাগুলি একত্র করিয়া "জীবন-দেবতা" নামে প্রকাশিত হয়। তাঁহার স্বলিখিত ভূমিকায় তিনি এই কবিতাগুলি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; উহা পড়া থাকিলে বোধ হয় টম্‌সন্-সাহেবের এ-বিষয়ে এতটা ভুল হইত না। সে যাই হোক্ শ্রীযুক্ত বাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে জীবন-দেবতা "আইডিয়াটি" সম্বন্ধে কয়েকটি চমৎকার কথা বলিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন—

"ভারতবর্ষে আমরা গ্রামদেবতা, কুলদেবতা, গৃহদেবতা, ইষ্টদেবতাকে মানি। সে মানা fetish মানা নয়। আমাদের ভক্তিতত্ত্ব সীমা-শূন্যতাকে অসীম বলে না। সকল সীমার মধ্যেই তিনি অসীম এই জন্য ভক্তগণ সীমায় সীমায় তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়া আনন্দিত হন। অসীম আকাশ আমার গৃহসীমার মধ্যে খণ্ড আকাশরূপেই আমার বিশেষ প্রিয়—অথচ পরমার্থত সেই আকাশ সীমাধর্ম্মী নহে—পরমাকাশ অসীম না হইলে প্রত্যেক গৃহেরই মধ্যে তাহা খণ্ডাকাশ হইতেই পারিত না। তেমনি পরমাত্মা অসীম বলিয়াই প্রত্যেক জীবাত্মায় তিনি বিশেষ,—সেই কারণেই বিশেষ আত্মার পরমাত্মার সহিত বিশেষ মিলনেই, সুতরাং সীমাবদ্ধ মিলনেই,—আমাদের আনন্দ। বস্তুত খৃষ্টান ধর্ম্মতত্ত্বের মধ্যে এই তত্ত্বই প্রধান। খৃষ্টানরা ঐতিহাসিক দেশে কালে সীমাবদ্ধ খৃষ্টের মধ্যেই পরম পুরুষের আবির্ভাব উপলব্ধি করিয়া পরিত্রাণ কামনা করেন। ঘনিষ্ঠ আশ্রয় প্রত্যাশায় অনন্ত আকাশকে আমরা গৃহমধ্যে খণ্ড আকাশ করিয়া ধরিয়াছি কিন্তু নিজের সীমার দোষে সেই খণ্ডতাকে আমরা বিকৃত করিতে পারি। আকাশকে একান্ত অবরুদ্ধ করিয়া কারাগারের আকাশ করা অসম্ভব নহে, তাহাকে আলোকহীন আকাশ করিতে পারি, তাহাকে বিরূপের মধ্যে বদ্ধ করিয়া অসুন্দর আকাশ করিতে পারি। কবি তাই তাঁহার কাব্যে মাঝে মাঝে বলিয়াছেন "হে আমার জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তোমাকে কি আমার জীবনের বিকৃতির দ্বারা পীড়িত করিয়াছি? যদি করিয়া থাকি আমার এই জীবনের সীমাকে ভাঙিয়া ফেলিয়া পুনরায় ইহাকে নূতন রূপ দাও।" অর্থাৎ আমার জীবনের সীমার মধ্যে যদি ছন্দের সুষমা থাকে, তবে যিনি অসীম তাঁহাকে সুন্দর করিয়া সম্পূর্ণ করিয়া আমারই জীবনে প্রকাশ করিতে পারি। সেই প্রকাশেই আমার চরিতার্থতা। আর জীবনে যদি ছন্দের বিকার ঘটে তবে অসীমের প্রকাশ আচ্ছন্ন হয়।

"এই জীবন-দেবতাকে কবি কখনো পুরুষভাবে কখনো স্ত্রীভাবে দেখিয়াছেন। ইহাতেও টম্‌সনের বুদ্ধি কিছু হচট খাইয়াছে। যেমন গাছের সঙ্গে পশুর সঙ্গে মানুষের সঙ্গে এমন কি অচেতন বিশ্ববস্তুর সঙ্গে পরস্পর নিগূঢ় ঐক্য উপলব্ধি করিতে ভারতীয় বুদ্ধিতে বাধে না তেমনি ভগবানের স্বরূপের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ-প্রকৃতিকে একই সত্যের প্রকাশ বলিয়া অনুভব করিতে সে আতঙ্কিত হয় না। কবিও নিজের জীবনের মধ্যে যে সকল পরম আবির্ভাব, যে সকল নিবিড় রস নানা উপলক্ষ্যে অনুভব করিয়াছেন নিঃসন্দেহেই তাহার মধ্যে কখনো পুরুষের কখনো নারীর ভাব পাইয়াছেন। সেই উভয় ভাবের মধ্যেই আনন্দের অসীমতা। এই জন্যই জীবন-দেবতাকে তাঁহার পক্ষে প্রিয়তম বলাও যত সহজ, প্রেয়সী বলাও তত সহজ।"

জগতের শান্তি

ইংলণ্ডের চিন্তাশীল লেখক শ্রীযুক্ত এইচ্, জি, ওয়েলস্ "দি নিউ ইয়র্ক টাইম্‌সে"র ১২ই জুন সংখ্যায়, কি উপায়ে জগতে যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ করা যাইতে পারে, এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ওয়েলস্ বলেন, উৎকট স্বদেশপ্রীতি ও স্বজাতি-প্রীতি হৃদয়ে পোষণ করিয়া, কিম্বা স্বদেশের বর্ত্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় আস্থা রাখিয়া বিশ্বপ্রীতি ও বিশ্ব-শান্তি স্থাপনের চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। জাতিসঙ্ঘ (League of Nations), নিরস্ত্রীকরণ-বৈঠক (Disarmament Conference), কিম্বা জাতিতে জাতিতে বিবাদবিসম্বাদের সালিশী নিষ্পত্তি (Universal Arbitration) ইত্যাদি বড় বড় গাল-ভরা কথা লইয়া কত লোকে মাতিয়া গিয়াছেন; কিন্তু অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে তাঁহারা সকলেই নিজ নিজ দেশকেই খুব বড় করিয়া দেখিতেছেন। তাঁহারা খরগোসের সঙ্গে ছোটেন, আবার শীকারী কুকুরের সঙ্গেও শীকার করিতে ছাড়েন না (Run with the hare and hunt with the hounds)। স্বদেশকেও ভালবাসিব, স্বদেশের বর্ত্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থাকেও (Established Government) মানিয়া লইব; আবার সেই দেশপ্রীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিকূল ব্যবস্থার প্রতিও শ্রদ্ধা দেখাইব এই দুটি কাজ একসঙ্গে চলিতে পারে না। বর্ত্তমানকালে দেশে দেশে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা আছে, তাহাই যুদ্ধের জন্য দায়ী এবং স্বদেশপ্রীতি সেই সমরানলের ইন্ধন। সুতরাং দেশপ্রীতিকে সুসংযত করিতে না পারিলে এবং দেশসকলের সীমারেখা মুছিয়া ফেলিয়া বিশ্বরাষ্ট্র (World State) না গড়িতে পারিলে, পৃথিবী হইতে যুদ্ধ-বিগ্রহের তিরোধানের আশা বিড়ম্বনা মাত্র। নিরস্ত্রীকরণ, শান্তি-বৈঠক, সালিশী নিষ্পত্তির বৈঠক ইত্যাদি যুদ্ধকে আজিকার মত মুলতবী রাখিতে পারে মাত্র; কিন্তু যুদ্ধ একেবারে বন্ধ করিতে পারে না। মানুষ যতদিন স্বদেশাভিমানের দিক হইতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার ভাব হৃদয়ে পোষণ করিবে, ততদিন যুদ্ধ অনিবার্য্য। সুতরাং বিশ্বমানবগোষ্ঠীর প্রতিনিধিস্বরূপ এমন একটি রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠান (Federal authority in the world's affairs) গড়িয়া তুলিতে হইবে, যাহা সমস্ত দেশের নৌবাহিনী ও সৈন্যবাহিনীর উপর অপ্রতিহত কর্তৃত্ব করিতে পারে। অবশ্য, বিশ্বরাষ্ট্র স্থাপিত হইলে আভ্যন্তরিক শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশ ছাড়া অন্য সৈন্য বা সমরপোতের আবশ্যকতা থাকিবে না; কিন্তু যদিই বা প্রয়োজন ঘটে, তবে তাহা সেই বিশ্ব-রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ অধীন থাকিবে। সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বজাতির, সর্ব্বদেশের জন্য একই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা করিতে হইবে, একই মুদ্রা চালাইতে হইবে এবং পৃথিবীর কাঁচামালের বিলিব্যবস্থা এমন হইবে যাহাতে জাতিতে জাতিতে প্রতিযোগিতার ভাব উদ্ভ্রান্ত না হয়। সর্ব্বোপরি এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও বিশ্বরাষ্ট্রের (World State)-এর সম্পূর্ণ অধীন থাকিবে। শ্রীযুক্ত এইচ্, জি, ওয়েলস্-এর প্রবন্ধের ইহাই মর্ম্মার্থ।

আমেরিকার নবজীবন-বাদ

আমেরিকা আজ শিল্পে, বিজ্ঞানে, রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা প্রভৃতি ক্রিয়াশীল জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে উন্নততম দেশ বলিয়াই প্রসিদ্ধ। অনাহার, মহামারী, যুদ্ধে পরাজয় ইত্যাদি মানবের যে কতকগুলি চিরন্তন ভয়ের কারণ আছে, বর্ত্তমান মার্কিণেরা সে সকলের হাত হইতে নিজেদের রক্ষা করিতে অনেকটা সমর্থ হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য্যের এত উন্নতি তাহারা করিয়াছে যে, দেশে খাদ্যের অভাব কখনও লক্ষিত হয় না; দারিদ্র্য, অনাহার বা অল্পাহার নাই বলিলেও চলে। মুটে-মজুরেরাও যাহাতে স্বচ্ছন্দে খাওয়া-পরা করিতে পারে, সে-বিষয়ে মার্কিণেরাই সর্ব্বপ্রথম পথ দেখাইয়াছে; কেননা, আমেরিকার মুটে-মজুরদের আয় পৃথিবীর অন্য সমস্ত দেশের মজুরদের আয়ের চাইতে বেশী। আমেরিকার ঔষধ অন্য কোন দেশের ঔষধ অপেক্ষা কোন অংশে হীন নয়: স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের এত উন্নতি হইয়াছে যে, সে-দেশে মহামারী কখনও দেখা দেয় না। অন্যান্য জাতিদের মত মার্কিণদের তেমন যুদ্ধ বিগ্রহে রুচি নাই—লীগ-অব্-নেশন্‌স্-স্থাপনের কৃতিত্ব তাহাদেরই। বর্ত্তমান শতাব্দীতে দর্শন ও মনোবিজ্ঞানের যাহা কিছু উন্নতি দেখা যায়, তাহাতে মার্কিণেরাই অগ্রদূত। মার্কিণের প্রগতির চিহ্নস্বরূপ এই সকল সত্যের উল্লেখ করিয়া সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ পণ্ডিত, ইংরেজ মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেল (Bertrand Russel) "দি নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স" পত্রে, "আমেরিকার নবজীবন" (The New Life that is America's) শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। মার্কিণের এই যে সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বার্ট্রাণ্ড্ রাসেল্ বলেন যে, মার্কিণেরা অন্তরের সহিত বিশ্বাস করে, মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্যনিয়ন্তা (He is the master of his own fate); তাহারা প্রাণে প্রাণে অনুভব করে যে, বসুন্ধরা বীরভোগ্যা; মানুষ ইচ্ছা করিলেই প্রকৃতির উপর স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে ও কলকব্জার মধ্য দিয়া সর্ব্বশক্তিমান হইয়া উঠিতে পারে। এই মতবাদকে মার্কিণ-দর্শনশাস্ত্রে Instrumental Theory বা "যন্ত্রবাদ" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই যন্ত্রবাদ-মতানুসারে, সত্যানুসন্ধানের জন্য মনকে

বিশেষভাবে প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন নাই, মানুষ তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে এমনভাবে কাজে লাগাইতে থাকিবে যাহাতে সে সর্ব্বদাই ক্রিয়াশীল থাকিতে বাধ্য হয়—সে ক্রিয়াশীলতার অন্ত নাই, তাহাতে যে কোন চরম মন্তব্যে পৌঁছিতে পারা যায় এমন কোনো ইঙ্গিতও নাই—আছে শুধু গতি; এই গতি-প্রবাহ হইতেই নানা বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান (knowledge) আহরণ করা সম্ভবপর হইবে। "কোন কিছু জানা অর্থাৎ ইচ্ছামত তাহাকে পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা (To know something is to be able to change it as we wish), ইহাই হইল এই যন্ত্রবাদের মূলকথা। প্রাচীনপন্থীরা জ্ঞানান্বেষণে যে ধ্যানপরায়ণতা (contemplativeness) দেখাইতেন, তাহা এই যন্ত্রবাদে নাই, আছে শুধু ক্রিয়াশীলতা। এই যন্ত্রবাদ static নহে; ইহা dynamic। মার্কিণেরা জীবনের নানাক্ষেত্রে এই যন্ত্রবাদকে আশ্রয় করিয়াই সকল জাতির অগ্রে চলিয়াছে। মনীষী রাসেলের উক্তির ইহাই মর্ম্মার্থ।

প্রাচীন ভারতে নাট্যকলা

সম্প্রতি "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত অশোকনাথ ভট্টাচার্য্য উক্ত শীর্ষক প্রবন্ধে প্রাচীন ভারতের শ্রাব্যকাব্য হইতে দৃশ্যকাব্যের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত করা যাইতে পারে কিনা তাহার আলোচনা করিয়াছেন। অশোকবাবু বলেন যে, মহাভারতে "নাটক" শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়, কিন্তু Hopkins-সাহেব বলেন যে তাহা প্রক্ষিপ্ত; আবার Hillebrandt সাহেবের মতে শান্তি পর্ব্বে "অভিনেতৃ" কথার উল্লেখ পাওয়া যায়। হরিবংশ হইতে জানা যায় যে, "যাদবগণ বারাঙ্গনা সহযোগে দৈত্যপতি বজ্রনাভের সম্মুখে রামায়ণের সারাংশ অবলম্বনে রচিত নাটক অভিনয় করিয়াছিলেন।" "রম্ভাভিসার" নামক আরও একখানি নাটক তাঁহারা বজ্রনাভের পুরীমধ্যে অভিনয় করেন। ইহাতে যথাযথভাবে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীও প্রদর্শিত হইয়াছিল। "কৈলাশো রূপিতশ্চাপি মায়য়া বহুলঙ্কনৈঃ (হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব, ৯৩ অঃ ২৯৫ শ্লোক); সে অভিনয়ে যাদবগণ দৈত্যগণকে সন্তুষ্ট করিয়া পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। মায়া দ্বারা কৈলাস পর্ব্বত প্রদর্শন দৃশ্যপটের কারসাজি ভিন্ন আর কি হওয়া সম্ভব? আর সে সময়ে দৃশ্যপটের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে পুরামাত্রায় অভিনয়ের বাকি রহিল কি? কে কি ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার বর্ণনও আছে। "মনোবতী" নাম্নী বারাঙ্গনা রম্ভার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন.........ইহার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে।" অশোকবাবুর মতে "রামায়ণেও নটনর্ত্তকের উল্লেখ আছে।" তিনি আরও বলেন "সাঁচীতে যে bas-relief পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে একদল কথকের মূর্ত্তি খোদিত আছে। এ জিনিষটি খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের বলিয়া পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন। ইহার মধ্যেও নৃত্যগীত ও অঙ্গসঞ্চালনের আভাস পাওয়া যায়।"

তারপর, কয়েকজন সংস্কৃতজ্ঞ পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মত, ব্যাকরণের বিবরণ ইত্যাদি বিস্তৃতভাবে আলোচনার পর অশোকবাবু বলেন যে "খৃষ্টপূর্ব্ব ৫ম শতাব্দীতে নাট্যকলা ভারতে বেশ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। অভিনয় সম্বন্ধে গ্রন্থাদিও রচিত হইয়াছিল।" উপসংহারে লেখক বলিয়াছেন:—

"পতঞ্জলির সময় রঙ্গমঞ্চের অস্তিত্ব ছিল। দৃশ্যকাব্যের উপাদানও যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল। নটগণ কেবল আবৃত্তি করা ছাড়া গানও গাহিত। "নটস্যভুক্তম্"—নটের ভোজন, নটের ক্ষুধা তখন খুব প্রসিদ্ধ। উত্তমমধ্যমও তাহার ভাগ্যে জুটিত। পুরুষ হইয়া যথাযোগ্য সাজসজ্জা করিয়া স্ত্রীলোকের ভূমিকা গ্রহণও তখন বেশ প্রচলিত ছিল। এই শ্রেণীর নাটকে "ভ্রুকুংস" বলিয়া ভাষ্যকার উল্লেখ করিয়াছেন। তবে ইহা হইতে এরূপ ধারণা করা যাইতে পারে যে, তখনও স্ত্রীলোক লইয়া অভিনয় করা ততটা প্রসিদ্ধিলাভ করে নাই। ভারতীয় দৃশ্যকাব্য তখনও শিশু।"

"—র"

মণিপুরী নৃত্য

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় "প্রবাসী"তে "সত্তর-বৎসর" এই নাম দিয়া স্বীয় জীবনের অভিজ্ঞতা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার এই জীবনস্মৃতিতে মণিপুরী নৃত্য সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধারযোগ্য:—

মণিপুরী রাস শ্রীহট্টের মণিপুরী সমাজে সর্ব্বপ্রধান উৎসব ছিল। এ রাস এক অপূর্ব্ব দৃশ্য ছিল। মণিপুরীরা অত্যন্ত সঙ্গীত-রসজ্ঞ এবং সঙ্গীতরসনিপুণ। সঙ্গীতের চর্চ্চা ঘরে ঘরে। মহিলারা প্রায় সকলেই নৃত্যগীত শিখিয়া থাকেন। এই রাসযাত্রায় ইঁহারা বাংলা দেশের মতন মূর্ত্তি রচনা করেন না। নিজেরা রাসলীলার অভিনয় করিয়া থাকেন। কোন সম্পন্ন গৃহস্থের প্রাঙ্গণে বা নাট-মন্দিরে পল্লীর সকল বালক-বালিকা মিলিয়া এই অভিনয় করেন। বৃত্তাকারে সুসজ্জিত বালক-বালিকারা প্রাঙ্গণটা ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া যান। আট নয় বছরের বালক-বালিকা হইতে আঠার বছরের অনূঢ়া যুবতী পর্য্যন্ত এই অভিনয়ের সামিল হইয়া থাকেন। বৃত্তের বাহিরে ইঁহাদের পিতামাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতি গুরুজনেরা মিলিয়া খোল-কর্ত্তালসহকারে রাসলীলা কীর্ত্তন করেন, আর ইঁহাদের

বালক-বালিকারা হাতে হাতে ধরিয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া, অতি মৃদু-মধুর নৃত্যকলাসহকারে এক লীলার অভিনয় করেন। যারা রাসে নাচে তাহাদের একটি করিয়া কৃষ্ণ সাজে ও তাহার দু'পাশে দুইটি করিয়া রাধা সাজিয়া থাকে। দেশে বিদেশে অনেক নাচ দেখিয়াছি কিন্তু এই মণিপুরী নাচের মতন এমন সুন্দর, এমন নির্ম্মল, এমন নিপুণ নৃত্যকলা কোথাও দেখি নাই। আমার বাল্যকালে কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রার সময়ে এই জীবন্ত মণিপুরী রাস দেখিবার জন্ত সহস্র লোক ভাঙিয়া পড়িত।"

—"র"

বেদের কথা

"মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে পরলোকগত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী-মহাশয়ের "বেদ-কথা" ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতেছে। উক্ত পত্রিকার আষাঢ়ের সংখ্যায় ঋগ্বেদ-সংহিতা সম্বন্ধে একটি চিত্তাকর্ষক ও তথ্যপূর্ণ সন্দর্ভ বাহির হইয়াছে। ইহাতে ত্রিবেদী-মহাশয় বলিয়াছেন যে "ঋক্ মন্ত্র বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঋষিগণ কর্ত্তৃক দৃষ্ট ও প্রকাশিত হইয়াছিল। কালে ঋক্ সংখ্যা বহুল হইয়া পড়িল। সকল ঋক্ সকলের জানিবার সম্ভাবনা থাকিল না, অনেক ঋক্ লুপ্ত হইতে চলিল, এমন সময় তৎকাল-প্রচলিত ঋক্-গুলি সঙ্কলন করিয়া ও শ্রেণীবিভাগ করিয়া সংগ্রহ-গ্রন্থ রচনা আবশ্যক হইয়া পড়িল। এই সংগ্রহ-গ্রন্থের নাম ঋগ্বেদ-সংহিতা। গ্রন্থ বলিলে লিখিত গ্রন্থ বুঝিতে হইবে না। গ্রন্থ লিখিয়া রাখিবার প্রথা তৎকালে প্রচলিত ছিল না, আবিষ্কৃত হইয়াছিল কিনা তাহা লইয়া তর্ক চলিতে পারে। সঙ্কলিত হইলে পর এই সংহিতাও অধ্যাপকেরা ও অধ্যয়নকর্ত্তারা মুখেই রাখিতেন। কালভেদে ও স্থানভেদে এই সংগ্রহের মধ্যে পাঠাদির ভেদ জন্মিয়া শাখাভেদ উৎপন্ন হয়। এক কালে হয়ত এইরূপ একুশখানি শাখা উৎপন্ন হইয়াছিল। এই শাখাসমূহের মধ্যে প্রভেদ কিরূপ? বাঙ্গালার রামায়ণের সহিত যেমন বোম্বাই-সংস্করণ রামায়ণের প্রভেদ, কতকটা সেইরূপ। চরণব্যূহের সময় পাঁচখানি মাত্র শাখা অবশিষ্ট ছিল। এখন কেবল একখানি মাত্র আছে, তাহাই শাকল শাখা। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র সম্ভবতঃ উহাকেই ভিত্তি করিয়া প্রণীত হইয়াছিল, সায়নাচার্য্য উহারই ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন, সায়নভাষ্য-সমেত এই শাকলশাখা মুদ্রিত করিয়া আচার্য্য মোক্ষমূলর যশস্বী হইয়াছেন। অন্যান্য শাখার নামমাত্র বা স্মৃতিমাত্র অবশিষ্ট আছে।"

* * *

"বেদের (এই) শাখাভেদ ঘটায় বেদের বিশুদ্ধি রক্ষার প্রয়োজন লক্ষিত হইয়াছিল। এই বিশুদ্ধি রক্ষার জন্ত যে চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা মনে করিলে বিস্মিত হইতে হয়। প্রসিদ্ধ অধ্যাপকগণ বেদের অনুক্রমণী রচনা করিয়াছিলেন। বৈদিক সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ শৌনক ঋষির প্রণীত অনুক্রমণীর অনেকগুলি এখনও প্রচলিত আছে। এই সকল অনুক্রমণীতে ঋগ্বেদ সংহিতার অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক মন্ত্রের ছন্দ, দেবতা, ঋষি প্রভৃতির উল্লেখ রহিয়াছে। ছন্দোঽনুক্রমণীতে প্রত্যেক মন্ত্রের ছন্দ, আর্ষানুক্রমণীতে প্রত্যেক মন্ত্রের ঋষি, অনুবাকানুক্রমণীতে দশটি মণ্ডলের অন্তর্গত ৮৫ অনুবাকের প্রত্যেকের প্রতীক (প্রথম চরণ বা চরণাংশ) ও প্রত্যেক অনুবাকে সূক্ত সংখ্যা দেখান হইয়াছে। বৃহদ্দেবতা গ্রন্থে প্রত্যেক মন্ত্রের দেবতা প্রদর্শিত হইয়াছে; প্রসঙ্গক্রমে নানা উপাখ্যানও বর্ণিত হইয়াছে। শৌনক শাকল শাখা ঋগ্বেদ সংহিতার মন্ত্র সংখ্যা, সূক্ত সংখ্যা, পদ সংখ্যা ও অক্ষর সংখ্যা পর্য্যন্ত করিয়া গিয়াছেন। এই গণনা তাঁহার নিজ ভাষায় উদ্ধৃতিযোগ্য।

অধ্যায়ানাং চতুঃষষ্টি মণ্ডলানাং দশৈব তু।
বর্গানাং তু সহস্রে দ্বে সংখ্যাতে চ ষড়ুত্তরে ॥
ঋচাং দশসহস্রাণি ঋচাং পঞ্চশতানি চ।
ঋচামশীতিঃ পাদশ্চ পারণং সহস্র কীর্ত্তিতম্ ॥
শাকল্য দৃষ্টে পদলক্ষমেকং
সার্দ্ধঞ্চ বেদে ত্রিসহস্রযুক্তম্।
শতানি চাষ্টৌ দশকদ্বয়ঞ্চ
পদানি ষট্ চেতি চ চর্চ্চিতানি ॥

* * *

চত্বারি বা শতসহস্রাণি দ্বাত্রিংশচ্চাক্ষর সহস্রাণি ॥

অর্থাৎ

শাকল্য দৃষ্টে ঋগ্বেদ সংহিতা মধ্যে ১০ মণ্ডল, ৬৪ অধ্যায়, ২০০৬ বর্গ, ১০১৭ সূক্ত আছে। ১০৫৮০ ঋক্ মন্ত্র এবং ১৫০০০০ (সার্দ্ধ লক্ষ)+৩০০০+৮০০+২০ (দশকদ্বয়)+৬=১৫৩৮২৬ পদ এবং চারিশত সহস্র বা চারিলক্ষ এবং দ্বাত্রিংশৎ সহস্র বা বত্রিশ হাজার (৪৩২০০০) অক্ষর আছে।

মুদ্রিত শাকল শাখার সহিত মিলাইলে দেখা যায়, শৌনক যে ঋগ্বেদ সংহিতার আলোচনা করিয়াছেন, ঠিক সেই সংহিতাই অপরিবর্ত্তিতভাবে আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে। কাত্যায়ন প্রণীত সর্ব্বানুক্রমণী গ্রন্থে ঋগ্বেদ সংহিতার প্রত্যেক সূক্তের প্রতীক সহিত উহার ঋষি, দেবতা ও ছন্দ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।"

—'র'

নানা কথা

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় মালয় উপদ্বীপ এবং সন্নিকটবর্ত্তী দ্বীপসমূহে ভ্রমণে গিয়াছেন তাহা সকলেই অবগত আছেন।

সিঙ্গাপুরের সার্ব্বজাতীয় অধিবাসী কর্ত্তৃক গঠিত সমিতি দ্বারা আমন্ত্রিত হইয়া তিনি বিগত ২০শে জুলাই তথায় উপস্থিত হন। তত্রত্য গবর্মেণ্ট হাউসে স্যর হিউ ও লেডী ক্লিফোর্ডের অতিথি হইয়া কবিবর তিন দিন যাপন করেন। সিঙ্গাপুরের ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন্ রবীন্দ্রনাথকে, কবি, দার্শনিক, শিক্ষা-নায়ক, স্বদেশ-ভক্ত এবং সর্ব্বোপরি সার্ব্বজনীন শান্তি এবং অন্তর্জাতিক সৌহৃদ্যের অগ্রদূত বলিয়া অভিনন্দিত করেন, এবং তদুপলক্ষে বলেন যে, বিভিন্ন জাতিবৃন্দের নিকট ভারতবর্ষের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া তিনি মাতৃভূমির মুখ উজ্জ্বলতর করিয়াছেন। উত্তরে কবি বলেন, সে গৌরব জাতীয়তার অধিকারে অধিগত হয় নাই,—মানবতার সূত্রেই অধিগত হইয়াছে। তাঁহার একান্ত বিশ্বাস ভারতবর্ষীয় চরিত্রের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ভারতবাসী পৃথিবীর সমগ্র জনসমূহের সহিত নিজেকে একীভূত করিতে পারে। প্রত্যেক দেশের এমন কিছু সম্পদ থাকেই যাহা অন্য দেশকে দেওয়া যায়;—ভারতবর্ষেরও সেরূপ সম্পদ আছে। তিনি যে কার্য্যের সূত্রপাত করিয়াছেন তাহাতেই প্রতিপন্ন হইবে যে, ভারতের আধ্যাত্মিক সম্পদের এমন প্রাচুর্য্য আছে যদ্দ্বারা পৃথিবীর অবশিষ্টাংশের সহিত যথার্থ আত্মীয়তা স্থাপিত হইতে পারে। সর্ব্বশেষে কবি বলেন, ভারতবর্ষের অতীত গৌরব এবং সমগ্র বিশ্বকে আহ্বান করিয়া প্রাচীন ভারতবর্ষের গভীর বাণী বিস্মৃত হইলে চলিবে না। প্যালেস্ দে থিয়েটারে চীন-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক আহূত সভায় চাইনিজ্ কন্সাল্ জেনেরাল্ রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দিত করিলে, চীনদেশের সহিত ভারতবর্ষের সুদূর অতীতে যে যোগ ছিল এবং ভবিষ্যতে যে যোগ-সাধন বাঞ্ছনীয় তৎ-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে অত্যদ্ভুত বাণী প্রচার করেন তাহার সংক্ষিপ্তসার না দিয়া বারান্তরে আমরা তাহা পূর্ণতর ভাবে প্রকাশিত করিব।

সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, ফিলিপাইন ষ্টেট ইউনিভারসিটির প্রেসিডেণ্ট মিঃ জর্জ্জ বোকেবো তাঁহাকে রাজধানী ম্যানিলা যাইবার জন্য এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি বক্তৃতা দিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে লিখিত পত্রে সভাপতি মহাশয় জানাইয়াছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার বক্তৃতা, বিশেষতঃ পাশ্চাত্যভাব ও সভ্যতা সম্বন্ধে প্রাচ্যজাতিবৃন্দের কিরূপ নীতি অবলম্বন করা উচিত এ বিষয়ে তাঁহার বাণী, শুনিবার জন্য সমুৎসুক রহিয়াছেন।

কবিবরকে নিমন্ত্রণের প্রস্তাব ম্যানিলার সংবাদপত্রসমূহ আন্তরিকভাবে সমর্থন করিয়াছে।

এই সম্পর্কে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ সম্বন্ধে দুইচার কথা বলা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্পেনদেশীয় নাবিকগণ কর্ত্তৃক এই দ্বীপমালা আবিষ্কৃত হয় এবং স্পেনের তদানীন্তন অধিপতি দ্বিতীয় ফিলিপের নামানুসারে ইহাদের "ফিলিপাইন" নামকরণ করা হয়। সার্দ্ধ তিন শতাব্দীরও অধিককাল যাবৎ স্পেনের অধিকারে থাকিবার পর, বিগত ১৮৯৮ সালে স্প্যানীস-আমেরিকান সমরের অবসানে পরাজিত স্পেন কর্ত্তৃক ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্পিত হয়। তদবধি ফিলিপাইন আমেরিকার অধীন। দেশের শাসনভার যুক্তরাষ্ট্র অনেকাংশেই অধিবাসীদের হস্তে দিয়া রাখিয়াছেন। তদ্ভিন্ন ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের উপযুক্ত বিবেচনা করিলে মার্কিন ফিলিপাইন পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন, অধিবাসিদের এরূপ প্রতিশ্রুতিও দিয়াছেন।

* * *

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত বিবিধ গ্রন্থরাজির মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত এবং পৃথ্বিরাজ কাব্য সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বসু মহাশয়ের রচিত মাইকেল জীবনচরিতের মত এমন গুণ-নির্ণয়-পটু জীবনী বাংলা ভাষায় অতি অল্পই আছে, এ কথা অসংশয়ে বলা যায়। শিশু-সাহিত্য বিষয়েও তাঁহার খ্যাতি কম নাই। যোগীন্দ্রনাথের যশ শুধু সাহিত্য ক্ষেত্রেই নিবদ্ধ

নহে ; দেওঘরের রাজকুমারী কুষ্ঠাশ্রমের প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনা সম্পর্কে তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্ব বহুকাল ধরিয়া উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে।

*   *   *

সম্প্রতি ঢাকা সারস্বত-সমাজের বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে বঙ্গের গভর্ণর স্যর্ ষ্ট্যান্লী য়্যাক্সন্ মহোদয় তাঁহার বক্তৃতা কালে দেশে সংস্কৃত শিক্ষার অনুশীলন ও টোল পদ্ধতির অনুবর্ত্তন সম্বন্ধে যে কয়েকটি কথা বলিয়াছেন তদ্বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের এবং দেশবাসিগণের যত্নশীল হওয়া উচিত। স্যর্ ষ্ট্যান্লী স্পষ্টই ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, দেশের প্রাচীন সভ্যতা ও উন্নতি সঞ্জীবিত রাখিতে হইলে টোলে সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা একান্ত আবশ্যক। তিনি বলিয়াছেন, সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চার ফলে জীবন-যাত্রা সহজ এবং চিত্তবৃত্তি সমুন্নত হইবে; এবং প্রাচীন রীতি অনুযায়ী গুরু-গৃহে বাসই এ বিষয়ে প্রশস্ত ব্যবস্থা, কারণ প্রকৃত শিক্ষার পক্ষে গুরু-শিষ্যের একত্র অবস্থান অনুপেক্ষণীয়। সর্ব্বাঙ্গীন পরিপুষ্টি সাধনের জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার পরস্পর আদান-প্রদান একান্ত আবশ্যক, স্যর্ ষ্ট্যান্লী জ্যাক্সন্ মহোদয় সে কথা বলিতেও ভুলেন নাই।

*   *   *

ঢাকায় বিশ্বভারতী সম্মিলনীর একটি শাখা আছে। গত ১লা আগষ্ট জগন্নাথ ইণ্টারমিডিয়েট্ কলেজ হলে এই সম্মিলনীর আহূত এক সভায় শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষ স্বর্গীয় কবি মনোমোহন ঘোষের জীবনী ও কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সেই আলোচনা সম্বন্ধে তিনি মনোমোহনের মৃত্যুর পর প্রকাশিত তাঁহার Songs of Love and Death কাব্য হইতে কতকগুলি কবিতা পাঠ করিবার পর, শ্রোতৃবর্গের অনুরোধে, "বিচিত্রা"য় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের "নটরাজ" -এর অনেকগুলি কবিতা আবৃত্তি করিয়া সভায় সকলকে আনন্দ দান করেন। ঢাকার বহু শিক্ষিতা মহিলা সভায় উপস্থিত ছিলেন; তাঁহারা প্রায় সকলেই বিশ্বভারতীর কার্য্যে সাতিশয় উৎসাহী। বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন চৌধুরীর উদ্যোগেই ঢাকায় এই সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠা, এবং শ্রীযুক্ত পরিমল কুমার ঘোষের সম্পাদকত্বে এবং শ্রীমান নীহারচন্দ্র রায়ের সহায়তায় ঢাকার বিশ্বভারতী সম্মিলনী খুব উৎসাহের সহিত কাজ করিতেছেন।

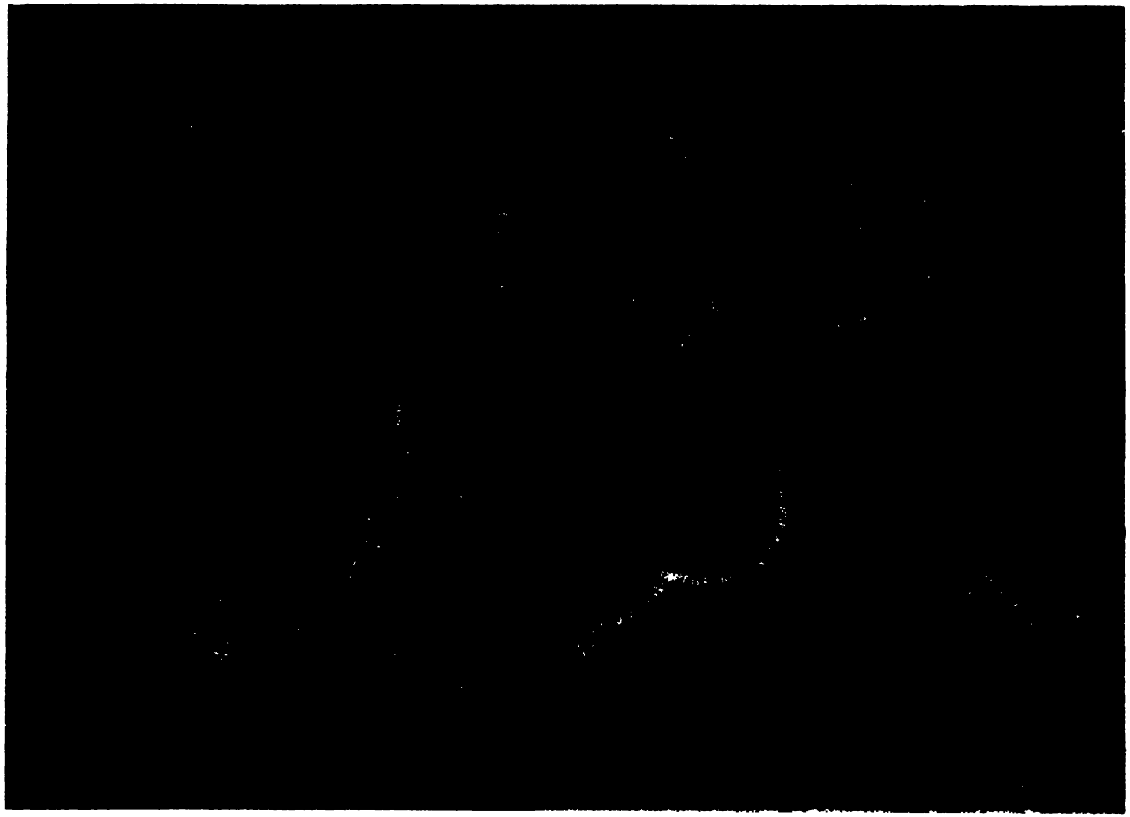
*   *   *

সম্প্রতি বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট কলিকাতায় একটী নূতন রাসায়নিক পরীক্ষাগার স্থাপিত করিয়াছেন। ডাঃ আর, এল্, দত্ত, ডি-এস-সি, এফ্ সি এস্, এফ্ আর এস্, ইঁহার তত্ত্বাবধায়ক। পরীক্ষাগারে আধুনিক উন্নত প্রণালীর যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম সমস্তই রাখা হইয়াছে। শিল্পী ও ব্যবসায়ীদিগকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করাই এই পরীক্ষাগার স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য। অল্পব্যয়ে ও সহজ উপায়ে যাহাতে এতদ্দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যাদি উৎপন্ন হয় তদ্বিষয়ে সুপরামর্শ দান ও সর্ব্ববিধ রাসায়নিক সমস্যার সমাধান করিবার জন্য কর্তৃপক্ষ সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিবেন। এমন কি আহূত হইলে তাঁহারা কারখানায় উপস্থিত হইয়া কলকব্জাদি পরিদর্শন করিবেন ও পরিচালনা সম্বন্ধে যথাবিধি সদুপদেশ দিবেন।

*   *   *

ডাঃ ভারোনোভ্ মনুষ্যদেহে বানরের লৈঙ্গিক-গ্রন্থি প্রবেশ করাইয়া বৃদ্ধকে পুনর্যৌবন দিবার যে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন এবং এখনও যাহার পরীক্ষা চলিতেছে, পাশ্চাত্য চিকিৎসক সমাজের কেহ কেহ তাহার বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি তুলিতেছেন। লণ্ডনের ডাক্তার বেড্‌ডো বেলী এবং ফ্রান্সের ডাক্তার এল্ এ লিচি প্রমুখ চিকিৎসকগণ বলেন ইহাতে সমাজের প্রভূত অনিষ্ট হইবে। কৃত্রিম যৌবনের ক্ষণস্থায়ী উম্মাদনায় বৃদ্ধদিগের নৈতিক অবনতি ত ঘটিবেই, তাহা ছাড়া ব্যাধিগ্রস্ত ও অপুষ্ট-দেহ সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া জাতীয় শক্তির মেরুদণ্ডকে অচিরেই দুর্ব্বল করিয়া দিবে।

Printed at the Modern Art Press, 1/2 Durga Pituri Lane, Calcutta,
by Srijut Probodh Lal Mukherjee, and published by him from 51 Pataldanga Street, Calcutta.



শরৎ

শিল্পী—শ্রীসুকুমার দেউস্কর, শান্তিনিকেতন

বিচিত্রা

প্রথম বর্ষ, ১ম খণ্ড | আশ্বিন, ১৩৩৪ | চতুর্থ সংখ্যা

ময়ূর

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বং
অগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।



ময়ূর, করোনি মোরে ভয়,
সেই গর্ব্ব, সেই মোর জয়।
বাহিরেতে আমলকী
করিতেছে ঝকমকি,
নবৈর উঠেছে কচি পাতা,
কোথায় দুয়ার থেকে
আমারে গিয়েছ দেখে,
খুলিয়া বসেছি মোটা খাতা।
লিখিতেছি নিজ মনে,—
হেরি' ওই আঁখিকোণে
অবজ্ঞায় ফিরে যাও চলি;
বোঝোনা, লেখনী ধরি'
কী যে এত খুঁটে মরি,
আমারে জেনেছ মূঢ় বলি'॥





সেই ভালো, ভালো যদি তাই,
তাহে মোর কোনো খেদ নাই।
তবু আমি তুমি আছি,
আসো তুমি কাছাকাছি,
মোরে দেখে নাহি করো ত্রাস।
যদিও মানব, তবু
আমারে করো না কভু
দানব বলিয়া অবিশ্বাস।



সুন্দরের দূত তুমি,
এ ধূলির মর্ত্যভূমি,
স্বর্গের প্রসাদ হেথা আনো,
তবুও ধরিনা তোরে,
বাঁধিনা পিঞ্জরে ধরে,
এও কি আশ্চর্য নাহি মানো ॥

ময়ূর

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



কাননের এই এক কোনা,—
হেথায় তোমার আনাগোনা।
চামেলি-বিতানতল
মোর বসিবার স্থল,
দিন যবে অবসান হয়।
হেথা আসো কী যে ভাবি;
মোর চেয়ে তোর দাবী
বেশি বই কম কিছু নয়।
জ্যোৎস্না ডালের ফাঁকে
হেথা আলিপনা আঁকে,
এ নিকুঞ্জ জানে আপনার।



কাঁচা পাতা যে বিশ্বাসে
দ্বিধাহীন হেথা আসে
তোমার তেমনি অধিকার॥



বর্ণহীন রিক্ত মোর সাজ,
তারি' লাগি পাছে পাই লাজ,
বর্ণে বর্ণে আমি তাই
ছন্দ রচিবারে চাই,
সুরে সুরে গীত চিত্র করি।
আকাশেরে বাসি ভালো,
সকাল সন্ধ্যার আলো
আমার প্রাণের বর্ণে ভরি।
ধরায় যেখানে, তাই,
তোমার গৌরব-ঠাঁই
সেথা আমারো ঠাঁই হয়।
সুন্দরের অনুরাগে
তাই মোর গর্ব্ব লাগে,
মোরে তুমি করো নাই ভয়॥



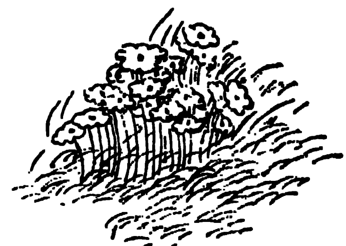
ময়ূর

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

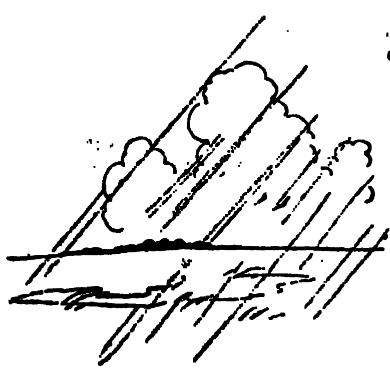


তোমার আমার তরে জানি
ময়ূরের এই রাজধানী।
তোর নাচ, মোর গীতি,
রূপ তোর, মোর প্রীতি,
তোর বর্ণ আমার বর্ণনা, —
শোভনের নিমন্ত্রণে
চলি মোরা দুইজনে,
তাই তুই আমার আপনা।
সহজ রঙের রঙ্গী
তুই যে গ্রীবার ভঙ্গী,
বিস্ময়ের নাহি পাই পার।
তুমি যে শস্য না পাও,
নিঃসংশয়ে আসো যাও,
এই মোর নিত্য পুরস্কার॥





নাশ করে যে আগ্নেয়বাণ
মুহূর্তে অমূল্য তোর প্রাণ —
তার লাগি বসুন্ধরা
হয় কি সবুজে ভরা,
তার লাগি ফুল নাহি ধরে।
যে-বসন্ত প্রাণে প্রাণে
বেদনার সুধা আনে
সে-বসন্ত নহে তার তরে।
ছন্দ ভেঙে দেয় সে যে,
অকস্মাৎ উঠি বেজে
অর্থহীন চকিত চীৎকার,
ঈর্ষাচ্ছন্ন অবিশ্বাস
বিশ্ববক্ষে হানে ত্রাস,
কুটিল সংশয় কদাকার॥



শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



সৃষ্টিছাড়া এই যে উৎপাত
হানে দানবের পদাঘাত
পুণ্য পৃথিবীর শিরে,—
তার লজ্জা তুই কিরে
আনিতে পারিবি মোর মনে?
অকৃতজ্ঞ নিষ্ঠুরতা
সৌন্দর্য্যেরে দেয় ব্যথা
কেন যে তা বুঝিবি কেমনে?
কেন যে হৃদয়ভাষা
বিধাতার ভালোবাসা
বিদ্রূপে করিছে ছারখার,
যে হস্ত দানেরি তরে
তারি রক্তপাত করে,
সেই লজ্জা নিখিল জনার ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



পরদেশী *

এসেছে কবে বিদেশী সখা
বিদেশী পাখী আমার বনে,
সকাল সাঁঝে কুঞ্জমাঝে
উঠিছে ডাকি সহজ মনে।



অজানা এই সাগর পারে
হ'ল না তার গানের ক্ষতি।

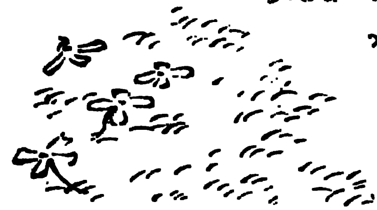


সবুজ তার ডানার আভা,
চপল তার নাচের গতি।
আমার দেশে যে-মেঘ এসে
নীপবনের মরমে মেশে,
বিদেশী পাখী গীতালি দিয়ে
মিতালি করে তাহার সনে॥

বটের ফলে আরতি তার,
রয়েছে লোভ নিমের তরে,



বন-ছায়ারে চক্ষু তার
অচেনা ব'লে দোষী না করে।

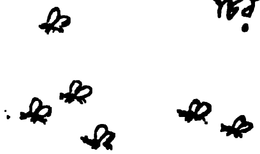


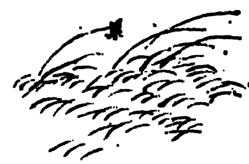
শরতে যবে শিশির বায়ে
উচ্ছ্বসিত শিউলি-বীথি
বাণীরে তার করে না ম্লান
কুহেলি-ঘন পুরানো স্মৃতি।

* পরলোকগত পিয়র্সন্‌ সাহেব কয়েক জোড়া বিদেশী পাখী শান্তিনিকেতন আশ্রমে ছাড়িয়াদিয়া ছিলেন, তাহাদেরি একটির উদ্দেশে।



শালের ফুল-ফোটার বেলা
মধু-কাঙালী লোভীর মেলা,
চির মধুর চুঁর মতো
সে ফুল তার হৃদয় হরে॥



বেণুবনের আগের ডালে
চূড়ল ফিঙ্গা যখন নাচে

পরদেশী এ পাখীর সাথে
পরাণে তার ভেদ কি আছে?
উষার ছোঁওয়া জাগায় ওরে
ডালিম শাখে পাতার কোলে,

চোখের আগে যে-ছবি জাগে
মাকেও তার প্রবাস ভোলে।
আলোকে সোনা, আকাশে নীলা,
সেথা যে চির-জানাজি লীলা,
মায়ের ভাষা শোনায় সেথাকে
শ্যামল ভাষা দেখায় গাছে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮ বৈশাখ ১৩৩৪



— তিনপুরুষ —

—উপন্যাস—

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

আজ ৭ই আষাঢ়। অবিনাশ ঘোষালের জন্মদিন। বয়স তার হোলো বত্রিশ। ভোর থেকে আসচে অভিনন্দনের টেলিগ্রাম, আর ফুলের তোড়া।

গল্পটার এইখানে আরম্ভ। কিন্তু আরম্ভের পূর্ব্বেও আরম্ভ আছে। সন্ধ্যাবেলায় দীপ জ্বালার আগে সকাল বেলায় সল্‌তে পাকানো।

এই কাহিনীর পৌরাণিক যুগ সন্ধান করলে দেখা যায় ঘোষালরা এক সময়ে ছিল সুন্দরবনের দিকে, তার পরে হুগলী জেলায় নুরনগরে। সেটা বাহির থেকে পর্টুগীজদের তাড়ায়, না ভিতর থেকে সমাজের ঠেলায় ঠিক জানা নেই। মরীয়া হ'য়ে যারা পুরাণো ঘর ছাড়তে পারে, তেজের সঙ্গে নূতন ঘর বাঁধবার শক্তিও তাদের। তাই ঘোষালদের ঐতিহাসিক যুগের সুরুতেই দেখি প্রচুর ওদের জমি-জমা, গোরু-বাছুর, জন-মজুর, পাল-পার্ব্বণ, আদায়-বিদায়। আজও তাদের সাবেক গ্রাম শেয়াকুলিতে অন্তত বিঘে দশেক আয়তনের ঘোষাল-দীঘি পানা-অবগুণ্ঠনের ভিতর থেকে পঙ্করুদ্ধকণ্ঠে অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিচ্চে। আজ সে দীঘিতে শুধু নামটাই ওদের, জলটা চাটুজ্জে জমিদারের। কি ক'রে একদিন ওদের পৈতৃক মহিমা জলাঞ্জলি দিতে হয়েছিল সেটা জানা দরকার।

এদের ইতিহাসের মধ্যম পরিচ্ছেদে দেখা যায় খিটিমিটি বেধেছে চাটুজ্জে জমিদারদের সঙ্গে। এবার বিষয় নিয়ে নয়, দেবতার পূজো নিয়ে। ঘোষালরা স্পর্দ্ধা ক'রে চাটুজ্জেদের চেয়ে ছ-হাত উঁচু প্রতিমা গড়িয়েছিল। চাটুজ্জেরা তার জবাব দিলে। রাতারাতি বিসর্জ্জনের রাস্তার মাঝে মাঝে এমন মাপে তোরণ বসালে যাতে ক'রে ঘোষালদের প্রতিমার মাথা যায় ঠেকে। উঁচু প্রতিমার দল তোরণ ভাঙ্‌তে বেরোয়, নীচু প্রতিমার

দল তাদের মাথা ভাঙ্‌তে ছোটে। ফলে, দেবী সে-বার বাঁধা বরাদ্দর চেয়ে অনেক বেশি রক্ত আদায় করেছিলেন। খুন-জখম থেকে মামলা উঠ্‌লো। সে মামলা থাম্‌ল ঘোষালদের সর্ব্বনাশের কিনারায় এসে।

আগুন নিব্‌ল, কাঠও বাকি রইল না, সবই হোলো ছাই। চাটুজ্জেদেরও বাস্তলক্ষ্মীর মুখ ফ্যাকাশে হ'য়ে গেলো। দায়ে প'ড়ে সন্ধি হ'তে পারে, কিন্তু তা'তে শান্তি হয় না। যে-ব্যক্তি খাড়া আছে, আর যে-ব্যক্তি কাৎ হ'য়ে পড়েচে—দুই পক্ষেরই ভিতরটা তখনো গর্‌গর্‌ করচে। চাটুজ্জেরা ঘোষালদের উপর শেষ কোপটা দিলে সমাজের খাঁড়ায়। রটিয়ে দিলে এককালে ওরা ছিলো ভঙ্গজ ব্রাহ্মণ, এখানে এসে সেটা চাপা দিয়েচে, কেঁচো লেজেচে কেউটে। যারা খোঁটা দিলে, টাকার জোরে তাদের গলার জোর। তাই স্মৃতিরত্নপাড়াতেও তাদের এই অপকীর্ত্তনের অনুস্বার-বিসর্গওয়ালা ঢাকী জুটল। কলঙ্ক-ভঞ্জনের উপযুক্ত প্রমাণ বা দক্ষিণা ঘোষালদের শক্তিতে তখন ছিল না, অগত্যা চণ্ডীমণ্ডপবিহারী সমাজের উৎপাতে এরা দ্বিতীয়বার ছাড়লো ভিটে। রজবপুরে অতি সামান্য-ভাবে বাসা বাঁধ্‌লে।

যারা মারে তা'রা ভোলে, যারা মার খায় তা'রা সহজে ভুলতে পারে না। লাঠি তাদের হাত থেকে খ'সে পড়ে ব'লেই লাঠি তা'রা মনে মনে খেলতে থাকে। বহু দীর্ঘকাল হাতটা অসাড় থাকাতেই মানসিক লাঠিটা ওদের বংশ বেয়ে চ'লে আসচে। মাঝে মাঝে চাটুজ্জেদের কেমন ক'রে ওরা জব্দ ক'রেছিল সত্যে মিথ্যে মিশিয়ে সে সব গল্প ওদের ঘরে এখনো অনেক জমা হ'য়ে আছে। খোড়ো চালের ঘরে আষাঢ় সন্ধ্যাবেলায় ছেলেরা সেগুলো হাঁ ক'রে শোনে। চাটুজ্জেদের বিখ্যাত দাশু সর্দ্দার রাত্রে যখন ঘুমোচ্ছিল তখন বিশ-পঁচিশজন লাঠিয়াল তা'কে ধ'রে এনে ঘোষালদের কাছারীতে কেমন ক'রে বেমালুম বিলুপ্ত ক'রে দিলে সে গল্প আজ একশো বছর ধ'রে ঘোষালদের ঘরে চ'লে আসচে। পুলিশ যখন খানা-তল্লাসী করতে এল নায়েব ভুবন বিশ্বাস অনায়াসে বল্‌লে, হাঁ, সে কাছারীতে এসেছিল তার নিজের কাজে, হাতে পেয়ে বেটাকে কিছু অপমানও করেচি, শুন্‌লেম নাকি সেই ক্ষোভে বিবাগী হ'য়ে চ'লে গেছে। হাকিমের সন্দেহ গেল না। ভুবন বল্‌লে, হুজুর এই বছরের মধ্যে যদি তার ঠিকানা বের ক'রে দিতে না পারি তবে আমার নাম ভুবন বিশ্বাস নয়। কোথা থেকে দাশুর মাপের এক গুণ্ডা খুঁজে বার কর্‌লে—একেবারে তাকে পাঠালে ঢাকায়। সে কর্‌লে ঘটি চুরি, পুলিসে নাম দিলে দাশরথি মণ্ডল। হোলো একমাসের জেল। যে তারিখে ছাড়া পেয়েচে ভুবন সেইদিন ম্যাজেষ্ট্রেটীতে খবর দিলে দাশু সর্দ্দার ঢাকার জেলখানায়। তদন্তে বেরোলো দাশু জেলখানায় ছিল বটে, তার গায়ের দোলাইখানা জেলের বাইরের মাঠে ফেলে চ'লে গেছে। প্রমাণ হোলো সে দোলাই সর্দ্দারেরই। তারপর সে কোথায় গেল সে খবর দেওয়ার দায় ভুবনের নয়।

এই গল্পগুলো দেউলে-হওয়া বর্ত্তমানের সাবেক কালের চেক। গৌরবের দিন গেছে; তাই গৌরবের পুরাতত্ত্বটা সম্পূর্ণ ফাঁকা ব'লে এত বেশি আওয়াজ করে।

যা হোক্, যেমন তেল ফুরোয়, যেমন দীপ নেবে, তেমনি এক সময়ে রাতও পোহায়। ঘোষাল পরিবারে সূর্য্যোদয় দেখা দিল অবিনাশের বাপ মধুসূদনের জোর কপালে।

২

মধুসূদনের বাপ আনন্দ ঘোষাল রজবপুরের আড়ৎ-দারদের মুহুরি। মোটা ভাত, মোটা কাপড়ে সংসার চলে। গৃহিণীদের হাতে শাঁখা খাড়ু, পুরুষদের গলায় রক্ষামন্ত্রের পিতলের মাদুলি আর বেলের আটা দিয়ে মাজা খুব মোটা পৈতে। ব্রাহ্মণ-মর্য্যাদার প্রমাণ ক্ষীণ হওয়াতে পৈতেটা হয়েছিল প্রমাণসই।

মফঃস্বল ইস্কুলে মধুসূদনের প্রথম শিক্ষা। সঙ্গে সঙ্গে অবৈতনিক শিক্ষা ছিল নদীর ধারে, আড়তের প্রাঙ্গণে, পাটের গাঁটের উপর চ'ড়ে ব'সে। যাচনদার, খরিদদার, গোরুর গাড়ীর গাড়োয়ানদের ভিড়ের মধ্যেই তার ছুটি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যেখানে রাজারে টিনের চালাঘরে সাজানো থাকে সার-বাঁধা গুড়ের কলসী, আঁটিবাঁধা তামাকের পাতা, গাঁঠ-বাঁধা বিলিতি র‍্যাপার, কেরোসিনের টিন, সর্ষের ঢিবি, কলাইয়ের বস্তা, বড় বড় তৌল দাঁড়ি আর বাটখারা, সেইখানে ঘুরে তার যেন বাগানে বেড়ানোর আনন্দ।

বাপ ঠাওরালে ছেলেটার কিছু হবে। ঠেলেঠুলে গোটা দুত্তিন পাস করাতে পারলেই ইস্কুল মাষ্টারী থেকে মোক্তারী ওকালতী পর্য্যন্ত ভদ্রলোকের যে-কয়টা মোক্ষ-তীর্থ তার কোনো না কোনোটাতে মধু ভিড়তে পারবে। অন্য তিনটে ছেলের ভাগ্যসীমারেখা গোমস্তাগিরি পর্য্যন্তই পিলপে-গাড়ি হ'য়ে রইল। তারা কেউ বা আড়ৎদারের কেউ বা তালুকদারের দফ্‌তরে কানে কলম গুঁজে শিক্ষানবিশিতে ব'সে গেল। আনন্দ ঘোষালের ক্ষীণ সর্ব্বস্বের উপর ভর ক'রে মধুসূদন বাসা নিলে কলকাতার মেসে।

অধ্যাপকেরা আশা করেছিল পরীক্ষায় এ ছেলে কলেজের নাম রাখবে। এমন সময় বাপ গেল মারা। পড়বার বই, মায় নোট-বই সমেত, বিক্রি ক'রে মধু পণ ক'রে বস্‌ল এবার সে রোজগার করবে। ছাত্র-মহলে সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড বই বিক্রি ক'রে ব্যবসা হোলো সুরু। মা কেঁদে মরে—বড় তার আশা ছিল, পরীক্ষা পাশের রাস্তা দিয়ে ছেলে ঢুক্‌বে "ভদ্দোর" শ্রেণীর ব্যূহের মধ্যে, তার পরে ঘোষাল বংশদণ্ডের আগায় উড়্‌বে কেরাণী-বৃত্তির জয়পতাকা।

ছেলেবেলা থেকে মধুসূদন যেমন মাল বাছাই করতে পাকা, তেমনি তার বন্ধু বাছাই করবারও ক্ষমতা। কখনো ঠকেনি। তার প্রধান ছাত্রবন্ধু ছিল কানাই গুপ্ত। এর পূর্ব্বপুরুষেরা বড় বড় সওদাগরের মুচ্ছুদ্দি-গিরি ক'রে এসেচে। বাপ নামজাদা কেরোসিন কোম্পানির আপিসে উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত।

ভাগ্যক্রমে এঁরি মেয়ের বিবাহ। মধুসূদন কোমরে চাদর বেঁধে কাজে লেগে গেল। চাল বাঁধা, ফুলপাতায় সভা সাজানো, ছাপাখানায় দাঁড়িয়ে থেকে সোনার কালিতে চিঠি ছাপানো, চৌকি কার্পেট ভাড়া ক'রে আনা, গেটে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা, গলা ভাঙিয়ে পরিবেশন, কিছুই বাদ দিলে না। এই সুযোগে এমন বিষয়-বুদ্ধি ও কাণ্ড-জ্ঞানের পরিচয় দিলে যে, রজনীবাবু তারা খুসী। তিনি কেজো মানুষ চেনেন, বুঝ্‌লেন এ ছেলের উন্নতি হবে। নিজের থেকে টাকা ডিপজিট্ দিয়ে মধুকে রজবপুরে কেরোসিনের এজেন্সীতে বসিয়ে দিলেন।

সৌভাগ্যের দৌড় সুরু হোলো ; সেই যাত্রাপথে কেরো-সিনের ডিপো কোন্ প্রান্তে বিন্দু আকারে পিছিয়ে পড়্‌ল। জমার ঘরের মোটা মোটা অঙ্কের উপর পা ফেল্‌তে ফেল্‌তে ব্যবসা হু-হু ক'রে এগোলো গলি থেকে সদর রাস্তায়, খুচরো থেকে পাইকিরিতে, দোকান থেকে আপিসে, উদ্যোগ-পর্ব্ব থেকে স্বর্গারোহণে। সবাই বল্‌লে, "একেই বলে কপাল!" অর্থাৎ, পূর্ব্বজন্মের ইষ্টিমেই এ-জন্মের গাড়ি চল্‌চে। মধুসূদন নিজে জান্‌ত যে, তাকে ঠকাবার জন্যে অদৃষ্টের ত্রুটি ছিল না, কেবল হিসেবে ভুল করেনি ব'লেই জীবনের অঙ্ক-ফলে পরীক্ষকের কাটা দাগ পড়েনি ;—যারা হিসেবের দোষে ফেল কর্‌তে মজবুৎ পরীক্ষকের পক্ষপাতের পরে তারাই কটাক্ষ-পাত ক'রে থাকে।

মধুসূদনের রাশ ভারী। নিজের অবস্থা সম্বন্ধে কথা-বার্ত্তা কয় না। তবে কিনা আন্দাজে বেশ বোঝা যায়, মরা গাঙে বান এসেচে। গৃহপালিত বাংলাদেশে এমন অবস্থায় সহজ মানুষে বিবাহের চিন্তা করে, জীবিতকাল-বর্ত্তী সম্পত্তি ভোগটাকে বংশাবলীর পথ বেয়ে মৃত্যুর পরবর্ত্তী ভবিষ্যতে প্রসারিত কর্‌বার ইচ্ছা তাদের প্রবল হয়। কন্যাদায়িকেরা মধুকে উৎসাহ দিতে ত্রুটি করে না, মধুসূদন বলে, "প্রথমে একটা পেট সম্পূর্ণ ভর্‌লে তারপরে অন্য পেটের দায় নেওয়া চলে।" এর থেকে বোঝা যায় মধুসূদনের হৃদয়টা যাই হোক পেটটা ছোটো নয়।

এই সময়ে মধুসূদনের সতর্কতায় রজবপুরের পাটের নাম দাঁড়িয়ে গেল। হঠাৎ মধুসূদন সব-প্রথমেই নদীর ধারের পোড়ো জমি বেবাক কিনে ফেল্‌লে, তখন দর সস্তা। ইঁটের পাঁজা পোড়ালে বিস্তর, নেপাল থেকে

এলো বড়ো বড়ো শাল কাঠ, সিলেট থেকে চূণ, কল কাতা থেকে মালগাড়ি বোঝাই করোগেটেড্ লোহা। বাজারের লোক অবাক! ভাবলে, "এই রে! হাতে কিছু জমেছিল, সেটা সইবে কেন! এবার বদহজমের পালা, কারবার মরণদশায় ঠেকলো ব'লে!"

এবারো মধুসূদনের হিসেবে ভুল হোলো না। দেখ্‌তে দেখ্‌তে রজবপুরে ব্যবসার একটা আওড় লাগলো। তার ঘূর্ণিটানে দালালরা এসে জুটলো, এলো মাড়োয়ারীর দল, কুলির আমদানী হোলো, কল বস্‌ল, চিম্‌নি থেকে কুণ্ডলায়িত ধূমকেতু আকাশে আকাশে কালিমা বিস্তার কর্‌লে।

হিসেবের খাতার গবেষণা না ক'রেও মধুসূদনের মহিমা এখন দূর থেকে খালি চোখেই ধরা পড়ে। একা সমস্ত গঞ্জের মালিক, পাঁচীল-ঘেরা দোতলা ইমারৎ, গেটে শিলাফলকে লেখা "মধুচক্র"। এ নাম তার কলেজের পূর্ব্বতন সংস্কৃত অধ্যাপকের দেওয়া। মধুসূদনকে তিনি পূর্ব্বের চেয়ে অকস্মাৎ এখন অনেক বেশি স্নেহ করেন।

এইবার বিধবা মা ভয়ে ভয়ে এসে বল্‌লে, "বাবা, কবে ম'রে যাবো, বৌ দেখে যেতে পারবো না কি?"

মধু গম্ভীরমুখে সংক্ষেপে উত্তর কর্‌লে, "বিবাহ কর্‌তেও সময় নষ্ট, বিবাহ ক'রেও তাই। আমার ফুরসৎ কোথায়?"

পীড়াপীড়ি করে এমন সাহস ওর মায়েরও নেই, কেননা সময়ের বাজার-দর আছে। সবাই জানে মধুসূদনের এক কথা।

আরো কিছুকাল যায়। উন্নতির জোয়ার বেয়ে কারবারের আপিস মফঃস্বল থেকে কলকাতায় উঠ্‌ল। নাতি নাতনীর দর্শন-সুখ সম্বন্ধে হাল ছেড়ে দিয়ে মা ইহলোক ত্যাগ কর্‌লে। ঘোষাল কোম্পানীর নাম আজ দেশ-বিদেশে, ওদের ব্যবসা বনেদী বিলিতি কোম্পানীর গা ঘেঁসে চলে, বিভাগে বিভাগে ইংরেজ ম্যানেজার।

মধুসূদন এবার স্বয়ং বল্‌লে, বিবাহের ফুরসৎ হ'ল। কন্যার বাজারে ক্রেডিট্ তার সর্ব্বোচ্চে। অতি-বড়ো অভিমানী ঘরেরও মানভঞ্জন করবার মত তার শক্তি। চারদিক থেকে অনেক কুলবতী, রূপবতী, গুণবতী, ধনবতী, বিদ্যাবতী কুমারীদের খবর এসে পৌছয়। মধুসূদন চোখ পাকিয়ে বলে, ঐ চাটুজ্জেদের ঘরের মেয়ে চাই।

ঘা-খাওয়া বংশ, ঘা-খাওয়া নেকড়ে বাঘের মতো, বড় ভয়ঙ্কর।

৩

এইবার কন্যাপক্ষের কথা।

নুরনগরের চাটুজ্জেদের অবস্থা এখন ভালো নয়। ঐশ্বর্য্যের বাঁধ ভাঙ্‌চে। ছয়-আনী সরিকরা বিষয় ভাগ ক'রে বেরিয়ে গেল, এখন তারা বাইরে থেকে লাঠি হাতে দশ-আনীর সীমানা খাব্‌লে বেড়াচ্চে। তা'ছাড়া রাধাকান্ত জীউর সেবায়তী অধিকার দশে-ছয়ে যতই সূক্ষ্মভাবে ভাগ কর্‌বার চেষ্টা চল্‌চে, ততই তার শস্য অংশ স্থূলভাবে উকীল মোক্তারের আঙিনায় নয়-ছয় হ'য়ে ছড়িয়ে পড়ল, আমলারাও বঞ্চিত হোলো না। নুরনগরের সে প্রতাপ নেই,—আয় নেই, ব্যয় বেড়েচে চতুর্গুণ। শতকরা ন'টাকা হারে সুদের ন'পা-ওয়ালা মাকড়সা জমিদারীর চারদিকে জাল জড়িয়ে চলেচে।

পরিবারে দুই ভাই, পাঁচ বোন। কন্যাধিক্য অপরাধের জরিমানা এখনো শোধ হয়নি। কর্ত্তা থাক্‌তেই চার বোনের বিয়ে হ'য়ে গেলো কুলীনের ঘরে। এদের ধনের বহরটুকু হাল আমলের, খ্যাতিটা সাবেক আমলের। জামাইদের পণ দিতে হোলো কৌলীন্যের মোটা দামে ও ফাঁকা খ্যাতির লম্বা মাপে। এই বাবদেই ন' পার্শেন্টের সূত্রে গাঁথা দেনার ফাঁসে বারো পার্শেন্টের গ্রন্থি পড়্‌ল। ছোট ভাই মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠে বল্‌লে, বিলেতে গিয়ে ব্যারিষ্টার হ'য়ে আসি, রোজগার না কর্‌লে চল্‌বে না। সে গেল বিলেতে, বড়ো ভাই বিপ্রদাসের ঘাড়ে পড়্‌ল সংসারের ভার।

এই সময়টাতে পূর্ব্বোক্ত ঘোষাল ও চাটুজ্জেদের ভাগ্যের ঘুড়িতে পরস্পরের লখে লখে আর একবার বেধে গেল। ইতিহাসটা বলি।

বড়বাজারের তনসুকদাস হাল্‌ওয়াইদের কাছে এদের একটা মোটা অঙ্কের দেনা। নিয়মিত সুদ দিয়ে আস্‌চে, কোনো কথা ওঠেনি। এমন সময়ে পুজোর ছুটিতে

বিপ্রদাসের সহপাঠী অমূল্যধন এলো আত্মীয়তা দেখাতে। সে হোলো বড় এটর্ণি আপিসের আর্টিকেলড্ হেডক্লার্ক। এই চশমা-পরা যুবকটি নুরনগরের অবস্থাটা আড়চোখে দেখে নিলে। সেও কলকাতায় ফিরল আর তনসুকদাসও টাকা ফেরৎ চেয়ে বস্‌ল; বল্লে, নতুন চিনির কারবার খুলেছে, টাকার জরুরী দরকার।

বিপ্রদাস মাথায় হাত দিয়ে পড়ল।

সেই সঙ্কটকালেই চাটুজ্জে ও ঘোষাল এই দুই নামে দ্বিতীয়বার ঘটল দ্বন্দ্বসমাস। তার পূর্ব্বেই সরকার বাহাদুরের কাছ থেকে মধুসূদন রাজখেতাব পেয়েচে। পূর্ব্বোক্ত ছাত্রবন্ধু এসে বল্লে, নতুন রাজা খোষ-মেজাজে আছে, এই সময়ে ওর কাছ থেকে সুবিধে মতো ধার পাওয়া যেতে পারে। তাই পাওয়া গেল,—চাটুজ্জেদের সমস্ত খুচরো দেনা একঠাই ক'রে এগারো লাখ টাকা সাত পার্সেন্ট্ সুদে। বিপ্রদাস হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌ল।

কুমুদিনী ওদের শেষ অবশিষ্ট বোন্ বটে, তেমনি আজ ওদের সম্বলেরও শেষ অবশিষ্ট দশা। পণ জোটা-নোর, পাত্র জোটানোর কথা কল্পনা কর্‌তে গেলে আতঙ্ক হয়। দেখ্‌তে সে সুন্দরী, লম্বা ছিপ্‌ছিপে, যেন রজনী-গন্ধার পুষ্পদণ্ড; চোখ বড় না হোক্ একেবারে নিবিড় কালো, আর নাকটি নিখুঁত রেখায় যেন ফুলের পাপড়ি দিয়ে তৈরি। রং শাঁখের মতো চিকণ গৌর; নিটোল দু'খানি হাত; সে হাতের সেবা কমলার বরদান, কৃতজ্ঞ হ'য়ে গ্রহণ কর্‌তে হয়। সমস্ত মুখে একটি বেদনায় সকরুণ ধৈর্য্যের ভাব।

কুমুদিনী নিজের জন্যে নিজে সঙ্কুচিত। তার বিশ্বাস সে অপয়া। সে জানে পুরুষরা সংসার চালায় নিজের শক্তি দিয়ে, মেয়েরা লক্ষ্মীকে ঘরে আনে নিজের ভাগ্যের জোরে। ওর দ্বারা তা হোলো না। যখন থেকে ওর বোঝ্‌বার বয়স হ'য়েচে তখন থেকে চারিদিকে দেখ্‌চে দুর্ভাগ্যের পাপদৃষ্টি। আর সংসারের উপর চেপে আছে ওর নিজের আইবুড়ো দশা, জগদ্দল পাথর, তার যত বড়ো দুঃখ, তত বড়ো অপমান। কিছু করবার নেই কপালে করাঘাত ছাড়া। উপায় করবার পথ বিধাতা মেয়েদের দিলেন না, দিলেন কেবল ব্যথা পাবার শক্তি। অসম্ভব একটা কিছু ঘটেনা কি? কোনো দেবতার বর, কোনো যক্ষের ধন, পূর্ব্বজন্মের কোনো একটা বাকি-পড়া পাওনার এক মুহূর্ত্তে পরিশোধ? এক একদিন রাতে বিছানা থেকে উঠে বাগানের মর্ম্মরিত ঝাউগাছগুলোর মাথার উপরে চেয়ে থাকে, মনে মনে বলে, "কোথায় আমার রাজপুত্র, কোথায় তোমার সাতরাজার ধন মাণিক, বাঁচাও আমার ভাইদের, আমি চিরদিন তোমার দাসী হ'য়ে থাক্‌ব।"

বংশের দুর্গতির জন্যে নিজেকে যতই অপরাধী করে, ততই হৃদয়ের সুধাপাত্র উপুড় ক'রে ভাইদের ওর ভালো-বাসা দেয়,—কঠিন দুঃখে নেঙড়ানো ওর ভালোবাসা। কুমুর পরে তাদের কর্ত্তব্য করতে পারচে না ব'লে ওর ভাইরাও বড়ো ব্যথার সঙ্গে কুমুকে তাদের স্নেহ দিয়ে ঘিরে রেখেচে। এই পিতৃমাতৃহীনাকে উপরওয়ালা যে স্নেহের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করেচেন ভাইরা তা ভরিয়ে দেবার জন্যে সর্ব্বদা উৎসুক। ও যে চাঁদের আলোর টুক্‌রো, দৈন্যের অন্ধকারকে একা মধুর ক'রে রেখেচে। যখন মাঝে মাঝে দুর্ভাগ্যের বাহন ব'লে নিজেকে সে ধিক্কার দেয়, দাদা বিপ্রদাস হেসে বলে, "কুমু, তুই নিজেই তো আমাদের সৌভাগ্য,—তোকে না পেলে বাড়িতে শ্রী থাক্‌তো কোথায়?"

কুমুদিনী ঘরে পড়াশুনো করেচে। বাইরের পরিচয় নেই বল্লেই হয়। পুরোণো নতুন দুই কালের আলো-আঁধারে তার বাস। তার জগৎটা আব্‌ছায়া;—সেখানে রাজত্ব করে সিদ্ধেশ্বরী, গন্ধেশ্বরী, ঘেঁটু, ষষ্ঠী; সেখানে বিশেষ দিনে চন্দ্র দেখ্‌তে নেই; শাঁখ বাজিয়ে গ্রহণের কুদৃষ্টিকে তাড়াতে হয়; অম্বুবাচীতে সেখানে দুধ খেলে সাপের ভয় ঘোচে; মন্ত্র প'ড়ে, পাঁঠা মানত ক'রে, সুপুরি আলো-চাল ও পাঁচ পয়সার সিন্নি মেনে, তাগা তাবিজ প'রে, সে জগতের শুভ অশুভের সঙ্গে কারবার; স্বস্ত্য-য়নের জোরে ভাগ্য সংশোধনের আশা;—সে আশা হাজার-বার ব্যর্থ হয়। প্রত্যক্ষ দেখা যায় অনেক সময়েই শুভ লগ্নের শাখায় শুভফল ফলে না, তবু বাস্তবের শক্তি নেই

প্রমাণের দ্বারা স্বপ্নের মোহ কাটাতে পারে। স্বপ্নের জগতে বিচার চলে না, একমাত্র চলে মেনে চলা। এ জগতে দৈবের ক্ষেত্রে যুক্তির সুসঙ্গতি, বুদ্ধির কর্তৃত্ব, ভালোমন্দর নিত্যতত্ত্ব নেই ব'লেই কুমুদিনীর মুখে এমন একটা করুণা। ও জানে বিনা অপরাধেই ও লাঞ্ছিত। আট বছর হোলো সেই লাঞ্ছনাকে একান্ত সে নিজের ব'লেই গ্রহণ করেছিল—সে তার পিতার মৃত্যু নিয়ে।

৪

পুরোণো ধনী ঘরে পুরাতন কাল যে-দুর্গে বাস করে তার পাকা গাঁথুনি। অনেক দেউড়ি পার হ'য়ে তবে নতুন কালকে সেখানে ঢুকতে হয়। সেখানে যারা থাকে নতুন যুগে এসে পৌঁছতে তাদের বিস্তর লেট্ হ'য়ে যায়। বিপ্রদাসের বাপ মুকুন্দলালও ধাবমান নতুন যুগকে ধরতে পারেন নি।

দীর্ঘ তাঁর গৌরবর্ণ দেহ, বাবরি-কাটা চুল, বড়ো বড়ো টানা চোখে অপ্রতিহত প্রভুত্বের দৃষ্টি। ভারি গলায় যখন হাঁক পাড়েন, অনুচর-পরিচরদের বুক থর্ থর্ ক'রে কেঁপে ওঠে। যদিও পালোয়ান রেখে নিয়মিত কুস্তি করা তাঁর অভ্যাস, গায়ে শক্তিও কম নয়, তবু সুকুমার শরীরে শ্রমের চিহ্ন নেই। পরণে চুনট করা ফুর্‌ফুরে মসলিনের জামা, ফরাসডাঙ্গা বা ঢাকাই ধুতির বহযত্নবিন্যস্ত কোঁচা ভূলুণ্ঠিত, কর্তার আসন্ন আগমনের বাতাস ইস্তাম্বুল আতরের সুগন্ধবার্তা বহন করে। পানের সোনার বাটা হাতে খানসামা পশ্চাদ্বর্ত্তী, দ্বারের কাছে সর্বদা হাজির তক্‌মাপরা আরদালি। সদর দরজায় বৃদ্ধ চন্দ্রভান জমাদার তামাকমাখা ও সিদ্ধি-কোটার অবকাশে বেঞ্চে ব'সে লম্বা দাড়ি দুই ভাগ ক'রে বারবার আঁচড়িয়ে দুই কানের উপর বাঁধে, নিম্নতন দারোয়ানরা তলোয়ার হাতে পাহারা দেয়। দেউড়ির দেওয়ালে ঝোলে নানারকমের ঢাল, বাঁকা তলোয়ার, বহুকালের পুরাণো বন্দুক, বল্লম, বর্শা।

বৈঠকখানায় মুকুন্দলাল বসেন গদির উপর, পিঠের পিছে তাকিয়া। পারিষদেরা বসে নীচে, সামনে বাঁয়ে দুই ভাগে। হুঁকাবরদারের জানা আছে এদের কার সম্মান কোন্ রকম হুঁকোয় রক্ষা হয়, বাঁধানো, আবাঁধানো, —না, গুড়্‌গুড়ি। কর্তা মহারাজের জন্যে বৃহৎ আলবোলা, গোলাপজলের গন্ধে সুগন্ধী।

বাড়ির আরেক মহলে বিলিতি বৈঠকখানা, সেখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর বিলিতি আসবাব। সামনেই কালো-দাগ-ধরা মস্ত এক আয়না, তার গিল্‌টি-করা ফ্রেমের দুই গায়ে ডানাওয়ালা পরীমূর্ত্তির হাতে-ধরা বাতিদান। তলায় টেবিলে সোনার জলে চিত্রিত কালো পাথরের ঘড়ি, আর কতকগুলো বিলিতি কাঁচের পুতুল। খাড়া-পিঠওয়ালা চৌকি, সোফা, কড়িতে দোদুল্যমান ঝাড়-লণ্ঠন সমস্তই হল্যাণ্ড-কাপড়ে মোড়া। দেয়ালে পূর্ব্ব-পুরুষদের অয়েল-পেণ্টিং, আর তার সঙ্গে বংশের মুরুব্বি দু'একজন রাজপুরুষের ছবি। ঘরজোড়া বিলিতি কার্পেট, তাতে মোটা মোটা ফুল টক্‌টকে কড়া রঙে আঁকা। বিশেষ ক্রিয়া-কর্ম্মে জিলার সাহেব-সুবাদের নিমন্ত্রণোপলক্ষ্যে এই ঘরের অবগুণ্ঠন মোচন হয়। বাড়িতে এই একটা মাত্র আধুনিক ঘর, কিন্তু মনে হয় এইটেই সব চেয়ে প্রাচীন ভূতে-পাওয়া কামরা, অব্যবহারের রুদ্ধ ঘনগন্ধে দম্-আটকানো দৈনিক জীবনযাত্রার সম্পর্কবঞ্চিত বোবা।

মুকুন্দলালের যে-সৌখীনতা সেটা তখনকার আদব-কায়দার অত্যাবশ্যক অঙ্গ। তার মধ্যে যে-নির্ভীক ব্যয়-বাহুল্য, সেইটেতেই ধনের মর্য্যাদা। অর্থাৎ ধন বোঝা হ'য়ে মাথায় চড়েনি, পাদপীঠ হ'য়ে আছে পায়ের তলায়। এঁদের সৌখীনতায় আম-দরবারে দান-দাক্ষিণ্য, খাস-দরবারে ভোগবিলাস,—দুইই খুব টানা মাপের। একদিকে আশ্রিত বাৎসল্যে যেমন অকৃপণতা, আর একদিকে ঔদ্ধত্যদমনে তেম্‌নি অবাধ অধৈর্য্য। একজন হঠাৎ-ধনী প্রতিবেশী গুরুতর অপরাধে কর্তার বাগানের মালীর ছেলের কান ম'লে দিয়েছিল মাত্র; এই ধনীর শিক্ষাবিধান বাবদ যত খরচ হয়েচে, নিজের ছেলেকে কলেজ পার করতেও এখনকার দিনে এত খরচ করে না। অথচ মালীর ছেলেটাকেও অগ্রাহ্য করেন নি। চাব্‌কিয়ে তাকে শয্যা-গত করেছিলেন। রাগের চোটে চাবুকের মাত্রা বেশি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হয়েছিল ব'লে ছেলেটার উন্নতি হ'ল। সরকারী খরচে পড়াশুনো ক'রে সে আজ মোক্তারি করে।

পুরাতন কালের ধনবানদের প্রথা মতো মুকুন্দলালের জীবন ছুই মহলা। এক মহলে গার্হস্থ্য, আর এক মহলে ইয়ার্কি। অর্থাৎ এক মহলে দশকর্ম্ম, আর এক মহলে একাদশ অকর্ম্ম। ঘরে আছেন ইষ্টদেবতা আর ঘরের গৃহিণী। সেখানে পূজা-অর্চনা, অতিথি-সেবা, পাল-পার্ব্বণ, ব্রত-উপবাস, কাঙালী-বিদায়, ব্রাহ্মণ-ভোজন, পাড়া-পড়শী, গুরু-পুরোহিত। ইয়ারমহল গৃহসীমার বাইরেই, সেখানে নবাবী আমল, মজলিসি সমারোহে সরগরম। এইখানে আনাগোনা চল্‌ত গৃহের প্রত্যন্তপুরবাসিনীদের। তাদের সংসর্গকে তখনকার ধনীরা সহবৎ শিক্ষার উপায় ব'লে গণ্য করত। ছুই বিরুদ্ধ হাওয়ার ছুই কক্ষবর্ত্তী গ্রহ-উপগ্রহ নিয়ে গৃহিণীদের বিস্তর সহ্য কর্‌তে হয়।

মুকুন্দলালের স্ত্রী নন্দরাণী অভিমানিনী, সহ্য করাটা তাঁর সম্পূর্ণ অভ্যাস হোলো না। তার কারণ ছিল। তিনি নিশ্চিত জানেন বাইরের দিকে তাঁর স্বামীর তানের দৌড় যতদূরই থাক্ তিনিই হচ্চেন ধুয়ো. ভিতরের শক্ত টান তাঁরই দিকে। সেই জন্যেই স্বামী যখন নিজের ভালোবাসার পরে নিজে অন্যায় করেন, তিনি সেটা সইতে পারেন না। এবারে তাই ঘট্‌লো।

৫

রাসের সময় খুব ধুম। কতক কলকাতা কতক ঢাকা থেকে আমোদের সরঞ্জাম এলো। বাড়ির উঠোনে কৃষ্ণ-যাত্রা, কোনোদিন বা কীর্ত্তন। এইখানে মেয়েদের ও সাধারণ পাড়াপড়শির ভিড়। অন্যবারে তামসিক আয়োজনটা হ'ত বৈঠকখানা ঘরে; অন্তঃপুরিকারা, রাতে ঘুম নেই, বুকে ব্যথা বিঁধ্‌চে, দরজার ফাঁক দিয়ে কিছু কিছু আভাস নিয়ে যেতে পারতেন। এবারে খেয়াল গেল বাইনাচের ব্যবস্থা হবে বজরায় নদীর উপর।

কি হচ্চে দেখবার জো নেই ব'লে নন্দরাণীর মন কৃষ্ণ-বাণীর অন্ধকারে আছড়ে আছড়ে কাঁদতে লাগ্‌লো। ঘরে কাজকর্ম্ম, লোককে খাওয়ানো-দাওয়ানো দেখাশুনো হাসিমুখেই কর্‌তে হয়। বুকের মধ্যে কাঁটাটা নড়্‌তে চড়্‌তে কেবলি বেঁধে, প্রাণটা হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে ওঠে, কেউ জান্‌তে পারে না। ও-দিকে থেকে থেকে তৃপ্ত কণ্ঠের রব ওঠে, জয় হোক্ রাণীমার।

অবশেষে উৎসবের মেয়াদ ফুরোলো, বাড়ি হ'য়ে গেলো খালি। কেবল ছেঁড়া কলাপাতা ও সরা খুরি ভাঁড়ের ভগ্নশেষের উপর কাক কুকুরের কলরব-মুখর উত্তর-কাণ্ড চল্‌চে। ফরাসেরা সিঁড়ি খাটিয়ে লণ্ঠন খুলে নিলো, চাঁদোয়া নামালো, ঝাড়ের টুক্‌রো বাতি ও শোলার ফুলের ঝালরগুলো নিয়ে পাড়ার ছেলেরা কাড়াকাড়ি বাধিয়ে দিলো। সেই ভিড়ের মধ্যে মাঝে মাঝে চড়ের আওয়াজ ও চীৎকার কান্না যেন তারস্বরের হাউইয়ের মতো আকাশ ফুঁড়ে উঠ্‌চে। অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণ থেকে উচ্ছিষ্ট ভাত তরকারির গন্ধে বাতাস অম্লগন্ধী; সেখানে সর্ব্বত্র ক্লান্তি, অবসাদ ও মলিনতা। এই শূন্যতা অসহ্য হ'য়ে উঠ্‌ল যখন মুকুন্দলাল আজও ফিরলেন না। নাগাল পাবার উপায় নেই ব'লেই নন্দরাণীর ধৈর্য্যের বাঁধ হঠাৎ ফেটে খান্ খান্ হ'য়ে গেলো।

দেওয়ানজিকে ডাকিয়ে পরদার আড়াল থেকে বল্‌লেন,—"কর্ত্তাকে বল্‌বেন, বৃন্দাবনে মার কাছে আমাকে এখনি যেতে হচ্চে। তাঁর শরীর ভালো নেই।"

দেওয়ানজি কিছুক্ষণ টাকে হাত বুলিয়ে মৃদুস্বরে বল্‌লেন,—"কর্ত্তাকে জানিয়ে গেলেই ভালো হ'ত, মা ঠাক্‌রুণ। আজকালের মধ্যে বাড়ি ফিরবেন খবর পেয়েচি।"

"না, দেরী কর্‌তে পারব না।"

নন্দরাণীও খবর পেয়েছেন আজকালের মধ্যেই ফের্‌বার কথা। সেই জন্যেই যাবার এত তাড়া। নিশ্চয় জানেন, অল্প একটু কান্নাকাটি সাধ্যসাধনাতেই সব শোধ হ'য়ে যাবে। প্রতিবারই এমনি হয়েচে। উপযুক্ত শাস্তি অসমাপ্তই থাকে। এবারে তা কিছুতেই চল্‌বে না। তাই দণ্ডের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েই দণ্ডদাতাকে পালাতে হচ্চে। বিদায়ের ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে পা সর্‌তে চায় না—শোবার খাটের উপর উপুড় হ'য়ে প'ড়ে ফুলে ফুলে কান্না। কিন্তু যাওয়া বন্ধ হোলো না।

তখন কার্ত্তিক মাসের বেলা ছটো। রৌদ্রে বাতাস আতপ্ত। রাস্তার ধারের সিসু তরুশ্রেণীর মর্ম্মরের সঙ্গে মিশে কচিৎ গলা-ভাঙা কোকিলের ডাক আস্‌চে। যে রাস্তা দিয়ে পাল্কী চলেচে, সেখান থেকে কাঁচা ধানের ক্ষেতের পরপ্রান্তে নদী দেখা যায়। নন্দরাণী থাক্‌তে পারলেন না, পাল্কীর দরজা ফাঁক ক'রে সেদিকে চেয়ে দেখ্‌লেন। ওপারের চরে বজ্‌রা বাঁধা আছে, চোখে পড়্‌ল। মাস্তুলের উপর নিশেন উড়্‌চে। দূর থেকে মনে হোলো, বজ্‌রার ছাতের উপর চিরপরিচিত গুপি হরকরা ব'সে; তার পাগ্‌ড়ির তক্‌মার উপর সূর্য্যের আলো ঝক্‌মক্‌ কর্‌চে। সবলে পাল্কীর দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন, বুকের ভিতরটা পাথর হ'য়ে গেলো।

৬

মুকুন্দলাল, যেন মাস্তুল-ভাঙা, পাল-ছেঁড়া, টোল-খাওয়া, তুফানে আছাড় লাগা জাহাজ, সংকোচে বন্দরে এসে ভিড়্‌লেন। অপরাধের বোঝায় বুক ভারী। প্রমোদের স্মৃতিটা যেন অতি-ভোজনের পরের উচ্ছিষ্টের মতো মনটাকে বিতৃষ্ণায় ভ'রে দিয়েছে। যারা ছিল তাঁর এই আমোদের উৎসাহ-দাতা উদ্যোগকর্ত্তা, তারা যদি সাম্‌নে থাক্‌ত তাহ'লে তাদের ধ'রে চাবুক কষিয়ে দিতে পারতেন। মনে মনে পণ কর্‌চেন আর কখনো এমন হ'তে দেবেন না। তাঁর আলুথালু চুল, রক্তবর্ণ চোখ আর মুখের অতি শুষ্কভাব দেখে প্রথমটা কেউ সাহস ক'রে কর্ত্রীঠাকুরুণের খবরটা দিতে পারলেন না, মুকুন্দলাল ভয়ে ভয়ে অন্তঃপুরে গেলেন। "বড় বৌ, মাপ করো, অপরাধ করেছি, আর কখনো এমন হবে না" এই কথা মনে মনে বল্‌তে বল্‌তে শোবার ঘরের দরজার কাছে একটুখানি থমকে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে ভিতরে ঢুক্‌লেন। মনে মনে নিশ্চয় স্থির করেছিলেন যে অভিমানিনী বিছানায় প'ড়ে আছেন। একেবারে পায়ের কাছে গিয়ে পড়্‌বেন এই ভেবে ঘরে ঢুকেই দেখ্‌লেন ঘর শূন্য। বুকের ভিতরটা দ'মে গেল। শোবার ঘরে বিছানায় নন্দরাণীকে যদি দেখ্‌তেন তবে বুঝ্‌তেন যে, অপরাধ ক্ষমা করবার জন্যে মানিনী অর্দ্ধেক রাস্তা এগিয়ে আছেন। কিন্তু বড়-বৌ যখন শোবার ঘরে নেই তখন মুকুন্দলাল বুঝ্‌লেন তাঁর প্রায়শ্চিত্তটা হবে দীর্ঘ এবং কঠিন। হয় তো আজ রাত পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর্‌তে হবে, কিম্বা তবে আরো দেরী। কিন্তু এতক্ষণ ধৈর্য্য ধ'রে থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। সম্পূর্ণ শাস্তি এখনি মাথা পেতে নিয়ে ক্ষমা আদায় করবেন, নইলে জলগ্রহণ করবেন না। বেলা হয়েছে, এখনো স্নানাহার হয়নি, এ দেখে কি সাধ্বী থাক্‌তে পারবেন? শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখ্‌লেন, প্যারী দাসী বারান্দার এক কোণে মাথায় ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞাসা করলেন, "তোর বড়ো বৌমা কোথায়?"

সে বল্‌লে, "তিনি তাঁর মাকে দেখ্‌তে পরশুদিন বৃন্দাবনে গেছেন।"

ভালো যেন বুঝ্‌তে পারলেন না, রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় গেছেন?"

"বৃন্দাবনে। মায়ের অসুখ।"

মুকুন্দলাল একবার বারান্দার রেলিং চেপে ধ'রে দাঁড়ালেন। তারপরে দ্রুতপদে বাইরের বৈঠকখানায় গিয়ে একা ব'সে রইলেন। একটি কথা কইলেন না। কাছে আস্‌তে কারো সাহস হয় না।

দেওয়ানজি এসে ভয়ে ভয়ে বল্‌লেন, "মাঠাকুরুণকে আন্‌তে লোক পাঠিয়ে দিই?"

কোনো কথা না ব'লে কেবল আঙুল নেড়ে নিষেধ করলেন। দেওয়ানজি চ'লে গেলে রাধু খানসামাকে ডেকে বল্‌লেন, "ব্র্যাণ্ডি লে আও।"

বাড়িশুদ্ধ লোক হতবুদ্ধি। ভূমিকম্প যখন পৃথিবীর গভীর গর্ভ থেকে মাথা নাড়া দিয়ে ওঠে তখন যেমন তাকে চাপা দেবার চেষ্টা করা মিছে, নিরুপায়ভাবে তার ভাঙা-চোরা সহ্য করতেই হয়,—এ-ও তেমনি।

দিনরাত্ত চল্‌চে নির্জ্জল ব্র্যাণ্ডি। খাওয়া-দাওয়া প্রায় নেই। এমনি শরীর পূর্ব্ব থেকেই ছিল অবসন্ন, তারপরে এই প্রচণ্ড অনিয়মে বিকারের সঙ্গে রক্তবমন দেখা দিলো।

কলকাতা থেকে ডাক্তার এলো,—দিনরাত মাথায় বরফ চাপিয়ে রাখ্‌লে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মুকুন্দলাল যাকে দেখেন রেগে ওঠেন, তাঁর বিশ্বাস তাঁর বিরুদ্ধে বাড়িসুদ্ধ লোকের চক্রান্ত। ভিতরে ভিতরে একটা নালিশ গুমরে উঠ্‌ছিল,—এরা যেতে দিলে কেন?

একমাত্র মানুষ যে তাঁর কাছে আস্‌তে পার্‌ত সে কুমুদিনী। সে এসে পাশে বসে; ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তার মুখের দিকে মুকুন্দলাল চেয়ে দেখেন,—যেন মার সঙ্গে ওর চোখে কিম্বা কোথাও একটা মিল দেখ্‌তে পান। কখনো কখনো বুকের উপরে তার মুখ টেনে নিয়ে চুপ ক'রে চোখ বুজে থাকেন, চোখের কোণ দিয়ে জল প'ড়তে থাকে, কিন্তু কখনো ভুলে একবার তার মার কথা জিজ্ঞাসা করেন না। এদিকে বৃন্দাবনে টেলিগ্রাম গেছে। কর্ত্রী ঠাক্‌রুণের কালই ফের্‌বার কথা। কিন্তু শোনা গেল কোথায় এক জায়গায় রেলের লাইন গেছে ভেঙে।

৭

সে-দিন তৃতীয়া; সন্ধ্যাবেলায় ঝড় উঠ্‌ল। বাগানে মড়্ মড়্ ক'রে গাছের ডাল ভেঙে পড়ে। থেকে থেকে বৃষ্টির ঝাপ্‌টা ঝাঁকানী দিয়ে উঠ্‌ছে ক্রুদ্ধ অধৈর্য্যের মতো। লোকজন খাওয়াবার জন্যে যে চালাঘর তোলা হয়েছিল তার করগেটেড্ লোহার চাল উড়ে দীঘিতে গিয়ে পড়্‌ল। বাতাস, বাণবিদ্ধ বাঘের মতো গোঁ গোঁ ক'রে গোঙরাতে গোঙরাতে আকাশে আকাশে ল্যাজ ঝাপ্‌টা দিয়ে পাক্ খেয়ে বেড়ায়।

হঠাৎ বাতাসের এক দমকে জানলা-দরজাগুলো খড়্-খড়্ ক'রে কেঁপে উঠ্‌ল। কুমুদিনীর হাত চেপে ধ'রে মুকুন্দলাল বল্‌লেন, "মা কুমু, ভয় নেই, তুই তো কোনো দোষ করিসনি। ঐ শোন্ দাঁতকড়্‌মড়ানি, ওরা আমাকে মারতে আস্‌চে।"

বাবার মাথার বরফের পুঁটুলি বুলোতে বুলোতে কুমুদিনী বলে, "মারবে কেন বাবা? ঝড় হচ্চে, এখনি থেমে যাবে।"

"বৃন্দাবন? বৃন্দাবন.. চন্দ্র...চক্রবর্ত্তী। বাবার আমলের পুরুৎ—সে তো ম'রে গেছে—ভূত হ'য়ে গেছে বৃন্দাবনে। কে বল্‌লে সে আস্‌বে?"

"কথা কোয়ো না, বাবা, একটু ঘুমোও!"

"ঐ যে, কাকে বল্‌চে, খবরদার, খবরদার!"

"কিছু না, বাতাসে বাতাসে গাছগুলোকে ঝাঁকানি দিচ্চে।"

"কেন, ওর রাগ কিসের? এতই কি দোষ করেচি, তুই বল্ মা!"

"কোনো দোষ করোনি বাবা! একটু ঘুমোও।"

"বিন্দে দূতী? সেই যে মধু অধিকারী সাজত।

মিছে করো কেন নিন্দে,

ওগো বিন্দে শ্রীগোবিন্দে—"

চোখ বুজে গুন্ গুন্ ক'রে গাইতে লাগ্‌লেন।

"কার বাঁশি ঐ বাজে বৃন্দাবনে?

সই লো, সই

ঘরে আমি রইব কেমনে?

রাধু, ব্র্যাণ্ডি লে আও!"

কুমুদিনী বাবার মুখের দিকে ঝুঁকে প'ড়ে বলে, "বাবা, ও কি বল্‌চ?" মুকুন্দলাল চোখ চেয়ে তাকিয়েই জিভ কেটে চুপ করেন। বুদ্ধি যখন অত্যন্ত বেঠিক তখনো এ-কথা ভোলেননি যে, কুমুদিনীর সামনে মদ চল্‌তে পারে না।

একটু পরে আবার গান ধরলেন,

"শ্যামের বাঁশি কাড়তে হবে,

নইলে আমায় এ বৃন্দাবন ছাড়তে হবে।"

এই এলোমেলো গানের টুক্‌রোগুলো শুনে কুমুর বুক ফেটে যায়,—মায়ের উপর রাগ ক'রে, বাবার পায়ের তলায় মাথা রেখে, যেন মায়ের হ'য়ে মাপ চাওয়া।

মুকুন্দ হঠাৎ ডেকে উঠ্‌লেন, "দেওয়ানজি!"

দেওয়ানজি আস্‌তে তাকে বল্‌লেন, "ঐ যেন ঠক্ ঠক্ শুন্‌তে পাচ্চি।"

দেওয়ানজি বল্‌লেন, "বাতাসে দরজা নাড়া দিচ্চে।"

"বুড়ো এসেচে, সেই বৃন্দাবনচন্দ্র—টাক মাথায়, লাঠি হাতে, চেলির চাদর কাঁধে। দেখে এসো ত। কেবলি ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্ করচে। লাঠি, না খড়ম?"

রক্তবমন কিছুক্ষণ শান্ত ছিল। তিনটে রাত্রে আবার আরম্ভ হ'ল। মুকুন্দলাল বিছানার চারিদিকে হাত বুলিয়ে জড়িতস্বরে বল্‌লেন, "বড়-বৌ, ঘর যে অন্ধকার! এখনো আলো জ্বালবে না?"

বজ্‌রা থেকে ফিরে আস্‌বার পর মুকুন্দলাল এই প্রথম স্ত্রীকে সম্ভাষণ করলেন,—আর এই শেষ।

বৃন্দাবন থেকে ফিরে এসে নন্দরাণী বাড়ির দরজার কাছে মূর্চ্ছিত হ'য়ে লুটিয়ে পড়লেন। তাঁকে ধরাধরি ক'রে বিছানায় এনে শোয়ালো। সংসারে কিছুই তাঁর আর রুচ্‌লো না। চোখের জল একেবারে শুকিয়ে গেলো। ছেলেমেয়েদের মধ্যেও সান্ত্বনা নেই। গুরু এসে শাস্ত্রের শ্লোক আওড়ালেন, মুখ ফিরিয়ে রইলেন। হাতের লোহা খুললেন না—বল্‌লেন, "আমার হাত দেখে বলেছিল আমার এয়োৎ ক্ষয় হবে না। সে কি মিথ্যে হ'তে পারে?"

দূর সম্পর্কের ক্ষেমা ঠাকুরঝি আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে বল্‌লেন, "যা হবার তাতো হয়েচে, এখন ঘরের দিকে তাকাও। কর্ত্তা যে যাবার সময় বলে গেছেন, বড়-বৌ, ঘরে কি আলো জ্বালবে না?"

নন্দরাণী বিছানা থেকে উঠে ব'সে দূরের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন, "যাবো, আলো জ্বাল্‌তে যাবো। এবার আর দেরি হবে না।" ব'লে তাঁর পাণ্ডুবর্ণ শীর্ণ মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল, যেন হাতে প্রদীপ নিয়ে এখনি যাত্রা ক'রে চলেচেন।

সূর্য্য গেছেন উত্তরায়ণে; মাঘ মাস এলো, শুক্ল চতুর্দ্দশী। নন্দরাণী কপালে মোটা ক'রে সিঁদুর পরলেন, গায়ে জড়িয়ে নিলেন লাল বেনারসী সাড়ি। সংসারের দিকে না তাকিয়ে মুখে হাসি নিয়ে চ'লে গেলেন।

(ক্রমশ)



পাহাড়িয়া



তিন-দরিয়া

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—গদ্য-ছন্দ—

ধাব্‌লা পাহাড়ের ঠিক নীচেই
কাঁতি-কালো করাতি-পাহাড়,
তারও নীচে তিনমুখে তিনটে চুড়ো
—মনিয়া-পাহাড়, তুঁতিয়া-পাহাড়, সুর্খি-পাহাড়—
—লাল সবুজ নীল,
রঙ ফেরায় ওরা সকালে বৈকালে দুপুরে।

তিন পাহাড়ের অনেক নীচে,—
ভাঙ্গনের ধারেই, টুংসুং বস্তি,
বস্তি পাহাড়ের অনেক উপরে,—
মশানের কাছেই শালবন,—
—চিতার ধুঁয়াতে ঝাপ্‌সা দিনরাতই—
টুংসুং লামার গুম্ফা উঠ্‌ছে সেখানে।



কথা দিয়েছে বস্তির মেয়েরা
—পাথর তুলে দেবে জনে জনে তিনশো ষাট,
সুরু করেছে সবাই পাথর বহার শক্ত কাজ।

নীচে থেকে উপর পাহাড় অনেকটা পথ,
সেখানে উঠে যায় মেয়েরা রোজই,—
ভারি ভারি পাথর ব'য়ে,
—দেওয়ালের পাথর, দেউলের পাথর
ব'য়ে চলে একে একে,
পিঠে ভার যায় মেয়েরা—
সারি সারি পিপীলিকা যেন।



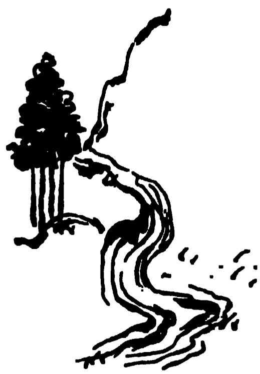
চড়াই পথ বিষম সরু,—
ঠেকেছে গিয়ে মেঘের গোড়ায়,
—কুন্‌রী-ঝোপের টাট্‌কা সবুজে আড়াল-করা হাঁটাপথ—
বেগানা পথটা গড়ানে পিছল,
খোঁচা খোঁচা পাথর বিছানো,—
চ'লে গেছে মশান ছাড়িয়ে
কত যে উপরে ঠিক নেই;
মরা ঝর্ণা কেটে গেছে পথটা কতকাল হ'ল,—
থেকে থেকে ঝাঁপে পথ রঙ-কুয়াসা,
রোদ পড়ে থেকে থেকে এ পথে,—
পায়ের তলায় পাথর ক'খানা
আগুন হ'য়ে ওঠে।
কতদিন ধ'রে চ'লেছে এ পথে কত না মেয়ে,—
পাথরের বোঝা নামিয়ে দিয়েছে মশানের ধারেই
সে কত বার তা'র হিসেব নেই।

ব্রতচারিণী বস্তির মেয়েরা,—
ছোটবড় সবাই করছে কঠোর,—
শোধায় না কেউ পূর্ণ হবে ব্রত কতদিনে,
কথাটি নেই, হাসি হাসি মুখ
ক'রে চলেছে কাজ সমাধা টুংমুং গুম্ফার,
আনন্দ পায় এরা ভারি বোঝা ব'য়ে,—
কুয়াসায় উপরে উপরে চলে চলায়,
এরা জানে মশান ছাড়িয়ে উপর-বনেতে,
পিয়াশালের নিবিড় ছায়ায়,
উঠবে একদিন অটুট গুম্ফা,—
টুংমুং বস্তির কামনা-জড়ানো পাথরে পাথরে
আকাশের খুব কাছাকাছি।

পাহাড়িয়া

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বস্তি ছেড়ে একটু তফাতে,
পাইনিয়া বনের ধারেই,
দেখা যায় তিখ্-ঝর্ণা নেমে এসেছে,—
সে যেন তিন পাহাড়ের আশীর্ব্বাদ
ব’য়ছে দিনরাত ধারা দিয়ে ত্রিধারায়।



এইখানটিতে দিনরাতই
রৌদ্রে-ছায়াতে লতায়-পাতায়,—
মনের কথা চালাচালি করে,
ঝর্ণার জলে অচল পাথরে
কথা হয় যেন কত কী!
তল্লাটের মেয়েরা আসে,
দূর দূর থেকে এইখানে,
মান্‌সিক্ দিতে ঝর্ণাতলায়,
মান্‌সা-পুজোর ডালা ব’য়ে
অপরাহ্নে রোজই আসে
মেয়ে কয়টি একা দোকা।

তিখ্-ঝর্ণার উপরে নীচে, অরণ্যে পাহাড়ে
আছেন দেবতা একলাটি,
ঝর্ণার বুকে জমাকরা পাষাণ
সেখানে আছেন তিনি চিরদিনই,—
—দাঁড়িয়ে আছেনই সাদা কালো শিল-পাটে পা রেখে—
মানস জানাতে তিনি, মনখানি জান্‌তেও তিনি।

তিনি বনের দেবতা,—
বসেন সকালের ফুলে, সন্ধ্যার ফুলে, রাতের ফুলে;
তিনি জলের দেবতা,—
আছেন ঝর্ণায়, আছেন নদীতে, আছেন সাগরেও;
জলমাটির দেবতা তিনি,—
জাগেন স্রোতে-ঘেরা পাথরে,
ঘুমান পদ্মবনের গোড়াতে একলা,
—পলকে পলকে পূজো নেন্ তিনি বস্তির মেয়ের।

মন জানিয়ে কত কী লেখা নতুন নিশান,—
এপার গাছের নতুন পাতার,
ওপার গাছের ফুলের ডালে,—
জল ঝরে মাঝে পাথরে পাথরে।
এইখানে দেয় মান্‌সিক বস্তির মেয়েরা,—
—ধরে বেজোড় ফুল, নতুন পুতুল পিটুলীর, বাতিধূপের—
মানস জানিয়ে পূজা করে মনে মনে,—
ফেরে যে যার বস্তিতে একা দোকা,
জলতে থাকে ঝর্ণা-তলায় মান্‌সা-পিদুম—
একটি, দুটি, তিনটি।



বাতাসের মুখেই ধরা
মনের-কথা-জানানো বাতি,—
যত্নে-তোলা বেজোড় ফুল,—
পল্‌কা পিটুলির খেলার পুতুল,—
কত নেভে, কত থাকে জলে,—
কত ভেসে যায়, কত বা শুখায়,—
কত ভেঙ্গে প'ড়ে, কত পায় ক্ষয়,—
সংখ্যা নেই তা'র।



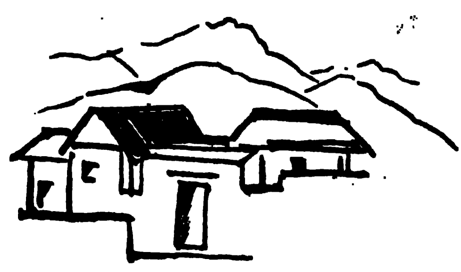
সাঁজ-সেঁজুতীর বেলাশেষে
যখন হিম হ'ল রোদ,—
ঘুমিয়ে গেল যোনান্ পাখী সোনালী রূপালী,
—আলিসে-হেলা পলাশ-ডালে
যেন সে ফুলটি জোড়-ভাঙ্গা,—
সন্ধ্যাতারা এল চুপে চুপে,—
পূজার বেলায় মানস-পিদুম্
নামিয়ে রাখ্‌লে বনের ধারেই,—
নিরিবিলি এ-সময় ভিখ্‌-ঝর্ণাতে
মেয়েদের দেওয়া মান্‌সা-পিদুম
যে-কথা জানায় মানস-দেবতাকে নিরালা পেয়ে,—
বস্তির মেয়ের মনই জানে তা'র সন্ধান।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আকাশে-ধরা তারার পিছম্
নিত্য জলে, নিত্য নেভে,
ঝর্ণায়-দেওয়া মান্‌সা-বাতি
এই জলে, এই জলে না,—
বস্তির মেয়ের মনের কোণে মান্‌সা নিত্যই
মনে মনে জ্ব'লে, মনেতে মেলায়—তিনসন্ধ্যা।

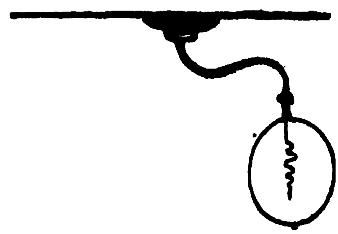
রাত্রিমুখে পরাহ-পাখী ডাকাডাকি করে,—
আঁখ্‌লী-ফুলের কাঁটার বেড়ায়;
দিন হয় শেষ রঙে রঙে ঝড় উঠিয়ে,
পাহাড়ে পাহাড়ে চম্‌কায় রঙ,—
পদ্মরাগ নীলকান্ত অয়স্কান্ত,
ইন্দ্রধনুর রঙের টঙ্কার বাজে মেঘে মেঘে,—
ফুটে ওঠে ফুল।শিমুল, পলাশ, করবী, কাঞ্চন,—
ঝলক্ দেয় পাতা হরিৎ-পীৎ, নীল-পীত, নীলারুণ,—
রঙ ফেরায় দিক্ বিদিক
বহুরূপ, বহুরঙ।

চক্‌বাজারে সিনেমা-হাউস
জ্বালে এ সময়ে বিজ্‌লী-বাতি,
চলে সবাই বস্তির মেয়েরা,—
চলন্ত-ছবির তামাসা দেখ্‌তে,
রঙ্গিণী সব, রঙ্গীন সাজ,
বড় রাস্তায় হেলে দুলে চলে,
—হয়দী কম্‌লী শ্যাম্‌লী সুরথী—
ঝিলিমিলি রঙ চম্‌কায় পুঁতির গহনায়,—
ফিরোজী কাঁচের বুক পাটায়,—
ফুলকাটা সাটিনের আঙ্‌রাখায়,
সোনার হারে, গালার চুড়ি ঝমঝমে কঙ্কনে;



নতুন ক'রে সেজেছে সবাই,
রুখ্ চুলে বেণী দুলিয়ে চ'লেছে পান খেয়ে;—
থিয়েটারে-শেখা বাংলা গান মুখে মুখে সবারই,

—নয়ানবাণ ভুরুধনুর খিচুড়ি পাকানো গান—
সিনেমা-হাউসের সাইনবোর্ডের কাছেই,—
আধা-পরিষ্কার আধা-ঘোলাটে বিজ্‌লী-বাতির
ফানুস ঘিরে পতঙ্গ যেন ঘোরেফেরে সবাই,
সাপের মতো কুণ্ডলী পাকানো,—
জলন্ত তার-বিজুলীটা,—
আলোর ধাঁধা দিয়ে চায় অন্ধকারে ;
লামার পাহাড়, ভিখ্‌ঝর্ণা
দেখে না আর বস্তির মেয়েরা—
মনের কোণেও।



তিন পাহাড়ের তিন্‌টে রঙ নেভে আস্তে এ সময়ে,-
ওঠে চাঁদ টোল্‌-খাওয়া গোল,
—ত্রিশির ভৈরবের মস্ত চোখ্‌টা চেয়ে দেখে যেন ; —
টুংসুং লামার পাথরের স্তূপটা মশানের ধারেই
দেখায় আকাশের গায়ে কালি দিয়ে টানা ;
অন্ধকারে সবার উপরে ফুটে ওঠে ধব্‌লাগিরি
—শিলা-সাদা, ফেনী-সাদা, ধুতুরী-সাদা।



দুপুর রাতে বিজ্‌লী-বাতি
সিনেমা হাউসে নেভে দপ্‌ করে,—
ঘরে ফেরে বস্তির মেয়েরা,—
চাঁদের আলো ঠাণ্ডা লাগে চোখে,
দোকান্ পাট বন্ধ এখন,
কাফি-খানা ফেলেছে ঝাঁপ,
রাস্তায় প'ড়েছে ঘরের ছাওয়া সুর্ম্মি-কালো—
একটা, দুটো, তিনটে॥



—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়াসু

যাত্রা যখন আরম্ভ করা গেল আকাশ থেকে বর্ষার পর্দা তখন সরিয়ে দিয়েচে; সূর্য্য আমাকে অভিনন্দন করলেন। কলকাতা থেকে মাদ্রাজ পর্য্যন্ত যতদূর গেলুম, রেলগাড়ির জানলা দিয়ে চেয়ে চেয়ে মনে হ'ল পৃথিবীতে সবুজের বান ডেকেচে। শ্যামলের বাঁশীতে তানের পর তান লাগ্‌চে তার আর বিরাম নেই। ক্ষেতে ক্ষেতে নতুন ধানের অঙ্কুরে কাঁচা রং, বনে বনে রস-পরিপুষ্ট প্রচুর পল্লবের ঘন সবুজ। ধরণীর বুকের থেকে অহল্যা জেগে উঠেচেন, নবদূর্ব্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রের পায়ের স্পর্শ লাগ্‌ল।

প্রকৃতির এই নব জীবনের উৎসবে রূপের উত্তরে রসের গান গাবার জন্যেই আমি এসেছিলুম এই কথাই কেবল মনে পড়ে। কাজের লোকেরা জিজ্ঞাসা করে, তার দরকার কি? বলে, ওটা সৌখীনতা। অর্থাৎ এই প্রয়োজনের সংসারে আমরা বাহুল্যের দলে। তাতে লজ্জা পাবো না। কেননা এই বাহুল্যের দ্বারাই আত্মপরিচয়।

হিসাবী লোকেরা একটা কথা বারবার ভুলে যায় যে, প্রচুরের সাধনাতেই প্রয়োজনের সিদ্ধি; এই আষাঢ়ের পৃথিবীতে সেই কথাটাই জানালো। আমি চাই ফসল, যেটুকুতে আমার পেট ভরবে। সেই স্বল্প প্রত্যাশাকে মূর্ত্তিমান দেখি তখনি যখন বর্ষণে অভিষিক্ত মাটির ভাণ্ডারে শ্যামল ঐশ্বর্য্য আমার প্রয়োজনকে অনেক বেশি ছাপিয়ে পড়ে। মুষ্টি ভিক্ষাও জোটেনা যখন ধনের সঙ্কীর্ণতা সেই মুষ্টিকে না ছাড়িয়ে যায়। প্রাণের কারবারে প্রাণের মুনফাটাই লক্ষ্য, এই মুনফাটাই বাহুল্য। আমাদের সন্ন্যাসী মানুষরা এই বাহুল্যটাকে নিন্দা করে; এই বাহুল্যকেই নিয়ে কবিদের উৎসব। খরচপত্র বাদেও যথেষ্ট উদ্‌বৃত্ত যদি থাকে তবেই সাহস ক'রে খরচপত্র চলে এই কথাটা মানি ব'লে আমরা মুনফা চাই। সেটা ভোগের বাহুল্যের জন্যে নয়, সেটা সাহসের আনন্দের জন্যে। মানুষের বুকের পাটা যাতে বাড়ে তাতেই মানুষকে কৃতার্থ করে।

বর্ত্তমান যুগে য়ুরোপেই মানুষকে দেখি যার প্রাণের মুনফা নানা খাতায় কেবলি বেড়ে চলেচে। এই জন্যেই পৃথিবীতে এত ঘটা ক'রে সে আলো জ্বাললো। সেই আলোতে সে সকল দিকে প্রকাশমান। অল্প তেলে কেবল একটি মাত্র প্রদীপে ঘরের কাজ চ'লে যায়, কিন্তু পুরো মানুষটা তাতে অপ্রকাশিত থাকে। এই অপ্রকাশ অস্তিত্বের কার্পণ্য, কম ক'রে থাকা। এটা মানব-সত্ত্বের অবসাদ। জীবলোকে মানুষরা জ্যোতিষ্ক জাতীয়; জন্তুরা কেবলমাত্র বেঁচে থাকে, তাদের অস্তিত্ব দীপ্ত হ'য়ে ওঠেনি। কিন্তু মানুষ কেবল যে আত্মরক্ষা করবে তা নয়, সে আত্মপ্রকাশ করবে। এই প্রকাশের জন্যে আত্মার দীপ্তি চাই। অস্তিত্বের প্রাচুর্য্য থেকে, অস্তিত্বের ঐশ্বর্য্য থেকেই এই দীপ্তি। বর্ত্তমান যুগে য়ুরোপই সকল দিকে আপনার রশ্মি বিকীর্ণ করেচে, তাই মানুষ সেখানে কেবল যে টিঁকে আছে তা নয়, টিঁকে থাকার চেয়ে আরো অনেক বেশি ক'রে আছে। পর্য্যাপ্তে চলে আত্মরক্ষা, অপর্য্যাপ্তে আত্মপ্রকাশ। য়ুরোপে জীবন অপর্য্যাপ্ত;

এটাতে আমি মনে দুঃখ করিনে। কারণ যে দেশেই যে কালেই মানুষ কৃতার্থ হোক্ না কেন সকল দেশের সকল কালের মানুষকেই সে কৃতার্থ করে। য়ুরোপ আজ প্রাণ-প্রাচুর্য্যে সমস্ত পৃথিবীকেই স্পর্শ করেচে। সর্ব্বত্রই মানুষের সুপ্ত শক্তির দ্বারে তার আঘাত এসে পড়্‌ল। প্রভুত্বের দ্বারাই তার প্রভাব।

য়ুরোপ সর্ব্বদেশ সর্ব্বকালকে যে স্পর্শ করেচে সে তার কোন্ সত্য দ্বারা? তার বিজ্ঞান সেই সত্য। তার যে বিজ্ঞান মানুষের সমস্ত জ্ঞানের ক্ষেত্রকে অধিকার ক'রে কর্ম্মের ক্ষেত্রে জয়ী হয়েচে সে একটা বিপুল শক্তি। এইখানে তার চাওয়ার অন্ত নেই, তার পাওয়াও সেই পরিমাণে। গত বছর য়ুরোপ থেকে আসবার সময় একটি জর্ম্মন যুবকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তিনি তাঁ'র অল্প বয়সের স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ভারতবর্ষে আস্‌ছিলেন। মধ্য ভারতের আরণ্য প্রদেশে যে-সব জাতি প্রায় অজ্ঞাতভাবে আছে দুবৎসর তাদের মধ্যে বাস ক'রে তাদের রীতিনীতি তন্ন তন্ন ক'রে জান্‌তে চান। এরই জন্যে তাঁরা দুজনে প্রাণ পণ করতে কুণ্ঠিত হন নি। মানুষ সম্বন্ধে মানুষকে আরো জান্‌তে হবে, সেই আরো-জানা বর্ব্বর জাতির সীমার কাছে এসেও থামে না। সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়কে এই রকম সত্ত্ব-বদ্ধ ক'রে জানা, ব্যূহ-বদ্ধ ক'রে সংগ্রহ করা, জানবার সাধনায় মনকে সম্পূর্ণ মোহমুক্ত করা, এতে ক'রে মানুষ যে কত প্রকাণ্ড বড়ো হয়েচে য়ুরোপে গেলে তা বুঝ্‌তে পারা যায়। এই শক্তি দ্বারা পৃথিবীকে য়ুরোপ মানুষের পৃথিবী ক'রে সৃষ্টি ক'রে তুলচে। যেখানে মানুষের পক্ষে যা' কিছু বাধা আছে তা' দূর করবার জন্যে সে যে-শক্তি প্রয়োগ করচে তাকে যদি আমরা সাম্‌নে মূর্ত্তিমান ক'রে দেখ্‌তে পেতুম তাহলে তার বিরাটরূপে অভিভূত হ'তে হ'ত।

এইখানে য়ুরোপের প্রকাশ যেমন বড়ো, যাকে নিয়ে সকল মানুষ গর্ব্ব করতে পারে, তেমনি তার এমন একটা দিক আছে যেখানে তার প্রকাশ আচ্ছন্ন। উপনিষদে আছে, যে-সাধকেরা সিদ্ধিলাভ করেচেন, "তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি" তাঁরা সর্ব্বগামী সত্যকে সকল দিক থেকে লাভ ক'রে যুক্তাত্মভাবে সমস্তের মধ্যে প্রকাশ করেন। সত্য সর্ব্বগামী ব'লেই মানুষকে সকলের মধ্যে প্রবেশাধিকার দেয়। বিজ্ঞান বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে মানুষের প্রবেশ-পথ খুলে দিচ্চে। কিন্তু আজ সেই য়ুরোপে এমন একটি সত্যের অভাব ঘটেচে যাতে মানুষের মধ্যে মানুষের প্রবেশ অবরুদ্ধ করে। অন্তরের দিকে য়ুরোপ মানুষের পক্ষে একটা বিশ্বব্যাপী বিপদ হ'য়ে উঠ্‌ল। এইখানে বিপদ তার নিজেরও।

এই জাহাজেই একজন ফরাসী লেখকের সঙ্গে আমার আলাপ হ'ল। তিনি আমাকে বল্‌ছিলেন যুদ্ধের পর থেকে য়ুরোপের নবীন যুবকদের মধ্যে বড়ো ক'রে একটা ভাবনা ঢুকেচে। এই কথা তারা বুঝেচে, তাদের আইডিয়ালে একটা ছিদ্র দেখা দিয়েছিল যে-ছিদ্র দিয়ে বিনাশ ঢুক্‌তে পারলে। অর্থাৎ কোথাও তারা সত্য ভ্রষ্ট হ'ল এতদিনে সেটা ধরা পড়েচে।

মানুষের জগৎ অমরাবতী, তার যা সত্য ঐশ্বর্য্য তা দেশে কালে পরিমিত নয়। নিজের জন্য নিয়ত মানুষ এই-যে অমর লোক সৃষ্টি করচে তার মূলে আছে মানুষের আকাঙ্ক্ষা করবার অসীম সাহস। কিন্তু বড়োকে গড়্‌বার উপকরণ মানুষের ছোটো যেই চুরি করতে সুরু করে অমনি বিপদ ঘটায়। মানুষের চাইবার অন্তহীন শক্তি যখন সঙ্কীর্ণ পথে আপন ধারাকে প্রবাহিত করতে থাকে তখনই কূল ভাঙে, তখনি বিনাশের বন্যা দুর্দ্দাম হ'য়ে ওঠে। অর্থাৎ মানুষের বিপুল চাওয়া ক্ষুদ্র নিজের জন্যে হ'লে তাতেই যত অশান্তির সৃষ্টি। যেখানে তার সাধনা সকলের জন্যে সেইখানেই মানুষের আকাঙ্ক্ষা কৃতার্থ হয়। এই সাধনাকেই গীতা যজ্ঞ বলেচেন; এই যজ্ঞের দ্বারাই লোকরক্ষা। এই যজ্ঞের পন্থা হচ্চে নিষ্কাম কর্ম্ম। সে কর্ম্ম দুর্ব্বল হবে না, সে কর্ম্ম ছোটো হবে না, কিন্তু সে কর্ম্মের ফল-কামনা যেন নিজের জন্যে না হয়।

বিজ্ঞান যে-বিশুদ্ধ তপস্যার প্রবর্ত্তন করেচে সে সকল দেশের, সকল কালের, সকল মানুষের,—এই জন্যেই মানুষকে তাতে দেবতার শক্তি দিয়েছে, সকল রকম দুঃখ দৈন্য পীড়াকে মানবলোক থেকে দূর করবার জন্যে সে অস্ত্র গড়চে;

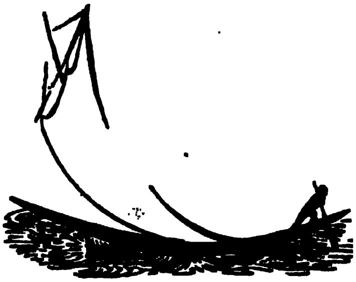
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মানুষের অমরাবতী নির্ম্মাণের বিশ্বকর্ম্মা এই বিজ্ঞান। কিন্তু এই বিজ্ঞানই কর্ম্মের রূপে যেখানে মানুষের ফল-কামনাকে অতিকায় ক'রে তুললে সেইখানেই সে হ'ল যমের বাহন। এই পৃথিবীতে মানুষ যদি একেবারে মরে তবে সে এই জন্যেই মরবে,—সে সত্যকে জেনেছিল কিন্তু সত্যের ব্যবহার জানে নি। সে দেবতার শক্তি পেয়েছিল, দেবত্ব পায় নি। বর্ত্তমান যুগে মানুষের মধ্যে সেই দেবতার শক্তি দেখা দিয়েচে য়ুরোপে। কিন্তু সেই শক্তি কি মানুষকে মারবার জন্যেই দেখা দিল? গত য়ুরোপের যুদ্ধে এই প্রশ্নটাই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে প্রকাশ পেয়েছে। য়ুরোপের বাইরে সর্ব্বত্রই য়ুরোপ বিভীষিকা হ'য়ে উঠেচে তার প্রমাণ আজ এসিয়া আফ্রিকা জুড়ে। য়ুরোপ আপন বিজ্ঞান নিয়ে আমাদের মধ্যে আসে নি, এসেছে আপন কামনা নিয়ে। তাই এসিয়ার হৃদয়ের মধ্যে য়ুরোপের প্রকাশ অবরুদ্ধ। বিজ্ঞানের স্পর্দ্ধায় শক্তির গর্ব্বে, অর্থের লোভে পৃথিবী জুড়ে মানুষকে লাঞ্ছিত করবার এই যে চর্চ্চা বহুকাল থেকে য়ুরোপ করচে, নিজের ঘরের মধ্যে এর ফল যখন ফল্‌ল তখন আজ সে উদ্বিগ্ন। তৃণে আগুন লাগাচ্ছিল, আজ তার নিজের বনস্পতিতে সেই আগুন লাগল। সে ভাবচে থামব কোথায়? সে থামা কি যন্ত্রকে থামিয়ে দিয়ে? আমি তা বলিনে। থামাতে হবে লোভ। সে কি ধর্ম্ম-উপদেশ দিয়ে হবে? তাও সম্পূর্ণ হবে না। তার সঙ্গে বিজ্ঞানেরও যোগ চাই। যে সাধনায় লোভকে ভিতরের দিক থেকে দমন করে সে সাধনা ধর্ম্মের, কিন্তু যে সাধনায় লোভের কারণকে বাইরের দিক থেকে দূর করে সে সাধনা বিজ্ঞানের। দুইয়ের সম্মিলনে সাধনা সিদ্ধ হয়, বিজ্ঞান-বুদ্ধির সঙ্গে ধর্ম্ম-বুদ্ধির আজ মিলনের অপেক্ষা আছে।

জাভায় যাত্রাকালে এই সমস্ত তর্ক আমার মাথায় কেন এল জিজ্ঞাসা করতে পারো। এর কারণ হচ্চে এই যে,—ভারতবর্ষের বিদ্যা একদিন ভারতবর্ষের বাইরে গিয়েছিল। কিন্তু সেই বাইরের লোক তাকে স্বীকার করেচে। তিব্বত মঙ্গোলিয়া মালয়দ্বীপসকলে ভারতবর্ষ জ্ঞান-ধর্ম্ম বিস্তার করেছিল মানুষের সঙ্গে মানুষের আন্তরিক সত্য সম্বন্ধের পথ দিয়ে। ভারতবর্ষের সেই সর্ব্বত্র প্রবেশের ইতিহাসের চিহ্ন দেখবার জন্যে আজ আমরা তীর্থযাত্রা করেছি। সেই সঙ্গে এই কথাও দেখবার আছে সেদিনকার ভারতবর্ষের বাণী শুষ্কতা প্রচার করেনি। মানুষের ভিতরকার ঐশ্বর্য্যকে সকলদিকে উদ্বোধিত করেছিল, স্থাপত্যে ভাস্কর্য্যে চিত্রে সঙ্গীতে সাহিত্যে;—তারি চিহ্ন মরুভূমে অরণ্যে পর্ব্বতে দ্বীপে দ্বীপান্তরে, দুর্গম স্থানে দুঃসাধ্য কল্পনায়। সন্ন্যাসীর যে-মন্ত্র মানুষকে রিক্ত করে নগ্ন করে, মানুষের যৌবনকে পঙ্গু করে, মানব চিত্তবৃত্তিকে নানাদিকে খর্ব্ব করে এ সে মন্ত্র নয়। এ জরাজীর্ণ কৃশপ্রাণ বৃদ্ধের বাণী নয়, এর মধ্যে পরিপূর্ণপ্রাণ বীর্য্যবান যৌবনের প্রভাব।

১ শ্রাবণ ১৩৩৪।

(ক্রমশঃ)



"—ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"

—শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়



(১)

আরে ছ্যাঃ! হারু চাষ করে!
Civilisation হ'তে বহুদূরে,
Village-এ আবাদে বাস করে।
আপনার হাতে জল, কাদা, মাটি ঘাঁটে সে,
কাদা ও কিচড়ে সদা খালি পায়ে হাঁটে সে,
বলদের সাথে দিবস কাটায় মাঠে সে,
ধিক!—তা'রে ধিক!
অমার্জ্জ্য তা'র আচার ব্যাভার,
অনার্য্য তা'র চারিদিক!



(২)

ছি, ছি! হারু ফেরি হেঁকে যায়!
সহর ঘুরিয়া দিবা দু'পহরে,
বোঝার বহরে বেঁকে যায়।
বাজারের যত বাজে মাল-গুলা দিন আনায়,
দোরে আনি বেচে আনার জিনিষ তিন আনায়,
কথার ছলনে ভুলায় শিশু ও জেনানায়,
কম পাজি সে!
এত লোভী, দু'টা পয়সার লোভে—
দু' ক্রোশ হাঁটিতে রাজী সে!

"—ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"

শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়



(৩)

ধিক ! ধিক ! হারু চাপ্‌রাসী !
প্রভু লাগি জাত বর্জ্জিতে পারে,
অর্জ্জিতে পারে পাপরাশি ।
গোলামীতে বাঁধা শোয়া, বসা, ওঠা, হাঁটা তা'র,
সেলামে, সেলামে নাকে ও কপালে ধাঁটা তা'র,
তবু যা'র খায়, তা'রে ধ'রে ক'ষে চাটাবার
মতো রোখ্‌ নাই ।
অন্নের দায়ে, আত্মা ও কায়
বিকালো, সে-দিকে চোখ নাই !



(৪)

হারু সন্ন্যাসী ! বেশ ত, বাঃ !
কামনা না যাক্, কামানো ঘুচেছে
বেড়ে চলে দাড়ি কেশ,—তোফাঃ !
কিচ্ছু না ক'রে বচ্ছর-ভোর খেতে চান,
বাণী না খসায়ে জ্ঞানীর আসন পেতে চান,
বিনা খরচায়, গাঁজা-চর্চ্চায় মেতে যান,
আহা ! নম' তায় ।
পলাতক ইনি ছাড়ি সুতজায়া,
ছাড়ি যত মায়া-মমতায় !

—এই কবিতার ছবি-গুলিও বনবিহারীবাবু কর্ত্তৃক অঙ্কিত—বিঃ সঃ

ভানুসিংহের পত্রাবলী

পত্রের পাত্র

১। ভানুসিংহ

২। একটি দশমবর্ষীয়া বালিকা

২১

শান্তিনিকেতন।

আচ্ছা বেশ, রাজি। ভানুদাদা নামই বহাল হ'ল। এ নামে আজ পর্য্যন্ত আমাকে কেউ ডাকেনি, আর কেউ যদি ডাকে তবে তার উত্তর দেবোনা। সিণ্ডারেলার গল্প জানত ? তার একপাটি জুতো নিয়ে রাজার ছেলে পা মেপে বেড়াতে লাগ্‌ল। আমার ভানু নামটা সেই রকম একপাটি; যদি কেউ ব্যবহার করতে যায় আমি তখনি বল্‌তে পারব— আচ্ছা আগে নিজের নামের পাটির সঙ্গে মিলিয়ে দেখ। যার নাম সুরবালা, সে বল্‌বে সুরো সুরু সুরি কিছুতেই ভানুর সঙ্গে মিল্‌বেনা, যার নাম মাতঙ্গিনী সে বল্‌বে মাতু, মাতি, মাতো কিছুতেই মিল্‌বে না, তিনকড়িরও সেই দশা, কাত্যায়নীরও তাই; জগদম্বা, পীতাম্বরী, গুরুদাসী, শঙ্খেশ্বরী, নগেন্দ্রমোহিনী, কারোই কাছে ঘেঁষবার জো নেই। ভারি সুবিধে হয়েচে। কেবল আমার মনে ভারি ভয় রয়ে গেল, পাছে কারো নাম থাকে "কানু বিলাসিনী"। তবে তাকে কি ব'লে ঠেকাব ? তুমি ভেবে রেখে দিয়ো।

ছুটির দিন এল—পর্শু ছুটি, তারপরে কি করব ? তখন কেবল শিউলি বন, শিশির-ভেজা ঘাস, আর দিগন্ত-প্রসারিত মাঠ আমার মুখ তাকিয়ে থাক্‌বে। তারা ত আমার কাছে ইংরেজি শিখ্‌তে চায়না—তা'রা চায় আমার মনের মধ্যে যে আনন্দের সোনার কাটি আছে সেইটে ছুঁইয়ে দিয়ে তাদের জাগিয়ে তুল্‌ব, এবং আমার চেতনার সঙ্গে তাদের সৌন্দর্য্যকে মিলিয়ে দেব। আমার জাগরণের ছোঁয়াচ না লাগ্‌লে পরে প্রকৃতি জাগ্‌বে কি ক'রে ? নীলাকাশের কিরণ-কমলের উপরে শারদলক্ষ্মী আসনগ্রহণ করেন, কিন্তু আমার আনন্দদৃষ্টি না পড়লে পরে সে পদ্মই ফোটে না।

আজ বুধবার। আজ মন্দিরে ছুটির ঠাকুরের কথা বলেচি। যখন আমরা কাজ করতে থাকি তখন শক্তির সমুদ্র থেকে আমাদের মধ্যে জোয়ার আসে, তখন আমরা মনে করি এ শক্তি আমারই এবং এই শক্তির জোরেই আমরা বিশ্বজয় করব। কিন্তু শক্তিকে বরাবর খাটাতে ত পারিনে—সন্ধ্যা যখন আসে তখন ত কাজ বন্ধ হয়, তখন ত আর গাণ্ডীব তুলতে পারিনে। তাই জোয়ার ভাঁটার ছন্দকে জীবের মেনে চলা চাই, একবার আমি, একবার তুমি। সেই তুমিকে বাদ দিয়ে যখন মনে করি আমিই কর্ত্তা, তখনই জগতে মারামারি বেধে যায়—রক্তে ধরণী পঙ্কিল হ'য়ে ওঠে। মা তাঁর মেয়েকে ডেকে বলেন, সংসারের কাজে তুমি আমার সঙ্গে লেগে যাও, মেয়ে তখন কোমর বেঁধে লাগে, কিন্তু সে যখন ভুলে যায় যে, এই কাজ তার মায়ের সংসারেরই কাজ। যখন অহঙ্কার ক'রে ভাবে আমি যেমন ইচ্ছা তাই করব, তখন সে সংসারের ব্যবস্থাকে উলট্‌ পালট্‌ ক'রে জঞ্জাল জমিয়ে

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোলে—অবশেষে এমন হয় যে, মা ঝাঁটা হাতে নিয়ে সমস্ত আবর্জ্জনা ঝেঁটিয়ে ফেলেন। মেয়ের সেই কাজটুকুর উপরে ঝাঁটা পড়ে না যখন সে কাজ মায়ের সংসার ব্যবস্থার সঙ্গে মেলে। সংসার-স্থিতির সঙ্গে এই যে মিলিয়ে কাজ করা এতে আমাদের যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে—অর্থাৎ মিল রেখেও আমরা তার মধ্যে নিজের স্বাতন্ত্র্য রাখ্‌তে পারি—তাতেই সৃষ্টির বৈচিত্র্য। মেয়ের হাতের কাজটুকু মায়ের অভিপ্রায়কে প্রকাশ ক'রেও নিজেকে বিশিষ্টভাবে প্রকাশ কর্‌তে পারে। যখন তাই সে করে তখন তার সেই সৃষ্টি মায়ের সৃষ্টির সঙ্গে মিলে স্থিতি লাভ করে। বিশ্বকর্ম্মার কাজে আমরা যখন যোগ দিই তখন যে-পরিমাণে তাঁর সঙ্গে মিল রেখে ছন্দ রেখে চলি সেই পরিমাণে আমাদের কাজ অক্ষয়কীর্ত্তি হ'য়ে ওঠে,—যে পরিমাণে বাধা দিই সেই পরিমাণে আমরা প্রলয়কে ডেকে আনি। নিজের জীবনকে এই প্রলয় থেকে যদি বাঁচাতে চাই তা হ'লে প্রতিদিনই আমি-তুমির ছন্দ মিলিয়ে চল্‌তে হবে—সেই ছন্দেই মানুষের সৃষ্টি মানুষের ইতিহাস অমরতা লাভ করে। দেখ্‌চ ত মা আজ পশ্চিমের ঘরে কি রকম প্রলয়ের সম্মার্জ্জনী নিয়ে বেরিয়েচেন। পশ্চিমের সভ্যতা মনে করছিল, তার শক্তি তার নিজেরই ভোগ, নিজেরই সমৃদ্ধির জন্যে। সে আমি-তুমির ছন্দকে একেবারে মানেনি। কিছুদূর পর্য্যন্ত সে বেড়ে উঠ্‌ল। মনে কর্‌ল সে বেড়েই চল্‌বে—এমন সময়ে ছন্দের অমিল ঘোচাবার জন্যে হঠাৎ একমুহূর্ত্তেই মায়ের প্রলয় অনুচর এসে হাজির। এখন কান্না, আর বক্ষে করাঘাত। ইতি ১৬ই আশ্বিন, ১৩২৫।

২২

শান্তিনিকেতন

মাদ্রাজের দিকে যে-দিন যাত্রা করেছিলুম সে-দিন শনিবার এবং সপ্তমী, অন্যান্য অধিকাংশ বিদ্যারই মত দিনক্ষণের বিদ্যা আমার জানা নেই। বল্‌তে পারিনে আমার যাত্রার সময় লক্ষকোটি যোজন দূরে গ্রহনক্ষত্রের বিরাট সভায় আমার এই ক্ষুদ্র মাদ্রাজ ভ্রমণ সম্বন্ধে কি রকম আলোচনা হয়েছিল, কিন্তু তার ফলের থেকে বোঝা যাচ্ছে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে ঘোরতর মতভেদ হয়েছিল। সেই জন্যে আমার ভ্রমণ-পথের হাজার মাইলের মধ্যে ছশো মাইল পর্য্যন্ত আমি সবেগে সগর্ব্বে এগতে পেরেছিলুম। কিন্তু বিরুদ্ধ জ্যোতিষ্কের দল কোমর বেঁধে এমনি অ্যাজিটেশন্ কর্‌তে লাগ্‌ল যে বাকি চারশো মাইলটুকু আর পেরতে পারা গেল না। জ্যোতিষ্ক সভায় কেবল মাত্র আমারই যাত্রা সম্বন্ধেই যে বিচার হয়েছিল তা নয়—বেঙ্গল-নাগপুর রেলোয়ে লাইনের যে এঞ্জিনটা আমার গাড়ি টেনে নিয়ে যাবে, মঙ্গল শনি এবং অন্যান্য ঝগড়াটে গ্রহেরা তার সম্বন্ধেও প্রতিকূল মন্তব্য প্রকাশ করেছিল। যদি বল সে সভায় ত আমাদের খবরের কাগজের কোনো রিপোর্টার উপস্থিত ছিল না তবে আমি খবর পেলুম কোথা থেকে, তবে তার উত্তর হ'চ্চে এই যে, আইনকর্ত্তারা তাঁদের মন্ত্রণা-সভায় কি আইন পাশ করেচেন তা তাঁদের পেয়াদার গুঁতো খেলেই সব চেয়ে পরিষ্কার বোঝা যায়। যে মুহূর্ত্তে হাওড়া ষ্টেশনে আমার রেলের এঞ্জিন বাঁশি বাজালে, সে বাঁশির আওয়াজে কত তেজ, কত দর্প। আর রবীন্দ্রনাথ ওরফে ভানুদাদা নামক যে-ব্যক্তি তোরঙ্গ বাক্স ব্যাগ বিছানা গাড়িতে বোঝাই ক'রে তাঁর তক্তর উপরে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে ইলেক্‌ট্রিক পাখার চলচ্চক্র-গুঞ্জন-মুখর রথকক্ষে একাধিপত্য বিস্তার করলেন তারই বা কত আশ্বস্ততা তার পরে কত গড়্ গড়্, খড়্ খড়্, ঝর্ ঝর্, ভোঁ ভোঁ, ঢং ঢং, ষ্টেশনে ষ্টেশনে কত হাঁক্ ডাক্, হাঁস্‌ফাঁস্, হন্ হন্, হট্ হট্, আমাদের গাড়ির দক্ষিণে বামে কত মাঠ বাট বন জঙ্গল নদী নালা গ্রাম সহর মন্দির মসজিদ কুটীর ইমারত যেন বাঘে তাড়া করা গোরুর পালের মত ঊর্দ্ধশ্বাসে আমাদের বিপরীত দিকে ছুটে পালাতে লাগ্‌ল। এমনি ভাবে চল্‌তে চল্‌তে যখন পিঠাপুরমে পৌছতে মাঝে কেবল একটা ষ্টেশন মাত্র আছে এমন সময় এঞ্জিনটার উপরে নক্ষত্রসভার অদৃশ্য পেয়াদা তার অদৃশ্য পরোয়ানা হাতে নিয়ে নেবে পড়্‌ল, আর অমনি কোথায় গেল তার চাকার ঘুরুনি, তার বাঁশির ডাক, তার ধূমোদগার, তার পাথুরে কয়লার ভোজ! পাঁচমিনিট যায়, দশ মিনিট যায়, বিশ মিনিট-

যায়, একঘণ্টা যায়, ষ্টেশন থেকে গাড়ি আর নড়েই না। সাড়ে পাঁচটায় পিঠাপুরমে পৌঁছবার কথা কিন্তু সাড়ে ছটা, সাড়ে সাতটা বাজে তবু এমনি সমস্ত স্থির হ'য়ে রইল যে, "চরাচরমিদং সর্ব্বং" যে চঞ্চল এ কথাটা মিথ্যা ব'লে বোধ হ'ল। এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে ধক্ ধক্ ধুক্ ধুক্ করতে করতে আর একটা এঞ্জিন এসে হাজির। তার পরে রাত্রি সাড়ে আট্‌টার সময় আমি যখন পিঠাপুরমে রাজবাড়িতে গিয়ে উঠ্‌লুম তখন আমার মনের অবস্থাটা দেখি ঠিক সেই এঞ্জিনেরই মত। মনকে জিজ্ঞাসা করলুম, "কেমন হে মাদ্রাজে যাচ্ছ ত? সেখান থেকে কাঞ্চি মদ্র অন্ধ্র পৌণ্ড্র প্রভৃতি কত দেশ দেশান্তর দেখ্‌বার আছে, কত মন্দির কত গুহা, কত তীর্থ ইত্যাদি ইত্যাদি,"—আমার মন সেই এঞ্জিনটার মত চুপ ক'রে গম্ভীর হ'য়ে রইল, সাড়াই দেয় না। স্পষ্ট বোঝা গেল, দক্ষিণের দিকে সে আর এক পাও বাড়াবে না। মনের সঙ্গে বেঙ্গল-নাগপুরের এঞ্জিনের একটা মস্ত প্রভেদ এই যে, এঞ্জিন বিগ্‌ড়ে গেলে আর একটা এঞ্জিন টেলিফোন্ ক'রে আনিয়ে নেওয়া যায়, কিন্তু মন বিগ্‌ড়লে সুবিধামত আর একটা মন পাই কোথা থেকে? সুতরাং মাদ্রাজ চারশো মাইল দূরে প'ড়ে রইল আর আমি গতকল্য শনিবার মধ্যাহ্নে সেই হাবড়ায় ফিরে এলুম। যে-শনিবার একদা তার কৌতুক-হাস্য গোপন ক'রে আমাকে মাদ্রাজের গাড়িতে চড়িয়ে দিয়েছিল, সেই শনিবারই আর একদিন আমাকে হাওড়ায় নামিয়ে দিয়ে তার নিঃশব্দ অট্টহাস্যে মধ্যাহ্ন আকাশ প্রতপ্ত ক'রে তুললে। এই ত গেল আমার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। কিন্তু তুমি যখন হিমালয় যাত্রায় বেরিয়েছিলে তখন নক্ষত্র-সভায় তোমার সম্বন্ধেও ত ভাল রেজোল্যুশন্ পাস্ হয়নি। আমরা সবাই স্থির করলুম গিরিরাজের শুশ্রূষায় তুমি সেরে আসবে। কিন্তু তারাগুলো কেন কুমন্ত্রণা করতে লাগ্‌ল। আমার বিশ্বাস কি জান, অনেকগুলো ঈর্ষাপরায়ণ তারা আছে, তারা তোমার ভানুদাদাকে একেবারেই পছন্দ করে না। প্রথমত, আমার নামটাই তাদের অসহ্য বোধ হয়, এই জন্যে বদ্‌নাম করবার সুবিধা পেলে ছাড়ে না। তার পরে দেখেচে আমার সঙ্গে আকাশের মিতার খুব ভাব আছে, সেইজন্যে নক্ষত্রগুলো আমাকে তাদের শত্রুপক্ষ ব'লে ঠিক করেছে। যাই হোক্, আমি ওদের কাছে হার মানবার ছেলে নই। ওরা যা করবার করুক্ আমি দিনের আলোর দলে রইলুম। তোমাকে কিন্তু কুচক্রী নক্ষত্রগুলোর উপরে টেক্কা দিতে হবে। বেশ শরীরটাকে সেরে নিয়ে, মনটাকে প্রফুল্ল ক'রে, হৃদয়টাকে শান্ত কর, জীবনটাকে পূর্ণ কর। তার পরে লক্ষ্যকে ঊর্দ্ধে রেখে অপরাজিত চিত্তে সংসারের সুখ দুঃখের ভিতর দিয়ে চ'লে যাও—কল্যাণ লাভ কর এবং কল্যাণ দান কর। নিজের বাসনাকে উদ্দাম ক'রে না তুলে মঙ্গলময়ের শুভ-ইচ্ছাকে নিজের অন্তরে বাহিরে সার্থক কর। ইতি ২০ অক্টোবর, ১৯১৮।

২৩

শান্তিনিকেতন

আমার ভ্রমণ শেষ হ'ল। যেখান থেকে যাত্রা আরম্ভ করেছিলুম সেইখানেই আবার এসে ফিরেছি। সকলেই পরামর্শ দিয়ে থাকে ছুটি পেলেই স্থান এবং বায়ু পরিবর্ত্তন করা দরকার, কিন্তু দেখা গেল সেটা যে অনাবশ্যক এবং ক্লেশকর সেইটে ভাল ক'রে বুঝে দেখ্‌বার জন্যেই কেবল পরিবর্ত্তনের দরকার। আসল দরকার, যেখানে আছি সেইখানেই মনটাকে সম্পূর্ণ এবং সচেতন ভাবে ঢেলে দেওয়া। এই যে মাঠ আমার চোখে পড়চে এর কি দেখ্‌বার যোগ্য রস ফুরিয়ে গেচে? আর এই যে শিশিরার্দ্র সকাল বেলাটি তার কিরণ-দলের মাঝখানে আমার মনকে মধুপান-রত স্তব্ধ ভ্রমরের মত স্থান দিয়েচে একি কোনো কালে এর বৃন্ত থেকে ঝ'রে পড়বে? আসল কথা, মনটা অসাড় হ'লেই তাকে সাড় দেবার জন্যে নাড়া দিতে হয়। তাই আমাদের সাধনা হওয়া উচিত কি করলে আমাদের মন অসাড় না হয়—তা হ'লেই নিজের মধ্যে নিজের সম্পদ লাভ করতে পারি, কেবলি বাইরের জন্যে ছটফট করতে হয় না। আমাদের যা-কিছু সব চেয়ে বড় সম্পদ, সব চেয়ে বড় আনন্দ, তার ভাণ্ডার যদি বাইরে থাকে তা হ'লে আমাদের তারি মুস্কিল, কেননা বাইরের পথে বাধা ঘটবেই, বাইরের দরজা মাঝে মাঝে বন্ধ হবেই। বাইরের কাছ

থেকে ভিক্ষা চাওয়ার অভ্যাস আমাদের ছেড়ে দিতে হবে। আমাদের ইচ্ছা বাইরের দিকে বাধা পেলেও আমরা যেন অন্তরের মধ্যে পূর্ণতা অনুভব ক'রে শান্তি পেতে পারি। নইলে নিজেও অশান্ত হই চারিদিককেও অশান্ত ক'রে তুলি। এই সংসার থেকে যে প্রীতি যে কল্যাণ আমরা অন্তরের মধ্যে পেয়েচি সেই আমাদের অন্তরতম লাভের জন্যে যেন আমরা গভীর ভাবে কৃতজ্ঞ হই। বাইরের দিকে যে কিছু জিনিষ পাইনি, সে দিক থেকে যা কিছু বাধা আস্‌চে, তারই ফর্দ্দটাকে লম্বা ক'রে তুলে যদি খুঁৎ খুঁৎ করি, ছট্‌ফট্‌ করতে থাকি, তা হ'লে অকৃতজ্ঞতা হয় এবং সেই চঞ্চলতা নিতান্তই বৃথা নিজের অন্তর বাহিরকে আবৃত করে মাত্র। স্থির হব, প্রশান্ত হব, মনকে প্রসন্ন রাখব তা হ'লেই আমাদের মন এমন একটি স্বচ্ছ আকাশে বাস করবে যাতে ক'রে অমৃতলোক থেকে আনন্দ-জ্যোতি আমাদের মনকে স্পর্শ করতে বাধা পাবে না। তোমার প্রতি তোমার ভানুদাদার এই আশীর্ব্বাদ যে, তুমি আপনার ইচ্ছাকে একান্ত তীব্র ক'রে চিত্তকে কাঙাল-বৃত্তিতে দীক্ষিত কোরো না—বিধাতার কাছে থেকে যা কিছু দান পেয়েছ তাকে অন্তরের মধ্যে নম্র-ভাবে গ্রহণ এবং অবিচলিত-ভাবে রক্ষা কর। শান্তি হ'চ্চে সত্য উপলব্ধি করবার সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল অবস্থা—সংসারের অনিবার্য্য আঘাতে ব্যাঘাতে, ইচ্ছার অনিবার্য্য নিষ্ফলতায় সেই সুস্নিগ্ধ শান্তি যেন তোমার মধ্যে বিক্ষুব্ধ না হয়। ইতি ১০ই কার্ত্তিক, ১৩২৫।

২৪

শান্তিনিকেতন

এতক্ষণ তুমি রেলগাড়িতে ধক্ ধক্ করতে করতে চলেচ, কত ষ্টেশন পার হ'য়ে চ'লে গিয়েচ—আমাদের এই লাল মাটির, এই তালগাছের দেশ হয়ত ছাড়িয়ে গেছ বা। আমার পূবদিকের দরজার সাম্‌নে সেই মাঠে রৌদ্র ধূ ধূ করচে এবং সেই রৌদ্রে নানা রঙের গোরুর পাল চ'রে বেড়াচ্চে। এক একটা তালগাছ [illegible] ঝাঁকড়া মাথা নিয়ে পাগ্‌লার মত দাঁড়িয়ে আছে। আজ দিনে আমার সেই বড় চৌকিতে বসা হ'ল না—খাওয়ার পর এণ্ড্রুজ সাহেব এসে আমার সঙ্গে বিদ্যালয়ের ভূত-ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সম্বন্ধে বহুবিধ আলোচনা করলেন তাতে অনেকটা সময় চ'লে গেল। তার পরে নগেনবাবু নামক এখানকার একজন মাষ্টার তাঁর এক মস্ত তর্জ্জমা নিয়ে আমার কাছে সংশোধন করবার জন্যে আন্‌লেন—তাতেও অনেকটা সময় চ'লে গেল। সুতরাং বেলা তিনটে বেজে গেছে তবু আমি আমার সেই ডেস্কে ব'সে আছি। বই কাগজ খাতা দোয়াত কলম ওষুধের শিশি এবং অন্য হাজার রকম জবড়জঙ্‌ জিনিসে আমার ডেস্ক পরিপূর্ণ। তার মধ্যে এমন অনেক আবর্জ্জনা আছে যা এখনি টেনে ফেলে দিলেই চলে; কিন্তু কুঁড়ে মানুষের মুস্কিল এই যে, আবশ্যকের জিনিস সে খুঁজে পায় না, আর অনাবশ্যক জিনিস না খুঁজলেও তার সঙ্গে লেগেই থাকে। এমন অনেক ছেঁড়া লেফাফা কাগজ-চাপা দিয়ে জমানো রয়েচে যার ভিতরকার চিঠিরই কোনও উদ্দেশ পাওয়া যায় না। মনে আছে আমাকে তোমার রূপকথা পাঠিয়ে দিতে হবে সেই অলাবু-নন্দিনীর "কাহিনী," আর সেই "চম্‌কিলা" "সোনেকিতরহ" চুলওয়ালী রাজকুমারীর কথা। তা ছাড়া আর একটি কথা মনে রাখ্‌তে হবে, মন খারাপ কোরো না—লক্ষ্মী মেয়ে হ'য়ে প্রসন্ন হাসি হেসে ঘর উজ্জ্বল ক'রে থাক্‌বে। সকলেই বল্‌বে তুমি এমন সোনেকিতরহ হাসি পেয়েচ কোন্ পারিজাতের গন্ধ থেকে, কোন্ নন্দনবীণার ঝঙ্কার থেকে, কোন্ প্রভাত-তারার আলোক থেকে, কোন্ সুর-সুন্দরীর সুখস্বপ্ন থেকে, কোন্ মন্দাকিনীর চলোর্ম্মি-কল্লোল থেকে, কোন্—কিন্তু আর দরকার নেই এখনকার মত এই কটাতেই চ'লে যাবে—কেননা কাগজ ফুরিয়ে এসেচে, দিনও অবসন্নপ্রায়, অপরাহ্ণের ক্লান্ত রবির আলোক ম্লান হ'য়ে এসেচে। ২ অগ্রহায়ণ ১৩২৫।

২৫

শান্তিনিকেতন

কাল তোমার চিঠি পেয়েছি, আমার চিঠিও নিশ্চয় তুমি পেয়েচ। এতক্ষণে নিশ্চয়ই বেশ হাসিমুখে সেই বাংলা

মহাভারত এবং চারুপাঠ পড়চ। যে তোমাকে দেখ্‌চে সেই মনে করচে চারুপাঠের মধ্যে খুব মনোহর গল্প এবং তোমার শিশু মহাভারতের মধ্যে খুব মজার কথা কিছু বুঝি আছে। কিন্তু তারা জানে না প্রায় দু'শো ক্রোশ তফাৎ থেকে ভানুদাদা তোমাকে খুসি পাঠিয়ে দিচ্চে—এত খুসি যে, কার সাধ্য তোমাকে বিরক্ত করে বা রাগায়, বা দুঃখ দেয়। আমি প্রায় সন্ধ্যাবেলায় সেই যে গান গাই "বীণা বাজাও মম অন্তরে" সেই গানটি তোমার মনের মধ্যে বরাবরকার মত স্বরলিপি ক'রে লিখে রেখে দেবার ইচ্ছা আছে—মনটি গানের সুরে এমনি বোঝাই হ'য়ে থাক্‌বে যে বাহিরের তুফানে তোমাকে নাড়া দিতে পারবে না। শুধু তোমাকে বলচিনে, আমারও ভারি ইচ্ছে, নিজের ভরা মনটির মাঝখানে বেশ নিবিষ্ট হ'য়ে ব'সে বাইরের সমস্ত যাওয়া-আসা কাঁদা-হাসার অনেক উপরে স্থির হ'য়ে থাক্‌তে পারি। আপনার ভিতরে আপনার চেয়ে বড় কাউকে যদি ধ'রে রাখা যায় তা' হলেই সেই ভিতরের গৌরবে বাহিরের ধাক্কাকে একটুও কেয়ার না করবার শক্তি আপনিই আসে। সেই ভিতরের ধনকে ভিতরে পেয়ে ভিতরে ধ'রে রাখবার জন্যেই আকাঙ্ক্ষা করচি। বাইরের কাছে যখনই কাঙাল-পনা করতে যাই তখনই সে পেয়ে বসে, তার আর দৌরাত্ম্যের অন্ত থাকে না—সে যতটুকু দেয় তার চেয়ে দাবী ঢের বেশি করে—সে এমন মহাজন যে, শতকরা পাঁচশো টাকা সুদ আদায় করতে চায়। সে শাইলক্‌, সামান্য টাকা দেয় কিন্তু ছুরি বসিয়ে রক্তে মাংসে তার শোধ নেবার দাবী করে। তাই ইচ্ছে করি বাহিরটাকে ধার দেব কিন্তু ওর কাছ থেকে শিকি পয়সা ধার নেব না। এই আমার মৎলবের কথাটা তোমার কাছে ব'লে রাখ্‌লুম। তোমার গণনামতে আমার যখন আটাশ বৎসর বয়স হবে ততদিনে যদি মৎলব সিদ্ধি হয় তাহলে বেশ মজা হবে। এখানকার খবর সব ভাল, সাহেব গেছে বাঁকিপুরে, দিনু কমল এসেচে আমার ঘরের একতলায়, আমি সেই অনুবাদের কাজে ভূতের মত খাট্‌চি। কিন্তু ভূত যে খুব বেশি খাটে এ অখ্যাতি তার কেন হ'ল বল দেখি? কথাটা সত্য হ'লে তো মরেও শান্তি নেই।

২৬

শান্তিনিকেতন

এখনও আমার কাজের ভিড় কিছুই কমে নি। সবাই মনে করে আমি কবি মানুষ, দিনরাত্রি আকাশের দিকে তাকিয়ে মেঘের খেলা দেখি, হাওয়ার গান শুনি, চাঁদের আলোয় ডুব দিই, ফুলের গন্ধে মাতাল হই, পল্লব-মর্ম্মরে থর্‌ থর্‌ ক'রে কাঁপি, ভ্রমর-গুঞ্জনে ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে যাই ইত্যাদি ইত্যাদি। এ-সব হ'ল হিংসের কথা। তারা জাঁক ক'রে বল্‌তে চায় যে, তারা কবিতা লেখে না বটে কিন্তু হপ্তায় সাতদিন ক'রে আফিসে যায়, আদালত করে, খবরের কাগজ চালায়, বক্তৃতা দেয়, ব্যবসা করে, তারা এত বড় ভয়ঙ্কর কাজের লোক। আফিসের ছুটি নিয়ে তারা একবার এসে দেখে যাক্‌ আমি কাজ করি কিনা। আচ্ছা, তারা খুব কাজ করতে পারে আমি না হয় মেনে নিলুম, কিন্তু খুব কাজ না করতে পারে এমন শক্তি কি তাদের আছে? যেই তাদের হাতে কাজ না থাকে অমনি তারা হয় ঘুমোয়, নয় তাস খেলে, নয় মদ খায়, নয় পরের নিন্দে করে, কি ক'রে যে সময় কাটাবে ভেবেই পায় না। আমার সুবিধা এই যে, যখন কাজ থাকে তখন রীতিমত কাজ করি, আবার, যখন কাজ না থাকে তখন খুব কষে কাজ না করতে পারি—তার কাছে কোথায় লাগে তোমার বাবার কমিটি মীটিং। যখন কাজ না-করার ভিড় পড়ে তখন তার চাপে আমাকে একেবারে রোগা ক'রে দেয়। সম্প্রতি কিন্তু কাজ করাটাই আমার ঘাড়ে চেপেচে, তাই সেই নাটকটা আর এক অক্ষরও লিখ্‌তে পারিনি। এই গোলমালের মধ্যে যদি লিখ্‌তে যাই আর যদি তাতে গান বসাই তবে তার ছন্দ আর মিল অনেকটা তোমার শিশু মহাভারতেরই মত হ'য়ে উঠ্‌বে। চিঠিতে যে ছবি এঁকেচ খুব ভাল হয়েচে। মেয়েটিকে দেখে বোধ হচ্চে ওর ইস্কুলে যাবার তাড়া নেই, ঘরকন্নার কাজের ভিড়ও বেশি আছে ব'লে মনে হচ্ছে না; ওর চুলের সমস্ত কাঁটা রাস্তায় প'ড়ে গেছে, আর "গহনা ওয়ছনা" "চুনারি উনারির" কোনও ঠিকানা নেই। "কঙ্ক"র ভিতর থেকে যে "ভুলহীন" বেরিয়ে এসেছিল এ-মেয়ে বোধ হয় সে নয়, এর নাম কি লিখে পাঠিয়ো। ইতি ৯ অগ্রহায়ণ, ১৩২৫।

চলচিত্তচঞ্চরী

লেখক—৺সুকুমার রায় | চিত্র-শিল্পী—শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন (নারদ)

পাত্রগণ

১। সাম্য-সিদ্ধান্ত সভার পাণ্ডাগণ

সত্যবাহন সমাদ্দার	...	চিন্তাশীল নেতা
ঈশান বাচস্পতি	...	কবি ও ভাবুক নেতা
সোম প্রকাশ	...	উন্নতিশীল যুবক
জনার্দ্দন	...	ঈশানের ধামাধারী
নিকুঞ্জ	...	সত্যবাহনের ঐ

২। শ্রীখণ্ড দেবের আশ্রমচারীগণ

শ্রীখণ্ড দেব — আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা নেতা ও সর্ব্বেসর্ব্বা

নবীন মাষ্টার প্রভৃতি আশ্রমবাসী শিক্ষকগণ

রামপদ, বিনয় সাধন প্রভৃতি ছাত্রগণ

৩। ভবদুলাল— আগন্তুক জিজ্ঞাসু ভদ্রলোক।

প্রথম দৃশ্য

সাম্য-সিদ্ধান্ত সভাগৃহ

[ঈশানবাবু এককোণে বসিয়া সঙ্গীত রচনায় ব্যস্ত। জনার্দ্দন তাঁহার নিকটেই উপবিষ্ট। সোমপ্রকাশ খুব মোটা মোটা ২।৩টি কেতাব লইয়া তাহারই একটাকে মন দিয়া পড়িতেছে—এমন সময়ে মালা হস্তে নিকুঞ্জের প্রবেশ]

জনা। আচ্ছা, শ্রীখণ্ড বাবুরা কেউ এলেন না কেন বলুন দেখি ?

নিকুঞ্জ। শুনলাম, ঈশেনবাবু নাকি ওঁদের কি insult করেছেন।

ঈশান। কি রকম! Insult করলাম কি রকম ? একটা কথা বললেই হল ? এই জনার্দ্দন বাবুই সাক্ষী আছেন —কোথায় insult হ'ল তা উনিই বলুন।

জনা। কই, তেমনত কিছুই বলেন নি—খালি স্বার্থ-পর মর্কট বলা হয়েছিল। তা ওঁরা যেমন অসহিষ্ণু ব্যবহার করছিলেন, তাতে ও'রকম বলা কিছুই অন্যায় হয় নি।

সোম। আর যদি insult করেই থাকে তাতেই বা কি ? তার জন্য কি এইটুকু সাম্যভাব ওঁদের থাকবে না যে, হৃদ্যতার সঙ্গে পরস্পরের সঙ্গে মিলতে পারেন ?

ঈশান। তাত বটেই। কিন্তু ঐযে ওঁরা একটি দল পাকিয়েছেন, ওতেই ওঁদের সর্ব্বনাশ করেছে।

জনা। অন্তত আজকের মত এই রকম একটা দিনেও কি ওঁরা দলাদলি ভুলতে পারেন না ?

সোম। যাই বলুন, এ সম্বন্ধে একজন পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিত যা বলেছেন আমারও সেই মত। আমি বলি, ওঁরা না এসেছেন ভালই হয়েছে।

[সত্যবাহনের শশব্যস্ত প্রবেশ]

সত্য। আসছেন, আসছেন, আপনারা প্রস্তুত থাকুন, এসে পড়লেন ব'লে। সোমপ্রকাশ, আমার খাতাখানা ঠিকা

আছে ত ? নিকুঞ্জবাবু, আপনি সামনে আসুন। না না থাক্, ঈশানবাবু আপনি একটু এগিয়ে যান।

ঈশান। আমি গেলে চলবে কেন ? আমার গানটা আগে হ'য়ে যাক,—



ঈশান বাচস্পতি—ভাবুক কবি, গায়ক ও নেতা

সত্য। না না, ওসব গানটানে কাজ নেই—ওসব আজ থাক্। আমার লেখাটা পড়তেই মেলা সময় যাবে—আর বাড়িয়ে দরকার নেই।

ঈশান। বেশ ত! আপনার লেখাটাই যে পড়তেই হবে তার মানে কি ? ওটাই থাকুক না কেন ?

সত্য। আচ্ছা, তাহলে তাই হোক্—আপনাদের গান আর বাজনাই চলুক। আমার লেখা যদি আপনাদের এতই বিরক্তিকর হয়, তা হ'লে দরকার কি ? চল সোমপ্রকাশ, আমরা চলে যাই।

সকলে। না না, সে কি, সে কি! তা কি হতে পারে ?

শ্যাম। (গদগদ) দেখুন, আমি মর্ম্মান্তিকভাবে অনুভব করছি, আজ আমাদের প্রাণে প্রাণে দিক্‌বিদিকে কত না আকুতি বিকুতি অল্পে অল্পে ধীরে ধীরে—

অনা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই হবে, তাই হবে। গানটাও থাকুক, লেখাটাও পড়া হোক।

নিকুঞ্জ। ঐ এসে পড়েছেন।

সকলে। আসুন, আসুন। স্বাগতং, স্বাগতম্।

[ভবদুলালের প্রবেশ, অভ্যর্থনা ও সঙ্গীত]

গুণী-জনবন্দন লহ ফুল চন্দন—কর অভিনন্দন
কর অভিনন্দন।
আজি কি উদিল রবি পশ্চিম গগনে,
জাগিল জগত আজি না জানি কি লগনে,
স্বাগত সঙ্গীত গুঞ্জন পবনে—কর অভিনন্দন
কর অভিনন্দন।
আলা-ভোলা বাবাজীর চেলা তুমি শিষ্য
সৌম্য মুরতি তব অতি সুখদৃশ্য,
মজিয়া হরষরসে আজি গাহে বিশ্ব—কর অভিনন্দন
কর অভিনন্দন।

সত্য। সোমপ্রকাশ, আমার খাতাখানা দাওত।

সোম। আজ আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে গোপনে গোপনে—

সকলে। আহা হা, খাতাখানা চাচ্ছেন, সেইটা আগে দাও।

সত্য। (খাতা লইয়া) আজ মনে পড়ছে সেই দিনের কথা, যেদিন সেই চৈত্র মাসে আমরা আলাভোলা বাবাজীর আশ্রমে গিয়েছিলাম। ওঃ, সেদিন যে দৃশ্য দেখেছিলাম, আজও তা আমাদের মানসপটে অঙ্কিত হয়ে আছে। দেখ্‌লাম মহা প্রশান্ত আলাভোলা বাবাজী হাস্যোজ্জ্বল মুখে পরম নির্লিপ্ত আনন্দের সঙ্গে তাঁর পোষা চামচিকেটিকে জিলিপি খাওয়াচ্ছেন। আজ আমাদের কি সৌভাগ্য যে বাবাজীর প্রিয় শিষ্য—একি, সোমপ্রকাশ, এ কোন্ খাতা নিয়ে এসেছ ? ধুতি চার খানা, বিছানার চাদর একখানা, বালিশের ওয়াড় একখানা, বাকি একখানা তোয়ালে—এ সব কি ?

সোম। কেন ? আপনিই ত আমার কাছে রাখতে দিলেন।

সত্য। বলি, একবার চোখ বুলিয়ে দেখতে হয়ত, সাপ দিলাম, না ব্যাং দিলাম ?—দেখুন দেখি! এত কষ্ট করে রাত জেগে, সুন্দর একটা প্রবন্ধ লিখলাম, এখন নিয়ে এসেছে কি না কার একটা ধোপার হিসেবের খাতা! এত যে বলি, নিজেদের বিচারবুদ্ধি অনুসারে কাজ করবে, তা কেউ শুনবে না।

৺সুকুমার রায়

ভব। তা দেখুন, ওরকম ভুল অনেক সময়ে হ'য়ে যায়—কর্‌তে গেলাম এক, হ'য়ে গেল আর! আমার সেজো মামা একবার ঘিয়ের কারবার করে ফেল মেরেছিলেন—সেই থেকে কেউ গব্যঘৃত বল্লেই তিনি ভয়ানক ক্ষেপে যেতেন। আমি ত তা জানি না; মামারবাড়ী গিয়েছি, মহেশদা বল্ল "বলত গব্যঘৃত"। আমি চেঁচিয়ে বল্‌লাম "গ--ব্য--ঘৃ---ত" অমনি দেখি সেজমামা ছাতের সমান লাফ দিয়ে তেড়ে মার্‌তে এয়েছে! দেখুন ত কি অন্যায়! আমি ত ইচ্ছা করে ক্ষেপাই নি!

সত্য। যাক্। আমি যা বল্‌তে চেয়েছিলাম তা এই যে, বাইরের জিনিস যেমন মানুষের ভেতরে ধরা পড়ে, তেমনি ভেতরের জিনিসও সময় সময় বাইরে প্রকাশ পায়। আমাদের মধ্যে আমরা অন্তরঙ্গভাবে যে সব জিনিস পাচ্ছি সেগুলোকে এখন বাইরে প্রকাশ করা দরকার।

ভব। ঠিক বলেছেন। এই মনে করুন, যে কেঁচো মাটির মধ্যে থাকে, মাটির রস খেয়ে বাড়ে, সেই কেঁচোই আবার মাটি ফুঁড়ে বাইরে চলে আসে।

সকলে। (মহোৎসাহে) চমৎকার! চমৎকার!

নিকুঞ্জ। দেখেছেন, কেমন সুন্দরভাবে উনি কথাটা গুছিয়ে নিলেন!

ভব। তা হ'লে সমাদ্দার মশাই, আপনি ঐ যেটা পড়বেন বলেছিলেন, আমায় সেটা দেবেন ত। আমি একখানা বড় বই লিখছি, তাতে ওটা ঢুকিয়ে দেব—

সোম। এ আমাদের বিশেষ সৌভাগ্য বলতে হবে। আপনি যদি এ কাজের ভার নেন্, তা'হলে আমাদের ভেতরকার ভাবগুলি সুন্দরভাবে সাজিয়ে বলতে পারবেন।

জনা। হ্যাঁ, এ বিষয়ে ওঁর একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা দেখা যাচ্ছে।

ভব। আর আপনার ঐ গানটাও আমায় শিখিয়ে দেবেন, ওটাও আমার বইয়ে ছাপাতে চাই।

ঈশান। নিশ্চয়! নিশ্চয়! ওটা আমার নিজের লেখা। গান লেখা হচ্ছে আমার একটা বাতিক।

সোম। কি রকম আগ্রহ আর উৎসাহ দেখেছেন ওঁর?

ঈশান। তাত হবেই। সকলের উৎসাহ কেন যে হয় না এই ত আশ্চর্য্য।

[গান]

এমন বিমর্ষ কেন?
মুখে নাই হর্ষ কেন?
কেন ভব-ভয়-ভীতি ভাবনা প্রভৃতি
বৃথা বয়ে যায় বর্ষ কেন?
(হায় হায় হায় বৃথা বয়ে যায় বর্ষ কেন?)

ভব। [লিখিতে লিখিতে] চমৎকার! এটা আমার বইয়ে দিতেই হবে। আমার কি মুস্কিল জানেন? আমিও পোৗট্রি লিখি, কিন্তু তার সুর বসাতে পারি না। এইত এবার একটা লিখেছিলাম—

বলি ও হরি রামের খুড়ো—
(তুই) মর্‌বিরে মর্‌বি বুড়ো।

মশায়, কত রকম সুর লাগিয়ে দেখলাম—তার একটাও লাগল না। কি করা যায় বলুন ত?

ঈশান। ওর আর করবেন কি? ওটা ছেড়ে দিন না—

ভব। তা অবিশ্যি, তবে twinkle, twinkle little star—এই সুরটা অনেকটা লাগে

[গান]

বলি ও হরিরামের খুড়ো—
(তুই) মরবি রে মর্‌বি বুড়ো।
সর্দ্দি কাশী হল্‌দি জ্বর
ভুগবি কত জল্‌দি মর।

কিন্তু এটাও ঠিক হয় না। ঐযে 'মর্‌বি রে মর্‌বি' ঐ জায়গাটার আরও জোর দেওয়া দরকার। কি বলেন?

ঈশান। হ্যাঁ, যে রকম গান্—একটু জোরজার করলে সহজে মরবে কেন?

সোম। [জনান্তিকে] কিন্তু শ্রীখণ্ডবাবুদের এসমস্ত কাণ্ড প্রকাশ করে দেওয়া উচিত।

সত্য। উচিত সেত আজ বছর ধরে শুনে আস্‌ছি। উচিত হয়ত বলে ফেললেই হয়? নিকুঞ্জবাবু কি বলেন?

নিকুঞ্জ। নিশ্চয়ই। কিসের কথা হচ্ছিল?

সত্য। ঐ শ্রীখণ্ডদেবের আশ্রমের কথা। এবারে "সত্য-সম্বিৎসায়" কি লিখেছি পড়েন নি বুঝি ?

নিকুঞ্জ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওটা চমৎকার হয়েছে। পড়ে দিন না—উনি শুনে সুখী হবেন।

সত্য। [পাঠ] এই যে অগণ্য গ্রহ-তারকা মণ্ডিত গগন-পথে ধরিত্রী ধাবমান, ভূধর কন্দর ভ্রাম্যমান—এই যে সাগরের ফেনিল লবণাম্বুরাশি নীলাম্বরাভিমুখে নৃত্য করিতে করিতে নিত্য নবোৎসাহে দিক্‌দিগন্ত ধ্বনিত ঝঙ্কৃত করিয়া, কি যেন চায়, কি যেন চায়—প্রতিধ্বনি বলিতেছে সাম্য সমীক্ষপন্থা।

নিকুঞ্জ। শুনছেন ? ভাষার কেমন সতেজ অথচ—সহজ ভঙ্গী, সেটা লক্ষ্য করেছেন ? ওর মধ্যে শ্রীখণ্ডবাবুদের উপর বেশ একটু কটাক্ষ রয়েছে।

জনা। তাহ'লে আশ্রমের কথাটা আগে বলে নিন্—নইলে উনি বুঝবেন কেমন ক'রে।

ঈশান। সেইটিই ত আগে বলা উচিত। সোমপ্রকাশ তুমি বলত হে—বেশ ভাল করে গুছিয়ে বল।

সত্য। আচ্ছা তাহ'লে সোমপ্রকাশই বলুক—(অভিমান)

সোম। কথাটা হয়েছে কি—এই যে ওঁরা একটা আশ্রম করেছেন, তার রকম-সকমগুলো যদি দেখেন—সর্ব্বদাই কেমন একটা—অর্থাৎ, আমি ঠিক বোঝাতে পারছি না—কি শিক্ষার দিক দিয়ে, কি অন্যদিক দিয়ে, যেমন ভাবেই দেখুন—আমার কথাটা বুঝতে পারছেন ত ? যেমন, ইয়ের কথাটাই ধরুন না কেন—মানে, সব কথাত আর মুখস্থ করে রাখিনি !

ভব। তা'ত বটেই, এতো আর একজামিন দিতে আসেন নি।

নিকুঞ্জ। সমাদ্দার মশাইকে বলতে দাও না।

সত্য। না, না, আমায় কেন ? আমি কি আপনাদের মত তেমন গুছিয়ে ভাল করে বলতে পারি ?

সকলে। কেন পারবেন না ? খুব পারবেন।

সত্য। আর মশাই, ওসব ছোট কথা—কে কি বলল আর কে কি করল ! ওর মধ্যে আমার কেন ?

জনা। আচ্ছা, তা'হলে আর কেউ বলুন না।

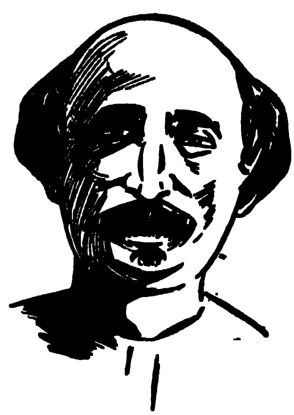
সত্য। কি আপদ ! আমি কি বলব না বলছি ? তবে, কি রকম ভাব থেকে বলছি সেটা ত একবার জানান উচিত, তা নয়ত শেষকালে আপনারাই বলবেন সত্যবাহন সমাদ্দার পরনিন্দা করচে।

জনা। হ্যাঁ, শুধু বললেই ত হ'লনা, দশদিক বিবেচনা করে বলতে হবে ত ?

সত্য। আমার হয়েছে কি, ছেলেবেলা থেকেই কেমন অভ্যাস—পরনিন্দা পরচর্চ্চা এ সব আমি আদবে সইতে পারি না।

জনা। আমারও ঠিক তাই। ওসব একেবারে সইতে পারি না।

সোম। পরনিন্দা ত দূরের কথা, নিজের নিন্দাও সহ্য হয় না।



জনার্দ্দন—ঈশানের ধামাধারী

সত্য। কিন্তু তা ব'লে সত্য কি আর গোপন রাখা যায় ?

ভব। গোপন করলে আরও খারাপ। ছেলেবেলায় একদিন আমাদের ক্লাসে একটা ছেলে 'কৃ' ক'রে শব্দ করেছিল। মাষ্টার বললেন, "কে করল, কে করল ?" আমি ভাবলাম আমার অত বলতে যাবার দরকার কি। শেষটায় দেখি, আমাকেই ধরে মারতে লেগেছে। দেখুন দেখি ! ওসব কক্ষণো গোপন করতে নেই।

জনা। আমাদেরও তাই হ'য়েছে। কিছু বলি না ব'লে দিন দিন ওরা যেন আস্কারা পেয়ে যাচ্ছে।

৺সুকুমার রায়

নিকুঞ্জ। আশ্রমের ছেলেগুলো পর্য্যন্ত যেন কি এক রকম হ'য়ে উঠ্‌ছে।

জনা। হ্যাঁ, ঐ রামপদটা সেদিন সমাদ্দার মশাইকে কি না বল্‌লে।

নিকুঞ্জ। হ্যাঁ, হ্যাঁ--ঐ কথাটা একবার বলুন দেখি, তাহ'লে বুঝবেন ব্যাপারটা কতদূর গড়িয়েছে।

জনা। হ্যাঁ বুঝলেন? ছোকরার এতবড় আস্পর্দ্ধা সমাদ্দার মশাইকে মুখের উপর বলে কি যে,—হ্যাঁ, কি-না বল্‌লে!

নিকুঞ্জ। কি যেন--সেই খুলনার মোকদ্দমার কথা নয় ত?

জনা। আরে না, ঐ যে পিল্‌সুজের বাতি নিয়ে কি একটা কথা।

সোম। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার মনে পড়েছে কি একটা সংস্কৃত কথা তার দুতিন রকম মানে হয়।

নিকুঞ্জ। ওঁরই কি একটা কথা ওঁরই উপর খাটাতে গিয়েছিল। মোটকথা, তার ও রকম বলা একেবারেই উচিত হয় নি।

ভব। কি আপদ! তা আপনারা এসব সহ্য করেন কেন?

সত্য। সহ্য না করেই বা করি কি? কিছু কি বল্‌বার যো আছে? এই ত সেদিন একটা ছোকরাকে ডেকে গায়ে হাত বুলিয়ে মিষ্টি করে বুঝিয়ে বল্‌লাম—"বাপুহে, ও রকম বাঁদরের মত ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছ, বলি, কেবল এয়ারকি করলে ত চল্‌বে না! কর্ত্তব্য বলে যে জিনিস আছে সেটা কি ভুলেও এক-আধবার ভাবতে নেই? এদিকে নিজের মাথাটি যে খেয়ে ব'সেছ"—মশাই বল্‌লে বিশ্বাস করবেন না, এতেই সে একেবারে গজগজিয়ে উঠে আমার কথাগুলো না শুনেই হন্‌হন্ করে চলে গেল!

সোম। এইত দেখুন না, এখানে সকলে সাধু সঙ্গে ব'সে কত সৎপ্রসঙ্গ হচ্ছে শুনলেও উপকার হয়। তা, ওরা কেউ ভুলেও একবার এদিকে আসুক দেখি, তা আসবে না।

জনা। তা আসবে কেন? যদি দৈবাৎ ভাল কথা কানে ঢুকে যায়!

সত্য। আসল কথা কি জানেন? এ সব হচ্ছে শিক্ষা এবং দৃষ্টান্ত। এই যে শ্রীখণ্ডদেব, লোকটি বেশ একটু অহং-ভাবাপন্ন। এইত দেখুন না, আমাদের এখানে আমি আছি, এঁরা আছেন, তা মাঝে মাঝে আমাদের পরামর্শ নিলেই—

[রামপদর প্রবেশ]

এই দেখুন এক মূর্ত্তিমান এসে হাজির হয়েছে।

নিকুঞ্জ। আরে দেখ্‌ছিস্ আমরা বসে কথা বলছি, এর মধ্যে তোর পাকামো করতে আসবার দরকার কি বাপু?

জনা। বলি, একি বাঁদর নাচ—না সঙের খেলা, যে তামাসা দেখতে এয়েছ?

রাম। [স্বগত] কি আপদ! তখনি বলেছি, আমায় ওখানে পাঠাবেন না—

নিকুঞ্জ। কি হে, তুমি সমাদ্দার মহাশয়ের সঙ্গে বেয়াদবি কর—এই রকম তোমাদের আশ্রমে শিক্ষা দেওয়া হয়?

রাম। আমি? কই, আমিত—আমার ত মনে পড়ে না, আমি—

সত্য। আমি, আমি, আমি,—কেবল আমি! আমি, আমি, এত আত্মপ্রচার কেন? আর কি বলবার বিষয় নেই?

ঈশান। "আত্মম্ভরী অহঙ্কার আত্মনামে হুহুঙ্কার
তার গতি হবে না হবে না—"

সোম। দেখ, ওরকমটা ভাল নয়—নিজের কথা দশ জনের কাছে ব'লে বেড়াব, এ ইচ্ছাটাই ভাল নয়।

সত্য। আমি যখন খুলনায় চাকরী করতাম, ফাউসন সাহেব নিজে আমায় সার্টিফিকেট্ দিলে—"বিদ্যায় বুদ্ধিতে, জ্ঞানে উৎসাহে, চরিত্রে সাধুতায়, সেকণ্ড টু নন্-ন্ (second to none)!! কারুর চাইতে কম নয়। আমি কি সে কথা তোমায় বল্‌তে গিয়েছিলাম?

নিকুঞ্জ। আমার পিসতুতো ভাই সেবার লাট্ সাহেবের সামনে গান করলে আমি কি তা নিয়ে ঢাক পিটিয়েছিলাম?

ঈশান। আমার তিন Volume ইংরাজী কাব্য 'In Memoriam'. 'O Mandhata!' 'O Mores!' যেবার বেরুল সেবার Bengalee-তে কি লিখেছিল জানেন ত? We congratulate the distinguished author of this monumental production (Double Demy Octavo 974 pages), who is evidently in possession of a stupendous amount of astounding information!"

এঁরা যদি কথাটা না তুল্‌তেন, আমি কি গায়ে পড়ে গল্প করতে যেতুম?



সত্যবাহন সমাদ্দার—চিন্তাশীল নেতা

রাম। কি জানি মশাই, আমার শ্রীখণ্ডবাবু পাঠিয়ে দিলেন—তাই বল্‌তে এলুম।

সত্য। দেখ তর্ক করোনা—তর্ক ক'রে কেউ কোন দিন মানুষ হতে পারে নি।

নিকুঞ্জ। হ্যাঁ, ওটা তোমাদের ভারি একটা বদভ্যাস। আজ পর্য্যন্ত তর্ক ক'রে কোন বড় কাজ হয়েছে এ রকম কোথাও শুনেছ?

ঈশান। এই যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, যাতে ক'রে চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রকে চালাচ্ছে, সে কি তর্ক করে চালাচ্ছে?

সোম। আমি দেখছি এ বিষয়ে বড় বড় পণ্ডিতের সকলেরই একমত।

সত্য। আমার সিদ্ধান্ত-বিশুদ্ধিকা বইখানাতে একথা বার বার করে দেখিয়েছি যে তর্ক ক'রে কিছু হবার যো নেই। মনে করুন যেন তর্ক হচ্ছে যে, আফ্রিকা দেশে সেউ-ফল পাওয়া যায় কিনা। মনে করুন যদি সত্যি করে সে ফল থাকে, তবে আপনি বল্‌বার আগেও সে ছিল বলবার পরেও সে থাকবে। আর যদি সে ফল না থাকে, তবে আপনি হ্যাঁ বল্‌লেও নেই, না বল্‌লেও নেই। তবে তর্ক ক'রে লাভটা কি?

ভব। তাত বটেই—ফোড়া যদি পাকবার হয় তাকে আঢ্‌ল ক'রেই রাখো—আর পুলটিস্ দিয়েই ঢাকো, সে টন্‌টনিয়ে উঠবেই।

নিকুঞ্জ। আরে মশাই এ সব বলিই বা কাকে—আর বল্লে শোনেই বা কে!

সোম। শুন্‌লেই বা বোঝে কয়জন আর বুঝলেই বা ধর্‌তে পারে কয়জন? ঐ ধরাটাই আসল কিনা।

[ঈশানের সঙ্গীত]

ধরি ধরি ধর ধর ধরি কিন্তু ধরে কই?
কারে ধরি কেবা ধরে ধরাধরি করে কই?
ধরণে ধারণে তারে ধরণী ধরিতে নারে
আঁধার ধারণা মাঝে সে ধারা শিহরে কই?

জনা। কথাটা বড় খাঁটি। এই যে আমাদের সমাদ্দা-চক্র আর সমসাম্য-সাধন আর মৌলিক খণ্ডাখণ্ড ভাব, এ সমস্ত ধরেই বা কে, আর ধরতে জানেই বা কে?

সত্য। ধরা না হয় দূরের কথা, ও বিষয়ে ভাল ভাল বই যে দু'একখানা আছে, সে-গুলো পড়া উচিত। আমি বেশী কিছু বল্‌ছি না—অন্ততঃ আমার সাম্য-নির্ঘণ্ট আর সিদ্ধান্ত-বিশুদ্ধিকা, এ দুখানা পড়তে পারে ত।

৺সুকুমার রায়

ভব। তাহ'লে ত পড়ে দেখতে হচ্ছে। কি নাম বল্‌লেন বইটার?

সত্য। সাম্য-নির্ঘণ্ট, তিন টাকা ছআনা, আর সিদ্ধান্ত-বিশুদ্ধিকা—তিন ভলুম, খণ্ড-সিদ্ধান্ত অখণ্ড-সিদ্ধান্ত আর খণ্ডাখণ্ড-সিদ্ধান্ত—সাত টাকা চার আনা। ছখানা বই এক সঙ্গে নিলে সাড়ে নয় টাকা, প্যাকিং চার পয়সা, ডাক মাশুল সাড়ে পাঁচ আনা, এই সব শুদ্ধ ন'টাকা সাড়ে চোদ্দ আনা।

ভব। তা এটা আপনার কোন এডিশন্ বল্‌লেন?

ঈশান। আঃ—ফাষ্ট্ এডিশন্ মশাই, ফাষ্ট্ এডিশন্—এইত সবে সাত বছর হ'ল, এর মধ্যেই কি?

সত্য। তা আমিত আর অন্যদের মত বিজ্ঞাপনের চটক্ দিয়ে নিজের ঢাক নিজে পেটাই না।

ঈশান। হ্যাঁ, উনিত আর নিজে পেটান না—ওঁর পেটাবার লোক আছে। তা ছাড়া এই সব কাগজওয়ালা-গুলো এমন হতভাগা, কেউ ওঁর বইয়ের সুখ্যাত করতে চায় না।

সত্য। কেন, সচ্চিন্ত-সন্দীপিকায় বেশ লিখেছিল।

ঈশান। ও হ্যাঁ, আপনার মেজোমামা লিখেছিলেন বুঝি?

সত্য। মেজোমামা নয়, সেজো মামা। কিহে তোমার এখানে হ্যাঁ ক'রে সব কথা শুন্‌বার দরকার কি বাপু?

[রামপদ'র প্রস্থান]

ভব। আচ্ছা ঐ যে খণ্ডাখণ্ড কি সব বল্‌ছিলেন, ও-গুলোর আসল ব্যাপারটা কি একটু বুঝিয়ে বল্‌তে পারেন?

নিকুঞ্জ। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা এই বেলা বুঝিয়ে নিন। এবিষয়ে উনিই হচ্ছেন authority।

সত্য। ব্যাপারটা কি জানেন, খণ্ড-সিদ্ধান্ত হ'চ্ছে যাকে বলে পৃথগ্‌দর্শন। যেমন কুকুরটা ঘোড়া নয়, ঘোড়াটা গরু নয়, গরুটা মানুষ নয়—এই রকম। এ নয়, ও নয়, তা নয়, সব আলগা, সব খণ্ড খণ্ড—এই সাধারণ ইতর লোকে যেমন মনে করে।

ভব। [স্বগত] দেখলে! আমার দিকে তাকিয়ে বল্‌ছে সাধারণ ইতর লোক!

সত্য। আর অখণ্ড-সিদ্ধান্ত হচ্ছে, যাকে আমরা বলি "কেন্দ্রগতং নির্ব্বিশেষং" অর্থাৎ এই যে নানারকম সব দেখছি এ কেবল দেখবার রকমারি কিনা! আসলে বস্তু হিসাবে ঘোড়াও যা গরুও তা—কারণ বস্তুত আর স্বতন্ত্র নয়—মূলে কেন্দ্রগতভাবে সমস্তই এক অখণ্ড—বুঝলেন না?

ভব। হ্যাঁ বুঝেছি। মানে কেন্দ্রগতং নির্ব্বিশেষং—এইত?

সত্য। হ্যাঁ, বস্তুমাত্রেই হচ্ছে তার কেন্দ্রগত কতকগুলি গুণের সমষ্টি। মনে করুন, ঘোড়া আর গরু—এদের গুণ-গুলি সব মিলিয়ে-মিলিয়ে মিলিয়ে দেখুন। ঘোড়া চতুষ্পদ, গরু চতুষ্পদ, ঘোড়া পোষ মানে, গরু পোষ মানে—সুতরাং এখান দিয়ে অখণ্ড হিসাবে কোন তফাৎ নেই, এখানে ঘোড়াও যা গরুও তা। আবার দেখুন, ঘোড়াও ঘাস খায় গরুও ঘাস খায়—এও বেশ মিলে যাচ্ছে, কেমন?

ভব। কিন্তু ঘোড়ার ত শিং নাই, গরুর শিং আছে—তা হ'লে সেখান দিয়ে মিল্‌বে কি করে?

সত্য। সেখানে গাধার সঙ্গে মিল্‌বে। এমনি করে সব পদার্থের সব গুণ নিয়ে যদি কাটাকাটি করা যায়, তবে দেখবেন খণ্ড fraction সব কেটে গিয়ে বাকী থাক্‌বে—এক। তাকেই বলি আমরা অখণ্ড-তত্ত্ব।

ভব। এইবারে বুঝেছি। এই যেমন তাসে তাসে জোড় মিলিয়ে সব গেল কেটে বাকী রইল—গোলামচোর।

সত্য। কিন্তু সাধন করলে দেখা যায়, এর উপরেও একটা অবস্থা আছে। সেটা হচ্ছে সমসাম্যভাব, অর্থাৎ খণ্ডাখণ্ড মীমাংসা। এ অবস্থায় উঠতে পারলে তখন ঠিকমত সমীক্ষা সাধন আরম্ভ হয়।

ভব। "সমীক্ষা" আবার কি?

সত্য। সাধনের স্তরে উঠে যেটা পাওয়া যায়, তাকে বলে সমীক্ষা—সেটা কি রকম জানেন?

ভব। থাক্, আজ আর নয়। আমার আবার কেমন মাথার ব্যারাম আছে।

সত্য। না, আমি ওর ভেতরকার জটিল তত্ত্বগুলো কিছু বল্‌ছি না, খালি গোড়ার কথাটা একটুখানি ধরিয়ে দিচ্ছি।

অর্থাৎ এটুকু তলিয়ে দেখবেন যে ঘোড়াটা যে অর্থে ঘাস খাচ্ছে গরুটা ঠিক সে অর্থে ঘাস খাচ্ছে কি না—

ভব। তা কি ক'রে খাবে? এ হ'ল ঘোড়া, ও হ'ল গরু,—তবে দুজনের যদি একই মালিক হয়, তবে এ-ও মালিকের অর্থে খাচ্ছে, ও-ও মালিকের অর্থে খাচ্ছে—

সত্য। না না—আপনি আমার কথাটা ঠিক ধর্‌তে পারেন নি।

ভব। ও—তা হবে। আমার আবার মাথার ব্যারাম আছে কি না। আচ্ছা, আজকে তা'হ'লে উঠি। অনেক ভাল ভাল কথা শোনা গেল—বই লেখবার সময়ে কাজে লাগবে।

ঈশান। ওঁকে একখানা নোটিশ দিয়েছেন ত?

জনা। ও, না। এই একখানা নোটিশ নিয়ে যান্ ভবদুলাল বাবু। আজ অমাবস্যা, সন্ধ্যার সময় আমাদের সমীক্ষা-চক্র বস্‌বে।

সোম। আজ ঈশানবাবু চক্রাচার্য্য—ওঃ! ওঁর ইয়ে শুন্‌লে আপনার গায়ের লোম খাড়া হ'য়ে উঠবে।

ঈশান। এই তত্ত্ব-টত্ত্ব যে সব শুন্‌লেন্ ওগুলো হচ্ছে বাইরের কথা। আসল ভেতরের জিনিস যদি কিছু পেতে চান তবে তার একমাত্র উপায় হচ্ছে সমীক্ষা সাধন।

[সকলের প্রস্থান]

ভাবগুলো সব আল্‌গা হ'য়ে যাচ্ছে। যেন চারদিকে কি একটা কাণ্ড হ'চ্ছে, সেটা ভেতরে হ'চ্ছে কি বাইরে হ'চ্ছে বোঝা যাচ্ছে না। কেবল মনে হ'চ্ছে, ঝাপ্‌সা ছায়ার মত কে যেন আমার চারদিকে ঘুর্‌ছে। ঘুর্‌ছে ঘুর্‌ছে আর মনের বাঁধন সব খুলে আস্‌ছে।

[সত্যবাহন ও ভবদুলালের প্রবেশ]

ভব। [সশব্দে খাতা ফেলিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে] বাস্‌রে! কি গরম!

সকলে। স্‌-স্‌-স্‌-স্‌- - -



ভবদুলাল—চলচিত্তচঞ্চরী রচয়িতা

দ্বিতীয় দৃশ্য

সমীক্ষা মন্দির

[অন্ধকার ঘরের মাঝখানে লাল বাতি, ধূপধুনা ইত্যাদি। কপালে চন্দন মাখিয়া ঈশান উপবিষ্ট. তাহার পাশে একদিকে সোমপ্রকাশ ও জনার্দন, অপর দিকে নিকুঞ্জ ও দুইটি শূন্য আসন]

[ঈশানের সঙ্গীত ও তৎসঙ্গে সকলের যোগদান]

ঈশান। দেখতে দেখতে সব যেন নিস্তেজ হ'য়ে ছায়ার মত মিলিয়ে গেল। বোধ হ'ল যেন ভেতরকার খণ্ড খণ্ড

ভব। এখন সেই মক্ষিকা চক্র হবে বুঝি?

নিকুঞ্জ। এখন কথা বলবেন না—স্থির হয়ে বসুন।

সোম। মক্ষিকা নয়—সমীক্ষা।

ঈশান। অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে তারপর ভয়ে ভয়ে বল্‌লাম, "কে"? শুন্‌লাম আমার বুকের ভিতর থেকে ক্ষীণ সরু গলায় কে যেন বল্‌লে "আমি"। বোধ হ'ল যেন ছায়াটা চল্‌তে চল্‌তে থেমে গেল। তখন সাহস ক'রে আবার বল্‌লাম "কে"? অমনি "কে-কে-কে" ব'লে কাঁপতে কাঁপতে কাঁপতে কাঁপতে কে যেন পর্দ্দার মত স'রে গেল—চেয়ে

৺সুকুমার রায়

দেখলাম, আমিই সেই ছায়া, ঘুর্‌ছি ঘুর্‌ছি আর বাঁধন খুল্‌ছে!

জনা। মনের লাটাই ঘুর্‌ছে আর সুতো খুল্‌ছে, আর আত্মা-ঘুড়ি উধাও হ'য়ে শূন্যে উড়ে গোঁৎ খাচ্ছে!

ঈশান। কালের স্রোতে উজান ঠেলে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে চল্‌ছি আর দেখ্‌ছি যেন কাছের জিনিস সব ঝাপসা হ'য়ে স'রে যাচ্ছে, আর দূরের জিনিসগুলো অন্ধকার ক'রে ঘিরে আস্‌ছে। ভূত, ভবিষ্যৎ সব তাল পাকিয়ে জ'মে উঠ্‌ছে আর চারিদিক হ'তে একটা বিরাট অন্ধকার হাঁ ক'রে আমায় গিল্‌তে আস্‌ছে। মনে হ'ল একটা প্রকাণ্ড জঠরের মধ্যে অন্ধকারের জারক-রসে অল্পে অল্পে আমায় জীর্ণ ক'রে ফেল্‌ছে আর সৃষ্টি প্রপঞ্চের শিরায় আমি অল্পে অল্পে ছড়িয়ে পড়্‌ছি। অন্ধকার যতই জমাট হ'য়ে উঠ্‌ছে, ততই আমায় আস্তে আস্তে ঠেল্‌ছে আর বল্‌ছে, "আছ নাকি, আছ নাকি?" আমি প্রাণপণে চীৎকার ক'রে বল্‌লাম--"আছি।" কিন্তু কোনও আওয়াজ হ'ল না—খালি মনে হ'ল অন্ধকারের পাঁজরের মধ্যে আমার শব্দটা নিশ্বাসের মত উঠ্‌ছে আর পড়্‌ছে।

ভব। উঃ! বলেন কি মশাই?

ঈশান। কোথাও আলো নেই শব্দ নেই, কোন স্থল নেই, বস্তু নেই—খালি একটা অন্ধপ্রাণের ঘূর্ণী ঝড়ের বাঁধন ঠেলে ঠেলে বুদ্‌বুদের মত চারিদিকে ফুলে উঠ্‌ছে। দেখলাম সৃষ্টির কারখানায় মালপত্রের হিসাব মিল্‌ছে না। অন্ধকারের ভাঁজে ভাঁজে পঞ্চতন্মাত্রা সাজান থাকে, এক জায়গায় তার কাঁচা মশলাগুলো ভূতশুদ্ধি না হ'তেই হুড়্ হুড়্ ক'রে স্থূল-পিণ্ডের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। আমি চীৎকার ক'রে বল্‌তে গেলুম "সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! সৃষ্টিতে ভেজাল পড়েছে—" কিন্তু কথাগুলো মুখ থেকে বেরোলই না। বেরোল খালি হা হা হা হা একটা বিকট হাসির শব্দ। সেই শব্দে আমার সমীক্ষা-বন্ধন ছুটে গিয়ে সমস্ত শরীর ঝিম্ ঝিম্ কর্‌তে লাগল।

ভব। আপনি চ'লে আসবার পর আমি দেখলাম সেই যে লোকটা ভেজাল দিয়েছে, সেই ভেজাল ক্রমাগত ঠেলে উপর দিকে উঠতে চাচ্ছে। উঠতে পার্‌ছে না, আর গুমরে গুমরে কেঁপে উঠ্‌ছে। আর কে যেন ফিস্ ফিস্ ক'রে বল্‌ছে, "Shake the bottle, shake the bottle".—সত্যি!

ঈশান। কি মশাই আবোল তাবোল বক্‌ছেন!

সোম। দেখুন, এ সব বিষয়ে ফস্ ক'রে কিছু বল্‌তে নেই—আগে ভিতরে ভিতরে ধারণা সঞ্চয় কর্‌তে হয়।

জনা। হ্যাঁ, সব জিনিসে কি আর ফেকি চলে?

ভব। ও, ঠিক হয়নি বুঝি? তা আমার ত অভ্যেস নেই—তার উপর ছেলেবেলা থেকেই কেমন মাথা খারাপ। সেই একবার পাগ্‌লা বেড়ালে কাম্‌ড়েছিল, সেই থেকে ঐ রকম। সে কি রকম হ'ল জানেন? আমার মেজো মামা, যিনি ভাগলপুরে চাকরী করেন, তাঁর ঐ পশ্চিমের ঘরটায় টেঁপি, টেঁপির বাপ, টেঁপির মামা, মনোহর চাটুয্যে,—না, মনোহর চাটুয্যে নয়—মহেশ দা, ভোলা,—

ঈশান। তাহ'লে ঐ চলুক, আমি এখন উঠি।

ভব। শুনুন না—সবাই ব'সে ব'সে গল্প কর্‌ছে এমন সময়ে আমরা ধর্ ধর্ ধর্ ধর্ ব'লে বেড়ালটাকে তাড়া ক'রে ঘরের মধ্যে নিতেই বেড়ালটা এক লাফে জানালার উপর যেই না উঠেছে, অম্‌নি আমি দৌড়ে গিয়ে খপ্ ক'রে ধরেছি তার ল্যাজে—আর বেড়ালটা ফ্যাস্ ক'রে আমার হাতের উপর কাম্‌ড়ে দিয়েছে।

[ঈশানের প্রস্থানোদ্যম]

ভব। এই একটু শুনে যান্—গল্পটা ভারি মজার।

ঈশান। দেখুন, এটা হাস্‌বার এবং গল্প করবার জায়গা নয়।

ভব। তাই নাকি? তবে আপনি যে এতক্ষণ গল্প করছিলেন।

ঈশান। গল্প কি মশাই? সমীক্ষা কি গল্প হ'ল?

জনা। কাকে কি বলে তাই জানেন না, কেন তর্ক করেন মিছিমিছি?

ভব। না, না, তর্ক কর্‌ব কেন? দেখুন তর্ক ক'রে কিছু হবার যো নেই। এই যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, এযে তর্ক করে সব চালাচ্ছে, সেকি ভাল ক'রছে? আমি তর্কের জন্য বলিনি।

সত্য। দেখুন, এ আপনাদের ভারি অন্যায়। ভুলচুক কি আর আপনাদের হয় না? অমন করলে মানুষের শিখবার আগ্রহ থাক্‌বে কেন?

[আশ্রমের ছাত্র বিনয়সাধনের প্রবেশ]

ঈশান। ঐ দেখ, আবার একটি এসে হাজির। তুমি কে হে ?

বিনয়। আমি? হ্যাঃ, আমার কথা কেন বলেন? আমি আবার একটা মানুষ! হ্যাঃ, কি যে বলেন?

ঈশান। বলি, এখানে এয়েছ কি কর্‌তে?

সত্য। কি নাম তোমার?

বিনয়। আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীবিনয়সাধন। [পকেট হইতে পত্র বাহির করিয়া] ভবদুলালবাবু কার নাম?

সত্য। কেন হে, বেয়াদব? সে খবরে তোমার দরকার কি?



সোম প্রকাশ—উন্নতিশীল যুবক

নিকুঞ্জ। একি এয়ার্কি পেয়েছ? তোমার বাপ ঠাকুর্দার বয়সী ভদ্রলোক সব—ছি, ছি, ছি!

জনা। কি আস্পর্দ্ধা দেখুন ত!

নিকুঞ্জ। হ্যাঁ,—কার বাপের নাম কি, শ্বশুরের বয়স কত, ওর কাছে তার কৈফিয়ৎ দিতে হবে।!

সত্য। এই এঁর নাম ভবদুলালবাবু। এখন কি বলতে চাও এঁর বিরুদ্ধে বল।

বিনয়। না, না, বিরুদ্ধে বল্‌ব কেন?

সত্য। কাপুরুষ! এইটুকু সৎসাহস নেই—আবার আস্ফালন কর্‌তে এসেছ?

বিনয়। আহা, আমার কথাটাই আগে বল্‌তে দিন—

সত্য। শুন্‌লেন ভবদুলালবাবু? ওর কথাটা আগে বল্‌তে দিতে হবে। আমাদের কথাগুলোর কোন মূল্যই নেই।

নিকুঞ্জ। দশজনে যা শুন্‌বার জন্যে কত আগ্রহ ক'রে আসে, এঁরা সে-সব তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবেন।

সোম। এইজন্য সাধকেরা বলেন যে, মানুষের ভূয়োদর্শনের অভাব হ'লে মানুষ সব কর্‌তে পারে।

বিনয়। কি আপদ! মশায় চিঠিখানা দিতে এসেছিলুম তাই দিয়ে যাচ্ছি—এই নিন। আচ্ছা ঝক্‌মারি যা হোক্!

[দ্রুত প্রস্থান]

সোম। মানুষের মনের গতি কি আশ্চর্য্য! একদিকে heredity আর একদিকে environment—এই দুয়ের প্রভাব একসঙ্গে কাজ ক'রে যাচ্ছে।

ভব। [পত্র পাঠ করিয়া] শ্রীখণ্ডবাবু আমাকে কাল ওখানে নিমন্ত্রণ করেছেন।

ঈশান। কি! এতবড় আস্পর্দ্ধা! আবার নিমন্ত্রণ কর্‌তে সাহস পান কোন্ মুখে?

সত্য। না, যাবনা আমরা। সত্যবাহন সমাদ্দার ওসব লোকের সম্পর্ক রাখে না।

ভব। উনি লিখছেন, "কাল ছুটির দিন, আপনার সঙ্গে নিরিবিলি বসিয়া কিছু সৎপ্রসঙ্গ করিবার ইচ্ছা আছে।"

ঈশান। ঐ, দেখেছেন? "নিরিবিলি বসিয়া"। কেন বাপু, আমরা এক আধ জন ভদ্রলোক থাক্‌লে তোমার আপত্তিটা কি?

জনা। এর থেকেই বোঝা উচিত যে ওঁর মতলবটা ভাল নয়।

নিকুঞ্জ। ঠিক বলেছেন। মতলব যদি ভালই হবে, তবে এত ঢাক্‌ঢাক্ গুড়্‌গুড়্ কেন? নিরিবিলি বস্‌তে চান কেন?

সোম। বুঝেছেন ভবদুলালবাবু, আপনি ওখানে যাবেন না। গেলেই বিপদে পড়বেন।

৺সুকুমার রায়

ভব। বল কিহে? ছুরিছোরা মার্‌বে নাকি?

সোম। না, না, বিপদটা কি জানেন? চিন্তাশীল লোকেরা বলেন যে, বিপদ মারাত্মক হয় সেখানে, যেখানে তার অন্তর্গূঢ় ভাবটিকে তার বাইরের কোন অবান্তর স্বরূপের দ্বারা আচ্ছন্ন ক'রে রাখা হয়।

ভব। [পুলকিতভাবে] এ আবার কি বলে শুনুন।

সোম। স্বয়ং Herbert Spencer এ কথা বলেছেন। আপনি Herbert Spencerকে জানেন ত?

ভব। হ্যাঁ...হার্ব্বার্ট, স্পেন্সার, হাঁচি, টিক্‌টিকি, ভূত প্রেত সব মানি।

সত্য। আপনি ভাববেন না ভবদুলালবাবু, আপনার কোন ভয় নাই। আমি আপনার সঙ্গে যাব, দেখি ওরা কি কর্‌তে পারে।

নিকুঞ্জ। বাস্, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

ঈশান। সেই জুবিলির বছর কি হয়েছিল মনে নেই? শ্রীখণ্ডবাবু ওঁদের ওখানে এক বক্তৃতা দিলেন, আমরা দল বেঁধে শুন্‌তে গেলাম। গিয়ে শুনি, তার আগাগোড়াই কেবল নিজেদের কথা। ওঁদের আশ্রম, ওঁদের সাধন, ওঁদের যত ছাই-ভস্ম, তাই খুব ফলাও ক'রে বল্‌তে লাগ্‌লেন।

সত্য। শেষটায় আমি বাধ্য হ'য়ে উঠে তেজের সঙ্গে বল্‌লাম, "লালাজি দেওনাথের সময় থেকে আজ পর্য্যন্ত যে অখণ্ড-সাধন-ধারা প্রবাহিত হ'য়ে আস্‌ছে, তা' যদি কোথাও অক্ষুণ্ণ থাকে, তবে সে হচ্ছে আমাদের সাম্য-সিদ্ধান্ত সভা।

ঈশান। ওঁরা সে সব ভেঙ্গে চুরে এখন বিজ্ঞানের আগড়ুম বাগড়ুম কর্‌ছেন। আরে বিজ্ঞান বিজ্ঞান বল্‌লেই কি লোকের চখে ধুলো দেওয়া যায়!

নিকুঞ্জ। বেশীদূর যাবার দরকার কি? ওঁরা কি রকম সব ছেলে তৈরী করছেন তাও দেখুন, আর আমাদের সোম প্রকাশকেও দেখুন।

জনা। একটা আদর্শ ছেলে বল্‌লেই হয়।

সোম। না, না, ছি ছি ছি, কি বল্‌ছেন! আমি এই যেমন লোহিত সাগর আর ভূমধ্য সাগরের মধ্যে সুয়েজ প্রণালী, আমায় সেই রকম মনে কর্‌বেন।

জনা। আসল কথা হচ্ছে, আমরা এখন সাধনের যে স্তরে উঠেছি, ওঁরা সে পর্য্যন্ত ধারণা কর্‌তেই পারেন নি।

নিকুঞ্জ। ওঃ! গতবারে যদি আপনি থাক্‌তেন! ঈক্ষা ও সমীক্ষা সম্বন্ধে সমাদ্দার মশাই যা বল্‌লেন শুন্‌লে আপনার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত।

ঈশান। হ্যাঁ হ্যাঁ, কাঁটা দিয়েত উঠত, কিন্তু এখন দুপুর রাত পর্য্যন্ত আপনাদের ঐ আলোচনাই চল্‌বে নাকি!

[সকলের গাত্রোত্থান]

সত্য। তা হ'লে এই কথা রইল, কাল আপনার বাড়ী হ'য়ে আমি আপনাকে নিয়ে যাব।

[সকলের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

শ্রীখণ্ড দেবের আশ্রম

[ছাত্রেরা Semicircle হইয়া দণ্ডায়মান। শিক্ষক নবীনবাবু প্রভৃতি ব্যস্তভাবে ঘোরাঘুরি করিতেছেন। শ্রীখণ্ড দেব ঘরের মাঝখানে একটা টেবিলের উপর বড় বড় বই সাজাইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন। একপাশে কতকগুলি অদ্ভুত যন্ত্র ও অর্থহীন Chart প্রভৃতি। দেয়ালে কতকগুলি কার্ডে নানারকম motto লেখা রহিয়াছে।]

নবীন। [জানালা দিয়া বাহিরে তাকাইয়া] এই যাটি করেছে! সঙ্গে সঙ্গে সত্যবাহন সমাদ্দারও আসছে দেখ্‌ছি।

শ্রীখণ্ড। আসুক, আসুক। একবার চোখ মেলে সব দেখে যাক্‌। তারপর দেখি, ওর কথা বলবার মুখ থাকে কিনা।

নবীন। এসে একটা গোলমাল না বাধালেই হয়।

শ্রীখণ্ড। তা যদি করে তাহলে দেখিয়ে দেব যে শ্রীখণ্ড লোকটিও বড় কম গোলমেলে নয়।

[সত্যবাহন ও ভব দুলালেরপ্রবেশ]

সত্য। এই যে, ছেলেগুলো সব হাজির রয়েছে দেখ্‌ছি।

শ্রীখণ্ড। না; সব আর কোথায়? ছুটিতে অনেকেই বাড়ী গিয়েছে।

সত্য। খালি খুব খারাপ ছেলেগুলো র'য়ে গেছে বুঝি?

শ্রীখণ্ড। খারাপ ছেলে আবার কি মশায়? মানুষ আবার খারাপ কি? খারাপ কেউ নয়। ঘোর অসাম্য বদ্ধ পাষণ্ড যে তাকেও আমরা খারাপ বলি না।

ভব। তাত বটেই। ও-সব বল্‌তে নেই। আমি একবার আমাদের গোবরা মাতালকে খারাপ লোক বলেছিলাম্‌, সে এত বড় একটা থান ইঁট নিয়ে আমায় মারতে এসেছিল। ও-রকম কখ্‌খনো বলবেন না।

সত্য। সে কি মশায়! যে খারাপ তাকে খারাপ বল্‌ব না? আলবৎ বল্‌ব। খারাপ ছেলে!

শ্রীখণ্ড। আহা হা, উনি আশ্রমের শিক্ষক—নবীন বাবু।

সত্য। ও, তাই নাকি! যাই হোক্‌, তুমি কি পড়ছে ছোক্‌রা?

ছাত্র। শব্দার্থ-খণ্ডিকা, আয়ব্যন্ধ-পদ্ধতি, লোকাষ্ট-প্রকরণ, Sinnek's Cosmopœdia, Pall's Extra Cyclic Equilibrium and the Negative Zero—

সত্য। থাক্‌ থাক্‌, আর বল্‌তে হবে না! দেখুন, অত বেশী পড়িয়ে কিছু লাভ হয় না। আমি দেখেছি ভাল বই খান-দুই হ'লেই এদিককার শিক্ষা সব এক রকম হয়ে যায়।

ভব। আমার "চলচিত্তচঞ্চরী" বইখানা আপনাদের লাইব্রেরীতে রাখেন না কেন?

শ্রীখণ্ড। বেশ ত, দিন না এক কপি।

ভব। আচ্ছা, দেব এখন। ওটা হয়েছে কি, বইটা এখনও বেরোয় নি। মানে খুব বড় বই হচ্ছে কিনা; অনেক সময় লাগবে। কোথায় ছাপতে দিই বলুন ত?



শ্রীখণ্ড দেব—আশ্রম-প্রতিষ্ঠাতা নেতা

শ্রীখণ্ড। ও, এখনো ছাপ্‌তে দেন নি বুঝি?

ভব। না, এই লেখা হ'লেই ছাপতে দেব। আগে একটা ভূমিকা লিখ্‌তে হবে ত? সেটা কি রকম লিখ্‌ব তাই ভাব্‌ছি। খুব বড় বই হবে কি না!

শ্রীখণ্ড। কি নাম বল্‌লেন বইখানার?

ভব। কি নাম্‌ বল্‌লাম? চলচঞ্চল, কি না? দেখুন ত মশাই, সব ঘুলিয়ে দিলেন—এমন সুন্দর নামটা ভেবেছিলাম।

সত্য। হ্যাঁ, যা বল্‌ছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে আজকাল বাজারে দু'খানা বই বেরিয়েছে—সাম্য-নির্ঘণ্ট আর সিদ্ধান্ত-বিশুদ্ধিকা—তা'তে শিক্ষাতত্ত্ব আর সাধনতত্ত্ব এই দুটো দিকই সুন্দর ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

৺সুকুমার রায়

শ্রীখণ্ড। ঐত,—ও বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে আমাদের মিলবে না। আমরা বলি—অখণ্ড শিক্ষার আদর্শ এমন হওয়া উচিত যে তা'র মধ্যে বেশ একটা সর্ব্বাঙ্গীন সামঞ্জস্য থাকবে—যেমন নিশ্বাস এবং প্রশ্বাস।

সত্য। ঐ ক'রেই ত আপনারা গেলেন। এদিকে ছেলেগুলার শাসন টাসনের দিকে আপনাদের এক ফোঁটা দৃষ্টি নেই।

শ্রীখণ্ড। শাসন আবার কি মশাই? জানেন, ছেলেদের ধমক্ ধামক্ শাসন এতে আমি অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব করি।

ভব। আমারও ঠিক ঐ রকম। আমি যখন পাটনায় মাষ্টার ছিলুম—একদিন একেবারে বার চোদ্দটা ছেলেকে আচ্ছা ক'রে পিটিয়ে দেখ্‌লুম সন্ধ্যের সময় ভারি ক্লেশ হ'তে লাগ্‌ল—হাত টন্‌টন্, কাঁধে ব্যথা।

সত্য। যাক্, যে কথা বল্‌ছিলাম। আমরা আজ ক'দিন থেকে বিশেষ ভাবে চিন্তা ক'রে বেশ বুঝ্‌তে পারছি যে এদের শিক্ষার মধ্যে কতকগুলো গুরুতর গলদ থেকে যাচ্ছে। কেবল নির্ব্বিকল্প সত্যের অনুরোধেই আমি সেদিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রতে বাধ্য হচ্ছি। যথা—(পাঠ) প্রথম—সাম্যসাধনাদি অবশ্য সম্পাদনীয়—বিষয় অনৈকাগ্রতা, অনভিনিবেশ, ও চঞ্চলচিত্ততা।

ভব। "চলচিত্ত চঞ্চরী"—মনে হয়েছে।

সত্য। বাধা দেবেন না। দ্বিতীয়—বিবিধ মৌলিক বিষয়ে সম্যক্ শিক্ষাভাবজনিত খণ্ডাখণ্ড বিচারহীনতা। তৃতীয়—বিবেক-বৃত্তির নানা বৈষম্যঘটিত অবিমৃষ্যকারিতা—

ভব। বড্ড দেরী হ'য়ে যাচ্ছে।

সত্য। হোক দেরী। বিবেকবৃত্তির নানা বৈষম্য ঘটিত—

ভব। ওটা বলা হয়েছে—

সত্য। আঃ—নানা বৈষম্য ঘটিত অবিমৃষ্যকারিতা ও আত্মপ্রচার-তৎপরতা। চতুর্থ—শ্রদ্ধা গাম্ভীর্য্যাদি পরিপূর্ণ বিনয়াবনতির ঐকান্তিক অভাব। পঞ্চম—

শ্রীখণ্ড। দেখুন, ও-সব এখন থাক্। আপনাদের এ-সব অভিযোগ আমরা অনেক শুনেছি। তা'র জবাব দেবার কোন প্রয়োজন দেখি না। কিন্তু তা হলেও সম্যক শিক্ষাভাব ব'লে যেটা বল্‌ছেন সেটা একেবারে অন্যায়। যে-রকম সাবধানতার সঙ্গে উন্নত বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে আমরা আধুনিক—Metapsychological Principles অনুসারে সমস্ত শিক্ষা দিয়ে থাকি—তার সম্বন্ধে এমন অভিযোগের কোন প্রমাণ আপনি দিতে পারেন?

সত্য। একশোবার পারি। তা হ'লে শুনবেন? আপনাদেরই কোন এক ছাত্রের কাছে কোন একটি ভদ্রলোক খণ্ডাখণ্ডের যে ব্যাখ্যা শুনলেন—আমাদের নিকুঞ্জ বাবুর দাদা বল্‌ছিলেন সে একেবারে রাবিশ্—মানেই হয় না।

শ্রীখণ্ড। তাতে কি প্রমাণ হ'ল? ও-ত একটা শোনা কথা।

সত্য। দেখুন, নিকুঞ্জবাবু আমার অত্যন্ত নিকট বন্ধু। তাঁর দাদাকে অবিশ্বাস করা আর আমাকে মিথ্যাবাদী বলা একই কথা।

শ্রীখণ্ড। তা হ'লে দেখ্‌ছি আপনাদের সঙ্গে কথা বলাই বন্ধ কর্‌তে হয়।

সত্য। দেখুন, উত্তেজিত হবেন না। উত্তেজিত ভাবে কোন প্রসঙ্গ করা আমার রীতি বিরুদ্ধ।

ভব। বড্ড দেরী হ'য়ে যাচ্ছে।

সত্য। আঃ—কেন বাধা দিচ্ছেন? জিজ্ঞাসা করি খণ্ডাখণ্ডের যে তত্ত্বপর্য্যায় সেটা আপনারা স্বীকার করেন ত?

শ্রীখণ্ড। আমরা বলি, খণ্ডাখণ্ডটা তত্ত্বই নয়—ওটা তত্ত্বাভাব। আর সমসাম্য যেটাকে বলেন সেটা সাধন নয়—সেটা হ'চ্ছে একটা রসভাব। আপনারা এ-সব এমনভাবে বলেন যেন খণ্ডাখণ্ড সমসাম্য সব একই কথা। আসলে তা নয়। আপনারা যেখানে বলেন—কেন্দ্রগতং নির্ব্বিশেষং, আমরা সেখানে বলি—কেন্দ্রগতং নির্ব্বিশেষঞ্চ। কারণ ও-দুটো স্বতন্ত্র জিনিস। আপনারা যা আওড়াচ্ছেন ও-সব সেকেলে পুরোণো কথা—এ-যুগে ও-সব চলবে না। এ-কালের সাধন বলতে আমরা কি বুঝি শুনবেন—? [ছাত্রের প্রতি] বলত, সাধন কাকে বলে।

ছাত্র। নবাগত যুগের সাধন একটা সহজ বৈজ্ঞানিক প্রণালী যার সাহায্যে একটা যে কোন শব্দ বা বস্তুকে

অবলম্বন ক'রে তারই ভিতর থেকে উত্তরোত্তর পর্য্যায়ক্রমে নানা রকম অনুভূতির ধারাকে অব্যাহত স্বাভাবিকভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়।

শ্রীখণ্ড। শুনলেন ত? আপনাদের সঙ্গে আকাশ পাতাল তফাৎ। ওটা আবার বলত হে।

ছাত্র। [পুনরাবৃত্তি]

সত্য। দেখুন, কোন কথা ধীরভাবে শুনবেন সে সহিষ্ণুতা আপনার নেই। অকাট্য কর্ত্তব্যের প্রেরণায় আপনারই উপকারের জন্য এ-কথা আজকে আমায় বল্‌তে হ'চ্ছে যে, ঐ অহঙ্কার ও আত্মসর্ব্বস্বতাই আপনার সর্ব্বনাশ করবে। চলুন, ভবদুলাল বাবু।

ভব। এই একটু শুনে যাই। বেশ লাগ্‌ছে মন্দ না।

সত্য। তা হ'লে শুনুন, খুব করে শুনুন। অকৃতজ্ঞ, বিশ্বাসঘাতক, পাষণ্ড—[প্রস্থান]

ভব। হ্যাঁ, তারপর সেই বৈজ্ঞানিক প্রণালী—

শ্রীখণ্ড। হ্যাঁ, ওটা এই আশ্রমের একটা বিশেষত্ব—একটা Graduated Psycho-thesis of Phonetic Forms. ওটা অবলম্বন ক'রে অবধি আমরা আশ্চর্য্য ফল পাচ্ছি। অথচ আমাদের প্রাথমিক শ্রেণীর ছাত্রেরা পর্য্যন্ত এর সাধন ক'রে থাকে। মনে করুন যে-কোন সাধারণ শব্দ বা বস্তু—কতখানি জোরের কথা একবার ভাবুন ত?

ভব। চমৎকার! আমার চলচিত্তচঞ্চরীতে ওটা লিখ্‌তেই হ'বে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে যে কোন সাধারণ শব্দ বা বস্তু—একটা দৃষ্টান্ত দিতে পারেন?

শ্রীখণ্ড। হ্যাঁ, মনে করুন গোরু। গো, রু। 'গো' মানে কি? "গোস্বর্গপশুবাক্‌বজ্রদিঙ্‌নেত্রঘৃণিভূজলে", গো মানে গরু, গো মানে দিক, গো মানে ভূ—পৃথিবী, গো মানে স্বর্গ, গো মানে কত কি। সুতরাং এটা সাধন করলে গো বল্‌লেই মনে হবে পৃথিবী, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য, ব্রহ্মাণ্ড। 'রু' মানে কি? 'রব রাব রুত রোদন' 'কর্ণেরৌতি কিমপিশনৈর্বিচিত্রং'; "রু" মানে শব্দ। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অব্যক্ত মর্ম্মর শব্দ বিশ্বের সমস্ত সুখ দুঃখ ক্রন্দন—সব ঘুরতে ঘুরতে ছন্দে ছন্দে বেজে উঠ্‌ছে—music of the spheres—দেখুন একটা সামান্য শব্দ দোহন ক'রে কি অপূর্ব্ব রস পাওয়া যাচ্ছে। আমার শব্দার্থ-খণ্ডিকায় এই রকম দেড় হাজার শব্দ আমি খণ্ডন ক'রে দেখিয়েছি। গরুর সূত্রটা বলত হে।

ছাত্রগণ। খণ্ডিত গোধন মণ্ডল ধরণী
শবদে শবদে মন্থিত অরণী,
ত্রিজগত যজ্ঞে শাশ্বত স্বাহা—
নন্দিত কলকল ক্রন্দিত হাহা!
স্তম্ভিত সুখ দুখ মন্থন মোহে
প্রলয় বিলোড়ন লটপট লোহে;
মৃত্যু ভয়াবহ হম্বা হম্বা
রৌরব তরণী তুঁহু জগদম্বা
শ্যামল স্নিগ্ধা নন্দন বরণী
খণ্ডিত গোধন মণ্ডল ধরণী॥

ভব। ঐ গোরুর কথা যা বললেন—আমি দেখেছি মহিষেরও ঠিক তাই। জয়রামের মহিষ একবার আমায় তাড়া করেছিল—তারপর যেই না গুঁতো মেরেছে অমনি দেখি সব বোঁ বোঁ ক'রে ঘুরছে। তখন মনে হ'ল—চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানিচ। আচ্ছা আপনারা ঐ সমীক্ষা-টমীক্ষা করেন না?

শ্রীখণ্ড। ওগুলো মশায়, ক'রে ক'রে বুড়ো হ'য়ে গেলাম। আসল গোড়াপত্তন ঠিক না হ'লে ও-সবে কিছু হয় না। ওদের খণ্ডাখণ্ড আর আমাদের শব্দার্থ-খণ্ডন—দুটোই দেখ্‌লেন ত? আসল কথা ওদের মতলবটা হ'চ্চে একেবারে ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাবেন। খণ্ডসাধন হ'তে না হ'তেই ওঁরা একলাফে আগ ডালে গিয়ে চ'ড়ে বস্‌তে চান। তাও কি হয় কখন?

নবীন। দেখুন, এরা কিছু শুনবে ব'লে আশা ক'রে আছে। আপনি এদের কিছু বলুন?

ভব। বেশ ত, দেখ বালকগণ, চলচিত্তচঞ্চরী ব'লে আমার একখানা বড় বই হবে—ডবল ডিমাই ৭০০ কি

৺সুকুমার রায়

৮০০ পৃষ্ঠা—দামটা এখনও ঠিক করিনি—একটু কম ক'রেই করব ভাব্‌ছি—আচ্ছা, চার টাকা করলে কেমন হয়? একটু বেশী হয়, না? আচ্ছা ধরুন ৩।০ টাকা? ঐ বইয়ের মধ্যে নানারকম ভাল ভাল কথা লেখা থাক্‌বে। যেমন মনে কর, এই এক জায়গায় আছে—চুরি করা মহাপাপ—যে না বলিয়া পরের দ্রব্য গ্রহণ করে তাহাকে চোর বলে। তোমরা না ব'লে কখনও পরের জিনিস নিয়ো না। তবে অবিশ্যি সব সময় ত আর ব'লে নেওয়া যায় না। যেমন, আমি একবার একটা ভদ্রলোককে বল্‌লাম, "মশায় আপনার সোনার ঘড়ীটা আমাকে দেবেন?" সে বল্‌ল, "না দেব না।" ছোটলোক! আমরা ছেলেবেলায় একটা বই পড়েছিলাম তার নাম মনে নেই—তার মধ্যে একটা গল্প ছিল —তার সবটা মনে পড়ছে না—ভুবন ব'লে একটা ছেলে তার মাসীর কান কাম্‌ড়ে দিয়েছিল। মনে কর তার নিজের কানত নয়—মাসীর কান। তবে না ব'লে কামড়ে নিল কেন? এর জন্য তার কঠিন শাস্তি হয়েছিল।

শ্রীখণ্ড। আচ্ছা, আজ এ পর্য্যন্তই থাক্‌। আবার আস্‌বেন ত?

ভব। আসব বই কি? রোজ আসব। এইত আজ-কেই আমার সতের পৃষ্ঠা লেখা হয়ে গেল। এ রকম হপ্তাখানেক চল্‌লেই বইখানা জ'মে উঠ্‌বে। আচ্ছা আজ আসি।

[গুন গুন গান করিতে করিতে প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

[ঈশান, নিকুঞ্জ, জনার্দ্দন ও সোমপ্রকাশ উপবিষ্ট]

[সত্যবাহনের প্রবেশ]

জনা। তারপর সেদিন ওখানে কি হ'ল?

নিকুঞ্জ। হ্যাঁ, আপনি কদিন আসেন নি; আমরা শোনবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে আছি।

সত্য। হবে আর কি, হুঁঃ! একথা ভাবতেও কষ্ট হয় যে শ্রীখণ্ডবাবু একদিন আমাদেরই একজন ছিলেন। আজ আমাদের সংস্পর্শে থাকলে তাঁর কি এমন দশা হ'ত? সামান্য ভদ্রতা পর্য্যন্ত ওঁরা ভুলে গেছেন।

ঈশান। ভবদুলাল বাবুকে ওখানেই রেখে এলেন নাকি?

সত্য। তাঁর কথা আর বল্‌বেন না। তিনি তাঁর গুরুর নামটি একেবারে ডুবিয়েছেন। কি বল্‌ব বলুন, তাঁর সাম্‌নে শ্রীখণ্ডবাবু আমায় বার বার কি রকম দারুণ ভাবে অপমান করতে লাগ্‌লেন—উনি তার বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত করলেন না—উলটে বরং ওঁদের সঙ্গেই নানা রকম হৃদ্যতা প্রকাশ করতে লাগলেন।

নিকুঞ্জ। ছি, ছি, ছি, এ একেবারে অমার্জ্জনীয়।

সোম। দেখুন, কিসে যে কি হয় তা কি কেউ বল্‌তে পারে? আমরা অসহিষ্ণু হ'য়ে ভাব্‌ছি ভবদুলাল বাবু আমাদের ত্যাগ করেছেন—আমি বলি কে জানে?—হয়ত অলক্ষিতে আমাদের প্রভাব এখনো তাঁর উপর কাজ কর্‌ছে।

সত্য। ও সব কিছু বিশ্বাস নেই হে—সামান্য বিষয়ে যে খাঁটি ও ভেজাল চিন্‌তে পারে না—তার থেকে কি আর আশা করতে বল?

ঈশান। [গান]

কিসে যে কি হয় কে জানে!
কেউ জানে না, কেউ জানে না
যার কথা সে বুঝেছে সে জানে।

[বাহিরে পদশব্দ ও গান গাহিতে গাহিতে ভবদুলালের প্রবেশ — Twinkle Twinkle-এর সুর]

ভয় ভয় ভীতি ভাবনা প্রভৃতি—

ঈশান। ওকি রকম বিশ্রী সুরে গাইছেন বলুন ত?

ভব। ওটা আমার একটা নতুন গান।

ঈশান। আপনার গান কি রকম? আমি আজ পাঁচ বছর ওটা গেয়ে আস্‌ছি। আর ওটার ওরকম সুর মোটেই নয়। ওটা এই রকম—(গান)।

ভব। তাই নাকি? ওটা আপনার গান? ঐ যা, ওটাও আমার চলচিত্তচঞ্চরীতে দিয়ে ফেলেছি। তা আপনার নামেই দিয়ে দেব।

নিকুঞ্জ। কি মশায়, আপনার আশ্রমিক পর্ব্ব শেষ হ'ল?

ভব। কি বল্‌লেন? কি পর্ব্বত?

নিকুঞ্জ। বলি আশ্রমের সখটা মিট্‌ল?

ভব। হ্যাঁ, দুদিন বেশ জমেছিল, তারপর ওঁরা কি রকম করতে লাগলেন তাই চ'লে এলাম। আসবার সময় একটা ছেলের কান ম'লে দিয়ে এসেছি।

সোম। দূরবীক্ষণ যন্ত্রে যেমন দূরের জিনিষকে কাছে এনে দেখায় তেম্‌নি কিছুক্ষণ আগে আমার একটা অনুভূতি এসেছিল যে আপনি হয়ত আবার আমাদের মধ্যে ফিরে আসবেন।

ভব। ওঁদের আশ্রমে একটা দূরবীণ আছে—তার এমন তেজ যে চাঁদের দিকে তাকালে চাঁদের গায়ে সব ফোস্‌কা ফোস্‌কা মতন পড়ে যায়। বোধ হয় thousand horse power, কি তার চাইতেও বেশী হবে।

ঈশান। এত বুজরুকিও জানে ওরা।

জনা। ওঁকে ভালমানুষ পেয়ে সাপ বোঝাতে ব্যাং বুঝিয়ে দিয়েছে।

ভব। হ্যাঁ, ব্যাং বল্‌তে মনে হ'ল,—সোমপ্রকাশের কথা ওঁরা কি বলেছেন শোনেন নি বুঝি?

সোম। না, না, কিছু বলেছেন নাকি?

ভব। আমি ওঁদের কাছে সোমপ্রকাশের সুখ্যাত করছিলাম, তাই শুনে শ্রীখণ্ডবাবু বল্‌লেন যে আমরা চাই মানুষ তৈরী করতে—কতকগুলো কোলা ব্যাং তৈরী ক'রে কি হবে?

নিকুঞ্জ। আপনি এর কোন প্রতিবাদ করলেন না?

ভব। না—তখন খেয়াল হয় নি।

সোম। মানুষকে চেনা বড় শক্ত। Herbert Latham তাঁর একটি প্রবন্ধে লিখেছেন যে, ক্ষমতা এবং অক্ষমতার দুইয়েরই মৌলিক রূপ এক। ওঁরা একথা স্বীকার করবেন কিনা জানি না।

ভব। হুঁ, হুঁ, খুব স্বীকার করেন—এই ত সেদিন আমায় বল্‌ছিলেন যে ঈশেন এবং সত্যবাহন দুই সমান—এ বলে আমায় দ্যাখ্‌ আর ও বলে আমায় দ্যাখ্‌। আরে দেখব আর কি? এরও যেমন কানকাটা খরগোসের মতন চেহারা, ওরও তেম্‌নি হাঁ-করা বোয়াল মাছের মতন চেহারা!

সত্য। কি! এতবড় আস্পর্দ্ধা! আমায় কানকাটা খরগোস বলে!

ভব। না, না, আপনাকে ত তা বলেনি—আপনাকে বোয়াল মাছ বলেছে।

নিকুঞ্জ। কি অভদ্র ভাষা! আমায় কিছু বল্‌লে?

ভব। আমি জিজ্ঞেস্‌ করেছিলুম—তা বল্‌লে, নিকুঞ্জ কোন্‌টা?—ঐ যে ছাগ্‌লা দাড়ি, না যার ডাবা হুঁকোর মত মুখ?

নিকুঞ্জ। আপনি কি বল্লেন?

ভব। আমি বল্‌লাম ডাবা হুঁকো।

নিকুঞ্জ। নাঃ—এক-একটা মানুষ থাকে, তাদের মাথায় খালি গোবর পোরা!

ভব। কি আশ্চর্য্য! শ্রীখণ্ডবাবুও ঠিক তাই বলেন। বলেন ওদের মাথায় খালি গোবর—তাও শুকিয়ে ঘুঁটে হ'য়ে গেছে।

সত্য। এ সব আর সহ্য হয় না। মশায়, আপনি ওখানে ছিলেন—বেশ ছিলেন। আবার আমাদের হাড় জ্বালাতে এলেন কেন?

ঈশান। আহা, ও কি? উনি আগ্রহ ক'রে আস্‌ছেন সেত ভালই।

জনা। হ্যাঁ, বেস ত, উনি আসুন না।

সত্য। আগ্রহ কি নিগ্রহ কে জানে?

নিকুঞ্জ। হ্যাঁ, অত অনুগ্রহ নাই করলেন।

ভব। হাঃ, হাঃ, হাঃ, ও'টা বেশ বলেছেন। ছেলেবেলায় আমাদের সঙ্গে একজন পড়ত—সেও ঐ রকম কথা গোলমাল করত। দ্রাক্ষাকে বল্ত দ্রাহ্মা। ঐ 'কএ মূর্দ্ধণ্য ষএ' ক্ষ আর 'হ এ ম এ' হ্ম, বুঝ্লেন না?



নিকুঞ্জ—সত্যবাহনের ধামাধারী

সত্য। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝেছি মশায়।

ভব। আমরা ছেলেবেলায় পড়েছিলাম—শৃগাল ও দ্রাক্ষা ফল। দ্রাক্ষা ব'লে এক রকম ফল আছে—মানে আছে কিনা জানি না, কিন্তু তর্ক ক'রে ত লাভ নাই। মনে করুন যদি বলেন নাই, তা সে আপনি বল্লেও আছে, না বল্লেও আছে। তা হ'লে তর্ক ক'রে লাভ কি? কি বলেন?

সত্য। আপনার কাছে কোন কথা বলাই বৃথা।

ভব। না না, বৃথা হবে কেন? ওটা আমার চলচিত্তচঞ্চরীতে দিয়েছি ত। আপনার নাম ক'রেই দিয়েছি।

সত্য। আমার নাম করেছেন, কি রকম? আপনি ত সাংঘাতিক লোক দেখ্ছি মশায়। দেখুন, ঐ যা'-তা' লিখ্বেন আর আমার নামে চালাবেন—এ আমি পছন্দ করি না।

ভব। বাঃ! নাম কর্ব না? তা নইলে শেষটায় লোকে আমায় চেপে ধর্বে আর আমি জবাব দিতে পার্ব না, তখন? সে হচ্ছে না। ঐ ঈশান বাবুর বেলাও তাই। যার যার গান, তার তার নাম।

সত্য। দেখুন, আপনি সহজ কথা বুঝবেন না আবার জেদ করবেন।

ভব। ও, ভুল হয়েছে বুঝি? তা আমার আবার মাথার ব্যারাম আছে কিনা। সেই সেবার সেই সজারুতে কাম্ড়েছিল—

ঈশান। কি মশায়, সেদিন বল্লেন বেড়াল, আর আজ বলছেন সজারু।

ভব। ও, তাই নাকি? বেড়াল বলেছিলাম নাকি? তা হবে। তা. ও বেড়ালও যা সজারুও তাই। ও কেবল দেখ্বার রকমারি কিনা। আসলে বস্তু ত আর স্বতন্ত্র নয়। কারণ কেন্দ্রগতং নির্ব্বিশেষম্। কি বলেন? ওটাও দিয়ে দিই, কেমন?

সত্য। দেখুন, যে বিষয়ে আপনার বুঝ্বার ক্ষমতা হয়নি সে বিষয়ে এরকম যা তা যদি লেখেন তবে আপনার সঙ্গে আমার জন্মের মতন ছাড়াছাড়ি।

ভব। কি মুস্কিল! শ্রীখণ্ডবাবুও ঠিক ঐ রকম বল্লেন। ওঁদেরই কতকগুলো ভাল ভাল কথা সেদিন আমি ছেলেদের কাছে বল্ছিলাম, এমন সময় উনি রেগে—"ওসব কি শেখাচ্ছেন" ব'লে একেবারে তেইশখানা পাতা ছিঁড়ে দিলেন। তাই ত চ'লে এলাম।

ঈশান। একি মশায়? খাতায় এসব কি লিখেছেন।

ভব। কেন, কি হয়েছে বলুন দেখি?

ঈশান। কি হয়েছে—? এই আপনার চলচিত্তচঞ্চরী? এসব কি? ঈশানবাবুর ছায়া ঘুরছে—লাটাই পাকাচ্ছে—আর ঈশেনবাবু গোঁৎ খাচ্ছেন। পেটের ভিতর বিরাট অন্ধকার হাঁ ক'রে কামড়ে দিয়েছে—চ্যাঁচাতে পারছেন না, খালি নিশ্বাস উঠ্ছে আর পড়ছে—সব ঝাপ্সা দেখ্ছে—গা ঝিম ঝিম—Nux Vomica 30—

ভব। বাঃ! ও গুলো ত আপনাদেরই কথা। শুধু Nux Vomica-টা আমার লেখা।

[ঘোর উত্তেজনা]

সকলে। দিন দেখি খাতাখানা।

ভব। আঃ—আমার চলচিত্তচঞ্চরী—

সত্য। ধ্যেৎ তেরি চলচিত্তচঞ্চরী—

ভব। ওকি মশায়—টানাটানি করেন কেন? একেত শ্রীখণ্ডবাবু তেইশখানা পাতা ছিঁড়ে দিয়েছেন—হাঁ, হাঁ, হাঁ, করেন কি, করেন কি? দেখুন দেখি মশায়, আমার চলচিত্তচঞ্চরী ছিঁড়ে দিলে!

[ছেঁড়া খাতা সংগ্রহের চেষ্টা]

সত্য। এই ঈশেনবাবুর যত বাড়াবাড়ী। আপনার ওসব গান আর সমীক্ষা ওঁকে শোনাবার কি দরকার ছিল?

ঈশান। আপনি আবার আহ্লাদ ক'রে ওঁর কাছে খণ্ডাখণ্ডের ব্যাখ্যা করতে গেলেন কেন?

ভব। খাতা ছিঁড়ে দিয়েছেন তা কি হয়েছে। আবার লিখ্‌ব—চলচিত্তচঞ্চরী—লাল রংএর মলাট—চামড়া দিয়ে বাঁধান। তার উপরে বড় বড় করে সোনার জলে লেখা—চলচিত্তচঞ্চরী—Published by ভবদুলাল। একুশ টাকা দাম করব। তখন দেখ্‌ব—আপনার ঐ সাম্যঘণ্ট আর সিদ্ধান্ত বিসূচিকা কোথায় লাগে।

[গান]

সংসার কটাহ তলে জ্বলে রে জ্বলে!
জ্বলে মহাকালানল জ্বলে জ্বল জ্বল,
সজল কাজল জ্বলে রে জ্বলে।
অলক তিলক জ্বলে ললাটে,
সোনালি লিখন জ্বলে মলাটে,
খেলে কাঁচাকচু জ্বলে চুলকানি
জ্বলে রে জ্বলে।

রবীন্দ্রনাথের পত্র

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

আমার শারীরিক অবসাদ এত বেশি হয়েচে যে, চিঠিপত্র লেখা প্রভৃতি সংসারের ছোট ছোট ঋণগুলোও প্রতিদিন জমে উঠ্‌চে—পরজন্মে এই পাপের যদি দণ্ড থাকে তাহলে নিশ্চয়ই আমি দৈনিক সংবাদ-পত্রের এডিটর হব। সে আশঙ্কার কথা মনে উদয় হলেই নির্ব্বাণ মুক্তির জন্যে উঠে পড়ে লাগ্‌তে ইচ্ছা হয়—কিন্তু আপাতত তার চেয়ে সহজ চিঠির জবাব দেওয়া। সবুজপত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে বই কি। দেশের তরুণদের মনে সবুজ রং-কে বেশ পাকা করে দেবার পূর্ব্বে তোমার ত নিষ্কৃতি নেই। প্রবীণতার বর্ণহীন রসহীন চাঞ্চল্যহীন পবিত্র মরুভূমির মাঝে মাঝে অন্তত একটা আধটা এমন ওয়েসিস থাকা চাই যাকে সর্ব্বব্যাপী জ্যাঠামির মারী-হাওয়াতেও মেরে ফেল্‌তে না পারে। অন্তহীন বালুকারাশির মধ্যে তোমার নিত্যমুখর সবুজপত্রের দোদুল্যমান ছায়াটুকু যৌবনের চির-উৎসধারার পাশে অক্ষয় হয়ে থাক্। প্রাণের বৈচিত্র্য আপন বিদ্রোহের সবুজ জয়পতাকাটি শুভ্র একাকারত্বের বুকের মধ্যে গেড়ে দিয়ে অমর হয়ে দাঁড়াক্। আমার এই খোলা জানলাটার কাছে বিশ্রাম-শয্যায় শুয়ে আমি আমার ঐ সাম্‌নের মাঠের দিকে চেয়ে অনেকটা সময় কাটাই। ওখানে দেখতে পাই মাঠের সমস্ত ঘাস শুকিয়ে পাণ্ডুবর্ণ হয়ে গেছে, শাস্ত্র-উপদেশ ভরা অতি পুরাতন পুঁথির পাতার মত। অনেকদিন বৃষ্টি নেই, রৌদ্রও প্রখর—তাতে শুষ্কতা প্রবল হয়ে এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্ত পর্য্যন্ত সমস্ত ভূমিকে অধিকার করেছে। তার প্রতাপ যে কত বড় তা এই দূর-বিস্তৃত শূন্যতার একটানা বিস্তার দেখ্‌লেই বুঝতে পারা যায়। কিন্তু এরই মধ্যে একটি মাত্র তালগাছ এত বড় সনাতন নির্জ্জীবতাকে উপেক্ষা করে একলাই দাঁড়িয়ে আকাশের সঙ্গে আলোকের সঙ্গে নিত্যই আপনার পত্র-ব্যবহার চালাচ্চে। কোথাও কিছুমাত্র বাণী নেই, কিন্তু ঐ একটুকুখানি মাত্র জায়গায় বাণীর উৎস কিছুতেই আর বন্ধ হয় না। একটি দেবশিশু প্রকাণ্ড দৈত্যের মুখের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে যদি তুড়ি মারে তাহলে সে যেমন হয় এও তেমনি। যে অমর তার ত প্রকাণ্ড হবার দরকার করে না, মৃত্যুই আপনার আয়তনের প্রসার নিয়ে বড়াই করে। তোমার সবুজপত্র ঐ তালগাছটিরই মত দিগন্তবিস্তৃত বার্দ্ধক্যের মরুদরবারের মাঝখানে একলা দাঁড়াক্। জরাসন্ধের দুর্গ ভয়ানক দুর্গ—সেখানে প্রকাণ্ড কারাগার, সেখানে লোহার শিকলের মালার আর অন্ত নেই। কিন্তু তার ভয়ঙ্কর কড়া পাহারার মধ্যেও পাণ্ডব এসে প্রবেশ করে, তার সৈন্য নেই সামন্ত নেই; সেই নিরস্ত্র তারুণ্য কত সহজে কত অল্প সময়ে জরাসন্ধকে ভূমিসাৎ করে দিয়ে তার কারাগারের দ্বার ভেঙে দেয়; সেখানে বন্দী ক্ষত্রিয়দের মুক্তিদান করে। আমাদের দেশেও জরাসন্ধের দুর্গের মধ্যে দেশের ক্ষত্রিয়েরাই বন্দী রয়েছে, যারা ক্ষত থেকে দেশকে ত্রাণ করবে, যারা দূরে দূরান্তরে আপন অধিকার বিস্তার করবে, যারা বিরাট্ প্রাণের ক্ষেত্রে দেশের জয়ধ্বজা বহন করে নিয়ে যাবে, আমাদের অশ্বমেধের ঘোড়ার রক্ষক হবে যা'রা। সেই যুবক ক্ষত্রিয়দের হাত পা থেকে জরার লোহার বেড়ি ঘুচিয়ে দেবার ব্রত নিয়েচ তোমরা; তোমাদের সংখ্যা বেশি নয়, তোমাদের সমাদর কেউ করবে না, তোমাদের গাল দেবে, কিন্তু জয়ী হবে তোমরাই—জরার জয়, মৃত্যুর জয় কখনই হবে না।

তোমাদের সবুজপত্রের দরবারে আমাকে তোমরা আমন্ত্রণ করেচ। তোমাদের সাধনা যখন সবুজপত্রের নাম নিয়ে আপনাকে প্রকাশ করেনি তখনো এই সাধনা আমি গ্রহণ করেছি, বহন করেছি। তারুণ্য নূতন নূতন কালে, নূতন নূতন রূপে, নূতন নূতন পুষ্প-পল্লবে নিজেকে বারবার প্রকাশ করে। প্রাণের অক্ষয়-বট যে অক্ষয়,

তার কারণ তার মজ্জার মধ্যে চির-তারুণ্যের রসধারা বইচে। তাই প্রতি বসন্তেই সে বারেবারে নূতন বেশে নবযুবক হয়ে দেখা দেয়। আমাদের দেশেও জীর্ণ বটের মজ্জার মধ্যে যদি যৌবনের রস একেবারেই না থাকত তাহলে এর দ্বারা দেশের চিতাকাষ্ঠই রচনা হত। কিন্তু এখানেও দেখি মাঝে মাঝে যৌবন একটা আকস্মিক বিদ্রোহের মত কোথা হতে আবির্ভূত হয়ে কঠিন জরার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে। আমাদের সময়ে সে নির্ভয়ে এসেছে, নূতন কথা বলেচে, মার খেয়েছে, পুরাতন আপন চণ্ডীমণ্ডপে বসে তাকে একঘরে করে দিয়েচে। সেদিন আমি সেই ঝোড়োদলের মধ্যেই ছিলুম। দল যে বাহিরে খুব বড় ছিল তা নয়, কিন্তু অন্তরে তার বেগ ছিল। চণ্ডীমণ্ডপনিবাসীরা এখনো সেজন্যে আমাকে ক্ষমা করেনি। আমি তাদের ক্ষমার দাবীও করিনে, কেননা আমি জেনে শুনে ইচ্ছাপূর্ব্বক চণ্ডীমণ্ডপের শান্তি ভঙ্গ করেছি, সেখানকার বৈকালিক নিদ্রার যতদূর ব্যাঘাত করবার তা করতে ত্রুটি করিনি। অর্থাৎ বিকালের নিস্তব্ধ তন্দ্রা-লোকে সকালের চাঞ্চল্য সমীরিত করবার চেষ্টা করেছি।

আমাদের কালের সেই চাঞ্চল্য-সাধনাই তোমাদের কালের নূতন পাতায় বিকশিত হয়ে নীলাকাশের উপুড়-পেয়ালা থেকে সূর্য্যালোকের তেজোরস পান করবার চেষ্টা করচে। সেই তেজ তোমাদের ফলে ফলে সঞ্চারিত ও সঞ্চিত হয়ে দেশের প্রাণ-ভাণ্ডারকে পুনঃ পুনঃ পূর্ণ করবে।

কিন্তু একটা কথা তোমরা ভুলে গেছ, ইতিমধ্যে আমার পদোন্নতি হয়েচে। ছিলেম যুবক মহারাজের দ্বারের প্রহরী এখন শিশুমহারাজের সভায় সখার পদ পেয়েছি। অর্থাৎ নবজন্মের সীমানার কাছাকাছি এসে পৌচেছি—মৃত্যুর পূর্ব্বে এই চৌকাঠটি পেরোনোই বাকি আছে। এই যে এগোবার দিকে চলেচি এখন আমাকে পিছুডাক ডেকো না। বিধাতা আমাকে বর দিয়েচেন আমি বুড়ো হয়ে মরব না। সেই জন্যে যৌবন-মধ্যাহ্ন পেরিয়ে আমার আয়ু চিরশ্যামল শিশুদিগন্তের দিকে নেমেচে। আমার জীবনের শেষ কাজ এবং শেষ আনন্দ ঐ খানেই রেখে যাবার জন্যে আমার ডাক পড়েচে। যৌবনের জয়যাত্রায় আমার জীবনের অধিকাংশ কালই আমি আঘাত অপমান নিন্দার কাছে হার মানি নি, আমি অশান্তির অভিঘাতের ভয়ে পিঠ ফিরিয়ে পালিয়ে যাইনি। কিন্তু এখন দিনশেষে আমার মনিবের হাত থেকে পুরস্কার নেবার সময় হয়েচে। আমার মনিব এসেচেন শিশু হয়ে, পুরস্কারও পাচ্চি। তাঁর কাজে শান্তি অল্প, শান্তি যথেষ্ট, কিন্তু ছুটি একটুও নেই। সেই জন্যে এখান থেকে আমি তোমাদের জয় কামনা করি, কিন্তু তোমাদের তালে তালে পা ফেলে তোমাদের অভিযানে চলব এখন আমার আর সে অবকাশ নেই। আগামী কালে যারা যুবক হবে আমি এখন তাদের সঙ্গ নিয়েচি। তাদের সেই ভাবী যৌবন নির্ম্মল হবে, নির্ভয় হবে, বাধা-মুক্ত হবে, জড়তা স্বার্থ বা জনাদরের প্রবলতা বা প্রলোভনে অভিভূত না হয়ে সত্যের জন্য আপনাকে উৎসর্গ করবে এই যে আমি কামনা করেচি সেই কামনা যদি আমার কিছু পরিমাণেও সিদ্ধ হয় তাহলেই আমার জীবন চরিতার্থ হবে। ইতি ১৭ বৈশাখ, ১৩২৬।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই পত্রখানি কবি, শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন।
প্রমথ বাবুর সৌজন্যে ইহা বিচিত্রায় প্রকাশিত হইল। বিঃ সঃ



চকিত ও নিশ্চিন্ত

শিল্পী—শ্রীপ্রভাত মোহন বন্দোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন

ক্রমশঃ-প্রকাশ্য উপন্যাস

সতী

শ্রী নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

(৬)

যে দিন সুরমা প্রথম জানিল যে তার স্বামী মাতাল ও চরিত্রহীন হইয়াছেন, যে দেবতাকে এতদিন সে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া পূজা করিয়া জীবন সার্থক করিয়াছে সে পিশাচ হইয়া দাঁড়াইয়াছে তখন তার মনে হইল, জীবনে যেন আর কোনো অবলম্বনই তার নাই। তার সমস্ত আত্মা গভীরভাবে শিকড় গাড়িয়াছিল তার স্বামীর সত্তায়। এই সর্ব্বনাশ যেন তাহাকে সেই চিরদিনের আশ্রয় হইতে সমূলে উৎপাটন করিয়া তাহাকে অসীম শূন্যের ভিতর ছাড়িয়া দিল। সে কোনও আশ্রয় খুঁজিয়া পাইল না, তার জীবনের আর কোনও অর্থ রহিল না। সে কেবল আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

কি মর্ম্মান্তিক এ দুঃখ। বুক ফাটিয়া যায় ইহাতে, তবু এতো মুখ ফুটিয়া কারও কাছে বলিবার নয়। আজ তার সর্ব্বস্ব হারাইয়া গিয়াছে, তার প্রতিষ্ঠার আর বিন্দু-মাত্র স্থান নাই। এ লজ্জা, এ অপমান, এ লাঞ্ছনা সে সহিবে কি করিয়া? কেমন করিয়া লোকের কাছে মুখ দেখাইবে? অন্তরতম সুহৃদের কাছেও যে এ লজ্জার কথা মুখ ফুটিয়া বলিবার নয়!

তাই সুরমা সুধু কাঁদিল। তিনদিন সে লুকাইয়া লুকাইয়া কেবলি কাঁদিল, স্বামীকে কিছু বলিল না।

কাঁদিয়া কাঁদিয়া যখন তার বেদনা সহনীয় হইয়া গেল তখন সে মনস্থির করিয়া তার কর্ত্তব্য নির্ণয় করিল। তার তো আপনার দুঃখে কাঁদিবার সময় নাই। সতী সে, স্বামীকে রক্ষা করিবার ভার যে তাহার। তা' ছাড়া এত দিন পরে আবার যে অভাগ্য সন্তান তার গর্ভে স্থান লই-য়াছে তাহাকে বাঁচাইতে হইবে সবচেয়ে নিদারুণ অপমান হইতে। শিশুর কাছে পিতার কলঙ্ক যে কত বড় লজ্জা কত বড় অপমানের কথা তাহা সুরমা আপনার অন্তর দিয়া অনুভব করিল। সে লজ্জা, সে অপমান তাকেই নিবারণ করিতে হইবে। যদি আবশ্যক হয়, প্রাণ দিয়াও সে তার স্বামীকে পাপ হইতে রক্ষা করিবে।

সেদিন গভীর রাত্রে ভূপতি যখন ফিরিল তখন সুরমা কৃত-সঙ্কল্প হইয়া বসিয়া ছিল।

ভূপতি আসিয়া বলিল, তার আহার হইয়া গিয়াছে, সে আর খাইবে না। সুরমাকে খাইতে বলিলে সে বাড়া ভাত তুলিয়া লইয়া বারান্দায় গিয়া আঁস্তাকুড়ে ফেলিয়া হাত ধুইয়া আসিল।

ভূপতি স্তব্ধ হইয়া দেখিল।

তার পর সে স্বামীর পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া বলিল, "ওগো একি সর্ব্বনাশ করছো তুমি আমার। আমাকে দয়া কর। এতদিন যে তুমি আমায় বড় আদর দিয়েছ, তোমার ছায়ায় রেখে আমাকে সব দুঃখ থেকে বাঁচিয়েছ, সামান্য আঁচড়টুকু আমার গায় লাগলে ব্যথা পেয়েছ। আজ তুমি কেমন ক'রে নিজ হাতে আমায় এমন ব্যাথা দিচ্ছ? দয়া কর।"

ভূপতি এ ব্যাপারে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। সে শুধু নির্ব্বোধের মত চুপ করিয়া বসিয়া রহিল—কোনও কথা খুঁজিয়া পাইল না বা কিছু করিতে পারিল না। আর তার চরণতলে তার চিরদয়িতা পত্নী মাথা লুকাইয়া, এলা-

য়িত ঘন কেশরাশি তার ছুটি পায়ের উপর ছড়াইয়া করুণ স্বরে বিলাপ আবেদন করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পর সে সুরমার হাত ধরিয়া তুলিতে চেষ্টা করিল। সুরমা ছুই হাতে পা চাপিয়া জড়াইয়া ধরিয়া রহিল, বলিল, "উঠ্বো না আমি, ছাড়বো না পা'। বল তুমি এসব ছাড়বে। যেমনটি ছিলে তেমনি হ'বে, তবে ছাড়বো।"

আম্‌তা আমতা করিয়া ভূপতি বলিল, "কি বলছো তুমি? কে তোমার মাথায় এ সব ঢুকিয়েছে? এ সব মিথ্যে ক'রে বানিয়ে কে ব'লেছে তোমায়?"

পা ছাড়িয়া বসিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া সুরমা বলিল, "কেউ কিছু বলেনি আমায়! সতী যে, তাকে এসব বলবার দরকার করে না। তোমার মনে একটু পাপের ছায়া পড়লে আমার অন্তর তাতে চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। তোমার মুখখানে চাইলে আমি তোমার ভিতরটা সব দেখ্‌তে পাই। আমার কাছে লুকোবার চেষ্টা ক'রো না। ছুঃখের উপর আর ছুঃখ বাড়িও না। ওগো, তুমি যে চিরদিন সত্যবাদী, এ পাপ কি তোমায় আজ মিথ্যাবাদী বানাবে?"

সুরমার চোখের দিকে চাহিয়া আর ভূপতির মিথ্যা বলিতে সাহস হইল না। সে এই সামান্য ক্ষীণপ্রাণ নারীর কাছে আপনাকে অত্যন্ত ছুর্ব্বল ও অসহায় বোধ করিল। সুরমার দৃষ্টি সে সহিতে পারিল না, চক্ষু নত করিয়া শুধু বলিল, "থাক গে, সত্যি মিথ্যার বিচার ক'রে আর কি হ'বে। তুমি যা শুনেছ তা' ঠিক নয়, আমি কিছু করি নি, শুধু কয়েকদিন গান শুনতে গিয়েছিলাম"—

সুরমা বলিল, "ছি, ছি, আবার মিথ্যে ব'লছো। আমার কাছে তুমি মিথ্যে ব'লছো? তুমি যে নিজে আমাকে কথা ও দৃষ্টান্ত দিয়ে সত্যধর্ম্ম শিখিয়েছ! আপনাকে তুমি এত খাট' ক'রো না, তোমার পায়ে পড়ি।"

ভূপতি বলিল, "তা তুমি তাই বুঝে থাক তবে তাই ঠিক। যাক গে, আর না হয় নাই গেলাম। নেও, কেঁদো না, এসো।"

আবার পা ধরিয়া সুরমা বলিল, "তবে তাই বল, আমার গা ছুঁয়ে শপথ কর আর তুমি যাবে না, আর মদ খাবে না।"

মুখখানা একটু হাসির মত করিয়া ভূপতি সুরমার গায়ে হাত দিয়া বলিল, "আচ্ছা তা নইলে যদি নাই হয় তবে তাই ক'রছি, তোমার গা ছুঁয়েই বলছি আর যাব না। আর মদ খাব না।"

বলিয়া সে বিছানার উপর শুইয়া পড়িয়া বলিল, "নেও এখন শোবে এসো।" কিছু খাইবার কথা বলিতে একবার ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু কি জানি কেন তার সাহস হইল না।

সুরমা উঠিয়া ছুয়ারে খিল দিয়া আসিল, তার পর আসিয়া বলিল, "আজকের দিনটা আমায় মাপ কর, আজকে আমি তোমার কাছে শুতে পারছি না, কিছুতেই মন চাচ্ছে না। আজ আমাকে ক্ষমা কর।" বলিয়া সে একটা বালিস মেঝেয় ফেলিয়া আঁচল পাতিয়া শুইয়া পড়িল।

ইহার উপর কোনও কথা কহিতে ভূপতি অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইল। বিলাসের সদ্য-আলিঙ্গন-দূষিত তার দেহ স্পর্শ করিতে সুরমার এ সঙ্কোচ দেখিয়া তার রাগ হইল, কিন্তু তবু নিজের অপরাধ স্মরণ করিয়া সে আর কোনও কথা বলিতে সাহস করিল না।

তারপর ছুজনে চুপ করিয়া শুইয়া রহিল, কিন্তু কেহই ঘুমাইল না।

সুরমা শুইয়া শুইয়া নীরবে তার অদৃষ্টের কথা ভাবিতে লাগিল আর তার ছুই চক্ষু গড়াইয়া জল পড়িতে লাগিল। সে মনে মনে সকল দেবতার কাছে প্রার্থনা করিল যেন তার স্বামীর সুমতি হয়, তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার শক্তি যেন হয়।

ভূপতি শুইয়া শুইয়া আকাশ পাতাল চিন্তা করিতে লাগিল। সুরমা জানিতে পারিলে যে কি বিপরীত কাণ্ড হইবে সেই ভয়ে সে অনেক দিন কষ্ট পাইয়াছে। সেই আশঙ্কিত ব্যাপারটা এত সহজে নিষ্পত্তি হইয়া যাওয়ায় সে কতকটা আরাম বোধ করিল। যা'ক, আপদ চুকিয়া গিয়াছে; এতদিনকার লুকাচুরীতে তার প্রাণ হাঁপাইয়া

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

উঠিয়াছিল, সে সব যে মিটিয়া গিয়াছে তাহাতে সে বেশ একটু শান্তি বোধ করিল।

তারপর তার প্রতিজ্ঞার কথা! এ প্রতিজ্ঞা সে রক্ষা করিবে! মিছামিছি সুরমাকে কষ্ট দিবে না। সুরমাকে ভূপতি সত্য সত্যই প্রাণ দিয়া ভালবাসিত। তার কান্না ও কাতর আবেদন শুনিয়া তার প্রাণে বাস্তবিকই খুব ঘা লাগিয়াছিল। তাই সে স্থির করিল আর সে সুরমাকে দুঃখ দিবে না। বিলাসের কাছে আর সে যাইবে না। কিন্তু—বিলাসও যে তাকে সত্য সত্যই ভালবাসে! তার কত কথা মনে পড়িল। বিলাসের আদর সোহাগ, তার হাসি কৌতুক, মদ খাওয়া বা অন্য কোথাও যাওয়ার জন্য তার তিরস্কার, কান্নাকাটি, ভূপতির অদর্শনে বিলাসের উৎকণ্ঠা—সব মনে পড়িল। কিন্তু যাক সে সব! ও পথে আর নয়!

ভূপতি যদি না যায় তবে বিলাস অবশ্যই আবার অন্য পুরুষকে গ্রহণ করিবে, তাকেও ঠিক তেমনি করিয়া আদর করিবে, অন্যে আসিয়া বিলাসকে প্রেমসম্ভাষণ করিবে। ভাবিতে ভূপতির মনের ভিতর সহস্র বৃশ্চিক দংশন করিল। সে কিছুতেই হইতে পারে না।

সেই সময় সুরমা পাশ ফিরিল। ভূপতি আবার তার বর্ত্তমান আবেষ্টনে ফিরিয়া আসিল। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিল, "যাক্ গে যাক্, হয় হ'বে কি আর ক'রবো। সুরমাকে তাই বলে কষ্ট দেওয়া যায় না।" একথা বলিতেও তার প্রাণের ভিতর একটা দারুণ বেদনা মোচড় দিয়া উঠিল।

ভূপতির আবার মনে হইল সুরমার এতটা বাড়াবাড়ি অন্যায়। সে তো সুরমার কোনও অযত্ন করে নাই—ঠিক আগের মতই সে তাকে ভালবাসে—আগের মতই সে ভূপতির সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। তা ভূপতি বাহিরে কোথায় কোন্ দিন কি করে তাতে সুরমার কি-ই এমন আসে যায়। কিন্তু এ সব তাকে কিছু বুঝান যাইবে, এ চিন্তা বৃথা। বিলাসকে ত্যাগ করিতেই হইবে।

কিন্তু বিলাস যদি না ছাড়ে! সেও তো ভূপতিকে ভালবাসে। তার ভালবাসার তুলনা নাই। সুরমা ভালবাসে তার স্বামীকে, এতো সবাই করিয়া থাকে। কিন্তু বিলাসের সঙ্গে তার কোনও সম্বন্ধ নাই—বিলাস জানে ইচ্ছা করিলেই ভূপতি তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারে, তবু সে তাকে প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসে। ভূপতির সামান্য সুখের জন্য সে যে-কোনও কষ্ট স্বীকার করিতে পারে। ইহার পরিচয় সম্যক না পাইলেও তার কথা বার্ত্তা কাজ কর্ম্ম দেখিয়া ভূপতির এ বিষয়ে সন্দেহ মাত্রও ছিল না। সুতরাং ভূপতি ছাড়িয়া দিলেই যে বিলাস তাহাকে নির্ব্বিবাদে ছাড়িয়া দিবে তার নিশ্চয়তা কি? বিলাস হয় তো একথা শুনিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া একটা কাণ্ড কারখানা করিয়া বসিবে। হয়তো আত্মহত্যাও করিতে পারে। আরও কত কিছু ভয়ানক কাণ্ড করিতে পারে। ভাবিতে ভূপতির বুক কাঁপিয়া উঠিল। সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। সুরমার দিকে চোখ পড়িতে আবার চুপ করিয়া শুইয়া পড়িল। ভাবিল, 'যা'ক কি আর করিব—উপায় নাই। সুরমাকে একথা কিছুতেই বুঝান যাইবে না।'

এমনি করিয়া ভাবিতে ভাবিতে তার অনেক রাত্রি কাটিল। শেষ রাত্রে সে ঘুমাইয়া পড়িল। যখন তার ঘুম ভাঙ্গিল তখন সুরমা উঠিয়া গিয়াছে। বাহিরে গিয়া সে দেখিল সুরমা স্নান করিয়া প্রতিদিনের মত নিবিষ্টমনে গৃহকর্ম্ম করিতেছে। ভূপতিকে সে স্মিতমুখে সম্ভাষণ করিল, তার মুখ ধোয়া হইলে তাহার খাবার ও চা আনিয়া দিয়া এমন ভাবে আলাপ আরম্ভ করিয়া দিল যেন কিছুই হয় নাই। কাল রাত্রের ব্যাপারটা যেন একটা দারুণ দুঃস্বপ্ন মাত্র। তার বাহির দেখিয়া কাহারও অনুমান করিবার উপায় ছিল না কি ঝড়টা তার ভিতর বহিয়া গিয়াছে—এবং এখনও থাকিয়া থাকিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিতেছে।

ভূপতির না ভিতর না বাহির ছিল আগের মত। তার মনের ভিতর ছিল দারুণ বিক্ষোভ, মুখ খানাও শুষ্ক, মেঘাচ্ছন্ন! বিলাসের প্রতি আকর্ষণ ও সুরমার ভয় এই উভয়ের মিশ্রণে তার মনে যে দ্বন্দ্ব কাল রাত হইতে চলিতেছিল তাহা সমানে চলিতে লাগিল। সে বেশীক্ষণ অন্তঃপুরে থাকিল না। তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়া সে চিৎপাত হইয়া ফরাসের উপর শুইয়া তার অন্তরের এ প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার আবেগ

সহিতে লাগিল। কিন্তু একথা স্থির রহিল যে বিলাসের কাছে আর যাওয়া হইবে না।

সেই দিন দ্বিপ্রহরে এককড়ি গিয়া তাহাকে আফিসে খবর দিল যে বিলাসের বড় অসুখ। ভেদ বমি হইয়া সে অস্থির হইয়া পড়িয়াছে।

আর দ্বিধা রহিল না। আফিস হইতে ছুটি লইয়া ভূপতি তখনি বড় ডাক্তার লইয়া বিলাসের বাড়ী উপস্থিত হইল। বিলাস যদিও অত্যন্ত অস্থির হইয়াছিল, তবু বাস্তবিক তার বেশী কিছু হয় নাই। সামান্য অজীর্ণ, ভূপতি যাইবার ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই সে সুস্থির হইল। তারপর কিছুক্ষণ আমোদ আহ্লাদ করিয়া ঠিক আফিস হইতে ফিরিবার সময় ভূপতি বাড়ী ফিরিল।

সুরমা হাসি মুখে তাহাকে সম্ভাষণ করিল। সে নিজ হাতে ভূপতির চাদরটা খুলিয়া আলনায় রাখিয়া ভূপতিকে চুম্বন করিবার জন্য অগ্রসর হইল। হঠাৎ যেন বিভীষিকা দেখিয়া পিছাইয়া গেল, তার পর ধপ্ করিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল। আর্ত্তনাদ করিয়া সে বলিল, "আবার তুমি গিয়াছিলে সেখানে? ওঃ!"

ভূপতি যেন কেমনতর হইয়া গেল। সুরমা কি করিয়া টের পাইল? তার কি দিব্যদৃষ্টি আছে? কিন্তু সে নিমিষে আপনাকে সামলাইয়া বলিল, "কই না! কি অন্যায় তোমার! এমন কথা আমাকে বলছ কি করে?" সে ভারী রাগ দেখাইল।

সুরমা তখন সুস্থির হইয়া উঠিল। স্বামীর কাছে অগ্রসর হইয়া তার কাঁধের উপর হইতে ছোট একটী সোনার ব্রুচ তুলিয়া লইয়া ভূপতির হাতে দিল। ব্রুচের উপর লেখা ছিল "তোমারই"। ভূপতিই এ ব্রুচটা বিলাসকে দিয়াছিল, ইহা সে সদা সর্ব্বদা পরিত। কখন যে কি প্রকারে এই বিশ্বাস-ঘাতক অলঙ্কার বিলাসের কাপড় হইতে খুলিয়া গোপনে খসিয়া ভূপতির কোটের ভিতর বিঁধিয়া বসিয়াছিল তাহা সে বা বিলাস টের পায় নাই। ভূপতি বুঝিল শেষ-বিদায়-আলিঙ্গনের সময় এই সর্ব্বনেশে কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে।

ভূপতি তখন আমতা আমতা করিয়া বলিল, "অ্যা" হাঁ—আজ আফিসে খবর পেলাম তার কলেরা হ'য়েছে-তাই একবার দেখতে গিয়েছিলাম—মারা যায় সে, একবার দেখতে চেয়েছিল তাই—আর কিছু নয় সুরো!

একথার ভিতর সত্যের খাদ থাকিলেও তাহাতে এখন কুলাইল না। বিশেষ, কলেরার মরণাপন্ন রোগী দেখিতে যাওয়ায় ব্রুচ জামায় বিঁধিয়া যাওয়ার কোনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা হয় না। কথাটা বলিয়াই ভূপতি একথা বুঝিতে পারিল এবং আরও অপ্রস্তুত হইয়া গেল।

সুরমা কেবল ঘৃণায় ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া একবার তীব্র দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া বাহির হইয়া গেল। ভূপতি বেকুব বলিয়া আপনাকে মনে মনে তিরস্কার করিতে করিতে নিজেই কাপড় চোপড় ছাড়িয়া মুখ ধুইতে গেল।

বাহিরে গিয়া দেখিল সুরমা একান্তমনে অভ্যাসমত খাবার ঠিক করিতেছে। তার মুখ একটু গম্ভীর, কিন্তু তা ছাড়া তার যে কিছু হইয়াছে ইহা বুঝিবার কোনও উপায় নাই।

মুখ ধুইয়া ভূপতি ঘরে ঢুকিয়া সুরমার প্রত্যাবর্ত্তনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, এবং এবার আসিলে সে কি বলিবে ও কি করিবে মনে মনে তার মুসাবিদা করিতে লাগিল।

কিন্তু সুরমা অভ্যাসমত খাবার লইয়া আসিল না—আসিল ঝি।

(৭)

ইহার পর সুরমা আর ভূপতিকে কিছু বলিল না। সে কেবল স্বামীর সংসর্গ ও সম্ভাষণ একেবারে পরিত্যাগ করিল। ভূপতি ইহাতে প্রথমে একটু অপ্রস্তুত হইল কিন্তু মোটের উপর সে ইহাতে স্বস্তি পাইল। এতদিন তার ভয় ছিল সুরমা পাছে জানিতে পারে এবং জানিতে পারিলে যে কি ভয়ানক ব্যাপার হইবে তাহা স্মরণ করিতে সে শিহরিয়া উঠিত। কিন্তু এখন যখন জানাজানিটা হইয়া গেল তখন আর তার সঙ্কোচ রহিল না। যদি ইহার পরও সুরমা পুনরায় এ প্রসঙ্গের উত্থাপন করিত তবে সে হয় তো

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

একটু বিপদে পড়িত, কিন্তু সুরমা বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া দিয়া তাহাকে সে দায় হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছিল। মোটের উপর সে ইহাতে বাঁচিয়া গেল। এখন সে অসঙ্কোচে বাহিরে গতায়াত করিতে লাগিল, এবং ক্রমে রাত্রিতে মত্ত অবস্থায়ও বাড়ী ফিরিতে আর বাধা রহিল না।

যেদিন ভূপতি মত্ত অবস্থায় প্রথম বাড়ী ফিরিল সেদিন তার অবস্থা দেখিয়া সুরমা একেবারে পাথরের মূর্ত্তির মত নিশ্চল স্তব্ধ হইয়া গেল। এখন যে কি করিতে হইবে তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। সে সুধু জ্যোতিকে ডাকিয়া দিয়া অন্য ঘরে গিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তার পর সে আহার বন্ধ করিল। তিন দিন সম্পূর্ণ অনাহারে কাটাইল। কিন্তু জ্যোতি ভয়ানক উৎপাত আরম্ভ করিল। সে অনেক বুঝাইল, অনেক অনুনয় করিল, শেষে নিজে খাওয়া বন্ধ করিল। সুরমার কাজেই চতুর্থ দিনে পুনরায় খাইতে হইল। ভূপতি এ-কয়দিন একটু চিন্তিত ও অন্যমনস্ক ছিল, কিন্তু স্ত্রীর কাছে গিয়া এ সম্বন্ধে কোনও কথা কওয়া বা তাহাকে অনুরোধ করা তার পক্ষে অসম্ভব ছিল। সুরমা তার সঙ্গে কথা কয় না, সে কাছে গেলেই সরিয়া যায়। ভূপতির এজন্য তার কাছে অগ্রসর হইতে গুরুতর সঙ্কোচ বোধ হইত। অথচ সুরমা যে না খাইয়া ছট্‌ফট্‌ করিবে এবং হয় তো মরিয়া যাইবে, এ কথা ভাবিতে প্রাণটা হাঁফাইয়া উঠিত। যেদিন সে খবর পাইল সুরমা আহার করিয়াছে সেদিন সে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল এবং নিশ্চিন্ত মনে সে পথে তিন পেগ হুইস্কী খাইয়া বিলাসের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল।

উপস্থিত বিপদ কাটিয়া যাওয়ায় যদিও ভূপতি একটু সন্তুষ্ট হইল তবু আর একদিক দিয়া তার মনটা খারাপ হইয়া উঠিল। সুরমা তার সঙ্গে কথা বলে না।

ভূপতির বেতন বৃদ্ধি হইলে সে সেদিন খুসী হইয়া বাড়ী ফিরিয়া পুরাতন অভ্যাসবশে হঠাৎ সুরমার গায়ে হাত দিয়া কি একটা সোহাগের কথা বলিতে গিয়াছিল, তাহাতে সুরমা ফোঁস করিয়া গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিয়াছিল, "কি সাহসে তুমি আমার গা ছুঁতে এসো! বেশ্যার অঙ্গ স্পর্শ ক'রে এসে আমায় ছুঁতে লজ্জা করে না। ফের যদি ছোঁও গলায় দড়ি দেব বল্‌ছি।" বলিয়া সে গিয়া স্নান করিয়া বস্ত্র-ত্যাগ করিল।

সুরমার এ-সব ব্যবহার ভূপতির চক্ষে ক্রমে বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তাহার ভিতরের পুরুষ এবং স্বামী একসঙ্গে গর্জ্জন করিয়া বলিল, স্ত্রীর এত স্পর্দ্ধা ভাল নয়। তা ছাড়া সে এমনই বা কি করিয়াছে? সে এক নিঃশ্বাসে অনেক এমন বড় বড় নামজাদা লোকের নাম করিতে পারে যারা তার চেয়ে অনেক বেশী অপকার্য্য করে, এবং তাদের স্ত্রীরা তার জন্য কিছুই বলে না। সুরমা কি এক স্বর্গের দেবী যে এই সামান্য কারণে সে এতটা বাড়াবাড়ি করিতে থাকিবে? ইহা ভূপতির পক্ষে দারুণ অপমান! এই বলিয়া সে অন্তরে অন্তরে ফুলিতে লাগিল, কিন্তু এ অপমানের প্রতিকার করিবার কোনও চেষ্টা, এমন কি ভাষায় প্রতিবাদ করিবার পর্য্যন্ত কোনও উদ্যোগ সে করিতে পারিল না। সে কেবল মনে মনে গুমরাইতে এবং বেশী করিয়া হুইস্কী খাইতে লাগিল।

ভূপতি আরও লক্ষ্য করিল যে জ্যোতির সঙ্গে এখন সুরমার বড় বেশী ভাব। এখন সব সময় তার কথাবার্ত্তা জ্যোতির সঙ্গে! আগে যে সব বিষয়ে সুরমা আলোচনা করিত একমাত্র ভূপতির সঙ্গে, তার যে-সব ফরমায়েস হইত ভূপতিরই উপর, এখন সে-সব হয় জ্যোতির সঙ্গে। তা' ছাড়া ভূপতি যখনি আসে তখনই দেখে সুরমা জ্যোতির সঙ্গে মৃদুস্বরে কথাবার্ত্তা বলিতেছে, সে আসিলেই দুজনের কথা বন্ধ হইয়া যায়, এবং প্রায়ই দুই জনে দুই দিকে চলিয়া যায়। এ-সব দেখিয়া তার বড় রাগ হইত, বিশেষ করিয়া জ্যোতির উপর। কিন্তু কিছু বলিবার তার সাধ্য ছিল না।

একদিন সে বাড়ী আসিয়া দেখিল সুরমা জ্যোতির সঙ্গে বসিয়া খুব নিবিষ্টভাবে কি আলাপ করিতেছে। সে একটু অন্তরালে দাঁড়াইয়া তাদের কথা শুনিবার চেষ্টা করিল। বিশেষ কিছু শুনিতে পাইল না, কিন্তু তার মনে হইল তারা ভূপতির সম্বন্ধেই আলাপ করিতেছে।

কথাটা মোটেই ভূপতির সম্বন্ধে হইতেছিল না। জ্যোতি সেই ভিখারিণীর সঙ্গে গিয়া তাড়াতাড়ি একখানা খোলাঘর

ভাড়া করিয়া তার কন্তাকে সেখানে লইয়া গিয়াছিল এবং দাই ডাকাইয়া সে যুবতীর সুপ্রসবের ব্যবস্থা করিয়াছিল। তার পর হইতে সেই মা ও মেয়ে সেখানেই থাকে, জ্যোতি তাদের খরচ পত্র দেয় এবং তাদের কিছু কিছু উপার্জ্জনের উপায় করিবার চেষ্টা করে। সে একটা যাঁতা এবং কিছু ছোলামটর কিনিয়া তাহাদের দিয়াছিল এবং একজন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়া মেয়েটিকে সেলাইয়ের কাজ শিখাইতেছিল, যাহাতে তাহারা স্বচ্ছন্দে তাদের জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে। কিন্তু শীঘ্রই সে বুঝিতে পারিল যে ভিক্ষাবৃত্তি ও যথেচ্ছাচারে ইহাদের স্বভাব এমন বিগড়াইয়া গিয়াছে যে, ইহাদিগকে একেবারে নিজেদের হাতে ছাড়িয়া দিলে ইহাদের কোনওরূপ উন্নতি অসম্ভব। তাই সে রোজ একবার সেখানে গিয়া তাদের দেখা শোনা করিত এবং তাদের শিক্ষা দিত।

তারপর সে পথে ঘাটে ঘুরিয়া কয়েকটি হতভাগ্য শিশু সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহাদিগকেও সে এই ঘরে আশ্রয় দিয়াছিল। ক্রমে তার প্রতিষ্ঠান বাড়িয়া উঠিল, জ্যোতিকে আরও ঘর লইতে হইল এবং ইহাদের দেখাশোনা ও শিক্ষা কার্য্যের জন্ত অনেক সময় ইহাদের সঙ্গে কাটাইতে হইল।

সে হিসাব করিয়া দেখিল যে, ইহাদের জন্ত একটা স্থায়ী বাসস্থান জোগাড় করিতে পারিলে অনেকটা কাজের সুবিধা হয়। সে খুঁজিয়া নারিকেলডাঙ্গায় একটা জমীর সন্ধান করিয়াছিল। হাজার তিনেক টাকা হইলে সে জমীটা লইয়া একটা মাথা গুঁজিবার মত স্থান করিয়া লওয়া যায়। সে সেই জমীটা বায়না করিয়া আসিয়াছে।

এ সমস্ত কাজ জ্যোতি আগাগোড়াই তার বউদিদির সঙ্গে পরামর্শ করিয়া করিয়াছে, এবং এই বাড়ী করিবার প্রস্তাবটা একরকম সুরমারই। তাই সে আজ আসিয়া সুরমাকে তার কৃতকর্ম্মের পরিচয় দিতেছিল। টাকার প্রসঙ্গে সে কেবল একবার মাত্র ভূপতির নাম করিয়াছিল।

ভূপতি গট্ গট্ করিয়া সেখানে আসিয়া বলিল, "কি পরামর্শ হ'চ্ছে দুজনে? আমার সম্বন্ধে কি কথা হ'চ্ছে শুনি।"

জ্যোতি বলিল, "বিশেষ কিছু নয় দাদা, আমার কিছু টাকার দরকার—তিন হাজার, তোমার কাছে চাইতে হ'বে তাই বলছিলাম।"

ভূপতি বিস্মিত হইয়া বলিল, "তিন হাজার টাকা কি দরকার শুনি।"

"একটা বাড়ী কিনবো।"

"তিন হাজার টাকায় বাড়ী! কলকাতায়! তুই কি ক্ষেপে গেলি নাকি?"

"না দাদা, আমাদের মতন বাড়ী নয়, একটু জমীর উপর খানকয়েক খোলা ঘর।"

"কেন তা' দিয়ে কি হ'বে?"

"কয়েকটি গরীব দুঃখীর থাকবার ব্যবস্থা হবে।"

"হুঁ তা বুঝতে পেরেছি। তিন হাজার টাকা দিয়ে ঘর হ'বে গরীব দুঃখীর থাকবার। কেন টাকা কি খোলাম্ কুচি? তিন হাজার টাকার তিনটি পয়সাও পাবে না, আর তা ছাড়া তোমার এই সব বাঁদরামো চলবে না। এখন তিন মাস নেই একজামিনের বাকী, তুমি যে সারা-দিন টো টো ক'রে সব বাজে ধান্ধায় ঘুরে বেড়াবে সে চলবে না।"

জ্যোতি বলিল, "আমি তো একজামিন দেবো না।"

বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে জ্যোতির দিকে চাহিয়া ভূপতি বলিল, "একজামিন দিবি না কি রে?"

জ্যোতি বলিল, "না আমি পড়বো না আর। আমি এই কাজই ক'রবো।"

ভূপতি কিছুক্ষণ বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া থাকিয়া বলিল, "ও সব বাঁদরামি চলবে না; লক্ষ্মী ছেলের মত পড়বে পড়, নইলে স্পষ্ট বলছি আমার বাড়ীতে তোমার স্থান হ'বে না।

চিরস্নেহ-পরায়ণ দাদার মুখে এই কঠোর কথা শুনিয়া জ্যোতি নিজের কর্ণকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। সে বিস্ময়-স্তব্ধ হইয়া দাদার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া শেষে বলিল, "দাদা,—"

ভূপতি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মাটির দিকে চাহিয়াছিল, সে তীব্র স্বরে বলিল, "আমি কোনও কথা শুনতে চাই না।

আমার এক কথা—প'ড়বে পড়, না হয় বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও।"

সুরমা এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল, সে এ-কথায় দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "কি মাতালের মত বকছো? কাকে কি বলছো তুমি?"—

বাধা দিয়া মুখ বিকৃত করিয়া ভূপতি বলিল, "হাঁ গো হাঁ আমি মাতাল, আমি বদমায়েস, যত সাধু তোমার ঐ দেওর। তা' মাতাল হই বদমায়েস হই, আমি বাড়ীর কর্ত্তা, আমার এই হুকুম।"

বলিয়াই সে গট্ গট্ করিয়া চলিয়া গেল। যদিও সে যথেষ্ট তেজ দেখাইয়া কথাগুলি বলিতেছিল তবু তার প্রাণের ভিতরটা ধুক্ ধুক্ করিতেছিল, এই ভাবিয়া যে, তার এ কথায় এমন মর্ম্মান্তিক উত্তর হইতে পারে, যাহার জবাব সে দিতে পারিবে না। সেখানে দাঁড়াইয়া সুরমা বা জ্যোতির কাছে সে জবাব শুনিবার তার সাহস ছিল না। তাই সে তেজ দেখাইয়া তার ভীরুতা আবরণ করিতে করিতে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

[ক্রমশঃ]

তন্ময়

শ্রীলীলাদেবী

আপনার মুখে হেরি তাহার বয়ান
শিহরি চমকে,
প্রতি অণু ভরি ওঠে উদ্দাম পরাণ
উছাস্ পুলকে!
হেরিতেছি কার মুখ? আমার না তার?
মুকুর করে কি আজি ছল অনিবার?
সেই মুখ, সেই চোখ, তেমনি চাহনি
সেই তো করুণা মাখা অধর তেমনি,
আপনারে আপনি কি করিব প্রণাম;
কেমনে গৌর হ'ল তনু তার শ্যাম?
চোখ মুছি ফিরে দেখি যদি ভ্রম হয়
কই ভ্রম? সেই মুখ—এতো ভুল নয়
বিচিত্র মুকুর সখি, কি কলা-কুশল,
আমার এ মুখে দেখি সে মুখ কেবল।

দুই লাউ

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

মাচার লাউ ছিল বাঁশের মাচাটিতে
বনের লাউ ছিল বনে,
একদা কি করিয়া মিলন হল দোঁহে
কি ছিল রাঁধুনীর মনে!
বনের লাউ বলে মাচার লাউ ভাই
মাচাতে কি করেই ছিলে,
মাচার লাউ বলে বনের লাউ, হায়
বনেতে কেন গজাইলে?
বনের লাউ বলে—না,
আমি, সে কথা ফাঁস না করিব,
মাচার লাউ বলে—ছিঃ
আমি, আর না তোরে শুধাইব।





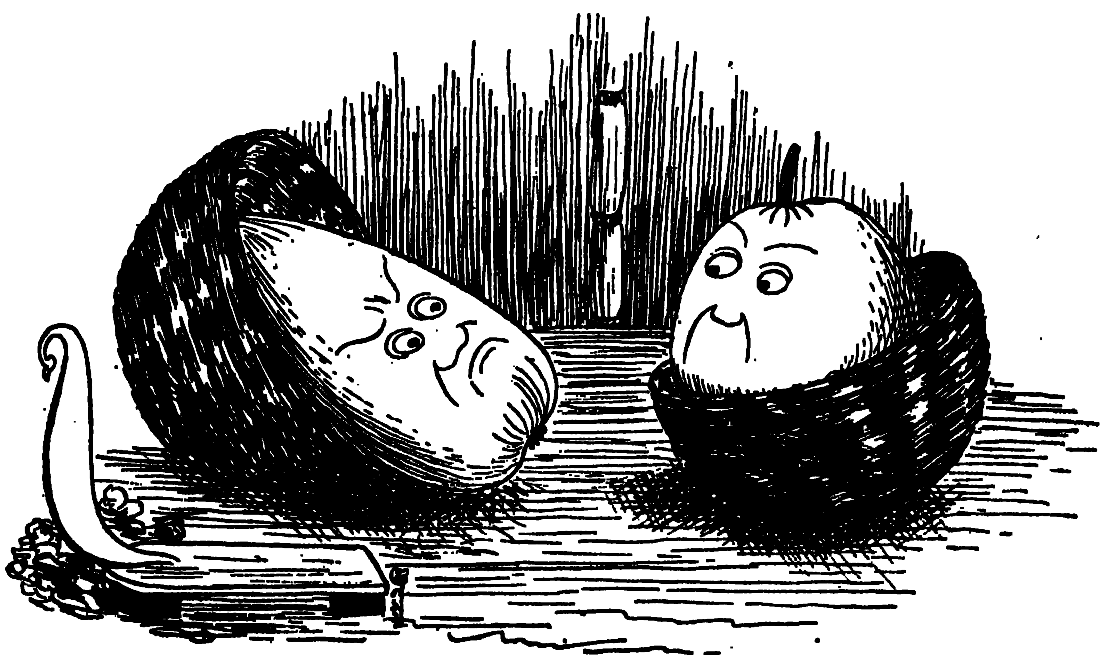
বনের লাউ ভাবে ঝাঁকাতে শুয়ে শুয়ে
বনের লাউ মোটা কত,
মাচার লাউ দেখে বাঁকানো বোঁটা তার
চিকণ টিকটির মত।
বনের লাউ বলে মাচার লাউ ভাই
বনের লাউ কিবা কালো,
মাচার লাউ বলে বনের লাউ ভাই
মাচার লাউ খেতে ভালো।
বনের লাউ বলে—না,
আমি, চিংড়ী মাছে মজে যাই,
মাচার লাউ বলে—ধ্যেৎ
তুই, কেবলি বীচিতে বোঝাই।

দুই লাউ

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

বনের লাউ বলে গাছের ডালগুলি
  জড়াতে সুখ লাগে বেশ,
মাচার লাউ বলে কাঠির বেড়া দিয়ে
  ঘেরাও থাকা কি আয়েস!
বনের লাউ বলে ঝড়েতে দোল খাই
  চীনের যেন গো ফানুস,
মাচার লাউ বলে রোদেতে গড়াইলে
  হাঁ করে দেখে যে মানুষ।
বনের লাউ বলে,—না,
 সেথা, হাঁড়িতে চুণ কালি মাখা,
মাচার লাউ বলে,—চুপ্,
  বনে, ছাগলে টেনে খায় শাখা।

এমনি দুই লাউ দোঁহারে দোষ দেয়
  তবু না খচাখচি মেটে,
ঝাঁকার ফাঁকে ফাঁকে দরশে কটমট
  রাগেতে মরে যেন ফেটে।
দুজনে কেহ কারে হারাতে নাহি পারে
  হারিতে কেহ নাহি চায়,
দুজনে যথাযথা দাপটি কহে কথা
  শাসায়ে ডাকে, কাছে আয়;
বনের লাউ বলে—না,
 আমি, ছুঁতেও করি তোরে 'হেট্',
মাচার লাউ বলে—ইস্,
 তোর, বঁটিতে কাটা যাবে পেট।



বৈজুর ক্রন্দন

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশ-গুপ্ত

চরিত্র-পরিচয়

মিসেস্ হালদার

মিঃ হালদার

বৈজু } চাকর
সাধু }

দৃশ্য পরিচয়

বাগান-ঘেরা একতালা একখানা বাড়ী। বাড়ীর খোলা বারান্দায় মিঃ এবং মিসেস্ হালদার বসিয়া চা পান করিতেছিলেন।

প্রকৃতি পরিচয়

শীতের কালের অপরাহ্নে বাগানের গাছে গাছে মাঠে মাঠে সূর্য্য-তেজের প্রখরতা ক্রমেই মলিন হইয়া আসিতেছিল।

মিসেস্ হালদার

হ্যাঁ ভালকথা; বৈজু যে আবার দেশে যাবার জন্ম ছুটী চাচ্ছিল।

মিঃ হালদার

সে কি! এইত সেদিন দেশ থেকে ঘুরে এল, এর-মধ্যে আবার দেশে যাবে কি?

মিসেস্

বল্‌ছিল ছেলের জন্তে আমার বড় মন কেমন করছে ক'দিন ধরে, একবার দেশে গিয়ে ছেলেটাকে দেখে আস্‌তে চাই।

মিঃ

আব্দার! পরের চাক্‌রী কর্ত্তে গেলে কথায় কথায় অত মন কেমন কর্লে চলে না।

মিসেস্

সে যা হয় তুমি ওকে বলে দিও, বড় জ্বালাতন কর্‌ছিল সকাল বেলা আমাকে।

মিঃ

বেশ ছিল—বছরের পর বছর কেটে যেত, দেশে যাবার নামও কর্ত্ত না। এই বছর পাঁচেক আগে বুড়ো বয়সে দেশে গিয়ে একটা বিয়ে করে বস্‌ল, সেই থেকে খালি দেশে যাওয়ার জন্ত ছট্‌ফটানি।

মিসেস্

বিয়ে করেও ততটা হয়নি, ছেলে হওয়ার পর থেকেই ঐ রকম হয়েছে।

মিঃ

না, না, এখন ওর দেশে যাওয়া হবে না। আর ও গেলে এদিক চল্‌বেই বা কেমন করে?

মিসেস্

আর ত কিছু নয়, চলে একরকম যাবেই, খালি খোকা-টাকে নিয়ে ভাবনা। খোকাটা ওর বড় বাধ্য হয়েছে কি না, ওকে চোখে হারায়।

মিঃ

তবে? তুমি ওকে বলে দিও যে, এখন ও ছুটী পাবে না।

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশ-গুপ্ত

মিসেস্

আমি কিছু বল্‌তে পার্ব্ব না, যা হয় তুমি বলে দিও।

মিঃ

(উচ্চৈঃস্বরে) বৈজু! বৈজু!

বৈজু

(অন্তরালে) হুজুর!

(বৈজুর প্রবেশ)

মিঃ

তুই নাকি আবার দেশে যেতে চাইচিস্?

বৈজু

হঁ্যা হুজুর।

মিঃ

এই ত সেদিন দেশ থেকে ঘুরে এলি, এর মধ্যে আবার দেশে যাওয়া কি?

বৈজু

হুজুর, ছেলেটার জন্তে বড় মনটা কেমন কর্চ্ছে কদিন ধরে।

মিঃ

তোর আক্কেল ত খুব! দেখচিস্ খোকা তোকে একদণ্ড না দেখ্‌লে থাক্‌তে পারে না, কোন আক্কেলে দেশে যেতে চাইচিস্?

বৈজু

হুজুর, আমি কি খোকাকে ছেড়ে থাক্‌তে পারি? তবে মনটা বড়ই ছট্‌ফট্‌ কর্চ্ছে একবার ছেলেটাকে দেখ্‌বার জন্তে। সেও ঠিক এই খোকার মতন এত বড়ই হয়েছে।

মিঃ

না, এখন দেশে যেতে পাবে না।

বৈজু

হুজুর, শুধু যাব আর আস্‌ব—একহপ্তার ছুটী।

মিঃ

না—যা।

(বৈজুর নতমুখে প্রস্থান)

মিসেস্

তা এক কাজ করুক না।

মিঃ

কি?

মিসেস্

দেশে কাউকে লিখে দিক না, ছেলেকে আর বউকে এখানে রেখে যেতে। সকাল বেলা আমাকে বলছিল আমি ছেলেটাকে ছেড়ে থাক্‌তে পারি না মেমসাহেব। এবার দেশে গিয়ে তাদের নিয়ে আস্‌ব, তারা এইখানেই থাক্‌বে আপনার কাজকর্ম্ম কর্বে।

মিঃ

তুমি ওর ঐ কথা শুনে একেবারে গলে গেলে যে দেখ্‌ছি। এখানে আবার কতকগুলো লোক বাড়িয়ে কি হবে? বিশেষতঃ খোকারই বয়সী ছেলে, এলেই খোকার খেলার সাথী হবে। এ বয়সে খোকাকে কিছুতেই ছোটলোকের ছেলের সঙ্গে মিশ্‌তে দেওয়া উচিত নয়।

(এক টেলিগ্রাম্ হস্তে বৈজুর প্রবেশ)

বৈজু

হুজুর, আমার নামে এ কি তার এসেছে দেখুন ত।

মিঃ

(টেলিগ্রাম্ পড়িয়া) By Jove! Extremely bad news. His son is dead!

মিসেস্

সে কি?

বৈজু

কি হুজুর?

মিঃ

'Your son dead come at once.' Read it

(টেলিগ্রাম্ মিসেস্ হালদারের হাতে দিলেন)

বৈজু

কি হুজুর ?

মিঃ

You tell him I don't know what to say. আমি চল্লাম্।

(মিঃ হালদার উঠিয়া গেলেন)

মিসেস্

তোমার দেশ থেকে তার এসেছে।

(বৈজু নীরব)

মিসেস্

তোমার ছেলের খুব ব্যামো, এখুনি তোমায় দেশে যেতে লিখেছে।

(বৈজু নীরব)

ব্যামো।

মিসেস্

খুব বেশী ব্যামো, আজকেই তুমি দেশে চলে যাও।

(নীরব বৈজু)

মিসেস্

কখন তোমার দেশে যাওয়ার ট্রেন ?

বৈজু

(আর্ত্তস্বরে) মেমসাহেব !

মিসেস্

তোমার দেশের গাড়ী ছাড়ে কটায় ?

বৈজু

সন্ধ্যা ছটার সময়।

মিসেস্

এখুনি যাও জিনিসপত্তর গুছিয়ে নাও। কিছু টাকা-কড়ি সঙ্গে নিয়ে যাও।

(বৈজু নতমুখে চলিয়া গেল)

মিসেস্

(উচ্চৈঃস্বরে) সাধু ! সাধু !

(সাধুর প্রবেশ)

মিসেস্

বৈজু ছটার ট্রেনে দেশে যাবে ঠাকুরকে বলো এখুনি রান্না চড়িয়ে দিতে, বৈজু যেন খেয়ে যেতে পারে।

(সাধুর প্রস্থান ;

মিঃ হালদার পুনরায় প্রবেশ করিলেন)

মিঃ

কি বল্লে ?

মিসেস্

বল্লাম আজকেই দেশে চলে যেতে। তুমি কিছু টাকা ওর সঙ্গে দিয়ে দাও।

মিঃ

তা না হয় দিচ্ছি, কিন্তু খোকার কি ব্যবস্থা হবে ?

মিসেস্

সে যেমন করে হোক্ ভুলিয়ে রাখতেই হ'বে। তাই বলে ত আর এখন ওকে আট্‌কে রাখা যায় না।

মিঃ

বল্লে কি ?

মিসেস্

বল্লাম তোমার ছেলের বড় বেশী অসুখ, এখুনি দেশে চলে যাও।

মিঃ

কি বিপদ ! বেশ ছিল, বুড়ো বয়সে একটা বিয়ে করেই এই সব মুস্কিল।

(ছুটিয়া খোকার প্রবেশ)

খোকা

মা, বৈজু চলে যাবে কেন ?

মিসেস্

যাবে না ? ওর মাকে দেখ্‌তে যাবে না ?

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশ-গুপ্ত

খোকা

না। যাবে কেন?

মিসেস্

ওর মার জন্যে ওর মন কেমন করে না? যাবে, মাকে দেখে আবার চলে আসবে।

খোকা

না, যাবে না।

মিঃ

ছিঃ খোকা, অমন কর্ত্তে নেই। বৈজু চলে গেলে আমি তোমাকে সাদা দুধের মত একটা কুকুর ছানা কিনে দোব।

খোকা

না। বৈজু যাবে না।

মিসেস্

ছিঃ খোকা, অমন করে না। (মিঃ হালদারের প্রতি) তুমি খোকাকে নিয়ে একটু মোটরে বেড়িয়ে এস। খোকা মোটরে বেড়াতে যাবে?

খোকা

না। (কাঁদিতে লাগিল)

মিঃ

কি মুস্কিল।

(বৈজু প্রবেশ করিয়া খোকাকে কোলে তুলিয়া লইল।)

মিসেস্

থাক্, থাক্, ও আমার কাছেই থাক। তুমি যাও, তৈরী হয়ে নাও।

বৈজু

একটু থাকুক আমার কাছে।

(খোকাকে কোলে করিয়া বৈজুর প্রস্থান)

মিসেস্

বাজ্‌ল কটা?

মিঃ

সাড়ে চারটে।

মিসেস্

সাধুকে একবার ডাক না।

মিঃ

সাধু! সাধু!

(সাধুর প্রবেশ)

মিসেস্

রান্না চড়ান হয়েছে?

সাধু

হ্যাঁ মেমসাহেব।

মিসেস্

বৈজু জিনিষ পত্তর গুছিয়ে নিয়েছে?

সাধু

না। আপনাদের কাছ থেকে গিয়ে এতক্ষণ বাগানে ঝাউগাছ তলায় চুপ ক'রে বসেছিল। তারপর খোকার কান্না শুনে এসে খোকাকে নিয়ে গেল।

মিসেস্

এক কাজ কর, তোমাতে আর সেঁথিয়াতে বৈজুর জিনিষপত্তর গুলো গুছিয়ে দাও।

(সাধুর প্রস্থান)

মিসেস্

বৈজু খোকার কতকগুলো পুরোণো জামা চাইছিল, ছেলের জন্যে দেশে নিয়ে যাবে।

মিঃ

আর জামা দিয়ে কি হবে?

মিসেস্

চায় যদি ত দিতেই হবে।

মিঃ

চাইবে ত বটেই, ছেলের অসুখ শুনে দেশে যাচ্ছে জামা নিতে ভুলে যাবে?

মিসেস্

কি জানি।

(এমন সময় বাগানে বৈজুর মুখে খোকার ঘুম পাড়ানি গান শোনা গেল)

মিঃ

ওর যাবার ত কোন লক্ষণ দেখ্‌ছি না। ঐত খোকাকে নিয়ে বাগানে বেড়াচ্ছে।

মিসেস্

কটা বাজ্‌ল ?

মিঃ

পাঁচটা বাজ্‌তে দশ মিনিট।

মিসেস্

সময় ত বেশী নেই।

মিঃ

তুমি যাওনা ; গিয়ে একবার দেখ না।

মিসেস্

থাক্, খোকাকে যদি ঘুম পাড়িয়ে ফেলতে পারেত ভালই হ'বে, নৈলে যাবার সময় খোকা একটা কাণ্ড কর্‌বে।

মিঃ

কত টাকা দিতে হ'বে ?

মিসেস্

পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে দাও।

মিঃ

অত টাকা নিয়ে কি কর্ব্বে ?

মিসেস্

এ সময় গিয়ে স্ত্রীর হাতে কিছু টাকা দিয়ে আস্‌তে হবে ত।

মিঃ

তা বটে। ছোটলোক টাকা হাতে পেলেই শোক অনেকটা ভুলতে পার্ব্বে।

(নতমুখে বৈজুর প্রবেশ)

মিসেস্

কি ? খোকাকে ঘুম পাড়িয়ে শুইয়ে দিয়ে এলে ?

বৈজু

হ্যাঁ।

মিসেস্

এইবার যাও, শীগ্‌গির শীগ্‌গির গুছিয়ে নাও। তোমার ত আর সময় বেশী নেই।

(বৈজু নীরব)

মিসেস্

কি ? কিছু বলতে চাও ?

বৈজু

(কম্পিতকণ্ঠে) মেমসাহেব আমি যাব না।

মিসেস্

কেন ?

বৈজু

খোকাকে ছেড়ে আমি যেতে পার্ব্বনা মেমসাহেব— আমি যাব না।

(বৈজু আকুলভাবে কাঁদিতে লাগিল)

মিঃ

ওকি ? পাগল হলি নাকি ? ও রকম করে কাঁদচিস্ কেন ?

বৈজু

হুজুর, খোকা কি সহজে ঘুমুতে চায়। এক একবার ঘুমিয়ে পড়ে আবার চম্‌কে জেগে উঠে আমার গলা জড়িয়ে ধরে বলে "বৈজু তুমি যাবে না"। যখন আমি কথা দিলাম যে আমি যাবনা, তখন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুল—হুহাতে আমার গলাটা জড়িয়ে ধরে।

মিসেস্

তা হোক্, তুমি ত শীঘ্র চলে আস্‌বে—যাও।

বৈজু

না মেমসাহেব, খোকাকে আমি ফাঁকি দিতে পার্ব্বনা, আমি যাবনা।

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশ-গুপ্ত

মিঃ

কিন্তু তোর ছেলের অসুখের কথা একবার ভাব্‌ছিস্‌ নে?

বৈজু

হুজুর, কতদিন তাকে দেখিনি,—তা আর কি করবো? খোকা জেগে উঠে যখন দেখ্‌বে আমি চলে গেছি খোকার দু'চোখ দিয়ে জল পড়বে—সে আমি পার্ব্বনা হুজুর! খোকাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেলে সেও আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে যাবে—

(বৈজু আকুলভাবে কাঁদিতে লাগিল।
মিঃ এবং মিসেস্‌ হালদার পরস্পর
মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিলেন—
কিছুক্ষণ সকলে নীরব)

বৈজু

তার চেয়ে আমি যাব না। খোকা জেগে উঠে আমায় দেখে হাসলে আমার ছেলের অসুখ আপনিই ভাল হ'য়ে যাবে—মেমসাহেব, আমি যাব না।



ভাব ও অভাব

[শিল্পী—শ্রীচঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়]

সনেট

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

যদি

যদি না কহিতে কথা; না ফুটিত যদি
নয়নের ভাষা ওই অধর কোনায়;
হৃদি না উঠিত কাঁপি; সুখে বেদনায়
বাহুমাল্য না শোভিত কণ্ঠে নিরবধি;—
যদি না আসিত রাতি; রহিত অবধি
মিলনের লগ্ন শুভ গোধূলি সীমায়;
বাঁশী না বাজিত সুরে; মধু পূর্ণিমায়
প্রেম না ফুটিত রূপে জনম লবধি!

মিলনের ক্লান্ত স্মৃতি বাসর প্রভাতে
ফুটিত না সুরে কভু বিদায়ের সাথে।

হয়ত বা বহুদূরে কল্পলোকে আজি,
মুহূর্ত্তটা—বুকে ধরি' অনন্ত বরষ—
ভরিয়া রাখিত মোর কল্পনার সাজি
স্বপনে রাখিত ঢাকি মিলন পরশ।

চিরন্তনী

সে যে জেগেছিল মোর বাঁশরীর সুরে—
আমার নয়ন পাতে ফুটেছিল রূপে,
পরশে সঙ্কোচ ছিল, কথা চুপে চুপে.
দৃষ্টি ছিল কল্পলোকে কোথায় সুদূরে।
সেই রজনীটি মোর এই মর্ত্ত্যপুরে
পরিশ্রান্ত মিলনের তীব্রগন্ধ ধূপে
কোথা মিশে গেল আজি—স্মৃতি অন্ধকূপে
হারানু কবে না জানি ক্ষণিকা বধূরে।

মুহূর্ত্তের জ্বালা শুধু; যে গিয়েছে যাক,
অতীতের বাঁধা বীণা রহুক নির্ব্বাক।

আমার মানস কুঞ্জে আমি জানি তবু
ব্যর্থ হয় নাই সেই অভিসার রাতি;
মানসী প্রিয়া সে মোর ভোলে নাই কভু
জ্বালিয়া রেখেছে চির মিলনের বাতি।

শিল্প-গুরু শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

একটা অচল শিল্পকে সচল করবার ভার যে ব্যক্তি অতি সহজভাবে সকল সমালোচনা ঠেলে নিয়েছিলেন, তাঁর বিষয় হু'কলমে-যে কিছু লিখ্‌তে পারব তা' ভরসা রাখি না। তবে সোজাসুজি তাঁর কাজ, তাঁর চিন্তা যা' ছেলেবেলা থেকে দেখ্‌বার ও জান্‌বার সুযোগ পেয়েচি তাই এই প্রবন্ধে বলবার চেষ্টা করব। কৃতকার্য্য হব কিনা জানি না।

যখনকার কথা বলচি তখন ভারতের চিত্রকলা অজন্তা, রামগড়, বাগ্‌, সিগিরিয়া, অনুরাধাপুর, দান্তোল প্রভৃতি ভারতের ও সিংহলের নানাস্থানে শতজীর্ণ কাঁথার মত ছিন্ন-ভিন্ন অবস্থায় গুহা-গহ্বরে লুকানো আছে, আর মোগল ছবি ইউরোপের "টুরিষ্ট্‌দের" মারফৎ "কিউরিও" হিসাবে দেশবিদেশে চালান যাচ্চে। দেশে ইংরাজী-শিক্ষাগর্ব্বিত আমাদের মুখে মুখে তখন মাইকেল এঞ্জিলো, র‍্যাফেল, রসেটি প্রভৃতি ইউরোপীয় শিল্পীদের চিত্রের সংবাদ ঘোষিত হচ্চে। বল্‌তে লজ্জা করবার কিছু নেই, এই লেখকও র‍্যাফেলের স্বপ্ন ছেলেবেলায় তখন খুবই দেখ্‌তেন। সস্‌ পেন্টিং, লাইট্‌ এণ্ড শেড্‌, পার্‌স্‌পেক্‌টিভ্‌ প্রভৃতি বুলির খৈ ফুটছে আর্ট স্কুলের ভিতরে ও বাইরে, এবং অজ পাড়াগাঁয়েতেও চলেছে। রবিবর্ম্মার ছবি, বৌবাজারের আর্ট-ষ্টুডিওর লিথোগ্রাফ্‌ ইত্যাদি তখনকার দিনের ছিল খুব ভাল ছবির মাপকাঠি। এ হেন ভারত-চিত্রকলার দুর্দ্দিনে শিল্পলক্ষ্মীর পড়ো দেউলে নতুন প্রদীপ জ্বাল্‌লেন বাংলাতে শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ। তখন তাঁর বয়স ত্রিশ কি বত্রিশ হবে। বাজারে গুজব র'টে গেল "লর্ড কার্জ্জন আর হ্যাভেল্‌ সাহেব দু'জনে মিলে এই অবনীন্দ্রবাবুর সাহায্যে ভারতবর্ষ থেকে 'ফাইন আর্ট্‌' বিসর্জ্জন দেবার একটা "পলিসি" করেচে—আসলে ভারতবর্ষে "ফাইন আর্ট্‌" (painting) কস্মিনকালে ছিল না, এবং দেশের আর্টের উন্নতি ইউরোপীয় আর্টের নকল ক'রে যাও বা হ'তে পারত, তাও এঁরা হ'তে দেবেন না"। দেশময় খবরের কাগজের পাতায় পাতায় নানান্‌ সমালোচনা চল্‌তে লাগল। হাফ্‌টোনের শৈশবাবস্থায় "প্রবাসী"র পৃষ্ঠায় অস্পষ্ট ছাপার ভিতর তাঁর চিত্র প্রচার হওয়ায় সে সময় দেশের লোকের মনে সে ধারণা প্রায় বদ্ধমূল হ'য়ে গেল। এ বিষয় "ফিনিসিং-টচ্‌" দিলে বাঙলার সুপণ্ডিত সাহিত্যিক স্বর্গীয় সুরেশ সমাজপতি মহাশয়ের "সাহিত্য"।

ঠিক্‌ যে সময় অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেব কলকাতার আর্ট স্কুল ছেড়ে বিলাতে চ'লে গেছেন এবং পূজনীয় অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীকে নিয়ে কলকাতা আর্ট স্কুলে নতুন চিত্রকলা শিক্ষার পত্তন দিচ্ছেন, এই সময় তাঁর কাছে এই লেখকও হাজির হ'য়েছিলেন তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রতে। অবনীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত ভারতচিত্রকলা বিভাগটির নাম "Advanced Design Class" রাখা হ'য়েছিল। তারই এক অংশে দেশী রীতিতে নানা মণ্ডন শিল্প, যথা,—lacquer work, stained glass design, wood carving প্রভৃতি শেখাবার ব্যবস্থা ছিল। ভারত-চিত্রকলা বিভাগে কোনো বেতনের ব্যবস্থা ছিল না। বরং শিষ্যদের কিছু কিছু বৃত্তিরও তিনি বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছিলেন। তিনি নিজেও কখন কখন ছাত্রদের বৃত্তি দিয়ে সাহায্য ক'রতেন। কিন্তু কিছুদিন ধ'রে আর্ট স্কুলের ছাত্ররা তাঁর বিভাগে যাবার কোনোই আগ্রহ প্রকাশ ক'রত না। ১৯০৭ সালে লর্ড কিচ্‌নার ও কয়েকজন ইংরাজ ও দেশীয় উৎসাহী মহোদয়ের যোগে তিনি এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রদ্ধেয় শিল্পী শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি প্রাচ্য শিল্পকলা সমিতি স্থাপনা করেন। সেই সময় এই সমিতির সভ্যসংখ্যা ছিল মাত্র একত্রিশ। পাঁচ জন দেশীয়

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

সভ্য, বাকি সবই ইউরোপীয়। ১২০৮ সালে সেই সমিতির প্রথম চিত্র প্রদর্শনী কলিকাতা আর্ট স্কুলে খোলা হয়। সেই প্রদর্শনীতে প্রথমে অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু, স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী এবং এই লেখক প্রভৃতি মাত্র কয়েকজন শিল্পীর আঁকা দেশীয় ধরণের চিত্র দেখান হ'য়েছিল। এই সমিতির প্রদর্শনীর শিল্পীসংখ্যা ক্রমে ক্রমে প্রতি বৎসর বেড়েই চলেচে—এখন ভারতীয় পদ্ধতির শিল্পীসংখ্যা অন্যূন দুই শতের উপর। এই প্রদর্শনীই অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যদের শিল্পকলা প্রচারের বিশেষ বাহন।

আমরা শুনেচি তিনি শৈশব থেকেই শিল্পকলার অনুকূল আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হ'য়েছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ঠাকুর পরিবারে তৎকালে সঙ্গীত চর্চ্চা, শিল্প চর্চ্চা ঘরে ঘরে চল্‌চে। কবিগুরু পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ তখন বিশ্বের কাছে জ্ঞাত ছিলেন না, তাই তখন তিনি তরুণ আত্মীয়দের তাঁর কিরণ-পাতে আলোকিত করবার সুযোগ পেতেন। তার মধ্যে দুজনের প্রতি তাঁর বিশেষ লক্ষ্য ছিল—একজন বাণী কবি বলেন্দ্রনাথ এবং অপর শিল্পসেবী অবনীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে অবনীন্দ্রনাথকে শিল্পকলার উৎসাহ দিলেও পরবর্ত্তীকালে ভারত-শিল্পকলার বিকাশের কর্ণধার অবনীন্দ্রনাথই এ বিষয় সন্দেহ নাই।

১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীতে 'কলাভবন' স্থাপনার পূর্ব্বে ১৯১৩ সাল থেকে ১৯১৫ সাল পর্য্যন্ত আমি যখন শান্তিনিকেতনে শিল্প-শিক্ষক নিযুক্ত ছিলুম তখন থেকে এ বিষয় কবিকে বিশেষভাবে এই চিত্রকলার দিকে আকৃষ্ট হ'তে দেখি। অবনীন্দ্রনাথের শৈশবে তাঁর আত্মীয়দের মধ্যে দু'জন চিত্রশিল্পী ছিলেন, একজন কবি রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয় শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সত্যপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় এবং অপরটি ভ্রাতুষ্পুত্র স্বর্গীয় হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর। অবনীন্দ্রনাথ যে বিশেষভাবে শিল্পচর্চ্চা ক'রতেন একথা তখন আত্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে তেমন জানা ছিল না—তাঁরা সত্যবাবু এবং হিতুবাবুকেই তাঁদের বাড়ীর আর্টিষ্ট ব'লে জানতেন। এঁরা দু'জন ছাড়া রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাম উল্লেখযোগ্য। পূজনীয় স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পেনসিলে আঁকা মূর্ত্তিচিত্রের কথা হয়ত অনেকেই জানেন। আমরা "ভারতী" ও "বালক" পত্রে অবনীন্দ্রনাথ, সত্যপ্রকাশ ও হিতেন্দ্রনাথের আঁকা ছবি দেখেচি। তখনও অবনীন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব প্রতিভার বিকাশ সম্বন্ধে কেহই তত জানতেন না। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দিয়ে যে চিত্রাঙ্গদার ছবি আঁকিয়েছিলেন তা' থেকে তাঁর এই অসাধারণ সৃজনী শক্তি অঙ্কুরিত হ'তে দেখা যায়।

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের ভারত-শিল্পকলার প্রবর্ত্তনের কথা যে কি ভাবে কখন ঠিক্ তাঁর মনে এসেছিল তা' তিনিই ব'লতে পারেন। তবে যা' তিনি এ বিষয়ে লক্ষ্ণৌয়ের শিল্প প্রদর্শনীতে বক্তৃতাকালে বলেচেন এবং যা' আমাদের পূর্ব্বে গল্পচ্ছলে বলেছিলেন, তা' থেকে এই মনে হয় যে, সেটা একটা তাঁর মনের ভিতরকার তাগিদের মত একদিন সহসা এসেছিল এবং তিনি নির্ভয়ে ভারত শিল্প চর্চ্চায় লেগে গিয়েছিলেন কোনো গুরুর কাছে না শিখেই। তবে তিনি আমাদের শেখানর সময় গোড়ায় গোড়ায় ব'লতেন, "তাইত হে তোমাদের এনাটমি শেখাচ্চি না, শেড্ এণ্ড লাইট শেখাচ্চি না—ভুল পথে নিয়ে যাচ্চি না ত?" কিন্তু তিনি কৌতুকছলেই একথা ব'লতেন, আর এ ভাব তাঁর তখন স্থায়ীভাব ছিল না। তা'ছাড়া তিনি জাপানের নব যুগের সংস্কারক এবং জাতীয় শিল্পের প্রবর্ত্তক স্বর্গীয় ওকাকুরাকে বন্ধুভাবে পাওয়ায় এই মহৎ অনুষ্ঠানে বিশেষ একটা জোর পেয়েছিলেন। ওকাকুরা তাঁকে চাটুকারের মত বাড়িয়ে দিয়ে কখনও উৎসাহ দেন নি—বরং আমরা জানি খুব শক্ত সমালোচনার দ্বারাই তিনি প্রমাণ ক'রে দিয়েছিলেন যে, তাঁর পথই সমগ্র ভারতের শিল্পতীর্থ যাত্রীদের পথ। রবীন্দ্রনাথ ও ওকাকুরা ছাড়া তাঁর উৎসাহী বন্ধুদের মধ্যে ই, বি, হাভেল সাহেবের নাম গোড়ায়ই উল্লেখ করা উচিত। আমরা শুনেচি, গুণগ্রাহী হাভেল সাহেব তাঁর গুণের পরিচয় পেয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রবার জন্যে উৎসুক হ'য়ে ওঠেন এবং তাঁর স্কুলের শিক্ষক স্বর্গীয় হরিনারায়ণ বসু মহাশয়ের দ্বারা অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হন। অবনীন্দ্রনাথ তখন

ঘরে ব'সে আপনার খেয়ালে বৈষ্ণব পদাবলী অবলম্বন ক'রে ধারাবাহিক ছবি ভারত-শিল্পপদ্ধতিতে আঁকছিলেন। সেই চিত্রগুলি দেখে হ্যাভেল সাহেব মোহিত হন এবং তাঁকে তাঁর সহকারীরূপে পাবার জন্যে ব্যগ্র হ'য়ে ওঠেন। অবনীন্দ্রনাথ চিরকাল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে লালিত-পালিত হ'য়েছিলেন, দাসত্বের ভার তাঁর পক্ষে অসহ্য ছিল; কিন্তু কেবল হ্যাভেল সাহেবকে বন্ধুভাবে লাভ করবার লোভে তাঁর সহকারীরূপে কাজ ক'রতে তিনি প্রবৃত্ত হন

অবনীন্দ্রনাথ যে শুধু দেশেরই শিল্পকলায় যুগান্তর এনেচেন তা' নয়—সমগ্র পৃথিবীর। চতুর্দ্দশ খৃষ্টাব্দীতে ইটালীয় শিল্পী র‍্যাফেল, মাইকেল এঞ্জিলো প্রভৃতি কয়েকজনে যেরূপ ইউরোপের শিল্পকলার যুগ পরিবর্ত্তন করেছিলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে আবার এই ভারতবর্ষে বিংশ শতাব্দীতে অবনীন্দ্রনাথও তেমনি নবযুগের সৃষ্টি ক'রলেন। তিনি যে ভাবধারা পরিবর্ত্তন ক'রলেন তা' আমাদের দেশের পক্ষে নূতনও বটে এবং পুরাতনেরও গৌরব বৃদ্ধি করে। "বস্তুষ্টম্ তল্লিখিতম্" এই হ'ল আধুনিক বিশ্বচিত্রকলার কথা। কিন্তু তিনি একেবারে ধ্যান-কল্পনার সাহায্যে চিত্রকলা চর্চ্চার প্রবর্ত্তন ক'রে দিলেন;—শিল্পীকে শুধু কারীগর নয়, কবি ক'রে দিলেন।



অবনীন্দ্রনাথ

শ্রীযুক্ত অলকেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক গৃহীত ফোটোগ্রাফ হইতে

অবনীন্দ্রনাথ কলকাতার আর্ট স্কুলের সহকারী অধ্যক্ষ হওয়ায় কাগজে প্রতিবাদ হওয়া ছাড়া স্কুলের ছাত্ররা এবং মাষ্টারেরা একযোগে ধর্ম্মঘট ক'রলেন এই ব'লে যে, তাঁকে এনে গভর্মেণ্ট ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে "ফাইন আর্ট" শেখাবার পথ বন্ধ ক'রে দিলে, অতএব এ আর্ট স্কুল পরিত্যাজ্য। অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেবও তখন অবনীন্দ্রনাথকে সহকারী পেয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে ভারতশিল্প প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করচেন। তিনি যত ইটালীয় গ্রীক্ প্রভৃতি প্লাস্টারের বড় ছোট মূর্ত্তি স্কুলে মডেলরূপে ব্যবহার হ'ত, সেগুলি নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণীর জলে বিসর্জ্জন দিলেন এবং যত বিলাতি তৈলচিত্র চিত্রশালায় রাখা ছিল সেগুলিকে একে একে নিলাম ক'রে দিলেন; তার পরিবর্ত্তে অবনীন্দ্রনাথের সাহায্যে প্রাচীন

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

মোগল ও রাজপুত চিত্রাবলী চিত্রশালার জন্যে সংগ্রহ ক'রতে আরম্ভ ক'রলেন। সেই সময় অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গগনেন্দ্রনাথও তাঁদের নিজের বাড়ীতে একটি প্রাচীন চিত্রকলার সংগ্রহ ক'রেছিলেন। তিনি তাঁর ছাত্রদের এই প্রাচীন চিত্র সংগ্রহকালে চিত্রকলার বিষয় যাবতীয় খুঁটিনাটি তথ্য সহজভাবে বুঝিয়ে দিতেন।

তাঁর নিকট ভারত-শিল্পকলা জানবার ও শেখবার জন্যে স্বেচ্ছায় প্রবৃত্ত হ'য়ে প্রথমে এলেন শিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু। তাঁর কাছে তিনি কিছুদূর অগ্রসর হতে-না-হতেই সেই বছরেই এলেন প্রতিভাবান শিল্পী স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রতে—এবং তার ঠিক পরের বছর এই লেখক। তার অব্যবহিত পরে মহীশূরের দরবারের তরফ থেকে প্রেরিত হ'য়ে এলেন ভেঙ্কাটাপ্পা, আর এলেন, সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শৈলেন্দ্রনাথ দে প্রভৃতি আরো কয়েকজন। লঙ্কাদ্বীপ থেকেও সে-সময় একজন এসেছিলেন তাঁর নাম 'নাগাহাওয়াত্তা'। শিষ্যদের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের সম্বন্ধ খুবই মধুর। তিনি কখনও শিষ্যদের গুরুমশাই হ'য়ে কঠোর শাসনের দ্বারা ভয় দেখাতেন না, বা খুব বেশী নিজের হাতে এঁকে-জুকে বা সংশোধন ক'রে দিতেন না। তিনি নিজে শিষ্যদের সঙ্গে ব'সে যেতেন ছবি আঁকতে, আর বন্ধু ভাবে গল্প-গুজব করতেন। সেই গল্প-গুজবের মধ্যেই শিষ্যেরা এমন অনেক তথ্য জানতে পারত যা' কোনো কলেজের লেক্‌চারে সম্ভব নয়। তিনি ভারতের, জাপানের, এমেরিকা ও ইউরোপের শিল্প ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের কাছে এমন ভাবে বলতেন যা' কখনও আমরা ভুলেও ভাব্‌তে পারতুম না যে তিনি আমাদের শেখ্‌বার জন্যে বিশেষ ভাবে বলছেন। নানান্ সহজ কথার ভিতর দিয়ে তিনি ক্রমশ ক্রমশ শিষ্যদের মানুষ ক'রে তুলতেন, শেখানো নিয়ম আয়ত্ত করাতেন না। ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ক'রে চলা শিল্পকলার মধ্যে যে কতটা দরকার তা' তিনি জান্‌তেন এবং সেইজন্যেই আজ তাঁর শিষ্যরা নিজের নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখেচে। সে সময় তাঁর প্রবর্ত্তিত নূতন ধরণে আঁকার পদ্ধতিটা আমাদের কাছে নূতনই তিনি রেখে দিয়েছিলেন, তাঁর ব্যক্তিত্ব আমাদের উপর চাপাতে চাননি। তিনি জান্‌তেন যে, জাতীয় ঐতিহ্যের চর্চ্চার দ্বারা ক্রমশ তাঁর শিষ্যদের ব্যক্তিত্ব ও বিশেষত্ব নিজের নিজের কাছে ফুটে উঠ্‌বে এবং সেইজন্যে তাদের তিনি সে বিষয় জান্‌বার ও দেখ্‌বার বিষয় যথেষ্ট সাহায্য ক'রেছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে Lady Herringham-এর অজন্তা চিত্রাবলী নকল করবার অভিযানে নন্দলাল বসুকে এবং এই লেখককে ১৯০৯-১৯১০ এবং ১৯১০-১৯১১ সালে শীতকালে যেতে হয়। তাঁদের সাহায্যের জন্যে তাঁর আরো কয়েকটি শিষ্যও সে সময় অজন্তা গিয়েছিলেন। * অজন্তায় যাওয়ার ফলে নন্দলাল বসুর শিল্পকলা অজন্তার প্রেরণা লাভ ক'রে উন্মেষিত হ'ল; আর এই লেখকেরও সে সময় তরুণ বয়সেই শিল্প-শিক্ষা মার্জ্জিত হ'য়েছিল সেই বিরাট শিল্পকলা দেখে ও নকল ক'রে।

দেশী ভিত্তিচিত্র অঙ্কন পদ্ধতি (Frescoe Painting) সম্বন্ধে চর্চ্চা অবনীন্দ্রনাথ নিজে ক'রেছিলেন। জয়পুর থেকে কারীগর আনিয়ে প্রাচীন রাজপুতনার ধরণে দেয়ালের গায়ে ছবি আঁকার কৌশল শিখেছিলেন। তাঁর কচ ও দেবযানী ছবিটী একটি এই প্রকারের ভিত্তিচিত্র। হ্যাভেল সাহেবের সর্ব্বপ্রথমে লেখা বই The Indian Painting & Sculpture-এ তার একটি সুন্দর প্রতিলিপি আছে। শিষ্যেরা অজন্তা থেকে ঘুরে এলেও বিশেষ ভাবে ভিত্তিচিত্র সম্বন্ধে চেষ্টা কেউই বড় একটা করেন নি। তাঁর দেখাদেখি নন্দলাল বসু ও এই লেখক কয়েকবার মাত্র মাটি দিয়ে দেয়ালের গায়ে ও কাঠের পাটায় আঁকার চেষ্টা করেছিলেন মাত্র। অবনীন্দ্রনাথের ছবি আঁকার পদ্ধতি কখনও এক ভাবে একই রাস্তায় চলেনি। কখন কাঠের উপর তৈলচিত্রও এঁকেছেন যথা "মৃত্যুশয্যায় সম্রাট সাজাহান"। তবে তাঁর বেশির ভাগ ছবিই কাগজে লেখা। জাপানি ধরণে রেশমের কাপড়ে তিনি আমাদের আঁকতে শিখিয়েছেন, কিন্তু নিজে কখনও জাপানি ধরণে সিল্ক-পেন্টিং করেন নি। বাঙলার পুরাতন পটের ধরণে কাপড়ের উপর তিনি অনেক ছবি এঁকেছেন। তা' ছাড়া তাঁর রঙ গোলবার বা লাগাবার পদ্ধতি

* লেখক প্রণীত "অজন্তা" পুস্তক দ্রষ্টব্য।

গতানুগতিক tempara, opaque, transparent হিসাবে, অথবা রাজপুত, মোগল, অজন্তা বা কোনো প্রাচীন শিল্পের দেখান রাস্তা ধ'রে চলে না। বরাবরই আমরা দেখ্‌চি তিনি খেলার ছলে রঙ তুলি নিয়ে কাজ করচেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে নানান ধরণ (style) আপনি তাঁর চিত্রপটে গজিয়ে উঠ্‌চে। সেইজন্যেই তাঁর প্রতিভা মাষ্টারী করবার মত একটা মাপকাঠি বা নিয়ম প্রণালী (canon) নিয়ে শিষ্যদের ব্যতিব্যস্ত করেনি। তিনি তাঁর কাজের দ্বারাই শিষ্যদের অভিনব চিন্তা ও ভাব-রাজ্যে নিয়ে যান। তারাও তাই তাঁর নিকট ভাবতে শিখেচে, দেখতে শিখেচে এবং দেখাতেও শিখেচে। এবিষয় বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব লাট লর্ড রোনাল্ডশে প্রণীত The Heart of Aryavarta বই থেকে কয়েকটি কথা তুলে দিচ্চি :—

"It is interesting to recall the fact that these two artists, (Dr. A. N. T. and G. N. T.) now generally recognised as the founders of the modern Bengali school of painting, were at this time ignorant—so they have informed me—of the tradition and formulæ embodied in the Silpa Sastras, the Indian classic on fine art. Yet impelled by a curious spiritual *malaise* they embarked upon the work which was so soon to bear fruit. It was though deep down in the subconscious regions of their being the instinct of the old Indian masters was striving to find expression. The atmosphere amid which they worked may be gathered from a description of them given by an acute observer, as aiming at the development of an indigenous school of imaginative painting stimulated by their own example and by the study of the legends of Sanskrit literature. In the family residence of the Tagores in Dwarka Nath Tagore Lane in Calcutta, they gathered round them a group of artists, many of whom—Nanda Lal Bose, O. C. Ganguly, Khsitindra Nath Mazumdar, Asit Kumar Haldar, Surendra Nath Kar, and Mukul Chandra Dey, to mention but a few—have since made names for themselves as exponents of the modern school of Indian painting. The studio where this interesting circle met was described by the same observer as being not so much a school for the encouragement of indigenous art, as a place for the development of taste, for the cultivation of sense of beauty, a love of beautiful things, especially such beautiful things as are expressive of the mind of India in its evolution."

তাঁর কতকগুলি শিষ্য ও শিষ্যের-শিষ্য আজকাল ভারতবর্ষের নানান স্থানে দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার নিয়েচেন। তাঁর প্রধান শিষ্য নন্দলাল বসু আজকাল শান্তিনিকেতনে কলাভবনের অধ্যক্ষ, শ্রীযুক্ত প্রমোদ কুমার চট্টোপাধ্যায় এখন বড়োদার কলাভবনে ভারতীয় শিল্পকলার অধ্যাপক, শ্রীমান্ মনীন্দ্র ভূষণ গুপ্ত লঙ্কাদ্বীপের মাহিন্দ কলেজের শিল্প-শিক্ষক, শ্রীমান্ রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী অন্ধ্র জাতীয় কলাশালার অধ্যাপক, শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত লাহোর মেয়ো স্কুল অব আর্টের সহকারী অধ্যক্ষ, প্রবন্ধ লেখক লক্ষ্মৌ গভমেণ্ট আর্ট এণ্ড ক্রাফ্‌ট স্কুলের অধ্যক্ষ এবং শ্রীমান্ বীরেশ্বর সেন সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। ভারতীয় পদ্ধতিতে ছবি আঁকার রেওয়াজ আজ ভারতের নানাস্থানে দেখা দিয়েচে। বম্বে আর্টস্কুলেও দেখাদেখি অজন্তার ধরণের ভিত্তিচিত্র আঁকবার আজকাল প্রয়াস চলচে, আর অপরাপর স্থানেও এই ভারতীয় শিল্প-পদ্ধতির প্রচলনের চেষ্টা হচ্চে। অবনীন্দ্রনাথের কীর্ত্তি, এই ভারত শিল্পকলার আদর, দিন দিন ভারতবর্ষে যত বাড়তে থাকবে ততই দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত হ'তে থাকবে। ১৯০১ সাল থেকে তাঁর একান্ত চিন্তা ও চেষ্টার ফলে তাঁর বন্ধু হ্যাভেল সাহেবের উৎসাহে যে ভারতীয় শিল্পকলার আদর আজ এই ২৫ বৎসরের মধ্যে ভারতের দশ দিকে দেখতে পাওয়া যাচ্চে তাতে ভরসা হয় ভারত শিল্পকলা জাতীয় ঐতিহ্যের ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে গেল—এর আর অপমৃত্যুর সম্ভাবনা নেই। এখন এই বরণীয় শিল্পীর উদার উদাহরণ দেখে দেশের শিল্পী ও বণিকেরাও যদি তাঁরই মত দেশের রুচি ফেরাবার চেষ্টা করেন এবং বসনে ভূষণে তৈজসপত্রে সকল বিষয়ই তাঁর মত দেশীয় বিশেষত্বে মণ্ডিত ক'রে তুলতে পারেন ত দেশের মর্য্যাদা বাড়ে এবং আমরা যে একটা পৃথিবীর মধ্যে মনুষ্যজাতি বেঁচে আছি তা' প্রমাণিত হয়।

অবনীন্দ্রনাথ চিত্র শিল্প ছাড়াও দেশের গৃহশিল্প (Cottage Industry) সম্বন্ধেও অনেক উন্নতির উদ্যোগ করেচেন। তার ফলে Bengal Home Industry-র

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

দোকান আজও ক'লকাতায় বর্ত্তমান আছে। তিনি নিজের বাসগৃহের চেয়ার টেবিল গুলিরও আমূল পরিবর্ত্তন ক'রে দেশী ছাঁদে সেগুলিকে তৈরী ক'রে দেশী তৈজসপত্রেরও একটা দিক্ খুলে দিয়েচেন। ধনী গৃহের কেদারা প্রভৃতি সাধারণতঃ দেখা যায় বিলাতের ফ্যাসানের উচ্ছিষ্ট, যা' বহুকাল থেকে ইউরোপ অচল ব'লে (out of fashion) পরিত্যাগ করেচে, তাই শোভা পাচ্চে। নূতন ধরণ বা প্রাচীন ভারতীয় ধরণের কোনো জিনিষের প্রবর্ত্তন করা তাঁদের কস্মিনকালে মাথায়ও আসেনি। অবনীন্দ্রনাথের পথ অবলম্বন ক'রে রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথ বিচিত্রা সভার জন্যে যে আসবাব পত্র তৈরী করিয়েছিলেন তা' সত্যই আদর্শ। এই ভাবে নাটকে পট যবনিকা প্রভৃতির ভিতরও যা' কিছু অভিনবত্ব রবীন্দ্রনাথের নাট্যের অভিনয় কালে দেখা যায় তারও গোড়ায় আছেন এই শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ। অনেকের ধারণা এই যে চিত্রশিল্পীরা কারু-শিল্প সম্বন্ধে চিরকালই অনভিজ্ঞ—কিন্তু তা' সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। মাইকেল এঞ্জিলো যে চিত্রকর হয়েও স্থাপত্য-কলায় কত অভিজ্ঞ ছিলেন তার সাক্ষি ইটালীর বড় বড় সুন্দর সুন্দর হর্ম্মাবলী এখনও দিচ্চে। ভাটিকানের ঝাড়বাতির নক্সা র‍্যাফেল ক'রে দিয়েছিলেন ব'লে জানা যায়। তেমনি অবনীন্দ্রনাথ যেমন চিত্র আঁকতেও পটু তেমনি গহনার জন্যে নক্সা, আসবাবপত্রের জন্যে নক্সা, সকল বিষয়েই ভারত শিল্পীদের পথ প্রদর্শক। তিনি আজ যে দীপ ভারতশিল্পের ভাঙা দেউলে জ্বালিয়ে দিলেন তা' চিরকাল জ্বলবে এবং ভরসা হয় তার কিরণ ক্রমশ তারতম্য বিকীর্ণ হ'য়ে আরো উজ্জ্বলতর হ'য়ে উঠ্‌বে।

এখন তিনি ক'লকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতকলা বিষয়ে বক্তা নিযুক্ত আছেন। তিনি তাঁর কায়মনোবাক্যের দ্বারা এতদিন যে দেশের শিল্পকলার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দেশের দশের নিকট আবেদন ক'রে আসচেন, তাঁর সে ডাক আজ সবাইকার কানে পৌছেচে দেখে খুবই আনন্দ হয়। তিনি তাঁর শিষ্যদের কাছেই গোড়ায় গোড়ায় বক্তৃতা দিতেন, ক্রমশ দেশ তাঁকে যখন দেশের শিল্পকলার অগ্রণী ব'লে গণ্য করলে তখন থেকে প্রকাশ্যভাবে বড় বড় সভায়ও তাঁকে বক্তৃতা দিতে হচ্চে।

"ভারতশিল্প" কেতাবটি এইরূপ বক্তৃতার সমষ্টি এবং ভারত শিল্পের বিষয় বাঙলাভাষায় এই প্রথম বই। ভারতশিল্প-কলার বিষয় প্রবন্ধ প্রবাসী, ভারতবর্ষ, ভারতী ও মানসী পত্রিকায় অসংখ্য বেরিয়েচে। তাঁর গ্রন্থের মধ্যে "বাঙলার ব্রতকথা" বইটি একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য পুস্তক। প্রাচীন শিল্পকলার যোগসূত্র এই ব্রতকথা ও আলপনার ভিতর বাঙলা দেশে এখনও কিছু পাওয়া যায়। তার প্রচারের দ্বারা তিনি গৃহস্থালী শিল্পকলারও যে একটা দিক খুলে দিয়েচেন সে বিষয় সন্দেহ নেই। দুঃখের বিষয় বঙ্গদেশে যদিও তাঁর বইটির বহুল প্রচার হয়নি কিন্তু ফরাসীদেশে তার খুব প্রচার হয়েচে—তারা আলপনার নকলে পর্দা চাদর মণ্ডন ক'রে গৃহের শ্রীবৃদ্ধি করচেন। তাঁর ক্ষীরের পুতুল, শকুন্তলা, পালক, ভূতপত্রীর দেশ প্রভৃতি বইয়ের পরিচয় নতুন করে দেবার কিছু নেই। তাঁর ভাষাও তাঁর চিত্রকলারই মত রঙ ও রেখায় রূপকে ফোটায়—যা তাঁর একেবারেই নিজস্ব—যার নকল করাও কারুপক্ষে সহজসাধ্য নয়। ছোট ছোট সহজ কথায় ছবি ফোটাতে তিনি একেবারে অদ্বিতীয়। রূপকথার ভাষাতে রূপ ফোটানোর ক্ষমতা বাঙলার লেখকদের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না। ভাষার এই দৈন্য তিনি মিটিয়েচেন। আধুনিক বাঙলা ভাষা যাঁদের লেখনীর দ্বারা আজ এতদূর পুষ্ট হয়ে উঠেচে অবনীন্দ্রনাথও তাদেরই মধ্যে একজন। তাঁর রচিত "ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ" এবং "ভারতশিল্পের এনাটমি" বই দুখানি শিল্পসাহিত্যের অমূল্য রত্ন। বাঙলার বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডাক্তার উপাধীতে ভূষিত করে দেশের শিল্প ও ভাষারই মর্য্যাদা বাড়িয়েচেন। গভর্মেণ্টও তাঁকে C. I. E. টাইটেল দিয়ে তাঁর মর্য্যাদা যত না বাড়ান দেশের শিল্পকলার ও শিল্পীদেরই আদর ও কদর দেখিয়েচেন। তাঁর মর্য্যাদা শুধু টাইটেল লাগানোর দ্বারাই যে বেড়েচে তা বললে ভুল হবে। কেননা তাঁর এই সকল অযাচিত টাইটেল পাবারও ঢের পূর্ব্বে থেকেই আমরা দেখেচি দেশ-বিদেশের গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তি, রাজন্যবর্গ তাঁর দ্বারিকানাথ

ঠাকুরের গলিস্থ বাসভবনে তাঁর ছবি দেখতে ও সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করতে বহুদূর থেকে এসেচেন। ইংলণ্ডের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী Prof. W. Rothenstien ভারত ভ্রমণে এসে কলকাতায় বিশেষভাবে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয় লাভ করবার জন্যে এসেছিলেন। Rothenstien এখন বিলাতের Royal College of Art-এর অধ্যক্ষ। এইরূপ অনেক শিল্পজগতের জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি তাঁর সংস্পর্শে এসেচেন এবং তাঁর সঙ্গে ভাববিনিময়ে মুগ্ধ হ'য়ে গেছেন। রাশিয়ার সুবিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ও শিল্পী নিকোলাশ রোরিক্, প্যারিনগরীর কারুকুশলা বিদুষী শিল্পী মাদাম কার্প্লে, পোলাণ্ডের অদ্বিতীয় চিত্রকর কাল্‌মিকফ্, নরওয়ের মূর্ত্তিচিত্রবিৎ জুয়েল ম্যাড্‌সেন, জাপানের নবশিল্পের দিক্‌পাল তাইকোয়ান, কাৎসুতা, হিসিতাসান কাম্পো আবাইসান প্রভৃতি বহু দেশের শিল্পাচার্য্যগণ তাঁর কাছে এসেচেন আমরা দেখেচি। তাছাড়া লর্ড হার্ডিং, লর্ড কারমাইকেল, লর্ড রোনাল্ডশে প্রভৃতি লাটসাহেবেরা তাঁর সখ্যতায় মুগ্ধ হয়েচেন।

এখন লেখক বিদায় নেবার সময় ১৩১৯ সালে অবনীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন কলাভবনে অভ্যর্থনাকালে যে একটি কবিতা শিল্পীদের তরফ থেকে রচনা ক'রে তাঁর বন্দনা করেছিলেন সেইটি এখানে উদ্ধৃত ক'রে, এবং পুনরায় তাঁকে বন্দনা ক'রে বিদায় প্রার্থনা করচেন :—

চিত্র-কলার কবি তুমি—
আলোক তুলি হাতে,
ভারত বাণীর চিত্তটিরে
জাগাও আপনাতে।
বর্ণ ছটার সুরের মীড়ে,
অঙ্গারেতে ফলাও হীরে
অমর রেখাপাতে।
রূপের দীপে অরূপ আলো
হৃদয় মাঝে তুমিই জ্বালো
রসের বেদনাতে।

দূর্ব্বা

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

আদিম শৈশব-যুগ উত্তরিয়া যবে
ধরিত্রী পশিল নব-যৌবন-সীমায়,
দিনে দিনে উদ্‌ঘাটিত তনুর গৌরবে
আচ্ছাদিতে নীল সিন্ধু-বাসে না কুলায়,
উপরে তপন মেলি লোলুপ নয়ন
একদৃষ্টে নেহারিল সে আনগ্ন রূপ,
লজ্জা-লোম-হরষণে সহসা তখন
অঙ্কুরিল দুর্ব্বারাজি ; ঢাকিল অনুপ
নিম্নভূমি সনে উচ্চ গিরি-সানু-দেশ ;
শ্যামল-নিচোলা পৃথ্বী চকিত সম্ভ্রমে
হেরিল সে আপনার নবোদ্গত বেশ।
মর্ম্মভেদী রবি-রশ্মি স্নিগ্ধ হল ক্রমে ;—
নিশি আসি চুপে চুপে চুম্বনে তাহার
পরাল সে পরিচ্ছদে মুকুতার হার।

আন্ধ্‌লি রাইতে

শ্রীসুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য

হাওয়ার ভারে আকাশখানি কাজলা কালো,
নিরুদ্দিশে দিন ফুরাল্যো ;
সাঝের আগেই জাল্‌লি বাতি বেদিশ্‌ হয়্যা,
কাপণ ভরা দাহণ লয়্যা—
আপনারি যে বুকের তলায় নিবলো শেষে,
ঘরখানি তোর ডুবলো যে রে
গহিণ ঘন অতল আন্ধে, আগ্‌-রাইতেই,
জাল্‌লি বাতি যার লাইগা, সে না আইতেই।

নিদ্‌-নিথরি রাইতের অকূল পাথার পারে
আবুইরে আর কান্দিস নারে,
বুকের যত রক্ত-রসের জ্বলন লাগা
আভোরে এই একলা জাগা
হৈবো সারা সেকি রে তোর চোখের জলে ?
নিশুৎ রাইতের আন্ধার তলে
দিষ্টি যদি হারায় দিশা, পরাণ খানি—
জাগত্যাছে যে একলা একা,—হরিণ-কাণি।

কালার কালো-কালিন্দীরা আন্ধ্‌লি নিশা,
নাই কোন দিগ্‌ নাইরে দিশা ;
এমুন রাইতে তোর লাইগা যে ছাড়ল্যো ঘর,
ঠিক্‌ণা হারা পথের পর
তার পায়েরি চলন-লাগা শব্দটা সে,
আলখ পথের আপনারি যে
বুকের ধিকি ধোনির মত বাইবো শুনা,
এক পলকে থাম্‌ব্যো তোর এ পহর গুণা।

বিহাণ কালে ভিজা রৈদের কাচা সোণায়
আঙিণাটীর কোণায় কোণায়
ফুট্‌লো হাসি পাখ্‌রি-মেলা ফুলের দলে ;
এমুন সোমে আগুণ তলে—
আইলো সে যে, থাম্‌ল্যো সে যে খ্যানেক কাল,
মুখের তারি হাসির জাল—
চক্‌মকা সে রৈদের পরে পড়ল্যো ছায়্যা,
তুই ক্যাবলি বিভোর চোখে থাক্‌লি চায়্যা।

তারপরে সে আইলো রাইতে জোচ্‌না ভরা,
দিগ্‌বিদিগে কাপণ ধরা—
—বাঁশীর সুরে— যেইখানে যে স্বপন আছে,
—আন্‌ল্যো তোরি বুকের কাছে,
আছিলি হায় আজন্মেরি গান-উপাসী
সেদিন খালি শুনলি বাঁশী ;
গাথলি মালা রৈলো বান্ধা আচল-আড়ে,
রাইত পোয়াইতে আপন হাতে ছিড়লি তারে।

মিলন মাঝে গাহান-হাসির আড়াল যত
আন্ধ্‌লি রাইতে হৈলো গত।
আইজ ক্যাবলি হাতের পরে হাতটী থুয়ায়
কাপণ ভরা একটী ছুয়ায়
পড়ব্যো কয়্যা এক পলকে সরম টুক্‌,
সুখের ভারে আবশ বুক
রাখ্‌রিয়ে তার কাপণ-লাগা বুকের পরে ;
জাগণ তোর এ নিব্‌বো রাইতের শেষ পহরে।

প্রগতি

শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

(১)

প্রগতি বোল্‌তে আদর্শ কিম্বা প্রেরণা অনুসারে অগ্রসর হ'ওয়া বুঝি।

মানুষই আদর্শ সৃষ্টি করে। মানুষই প্রেরণার আধার। মানুষই অগ্রসর হয়।

অগ্রসর হওয়ার এক নাম পরিবর্ত্তন।

(২)

মানুষের অগ্রসৃতি সরল রেখায় নয়। অতএব পুরাতন জ্যামিতির নিয়ম এখানে সম্পূর্ণভাবে খাটে না।

জীব-জগতের পরিবর্ত্তন চারিধারে হয়। মানুষের পরিবর্ত্তন তারও বাইরে। সেখানে দিক্ নির্ণয় অসম্ভব, দিক্ নেই বোলে। মানুষ তার জ্যামিতি এবং জীবতত্ত্বের অংশটুকু জয় কোরে দিক্ হারিয়ে ফেলে।

জীবের পরিণতি কালের মধ্যেই। জীব-বিজ্ঞানে কালের যথেষ্ট মর্য্যাদা দেওয়া হয় না। যদিও অভিব্যক্তিবাদই কালপূজার বোধন। মানুষের জীবনে কমা থেকে দাঁড়ি সবই আছে। জীবের স্থিতিই উদ্দেশ্য, মানুষের স্থিতি হচ্ছে মৃত্যু। অতএব জীবতত্ত্বের অভিব্যক্তিবাদ এখানে সম্পূর্ণভাবে খাটে না।

মানুষ জড় ও জীব। তার ওপর মানুষের আত্মা আছে। অতএব জড় ও জীবজগতের নিয়ম এ-ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য না হলেও, একেবারে ভুল নয়। ভুল সংশোধিত হয়, অসম্পূর্ণতা লুপ্ত হয়, আত্মার সন্ধান পেলে। আত্মার কি নিয়ম জানি না। বোধ হয়, আত্মা নিয়মকর্ত্তা, আপনাতে আপনি অধিষ্ঠিত, অর্থাৎ স্বাধীন। অতএব পরিবর্ত্তনের পরিণতি মানুষের স্ব-অধীনতা।

(৩)

প্রেরণা পূর্ব্বকালের, আদর্শ উত্তরকালের।

দেবতাও যে মানুষকে ভর করেন এবং মানুষের সব কার্য্যই দৈবিক,—বিশ্বাস কোরতে গেলে স্নানঘরের কলের জল সত্য এবং স্রোতের জলকে মিথ্যা গণ্য কোরতে হয়।

গোমুখীতে তীর্থস্নান না কোরে টালার ট্যাঙ্কের তলায় মাথা রাখলে কাজ চলে, পুণ্য হয় না।

(৪)

আদর্শের উৎপত্তি পুরুষ প্রকৃতির দ্বন্দ্বে। কালও প্রকৃতি। যখন পারিপার্শ্বিক অবস্থা, নিজের জড় প্রকৃতি এবং বর্ত্তমানের সঙ্গে মানুষের গরমিল হয়, তখনই দ্বন্দ্বের বাইরে যাবার ইচ্ছা হয়।

অশান্তির ফল দিবাস্বপ্ন, Utopia, রামরাজত্ব, সত্য-যুগ।

আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখ্‌বার জন্য শক্তি চাই। সব চেয়ে বড় শক্তি মানুষের সহজ প্রবৃত্তি। সহজ প্রবৃত্তিগুলির মধ্যে যে কয়টির সাহায্যে অশান্তি দূরীভূত হওয়া সম্ভব, সেইগুলির ব্যবহার স্থিরীকৃত হলেই ধর্ম্মাচার আরম্ভ হয়। আচারগুলি প্রথম প্রথম আদর্শের সহায় হয়। তার পর মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। প্রভাবের নাম ধর্ম্মবুদ্ধি। তৈরী জিনিষ হাতের কাছে পেলে কে আর খাটুতে চায়? তখন মানুষ সব ধার্ম্মিক হ'য়ে ওঠে। আদর্শের পরিণতি ধর্ম্মগত প্রাণ হওয়া, ধর্ম্মবুদ্ধি আদর্শের কারণ নয়। যে মানুষের মন ধর্ম্মবুদ্ধিতে আচ্ছন্ন না হ'ল, সে মন নতুন আদর্শ গড়তে ব্যস্ত হ'ল। অন্যের ধর্ম্মবুদ্ধি, এমন কি নিজের ধর্ম্মবুদ্ধিও, নতুন আদর্শ-গঠনের অন্তরায়। তখন আবার অশান্তি। এই চল্‌ল চিরকাল।

(৫)

আদর্শ-গঠন এক প্রকারের মূল্য-নির্দ্ধারণ। সে মূল্যের ভিত্তি সংখ্যা হ'লে আপেক্ষিকত্ব মানে কেবল বিয়োগ হ'ত। জীবন সরলরেখা হ'লেও তাই হ'ত, যেমন কগ সরল রেখা

হ'লে কখ = কগ—খগ। বক্ররেখা হ'লে শুধু বিয়োগ হবে না। তখন একটি বিন্দুর মূল্য নেহাৎ একান্ত, অথচ তার নিকটবর্ত্তী ঐ ধরণের মূল্যবান অনেক বিন্দু রয়েছে।

মানুষ ফুটে ওঠে, চারিধারেরও বাইরে। তাতেও সময় লাগে।

(৬)

মূল্য শুধু সময়ের ওপর স্থাপিত কোরলে. যা কিছু হচ্ছে কি হবে, তাই, যা হয়ে গিয়েছে তার চেয়ে ভাল কিম্বা মন্দ প্রমাণিত হ'ত। বস্তুত তা নয়। অথচ সবই ঘটুচে কালের ভেতর। সেইজন্য- মূল্যের গুরুত্ব নির্ভর করে কোন্‌টি কালের অতীত এবং কিসের সাহায্যে কালের অতীত হওয়া যায়, তার ওপর। যেমন সা, রে, গা, মা সাধবার পর গানের স্বাধীনতা। বড় খইগুলোই ভাজবার সময় খোলার বাইরে গিয়ে পড়ে। সমাজের ভেতর থেকে সমাজের বাইরে গেলে মানুষ মানুষ হয়। দ্বীপের মধ্যে রবিন্‌সন ক্রুসোর বাহাদুরী হিন্দুসভার সভ্যের মতনই।

(৭)

বুদ্ধি দিয়ে আদর্শ সৃজন কোরলে মানুষ কর্ত্তৃত্ব করবার আত্মপ্রসাদ উপভোগ কোরতে পারে, কিন্তু জীবনটা হয় কল। জীবনের খানিকটা কল, খানিকটা জীব—কিন্তু গোটা জীবন তারও অতিরিক্ত একটি অখণ্ড শক্তি। এই শক্তি আত্মার। আত্মশক্তি, আত্মোপলব্ধির, আত্মানুভূতির ফল। উন্নতি মানে মানুষের আত্মশক্তির বিকাশ।

(৮)

মানুষ বোলতে ব্যক্তি বুঝি। সমাজ কিম্বা দেশের কোন আত্মা নেই। আছে শুধু ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং আচার-ব্যবহারের বিশেষত্ব। সমাজ ব্যক্তির সহায় এবং সুবিধা মাত্র। দেশাত্মবোধ আত্মার সংশ্লিষ্ট কোন বস্তু নয়, ব্যক্তিগত মনের তৈরী এবং সেই মনেরই মধ্যে সুবিধাসূচক মন্ত্র মাত্র। ব্যক্তিরই মন ও আত্মা আছে। ব্যক্তিই ইতিহাস সৃষ্টি করে।

(৯)

সমাজের সভ্যতা, ব্যক্তির বৈদগ্ধ্য। বৈদগ্ধ্যই গতি, অগ্রসৃতি এবং প্রগতির মূলশক্তি। সভ্যতা সেই গতির রুদ্ধ অবস্থা, চরম অবস্থা, অর্থাৎ মৃত্যু। বৈদগ্ধ্য আত্মার বিকাশ। বুদ্ধির দ্বারা সেই বিকাশকে নিয়মে গ্রথিত কোরে বোঝবার প্রয়াসকে সভ্যতা বলা যেতে পারে। বৈদগ্ধ্যে উপনিষদ, সভ্যতায় টীকাভাষ্য। একটিতে মানুষ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি, আর্টিষ্ট, সম্পূর্ণ মানুষ; অন্যটিতে মানুষ কলের কুলী, যজ্ঞের পুরোহিত, স্কুল-মাষ্টার এবং সাহিত্যক্ষেত্রে সমালোচক ও প্রবন্ধলেখক। একটির দেবতা ব্রহ্মা—রবীন্দ্রনাথ; অন্যটির দেবতা বিষ্ণু—৺ভূদেবচন্দ্র।

(১০)

অতএব সামাজিক উন্নতির কোনো মানে নেই। যে সমাজে আত্মার যতটুকু বিকাশ সম্ভব সে সমাজ ততটুকু উন্নত। নিজের মৃত্যু দিয়ে ব্যক্তির স্বাধীনতা বিকাশের অবকাশ দেওয়াই উন্নত সমাজের একমাত্র কর্ত্তব্য। এই অবকাশ কিম্বা সুযোগই আসল জিনিষ, সমাজে কয়জন আত্মজ্ঞ ব্যক্তি আছেন তাঁদের সংখ্যা আসল জিনিষ নয়। 'বিন্দু' কিম্বা আত্মা 'জরীপ' করবার যন্ত্র হয়ত অধ্যাপক বিনয়কুমারের কাছে আছে, আমার কাছে নেই। তুলনামূলক বিচারে আত্মবিকাশের কোন মূল্য নেই। সে জন্য দুঃখ হত না যদি তুলনামূলক বিচারপদ্ধতিতে কোন মাপকাঠি টিঁকে থাকত, কিম্বা তার সাহায্যে নতুন কোন 'জরীপ-যন্ত্র' তৈরী করা যেত। হয়ত একটা রবীন্দ্রনাথ দশটা শেলীর মতন, একটা ঋষি কুড়িটা সেণ্ট ফ্রান্সিসের সমান! কে জানে?

(১১)

আপাতত আমি এই মনে করি।

"সাউথ ৮৭৫১"

—গল্প—

—শ্রীপান্নালাল অধিকারী

রাত্রি প্রায় বারোটা। সন্ধ্যাবেলা থেকে নিত্যকার উৎসব চল্‌ছিল। আলো নিবিয়ে দিয়ে শোবার ব্যবস্থা করছি, এমন সময়ে টেলিফোনে কিড়িং কিড়িং করে উঠ্‌লো। রিসিভারটা কানে দিতেই শুনি চমৎকার মিঠে মেয়ে গলা—

—হ্যালো, South 8741.—

—আজ্ঞে না, 8751 —

—ভুল নম্বর দিয়েচে, মাফ করবেন, এত রাত্রে বিরক্ত করলুম।

—Wrong number-এ চিরকালই পেয়ে থাকি হাজারীমল গম্ভীরচাঁদের গদী কিংবা চেতলার আড্ডিদের আড়ৎ। আমি কিছু মনে করবো না, আপনার যা বল্‌বার আছে আমার বল্‌তে পারেন।

—আপনি বেশ মজার লোক, আপনাকে চিনি না অথচ—

—কিছু দরকার নেই চেন্‌বার, গোপন কথা বল্‌তে হ'লে অচেনা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। হাঁসের গলা জড়িয়ে দময়ন্তী কত কথাই না বলেছে, তা'তে সুবিধে যে প্রকাশের ভয় নেই।

—হ্যামালেস দেখ্‌ছি, আমার তো কিছুই বল্‌বার নেই আপনাকে।

—কেন, কোন কবিতাও কি মুখস্থ নেই, "পাখী সব করে রব" কিংবা "দেশ বৎস সম্মুখেতে প্রসারিত তব"? দেখুন, আপনাকে আজ কিছুতেই ছাড়চিনে, কানে মিঠে আওয়াজ এই আমার প্রথম।

—কেন, আপনার বন্ধুবান্ধবদের—

—অসহ্য! শুন্‌লে আপনার রাত্রে ঘুম হবে না।

—আপনার গলাও তো কোকিলবিনিন্দিত বলে মনে হচ্ছে না, আর আমারও রাত জাগ্‌বার বাসনা নেই।

—আপনার রিসিভারের দোষ; আমার গান শুন্‌লে মত বদ্‌লাতেন।

—তবু যদি নেশা না করতেন।

—আশ্চর্য্য! আপনি আমার তথ্য আবিষ্কার করেছেন, কথাগুলো জড়িয়ে যাচ্ছে কি?

—বেজায়।

—দয়া করে এক মিনিট দাঁড়ান, টুথপেষ্ট দিয়ে মুখ ধুয়ে বোলটা এলাচ চিবিয়ে আস্‌ছি।

—কাজ নেই, বাথরুমে পড়ে যাবেন।

—আপনার নামটা বল্‌বেন?

—না।

—বাড়ীর নম্বর?

—কেন?

—এক্ষুণি ট্যাক্‌সি করে গিয়ে আপনার বাড়ীর সাম্‌নে নেবে, মাথায় ভরা কলসীর উপর কুঁজো রেখে কুড়ি পা হেঁটে দেখিয়ে দেবো, নেশা আমার মোটেই হয় নি।

—ধন্যবাদ, এত রাত্রে সার্কাস দেখ্‌বার সখ নেই।

—কাল দেখা হবে কি?

—আশায় থাক্‌তে পারেন।

—আমার নম্বরটা টুকে নিন।

—মনে আছে।

—আট আর সাত পনেরো, তা'তে পাঁচ আর এক হ'রে একুশ, তিন দিয়ে ভাগ করলে রইল সাত, সাতে সপ্ত ঋষি, মনে রাখ্‌বার সুবিধে হবে।

—(হাসিয়া) ভালো ঋষিবর, আপনি ধ্যানস্থ হউন, আমি চল্লুম।

* * * *

পরদিন শনিবার। সন্ধ্যেবেলা থেকে অস্থির হয়ে বার বার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছি, কখন বারোটা বাজবে। আমার

শ্রীপান্নালাল অধিকারী

বাড়ীর খুব কাছেই থাক্‌তো সলপের জমীদারের ছেলে নরেন, আমিই ছিলাম তার বড় বন্ধু। সেদিন তার বিশেষ অনুরোধ সত্ত্বেও তার সঙ্গে গেলুম না। বেচারী দুঃখিত হয়ে ফিরে গেল। বলে গেল পরে আবার মোটর পাঠিয়ে দেবে, যত রাত্রিই হয় একবার যেন যাই।

বারোটা বাজ্‌লো। খানিক পরেই কিড়িং-কিড়িং-কিড়িং, কালকের সেই মিঠে গলা।

—হ্যালো, South 8751—

—অভাগাই বটে।

—বেরুননি যে বড়!

—আপনার সাক্ষাতের আশায়।

—আপনার বন্ধুরা নিশ্চয়ই এসে ফিরে গেছেন।

—যেতে দিন, সব ক'টাকে ভোর রাত্রে গিয়ে আমাকেই ফিরিয়ে আন্‌তে হবে।

—লাইক্‌বোট বিশেষ! ভালো, ঐ গানটা জানেন 'পিয়া বিন্থ নাহি'? কাল্‌কে তো বল্‌ছিলেন গাইতে পারেন।

—একশো বার। পিয়ারা সাহেব তো ঐ গানটা আমার কাছেই শিখে গ্রামোফোনে দেন; বিশ্বাস না হয়, কার্‌-নবিশের ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করবেন।

—বটে, আর 'প্রাণ যে গেল নিয়ে সে ত আর' ও-গান-টাও বোধ হয় স্বর্গীয়া বিনোদিনী দাসী আপনার কাছেই শিখেছিলেন!

—ও গানটা আমি প্রায়ই গেয়ে থাকি, তবে স্বর্গগতা যাঁর নাম করলেন তিনি যখন মারা যান তখন আমি শিশু।

—এখন তো আপনি যুবক বলে মনে হচ্ছে, বিয়ে-থা করেন না কেন?

—সাহস হয় না।

—সাহসের যদি কিছু দরকার থাকে, তবে আপনার যিনি সহধর্ম্মিণী হবেন তাঁরই আবশ্যক।

—এক্ষুণি প্রস্তাব করে দেখ্‌বো?

—না।

—কেন?

—আপনার মাত্রা ঠিক থাকে না।

—কোন রাত্রিতেও ত বোল মাত্রার উপর যায় না।

—ওটা কমিয়ে ফেলুন। যাক্‌, আপনি রবিবাবুর গান ভালবাসেন?

—বিলক্ষণ।

—ঐ গানটা কেমন লাগে—'আজ শুক্লা একাদশী'?

—ঐটে ছাড়া; সাম্‌নের বাড়ীর মেয়েটা রোজ সন্ধ্যে-বেলা ঐ গানটা চেঁচিয়ে কান ঝালাপালা করে দিয়েছে। এমন-কি রবিবাবু শুন্‌লে দুঃখিত হবেন, বইয়ের ও-পাতা-টাই ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি।

—বইখানি বোধ হয় আপনার নিজের নয়।

—না, আমার বন্ধু নরেনের বোনের, স্বয়ং গায়িকার।

—ছিঁড়ে ভালো করেননি, আর একখানা কিনে পাঠিয়ে দেবেন। আজ তাহ'লে আসি।

—কাল দেখা হবে তো?

—হতেও পারে।

—দেখুন আমার অবস্থা হলো, 'শুধু বাঁশী শুনেছি' ভাব।

—মেসেজ রেটে আমারি ক্ষতি, প্রত্যেক কলে দু'আনা।

—শ্রীরাধার কি আপশোষ, গোকুলে টেলিফোন ছিল না—নইলে রাত বারোটার সময়ে চাইতেন 'বৃন্দাবন 8751, হ্যালো নন্দঘোষের বাড়ী, একবার শ্রীকৃষ্ণকে ডেকে দেবেন'।

* * * * *

এই ধরণের আলাপ প্রায় রোজই চল্‌তে লাগ্‌ল। এম্‌নি করে টেলিফোনের তার অবলম্বন করে এই অচেনা সুন্দরীর সঙ্গে এক অদ্ভুত মিলন-লীলা সুরু হলো। যাকে কখনো দেখিনি, কখনো দেখ্‌তে পাব এ-আশা করতে পারছি না; এমন কি যার নাম-ধাম পর্য্যন্ত জানি না, বোধ হয় সেই সময়টায় তাকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভাল-বেসে ফেল্‌লুম। সন্ধ্যের পর আর ঘরের বাইরে যেতুম না, পাছে আমার রহস্যময়ী 'রিং' করে উত্তর না পেয়ে ফিরে যান। একে একে সমস্ত বন্ধু সরে পড়লো। আমার প্রিয় সুহৃদ্‌ নরেন পর্য্যন্ত আমার এই পাগ্‌লামীতে বিরক্ত হয়ে আমায় এক রকম পরিত্যাগ করলো। সন্ধ্যে

থেকে কেবলি রিসিভারের দিকে তাকিয়ে থাকতুম, আর টেলিফোনের আবিষ্কর্ত্তার উদ্দেশ্যে হাতজোড় করে শত শত প্রণাম জানাতুম। এমন-কি Exchange girls-দের মাইনে বাড়ানোর উমেদারী করে Statesman-এ এক লম্বা চিঠি ছাপিয়ে ফেললুম। যেমন চাঁদে পাওয়া বলে, আমাকেও তেম্‌নি ঐ টেলিফোনে পেয়ে বস্‌লো। আগে ফোনের বিল দেখে মাঝে মাঝে মনে হ'ত, এই অনাবশ্যক খরচটা বন্ধ করে দিই, এখন বিলগুলোকে frame-এ বাঁধিয়ে রাখ্‌তে ইচ্ছে করে। ভাব্‌তাম, এই নির্ব্বাক অথচ আমার কাছে শ্রেষ্ঠ বাক্যের আধার, ছোট্ট রিসিভারটির ভিতর আমার সাত-রাজার ধন মাণিক লুকিয়ে আছে, একদিন সে নিশ্চয় তার স্বরূপ প্রকাশ করবে। দিনের পর দিন হাসিগল্পের ভিতর দিয়ে আমার সমস্ত আশা-ভরসা, আমার যা কিছু পাপ-পুণ্য, ব্যথা-আনন্দ, এই অজ্ঞাত প্রেয়সীকে নিবেদন করে চলেছি।

* * * *

একদিন বাইরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হচ্ছে, জান্‌লা দিয়ে দেখ্‌তে পাচ্ছি রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে গেছে। ঘণ্টার কাঁটা প্রায় একটার কাছাকাছি। সে-দিন আর তার সাক্ষাৎ পাব না বলে মনে হলো। কিন্তু একটা বাজতেই হঠাৎ টেলিফোনের কিড়িং কিড়িং, গলাটা একটু ভারী—

—হ্যালো South 8751.

—শ্রী চাতক।

—এত জলেও তৃষ্ণা মেটেনি?

—চাতক তিন প্রকার।

—আপনি কোন্ শ্রেণীর?

—প্রেমের। দেখুন একটা কথা ভাব্‌ছিলুম, একটা সামান্য ভুল থেকে যে-প্রেমের সৃষ্টি তা কি কখনো বাস্তব হতে পারে?

—কি রকম?

—যদি সে-দিন ভুল নম্বর না দিত তাহ'লে আমাদের এই প্রণয়,—রাগ করবেন না, আমার দিক দিয়ে ত বটেই,—এই প্রণয়ের সৃষ্টিই হতো না।

—ঐ নম্বরি যদি চেয়ে থাকি? অচেনা ভদ্রলোকের সঙ্গে আচমকা কি বলে কথা আরম্ভ করি! প্রণয়টা যে আপনার একতরফা সেটা বেশ হৃদয়ঙ্গম করেছেন তাহ'লে!

কড়াং—ব্যস্ বন্ধ! এত আশ্চর্য্য ব্যাপার, ক্ষমা চাইবারও আমার উপায় নেই। চুপ করে বসে রইলাম, আশা নিশ্চয়ই আবার আস্‌বে। প্রায় আধঘণ্টা পরে আবার কিড়িং কিড়িং—স্বর অত্যন্ত ভিজে, বাইরের আকাশের মত।

—আপনি এখনো জেগে আছেন? আমি মনে করলুম রাগ করে ঘুমিয়ে পড়েছেন। আপনার উপর অভিমানও করবার আমার উপায় নেই, যেহেতু আপনি আমার নম্বর জানেন না। যাক্ ঘুমোন।

—ঘুম ত আমার অনেকদিনই গেছে।

—কেন সেই 'শুক্লা একাদশীর' গানে নাকি?

—না, সেই গানটা ছেড়ে মেয়েটা এবার ধরেছে 'দেখা পেলেম ফাল্গুনে'।

—এ-পাতাটাও তাহ'লে ছিঁড়তে হ'লো। আমি দেখ্‌ছি শেষে বইখানির মলাট ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। বন্ধুর ভগ্নীর ওপর অত আক্রোশ কেন? মনে মনে নিশ্চয়ই তাকে খুব ভালবাসেন।

—মোটেই না, আপনি ঐ সন্দেহটা একেবারে করবেন না। যদি ভাল কাউকে বাসি সে টেলিফোনের তারের ও-দিকটায় বসে আছে।

—Exchange girls-দের কথা বল্‌ছেন? বন্ধুর ভগ্নীর নামটি কি?

—মীরা। এখনো বেশ জলে হচ্ছে—

—মীরার সঙ্গে আপনার আলাপ আছে?

—হ্যাঁ চেনা আছে বটে। দেখুন বেজায় ঠাণ্ডা পড়েছে, গায়ে গরম কিছু আছে তো, না থাকে আমার শালটা পাঠিয়ে দিই।

—সার ফিলিপ্ সিড্‌নী আর কি। নামটাই সইতে পারেন না দেখ্‌ছি, মেয়েটি খুব সুন্দরী বোধ হয়?

শ্রীপান্নালাল অধিকারী

—আরে না, সাধারণত. কলেজে-পড়া মেয়েরা যেমন হয়ে থাকে, ও কিছু নয়। আমি হলফ্ করে বল্তে পারি, আপনি তার চেয়ে ঢের বেশী সুন্দরী। আজ ম্যাডানে একটা নতুন ফিল্ম্ ছিল।

—দেখেছি। আপনি রাস্তায় বেরুনোর সময় মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটেন না বোধ হয়, নিশ্চয়ই মীরাকে দু'বেলা দেখে থাকেন।

—আপনাকে একটা কথা বলি, তাহলেই সব বুঝতে পারবেন। আমার bifocal চশমা, উপরের দিকটা দূরের জিনিষ দেখ্বার, নীচের দিকটা কাছের জিনিষ পড়বার। আমি সেটাকে উল্টে নিয়েছি, পাছে মেয়েটাকে দু'বেলা স্পষ্ট দেখ্তে হয়। ফিল্ম্টা কেমন্ লাগ্লো? আমার ভালো লাগেনি।

—চশমার কাঁচ ওল্টানো ছিল বলে ভালো দেখ্তে পান্ নি। আবার ঠিক করে নেবেন, তাহ'লে ফিল্ম্ আর মেয়ে দুটোই পছন্দ হবে। Telephone Directory-র পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে 'শঙ্করকুমার' নামটা পড়ে খেয়াল হলো লোকটার সঙ্গে একটু আলাপ করে দেখি। তা দেখ্ছি আপনি মোটেই শঙ্করাচার্য্য নন, বেশ প্রেমে প'ড়েছেন।

—কার?

—মীরার।

—দোহাই আপনার, আর আমায় জ্বালাবেন না। আমি শপথ করে বল্ছি সে মেয়ের প্রেমে পড়িনি, পড়িনি, পড়িনি। আমাকে অন্যায় সন্দেহ করে পথে ভাসিয়ে যাবেন না।

—যে-রকম বৃষ্টি হচ্ছে তাতে সবাইকেই ভাস্তে হবে। দেখুন, কিছুদিন আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে না, কলকাতার বাইরে যেতে পারি। কিন্তু মনে রাখ্বেন, বাংলা দেশে একটি মেয়ে আছে যে আপনার সমস্ত খবর রাখ্বে। যদি চট্ করে বিয়ে করেন তবে সে খবরটা Statesman-এর Personal column-এ দেবেন, আপনাকে একটা উপহার পাঠাবো। আচ্ছা, আমার গলার স্বরটা বেশ ভাঙ্গা ভাঙ্গা মনে হচ্ছে কি?

*　　*　　*　　*

তারপর মাস দুয়েক আর কোন সাড়া পাইনি। আমিও প্রায়ই বাড়ী থাক্তে পারতুম না। বন্ধুবর নরেনের একটা কঠিন অপারেশন করাতে হয়, প্রায় দু'মাস তার বিছানার পাশে বসে রাত্রি কাটিয়েছি। রোজ সকাল বেলা গিয়ে চাকরকে জিজ্ঞাসা করি, কেউ রিং করেছিল কিনা, রোজই এক উত্তর 'না'। নরেনের ঘরে ফোনের দিকে তাকিয়ে কত রাত্রি এই কথাটাই মনে হয়েছে, টেলিফোনের তারে যে প্রেমের সৃষ্টি তা ছিন্ন হয়ে যেতে কতক্ষণ। আস্তে আস্তে সমস্ত জিনিসটাকে আমার একটা সুন্দর স্বপ্নের মতন মনে হতে লাগ্লো।

নরেনের অসুখ উপলক্ষে নরেনের বাবার সঙ্গে খুব আলাপ হয়ে গেল। নরেনের অন্তরঙ্গ বন্ধু জানা সত্ত্বেও বৃদ্ধ যে আমাকে সন্দেহ করতেন না বরং স্নেহ করতেন, এইটে আমার বড় আশ্চর্য্য লাগ্তো। বোধ হয় তার কারণ তিনি যখন টেলিগ্রাম পেয়ে দেশ থেকে এলেন তখন দেখ্লেন আমার অক্লান্ত সেবা।

ক্রমে নরেন সেরে উঠ্লো। নরেনের পিতা আমার কুলশীলের পরিচয় পেয়ে তাঁর কন্যার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব করে বস্লেন। কিছুদিন প্রেমের রিহার্স্যাল দিয়ে ঐ রকম একটা জিনিষের জন্যই বোধ হয় আমার মন উন্মুখ হয়েছিল। আর এই দু'মাস মীরাকে এত ঘনিষ্ঠভাবে দেখ্বার সুযোগ পেয়েছি যাতে ধীরে ধীরে আমার মনটা তার দিকে একটু আকৃষ্টও হয়ে পড়েছিল। সব চেয়ে ভালো লাগ্তো, সেই সেবা-নিরতা কিশোরীর স্নেহময় অন্তরখানি। তার সেই অক্লান্ত সেবার মধ্যে এক মুহূর্ত্তের তরেও উচ্ছৃঙ্খল দাদার প্রতি ঘৃণা কিম্বা বিরক্তির চিহ্ন পর্য্যন্ত ছিল না।

শুভদৃষ্টির সময় মীরার দিকে তাকিয়ে দেখি তার চোখে-মুখে এক দুষ্টুমির হাসির রেখা লেগে আছে। ভারি মিষ্টি দেখাচ্ছিল। বিয়ের আসনে বসে ভাব্ছিলুম, ব্যাপারটা কি। পুরুত-ঠাকুর বলছিলেন এক, আমি বলছিলুম অন্য। কন্যাপক্ষের পুরুত বল্ছেন— প্রজাপতি ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ—তাতে বরপক্ষের পুরুত কি একটা

আপত্তি করে বসলেন, ছ'জনে তুমুল শাস্ত্রীয় বাগ্‌যুদ্ধ সুরু হলো। ছোট্ট হাতখানি দিয়ে আমার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে একগাদা চেলীর ঘোমটার ভিতর থেকে অত্যন্ত চাপা-গলায় মীরা বল্লে—হ্যালো সাউথ 8751। এক মুহূর্তে সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল, আমি আনন্দে দিশেহারা হয়ে একটু জোরেই বলে ফেললুম, এঁ্যা কি বোকা? পুরুত-ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, কি, কি! কে বোকা? আমি বললুম, আজ্ঞে না,—প্রজাপতি ঋষি—

রূপকথা

শ্রীনলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়

১

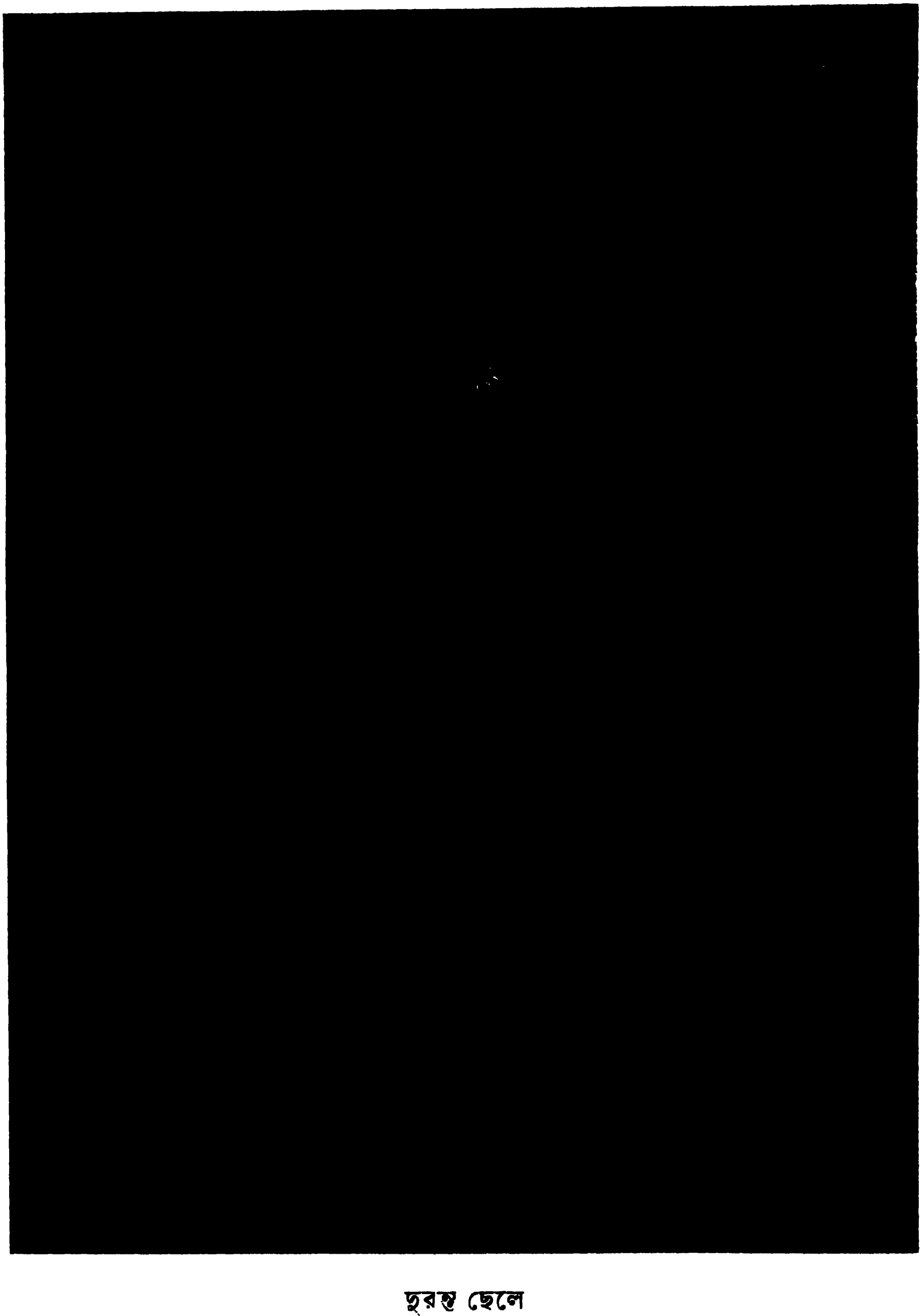
মেঘের অঙ্গনা আবৃত তনুলতা
মেঘের ঘরে বসি কহিছে রূপকথা।
এক যে রবি ছিল রাজার এক ছেলে
আলোর রথে রথে ভ্রমিত অবহেলে,
গহন কান্তারে, গিরির শিরে শিরে,
সাগর কূলে কূলে, নদীর তীরে তীরে;
খুঁজিয়া সারা হ'ত কার সে মুখখানি,
ভাবিত মনে মনে জেনেও নাহি জানি।

২

পুরাণো বট গাছ শীতল ছায়া তার,
তড়াগ উপরেতে বিছায় মায়া কা'র।
প্রাচীন বাঁধাঘাট, পঙ্কময় জল,
তাহারি বুক ঘেঁসে মোহিয়া ধরাতল,
ফুটিয়া আছে আজো, ফুটে সে প্রতিদিন,
কার সে হাসিরাশি উজলে তনু ক্ষীণ,
ঘেরিয়া থাকে তারে বটের সব পাতা,
দূরেতে থাকি রবি নোয়ায় লাজে মাথা।

৩

মেঘের অঙ্গনা শিহরে তনুলতা,
টুটিল ঘরখানি হ'ল না রূপ-কথা।
আঁখির কোণে কোণে জমিল কত জল,
দামিনী ঝলসিল প্লাবিল ধরাতল;
পুরাণো বাঁধাঘাট তাহারি বুক ঘেঁসে,
বালিকা এলো চুলে চাহিল হেসে হেসে।
তাহারি চোখে চেয়ে, অরুণ-আঁখি মেলে,
সোনার রথে এল রাজার এক ছেলে।



দুরন্ত ছেলে

"বিচিত্রা", আশ্বিন, ১৩৩৪

কজরী

শ্রীঅনাথনাথ বসু

একটী অনাদৃত মৃতপ্রায় ব্রতোৎসবের কাহিনী বলিতেছি। এককালে এই ব্রতটী সমগ্র উত্তর ও মধ্য-ভারতের গৃহে গৃহে অনুষ্ঠিত হইয়া বহু নরনারীর উৎসব-লিপ্সা মিটাইত। এখনও মির্জাপুর ও কাশী অঞ্চলে এবং মধ্য-ভারতে কোথাও কোথাও ইহার অনুষ্ঠান আছে বটে কিন্তু ইহার মধ্যে সে প্রাণ আর নাই; এই উৎসব আজ আর জনসাধারণের চিত্তকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিতে পারে না। আমরা আজ সভ্য হইয়াছি।

মানুষের উৎসবগুলি যে পরিমাণে তাহার ধর্ম্মবোধের পরিচয় দেয়, বোধ করি সেই পরিমাণেই তাহার অন্তরের সৌন্দর্য্য-বোধেরও সূচনা করে। ভক্ত তাহার দেবতাকে মন্ত্রদ্বারা পূজা করিয়াই ক্ষান্ত হয় না; সে পুষ্প, অর্ঘ্য, সঙ্গীত ইত্যাদি নানা সৌন্দর্য্যসম্ভার দিয়া তাহার প্রিয়কে ঘিরিয়া ফেলে, তাহার রুচি শিক্ষা দীক্ষা ও সৌন্দর্য্য-বোধের অনুপাতে নানা সুন্দর বস্তু দিয়া দেবতার পূজা-উপচার রচনা করে। সুতরাং প্রতি ব্রত, প্রতি উৎসবের দুইটী দিক আছে, একটী ধর্ম্মবোধের বা আধ্যাত্মিক, অপরটী সৌন্দর্য্যবোধের বা aesthetic। ইহাই পূজার তত্ত্বকথা।

মানুষের সভ্যতার ও মানসিক উন্নতির ইতিহাস রচনায় এই জন্যই এই ব্রতোৎসবগুলির আলোচনার প্রয়োজন রহিয়াছে। এগুলির মধ্যে এক দিক দিয়া যেমন আদিম মনের পরিচয় রহিয়া গিয়াছে তেমনি অন্যদিক দিয়া সেই মনেরই ক্রমবিকাশের ইতিহাসের ধারা যুগের পর যুগ তাহার পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। সৃষ্টির প্রথম যুগে মানুষ যে মনোভাব লইয়া দেবতার পূজা আরম্ভ করিয়াছিল সভ্যতার পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে সে মনোভাব ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইতেছিল; আদিমকালের পূজার আয়োজন যুগের পর যুগ ধরিয়া নব নব সম্ভারে, নব নব সমারোহে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল এবং দীর্ঘকালের ঐশ্বর্য্যসঞ্চয়ে সেগুলি যে অপরূপ রূপ ধারণ করিতেছিল তাহা সৌন্দর্য্যপিপাসুর চিত্তকে তৃপ্তি দিবার অধিকারে এবং গৌরবে পরিপূর্ণই হইয়া উঠিতেছিল।

কিন্তু আমরা এই উৎসবগুলিকে আজ আমাদের গৃহ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছি। আমাদের যুক্তি—এই-গুলির মধ্যে একটা অত্যন্ত স্থূলভাবের ধর্ম্মবোধের পরিচয় আছে যাহা আমাদের অন্তরের সূক্ষ্ম ধর্ম্মবোধকে পীড়া দেয়। একথা হয়ত' সত্য, কিন্তু এই ব্রতগুলিকে ঘিরিয়া যে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হইয়াছিল সেই সৌন্দর্য্যের আয়োজনকে আমাদের সভ্য-জীবনের প্রাঙ্গণ হইতে নির্ব্বাসন দিবার কোন প্রয়োজন ছিল কি?

কোন আদিম যুগে নরনারীর সম্ভোগ-লিপ্সার অত্যন্ত স্থূল একটা মূর্ত্তরূপ বসন্তোৎসবের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়াই কি বসন্তোৎসবের নৃত্যমালা, গীতনৈবেদ্য, পুষ্প-সম্ভারকে আমাদের গৃহদ্বার হইতে বিদায় করিয়া দিতে হইবে? এইগুলির মধ্যে যে স্বতঃ-উৎসারিত সৌন্দর্য্যানুভূতি বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহার কি কোন মূল্যই নাই?

সৃষ্টি ও জন্মরহস্য চিরদিনই মানুষের বিস্ময়ের বস্তু হইয়া আছে। যে অদৃশ্য শক্তির বলে বিশ্বজগতে ধ্বংস ও সৃষ্টির লীলা চলিতেছে তাহার নিকট মানুষ চিরদিনই মাথা নত করিয়াছে এবং তাহাকে পূজা করিয়াছে; এই শক্তির প্রসাদকামনায় বহু বলি, অর্ঘ্য, নৈবেদ্যও সে দিয়াছে। আমাদের মধ্যে বহু ব্রত-উৎসবের জন্মকথা এই শক্তির প্রসাদলাভ চেষ্টার অন্তরালে লুক্কায়িত আছে। যে ওষধি আমাদের অন্ন যোগাইতেছে, আমাদের দেহ পুষ্ট করিতেছে, কোন্ শক্তির বলে তাহার প্রাণসঞ্চার হয়, তাহা মানুষ আবিষ্কার করিতে পারে নাই বলিয়াই একদিন সে ওষধি-বনস্পতির মধ্যে দেবশক্তির আরোপ করিয়াছে; যে ভূমি তাহাকে ধারণ করিয়াছে তাহাকে মাতারূপে কল্পনা

করিয়াছে এবং এই মাতাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টায় নানা পূজা দিয়াছে। এইরূপেই বহু ওষধি-দেবতার (Vegetation Deity) পরিকল্পনা হইয়াছে এবং বহু ব্রত-অনুষ্ঠানের জন্ম হইয়াছে।

পরবর্ত্তীকালে উপাসকের জ্ঞান-দৃষ্টির এবং সৌন্দর্য্য-বোধের ক্রমবিকাশের সহিত এই ব্রত-অনুষ্ঠানগুলি নব নব কল্পনাদ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছে এবং ধীরে ধীরে সেগুলির দেহান্তর না ঘটিলেও রূপান্তর ঘটিয়াছে।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্।

ভারতবর্ষে গ্রীষ্মকালে প্রখর সূর্য্যের তাপে বিশ্বপ্রকৃতি রসহীন, শুষ্ক, মরুপ্রায় হইয়া ওঠে; যেন তখন শ্যামলতা লাভের জন্য পৃথিবীর রৌদ্রদগ্ধ তপস্যা চলিতেছে। মানুষের মনও তখন প্রকৃতির এই নীরস শুষ্কতায় কাতর হইয়া ওঠে।

তাহার পর আকাশ নীল-নব মেঘে ভরিয়া যায়, মেঘমেদুর অম্বরে বিদ্যুৎ গর্জ্জন করিয়া ওঠে, বর্ষা নাবে, শুষ্ক তৃষ্ণার্ত্ত পৃথিবীর তৃষ্ণা মেটে, বক্ষ শীতল হয়। তখন আবার চারিদিক শ্যামল, সজীব, প্রাণবান্ হইয়া ওঠে। পৃথিবী নবরসসঞ্চারে নব নব তৃণপল্লবের জন্ম দেয়, শুষ্কপ্রায় ক্ষীণস্রোতা শীর্ণা নদী পরিপূর্ণ হইয়া দু'কূল ছাপাইয়া বহিয়া যায়। বর্ষার স্নিগ্ধ ধারায় স্নান করিয়া সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি নবীন শ্যামরূপ ধারণ করে।

বর্ষাই ভারতের বসন্ত ঋতু।

প্রকৃতির যে নিয়মে ঋতুচক্রের এই লীলা, সৃষ্টির মধ্যে এই শুষ্কতা ও শ্যামলতার জরা ও যৌবনের খেলা চলিতেছে, মানুষ তাহার রহস্য সন্ধান করিয়া পায় নাই, তাই সেদিন এই সমস্তই তাহার নিকট বিস্ময়ের বস্তু হইয়াছিল। প্রকৃতির শ্যামলতা তাহার অন্ন দিবে, তাই এই শ্যামলতাকে কামনা করিয়া সে ব্যাকুল আগ্রহে পূজা অর্ঘ্য দিত, এবং যখন এই ঈপ্সিত শ্যামলতা সৃষ্টির মধ্যে দেখা দিত তখন তাহার প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছে, দেবতা প্রসন্ন হইয়াছেন ভাবিয়া সে উৎসব করিত, নৃত্যগীতে প্রকৃতি-প্রাঙ্গণ মুখরিত করিয়া তুলিত।

এককালে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সর্ব্বদেশে শস্যের জন্মোৎসব এইরূপ নানা নৃত্যগীত দ্বারা অনুষ্ঠিত হইত এবং তখন বহু ব্রত অনুষ্ঠান এই শস্যপূজার সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত ছিল;—আজ তাহার হয়ত' কোন পরিচয়ই নাই, সভ্যতার ক্রম-বিকাশের সহিত এই জন্ম-ইতিহাস একেবারেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। হীনকুলজাত লোক যখন সমাজে উচ্চস্থান অধিকার করে তখন তাহার জন্ম-ইতিহাস নূতনভাবে রচিত হয়, তাহার জন্মে আভিজাত্য পরিকল্পিত হয়। ইতিহাসে এরূপ ঘটনা বিরল নহে। তেমনি যে ব্রতের জন্ম হয়ত প্রকৃতির কোন বিশেষ বিকাশের রহস্য-যবনিকা উন্মোচনের অক্ষমতার সহিত জড়িত ছিল, পরবর্ত্তীকালে নবীন সৌন্দর্য্য-সম্পাতে ও পরিকল্পনাস্পর্শে তাহার জন্ম-কাহিনীর আমূল পরিবর্ত্তন হয়, নূতন অর্থে এবং ঐশ্বর্য্যে তাহা সম্পূর্ণ নূতন ব্রতেই পরিণত হয়।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কোন কোন স্থানে এখন কজরী নামে যে ব্রতটী নৃত্য ও গীত দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় তাহা এককালে এই বর্ষাপ্রকৃতির শ্যামলতার পূজাই ছিল। তাহার নামের মধ্যেই সে পরিচয় রহিয়াছে। 'কজরী' 'কজ্জলী' শব্দের অপভ্রংশ। প্রকৃতির কজ্জল শ্যামরূপে পূজা এই 'কজরী' ব্রত। কিন্তু ধীরে ধীরে এই ব্রতের অর্থ ভিন্নতর নূতনতর হইয়া গিয়াছে; বর্ত্তমান কালে কজরী ব্রত ভ্রাতার কল্যাণ কামনায় ভগিনীকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়।

নবোদ্ভিন্ন ধান্য-যবের গাছের মধ্যে যে শ্যামলতার দেবী অধিষ্ঠিতা তাঁহারই পূজায় কজরীব্রতের আরম্ভ। শ্রাবণের শুক্লা তৃতীয়ার দিন প্রভাতে পুরনারীরা নদীর স্নিগ্ধ নীরে স্নান করিয়া পবিত্র হইয়া একটী পত্রপুটে বিশুদ্ধ মৃত্তিকায় ধান্য বা যবের বীজ বপন করেন; তাহার পর তাহাতে জল সিঞ্চন করিয়া আবর্জ্জনা-মুক্ত পবিত্র স্থানে অন্ধকারের মধ্যে রাখিয়া দেন। শ্রাবণী পূর্ণিমার দিন স্নান করিয়া পবিত্র হইয়া তাঁহারা এই পত্রপুটগুলি নদীতীরে লইয়া যান্। পত্রপুটগুলিকে "ভুজরিয়া" বলে। ভগ্নিগণ পত্রপুট নদীর জলে ভাসাইয়া দিলে ভ্রাতারা সেগুলি তুলিয়া আনেন। ভ্রাতা ভিন্ন অন্য কেহ ভুজরিয়াগুলিকে স্পর্শ করিলে ব্রতচারিণীর ব্রতভঙ্গ হয়; সুতরাং ভুজরিয়া বিসর্জ্জনের সময় ভগ্নীর ব্রতরক্ষার জন্য ভ্রাতারা সেখানে উপস্থিত থাকেন। এই 'ভুজরিয়া' রক্ষা করিতে গিয়া প্রাচীনকালে

শ্রীঅনাথনাথ বসু

কত রক্তপাত হইত। বুন্দেলখণ্ডের বিখ্যাত আল্‌হার গানের একটী অংশ—কীর্ত্তিসাগরের তীরে ভুজরিয়ার লড়াই। মহোবার রাজকুমারী পরমালদুহিতা চন্দ্রাবতীর ভুজরিয়া রক্ষা করিবার জন্য বিখ্যাত কীর্ত্তিসাগরের তীরে পৃথ্বীরাজের সহিত মহোবার সৈন্যের যে যুদ্ধ হয় তাহারই স্মরণে এখনো উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের নাটগণ এই আল্‌হার গান গায়। এখনো মহোবার লোক কীর্ত্তিসাগরের তীরে কোন্‌খানে সে যুদ্ধ হয়, কোন্‌খানে কোন্ সেনাপতি মহোবার নারীর সম্মান রক্ষা করিবার জন্য প্রাণ দেন্ তাহা দেখাইয়া গৌরব অনুভব করে। আজও তাহারা সেই ভীষণ যুদ্ধে কীর্ত্তিসাগরের জল কেমন করিয়া রক্তবর্ণ হইয়াছিল, ধরিত্রী শোণিতকলুষিত হইয়াছিল, উৎসবাগত নরনারীর হরিৎ-বর্ণের পরিচ্ছদ রক্তরঞ্জিত হইয়া গিয়াছিল তাহাই কীর্ত্তন করিয়া অশ্রুপাত করে। সে সকল স্থান এখনো মহোবার নরনারীর নিকট বহুস্মৃতিপূত তীর্থের মত পবিত্র হইয়া আছে।

ভুজরিয়া বিসর্জ্জনের পর ভ্রাতারা সেগুলিকে জল হইতে উঠাইয়া ভগ্নীর হস্তে দেন, তখন ভগ্নীরা মৃত্তিকা ধুইয়া সেই ধান্যযবের ছোট ছোট চারাগুলি গৃহে লইয়া যান্; তাহার পর ভ্রাতার কর্ণে তাহারই দুই একটী গুঁজিয়া দিয়া তাহার হস্তে রাখী বাঁধিয়া দেন। শ্রাবণী পূর্ণিমা এইজন্যই রাখীপূর্ণিমা নামে পরিচিত।

'রাখী' শব্দটী রক্ষ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ভগবান্ ভ্রাতাকে রক্ষা করুন্, তাঁহার সমস্ত অকল্যাণ দূর করুন্ ভগিনীগণ ভ্রাতার হস্তে 'রাখী'র মাঙ্গলিক সূত্র বাঁধিয়া দিয়া তাহাই প্রার্থনা করেন। ভ্রাতারাও তখন ভগিনীকে 'চোলী' (অঙ্গবস্ত্র) উপহার দিয়া তাঁহাকে সমস্ত অপমান হইতে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দান করিয়া আশীর্ব্বাদ বা প্রণাম করেন। অনাত্মীয় পুরুষকে ভুজরিয়া ও রাখী দান করিলে তাহার সহিত ধর্ম্মভ্রাতার সম্পর্ক পাতান হয়। এইভাবে বহু অনাত্মীয় নরনারীর মধ্যে যে ধর্ম্মসম্বন্ধ পাতান হয় তাহা রক্তের সম্বন্ধ অপেক্ষা কোন অংশেই শিথিল নয়।

এই রাখীপূর্ণিমাই ঝুলন-পূর্ণিমা। বৈষ্ণব গ্রন্থসমূহে কৃষ্ণলীলার ঝুলন বা হিন্দোল-লীলার বর্ণনা পাওয়া যায়। দুল্ ধাতু হইতে বাংলা ঝুল্ এবং ঝুলন এবং সংস্কৃত হিন্দোল শব্দ আসিয়াছে। আজকাল ঝুলন-পূর্ণিমা আমাদের হৃদয়ে শুধু কৃষ্ণলীলার স্মৃতিই জাগাইয়া দেয়; কিন্তু এই হিন্দো-লোৎসবের মধ্যে একটী অতি প্রাচীনকালের উৎসবস্মৃতি লুক্কায়িত আছে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে ইহা আদিমকালের একটী জ্যোতিষিক ঘটনার প্রতীক। সূর্য্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের মধ্যে যে হিন্দোল আছে তাহারই বিজ্ঞাপনের জন্য এককালে ভাদ্রমাসে এবং বর্ত্তমানে শ্রাবণ মাসে এই উৎসবের অনুষ্ঠান। একথা হয়ত' অসম্ভব নহে এবং এইজন্যই হয়ত' যখন সূর্য্য এবং কৃষ্ণের অভেদত্ব স্বীকার করিয়া সৌর উৎসবগুলিকে বৈষ্ণব উৎসবে রূপান্তরিত করা হয় তখন এই হিন্দোল উৎসব বৈষ্ণব উৎসবে পরিণত হইল। তবে একদিন এই ঝুলন-পূর্ণিমা বিশেষ করিয়া 'কজরী' ব্রতের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। জ্যোতিষিক দেবতা এবং ওষধি দেবতার মধ্যে একটী নিগূঢ় যোগ আছে। সূর্য্যদেবতার কল্যাণেই পৃথিবীতে ওষধি বনস্পতির জন্ম হয় এ তথ্য হয়ত' অতি প্রাচীনকালেই মানুষে জানিয়াছিল—এইজন্যই হয়ত' সূর্য্যোৎসব এবং শস্য-জন্মোৎসব এককালে একাঙ্গীন ভাবে মিলিয়া গিয়াছিল এবং উভয়েই পরবর্ত্তীকালে কৃষ্ণলীলার মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছিল। জনসাধারণের আচরিত বহু অকুলীন ব্রত নব নব ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে নূতন কৌলীন্য লাভ করিয়াছে, ব্রতোৎসবের ইতিহাসে এরূপ উদাহরণ বিরল নহে।

ভ্রাতৃ-অর্চ্চনার পর ভগিনীরা ঝোলায় উঠিয়া গান গাহেন। নগরের উপকণ্ঠে উপবনে ঝোলা টাঙ্গাইয়া এই ঝুলন উৎসব আরম্ভ হয়। পূর্ণিমা হইতে চারিদিন পর্য্যন্ত উৎসব চলে; অনেকে অবশ্য সারা মাসই উৎসব করে। তখন নৃত্যগীতে উপবনগুলি মুখরিত হইয়া ওঠে।

এই গীতই উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের বিখ্যাত কজরী গীত। আমাদের বাংলা দেশের বাউল কীর্ত্তনেরই মত কজরী এক বিশেষ প্রকারের সঙ্গীত এবং বাউল কীর্ত্তনেরই মত সেগুলি একান্ত জনসাধারণের জিনিষ। সেগুলিরই মত ইহাদের মধ্যে এক বিশেষ প্রকারের দরদ আছে যাহা লোকচিত্ত তৃপ্ত করিতে পারে। কজরী নবশ্যামলতার

আবাহন-মন্ত্র, তাই ইহার সুরের মধ্যে এমন এক প্রকারের উচ্ছ্বাস, মাদকতা এবং হিল্লোল আছে যাহার সহিত ঝুলনের হিন্দোল এবং চারিপাশের প্রকৃতির নবজন্মের উচ্ছ্বসিত উদ্দামতার সুর ঠিক মেলে।

কজরীতে যে সকল গান গাওয়া যায় সেগুলির মধ্যে অনেকগুলিই কৃষ্ণরাধার মিলনবিরহের কাহিনী লইয়া। মানুষের মনে সুন্দরকে পাইবার জন্য যে চিরন্তন বিরহব্যথা জাগিয়া আছে—যাহা কৃষ্ণরাধার রূপকের মধ্যে ভক্তহৃদয়ের নিকট অম্লান ভাবে ফুটিয়া আছে, কজরীর অধিকাংশ গীতে তাহারই সুর বাজিয়া ওঠে। শ্রাবণ আসিল, চারিদিক মেঘে আঁধার হইয়া গেল, আকাশে মেঘগর্জ্জন হইতেছে, বিদ্যুৎ চমকিতেছে, ময়ূর উতলা হইয়া নৃত্য করিতেছে, পাপিয়া চাতক প্রাণ খুলিয়া গান করিতেছে—কিন্তু বিরহিণী আমি, আমার অন্তরে সে রস কোথায়, আমার প্রিয় আজ কোথায়, ইহাই কজরী গানের বিশেষ সুর।

ইংরেজ নৃ-তত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে কেহ কেহ এই উৎসবটীকে অশ্লীল বলিয়াছেন; আমাদের দেশের বহু উৎসবগুলিকেই তাঁহারা এইভাবে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন; ঝুলন, হোলী,—তাহাদের গানগুলি সকলই তাঁহাদের নিকট অশ্লীল। মিলনবিরহের গানগুলি সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালেই মানুষের অন্তরতম ভাবগুলি প্রকাশ করিয়াছে; তাহার মধ্যে কোন অশ্লীলতাই নাই। তবে একথা সত্য এই উৎসবের মাতামাতি কোন কোন সময়ে সংযমের সূক্ষ্ম-সীমারেখা অতিক্রম করিয়া যাইত। জীবন-সংগ্রামের অবকাশে গ্রাম্য নরনারীর সহজ সরল উচ্ছ্বাসময় উৎসবায়োজনের ও আমাদের সভ্যজীবনের উৎসব-আদর্শের মধ্যে এমন একটি বিরাট পার্থক্য আছে যাহার ফলে আমরা তাহাদের উৎসবের প্রকৃত স্বরূপটী বুঝিতে পারি না, এবং সেইজন্য সেগুলি আমাদের নিকট অবিচার লাভ করে।

কজরী যে প্রকৃতির শ্যামলতার উৎসব তাহার একটী প্রমাণ পাওয়া যায়। ভুজরিয়া বিসর্জ্জন করিবার সময় সকলকেই হরিৎবর্ণের পরিচ্ছদ পরিতে হয়। পুরনারীদের বস্ত্র, চোলী, ওড়না সকলই সেদিন সবুজ রঙে রঞ্জিত হয়; পুরুষেরাও সেদিন সবুজ কাপড়, পাগড়ী পরে; এমন কি প্রাচীনকালে যে যোদ্ধারা ভুজরিয়া রক্ষা করিতে আসিত তাহাদের অশ্বগুলি পর্য্যন্ত হরিৎবর্ণে রঞ্জিত হইত। ইতর ভদ্র, ধনী নির্ধন, নরনারী নির্ব্বিশেষে সকলেই কজরী উৎসবের দিন এমন করিয়া সবুজ হইয়া গান গাহিত, নৃত্য উৎসব করিত। এখনকার দিনেও পুরুষেরা সেদিন অন্তত তাহাদের পাগড়ীটা সবুজ রঙে রাঙাইয়া লইয়া যায়।

এইভাবেই একদিন কজরী উৎসব সম্পন্ন হইত। আজিকার সভ্যতার যুগে এই উৎসব ও ব্রত পরিত্যক্ত হইয়াছে; ভগ্নিদের ভ্রাতৃঅর্চ্চনাও আজ বিরল হইয়া উঠিয়াছে। আজ যখন মানুষ প্রকৃতির সকল রহস্য জানিতে পারিয়াছে বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতেছে—তখন প্রকৃতির শ্যামল নবীনতার মধ্যে প্রাণের বিকাশকে কোনপ্রকার উৎসবের দ্বারা আবাহন করিবার কোন সার্থকতাই আর তাহার কাছে নাই। বোধ করি জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়া আমরা বিজ্ঞতর হইয়াছি। এই বিজ্ঞতার মধ্যে সহজ আনন্দ-উৎসবের আর কোন স্থান নাই; তাই কজরী গীতও নাই, ঝুলনের দোলও নাই, নৃত্যও নাই। আধুনিক সভ্যতার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণ হইতে চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসিত হইয়াছে।

নৃত্য

শ্রীসাহানা দেবী

বোলপুর শান্তিনিকেতনে, দোলপূর্ণিমার দিন এবার কবিবরের নবরচিত 'নটরাজ' আশ্রম-বিদ্যালয়ের বালিকা-দের দ্বারা নৃত্যে অভিনীত হয়। জিনিষটি সম্পূর্ণ নতুন রকমের। ভারি হৃদয়গ্রাহী ও চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। নৃত্যের ভঙ্গীর ভিতর দিয়ে প্রকৃতির ছয়টি ঋতুর রূপ-প্রকাশই এই 'নটরাজ'-এর মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রকৃতির মনোভাবকে মানুষের অঙ্গ-সঞ্চালনের মধ্য দিয়ে প্রকট ক'রে তোলার কল্পনা, এক কবি ছাড়া অপরে সম্ভব নয় ব'লেই, তিনি তাকে কাব্যে ও সুরে বন্দী ক'রে নৃত্যের প্রাঙ্গণে পৌঁছে দিয়েছেন। বিদ্যালয়ের কয়েকটি বালিকা অদ্ভুত নৈপুণ্যে কবিকল্পনার এই সৃষ্টিকে মূর্ত্ত ক'রে তুলে আমাদের স্তম্ভিত ও বিস্মিত ক'রে দিয়েছিল।

'নটরাজ'-এ প্রত্যেক ঋতুর গানের সঙ্গে নাচ ও একটি ক'রে কবিতা পড়া হয়েছিল। Chorus-এ নৃত্য কেবল দু'চারটি ছিল; নইলে প্রত্যেকটি ঋতুরই একটি solo নৃত্য chorus গানের সঙ্গে হয়েছিল। প্রতি নৃত্যের পূর্ব্বে কবি নিজেই কবিতা পাঠ করেছিলেন। Chorus গীতের সঙ্গে solo নৃত্যের অবতারণা বোধ হয় কবিরই প্রথম সৃষ্টি।

মুসলমান রেনেসাঁসের (Renaissance) পর থেকে উচ্চশ্রেণীর নৃত্যভঙ্গী প্রায়ই বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে প্রকাশ করবার একটা সাধারণ রীতি বা ধারা চ'লে আসছে দেখা যায়। উদাহরণ—বাঈ নাচ। এই বাঈ নাচে আমরা দুটি রূপের প্রচলন দেখ্‌তে পাই। একটি তালের মাহাত্ম্যকে সুরের সাহায্যে অঙ্গের ভঙ্গিমার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা, অপরটি, মানুষের মনোগত (সচরাচর প্রেমের) বিচিত্র ভাবের লহরী-লীলাকে সুর ও তালের সঙ্গে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুনিপুণ ভঙ্গির সাহায্যে প্রস্ফুটিত করে তোলা।

বাঈ নাচই সর্ব্বোচ্চাঙ্গের নৃত্য,—প্রচলিত মতানুসারে। শুনেছি মাদুরা, তাঞ্জোর, প্রভৃতি দক্ষিণাঞ্চলে মন্দিরের নৃত্য (Temple dance) নাকি অপূর্ব্ব। দেখার সৌভাগ্য এখনও হয়নি। মণিপুরের নাচও প্রসিদ্ধ। তবে, এ-সব দেশের নৃত্যের ভঙ্গী আজকাল প্রায় মুমূর্ষু বললেই হয়। অজন্তার চিত্রে কয়েকটি কী মনোজ্ঞ নৃত্যের ভঙ্গীই দেখ্‌তে পাওয়া যায়! দেখ্‌লে কেবলি মনে হয়—এ যেন আমাদের একান্তই নিজস্ব, একান্তই আপনার বস্তু! চিত্রের প্রতি মর্ম্মস্পর্শী রেখায় যেন তাকে চিরজীব ক'রে রেখেছে। এই চিত্রের মধ্যে প্রাণের গভীর স্পর্শ, আজ আমাদের অন্তরে স্বচ্ছ সলিলের মতোই সুস্পষ্ট হ'য়ে প্রতিভাত হয়,—যা দেখ্‌বা মাত্র প্রাণ আপনা হতেই গেয়ে ওঠে—"এ তো আমাদের,—আমাদেরই এ—! একেই বুঝি এতকাল না জেনে খুঁজেছিলাম, চেয়েছিলাম! এ আমাদেরই যেন আগে ছিল—কেবল কবে, কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গোপনের আশ্রয় নিয়েছিল—!" এ-সব প্রাণস্পর্শী ভঙ্গী লুপ্তপ্রায় আজ এই বাঈ নাচের প্রতিপত্তির প্রভাবে।

বাঈ নাচের আবেদন মানুষের প্রাণে কোনও গভীর খোরাক যোগাতে পারে ব'লে মনে হয় না। তার ভঙ্গিমাতে প্রাণের সাড়ার বড়ই অভাব বোধ হয়। সে নৃত্যে আনন্দ দেয়, কিন্তু সুধা-বর্ষণ করে না। সে নৃত্যে চিত্তকে লুব্ধই করে, অন্তরকে ভ'রে দিতে পারে না। সে নৃত্যে আনন্দের চঞ্চলতাই বেশি—গভীরতা নেই। সে নাচে মোহের স্বপ্নজাল সৃষ্টি করতে পারে, হৃদয়ে গভীর অনুভূতির ছাপ দিতে পারে না। তবু, বাঈ নাচ যে আর্টের একটি সম্পদ, এ অস্বীকার করার কোনও অভিপ্রায় আমার নেই।

আমাদের দেশে আজকাল নৃত্যের স্থান বড়ই সঙ্কীর্ণ হ'য়ে পড়েছে। নৃত্যের উপলব্ধি বড়ই অসার স্তরে এসে পৌঁচেছে। নৃত্যের নামেই আমরা চমকে উঠি—কানে আঙুল দিই—কেননা নৃত্যের আসর যে আজকাল কেবল দুর্গন্ধময় গলির বিলাস-ভবনে! নৃত্যের স্মৃতিও তাই

আমাদের মনে বড়ই অপবিত্র। নৃত্যের কী অপমান তাই ভাবি! দেবদেবীর পূজার মন্দির থেকে একেবারে কোথায় কোন নীচে ভোগের লীলা-নিকেতনে সে নেমে এসেছে! শুনেছি, পূর্ব্বে আমাদের দেশেও দেবালয়ে নৃত্য দেবপূজারই একটি অঙ্গ ছিল। দাক্ষিণাত্যে মন্দিরের নৃত্যের আদর্শ এখনও বড়। কারণ একমাত্র ভোগ তৃপ্তির হীনকার্য্যে ব্যাপৃত না রেখে, সাধনার এই পবিত্র বস্তু দেবতার চরণে পূজার ফুলের অর্ঘ্যস্বরূপ নিবেদন ক'রে ধন্য হবার অভিলাষ আজও তারা করতে জানে। কিন্তু সচরাচর এই সৌন্দর্য্য সৃষ্টিকে কী হীনতায় না বন্দী করে রাখা হয়েছে! তাই জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হয়, মুক্তির কোনও সম্ভাবনা কি এখন আর নেই? আমরাই যে তাকে অস্পৃশ্য ক'রে রেখেছি আমাদের অঙ্গনের দ্বারে প্রবেশের অধিকার না দিয়ে। মুক্ত কি তাকে আর করা চলে না কোনও প্রকারেই? নৃত্য শুধু লালসা-তৃপ্তির চমকপ্রদ বস্তুই নয়, একটি মস্ত বড় আর্ট, এ-কথা তো বুঝবার সময় এসেছে। চিত্র বা সঙ্গীত-কলার মতো আমাদের দেশের আর্টের সভায় তাকে নিমন্ত্রণপত্র পাঠাবার সময় কি এখনও হয়নি? এবার 'নটীর পূজায়' নৃত্যে শ্রীমতী গৌরী দেবী যে অসামান্য দক্ষতা ও কৃতিত্বের সঙ্গে নৃত্যকলার অপূর্ব্ব মহিমা বিকীর্ণ করেছিলেন, তা থেকে আর্টের জগতে নৃত্যের আসন কি তিনি অনেক উচ্চ স্তরে নিয়ে বিছিয়ে দেন নি? নৃত্যের ভিতর দিয়ে ভক্তি ও স্তুতির অকৃত্রিম ভাবের প্রকাশকে কী নৈপুণ্যের দ্বারাই না তিনি দেখিয়েছেন! সমস্ত মন, সমস্ত অন্তরাত্মা কেবল ভক্তিভরে বিধাতার চরণে লুয়ে পড়ার আকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর কোনও ভাবই মনে আসবার অবকাশ পায়নি! নৃত্যের সাহচর্য্যে মানুষের অন্তরকে এরূপ অমিশ্র ভক্তিরসে আপ্লুত বা অনুপ্রাণিত করবার শক্তি ও প্রেরণা—সাধনার লভ্য স্বর্গীয় দান,—তা বুঝবার সময় যেন এবার হয়েছে।

পাশ্চাত্য প্রদেশে নৃত্যের সমাদর ঘরে ঘরে। বাল্য-কাল থেকে তাদের এ-বিষয়ে রীতিমতো শিক্ষা দেওয়া হয়। আমাদের দেশ অবশ্য বহু বিষয়েই তাদের দেশ থেকে পিছিয়ে আছে; তাদের সঙ্গে তুলনা যে ক'রছি, তা নয়। কেবল এটুকু বলতে চাই যে, আর্টের রাজ্যে নৃত্য যে একটি মস্ত বড় সম্পদ সেটা তারা তাদের সাধনার দ্বারা বোঝাতে ও দেখাতে পেরেছে। নৃত্যকলার গৌরবমুকুটমণি শ্রীমতী আনা পাল্‌ভোভার অত্যাশ্চর্য্য নৃত্যকৌশল যিনি দেখেছেন, তিনি এ-কথা স্বীকার না ক'রে পারবেন না। এমনই আরো কত বড় বড় নৃত্যপটু নারী য়ুরোপে আছেন, যাঁদের সন্ধানও অনেক সময় আমরা জান্‌তে পারি না। তবে এটা আমরা প্রত্যেকেই বুঝতে পেরেছি যে, তাদের দেশে নৃত্যের উপলব্ধি (appreciation) খুবই বড় ও সার্ব্বজনীন। নৃত্যের মহিমা সম্বন্ধে তাদের মন খুবই সচেতন, তাই তাদের শত শত নরনারী এই সাধনাকে বরণ ক'রে, তারই সেবায় আত্মোৎসর্গ ক'রে তাকে আরো মূর্ত্ত ক'রে তোলার জন্য কী অপরিসীম পরিশ্রমই না করছে। শুধু য়ুরোপে কেন, আমেরিকা, জাপান, চীন ইত্যাদি প্রায় সব দেশই, নৃত্যের উচ্চত্ব উপলব্ধি করেছেন। কারণ সে সব দেশেও, নৃত্যকে কেবল লঘু পঙ্কিল দৃষ্টিতে দেখা হয় না, তার মর্য্যাদা ও মূল্যের গভীরতা সম্বন্ধে সে দেশের লোকের মন যথেষ্ট সজাগ। ভারতবর্ষে একমাত্র গুজরাটীদের নৃত্যের আদর্শ এখনও খুবই উন্নত শুন্‌তে পাই। তাদের মধ্যে সভ্য-সমাজে,—ভদ্র পরিবারের শুধু ছোট মেয়েরা নয়, বিবাহিতা ভদ্রমহিলারাও জনসাধারণের নিকট অনায়াসে নৃত্য ক'রে থাকেন। যদিও সে নৃত্য খুব উচ্চ শ্রেণীর নয়, তবুও, মনের এই ঔদার্য্য যে অনেকটা আশাপ্রদ, এ-কথা উল্লেখ না ক'রে থাকতে পারলাম না।

আমরা সকলেই জানি, কোনও বড় জিনিষ লাভ করতে গেলেই তার যোগ্য মূল্য দিতেই হবে। সাধনা ও অধ্যবসায় ব্যতীত কোনো শ্রেষ্ঠ সম্পদই লাভ করা যায় না। কিন্তু এ দেশের মত বোধ হয় কোনো দেশেই নৃত্যের পরিচর্য্যা এমন জঘন্য আবর্জ্জনার স্তূপে হয় না! এই যে সাধনা, এই যে সৃষ্টির একটা বৃহৎ প্রচেষ্টা,—এর সন্ধান আমাদের অন্তরে কোথায়? শুধু তাই নয়, এই মনোরম সৃষ্টি-উপলব্ধির আনন্দকে আমরা কোথায় বেঁধে রেখেছি?

সে যে ভোগাকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তারই তরল প্রবাহে ভেসে চলে যায়, অন্তরের মর্ম্ম-তারে গুঞ্জনধ্বনি তোলে না। কারণ আমাদের মন এতকাল নৃত্যের কাছ থেকে কেবল বিলাসেরই খোরাক চেয়ে এসেছে বলেই তার অভি-ব্যক্তি শুধু সেই একদিকেই সীমাবদ্ধ হ'য়ে আছে। এ-দেশে নৃত্যের দর্শকমণ্ডলী নৃত্যের মধ্যে শুধু বাহ্যেন্দ্রিয়ের স্থূলতাকেই দেখ্‌তে চেয়েছে, তাই তার আবেদন এত অগভীর ও নিম্ন শ্রেণীর হ'য়ে নিম্ন স্তরেই প'ড়ে আছে।

মানুষের মন সর্ব্বদা বিকাশের পথে অগ্রসর হচ্ছে বলেই আশা করা যায় নৃত্যের আসনও বৃহত্তর পংক্তিতে বিছাবার সুযোগ আসবে। নৃত্যের উচ্চত্বকে এতকাল খর্ব্ব ক'রে আসা হয়েছে—কেবল চাওয়ার দীনতায় ও দৃষ্টির হীনতায়। আজ তাই সকলের অন্তরের ক্রম-উন্মীলনের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যের সভায় আমাদের দাবী আরো অনেক বড় অনেক উঁচু ও অনেক পবিত্র হ'য়ে ওঠার কথা। মানুষের মন যখন আর অল্পতে সন্তুষ্ট নয়, তখন নৃত্যের নিকটই বা অল্প পাওয়ায় তুষ্ট থাকতে রাজী হবে কেন? তার কাছেও যে বলবার, চাইবার ও আশা করবার দিন এসেছে—"নাল্পে সুখমস্তি!"—অল্পে আর সুখ নেই। তাকেও এখন বিশ্বের সভাতলে গৌরব মূর্ত্তিতে আসবার জন্য আহ্বান করতে হবে। তার অপরূপ রূপের স্বর্গীয় মাধুরীতে আমাদের অতৃপ্ত নয়ন ও মনে তৃপ্তির সুষমার প্রলেপ দিতে হবে। লিপ্সার নীচ দৃষ্টি থেকে উদ্ধার ক'রে তাকে মহত্ত্বের ও সম্মানের ঊর্দ্ধদৃষ্টি দিয়ে আকর্ষণ করতে হবে। লালসা মেটাবার দিন এবার গত। তাকে জানতে হবে, বুঝতে হবে যে দর্শকের মনে সৃষ্টিরসের নিত্য নতুন উপলব্ধি ও উদ্ভাবনী শক্তির উৎস খুলে মন্ত্রমুগ্ধ ও স্তম্ভিত ক'রে জগৎ-কলার আসরে স্থান বেছে নেবার দিন এবার আগত। ভুবন-গৃহের ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডারে তাকেও এবার দান দিতে হবে। জীবন, যৌবন নিয়ে ছেলেখেলার দিন ফুরিয়েছে—এ-কথাকে স্মরণপথে আনবার শুভদিন এবার তার এসেছে। মানবের মনের সঙ্গে নৃত্যের মনপ্রাণও জেগে উঠুক তার মোহের নিদ্রা ত্যাগ ক'রে। তার অন্তরতম প্রদেশের নিহিত প্রকৃত সত্যটি এবার রূপ ধ'রে সাড়া দিক তারই প্রকৃত স্বরে। যাদুকরী এবার ছলনার বেশ পরিত্যাগ ক'রে সত্যস্বরূপে দেখা দিয়ে চঞ্চল মনের মোহের ইন্দ্র-জাল দু'হাতে ছিঁড়ে ফেলে, আশ্বস্ত করুক আমাদের হৃদয়কে—"ও যে আমার ছলপরা কৃত্রিম রূপ! এই আমি আমার প্রকৃত রূপে অবতীর্ণ!"—বিশ্রব্ধ বিস্ময়ে, আমাদের অন্তরাত্মা নত হ'য়ে, ভক্তিসহকারে তার বন্দনায়, পূজায় প্রবৃত্ত হোক।

নৃত্য সম্বন্ধে অনেক আলো সম্প্রতি, কবির 'নটীর পূজা' ও 'নটরাজ'-এর নৃত্য দর্শনে পেয়েছি। নৃত্যের এই বেশ-পরিবর্ত্তনে আমাদের প্রত্যেকেরই মনে অতুলনীয় বৈভবের সৌন্দর্য্যরশ্মি সৃষ্টি করেছিল। মনে হয়েছিল নৃত্যকে যেন দেবীরূপে নতুন আলোকে মণ্ডিত দেখ্‌লাম! মনে হয়েছিল, এত রূপ, এমন পবিত্র নীরন্ধ্র সৌরভ, এমন হৃদয় আলো-করা বিমল জ্যোতি কোথায়, কোন গভীর গহ্বরে আড়াল পড়েছিল! বারবারই মন বলেছে—একি দীপ্তি! একি তৃপ্তি! এ তৃপ্তি, সেই ক্ষণিকের স্রোতে ভেসে যাওয়া, ভুলে যাওয়া তৃপ্তি নয়। এ তৃপ্তি প্রতি মুহূর্ত্তকে, নতুন রসে সিঞ্চিত ক'রে, আনন্দের গভীরতা কেবলই বাড়িয়ে চ'লে অসীম নেশার তৃপ্তি। তবে নৃত্যকে আমরা আগে ঠিক যে-ভাবে দেখ্‌তে বা পেতে চাইতাম, তার থেকে এখন কিছু শুভ্র সুন্দর বেশে তাকে গ্রহণ করতে মন না-ও আপত্তি করতে পারে, এ-কথাটি বোধ হয় ভরসা ক'রে বলা চলে। কারণ, আমরা সেদিকে অনেকটা প্রস্তুত না হ'য়ে থাকলে "নটীর পূজা" বা "নটরাজ"-এর নৃত্যতে দর্শকমণ্ডলীর মন এমন গভীরভাবে সাড়া দিতে পারত না। হয় তো কিছুদিন পূর্ব্বে এ-প্রশ্ন উত্থাপনের কথা শুনলে তাঁদেরই মধ্যে অনেকেই (মনে যাই থাক) শিউরে উঠ্‌তে দ্বিধা বোধ করতেন বলে মনে হয় না। তবে অনেক জটিল প্রশ্ন ও সমস্যার সমাধান কালের গতির প্রবাহে সহজ সরল ও সুসাধ্য হ'য়ে আসে বলেই বা কিছু ভরসা। প্রায় ত্রিশ বছর আগে সঙ্গীতের আরাধনা এমন সার্ব্বজনীন ভাবে সুরু হবে কেই বা ভেবেছিল? তখন এ কল্পনাও স্বপ্নাতীত ছিল। কারণ সঙ্গীতের গৃহও তো তখন, —নৃত্যের পাশে না হোক, কাছেই ছিল বললেও অত্যুক্তি

হয় না। সে আজ এগিয়ে উঠে এসেছে ভদ্রসমাজে, অনেক বাধাবিঘ্ন, ঘাতপ্রতিঘাত অতিক্রম ক'রে। তার আসল মহিমার গৌরব স্থানের উপর নির্ভর করে—এ-কথা সকলেই জানে। য়ুরোপে তো বটেই, অন্যান্য দেশেও, নৃত্য সঙ্গীতের পাশেই স্থান পেয়ে এসেছে—কেবল আমাদের দেশ ছাড়া। তাই মনে হয় আমাদের দেশেও সে শুভদিনের হয়তো আর দেরী নেই—কে জানে! কে বলতে পারে!

যা সত্য, তা কখনও লুপ্ত হয় না,—চিরকালই শুনে এসেছি। নৃত্যের সৃষ্টিতে তার ভঙ্গিমা ও ব্যঞ্জনার মধ্যে, আজ বলে নয়, বহুপূর্ব্বেই সত্যরসের আস্বাদ পাওয়া গিয়েছে,—তাই তা বিলুপ্ত, এ-কথা মানতে অন্তর কিছুতেই রাজী হয় না। কেননা যুগ পরিবর্ত্তনের সময়ে, অনেক সৃষ্টির মাহাত্ম্যই অতীতের কালগর্ভে চাপা পড়ে দেখা যায়; তাই বলেই তা বিনাশপ্রাপ্ত, এ-কথা মানা সম্ভব নয়। কারণ যুগে যুগে, মানুষের মনে ও দৃষ্টিতে সেই বিগত বিভবের প্রতিচ্ছবি, নব নব রূপ, রস ও গন্ধে আবার ভাস্বর হ'য়ে ওঠে। কালের নীরধির অতল গর্ভে যা অন্তর্হিত হয়, তা যথার্থ যায় না। নীলাম্বুর তরঙ্গোচ্ছ্বাস তাকে এক কূল থেকে নিয়ে অন্য কূলে ভিড়িয়ে দেয়—এই পর্য্যন্ত! জগতের ভাণ্ডারে শেষের হিসাবে কোনও খরচই জমা করা হয় না।

বৌদ্ধযুগে, নৃত্যের বিকাশধারা যে উচ্চ আদর্শে পরিণতি নিয়েছিল, তার প্রমাণ, অজন্তার নানাবিধ চিত্র ও বহু বৌদ্ধ কীর্ত্তিকলাপ থেকে পাওয়া যায়। নৃত্যকে তারা শুধু মঞ্জীরের গুঞ্জন-তালের মধ্যেই খোঁজেনি। তার প্রতি ভঙ্গিমাকে অনুভূতির জীবন্ত স্পর্শে মূর্ত্ত ক'রে তুলবার সন্ধান জেনেছিল। নৃত্যের প্রতিমা তাদের অন্তরে শুধু পাষাণ মূর্ত্তিই ছিল না—ঐকান্তিক পূজার একাগ্রতার ভিতর দিয়ে তারা তার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল, এটা খুবই স্পষ্ট বোঝা যায়। মুসলমান যুগ থেকে নৃত্যকে, ভোগের সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে পদার্পণ করে নেমে আসতে দেখা যায়। তখন থেকেই এই বাঈ নাচের উদ্ভব। কেবল একটি গণ্ডীতে আবদ্ধ থেকে ক্রমে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে, ধীরে ধীরে প্রাণ ও প্রেরণাহীন স্তরে নৃত্য তার অপরূপ সৃষ্টিশক্তিকে হারিয়ে ফেলে। সেই অবধি আজও সে সেই একই অবস্থায় প'ড়ে আছে।

নৃত্যশিক্ষার ভার যাদের উপর, তারা অধিকাংশই অশিক্ষিত (uncultured) লোক ব'লে তাদের শিক্ষা দেবার প্রণালীতে যা হয়ে আসছে (traditional)—তার বেশি আর দেবার কিছু, বা প্রেরণার কোনও রসই সৃষ্টি করবার ক্ষমতা বা যোগ্যতা থাকে না। তারা শুধু Technique-টিরই চর্চ্চা করতে ভালবাসে বা জানে, এবং তাকেই কেবল চায়। অর্থাৎ যন্ত্রী থেকে যন্ত্রই তাদের কাছে বেশি প্রিয়। তাই শুধু সেই যন্ত্রের অনুশীলনেই কেবল ব্যস্ত ও সচেষ্ট হ'য়ে তার ভিতরকার আসল সত্তা যে প্রাণ বা জীবনী-শক্তি, তাকে একেবারেই বিস্মৃত হয়। তাই তাদের শিক্ষা গ্রহণের ফলে, নৃত্যের ব্যঞ্জনা শিক্ষিত (cultured) সম্প্রদায়ের কাছে এত অর্থশূন্য অর্থাৎ expressionless মনে হয়। কারণ এ-সব ওস্তাদদের কাছে শিক্ষা প্রাপ্ত হ'য়ে যারা সেই শিক্ষার অনুবর্ত্তনে নিযুক্ত থাকে, তারাও যে অশিক্ষিতাই। কাজেই, দর্শকবৃন্দ নৃত্য থেকে কোনও স্বর্গায় প্রেরণা সংগ্রহে বঞ্চিত হ'য়ে, নিজেদের অধঃপতনের অন্যতম কারণ নির্ণয় ক'রে, তাকে নির্ব্বাসনের আদেশ দিলেন। ফলে সেই হ'তে আজও নৃত্যরাণী ভদ্রসমাজের মনে অশুচি, অস্পৃশ্য ও ঘৃণ্য হয়ে আছে এবং সেই থেকে এখনও তার নাম শ্রবণে আমরা ভয়ে বিবর্ণ হয়ে কানে আঙুল দিই!

নৃত্যের ভিতর যে যথেষ্ট গ্রহণীয় সামগ্রী আছে, এ-খোঁজ আমরা পেয়েছি। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হাতে নৃত্য যে প্রাণবন্ত রূপ ধারণ করতে জানে তার প্রমাণ "নটীর পূজা" ও "নটরাজে"র নৃত্যমাধুর্য্য। আমাদের হৃদয়কে সৃষ্টির অভাবনীয় সৌন্দর্য্যের মহনীয় প্রেরণার রঙীন আল্পনা বুলাবার ক্ষমতা নৃত্যকলার প্রভূত পরিমাণেই আছে। শুধু "নটীর পূজা" বা "নটরাজ"-এই নয়, পৃথিবীর চারিপাশে দৃষ্টি ফেরালেই সে শক্তির প্রাচুর্য্য বুঝতে বেশি কষ্ট পেতে হয় না। অথচ এই

শ্রীসাহানা দেবী

অবর্ণনীয় শক্তি-সাধনার কোনও প্রচেষ্টা না দেখ্‌তে পাওয়া যে কত বড় ক্ষোভের কথা তাই ভাবি। তাই বারবার মনে হয়, শিক্ষিত লোকের হাতে এই শক্তির পরিস্ফুরণ, আরো কত সম্পদৈশ্বর্য্যেই গরীয়ান্‌ হ'য়ে উঠ্‌বার সম্ভাবনা। তাঁদের হাতে নৃত্য যে প্রাণ পাবে, সঞ্জীবিত হ'য়ে উঠ্‌বে, তার ভঙ্গির লহরে লহরে যে নতুন নতুন অর্ঘ্যের অঞ্জলি উৎসৃষ্ট হ'য়ে উঠ্‌বে—এ বিষয়ে ত কোনও সন্দেহ জাগতে পারে না।

শান্তিনিকেতনে বালিকাদের নৃত্যের কোনও শিক্ষাই দেওয়া হয় নাই। তাদের নিজেদের অন্তরের উপলব্ধিকে নৃত্যে মূর্ত্তিদান দিতে সক্ষম হয়েছিল শুধু culture-এর গুণেই। নাচের Technique-টি ভাল রকম শিখ্‌তে পেলে ঐ নৃত্যের ভিতর দিয়ে আরো কত সৃষ্টি করাই তাদের পক্ষে সম্ভব হোত! কিছু না জেনে, না শিখে, যারা এতটা রসের আমদানী করতে পেরেছে, ভালমত শিক্ষা পেলে তাদের একটা বড় রকম সৃষ্টিশক্তির উৎস যে খুলে যেতে পারত এ-বিষয় কোনও সংশয় কি থাকতে পারে? তাই মনে হয় নাচের Technique-টি ভাল ক'রে শিক্ষা করা দরকার তারই বিকাশের সহায়তার জন্য। Technique ভাল রকম জানা থাকলে সৃষ্টির সুযোগ (scope) ঢের বেশি পাওয়া যায়।

এখনও ভারতের কোনও কোনও অঞ্চলে নৃত্যের ভাল ভাল শিক্ষক পাওয়া যায়। অল্প বয়স থেকে বালিকাদের শিক্ষা দিতে পারলে, ক্রমে তাদের বয়োবৃদ্ধি ও culture-এর সঙ্গে সঙ্গে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষমতানুযায়ী সৃষ্টির একটা সুযোগ পায়। তা'ছাড়া, ছোট থেকে নাচ আরম্ভ করলে আমাদের অনুদার ভীতি-বিহ্বল দৃষ্টিতেও ক্রমে স'য়ে আসবে। কেননা, তাদের বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এবং আমাদের পারিপার্শ্বিকের সচকিত দৃষ্টিও অভ্যস্ত হ'য়ে আসবার অনেকটা সময় পাবে। নতুবা ছোটবড় প্রত্যেককেই নাচ সুরু ক'রে দেবার আর্জ্জি আমার যে সমাজের অনুশাসনে মঞ্জুর হবার কোনও সম্ভাবনা নেই—তা আমার বিলক্ষণ জানা আছে। ত্রিশ বৎসর আগে সঙ্গীত সম্বন্ধে যেমন অনেকের ধারণা অচেতন ছিল, তেমনি নৃত্য সম্বন্ধেও যদি আজ অনেকের কল্পনা অজ্ঞ থেকে থাকে তো আশ্চর্য্য হবার বিশেষ কোনও কারণই খুঁজে পাই না। তার জাগরণের সাড়া অনেকেই অন্তরে পেয়ে থাকলেও বাইরে প্রকাশ করবার ক্ষমতা হয়ত এখনও অর্জ্জন করতে পেরে ওঠেন নি। সে জন্য তাঁদের দোষ দেওয়া তো চলে না, কেননা মনের ও অনুভবের অন্তর্দৃষ্টি আমাদের অনেকটা খুলে গেলেও, সংস্কারের প্রভাবে বাইরের দৃষ্টি এখনও যে আবৃত, এ-কথা আমরা সবাই কম-বেশি জানি। তবু, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, নৃত্য আবার উঠ্‌বেই—এবং সে উত্থান অদূরেই।

যাদুকরী

—গল্প—

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

১

প্রাঙ্গণের একপ্রান্তে অবস্থিত, ক্ষুদ্র, জীর্ণ রান্নাঘর খানির মধ্য হইতে ভাতের ফ্যান্ গলাইতে গলাইতে জগদম্বা ডাকিল,—"ওরে, ও খাঁদা—খাঁদা,—ওরে কোথা গেলি রে?"

অনুসন্ধানের ডাক শেষ হইবার অনেকক্ষণ পরে, সেই ঘরেরই ঠিক পিছনে, খিড়কীর পুকুরঘাট হইতে সাড়া আসিল,—"কেন গো;——যাঃ, খুলে গেল! ওরে বাস্‌রে!—বেচা, দেখলি নি ক?"

হাত দুইতিন অন্তরে দণ্ডায়মান্ হাড়িদের বেচারামের হস্তেও সুতা-খাটানো ধনুকের মত বাঁকা একখণ্ড কঞ্চি শোভা পাইতেছিল, এবং তাহার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ক্ষুদ্র খড়ের ক্যাৎনাটীর প্রতি এমনই ঐকান্তিক একাগ্রতার সহিত নিবদ্ধ ছিল যে, সে খাঁদার 'ওরে বাস্‌রে'র কারণ বিন্দুমাত্র না লক্ষ্য করিয়াও, চাপা গলায় ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল,—"দেখেছি মাইরি, খুব বড় মাছ! বোধ হয় পোনা—তা'ই উঠ্‌লো না রে ভাই!"

অধিকতর উত্তেজিত এবং চাপা গলায় খাঁদা বলিল,—"উঠ্‌লো না কি রে? তুই কিচ্ছু দেখিস্ নি। আর একটু হ'লে সুতো ছিঁড়ে নিয়ে যেতো, তা' জানিস্?"

এই শিশু-শিকারীযুগল আজ এই পুষ্করিণীর পলায়িত মৎস্যের আয়তন এবং তাহার সুতা ছিঁড়িবার শক্তি সম্বন্ধে যে প্রকাণ্ড ধারণাটুকু উপলব্ধি করিয়া লইয়াছিল, সেটুকু তাহাদের নিঃশেষে দূর হইবে সেদিন, যেদিন তাহারা ভাঙ্গা কঞ্চি ত্যাগ করিয়া সত্যিকারের আসল ছিপ্ ধরিতে শিখিবে; এবং সেইদিন তাহারা বুঝিবে যে, কল্মীর দল বা নিমজ্জিত কঞ্চি বা তালের বাগ্‌ড়ার লাগিয়া সুতা-ছেঁড়া ভিন্ন মৎস্য-জাতীয় কোন প্রকার জীবকর্ত্তৃক তদ্রূপকার্য্য সংঘটিত হওয়া, এই হিঞ্চে-কল্মী-পূর্ণ নিরামিষ জলাশয়টাতে একান্তই অসম্ভব।

ফ্যান্ ফেলিতে আসিয়া জগদম্বা চীৎকার করিয়া উঠিল,—"ওরে অলপ্পেয়ে! অ্যাঁ! সেই থেকে এই পচা জলের মধ্যে ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছিস্? দাঁড়াও,—চুলোর দোরে দি তোর ছিপ্-সুতো! কত ক'রে এই না তোকে জ্বর থেকে তুলিছি! আবার পড়্‌বার মৎলব কচ্ছিস্ বটে?—আয় বল্‌চি—উঠে আয় এক্ষুণি!"

জলের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া খাঁদা কিছু-একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু কথা কহিতে বোধ হয় সাহস করিল না, পাছে তাহার পলায়িত পোনা, অথবা তাহারি কোন আত্মীয়-স্বজন বা জ্ঞাতি-বান্ধব, বঁড়সীর কাছে আসিয়া কথার গোলমালে আবার পালাইয়া যায়!

"উঠ্‌ছিস্ না যে বড়,—শীগ্‌গীর উঠে আয় পোড়ার-মুখো!—আঁটকুড়ীর বেটী ছেলে বিইয়ে রেখে গিয়ে কী ক্যাঁসাদেই আমায় ফেলেছে গো!—তবুও জলে দাঁড়িয়ে রইলি? ওরে মুখপোড়া, এ পুকুরে কি মাছ আছে,—না তুই মাছ ধর্‌তে পারিস? শীগ্‌গীর উঠে আয় বল্‌চি!"

উত্তর না দিলেও আর চলে না, দিলেও এদিকে বড়মাছ হয় ত পালাইয়া যায়। সুতরাং উভয়-সঙ্কটে পড়িয়া, দৃষ্টিটা জলের দিকেই স্থির রাখিয়া, কিঞ্চিৎ বিরক্তির ভাবে খাঁদা শুধু বলিল,—"আঃ!"

"দাঁড়া ত মুখপোড়া, তোর 'আঃ' আমি বার কচ্চি" বলিয়া জগদম্বা দৌহিত্রের হাত হইতে কঞ্চিগাছটা ছিনাইয়া লইল এবং তাহার নড়া ধরিয়া বাটীর মধ্যে উঠাইয়া আনিল।

গোয়ালের আড়ার উপর কঞ্চিগাছটা রাখিতে রাখিতে জগদম্বা বলিল,—"আহা, বাবুর ছিপের কিবে রূপ গো!"

খাঁদা রান্নাঘরের ভাঙ্গা খুঁটিটা জড়াইয়া ধরিয়া রাগে ফুলিতেছিল।

যাদুকরী

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

"শুক্‌নো কঞ্চি ক'গাছা কুড়িয়ে মরাইতলায় রেখেছিলুম উনুন্ ধরাবো বলে, নক্ষীছাড়া দস্যি দু'বেলা মাছ ধ'রে ধ'রে দিলে সেগুলো শেষ ক'রে! তোর মাছ ধরার নিকুচি করেচে! এই, আড়ার ওপর তুলে রাখলুম, এইবার দেখি, কেমন ক'রে তুই ছিপ্ পাড়িস্।"

এত বড় অত্যাচার খাঁদার আর সহ্য হইল না। ফোঁস্ ফোঁস্ করিতে করিতে আসিয়া, দিদিমাকে খিম্‌চাইয়া, আঁচ্‌ড়াইয়া, কাপড় ধরিয়া টানা-হিঁচড়া করিতে করিতে বলিল,—"পোড়ারমুখী কোথাকার, হতভাগী কোথাকার, আমার ছিপ্ দে বল্‌চি, শূয়ার, ইষ্টুপিড্!"

"দাঁড়া ত অলপ্পেয়ে, ছিপ্ দেওয়াচ্চি তোকে!—ওমা! একটু সুতো কেটে কাট্‌নায় রাখবার যো নেই! যা মেহন্নত্ ক'রে সুতো কাটা! বামুনের হাতে কখনো একটা পৈতে দিতে পারি না! নক্ষীছাড়া দশবার ক'রে গিয়ে সুতোটুকু ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিয়ে আস্‌ছে! এক গাদা আল্‌পিন্ ছিল নীলার বাক্সটার ভেতর, তা'র একটাও নেই! মুখপোড়া সবগুলোকে বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে বঁড়শী করেছে! ভারি মাছ ধরিয়ে মদ্দ হ'য়েছেন,—গেল যাঃ!"

বনমালী মুকুজ্জ্যের মেয়ে রাজবালা আগুন লইবার জন্য দু'খানি ঘুঁটে হাতে করিয়া আসিয়া রান্নাঘরের ছাঁচ-তলায় দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হ'য়েছে মামী?"

"হওয়ার কথা আর বলিস্ নি মা। নই পুকুরের পচা পাঁকের ওপর দাঁড়িয়ে মাছ ধরছিলেন, তুলে এনেছি, তাই গোপালের আমার 'আগ্' হ'য়েছে!—দাঁড়িয়ে রইলি কেন মা, দাওয়ার ওপর একটু উঠে বোস্, এই ভাত ক'টা বেড়ে নিয়ে, হাত ধুয়ে আগুন তুলে দি'।—এস গো দাদাঠাকুর, ভাত খাবে এস। বাল্‌তির জলে ভাল ক'রে হাত দুটী ধুয়ে এস। এস—খেয়ে দেয়ে নিয়ে, তারপর ব'সে ব'সে রাগ কোরো এখন।"

"বেরো বল্‌চি, আমি খাব না, তোর কথা বল্‌তে হ'বে না। পোড়ারমুখী কোথাকার!"

"পোড়ারমুখীর কাছে থাকিস্ কেন? পোড়ারমুখী না হ'লে যে এদিকে আবার হয় না। যেতে পারিস্ না বাপের কাছে? যা', দূর হ'য়ে যা,—বাপের কাছে গিয়ে থাক্‌গে যা। আমিত পোড়ারমুখী, সুন্দরী ভাল মা হ'য়েছে, থাক্‌তে পারিস্ না গিয়ে সেখানে? আমার এ সব পেড়ায় ভোগ করবার ত দরকার নেই। যা', বেরো আমার বাড়ী থেকে।"

মুখ গোঁজ করিয়া খাঁদা বলিল,—"বেরোব না, পোড়ারমুখী কোথাকার! তুই বেরো। তোর বাড়ী?"

"আমার নয় ত কা'র—তোমার?"

"হ্যাঁ আমার।" খাঁদুর চোখে দু'এক ফোঁটা জলও ঝরিতেছিল, একটু থামিয়া আবার বলিল,—"এ ত তোমার বরের বাড়ী।"

রাজ ও জগদম্বা উভয়ে উভয়ের মুখের দিকে চাহিয়া গোপনে হাসিল। জগদম্বা খাঁদার সামনে আসিয়া বলিল,—"তা'হলেও তোরত আর নয়। তুইত আর আমার বর ন'স। বলেছিলুম বটে,—তা এরকম হাড়-জ্বালানো বরে আমার আর কাজ নেই!"

খাঁদার রাগ দ্বিগুণ মাত্রায় বাড়িয়া উঠিল। ভাঙ্গা খুঁটিটাকে দু'হাতে জোরে নাড়াইতে নাড়াইতে, ভ্যাংচাইয়া বলিল,—"আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা,—পোড়ারমুখী কোথাকার!"

রাজবালা বলিল,—"মামী বুঝি খাঁদুকে বিয়ে করবে বলেছিলে?"

আগুন শুদ্ধ ঘুঁটেখানি রাজর হাতের কাছে রাখিয়া জগদম্বা বলিল,—হ্যাঁ মা। সেদিন বল্‌ছিল, 'সকলের বর আছে, তোমার নেই কেন দিদি মা?' আমি বল্লুম,—'আমারও ছিল রে, মরে গেছে।' ও বল্লে,—"আবার বর কর না কেন।" আমি বল্লুম, 'একবার বিয়ে হ'লে আর কি হ'তে আছে?' ও বল্লে, 'কেন, মা তো ম'রে গেছে, তা বাবা ত আবার বিয়ে কল্লে।' তা, আমি বল্লুম, 'তুই যদি আমার বর হোস, ত না হয় তোকেই আবার বিয়ে করি।' তা, ও তা'তে রাজী হ'ল।—তা, বলেছিলুম বটে যে, ওকেই আবার বিয়ে করবো, কিন্তু এরকম কথার অবাধ্য বর নিয়ে আমি কি করবো, তোরাই বল্‌ত মা রাজ" বলিয়া রাজর মুখের দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিল। রাজও হাসিল। তারপর, আগুন লইয়া বাইতে

খাইতে রাজ বলিল,—"যাও মাণিক, ভাত খাওগে। দিদিমা যা' বলে, শুনতে হয়। তুমি যে লক্ষী ছেলে।"

জগদম্বা কড়া হইতে বাটী করিয়া খানিকটা দুধ লইয়া থালার কাছে রাখিল এবং খাঁদাকে জোর করিয়া কোলে তুলিয়া থালার কাছে বসাইয়া বলিল,—"মাণিক আমার, সোনা আমার, যাদু আমার, এই কতখানি সর দিয়েছি ভাখ্ একবার। তুই যে আমার ছিষ্টিধর, আমার বংশের দুলাল, আমার নয়নের—"

"রাজ মাসীর কাছে কেন বিয়ের কথা বল্‌লি?"

"আচ্ছা, আর বলবো না। দেখ্‌দেখি বাবা, জলে দাঁড়িয়ে থেকে পা দুটো একেবারে ঠাণ্ডা হিম্ হ'য়ে গেছে! চারিদিকে জর-জাড়ি হচ্ছে, আবার পড়লে, আর কি তোকে বাঁচাতে পারবো! কথা শোন না কেন বাবা! নাও, শীগ্‌গীর খেয়ে দেয়ে নিয়ে, চল, পাঠশালায় দিয়ে আসি। ছেলেরা সব বই সেলেট্ নিয়ে কখন্ গেছে! তা'রা ভাব্‌বে, 'ওমা' খাঁদাটার রোজ আস্‌তে দেরী হয়।"

২

ছোট্ট একটু আখ্যায়িকা, একরত্তি তা'র পূর্ব্ব-কথা। বলিলেও হয়, না বলিলেও হয়।

একমাত্র কন্যা লীলাবতীর বয়স যখন পাঁচ বৎসর, তখন পাগল স্বামীর মৃত্যু হয়। স্বামীর মৃত্যুতে হাতের নোয়া ও সিঁথির সিঁদুর লোপ ব্যতীত সংসারে জগদম্বা আর কিছুরই পরিবর্ত্তন জানিতে পারিল না। বরং দিনরাত দুরন্ত পাগ্‌লাকে লইয়া ঘর করার যে একটা মহা আতঙ্ক ছিল, তাহার শেষ হইয়া গেল। সংসারে 'ন-মাতা, ন-পিতা, ন-ভ্রাতা'। গ্রাসাচ্ছাদনের কয়েক বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমী এবং কন্যা লীলাবতী এই দুইটী বস্তু অবলম্বন করিয়া বিধবা তাহার দিন কাটাইতে লাগিল।

লীলা বড় হইল। জগদম্বা তাহার বিবাহ দিল। বুক ছিঁড়িয়া তাহাকে শ্বশুরবাটী পাঠাইল। শ্বশুরের সংসারও লীলার ফাঁকা; অর্থাৎ, শ্বশুর আর স্বামী, স্বামী আর শ্বশুর। বছর খানেক পরে সেই শ্বশুরেরও যখন তিরোভাব ঘটিল, তখন প্রমথনাথ নিজের গৃহে তালাচাবি বন্ধ করিয়া স্ত্রীকে লইয়া শ্বশুরালয়ে আসিয়া আবির্ভূত হইল।

তাহার পর লীলা একটী ফুটফুটে সন্তানের জননী হইল। কিন্তু খাঁদুর জন্মের পর, লীলার শরীর এমন ভাঙ্গিয়া পড়িল যে আর তাহা শোধরাইল না। খাঁদু দিদিমার কোলেই মানুষ হইতে লাগিল, আর লীলা তাহার নানাপ্রকার রোগ লইয়া দিন কাটাইতে লাগিল। এই অবস্থায় বছর তিনেক পরে, লীলা আর একটী কন্যা প্রসব করিল এবং ছয়দিনের দিন আঁতুড় ঘরেই স-কন্যা লীলার ইহলীলার পরিসমাপ্তি হইয়া গেল।

নদীর ধারে স্ত্রীর শেষ গতি সম্পন্ন করিয়া প্রমথ নির্ব্বাপিত চিতা হইতে খানিকটা ভস্ম সঙ্গে করিয়া আনিল, এবং তাহা একটী পাত্রে রাখিয়া, তাহা সদরবাটীর আমগাছতলায় প্রোথিত করিয়া, মিস্ত্রী ডাকাইয়া, তদুপরি একটী বেদী নির্ম্মাণ করাইল। পাড়া-প্রতিবাসীদের কোন প্রকার আনন্দ-উৎসবে যোগদান একেবারেই বন্ধ করিয়া দিল; দু'একটী শোকের কবিতা লিখিল; এবং কলিকাতা হইতে 'উদ্ভ্রান্ত-প্রেম' আনাইয়া, দিনের অধিকাংশ সময়ই তাহা হস্তে লইয়া স্ত্রীর বেদীপার্শ্বে কাটাইতে আরম্ভ করিল। বন্ধুদের মধ্যে যাহারা পুনরায় দার-পরিগ্রহের কথা বলিতে আসিয়াছিল, প্রমথ তাহাদের সহিত ঘৃণায় একেবারেই বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া দিয়াছিল।

বৎসরাধিক কাল এইভাবেই কাটিয়া যাইবার পর, হঠাৎ প্রমথর পরিবর্ত্তন দেখা দিল; এবং ধর্ম্মে, অর্থাৎ সংসার ধর্ম্মে, পুনরায় তাহার মতিগতি সুস্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইল।

তাহার পর যাহা হইয়া থাকে। মাসকতক ধরিয়া এখানে-ওখানে ঘুরিতে ঘুরিতে, একদিন, ক্রোশ দুই তিন দূরবর্ত্তী মাধবপুরে গোঁসাইবাড়ী একটী বয়স্থা কন্যা দেখিয়া আসিল, এবং কালবিলম্ব না করিয়া সঙ্গে সঙ্গেই কন্যাটীর পাণিপীড়ন করিয়া প্রাচীন সনাতন প্রথার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিল।

স্ত্রী বিন্দুবালা বিবাহের পর এই দেড় বৎসর কাল পিত্রালয়েই আছে। প্রমথ নিজের গ্রামের জমীদার-সেরেস্তায় একটী কর্ম্মের যোগাড় করিয়া লইয়াছে। বহুদিন পরিত্যক্ত পৈত্রিক জীর্ণ ভদ্রাসনের আবার সংস্কার হইতেছে।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

এইবার স্ত্রীকে আনিয়া আবার নূতন করিয়া গৃহস্থালী পাতিয়া সংসারধর্ম্ম করিবার সর্ব্বপ্রকার আয়োজনই প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল।

এইটুকু মাত্রই এই ক্ষুদ্র কাহিনীর অতীত ইতিহাস।

৩

আহারাদি সারিয়া, খাঁদাকে পাঠশালায় রাখিয়া আসিয়া, জগদম্বা তুলার পাঁজ লইয়া টেকোয় সুতা কাটিতে কাটিতে অতীত ও বর্ত্তমানের অনেক কথাই চিন্তা করিতেছিল। উমার মা আসিয়া, খুঁটি ঠেস্ দিয়া বসিয়া বলিল,—"বৌদি', দিদি কাল মাধবপুরে শিষ্যি-বাড়ী গিয়েছিল। প্রমথর নতুন বৌকে দেখে এল। দিদি বল্লে,—'হ্যাঁ, সুন্দরী যা'কে বল্‌তে হয়! রূপ উথ্‌লে পড়ছে! তবে ধাড়ী মেয়ে বাপু। ওরা যা'ই বলুক, সতের আঠার বছরের কম কিছুতেই নয়।'"

"মাধবপুরে বুঝি হেমার শিষ্যি আছে?"

"ঐ একঘর নাপিত,—তা'ও সব মরে-হেজে গেছে। —তা' বো'য়ের চোখে মুখে কথা! খুব গিন্নী, খুব বান্নী, বলিয়ে-কইয়ে, লিখিয়ে-পড়িয়ে,—একেবারে পাকা-পোক্ত, ফিট্-ফাইন্।"

"তা, পেরমথর ভালই হ'য়েছে। এতদিন ত সংসার কা'কে বলে তা' জানতে হয় নি। আসনে বসে, তৈরী ভাত দু'বেলা খেয়েছে, আর কেবল বেড়িয়ে বেড়িয়েছে। এখন ত আর তা' হ'বে না। এখন চাকরীও ক'ত্তে হ'বে, পয়সা উপায়ও ক'ত্তে হ'বে, হাট-বাজারও ক'ত্তে হ'বে। সংসারের সবই এখন নিজেকে ক'ত্তে হ'বে। আর, তখন যদি একদিন বলিছি,—'বাবা, নীলা আজ দু'টা পত্তি করবে, একবার জেলেবাড়ী গিয়ে দেখ না যদি কিছু জাওলা মাছ-টাছ পাও,'—অমনি হুম্‌কী দিয়ে এসেছে—'হুঁঃ, আমি যা'ব জেলেপাড়ায় মাছ খুঁজ্‌তে!' পরের খোসামোদ ক'রে, ঠাকুরঝি, চিরকাল হাঁঠ ক'রে আনিয়েছি—পেরমথ কখন একদিন হাঠে গিয়ে হাঁঠ ক'রে এনেছে! কখন কুটোটি নেড়ে সংসারের কোন উপ্‌গার করে নি। সব কথাই হৃদে গাঁথা আছে উমার মা। তা', সুন্দরী বৌ হ'য়েছে, সুখ হ'য়েছে, ভালই হ'য়েছে,—তবে তা' শুনে ত আর আমার বুকের জ্বালা জুড়ুবে না। আমার নীলা যেদিন গেছে, সেদিন থেকে আমার বুকের জ্বলুনির আর বিরাম নেই।"

"বলেচে,—'ন-গাঁয়ের বাড়ীর ঘর-দোর সব মেরামত হচ্ছে। ওমাসের দোসরা তারিখে যা'ব। ওখান থেকে ত কাছেই,—একদিন মাকে দেখ্‌তে যাব। তাঁর পায়ের ধূলো—

"মুখে নুড়ো জেলে দি তা'র! আস্পদ্দার কথা দেখ? 'মাঁকেঁ দেঁখঁতেঁ যাঁবোঁ'! গভ্‌ভোধারিণী মা! একবার এলে মজাটা——

"দিদ্‌মা উ!"

"কিরে খেঁদো, এরি মধ্যে চলে এলি কেন পাঠশালা থেকে? এই ত তোকে রেখে আস্‌ছি!"

"খি"

"খি কি রে?"

"দে"

"সত্যি না মিছে? এইত একরাশ গিলে এলি!"

তাড়াতাড়ি সিলেট বই দাওয়ার উপর ফেলিয়া দিয়া, টিপি টিপি হাসিতে হাসিতে, খাঁদা বলিল, "সত্যি গো সত্যি, খাবার দিয়েই দেখ না; তখন ভাল ক'রে খেতে দিলে কই?"

উমার মা বলিল,—"না না, সত্যিই হ'বে বোধ হয়, তা' না হ'লে আর তাড়াতাড়ি চ'লে আসে বৌদি'?"

"মনেও কোরো না ঠাকুরঝি! নিত্যুই ও এইরকম ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে আসে! মশাই বলে যে, 'আপনি যতক্ষণ ব'সে থাকেন, খুড়ী-ঠাকরুণ, ততক্ষণ চুপ্‌টী ক'রে খাঁদু আপনার বেশ ব'সে থাকে, তারপর আপনি উঠে গেলেই, ও আর থাকতে চায় না।' এ কি মুস্কিল ভাই! আমি গিয়ে কি সারাদিন পাঠশালায় ব'সে থাকতে পারি? পেরথম্ পেরথম্ ত তা'ও ভাই করিছি। সেই জলখাবারের ছুটী পর্য্যন্ত ব'সে থেকে, ছুটী হ'লে পরে, ওকে একেবারে সঙ্গে ক'রেই নিয়ে আসতুম্। এখন ওকে রেখে বাড়ী আস্‌তে না আস্‌তেই, ও এসে হাজির! হয় ক্ষিদে, নয় জলতেষ্টা, না হয় ঐ রকম একটা কিছু। বল কেন ঠাকুরঝি, কি করি যে এ ছেলেকে নিয়ে, তা জানিনে।"

"ব'সবে ব'সবে, এইরকম ক'ত্তে ক'ত্তেই মন ব'সবে। আর ওর বয়েসই বা কি বৌদি?"

"তা' হ'লেও, এখন থেকে মন বসাতে ন' পারলে—— হ্যাঁরে, আবার ঐ কতকগুলো কস্‌টে খেজুর নিয়ে এলি? খাস্ নি বাবা, পেট্ কাম্‌ড়ে সারা হ'য়ে যাবি!"

খেজুরগুলি পৈঠার উপর রাখিয়া খাঁদা বলিল,— "কস্‌টে নয় গো, দেখ না কেমন পাকা পাকা। খাবে দিদ্‌মা?"

"হ্যাঁ, ঐ আঁস্তাকুড়ের খেজুর আমায় খেতে হ'বে বৈ কি!"

"আঁস্তাকুড়ের নয় গো। বেচাদের গাছের—মাইরি।"

"তা ভাল, ঐখানেই থাক্ অমনি, ও আর খেওনা মাণিক। উমার মা, ভাই, গা-টা আবার শীত্ শীত্ ক'রে আস্‌ছে, জ্বর আবার আজও এল দেখছি!"

"বৌদি, নিত্যি যখন এরকম জ্বর হচ্ছে, তখন ভাল দেখে একটা ওষুধ-টোষুধ খাও। ঐ আমার উমার জন্যে——"

"হ্যাঁ, নীলাকে খেয়ে ব'সে আছি, আমাকে এখন পাঁচ রকম ওষুধ-বিষুধ খেয়ে বাঁচবার চেষ্টা ক'ত্তে হ'বে বৈ-কি!"

"তা কি কর্ব্বে বল। ছেলেটার জন্যেও ত বাঁচ্‌তে হবে। তা' না হ'লে, ওকে আর কে দেখ্‌বে বল?"

"যা'র ছেলে সেই নিয়ে যাবে উমার মা। তুমি মনে করেছ, খোঁদোকে আমার কাছে রাখবে,—মনেও তা কোরো না। এই কবে এসে নিয়ে যায় একদিন!—এরি মধ্যে শাসিয়ে দশখানা চিঠি দিয়েছেন—'আর আপনার কাছে শ্রীমানকে রাখা চলিবে না, যেহেতু তাহার পড়াশুনার সময় আসিয়াছে। এই সময় অবহেলায় নষ্ট হইলে, লেখা-পড়া হওয়া কঠিন হইবে।' তারপর, আরও কত কি,—হ্যাঁ—'ওখানে থাকিলে বালকের স্বাস্থ্য ভাল থাকিবে না।' সে কতভাবেরই কথা উমার মা! তা, বালকের স্বাস্থ্য এখানে কি ক'রে আর ভাল থাক্‌বে বল? মা'র পেট থেকে প'ড়ে অব্‌ধি ত সুন্দরী বৌয়ের কাছেই ছিল এতদিন, এখন এখানে থাকলে ত স্বাস্থ্য খারাপ হ'বেই। শ্রীমানকে আর এখানে রাখা কি ক'রে—নাঃ, উমার মা, আর ব'সে থাকা হ'ল না, লেপ মুড়ি দিতে হ'ল! খাঁদু, কোথাও যেওনা বাবা, বাড়ীতে ব'সে খেলা করো।"

৪

সেদিন রাত্রে দৌহিত্র ও মাতামহীতে শুইয়া শুইয়া কথা হইতেছিল; জগদম্বার জ্বর বোধ হয় ছাড়িয়া আসিতে-ছিল। খাঁদুকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল,— "আচ্ছা খাঁদু, আমি যদি ম'রে যাই বাবা, তুই কা'র কাছে থাকবি?"

"তুমি মরবে কেন?"

"আমি কি আর চিরকালই বাঁচ্‌বো বাবা? দেখ্‌ছিস্ না, রোজ রোজই জ্বর হ'তে আরম্ভ হ'য়েছে। হয় ত কবে একদিন টুপ্ ক'রে ম'রে যাবো।"

"না দিদ্‌মা, তুমি মোরো না!"

"বেঁচে থেকে কি হ'বে বল্? তুই ত আর একটী কথা আমার শুনিস্ না! আচ্ছা, সত্যি হঠাৎ যদি ম'রেই যাই, তা' হ'লে কি কর্ব্বি তখন তুই?"

"তক্ষুণি বেচাদের বাড়ী ছুটে যাব। কিন্তু কি ক'রে জান্‌তে পারবো দিদ্‌মা যে তুমি ম'রে গেছ? চোক তা'হলে ত আর চাইবে না,—খুব ডাক্‌লেও না?"

"না। তা, হাড়ী-বাড়ী ছুটে গিয়ে কি কর্‌বি বল্? ঐ রাজমাসীদের বাড়ী গিয়ে খবর দিবি, ঐ ফটিক মামাদের ছুটে গিয়ে বল্‌বি, ঐ—"

বাধা দিয়া খাঁদু বলিল,—"আচ্ছা, দিদ্‌মা, যদি এম্‌নি রাত্তির বেলায় ম'রে যাও, তা' হ'লে কি হ'বে? কি ক'রে অন্ধকারে একলা বেরুবো? সে বড় মুস্কিল হবে দিদ্‌মা! তুমিও চোক বুজে থাকবে, কথা ক'বে না, আর আমিও বেরুতে পারবো না!"

"সেই ত বাবা, সেই কথাই ত ভাব্‌চি।"

"দেখ দিদ্‌মা, তুমি শোবার সময় রাত্তিরে ওপরকার খিল্‌টা আর দিওনাক। ওপরের খিল্‌টা দে'য়া থাক্‌লে দিদ্‌মা, আমি ত নাগাল পাব না! শুধু নীচের খিল্‌টা দে'য়া থাক্‌লে, টপ্ ক'রে খুলে ফেল্‌বো। ফেলেই, দাওয়ায় বেরিয়ে খুব চেঁচিয়ে 'বেচা বেচা' ব'লে ডাক্‌বে।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

তারপর ওরা ত শুনতে পেলেই ছুটে আসবে। এলেই বলবো,—ওরা রাজমাসীদের খবর দেবে।"

খাঁদুর ছোট মাথাটিতে নিজের শীর্ণ উত্তপ্ত হাত বুলাইতে বুলাইতে জগদম্বা বলিল,—"না বাবা, অত তোমায় কিচ্ছু করতে হবে না ধন। মরি যদি ত দিনের বেলাতেই মরবো?"

"তখন যদি পাঠশালায় থাকি দিদ্‌মা?"

"তোমায় ডাকিয়ে আনবো মাণিক" বলিয়া জগদম্বা আরও কোলের কাছে খাঁদুকে টানিয়া, তাহার পিঠে-মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল,—"আচ্ছা খাঁদু, এই ছ'মাস ধ'রে যে বাবা পাঠশালায় যাচ্ছিস্, শিখ্‌তে টিক্‌তে পেরেছিস্ কিছু?"

"হুঁ"।

"কি শিখেছিস্ বল্ দেখি একবার। তোর বাপও খালি লিখ্‌ছে, এখানে থাকলে তোর পড়া-শুনো কিছু হবে না। তোকে আমার কাছে আর বেশীদিন রাখবে না বাবা। এই কবে এসে হয়ত একদিন নিয়ে যায়!"

"ইস্—গেলে ত? আমিত এখানে খুব ভাল পড়া শিখ্‌ছি,—তা' হ'লেও নিয়ে যাবে?"

"আচ্ছা, কি শিখিছিস্ বল দেখি?"

"বোলবো,—অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ঌ ক খ ঙ জ—

"তা' হ'লে ত খুবই শিখিছিস্ দেখ্‌চি বাবা! একেবারে বর্গীয় জ পর্য্যন্ত শিখে ফেলেছিস্?"

"হ্যাঁ দিদ্‌মা! আবার সট্‌কে বলবো দেখবে?—এক, ছুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ, উনিশ, তের, পনর—

নাতি দিদিমাতে এই প্রকার গভীর বিষয়ের আলোচনা চলিতে চলিতে একসময় খাঁদু ঘুমাইয়া পড়িল। সেদিন সন্ধ্যা হইতেই আকাশ ঘনাইয়া ছুর্য্যোগের সৃষ্টি করিয়াছিল। অনেক রাত্র পর্য্যন্ত জগদম্বার চক্ষে নিদ্রা আসিল না। বাহিরে তখন ঝর্ ঝর্ করিয়া অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছিল। শ্রাবণের মেঘাবৃত নৈশ আকাশে কোথাও একরত্তি আলোর আভাস মাত্র ছিল না। চারিদিকে বিকট ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার। সেই গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া, এক-একবার দমকা বাতাস আসিয়া ঘরের চাল ও গাছপালাকে কাঁপাইয়া ও দোলাইয়া দিয়া যাইতেছিল। অন্ধকারের রাজ্যে বাতাস এবং বৃষ্টির যেন রাক্ষুসে খেলা চলিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে এক-একবার দূরের কোনো গ্রাম হইতে কোনো কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ চৌকিদারের চৌকির হাঁক্ বিকট হইয়া বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল। প্রকৃতির এই বিপর্য্যয়ের মধ্যে জগদম্বার সমস্ত অন্তর আজ কি-যেন একটা আতঙ্কে থাকিয়া থাকিয়া শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। এই সময়, বোধ হয় কি একটা ভয়ের স্বপ্ন দেখিয়া, খাঁদু অস্ফুটে ডাকিয়া উঠিল,—"দিদ্‌মা গো!' জগদম্বা তাহাকে একবারে বুকের সহিত মিশাইয়া চাপিয়া ধরিল, তা'রপর প্রায় সারারাত্রি অনিদ্রায় কাটাইয়া ভোরের দিকে জগদম্বা ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন প্রাতে যখন খাঁদু তাহাকে ডাকাডাকি করিয়া তুলিয়া দিল, তখন উঠান রোদে ভরিয়া গিয়াছিল এবং গরু ছাড়িয়া দিবার জন্য দূরে উচ্চ কণ্ঠরব শোনা যাইতেছিল।

৫

আজ আটদিন হইল প্রমথ আসিয়া খাঁদুকে নবগ্রাম লইয়া গিয়াছে। জগদম্বাকেও যাইবার জন্য বিশেষরূপে পিড়াপিড়ী করিয়াছিল, ফলে প্রমথকে কতকগুলি কড়া কথা শুনিতে হইয়াছিল।

জগদম্বার জ্বর বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু আজকাল জ্বর আবার আসে। তবে দিনের বেলা তাহার জ্বর আসিতে কেহ দেখে নাই। জগদম্বা বলে, রাত্রে আসে। রাজবালা এখন আগুন লইতে আসিয়া প্রায় প্রত্যহই ফিরিয়া যায়, আগুন পায় না।

জগদম্বা বলে,—"উনুনে আর কি জন্যে আগুন দোবো মা, ভাত খাবে কে?- রোজই রাতে জ্বর হয়।" সুতরাং জগদম্বা উনুনে আগুন দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু সারা রাত্রি ধরিয়া যাহার জ্বর হয়, সে প্রত্যূষে বিছানা হইতে উঠিতেও পারে, গরু-বাছুরের সেবাও করিতে পারে, এবং অন্যান্য যাবতীয় গৃহকার্য্য করিতেও তাহার বাধে না,—পারে না শুধু রাঁধিয়া ছু'টা ভাত খাইতে, আর অবসর সময়ে আগেকার দিনের মত পাড়া প্রতিবাসীদের বাড়ী বেড়াইতে।

ঘরের কাজকর্ম্ম সারিয়া যেটুকু সময় থাকে, হয় সেটুকু শুইয়া থাকে, নয় ত বসিয়া বসিয়া সূতা কাটে। সূতা কিন্তু আগের দিনের মত ভাল কাটা হয় না। হয় তাহা মোটা বেয়োর, নয় ত বা ঘন ঘন ছিঁড়িয়া যায়।

সেদিন দুপুরবেলা বসিয়া বসিয়া জগদম্বা সূতা কাটিতেছিল। উমার মা আসিয়া বসিল। দু'এক কথার পর বলিল,—"শরীরটা তোমার বৌদি' বড্ড খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে! তখন অত ভুগ্‌ছিলে,—জরের ওপর জর—তা'তেও কিন্তু এমন যাচ্ছেতাই হ'য়ে যাও নি। এই পাঁচ সাত দিনেই যেন একেবারে তোমায় ভেঙ্গে দিয়েছে! আচ্ছা, কখন্ তোমার জর আসে বৌদি'? তুমি বাপু একটা ওষুদ্ টোষুদ্ খাও, নইলে চল্‌বে না।"

"খাব এইবার।"

"হ্যাঁ, তাই খাও, নইলে—হ্যাঁ, খাঁদুর আর কোন খবর্ টবর্ পাওনি বৌদি'? কারুকে ন'গাঁয়ে পাঠাওনি?"

"হ্যাঁ, মর্‌চি নিজের জ্বালায়,—খাঁদুর খবর! ওটাকে নিয়ে গেছে, না বেঁচিছি।"

"ছেলেটা জর নিয়ে গেল, কেমন রইল—

"যেমন থাকে থাক্ বোন্, আমার আর ওসব ঝক্কি ভাল লাগে না। তা'র জন্যে কি আমায় কম জালাতন হ'তে হ'ত? এই দেখনা, ক'দিন নেই ত,—এই কত সুতোর নলি হ'য়েছে! সে থাকলে কি এর একটুও থাক্‌তো? আর বাড়ীঘর নৈরেকার কর্‌বার শিরোমণি ছিল! কঞ্চি কেটে, বাঁশ কেটে, ছাই-ভস্ম, কাদা-মাটি, ইট-পাট্‌কেল্, সুতো, দড়ি, ন্যাকড়া, কাগজে ঘর-দোর একেবারে একাকার ক'রে রাখতো! আর তা' ছাড়া, তা'র জন্যে কি কোন কাজ ক'ত্তে পেতুম, উমার মা? দুদণ্ড ভগবানের নাম ক'ত্তেই যার সময় পেতুম না! দিনের মধ্যে হাজার বার তা'র 'দিদ্‌মা গো'র সাড়া দিতে দিতেই প্রাণ ওষ্ঠাগত হ'ত! শত্তুরকে নিয়ে গেছে—না বেঁচেছি!"

আরও খানিকক্ষণ একথা সেকথার পর উমার মা উঠিয়া গেল। জগদম্বাও সূতা কাটা বন্ধ করিয়া উঠিয়া ঘরের মধ্যে যাইয়া শুইয়া পড়িল। আল্‌নায় খাঁদুর একখানি নীল রংকরা ধুতি ঝুলিতেছিল। এবার পূজার সময় দোকানে ঐরকম কাপড় দেখিয়া খাঁদু বড় বায়না ধরিয়াছিল, তা'ই জগদম্বা এগার-আনা পয়সা দিয়া তাহা কিনিয়া দিয়াছিল। জগদম্বা উঠিয়া সেখানি ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া কোঁচাইয়া আবার আল্‌নার উপর রাখিয়া দিল। তা'র পর নিজের মনেই বলিল,—"আহা, কাপড়খানার জন্যে ম'রে যায়, তা' পরতে পাবে না, ফেলে গেল! আর এই দেখ, বই সেলেট্ পর্য্যন্ত নিয়ে যায় নি! তাড়াতাড়ি ছেলেকে নিয়ে যেতে পারলে যেন হয়" বলিয়া সেগুলিও গোছাইয়া ভাঙ্গা তোরঙ্গটার মধ্যে রাখিতে রাখিতে বলিল,—"দেখেছ একবার, সেদিন কান্নাকাটি ক'রে, পয়সা দু'আনা নিয়ে গিয়ে এই খাতা আর পেনসিল্ কেনা হ'য়েছে, আর এই সব ছাঁই-পাঁশ, চিত্তির্ বিচিত্তির্, আঁক্-জোঁক্ কেটে কাগজগুলো সব নষ্ট করেচে! আহা, বাছা নিয়ে যেতেও পারলে না!"

লীলা, প্রমথ ও খাঁদুর একসঙ্গে একখানি ফটো ছিল। জগদম্বার শূন্য বাক্সের মধ্যে লক্ষ্মীর কৌটা ও এই ফটোখানি থাকিত। মধ্যে মধ্যে জগদম্বা ছবিখানি বাহির করিত। আজ সকালে সেখানি বাহির করিয়া বিছানার তলায় রাখিয়াছিল। সেখানি এখন হাতে করিয়া আবার শয্যায় আসিয়া শুইয়া পড়িল।

উঠান হইতে কে ডাকিল,—"খুড়ীমা ঘরে আছ নাকি গো?"

তাড়াতাড়ি বুকের উপর হইতে ছবিখানি সরাইয়া বালিসের তলায় রাখিয়া উঠিয়া বসিল, এবং বাহিরের দিকে চাহিয়া বলিল,—"কে রে, বোষ্টুম বৌ?—আচ্ছা, তোর আক্কেল কি বল্ দেখি? আজ চার দিন হোল, তোর মোটে দেখাই নেই। যখনই যাই, তখনি গিয়ে দেখি ঘরে তালা বন্ধ। কোথায় ছিলি এত দিন?"

বোষ্টুম বৌ দুয়ারের বাহিরে বসিয়া বলিল,—"সে কথা আর বোলো না মা। মনে কোরো না যে বোষ্টুম বৌ যায় নি। ন'গাঁ, মণিপুর, আজাগাঁ—ভিক্ষের জন্যে এ ত' আমাকে নিত্যুই যেতে হয় মা। ন'গাঁয়ে তা'র পর্‌দিনই আমি গিয়েছিলুম,—খবরও এনেছি, কিন্তু খুড়ী-ঠাকরুণ গাঁয়ে আর এসে পৌঁছুতে পারি নি। পথেতেই মা এমন

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

জ্বর এলো যে আর দাঁড়াতে পাল্লুম না। ঐ মণিপুরে ভাসুর পোর ঘরেই কষ্টে সৃষ্টে গিয়ে পড়লুম। তারপর, রাত্তির থেকে একেবারে বেধড়ক জ্বর! এই তিন দিন পরে আজ সকালে জ্বরটা ছেড়েছে খুড়ীমা। তাই ভাবলুম, আহা, খুড়ীমা ভেবে সারা হচ্ছে, আস্তে আস্তে এইটুকু গিয়ে খবরটা একবার দিয়ে আসি। নইলে পরে—

"ছেলেটা কেমন আছে বল্ দেখি ?"

"না, খাঁদু তোমার ভাল আছে। ডাক্তার দেখাচ্ছে, ওষুধ-পত্তর খাচ্চে—

"ওষুধ-পত্তর খাচ্চে! তাহ'লে এখনো অসুখ সারে নি ?"

"না, অসুখ সেরে গেছে। সেই দিন পত্তি করেছে।"

"তা' পেরমথ তোকে চিন্‌তে পারলে ত? খাঁদু তোকে দেখে কিছু বল্লে না ?"

"জামাইবাবু তখন ঘরে ছিল না, কাচারী গ্যাছ্‌লো। বৌটীত আর আমাকে চেনে না। খুব রূপসী বৌ হ'য়েছে জামাইবাবু এবার! রূপ আর গায়ে ধরে না! তা' আমি যেমন ভিক্ষে কত্তে গিছি, ভিক্ষে চাইলুম্। বৌটী ব'ল্‌লে,—'ভিক্ষে দিতে নেই গো, ছেলের আমার অসুখ'। দেখ্‌লুম—খাঁদুকে কোলে ক'রে বিছানার ওপর ব'সে ব'সে বাতাস্ কচ্চে। একগাছি—

বাধা দিয়া জগদম্বা জিজ্ঞাসা করিল,—"খাঁদুকে কোলে ক'রে ব'সে বাতাস কচ্চে ?"

"হ্যাঁ গো। একগাছি সোনার হার খাঁদুর গলায় পরান। বোধ হয়, বৌয়েরই হার,—দু'নলি ক'রে পরিয়ে দিয়েছে। মাথার শিওরে—

"নিজের হার খাঁদুর গলায় পরিয়ে দিয়েছে!"

"হ্যাঁ। মাথার শিওরে একখানা রেকাবিতে বেদানা, বিলাতী খেঁজুর, বিস্কুট্, আরও সব কি র'য়েছে।"

"তুই আর কা'রো বাড়ী গিয়ে পড়িস্ নি ত ?"

"কি যে বলে খুড়ীমা তা'র ঠিক নেই। পাঁচ বছর বয়েস থেকে মায়ের সঙ্গে ন'গ্গারে ভিক্ষেয় যাচ্চি। জামাই-বাবুদের বাড়ী আর আমি চিনি না! একেবারে সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের নাগোয়া বাড়ী!"

"হ্যাঁ, সেই বাড়ীই বটে। আঃ খাঁদু তোকে দেখ্‌তে পেলে না ?"

"তোমার খাঁদুও ত আমায় তেমন চেনে না গো! তারপর, আমি একটু জল চাইলুম। এক ডেলা মিছরী আর এক ঘটি জল দিয়ে বৌটী বল্‌লে,—"এস বাছা আর একদিন। ছেলের আমার অসুখ সারলে একদিন এসে ভিক্ষে নিয়ে যেও। ক'দিনের পর আজ দু'টী পত্তি দিয়িছি মা, আজ আর ভিক্ষেটা দেবো না। এখনো ওষুধ—।"

"দিদ্‌মা!"

চমকের প্রথম বেগ্ কাটিতে না কাটিতে, জগদম্বা দেখিল, নূতন ভেল্‌ভেটের সুট্ ও সোনার হারে সজ্জিত হইয়া খাঁদু উঠানের মাঝখানে দাঁড়াইয়া বলিতেছে,—"শীগ্‌গীর উঠে এসে দেখ না, কে আস্‌চে! গরুর গাড়ী ক'রে তোমাকে—"

কথার শেষ হইল না। সঙ্গে সঙ্গেই একটী ষোল সতের বৎসরের মেয়ে, লাল পাড়ের একখানি সাড়ী পরিয়া উঠান আলো করিয়া প্রবেশ করিল এবং দাওয়ার উপর উঠিয়া তাহার অনাবৃত মুখ জগদম্বার পায়ের উপর রাখিয়া বলিল,—"কি অপরাধ করেছি মা, যে মেয়েকে তোমার এত শাস্তি দেবে ?"

বোষ্টুম বৌ অবাক হইয়া গিয়াছিল, এতক্ষণে তাহার বাক্ ফুটিল—"ও খুড়ীমা, জামাইবাবুর নতুন বৌ যে গো!"

বিন্দু তেমনি ভাবেই জগদম্বার পায়ের উপর মুখ রাখিয়া বলিতে লাগিল,—"দিদি সগ্‌গে গেছে, কিন্তু আমিও ত তোমার মেয়ে মা। কি অপরাধে মায়ের সেবা থেকে তুমি আমায় বঞ্চিত করবে? পেটে জন্মাইনি, তা' সে অপরাধ আমার, না ভগবানের, তুমিই তা' আমাকে ব'লে দাও। তুমি মাথার ওপর না থাকলে, আমি খাঁদুকে কেমন ক'রে মানুষ ক'রে তুলবো? তাই, তোমার খাঁদুই তোমাকে আজ নিতে এসেছে মা; বল, তার বাড়ীতে তুমি যা'বে কি না ?"

রক্তশূন্য শীর্ণ হাতখানি দিয়া বিন্দুকে ধরিয়া উঠাইয়া জগদম্বা ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল,—"এখানকার বাড়ী ঘর—?"

বিন্দু খাঁদুকে কোলে তুলিয়া লইয়া বলিল,—"সে সব-ব্যবস্থাই আমি ক'রতে পারবো মা; তুমি শুধু তোমার ওপর আমার মেয়ের অধিকারটুকু দাও।"

জগদম্বা বলিল,—"দেবার আগেই, সে ত তুমি জোর ক'রে আদায় ক'রে নিয়েছ! খাঁদু আমার যখন তোমায় ভালবেসেছে, মা ব'লে যখন তোমার কোলে তা'র জায়গা ক'রে নিয়েছে, মেয়ের দাবী তখন ত মা তোমার আপ্‌না হ'তেই জন্মে গেছে!"

* * * *

পরদিন প্রাতে একহাতে তসরের কাপড় ও হরিনামের মালা এবং আর এক হাতে সুতার নলি, টেকো, তুলার পাঁজ প্রভৃতির পুঁটুলি লইয়া, সকলের আগেই যখন জগদম্বা গাড়ীতে আসিয়া উঠিয়া বসিল, তখন সদর দরজার সাম্‌নে দাঁড়াইয়া বিন্দু উমার মা'র হাতে বাড়ীর চাবি দিয়া বলিল,—"তা'হলে এই দু'চারটে দিন একটু দেখো পিসিমা; এরি মধ্যেই লোক পাঠিয়ে আমি সব ব্যবস্থা ক'রে ফেল্‌বো।"

সেই সময় বোষ্টম বৌ আসিয়া পিছন হইতে বলিল,— "মাকে পাক্‌ড়া ক'রে শুধু নিয়ে গেলেই ত হ'বে না দিদিমণি, আমার ভিক্ষের কথাটা মনে আছে ত?"

পিছন ফিরিয়া বিন্দু বলিল,—"হ্যাঁ দিদি, আছে বৈ কি" বলিয়া আঁচল হইতে একটা টাকা খুলিয়া বোষ্টুম বৌয়ের হাতে দিল।

"কি আর বলবো দিদিমণি, তোমার মত এম্‌নি মন যেন সকলকারই হয়। রাধারাণী তোমার ভাল করুন।"

খাঁদুকে কোলে তুলিয়া লইয়া বিন্দু বলিল,—"আশীর্ব্বাদ কর দিদি, আজ যেমন আনন্দ পেলুম, এই রকম আনন্দ যেন চিরকাল তোমার রাধারাণী দেন।"

খাঁদু তখন বিন্দুর কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপি চুপি বলিল,—"গোয়ালের আড়া থেকে আমার ছিপ্‌ গাছটা পেড়ে দেবে?—নিয়ে যাবো।"

ভিক্ষা

হুমায়ুন কবির

তোমার কুসুমরাশি—আমি তার একটী পল্লব
নীরবে মাগিয়াছিনু। আকাশের কত শত তারা,—
তাহারি একটী যদি মোর প্রাণে তোলে গীতিরব,
আমার অন্তর ভরি' সঙ্গোপনে ঢালে সুধাধারা,
আকাশ করে না রোষ। তোমার কাননে আসি আমি
একটী কুসুম যদি হৃদয়ে লুকায়ে নিয়ে যাই,
কেহ জানিবে না কথা, অকস্মাৎ যাবে নাকো থামি'
দক্ষিণ পবন বনে, শুক্লা শশি চাহিবে বৃথাই!
তুমি জানিবে না কিছু, শুধু মোর জীবন ভরিয়া
উঠিবে বাজিয়া বাঁশী, পরাণের আঁধার হরিয়া
আলোক উঠিবে হাসি'; ভেসে চলে যাবে মেঘদল,
ঝলিবে নয়ন কোণে মুক্তাবিন্দুসম অশ্রুজল!
হৃদয়ের বেদনায় হৃদয়ে উঠিবে বাজি গান
হতাশা ভুলিয়া গিয়া স্বপ্ন শুধু দেখিবে পরাণ!



(৪)

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী

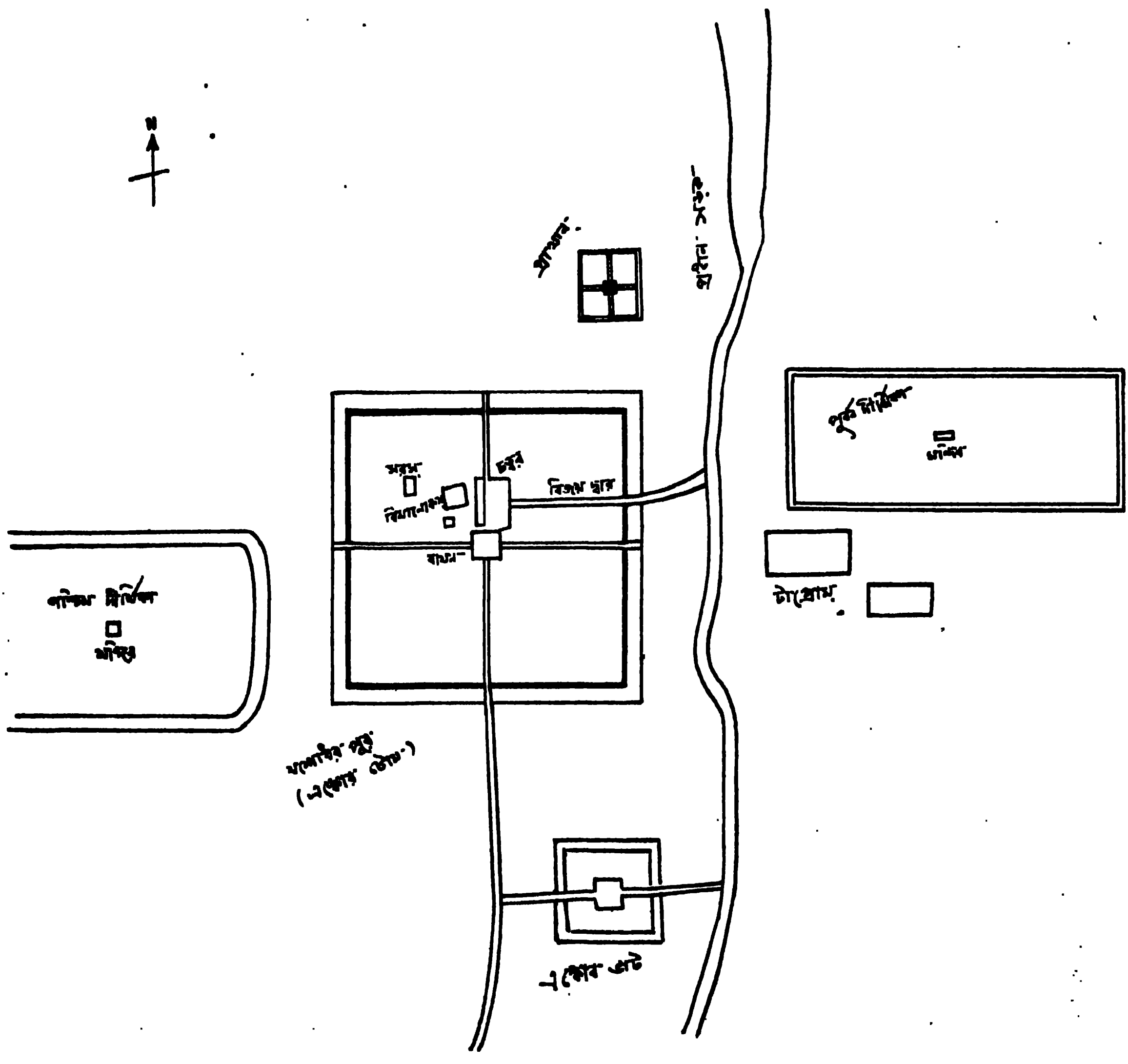
প্রাচীন যশোধরপুরের প্রাচীরের বাইরে যে-সব ভগ্নাবশেষ আছে তার ভিতর টা-প্রোম (Ta-prohm) এবং প্রা-খানই (Pra Khan) উল্লেখ যোগ্য। যশোধরপুরের বিজয়-দ্বার দিয়ে বেরিয়ে আমরা টা-প্রোমের উদ্দেশ্যে যাত্রা কর্‌লাম। বিজয়-দ্বারের অনতিদূরেই প্রধান সড়ক। দেখ্‌লেই মনে হয় প্রাচীনকালে এটা ছিল রাজপথ। যশোধরপুরের পাশ দিয়ে এটা বরাবর উত্তরমুখে গিয়েছে। এই পথ দিয়েই কম্বোজের উত্তরভাগের নানাস্থানে এবং প্রত্যন্ত দেশ সমূহে পৌছা যায়। এই রাজপথের দুই পাশে এখনো নানা স্থানে পুরাণো মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। এই সব মন্দিরের অধিনায়কদের উপর যে সেকালে রাজপথ-সংরক্ষণের কর্ত্তব্য ন্যস্ত ছিল, এবং দেশের বিপন্ন অবস্থায় অনুধারণ ক'রে তাঁরা দেশ রক্ষার ভার কতকটা নিতেন তা' স্বতঃই মনে হয়।

পুরাণো পথ বেয়ে যেতে ইতিহাসের অনেক কথাই মনে পড়ে। এই পথ দিয়ে কম্বোজের কত অভিযানই না গিয়েছে! একদিন যখন কম্বোজ-সেনানী দিগ্বিজয় ক'রে এই পথে ফিরত, তখন যশোধরপুরের পুরবাসিনীরা নগরের



টা-প্রোম
—
মন্দিরগাত্রের
শিল্পকার্য্য

বিজয়-দ্বারে উপস্থিত হ'য়ে কত মঙ্গলঘণ্টাই না বাজিয়েছেন—বিজয়ী বাহিনীর উপর কত পুষ্পবর্ষণই না করেছেন। যুদ্ধ-প্রত্যাগত দয়িতের মিলন প্রতীক্ষায় তাঁরা এসে এই নিবিড় বনে আচ্ছন্ন। প্রাচীন অশ্বথ বহু শাখা প্রশাখা বিস্তার ক'রে তার বর্তমান দুরবস্থার অভিব্যক্তি স্বরূপ দাঁড়িয়ে আছে।



প্রাচীন যশোধরপুরের (বা এঙ্কোরের) নক্সা

রাজপথের পাশে দাঁড়াতেন ;—অনেকের বুক উৎসাহে ও আনন্দে ভ'রে উঠ্‌ত, অনেকে দুঃখ-দীর্ণ হৃদয়ে সাশ্রুনেত্রে ঘরে ফিরে যেতেন। সেই উৎসাহ-উদ্দীপনা-হর্ষ-উদ্বেগ-প্লাবিত রাজপথ আজ জনকোলাহল-শূন্য—তার দু'ধার

এই অশ্বথ গাছের পাশ দিয়ে বনানী ভেদ ক'রে সঙ্কীর্ণ পথ বেয়ে আমরা টা-প্রোমের ভগ্নাবশেষ দেখ্‌তে চল্‌লাম। নগরের বিজয়-দ্বার থেকে টা-প্রোম বেশী দূরে নয় ; নগর-প্রাকার থেকে এক মাইলের বেশী হবে না—পূর্ব্বদিকে।

ইন্দোচীন ভ্রমণ

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী



প্রা-খান—পূর্ব্বাংশ

টা-প্রোমের উত্তরে পুরাকালের বিশাল দীর্ঘিকা ;—দক্ষিণ পশ্চিম কোণে পুরাতন দুর্গের জীর্ণস্তূপ। টা-প্রোম মন্দির কোন্ দেবতার উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত হয়েছিল তা' বলা যায় না। তবে প্রোম-যে "ব্রহ্ম" কথার রূপান্তর তা'তে কোনো সন্দেহ নেই। টা-প্রোম মন্দির রাজা জয়বর্ম্মণের রাজত্বকালে (১১৮৬-১২২১ খৃঃ অঃ অনুমান) নির্ম্মাণ করা হয়েছিল। তখন কম্বোজের গৌরবের যুগ চল্‌ছে। জয়বর্ম্মণ নিজে বৌদ্ধমতাবলম্বী না হ'লেও তিনি বৌদ্ধধর্ম্মকে শ্রদ্ধা ক'রতেন। কম্বোজের উন্নতিকল্পে তিনি অনেক কাজ করেছিলেন। টা-প্রোম মন্দিরে যে সংস্কৃত লেখা পাওয়া গিয়েছে তা'তে জানা যায় যে, তিনি কম্বোজের নানাস্থানে শতাধিক দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করে-ছিলেন। এ ছাড়া বহু দেবমন্দিরও নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন। টা-প্রোম মন্দির তাঁর মাতৃদেবীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়েছিল, এবং এই মন্দির পরিচালনার ভার পড়েছিল রাজকুমার সূর্য্যকুমারের উপর।

টা-প্রোম মন্দিরের ভগ্নাবশেষ প্রায় এক বর্গ মাইল স্থান অধিকার ক'রে রয়েছে। চারিদিকে পরিখা। প্রাচীন সেতু অতিক্রম ক'রে পূর্ব্বদ্বার দিয়ে টা-প্রোমের ভিতর প্রবেশ করলাম। পূর্ব্বে এই সেতুর দু'ধারে যে সুন্দর বেষ্টনী ছিল তা' এখন ধ্বংস হয়েছে। মন্দিরের বাইরের প্রাচীরও এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত। প্রকৃতির অত্যাচার থেকে মন্দির উদ্ধার করবার এ পর্য্যন্ত কোনো চেষ্টা হয় নি। কোথাও লতাগুল্মে ভগ্ন-চূড়া আচ্ছাদিত হ'য়ে রয়েছে—কোথাও বা তোরণ ভেদ ক'রে অশ্বত্থগাছ উঠেছে। মন্দির প্রাঙ্গণ বনে পরিণত হয়েছে। এখানে কোনো দেব দেবীর মূর্ত্তি পাওয়া যায় নি। তবে মন্দিরগাত্রের ক্ষোদিত চিত্রে হিন্দুধর্ম্মের অনেক পৌরাণিক কাহিনী অঙ্কিত র'য়েছে। জয়বর্ম্মণের প্রস্তরলেখা থেকে আমরা জান্‌তে পারি যে এই মন্দিরে এক সময় ষাট-সত্তর হাজার লোক পূজা দিতে আস্‌ত। মন্দিরের ভার ন্যস্ত হয়েছিল—আঠারো জন প্রধান পুরোহিত বা অধিকারীর ওপর। তাঁদের অধীনে ২৭৪০ জন সাধারণ এবং ২২৩২ জন সহকারী পুরোহিত এই মন্দিরের কার্য্যে নিযুক্ত থাক্‌তেন। এ ছাড়া মন্দিরে ৬১৫ জন সেবাদাসী ছিল।

টা-প্রোমের মন্দির থেকে বেরিয়ে বনপথ দিয়ে আমরা প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখ্‌তে চল্‌লাম। এটা টা-প্রোমের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত—দুর্গম অরণ্য এ'কে ঘিরে আছে। এর বর্ত্তমান নাম বান্তেই-কেদে (Banteai Kedei) বা পন্তেই-কেদে (Pontcai Kedei)। দুর্গে



বায়ুন—ক্ষোদিত-চিত্র

প্রবেশ করবার জন্ত কোন সুগম পথ না পেয়ে আমরা দুর্গ-প্রাকার প্রদক্ষিণ করেই ফিরতে বাধ্য হ'লাম। পুনরায় বনপথ বেয়ে প্রধান সড়কে এসে পড়লাম।

এঙ্কোর-ভাটে ফিরবার পূর্ব্বে উত্তর ভাগের ধ্বংসাবশেষ দেখে আসাই শ্রেয়ঃ। এর ভেতর উল্লেখযোগ্য টা-প্রোমের নিকটবর্ত্তী দীর্ঘিকা এবং যশোধরপুরের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত প্রা-খান (Prah-Khan)। প্রধান সড়ক বেয়ে উত্তর মুখে যেতে দীর্ঘিকা ও প্রা-খান পথে পড়ে। দীর্ঘিকা টা-প্রোমের পাশে, নগরের বিজয়-দ্বার থেকে খুব

এই দুই দীর্ঘিকাই যশোধরপুরের জল সরবরাহ ক'রত। দু'টী দীর্ঘিকারই মাঝখানে মন্দিরের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান। পূর্ব্ব দীর্ঘিকার মাঝখানে যে মন্দির আছে (Mebon of the Eastern Baray) সেটী রাজেন্দ্রবর্ম্মণের রাজত্বকালে (৯৪৪-৯৪৭ খৃঃ অঃ) নির্ম্মিত হয়েছিল। পশ্চিম দীর্ঘিকার মন্দির (Mebon of the Western Baray) খুব সম্ভবত রাজা যশোবর্ম্মণের সময় (৮৮৯ খৃঃ অঃ) নির্ম্মিত হয়। মন্দিরগুলি এখন ভগ্নস্তূপে পর্য্যবসিত হয়েছে। দু'টী মন্দিরেই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল অনুমান হয়।



বাক্রুয়ন

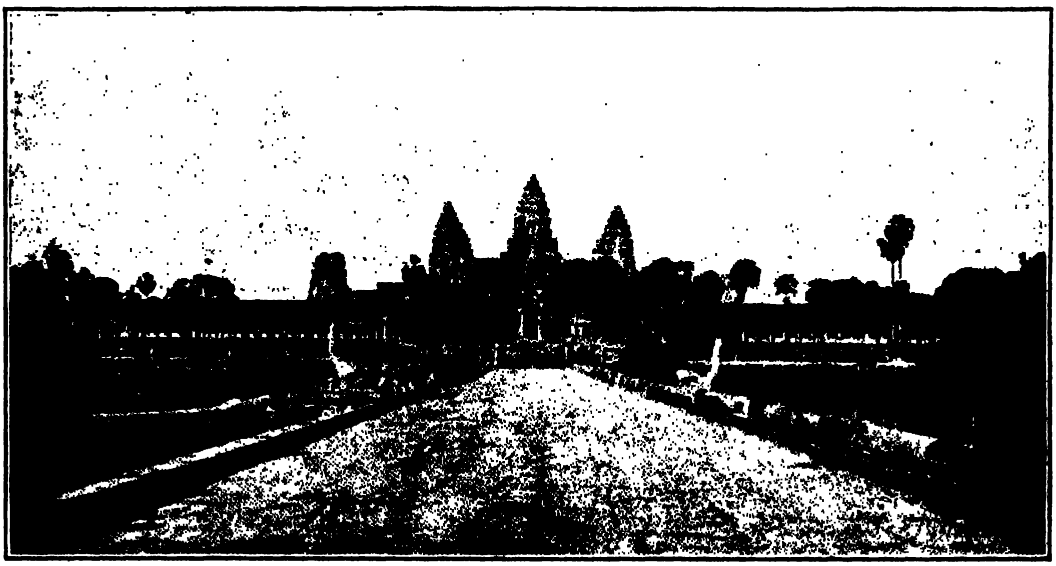
বেশী দূরে নয়। এই দীর্ঘিকাকে পূর্ব্ব বারাই (Eastern Baray) বলা হয়। এ ছাড়া আর একটি দীর্ঘিকা যশোধরপুরের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে বর্ত্তমান। এটীকে পশ্চিম বারাই (Western Baray) বলে। আমরা এই দুই দীর্ঘিকার নাম দোব পূর্ব্ব ও পশ্চিম দীর্ঘিকা। দুইটাই আয়তনে বিশাল এবং স্থানে স্থানে এখনও বেশ গভীর। প্রায় সারা বছরই ঐ সব স্থানে জল থাকে। শীতকালে স্থানে স্থানে শুকিয়ে গেলেও দীর্ঘিকা এখনো সম্পূর্ণ ভরাট হয় নি। জলকষ্টের সময়

পূর্ব্ব দীর্ঘিকার ধার বেয়ে আমরা প্রা-খানে পৌঁছলাম। পূর্ব্বেই বলেছি প্রা-খান খুব প্রাচীন। যশোধরপুর প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে এর নির্ম্মাণ হয়। রাজা জয়বর্ম্মণ (৮০২-৮৬৯ খৃঃ অঃ) প্রা-খানে বসবাস করতেন। তাঁর অধস্তন তিন পুরুষ পরে যশোবর্ম্মণ নূতন রাজপুরীর প্রতিষ্ঠা করেন। অনুমান হয় প্রা-খান বায়ন মন্দিরেরও পূর্ব্বে নির্ম্মিত হয়েছিল। যশোধরপুরের উত্তর-দ্বার দিয়ে বেরিয়েও প্রা-খানে পৌঁছান যায়। প্রা-খান নগর প্রাচীরের বাইরে ঠিক নৈঋত কোণে অবস্থিত। এ রাজপুরীও

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী

কম্বোজের স্থপতিদের চিরন্তন প্রণালীতে নির্ম্মিত হ'য়েছিল। চারদিকে প্রাচীর—তা'র বাইরে পরিখা। এই পরিখা সেতুর ওপর দিয়ে পার হ'তে হয়। প্রাচীরের ভেতরে রাজপুরীর অবস্থান। এখন তা অবশ্য ধ্বংসে পরিণত। প্রা-খানের উদ্ধার-কার্য্য এখনো আরম্ভ হয় নি। সিংহদ্বার বর্ত্তমান আছে। তবে রাজপুরীতে প্রবেশ করবার পথ এমন দুর্গম হ'য়ে পড়েছে যে, দু'পাশে বন পরিষ্কার ক'রে নূতন পথ তৈরী করতে হয়েছে। প্রা-খানের সব অংশ দেখা সম্ভবপর নহে। যতটা আমরা দেখ্‌তে পেলাম তা'তে কম্বোজের গরিমাময় যুগের কথাই মনে হচ্ছে পুরাতন কম্বোজের সবচেয়ে বড় কীর্ত্তিস্তম্ভ। কম্বোজের হিন্দু ইতিহাসের শেষভাগে এঙ্কোর-ভাটের নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হয়। তাই এখনো সেটী ধ্বংস হয় নি—সগর্ব্বে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে।

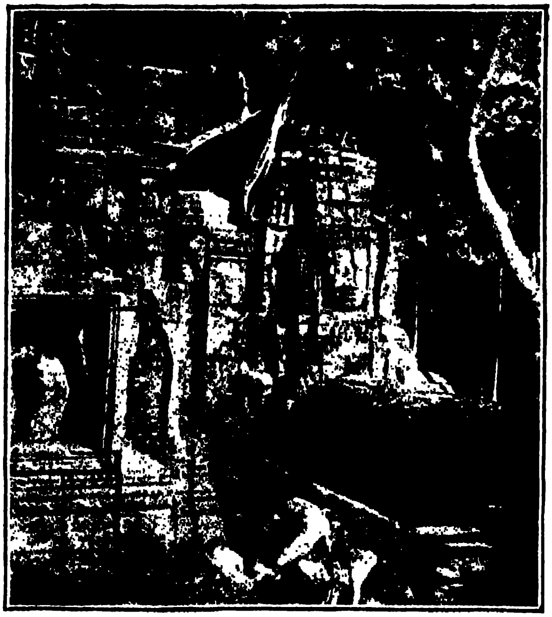
এঙ্কোর-ভাট রাজা সূর্য্যবর্ম্মণের রাজত্বকালে নির্ম্মিত হয়। সূর্য্যবর্ম্মণের রাজত্বকাল ১১১২-১১৬২ খৃঃ অঃ। এই সুদীর্ঘকালের ভেতর তিনি নানাভাবে কম্বোজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। তাঁর সবচেয়ে বড় কীর্ত্তি হচ্ছে এঙ্কোর-ভাট। ভাট কথার অর্থ মন্দির। এঙ্কোর-ভাট বিষ্ণু মন্দির। রাজা সূর্য্যবর্ম্মণ পরম বৈষ্ণব ছিলেন



এঙ্কোর-ভাট

হ'ল। যে যুগে বায়ন নির্ম্মিত হয়েছিল, সেই যুগেই প্রা-খানের প্রতিষ্ঠা। প্রা-খানের ভাস্কর্য্য ও খোদিত-চিত্রের ভেতর আমরা সেই যুগের দক্ষতারই পরিচয় পাই।

প্রা-খান দেখে আমরা যশোধরপুরের উত্তর-দ্বার দিয়ে নগর অতিক্রম ক'রে পুনরায় বায়নের পাশ দিয়ে এঙ্কোর-ভাটের দ্বারে ফিরে এলাম। এঙ্কোর-ভাট ভাল ক'রে দেখ্‌তে অনেক সময়ের প্রয়োজন। তাই এঙ্কোরে আমরা যে সপ্তাহকাল ছিলাম তার ভেতর শেষ তিন দিন আমরা এঙ্কোর-ভাটই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখেছি। এঙ্কোর-ভাটই —এবং সেই জন্য তাঁ'র উপাধি ছিল "পরমবিষ্ণুলোক"। এঙ্কোর-ভাটের নির্ম্মাণ কার্য্য তাঁর রাজত্বকালে আরম্ভ হ'লেও শেষ হ'তে অনেক সময় লেগেছিল। মন্দিরের অনেক অংশ এখনো অসম্পূর্ণ আছে, এবং তা' দেখে মনে হয় যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও (১২২১ খৃঃ অঃ) মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পূর্ণ হয় নি। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগেই কম্বোজে বহিঃ-শত্রুর আক্রমণ ও অন্তর্বিপ্লব সুরু হয় এবং এর অল্পদিন পরেই কম্বোজে হিন্দুরাজত্বের অবসান হয়। তাই এঙ্কোর-ভাটের নির্ম্মাণ



বায়ন-তোরণের অংশ

কার্য্যও আর শেষ হয় নি। এ ছাড়া এঙ্কোরে আরও অনেক মন্দির অসমাপ্ত রয়েছে।

এঙ্কোর-ভাটের পাঁচটী চূড়ার ভেতর দু'টী অসম্পূর্ণ; কিন্তু তবুও মন্দিরের সবটা দেখ্‌লে অবাক্ হ'তে হয়। যশোধরপুরের প্রাকার থেকে এঙ্কোর-ভাট খুব বেশী দূরে অবস্থিত নয়। সুবৃহৎ পরিখা সেতুর ওপর দিয়ে পার হ'য়ে মন্দিরের চত্বরে পৌঁছতে হয়। এই পরিখাটি সুগভীর। এখনো জলে ভরা। দু' একটী অংশমাত্র ভরাট হয়েছে। সেতুর কার্য্য শেষ হ'তে পারে নি ব'লে অনুমান হয়। সেতুর দু'দিকের বেষ্টনী অসমাপ্ত র'য়ে গেছে। সুপ্রশস্ত মন্দির চত্বর। খণ্ড খণ্ড প্রস্তর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হ'য়ে রয়েছে। স্থপতি সে-গুলিকে মন্দিরের কার্য্যে লাগাবার যে আর সময় পায়নি তা' দেখলেই মনে হয়।

মন্দির নানা স্তরে বিভক্ত। প্রধান প্রতিষ্ঠানে পৌঁছতে গেলে বহু চত্বর ও অলিন্দ অতিক্রম ক'রে উচ্চ সোপান বেয়ে উঠ্‌তে হয়। প্রতি চত্বরে দেব-সেবার জল রাখবার জন্ত দ্রোণী ছিল। মন্দিরে প্রধান প্রতিষ্ঠান ছাড়া আরও বহু ছোট প্রতিষ্ঠান ছিল। মন্দিরের প্রাচীর গাত্র ক্ষোদিত চিত্রে পরিশোভিত। কোথাও রামায়ণের কাহিনী, কোথাও পৌরাণিক কথা, কোথাও নরকের চিত্র এবং কোথাও বা মহাভারত এবং হরিবংশের ধর্ম্ম-কাহিনী ভাস্করের সুনিপুণ হস্তে মূর্ত্তি পেয়েছে। প্রতি তোরণ নানা ভাস্কর্য্যে শোভিত। দেখ্‌লেই মনে হয় যেন কম্বোজের শিল্পীদের মনের পটে তা'দের অদূর ভবিষ্যতের বিষাদকাহিনী প্রতিভাত হয়েছিল। তাই এঙ্কোরের এই শেষ কীর্ত্তির ভেতর তা'দের প্রতিভার চরম পরিচয় দিয়ে গেছে। বায়নে যে কলানৈপুণ্য পরিলক্ষিত হয় তা' অনেকস্থলে এঙ্কোর-ভাটের চেয়ে উচ্চাঙ্গের হ'লেও এঙ্কোর-ভাটে নানা শক্তির একত্র সমাবেশ হয়েছে।

পূর্ব্বেই বলেছি যে এঙ্কোর-ভাটের অনতিদূরে অল্পদিন থেকে একটী বৌদ্ধভিক্ষুসংঘ স্থাপিত হয়েছে। এঙ্কোর যখন শ্যামদেশের অন্তর্ভূ'ত হয় তখন থেকেই বৌদ্ধদের প্রতিপত্তি একটু বেড়েছে। এঙ্কোর-ভাটেও এ'দের হাত কিছু পড়েছে এবং মন্দিরের দু' একটী কক্ষে বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত হয়েছে। অবশ্য এ স্থাপনার ভেতর কোন প্রাণের সাড়া নাই।

কিছুদিন থেকে সাইগণের ভারতীয় বণিকদের ভেতর একটু ধর্ম্মভাব জেগেছে এবং তাঁরা কিছু অর্থব্যয় ক'রে এঙ্কোর-ভাটে নিয়মিত ভাবে প্রদীপ জ্বালবার ব্যবস্থা করেছেন। যে প্রদীপ সাতশো বছর ধ'রে নির্ব্বাপিত ছিল তা' আবার জ্বলেছে। তাই আশা হয় ভারতসন্তানদের চেষ্টায় আবার এঙ্কোরের ভাঙ্গা মন্দিরে নূতন ক'রে দেবতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হবে। মন্দির-চত্বর হয়ত আবার ভারত-সন্তানের কলধ্বনিতে মুখরিত হ'য়ে উঠ্‌বে।

এঙ্কোর-ভাট দেখেই আমাদের এঙ্কোর দেখা শেষ ক'রতে হ'ল। ভারতের প্রাচীন ঔপনিবেশিকদের যে কীর্ত্তি ছ'মাস ধ'রে দেখ্‌লেও চোখ তৃপ্ত হয় না আমাদের বাধ্য হ'য়ে তা' এক সপ্তাহে শেষ ক'রতে হ'য়েছে। তবে যা দেখেছি তা'তে স্তম্ভিত হ'য়েছি। হাজার বছর পূর্ব্বে ভারত-সন্তানেরা এই সাগর পারে এসে ভারত-মাতার যে বিজয়-স্তম্ভ স্থাপনা ক'রেছিলেন তা' কালের অনেক

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী

অত্যাচার সহ্য ক'রে আজও দাঁড়িয়ে আছে—শুধু ভারতের গৌরব কাহিনীর কথাই মনে ক'রিয়ে দিচ্ছে। সমুদ্র পারের বর্ব্বরজাতিদিগকে তাঁরা কার্য্যদক্ষ ক'রেছিলেন। তা'দের ভেতর স্থপতির ও শিল্পীর সৃষ্টি হ'য়েছিল—কলা-নৈপুণ্য তা'দের কাজের ভেতর ফুটে উঠেছিল। অভ্যাগত দীক্ষাগুরুর নিকট তা'রা শিক্ষালাভ ক'রেছিল ও সে শিক্ষাকে ফলবতী ক'রতে পেরেছিল। তা'ই তা'দের নামও স্মরণীয় হ'য়ে রয়েছে।

এঙ্কোরের কীর্ত্তি দেখ্‌লে আশ্চর্য্য হ'তে হয়—তা'র প্রধান কারণ যে এর প্রতি মন্দির ও রাজপ্রাসাদ প্রস্তরে নির্ম্মিত। এই সব প্রস্তর প্রায় ৪০ মাইল দূরবর্ত্তী পাহাড় থেকে সংগৃহীত হ'য়েছিল। পাহাড়ের যে স্থান থেকে প্রস্তর সংগৃহীত হ'ত তা' খুঁজে বের করা হয়েছে। যশোধরপুর ও এঙ্কোর-ভাট নির্ম্মাণ ক'রবার জন্য প্রস্তর সংগ্রহ ক'রতে যে লোকবলের আয়োজন ক'রতে হ'য়েছিল তা' শুধু বিশেষ পরাক্রমশালী রাজার পক্ষেই সম্ভবপর।

সে-রাজার ঐশ্বর্য্য আজ শুধু কল্পনার বস্তু। শুধু প্রস্তরফলকে তা'র গৌরব আজ নিবদ্ধ। কম্বোজের দুর্ভেদ্য বনানীর ভেতর তা'র কীর্ত্তিস্তম্ভ আজ লুক্কায়িত। মানুষের কত অভিযান কম্বোজের বুকের ওপর দিয়ে গিয়েছে। নিত্য নূতন জাত তা'র বুকের ওপর নূতন আবাসস্থল তৈরী ক'রেছে—নূতন নগর নির্ম্মাণ ক'রেছে। কিন্তু তেমন আর ক'রতে পারে নি। প্রাচীন যশোধরপুরের শ্রী এতটুকুও তা'রা ফিরিয়ে আন্‌তে চেষ্টা করে নি। বিপ্লবের দিনে এ-যশোধরপুরের মন্দিরে মন্দিরে পূজারীর হাত থেকে যে পূজার শঙ্খ লুটিয়ে ধূলায় পড়েছিল তা' আর বাজে নি। মন্দির-চূড়ার কাজ ক'রতে ক'রতে স্থপতি যেখানে থেমে গিয়েছিল—সে কাজ সমাপ্ত ক'রবার জন্য আর কেউ সেখানে হাত দেয় নি। চিত্রকর তা'র ক্ষোদিত চিত্র অর্দ্ধসমাপ্ত রেখে গেছে। কোথাও বা মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য শুধু আরম্ভ হ'য়েছিল—তা' আর শেষ হয় নি। নির্ম্মাণকল্পে যে-প্রস্তর সংগ্রহ করা হ'য়েছিল তা' মন্দির-প্রাঙ্গণে স্তূপাকার হ'য়ে রয়েছে। সাতশো বছর পূর্ব্বে যেখানে সে-গুলি ছিল সেখানেই রয়েছে—



এঙ্কোর-ভাট—ক্ষোদিত চিত্র

কা'রো হাত তা'তে পড়ে নি। যা'দের কলধ্বনিতে যশোধরপুর একদিন মুখরিত হ'ত তা'দের এমন কেউ নেই—যে এ-ভগ্নপুরীতে একটা প্রদীপ দেয়। কোন্ দেবতার অভিশাপে কম্বোজের এ-মহানগরীর যে এই শোচনীয় দশা হ'য়েছে তা' মানুষ বল্‌তে পারে না।

আবার যদি কোন ভারত-সন্তান কম্বোজের এই সমুদ্রতীরে পদার্পণ করেন, অনুরোধ করি, যেন তিনি এই বনপথ বেয়ে এসে যশোধরপুরীর মন্দির-প্রাঙ্গণে তাঁর পূজা দিয়ে যান। সাতশো বছর ধ'রে কোন ভারতীয় পর্য্যটক এ-পথে আসেন নি—ভারতের এ-কীর্ত্তিস্তম্ভের উদ্দেশ্যে তাঁর নমস্কারও জানিয়ে যান নি। ভারতের এ 'অতীত গৌরব কাহিনী'কে যদি নূতন ক'রে শোনাতে চান্—উৎসাহের আগুন যদি আবার ছড়িয়ে দিতে চান্—অনুরোধ করি কম্বোজের এই জনহীন পথ বেয়ে যেন তাঁরা দুর্ভেদ্য বনানীর ভেতর তাঁদের কৃতী পূর্ব্ব-পুরুষের স্মৃতি-রেখা দর্শন ক'রে যান। ভারত ইতিহাসের এক বড় গৌরবের কাহিনী তা'র ভেতর নিহিত রয়েছে।



এ যুগের ওমর

সেই নিরালা:পাতায় ঘেরা বনের ধারে শীতল ছায়,
খাদ্য কিছু পেয়ালা হাতে ছন্দ গেঁথে দিনটা যায়:;
মৌন ভাঙি মোর পাশেতে গুঞ্জে তব মঞ্জু-সুর—
সেই-তো সখি স্বপ্ন আমার সেই বনানী_স্বর্গপুর।

—শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

[শিল্পী—শ্রীচঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়]

"সাহিত্য-ধর্ম্মের সীমানা"-বিচার

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চী

কুরুক্ষেত্র-সমরে দ্রোণবধের পর অর্জ্জুন শোক, বিষাদ ও আত্মগ্লানিতে নিতান্ত মুহ্যমান হ'য়ে পড়েছিলেন। তাঁ'কে সান্ত্বনা ক'রতে শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরকে অনেক বেগ পেতে হ'য়েছিল। আমাদের বঙ্গসাহিত্য-রণক্ষেত্রের স্বয়ং-নির্ব্বাচিত গাণ্ডীবী বৃদ্ধ সাহিত্যগুরুর প্রতি বাণ নিক্ষেপ ক'রে, সেরূপ বিষাদগ্রস্ত হ'য়েছেন কিনা জানিনে। যদি হ'য়ে থাকেন তাঁ'কে আশ্বস্ত ক'রতে পারি, তিনি নিশ্চিন্ত হোন। তাঁ'র হাতের গাণ্ডীব-টঙ্কারে তাঁ'র নিজের কানে তালা ও শিশু-দর্শকদের চমক লাগলেও তা' বস্তুত লালশালুমণ্ডিত বংশখণ্ডনির্ম্মিত ক্রীড়াগাণ্ডীবমাত্র। বৃদ্ধ রণগুরুর সুশুভ্র কেশরাজি বা সুশুভ্রতর যশোরাশি তাঁ'র বাণনিক্ষেপে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি।

ব্যাপারটা একটু খুলে বলা দরকার। কিছুদিন হ'তে বাংলা-সাহিত্যক্ষেত্রের অঙ্গণে আর্টের স্বাধীনতার নামে নানারূপ উচ্ছৃঙ্খলতার যে তাণ্ডব-নৃত্য সুরু হ'য়েছে, তা' সকলেই লক্ষ্য ক'রেছেন। স্বাধীনতার অর্জ্জন ও পরিচালনে যে সুদৃঢ় সংযম ও বলিষ্ঠ সুস্থ বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োজন তা'র অভাব বশতই এইরূপ বিপরীত ব্যাপারের উদ্ভব হ'য়েছে। যৌন-সম্মিলনের যে-অংশ, মানুষ, স্বাভাবিক হ্রী বশতঃ চিরদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে যথাসম্ভব প্রচ্ছন্ন রেখে এসেছে,—বর্ব্বর পরুষহস্তে তা'র আবরণ উন্মোচন ক'রে এঁরা বিজয়গর্ব্বে স্ফীত হ'য়ে উঠেছেন। এঁদের কেউবা, আপনাকে আর্ট-জগতের নূতন মহাদেশ আবিষ্কার-কর্ত্তা কলম্বস্ ব'লে মনে ক'রেছেন; কারো ভাব বা দিগ্বিজয়ী সেকেন্দর সাহের মতো। শুনেছি সেকেন্দর সাহ সমস্ত পৃথিবী জয় করার পর "আর একটা পৃথিবী নেই" ব'লে দুঃখ ক'রেছিলেন। এঁরাও মানবের যুগ-পরম্পরাব্যাপী সাধন-সঞ্চিত, সুকুমার-সন্তর্পণে রক্ষিত পবিত্র ভাবগুলির গায়ে যে-ভাবে পঙ্কলেপনের হোলি-খেলা সুরু ক'রেছেন, তা'তে ঐরূপ দুঃখ করার আর বেশী বিলম্ব আছে ব'লে মনে হয় না! এঁরাও অচিরে রণজিৎসিংহের মত ব'লতে পারবেন—"বাস্, সব কালো হো গিয়া"—অবশ্য, যদি ইতিমধ্যে মানব-ইতিহাসের ভগবান যোগনিদ্রা হ'তে জাগ্রত হ'য়ে—"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত"—গীতার এই প্রতিশ্রুতি-বাক্য পালন না ক'রে বসেন!

যা' হোক্ সাহিত্য-রাজ্যের এই শোচনীয় অনাচারে সাহিত্য ও সমাজের শুভাকাঙ্ক্ষী মাত্রেই একান্ত উৎকণ্ঠিত হ'য়ে উঠেছেন। অনেকে এই উচ্ছৃঙ্খল অনার্য্য আচরণের প্রতিবাদও ক'রেছেন। তবে প্রতিবাদটা বেশীর ভাগ সমাজনীতির পক্ষ হ'তেই হ'য়েছে। যাঁরা আর্টের নামে সাত-খুন মাপ হয় মনে করেন, আমি সে-দলের লোক নই। আর্টের উপদ্রবে সমাজের অকল্যাণ-আশঙ্কা ঘ'টলে, আর্টকে সংযত করার অধিকার—সামাজিকদের আছে এ-কথা আমি পুরাদস্তুর বিশ্বাস করি। তথাপি, আমি মনে করি যে, এ-ক্ষেত্রে প্রতিবাদটা আর্টের প্রিয়ের তরফ হ'তে হ'লে, বেশী ফলপ্রদ হওয়ার সম্ভাবনা। কিছুদিন পূর্ব্বে দিল্লীতে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে শ্রীমান অমলচন্দ্র হোম তাঁর পঠিত অভিভাষণে, সে-কাজ বেশ দক্ষতার সহিত সম্পন্ন ক'রেছেন। শ্রীমানের প্রবন্ধে ধার যতই থাকুক্ না কেন, "সাহিত্যিক"-পদমর্য্যাদা, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি মর্য্যাদা ও বয়ো-মর্য্যাদার ভার না থাকায়, উহা যথাযোগ্য সমাদর লাভ ক'রেছে ব'লে মনে হয় না।

সাহিত্য-সমাজের এই বারোয়ারি অনাচার রবীন্দ্রনাথ কেন নীরবে উপেক্ষা ক'রছেন, সে-প্রশ্ন স্বভাবতই মনে উঠ্‌ত। বাংলা-সাহিত্যের চেয়ে ব্যাপকতর বিষয়ে সত্যের সন্ধান ও প্রচারে তিনি ব্যাপৃত আছেন ব'লে, হয়তো,

এদিকে তাঁ'র নজর পড়েনি, এই কথা মনে ক'রতেম। কিন্তু মনের প্রচ্ছন্ন কোণে এ-গোপন-আশা বরাবরই পোষণ ক'রে এসেছি যে, একদিন তাঁ'র নজর এ-দিকে প'ড়বেই, এবং এই তথাকথিত আর্টের প্রকৃত স্বরূপ লোকচক্ষুর সম্মুখে প্রকট হ'তে বিলম্ব হ'বে না। সকলেই জানেন গত শ্রাবণ মাসের "বিচিত্রা"য় রবীন্দ্রনাথ রসলোকের অমল-শুভ্র আলোকে ফেলে' বাংলা-সাহিত্যের নূতন ধারার মর্ম্মগত কদর্য্য স্বরূপটা প্রকাশ ক'রে দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের হাতের বজ্র কুসুমাবৃত হ'লেও উহা বজ্র এবং তা'র আঘাতও যেমন অমোঘ, তা'র বেদনাও তেমনি মর্ম্মন্তুদ। নূতনপন্থীরা চমক ভেঙে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রে ব'লছেন—"একি হোলো! Et tu Brute"! এক অদ্ভুত আত্মম্ভরিতার মোহে তাঁ'রা মনে ক'রতেন, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ চিন্তা ও ভাব-জগতে যে চিরন্তন সংগ্রাম সুরু ক'রে গেছেন, তাঁরাই উত্তরাধিকারসূত্রে তা'রই ধ্বজা বহন ক'রে চ'লেছেন। হঠাৎ তাঁ'দের সে মোহ টুটে যাওয়া যে নিরতিশয় মর্ম্মভেদী সকরুণ ব্যাপার, সে-কথা স্বীকার ক'রতেই হ'বে। মহাত্মাজীর বার্দোলী-সিদ্ধান্তের পর অসহযোগ-সংগ্রামের অনেক বড় বড় মহারথীর যে-দশা দাঁড়িয়েছিল, এঁদেরও অবস্থা অনেকটা সেই রকম।

নূতন পন্থীদের দলের প্রধান সেনাপতি হ'য়ে শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম-এ, ডি-এল্, ভাদ্রের "বিচিত্রায়" রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা ক'রেছেন। কিন্তু সেনাপতিপ্রবর নিজের ও তাঁ'র সেনার যে শোচনীয় দশা বর্ণনা ক'রেছেন তা'তে, তাঁ'দের উপর অস্ত্রক্ষেপ করা ক্ষাত্রনীতিসম্মত হ'বে কিনা ঘোর সন্দেহস্থল। নরেশবাবুর আত্মদশা-বর্ণনাটুকু উদ্ধৃত ক'রে দেওয়ার লোভ সম্বরণ করা কঠিন :—"কুরুক্ষেত্র-সমরে দ্রোণাচার্য্যকে আপনার বিরুদ্ধে রথারূঢ় দেখিয়া গাণ্ডীবীর ক্লৈব্যের উদয় হইয়াছিল। যাঁহাকে নিত্য নূতন রসের পূজারী, নূতন ধারার মন্ত্রগুরু ও অগ্রদূত বলিয়া নবসাহিত্য এতদিন পূজা করিয়া আসিয়াছে, আজ তাঁহার হাতে আঘাত খাইয়া সে যদি হঠাৎ বিভ্রান্ত ও বিচলিত হইয়া উঠে তবে তাহা বিচিত্র নয়।" অর্জ্জুনের "সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতে" ইত্যাদি আরো বহুবিধ দুরবস্থা ঘ'টেছিল। "নব-সাহিত্যের" অর্থাৎ "নব-সাহিত্যের নব-রত্নের" সে-সব ঘটেছে কিনা নরেশবাবু খোলসা জানান নি। বোধ হয় এক "ক্লৈব্যের" মধ্যেই সে-সব উহ্য রেখে দিয়েছেন। ও-শব্দটি আবার বহুব্যাপকার্থবাচী। যা' হোক্, অর্জ্জুনের এই শোচনীয় দুর্দশা দূর করার জন্য স্বয়ং শ্রীভগবানকে রণক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে গোটা অষ্টাদশ অধ্যায় গীতাখানি extempore রচনা ক'রে শোনাতে হ'য়েছিল, তবেই নাকি অর্জ্জুনের ক্লৈব্যের অপগম ঘটে। শাস্ত্রে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কোনও অবতারের আবি-র্ভাবের উল্লেখ না থাকায় নরেশবাবুর বোধ হয় সে সৌভাগ্যলাভ ঘটেনি। কাজেই তাঁ'র লেখাটিতে "ক্লৈব্য" "বিভ্রান্ত ও বিচলিত" হওয়া প্রভৃতির লক্ষণ আগাগোড়া দেদীপ্যমান হ'য়েই ফুটে আছে।

কথাটা অপ্রিয় নিশ্চয়ই—কিন্তু অসত্য মোটেই নয়। প্রমাণের অভাব নেই।

প্রথম প্রমাণ :—খামখা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অবতারণা ক'রে অর্জ্জুন সেজে নরেশবাবুর গাণ্ডীবহস্তে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মতের মিল না হ'লে তিনি অনায়াসেই তো জিজ্ঞাসু শিষ্যের মত আপনার সংশয় জানাতে পারতেন। পরস্পরের সম্বন্ধ-বিবেচনায় সেইটেই তো শোভন ও সঙ্গত হোতো। দ্রোণাচার্য্য-অর্জ্জুনের যুদ্ধ-কল্পনা এরূপ ক্ষেত্রে, দেশ-কাল-পাত্র-জ্ঞানশূন্য কল্পনার উৎকট বিকার মাত্র।

দ্বিতীয় প্রমাণ :—সাহিত্যিক প্রতিপক্ষগণের প্রতি "উন্মত্তের মত" "ইটপাটকেল যা' খুসী" প্রভৃতি নানাবিধ সুরুচিবহির্ভূত ভাষাপ্রয়োগ। সাহিত্যিক বা সামাজিক কোনও আদর্শেই ও-গুলি শিষ্টাচারসম্মত নয়। Mathew Arnold যাকে লেখার urbanity (আভিজাত্য) ব'লে উল্লেখ ক'রেছেন তা' শিষ্ট সাহিত্যের একটা বিশিষ্ট লক্ষণ। সাহিত্যিক প্রতিপক্ষের প্রতি ধৈর্য্যের অভাবে নিজের অন্তরের সাহিত্যের আদর্শই ক্ষুণ্ণ হয়

"সাহিত্য-ধর্ম্মের সীমানা"-বিচার

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চী

এবং উহা যথার্থ মানসিক বলের অভাব সূচনা করে। সত্যনির্ণয়েরও উহা প্রকৃষ্ট পথ নয়।

তৃতীয় প্রমাণ :—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধেও যথার্থ বিনয়নম্র শ্রদ্ধার্হ ভাবের ন্যূনতা। অবশ্য অন্যান্য প্রতিপক্ষদের তুলনায় নরেশবাবু তাঁ'র সম্বন্ধে অনেক বেশী ভাষার সংযম রক্ষা ক'রে চ'লেছেন সন্দেহ নাই; কিন্তু ভাবের অসংযম অনেক সময় ভাষার আড়াল হ'তেও ফুটে বেরিয়েছে। একটা উদাহরণ দিলেই কথাটা পরিষ্কার হ'বে। নরেশবাবু লিখেছেন—"তাঁ'র সাহিত্য-ধর্ম্ম-প্রবন্ধে যে সমালোচনা করিয়াছেন, তার তলায় তলায় যে এই কথাগুলিই তাঁ'কেও অনবরত খোঁচা মারিতেছে তা' স্পষ্ট দেখা যায়। তবু সাহিত্যের প্রকৃতি বিচারে যে এই সব কথা একেবারে অবান্তর রসজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ সে-কথাটা নিজের কাছে একেবারে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তাই তিনি বলিতে বাধ্য হইয়াছেন" ইত্যাদি।

উদ্ধৃত অংশের মধ্যে "অনবরত খোঁচা মারিতেছে", "একেবারে অস্বীকার", "বাধ্য হইয়াছেন" এই কথাগুলি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সোজা কথায় নরেশবাবুর মতে রবীন্দ্রনাথের আপত্তিও তাঁ'র পূর্ব্বগামীদের মতই—সমাজনীতির দিক হ'তে। তবে তিনি নাকি সাহিত্য-রসজ্ঞ-শিরোমণি, কাজেই তাঁ'কে পদমর্য্যাদার খাতিরে আসল আপত্তিটাকে সাহিত্যিক আপত্তির সাজ পরিয়ে সাহিত্য-সমাজে বের ক'রতে হ'য়েছে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ সত্যগোপনের অপরাধে অপরাধী তো বটেই—মিথ্যা-প্রচারও সম্ভবতঃ ক'রেছেন। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এত বড় গুরুতর অভিযোগ ইতঃপূর্ব্বে শুনেছি ব'লে মনে পড়ে না।

যা' হোক্ রবীন্দ্রনাথ যে-উক্তিটির দ্বারা এরূপ গুরুতর অপরাধ ক'রেছেন তা' দেখার ঔৎসুক্য পাঠকদের স্বভাবতই হ'তে পারে। সে উক্তিটি এই—"সাহিত্যে যৌন-সমস্যার তর্ক উঠেছে, সামাজিক হিতবুদ্ধির দিক দিয়ে তা'র সমাধান হবে না—তা'র সমাধান কলারসের দিক থেকে।" ভাবটাও কাটা-ছাঁটা পরিষ্কার, ভাষাও নির্ম্মল স্বচ্ছ। কোথাও আব্‌ছায়া বা ধোঁয়াটে কিছুমাত্র নাই। অথচ ওর মধ্য হ'তেই "খোঁচা মারিতেছে" প্রভৃতি হরেকরকমের জিনিষ নরেশবাবুর অদ্ভুত ভেল্কিবাজীতে বেরিয়ে প'ড়ল। শাস্ত্রে ব'লে শব্দ ব্রহ্ম—এক ওঁ-শব্দ হ'তেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ। আশ্চর্য্য কিছুই নাই!

নরেশবাবু যদি ক্ষমা করেন, তা'হ'লে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সম্বন্ধে তিনি যে-সব আপত্তি তুলেছেন অতি সহজেই তা'র মীমাংসার পথ বাৎলিয়ে দিতে পারি। একেবারে অমোঘ মুষ্টিযোগ। তিনি শুদ্ধাচারে শুদ্ধাসনে ব'সে নিবিষ্ট শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি অষ্টোত্তর শতবার পাঠ করুন, তাঁ'র সকল আপত্তির উত্তর তাঁ'র আপনার মনের মধ্যেই উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌বে। কথাটা পরিহাসের মতো শোনালেও মোটেই পরিহাস নয়। যে-কেহ দু'টি প্রবন্ধ অভিনিবেশসহকারে প'ড়বেন, তিনিই এ-কথার সত্যতা উপলব্ধি ক'রবেন। কিন্তু নরেশবাবু রাজী হ'লেও "বিচিত্রা"র সম্পাদকপ্রবর যে রাজী হবেন, সে সম্ভাবনা কম। তাঁ'র যে আবার কাগজ পোরাবার গরজ আছে।

নরেশবাবু রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি প'ড়েছেন স্কুলমাষ্টার ও উকীলের চোখ দিয়ে, রসজ্ঞ তত্ত্বজিজ্ঞাসুর দৃষ্টিতে নয়। তাঁ'র প্রবন্ধে ছত্রে ছত্রে তা'র পরিচয় আছে। প্রথমেই তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের 'ষ্টাইল' সম্বন্ধে আপত্তি জানিয়েছেন এবং কবিবরের ওরূপ ষ্টাইলে লেখা যে, লেখকের পক্ষে বড়ই পরিতাপের বিষয় হ'য়েছে সে-কথাটাও জানাতে ভোলেন নি। তাঁ'র উক্তিটা এই—"রবীন্দ্রনাথ তাঁ'র সিদ্ধান্তটি যুক্তির উপর নিয়মিতভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা না করিয়া কেবলমাত্র শ্রেণীবদ্ধ কাব্যস্তূপের উপর বসাইয়া দিয়াছেন এমনভাবে, যে পড়িয়া মনে হয় তাঁ'র পূর্ব্বকথাগুলি যুক্তির, কিন্তু হাতড়াইয়া দেখিতে গেলে ধরিবার ছুঁইবার মত কিছু পাওয়া যায় না। যুক্তির একটা পাকা জবাব যুক্তি দিয়া দেওয়া যায় কিন্তু কাব্যের উপরে যুক্তির বাণ কেবলি একটা ধোঁয়ার মধ্যে ঘুরিয়া মরে, কোনও কঠিন লক্ষ্যের সন্ধান পায় না।" শ্রীমল্লেখককৃত টিপ্পনী এই :—"নিয়মিতভাবে"

কথাটার তাৎপর্য্য কি? কিসের বা কার নিয়ম? Deductive ও Inductive Logic-এর কি? "কেবলমাত্র" কথাটার ইঙ্গিত কি? "কাব্যস্তূপ" কি "মানসী" "সোনার তরী" প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের স্তূপ? তা'র উপর উপবিষ্ট সিদ্ধান্ত একটি পরম কৌতুকাবহ দৃশ্য বটে। "পূর্ব্বকথাগুলি" কোন্ কথাগুলি—সন্ধান মিল্‌ল না। "কাব্যের উপর" "যুক্তির বাণ" প্রয়োগ ক'রলে তা' যে "ধোঁয়ার ছায়ার মধ্যে ঘুরিয়া মরে", সে ধোঁয়া, বাণের, না কাব্যের, না উভয়ের রাসায়নিক সংযোগের ফল? হায় রে! লক্ষণেরও ঠিক এই বিপদ হ'য়েছিল—মেঘাবলুপ্ত ইন্দ্রজিতের গায়ে বাণ নিক্ষেপ ক'রে।

ষ্টাইলের বিভিন্নতা বিষয়ের উপর নির্ভর করে এবং উহা খাঁটি হ'লে ব্যক্তিত্বের ধ্বজবজ্রাঙ্কুশচিহ্নে লাঞ্ছিত হ'য়ে উঠে। সাহিত্যিক প্রবন্ধ সাহিত্যরসাভিষিক্ত ষ্টাইলে রচিত হওয়াই সমীচীন। রবীন্দ্রনাথ ঠিক তাই ক'রেছেন এবং তাঁ'র প্রতিভার কিরণে "সাহিত্যধর্ম্ম" প্রবন্ধটি সার্থক রসরচনারূপে ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ যদি ইউক্লিডের প্রতিজ্ঞার ষ্টাইলে ওটা লিখ্‌তেন তা'হলে তিনি যে চমৎকার যুক্তিগর্ভ বা যুক্তিসর্ব্বস্ব একটা প্রকাণ্ড ব্যর্থতার সৃষ্টি ক'রে তুল্‌তে পারতেন তা' নিঃসন্দেহ। এক দুই ভাবে নম্বরওয়ারি যুক্তিগুলি সাজিয়ে প্রবন্ধটি রচিত হ'লে নরেশবাবুর ভিতরের বেত্রহস্ত গুরুমশায় নিশ্চয়ই খুব খুসী হ'য়ে উঠ্‌তেন। কিন্তু হায় Petitio Principii! হায় Excluded middle! তোমরা যে মগজের অস্ত্রশালায় প'ড়ে প'ড়ে মরিচা সঞ্চয় ক'রতে থাক্‌লে! কাব্যস্তূপের আবরণে যুক্তিগুলি ঢাকা থাকায় অস্ত্রপ্রয়োগের সুবিধা হ'লো না। গুরুমশায়ের রাগতো খুব স্বাভাবিক! অনেকে কাগজে কলমে যুক্তির ফাঁক অতি সহজেই ধ'রে ফেল্‌তে পারেন, কিন্তু জীবনের ক্ষেত্রে ঘটনাপুঞ্জের মর্ম্মনিহিত যুক্তিগুলি কিছুতেই তাঁ'দের নজরে পড়ে না; ফলে নানাবিধ বিড়ম্বনার সৃষ্টি ক'রে ব'সেন। কিন্তু যুক্তিগুলি কাব্যালঙ্কারের সৌন্দর্য্যে ভূষিত হ'লেই যে একেবারে নস্যাৎ হ'য়ে যাবে, কাব্যালঙ্কার যে এত বড় ভয়লোচন তা' পূর্ব্বে জানতেম না। রবীন্দ্রনাথের রচনাটি ফুলের মালার মতই সুন্দর বটে, কিন্তু তা' যে বিনি-সূতায় গাঁথা—তা'র ভিতরে যুক্তির কঠোর ডোর নেই, এ-কথা নরেশ বাবু কি ক'রে জান্‌লেন?

নরেশবাবুর দ্বিতীয় আপত্তি তাঁ'র নিজের ভাষায় এইরূপ:—"তা'ছাড়া সমগ্র আধুনিক সাহিত্য বেষ্টন করিয়া তিনি যে এই সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন তাহার বিষয়বস্তু নির্দ্দিষ্ট করিবার কোনও চেষ্টাই করেন নাই।" এই আপত্তিটিতে নৈয়ায়িক ও উকীল দুয়েরই গন্ধ পাওয়া যায়। "বাদীর আরজীতে মোকদ্দমার কারণ খোলসা বুঝা যায় না—সুতরাং cause of action-এর অভাব হেতু বাদীর দাবী ডিসমিস করিতে আজ্ঞা হয়" কয়েক পৃষ্ঠা ধ'রে বহু বাগাড়ম্বরসহকারে নরেশবাবু এই দরখাস্তই পেশ ক'রেছেন। তিনি যে পরে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে "সীমানা নির্দ্দেশ" করেন নি ব'লে পুনঃপুনঃ অভিযোগ ক'রেছেন, বলা বাহুল্য, তা'ও এই মূল অভিযোগেরই সামিল।

যাই হোক্ নরেশবাবুর এই অভিযোগের ভিত্তিটা কেমন মজ্‌বুত একবার দেখা দরকার। তাঁ'র যুক্তি-প্রণালীটা এইরূপ:—

(১) তিনি (রবীন্দ্রনাথ) "সমগ্র" আধুনিক সাহিত্য বেষ্টন করিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন "সমগ্র" সাহিত্য তা'র লক্ষ্যবস্তু হইতে পারে না—কারণ "খড়্গা-হস্ত শুচিধর্ম্মী" অনুরূপা দেবীর মতন সাহিত্যিকও আছেন।

(২) "বিদেশের আমদানী" কথাটারও কিছু পরিচয় পাওয়া যায় না, কারণ "কেবল কয়েকখানি অনুবাদ-গ্রন্থ ছাড়া কোন লেখকই তাঁহাদের বই বিদেশের আমদানী বলিয়া প্রচার করেন নাই এবং এমন অনেকে আছেন যাঁ'রা তাঁ'দের লেখা সম্পূর্ণরূপে এই দেশের জলমাটির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া দাবী করেন—যাহাদের হয়তো কবি এই সমালোচনায় বহির্ভূত বলিয়া মনে করেন না—তা'ছাড়া "বিদেশের আমদানী" কথাটা পরিচয় হিসাবে কোনও নির্দ্দেশই দেয় না—কেননা, একহিসাবে রাজা রামমোহনের পরবর্ত্তী সমস্ত সাহিত্যই অল্প-বিস্তর বিলাতী আমদানী।"

"সাহিত্য-ধর্ম্মের সীমানা"-বিচার

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চী

সেই বিশ্রুতকীর্ত্তি গর্দ্দভের কথা মনে প'ড়ে ভয় হ'চ্ছে যে-হতভাগ্য দুদিকের দুই সমান লোভনীয় সবুজ কচি ঘাসের আঁটির দিকে ক্যাল্ ক্যাল্ ক'রে চেয়ে' শেষে অনাহারে গর্দ্দভলীলা সাঙ্গ ক'রেছিল—সমালোচকের মুখপ্রিয় এত হরেক রকমের উপাদেয় সামগ্রী নরেশবাবু এই অল্প পরিসরটুকুর মধ্যে সাজিয়ে রেখেছেন! [পাঠকেরা উক্ত শ্বাপদ-কীর্ত্তিত-যশা চতুষ্পদের সহিত এ-পক্ষ লেখকের বুদ্ধির তুলনা ক'রলে তিনি বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হবেন না, কারণ, সেটা প্রমাণ হ'য়ে গেছে এই লেখাটায় হাত দিয়ে] এ-বিপদে চারদিক হ'তে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে যে কোনও একদিকে ছুটে যাওয়াই বাঁচার একমাত্র উপায়!

প্রথমে "সমগ্র আধুনিক সাহিত্য বেষ্টন করিয়া" ব্যাপারটা দেখা যাক। রবীন্দ্রনাথ তো দেখ্‌ছি "সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে" এইটুকুমাত্র লিখেছেন। বাহির হ'তে হাওয়ায় উড়ে আসার যখন সম্ভাবনামাত্র নেই, তখন নরেশবাবুর নিজের মগজ হ'তেই "সমগ্র" "বেষ্টন করিয়া" প্রভৃতি কথা এসেছে, এ-কথা মান্‌তেই হবে। কিন্তু নরেশবাবুর মগজই বা হঠাৎ এমন অঘটনঘটনপটীয়ান হ'য়ে উঠ্‌লেন কেন, সেটাও একটা ভাব্‌বার কথা। সকলই সেই মহামায়ার খেলা—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ভ্রান্তি-রূপেন সংস্থিতা"! নরেশবাবুর স্মৃতি-বিভ্রম ঘ'টেছে। ব্যাপারটা খুলে বলা দরকার।

বাল্যকালে নিশ্চয়ই নরেশবাবু বাংলা ব্যাকরণে অধি-করণ কারকের অধ্যায়ে অধিকরণ কারকে "এ-কার" বিভক্তি এবং সামীপ্য, একদেশ, বিষয়, ব্যাপ্তি এই সব অর্থে অধিকরণ কারক হওয়ার কথা উদাহরণসমেত প'ড়েছিলেন। এতদিন পরে আর সব ধুয়ে মুছে গিয়ে কেবল এইটুকু মনে আছে যে, অধিকরণে "এ-কার" বিভক্তি হয় এবং ব্যাপ্তি অর্থে অধিকরণ কারক হয়,—যেমন তিলে তৈল আছে অর্থাৎ তিল ব্যাপিয়া তৈল আছে। কাজেই রবীন্দ্রনাথের প্রযুক্ত "সাহিত্যে"-শব্দের অর্থ, "তিলে তৈল আছে" এই উদাহরণ খাটিয়ে, "সমগ্র আধুনিক সাহিত্য বেষ্টন করিয়া" ক'রে বসেছেন।

তারপর "বিদেশী আমদানী" সম্বন্ধে নরেশবাবু যা' মন্তব্য ক'রেছেন তা'র যুক্তিটা খুব পাকা সন্দেহ নেই। কোনও বিষয় কেউ স্বীকার না ক'রলেই বা কোনও বিষয় কেউ দাবী ক'রে বস্‌লেই যে, সেটাকে বেদবাক্য ব'লে মান্‌তে হবে, কোনও দেশের কোনও যুক্তি বা প্রমাণশাস্ত্রে তো এ-কথা ব'লে না। তবে এ-সব কথা যদি আপ্তবাক্য হয়, তা'হলে স্বতন্ত্র কথা। আর, রাম-মোহন রায়ের পরবর্ত্তী সমস্ত সাহিত্যই যে অল্প-বিস্তর বিদেশী আমদানী এ-কথাটাই বা কেমন টেকসই দেখা যাক্। কেবলমাত্র কয়েকটী নাম উল্লেখ ক'রলেই কথাটা যে কিরূপ ভিত্তিহীন তা' হাতে হাতে ধরা প'ড়বে। ঈশ্বরগুপ্ত, নিধুবাবু, রাম বসু—কবিওয়ালার দলের রচিত সাহিত্য, "আলালের ঘরের দুলাল", "হুতোম্ প্যাঁচার নক্সা", নাটুকে রামনারায়ণের নাটকাবলী—এই সকল সাহিত্যের কথা মনে ক'রলে নরেশবাবু নিজের কথার মূল্য স্বয়ংই নিরূপণ ক'রতে পারবেন।

এই প্রসঙ্গে নরেশবাবু ঘোষণা ক'রেছেন যে, রবীন্দ্র-নাথের অনেক কবিতার মর্ম্মবাণী বুঝ্‌তে হ'লে বিদেশী কবিতা-জ্ঞানের দো-ভাষীর সাহায্য দরকার। কথাটা মোটেই সত্য নয়। প্রত্যক্ষের চেয়ে বড় প্রমাণ নেই। আমি ঠিক বিপরীত রকমই বহু স্থলে দেখেছি। আসল কথা, রসিক জনেই কাব্যরসের মর্ম্ম বুঝে—সেজন্য বহু-ভাষাজ্ঞানের কোনই প্রয়োজন হয় না।

কবিতারসমাধুর্য্যং কবি বেত্তি ন কোবিদঃ।
ভবানী ভ্রূকুটীভঙ্গীর্ভবোবেত্তি ন ভূধরঃ॥

নরেশবাবু তাঁ'র প্রবন্ধে মাঝে মাঝে ব্যাসকূট বা ধাঁধা বা ঐরূপ কিছু একটা সাজিয়ে রেখেছেন, বোধ হয় পাঠকের বুদ্ধিবৃত্তি পরখের জন্য। একটা নমুনা দিই :—

"বিদেশের আমদানী" কথাটারও কিছু পরিচয় পাওয়া যায় না, কেননা............"

ঠিক পরবর্ত্তী বাক্যটি এই :—

"তা'ছাড়া 'বিদেশের আমদানী' কথাটা পরিচয়হিসাবে কোনও নির্দ্দেশই দেয় না——কেননা......... ।"

বাক্যের কেবলমাত্র হেতু নির্দ্দেশের অপ্রধান অংশ ছেড়ে দিয়ে প্রধান ও মূল বাক্য দুটী একত্র ক'রলে এইরূপ দাঁড়ায়ঃ—"'বিদেশের আমদানী' কথাটায়ও কিছু পরিচয় পাওয়া যায় না, তা'ছাড়া 'বিদেশের আমদানী' পরিচয়হিসাবে কোনও নির্দ্দেশই দেয় না"—একটা সমভাব-বিশিষ্ট—ইংরাজীতে যা'কে parallel passage ব'লে—হেঁয়ালি মনে প'ড়ছে; বহু বাল্যকালে শ্রুত।

"বিষ্ণুপদ সেবা ক'রে বৈষ্ণব সে নয়,
গাছের পল্লব নয় অঙ্গে পত্র হয়।
পণ্ডিতে বুঝিতে পারে দু-চারি দিবসে,
মূর্খেতে বুঝিতে নারে বৎসর চল্লিশে।

মূর্খত্বটাকে মেনে নিয়ে গোড়ায় হার মানাই ভাল—চল্লিশ বৎসর ধ'রে ও-জিনিষটার জের টেনে ওটাকে স্ফীত ক'রে তোলার প্রতি কোনও লোভ নাই।

এতক্ষণ এই প্যারার বড় বড় রত্নগুলির পরিচয় দিতে ব্যস্ত থাকায় একটি ছোট রত্নের প্রতি নজর প'ড়ে নি। রত্নটি ছোট বটে কিন্তু দামী জিনিষ।

"এবং এমন অনেকে আছেন যাঁ'রা তাঁ'দের লেখা সম্পূর্ণরূপে এই দেশের জলমাটির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া দাবী করেন,—যাঁহাদের হয়তো কবি এই সমালোচনার বহির্ভূত বলিয়া মনে করেন না।"

অর্থাৎ তাঁ'দের খাঁটি কাশ্মীরী শালকে রবীন্দ্রনাথ (হয়তো) জর্ম্মণ শাল ব'লে মনে করেন" এই অপূর্ব্ব অনুমানটি রবীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক অবিচারপ্রবণতার উদাহরণস্বরূপ দেওয়া হ'য়েছে না তাঁ'র খাঁটি-মেকি, আসল-নকল বিচারশক্তির অভাব প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে?

নরেশবাবুর নিকট হ'তে "বিষয়বস্তু নির্দ্দেশ" সম্বন্ধে একটা হাতে-কলমে শিক্ষা অর্থাৎ Practical Demonstration নিলে মন্দ হয় না।

তাঁ'র প্রথম প্যারাটাই ধরা যাক্ঃ—

"বাংলা সাহিত্যে কিছুকাল হইল ইত্যাদি।"

প্রথমেই দেখ্‌ছি "বাঙলা সাহিত্যে"। ঠিক ঐ কথাটির জন্যই তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রতি কঠোর প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিয়েছিলেন—তবে পণ্ডিতমশায়ের নিজের ছেলের পক্ষে "মাকড় মারলে ধোকড় হয়" এরূপ যদি কোনও শাস্ত্রবিধি থাকে তা'হলে স্বতন্ত্র কথা। কেবল একটি কথা জিজ্ঞাসার আছে। তাঁর এই "সাহিত্য" শব্দের এলাকার মধ্যে "খড়্গাহস্ত শুচিধর্ম্মী শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর" বইগুলি প'ড়ে কি? তার পর দেখ্‌ছি "কিছুকাল হইল"। "কিছু," শব্দটি তো মূর্ত্তিমান "অনির্দ্দেশ"। তার পর দেখ্‌ছি "শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই ভাবগঙ্গার ভগীরথ।" কলির এই ঠাকুর তো কেবল একটিমাত্র ভাবগঙ্গা নয়, অনেকে ভাবগঙ্গার ধারাই মর্ত্ত্যলোকে বহিয়ে দিয়েছেন। তার পর "ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে" ইতি ভণিতায় যা' ঘোষণা ক'রছেন তা'তেও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বিশেষ কিছু মিলে না। কারণ, "সাবেক মামুলী" এই বিশেষণ দু'টি চঞ্চল কালপ্রবাহে নিত্যই পরিবর্ত্তিত হচ্ছে। আজ যা "সাবেক মামুলী" বঙ্কিমবাবুর সময় তা' হয়তো "নূতন" ছিল—আবার বঙ্কিমবাবুর সময়ের "সাবেক মামুলী" রামমোহন রায়ের সময় সবেমাত্র রঙ্গশালায় প্রবেশ ক'রছে।

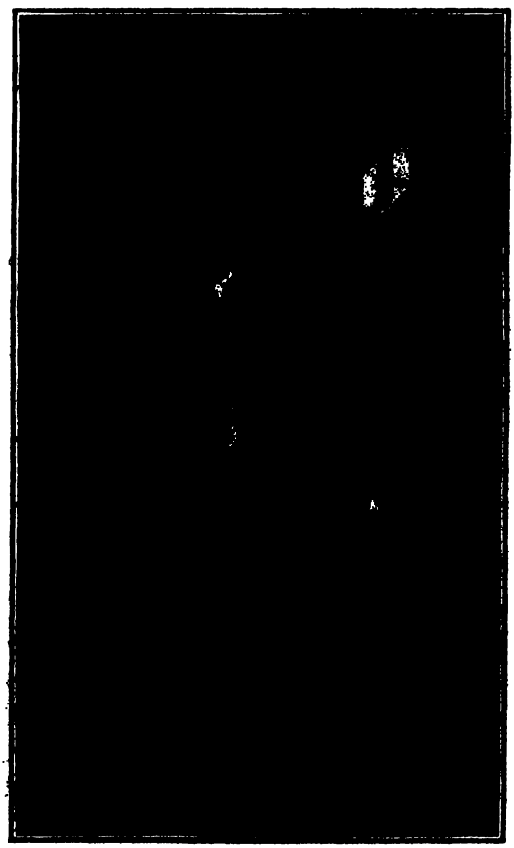
আসল কথা, সাধারণ সাহিত্য-রচনায় কেউ "বিষয়বস্তু নির্দ্দেশের" জন্য তেমন মাথা ঘামায় না। আর মাথা ঘামালেও, মাথার ঘামে নদী ব'য়ে যেতে পারে, কিন্তু লেখার ধারা অচল হ'য়েই থাকবে। এরূপ রচনার ক্ষেত্রে পাঠকদের বোধগম্য হওয়াটাই একমাত্র মাপকাটি।

নরেশবাবু "বিষয়বস্তু নির্দ্দেশের" পালা সাঙ্গ ক'রেছেন ভেবে একটু আশ্বস্ত হ'য়েছিলেম। কিন্তু এ-যে দেখ্‌ছি "ভাট কহে মহাশয়, বাণী যদি শেষ হয়, তথাপিও না হয় বর্ণন।" সুতরাং আবার তল্পীতল্পা বাঁধ্‌তে হ'লো।

নরেশবাবু উচ্যতেঃ—"বে-আব্রুতা" ও যৌন সম্বন্ধের উল্লেখ করিয়াও কবি বিষয় নির্ণয় সুকর করেন নাই"। কেননা যৌন সম্বন্ধের আলোচনা বঙ্কিমচন্দ্রের আমল হ'তে বরাবর আছে এবং সব চেয়ে বেশী রবীন্দ্রনাথের বিরাট গ্রন্থাবলীতে! আর আব্রু ও বে-আব্রুর মধ্যে কোনও নির্দ্দিষ্ট সীমারেখা নাই। দেশভেদে, কালভেদে, ব্যক্তিভেদে তা বিভিন্ন। নরেশবাবুর নিজের কথা এইঃ—"বে-আব্রু কাহাকে ব'লে এ-সম্বন্ধে মত ও রুচির ভেদ,







শিল্পী—শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীবিজেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চী

ভিন্ন ভিন্ন দেশে এবং ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ভিতর তো আছেই, একই যুগে ও দেশে বিভিন্ন মানুষের ভিতরও আছে।" উল্লিখিত অংশের "ভিন্ন ভিন্ন মানুষের" ও "বিভিন্ন মানুষের" মধ্যে ভিন্নতা উদ্ভিন্ন করা নরেশবাবু ভিন্ন আর কারো সাধ্যায়ত্ত কিনা জানি না।

যা' হোক্ "বে-আব্রুতা"র অনুসরণ কর্‌তে কর্‌তে নরেশবাবু ভূলোক ছেড়ে একেবারে ভুবর্লোক অর্থাৎ সাহিত্য-লোকে উত্তীর্ণ হ'লেন। সেখানেও দেখেন সমান অরাজক অবস্থা। সীমানা নিয়ে সমান মারামারি। এই উপলক্ষ্যে "চোখের বালি", "ঘরে বাইরে", "শ্রীকান্ত" "চরিত্রহীন" প্রভৃতি গ্রন্থের নাম কীর্ত্তন ক'রে নরেশবাবু রায় প্রকাশ ক'রে দিলেন যে, এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ কোনও অভ্রান্ত নির্দ্দেশ দেন নাই। পাছে কবির প্রতি অবিচার করা হয় এই আশঙ্কায়, নরেশবাবু সাবধান হ'য়ে জানিয়ে দিচ্ছেন—"কবির কতক কথায় মনে হয় যে, যতক্ষণ লেখক কেবল মনের অভিসার লইয়া আলোচনা করেন, ততক্ষণ শীলতার সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকেন, যখন তিনি মন ছাড়িয়া দেহ লইয়া টানাটানি করেন, তখনই তিনি বে-আব্রু।" প্রতিপক্ষের উকীল-ভাবে উক্ত কথা ব'লে পুনরায় হাকিম সেজে নরেশবাবু রায় প্রকাশ ক'রলেন—"তাহাতেও কথাটা স্পষ্ট হয় না। শারীর ব্যাপার মাত্রই তো অপাংক্তেয় নয়, কেননা চুম্বনের স্থান সাহিত্যে পাকা করিয়া দিয়াছেন বঙ্কিমচন্দ্র হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সকল সাহিত্য সম্রাট।" যাহা হোক এই ভাবে নরেশবাবু বহু বাগাড়ম্বরসহকারে প্রতিপন্ন ক'রতে চেষ্টা ক'রেছেন যে, আব্রু ও বে-আব্রুর মধ্যে সীমানা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কোনও "অভ্রান্ত নির্দ্দেশ" দেন নাই। আর একটি সিদ্ধান্ত তিনি ইঙ্গিতে প্রতিপন্ন করেছেন যে বাস্তবিকপক্ষে আব্রু ও বে-আব্রুর মধ্যে কোনও সীমারেখা নাই, কারণ দেশভেদে, কালভেদে উহার ধারণা বিভিন্ন।

লেখকের প্রবন্ধের এই অংশ পুনরুক্তি দোষে বিশেষরূপে দুষ্ট। রবীন্দ্রনাথ যে সীমারেখা সম্বন্ধে কোনও "অভ্রান্ত-নির্দ্দেশ" দেন্‌নি এই কথাটা হরেক রকম ভঙ্গীতে জানিয়েছেন এবং সব শেষে "সে-সীমারেখা কবি কোথায় টানিয়াছেন, তা'র বাহিরে কোন্ বই, ভিতরেই বা কোন্ বই" এ কথা কবি স্পষ্ট জানিয়ে দেন্-নি ব'লে অনুযোগ করেছেন। অর্থাৎ প্রকারান্তরে ঐ সকল বই ও গ্রন্থকারদের নামের সম্পূর্ণ ফিরিস্তি দাবী ক'রেছেন। বাস্তবিক পক্ষে রবীন্দ্রনাথ তাঁ'র প্রবন্ধের শেষে ঐ-সব নাম-সম্বলিত "ক"-"খ"-চিহ্নিত Schedule যদি দিতেন তা'হলে বড় ভাল করতেন; অনেক লেখকের সন্দেহ দোলায়মান চিত্তকে সুস্থির ক'রতে পারতেন।

রবীন্দ্রনাথ কোনও সীমানা নির্দ্দেশ ক'রেছেন কিনা সে-কথা পরে আলোচনা ক'রবো। অবান্তরভাবে দু'-একটা কথা বলা দরকার। "লেখক যতক্ষণ কেবল মনের অভিসার লইয়া আলোচনা করেন, ততক্ষণ শীলতার সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকেন, যখন তিনি মন ছাড়িয়া দেহ লইয়া টানাটানি করেন তখনই তিনি বে-আব্রু" নরেশবাবু রবীন্দ্রনাথের কতক কথায়, এই মতটা কবির ব'লে সিদ্ধান্ত করেছেন। কথাগুলির উল্লেখ ক'রলে নরেশবাবুর ঐরূপ ভুলের কারণটা সহজে ধরা প'ড়ত। যা' হোক্, রবীন্দ্রনাথের ভুল মতগুলিও যে ওরূপ কিম্ভূত-কিমাকার হ'তে পারে না, রবীন্দ্র-সাহিত্যে অভিজ্ঞ পাঠকমাত্রেই তা' বুঝ্‌তে পারবেন। যাকে নরেশবাবু "মানসিক অভিসার" ব'লেছেন তা'ও একান্ত "বে-আব্রু" হ'তে পারে যদি তা' নিরবচ্ছিন্ন লালসার রঙে অনুরঞ্জিত হ'য়ে উঠে।

তার পর "হৃদয়-যমুনা", "স্তন", "বিজয়িনী", "চিত্রাঙ্গদা" প্রভৃতি বহু কবিতায় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং দৈহিক ব্যাপার লইয়া অপূর্ব্ব রস উদ্বোধন করিয়াছেন',—নরেশবাবু এই কিম্বদন্তী বহন ক'রে এনেছেন। উক্ত কবিতাগুলিতে রবীন্দ্রনাথ যে অপূর্ব্ব রস উদ্বোধন ক'রেছেন এ-কথা খুবই সত্য; ও-গুলিতে দেহের প্রসঙ্গও কিছু আছে এ-কথাও সত্য; কিন্তু "দৈহিক ব্যাপার লইয়া" যে উক্ত "অপূর্ব্ব রস" উদ্বোধন ক'রেছেন এ-কথা একেবারেই যথার্থ নয়। বস্তুতঃ "দৈহিক ব্যাপার লইয়া" যে-রস উদ্বোধন করা সম্ভবপর, তা'র সম্বন্ধে "অপূর্ব্ব" বিশেষণটি

কোনও সময়েই প্রয়োগ করা যায় না। নরেশবাবুর উল্লিখিত কবিতাগুলির সবিস্তার বিশ্লেষণের স্থান এখানে নেই ; নইলে উক্ত কবিতাগুলিতে দৈহিক ব্যাপার যে নিতান্ত গৌণ একটা উপলক্ষ্য মাত্র, এ-কথা অতি সহজে যে কেউ বুঝ্‌তে পারতেন। যা' হোক্, কবিতা কয়টি থেকে কয়েক ছত্র ক'রে উদ্ধৃত ক'রে দিলেই আমার দাবীটা যে অমূলক নয় তা' প্রতিপন্ন হ'বে।

১। "হৃদয়-যমুনা"—শেষ কয়টি ছত্র এই :—

"নাহি রাত্রি দিনমান, আদি-অন্ত পরিমাণ
সে অতলে গীত-গান কিছু না বাজে ;
যাও সব যাও ভুলে, নিখিল বন্ধন খুলে
ফেলে দিয়ে এসো কূলে সকল কাজে।"

নরেশবাবুর ভুল হয়নি তো ? তিনি আর কারো "হৃদয়-যমুনা" নামক কোনও কবিতার সহিত রবীন্দ্রনাথের কবিতাটির গোল ক'রে বসেন নি তো ?

২। "স্তন"—"স্তন"-শীর্ষক দু'টি কবিতা আছে। দু'য়েরি কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করি :—

(ক) "হের গো কমলাসন জননী লক্ষ্মীর,
হের নারী-হৃদয়ের পবিত্র মন্দির।"

(খ) "উন্নত সতীর স্তন স্বরগ-প্রভায়
মানবের মর্ত্তভূমি ক'রেছে উজ্জ্বল ;

* * * *

ধরণীর মাঝে থাকি স্বর্গ আছে চুমি
দেব-শিশু মানবের ওই মাতৃভূমি।"

৩। তার পর "বিজয়িনী"। তা'র শেষ কয় ছত্র এই :—

"ত্যজিয়া বকুলমূল মৃদু-মন্দ হাসি
উঠিল অনঙ্গদেব। সম্মুখেতে আসি
থমকিয়া দাঁড়াল সহসা। মুখপানে
চাহিল নিমেষহীন নিশ্চল নয়ানে
ক্ষণকাল তরে। পরক্ষণে ভূমি'পরে
জানু পাতি বসি' নির্ব্বাক্ বিস্ময়ভরে
নতশিরে, পুষ্প-ধনু পুষ্প-শর-ভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা-উপচার
তূণ শূন্য করি'। নিরস্ত্র মদন-পানে
চাহিলা সুন্দরী শান্ত-প্রসন্ন-বয়ানে।"

"কড়ি ও কোমলের"—

"অতনু ঢাকিল মুখ বসনের কোণে
তনুর বিকাশ হেরি লাজে শির নত।"

এই দুই ছত্রে যে ভাবের উন্মেষ, এই "বিজয়িনী" কবিতায় তা'র পূর্ণতম বিকাশ।

৪। তার পর "চিত্রাঙ্গদা"। এই কাব্য-গ্রন্থখানিকে নরেশবাবু যে একটি কবিতা ব'লে ভুল ক'রেছেন, সেই ভুলের মধ্যেই তাঁ'র এই অদ্ভুত মতের নিদানতত্ত্ব মিলতে পারে। খুব সম্ভব তিনি নিজে এ-সব কিছুই প'ড়েননি, কোনও বেওয়ারিশ কিম্বদন্তীর উপর তাঁ'র সমালোচনার ইমারত খাড়া ক'রেছেন। অনেক লোক যেমন এমন সব বড়লোকের সঙ্গে আত্মীয়তা দাবী ক'রে বসেন, যাঁদের সঙ্গে কোনও জন্মে তাঁ'দের কোনও পরিচয় নেই, নরেশবাবুও কি তেমনি এই সব কবিতা ও কাব্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা দাবী ক'রেছেন—একই মনস্তত্ত্ব হ'তে ? "চিত্রাঙ্গদা"-র এক স্থানের একটু সামান্য অংশ উদ্ধৃত করলেই আমি যে কোনও অত্যুক্তির অপরাধে অপরাধী নই, পাঠকেরা তা' বুঝ্‌তে পারবেন।

আছে এক সীমাহীন
অপূর্ণতা অনন্ত মহৎ। কুসুমের
সৌরভ মিলায় থাকে যদি, এইবার
চাও।" সেই জন্ম-জন্মান্তের সেবিকার পানে

পুনশ্চ :—

বুঝিতে পারিনে
আমি রহস্য তোমার। এতদিন আছি
তবু যেন পাইনি সন্ধান। তুমি যেন
বঞ্চিত করিছ মোরে গুপ্ত থেকে সদা ;
তুমি যেন দেবীর মতন, প্রতিমার
অন্তরালে থেকে, আমারে করিছ দান
অমূল্য চুম্বন-রত্ন, আলিঙ্গন-সুধা
নিজে কিছু চাহ না, লহ না।

* * * *

"সাহিত্য-ধর্ম্মের সীমানা"-বিচার

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চী

তার কাছে এ সৌন্দর্য্যরাশি মনে হয়
মৃত্তিকার মূর্ত্তি শুধু, নিপুণ চিত্রিত
শিল্প-যবনিকা।

কবি এই কাব্যে সৌন্দর্য্যের সুধা দেহ-পাত্রে আকণ্ঠ পূরিয়া পান করাইয়াছেন নিঃসন্দেহ, কিন্তু সে কেবল দেহাতীতের অসীম আকাঙ্ক্ষাকে জীবন্তভাবে জাগিয়ে তোলার জন্য। বিদ্যাপতির "সখিরে কি পুছসি অনুভব মোয়" গানটি যে অসীমের রসে ভরপুর, "চিত্রাঙ্গদা" কাব্যে তা'রই প্রবাহ বেয়ে চ'লেছে।

"লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু—
তবু হিয়া জুড়ন না গেল"

এই ছত্রটিতে নরেশবাবু যদি কেবল বুকে বুকে সংস্পর্শ নামক "দৈহিক ব্যাপার" মাত্রই অনুভব করেন, তা'হলে যে তীর্থযাত্রী পুরীধামে জগবন্ধুর স্থানে আপনার বাড়ীর লাউমাচাখানি দেখেছিল, নরেশবাবুর চেয়ে সে যে বেশী অন্যায় ক'রেছিল, এ-কথা কিছুতেই বলা যায় না। তিনি অনর্থক কষ্ট ক'রে সাহিত্য-তীর্থযাত্রা না ক'রে যদি আপনার বাড়ীতে ব'সে লাউমাচাখানির সেবা ক'রতেন, তা'হলে মোক্ষফল না পেলেও যে বড় বড় লাউফল-প্রাপ্তি তাঁ'র ঘ'টত, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

যা' হোক্ উপরি উদ্ধৃত কবিতা-ছত্রগুলি প'ড়েও নরেশবাবু যদি মত পরিবর্ত্তন ক'রতে না পারেন, তা'হ'লে নিশ্চয় বুঝ্‌তে হবে, নরেশবাবুর মত নামক পদার্থটি বদ্‌লায় তাঁ'র নিজের কোনও গোপন খেয়ালে,—সত্য-মিথ্যার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রেখে নয়।

এইবার আসল বিষয়ে অবতরণ করা যাক—সেই বহুপূর্ব্বের "আব্রু ও বে-আব্রু"-র মধ্যে সীমা নির্দ্দেশের বিষয়। প্রথমেই দেখি, "এ-বিষয়ে কবিবর আমাদিগকে কোনও অভ্রান্ত নির্দ্দেশ দেন নাই" ব'লে নরেশবাবু আপশোষ ক'রেছেন। আপশোষেরই তো কথা সন্দেহ নাই। কারণ, তাঁ'র প্রবন্ধে নরেশবাবু এত সহজে এত "অভ্রান্ত" নির্দ্দেশ ছড়িয়ে গিয়েছেন যে, তাঁ'র পক্ষে বুঝাই কঠিন যে, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে উক্ত সহজ কাজ এরূপ দুঃসাধ্য কেন। যা' হোক ভেবে দেখুন হয়তো বুঝ্‌লেও বুঝ্‌তে পারেন।

যা' হোক্, "অভ্রান্ত" নির্দ্দেশ দেওয়ার স্পর্দ্ধা না রাখ্‌লেও রবীন্দ্রনাথ একটা নির্দ্দেশ দিয়েছেন এবং হয়তো সেটা "অভ্রান্ত" হ'তেও পারে।

"যা'কে সীমায় বাঁধ্‌তে পারি তা'র সংজ্ঞানির্ণয় চলে; কিন্তু যা' সীমার বাহিরে, যা'কে ধ'রে ছুঁয়ে পাওয়া যায় না, তা'কে বুদ্ধি দিয়ে পাইনে, বোধের মধ্যে পাই।......আমাদের এই বোধের ক্ষুধা আত্মার ক্ষুধা। সে এই বোধের দ্বারা আপনাকে জানে। যে-প্রেমে, যে-ধ্যানে, যে-দর্শনে, কেবলমাত্র এই বোধের ক্ষুধা মেটে তাই স্থান পায় সাহিত্যে রূপ-কলায়।"

* * * *

"মানুষের আহারের ইচ্ছা প্রবল সত্য, কিন্তু সার্থক সত্য নয়। পেট ভরানো ব্যাপারটা মানুষ তা'র কলা-লোকের অমরাবতীতে স্থান দেয়নি।"

* * * *

"প্রেমের মিলন আমাদের অন্তর-বাহিরকে নিবিড় চৈতন্যের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত ক'রে তোলে। বংশরক্ষার মুখ্য তত্ত্বটিতে সে দীপ্তি নাই।"

* * * *

"আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষার প্রবৃত্তি তা'দের উভয়ের প্রবৃত্তিতেই প্রবল। এই প্রবৃত্তিতে মনুষ্যত্বের সার্থকতা মানুষ উপলব্ধি করে না।"

উপরে যে কয়টি অংশ তোলা গেল তা'হতেই স্পষ্ট বুঝা যায় রবীন্দ্রনাথ আব্রু ও বে-আব্রুতার মধ্যে কি লক্ষণ অনুসারে সীমারেখা নির্দ্দেশ ক'রতে চান। যে-জিনিষ সেরে-মণে ওজন করা যায় না, ফুটে-ইঞ্চিতে মাপা চলে না—ঘণ্টায়-মিনিটে যা'র হিসাব হয় না—তা'র সম্বন্ধে এর চেয়ে সুস্পষ্টতর নির্দ্দেশ আর যে কি হ'তে পারে তা' আমার ধারণায় আসে না। রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত লক্ষণ মিলিয়ে যে-কোনও রসজ্ঞ ব্যক্তি বাংলা-সাহিত্যের কোন্ কোন্ বই বে-আব্রুর কোটায় পড়ে তা' অনায়াসে নির্ণয় ক'রতে পারেন। সেজন্য গ্রন্থ ও গ্রন্থকর্ত্তা-দের নামের ফিরিস্তীর কোনই প্রয়োজন দেখি না।

কিন্তু গোড়াতেই যদি গলদ ঘটে,—যে বোধের উপর সাহিত্য ও রূপ-কলার প্রতিষ্ঠা যদি তা'রই অভাব থাকে,—তা'হলে সে-ব্যক্তির পক্ষে সাহিত্য ও রূপ-কলার মায়া কাটানোই ভগবানের অমোঘ নির্দ্দেশ। বিপুলা বসুন্ধরায় তাঁ'র মানস-প্রকৃতির যোগ্যস্থানও ভগবান স্থির ক'রে রেখেছেন।

সব চেয়ে অদ্ভুত রহস্য এই যে, নরেশবাবু এতক্ষণ ধ'রে আব্রু ও বে-আব্রুর মধ্যে সীমানা-নির্দ্দেশের অসম্ভাব্যতা সম্বন্ধে বহু বাগ্‌বিতণ্ডা ক'রে হঠাৎ পরম অমায়িকভাবে, নিশ্চিন্তচিত্তে প্রত্যাদেশ প্রচার ক'রে বসলেন—

"বর্ত্তমান বাঙ্গলা-সাহিত্যে এমন কতকগুলি বই অবশ্যই জন্মিয়াছে যা'র সম্বন্ধে অসংকোচে বলা যায় যে, তাহা একটা শারীর ব্যাপার লইয়া ঘাঁটাঘাটি করিয়া মানুষের একটা নিকৃষ্ট বৃত্তির সেবা করিয়াছে মাত্র, তাহা লইয়া কোনও রস উদ্বোধন করে নাই।"

উদ্ধৃত অংশটুকুর মধ্যে "অবশ্যই", "অসংকোচে" প্রভৃতি শব্দগুলি বিশেষ উপভোগ্য। নরেশবাবু যে-সব বইকে তালাক্ দিয়ে দিলেন তাঁ'দের নামের ফিরিস্তা দেন নাই। সুতরাং তাঁ'র নিজের নজীর অনুসারে "বিষয়বস্তু-নির্দ্দেশ" নাই ব'লে তাঁ'র মাম্‌লাও ডিস্‌মিস্ হওয়ার যোগ্য। তবে যদি "অভ্রান্ত" কোনও "নির্দ্দেশ" দিয়ে থাকেন তা'হ'লে স্বতন্ত্র কথা। সুতরাং তাঁ'র "অভ্রান্ত" নির্দ্দেশটা একবার দেখ্‌তে হয়।

তিনি যে-সব বই-এর ধোপা-নাপিত বন্ধ ক'রতে চান তা'দের একটু পরিচয় দিয়েছেন। "তাহা একটা শারীর ব্যাপার লইয়া ঘাঁটাঘাটি করিয়া মানুষের একটা নিকৃষ্ট বৃত্তির সেবা করিয়াছে মাত্র, তাহা লইয়া কোনও রস উদ্বোধন করে নাই।"

উল্লিখিত বাক্যটিতে প্রথম "তাহা" "যার" এই সর্ব্বনামের বদলে ব'সেছে এবং "যার" ব'সেছে, পূর্ব্ব ছত্রের "বই"-এর বদলে। কিন্তু শেষের "তাহা" কা'র বদলে ব'সেছে? ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী "নিকৃষ্ট বৃত্তি"-রই তো ব্যাকরণানুসারে হওয়া সঙ্গত। তা'হলে অর্থ হয় "নিকৃষ্ট বৃত্তি লইয়া রস উদ্বোধন ক'রে নাই"; যদি দূরবর্ত্তী "শারীর ব্যাপারের" বদলে ব'সে থাকে তা'হলে অর্থ হয় শারীর ব্যাপার নিয়ে "ঘাঁটাঘাটি" ক'রছে, কিন্তু "রস উদ্বোধন" করে নাই। "ঘাঁটাঘাটি" শব্দটি রুচি-পীড়াজনক এবং বীভৎস-রসদ্যোতক ব'লে অলঙ্কারশাস্ত্রানুসারে শিষ্ট-সাহিত্যে বর্জ্জনীয়। আর ঐ সকল "বই"-এর যখন দু'খানি ক'রে হাত নেই তখন উহার ব্যবহারও হ'য়েছে নরেশবাবুর বহুনিন্দিত রূপকভাবে। "শারীর ব্যাপার লইয়া" আলোচনা কি প্রণালীতে কোন্ মাত্রায় ক'রলে "ঘাঁটাঘাটি" হ'য়ে উঠে নরেশবাবু তা'ও খোলসা বলেন নি। সুতরাং তাঁ'র নির্দ্দেশ "অভ্রান্ত" হ'তে পারে কিন্তু তা' মোটেই নির্দ্দেশ নয়।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বলা দরকার। নরেশবাবু প্রজনন প্রবৃত্তিকে "নিকৃষ্ট বৃত্তি" ব'লেছেন। "সমাজনীতি"-র ভূত রোজার ঘাড়ে ভর ক'রেছে দেখ্‌ছি। কিন্তু উহা কি যথার্থই নিকৃষ্ট? দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে উহা পরমধর্ম্ম ব'লে গণ্য হ'তে পারে। যে-দেশে লোকসংখ্যা বাড়ান অত্যাবশ্যক, সেখানে ইহা শ্রেষ্ঠধর্ম্ম। প্রাচীনকালে এ-দেশে কত রকমের পুত্র শাস্ত্র ও সমাজবিহিত ছিল নরেশবাবু তা' অবশ্যই জানেন। রবীন্দ্রনাথ এ-বিষয়ে কত সতর্ক! "যৌন-মিলনে"র যে চরম সার্থকতা মানুষের কাছে, তা' প্রজনার্থ নয়, কেননা সেখানে সে পশু", এই 'পশু' শব্দ সম্বন্ধে পাছে কেউ ভুল বুঝে সেই জন্য পরে লিখ্‌ছেন—"উপরে যে পশু-শব্দটা ব্যবহার ক'রেছি ওটা নৈতিক ভালমন্দ বিচারের দিক থেকে নয়; মানুষের বিশেষ সার্থকতার দিক থেকে।"

যাই হোক্, এটা সুস্পষ্ট যে, বাংলা-সাহিত্যে যে কলারসবিরোধী পঙ্কিলতা প্রবেশ ক'রেছে, সে-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ও নরেশবাবু একমত। সুতরাং হঠাৎ নরেশবাবুর সমরাভিযান বিশেষ রহস্যপূর্ণ। ভয়ে মানুষ অনেক সময় উগ্র হ'য়ে উঠে। নরেশবাবুর মনে রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্যীভূত গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে কোনও অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কা নেই তো? মনস্তত্ত্ববিদেরা স্থির ক'রবেন।

বাল্যকাল হ'তে "জগা-খিচুড়ী" নামক সুখাদ্যের নাম শুনে আসছি। জিনিষটি অপূর্ব্ব সন্দেহ নেই, কিন্তু এ-

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চী

পর্য্যন্ত চেখে দেখার সৌভাগ্য ঘটেনি। কি কি উপাদানে সে চিজ প্রস্তুত হয়, চেষ্টা ক'রেও তা'র সন্ধান মিলেনি। খুব সম্ভব, উপাদানের কোনও বৈশিষ্ট্য নাই, কেবলমাত্র পাচকের হাতের গুণে উক্ত অপূর্ব্ব পদার্থ সৃষ্টিলাভ করে। এতদিন পরে নরেশবাবুর কল্যাণে আমার জিহ্বা-কর্ণের বিবাদ মিটেছে। নরেশবাবুর বোধ হয়, সেই প্রথিত-যশা জগবন্ধু (বা জগন্নাথ) পাচকের নিকটই 'হাতে-হাতা' হয়েছে। এটা অবশ্য অনুমান মাত্র। যা' হোক্, নরেশ-বাবুর প্রস্তুত 'জগা-খিচুড়ী' পাঠকগণের সঙ্গেই ভোগ করা উচিত। তাঁ'রা যে, পাচকের হাতের তারিফ ক'রবেন, সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

রবীন্দ্রনাথের ভাণ্ডার হ'তে সংগৃহীত উপাদান :—

(১) যৌন-মিলনের যে চরম সার্থকতা মানুষের কাছে, তা' 'প্রজনার্থং' নয় কেননা সেখানে সে পশু। সার্থকতা তা'র প্রেমে, এইখানে সে মানুষ।"

(২) "বংশরক্ষাঘটিত পশুধর্ম্ম মানুষের মনস্তত্ত্বে ব্যাপক ও গভীর, বৈজ্ঞানিক এমন কথা বলেন। কিন্তু সে হোলো বিজ্ঞানের কথা—মানুষের জ্ঞান ও ব্যবহারে এর মূল্য আছে। কিন্তু রসবোধ নিয়ে যে সাহিত্য ও কলা, সেখানে এর সিদ্ধান্ত স্থান পায় না।"

পাচকের হাতের গুণের নমুনা :—

"দৈহিক সম্বন্ধের দিকটার বিষয়ে তাঁ'র মত এই যে রসবোধ নিয়ে যে সাহিত্য ও কলা সেখানে এর (বিজ্ঞানের) সিদ্ধান্ত স্থান পায় না।"

বলা বাহুল্য, প্রথম উদ্ধৃত অংশটিতেই রবীন্দ্রনাথ যৌন-মিলনের "দৈহিক সম্বন্ধের দিকটার বিষয়ে তাঁ'র মত" উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয়টিতে দৈহিক সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের কথাই ব'লেছেন, কিন্তু নরেশবাবুর হাতের গুণে দু'টিতে মিশে অপূর্ব্ব 'জগা-খিচুড়ী' প্রস্তুত হ'য়েছে।

এর পরই নরেশবাবু একটি অপূর্ব্ব অনুমানে উপস্থিত হ'য়েছেন। "এই কথাটা (কথাটা রবীন্দ্রনাথের নয়, নরেশবাবুর নিজের মনগড়া) পরবর্ত্তী কথার সঙ্গে সমন্বয় করিলে তাঁ'র সিদ্ধান্তটা এই বলিয়া মনে হয় যে, যৌন-মিলনের এই দিকটা লইয়া যে-সাহিত্য আলোচনা করে সেইটাই 'বিদেশের আমদানী বে-আব্রুতা' এবং তা'র উপরই তিনি কষাঘাত ক'রেছেন।" উদ্ধৃত অংশে "এই দিকটা" শব্দ দু'টি নরেশবাবু যৌন-মিলনের "দৈহিক সম্বন্ধের দিকটা" অর্থেই প্রয়োগ ক'রছেন, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। নিভাঁজ আদিরসাশ্রিত সাহিত্যটা যে এ-দেশের একটি সনাতন জিনিষ, রবীন্দ্রনাথের এ-বোধটুকুও নাই মনে ক'রলে, নিশ্চয়ই তাঁ'র এদেশী সাহিত্যের জ্ঞানের পরিসর সম্বন্ধে একটু বেশী মাত্রায় অবিচার করা হয়। অন্তত "বিদ্যাসুন্দর" বইখানি সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ একটু আধটু জ্ঞান আছে, নরেশবাবু তাঁ'র হাতের ন্যায়দণ্ডকে বিন্দুমাত্র না হেলিয়েও বোধ হয় এই ছোট দাবীটুকু মঞ্জুর ক'রতে পারতেন।

আসল কথা, রবীন্দ্রনাথ ঠিক কোন্ জিনিষটিকে হালের বিদেশী আমদানী বলেছেন সে-সম্বন্ধে নরেশবাবুর কোনও সুস্পষ্ট ধারণা নেই। বোধ হয়, "কাব্যের উপরে যুক্তির বাণ" প্রয়োগ ক'রে তিনি যে "ধোঁয়া"র সৃষ্টি করেছিলেন সেই ধোঁয়াই এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী।

রবীন্দ্রনাথ "সাধারণ সত্য" ও "সার্থক সত্যে"-র পার্থক্য পদ্মফুল ও কাঁকরের উপমা দিয়ে পরিস্ফুট ক'রে তুলেছেন। রসজ্ঞ পাঠকমাত্রেই জানেন তিনি ঐ উপমাটুকুর উপরই তাঁর সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করেন নি। সার্থক উপমা সত্যোপলব্ধির যে কিরূপ সহায়তা করে সে-কথা সুবিদিত। কিন্তু নরেশবাবু এই উপমাটিকে নিয়ে একেবারে অস্থির হ'য়ে উঠেছেন। তাঁ'র প্রত্যেক কথা আলোচনা ক'রে দেখার স্থান, সময়, প্রবৃত্তি ও প্রয়োজন এই চারেরই একান্ত অভাব। তবে পথ-চল্‌তিভাবে একটু ছুঁয়ে গেলে ক্ষতি নাই।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :—

"যে জিনিষের মধ্যে আমরা সম্পূর্ণকে দেখি সেই জিনিষই সার্থক। এক টুকরা কাঁকর আমার কাছে কিছুই নয়, একটি পদ্ম আমার কাছে সুনিশ্চিত।"

নরেশবাবু এইটুকু উদ্ধৃত করার সময় "সুনিশ্চিত" শব্দের পর বন্ধনীর হেপাজতে এবং অগ্র-পশ্চাৎ জিজ্ঞাসা

চিহ্নের পাহারায়ঃপ্রশ্ন ক'রেছেন—(? ইহা কি সার্থকের সঙ্গে একার্থবাচক ?)। এই বেতালের প্রশ্নের রাজার উত্তর এই যে,—"নিশ্চয়ই"। "সুনিশ্চিত" শব্দের যদি কোনও অর্থ থাকে তা'হ'লে তা' সুনিশ্চিত এই যে, তা'র মধ্যে আমরা তা'র সম্পূর্ণটাকে দেখি। যে-জিনিষের মধ্যে আমরা সম্পূর্ণকে যত কম দেখি তা' সেই পরিমাণেই অনিশ্চিত হ'য়ে পড়ে। ইতঃপূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে, যে-জিনিষের মধ্যে আমরা সম্পূর্ণকে দেখি, সেই জিনিষই সার্থক। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের মতে সুনিশ্চিত ও সার্থক একার্থবাচক সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। তার পর সমালোচক রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্তকে বাতিল ক'রে নিজেই পদ্ম ও কাঁকরের পার্থক্যের কারণ প্রচার ক'রেছেন যে, "পদ্ম আমাদের আনন্দ দেয় আমাদের রূপবোধকে পরিতৃপ্ত করিয়া, আর কাঁকর আমাদের পীড়া দেয়—সম্পূর্ণের প্রকাশ ও অপ্রকাশ এ-বিষয় একেবারে অপ্রাসঙ্গিক।" কাঁকর চোখে, ভাতে বা জুতার মধ্যে না ঢুক্‌লে পীড়া দেয় এ-কথা প্রমাণসাপেক্ষ। আর পদ্ম সুন্দর ব'লে আনন্দ দেয়, এ-কথা বল্‌লে বিশেষ কিছুই বলা হয় না। রবীন্দ্রনাথের অপরাধের মধ্যে এই যে, তিনি পদ্ম কেন রূপ-বোধকে পরিতৃপ্ত ক'রে আনন্দ দেয়, সে-কথাটা একটু তলিয়ে দেখার চেষ্টা ক'রেছেন। তাঁ'র সিদ্ধান্ত ভুল হ'লেও হোতে পারে, কিন্তু তা' মোটেই অপ্রাসঙ্গিক নয়। তার পর হঠাৎ নরেশবাবুর বিশ্বতোব্যাপী দৃষ্টি খুলে গেছে। তিনি লিখ্‌ছেন—"যে-ব্যক্তি এই বিশ্বব্যাপী দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র কাঁকরকে sub-specie—acternitatis দেখিতে পারিয়াছে, সে তা'র সার্থকতা লইয়া রসরচনা অনায়াসেই কবিতে পারে—ইত্যাদি।" ছেলেদের বর্ণজ্ঞান শিখাবার জন্য বর্ণপরিচয়াদি বই রচিত হ'য়ে থাকে; কিন্তু সে কেবল সাধারণ ছেলেদের জন্য। প্রহ্লাদ 'ক' দেখেই "কৃষ্ণ" স্মরণে কেঁদে আকুল হ'য়ে উঠেছিলেন। হঠাৎ যদি শিশুরাজ্যে প্রহ্লাদের বন্যা আসে, তা'হলে পাঠশালা বল, স্কুল-কলেজ বল, বিশ্ববিদ্যালয় বল সকলেরই অচিরে কৃষ্ণপ্রাপ্তি ঘটে সন্দেহ নেই।

তার পর খানিকক্ষণ ধ'রে নরেশবাবু খামখা হাওয়ার সঙ্গে লড়াই ক'রে চলেছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"যা' হোক্ এটা দেখা গেছে যে, যে-জিনিষটাকে কাজে খাটাই তা'কে যথার্থ ক'রে দেখিনে। প্রয়োজনের ছায়াতে সে রাহুগ্রস্ত হয়।" সোজা কথায়, কোন জিনিষকে কাজে খাটালে নজরটা সেই কাজের উপর গিয়েই সম্পূর্ণ পড়ে; তা'র মাপেই জিনিষটার মূল্য নিরূপণ হয়। জিনিষটা তা'র আপনার স্বরূপে যে কি, সে-দিকে মোটেই দৃষ্টি পড়ে না। কথাটা একেবারেই নূতন নয়। ভক্তি ও রসশাস্ত্রের এটা একেবারে প্রথম স্বতঃসিদ্ধ—First axiom। যথার্থ প্রেম-ভক্তি একেবারে অহেতুক, রসিক বৈষ্ণব মাত্রেই তা' জানেন। আর সৌন্দর্য্য-তত্ত্বটা রস-তত্ত্বেরই সামিল। কিন্তু এমনতো হ'য়ে থাকে, সুন্দর অথচ আমাদের কাজে লাগে—রবীন্দ্রনাথের কথায়, "আর একদিকে রাজকন্যা কাজের মানুষ।" যে আমার সংসারযাত্রার প্রধান সহায়, তা'কেই হয়তো মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসি। রবীন্দ্রনাথের মতে এরূপ হ'লেও ক্ষতি নেই। দুটো ভাবই পাশাপাশি থাক্‌তে পারে। কাজে লাগে ব'লে সুন্দরের সৌন্দর্য্য কণামাত্র কমে না। সংসারযাত্রার সহায় ব'লে প্রেমপাত্র বা প্রেমপাত্রী প্রেমের যোগ্যতা বিন্দুমাত্র হারায় না। কিন্তু এ নিয়ম খাটে কেবল সুস্থ-সবলচিত্তের পক্ষে। চিত্তের সে সবলতা না থাক্‌লে তা'কে "শুচি বায়ু"তে পেয়ে বসে। সংক্ষেপে এই তত্ত্ব বুঝিয়ে ঐরূপ "শুচি বায়ু"র উদাহরণ দিয়েছেন। উদাহরণ ক'টিতে যে একটু মৃদু ব্যঙ্গরস আছে, তা' প্রচ্ছন্ন হ'লেও সুস্পষ্ট—জুঁই ফুলের মৃদু বাসটুকুর মত। কিন্তু আমাদের সমালোচক-মশায় উদাহরণ কয়টি দেখেই, তাঁ'র সমস্ত দৃষ্টিশক্তি "নৈয়ায়িকের" দৃষ্টিশক্তিতে পরিণত ক'রে সেগুলির ফাঁক ধরার কাজে ঝাঁপিয়ে প'ড়েছেন। কাজেই "শুচি বায়ু" এই ছোট কথাটি তাঁ'র নজরে পড়েনি—ঠিক সেই বৈদ্য-প্রবরের মতো যিনি চক্ষুরোগীর "কর্ণং ছিত্বা কটিং দহেৎ"-এর ব্যবস্থা ক'রে ব'সেছিলেন,—রোগী পাওয়ার আনন্দে বই-এর পাতাটা উল্‌টিয়ে, সেটা যে গো-চিকিৎসা-প্রকরণ, সেটা দেখ্‌তে ঈষৎ একটু ভুল হওয়ায়।

"সাহিত্য-ধর্ম্মের সীমানা"-বিচার

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চী

রবীন্দ্রনাথের প্রদত্ত উদাহরণগুলিতে কোথায় কোথায় "ফাঁক" আছে ছিদ্রান্বেষী নৈয়ায়িকমশায় তা' ফাঁস ক'রে হঠাৎ আবার উজান বেয়ে গিয়ে, স্ত্রী-পুরুষের মিলনের যে দুটো দিক আছে, তা'র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্তের বিচারে প্রবৃত্ত হ'য়েছেন। তত্ত্বজ্ঞানীরা বলেন, কর্ম্মসূত্রের বন্ধনে জীবকে বারংবার সংসারে গতায়াত ক'রতে হয়। কুক্ষণে নরেশবাবুর প্রবন্ধ আলোচনা করার কর্ম্ম ঘাড়ে নিয়েছিলেম। এই দুষ্কর্ম্মের বন্ধন যতক্ষণ না ভোগের দ্বারা সম্পূর্ণ ক্ষয় হ'য়ে যায়, ততক্ষণ এইরূপই চল্‌বে। দুঃখ করা বৃথা!

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ—

"সাহিত্যে যৌনমিলন নিয়ে যে তর্ক উঠেছে সামাজিক হিত-বুদ্ধির দিক থেকে তা'র সমাধান হবে না—তার সমাধান কলা রসের দিক থেকে। অর্থাৎ যৌন-মিলনের মধ্যে যে দুটী মহল আছে মানুষ তা'র কোন্‌টিকে অলঙ্কৃত ক'রে নিত্যকালের গৌরব দিতে চায় এই হোলো বিচার্য্য।"

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের নিত্যানিত্য বস্তু এবং প্রধানতঃ যৌন-মিলনের দুটো দিকের কোনটা সাহিত্যের নিত্যরসের বিষয় হ'তে পারে, এই বিষয়ের একটু আলোচনা ক'রেছেন। তাঁ'র প্রবন্ধের গোড়ায়ও এ-বিষয়ে একটু ইঙ্গিত ক'রে গেছেন। মোটের উপর তাঁ'র সিদ্ধান্তটা এইরূপ —যে জিনিষের আপনার মধ্যে তা'র চরম পরিণাম নাই, যা অন্য কোনও উদ্দেশ্যের সোপান মাত্র, তা' সার্থক সত্য নয়। কলারস কেবলমাত্র সার্থক সত্যকেই আশ্রয় ও অলঙ্কৃত করে। স্ত্রী-পুরুষের মিলনে দৈহিক ব্যাপারের মধ্যে তা'র চরম পরিণাম নেই—তা'র উদ্দেশ্য ও পরিণাম জীব-সৃষ্টিতে। প্রেমের নিজের মধ্যে সেই চরম পরিণাম আছে। কাজেই—প্রেমই সার্থক সত্য, দৈহিক মিলন নয়। সুতরাং কলারস প্রেমকেই আশ্রয় করে। কিন্তু মানুষের অভিব্যক্তির বর্ত্তমান অবস্থায় মানুষ দেহী জীব। কাজেই অন্তরের প্রেমের মিলন বাহিরের দেহের মিলনে আপনাকে প্রকাশ্য ক'রতে চায় ও ক'রে থাকে। তখন অন্তরের প্রেমের অপূর্ব্ব আলোকে দেহের মিলনও ভাস্বর হ'য়ে উঠে। ঐরূপ প্রেমালোকদীপ্ত দৈহিক মিলন কলারসের আশ্রয় হ'তে পারে তখন প্রেমের সাহচর্য্যে সেও কলালোকে নিত্যত্ব লাভ ক'রতে সক্ষম হয়। প্রেমবিচ্ছিন্ন দৈহিক মিলনের মধ্যে সেই কলা-রসের নিত্যত্ব নাই। সাময়িক উত্তেজনা বশতঃ তা' কিছু দিনের জন্য বাহবা পেতে পারে বটে, কিন্তু তা'র মধ্যে নিত্য কালের মানবের উপভোগ-যোগ্য রস নেই। দু' কারণে প্রেম-বিচ্ছিন্ন দৈহিক মিলনের প্রসঙ্গ সাহিত্যে সমাদর লাভ করে—প্রথম লালসা উদ্দীপন হেতু, যেমন ইংলণ্ডে Restoration যুগে; দ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক কৌতূহল তৃপ্তির সহায়তা হেতু; যেমন বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সাহিত্যে। য়ুরোপীয় সাহিত্যের অনুকরণে বাংলা সাহিত্যেও সম্প্রতি ঐ বিকার প্রবেশ ক'রেছে এবং বিস্তারলাভ ক'রেছে। ওরূপ বিকার-গ্রস্ত সাহিত্য আপাততঃ যতই সমাদর লাভ করুক না কেন, ওর মধ্যে সাহিত্যিক নিত্যরস নেই।

এই তো গেল রবীন্দ্রনাথের কথা। এত অল্প পরিসরের মধ্যে এত বড় গভীর সত্য পরিস্ফুট ক'রে তোলা সাধারণ ক্ষমতার কাজ নয়। সমালোচক মশায় রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ আলোচনা প্রসঙ্গে যত কিছু প্রশ্ন তুলেছেন, সুধীও সুধীর পাঠক তা'র উত্তর ঐটুকুর মধ্যেই পাচ্ছেন। কিন্তু তা' ব'লে নিশ্চিন্ত হ'লে আমার ভোগ টুটে কৈ?

এইবার নরেশবাবুর আপত্তি শোনা যাক। গোড়াতেই একটা কথা জেনে রাখা ভাল। নরেশবাবু যে প্রতিপক্ষের মতখণ্ডনজনিত বিমল আত্মপ্রসাদে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠেছেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সে প্রতিপক্ষ তিনি স্বয়ং। রবীন্দ্রনাথের মত ব'লে তিনি যে-গুলিকে খাড়া ক'রে তুলেছেন, তা'র কারখানা তাঁ'র নিজের মগজের মধ্যে। অনেক বালক যেমন সঙ্গীর অভাবে একাই দু'পক্ষের হ'য়ে তাস সাজিয়ে নিয়ে, প্রতিপক্ষকে খেলায় হারিয়ে দেওয়ার গর্ব্ব অনুভব করে, এও কতকটা সেইরূপ।

নরেশবাবু প্রথমেই রায় প্রকাশ ক'রেছেন—"এই যুক্তির ধারার মধ্যে অনেকগুলি ফাঁক আছে।" থাকার কথাই তো; কারণ তা'রা ফাঁক সমেতই তো নরেশবাবুর কার-খানা হ'তে বেরিয়েছে। যা'হোক, নরেশবাবু কি বলেন শোনা উচিত। "প্রথমতঃ প্রয়োজন অপ্রয়োজন দিয়া কাজ হিসাবে সার্থকতা অসার্থকতার নির্ণয় হয় না।" হয়,

সে কথাতো কেউ বলেনি। অপ্রয়োজনীয় পদার্থ মাত্রেই কাব্য হিসাবে সার্থক এবং প্রয়োজনীয় পদার্থ মাত্রেই কাব্য হিসাবে অসার্থক, রবীন্দ্রনাথ কোথাও তো একথা বলেন নি। তিনি তো বরং ব'লেছেন—"যে-কবির সাহস আছে সুন্দরের সমাজে তিনি জাত বিচার করেন না। তাই কালিদাসের কাব্যে কদম্ববনের এক শ্রেণীতে দাঁড়িয়ে শ্যামজম্বু-বনান্তও আষাঢ়ের অভ্যর্থনা ভার নিল।"

তারপর নরেশবাবু ব'লছেন,—দ্বিতীয়তঃ যৌন সম্বন্ধের যে-দিকটা তিনি পশুধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাকে চিরকালই রসের বিচারে অসার্থক একথা বলা ঠিক নয়।"

"চিরকাল কথাটার তাৎপর্য্য বুঝতে পারলেম না। কোন্ শতাব্দী পর্য্যন্ত উহা সার্থক ছিল এবং কবে হোতে অসার্থক হোতে সুরু হোলো, নরেশবাবু তা' জানান নি।

অথ নরেশবাবু—"কবির কাব্য চিরদিনই কেবল মানসিক প্রেম লইয়া সীমাবদ্ধ না থাকিয়া দৈহিক ব্যাপারে আপনার সার্থকতা খুঁজিয়াছে; চুম্বন আলিঙ্গন ছাড়িয়া খুব কম কাব্যই প্রেমের চিত্র রচনায় সার্থকতা লাভ করিয়াছে।"

"মানসিক প্রেম" পদার্থ টা কি বুঝিলাম না। "শারীরিক প্রেম" নামে আর কোনরূপ প্রেম আছে নাকি? মাংসের প্রতি মাংসাশীর যে টান স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের রক্তমাংসের দেহের প্রতি সেইরূপ যে অন্ধ টান তাকেই কি তিনি "শারীরিক" প্রেম মনে করেন? "প্রেম লইয়া সীমাবদ্ধ" থাকা ব্যাপারটাই বা কি?

রবীন্দ্রনাথ কোনও দিন কোথাও ভুলক্রমে দেহটাকে বাতিল ক'রে দিয়েছেন এরূপ তো মনে পড়ে না। তাঁর নিজের কথা এই—"প্রেমের মিলন আমাদের অন্তর বাহিরকে নিবিড় চৈতন্যের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত ক'রে তোলে।" বাহির অর্থে যে দেহ সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। স্থানান্তরে তিনি লিখেছেন—

"প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে,
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন।"

শুনেছি সেকালের কোনও ইংরাজী-অনভিজ্ঞ উকীল বড় বড় ইংরাজী আইনের বই নিয়ে আদালতে যেতেন। কারণ জিজ্ঞাসায় জানিয়েছিলেন—To frighten the Judge!" বোধ হয় ঠিক সেই কারণেই নরেশবাবু এই প্রসঙ্গে কালিদাসের "মেঘদূত, ঋতুসংহার" ও চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির পদাবলীর নামোল্লেখ ক'রেছেন। মেঘদূত সম্বন্ধে নীরব থাকাই কর্ত্তব্য ছিল, তবুও নরেশবাবুকে কেবল একটীমাত্র অনুরোধ করি—যেখানে বিরহে প্রেমিকের "বলয়ভ্রংশরিক্ত-প্রকোষ্ঠ" অবস্থা ঘটে, সেখানে প্রেমের গভীরতা যে কতখানি, তিনি যেন একবার ভেবে দেখেন।

"ঋতু সংহারে" ঋতুর বর্ণনাটাই কাব্য হিসাবে সার্থক—সম্ভোগ মিলনের ছবিটা নয়। বড় কবির রচিত কাব্যের সকল অংশই যে কাব্য হিসাবে সার্থক, এ-কথা তিনি কি ক'রে জানলেন? বিদ্যাপতির নামে কতকগুলি সম্ভোগ-মিলনের-পদ প্রচলিত আছে সন্দেহ নেই; তার সকলগুলিই যে বিদ্যাপতির রচিত সে-কথাও জোর ক'রে বলা যায় না। আর বৈষ্ণব কবিদের রচিত সম্ভোগ মিলনের পদাবলী সম্বন্ধে আলোচনা ক'রতে হ'লে একটু সন্তর্পণেই করা উচিত। কোনও প্রকৃত রসিক বৈষ্ণব সে সকল ব্যাপারকে প্রাকৃত জীবের প্রাকৃত দেহ সম্বন্ধীয় লীলা ব'লে মনে করেন না। শ্রীযুক্ত রূপ গোস্বামী তাঁর "উজ্জ্বল নীলমণি"—নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে পুনঃ পুনঃ সাবধান করে দিয়েছেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু স্বয়ং এই সব পদাবলী শুনে মহাভাব প্রাপ্ত হ'তেন। শ্রীজীব গোস্বামীর মতো নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীও এই-সব রস গ্রন্থের বিস্তৃত টীকা ভাষ্য ক'রেছেন। সে-কথা ছেড়ে দিয়ে লৌকিক ভাবে দেখলেও, বিদ্যাপতির যে-সব পদ রসলোকে অমরত্ব লাভ ক'রেছে, তা'র একটীও সম্ভোগ মিলন বর্ণনাত্মক নয়। গোটা কয়েক নাম ক'রলেই সকলেই সে-কথা স্বীকার করবেন। "সজনি ভাল করি পেখন না ভেল"; "মাধব! তব বিধুবদনা"; "অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরী ভেলি মাধাই"; "সজল নয়ন করি, পিয়াপথ হেরি হেরি, তিল এক হয় যুগ চারি"; "এ-সখি হামারি দুখের নাহি ওর"; "সজনি কো কহই আওব মাধাই, কতদিনে ঘুচব ইহ হাহাকার"; "আজু রজনী হাম ভাগ্যে পোহায়নু"; "কি কহব রে সখি আনন্দ ওর"; "সখি কি পুছসি অনুভব মোর"। বিদ্যাপতির ভাণ্ডারে রস-হিসাবে

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী

সার্থক আরো বহু পদাবলী আছে। নিছক সম্ভোগ-মিলনে যে নিত্যরস থাকতে পারে না, রসজ্ঞ সমালোচক স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটী কথায় তা' সুন্দর ব্যক্ত ক'রে-ছিলেন। গীতগোবিন্দ কাব্যের আলোচনা উপলক্ষ্যে তিনি লিখেছিলেন—"গীতগোবিন্দ কাব্যে গীত থাকিলেও থাকিতে পারে কিন্তু গোবিন্দ নাই।"

আর চণ্ডীদাসের নামের সহিত সম্ভোগ-মিলনের ভাব এক সঙ্গে মনে আসাই যাকে ইংরাজীতে বলে Sacrilege, বৈষ্ণবেরা যাকে বলে থাকেন "সেবাপরাধ" তাই—এখানে অবশ্য সাহিত্য-সেবাপরাধ। এ অপরাধ জ্ঞানকৃত হ'লে তার প্রায়শ্চিত্ত নেই, অজ্ঞানকৃত হ'লে তা'র একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত উপযুক্ত রসিক গুরুর নিকট হ'তে চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠ পদগুলি সম্বন্ধে উপদেশ নেওয়া। তবে ভগবৎ-কৃপা ভিন্ন ফল লাভ সম্ভব নয়। চণ্ডীদাসের অপূর্ব্ব প্রেম-পদাবলীর একটীও আমি এখানে তুলব না। সত্য কথা ব'লতে গেলে যে-ব্যক্তি সম্ভোগ মিলন প্রসঙ্গে চণ্ডীদাসের পদাবলীর উল্লেখ করেন তাঁর নিকট ঐগুলির উল্লেখ ইচ্ছা করলেও আমার দ্বারা ঘটে উঠ্‌বে না! নরেশবাবু যদি পারেন আমাকে ক্ষমা করবেন। তবে চণ্ডীদাসের প্রেমের আদর্শ সম্বন্ধে বহুপূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছিলেন সেটুকু তুলে দিলে কথাটা পরিষ্কার হবে:—"সে-ভাব (প্রেম সাধনার ভাব) তাঁহার সময়কার লোকের মনোভাব নহে, সে-ভাব এখনকার সময়েরও ভাব নহে, সে-ভাবের সময় ভবিষ্যতে আসিবে।" চণ্ডীদাসের প্রতিভার মর্ম্ম-কথার পরিচয় তাঁর একটী পদে ফুটে উঠেছে:—

"রজনী দিবসে, হব পরবশে, স্বপনে রাখিব লেহা,
একত্র থাকিব নাহি পরশিব, ভাবিনী ভাবের দেহা।"

এই "ভাবিনী ভাবের দেহা" কথাটির যা মর্ম্মগত সত্য তারই উপলব্ধি সম্বন্ধে অসাড়তার ফলেই বর্ত্তমানে সাহিত্যে যত কিছু বিড়ম্বনা। একি মানবজাতির মর্ম্মস্নায়ুর পক্ষাঘাতের লক্ষণ?

নরেশবাবু এরপর আবার রসকলার দৈহিক ব্যাপারের স্থান সম্বন্ধে আলোচনা সুরু ক'রেছেন। তিনি এ-আলোচনা অনন্তকাল ধ'রে করুন—আমি কিন্তু "পাদমেকং ন গচ্ছামি" স্থির ক'রেছি। নরেশবাবুর পাঠকবর্গের প্রতি তাঁর যদি অনুকম্পা না থাকে সে বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই; কিন্তু আমার নিজের বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি আমার তো একটু দরদ আছে। ক্রমাগত একই খাদ্য পুষ্টি-লাভের পক্ষে অনুকূল নয়, এ একটী পরীক্ষিত সত্য।

এই প্রসঙ্গে একটী সাধু সঙ্কল্প মনে উদিত হ'য়েছে—গুরুর সঙ্গে শিষ্যের সন্ধিস্থাপনের জন্য একবার বিধিমত চেষ্টা ক'রে দেখ্‌ব। আসলে যে কোনও বিবাদের কারণ নাই, নরেশবাবুর মোহ কেটে গেলে, তিনিও তা' জলের মত বুঝ্‌তে পারবেন। নরেশবাবু ও রবীন্দ্রনাথের লেখা হ'তে একটু একটু তুলে দিলেই পাঠকেরা বুঝ্‌তে পারবেন যে, রবীন্দ্রনাথের যে-উক্তিতে নরেশবাবু সমরসজ্জা ক'রেছেন, নরেশবাবু নিজেও সেই কথাই ব'লেছেন—অবশ্য তাঁর অভ্যস্ত ভাষা ও ভঙ্গীতে।

নরেশবাবুর উক্তি:—

"যৌন সম্বন্ধের শারীর ব্যাপার লইয়া ঘাঁটাঘাটি করিয়া পাঠকের চিত্তের রিরংসার উপর বাণিজ্য করা...নিত্য অনিত্য কোনও রূপ রসই নয়........."

রবীন্দ্রনাথের উক্তি:—

".........বংশরক্ষার মুখ্য তত্ত্বটীতে সেই দীপ্তি নাই।

(নরেশবাবুর উল্লিখিত যৌন সম্বন্ধের শারীর ব্যাপার)

"যৌন মিলনের যে চরম সার্থকতা মানুষের কাছে তা' 'প্রজনার্থং' নয় কেননা সেখানে সে পশু।" (পুনরায় নরেশ বাবুর উল্লিখিত শারীর ব্যাপার)

"সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে বিদেশের আমদানী যে একটা বে-আব্রুতা এসেছে সেটাকেও এখানকার কেউ কেউ মনে করেন নিত্য-পদার্থ;"

নরেশবাবুর লেখাতে "ঘাঁটাঘাটি" শব্দের যা অর্থ, 'বে-আব্রুতা'রও ঠিক সেই তাৎপর্য্য। খুব সম্ভব ঘাঁটাঘাটি শব্দটী সংস্কৃত উদ্ঘাটন শব্দ থেকে জাত। উদ্ঘাটন—আবরণ উন্মোচন—বে-আব্রুতা।

সুতরাং দেখা গেল আসল বিষয়ে উভয়ের মতের মিল আছে। কেবল একটী বিষয়ে অনৈক্য দেখা যায়—তা'ও সহজেই মিটে যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের মতে এই

বে-আব্রুতার জন্ম—য়ুরোপের বৈজ্ঞানিক কৌতূহল চরিতার্থতা চেষ্টার অন্ধ অনুকরণে। নরেশবাবু মনে করেন ওটি পাঠকদের মনে রিরংসা উদ্দীপনের ইচ্ছা থেকে সঞ্জাত। সেনাপতি মহাশয় তাঁর নিজের দলের সৈন্যগণকে প্রতিপক্ষের চেয়ে নিশ্চয়ই ঢের ভাল ক'রে চিনেন। সুতরাং, আশা করি, রবীন্দ্রনাথ নরেশবাবুর "সংশোধন"টুকু বিনা দ্বিধায় গ্রহণ ক'রবেন। অনর্থক ভদ্রসন্তানদের "রিরংসা উদ্দীপন চেষ্টার গৌরব হ'তে বঞ্চিত করা রবীন্দ্রনাথের মতো মহৎ লোকের পক্ষে উচিত হয় না।

এর পর নরেশবাবু পুনরায় সেই সীমানা নির্দ্দেশের মামলা তুলেছেন। "যাহা রসরচনা ও যাহা কেবলমাত্র কদর্য্য ইন্দ্রিয়বিলাস তা'র মধ্যে প্রকৃত সীমা-নির্দ্দেশটাই আসল কথা।......... রবীন্দ্রনাথ যে কোথায় সীমারেখা টানিতে চান বুঝা গেল না।" কাজেই নরেশবাবুকে সে গুরুতর কাজের ভার নিজের হাতেই নিতে হোলো। নরেশবাবু রীতিমত পিলারবন্দী ক'রে এরূপ সীমা নির্দ্দেশ ক'রছেন:—"যাহা আমাদের রসবোধে সাড়া জাগায় সেটা আবৃত হোক, অনাবৃত হোক, তাহা আর্ট—আর যাহা রসবোধে সাড়া দেয় না, কেবল মানুষের পাশুপ্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করে তাহা আর্ট নয়।........ এই যে প্রভেদ ইহা একটা গভীর আধ্যাত্মিক প্রভেদ যাহার স্বরূপ প্রত্যেক রসজ্ঞ স্বীকার করিবেন কিন্তু অরসিককে অন্য কোনও বাহ্যলক্ষণ দিয়া বুঝাইবার কোনও উপায় নাই।"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে নরেশবাবুর মতে রসরচনা ও কদর্য্য ইন্দ্রিয়-বিলাসের মধ্যে প্রভেদ একটা গভীর আধ্যাত্মিক প্রভেদ যা'র অস্তিত্ব রসজ্ঞের রসের উপলব্ধিতে,—যে তা' বাহ্য লক্ষণ দিয়ে বুঝতে চায় সে লোক রসিক নয়। দেখা যাক্ রবীন্দ্রনাথ কিরূপ প্রভেদ ক'রেছেন। তিনি ব'লেছেন—

"আমাদের এই বোধের ক্ষুধা আত্মার ক্ষুধা। যে প্রেমে, যে ধ্যানে, যে দর্শনে কেবলমাত্র এই বোধের ক্ষুধা মিটে তাই স্থান পায় সাহিত্যে রূপকলায়"

যদি আধ্যাত্মিক ব'লে জগতে কিছু থাকে—তা'হ'লে উপরি উদ্ধৃত অংশের প্রতি অণু-পরমাণু আধ্যাত্মিক। এরূপ আধ্যাত্মিক প্রভেদ সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ ক'রে দেওয়া সত্বেও নরেশবাবুর মন ওঠেনি, তিনি অভিযোগ ক'রেছেন—"রবীন্দ্রনাথ যে কোথায় সীমারেখা টানিতে চান বুঝা গেল না।" সুতরাং মনে হয় তিনি বোধ হয় একটা বাহ্য লক্ষণ দাবী করছেন। নতুবা তাঁ'র অভিযোগের কোনও অর্থ পাওয়া যায় না। আর বাহ্য লক্ষণ যে দাবী করে, তা'র সংজ্ঞা নরেশবাবু নিজেই নির্দ্দেশ ক'রে দিয়েছেন। সুতরাং—তাঁর নিজের প্রদত্ত ছাড়পত্রের (Passport) বলেই তিনি যে অরসিকের গোলকধামে উত্তীর্ণ হয়েছেন, একথা নরেশবাবুকে মান্‌তেই হবে।

আরও একটা জিনিষ লক্ষ্য করার আছে। নরেশবাবু "রসবোধে সাড়া জাগায়" এবং "গভীর আধ্যাত্মিক প্রভেদ" ব'লে যেখানে হাল ছেড়ে দিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ তা' ছাড়িয়েও আরও গভীরতর মর্ম্মে প্রবেশ ক'রে "রসবোধে সাড়া জাগাবার" নিদানতত্ত্ব নির্ণয়ের চেষ্টা ক'রেছেন। এ-সত্বেও রবীন্দ্রনাথের নির্দ্দিষ্ট প্রভেদটা যে 'বাহ্য' প্রভেদ মাত্র, নরেশবাবু এইরূপ 'রুল' জারি ক'রেছেন। হয়তো বা "চৈতন্য রামানন্দ সংবাদে" উল্লিখিত মহাপ্রভুর ভাবে ভাবিত হ'য়ে নরেশবাবু "এহ বাহ্য" "এহ বাহ্য" শব্দের নির্দ্দেশ দ্বারা রায় রামানন্দকে—শ্রীবিষ্ণু!—রবীন্দ্রনাথকে রসলোকের অন্তরতম বৈকুণ্ঠের পথ প্রদর্শন ক'রেছেন। কিন্তু এ-সব মহাপ্রভুজনসুলভ ব্যাপারে মাদৃশ প্রাকৃত জনের নীরব থাকাই শ্রেয়।

তবে একটী ছোট কথা জানালে ক্ষতি নেই। রবীন্দ্রনাথ কেবল রসবোধের আব্রু ও আভিজাত্যের কথাই ব'লেছেন—সাড়ী জ্যাকেট ব্লাউস পেটিকোটের কথা তাঁর মনের ত্রিসীমানার ধার দিয়েও যায় নি। তাঁর কথাটা এই—"মানুষের রসবোধে যে আব্রু আছে, সেইটেই নিত্য—যে আভিজাত্য আছে রসের ক্ষেত্রে সেইটেই নিত্য।" সুতরাং নরেশবাবুর নগ্ন-নারীমূর্ত্তি, Venus of Milo প্রভৃতির উল্লেখ নিতান্তই অসংবদ্ধ আলাপ মাত্র।*

আসলে আব্রু জিনিষটা অন্তরের—যাকে সংস্কৃত কবিরা

* মুদ্রাকর সাবধান হবেন—"আলাপ স্থানে যেন প্রলাপ ছাপা না হয়"।

"সাহিত্য-ধর্ম্মের সীমানা"-বিচার

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চী

"শ্রী" বস্তের এবং বা "শ্রী"র কমলাসন। এই প্রসঙ্গে লর্ড বায়রণের উল্লিখিত তাঁর নিজের জীবনের একটা অভিজ্ঞতা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। সকলেই জানেন মানব জাতির প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা বশতঃ তিনি ভাষায় ও আচরণে সংযম রক্ষা ক'রে চলা আবশ্যক মনে ক'রতেন না। বড় বড় নামজাদা সাধু পুরুষের সঙ্গে আচরণেও এর ব্যতিক্রম ঘট্‌ত না। অনেকে মুখে রাগ প্রকাশ ক'রতেন বটে, কিন্তু কারো কাছে কোনও দিন বায়রণের এজন্য যথার্থ লজ্জা অনুভবের কারণ ঘটে নি। কেবল একবার মাত্র এর অন্যথা ঘটেছিল —শেলীর নিকটে। তাঁর একটা অসংযত বে-আব্রু কথায় শেলীর সমস্ত দেহে এমন একটা সকরুণ বেদনা ও কুণ্ঠার ভাবের বিকাশ হ'য়েছিল যে তাঁর মতো দুর্দ্ধর্ষ সিংহকেও মাথা নত ক'রতে হয়েছিল। শেলীর অন্তরপ্রকৃতির রসবোধের চেতনা একান্ত সুকুমার ছিল ব'লেই তিনি এরূপ পীড়া অনুভব ক'রেছিলেন। নতুবা শেলী যে, সাধারণ সামাজিক যৌননীতির ধার ধারতেন না একথা সর্ব্বজনবিদিত।

তারপর দুইটী প্যারা ধ'রে ভিক্টোরিয়া যুগের শ্লীল সাহিত্য, অপাংক্তেয় বিষয়-সংশ্লিষ্ট-রসবিচিত্র য়ুরোপীয় সাহিত্য ও তস্য বিকৃত পদাঙ্কানুসারী য়ুরোপীয় সাহিত্যের আলোচনা ছলে, পুনঃ পুনঃ "বাহ্য" এই ত্র্যক্ষর মন্ত্র জপ ক'রতে ক'রতে নরেশবাবু "অবশেষে উপনীত রাজপুতনায়" —অর্থাৎ বঙ্গ-সাহিত্য-ক্ষেত্রে। প্রথমেই তিনি বল্‌ছেন "—বঙ্গ-সাহিত্যেও এই নূতন প্রেরণার একটা প্রতিঘাত দেখা দিয়াছে একথা সত্য।"

ব্যাকরণের সাধারণ নিয়মানুসারে অন্বয় ক'রলে "এই" এই সর্ব্বনামটী পূর্ব্ব প্যারায় যে প্রেরণার উল্লেখ আছে তাকেই বুঝায়। অর্থাৎ "তাঁদের বিকৃত পদাঙ্কের অনুসরণে ইউরোপে বর্ত্তমান যুগে অনেক স্থলে একটা নিদারুণ উচ্ছৃঙ্খলতা, সাহিত্যের নামে বীভৎস অশ্লীলতা ও ব্যভিচার গজাইয়া উঠিয়াছে—" এই অংশটাকেই লক্ষ্য ক'রছে। বঙ্গ-সাহিত্যেও এই নূতন প্রেরণার একটা প্রতিঘাত দেখা দিয়াছে—একথা সত্য।

ব্যাকরণের নিয়মের উপর একান্ত নির্ভর সব সময়ে নিরাপদ নয়। সুতরাং সুধী সমাজে—"আভ্যন্তরীণ প্রমাণ" ব'লে যে প্রমাণের উল্লেখ দেখা যায়, তা'র সাহায্যে ব্যাকরণানুযায়ী সিদ্ধান্তটা যাচাই ক'রে দেখা ভাল। প্রবন্ধে স্থানাভাব, সুতরাং সে ভার আমি পাঠকদের উপরই দিচ্ছি। উক্ত প্রমাণ প্রয়োগের ফলে তাঁদের ধ্রুব প্রতীতি জন্মাবে যে, নরেশবাবু যা' লিখেছেন, তা' অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

নরেশবাবু তাঁর সৈন্যদলের দিগ্বিজয়ের কাহিনী নিম্নলিখিতভাবে সদম্ভে প্রচার ক'রেছেন :—"ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গ-সাহিত্যে যে প্রদেশ শিষ্ট সাহিত্যের সীমা-বহির্ভূত বলিয়া বর্জ্জিত ছিল তা'র ভিতর প্রবেশ করিয়া একাধিক সাহিত্যিক নূতন রস সৃষ্টির আয়োজন করিয়াছেন।" "বিষয় বস্তু নির্দ্দেশের" অভাব বশতঃ কথাটা সম্পূর্ণ বোধগম্য হ'লো না। প্রথম প্রশ্ন স্বভাবতঃ উঠে—"একই বা কে এবং অধিকই বা কোন্ ব্যক্তি?" এটার যথাযথ উত্তর পেলে নরেশবাবুর প্রবন্ধের মর্ম্মার্থ জলের মতন পরিষ্কার হ'য়ে যাবে। তারপর দ্বিতীয় প্রশ্ন এই—"নূতন" শব্দটা রসের বিশেষণ না আয়োজনের? যদি "রস" উহার লক্ষ্য হয়, তা'হ'লে কারো বোধ হয় কোনও আপত্তির কারণ থাক্‌তে পারে না। কারণ, এ রস যে চিরন্তন কলারস হ'তে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটা 'নূতন' রস, সে বিষয়ে কারো কোনও সন্দেহের বিন্দুমাত্র কারণ থাকতে পারে না।

পুনশ্চ :—"তা'র মধ্যে কতকটা যৌন সম্বন্ধের পূর্ব্বনিষিদ্ধ দেশ হইতে সংগৃহীত।" এখানেও বিষয়-বস্তু নির্দ্দেশের সম্পূর্ণ অভাব। যৌন সম্বন্ধ দু'রকমের হ'তে পারে। প্রথম শাস্ত্র ও সমাজ-বিহিত; দ্বিতীয় শাস্ত্র ও সমাজ-নিষিদ্ধ। শাস্ত্র ও সমাজ-বিহিত যৌন সম্বন্ধের আর এক নাম বিবাহ। বিবাহের নিষিদ্ধ দেশ, দেশ ও ধর্ম্মানুসারে—অসবর্ণ বিবাহ, সগোত্র বিবাহ, শ্যালিকা বিবাহ ইত্যাদি। আর দ্বিতীয় প্রকার যৌন সম্বন্ধের নিষিদ্ধ দেশ —পরস্ত্রীগমন, Incestuous relation প্রভৃতি। এই উভয়বিধ নিষিদ্ধ দেশের কোন্ দেশের ডাল তরু হতে তাঁদের নূতন রস সংগৃহীত হ'য়েছে, বিষয় নির্দ্দেশের অভাবে সেটা ঠিক বুঝা গেল না।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে নাকি অদৃশ্য অক্ষরে ভালমন্দ নির্ব্বিচারে এই নব সাহিত্যিক-দলের সকলের সৃষ্ট সকলবিধ

রসকেই "অনিত্য"• ব'লে "ভাসিয়ে" দিয়েছেন। এই নূতন রসের আপেক্ষিক গুরুত্ব (specific gravity) জানলে তা ভাসবে কি ডুববে এবং কিসে ভাসবে, তা' বৈজ্ঞানিক ব'লে দিতে পারবেন। এজন্য নরেশবাবুর বড় গোসা জন্মেছে। "সাহিত্য ধর্ম্ম"-প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তবিধ অপরাধের কোনও রূপ প্রমাণ না পাওয়ায়, এ-পক্ষ লেখককে বিনীতভাবে নিবেদন ক'রতে হয় যে, নরেশবাবুর মানসিক উত্তাপের পরিমাণ ১০০ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেডের চেয়ে বেশী জেনেও, আমি তাঁর সঙ্গে সহানুভূতি প্রকাশে একান্ত অসমর্থ। এই প্রসঙ্গে ইংলণ্ডের ডাক্তার জন্সনের সহিত রবীন্দ্রনাথের তুলনা ক'রে নরেশবাবু যে-রসের সৃষ্টি ক'রেছেন তা'র যথার্থ নিকাশের ক্ষেত্র মাসিক পত্রের পৃষ্ঠা নয়, মানুষের মুখমণ্ডল।

সাময়িক উত্তেজনা মাঝে-মাঝে সাহিত্যের ক্ষেত্র অধিকার ক'রে তা'র প্রকৃতি অভিভূত ক'রে ফেলে, এই সত্যের দৃষ্টান্ত স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বর গুপ্তের "পাঁঠা" ও "তপসে মাছ" সম্বন্ধীয় কবিতা দু'টির উল্লেখ করেছেন। নরেশবাবু অবশ্য তা'র প্রতিবাদ করেছেন। প্রতিবাদ খুব সম্ভব ভালই হ'য়েছে—ঠিক মতো বুঝ্তে পারি নি ব'লে নিশ্চয় ক'রে কিছু ব'লতে পারলেম না। তবে আমি যদি নরেশবাবু হ'তেম, তা' হ'লে এইরূপ লিখতেম;—"আজকাল কলিকাতার বাজারে ঈশ্বর গুপ্তের সময়ের মত নধর পুষ্ট কচি পাঁটার অভাব ঘটায় এবং ষ্টীমার প্রভৃতির উপদ্রবে ও Septic tank-এর ময়লার দৌরাত্ম্যে তপসে মাছের পূর্ব্বের স্বাদ না থাকায় উহারা রসসৃষ্টি ক'রতে অক্ষম হ'য়ে প'ড়েছে। কিন্তু ইংলণ্ডের "Roast pig"-এর স্বাদ বিন্দুমাত্র নূতন না হওয়ায়, উহা ইংরাজদের রসসৃষ্টির কাজ সমানভাবে চালিয়ে যাচ্ছে।" বোধ হয় এরূপ প্রতিবাদেও ফলের ইতর-বিশেষ বেশী কিছু হোতো না।

এই প্রসঙ্গে নরেশবাবু রবীন্দ্রনাথের যৌবন কালের রচিত এবং নরেশবাবুর যৌবনকালে বহুল প্রচলিত, কিন্তু অধুনা বিস্মৃতপ্রায়, কবিতা ও গানের উল্লেখ ক'রে মন্তব্য প্রকাশ ক'রেছেন—"তাহা হইতে এ-সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, তা'র বিষয়-বস্তু রসহিসাবে অচল—ইহাও বলা যায় না যে, সে কবিতা ও গানগুলি সত্যসত্যই সার্থক রসরচনা নয়।" স্থায়ী বা নিত্য রসের আশ্রয়ীভূত বিষয়-বস্তুর অভাবই যে কবিতা ও গান অচল হওয়ার একমাত্র কারণ, এমন কথা রবীন্দ্রনাথ তো কোথাও বলেন নি। উহা অন্ত-তম কারণ মাত্র। আরও পাঁচটা কারণে ওরূপ ঘটা সম্ভব। নরেশবাবুর মতো নৈয়ায়িকের ওরূপ ভুল হওয়া একান্ত দুঃখের বিষয় সন্দেহ নেই।

নরেশবাবু রবীন্দ্রনাথের "বিদেশের আমদানী" বিশেষণ-টার জন্য বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয়েছেন এবং সাভিমানে জানাচ্ছেন যে রবীন্দ্রনাথের নিকট হতে ওরূপ কটাক্ষপাত কোনও মতেই প্রত্যাশা করেন নি। আলো যে জানালা দিয়েই আসুক না কেন তাতে কিছু যায় আসে না, যদি তাতে অন্তরের মণিরত্ন উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠে; আর পদ্ম সরোবরের নিজের দেওয়া আলোতে না ফুটে আকাশের আলোতে ফুটে উঠে ব'লে কেউ তাকে দোষ দেয় না। এই দুই উপমা দ্বারা নরেশবাবু নিজের কথাটা ফুটিয়ে তুলেছেন। কোনও দিকের কোনও বিশেষ জানালা বা কোনও বিশেষ স্থানের বিশেষ আলোর প্রতি রবীন্দ্রনাথের কোনও পক্ষপাত আছে, এ-কথা তাঁর অতি বড় শত্রুও কোনও দিন বলে নি। বরঞ্চ, পশ্চিমের জানালাটার দিকেই ইদানীং তাঁর কিছু পক্ষপাত হয়েছে, সম্প্রতি সেইরূপ অপবাদই পেট্রিয়টদের মুখে শোনা যায়। যা'হোক্ একথা বিশ্ববিদিত যে, তাঁর 'বিশ্বভারতীর' একমাত্র কাজ পৃথিবীর সব দেশের সব দিকের সকল জানালা দরোজা সম্পূর্ণ খোলা ও চিরদিন খুলে রাখা। তাঁর একমাত্র আপত্তি, সম্মোহন ক্রিয়াধীন (Hypnotised) ব্যক্তিরা যে-সে-জিনিষকে আলো, মণিরত্ন, পদ্মফুল প্রভৃতি ব'লে ভুল করেছে ব'লে। তিনি সেই সম্মোহনের নেশাটুকুই ছুটিয়ে দিতে চান।

তা'র পর নরেশবাবু রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক কৌতূহল নিবৃত্তি সম্বন্ধীয় কটাক্ষের কথা উল্লেখ ক'রে লিখেছেন—"তাছাড়া এ-সাহিত্যের সম্বন্ধে তিনি এমন কথা বলিয়াছেন যাহা হইতে অনুমান হয় যে, এ-সাহিত্য কতকগুলি বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠিত সত্যকে আশ্রয় করিয়া—কোনও রূপরসের বিচার না করিয়া—বিজ্ঞানের সত্যকে সাহিত্যে চালাইবার চেষ্টা করিয়াছে।"

"সাহিত্য-ধর্ম্মের সীমানা"-বিচার

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চী

এদেশের লোকে বিজ্ঞান আলোচনা ক'রে থাকে, বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত সত্য সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান আছে এবং সেই জ্ঞানলব্ধ তথ্য সাহিত্যে চালিয়ে থাকে, এদেশের লোকের সম্বন্ধে এরূপ গুরুতর অপবাদের কথা রবীন্দ্রনাথ কোথায় করলেন? তাঁর নিজের কথাটা তো ঠিক অন্যরূপ :—

"যে দেশে বিজ্ঞানের অপ্রতিহত প্রভাবে অলজ্জ কৌতূহল-বৃত্তি দুঃশাসন মূর্ত্তি ধ'রে সাহিত্য-লক্ষ্মীর বস্ত্র হরণের অধিকার দাবী করছে, সে দেশের সাহিত্য অন্ততঃ বিজ্ঞানের দোহাই পেড়ে এই দৌরাত্ম্যের কৈফিয়ৎ দিতে পারে। কিন্তু যে-দেশে অন্তরে বাহিরে, বুদ্ধিতে ব্যবহারে বিজ্ঞান কোনও খানেই প্রবেশাধিকার পায়নি, সে-দেশের সাহিত্যে ধার করা নকল নির্লজ্জতাকে কার দোহাই দিয়ে চাপা দিবে?"

এই প্রসঙ্গে নরেশবাবু দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ ক'রেছেন যে, কোনও এক বক্তা (শ্রীমান অমলচন্দ্র হোম নাকি?) তাঁর (নরেশবাবুর) বইগুলি সম্বন্ধে Criminolgy-র উপর প্রতিষ্ঠিত ব'লে অপবাদ দিয়াছেন, অথচ প্রকৃত প্রস্তাবে, তাঁর একখানি মাত্র বই-এর একস্থলে মাত্র Criminolgy এই শব্দটী আছে এবং একটিমাত্র অবান্তর স্ত্রীচরিত্রে উক্ত বিজ্ঞানের কিছু আলোচনা আছে; এ-ছাড়া তাঁর আর কোনও বই-এ এ-জিনিষের নাম গন্ধও নাই।* রবীন্দ্রনাথ যদি তাঁর লক্ষ্যীভূত বইগুলির নামের ফিরিস্তী দিতেন তা'হ'লে বোধ হয়, নরেশবাবু প্রমাণ করে দিতে পারতেন যে, উক্ত বক্তার মত রবীন্দ্রনাথের কথার ভিত্তিও অতি ক্ষীণ এবং অনিশ্চিত। ভবিষ্যৎ বিপদাশঙ্কা অনেক সময় অজ্ঞাতসারে মানুষকে সাবধান ক'রে দেয়—যাকে ইংরাজীতে বলে Presentiment! বোধ হয় সেই জন্যই উক্ত নামের ফিরিস্তী তাঁর প্রবন্ধের একান্ত অপরিহার্য্য অঙ্গ এ-কথা জানা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ তা' তাঁর প্রবন্ধের সঙ্গে জুড়ে দেন নি।

*কেবল মাত্র ইহার দ্বারাই প্রতিপক্ষের অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণ হয় না যে খবরে অত্যন্ত জ্ঞান অজ্ঞাত সারে রচনায় প্রবেশ করতে পারে ও করে থাকে। তাহারা যদি বিদেশী বইএর অনুসরণ হয় তাহলে মূল গ্রন্থকার কি করেছেন না করেছেন সে কথা তাঁর জানা নাও থাকতে পারে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কথার ভিত্তি "অতি ক্ষীণ ও অনিশ্চিত" এ-প্রমাণ ক'রে দিতে পারতেন মনে ক'রেও নরেশবাবুর সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি হয় নি। কল্পিত প্রতিদ্বন্দ্বীকে স্পর্দ্ধাসহকারে সম্মুখ সমরে আহ্বান ক'রেছেন, যাকে ইংরাজীতে Challenge করা বলে। সেই Challenge-এর একটু নমুনার রস পাঠকদের পক্ষে উপভোগ্য হবে মনে হয়। "যে-সব লেখা সাহিত্য-পদবাচ্য তার সম্বন্ধে সাধারণভাবে একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, সেগুলি বিজ্ঞানের বই হইতে উপাদান কুড়াইয়া লেখা নয়—জীবনের প্রত্যক্ষ দর্শন ও আলোচনার উপর প্রতিষ্ঠিত। একথা যিনি অস্বীকার করিতে চান, নির্দ্দিষ্ট বিষয় হইতে দৃষ্টান্ত দিয়া যদি তিনি তাঁর কথা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন, তবে তার সম্যক উত্তর দিতে আমি প্রস্তুত।" যতগোল "সাহিত্য-পদবাচ্য" কথাটার "বাচ্য" শব্দটুকু নিয়ে। যাহা যথার্থই—"সাহিত্য-পদবাচ্য" নয় তা'ও সাময়িক উত্তেজনাহেতু সাহিত্য ব'লে সমাদর লাভ ক'রে থাকে রবীন্দ্রনাথের আপত্তি তো ঠিক ঐখানে। যা' যথার্থই জীবনের প্রত্যক্ষ-দর্শন ও আলোচনার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যা' সত্যই সাহিত্যের রসপূর্ণ, তা'কে নরেশ-বাবুর কল্পিত প্রতিদ্বন্দ্বী খামখা কেন যে "বিজ্ঞানের বই হইতে উপাদান কুড়াইয়া লেখা" ব'লে বস্‌বেন, সেটা ঠিক বুঝ্‌তে পারলেম না। অন্ততঃ চোখে ঠিক দেখতে পায় এমন একজন প্রতিদ্বন্দ্বী নরেশবাবুর খাড়া করা উচিত ছিল; নতুবা তাঁর বিজয়-গৌরব যে ম্লান হ'য়ে পড়বে।

আর "প্রত্যক্ষ-দর্শন ও আলোচনার" উপর প্রতিষ্ঠিত হ'লেই যে তা' সাহিত্য হ'য়ে উঠ্‌বে এমন কোনও ধরা-বাঁধা কথা নাই। সেই আলো ফেলে সব দেখা যায়, যাকে Wordsworth ব'লেছেন "The light that never was on sea or land"—সেই কলালোকের আলো—আর যায় ভাবরসিকের অন্তরের রসে অভিষিক্ত হওয়া। নতুবা কলা-সৃষ্টি সম্ভব নয়। আজ এই কলা-সৃষ্টি সম্পর্কে নরেশবাবু যে, "আলোচনা" শব্দটার পুনঃপুনঃ প্রয়োগ ক'রেছেন তাহা হাস্যজনকরূপে অপপ্রয়োগ। "আলোচনা" 'পর্য্যবেক্ষণের' ছোট ও "গবেষণা"র যমজ বোন্ এবং

"সিদ্ধান্তের" দিদি—সাহিত্য-কলার সহিত তা'র কোনওরূপ আত্মীয়তা বা কুটুম্বিতা নেই !

রবীন্দ্রনাথ "হাট ও হট্টগোল" সম্বন্ধে যে-কথা ব্যঙ্গাত্মক-ভাবে ব'লেছেন, সেটা যে তাঁ'র মতো দীর্ঘ-প্রবাসী ও নির্জ্জন নিবাসীর পক্ষে নিতান্ত অনধিকার চর্চ্চা তা' নরেশবাবু সম্পূর্ণ প্রতিপন্ন ক'রে দিয়েছেন ! তবুও তো নরেশবাবু বোধ হয় খবর রাখেন না রবীন্দ্রনাথ একান্ত অবজ্ঞাভরেই হাটকে দূরে-দূরে রেখেই চ'লে থাকেন। তা' নইলে তিনি কদাচই লিখতেন না :—

"আকাশ ঘিরে জাল ফেলে তারা ধরাই ব্যবসা
থাকগে তোমার পাটের হাটে মথুর কুণ্ডু শিবু সা।"

উপসংহারে নরেশবাবু মহাশয় হট্টগোল যে হাটের পূর্ব্ব-গামী, ফরাসী সাহিত্যের ইতিহাস হ'তে সে-কথা নিঃসংশয়-রূপে প্রতিপন্ন ক'রে (এ-দেশের ইতিহাসেও উদাহরণ মিলতো কেমন রামরূপ হাটের ঘাট হাজার বছর পূর্ব্বে রামায়ণরূপ হট্টগোলের সৃষ্টি) সর্ব্বশেষে জোর-গলায় ঘোষণা করেছেন :—

এ-দেশে যদি হাট নাও বসে থাকে, আমরা পশ্চিমের হাট হ'তে হট্টগোল সওদা ক'রে গ্রামোফোনে ধরে এনে বীণাপানির বাণীকুঞ্জে ও মানস সরোবরের কূলে পাঁচ পাঁচ হাত অন্তর একটা ক'রে বসিয়ে দিব। আজ বিশ্বব্যাপী ভাব-বিনিময়ের দিনে আমাদের এই জন্মগত অধিকার (Birth-right) হ'তে কে আমাদের বঞ্চিত ক'রতে পারে ?

হায় রবীন্দ্রনাথ ! যা-না লেখার জন্য চতুরাননের নিকট এত মর্ম্মান্তিক কাতর মিনতি, চতুরানন 'শিরসি' কি ঠিক্ তাই-ই লিখে বসলেন !

সঞ্চয়

খসম লাইগ্যা

পিয়ারের খসম, খসম আমার আইলানা
কইরা গেলা কাইলার হাটে যাই।
তিন দিন বাদে আস্‌বে গো খসম
আমার মানুষের উদ্দেশ নাই।
কোন বাঘ ভালুকের দ্যাশে বা গ্যালা
তুমি জান বাঁচাইতে পাল্লানা॥
যখন আমার মন হয় উতালা,
ঘরের পাশে কাঁদি গো ব'সে ঐ কচুগাছতলা,
ও আমার কচু গাছে ধরছে গো কচু
তুমি ছালুম চাইখা গ্যালানা॥
যখন আমি গোসল করবার যাই,
আমার দুচোখ দিয়ে ঝরে গো পানি
আমার খসম বাড়ী নাই।
তোমার বিবিজানের বিচ্ছেদের ছুরাত্
তুমি আপন চক্ষে দ্যাখ্‌লানা॥

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন

খসম—স্বামী, কাইলা—সিরাজগঞ্জের নিকটবর্ত্তী গ্রামের নাম, ছালুম—ব্যঞ্জন, ছুরাত্—রূপ।

এই পল্লী-গানটি জিলা পাবনা, দৌলতপুর গ্রাম নিবাসী বন্ধুবর আব্দুল কাদের সাহেবের নিকট হইতে সংগৃহীত। ইহা সিরাজগঞ্জের কৃষক ও মজুরগণের মুখে প্রায়ই শ্রুত হয়। শুনিতে পাওয়া যায় ইহা সত্য ঘটনা অবলম্বনে জনৈক অশিক্ষিত ব্যক্তি দ্বারা রচিত। ইহার মধ্যে গ্রাম্য বিরহ-বেদনার ভাব ও ছবি অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

পারুল-প্রসঙ্গ

"ও কি তোমাদের মত উপায় ক'রে খাবে নাকি ?"

"উপায় ক'রে না খাক্—তা' ব'লে মাছ দুধ চুরি ক'রে খাওয়াটা—"

"আমার ভাগের মাছ দুধ আমি ওকে খাওয়াব।"

"সে ত খাওয়াচ্ছই—তা'ছাড়াও যে চুরি করে। এ রকম রোজ রোজ—"

"বাড়িয়ে বলা কেমন তোমার স্বভাব। রোজ রোজ খায় ?"

"যাই হোক্—আমি বেরালকে মাছ দুধ গেলাতে পার্‌ব না। পয়সা আমার এত সস্তা নয়।"

এই বলিয়া ক্রুদ্ধ বিনোদ সমীপবর্ত্তিনী মেনি মার্জ্জারীকে লক্ষ্য করিয়া চটিজুতা ছুঁড়িল। মেনি একটি ক্ষুদ্র লম্ফ দিয়া মারটা এড়াইয়া বাহিরে চলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী পারুলবালাও চক্ষে আঁচল দিয়া উঠিয়া গেলেন। বিনোদ খানিকক্ষণ গুম্ হইয়া রহিল। কতক্ষণ আর এ-ভাবে থাকিবে ? অবশেষে তাহাকেও উঠিতে হইল। সে আসিয়া দেখে পশ্চিম বারান্দায় মাদুর পাতিয়া অভিমানে পারুল বালা ভূমি-শয্যা লইয়াছেন।

বিনোদ জিনিসটা লঘু করিয়া দিবার প্রয়াসে একটু হাসিয়া বলিল—"কি করছ ছেলেমানুষি! আমি কি সত্যি সত্যি তোমার বেরাল তাড়িয়ে দিচ্ছি!"

পারুল নিরুত্তর।

বিনোদ আবার কহিল—"চল চল—তোমার বেরালকে মাছ দুধই খাওয়ান যাক্।"

পারুল—"হ্যাঁ, সে তোমার মাছ দুধ খাওয়ার জন্যে ব'সে আছে কি না ? তাড়াবেই যদি, এই অন্ধকার রাত্রে না তাড়ালে চলছিল না ?"

"আচ্ছা আমি খুঁজে আন্‌ছি তাকে—কোথায় আর যাবে ?" বিনোদ লণ্ঠন হাতে বাহির হইয়া গেল।

এদিক ওদিক রাস্তা ঘাট জামগাছতলা প্রভৃতি চারিদিক খুঁজিল, কিন্তু মেনির দেখা পাইল না। নিরাশ হইয়া অবশেষে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল—পারুল ঠিক তেমনি ভাবেই শুইয়া আছে!—"কই দেখ্‌তে পেলাম না ত বাইরে। সে আস্‌বে ঠিক। চল, ভাত খাইগে চল।"

"চল, তোমাকে ভাত দিই, আমার আজ ক্ষিদে নেই।"

"Hunger strike করবে না কি!"

পারুল আসিয়া রান্নাঘরে যাহা দেখিল—তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই :—কড়ায় একটুও দুধ নাই—ভাজামাছগুলি অন্তর্হিত—ডালের বাটিটা উল্‌টান।

এই বিসদৃশ ব্যাপার দেখিয়া পারুল ত অপ্রস্তুত!

বিনোদ এ-সম্বন্ধে আর আলোচনা করা নিরাপদ নয় ভাবিয়া যাহা পাইল খাইতে বসিয়া গেল।

পারুলবালাও খাইলেন।

উভয়ে শুইতে গিয়া দেখে মেনি কুণ্ডলি পাকাইয়া আরাম করিয়া তাহাদের বিছানায় ঘুমাইতেছে।

"বনফুল"



ভার্য্যা

(আসিয়াছেন)

[শিল্পী—শ্রীচঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়]



জননী

[আসিতেছেন]

[শিল্পী—শ্রীচঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়]

ক্রমশঃ-প্রকাশ্য উপন্যাস



৬

দেওঘরের কাস্‌টেয়াস্‌ টাউনে সুকুমার বসুর গৃহ। সুকুমারের গৃহ প্রশস্ত, কিন্তু সে হিসাবে পরিজনবর্গ অল্প। বিধবা জননী, সে নিজে, তাহার স্ত্রী, ছুটি শিশু পুত্র এবং অনূঢ়া ভগিনী শোভা—এই লইয়া তাহার সংসার।

ন্যূনাধিক চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ই, আই রেলওয়ের কোনো ইংরাজ উচ্চ-কর্ম্মচারীকে মধুপুর রেল ষ্টেশনের তিন চার মাইল দূরে লাইনের ধারে সর্প দংশন করে। উক্ত কর্ম্মচারীর সঙ্গে ছিলেন সুকুমারের পিতামহ মহেশচন্দ্র। তিনি রেলওয়ে এঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে সামান্য বেতনের চাকরী করিতেন। যন্ত্রণায় ও আতঙ্কে সাহেব অভিভূত হইয়া পড়িলে প্রত্যুৎপন্নমতি মহেশচন্দ্র সাহেবের আহত স্থলের ঊর্দ্ধে দৃঢ়রূপে রজ্জু বাঁধিয়া, আহত স্থল ছুরী দিয়া কাটিয়া, তথায় মুখ দিয়া কতকটা রক্ত শোষণ করিয়া ফেলিয়া ট্রলি করিয়া, সহেবকে মধুপুরে লইয়া আসেন। সাহেব প্রাণ রক্ষা পাইয়া মহেশচন্দ্রের উপকারের কথা ভুলিলেন না। সৎসাহস ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার পুরস্কার স্বরূপ মহেশচন্দ্র কোম্পানী হইতে পারিতোষিক লাভ ত করিলেনই, অধিকন্ত সামান্য বেতনের চাকরি হইতে মুক্তি পাইয়া রেলওয়ের অধীনে ঠিকাদারীতে প্রবেশ করিলেন। উপরওয়ালার কৃপাদৃষ্টির সহিত লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি মিলিত হইল; অল্পকালের মধ্যে মহেশচন্দ্র প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া দেওঘরে বাড়ী করিলেন। একমাত্র পুত্রের মতি-গতি উপলব্ধি করিয়া মহেশচন্দ্র তাঁহার জীবদ্দশায় ঠিকাদারী বন্ধ করিলেন, এবং উপার্জ্জিত বিষয়-সম্পত্তির এরূপ পাকা ব্যবস্থা করিলেন যাহার ফলে পুত্রের উচ্ছৃঙ্খল ব্যয় এবং অপচয় সহ্য করিয়াও পৌত্র সুকুমারের হস্তে এমন অর্থাবশেষ পৌঁছিয়াছে যদ্দ্বারা, সাড়ম্বরে না হইলেও, স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা চলিয়া যাইতে পারে।

মহেশচন্দ্রের মৃত্যুর পর পুত্র বিহারীলাল সুকুমারের অধ্যয়নের অছিলায় কলিকাতায় মাণিকতলা ষ্ট্রীটে একটি বাসা ভাড়া করিয়া অসঙ্গত জীবন যাপনের সুবিধা করিলেন; এবং আট দশ বৎসর বিনা অগ্নিতে পত্নী গিরিবালাকে দগ্ধ করিয়া অবশেষে একদিন যখন উৎকট মদ্যপানের ফলে ইহ-লীলা শেষ করিলেন, ততদিনে সুকুমার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রথম ডিগ্রি লাভের প্রবেশ-দ্বারে উপর্য্যুপরি তিনবার মাথা ঠুকিয়াছিল। স্বামীর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত এবং পুত্রের বিষয়ে নিশ্চিত হইয়া গিরিবালা কলিকাতার বাস তুলিয়া দিয়া দেওঘরের বাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন। এ ঘটনায় ক্ষতি হইল একমাত্র শোভার; কারণ তাহার যাহা বন্ধ হইল, বাস্তবিকই তাহা লেখা-পড়া,—তাহার দাদার মত লেখা-পড়ার বৃথা অভিনয় নয়।

কলেজে অধ্যয়ন কালে সহপাঠী বিনয়কুমারের সহিত সুকুমারের পরিচয় ক্রমশঃ বন্ধুত্ব হইতে সৌহৃদ্যে এবং সৌহৃদ্য হইতে সখ্যে পরিণত হইয়া অবশেষে এমন আকার ধারণ করিয়াছিল যে, বহুকালব্যাপী নানাবিধ বিচ্ছেদ, ব্যতিক্রমেও

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

তাহা বিচ্ছিন্ন হয় নাই। সুকুমারের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে বাধ্য হইয়া বিনয় প্রায় মাসাবধি সুকুমারের গৃহে অতিথি হইয়া যাপন করিতেছে। দেওঘরে আসিয়া দুই-তিন দিন পরেই সে স্বতন্ত্র বাসস্থানের জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল, কিন্তু সুকুমারের পরিবারে সে কথা একেবারেই আমল পায় নাই। গিরিবালা বলিয়াছিলেন, "বাবা, সুকুমার আমার একমাত্র ছেলে। তুমি যদি আমার গর্ভে জন্মে তার দোসর হ'তে তা হ'লে কি আমি সুখী হতাম না? তোমাকে যে আমি পেটে ধরিনি, এইটুকুই আমার দুঃখ!" সুকুমারেরর স্ত্রী শৈলজা বলিয়াছিলেন, "ঠাকুরপো, আপনি এ-কথা প্রমাণ করবার জন্যে এত ব্যস্ত হয়েছেন কেন যে, আপনি আমাদের আত্মীয় নন?" সুকুমার হাসিয়া বলিয়াছিল, "আলাদা বাসা যদি নিতান্তই নাও বিনু, তাহ'লে এমন বড় দেখে নিয়ো যাতে আমরাও সকলে গিয়ে তোমার সঙ্গে থাক্‌তে পারি। তাতে আশা করি, তোমার আপত্তি হবে না?" অগত্যা বিনয়ভূষণকে স্বতন্ত্র বাসার অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

অপরাহ্ণ পাঁচটা। গৃহ সম্মুখের প্রাঙ্গণে একটা বৃহৎ চামেলী-লতার ঝাড়ের পাশে, মধ্যে একটা বেতের টেবিল লইয়া, বিনয় ও সুকুমার চায়ের প্রত্যাশায় মুখোমুখী বসিয়া গল্প করিতেছিল। পাশে একটা উঁচু চার-কোণা কাঠের টেবিলের উপর চায়ের সরঞ্জাম সাজানো। দুই হাতে দুই প্লেট্ খাবার লইয়া আসিয়া বেতের টেবিলের উপর রাখিয়া শোভা টি-পটের ঢাক্‌না খুলিয়া চামচ্ দিয়া চায়ের জল নাড়িয়া দেখিল, জল প্রস্তুত হইয়াছে। তখন সে চা তৈয়ারী করিতে ব্যাপৃত হইল।

অদূরে একটা ইজেলের উপর ক্যান্‌ভাসে শোভার ছবি খানিকটা অঙ্কিত রহিয়াছে,-- যতটা কমলার আঁকা হইয়াছে, প্রায় ততটাই। যে-দিন সকালে কমলার ছবি আঁকা সুরু হয়, সেইদিন বৈকাল হইতেই বিনয় শোভার ছবি আঁকিতে আরম্ভ করে। শোভার ছবি আঁকিবার প্রস্তাবকে নিতান্ত অকারণ পরিশ্রম ও অনাবশ্যক ব্যয় বলিয়া সকলে প্রবলভাবে আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু বিনয় কাহারো কথা শুনে নাই। সুকুমার যখন বলিয়াছিল, "অনর্থক শোভার ছবি এঁকে কি লাভ হবে বিনু?" তখন সে সহাস্য মুখে উত্তর দিয়াছিল, "আর কিছু লাভ হোক আর না হোক, দুটো ছবির মধ্যে কোন্‌টা ভাল হবে তা ত' বোঝা যাবে—যেটা অনর্থক আঁকব সেটা,—না, যেটা অর্থের জন্য আঁক্‌বো, সেটা।"

এইরূপে বিনয়ের দুইটি ক্যান্‌ভাসে সকালে বিকালে ধীরে ধীরে দুইটি ফুল ফুটিয়া উঠিতেছিল। একটিকে যদি রজনীগন্ধা বলিতে হয়, তাহা হইলে অপরটি নিশ্চয়ই অপরাজিতা;—কারণ শোভার দেহের বর্ণ ঘন-পল্লবাশ্রিত ছায়ার মত শ্যামল। কিন্তু পুষ্পোদ্যানে অপরাজিতার যে স্থান, সৌন্দর্য্যের স্তর-মালায় শোভার স্থান ঠিক ততটাই উচ্চে। তাহাকে দেখিলে মনে হয়,—"একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ",—মনে হয়, গঠনের সৌষ্ঠব দেহের বর্ণকে এতখানিও পরাজিত করিতে পারে!

"বিনুদা, আর এক পেয়ালা চা দোবো?"

শূন্য পেয়ালাটা শোভার দিকে তুলিয়া ধরিয়া বিনয় বলিল, "নিশ্চয় দেবে। এত ভাল চা ক'রে মাত্র এক পেয়ালা দিলে মহাপাপ হয় তা জেনো!"

শোভার মুখে সলজ্জ মৃদুহাস্য ফুটিয়া উঠিল। টি-পট্ হইতে বিনয়ের পেয়ালায় চা ঢালিতে ঢালিতে সে বলিল, "কোনো দিনই ত আপনি বলেননা যে খারাপ হয়েচে।"

বিনয় হাসিয়া বলিল, "তার একমাত্র কারণ কোনো দিনই খারাপ হয় না। একদিন একটু খারাপ ক'রে নিন্দে করবার সুযোগ আমাকে দাও?"

শোভা বলিল, "খারাপ হ'লেও আপনি সুখ্যাতি করবেন।"

মুখে অত্যধিক বিস্ময়ের ভাব আনিয়া বিনয় বলিল, "খারাপ হ'লেও সুখ্যাতি করবো? কেন, বলত শোভা? —আমাকে এতটা কপটচারী ব'লে কেন তোমার মনে হল?"

আবার শোভার মুখে সলজ্জ হাস্য ফুটিয়া উঠিল; বলিল, "এর মধ্যে কয়েকদিন চা খারাপ হয়েছিল, কিন্তু সে-সব দিনেও আপনি সুখ্যাতি করেছিলেন।"

শোভার উত্তর শুনিয়া সুকুমার হাসিয়া উঠিল; বলিল, "এর আর জবাব নেই!"

বিনয় বলিল, "জবাব আছে ভাই।" তাহার পর শোভাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "শোভা!"

সুকুমারের পেয়ালায় চা ঢালিতে ঢালিতে শোভা বলিল, "বলুন।"

"একটা কথা আছে জান ত'?

"কি কথা?"

"আপ্ রুচি খানা?"

"জানি; আপনিই একদিন বলেছিলেন।"

"তা হ'লে তোমার রুচির সঙ্গে আমার রুচি মিলবে, এর কি মানে আছে বল? তোমার যেদিন খারাপ লেগেছিল, আমার হয় ত সে দিন ভালো লেগেছিল।"

শোভা বলিল, "আমার রুচির সঙ্গে আপনার রুচি যদি না মেলে তা হ'লে আমার যে-দিন ভালো লাগে সেদিন ত আপনার খারাপ লাগা উচিত। কিন্তু সেদিনও আপনার ভাল লাগে কেন?"

সুকুমার হাসিয়া উঠিয়া সোল্লাসে বলিল, "চমৎকার! এর সত্যিই কোনো জবাব নেই!"

সহাস্যমুখে বিনয় বলিল, "সেদিন আমার ভাল লাগে চা ভাল হয় ব'লে—আর অন্যদিন আমার ভাল লাগে তোমার রুচির সঙ্গে আমার রুচি না মিলতে পারে ব'লে।"

ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া শোভা বলিল, "তা হ'লে আপনার খারাপ লাগবে কোন্ দিন?"

"বোধহয় এমন কোনো দিন, যে-দিন তোমার না লাগবে ভালো, না লাগবে খারাপ!" বলিয়া বিনয় উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল।

সুকুমার বলিল, "হারলে চলবেনা শোভা! এর একটা ভালো রকম উত্তর দেওয়া চাই।"

কিন্তু উত্তর দিবার অবসর পাওয়া গেল না, বাহিরে রাজপথে গেটের সম্মুখে একটা বৃহৎ মোটরকার নিঃশব্দে ধীরে ধীরে আসিয়া দাঁড়াইল।

দৃষ্টি পড়িল প্রথমে শোভার; সে বলিল, "দাদা, দেখ কারা এসেছেন।"

সুকুমার ও বিনয় যখন চাহিয়া দেখিল তখন দ্বিজনাথ মিত্র গাড়ীর দ্বার খুলিয়া অবতরণোদ্যত হইয়াছেন, এবং কমলা গাড়ীতে বসিয়া আছে।

"সুকু, দ্বিজনাথবাবুরা এসেছেন, তুমি ডেকে আনবে চল" বলিয়া বিনয় ত্বরিতপদে গেটের দিকে অগ্রসর হইল।

বিনয় ও সুকুমার সাদর অভ্যর্থনা করিয়া দ্বিজনাথ ও কমলাকে লইয়া আসিল।

শোভা দ্বিজনাথকে প্রণাম করিয়া কমলার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার হাত ধরিয়া একটু দূরে টানিয়া লইয়া গিয়া বলিল, "ভাই, তুমি আসাতে কত-যে খুসী হয়েছি তা আর কি বলব! চল ভাই, বাড়ীর ভেতর চল।"

কমলা সুমিষ্ট হাসি হাসিয়া বলিল, "আমি ত তোমার কথা ঠিক জানতাম না ভাই। আমিও তোমাকে হঠাৎ দেখে ভারী খুসী হয়েছি।" তাহার পর অদূরবর্ত্তী ইজেলের উপর ক্যান্‌ভাসে দৃষ্টি পড়ায় বলিল, "ও ছবি বিনয় বাবু আঁকচেন বুঝি?—চলত দেখে আসি।"

ছবির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া কমলা বলিল, "তোমার ছবি?"

"হ্যাঁ।"

একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়া নিবিষ্ট মনে ক্ষণকাল দেখিয়া কমলা বলিল, "চমৎকার হচ্ছে!"

মৃদু হাসিয়া শোভা বলিল, "চমৎকার হচ্ছে?—তা কি ক'রে হবে ভাই? আসলই যে চমৎকার নয়।"

একবার নিমেষের জন্য শোভাকে নিরীক্ষণ করিয়া কমলা বলিল, "আসলটি ত' চমৎকার!"

সবিস্ময়ে শোভা বলিল, "সে কি কমলা? কালো তোমার ভালো লাগে?"

কমলা হাসিয়া বলিল, "তোমার মত কালো ভালো লাগে।"

শোভা বলিল, "তোমার মত সুন্দরের মুখ থেকে এ কথা শুনলেও একটু ভরসা হয়!" বলিয়া হাসিয়া ফেলিল।

মৃদু হাসিয়া কমলা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি ভাই?"

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

"যে জিনিস আমার নিজের মধ্যে নেই আমার বাপ-মা স্নেহ ক'রে আমার সেই নাম দিয়েছেন ;—আমার নাম শোভা।" বলিয়া শোভা হাসিতে লাগিল।

কমলা হাসিয়া বলিল, "না ভাই, তোমার বাপ-মা বুঝেই তোমার নাম দিয়েছিলেন। তোমাকে দেখলে মনে হয় ওই জিনিসটাই তোমার খুব বেশী পরিমাণে আছে।" তাহার পর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "শোভা, তোমার ছবিটা বিনয়বাবু কবে আরম্ভ করেছেন ?"

শোভা বলিল, "যেদিন সকালে তোমার ছবি আরম্ভ করেছে'ন, ঠিক সেই দিন বিকেলে।"

একটু বিস্মিত স্বরে কমলা বলিল, "ঠিক একই দিনে ? কেন, বলত ?"

শোভা বলিল, "তাঁর খেয়াল ! বল্লেন, দুটো ছবি একসঙ্গে আরম্ভ ক'রে দেখা যাক্ কোনটা ভালো হয়। এ-ও কি দেখ্‌তে হবে ভাই ? ভালো কোন্‌টা হবে তা'ত বোঝাই যাচ্ছে।"

কমলা এ কথার কোনো উত্তর দিল না। আর কিছু-ক্ষণ শোভার ছবি দেখিয়া বলিল, "চল ভাই, বাড়ীর ভেতর যাবে বলছিলে,—চল।"

যাইতে যাইতে শোভা বলিল, "তুমি আমার কথা আজ জান্‌লে ; আমি কিন্তু এ কয়েক দিন ধ'রে তোমার কত কথাই শুনেছি।"

কমলা সবিস্ময়ে বলিল, "আমার কথা ?—কার কাছে ? —বিনয় বাবুর কাছে ?"

"হঁ্যা, বিনুদার কাছে।"

"কিন্তু তিনি—তিনি আমার কথা বিশেষ কিছু জানেন না ত।—"

"সে কি আর তেমন কোনো কথা ?—এম্‌নি সব।"

অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া মৃদুস্বরে কমলা বলিল, "ও।"

বারাণ্ডায় উঠিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহারা দুইজনে অদৃশ্য হইয়া গেল। তখন দ্বিজনাথ সুকুমারকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, "আচ্ছা, আপনাদের বাড়ীর নাম 'কোব্রা হাউস্' হ'ল কেন ? নামটি একটু অ-সাধারণ ব'লে বাড়ী খুঁজে বার করতে আমাদের কোনো কষ্ট পেতে হয় নি।"

এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে যে কাহিনী বলা হইয়াছিল, সুকুমার তখন সেই কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল।

(ক্রমশঃ)



স্বরলিপি

"নটরাজ"

শেষ মিনতি

কেন পান্থ এ-চঞ্চলতা ?
কোন্ শূন্য হ'তে এল কার বারতা ?
নয়ন কিসের প্রতীক্ষারত,
বিদায় বিষাদে উদাস মত,
ঘন কুন্তল-ভার ললাটে নত
ক্লান্ত তড়িৎ-বধূ তন্দ্রাগতা।
কেশর-কীর্ণ কদম্ব বনে,
মর্ম্মরি' মুখরিল মৃদু পবনে,
বর্ষণ-হর্ষ-ভরা ধরণীর
বিরহ-বিশঙ্কিত করুণ কথা !
ধৈর্য্য মানো, ওগো, ধৈর্য্য মানো,
বরমাল্য গলে তব হয়নি ম্লান,
আজো হয়নি ম্লান;
ফুলগন্ধ-নিবেদন-বেদন সুন্দর
মালতী তব চরণে প্রণতা॥

কথা ও সুর—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

র্সণা ধা I
কে ন

II ধপা -ধপা পগা মা। পা -া পণা পধা I পা -া -া -া। -গা -মা -পা -ধা I
পা ন্ থ এ চ ন্ চ ল তা • • • • • • •

। ধপা -র্সা র্সণা ধা I
• • কে ন

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

I পধা -পপা পপা মা । পা -া পণা ণধা I পা -া -া -প্রপা । -মপা -পর্মা জ্ঞা রা I
পা ন্ থ এ চ ন্ দ্র ন তা • • • •• • • কে ন

I গসা -া রা রা । রা -গা মা মা I পা -া -া -া । -া -া ॥ না -া I
পা ন্ থ এ চ ন্ চ ন তা • • • • • কো ন্

I না -া নর্সা র্সনা । র্সা -া র্সনা র্সা I র্সনাঃ -র্সর্রঃ র্সা ণধা । র্সণা -া ধা পা II
শূ • ন্য হ তে • এ ল কা র্ বা র তা • "কে ন"

-া -া I

II পমা ণা ধা ধা । ধা -া ধা না I না -া র্সা র্সনা । র্সা -া র্সা -না I
ন য় ন কি সে • র প্র তী • ক্ষা র ত • বি •

I র্সা -া -জ্ঞা -া । -া -া -া জ্ঞর্রা I র্না -া র্সা -া । -া -া না -র্সা I
দা • • • • • য়্ বি যা • দে • • • উ •

I সরা -া -া -ধা । -র্সণা -া -া ধা I পপা -া -া -া । -া -া -া -া I
দা • • • • • স্ ম ত • • • • • • • •

I পমা ণা ধা ধা । ধা -া ধা না I না -া র্সা র্সনা । র্সা -া সা -না I
ন য় ন কি সে • র প্র তী • ক্ষা র ত • বি •

I র্সা -া -জ্ঞা -া । -া -া -া জ্ঞর্রা I র্না -া র্সা -া । -া -া না -সা I
দা • • • • য়্ বি • যা • দে • • • উ •

I র্সর্া -া -া ধা । -সণা -া -া ধা I ধপা -া -া -া । -া -া পা না I
দা • • • - - স্ ম ত • • • • • ঘ ন

I না -া না না । না -া না না I না -া নর্সা র্সনা । র্রর্সা -া পা না I
কু ন্ ত ল ভা • র ল লা • টে ন ত • ঘ ন

I না -া না না । না -া না না I না -া নর্সা র্সনা । র্রর্সা -া -া -া I
কু ন্ ত ল ভা • র ল লা • টে ন ত • • •

I সা -া সা সা । রা রা রগা গরা I গা -া মা পা । পগা -মা -পা -ধা I
ক্লা ন ত ত ড়ি ত ব ধ ত ন্ দ্রা গ তা • • •

I ধপা -র্সা -া -া । -া -া ণা ধা I
• • • • • • "কে ন"

-া -া I

II সা -া সা সা । সরা -া গা গরা I গা -া মা মগা । মা -া -া -া I
কে • শ র কী র্ ণ ক দ ম্ ব ব নে • •

I মা -া মপা পমা । পা পা পধা ধপা I ধা ধা ণা ণা । ণধা -া -া -া I
ম র্ ম রি মু খ রি ল মৃ দু প ব নে • • •

I সা -া সা সা । সরা -া গা গরা I গা -া মা মগা । মা -া -া -া I
কে • শ র কী র্ ণ ক দ ম্ ব ব নে • • •

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

I মা -া মপা পমা । পা পা পধা ধপা I ধা ধা ণা ণা । ণধা -া -া -া I
ম র্ ম রি সু খ স্নি গ্ধ মৃ দু প ব নে • • •

I না -া না -া । না -া না না I ধনা -া নর্সা র্সনা । র্সর্সা -া -া -া I
ব র্ ষ ণ হ র্ ষ ভ রা • ধ র ণী • • র্

I পা ধা ণা র্রর্রা । র্সর্সা -া ণধা পা I পধা ধপা মা মগা । মা -া -া -া I
বি র হ বি শ ঙ্ কি ত ক রু ণ ক থা • • •

I র্সা -া র্সর্গা র্গা । গা -া র্গা র্গা I র্গর্মা -র্পা র্গর্মা র্গা । র্রসা -া না র্সা I
ধৈ • র্য্য মা নো • ও গো ধৈ • র্য্য মা নো • ব র

I র্সনা -া র্সা র্সনা । র্সা -া না র্সা I র্সনাঃ -র্সরঃ র্রর্সা ণধা । র্সণা -ধা পা ধা I
মা • ল্য গ লে • ত ব হ য়্ নি ম্লা ন • আ জো

I ণা -ধর্রা -র্রর্সা ণধা । ধপা -া মা গা I মা -ধা ধা ধা । ধা -া পধা মা I
হ য় নি ম্লা ন • ফু ল গ ন্ ধ নি বে • দ ন

I ধা -ণা ণধা র্সা । র্সণা -ধা পা পা I পা -া পধা ধপা । পধা ধপা মা গা I
বে • দ ন সু ন্ দ র মা • ল তী ত ব চ র

I মা -া পা পা । পগা -মা -পা -ধা I -পা -র্সা -া -া । -া -া ণা ধা IIII
ণে • প্র ণ তা • • • • • • • • • “কে ন”

সহযোগী-সাহিত্য

যোহান বোয়ার

হুমায়ুন কবির

সাহিত্যের মাপকাঠি লইয়া অনেক বিচার চলিয়াছে ও চলিবে। কেহ বলিয়াছেন সাহিত্য কেবলমাত্র প্রকাশেই সার্থক, সৌন্দর্য্য আপনাতেই পরিপূর্ণ, বাস্তব জগতের সহিত তাহার সম্বন্ধ বিচারের কোন প্রয়োজন নাই। আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন যে সৌন্দর্য্যের কোন নিরপেক্ষ বা absolute লক্ষণ নাই। একজনের চক্ষে যাহা সুন্দর, আরেকজন তাহাকেই কুৎসিত বলিতে পারেন, দেশ কাল ও পাত্র ভেদে সৌন্দর্য্য বোধেরও ভেদ পরিলক্ষিত হয়। আবার কেহ বলিয়াছেন যে, সাহিত্যের কাজ জীবনকে প্রতিফলিত করা মাত্র, সংসারের সকল ভাল মন্দ, সকল সুন্দর-অসুন্দরেরই স্থান সাহিত্যের প্রকাশের মধ্যে রহিয়াছে।

কেবলমাত্র জীবনের প্রতিবিম্ব দিয়াই সাহিত্য-রচনা যদি সম্ভব হইত, তবে সে সাহিত্য সৃষ্টির কোন সার্থকতা থাকিত না। কারণ আমরা বাস্তবজগতে দৈনন্দিন জীবনে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত সুন্দর ও অসুন্দরের সহস্র প্রকাশ প্রতিনিয়ত দেখিতেছি, সেই প্রত্যক্ষ প্রকাশকে ছাড়িয়া সাহিত্যের পরোক্ষে প্রকাশ লক্ষ্য করিবার কোন প্রয়োজন নাই। এখানে রসবেত্তা আসিয়া বলিবেন যে, জীবনের এই ভালমন্দের ছবি যখন আবেগ ও কামনার রঙে রঞ্জিত হয়, সুখ-দুঃখের স্পর্শ লাগিয়া হাসির মাণিক ও অশ্রুর মুকুতায় যখন তাহা ঝলমল করিতে থাকে, তখনই সাহিত্য গড়িয়া উঠে। তাঁহার মতে সাহিত্য জীবনের প্রতিবিম্ব মাত্র নহে—তাহা জীবনের চিত্র। আলোক-চিত্রের সহিত কলাচিত্রের প্রভেদ এইখানে যে আলোক-চিত্র বিশ্বস্তভাবে সকল কিছুই প্রতিফলিত করে, মূলের সঙ্গে কিছুই যোগ বা বিয়োগ করে না। কিন্তু সে প্রতিলিপির মধ্যে জীবনের স্পর্শ নাই। কিন্তু কলাচিত্র মানুষের অন্তরের বেদনা-আনন্দের রঙে রাঙিয়া বাহির হইয়া আসে, সে ছবিতে হয়ত বাস্তবের কোন কোন অংশ বাদ পড়িতে পারে, কোথাও আলোক হয়ত একটু বেশী উজ্জ্বল হইয়া ধরা দেয়, কোথাও ছায়া গভীরতর হইয়া প্রকাশ পায়—কিন্তু সেখানে প্রাণের স্পর্শ রহিয়াছে। এই প্রাণের স্পর্শ অনুভূতির তীব্রতা ও আবেগের প্রাচুর্য্যেই সাহিত্যের প্রাণ।

কিন্তু মানুষ কেবলমাত্র ভাবাকুল প্রাণীই নহে—মানুষ বুদ্ধিজীবিও বটে। তাই কেবল মাত্র তাহার আবেগ ও অনুভূতিতে সাড়া দিয়া সাহিত্য কখনোই পূর্ণ হইতে পারে না। ইচ্ছা, আবেগ ও জ্ঞান লইয়া মানুষের জীবন। কোন বিষয়কে আমাদের ইন্দ্রিয় সমূহ গ্রহণ করিলে আমরা তাহার জ্ঞান লাভ করি; এই জ্ঞানের ফলে যে সুখ বা দুঃখ অনুভূতি আমাদের অন্তরে জাগ্রত হয়, তাহাই আবেগের রঙে তাহাকে রঞ্জিত করে। সুখ আমরা পাইতে চাহি, দুঃখ আমরা এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করি, তাই সুখ-দুঃখ অনুভূতির ফলে আমাদের ইচ্ছার জন্ম। ইচ্ছার তৃপ্তিতেই সুখ, অপরিপূর্ণ কামনাতেই জীবনে বেদনার আগুন জ্বলিয়া ওঠে। মানুষের সকল কামনা এবং ইচ্ছা যদি সহজ এবং সরল হইত, তবে জীবনে এত বেদনা পুঞ্জিত হইয়া উঠিত না, হয়ত বা জীবনের গভীরতা ও মাধুর্য্যও আমরা এমন করিয়া উপলব্ধি করিতে পারিতাম না। আমরা যে কি চাই, নিজেরাই সম্পূর্ণভাবে বুঝিতে পারি না, হয়ত অন্তরের একদিক যাহা কামনা করিয়া উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে, হৃদয়ের আর এক দিক তাহারি বিতৃষ্ণায় তাহাকে এড়াইতে প্রাণপণ চেষ্টা করে। হয়ত হৃদয় যাহা চাহে, বুদ্ধি তাহাকে অস্বীকার করে, আবেগের সঙ্গে জ্ঞানের সংঘর্ষে জীবন কণ্টকিত হইয়া উঠে।

হুমায়ুন কবির

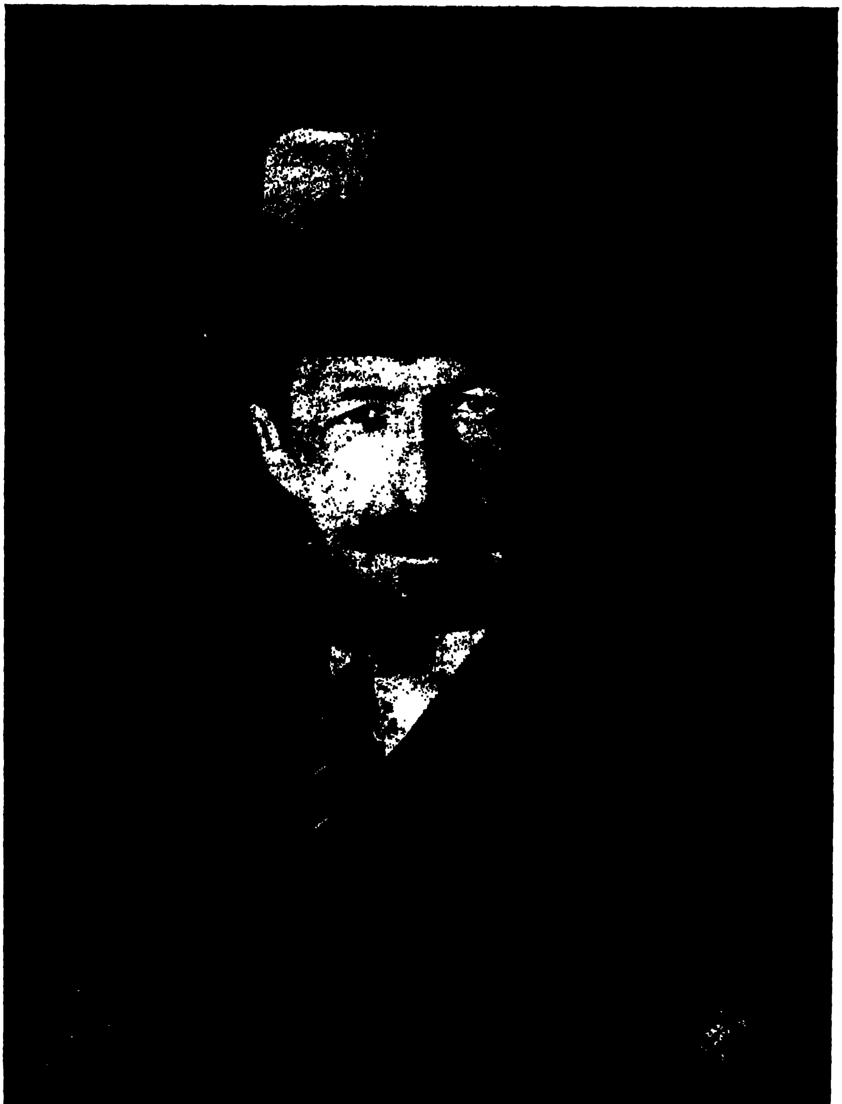
ধর্ম্মবোধ এবং নীতিজ্ঞান, সামাজিক সংগঠনের ফলেই হোক, অথবা মানুষের অন্তর্নিহিত বলিয়াই হোক, আজ আমাদের জীবনে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। সভ্যতার লক্ষণ মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিসমূহকে বিধি ও নিষেধের গণ্ডীর মধ্যে বাঁধিয়া তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করা। হয়ত প্রবৃত্তি যাহা কামনা করিতেছে, নীতিজ্ঞান আসিয়া তাহা বর্জ্জন করিতে বলিতেছে, ঘটনা সংস্থানের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নীতিবোধ ও প্রবৃত্তির ব্যাকুলতা দুইই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কখন যে কোনটী কাহাকে ছাপাইয়া যায় কেহ স্থির করিয়া বলিতে পারে না। প্রবৃত্তিসমূহের কণ্ঠরোধ করিয়া হত্যা করিলে নীতি-বোধের প্রকাশও আর সহজ থাকে না—আমরা সে-রকম লোককে বলি রুচিবাগীশ। আবার প্রবৃত্তির তাড়নায় যে নীতি ও ধর্ম্মবোধকে অস্বীকার করে, সেও সহজ পথ বাছিয়া লইয়া পশুত্ব অর্জ্জন করিয়া বসে। এই দুইয়ের সংঘাত হইতে আপনাকে বাঁচাইয়া, তাহাদের পরস্পরের সামঞ্জস্য সম্পাদন মানবজীবনের কঠিনতম সমস্যা।

এইখানে সাহিত্যে নীতির কথা উঠিয়া পড়ে। কেহ কেহ বলিবেন যে, সাহিত্যকে যদি কেবল নীতিমূলকই হইতে হয়, তবে সাহিত্য এবং নীতিশিক্ষার মধ্যে প্রভেদ কোথায়? নীতিশিক্ষা দানই যদি আর্টের চরম উদ্দেশ্য হয়, তবে শিশুপাঠ্য নীতিকথার চেয়ে আর্টের শ্রেষ্ঠতর প্রকাশ আর কিছুই নাই, কারণ তাহাতে নীতির প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটী কথাও নাই। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে বাহুল্যটুকু সমস্ত হৃদয়কে মাধুর্য্যে পরিপ্লুত করিয়া দেয়, তাহাই আর্টের প্রাণ। আর্টের উদ্দেশ্য নীতিশিক্ষা দান নহে। রূপকার ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া জীবনের এমন একটী সমস্যা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করেন, যাহাতে আমাদের সকল হৃদয় বেদনায় দুলিয়া উঠে, আনন্দে সাড়া দেয়, সুখ-দুঃখের মধ্য দিয়া তাহাকে উপলব্ধি করিতে চায়! Galsworthy বলিয়াছেন যেখানেই মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ আনন্দ-বেদনায় জটিল হইয়া উঠিয়াছে, সেখানেই সেই সমস্যার মধ্যে একটী সত্য নিহিত রহিয়াছে। সাহিত্যিকের কাজ সেই সমস্যাকে এমন ভাবে উপস্থাপিত করা যাহাতে সেই অন্তর্নিহিত সত্যটী প্রকাশ হইয়া পড়ে। যখনই আমরা বলি যে সাহিত্য জীবনের প্রতিবিম্বমাত্র নহে, তাহা সাহিত্যিকের অন্তরের সুখ-দুঃখের রঙে রঞ্জিত জীবনের ছবি, তখনই আমরা স্বীকার করিয়া লই যে সাহিত্যিকের নীতিবোধ, তাঁহার সহানুভূতি এবং তাঁহার বিচারবৃত্তি এই সমস্তাকে এমন ভাবে সাজাইবে যাহাতে আমরা তাহার মধ্যে তাঁহার অন্তরের প্রকাশ দেখিতে পাইব। জীবনের ছবি আঁকিয়া শিক্ষাদান সাহিত্যিকের ধর্ম্ম, নীতি প্রচার করিতে গেলে সাহিত্যের অপকর্ষ ব্যতীত নীতিরও কোন সুবিধা হইবে না।

বোয়ারের সকল রচনাও তাই উদ্দেশ্য মূলক। নীতি-শিক্ষাদান করিতে বোয়ার সাহিত্য রচনা করেন নাই; কিন্তু যে আদর্শের আলোকে তাঁহার সকল জীবন উদ্ভাসিত, মানুষের সঙ্গে মানুষের সকল সম্বন্ধেই তিনি সেই প্রকাশ মূর্ত্ত করিতে চাহিয়াছেন, তাই তাঁহার সকল রচনায় তাঁহার জীবনের আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছে। জীবনকে তিনি সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছেন,—মানুষের অন্তরের আবেগ, আদর্শের ক্ষুধা ও বুদ্ধির সাধনা সকলি তাঁহার সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। তিনি ঔপন্যাসিক, তাই মানুষের হৃদয়কে তিনি আকর্ষণ করিতে চাহিয়াছেন দুই দিক দিয়া। হৃদয়াবেগের পরিতৃপ্তি আমরা যেমন তাঁহার রচনায় খুঁজিয়া পাই, ঠিক তেমনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিও তাঁহার রচনায় চিন্তার খোরাক সংগ্রহ করে। আধুনিক জগতে জীবনের গূঢ়তম সমস্যাকে তিনি আর্টের জগতে নূতন রূপ দিয়াছেন; যাহা কেবলমাত্র বুদ্ধির শুভ্র-শীতল আলোকে আমরা পর্য্যবেক্ষণ করিতে চাহিতাম, তাহাকেই তিনি জীবনের অনিশ্চয়তা এবং জীবনের গতি-ভঙ্গি দিয়া, আশা আশঙ্কা আবেগের অস্থির আলোকে নূতন করিয়া প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। জীবনের সত্য নির্দ্দিষ্ট, সুস্পষ্ট বা সীমাবদ্ধ নহে, হইতে পারে না। কারণ জীবন গতিশীল, এবং মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই অনন্ত চাঞ্চল্য ও পরিবর্ত্তনের মধ্যে এমন

সত্য কী আছে যাহাকে ধরিয়া আমাদের জীবনের গতি আমরা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি,—তাহারি সন্ধানে বোয়ারের সাহিত্য-সাধনা প্রাণময়, ব্যাকুল, চঞ্চল।

ভালবাসিল, এবং ঘটনা সংস্থান বা সমাজের বহু বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়া তাহাদের মিলন হইল কি, হইল না,—এক সময় ইহা ছাড়া যে উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয় আর



যোহান বোয়ার

[কল্লোলের সৌজন্যে]

বহুদিন পর্য্যন্ত উপন্যাস বলিতে কেবলমাত্র প্রেম কাহিনীই বুঝাইয়াছে। দুইটী তরুণ নরনারী পরস্পরকে কিছু থাকিতে পারে, তাহা কেহ ভাবে নাই। অন্তরের আবেগের কাহিনী কহিয়া আমাদের হৃদয়ের

হুমায়ুন কবির

অনুভূতিকে আঘাত করাই উপন্যাসের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। কিন্তু আধুনিক যুগের অন্যান্য ঔপন্যাসিকের মতন বোয়ার এ বাধা অস্বীকার করিয়াছেন। প্রেম জীবনের একটী প্রধান উপাদান হইলেও তাহা যে জীবনের একমাত্র উপাদান, আধুনিক যুগের ঔপন্যাসিক তাহা স্বীকার করেন নাই। আমাদের আবেগের রূপ বিচিত্র, বিচিত্র আধারকে আশ্রয় করিয়া মানুষ স্বর্গ রচনা করিয়া থাকে, প্রেমের লীলাপ্রকাশ ব্যতীত মানুষের জীবনের আরো অনেক দিক রহিয়াছে। জ্ঞানের পিপাসা, বিপদের মোহ মানুষের হৃদয়কে আকর্ষণ করে, তাই মানুষ কেবলমাত্র প্রেমিক নহে, সে পথিকও বটে, সে দুঃসাহসী। মানুষের প্রেমও কেবলমাত্র নর নারীর যৌনপ্রেমে পর্য্যবসিত নহে। মাতার সন্তানের জন্য যে আবেগাকুল করুণা, বন্ধুর জন্য বন্ধুর যে প্রীতি, তাহাও প্রেমের অঙ্গীভূত। দুইটী নর-নারীর মিলন হইলে সেখানে তাহাদের জীবন শেষ হইয়া গেল না—বস্তুতঃ সেখানেই তাহাদের জীবন-যাত্রার আরম্ভ। পরস্পরের সহযোগিতায় ও সাহচর্য্যে তাহারা কেমন করিয়া পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে আপনার সামঞ্জস্য সম্পাদন করিল, পরস্পরের চিন্তা ও আদর্শের সংস্পর্শে জীবনের গতির কি পরিবর্ত্তন হইল,—তাহা লক্ষ্য করাও আজ ঔপন্যাসিকের কাজ। কবে কোন চিন্তার ধারা আসিয়া অন্তর স্পর্শ করিল, সমগ্র জীবনের গতি কেমন করিয়া বদলাইয়া গেল, তাহার কাহিনী আমাদের বুদ্ধি ও আবেগকে যেমন করিয়া আকর্ষণ করিতে পারে, এমন আর কিছুই নহে। আধুনিক যুগে উপন্যাস তাই কেবলমাত্র ভাব-জীবনের কাহিনী নহে, তাহা চিন্তা-জীবনেরও ইতিহাস।

বোয়ারের রচনার দুয়েকটী বিশেষ ভঙ্গির আলোচনা করিয়া আমরা তাঁহার উপন্যাসগুলির বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিব। তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব এইখানে যে, যে মাপকাঠি দিয়াই আমরা তাঁহার রচনার বিচার করিতে চাহি না কেন, তাহাতেই তাঁহার সাহিত্য শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যের আসনে স্থান পাইবে। ললিতকলার শ্রেষ্ঠতম বিকাশের লক্ষণ এই যে, যেখানে যেদিক দিয়াই আমরা তাহার পরীক্ষা করি না কেন, কষ্টিপাথরে সোনার রেখাই ফুটিয়া উঠে। তাহার কারণ এই যে সাহিত্য বিচারের সকল লক্ষণই derivative। শ্রেষ্ঠ সাহিত্য বলিয়া বিনা বিচারে মানুষের মন যুগযুগান্ত ধরিয়া যাহাকে গ্রহণ করিয়াছে, তাহাই পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যে সকল লক্ষণ অমরতার কারণ বলিয়া আমাদের মনে হয়, তাহাকেই আমরা সাহিত্যের মাপকাঠি বলিয়া গ্রহণ করি। মানব-মনের ধর্ম্মই এই যে আমাদের আবেগ ও অনুভূতি প্রথমে যাহাকে আনন্দে বরণ করিয়া লয় তাহাকেই বিচার করিয়া বুদ্ধিবৃত্তি দিয়া আমরা গ্রহণ করিতে প্রয়াস পাই, ভাল লাগিলে পরে তখন খুঁজিতে বসি কেন ভাল লাগিল। সাহিত্যের বিচারেও এ কথা সত্য।

কেবলমাত্র প্রকাশভঙ্গির দিক দিয়া দেখিতে গেলে বিশ্ব-সাহিত্যে বোয়ারের স্থান অতি উচ্চে। মানুষের আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা, আশা ও আশঙ্কার এমন উদ্বেল প্রকাশে তাঁহার সাহিত্য প্রাণবান যে আমাদের অন্তরের আশা-নিরাশা, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার তন্ত্রী তাহাতে সাড়া দিয়া ওঠে। Tolstoy বলিয়াছেন, ললিতকলার লক্ষণ এই যে রূপকার আপনার অন্তরে যে আবেগ উপলব্ধি করিয়াছেন, প্রকাশ-ভঙ্গির কৌশলে অপরের অন্তরেও তাহা তিনি সঞ্চারিত করিতে পারেন। এই সঞ্চার করিবার ক্ষমতা নির্ভর করে রূপকারের নিজের আবেগের তীব্রতার উপর। বোয়ার তাঁহার রচনায় যে আবেগকেই প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাকেই এমন গভীর ভাবে তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন যে তাঁহার সকল জীবন তাহাতে ওতপ্রোত হইয়া গিয়াছে। এইখানে তাঁহার কবি হৃদয়ের পরিচয়। কল্পনার তীব্রতা ও সহানুভূতির প্রাচুর্য্যে অপরের বেদনা তাঁহার আপনার হৃদয়ে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাই তাঁহার মানস-সৃষ্টিতে তিনি সেই বেদনা ও আনন্দকে যে রূপ দিয়াছেন, তাহাতে আমাদের অন্তরও সাড়া দেয়।

কিন্তু প্রকাশ ভঙ্গির কথা ছাড়িয়া দিলেও কেবলমাত্র বাস্তবের দিক দিয়া তাঁহার রচনা অনুপম। জীবনের সকল ব্যর্থতা, সকল বেদনার ইতিহাস কবি বোয়ারের হৃদয়ের কাছে ধরা পড়িয়াছে, কিন্তু তাহাদিগকে প্রকাশ করিয়াছেন ঔপন্যাসিক বোয়ার। চরিত্র সৃষ্টি ঔপন্যাসিকের কঠিনতম

পরীক্ষা, এবং তাহার সাফল্যেই তাঁহার সাহিত্য সৃষ্টির সার্থকতা। যে বেদনা ও আনন্দের সন্ধান তিনি মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধে খুঁজিয়া পাইয়াছেন, গীতি-কবির মতন কেবলমাত্র আপনার হৃদয়াবেগের প্রকাশে তাহাকে তিনি সঙ্গীত করিয়া তুলিতে চাহেন নাই; রক্ত মাংসের মানুষ গড়িয়া তাহাদের আকাঙ্ক্ষার সিদ্ধি ও ব্যর্থতার মধ্যে তাহাকে তিনি রূপ দিয়াছেন। তাঁহার উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা তাই কেবলমাত্র তাঁহার হৃদয়ের আবেগের প্রতিচ্ছবি নহে, তাহারাও আমাদেরই মত মানুষ, আমাদের মতনই তাহারা আপনার ব্যক্তিত্ব লইয়া প্রত্যেকে বিভিন্ন স্বতন্ত্র। আমাদের মতনই তাহারা জীবনের অর্থ খুঁজিতে প্রয়াস পায়, আমাদেরই মত তাহারা ভালবাসে এবং ভালবাসিয়া প্রতিদান না পাইলে আমাদের মতনই বেদনায় মুহ্যমান হইয়া পড়ে।

মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সামঞ্জস্য সম্পাদনে বোয়ার অতুলন। তাঁহার পুরুষ ও নারী প্রকৃতিরই কোলে মানুষ হইয়াছে; জ্ঞানের পিপাসা, ধন সম্মানের পিপাসায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেও তাহারা যে মাটীর ছেলে, মাটীর মেয়ে, একথা তাহারা কখনো ভুলিয়া যায় নাই। যখনই অন্তরের আলোড়নে জীবন বন্ধুর হইয়া উঠিয়াছে, কণ্টকিত জীবন-রুক্ষর আঘাতে হৃদয় দীর্ণ হইয়া পড়িতে চাহিয়াছে, তখনই প্রকৃতির বিরাম শান্তি ও সৌম্য নিস্তব্ধতার মধ্যে আসিয়া তাহারা সান্ত্বনার প্রলেপ-পরশ পাইয়াছে। প্রকৃতির সূক্ষ্মতম সৌন্দর্য্য ও বিপুলতম বিরাটতা উভয়ই তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে, নীরব বিস্ময়ে উভয়কেই তাঁহার হৃদয় গ্রহণ করিয়াছে।

ঔপন্যাসিক ও কবি বোয়ারকে মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন ভাবদ্রষ্টা বোয়ার। এই বিংশ শতাব্দীর জীবনের আবেগ ও আন্দোলন, অতৃপ্তি ও বিক্ষোভকে এমন করিয়া আর কেহ রূপ দিতে পারিয়াছেন কি না জানি না। মানুষের জ্ঞানের রাজ্য দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে, দিন দিন প্রকৃতির গুপ্ত ভাণ্ডার হইতে নব নব রত্ন আহরণ করিয়া আমরা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড জয় করিতে চাহি, বিলাসের উপকরণ ও ঐশ্বর্য্যেরও অন্ত নাই, কিন্তু মানুষের মন সে সকলকে তুচ্ছ করিয়া শান্তি খুঁজিয়া খুঁজিয়া কাঁদিয়া মরে। সৈন্তসম্ভারে মানুষের আত্মা সুখী হয় না, জ্ঞানের মদিরা পান করিয়া পিপাসা বাড়িয়াই চলে, ক্ষমতার ফেনিলতায় সে খিন্ন হইয়া পড়ে। জীবনের অর্থ খুঁজিবার এই যে প্রয়াস, মানুষের আদর্শ কোথায়, তাহার সকল সাধনার পরিণতি কিসে,—বোয়ার এই সব যেমন করিয়া বুঝিতে চাহিয়াছেন, এই সন্ধানের আকুলতায় তাঁহার রচনা যেমন ভাবে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে, আমরা তাহারি মধ্যে আমাদের অন্তরের চিরন্তন প্রশ্নের প্রকাশ দেখিতে পাই। তাঁহার সঙ্গে সহানুভূতিতে আমাদের হৃদয় সাড়া দিয়া উঠে, একই মানুষের যে প্রাণ আমাদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করিয়াছে, তাহার পরিচয়ে আমরা মুগ্ধ হই, তাঁহাকে আমরা ভালবাসিতে শিখি।

মানুষকে বোয়ার ভালবাসিয়াছেন। মানুষের মহত্ব, মানবাত্মার বিপুল সাধনা তাঁহাকে দুর্ব্বার আকর্ষণে টানিয়াছে। আমরা হাসি, কাঁদি, ঘর বাঁধি, ঘর ভাঙি, কিন্তু আমাদের অন্তরের কোন্ দুর্জ্জয় বিপুল আবেগ যে আমাদিগকে এ সব করাইতেছে, আমরা নিজেরাই তাহা জানি না। সমস্ত অন্তর দিয়া যাহা কিছু আমরা চাই, সমস্ত হৃদয় যাহার অভাবে কাঁদিয়া উঠে, তাহাও আমাদের মেলে না! তবু সহস্র বাধা বিপত্তি, ব্যর্থতা হতাশাকে জয় করিয়া আমরা অন্ধ নিয়তির সঙ্গে যুদ্ধ করি, হার মানিয়া কখনো বসিয়া থাকি না। জীবনের পাত্র যখন শুকাইয়া যায়, দিনের আলোক যখন আমাদের নয়নে নিভিয়া আসে, তখনো আমরা আশা করি, আকাঙ্ক্ষা করি, বেদনা পাই। সকল ব্যথা, সকল আঘাত, সকল ব্যর্থতার চেয়ে মহৎ, সকলের চেয়ে গভীর, সকলের চেয়ে দুর্ব্বার এই যে জীবন-কণা আমাদের অন্তরে নিহিত রহিয়াছে, তাহাকেই বোয়ার রূপ দিতে চাহিয়াছেন, জীবনের সেই চিরন্তন মূর্ত্তিই তাঁহার উপন্যাসের কায়া ধরিয়া পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। জীবনের অদম্য পিপাসা, অপ্রকাশকে প্রকাশ করিবার আকুল আকুতিতে আপনাকে প্রসারিত করিয়া দিবার যে বিপুল প্রয়াস, তাহাতে বোয়ারের রচনা কেবলমাত্র মধুরই হইয়া উঠে নাই, সুখদুঃখের আঘাত-সংঘাতে তাহা মহীয়ান হইয়া উঠিয়াছে।

মানবাত্মার এই দুর্জ্জয় দুঃসাহস, অন্ধকার ভেদ করিয়া আলোকের সন্ধানে মানুষের এই যুগযুগব্যাপী অভিযান

হুমায়ুন কবির

বোয়ারকে মুগ্ধ করিয়াছে, তাঁহার সকল চেতনা আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। তাই তাঁহার সকল রচনায় প্রকাশ পাইয়াছে মানবাত্মার দেবত্ব—the deification of the human spirit. পশু পূর্ব্বপুরুষের রক্তের উত্তরাধিকার পরিত্যাগ করিয়া, পারিপার্শ্বিক জগতের সকল ক্রুরতা, সকল নিষ্ঠুরতার আবেষ্টনের মধ্যে থাকিয়া মানুষের অন্তরে যে কখন আদর্শের ছায়াপাত হইল, কে জানে। কিন্তু তাহারি জন্য মানুষ যুগ যুগ ধরিয়া প্রবৃত্তিকে লঙ্ঘন করিয়া আপনার জীবনের গতি চালিত করিয়াছে, স্বভাবকে জয় করিয়া মানবত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এই যে আপনার সংস্কারকে জয় করিবার মহত্ব, তাহারি জয়গান বোয়ার গাহিয়াছেন, তাহারি উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় তাঁহার রচনা মুখর। সকল চরিত্র সৃষ্টি, সকল ঘটনাসংস্থান, প্রেম-প্রীতি, হিংসা-দ্বেষ, আকাঙ্ক্ষা-বিরাগ, আশা-নিরাশার সকল কাহিনীর মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে এই একই বাণী—মানুষকে আপনার আবেষ্টন জয় করিয়া তাহাকে ছাপাইয়া উঠিয়া মহত্তর জীবন স্থাপন করিতে হইবে। সেই আদর্শের স্বপ্নই তাহার স্বর্গ, সেই আদর্শের মূর্ত্তপ্রকাশই তাহার ভগবান।

কিন্তু তাই বলিয়া সংসারের বেদনা, সংসারে ক্ষুদ্রতার কথা বোয়ার ভুলিয়া যান নাই। আদর্শবাদীর আদর্শের উদ্ভাসিত আলোক যে জগতে পড়িয়াছে, সে আমাদের এই সুখদুঃখ আনন্দবেদনার জগৎ। সংসারের বেদনাকে, আঘাত-সংঘাতকে তিনি তুচ্ছ করিয়া দেখেন নাই; যেখানে যাহা কিছু খুঁত, যাহা কিছু ত্রুটী, নির্ম্মম করে পাষাণে তাহা তিনি খুদিয়া তুলিয়াছেন। সংসারে মায়ের বুকে শিশু মরিতেছে, নিষ্ঠুরের অন্যায় উৎপীড়নে হতভাগ্যের জীবনের ধারা শুকাইয়া যাইতেছে, স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত বাধিয়া মানুষ ক্ষুদ্রতা, নীচাশয়তার পরিচয় দিতেছে,—ইহাও যেমন সত্য,—তেমনি অন্যদিকে মানুষের আত্মা মানুষের জন্য কাঁদিতেছে, আপনার জীবনের সকল সুখ, সকল আশা হাসিমুখে বিসর্জ্জন দিয়া মানুষ অপরের দুঃখ বরণ করিয়া লইতেছে, তাহাও কি সত্য নয়? মানুষ যুগ যুগ ধরিয়া স্বপ্ন দেখিয়াছে, রঙের পরে রঙ মিশাইয়া যে ছবি আঁকিয়াছে তাহাতে কালিমার রেখাভাব দেখিয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়াছে, আবার কখনো বা আপনার অন্তরের আনন্দ গীতিমুখে উৎসারিত করিয়াছে। এই যে এষণা, এই যে গভীর সৌন্দর্য্য-প্রীতি, এই যে অনুভূতির তীব্রতা,—ইহাই যুগে যুগে মানুষকে অমর করিয়াছে। মানুষ আপনাকে ভুলিয়া গিয়া আদর্শের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়া তবে সুখী হইতে পারিয়াছে।

ঘটনার আবেষ্টনকে, পারিপার্শ্বিক জগতের সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করিবার এই যে সাধনা তাহাই মানবত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। দরিদ্রকে পদে পদে বাধা সহ্য করিয়া চলিতে হয়, হৃদয়ের সকল আশা তাহার স্বপ্নই থাকিয়া যায়। কিন্তু তাই বলিয়া সে কি তাহা নির্ব্বিকার চিত্তে গ্রহণ করে? বাস্তব-জগতে তাহার জীবনে যাহা সম্ভব হইল না, স্বপ্ন গাঁথিয়া গাঁথিয়া আপনার মানস-জগতে তাহাই সে উপভোগ করে, তাহার মানুষ-হৃদয় সকল সংকীর্ণতাকে অস্বীকার করিয়া, সকল বাধা জয় করিয়া জীবনের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে। তাঁহার Emigrants-এ তিনি দরিদ্রের জীবনে এই যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা—দারিদ্র্য হইতে মুক্তি, অধীনতা হইতে মুক্তি, সকল দীনতা হীনতা হইতে মুক্তি—এই মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকেই প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। স্বদেশে যাহাদের মানুষের অধিকার মিলিল না, শত স্মৃতি-মধুর পরিচিত ভুবন ছাড়িয়া তাহারা নূতন জগতের সন্ধানে নূতন পথে যাত্রা করিল। দেহের রক্ত জল করিয়া যাহারা দেশকে গড়িয়া তুলিয়াছে, যাহাদের পরিশ্রমের ফলেই মানুষের সভ্যতা, সেই শ্রমজীবি ও কৃষক যুগ-যুগান্তর ভরিয়া অনাদর অবহেলাই পাইয়া আসিয়াছে। তাহাদের অন্নে পরিপুষ্ট, তাহাদের বসনে সজ্জিত, তাহাদেরি পরিশ্রমে সৃষ্ট বিলাসের শত উপকরণে পরিতৃপ্ত সমাজ তাহাদিগকে ঘৃণা করিয়া আসিয়াছে, মানুষের অধিকার তাহাদিগকে দেয় নাই কিন্তু তাহারাও তো আমাদের মতনই মানুষ, আমাদের মতনই তাহাদের হৃদয় আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেল হইয়া উঠে, আমাদের মতনই তাহারা আদর্শের সন্ধানে ব্যাকুল হইয়া জীবনের পূর্ণতা খুঁজিয়া মরে। বহু যুগব্যাপী দাসত্ব অস্বীকার করিয়া আজ তাহারা আপনাদের মনুষ্যত্বের গৌরব, মনুষ্যত্বের

অধিকার চাহিয়া উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে, কে তাহাদিগকে বাঁধিয়া রাখিবে? অর্থই জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্ভ্রমের মূল, তাই সেই অর্থ-সম্পদ আহরণ করিতে Emigrants-এ Kal, Morten, Per দেশ পরিত্যাগ করিল। কিন্তু সকলেই যে কেবল অর্থ আহরণের জন্য যাত্রী সাজিল, তাহা নহে। স্বদেশের সংকীর্ণ সীমারেখার মধ্যে যাহাকে যে অধীনতা বা বিধিনিষেধের গণ্ডী পীড়া দিয়াছে, সে তাহারই হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য সুদূর বিদেশে যাত্রা করিল। এ বিদেশ কোন ভৌগলিক দেশ নহে, তাহা মানবের অন্তরের সুদূর গহনপুরী, যেখানে ছিন্ন কুসুম আবার ফুটিয়া উঠে, দীর্ণ হৃদয়ের অশ্রুজলের তলে হাসির আভাস শরতের বৃষ্টিস্নাত কুসুমের পরে রৌদ্রকরের মতন ঝলসিতে থাকে। তাই যখন তাহারা গন্তব্যস্থানে পৌছিয়া দেখিল ইহাও তাহাদের আকাঙ্খিত সেই স্বপ্নস্বর্গ নহে, তখন তাহাদের মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, অতৃপ্তিতে সকল অন্তর ভরিয়া গেল। স্বদেশের জন্য মন কাঁদিয়া উঠিল।

মানুষের সমাজে নূতন সাম্য, নূতন মৈত্রীর বন্ধন গড়িয়া তুলিবার যে ছবি বোয়ার Emigrants-এ আঁকিয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব। সভ্যতা যে কেমন করিয়া সম্ভব হয়, কত স্বার্থত্যাগ, কত সাধনা, কত প্রয়াস যে তাহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে, বোয়ার তাহাই প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। যাহারা এমন করিয়া নূতন সভ্যতা গড়িয়া তোলে, তাহারা বীর, তাহারা মহৎ, কিন্তু তাহাদের মহত্ব, তাহাদের বীর্য্য রক্তস্রোতে ধরণীকে ভাসাইয়া নহে,—প্রতিদিবসের ক্ষুদ্র অত্যাচার সহিয়া, শত অপরাধ, শত অপমান ক্ষমা করিয়া তাহাদের বীরত্বের প্রকাশ। দৈনন্দিন জীবনের এই যে তুচ্ছ বিরক্তিকর সহস্র ঘটনা, তাহাকে জয় করিয়া জীবনের পথে চলিবার সাধনা যে কত কঠিন তাহা সহজে চোখে ধরা পড়ে না। অকস্মাৎ বিকশিত ধূমকেতুর দীপ্তি সেখানে নাই, সেখানে রহিয়াছে গৃহপ্রদীপের কল্যাণ, গৃহ-প্রদীপের প্রতিদিন ধরিয়া আলোক বিকীরণ।

অর্থ তাহারা উপার্জ্জন করিল, ক্ষমতা ও সম্ভ্রম তাহাদের জুটিল, কিন্তু হৃদয় কি তাহাতে তৃপ্তি পায়? গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য একদিন যাহাকে প্রাণান্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, তাহার যখন দেহের ক্ষুধা মিটিল, তখনো ত তাহার অন্তরের ক্ষুধা মেটে নাই। বিলাসের প্রাচুর্য্যে যখন সে আপনাকে হারাইয়া ফেলিতেছে, তখনো সে সুখ খুঁজিয়া পায় নাই, তখনো তাহার হৃদয়ের কোণে যে কি অপূর্ণতা রহিয়াছে—তাহা প্রকাশ করিয়া বলিবার তাহার ক্ষমতা নাই, কিন্তু দিবা-রাত্রী প্রচ্ছন্ন কণ্টকের মতন তাহা তাহার অন্তরে বিঁধিতেছে। সমস্ত হৃদয় যাহা আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল, তাহারি সিদ্ধিতে মন বিবশ হইয়া পড়ে, প্রিয়হারা বঞ্চিতের মতন বুভুক্ষু ক্ষুধায় কাঁদিয়া মরে,—মানব মনের এ দুর্জ্ঞেয় রহস্যের অর্থ কি কেহ খুঁজিয়া পাইয়াছে? স্বদেশের জন্য মন যখন ব্যাকুল হইয়া উঠে, সেই স্বদেশে ফিরিয়া মন আবার বিদেশের জন্য কাঁদিয়া উঠে, সান্ত্বনা মানে না।

বোয়ার মানুষের জীবনকে গতিরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন। সকল পাওয়াকে, ছাড়াইয়া মহত্তর, বিপুলতর, অস্পষ্টতর যে এক বিরাট অসীম আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাহাকে অনুভব করিয়া আমরা তাহাকে উপলব্ধি করিতে চাহি। সে আছে জানিয়া তাহারি বিরহে আমাদের চোখে নিখিল জগত ভরিয়া অসীম রোদন আকুল হইয়া উঠে। জীবনের যে উৎসলীলা আমাদিগকে মুগ্ধ করিতেছে, তাহার গোপন সঞ্চার সৃষ্টির কোন্ অতল তলে তাহাও আমরা জানি না—জানিবার সাধনায় ব্যাকুল হইয়া উঠি। আরও আলোর জন্য আমাদের হৃদয় কাঁদিতে থাকে, আরও প্রীতি, আরও করুণার জন্য আমাদের হৃদয় ভিখারী, আরও স্বাধীনতার জন্য আমাদের আত্মা পিয়াসী, কিন্তু এ সকল ক্রন্দনের মূলে রহিয়াছে জীবনকে সম্পূর্ণভাবে লাভ করিবার সাধনা! মানবাত্মার এ ক্রন্দন স্বদেশ বিদেশের জন্য নয়, ধনমান, সম্ভ্রমের জন্য নয়, প্রেমপ্রীতির স্নিগ্ধছায়া-ঘন গৃহ-কোণের জন্য নয়,—এ ক্রন্দন সকল পাওয়ার অতীত এক অব্যক্ত অপ্রকাশের জন্য, এ ক্রন্দন মানবাত্মার আপনার ভগবানকে খুঁজিয়া পাইবার তপস্যা। এই যে অসীমের সন্ধান, ইহাই মানবাত্মার মহত্তম সাধনা—ইহাই তাহার ধর্ম্ম। *

* আগামী সংখ্যায় লেখক বোয়ার রচিত গ্রন্থাবলীর আলোচনা করিবেন। বিঃ সঃ

বিবিধ সংগ্রহ

নুতন ধরণের সরস্বতী মূর্ত্তি

গেল সরস্বতী পুজোর পরদিন বিকেলে আমরা যেমন বেরিয়ে থাকি তেম্নি বেড়াতে বেরিয়ে দেখি যে রাস্তায় সরস্বতীর নানা রকমের মূর্ত্তি নিয়ে গঙ্গায় বিসর্জ্জন দেবার জন্য মিসিল্ চলেছে। সরস্বতীর দেবী মানুষী ও বিদ্যাধরী ধরণের কত মূর্ত্তি যে দেখা গেল তার আর ঠিকানা নেই। কেউ প্রাচীন ধরণের আকর্ণ বিস্তৃত চোখ দিয়েছেন, দেবীর হাতের বীণা হাতেই রয়েছে বটে কিন্তু বাজাবার কোনই ভঙ্গী নেই,—এম্নি মূর্ত্তিই বেশী। আবার শুনতে পেলাম প্রাচীনের মধ্যে নূতন কিছু কর্‌তে যেয়ে কেউ নাকি দেবীকে চারখানা হাত দিয়েছেন, আর কেউ নাকি দেবীর হাতে বীণার বদলে অসি দিয়ে কলাচিন্তার অধিষ্ঠাত্রীর রস-চর্চ্চার দিকটাকে আমল দিতে চান নি। আরেক দিকে, আজকাল কার্ত্তিক যেমন বাবু হয়েছেন, তাঁর এ বোনটিরও সেদিকে নজর পড়েছে। তাই বহু বাবু সরস্বতীর আমদানি দেখা গেল। শুধু মানুষের মত চক্ষু নয়; এ মূর্ত্তিগুলির নমুনা দেখে মনে হ'ল শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর "সরস্বতী দেখা দিবে পরিয়া বনেট" বাণীটি বেশ সাফা হয়ে উঠেছে। লোকের রুচি-মাফিক্ রসদ জোগাতে গিয়ে কুমারটুলীর কারীগরদের কি দুর্দ্দশা হয়েছে, তা' বাস্তবিকই ভেবে দেখবার মত।

বৈচিত্র্যহীন মূর্ত্তি দেখে দেখে বিশেষ লক্ষ্য না ক'রেই আমরা রাস্তা চল্‌ছিলাম। হঠাৎ গোলদীঘির ধারে ভিড়ের মধ্যে খানিকটে দূর থেকেই একটি মূর্ত্তি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ কর্‌ল। আমরা এগিয়ে কাছে না গিয়ে পার্‌লাম না। এ মূর্ত্তিটি দেখে মনে হ'ল এ না দেখ্‌লে এবারকার সরস্বতী পুজোই ব্যর্থ হয়ে যেত। অতি চমৎকার এই মূর্ত্তিটী; একেবারে সাদা—কোথাও কোন রঙের বালাই ছিল না। বস্‌বার ভঙ্গিটি নতুন, বীণা বাজাবার ভঙ্গিটি নতুন, মুখের সে ভাব-তন্ময়তা আর কোথাও দেখেছি বলেত মনেই হয় না। হাঁসটি যে ভঙ্গিতে বসে আছে তাতে স্বাভাবিকতার সঙ্গে কারুকৌশলের বেশ মিল হয়েছে। তারপর যে চৌদোল বা মন্দিরের মধ্যে দেবীমূর্ত্তিটি স্থাপন করা হয়েছে তাতে অতি সুন্দর প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্যের আভাস আছে। একটি বিষয় আমাদের কাছে একটু বেমানান মনে হয়েছে। দেবীর পিছনের দিকে (back-ground) যে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখানো হয়েছে তা' বেশ সুন্দর হ'লেও পাশ্চাত্য ধরণের হয়েছে বলে এই ভারতীয় পদ্ধতির মধ্যে একটু খাপছাড়া মনে হচ্ছিল। মোটামুটি, এমন প্রকৃত শিল্পের কাজ যা দেখবা মাত্র মনকে কেড়ে নেয় তা আধুনিক কোন মূর্ত্তিতে আমরা দেখিনি। জিজ্ঞাসা করে জান্‌লাম্ কল্‌কাতার আর্ট স্কুলের হোষ্টেলের ছাত্রেরা নিজেরাই এই অনবদ্য মূর্ত্তিটি গড়েছেন।

দেবী মূর্ত্তির কল্পনা সম্বন্ধে খানিকটে বলা দরকার। আমরা যে সব সরস্বতী দেখ্‌তে পাই তাকে সাজিয়ে গুজিয়ে যেন একটি ছবি করে তোলা হয়। যা ভারতীয় রূপ রচনার প্রাণ সেই ভাব-যোজনার কোন সন্ধানই তাতে মিলে না। এইজন্য আমাদের সেকেলে লৌকিক ধরণে যারা মূর্ত্তি রচনা করে তাদের হাতের শিল্প আমাদের মনে বড় একটা সাড়া দেয় না। কৃষ্ণনগরের কুমোরদের তৈরী মূর্ত্তিও সুধু মানুষী ভাব দেখাবার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে উঠেছে। প্রাচীনের যেখানে প্রাণ ও সৌন্দর্য্য তাকে আমরা বর্ত্তমানের জীবন-ব্যাপারের মধ্যে ফুটিয়ে তুল্‌তে পার্‌লেই আমাদের প্রাণে একটা সাড়া আসবে। আর্ট স্কুলের হোষ্টেলের ছাত্রেরা তাই পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে শিক্ষিত হয়েও প্রাচীন ভারতের অবদান ও প্রাণ-ধারার সঙ্গে যোগ স্থাপন কর্‌তে পেরেছেন বলেই এই মূর্ত্তি রচনা সম্ভবপর হয়েছে। বৌদ্ধ তারামূর্ত্তি ও প্রজ্ঞাপরিমিতার ভাবটিকে হিন্দু সরস্বতী কল্পনার সঙ্গে মিশিয়ে একটি নূতন

ধরণ করা হয়েছে। এতে হয়ত কোন কোন পণ্ডিত আপত্তি তুলবেন। শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সরস্বতী সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেছেন—আশা করি তিনি ভারতীয় শিল্পের নব-গতির অগ্রগামী হিসাবে এ মূর্ত্তিটির একটু আমল দিবেন। হিন্দু দেবীর মধ্যে বৌদ্ধ দেবীর ভাব যোজনা করতে যদি কারু আপত্তি হয়, তবে আমরা একথা বলতে বাধ্য যে শুধু ওরূপ করাতেই মূর্ত্তির ভাব, মাধুর্য্য ও লাবণ্য যেন শতগুণ বেড়ে গিয়েছে—খালি শিল্পশাস্ত্রের বিধান ও গুরুগম্ভীর ধ্যানের মন্ত্রের খাতিরে এরূপ প্রাণবান্ শিল্প-সুষমা হারাতে আমরা রাজী নই। সমস্ত নতুন ব্যাপারে যা হয়ে থাকে এ মূর্ত্তি নিয়েও তাই হয়েছিল—অনেক বাধা ও আপত্তির মধ্য দিয়ে কাজ অগ্রসর হয়েছিল। আর্ট স্কুলের ছাত্ররা বিশেষ করে যবদ্বীপের বৌদ্ধ মূর্ত্তিগুলির চিত্র দেখে তাঁদের পরিকল্পনা ঠিক করে নিয়েছিলেন। দেশে এ ধরণের মূর্ত্তি গড়া হয় না বলে সব কিছুতেই নিজেদের মাথা খাটাতে হয়েছিল। গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে যে পদ্ধতিতে শেখান হয় তার সঙ্গে এ পদ্ধতির মিল নেই বলেও ছাত্রদের অনেকটা বেগ পেতে হয়েছিল। আমাদের দেশে মূর্ত্তি গড়তে তাতে রঙ্ দেওয়া চাই, তুলি দিয়ে চোখ এঁকে দেওয়া চাই। এঁরা এসব কিছুই করেননি বলে প্রাচীন পদ্ধতির পুরুত ঠাকুর নাকি পূজা করতেই রাজী হননি, তাঁকে বহু সাধ্য সাধনা ক'রে তবে এ চক্ষুহীন (?) মূর্ত্তিটির পূজা নির্ব্বাহ হয়েছিল! ভারতীয় প্রাচীন শিল্পের রাস্কিন শ্রীযুক্ত হ্যাভেল-সাহেবের অবদান আর্ট স্কুল হতে একেবারে লুপ্ত হয় নি। তাই বর্ত্তমান প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত ব্রাউন সাহেব ছেলেদের এ মূর্ত্তি দেখে খুব খুসী হয়েছিলেন ও উৎসাহ দিয়েছিলেন। তিনি নাকি বলেছিলেন যে এতদিন তিনি যা শিখিয়েছিলেন আজ তা সার্থক হয়েছে।



[redacted]

নূতন ধরণের সরস্বতী মূর্ত্তি

যাঁরাই এই মূর্ত্তিটি দেখেছিলেন তাঁরা সবাই একে গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিতে মানা করেছিলেন। ছাত্রদের কাছেই শুনতে পেলাম "ভারতবর্ষের" সম্পাদক মহাশয়ও মূর্ত্তিটিকে কোথাও

রাখবার জন্ত বারবার অনুরোধ করেছিলেন। আমরা যখন রাস্তায় দেখ্‌লাম তখনও ছাত্রদের এ মতি দেখে খানিকটে দুঃখিতই হয়েছিলাম। এরূপ ধরণের মূর্ত্তির প্রথম চেষ্টা বলেই এর মূল্য আছে। ছাত্ররা নিজেরাই যখন এটাকে নষ্ট কর্‌লেন তখন অগত্যা ফটো ছাড়া এর চিহ্ন রাখবার অন্য উপায় নেই। এই মূর্ত্তিটির যেসব ফটো রাখা হয়েছে দুর্ভাগ্যক্রমে সেগুলি বেশী ভাল হয় নি, তবু আশা করা যায় তা দেখেও অনুমান করা শক্ত হবে না যে মূর্ত্তিটি কিরূপ চমৎকার হয়েছিল।

শ্রীরমেশচন্দ্র বসু

গ্রন্থ বনাম সংবাদ-পত্র

সাড়ে নয়টা দশটার সময় যাহারা পান মুখে ও খবরের কাগজ বগলে, হাওড়া পুলের উপর দিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে কলিকাতার দিকে আসে, তাহাদের নিকট-আত্মীয়েরা খাস ইংলণ্ডেও দুর্লভ নহে। গত ১৫ই জুলাই, গ্রন্থবিক্রেতাদের সম্মেলনে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার মিঃ ব্রিমলে বাউয়েস্‌ এই শ্রেণীর জীবদিগকে বেশ দুকথা শুনাইয়া দিয়াছেন। সকাল বেলায় ট্রেণ হইতে নামিয়াই ইহারা যখন বাস্‌ ধরিতে ছুটে, তখন দেখা যায় প্রত্যেকের হাতেই একখানা করিয়া খবরের কাগজ। আবার সন্ধ্যার সময় কোন গতিকে ট্রেণে উঠিয়াই ইহারা পুনরায় একখানা খবরের কাগজ কিনিয়া, অবসন্নভাবে তাহার উপর চোখ বুলাইতে থাকে। এই দুবেলা খবরের কাগজ পড়ার অভ্যাস, ইহা কি স্বাস্থ্যকর? ভাইস্‌ চ্যান্সেলার মহাশয়ের মতে ইহা মানসিক পক্ষাঘাতের পরিচায়ক। শুধু খবরের কাগজই যাহাদের মানসিক দানাপানির সংস্থান করে, তাহাদের মনের অবস্থা যে কি রকম তাহা একটু ভাবিবার বিষয়।

মিঃ বাউয়েসের মতে এই রোগের প্রতিকার হইল বই কেনা ও পড়া। যদি জ্ঞানার্জ্জনই অধ্যয়নের লক্ষ্য হয়, তবে নিকৃষ্টতম পুস্তকও প্রথম শ্রেণীর সংবাদ-পত্রের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর। মিঃ বাউয়েসের এই সমস্ত মন্তব্য একটু হাল্কা ধরণের; সুতরাং খুব গম্ভীরভাবে ইহার আলোচনা করিলে হয়ত একটু ভুল করা হইবে। তবু খবরের কাগজের বিরুদ্ধে তিনি যে অভিযোগ আনিয়াছেন তাহা আন্তরিক; এবং বিষয়ে তিনি একক নহেন। এই ধরণের অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়।

এখন প্রশ্ন এই, আমরা খবরের কাগজ পড়ি কেন? জ্ঞানার্জ্জনের জন্ত কি? সকালে ঘুম ভাঙ্গিলেই যে, মনটা "ফরওয়ার্ড" বা "অমৃত বাজার পত্রিকা"র জন্ত ছটফট্‌ করিতে থাকে, সেটা কি ধনবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান ইত্যাদি শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের আশায়, না গল্প শুনিবার লোভে? আসলে এই গল্প শোনার প্রবৃত্তিই হইল আমাদের খবরের কাগজ পড়ার মূল প্রেরণা। ছোটবেলায় আমরা ঠাকুরমার মুখে রূপকথা শুনিতাম। এখন সংবাদ-পত্রই আমাদের ঠাকুরমা। এই ঠাকুরমার ভাণ্ডার অফুরন্ত। আজ কাপ্তেন লুঙ্গেসারের এরোপ্লেন; কাল কেভিন ওহিগিন্‌সের মৃত্যু; তার পরদিন হয়ত ডারবির ঘোড়দৌড় কিংবা মোহনবাগানের খেলা, বা পলাশীর দ্বিতীয় যুদ্ধ অথবা স্যাকো ও ভ্যানজেটির বিচার। ক্লান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত নিত্য নূতন কাহিনীর অভাব বা অপ্রাচুর্য্য নাই। ব্রিটিশ মিউজিয়াম্‌ ও ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর সমস্ত গ্রন্থ মিলিয়াও আমাদের এই পিপাসা মিটাইতে পারে না। সুতরাং সাধারণ লোককে সংবাদপত্র না পড়িয়া গ্রন্থ পড়িতে বলা যেরূপ সঙ্গত, শিশুকে রূপকথার পরিবর্ত্তে অতি-প্রাকৃতের উৎপত্তি ও বিবর্ত্তন সম্বন্ধে ফ্রেজারের বই পড়িতে বলা ঠিক সেইরূপই সঙ্গত।

তারপর শুধু গল্প শোনাই নয়। অধিকাংশ মানুষেরই অপর মানুষের জীবন সম্বন্ধে একটা অদম্য কৌতূহল আছে। এই কৌতূহল ভাল কি মন্দ জানি না। তবে ইহা স্বাভাবিক, অর্থাৎ ইহার ভিত্তি আমাদের সহজাত চরিত্রের উপর। অপরের নানা কাজের মধ্যে উঁকি মারা, নানা মতলবের উপর আড়ি পাতা একটা দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি। এই ব্যাধির বশেই আমরা ইতিহাস পড়ি, জীবনচরিত পড়ি, উপন্যাস পড়ি; এবং এই জন্তই সকাল-সন্ধ্যায় সংবাদপত্র না হইলে

আমাদের চলে না। আর এটা কি এতই নিন্দনীয়? জীবনের কাজে বিজ্ঞানের তথ্য ও যুক্তির দীর্ঘ এবং ভয়াবহ তালিকার চেয়ে মানবচরিত্রের সহিত ঘনিষ্ঠ ও অশ্রুসিক্ত পরিচয় কি একেবারেই হীনতর? নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না।

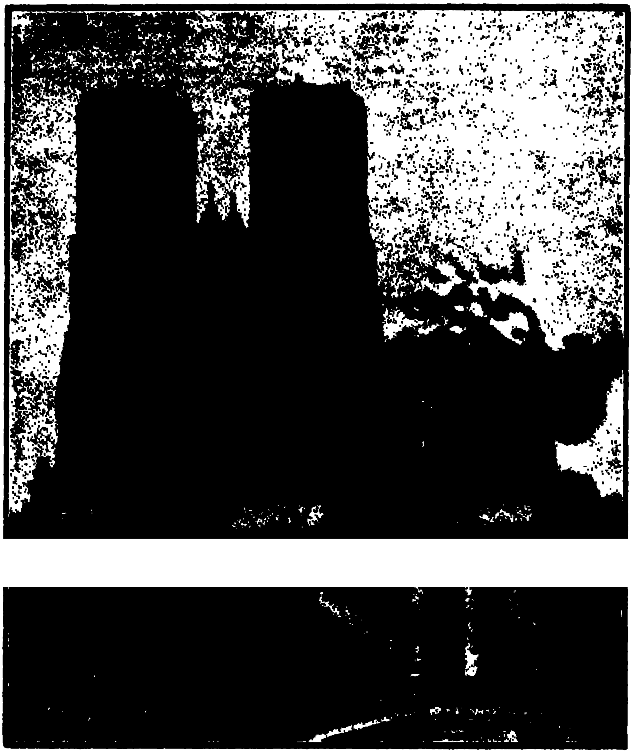
তারপর জ্ঞানার্জ্জনের কথা ধরাই যাক্। অবশ্য ইহা ঠিক যে কোন না কোন বিষয়ে প্রত্যেক মানুষেরই পুঙ্খানুপুঙ্খ ও অন্তরঙ্গ জ্ঞান থাকা দরকার। এইজন্য বইপড়া উচিত। সংবাদপত্র যদি এই ক্ষেত্রে গ্রন্থের প্রতিযোগিতা করে তবে তাহা ক্ষতিকর। কিন্তু তাহা কি করে? অধিকাংশ মানুষই নিজের নেশাটা বেশ ভাল করিয়াই বুঝে; সেজন্য সংবাদপত্রের মুখাপেক্ষা করে না। কিন্তু নিজের গণ্ডীর বাহিরে অন্যান্য সমস্ত বিষয়েই অল্পবিস্তর জ্ঞান থাকাটা সকলেই চায় এবং তাহা সকলেরই দরকার। সেজন্য বিরাট গ্রন্থ পড়িবার অবসর কোথায়, রুচি কোথায়? ধরা যাউক্ আমরা জগদীশ বসুর আবিষ্কার সম্বন্ধে বা আইনষ্টাইনের থিওরী সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহি। এই জ্ঞান আহরণের জন্য কি আচার্য্য মহাশয়ের বা এডিংটন সাহেবের মৌলিক গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করিতে হইবে? এরূপ উপদেশ দেওয়া চূড়ান্ত ভণ্ডামি ও বোকামি। সাধারণ মানুষ ব্যাপারটা বোঝে। সে তাই খবরের কাগজ পড়ে। সেখানে তাহার যতটুকু দরকার তাহা সে পায়; শুধু পায় না, বেশ সরল ও চিত্তাকর্ষকভাবেই পায়। এইটাই হইল আসল কথা। বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের রাজত্ব ন্যায়শাস্ত্রের অশরীরি রাজত্ব। সেখানে মানবহৃদয়ের স্বাদ স্পর্শ বা গন্ধ কিছু নাই। কর্ম্মক্লান্ত মন সেখানে হাঁপাইয়া উঠে। সংবাদপত্র লেখকের বাহাদুরী এই যে তিনি বিজ্ঞানের তথ্যও বেশ একটু ভঙ্গীর সহিত বলিতে জানেন। ওই ভঙ্গীর মধ্যে তাঁহার চরিত্রের ছাপ থাকিয়া যায়। আমরা তাঁহার লেখা পড়ি। পড়িয়া শুধু যে জ্ঞানার্জ্জন করি তাহা নয়; একটা গোটা মানুষের সাক্ষাৎ পাই। মস্তিষ্কের ক্ষতিটা হৃদয়ের লাভে পুরিয়া উঠে। সোশ্যালিজ্‌ম্ সম্বন্ধে কার্ল মার্ক্‌সের বা ক্রট্‌স্কির গ্রন্থ পড়ার ধৈর্য্য বা সামর্থ্য কটা লোকের আছে? কিন্তু দৈনিক বা মাসিক পত্রে এইচ্‌, জি, ওয়েল্‌স্ যদি এই বিষয়ে লেখেন তবে জ্ঞান ত মিলিবেই, উপরন্তু এইচ্‌, জি, ওয়েল্‌সকেও পাওয়া যাইবে। এই লাভের তুলনা নাই। সংবাদপত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের মানবীকরণে সাহায্য করে। এই জন্যই আমরা সংবাদপত্র পড়ি। বর্ত্তমান কালে গ্রন্থের সংখ্যাধিক্যের জন্য বা তাহাদের ভালমন্দ বুঝি না বলিয়াই যে আমরা সংবাদপত্র পছন্দ করি, ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের এই যুক্তি ঠিক নয়। আমাদের সংবাদপত্র-প্রীতি আরও দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই ভিত্তি হইল মানবতা।

শ্রীঅমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

রীম্‌সের বিখ্যাত ভজনালয়ের পুনর্গঠন

ফ্রান্সের অন্তঃপাতি রীম্‌সের বিখ্যাত ভজনালয়ের কথা বোধ হয় সকলেই কিছু না কিছু শুনিয়া থাকিবেন। পৃথিবীর মধ্যে এত বড় এবং এত সুন্দর কারুকার্য্যবিশিষ্ট গীর্জ্জা আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। বিগত মহাযুদ্ধের সময় জার্ম্মানদের দৃষ্টি এই গীর্জ্জাটীর উপর পতিত হয় এবং চার বৎসরের উপর্য্যুপরি গোলাবর্ষণের ফলে উহা প্রায় চূর্ণ করিয়া ফেলা হয়। যুদ্ধ-বিরতির পর আবার উহার পুনর্গঠনের ভার হাতে লওয়া হয় এবং মাত্র কয়েকমাস পূর্ব্বে যীশুখৃষ্টের তিরোধানের সাম্বাৎসরিক দিন, ২৫শে মে এই ভজনালয়ে আবার প্রথম উপাসনা আরম্ভ করা হইয়াছে।

১৯১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চারিদিকে সহরের উপর গোলাবর্ষণের ফলে সহর প্রায় জনশূন্য হইয়া যায়। বিশাল ভজনালয়ের উপাসনাতে যোগদান করিবার লোক সহরে ছিল না। এই ভীষণ গোলাবৃষ্টির মধ্যে ধর্ম্মপ্রাণ পাদ্রীসাহেব মাত্র একজন উপাসককে লইয়া গীর্জ্জায় প্রার্থনাদি করিতেছিলেন। চতুর্দ্দিক গোলাবর্ষণের আওয়াজের ফলে প্রার্থনায় তাঁহার অত্যন্ত ব্যাঘাত জন্মিতেছিল, কিন্তু তাহা সত্বেও তিনি গীর্জ্জার উপর গোলা পড়িবার পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ঈশ্বরোপাসনা করিয়াছিলেন। সেই রাত্রের মধ্যেই গোলা ফাটিয়া সমস্ত গীর্জ্জাটীতে আগুন লাগিয়া যায় এবং গীর্জ্জার মধ্যকার সমস্ত কাঠের কাজ একেবারে ভস্মীভূত



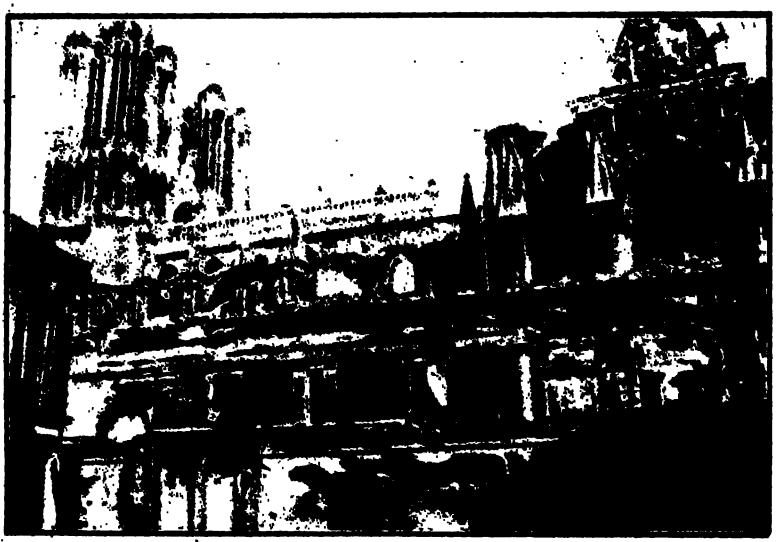
রীম্‌স্‌ ভজনালয়
(গোলাবর্ষণ হইবার কয়েকদিন পরের দৃশ্য)

হইয়া যায়। যুদ্ধ-শান্তির পর ৮ বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে আবার গীর্জ্জাটিকে খাড়া করা হইয়াছে এবং আবার এই স্থানে নিয়মিতভাবে উপাসনাদি আরম্ভ হইয়াছে। এই গীর্জ্জাটির পুনর্নির্ম্মাণে যে বিপুল অর্থ ব্যয় হইয়াছে তাহা য়ুরোপের বিভিন্ন দেশই যোগাইয়াছে। বিখ্যাত ধনকুবের জন্, ডি, রক্‌ফেলার ৬০ লক্ষ ফ্রাঙ্ক দিয়াছেন, ডেনমার্ক হইতে ১২ লক্ষ, নরওয়ে হইতে ২ লক্ষ এবং ইংলণ্ড হইতে ৪ লক্ষ ফ্রাঙ্ক পাওয়া গিয়াছে, এতদ্ব্যতীত ফরাসী গভর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসর ১০ লক্ষ ফ্রাঙ্ক দিয়াছেন। অদ্যাবধি প্রায় ১ কোটী ১০ লক্ষ ফ্রাঙ্ক খরচ হইয়াছে; আরও কত খরচ হইবে তাহা বলা দুষ্কর।

মধ্যযুগের স্থপতি-বিদ্যার নিদর্শন এই বিরাট ভজনালয়টী ধ্বংশের পূর্ব্বে এবং পরে যিনি দেখেন নাই, পুনর্নির্ম্মাণে কেন যে ৮ বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অজস্র অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা তাঁহার পক্ষে দুরূহ। বিগত ৪০ বৎসর ধরিয়া গীর্জ্জার দারুময় কারুকার্য্য সকলের যে নির্ম্মাণকার্য্য চলিতেছিল তাহা বিগত যুদ্ধের সময় পর্য্যন্তও পরিসমাপ্ত হয় নাই; এমন সময় আগুন লাগিয়া উহা সমস্তই ভস্মীভূত হইয়া গেল। কিছুদিন পূর্ব্বেই জার্ম্মানরা গীর্জ্জাটিতে একটা অস্থায়ী হাঁসপাতাল স্থাপন করিয়া, হাঁসপাতালের ব্যবহারের জন্য প্রায় ১০০ শত লোকের শয়নোপযোগী খড় মজুত রাখিয়াছিল। এই খড়, গীর্জ্জায় মজুত টেবিল চেয়ার ইত্যাদির সহিত মিলিয়া ঐদিনকার অগ্নিকাণ্ডে ইন্ধন যোগাইয়াছিল। ছাদের ওক্ কাঠের কড়ি বরগাগুলিও মন্দ রসদ যোগায় নাই। এই বিরাট অগ্নিকাণ্ডটী দুই দিন ধরিয়া চলিয়াছিল। দারুণ উত্তাপে ছাদের সীসার আবরণটী গলিয়া গিয়া নর্দ্দামা ইত্যাদি দিয়া গলিত সীসা মুষলধারে বৃষ্টির ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতেছিল। আগুন নিভিবার পর দেখা গেল যে, কেবলমাত্র দেওয়ালগুলি ও ছাদের কিয়দংশ খাড়া রহিয়াছে! আটটী ঘণ্টাবিশিষ্ট ঘণ্টাঘরটী পড়িয়া গিয়াছে এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর যে সব রঙীন ও নক্সা-করা কাচের দরজা জানালাগুলি ছিল সব চুরমার হইয়া গিয়াছে। মধ্যযুগের ভাস্কর্য্যের নিদর্শন যে সব পাথরের মূর্ত্তি গীর্জ্জার শোভাবর্দ্ধন করিত উহা সবই উত্তাপে ফাটিয়া গিয়া বিকৃত হইয়া গিয়াছে। এক কথায় সমস্ত ইউরোপের কেন্দ্রীভূত মধ্যযুগের শিল্প ও চারুকলার নিদর্শন সবই দুইদিনের অগ্নিকাণ্ডে রসাতলে গিয়াছে। মহাযুদ্ধের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বরাবরই এই গীর্জ্জাটার উপর সমভাবে গোলাবর্ষণ চলিয়াছিল। এই গোলাবর্ষণ এত ভীষণাকার ধারণ করিয়াছিল যে ১৯১৭ সালে বড় বড় কামান হইতে ঠিক

গীর্জ্জাঘরের উপর প্রায় ২৮৭টি গোলা বর্ষিত হইয়াছিল এবং ইহা ছাড়াও অনির্দ্দিষ্ট গোলাগুলির বর্ষণ ইহার উপর যে কত হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও যে গীর্জ্জার দেওয়ালগুলি খাড়া ছিল তাহা হইতেই বুঝা যায় যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর কিরূপ দক্ষ কারিগর দ্বারা উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। এইরূপ গোলাবর্ষণের ফলে দেওয়াল-গুলির পাথর একটা একটা করিয়া খসিয়া পড়িতে লাগিল। যখন জার্ম্মানরা রীম্‌স্ ছাড়িয়া চলিয়া গেল তখন কেবলমাত্র দেওয়ালের বাহিরের ভগ্নপ্রায় দৃশ্য ছাড়া গীর্জ্জার আর কিছুই চোখে পড়িত না। দূর হইতে দেখিলে তখনও মনে হইত যেন গীর্জ্জাটা স্বাভাবিক অবস্থাতেই দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু কাছে আসিলেই প্রকৃত অবস্থা পরিস্ফুট হইত। দেওয়াল এবং খিলানগুলির অধিকাংশই আঘাতের পর আঘাত খাইয়া চুরমার হইয়া যায়। যেগুলির মাথা তখনও দাঁড়াইয়াছিল তাহাদের প্রত্যেকটার মধ্যেও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ফাটল ও গর্ত্ত হইয়া গিয়াছিল। দরজা জানালায় কাঁচের কোন চিহ্নই ছিল না। চারিটী প্রধান থামের মধ্যে একটী একেবারেই চুরমার হইয়া যায়। মেঝের উপর গোলা পড়িয়া ফাটিয়া যাওয়ায় ক্ষুদ্র বৃহৎ গুহার সৃষ্টি করিয়াছিল। গীর্জ্জার চতুর্দ্দিকে ৩৫টী প্রসিদ্ধ ধর্ম্মযাজক ও খৃষ্ট শিষ্যের যে পাথরের প্রতিমূর্ত্তি ছিল, তাহার প্রায় অধিকাংশই চূর্ণ বিচূর্ণ বা হতশ্রী হইয়া গিয়াছিল।

যুদ্ধের পর সমস্ত খৃষ্টীয় জগতের দৃষ্টি এই পুরাতন গীর্জ্জার পুনর্গঠনের দিকে আকৃষ্ট হয়। দুই বৎসর কেবল মেঝে প্রস্তুত ও দেওয়ালগুলির পাথর সন্নিবেশিত করিতেই কাটিয়া গেল। তাহার পর কড়ি বরগা লাগান, খিলান তৈয়ারী এবং ছাদ তৈয়ার কার্য্যে হাত দেওয়া হইল। ছাদের কড়ি বরগা ইত্যাদি প্রধানতঃ ওক্ কাঠের উপর সিসা দিয়া মুড়িয়াই লাগান ছিল, কিন্তু ঐ ভাবে আবার উহার গঠন আধুনিক ইঞ্জিনিয়রদের মনঃপূত না হওয়ায় বিখ্যাত ফরাসী ইঞ্জিনিয়র মসিঁয়ে দিনোঁর স্কিম্ অনুসারে ও তাঁহার তত্ত্বাবধানে ফেরো-কন্‌ক্রীটের কড়ি বরগা লাগাইয়া আবার ছাদ তৈয়ার করা হয়। আবার যদি ওক্ কাঠের কড়ি বরগা দ্বারাই কাজ করিতে হইত তাহা হইলে আবশ্যক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতেই ৫ বৎসর লাগিয়া যাইত এবং তাহার মূল্যও সাধ্যাতিরিক্ত হইয়া পড়িত। ফেরো-কন্‌ক্রীটের আর একটা সুবিধা এই যে ইহার যে-কোন অংশ দরকার মত সমস্তটা না খুলিয়াই বদ্‌লান যাইতে পারে এবং আগুন বা শীত-গ্রীষ্ম ইহার কোনরূপ ক্ষতি করিতে পারে না। ছাদটা তৈয়ার করিতে প্রায় ১৩ মাস লাগিয়াছিল। দরজা জানালার রঙীন বা বিচিত্রিত কাঁচগুলির পুনঃস্থাপনা আর সম্ভবপর হয় নাই কারণ সেইরূপ জিনিষ আজকাল আর পাওয়া যায় না। পুরাতন কাঁচের টুক্‌রা-গুলি সংগ্রহ করিয়া উহাই জুড়িয়া জুড়িয়া



রীম্‌স্ ভজনালয়
(গোলাবর্ষণ হইবার একমাস পরের দৃশ্য)

লাগান হইয়াছে এবং যে সব টুক্‌রা পাওয়া যায় নাই তাহাদের স্থানে যতদূর সম্ভব সেইরূপ নূতন কাঁচ দিয়া যাহাতে পূর্ব্বেকার মত দেখায় সেইরূপ ভাবে কোনপ্রকারে সংযোগ করা হইয়াছে। এই কার্য্যের জন্য মসিঁয়ে জ্যাক্‌স্ সাইমন্‌কে অনেক দিন ধরিয়া পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। ইঁহারা বংশপরম্পরায় এই গীর্জ্জার দরজা জানালার কাঁচগুলির প্রায় ২০০ শত বৎসর ধরিয়া রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আসিতেছেন। গীর্জ্জার বাহিরের চত্বরে যে সকল প্রস্তরমূর্ত্তি ছিল তাহার ছাঁচ ও ছবি প্রস্তুত করিয়া প্যারিসের ট্রকেডারোতে ও যাদুঘরে রাখা হইয়াছে।

"হিমাংশু"

নানা-কথা

অতীব দুঃখের বিষয় রামকৃষ্ণ মিশনের শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ সম্প্রতি দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গসাহিত্যের কতটা যে ক্ষতি হইল তাহা বলা যায় না। তিনি কর্ম্মী রূপে বঙ্গদেশে বিশেষ ভাবে পরিচিত ছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক রূপে বন্যা, দুর্ভিক্ষ, সংক্রামক রোগ প্রপীড়িত জনসাধারণের সেবাই তাঁহার জীবনের ব্রত স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সংঘবদ্ধ রূপে কার্য্য করিবার ক্ষমতা যে অন্যজাতির অপেক্ষা বাঙ্গালীরও কম নয়, একথা তিনি সভ্যজগতের সমক্ষে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। বাঙ্গালী জাতিকে তিনি উদাহরণ দ্বারা শিখাইয়াছেন যে স্বার্থপ্রতিষ্ঠার ভাব বিসর্জ্জন না দিলে কার্য্যসফলতা দুর্লভ। এই ত্যাগ-মন্ত্রে যে-কয়েকজন বাঙ্গালী যুবক চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন তন্মধ্যে শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ছিলেন একজন। পরে সারদানন্দ নাম গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসী-পরিব্রাজক রূপে পৃথিবীর নানা স্থানে তিনি বেদান্ত প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া তাঁহার কার্য্যসীমা বঙ্গদেশেই বিশেষরূপে নিবদ্ধ ছিল।

কিন্তু স্বামী সারদানন্দকে শুধু কর্ম্মযোগী রূপে দেখিলেই চলিবে না। তাহাতে তাহার প্রতি যত না হউক, আমাদের নিজেদের প্রতি যথেষ্ট অবিচার করা হইবে। বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার দান অতুলনীয়ঃ সুললিত ভাষা এবং মার্জ্জিত ভঙ্গী ছিল তাঁহার রচনার বিশেষত্ব। তাঁহার রচনায় কোথাও ভাবের লঘুত্ব অথবা ওঃস্বিতার অভাব পরিলক্ষিত হয় না। তাহার কারণ, সারদানন্দের ভিতরে গভীর পাণ্ডিত্যের সহিত প্রকৃত ভাবুকতার সংমিশ্রণ হইয়াছিল। সাহিত্য-সাধনাও ছিল তাঁহার আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গ—একটা বিশিষ্ট অঙ্গ। তাঁহার রচিত 'ভারতে শক্তিপূজা' শুধু বঙ্গ সাহিত্যে নয়, বিশ্ব সাহিত্যে এক অপূর্ব্ব স্থান অধিকার করিয়াছে। তাঁহার শেষ গ্রন্থ "শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ" তাঁহাকে বাংলাদেশে অমর করিয়া রাখিবে। ইংরাজীতে লিখিত তন্ত্রশাস্ত্রের উপর কতকগুলি প্রবন্ধ প্রায় ত্রিশ বৎসর আগে তিনি মাদ্রাজের 'ব্রহ্মবাদীনে' প্রকাশিত করেন। সেগুলি য়ুরোপীয় বিদ্বজ্জন সমাজে বিশেষরূপে আদৃত হইয়াছিল।

তাঁহার স্মরণে বাঙ্গালীর কল্যাণ হউক।

রবীন্দ্রনাথ যখন গতবার য়ুরোপ যাত্রা করেন তখন বিশ্বভারতীর অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রশান্ত কুমার মহলানবিশ সস্ত্রীক তাঁহার অনুগমন করেন। মহলানবিশ-দম্পতি কবির সহিত য়ুরোপের নানা স্থান পরিদর্শন করেন। কবির দেশে প্রত্যাগমনের পরেও মহলানবিশ মহাশয়কে বৈজ্ঞানিক গবেষণা কার্য্যের জন্য লণ্ডনে আরও কিছুদিন থাকিতে হয়। নানা দেশে সম্মান লাভ করিয়া শ্রীযুক্ত প্রশান্ত কুমার এবং তাঁহার বিদুষী সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী নির্ম্মলা মহলানবিশ সম্প্রতি দেশে ফিরিয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা করিতেছি। বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত কবির 'জাভাযাত্রীর পত্র' শ্রীমতী নির্ম্মলা মহলানবিশকে লিখিত।

*   *   *

কবির প্রতিভার প্রথম উন্মেষের সময় 'মায়ার খেলা' রচিত হইয়াছিল। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে কবি যে সুর তুলিয়াছিলেন, বঙ্গবাসী তাহা আজও ভুলে নাই; আজও সে সুর তাহাদের প্রাণে প্রতিধ্বনি সৃজন করে। তাহার প্রমাণ তিনদিন ধরিয়া কলিকাতায় 'এম্পায়ার থিয়েটারে' 'মায়ার খেলা' দেখিবার জন্য জনসমাগম। শেষ রজনীতে প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-বিৎ শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছিলেন। অভিনয় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছিল।

*   *   *

প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনের ষষ্ঠ বাৎসরিক অধিবেশন আগামী বড়দিনের ছুটীতে মিরাটে হইবে স্থির হইয়াছে। এই সম্মিলন বাঙ্গালীমাত্রেরই গৌরবের ও আদরের বস্তু। ইহা আমাদের জাতীয় একতা ও অন্তরঙ্গতার প্রতীক স্বরূপ। মৌলিক প্রবন্ধপাঠ ও তদ্বিষয়ক আলোচনা এই সম্মিলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই অনুষ্ঠানটির প্রতি বাঙ্গালীমাত্রেরই সহানুভূতি আকৃষ্ট হউক ইহাই আমাদের প্রার্থনা। এ সম্বন্ধে পত্রাদি লিখিতে হইলে শ্রী হরি মোহন মুখোপাধ্যায়, কার্য্যাধ্যক্ষ, প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলন, ষষ্ঠ অধিবেশন, দুর্গাবাড়ী, সদর বাজার, মিরাট,—এই ঠিকানায় লিখিলে চলিবে।

*   *   *   *   *   *

'বিচিত্রা'র এবারকার প্রচ্ছদপট বিখ্যাত শিল্পী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার সেনের পরিকল্পনা

সংকলন

আহ্বান

আমার তরে পথের পরে কোথায় তুমি থাকো
সে কথা আমি শুধাই বারে বারে।
কোথায় জানি আসনখানি সাজিয়ে তুমি রাখো
আমার লাগি নিভৃতে একধারে।
বাতাস বেয়ে ইসারা পেয়ে গেছি মিলন আশে
শিশির-ধোওয়া আলোতে ছোঁওয়া শিউলি-ছাওয়া ঘাসে,
খুঁজেছি দিশা বিলোল জল-কাকলী-কল ভাবে
অধীরধারা নদীর পারে পারে।
আকাশকোণে মেঘের রঙে মায়ার যেথা মেলা,
তটের তলে স্বচ্ছ জলে ছায়ার যেথা খেলা,
অশথশাখে কপোত ডাকে সেথায় সারা বেলা
তোমার বাঁশি শুনেছি বারে বারে॥
কেমনে বুঝি আমারে খুঁজি কোথায় তুমি ডাকো,
বাজিয়া উঠে ভীষণ তব ভেরী।
সরম লাগে, মন না জাগে, ছুটিয়া চলিনাকো,
দ্বিধার ভরে দুয়ারে করি দেরি।
ডেকেছ তুমি মানুষ যেথা পীড়িত অপমানে,
আলোক যেথা নিবিয়া আসে শঙ্কাতুর প্রাণে,
আমারে চাহি ডঙ্কা তব বেজেছে সেই খানে
বন্দী যেথা কাঁদিছে কারাগারে।
পাষাণ ভিৎ টলিছে যেথা ক্ষিতির বুক কাটি'
ধূলার চাপা অনলশিখা কাঁপারে তোলে মাটি,
বিদ্রোহ আসি বহুযুগের বাঁধন ফেলে কাটি',
সেথায় ভেরী বাজাও বারে বারে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[প্রবাসী ভাদ্র ১৩৩৪]

মার্কিণ যুক্তরাজ্যের য়ুনিভার্সিটি

আমেরিকার যুক্তরাজ্যে যত "য়ুনিভার্সিটি" বা "কলেজ" আছে পৃথিবীর অন্য কোন দেশে বোধ হয় তত নাই। এই সমস্ত য়ুনিভার্সিটিতে অগণিত ছাত্র পড়ে, ইহাদের সংস্থিতি ও সম্প্রসারণের জন্য অপরিমিত অর্থ ব্যয় করা হয়, ইহাদের উদ্দেশ্যও ভিন্ন ভিন্ন —এই সকল কথা যাঁহারা ঐ দেশে ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন তাঁহারা বলিয়া থাকেন। কিন্তু যুক্তরাজ্যে "য়ুনিভার্সিটি" বলিতে সত্য সত্য কি বুঝায়, তাহা অনেকেই জানেন না। লর্ড ব্রাইস্ আমেরিকার য়ুনিভার্সিটির প্রশংসা করিলেও য়ুরোপে, বিশেষতঃ বিলাতে, আমেরিকার "য়ুনিভার্সিটি" কথায় অনেকেই নাসিকা কুঞ্চিত করেন। যাঁহারা অক্সফোর্ড কিম্বা কেম্ব্রিজের কথা মনে রাখিয়া আমেরিকার য়ুনিভার্সিটির বিচার করেন, তাঁহারা যথার্থই দেখিতে পান যে শুদ্ধ সাহিত্য ও জ্ঞানের চর্চ্চার দিকে আমেরিকার "কলেজ" বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ঝোঁক খুব কম; এই সকল কলেজে humanist বা classical scholar-রা খুব বেশী উৎসাহ পান না। কিন্তু সমাজ-বিজ্ঞান, প্রকৃতি-বিজ্ঞান, ভেষজ-বিজ্ঞান ও ব্যবস্থা-বিজ্ঞান (Science of Law) ইত্যাদি বিষয়ের চর্চ্চা এত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে যে য়ুরোপ হইতেও বহু ছাত্র তথায় অধ্যয়ন করিতে যায়। তথাপি, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও ব্যবসায়াত্মক বিদ্যার অনেক উন্নতিসাধন করিলেও, এ-কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে সেখানে ডিগ্রীলাভের জন্য যে শিক্ষা (Under-graduate education) দেওয়া হয় তাহা খুব সন্তোষজনক নহে। মার্কিণরা নিজেরাই এ-কথা স্বীকার করিয়া থাকেন।

"কন্টেম্পরেরী রিভিউ" পত্রের গত মার্চ্চসংখ্যায় এ-সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে; ইহা হইতে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয় বলিতে কি বুঝায় তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধের লেখক বলেন যে আমেরিকার

মার্কিণ যুক্তরাজ্যের য়ুনিভার্সিটি

কলেজগুলির শিক্ষাটা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উপযুক্ত তো নহেই, পরন্ত, ইহার অর্দ্ধেক কাজই যেন স্কুলের কাজ মাত্র। পাঠ্যবিষয়ের সংখ্যাও এত বেশী যে ছাত্ররা পল্লবগ্রাহী না হইয়াই পারে না। এই শিক্ষার গভীর হইতে গভীরতর জ্ঞানলাভে কোন প্রকার সাহায্যই করে না। অতিশয় পরিশ্রমসহকারে-যে জ্ঞানচর্চ্চা করিতে হয় ছাত্ররা তাহা অনুভব করে না; মনের অনুশীলন কিম্বা মেধার উৎকর্ষসাধনও সম্যক্‌রূপে হয় না। সুতরাং কলেজগুলিতে যে চারি বৎসর সাধ্যবসায় অধ্যয়নের কালে ছাত্রগণ নব নব জ্ঞানলাভের প্রেরণা পাইবে কিম্বা তাহাদের কল্পনা জাগ্রত হইয়া উঠিবে বলিয়া আশা করা যাইত তাহার কিছুই হয় না। এই সমস্ত কলেজের সংস্থিতি প্রসারণের জন্য যে অজস্র অর্থব্যয় হইতেছে তৎপরিমাণে ফল কিছুই পাওয়া যাইতেছে না।

আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারার্থে তীব্র আলোচনা চলিতেছে। কিন্তু সংস্কার করিতে গেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান স্বরূপটি কি তাহা উপলব্ধি করা আবশ্যক। উক্ত পত্রের প্রবন্ধ-লেখকের মতে :—

(১) আমেরিকার প্রত্যেক কলেজে ছাত্রসংখ্যা অতিশয় বেশী। খুব বেশীসংখ্যক ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা দিতে গেলে সেই শিক্ষা যে অত্যন্ত উঁচু দরের হইতে পারে না তাহা সহজেই অনুমেয়। প্রতিভাশালী ছাত্রদের তাহাতে ক্ষতি হয়।

(২) নানা দেশের নানা লোক সেখানে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিতেছে। স্বদেশের কাল্‌চার্ বা শিক্ষার ধারা তাহারা ভুলিয়া গিয়া আমেরিকার জীবনের সঙ্গে তাহাদের জীবন মিশাইয়া দিতেছে। তাহাদের কাল্‌চারের কোন বনিয়াদ গড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না। কলা, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ের চর্চ্চায় তাহারা কোন প্রেরণা পায় না।

(৩) ইংরেজী ভাষা রাষ্ট্রীয় ভাষা হইলেও, লেখ্য ভাষা ও কথ্য ভাষার মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ হইয়া পড়িতেছে। চিকাগোর কোন রুশীয় বালককে ইংরেজী সাহিত্যের ভাষা বাঙালী ছাত্রেরই মত বৈদেশিক ভাষারূপে শিখিতে হয়, যদিও কথাবার্ত্তায় কোন রকমে ইংরেজীতে মনের ভাব সে প্রকাশ করিতে পারে। এইজন্যই আমেরিকার য়ুনিভার্সিটির অনেক কৃতবিদ্য গ্র্যাজুয়েটেরও ইংরেজী জ্ঞান খুব সন্তোষজনক নহে। অবশ্য এই ভাষার বাধা সকল কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে নাই।

(৪) বিলাতের ছাত্রদের যেমন নিজে পরিশ্রম করিয়া বিদ্যার্জ্জন করিতে হয়, মার্কিণ ছাত্রদের ততটা করিতে হয় না— মার্কিণ ছাত্ররা বিলাতের ছাত্রদের মত গ্রন্থকীট হয় না। ছাত্রদের গৃহে কিছু শিখিতে হইবে তাহা মার্কিণ শিক্ষকরা মনে করেন না।

(৫) বিলাতের ছাত্ররা classics-এ যতটা কৃতিত্ব দেখাইতে পারে, মার্কিণ ছাত্ররা ততটা পারে না। পরন্ত, প্রকৃতিবিজ্ঞান কিম্বা রসায়নে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য তত বেশী নহে।

(৬) আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ত্রুটীর জন্য প্রবেশিকা স্কুলগুলিও অনেকটা দায়ী—এই সমস্ত স্কুলে ভাল শিক্ষাদান হয় না।

(৭) আমেরিকার ছাত্ররা পড়ার চেয়ে খেলায় বেশী সময় দেয়। খেলার শিক্ষককে প্রফেসরের সমান বেতন দেওয়া হয়।

(৮) আমেরিকার ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রতি খুব শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে—এই শিক্ষার প্রতি তাহাদের প্রবল আকর্ষণ। তাহারা মনে করে, ডিগ্রিলাভ না করিলে সমাজে উচ্চ আসন লাভ কিম্বা যথোচিত অর্থোপার্জ্জন করা যায় না। তাছাড়া জ্ঞানের আদর্শদ্বারাও অনেকে অনুপ্রাণিত হয়। তাহারা মনে করে কলেজের শিক্ষালাভ না করিলে জীবনটা ব্যর্থ হইয়া যায়।

(৯) যে কারণে হোক্, আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রসংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে; ইহাতে কর্ত্তৃপক্ষরা চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। বাস্তবিকই তো ছাত্রসংখ্যা অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পাইলে, শিক্ষার উৎকর্ষ হইতে পারে না।

(১০) কোন কোন প্রদেশে (State-এ) সরকারী য়ুনিভার্সিটি-গুলিকে সরকারের রাজকীয় প্রয়োজনসিদ্ধির যন্ত্ররূপে ব্যবহার করা হয়। সরকার এমন ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন যে হাই-স্কুলগুলি হইতে প্রেরিত ছাত্রকে য়ুনিভার্সিটি ভর্ত্তি করিতে বাধ্য, যদিও ঐ স্কুলগুলির উপর য়ুনিভার্সিটির কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। আরও চমৎকার কথা এই যে, হাইস্কুলের ছাত্রদের কোন প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে হয় না। স্কুলের কোর্স বা নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য শেষ করিলেই ছাত্ররা হেডমাষ্টারের নিকট হইতে এক সার্টিফিকেট্ পায় এবং সেই সার্টিফিকেট দেখাইলেই য়ুনিভার্সিটি তাহাদিগকে ভর্ত্তি করিতে বাধ্য। ফলে, দলে দলে অনুপযুক্ত ছাত্র কলেজে ভর্ত্তি হয়। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল এই যে, শিক্ষার আদর্শ ও মান ছোট হইয়া যায়।

(১১) মার্কিণ ছাত্রদের কলেজি-শিক্ষালাভের অনুপযুক্ততা এবং তাহাদের সংখ্যাধিক্য এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করে যে তাহাতে য়ুরোপের মত উচ্চদরের শিক্ষা আমেরিকার আশাই করা যায় না। সেইজন্য উচ্চদরের অধ্যাপকও পাওয়া যায় না।

সে যাহা হউক, উক্ত ত্রুটিগুলি থাকা সত্ত্বেও আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যেন সমাজকে কি করিয়া সেবা করিতে হইবে তাহারই শিক্ষা দিবার আদর্শে অনুপ্রাণিত, এ-কথা না বলিয়া

পাওয়া যায় না।* দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে খুব ঝোঁক না দিলেও ইহারা প্রকৃতি-বিজ্ঞান, ভূগোল ও মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে আশাতীত উন্নতি করিয়াছে।

অধ্যয়নরূপ তীব্র তপস্যার ফলে যে মেধার উৎকর্ষ সাধন হয়, তাহার আদর্শ য়ুরোপের তুলনায় আমেরিকায় তেমন আদৃত নয়। সেখানে উৎকৃষ্ট নাগরিক প্রস্তুত করাই যেন য়ুনিভার্সিটির বিশেষ কার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের বিকাশের দিকেই, শিক্ষাক্ষেত্রে আমেরিকায় চিন্তাশীল নেতাদের ঝোঁক।

কিন্তু কোন কোন প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয় সেবার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া পুলিশেরও কোন কোন কাজ করে। দুগ্ধবতী গাভী পরীক্ষা করা, গরুর টীকা দেওয়া, মড়ক নিবারণ, ও বিশুদ্ধ খাদ্যসম্বন্ধে বিধিব্যবস্থা সমাজে কার্য্যকরী করা ইত্যাদি কার্য্য অনেক য়ুনিভার্সিটি করিয়া থাকেন।

শ্রীরমেশচন্দ্র রায়

নারী-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

ভাদ্রের 'প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়ের সহিত রবীন্দ্রনাথের আলাপ-আলোচনার যে অংশটুকু প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে আমরা কবিবরের কথার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না :—

বাঁধ বেঁধে যদি নদীর ধারা বন্ধ কর, তবে জলের জন্যে জলাশয় খুঁড়তে হয়। অবরুদ্ধ স্বভাবের নিয়মই কৃত্রিম প্রণালীকে খুঁজে খুঁজে বের করে। মেয়েরা যেখানে গৃহিনী সেখানে বিশেষ গৃহেই তাদের অধিকারের সীমা, যেখানে তারা হ্লাদিনী সেখানে তারা সমস্ত বিশ্বের। যে-মেয়ের মধ্যে এই হ্লাদিনী শক্তির বিশেষ প্রতিভা আছে সে আপনার এই শক্তিকে জানে। সে যদি এই শক্তিকে বিচিত্র ও বিস্তীর্ণভাবে প্রয়োগ করবার সহজ ক্ষেত্র না পায় তাহ'লেই তার রুদ্ধ শক্তি সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে বিকৃতি ঘটায়। সমাজের গৃহবায়ুমণ্ডলকে এই বিকৃতির বাষ্প থেকে রক্ষা করবার জন্যেই দুই একটা জানালা একদা খোলা হয়েছিল। একদিক থেকে দেখতে গেলে সেটাতে সমাজকে এবং এই শ্রেণীর মেয়েকে কঠোর আঘাত থেকে বাঁচানোই হয়েছে। পুরুষের চিত্তে শক্তির প্রেরণা সঞ্চার যে-মেয়েদের পক্ষে প্রচুর পরিমাণে স্বাভাবিক, যক্ষেত্রে তারা আপন অপ্রতিহত মহিমা অনুভব করতে পারলে তবে তাদের প্রকৃতি সার্থক হ'তে পারে। প্যারিসে যে সকল নারী তাদের স্যাল-সভায় মনীষী পুরুষমণ্ডলীকে নিজের মোহিনী শক্তির দ্বারা টেনে নিয়ে তাদের চিত্তকে আন্দোলিত ক'রে আলাপ-আলোচনার তরঙ্গ জাগতেন তাঁরা এই জাতের। তাঁরা অনেকে বিবাহিতা হ'লেও গৃহধর্ম্মের গণ্ডীকে স্বভাবতই ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। সূর্য্যের আলো স্বভাবতই যেমন গাছের মজ্জায় মজ্জায় প্রাণ সঞ্চার করে তেমনি ক'রেই তাঁরা তাঁদের সমকালবর্ত্তী গুণীদের মনের ভিতর নারী-লাবণ্যের কিরণ বিকীর্ণ ক'রে তাঁদের মধ্যে সফলতা সঞ্চার করতেন। নারী-প্রকৃতি থেকে প্রবাহিত এই জীবনীধারার জন্যে পুরুষ-চিত্ত আপন সার্থকতার অভিপ্রায়ে অপেক্ষা করে একথা আমরা সব সময়ে জানি না,—এরই অভাবে যে আমাদের কৃতিত্বের কৃশতা ঘটে সে সম্বন্ধেও সব সময়ে আমরা সচেতন নই। কিন্তু একথাটা আমরা ধ'রে নিতেই পারি পুরুষচিত্তের সম্পূর্ণতার জন্যই নারীশক্তির প্রভাব নিতান্তই চাই। এমন কি আধ্যাত্মিক সাধনাতেও। বুদ্ধদেবের শুষ্ক তপস্যার অন্তে সুজাতার যে সুন্দর সেবাটুকু এসেছিল এর মধ্যে সেই অর্থটি আছে; যিশুখৃষ্টের প্রকৃতি আপন তৃপ্তির পূর্ণতার জন্যেই মেরি মার্থার ভক্তি নিবেদনের বিশেষ অপেক্ষা করেছে। যুদ্ধে পুরুষ প্রাণ দেয় তার পিছনেও মেয়েদের প্রেরণা-বাণী থাকে, রাজপুতদের ইতিহাসে তা দেখা যায়, মধ্যযুগের য়ুরোপীয় ক্ষত্রিয়দের বিবরণেও তা পাই। পুরুষ এই শক্তির প্রত্যক্ষ প্রেরণা থেকে যখন সমাজধারায় বঞ্চিত হয় তখনি ধর্ম্ম-তন্ত্রের ছদ্মপথ দিয়ে তৃপ্তির উপায় খোঁজে এবং সেই সব কৃত্রিম উপায়ে তার পৌরুষকে পুষ্ট করে না, বিকৃত করে, আমরা তার দৃষ্টান্ত প্রত্যহ দেখতে পাই।

"প্রেয়সীর কাছ থেকে বিজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞানের সহযোগিতা দাবী করাটাই সব চেয়ে বড় ক'রে তুলোনা...বিবাহ রাত্রিটা নাইট স্কুলে Extension lecture-এর প্রথম প্রতিষ্ঠার উৎসব নয়। নারীর কাছে যদি তার প্রেমের আত্মনিবেদন পাও তাহ'লে সেটা তোমার পক্ষে সব চেয়ে মূল্যবান জিনিষ। তার কারণ এ নয় যে তাতে তোমার হৃদয়ের তৃপ্তিসাধন হয়, তার কারণ এই যে তাতে তোমার বুদ্ধিতে, তোমার কর্ম্মশক্তিতে তোমার প্রকৃতির সকল অংশেই পূর্ণতা সাধন হয়।"......

"স্ত্রীর প্রতি আপন কর্তৃত্ব-গৌরব সপ্রমাণ করবার স্বত্বটাকে পুরুষ যে আপন প্রাপ্য ব'লে মনে করে এটা আমাদের দেশে কেবল নয়, ন্যূনাধিক সকল দেশেই শরীর-তত্ত্ব, বা মনস্তত্ত্বঘটিত যে কোন কারণেই হোক স্ত্রীলোককে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্যে পুরুষের উপর নির্ভর করতে হয়। সেই কারণটাকে অবলম্বন ক'রে পুরুষ যথেচ্ছা তার দাম আদায় ক'রে নিতে চায়। পেটের দায়ে যে পুরুষ অন্য পুরুষের মুখ তাকাতে বাধ্য তাকেও সেই নির্ভরের পরিমাণে আপন স্বাতন্ত্র্য বিকিয়ে দিতে হয়—এমন কি তার চেয়েও অনেক বেশী। এই নিয়েইত য়ুরোপে অনেকাল ধনিকে শ্রমিকে হাতাহাতি চল্‌ছে এবং সেই একই লড়াই আজকের দিনে সেখানে মেয়ে পুরুষে। অন্নের দিক থেকে মেয়েরা পুরুষদের কাছ থেকে যা পায়, মানস-ক্ষুধার দিক থেকে তারা যে

পুরুষকে তার চেয়ে অনেক বেশী ভুগিয়ে থাকে এই সূক্ষ্ম কথাটি বোঝবার শক্তি অল্প লোকেরই আছে, কেননা এটা চোখে দেখবার জিনিষ নয়। প্রভুত্ব নিয়ে মানুষ বড়াই করে কেন না প্রভুত্ব বর্ব্বরতার অঙ্গ, প্রভাব নিয়ে বড়াই করে না, সেটা গায়ের জোরের উপরের কথা।……

"বাইরের দিক থেকে পাওয়ার একটা বিপদ নিশ্চয় আছে, তা গভীরতর পাওয়াকে অনেক সময় ম্লান করে। ইংরেজ ভারতবর্ষকে হস্তগত করেছে ব'লেই সেই বাহ্য শক্তির অহঙ্কারে ভারতবর্ষকে সর্ব্বতোভাবে জানা তার পক্ষে এত দুরূহ। নিজের অধিকারের দলিলে প্রমাণিত বস্তুগুলির ফর্দ্দ ধরে যে পুরুষ স্ত্রীর মূল্য যাচাই করে তার মধ্যে মানব-ইতিহাসের আদিম যুগের স্থূল বর্ব্বরতা প্রবল হ'য়েই আছে; সেই মানব মানস-পৃথিবীর আফ্রিকাবাসী। কিন্তু তাই বলেই বাইরের পাওয়াটাকে বাদ দিয়ে চলাই স্ত্রী-পুরুষের প্রেমের পরিপূর্ণতা, এ কথাটা মিথ্যে। মানুষের আধ্যাত্মিক মানুষের আধিভৌতিকের উপরের জিনিষ ব'লেই যে সে আধিভৌতিকের বাহিরে তা নয়। আধিভৌতিককে যখনি সে আপন অঙ্গীকৃত ক'রে নেয় তখনিই সে আপন সম্পূর্ণতা পায়। দেহ-হীন প্রেতের অবস্থা যে আত্মাহীন দেহের চেয়ে ভালো তা আমি মনে করি না। শেষোক্ত পদার্থটা দিনের বেলায় উৎপাত করে তাকে ঠেকানো যায়, প্রথমোক্তটার উপদ্রব অন্ধকার রাত্রে। তাকে দাবিয়ে রাখবার জন্যে মানুষ কত শাস্ত্র থেকে কত মন্ত্র পাড়ে তার ঠিক নেই কিন্তু কিছুতেই পেরে ওঠে না। সেই জন্যই মানুষের যথার্থ সাধনা হচ্চে শব্দকে ত্যাগ ক'রে অর্থকে শূন্যে খুঁজে বেড়ানো নয়, শব্দের মধ্যেই অর্থকে পাওয়া। বিবাহে তার সাধনা হচ্চে, স্ত্রীকে মন্ত্র প'ড়ে পেয়েছি ব'লেই তাকে স্থূল বস্তুর মতো পেয়েছি এমন কথা মনে করার অপরিসীম মূঢ়তা ঘুচিয়ে দেওয়া, এই কথা অন্তরের সঙ্গে জানা যায় যে, মানুষকে দখল না করলেই তবেই তাকে লাভ করা সম্ভব হয়। পরকীয়া সাধনের তত্ত্বটা মিথ্যা নয়,—তার মানেই হচ্চে পরকীয়া নারী আমার বাধ্য নয় ব'লেই আমার পরে তার শক্তি এত প্রবল, তার প্রেমের এত মূল্য। এইজন্য বিবাহ যখন বর্ব্বরযুগের স্থূল শাসনের থেকে মুক্তি পাবে তখন সকল বিবাহেই পরকীয়া সাধন প্রচলিত হবে, তখন স্ত্রীর স্বাতন্ত্র্য আছে বলেই তার মূল্য পুরুষের কাছে বেশী হবে। বিবাহে নিজের স্ত্রীকে নিয়ে এই পরকীয়া সাধনার যুগ এসেচে ব'লেই আশা করি। যদি এসে থাকে তবে মূঢ়তা ক'রে আমরা যেন সেই সাধনার অধিকার থেকে বঞ্চিত না হই।"

আদর্শচ্যুতি ও প্রক্ষিপ্ত মতবাদ

ভাদ্রের 'ভারতবর্ষে' শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত উপনিষদের যুগে রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির আলোচনায় দেখাইয়াছেন যে ভারতবর্ষে রাজনীতির আদর্শে অনেকবার বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। কার্য্যকারণ-পরম্পরার উল্লেখ তিনি লিখিতেছেন :—

ভারতবর্ষের রাজ-আদর্শ অত্যন্ত উচ্চ থাকিলেও আদর্শচ্যুতি ও বিপর্য্যয় অনেকবার অনেক স্থানে হইয়া থাকা সম্ভব। মানুষ দুর্ব্বলতায় ঘেরা, তাই আদর্শচ্যুতি পুনঃ পুনঃ হয়। কিন্তু আদর্শ বজায় থাকিলে পুনরায় আদর্শ লাভের পথ ফিরাইয়া পাওয়া যায়। আর্য্য-গণ্ডী যতই বর্দ্ধিত হইয়াছে, সমাজে জ্ঞান ও বিশ্বাস যতই নির্দ্দিষ্টরূপ ধারণ করিয়াছে, নানা রুচির নানা মতের লোকও ততই বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, যাঁহারা রাজ আদর্শ বা ধর্ম্মসংস্কারের বিরুদ্ধ মত পোষণ করিয়াছেন, তাঁহারাও নির্ভয়ে নিজ মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। জীবন্ত, প্রাণপূর্ণ সমাজে বিভিন্ন মতবাদ শুনিবার মত মনোবৃত্তি ও ঔদার্য্য ছিল। কোনও কোনও বিরুদ্ধ মত লোকপ্রিয় হইয়াছে এবং নূতন মত আশ্রয় করিয়া নূতন দলও গঠিত হইয়াছে। এই বিরুদ্ধবাদীদের কাহারও কাহারও মতবাদ ও মনোবৃত্তির পরিচয় আজও পাওয়া যায়। কেহ বা সরল পথে, নিজ নামে নিজ দায়িত্বে মত প্রচার করিয়াছেন, আবার কেহ বা সমাজ ও ধর্ম্মকে আঘাত করিবার জন্য ছদ্মনাম ও ছদ্মবেশ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষের প্রথম ও দ্বিতীয় যুগের অর্থাৎ বৈদিক ও উপনিষদের যুগের কোনো গ্রন্থই বিদ্যমান নাই। অনেক গ্রন্থই মানুষের স্মৃতিতে ছিল; এবং যাহা লিখিত ছিল তাহার যে অংশ তৃতীয় যুগে পুনর্লিখিত হইয়াছিল তাহাই বর্ত্তমান আছে। দ্বিতীয় যুগ বলিতে সাধারণতঃ উপনিষদের সময় হইতে বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বুঝায়। দ্বিতীয় যুগের গ্রন্থ না পাইলেও পরবর্ত্তী যুগের গ্রন্থ হইতে দ্বিতীয় যুগের অবস্থা যথাসম্ভব বুঝিতে পারা যায়। যাঁহারা কোনও বিশেষ মত পোষণ করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিজ মতবাদ অধিক লোকের মধ্যে চালাইয়া দিবার জন্য কোনও সুপরিচিত গ্রন্থের মধ্যে স্ব-মত প্রক্ষেপ করিতেন। দ্বিতীয় যুগের অনেক মত পরবর্ত্তী যুগের লিখিত গ্রন্থাদি হইতে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। মতবাদ মাত্রেই পুরাতন এই বিশ্বাস উৎপাদন করিলে সাফল্যের আশা বেশী বলিয়া গ্রন্থকে বহু পুরাতন আবরণ দেওয়ার চেষ্টাও বিদ্যমান ছিল। এই সকল কারণে তৃতীয় যুগে লিপিকৃত দ্বিতীয় ও প্রথম যুগের গ্রন্থাদির কতটা খাঁটি ও কতটা যে প্রক্ষিপ্ত তাহা স্থির করা দুরূহ। দ্বিতীয় পর্ব্বে মহাভারত রামায়ণ রচিত হয়। কিন্তু যে রামায়ণ ও মহাভারত প্রচলিত আছে উহার অনেক অংশই প্রাথমিক রামায়ণে ও মহাভারতে

ছিল না। কতকগুলি স্থানে প্রক্ষেপকের অঙ্গুলির ছাপ সুস্পষ্ট বর্ত্তমান। কতকগুলি আবার সন্দেহজনক, প্রক্ষেপ হইতেও পারে-নাও পারে।

দ্বিতীয় যুগে যে রাজ-ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির রামচন্দ্র ও জনকের চরিত্রে উজ্জ্বল, সেই রাজধর্ম্মের বিকারও রামায়ণ মহাভারত মনুসংহিতার প্রক্ষেপে বিদ্যমান। মহাভারতের দ্বাদশ পর্ব্বে ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠিরের কথোপকথনে অতি-বিস্তারের সহিত ধর্ম্মনীতি ও রাজনীতি আলোচিত হইয়াছে। আর এই পর্ব্বেই প্রক্ষেপকার তাঁহার বিকৃত নীতি সকল প্রবেশ করাইবার উপযুক্ত স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে এমন সকল হেয় উপদেশ দিতেছেন যে, আদি মহাভারতকারের কল্পনায় তাহা থাকিতে পারে না। এই সকল নির্লজ্জ প্রক্ষেপের কিছু কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। কারণ এই সমস্ত মতবাদের দ্বারা আমাদের অতীত ইতিহাসে রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি যে কুটিলতা-মলিন ছিল এমন ভুল করিবার সম্ভাবনা আছে। পাশাপাশি অত্যন্ত উচ্চ আদর্শ ও অত্যন্ত নীচবৃত্তি সমর্থিত হইয়াছে। এক পাতায় যাহা বরেণ্য বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছে, অপর পৃষ্ঠায় তাহাই অকার্য্য, বলিয়া নিন্দিত হইয়াছে। মহাভারতের মূলে যে আদর্শ তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন, কারণ তাহা সর্ব্বলোকবিদিত। যে সকল কদাচার সমর্থিত হইয়াছে ও দুর্নীতি ধর্ম্মনীতি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে তাহারই কিছু কিছু আলোচনা করিব। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে যে রাজধর্ম্মের উপদেশ দিতেছেন, তাহার একস্থানে ভরদ্বাজ নামক কাহারও মত বলিয়া ভীষ্ম যাহা উপদেশ দিতেছেন তাহা এই :-

"শূন্য গৃহের ন্যায় আপনার ধনাগমই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করা তাঁহার (নির্ধন রাজার) অতীব কর্ত্তব্য।" "মঙ্গলার্থী ব্যক্তি (রাজা) অঞ্জলী-বন্ধন, শপথ, মিষ্টবাক্য প্রয়োগ, প্রণতি ও অশ্রু-মোচন করিয়াও অকার্য্য সাধন করিবে। যতদিন সময়ের প্রতিকূলতা থাকিবে ততদিন শত্রুকে স্কন্ধে বহন ও সময় অনুকূল হইলে তাহাকে প্রস্তর-নিক্ষিপ্ত কলসের ন্যায় বিনাশ করিবে।" (মহাভারত ১২ পর্ব্ব, ১৪০ অধ্যায়)। আবার কোনও ঋষির বা শাস্ত্র-প্রণেতার দোহাই না দিয়া প্রক্ষেপকারী কতকগুলি নীতি-বিগর্হিত কর্ম্মের উপদেশ ভীষ্মের মুখেই দিয়াছেন। ১৩০ অধ্যায়ে দুরবস্থায় পতিত রাজার কর্ত্তব্য বিষয়ে যে সকল উপদেশ বর্ণিত হইয়াছে তাহার কদর্য্যতা এত বেশী যে, যিনি প্রক্ষেপটি করিয়াছেন, তিনিও কৃপাপূর্ব্বক এইটুকু ভূমিকা না করিয়া পারেন নাই যে, "তুমি (যুধিষ্ঠির) একণে আমাকে (ভীষ্ম) অতি নিগূঢ় ধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে। জিজ্ঞাসা না করিলে ইহা ব্যক্ত করা নিতান্ত অনুচিত। এই নিমিত্ত আমি ইহার উল্লেখ করি নাই।" এইরূপ ভূমিকা করিয়া যে সকল উপায় বিবৃত হইয়াছে তাহাতে না সমাজ না ধর্ম্ম টিকিতে পারে। হিংসাই এস্থলে পৃথিবীতে স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। স্বার্থ-রক্ষাই সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। স্বার্থ-সাধনের জন্য ধন আবশ্যক, অতএব রাজা যে-কোনও প্রকারে ধন সংগ্রহ করিবে। বলপূর্ব্বক, ছল পূর্ব্বক, অত্যাচার করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে, কেন না কোষই রাজার বলের মূল, বল ধর্ম্মের মূল, ধর্ম্ম প্রজাগণের মূল। অথবা প্রজা-পালন করিতে হইলে ধর্ম্ম-রক্ষা করা চাই। তজ্জন্য বল চাই, বলের জন্য কোষ অর্থাৎ ধন চাই। "অতএব ক্ষত্রিয় আপৎকালে ধনবান ব্যক্তির নিকট হইতে বলপূর্ব্বক ধন গ্রহণ করিবে।"

এই সকল উক্তি হইতে ইহাই অনুমান করা যায় যে, কুপরামর্শ দিবার এবং অধর্ম্ম-প্রবৃত্তি জাগ্রত করিয়া সমাজ নষ্ট করিবার মত লোক এখনকার ন্যায় আলোচ্য যুগেও ছিল। এমন কি তাঁহারা বহুল প্রচারিত ধর্ম্ম ও নীতি গ্রন্থের মধ্যেও কৌশলে ও প্রচ্ছন্নভাবে এই সকল দুর্নীতিপূর্ণ বাক্য প্রবেশ করাইয়া দিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু এই সকল দুর্নীতিই যে রাজনীতি বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল তাহা বিবেচনা করিলে ভুল হইবে। ভারতবর্ষে যাঁহারা দুর্নীতিক শাস্ত্রের রূপ দান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কৌটিল্যই তাঁহাদের মধ্যে প্রধান।

আগামী সংখ্যায়

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রবন্ধ

মহাভারত ও গীতা

প্রকাশিত হইবে।

Printed at the Modern Art Press, 1/2 Durga Pituri Lane, Calcutta,
by Srijut Probodh Lal Mukherjee, and published by him from 51, Pataldanga Street, Calcutta.



আহীরিণী

শিল্পী— শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

বিচিত্রা

প্রথম বর্ষ, ১ম খণ্ড	কার্ত্তিক, ১৩৩৪	পঞ্চম সংখ্যা

দেবদারু



তপোমগ্ন হিমাদ্রির ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করি চুপে
বিপুল প্রাণের শিখা উচ্ছ্বসিল দেবদারুরূপে।
সূর্য্যের যে জ্যোতির্ম্মন্ত্র তপস্বীর নিত্য উচ্চারণ
অন্তরের অন্ধকারে, পারিল না করিতে ধারণ
সেই দীপ্ত রুদ্র বাণী, — তপস্যার সৃষ্টিশক্তিবলে
সে বাণী ধরিল শ্যামকায়া; সবিতার সভাতলে
করিল সাবিত্রীগান; স্পন্দমান ছন্দের মর্ম্মরে
ধরিত্রীর সামগাথা বিস্তারিল অনন্ত অম্বরে।
ঋজু দীর্ঘ দেবদারু — গিরি ধ্রুব শ্রেষ্ঠ [illegible] কবে কোন
আপন মহিমা চেয়ে; অন্তরে ছিল যে তার ধ্যান
বাহিরে তা সত্য হোলো; ঊর্দ্ধ হতে দেখেছিল স্বপ্ন
ঊর্দ্ধপানে অভিব্যক্ত শোভা করি দিলো একদিন।
আপন দর্পের দুর্গে স্বর্গ তার রহিল না দূর,
ধূলার সঙ্গীতে বাজে মুক্তিকাম মুরলীর সুর॥

২৪ জ্যৈষ্ঠ
১৩৩৪
শিলঙ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—তিনপুরুষ—

—উপন্যাস—

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮

বাবার মৃত্যুর পর বিপ্রদাস দেখ্‌লে, যে-গাছে তাদের আশ্রয় তার শিকড় খেয়ে দিয়েচে পোকায়। বিষয় সম্পত্তি ঋণের চোরাবালির উপর দাঁড়িয়ে,—অল্প ক'রে ডুব্‌ছে। ক্রিয়া-কর্ম্ম সংক্ষেপ ও চালচলন খাটো না কর্‌লে উপায় নেই। কুমুর বিয়ে নিয়েও কেবলি প্রশ্ন আসে, তার উত্তর দিতে মুখে বাধে। শেষকালে নুরনগর থেকে বাসা তুল্‌তে হ'ল। কলকাতায় বাগবাজারের দিকে একটা বাড়িতে এসে উঠ্‌ল।

পুরোনো বাড়িতে কুমুদিনীর একটা প্রাণময় পরিমণ্ডল ছিল। চারদিকে ফুলফল, গোয়ালঘর, পুজোবাড়ি, শস্যক্ষেত, মানুষজন। অন্তঃপুরের বাগানে ফুল তুলেচে, সাজি ভরেচে, নুন লঙ্কা ধনে-পাতার সঙ্গে কাঁচা কুল মিশিয়ে অপথ্য করেচে; চালতা পেড়েচে, বোশেখ জষ্টির ঝড়ে আমবাগানে আম কুড়িয়েচে। বাগানের পূর্ব্বপ্রান্তে ঢেঁকিশাল, সেখানে নাড়ু কোটা প্রভৃতি উপলক্ষ্যে মেয়েদের কলকোলাহলে তারো অল্প কিছু অংশ ছিল। শ্যাওলায়-সবুজ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা খিড়্‌কির পুকুর, ঘন ছায়ায় স্নিগ্ধ, কোকিল ঘুঘু দোয়েল শামার ডাকে মুখরিত। এইখানে প্রতিদিন সে জলে কেটেছে সাঁতার, নালফুল তুলেছে, ঘাটে ব'সে দেখেচে খেয়াল, আনমনে একা ব'সে করেছে পশম সেলাই। ঋতুতে ঋতুতে মাসে মাসে প্রকৃতির উৎসবের সঙ্গে মানুষের এক একটি পরব বাঁধা; অক্ষয়-তৃতীয়া থেকে দোলযাত্রা বা সন্তীপুজো পর্য্যন্ত কত কি। মানুষে প্রকৃতিতে হাত মিলিয়ে সমস্ত বছরটিকে যেন নানা কারুশিল্পে বুনে তুলচে। সবই যে সুন্দর, সবই যে সুখের তা নয়। মাছের ভাগ, পুজোর পার্ব্বণী, কর্ত্রীর পক্ষপাত, ছেলেদের কলহে স্ব-স্ব ছেলের পক্ষসমর্থন প্রভৃতি নিয়ে নীরবে ঈর্ষা বা তারস্বরে অভিযোগ, কানে কানে

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরচর্চ্চা বা মুক্তকণ্ঠে অপবাদ-ঘোষণা, এ সমস্ত প্রচুর পরিমাণেই আছে,—সব চেয়ে আছে নিত্যনৈমিত্তিক কাজের ব্যস্ততার ভিতরে ভিতরে নিয়ত একটা উদ্বেগ,—কর্ত্তা কখন্ কি ক'রে বসেন, তাঁর বৈঠকে কখন্ কি দুর্য্যোগ' আরম্ভ হয়। যদি আরম্ভ হোলো তবে দিনের পরে দিন শান্তি নেই। কুমুদিনীর বুক দুর দুর করে, ঘরে লুকিয়ে মা কাঁদেন, ছেলেদের মুখ শুক্নো। এই সমস্ত শুভে অশুভে সুখে দুঃখে সর্ব্বদা আন্দোলিত প্রকাণ্ড সংসার যাত্রা।

এরই মধ্য থেকে কুমুদিনী এলো কলকাতায়। এ যেন মস্ত একটা সমুদ্র কিন্তু কোথায় একফোঁটা পিপাসার জল? দেশে আকাশের বাতাসেরও একটা চেনা চেহারা ছিল। গ্রামের দিগন্তে কোথাও বা ঘন বন, কোথাও বা বালির চর, নদীর জল রেখা, মন্দিরের চূড়ো, শূন্য বিস্তৃত মাঠ, বুনো ঝাউএর ঝোপ, গুণটানা পথ,—এরা নানা রেখায় নানা রঙে বিচিত্র ঘের দিয়ে আকাশকে একটি বিশেষ আকাশ ক'রে তুলেছিল, কুমুদিনীর আপন আকাশ। সূর্য্যের আলোও ছিল তেম্নি বিশেষ আলো। দীঘিতে, শস্য-ক্ষেতে, বেতের ঝাড়ে, জেলে নৌকোর খয়েরি রঙের পালে, বাঁশঝাড়ের কচি ডালের চিকণ পাতায়, কাঁঠালগাছের মসৃণ-ঘন সবুজে, ওপারের বালুতটের ফ্যাকাশে হল্‌দেয়,—সমস্তর সঙ্গে নানাভাবে মিশিয়ে সেই আলো একটি চির-পরিচিত রূপ পেয়েছিল। কলকাতার এই সব অপরিচিত বাড়ির ছাদে দেয়ালে কঠিন অনম্র রেখার আঘাতে নানাখানা হ'য়ে সেই চিরদিনের আকাশ আলো তাকে কোনো লোকের মতো কড়া চোখে দেখে। এখানকার দেবতাও তাকে একঘরে করেচে।

বিপ্রদাস তাকে কেদারার কাছে টেনে নিয়ে বলে, "কি কুমু, মন কেমন করচে?"

কুমুদিনী হেসে বলে, "না দাদা, একটুও না।"

"যাবি বোন, ম্যুজিয়ম্ দেখ্‌তে?"

"হ্যাঁ যাবো।"

এত বেশি উৎসাহের সঙ্গে বলে যে, বিপ্রদাস যদি পুরুষ মানুষ না হোতো তবে বুঝ্‌তে পারতো যে এটা স্বাভাবিক নয়। ম্যুজিয়মে না যেতে হলেই সে বাঁচে। বাইরের লোকের ভিড়ের মধ্যে বেরোনো অভ্যেস নেই ব'লে জনসমাগমে যেতে তার সঙ্কোচের অন্ত নেই। হাত পা ঠাণ্ডা হ'য়ে যায়, চোখ চেয়ে ভাল ক'রে দেখ্‌তেই পারে না।

বিপ্রদাস তাকে দাবা খেলা শেখালে। নিজে অসামান্য খেলোয়াড়, কুমুর কাঁচা খেলা নিয়ে তার আমোদ লাগে। শেষকালে নিয়মিত খেলতে খেলতে কুমুর এতটা হাত পাকলো যে, বিপ্রদাসকে সাবধানে খেল্‌তে হয়। কলকাতায় কুমুর সমবয়সী মেয়ে-সঙ্গিনী না থাকাতে এই দুই ভাই বোন্ যেন দুই ভাইয়ের মতো হ'য়ে উঠেছে। সংস্কৃত সাহিত্যে বিপ্রদাসের বড়ো অনুরাগ; কুমু একমনে তার কাছ থেকে ব্যাকরণ শিখেচে। যখন কুমারসম্ভব পড়্‌লে তখন থেকে শিবপূজায় সে শিবকে দেখ্‌তে পেলে, সেই মহাতপস্বী যিনি তপস্বিনী উমার পরম তপস্যার ধন। কুমারীর ধ্যানে তার ভাবী পতি পবিত্রতার দৈব-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে দেখা দিলে।

বিপ্রদাসের ফটোগ্রাফ তোলার সখ, কুমুও তাই শিখে নিলে। ওরা কেউ বা নেয় ছবি, কেউ বা সেটাকে ফুটিয়ে তোলে। বন্দুকে বিপ্রদাসের হাত পাকা। পার্ব্বণ উপলক্ষ্যে দেশে যখন যায়, খিড়কির পুকুরে ডাব, বেলের খোলা, আখরোট প্রভৃতি ভাসিয়ে দিয়ে পিস্তল অভ্যাস করে; কুমুকে ডাকে, "আয় না কুমু, দেখ্ না চেষ্টা ক'রে।"

যে-কোন বিষয়েই তার দাদার রুচি সে-সমস্তকেই বহু যত্নে কুমু আপনার ক'রে নিয়েচে। দাদার কাছে এস্রাজ শিখে শেষে ওর হাত এমন হোলো যে, দাদা বলে, আমি হার মানলুম।

এমনি ক'রে, শিশুকাল থেকে যে-দাদাকে ও সব চেয়ে বেশি ভক্তি করে, কলকাতায় এসে তাকেই সে সব চেয়ে কাছে পেলে। কলকাতায় আসা সার্থক হোলো। কুমু স্বভাবতই মনের মধ্যে একলা। পর্ব্বতবাসিনী উমার মতোই ও যেন এক কল্প-তপোবনে বাস করে, মানস সরোবরের কূলে। এই রকম জন্ম-একলা মানুষদের জন্যে দরকার মুক্ত আকাশ, বিস্তৃত নির্জ্জনতা, এবং তারই মধ্যে এমন একজন কেউ, যাকে নিজের সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে

ভক্তি করতে পারে। নিকটের সংসার থেকে এই দূর-বর্ত্তিতা মেয়েদের স্বভাবসিদ্ধ নয় ব'লে মেয়েরা এটা একেবারেই পছন্দ করে না। তারা এটাকে হয় অহঙ্কার, নয় হৃদয়হীনতা ব'লে মনে করে। তাই দেশে থাকতেও সঙ্গিনীদের মহলে কুমুদিনীর বন্ধুত্ব জ'মে ওঠেনি।

পিতা বর্ত্তমানেই বিপ্রদাসের বিবাহ প্রায় ঠিক, এমন সময় গায়ে হলুদের দুদিন আগেই কনেটি জ্বর বিকারে মারা গেল। তখন ভাটপাড়ায় বিপ্রদাসের কুষ্ঠীগণনায় বেরোলো, বিবাহস্থানীয় দুর্গ্রহের ভোগক্ষয় হ'তে দেরি আছে। বিবাহ চাপা পড়্‌লো। ইতিমধ্যে ঘট্‌ল পিতার মৃত্যু। তার পর থেকে ঘটকালি প্রশ্রয় পাবার মতো অনুকূল সময় বিপ্রদাসের ঘরে এলো না। ঘটক একদা মস্ত একটা মোটা পণের আশা দেখালে। তাতে হোলো উল্টো ফল। কম্পিত হস্তে হুঁকোটা দেয়ালের গায়ে ঠেকিয়ে সে-দিন অত্যন্ত দ্রুত পদেই ঘটককে রাস্তায় বেরিয়ে পড়্‌তে হয়েছিল।

৯

সুবোধের চিঠি বিলেত থেকে আসত নিয়ম মতো। এখন মাঝে মাঝে ফাঁক পড়ে। কুমু ডাকের জন্যে ব্যগ্র হ'য়ে চেয়ে থাকে। বেহারা এবার চিঠি তারই হাতে দিলো। বিপ্রদাস আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাড়ি কামাচ্চে, কুমু ছুটে গিয়ে বল্‌লে, "দাদা, ছোড়দাদার চিঠি।"

দাড়িকামানো সেরে কেদারায় ব'সে বিপ্রদাস একটু যেন ভয়ে ভয়েই চিঠি খুল্‌লে। পড়া হ'য়ে গেলে চিঠিখানা এমন ক'রে হাতে চাপ্‌লে যেন সে একটা তীব্র ব্যথা।

কুমুদিনী ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "ছোড়দাদার অসুখ করেনি তো?"

"না, সে ভালোই আছে।"

"চিঠিতে কি লিখেচেন বলোনা দাদা।"

"পড়াশুনোর কথা।"

কিছুদিন থেকে বিপ্রদাস কুমুকে সুবোধের চিঠি পড়তে দেয় না। একটু আধটু প'ড়ে শোনায়। এবার তাও নয়। চিঠিখানা চেয়ে নিতে কুমুর সাহস হোলো না, মনটা ছট্‌ফট্‌ করতে লাগ্‌ল।

সুবোধ প্রথম প্রথম হিসেব ক'রেই খরচ চালাতো। বাড়ির দুঃখের কথা তখনো মনে তাজা ছিল। এখন সেটা যতই ছায়ার মতো হ'য়ে এসেচে, খরচও ততই চলেচে বেড়ে। বল্‌চে, বড়োরকম চালে চলতে না পারলে এখানকার সামাজিক উচ্চশিখরের আব্‌হাওয়ায় পৌঁছনো যায় না। আর তা না গেলে বিলেতে আসাই ব্যর্থ হয়।

দায়ে প'ড়ে দুই একবার বিপ্রদাসকে তার-যোগে অতিরিক্ত টাকা পাঠাতে হয়েচে। এবার দাবী এসেচে দেড়শো পাউণ্ডের,—জরুরী দরকার।

বিপ্রদাস মাথায় হাত দিয়ে বল্‌লে, পাবো কোথায়? গায়ের রক্ত জল ক'রে কুমুর বিবাহের জন্যে টাকা জমাচ্চি, শেষে কি সেই টাকায় টান পড়বে? কি হবে সুবোধের ব্যারিষ্টার হ'য়ে, কুমুর ভবিষ্যৎ ফতুর ক'রে দিয়ে যদি তার দাম দিতে হয়?

সে রাত্রে বিপ্রদাস বারান্দায় পায়চারি ক'রে বেড়াচ্চে। জানেনা, কুমুদিনীর চোখেও ঘুম নেই। এক সময়ে যখন বড়ো অসহ্য হোলো কুমু ছুটে এসে বিপ্রদাসের হাত ধ'রে বল্‌লে, "সত্যি ক'রে বলো দাদা, ছোড়দাদার কী হয়েচে? পায়ে পড়ি, আমার কাছে লুকিয়োনা।"

বিপ্রদাস বুঝ্‌লে গোপন করতে গেলে কুমুদিনীর আশঙ্কা আরো বেড়ে উঠ্‌বে। একটু চুপ ক'রে থেকে বল্‌লে, "সুবোধ টাকা চেয়ে পাঠিয়েচে, অত টাকা দেবার শক্তি আমার নেই।"

কুমু বিপ্রদাসের হাত ধ'রে বল্‌লে, "দাদা, একটা কথা বলি, রাগ করবে না বলো।"

"রাগ করবার মতো কথা হ'লে রাগ না ক'রে বাঁচ্‌বো কী ক'রে?"

"না দাদা, ঠাট্টা নয়, শোনো আমার কথা,—মায়ের গয়না তো আমার জন্যে আছে,—তাই নিয়ে—"

তিন-পুরুষ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"চুপ, চুপ, তোর গয়নায় কি আমরা হাত দিতে পারি!"

"আমি তো পারি।"

"না, তুইও পারিস্‌নে। থাক্‌ সে সব কথা, এখন ঘুমোতে যা।"

কলকাতা সহরের সকাল, কাকের ডাক ও ক্যাভেঞ্জারের গাড়ির খড়্‌-খড়ানিতে রাত পোয়ালো। দূরে কখনো ষ্টীমারের, কখনো তেলের কলের বাঁশি বাজে। বাসার সামনের রাস্তা দিয়ে একজন লোক মই কাঁধে জরারি বটিকার বিজ্ঞাপন খাটিয়ে চলেচে; খালি গাড়ির ছুটো গরু গাড়োয়ানের দুই হাতের প্রবল তাড়ার উত্তেজনায় গাড়ি নিয়ে দ্রুতবেগে ধাবমান; কল থেকে জল নেবার প্রতিযোগিতায় এক হিন্দুস্থানী মেয়ের সঙ্গে উড়িয়া ব্রাহ্মণের ঠেলাঠেলি বকাবকি জমেচে। বিপ্রদাস বারান্দায় ব'সে; গুড়গুড়ির নলটা হাতে; মেঝেতে প'ড়ে আছে না-পড়া খবরের কাগজ।

কুমু এসে বল্‌লে, "দাদা, 'না' বোলোনা।"

"আমার মতের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবি তুই? তোর শাসনে রাতকে দিন, না-কে হঁা করতে হবে?"

"না, শোনো বলি;—আমার গয়না নিয়ে তোমার ভাবনা ঘুচুক।"

"সাধে তোকে বলি বুড়ি? তোর গয়না নিয়ে আমার ভাবনা ঘুচবে এমন কথা ভাবতে পার্‌লি কোন্‌ বুদ্ধিতে?"

"সে জানিনে, কিন্তু তোমার এই ভাবনা আমার সয় না।"

"ভেবেই ভাবনা শেষ করতে হয় রে, তাকে ফাঁকি দিয়ে থামাতে গেলে বিপরীত ঘটে। একটু ধৈর্য্য ধর্‌, একটা ব্যবস্থা ক'রে দিচ্চি।"

বিপ্রদাস সে মেলে চিঠিতে লিখ্‌লে,—টাকা পাঠাতে হ'লে কুমুর পণের সম্বলে হাত দিতে হয়; সে অসম্ভব।

যথা সময়ে উত্তর এলো। সুবোধ লিখেচে কুমুর পণের টাকা সে চায় না। সম্পত্তিতে তার নিজের অর্দ্ধ অংশ বিক্রী ক'রে যেন টাকা পাঠানো হয়। সঙ্গে সঙ্গেই পাউয়ার অফ্‌ এটর্নি পাঠিয়েচে।

এ চিঠি বিপ্রদাসের বুকে বাণের মতো বিধ্‌লো। এত বড়ো নিষ্ঠুর চিঠি সুবোধ লিখ্‌লো কি ক'রে? তখনি বুড়ো দেওয়ানজিকে ডেকে পাঠালে। জিজ্ঞাসা করলে, "ভূষণ রায়রা করিমহাটী তালুক পত্তনি নিতে চেয়েছিল না? কত পণ দেবে?"

দেওয়ান বল্‌লে, "বিশ হাজার পর্য্যন্ত উঠ্‌তে পারে।"

"ভূষণ রায়কে তলব দিয়ে পাঠাও। কথাবার্ত্তা কইতে চাই।"

বিপ্রদাস বংশের বড়ো ছেলে। তাঁর জন্মকালে তাঁর পিতামহ এই তালুক স্বতন্ত্র ভাবে তাঁকেই দান করেচেন। ভূষণ রায় মস্ত মহাজন, বিশ পঁচিশ লাখ টাকার তেজারতী। জন্মস্থান করিমহাটীতে। এই জন্যে অনেক দিন থেকে নিজের গ্রাম পত্তনী নেবার চেষ্টা। অর্থ-সঙ্কটে মাঝে মাঝে বিপ্রদাস রাজি হয় আর কি, কিন্তু প্রজারা কেঁদে পড়ে। বলে, ওকে আমরা কিছুতেই জমিদার ব'লে মানতে পারব না। তাই প্রস্তাবটা বারে বারে যায় ফেঁসে। এবার বিপ্রদাস মন কঠিন ক'রে বস্‌ল। ও নিশ্চয় জানে সুবোধের টাকার দাবী এইখানেই শেষ হবে না। মনে মনে বল্‌লে, আমার তালুকের এই সেলামির টাকা রইল সুবোধের জন্যে, তার পর দেখা যাবে।

দেওয়ান বিপ্রদাসের মুখের উপর জবাব দিতে সাহস করলে না। গোপনে কুমুকে গিয়ে বল্‌লে, "দিদি, তোমার কথা বড়োবাবু শোনেন। বারণ করো তাঁকে, এটা অন্যায় হচ্চে।"

বিপ্রদাসকে বাড়ির সকলেই ভালোবাসে। কারো জন্যে বড়োবাবু যে নিজের স্বত্ব নষ্ট করবে, এ ওদের গায়ে সয় না।

বেলা হয়ে যায়। বিপ্রদাস ঐ তালুকের কাগজ-পত্র নিয়ে ঘাঁট্‌চে। এখনো স্নানাহার হয় নি। কুমু বারে বারে তাকে ডেকে পাঠাচ্চে। শুক্‌নো মুখ ক'রে এক সময়ে অন্দরে এলো। যেন বাজে-ছোঁওয়া পাতা-ঝল্‌সানো গাছের মতো। কুমুর বুকে শেল বিধ্‌ল।

স্নানাহার হ'য়ে গেলে পর বিপ্রদাস আলবোলায় নল হাতে খাটের বিছানায় পা ছড়িয়ে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বস্‌ল যখন, কুমু তার শিয়রের কাছে ব'সে ধীরে ধীরে তার

চুলের মধ্যে হাত বুলোতে বুলোতে বল্‌ল, "দাদা, তোমার তালুক তুমি পত্তনী দিতে পারবে না।"

"তোকে নবাব সিরাজউদ্দৌলার ভূতে পেয়েচে নাকি? সব কথাতেই জুলুম?"

"না দাদা, কথা চাপা দিয়ো না।"

তখন বিপ্রদাস আর থাক্‌তে পারলে না, সোজা হ'য়ে উঠে ব'সে কুমুকে শিওরের কাছ থেকে সরিয়ে সাম্‌নে বসালে। রুদ্ধ স্বরটাকে পরিষ্কার করবার জন্যে একটুখানি কেশে নিয়ে বল্‌লে, "সুবোধ কি লিখেচে জানিস্? এই দেখ্!"

এই ব'লে জামার পকেট থেকে তার চিঠি বের ক'রে কুমুর হাতে দিলে। কুমু সমস্তটা প'ড়ে দুই হাতে মুখ ঢেকে বল্‌লে, "মাগো, ছোড়দাদা এমন চিঠিও লিখ্‌তে পারলে?"

বিপ্রদাস বল্‌লে, "ওর নিজের সম্পত্তি আর আমার সম্পত্তিতে ও যখন আজ ভেদ ক'রে দেখ্‌তে পেরেচে, তখন আমার তালুক আমি কি আর আলাদা রাখ্‌তে পারি? আজ ওর বাপ নেই, বিপদের সময়ে আমি ওকে দেবো না তো কে দেবে?"

এর উপর কুমু আর কথা কইতে পারলে না, নীরবে তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। বিপ্রদাস তাকিয়ায় আবার ঠেস দিয়ে চোখ বুজে রইলো।

অনেকক্ষণ দাদার পায়ে হাত বুলিয়ে অবশেষে কুমু বল্‌লে, "দাদা, মায়ের ধন তো এখনো মায়েরি আছে, তাঁর সেই গয়না থাক্‌তে তুমি কেন—"

বিপ্রদাস আবার চম্‌কে উঠে ব'সে বল্‌লে, "কুমু, এটা তুই কিছুতে বুঝ্‌লি নে, তোর গয়না নিয়ে সুবোধ আজ যদি বিলেতে থিয়েটার কন্‌সর্ট্ দেখে বেড়াতে পারে তা হ'লে আমি কি তাকে কোনো দিন ক্ষমা করতে পারব,— না, সে কোনোদিন মুখ তুলে দাঁড়াতে পারবে? তাকে এত শাস্তি কেন দিবি?"

কুমু চুপ ক'রে রইল, কোনো উপায় সে খুঁজে পেল না। তখন, অনেকবার যেমন ভেবেচে তেম্‌নি ক'রেই ভাব্‌তে লাগ্‌ল,—অসম্ভব কিছু ঘটে না কি? আকাশের কোনো গ্রহ, কোনো নক্ষত্র এক মুহূর্ত্তে সমস্ত বাধা সরিয়ে দিতে পারে না? কিন্তু শুভ-লক্ষণ দেখা দিয়েচে যে, কিছুদিন থেকে বার বার তার বাঁ চোখ নাচ্‌চে। এর পূর্ব্বে জীবনে আরো অনেকবার বাঁ চোখ নেচেছে, তা নিয়ে কিছু ভাববার দরকার হয় নি। এবারে লক্ষণটাকে মনে মনে ধ'রে পড়ল। যেন তার প্রতিশ্রুতি তাকে রাখতেই হবে— শুভ-লক্ষণের সত্য-ভঙ্গ যেন না হয়।

১০

বাদলা করেচে। বিপ্রদাসের শরীরটা ভালো নেই। বালাপোষ মুড়ি দিয়ে আধ-শোওয়া অবস্থায় খবরের কাগজ পড়্‌চে। কুমুর আদরের বিড়ালটা বালাপোষের একটা ফালতো অংশ দখল ক'রে গোলাকার হ'য়ে নিদ্রা-মগ্ন। বিপ্রদাসের টেরিয়র্ কুকুরটা অগত্যা ওর স্পর্দ্ধা সহ্য ক'রে মনিবের পায়ের কাছে শুয়ে স্বপ্নে এক-একবার গোঁ গোঁ ক'রে উঠ্‌চে।

এমন সময়ে এলো আর এক ঘটক।

"নমস্কার!"

"কে তুমি?"

"আজ্ঞে, কর্ত্তারা আমাকে খুবই চিন্‌তেন, (মিথ্যে কথা) আপনারা তখন শিশু। আমার নাম নীলমণি ঘটক, ৺গঙ্গামণি-ঘটকের পুত্র।"

"কি প্রয়োজন?"

"ভালো পাত্রের সন্ধান আছে। আপনাদেরই ঘরের উপযুক্ত।"

বিপ্রদাস একটু উঠে বস্‌ল। ঘটক রাজাবাহাদুর মধুসূদন ঘোষালের নাম কর্‌লে।

বিপ্রদাস বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "ছেলে আছে না কি?"

ঘটক জিভ কেটে বল্‌লে, "না, তিনি বিবাহ করেন নি। প্রচুর ঐশ্বর্য্য। নিজে কাজ দেখা ছেড়ে দিয়েছেন, এখন সংসার কর্‌তে মন দিয়েচেন।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিপ্রদাস খানিকক্ষণ ব'সে গুড়গুড়িতে টান দিতে লাগ্‌ল। তার পরে হঠাৎ এক সময়ে একটু যেন জোর ক'রে ব'লে উঠ্‌ল,—"বয়সের মিল আছে এমন মেয়ে আমাদের ঘরে নেই।"

ঘটক ছাড়্‌তে চায় না, বরের ঐশ্বর্য্যের যে পরিমাণ কত, আর গবর্ণরের দরবারে তাঁর আনাগোনার পথ যে কত প্রশস্ত ইনিয়ে-বিনিয়ে তারি ব্যাখ্যা করতে লাগ্‌ল।

বিপ্রদাস আবার স্তম্ভিত হ'য়ে ব'সে রইল। আবার অনাবশ্যক বেগের সঙ্গে ব'লে উঠ্‌ল, "বয়সে মিলবে না।"

ঘটক বল্‌লে, "ভেবে দেখবেন, দু-চারদিন বাদে আর একবার আস্‌বো।"

বিপ্রদাস দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার শুয়ে পড়্‌ল।

দাদার জন্যে গরম চা নিয়ে কুমু ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল। দরজার বাইরে গামছা সুদ্ধ একটা ভিজে জীর্ণ ছাতি ও কাদা-মাখা তালতলার চটি দেখে থেমে গেল। ওদের কথাবার্ত্তা অনেকখানি কানে পৌঁছল। ঘটক তখন বল্‌চে, "রাজাবাহাদুর এবার বছর না যেতে মহারাজা হবেন এটা একেবারে লাট সাহেবের নিজ মুখের কথা। তাই এতদিন পরে তাঁর ভাবনা ধরেচে, মহারাণীর পদ এখন আর খালি রাখা চল্‌বে না। আপনাদের গ্রহাচার্য্য কিনু ভট্‌চাজ্‌ দূর সম্পর্কে আমার সম্বন্ধী, তার কাছে কন্যার কুষ্ঠি দেখা গেল—লক্ষণ ঠিকটি মিলেচে। এই নিয়ে সহরের মেয়ের কুষ্ঠি ঘাঁটতে বাকি রাখিনি—এমন কুষ্ঠি আর একটিও হাতে পড়ল না। এই দেখে নেবেন, আমি আপনাকে ব'লে দিচ্ছি, এ সম্বন্ধ হয়েই গেছে, এ প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ।"

ঠিক এই সময়ে কুমুর আবার বাঁ চোখ নাচ্‌ল। শুভ লক্ষণের কি অপূর্ব্ব রহস্য! কিনু আচার্য্যি কতবার তার হাত দেখে বলেচে, রাজরাণী হবে সে। করকোষ্ঠীর সেই পরিণত ফলটা আপনি বেছে আজ তার কাছে উপস্থিত। ওদের গ্রহাচার্য্য এই ক'দিন হ'ল বার্ষিক আদায় করতে কলকাতায় এসেছিল; সে ব'লে গেছে, এবার আষাঢ় মাস থেকে বৃষরাশির রাজসম্মান, স্ত্রীলোকঘটিত অর্থলাভ, শত্রুনাশ; মন্দের মধ্যে পত্নী-পীড়া, এমন কি হয় তো পত্নী-বিয়োগ। বিপ্রদাসের বৃষরাশ। মাঝে মাঝে দৈহিক পীড়ার কথা আছে। তারও প্রমাণ হাতে হাতে, কাল রাত থেকে স্পষ্টই সর্দ্দির লক্ষণ। আষাঢ় মাসও পড়্‌ল—পত্নীর পীড়া ও মৃত্যুর কথাটা ভাববার আশু প্রয়োজন নেই, অতএব এবার সময় ভালো।

কুমু দাদার পাশে ব'সে বল্‌লে, "দাদা, মাথা ধ'রেছে কি?"

দাদা বল্‌লে, "না।"

"চা তো ঠাণ্ডা হ'য়ে যায় নি? তোমার ঘরে লোক দেখে ঢুকতে পারলুম না।"

বিপ্রদাস কুমুর মুখের দিকে চেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌লে। ভাগ্যের নিষ্ঠুরতা সব চেয়ে অসহ্য, যখন সে সোনার রথ আনে যার চাকা অচল। দাদার মুখভাবে এই দ্বিধার বেদনা কুমুকে ব্যথা দিলে। দৈবের দানকে কেন দাদা এমন ক'রে সন্দেহ করচেন? বিবাহ ব্যাপারে নিজের পছন্দ ব'লে যে একটা উপসর্গ আছে, এ চিন্তা কখনো কুমুদিনীর মাথায় আসে নি। শিশুকাল থেকে পরে পরে সে তার চার দিদির বিয়ে দেখেচে। কুলীনের ঘরে বিয়ে—কুল ছাড়া আর বিশেষ কিছু পছন্দর বিষয় ছিল তাও নয়। ছেলেপুলে নিয়ে তবু তারা সংসার করচে, দিন কেটে যাচ্চে। যখন দুঃখ পায় বিদ্রোহ করে না; মনে ভাব্‌তেও পারে না যে, কিছুতেই এটা ছাড়া আর কিছুই হ'তে পারত। মা কি ছেলে বেছে নেয়? ছেলেকে মেনে নেয়। কুপুত্রও হয়, সুপুত্রও হয়। স্বামীও তেমনি। বিধাতা তো দোকান খোলেন নি। ভাগ্যের উপর বিচার চল্‌বে কার?

এতদিন পরে কুমুর মন্দ ভাগ্যের তেপান্তর মাঠ পেরিয়ে এল রাজপুত্র ছদ্মবেশে। রথচক্রের শব্দ কুমু তার হৃৎস্পন্দনের মধ্যে ঐ যে শুনতে পাচ্চে। বাইরের ছদ্মবেশটা সে যাচাই ক'রে দেখ্‌তেই চায় না।

তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়েই সে পাঁজি খুলে দেখ্‌লে আজ মনোরথ দ্বিতীয়া। বাড়ীতে কর্ম্মচারীদের মধ্যে যে কয়জন ব্রাহ্মণ আছে সন্ধ্যাবেলা ডাকিয়ে তাদের ফলার করালে, দক্ষিণাও যথাসাধ্য কিছু দিলে। সবাই আশীর্ব্বাদ করলে, রাজরাণী হ'য়ে থাকো, ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক্।

দ্বিতীয়বার বিপ্রদাসের বৈঠকখানায় ঘটকের আগমন। তুড়ি দিয়ে শিব শিব ব'লে বৃদ্ধ উচ্চস্বরে হাই তুললে। এবারে অসম্মতি দিয়ে কথাটাকে শেষ ক'রে দিতে বিপ্রদাসের সাহস হোলো না। ভাবলে, এত বড়ো দায়িত্ব নিই কি ক'রে? কেমন ক'রে নিশ্চয় জানব কুমুর পক্ষে এ সম্বন্ধ সব চেয়ে ভালো নয়? পশুদিন শেষকথা দেবে ব'লে ঘটককে বিদায় ক'রে দিলে।

১১

সন্ধ্যার অন্ধকার মেঘের ছায়ায় বৃষ্টির জলে নিবিড়। কুমুর আসবাব-পত্র বেশি কিছু নেই। এক পাশে ছোট খাট, আলনায় গুটি দুয়েক পাকানো সাড়ি আর চাঁপা-রঙের গামছা। কোণে কাঁঠাল কাঠের সিন্দুক, তার মধ্যে ওর ব্যবহারের কাপড়। খাটের নীচে সবুজ রঙ করা টিনের বাক্সে পান সাজবার সরঞ্জাম, আর একটা বাক্সে চুল বাঁধবার সামগ্রী। দেয়ালের খাঁজের মধ্যে কাঠের থাকে কিছু বই, দোয়াত কলম, চিঠির কাগজ, মায়ের হাতের পশমে বোনা বাবার সর্ব্বদা ব্যবহারের চটিজুতো জোড়া; শোবার খাটের শিয়রে রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপের পট। দেয়ালের কোণে ঠেসানো একটা এসরাজ।

ঘরে কুমু আলো জ্বালায় নি। কাঠের সিন্দুকের উপর ব'সে জানলার বাইরে চেয়ে আছে। সামনে ইঁটের কলেবরওয়ালা কলকাতা, আদিম কালের বর্ম্ম-কঠিন একটা অতিকায় জন্তুর মতো, জলধারার মধ্য দিয়ে ঝাপসা দেখা যাচ্চে। মাঝে মাঝে তার গায়ে গায়ে আলোক-শিখার বিন্দু। কুমুর মন তখন ছিল অদৃষ্টনিরূপিত তার ভাবীলোকের মধ্যে। সেখানকার ঘরবাড়ি লোকজন সবই তার আপন আদর্শে গড়া। তারই মাঝখানে নিজের সতীলক্ষ্মী রূপের প্রতিষ্ঠা, কত ভক্তি, কত পূজা, কত সেবা। তার নিজের মায়ের পুণ্যচরিতে একজায়গায় একটা গভীর ক্ষত র'য়ে গেছে। তিনি স্বামীর অপরাধে কিছুকালের জন্যেও ধৈর্য্য হারিয়েছিলেন। কুমু কখনো সে ভুল করবে না।

বিপ্রদাসের পায়ের শব্দ শুনে কুমু চমকে উঠল। দাদাকে দেখে বললে, "আলো জেলে দেবো কি?"

"না কুমু, দরকার নেই" ব'লে বিপ্রদাস সিন্দুকে তার পাশে এসে বসলো। কুমু তাড়াতাড়ি মেঝের উপর নেমে ব'সে আস্তে আস্তে তার পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

বিপ্রদাস স্নিগ্ধ-স্বরে বললে, "বৈঠকখানায় লোক এসেছিল তাই তোকে ডেকে পাঠাই নি। এতক্ষণ একলা ব'সে ছিলি?"

কুমু লজ্জিত হ'য়ে বললে, "না, ক্ষেমা পিসি অনেকক্ষণ ছিলেন।" কথাটা ফিরিয়ে দেবার জন্যে বললে, "বৈঠকখানায় কে এসেছিল, দাদা?"

"সেই কথাই তোকে বলতে এসেচি। এ বছর জষ্টি মাসে তুই আঠারো পেরিয়ে উনিশে পড়লি, তাই না?"

"হাঁ দাদা, তাতে দোষ হয়েছে কি?"

"দোষের কথা না। আজ নীলমণি ঘটক এসেছিল। লক্ষ্মী বোন, লজ্জা করিস্‌নে। বাবা যখন ছিলেন তোর বয়স দশ—বিয়ে প্রায় ঠিক হয়েছিল। হ'য়ে গেলে তোর মতের অপেক্ষা কেউ করত না। আজ তো আমি তা পারিনে। রাজা মধুসূদন ঘোষালের নাম নিশ্চয়ই শুনেছিস্। বংশ মর্য্যাদায় ওঁরা খাটো নন। কিন্তু বয়সে তোর সঙ্গে অনেক তফাৎ। আমি রাজি হ'তে পারিনি। এখন, তোর মুখের একটা কথা শুনলেই চুকিয়ে দিতে পারি। লজ্জা করিস্‌নে কুমু।"

"না, লজ্জা করব না।" ব'লে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। "যাঁর কথা বলচ নিশ্চয়ই তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ঠিক হ'য়েই গেছে।" এটা সেই ঘটকের কথার প্রতিধ্বনি—কখন্ কথাটা এর মনের গভীরতায় আটকা পড়ে গেছে।

বিপ্রদাস আশ্চর্য্য হ'য়ে বললে, "কেমন ক'রে ঠিক হোলো?"

কুমু চুপ ক'রে রইলো।

বিপ্রদাস তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললে, "ছেলেমানুষী করিসনে, কুমু।"

কুমুদিনী বললে, "তুমি বুঝবে না দাদা, একটুও ছেলেমানুষী করচিনে।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দাদার উপর তার অসীম ভক্তি। কিন্তু দাদা ত দৈব-বাণী মানে না, কুমুদিনী জানে এইখানেই দাদার দৃষ্টির ক্ষীণতা।

বিপ্রদাস বল্‌লে, "তুই তো তাঁকে দেখিস্ নি।"

"তা হোক, আমি যে ঠিক জেনেচি।"

বিপ্রদাস ভালো ক'রেই জানে এই জায়গাতেই ভাই বোনের মধ্যে অসীম প্রভেদ। কুমুর চিত্তের এই অন্ধকার মহলে ওর উপর দাদার একটুও দখল নেই। তবু বিপ্রদাস আর একবার বল্‌লে, "দেখ্ কুমু, চিরজীবনের কথা, ফস্ ক'রে একটা খেয়ালের মাথায় পণ ক'রে বসিস্ নে।"

কুমু ব্যাকুল হ'য়ে বল্‌লে, "খেয়াল নয় দাদা, খেয়াল নয়। আমি তোমার এই পা ছুঁয়ে বল্‌চি আর কাউকে বিয়ে কর্‌তে পার্‌ব না।"

বিপ্রদাস চম্‌কে উঠল। যেখানে কার্য্যকারণের যোগা-যোগ নেই সেখানে তর্ক করবে কী নিয়ে? অমাবস্যার সঙ্গে কুস্তি করা চলে না। বিপ্রদাস বুঝেচে, কি একটা দৈব-সঙ্কেত কুমু মনের মধ্যে বানিয়ে বসেচে। কথাটা সত্য। আজই সকালে ঠাকুরকে উদ্দেশ ক'রে মনে মনে বলেছিল, এই বেজোড় সংখ্যার ফুলে জোড় মিলিয়ে সব শেষে যেটি বাকি থাকে তার রঙ যদি ঠাকুরের মতো নীল হয় তবে বুঝবো তাঁরই ইচ্ছা। সব শেষের ফুলটি হ'ল নীল অপরাজিতা।

অদূরে মল্লিকদের বাড়িতে সন্ধ্যারতির কাঁসর-ঘণ্টা বেজে উঠ্‌ল। কুমু জোড় হাত ক'রে প্রণাম করলে। বিপ্রদাস অনেকক্ষণ রইল ব'সে। ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্চে; বৃষ্টিধারার বিরাম নেই।

১২

বিপ্রদাস আরো কয়েকবার কুমুদিনীকে বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করলে। কুমু কথার জবাব না দিয়ে মাথা নীচু ক'রে আঁচল খুঁটতে লাগলো।

বিয়ের প্রস্তাব পাকা, কেবল একটা বিষয় নিয়ে দুই পক্ষে কিছু কথা-চালাচালি হোলো। বিয়েটা হবে কোথায়? বিপ্রদাসের ইচ্ছে কলকাতার বাড়িতে। মধুসূদনের একান্ত জেদ নূরনগরে। বরপক্ষের ইচ্ছেই বাহাল রইল।

আয়োজনের জন্যে কিছু আগে থাকতেই নূরনগরে আস্‌তে হোলো। বৈশেখ জষ্টির খরার পরে আষাঢ়ের বৃষ্টি নাম্‌লে মাটি যেমন দেখ্‌তে দেখ্‌তে সবুজ হ'য়ে আসে, কুমুদিনীর অন্তরে-বাহিরে তেমনি একটা নূতন প্রাণের রঙ লাগল। আপন মন গড়া মানুষের সঙ্গে মিলনের আনন্দ ওকে অহরহ পুলকিত ক'রে রাখে। শরৎ কালের সোনার আলো ওর সঙ্গে চোখে কথা কইচে, কোন এক অনন্তকালের মনের কথা। শোবার ঘরের সামনের বারান্দায় কুমু মুড়ি ছড়িয়ে দেয়, পাখীরা এসে খায়; রুটির টুক্‌রো রাখে, কাঠবিড়ালী চঞ্চল চোখে চারিদিকে চেয়ে দ্রুত ছুটে এসে ল্যাজের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ায়; সামনের দুই পায়ে রুটি তুলে ধ'রে কুটুর কুটুর ক'রে খেতে থাকে। কুমুদিনী আড়াল থেকে আনন্দিত হ'য়ে ব'সে দেখে। বিশ্বের প্রতি ওর অন্তর আজ দাক্ষিণ্যে ভরা। বিকেলে গা ধোবার সময় খিড়কির পুকুরে গলা ডুবিয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাকে, জল যেন ওর সর্ব্বাঙ্গে আলাপ করে। বিকেলের বাঁকা আলো পুকুরের পশ্চিম ধারের বাতাবি-লেবু গাছের শাখার উপর দিয়ে এসে ঘন কালো জলের উপরে নিকষ সোনার রেখার মতো ঝিকিমিকি করতে থাকে; ও চেয়ে চেয়ে দেখে, সেই আলোর ছায়ায় ওর সমস্ত শরীরের উপর দিয়ে অনির্ব্বচনীয় পুলকের কাঁপন ব'য়ে যায়। মধ্যাহ্নে বাড়ির ছাদের চিলে কোঠায় একলা গিয়ে ব'সে থাকে, পাশের জামগাছ থেকে ঘুঘুর ডাক কানে আসে। ওর যৌবন-মন্দিরে আজ যে দেবতার বরণ হচ্চে ভাবঘন রসের রূপটি তার, কৃষ্ণরাধিকার যুগলরূপের মাধুর্য্য তার সঙ্গে মিশেচে। বাড়ির ছাদের উপরে এস্রাজটি নিয়ে ধীরে ধীরে বাজায়, ওর দাদার সেই ভূপালি সুরের গানটি:—

"আজু মোর ঘরে আইল পিয়রওয়া
রোমে রোমে হরখীলা।"

রাত্রে বিছানায় ব'সে প্রণাম করে, সকালে উঠে বিছানায় ব'সে আবার প্রণাম করে। কাকে করে সেটা স্পষ্ট নয়,—একটি নিরবলম্ব ভক্তির স্বতঃ-স্ফূর্ত্ত উচ্ছ্বাস।

কিন্তু মন-গড়া প্রতিমার মন্দিরদ্বার চিরদিন তো রুদ্ধ থাক্‌তে পারে না। কানাকানির নিশ্বাসের তাপে ও বেগে সে মূর্ত্তির সুষমা যখন ঘা খেতে আরম্ভ করে তখন দেবতার রূপ টিঁকবে কি ক'রে। তখন ভক্তের বড়ো দুঃখের দিন।

একদিন তেলেনিপাড়ার বুড়ি তিনকড়ি এসে কুমুদিনীর মুখের সামনেই ব'লে বস্‌ল, "হ্যাঁ গা, আমাদের কুমুর কপালে কেমন রাজা জুট্‌ল? ঐ-যে বেদেনীদের গান আছে,—

'এক যে ছিল কুকুর-চাটা শেয়াল-কাঁটার বন,
কেটে করলে সিংহাসন।"

এ-ও সেই শেয়ালকাঁটা বনের রাজা। ঐতো রজবপুরের আন্দো মুহুরির ছেলে মোধো। দেশে যে-বার আকাল, মগের মুলুক থেকে চাল আনিয়ে বেচে ওর টাকা। তবু বুড়ি মা'কে শেষদিন পর্য্যন্ত রাঁধিয়ে রাঁধিয়ে হাড় কালী করিয়েচে।"

মেয়েরা উৎসুক হ'য়ে তিনকড়িকে ধ'রে বসে; বলে, "বরকে জান্‌তে না কি?"

"জানতুম না? ওর মা যে আমাদের পাড়ার মেয়ে, পুরুত চক্রবর্ত্তীদের ঘরের। (গলা নীচু ক'রে) সত্যি কথা বলি বাছা, ভালো বামুনের ঘরে ওদের বিয়ে চলে না। তা হোক্ গে, লক্ষ্মী তো জাত বিচার করেন না।"

পূর্ব্বেই বলেচি কুমুদিনীর মন একালের ছাঁচে নয়। জাতকুলের পবিত্রতা তার কাছে খুব একটা বাস্তব জিনিষ। মনটা তাই যতই সঙ্কুচিত হ'য়ে ওঠে ততই যারা নিন্দে করে তাদের উপর রাগ করে; ঘর থেকে হঠাৎ কেঁদে উঠে ছুটে বাইরে চ'লে যায়। সবাই গা-টেপাটেপি ক'রে বলে, "ইস্, এখনি এত দরদ? এ-যে দেখি দক্ষ-যজ্ঞের সতীকেও ছাড়িয়ে গেলো।"

বিপ্রদাসের মনের গতি হাল আমলের, তবু জাতকুলের হীনতায় তাকে কাবু করে। তাই, গুজবটা চাপা দেবার অনেক চেষ্টা করলে। কিন্তু ছেঁড়া বালিশে চাপ দিলে তার তুলো যেমন আরো বেশি বেরিয়ে পড়ে, তেমনি হোলো।

এদিকে বুড়ো প্রজা দামোদর বিশ্বাসের কাছে খবর পাওয়া গেল যে, বহুপূর্ব্বে ঘোষালেরা নুরনগরের পাশের গ্রাম শেয়াকুলির মালেক ছিল। এখন সেটা চাটুজ্জেদের দখলে। ঠাকুর বিসর্জ্জনের মামলায় কি ক'রে সব সুদ্ধ ঘোষালদেরও বিসর্জ্জন ঘটেছিল, কি কৌশলে কর্ত্তাবাবুরা, শুধু দেশ ছাড়া নয়, তাদের সমাজ ছাড়া করেছিলেন, তার বিবরণ বল্‌তে বল্‌তে দামোদরের মুখ ভক্তিতে উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। ঘোষালেরা এককালে ধনে মানে কুলে চাটুজ্জেদের সমকক্ষ ছিলেন এটা সুখবর, কিন্তু বিপ্রদাসের মনে ভয় লাগলো যে, এই বিয়েটাও সেই পুরাতন মামলার একটা জের না-কি?

১৩

অঘ্রাণ মাসে বিয়ে। ২৫শে আশ্বিন লক্ষ্মীপুজো হ'য়ে গেল। হঠাৎ ২৭শে আশ্বিনে তাঁবু ও নানাপ্রকার সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে ঘোষাল কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ওভারসিয়র এসে উপস্থিত, সঙ্গে একদল পশ্চিমী মজুর। ব্যাপারখানা কি? শেয়াকুলিতে ঘোষালদীঘির ধারে তাঁবু গেড়ে বর ও বরযাত্রীরা কিছুদিন আগে থাক্‌তেই সেখানে এসে উঠ্‌বেন।

এ কি-রকম কথা? বিপ্রদাস বল্‌লে, "তাঁরা যতজন খুসি আসুন, যতদিন খুসি থাকুন, আমরাই বন্দোবস্ত ক'রে দেবো। তাঁবুর দরকার কি? আমাদের স্বতন্ত্র বাড়ি আছে, সেটা খালি ক'রে দিচ্চি।"

ওভারসিয়র বল্‌লে, "রাজাবাহাদুরের হুকুম। দীঘির চারিধারের বন-জঙ্গলও সাফ ক'রে দিতে বলেচেন,—আপনি জমিদার, অনুমতি চাই।"

বিপ্রদাস মুখ লাল ক'রে বল্‌লে, "এটা কি উচিত হচ্চে? জঙ্গল তো আমরাই সাফ ক'রে দিতে পারি।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওভারসিয়র বিনীতভাবে উত্তর করলে, "ঐখানেই রাজাবাহাদুরের পূর্ব্বপুরুষের ভিটে বাড়ি, তাই সখ হয়েচে নিজেই ওটা পরিষ্কার ক'রে নেবেন।"

কথাটা নিতান্ত অসঙ্গত নয়, কিন্তু আত্মীয়-স্বজনেরা খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগলো। প্রজারা বলে, এটা আমাদের কর্ত্তাবাবুদের উপর টেক্কা দেবার চেষ্টা। হঠাৎ তবিল ফেঁপে উঠেচে, সেটা ঢাকা দিতে পারচে না; সেটাকে জয়ঢাক ক'রে তোলবার জন্তেই না এই কাণ্ড? সাবেক আমল হ'লে বরসুদ্ধ বরসজ্জা বৈতরণী পার করতে দেরি হোতো না। ছোটোবাবু থাকলে তিনিও সইতেন না, দেখা যেতো ঐ বাবুগুলো আর তাঁবুগুলো থাক্‌তো কোথায়!

প্রজারা এসে বিপ্রদাসকে বল্‌লে, "হুজুর, ওদের কাছে হট্‌তে পারব না। যা খরচ লাগে আমরাই দেব।"

ছয়-আনার কর্ত্তা নবগোপাল এসে বল্‌লে, "বংশের অমর্য্যাদা সওয়া যায় না। একদিন আমাদের কর্ত্তারা ঐ ঘোষালদের হাড়ে হাড়ে ঠকাঠকি লাগিয়েচেন, আজ তারা আমাদেরি এলাকার উপর চড়াও হ'য়ে টাকার ঝলক্ মারতে এসেচে! ভয় নেই দাদা, খরচ যা লাগে আমরাও আছি। বিষয় ভাগ হোক, বংশের মান তো ভাগ হ'য়ে যায় নি।"

এই ব'লে নবগোপালই ঠেলেঠুলে কর্ম্মকর্ত্তা হ'য়ে বস্‌লো।

বিপ্রদাস কয়দিন কুমুর কাছে যেতে পারে নি। তার মুখের দিকে তাকাবে কি ক'রে? কুমুর কাছে বরপক্ষের স্পর্দ্ধার কথা কেউ যে গলা খাটো ক'রে বলবে সমাজে সে দয়া বা ভদ্রতা নেই। তারই কাছে সবাই বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলে। মেয়েদের রাগ তারই পরে। ওরি জন্তে পূর্ব্ব-পুরুষের মাথা যে হেঁট হোলো! রাজরাণী হ'তে চলেচেন! কিবে রাজার ছিরি!

জাতকুলের কথাটাকে কুমু তার ভক্তি দিয়ে চাপা দিয়েছিল। কিন্তু ধনের বড়াই ক'রে শ্বশুরকুলকে খাটো করার নীচতা দেখে তার মন বিষাদে ভ'রে উঠলো। কেবলি লোকের কাছ থেকে সে পালিয়ে বেড়ায়। ঘোষাল-দের লজ্জায় আজ যে ওরি লজ্জা। দাদার মুখ থেকে কিছু শোনবার জন্তে মনটা ছট্‌ফট্ করচে। কিন্তু দাদার দেখা নেই, অন্দরমহলে খেতেও আসে না।

একদিন বিপ্রদাস অন্তঃপুরের বাগানে ভিয়েনঘরের জন্তে চালা বাঁধবার জায়গা ঠিক করতে গিয়ে হঠাৎ খিড়কির পুকুরের ঘাটে দেখে কুমু নীচের পৈঠের উপর ব'সে মাথা হেঁট ক'রে জলের দিকে তাকিয়ে আছে। দাদাকে দেখে তাড়াতাড়ি উপরে উঠে এলো। এসেই রুদ্ধস্বরে বল্‌লে, "দাদা, কিছুই বুঝতে পারচিনে।" ব'লেই মুখে কাপড় দিয়ে কেঁদে উঠ্‌লো।

দাদা ধীরে ধীরে পিঠে হাত বুলিয়ে বল্‌লে, "লোকের কথায় কান দিস্‌নে বোন।"

"কিন্তু ওঁরা এ-সব কী করচেন? এতে কি তোমা-দের মান থাক্‌বে?"

"ওদের দিকটাও ভেবে দেখিস্। পূর্ব্বপুরুষের জন্ম-স্থানে আস্‌চে, ধুমধাম করবে না? বিয়ের ব্যাপার থেকে এটাকে স্বতন্ত্র ক'রে দেখিস্।"

কুমু চুপ ক'রে রইল। বিপ্রদাস থাক্‌তে পারলে না, মরীয়া হ'য়ে বল্‌লে, "তোর মনে যদি একটুও খট্‌কা থাকে বিয়ে এখনো ভেঙে দিতে পারি।"

কুমুদিনী সবেগে মাথা নেড়ে বল্‌লে, "ছি ছি, সে কি হয়?"

অন্তর্য্যামীর সামনে সত্যগ্রন্থিতে তো গাঁঠ প'ড়ে গেছে। বাকি যেটুকু সে তো বাইরের।

বিপ্রদাসের একেলে মন এতটা নিষ্ঠায় অধৈর্য্য হ'য়ে ওঠে। সে বল্‌লে, "দুই পক্ষের সততায় তবেই বিবাহ-বন্ধন সত্য। সুরে-বাঁধা এস্রাজের কোনো মানেই থাকে না যদি বাজাবার হাতটা হয় বেসুরো। পুরাণে দেখ্ না, যেমন সীতা তেমনি রাম, যেমন মহাদেব তেমনি সতী, অরুন্ধতী যেমন বশিষ্ঠও তেমনি। হাল আমলের বাবুদের নিজেদের মধ্যে নেই পুণ্য তাই একতরফা সতীত্ব প্রচার করেন। তাঁদের তরফে তেল জোটে না সল্‌তেকে বলেন জল্‌তে—শুকনো প্রাণে জল্‌তে জল্‌তেই ওরা গেলো ছাই হ'য়ে।"

কুমুকে বলা মিথ্যে। এখন থেকে ও মনে মনে জোরের সঙ্গে জপ্‌তে লাগ্‌ল, তিনি ভালোই হোন্ মন্দই হোন্ তিনি আমার পরম গতি।

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ
বীতরাগভয়ক্রোধঃ—

শুধু যতী ধর্ম্মের নয়, সতী ধর্ম্মেরও এই লক্ষণ। সে ধর্ম্ম সুখ-দুঃখের অতীত,—তাতে ক্রোধ নেই, ভয় নেই। আর অনুরাগ? তারই বা অত্যাবশ্যকতা কিসের। অনুরাগে চাওয়া-পাওয়ার হিসেব থাকে, ভক্তি তারো বড়ো। তাতে আবেদন নেই, নিবেদন আছে। সতী ধর্ম্ম নির্ব্যক্তিক, যাকে ইংরেজিতে বলে ইম্পার্সোনাল। মধুসূদন ব্যক্তিটিতে দোষ থাক্‌তে পারে, কিন্তু স্বামী নামক ভাব পদার্থটি নির্ব্বিকার নিরঞ্জন। সেই ব্যক্তিকতাহীন ধ্যানরূপের কাছে কুমুদিনী একমনা হ'য়ে নিজেকে সমর্পণ ক'রে দিলে।

১৪

ঘোষাল-দীঘির ধারে জঙ্গল সাফ্ হ'য়ে গেলো,—চেনা যায় না। জমি নিখুঁৎভাবে সমতল, মাঝে মাঝে সুরকি দিয়ে রাঙানো রাস্তা, রাস্তার ধারে ধারে আলো দেবার থাম। দীঘির পানা সব তোলা হয়েচে। ঘাটের কাছে ভক্‌ভকে নতুন বিলিতী পাল-খেলাবার দুটি নৌকো; তাদের একটির গায়ে লেখা "মধুমতী", আর একটির গায়ে "মধুকরী"। যে তাঁবুতে রাজাবাহাদুর স্বয়ং থাক্‌বেন তার সামনে ক্রেমে হল্‌দে বনাতের উপর লাল রেশমে বোনা, "মধুচক্র"। একটা তাঁবু অন্তঃপুরের, সেখান থেকে জল পর্য্যন্ত চাটাই দিয়ে ঘেরা ঘাট। ঘাটের উপরেই মস্ত নিমগাছের গায়ে কাঠের ফলকে লেখা, "মধুসাগর"। খানিকটা জমিতে নানা আকারের চাক্‌কায় সূর্য্যমুখী রজনীগন্ধা, গাঁদা দোপাটি, ক্যানা ও পাতাবাহার, কাঠের চৌকো বাক্সে-আনা রঙের বিলিতি ফুল। মাঝে একটি ছোটো বাঁধানো জলাশয়, তারি মধ্যে লোহার ঢালাই করা নগ্ন স্ত্রী-মূর্ত্তি, মুখে শাঁখ তুলে ধরেচে, তার থেকে ফোয়ারার জল বেরোবে। এই জায়গাটার নাম দেওয়া হয়েচে, "মধুকুঞ্জ"। প্রবেশ-পথে কারুকাজ করা লোহার গেট, উপরে নিশান উড়চে—নিশানে লেখা, "মধুপুরী"। চারদিকেই মধু নামের ছাপ। নানারঙের কাপড়ে কানাতে চাঁদোয়ায় নিশানে রঙীন ফুলে চিনালণ্ঠনে হঠাৎ-তৈরি এই মায়াপুরী দেখবার জন্যে দূর থেকে দলে দলে লোক আস্‌তে লাগ্‌ল। এদিকে ঝক্‌ঝকে চাপরাশ-ঝোলানো হলদের উপর লাল পাড় দেওয়া পাগড়ি-বাঁধা, জরির ফিতে দেওয়া লাল বনাতের উর্দ্দিপরা চাপরাশীর দল বিলিতি জুতো মস্‌মসিয়ে বেড়ায়, সন্ধ্যাবেলায় বন্দুকে ফাঁকা আওয়াজ করে, দিনরাত প্রহরে প্রহরে ঘণ্টা বাজায়, তাদের কারো কারো চামড়ার কোমরবন্ধে ঝোলানো বিলিতি তলোয়ারটা জমিদারের মাটিকে পায়ে পায়ে খোঁচা দিতে থাকে। চাটুজ্জেদের সাবেক কালের জীর্ণসাজ-পরা বরকন্দাজেরা লজ্জায় ঘর হ'তে বার হ'তে চায় না। কাণ্ড দেখে চাটুজ্জে পরিবারের গায়ে জ্বালা ধরল। নূরনগরের পাঁজরটার মধ্যে বিঁধিয়ে দিয়ে শেলদণ্ডের উপর আজ ঘোষালদের জয়পতাকা উড়েচে।

শুভ পরিণয়ের এই সূচনা।

(ক্রমশঃ)



শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীমতী নির্ম্মলকুমারী মহলা-
নবিশকে লিখিত—বিঃ সঃ,

২

কল্যাণীয়াসু

দেশ থেকে বেরোবার মুখে আমার উপর ফরমাস এল কিছু কিছু লেখা পাঠাতে হবে। কাকে পাঠাব লেখা, কে পড়বে? সর্ব্বসাধারণ? সর্ব্বসাধারণকে বিশেষ ক'রে চিনিনে এই জন্তে তার ফরমাসে যখন লিখি তখন শক্ত ক'রে বাঁধানো খুব একটা সাধারণ খাতা খুলে লিখ্‌তে হয়, সে লেখার দাম খতিয়ে হিসেব কষা চলে।

কিন্তু মানুষের একটা বিশেষ খাতা আছে তার আল্‌গা পাতা,—সেটা যা-তা লেখবার জন্তে, সে লেখার দামের কথা কেউ ভাবেও না। লেখাটাই তার লক্ষ্য, কথাটা উপলক্ষ্য। সে রকম লেখা চিঠিতে ভালো চলে; আটপৌরে লেখা,—তার না আছে মাথায় পাগ্‌ড়ি, না আছে পায়ে জুতো। পরের কাছে পরের বা নিজের কোনো দরকার নিয়ে সে যায় না; সে যায় যেখানে বিনা দরকারে গেলেও জবাবদিহি নেই,—যেখানে কেবলমাত্র ব'কে যাওয়ার জন্তেই যাওয়া আসা।

স্রোতের জলের যে ধ্বনি সেটা তার চলারই ধ্বনি, উড়ে-চলা মৌমাছির পাখার যেমন গুঞ্জন। আমরা যেটাকে বকুনি বলি সেটাও সেই মানসিক চ'লে যাওয়ারই শব্দ। চিঠি হচ্চে লেখার অক্ষরে ব'কে যাওয়া।

এই ব'কে যাওয়াটা মনের জীবনের লীলা। দেহটা কেবলমাত্র চল্‌বার জন্তেই বিনা প্রয়োজনে মাঝে মাঝে এক-একবার খাঁ ক'রে চ'লে ফিরে আসে। বাজার করবার জন্তেও নয়, সভা করবার জন্তেও নয়, নিজের চলাতেই সে নিজে আনন্দ পায় ব'লে। তেমনি নিজের বকুনিতেই মন জীবনধর্ম্মের তৃপ্তি পায়। তাই বকবার অবকাশ চাই, লোক চাই। বক্তৃতার জন্তে লোক চাই অনেক, বকার জন্তে এক-আধজন।

দেশে অভ্যস্ত জায়গায় থাকি নিত্যনৈমিত্তিক কাজের মধ্যে, জানা অজানা লোকের ভিড়ে। নিজের সঙ্গে নিজের আলাপ করবার সময় থাকেনা। সেখানে নানা লোকের সঙ্গে নানা কেজো কথা নিয়ে কারবার। সেটা কেমনতরো? যেন বাঁধা পুকুরের ঘাটে দশজনে জটলা ক'রে জল ব্যবহার। কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা চাতকের ধর্ম্ম আছে; হাওয়ায় উড়ে আসা মেঘের বর্ষণের জন্তে সে চেয়ে থাকে একা একা। মনের আকাশে উড়ো ভাবনাগুলো সেই মেঘ,—সেটা খামখেয়ালের ঝাপটা লেগে; তার আবির্ভাব তিরোভাব সবই আকস্মিক। প্রয়োজনের তাগিদ মতো তাকে বাঁধা নিয়মে পাওয়া যায় না ব'লেই তার বিশেষ দাম। পৃথিবী আপনারই বাঁধা জলকে আকাশে উড়ো জল ক'রে দেয়—নিজের ফসল-ক্ষেতকে সরস করবার জন্তে সেই

জলের দরকার। বিনা প্রয়োজনে নিজের মনকে কথা বলাবার সেই প্রয়োজন, সেটাতে মন আপন ধারাতেই আপনাকে অভিষিক্ত করে।

জীবনযাত্রার পরিচিত ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে মন আজ যা'-তা' ভাববার সময় পেলো। তাই ভেবেছি কোনো সম্পাদকী বৈঠক স্মরণ ক'রে প্রবন্ধ আওড়াব না, চিঠি লিখ্‌ব তোমাকে। অর্থাৎ পাত পেড়ে ভোজ দেওয়া তাকে বলা চল্‌বেনা, সে হবে গাছতলায় দাঁড়িয়ে হাওয়ায় প'ড়ে যাওয়া ফল আঁচলে ভ'রে দেওয়া। তার কিছু পাকা কিছু কাঁচা, তার কোনোটাতে রঙ ধরেচে, কোনটাতে ধরেনি। তার কিছু রাখ্‌লেও চলে, কিছু ফেলে দিলেও নালিশ চল্‌বে না।

সেই ভাবেই চিঠি লিখ্‌তে সুরু করেছিলুম। কিন্তু আকাশের আলো দিলে মুখ ঢাকা। বৈঠকখানার আসর বন্ধ হ'য়ে গেলে ফরাস বাতি নিবিয়ে দিয়ে যেমন ঝাড়লণ্ঠনে ময়লা রঙের ঘেরাটোপ পরিয়ে দেয়, দ্যুলোকের ফরাস সেই কাণ্ডটা করলে; একটা ফিকে ধোঁয়াটে রঙের আবরণ দিয়ে আকাশ-সভার তৈজসপত্র দিলে মুড়ে। এই অবস্থায় আমার মন তার হাল্‌কা কলমের খেলা আপনিই বন্ধ ক'রে দেয়। বকুনির কূলহারা ঝরণা বাক্যের নদী হ'য়ে কখন্ এক সময় গভীর খাদে চল্‌তে আরম্ভ করে, তখন তার চলাটা কেবলমাত্র সূর্য্যের আলোয় কলধ্বনির নূপুর বাজানোর জন্যে নয়, একটা কোন লক্ষ্যে পৌঁছবার সাধনায়। আনমনা সাহিত্য তখন লোকালয়ের মাঝখানে এসে প'ড়ে সমনস্ক হ'য়ে ওঠে। তখন বাণীকে অনেক বেশী অতিক্রম ক'রে ভাবনাগুলো মাথা তুলে দাঁড়ায়।

উপনিষদে আছে, স নো বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা,—তিনি ভালোবাসেন, তিনি সৃষ্টি করেন, আবার তিনিই বিধান করেন। সৃষ্টি করাটা সহজ আনন্দের খেয়ালে, বিধান করায় চিন্তা আছে। যাকে খাঁ সাহিত্য বলে সেটা হ'ল সেই সৃষ্টিকর্ত্তার এলেকায়, সেটা কেবল আপন মনে। যদি কোন হিসাবী লোক স্রষ্টাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, "কেন সৃষ্টি করা হ'ল" তিনি জবাব দেন, "আমার খুসি"! সেই খুসিটাই নানারঙে নানারসে আপনাতেই আপনি পর্য্যাপ্ত হ'য়ে ওঠে। পদ্মফুলকে যদি জিজ্ঞাসা করো, "তুমি কেন হ'লে?" সে বলে, "আমি হবার জন্যেই হলুম।" খাঁটি সাহিত্যেরও সেই একটি মাত্র জবাব।

অর্থাৎ সৃষ্টির একটা দিক আছে যেটা হচ্ছে সৃষ্টিকর্ত্তার বিশুদ্ধ বকুনি। সেদিক থেকে এমনো বলা যেতে পারে, তিনি আমাকে চিঠি লিখ্‌ছেন। আমার কোন চিঠির জবাবে নয়, তাঁর আপনার বলতে ইচ্ছে হয়েচে ব'লে; কাউকে তো বলা চাই। অনেকেই মন দিয়ে শোনে না, অনেকে বলে এ তো সারবান নয়; এতো বন্ধুর আলাপ, এতো সম্পত্তির দলিল নয়। সারবান থাকে মাটির গর্ভে, সোনার খনিতে, সে নেই ফুলের বাগানে, নেই সে উদয়-দিগন্তে মেঘের মেলায়। আমি একটা গর্ব্ব ক'রে থাকি, ঐ চিঠি-লিখিয়ের চিঠি পড়্‌তে পারৎপক্ষে কখনো ভুলিনে। বিশ্ব-বকুনী যখন-তখন আমি শুনে থাকি। তাতে বিষয়-কাজের ক্ষতি হয়েচে, আর যারা আমাকে দলে ভিড়িয়ে কাজে লাগাতে চায় তাদের কাছ থেকে নিন্দাও শুনেচি; কিন্তু আমার এই দশা।

অথচ মুস্কিল হয়েছে এই যে, বিধাতাও আমাকে ছাড়েন নি। সৃষ্টিকর্ত্তার লীলাঘর থেকে বিধাতার কারখানাঘর পর্য্যন্ত যে রাস্তাটা গেছে সে রাস্তায় দুই প্রান্তেই আমার আনাগোনার কামাই নেই।

এই দোটানায় প'ড়ে আমি একটি কথা শিখেছি। যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা স এব বিধাতা, সেই জন্যেই তাঁর সৃষ্টি ও বিধান এক হ'য়ে মিশেচে, তাঁর লীলা ও কাজ এই দুইয়ের মধ্যে একান্ত বিভাগ পাওয়া যায় না। তাঁর সকল কর্ম্মই কারু-কর্ম্ম, ছুটিতে খাটুনীতে গড়া; কর্ম্মের রূঢ় রূপের উপর সৌন্দর্য্যের আব্রু টেনে দিতে তাঁর আলস্য নেই। কর্ম্মকে তিনি লজ্জা দেননি। দেহের মধ্যে যন্ত্রের ব্যবস্থা-কৌশল আছে কিন্তু তাকে আবৃত ক'রে আছে তার সুষমা-সৌষ্ঠব, বস্তুত সেইটেই প্রকাশমান।

মানুষকেও তিনি সৃষ্টি করবার অধিকার দিয়েচেন; এইটেই তার সব চেয়ে বড়ো অধিকার। মানুষ যেখানেই আপনার কর্ম্মের গৌরব বোধ করেচে সেখানেই কর্ম্মকে সুন্দর করবার চেষ্টা করেচে। তার ঘরকে বানাতে চায়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুন্দর ক'রে, তার পানপাত্র অন্নপাত্র সুন্দর, তার কাপড়ে থাকে শোভার চেষ্টা। তার জীবনে প্রয়োজনের চেয়ে সজ্জার অংশ কম থাকে না। যেখানে মানুষের মধ্যে স্বভাবের সামঞ্জস্য আছে সেখানে এই রকমই ঘটে।

এই সামঞ্জস্য নষ্ট হয়, যেখানে কোনো একটা রিপু—বিশেষত লোভ—অতি প্রবল হ'য়ে ওঠে। লোভ জিনিষটা মানুষের দৈন্য থেকে, তার লজ্জা নেই—সে আপন অসম্ভ্রমকে নিয়েই বড়াই করে। বড়ো বড়ো মুনফাওয়ালা পাটকল চটকল গঙ্গার ধারের লাবণ্যকে দলন ক'রে ফেলেছে দম্ভ ভরেই। মানুষের রুচিকে সে একেবারেই স্বীকার করেনি, একমাত্র স্বীকার করেচে তার পাওনার ফুলে-ওঠা থলিটাকে।

বর্ত্তমান যুগের বাহ্যরূপ তাই নির্লজ্জতায় ভরা। ঠিক যেন পাকযন্ত্রটা দেহের পর্দ্দা থেকে সর্ব্বসম্মুখে বেরিয়ে এসে আপন জটিল অন্ত্রতন্ত্র নিয়ে সর্ব্বদা দোলায়মান। তার ক্ষুধার দাবী ও সুনিপুণ পাকপ্রণালীর বড়াইটাই সর্ব্বাঙ্গীন দেহের সম্পূর্ণ সৌষ্ঠবের চেয়ে বড় হ'য়ে উঠেচে। দেহ যখন আপন স্বরূপকে প্রকাশ করতে চায় তখন সুসংযত সুষমার দ্বারাই করে,—যখন সে আপন ক্ষুধাকেই সব ছাড়িয়ে একান্ত ক'রে তোলে তখন বীভৎস হ'তে তার কিছুমাত্র লজ্জা নেই। লালায়িত রিপুর নির্লজ্জতাই বর্ব্বরতার প্রধান লক্ষণ, তা সে সভ্যতার গিল্‌টি-করা তক্‌মাই পরুক কিম্বা অসভ্যতার পশুচর্ম্মেই সেজে বেড়াক,—devil danceই নাচুক কিম্বা jazz dance।

বর্ত্তমান সভ্যতায় রুচির সঙ্গে কৌশলের যে বিচ্ছেদ চারদিক থেকেই দেখ্‌তে পাই তার একমাত্র কারণ, লোভটাই তার অন্য সকল সাধনাকে ছাড়িয়ে লম্বোদর হ'য়ে উঠেছে। বস্তুর সংখ্যাধিক্য-বিস্তারের প্রচণ্ড উন্মত্ততায় সুন্দরকে সে জায়গা ছেড়ে দিতে চায় না। সৃষ্টিপ্রেমের সঙ্গে পণ্যলোভের এই বিরোধে মানব-ধর্ম্মের মধ্যে যে আত্মবিপ্লব ঘটে তাতে দাসেরই যদি জয় হয়, পেটুকতারই যদি আধিপত্য বাড়ে তাহলে যম আপন সশস্ত্র দূত পাঠাতে দেরি করবে না, দলবল নিয়ে নেমে আসবে যেব হিংসা মোহ মদ মাৎসর্য্য—লক্ষ্মীকে দেবে বিদায় ক'রে।

পূর্ব্বেই বলেছি, দীনতা থেকে লোভের জন্ম;—সেই লোভের একটি স্থূলতনু সহোদরা আছে তার নাম জড়তা। লোভের মধ্যে অসংযত উদ্যম; সেই উদ্যমেই তাকে অশোভন করে। জড়তায় তার উল্‌টো, সে ন'ড়ে বস্‌তে পারে না; সে না পারে সজ্জাকে গড়তে, না পারে আবর্জ্জনাকে দূর করতে,—তার অশোভনতা নিরুদ্যমের। সেই জড়তার অশোভনতায় আমাদের দেশের মানব সম্ভ্রম নষ্ট করেচে। তাই আমাদের ব্যবহারে আমাদের জীবনের অনুষ্ঠানে সৌন্দর্য্য বিদায় নিতে বস্‌ল; আমাদের ঘরে দ্বারে বেশে ভূষায় ব্যবহার সামগ্রীতে রুচির স্বাধীন প্রকাশ রইল না;—তার জায়গায় এসে প'ড়েচে চিত্তহীন আড়ম্বর,—এতদূর পর্য্যন্ত শক্তির অসাড়তা এবং আপন রুচি সম্বন্ধেও নির্লজ্জ আত্ম-অবিশ্বাস যে, আমাদের সেই আড়ম্বরের সহায় হয়েচে চৌরঙ্গীর বিলিতি দোকানগুলো।

বারবার মনে করি লেখাগুলোকে করব বঙ্কিমবাবু যাকে বলেচেন "সাধের তরণী"। কিন্তু কোথা থেকে বোঝা এসে জমে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে সাধের তরী হ'য়ে ওঠে বোঝাই তরী। ভিতরে রয়েচে নানাপ্রকারের ক্ষোভ, লেখনীর আওয়াজ শুনেই তারা স্থানে অস্থানে বেরিয়ে পড়ে; কোনো বিশেষ প্রসঙ্গ যার মালেক নয় এমন একটা রচনা পেলেই সেটাকে অগ্নিবাস্ গাড়ি ক'রে তোলে। কেউ বা ভিতরেই ঢুকে বেঞ্চির উপর পা তুলে ব'সে যায়, কেউ বা পায়দানে চ'ড়ে চল্‌তে থাকে, তারপরে যেখানে খুসি অকস্মাৎ লাফ দিয়ে নেমে পড়ে।

আজ শ্রাবণ মাসের পয়লা। কিন্তু কাঁকড়া ঝুঁটিওয়ালা শ্রাবণ এক ভবঘুরে বেদের মতো তার কালো মেঘের তাঁবু গুটিয়ে নিয়ে কোথায় যে চলে গেছে তার ঠিকানা নেই। আজ যেন আকাশ-সরস্বতী নীলপদ্মের দোলায় দাঁড়িয়ে। আমার মন ঐ সঙ্গে সঙ্গে দুলচে সমস্ত পৃথিবীটাকে ঘিরে। আমি যেন আলোতে তৈরি, বাণীতে গড়া, বিশ্বরাগিণীতে ঝঙ্কৃত, জলে স্থলে আকাশে ছড়িয়ে যাওয়া। আমি শুন্‌তে পাচ্চি সমুদ্রটা কোন্ কাল থেকে কেবলি ভেরী বাজাচ্চে, আর পৃথিবীতে তারই উত্থান পতনের ছন্দে জীবের

ইতিহাস-যাত্রা চলেচে আবির্ভাবের অস্পষ্টতা থেকে তিরোভাবের অদৃশ্যের মধ্যে। একদল বিপুলকায় বিকটাকার প্রাণী যেন সৃষ্টিকর্তার দুঃস্বপ্নের মতো দলে দলে এল, আবার মিলিয়ে গেলো। তারপরে মানুষের ইতিহাস কবে সুরু হোলো প্রদোষের ক্ষীণ আলোতে, গুহা গহ্বর অরণ্যের ছায়ায় ছায়ায়। দুই পায়ের উপর খাড়া-দাঁড়ানো ছোট ছোট চটুল জীব, লাফ দিয়ে চ'ড়ে চ'ড়ে বস্‌ল মহাকায় বিপদ বিভীষিকার পিঠের উপর, বিষ্ণু যেমন চড়েছেন গরুড়ের পিঠে। অসাধ্যের সাধনায় চল্‌ল তারা জীর্ণ যুগান্তরের ভগ্নাংশবিকীর্ণ দুর্গম পথে। তারি সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীকে ঘিরে ঘিরে বরুণের মৃদঙ্গ বাজতে লাগল দিনে রাত্রে, তরঙ্গে তরঙ্গে। আজ তাই শুন্‌চি, আর এমন কোনো একটা কথা ছন্দে আবৃত্তি করতে ইচ্ছা কর্‌চে যা অনাদিকালের। আজকের দিনের মতোই এই রকম আলো-ঝল্‌মলানো কলকলকলোল্লিত নীলজলের দিকে তাকিয়ে ইংরেজ কবি শেলি একটি কবিতা লিখেছেন :—

The sun is warm, the sky is clear,
The waves are dancing fast and bright.

কিন্তু এ তাঁর ক্লান্ত জীবনের অবসাদের বিলাপ। এর সঙ্গে আজ ভিতরে বাইরে মিল পাচ্চিনে। একটা জগৎ-যোড়া কলক্রন্দন শুন্‌তে পাচ্চি বটে, সেই ক্রন্দন ভরিয়ে তুল্‌চে অন্তরিক্ষকে, যে অন্তরিক্ষের উপর বিশ্বরচনার ভূমিকা,—যে অন্তরিক্ষকে বৈদিক ভারত নাম দিয়েচে ক্রন্দসী। এ কিন্তু শ্রান্তিভারাতুর পরাভবের ক্রন্দন নয়। এ নবজাত শিশুর ক্রন্দন,—যে শিশু ঊর্দ্ধস্বরে বিশ্ব-দ্বারে আপন অস্তিত্ব ঘোষণা ক'রে তার প্রথম ক্রন্দিত নিশ্বাসেই জানায়, "অয়মহং ভোঃ।" অসীম ভাবীকালের দ্বারে সে অতিথি। অস্তিত্বের ঘোষণায় একটা বিপুল কান্না আছে। কেননা বারে বারে তাকে ছিন্ন করতে হয় আবরণ, চূর্ণ করতে হয় বাধা। অস্তিত্বের অধিকার প'ড়ে-পাওয়া জিনিষ নয়, প্রতি মুহূর্ত্তেই সেটা লড়াই কোরে নেওয়া জিনিষ। তাই তার কান্না এত তীব্র, আর জীবলোকে সকলের চেয়ে তীব্র মানবসত্তার নব-জীবনের কান্না। সে যেন অন্ধকারের গর্ভ বিদারণ করা নবজাত আলোকের ক্রন্দন-ধ্বনি। তারি সঙ্গে সঙ্গে নব নব জন্মে নব নব যুগে দেবলোকে বাজে মঙ্গলশঙ্খ, উচ্চারিত হয় বিশ্বপিতামহের অভিনন্দন মন্ত্র।

আজকের দিনে এই আমার শেষ উপলব্ধি নয়। সকালে দেখলুম, সমুদ্রের প্রান্তরেখায় আকাশ তার জ্যোতির্ম্ময়ী চিরন্তনী বাণীটি লিখে দিলে; সেটি পরম শান্তির বাণী, তা মর্ত্ত্যলোকের বহু যুগের বহু দুঃখের আর্ত্ত কোলাহলের আবর্ত্তকে ছাড়িয়ে ওঠে, যেন অশ্রুর ঢেউয়ের উপরে শ্বেত-পদ্মের মতো। তারপরে দিনশেষের দিকে দেখলুম একটি অখ্যাত ব্যক্তিকে, যার মধ্যে মনুষ্যত্ব অপমানিত—যদি সময় পাই তার কথা পরে বলব। তখন মানব-ইতিহাসের দিগন্তে দিগন্তে দেখতে পেলুম বিরোধের কালো মেঘ, অশান্তির প্রচ্ছন্ন বজ্রগর্জ্জন, আর লোকালয়ের উপর রুদ্রের ভ্রূকুটি-চ্ছায়া। ইতি ২ শ্রাবণ, ১৩৩৪।

৩

বুনো হাতি মূর্ত্তিমান উৎপাত, বজ্রবৃংহিত ঝড়ের মেঘের মতো। এতটুকু মানুষ, হাতির একটা পায়ের সঙ্গেও যার তুলনা হয় না, সে ওকে দেখে খামখা ব'লে উঠ্‌ল আমি এর পিঠে চ'ড়ে বেড়াব। এই প্রকাণ্ড দুর্দ্দাম প্রাণ-পিণ্ডটাকে গাঁগাঁ ক'রে শুঁড় তুলে আস্‌তে দেখেও এমন অসম্ভবপ্রায় কথা কোন একজন ক্ষীণকায় মানুষ কোন এককালে ভাবতেও পেরেছে এইটেই আশ্চর্য্য। তারপরে "পিঠে চড়ব" বলা থেকে আরম্ভ ক'রে পিঠে চ'ড়ে বসা পর্য্যন্ত যে ইতিহাস সেটাও অতি অদ্ভুত। অনেকদিন পর্য্যন্তই সেই অসম্ভবের চেহারা সম্ভবের কাছ দিয়েও আসেনি—পরম্পরাক্রমে কত বিফলতা কত অপঘাত মানুষের সঙ্কল্পকে বিদ্রূপ করেছে তার সংখ্যা নেই, সেটা গণনা ক'রে ক'রে মানুষ বলতে পারত এটা হবার নয়। কিন্তু তা বলেনি। অবশেষে একদিন সে হাতির মত জন্তুরও পিঠে চ'ড়ে ফসল ক্ষেতের ধারে, লোকালয়ের রাস্তার-ঘাটে ঘুরে বেড়ালো। এটা সাংঘাতিক অধ্যবসায়, সেই জন্যেই গণেশের হাতির মুণ্ডে মানুষের সিদ্ধির মূর্ত্তি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই সিদ্ধির দুই দিকে দুই জন্তুর চেহারা, একদিকে রহস্য-সন্ধানকারী সূক্ষ্ম-ঘ্রাণ তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি খরদন্ত চঞ্চলকৌতূহল, সেটা ইঁদুর, সেইটেই বাহন; আর একদিকে বন্ধনে বশীভূত বন্যশক্তি, যা দুর্গমের উপর দিয়ে বাধা ডিঙিয়ে চলে, সেই হ'ল যান,—সিদ্ধির যান-বাহনযোগে মানুষ কেবলি এগিয়ে চলচে। তার ল্যাবরেটরিতে ছিল ইঁদুর, আর তার য়েরোপ্লেনের মোটরে আছে হাতী। ইঁদুরটা চুপিচুপি সন্ধান বাৎলিয়ে দেয়, কিন্তু ঐ হাতিটাকে কায়দা ক'রে নিতে মানুষের অনেক দুঃখ। তা হোক, মানুষ দুঃখকে দেখে হার মানে না, তাই সে আজ দ্যুলোকের রাস্তায় যাত্রা আরম্ভ করলে। কালিদাস রাঘবদের কথায় বলেচেন, তাঁরা "আনাকরথবর্ত্মনাম্"—স্বর্গ পর্য্যন্ত তাঁদের রথের রাস্তা। যখন একথা কবি বলেচেন, তখন মাটির মানুষের মাথায় এই অদ্ভুত চিন্তা ছিল যে, আকাশে না চল্‌লে মানুষের সার্থকতা নেই। সেই চিন্তা ক্রমে আজ রূপ ধ'রে বাইরের আকাশে পাখা ছড়িয়ে দিলে। কিন্তু রূপ যে ধর্‌ল সে মৃত্যুঞ্জয়কারী ভীষণ তপস্যায়। মানুষের বিজ্ঞান-বুদ্ধি সন্ধান করতে জানে এই যথেষ্ট নয়; মানুষের কীর্ত্তিবুদ্ধি সাহস করতে জানে এইটে তার সঙ্গে যখন মিলেছে, তখনি সাধকদের তপঃসিদ্ধির পথে পথে ইন্দ্রদেব যে-সব বাধা রেখে দেন সেগুলো ধূলিসাৎ হয়।

তীরে দাঁড়িয়ে মানুষ সামনে দেখ্‌লে সমুদ্র। এত বড়ো বাধা কল্পনা করাই যায় না। চোখে দেখ্‌তে পায় না এর পার, তলিয়ে পায় না এর তল। যমের মোষের মতো কালো—দিগন্তপ্রসারিত বিরাট একটা নিষেধ কেবলি তরঙ্গ-তর্জ্জনী তুলচে। চিরবিদ্রোহী মানুষ বল্‌লে, নিষেধ মান্‌ব না। বজ্রগর্জ্জনে জবাব এলো, না মানো তো মর্‌বে। মানুষ তার এতটুকুমাত্র বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তুলে বল্‌লে, মরি তো মর্‌ব! এই হোলো জাত-বিদ্রোহীদের উপযুক্ত কথা। জাত-বিদ্রোহীরাই চিরদিন জিতে এসেচে। একেবারে গোড়া থেকেই প্রকৃতির শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে মানুষ নানা ভাবেই বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে দিলে। আজ পর্য্যন্ত তাই চল্‌চে। মানুষদের মধ্যে যারা যত খাঁটি বিদ্রোহী, যারা বাহ্য শাসনের সীমা-গণ্ডি যতই মান্‌তে চায় না, তাদের অধিকার ততই বেড়ে চলতে থাকে।

যেদিন সাড়ে তিন হাত মানুষ স্পর্দ্ধা ক'রে বল্‌লে, এই সমুদ্রের পিঠে চড়ব, সেদিন দেবতারা হাস্‌লেন না,—তাঁরা এই বিদ্রোহীর কানে জয়-মন্ত্র পড়িয়ে দিয়ে অপেক্ষা ক'রে রইলেন। সমুদ্রের পিঠ আজ আয়ত্ত হয়েচে, সমুদ্রের তলটাকেও কায়দা করা সুরু হোলো। সাধনার পথে ভয় বারবার ব্যঙ্গ ক'রে উঠ্‌চে, বিদ্রোহীর অন্তরের মধ্যে উত্তর-সাধক অবিচলিত ব'সে প্রহরে প্রহরে হাঁক দিচ্চে, "মা ভৈঃ"।

কালকের চিঠিতে ক্রন্দসীর কথা বলেচি, অন্তরিক্ষে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্‌চে সত্তার ক্রন্দন গ্রহে নক্ষত্রে। এই সত্তা বিদ্রোহী, অসীম অব্যক্তের সঙ্গে তার নিরন্তর লড়াই। বিরাট অপ্রকাশের তুলনায় সে অতি সামান্য, কিন্তু অন্ধকারের অন্তহীন পারাবারের উপর দিয়ে ছোটো ছোটো কোটি কোটি আলোর তরী সে ভাসিয়ে দিয়েচে—দেশ কালের বুক চিরে অতল স্পর্শের উপর দিয়ে তার অভিযান। কিছু ডুবচে কিছু ভাসচে, তবু যাত্রার শেষ নেই।

প্রাণ তার বিদ্রোহের ধ্বজা নিয়ে পৃথিবীতে অতি দুর্ব্বলরূপে একদিন দেখা দিয়েছিল। অতি প্রকাণ্ড, অতি কঠিন, অতি গুরুভার অপ্রাণ চারদিকে গদা উদ্যত ক'রে দাঁড়িয়ে, আপন ধূলোর কয়েদ-খানায় তাকে দ্বার জানলা বন্ধ ক'রে প্রচণ্ড শাসনে রাখতে চায়। কিন্তু বিদ্রোহী প্রাণ কিছুতেই দমে না,—দেয়ালে দেয়ালে কত জায়গায় কত ফুটোই করচে তার সংখ্যা নেই, কেবলি আলোর পথ নানাদিক দিয়েই খুলে দিচ্চে।

সত্তার এই বিদ্রোহ-মন্ত্রের সাধনায় মানুষ যতদূর এগিয়েচে এমন আর-কোনো জীব না। মানুষের মধ্যে যার বিদ্রোহ-শক্তি যত প্রবল যত দুর্দ্দমনীয় ইতিহাসকে ততই সে যুগ হতে যুগান্তরে অধিকার করচে, শুধু সত্তার ব্যাপ্তি দ্বারা নয়, সত্তার ঐশ্বর্য্য দ্বারা।

এই বিদ্রোহের সাধনা দুঃখের সাধনা—দুঃখই হচ্চে হাতী, দুঃখই হচ্চে সমুদ্র। বীর্য্যের দর্পে এর পিঠে যারা চড়ল তারাই বাঁচ্‌ল, ভয়ে অভিভূত হ'য়ে এর তলায় যারা পড়েচে তারা মরেচে। আর যারা এ'কে এড়িয়ে শস্তার

ফল লাভ করতে চায় তারা নকল ফলের ছদ্মবেশে ফাঁকির বোঝার ভারে মাথা হেঁট ক'রে বেড়ায়। আমাদের ঘরের কাছে সেই জাতের মানুষ অনেক দেখা যায়। বীরত্বের হাঁক ডাক করতে তারা শিখেচে কিন্তু সেটা যথাসম্ভব নিরাপদে করতে চায়। যখন মার আসে তখন নালিশ ক'রে বলে, বড়ো লাগ্‌চে। এরা পৌরুষের পরীক্ষাশালায় ব'সে বিলিতি বই থেকে তার বুলি চুরি করে, কিন্তু কাগজের পরীক্ষা থেকে যখন হাতের পরীক্ষার সময় আসে তখন প্রতিপক্ষের অনৌদার্য্য নিয়ে মামলা তুলে বলে,—ওদের স্বভাব ভালো নয়, ওরা বাধা দেয়।

মানুষকে নারায়ণ সখা ব'লে তখনি সম্মান করেচেন যখন তাকে দেখিয়েচেন তাঁর উগ্ররূপ, তাকে দিয়ে যখন বলিয়েছেন, দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্,—যখন মানুষ প্রাণ মন দিয়ে এই স্তব করতে পেরেছে :—

অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ—

তুমিই অনন্তবীর্য্য, তুমিই অমিতবিক্রম, তুমিই সমস্তকে গ্রহণ করো, তুমিই সমস্ত। ইতি ৩রা শ্রাবণ, ১৩৩৪।

৪

কাল সকালেই পৌঁছব সিঙাপুরে। তার পর থেকে আমার ডাঙার পালা। এই যে চল্‌চে আমার মনে মনে বকুনি, এটাতে খুবই বাধা হবে। অবকাশের অভাব হবে ব'লে নয়, মন এই ক'দিন যে-কক্ষে চলছিল সে কক্ষ থেকে ভ্রষ্ট হবে ব'লে। কিসের জন্যে? সর্ব্বসাধারণ ব'লে যে একটা [illegible] আছে তারই আকর্ষণে।

লেখবার সময় তার কোনো আকর্ষণ যে একটুও মনের মধ্যে থাক্‌বে না তা হ'তেই পারে না। কিন্তু তার নিকটের আকর্ষণটা লেখার পক্ষে বড়ো ব্যাঘাত। কাছে যখন সে থাকে তখন সে কেবলি ঠেলা দিয়ে দিয়ে দাবী করতে থাকে। দাবী করে তারই নিজের মনের কথাটাকে। প্রকাণ্ড একটা বাইরের ফরমাস কলমটাকে ভিতরে ভিতরে টান মারে। বল্‌তে চাই বটে তোমাকে গ্রাহ্য করিনে, কিন্তু হেঁকে উঠে বলার মধ্যেই গ্রাহ্য করাটা প্রমাণ হয়।

আসল কথা, সাহিত্যের শ্রোতৃ-সভায় আজ সর্ব্বসাধারণই রাজাসনে। এ সত্যটাকে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়ে লিখতে বসা অসম্ভব। প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে উড়িয়ে দেবেই বা কেন? এমন সময় কবে ছিল যখন সাহিত্য সমস্ত মানব-সাধারণের জন্যেই ছিল না?

কথাটা একটু ভেবে দেখবার। কালিদাসের মেঘদূত মানব-সাধারণের জন্যেই লেখা আজ তার প্রমাণ হ'য়ে গেছে। যদি কোনো বিশিষ্ট দলের জন্যে লেখা হোতো তাহলে সে দলও থাকৃত না আর মেঘদূতও যেত তারি সঙ্গে অনুমরণে। কিন্তু এখন যাকে পাব্লিক বল্‌চি কালিদাসের সময় সেই পাব্লিক অত্যন্ত গা-ঘেঁষা হ'য়ে শ্রোতারূপে ছিল না। যদি থাকৃত তাহ'লে যে মানব-সাধারণ শত শত বৎসরের মহাক্ষেত্রে সমাগত তাদের পথ তারা অনেকটা পরিমাণে আট্‌কে দিত।

এখনকার পাব্লিক একটা বিশেষ কালের দানাবাঁধা সর্ব্বসাধারণ। তার মধ্যে খুব নিরেট হ'য়ে তাল পাকিয়ে আছে এখনকার কালের রাষ্ট্র-নীতি, সমাজ-নীতি, ধর্ম্ম-নীতি, এখনকার কালের বিশেষ রুচি প্রবৃত্তি এবং আরো কত কি। এই সর্ব্বসাধারণ যে, মানব-সাধারণের প্রতিরূপ তা বলা চলবে না। এর ফরমাস যে একশো বছর পরের ফরমাসের সঙ্গে মিল্‌বে না সে কথা জোর ক'রেই বলতে পারি। কিন্তু এই উপস্থিত কালের সর্ব্বসাধারণ কানের খুব কাছে এসে জোর গলায় হুও দিচ্চে বাহবা দিচ্চে।

উপস্থিত কালের সঙ্কীর্ণ পরিধির তুলনাতেও এই হুও বাহবার স্থায়িত্ব অকিঞ্চিৎকর। পাব্লিক মহারাজ আজ দুই চোখ লাল ক'রে যে কথাটাকে প্রত্যাখ্যান করেচে আস্‌চে কাল সেইটেকেই এমনি চড়া গলায় ব্যবহার করে যেন সেটা তার নিজেরই চিরকালের চিন্তিত কথা। আজ যে কথা শুনে তার দুই গাল বেয়ে চোখের জল ব'য়ে গেল, আস্‌চে কাল সেটাকে নিয়ে হাসাহাসি করবার সময় নিজের গদগদ চিত্তের পূর্ব্ব ইতিহাসটি সম্পূর্ণ বে-কবুল যায়।

জাভা-যাত্রীর পত্র

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইংরেজ বেণের আপিসঘর গুদামঘরের আশে পাশে হঠাৎ যখন কলকাতা সহরটা মাথাঝাড়া দিয়ে উঠল তখন সেখানে এই নতুন-গড়া দোকান-পাড়ায় এক পাব্লিক দেখা দিলে। অন্তত তার এক ভাগের চেহারা হুতুম পেঁচার নকসায় উঠেচে। তারি ফরমাসের ছাপ পড়েচে দাশুরায়ের পাঁচালিতে। ঘন ঘন অনুপ্রাস তপ্ত খোলার উপরকার খইয়ের মত পট্‌পট্‌ শব্দে ফুটে ফুটে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল—

ভাবো শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে
নিতান্ত কৃতান্ত ভয়ান্ত হবে ভবে।

চারিদিকে হায় হায় শব্দে সভা তোলপাড়। দুই কানে হাত-চাপা তারস্বরে দ্রুত লয়ে গান উঠল—

ওরে রে লক্ষণ, একি অলক্ষণ
বিপদ ঘটেচে বিলক্ষণ।
অতি অগণ্য কাজে, অতি জঘন্য সাজে
ঘোর অরণ্য মাঝে কত কাঁদিলাম—ইত্যাদি।

দোকান-পাড়ার জনসাধারণ খুসি হ'য়ে নগদ বিদায় করলে। অবকাশের সম্পদকে অবকাশের শিক্ষাযোগে ভোগ করবার শক্তি যার ছিল না সেই ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাটের পাব্লিককেই মাথা-গুনতির জোরে মানব-সাধারণের প্রতিনিধি ব'লে মেনে নিতে হবে নাকি? বস্তুত এই জনসাধারণই দাশুরায়ের প্রতিভাকে বিশ্ব-সাধারণের মহা সভায় উত্তীর্ণ হ'তে বাধা দিয়েছিল।

অথচ ময়মনসিং থেকে যে-সব গাথা সংগ্রহ করা হয়েচে তাতে সহজেই বেজে উঠ্‌চে বিশ্ব-সাহিত্যের সুর। কোনো সহরে পাব্লিকের দ্রুত ফরমাসের ছাঁচে ঢালা সাহিত্য ত সে নয়। মানুষের চিরকালের সুখ দুঃখের প্রেরণায় লেখা সেই গাথা। যদি বা ভিড়ের মধ্যে গাওয়া হয়েও থাকে তবু এ ভিড় বিশেষ কালের বিশেষ ভিড় নয়। তাই এ সাহিত্য সেই ফসলের মতো যা গ্রামের লোক আপন মাটির বাসনে ভোগ ক'রে থাকে বটে তবুও তা বিশ্বেরই ফসল,—তা ধানের মঞ্জরী।

যে-কবিকে আমরা কবি ব'লে সম্মান ক'রে থাকি তার প্রতি সম্মানের মধ্যে এই সাধু-বাদটুকু থাকে যে, তার একলার কথাই আমাদের সকলের কথা। এই জন্যেই কবিকে একলা বল্‌তে দিলেই সে সকলের কথা সহজে বল্‌তে পারে। হাটের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সেই দিনকার হাটের লোকের মনের কথা যেমন-তেমন ক'রে মিলিয়ে দিয়ে তাদের সেইদিনকার বহু-মুণ্ডের মাথানাড়া গুন্‌তির জোরে আমরা যেন আপন রচনাকে কৃতার্থ মনে না করি, যেন আমাদের এই কথা মনে করবার সাহস থাকে যে, সাহিত্যের গণনা-তত্ত্বে এক অনেক সময়েই হাজারের চেয়ে সংখ্যায় বেশি হ'য়ে থাকে।

এইবার আমার জাহাজের চিঠি তার অন্তিম পংক্তির দিকে হেলে পড়ল। বিদায় নেবার পূর্ব্বে তোমার কাছে মাপ চাওয়া দরকার মনে কর্‌চি। তার কারণ চিঠি লিখব ব'লে বসলুম কিন্তু কোনমতেই চিঠি লেখা হ'য়ে উঠ্‌ল না। এর থেকে আশঙ্কা হচ্চে আমার চিঠি লেখবার বয়স পেরিয়ে গেছে। প্রতিদিনের স্রোতের থেকে প্রতি দিনের ভেসে আসা কথা ছেঁকে তোলবার শক্তি এখন আমার নেই। চল্‌তে চল্‌তে চারদিকের পরিচয় দিয়ে যাওয়া এখন আমার দ্বারা আর সহজে হয় না। অথচ এক সময়ে এ শক্তি আমার ছিল। তখন অনেককে অনেক চিঠিই লিখেচি। সেই চিঠিগুলি ছিল চল্‌তি কালের সিনেমা ছবি। তখন ছিল মনের পটটা বাইরের সমস্ত আলো ছায়ার দিকে মেলে দেওয়া। সেই সব ছাপের ধারায় চল্‌ত চিঠি। এখন বুঝিবা বাইরের ছবির ফোটোগ্রাফটা বন্ধ হ'য়ে গিয়ে মনের ধ্বনির ফোনোগ্রাফটাই সজাগ হ'য়ে উঠেচে। এখন হয়তো দেখি কম, শুনি বেশি।

মানুষ তো কোন একটা জায়গায় খাড়া হ'য়ে দাঁড়িয়ে নেই। এই জন্যেই চলচ্চিত্র ছাড়া তার যথার্থ চিত্র হ'তেই পারে না। প্রবহমান ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে চলমা[illegible] পরিচয় মানুষ দিতে থাকে। যারা আপন লোক, [illegible] তারা সেই পরিচয়টা পেতে ইচ্ছে করে। বিদেশে নূতন নূতন ধাবমান অবস্থা ও ঘটনার চঞ্চল ভূমি[illegible] উপরে প্রকাশিত আত্মীয় লোকের ধারাবাহিক পরিচয়ের ইচ্ছা স্বাভাবিক। চিঠি সেই ইচ্ছা পূরণ করবার জন্যেই।

কিন্তু সকল প্রকার রচনাই স্বাভাবিক শক্তির [illegible]

ছন্দে। চিঠি-রচনাও তাই। আমাদের দলের মধ্যে আছেন সুনীতি। আমি তাঁকে নিছক পণ্ডিত ব'লেই জানতুম্। অর্থাৎ আস্ত জিনিষকে টুক্‌রো করা ও টুক্‌রো জিনিষকে জোড়া দেওয়ার কাজেই তিনি হাত পাকিয়েচেন ব'লে আমার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু এবার দেখ্‌লুম বিশ্ব বলতে যে ছবির স্রোতকে বোঝায়, যা ভিড় ক'রে ছোটে এবং এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকেনা তাকে তিনি তালভঙ্গ না ক'রে মনের মধ্যে দ্রুত এবং সম্পূর্ণ ধরতে পারেন আর কাগজে-কলমে সেটা দ্রুত এবং সম্পূর্ণ তুলে নিতে পারেন। এই শক্তির মূলে আছে বিশ্ব-ব্যাপারের প্রতি তাঁর মনের সজীব আগ্রহ। তাঁর নিজের কাছে তুচ্ছ ব'লে কিছুই নেই, তাই তাঁর কলমে তুচ্ছও এমন একটি স্থান পায় যাতে তাকে উপেক্ষা করা যায় না। সাধারণত একথা বলা চলে যে শব্দ-তত্ত্বের মধ্যে যারা তলিয়ে গেছে শব্দ-চিত্র তাদের এলেকার সম্পূর্ণ বাইরে, কেননা চিত্রটা একেবারে উপরের তলায়। কিন্তু সুনীতির মনে সুগভীর তত্ত্ব ভাসমান চিত্রকে ডুবিয়ে মারেনি এই বড়ো অপূর্ব্ব। সুনীতির নীরন্ধ্র চিঠিগুলি তোমরা যথা সময়ে পড়তে পাবে—দেখবে এগুলো একেবারে বাদশাই চিঠি। এতে চিঠির ইম্পিরিয়ালিজম্; বর্ণনা সাম্রাজ্য সর্ব্বগ্রাহী, ছোট বড়ো কিছুই তার থেকে বাদ পড়েনি। সুনীতিকে উপাধি দেওয়া উচিত, লিপি-বাচস্পতি কিম্বা লিপি-সার্ব্বভৌম, কিম্বা লিপি-চক্রবর্ত্তী। ইতি ৩রা শ্রাবণ, ১৩৩৪। নাগপঞ্চমী।

ভানুসিংহের পত্রাবলী

পত্রের পাত্র

১। ভানুসিংহ

২। একটি দশমবর্ষীয়া বালিকা

২৭

শান্তিনিকেতন

আজকের তোমাকে সব খবরগুলি দেওয়া যাক। অনেক দিন পরে আজ আমার ইস্কুল খুলেচে, আজ থেকে ইস্কুল মাষ্টারি ফের সুরু হ'ল। আজ সকালে তিনটে ক্লাস নিয়েছি। কিন্তু ছেলেরা সব আসেনি, খুব কম এসেচে। বোধ হয় ব্যামোর ভয়ে আস্‌ছেনা। আমার বৌমা হঠাৎ কোথায় হারিয়ে গেছেন জিজ্ঞাসা করেছো। তিনি পাড়াতেই আছেন। আমি যে-ঘরে থাকি—তার সামনে এক লাল রাস্তা আছে, তার ঠিক ওধারেই এক দোতলা ইমারৎ তৈরি হচ্ছে—তারই একতলা ঘরে তিনি বাস করেন। শ্রীমতী তুলসীমঞ্জরী তাঁকে অচ্ছী অচ্ছী কাহনী শুনাতী হৈ, কিন্তু আমি সেটা আন্দাজে বল্‌চি। কিছুকাল থেকে তার কণ্ঠস্বরও শুনিনি, তাকে দেখতেও পাইনি—তাই আশঙ্কা হচ্চে সে হয়ত তার সেই রূপকথার "কহ্নু"র মধ্যে ঢুকে পড়েচে। যাই হোক পাড়ার সমস্ত খবর রাখবার সময় আমি পাইনে, আমি কখনওবা আমার সেই কোণের ডেস্কে কখনওবা সেই লাইব্রেরি ঘরের টেবিলে ঘাড় হেঁট ক'রে কলম চালিয়ে দিনযাপন করচি। সাম্‌নেকার খাতা-পত্রের বাইরে যে-একটি প্রকাণ্ড জগৎ আছে, তার প্রতি ভাল ক'রে চোখ তুলে যে দেখা সে আর দিনের আলো থাকতে ঘ'টে উঠ্‌ছেনা। সন্ধ্যার পরে সেই নীচের বারান্দায় খাবার টেবিলটা ঘিরেই বৈঠক হয়, সেখানে তর্ক হয় বিতর্ক হয় এবং মাঝে মাঝে গানও হ'য়ে থাকে। কারণ আজকাল ফের আবার দুটা একটা ক'রে গান জম্‌চে। সন্ধ্যার পরে সেই আমার কোণের বিছানায় তাকিয়া ঠেস্ দিয়ে কেরোসিনের আলোয় মৃদুমন্দস্বরে খাতা পেন্‌সিল হাতে গান করি, আর পশ্চিমের উন্মুক্ত বাতায়ন থেকে—তুমি ভাব্‌ছ সেই বাতায়ন থেকে স্বর্গের অপ্সরীরা আমার গান শুন্‌তে আসেন—ঠিক তা নয়—সেই উন্মুক্ত বাতায়ন থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে কীট-পতঙ্গ আস্‌তে থাকে,—তাও যদি তারা আমার গান শুনে মুগ্ধ হ'য়ে আস্‌ত, তাহলেও আমি মনে মনে একটু অহঙ্কার করতে পারতুম,—তারা আসে ঐ ডীট্‌জ্‌ লণ্ঠনের কেরোসিন আলোটা লক্ষ্য ক'রে। উন্মুক্ত বাতায়ন থেকে হঠাৎ এক-একবার—আন্দাজ ক'রে বল দেখি কি শুন্‌তে পাই? তুমি ভাব্‌চ নক্ষত্রলোক থেকে অনাহত বীণার অশ্রুত গীত-ধ্বনি? তা নয়; এক সঙ্গে ভোঁদা, দামু, টম, রঞ্জু এবং এ মুল্লুকের যত দিশি কুকুরের তুমুল চীৎকার-শব্দ। যদি এরা আমার এই গান শুনে বাহবা দেবার জন্যে এই আওয়াজ করত, তাহলেও বুঝতুম কবির গানে চতুষ্পদ জন্তুরা পর্য্যন্ত মুগ্ধ—কিন্তু তা নয়, তারা স্বজাতি আগন্তুকের প্রতি অসহিষ্ণুতা প্রকাশ ক'রে স্বর্গ-মর্ত্ত্যকে চঞ্চল ক'রে তোলে—কবির গানে তারা কর্ণপাতও করেনা। যাই হোক, ভূতলের কুকুর থেকে আকাশের তারা পর্য্যন্ত সবাই যদিচ উদাসীন

তবুও দুটো একটা করে গান জমচে। ১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩১৫।

২৮

শান্তিনিকেতন

আজ দুপুরবেলা যখন খেতে বসেচি, এমন সময়—রোসো আগে ব'লেনি কি খাচ্ছিলুম—খুব প্রকাণ্ড মোটা একটা রুটি—কিন্তু মনে কোরোনা তার সবটাই আমি খাচ্ছিলুম। রুটিটাকে যদি পূর্ণিমার চাঁদ ব'লে ধ'রে নেও তাহলে আমার টুক্‌রোটি দ্বিতীয়ার চাঁদের চেয়ে বড় হবে না। সেই রুটির সঙ্গে কিছু ডাল ছিল, আর ছিল চাট্‌নি আর একটা তরকারিও ছিল। যাহোক্ ব'সে ব'সে রুটি চিবোচ্ছি এমন সময়—রোসো আগে ব'লে নিই রুটি ডাল চাট্‌নি এল কোথা থেকে?—তুমি বোধ হয় জানো আমার এখানে প্রায় পঁচিশজন গুজরাটি ছেলে আছে—আমাকে খাওয়াবে ব'লে তাদের হঠাৎ ইচ্ছা হয়েছিল। তাই আজ সকালে আমার লেখা সেরে স্নানের ঘরের দিকে যখন চলেচি এমন সময় দেখি একটা গুজরাটি ছেলে থালা হাতে ক'রে আমার দ্বারে এসে হাজির। যাহোক্, নীচের ঘরে টেবিলে ব'সে ব'সে রুটির টুক্‌রো ভাঙ্‌চি আর খাচ্ছি, আর তার সঙ্গে একটু একটু চাট্‌নিও মুখে দিচ্ছি এমন সময়—রোসো, আগে ব'লে নিই খাবার কি রকম হয়েছিল। রুটিটা বেশ শক্ত-গোছের ছিল; যদি আমাকে সম্পূর্ণ চিবিয়ে সবটা খেতে হ'ত তাহলে আমার একলার শক্তিতে কুলিয়ে উঠত না, মজুর ডাকতে হ'ত। কিন্তু ছিঁড়তে যত শক্ত মুখের মধ্যে ততটা নয়। আবার রুটিটা মিষ্টি ছিল; ডাল তরকারি দিয়ে মিষ্টি রুটি খাওয়া আমাদের আইনে লেখে না, কিন্তু খেয়ে দেখা গেল যে, খেলে যে বিশেষ অপরাধ হয় তা নয়। সেই রুটি খাচ্ছি ঠিক এমন সময়—রোসো, ওর মধ্যে একটা কথা বলতে একেবারেই ভুলে গেছি, দুটো পাঁপর-ভাজাও ছিল; সে দুটো, আমি যাকে ব'লে থাকি সুশ্রাব্য—অর্থাৎ খেতে বেশ ভাল লাগে। শুনে তুমি হয়ত আশ্চর্য্য হবে এবং আমাকে হয়ত মনে মনে পেটুক ঠাউরে রেখে দেবে—এবং যখন আমি কাশীতে যাব তখন হয়ত সকালে বিকালে আমাকে চাট্‌নি দিয়ে কেবলি পাঁপর-ভাজা খাওয়াবে। তবু সত্য গোপন করব না, দুখানা পাঁপর-ভাজা সম্পূর্ণই খেয়েছিলুম। যাহোক্ সেই পাঁপর মচ্‌মচ্‌ শব্দে খাচ্চি এমন সময়—রোসো, মনে ক'রে দেখি সে সময়ে কে উপস্থিত ছিল। তুমি ভাবচ তোমার বউমা তোমার ভানুদাদার পাঁপর-ভাজা খাওয়া দেখে অবাক হ'য়ে হতবুদ্ধি হ'য়ে টেবিলের এক কোণে ব'সে মনে মনে ঠাকুর-দেবতার নাম করছিলেন, তা নয়—তিনি তখন কোথায় আমি জানি নে। আর কমল? সে-ও যে তখন কোথায় ব'সে রোদ পোয়াচ্ছিল তা আমি জানি নে। তাহলে দেখচি টেবিলে আমি একলা ছাড়া কেউই ছিল না। যাই হ'ক দুখানা পাঁপর-ভাজার পরে প্রায় সিকিটুক্‌রো রুটির পৌনে চার আনা যখন শেষ করেছি এমন সময়—হাঁ, হাঁ, একটা কথা বলতে ভুলে গেচি—আমি লিখেচি খাবার সময়ে কেউ ছিল না, কথাটা সত্য নয়। ভোঁদা কুকুরটা একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে লালায়িত জিহ্বায় চিন্তা করছিল যে, আমি যদি মানুষ হতুম তা হ'লে সকাল থেকে রাত্তির পর্য্যন্ত ঐ রকম মুচ্‌মুচ্‌ মুচ্‌মুচ্‌ মুচ্‌মুচ্‌ ক'রে কেবলি পাঁপর-ভাজা খেতুম; ইতিহাসও পড়তুম না, ভূগোলও পড়তুম না,—শিশু মহাভারত চারুপাঠের কোনো ধার ধারতুম না। যাহোক যখন দুখানা পাঁপর-ভাজা এবং কিছু রুটি ও চাট্‌নি খেয়েছি এমন সময়,—কিন্তু ডালটা খাইনি, সেটা নারকোল দিয়ে এবং অনেকখানি কুয়োর জল দিয়ে তৈরি করেছিল তাতে ডালের চেয়ে কুয়োর জলের স্বাদটাই বেশি ছিল, আর তরকারিটাও খাই নি—কেননা আমি মোটের উপর তরকারি প্রভৃতি বড় বেশি খাই নে। যাই হোক্ যখন রুটি এবং পাঁপর-ভাজা খাওয়া প্রায় শেষ হয়েচে এমন সময়ে ডাক-হরকরা আমার হাতে কাশীর ছাপ মারা একখানা চিঠি দিয়ে গেল।

২৯

শান্তিনিকেতন

দেরি ক'রে তোমার চিঠির উত্তর দিয়েছি: তুমি আমাকে এত বড় অপবাদ দেবে আর আমি তাই যে নীরবে

সহ্য ক'রে যাব এতবড় কাপুরুষ আমাকে পাওনি। কখ্খনো দেরী করিনি, এ আমি তোমার মুখের সাম্নে বল্‌চি। এতে তুমি রাগই কর আর যাই কর। দেরি করিনি, দেরি করিনি, দেরি করিনি,—এই তিনবার খুব চেঁচিয়েই ব'লে রাখলুম—দেখি তুমি এর জবাব কি দাও। যত দোষ সব আমার, আর তোমার অগস্ত্যকুণ্ডের পোষ্টমাষ্টারটি বুঝি আটত্রিশটা গুণের আধার? ভালো কথা মনে পড়ল, তোমাকে শেষবারে চিঠি লেখার পর আমি খোঁজ নিয়ে শুন্‌লুম শ্রীমতী তুলসী মঞ্জরীকে বৌমা বিদায় ক'রে দিয়েচেন। কি অন্যায় দেখ দেখি! তার অপরাধটা কি? না, সে যতটা কাজ করে তার চেয়ে কথা কয় বেশী। তাই যদি হয়, তাহলে তোমার ভানুদাদার কি হবে বলত? আমিত জন্মকাল থেকে কেবল কথাই ক'য়ে আসচি, তুলসীমঞ্জরী যেটুকু কাজ করেচে আমি তাও করিনি। বৌমা তাই রেগে মেগে হঠাৎ যদি আমার খোরাকি বন্ধ ক'রে দেন তাহলে আমার কি দশা হবে? যাই হোক, এই কথাটা নিয়ে এখন থেকে ভাবনা ক'রে কোনও লাভ নেই—সময় যখন উপস্থিত হবে তখন তোমাকে খবর দেওয়া যাবে, আমার যা কপালে থাকে তাই হবে। কিন্তু তোমার গুরুমা তোমাকে যে-ছাঁদে বাংলা চিঠি লেখাতে চান আমাকে সেই ছাঁদে লিখ্‌লে চল্‌বেনা—তা আমার নামের আগে শুধু না-হয় একটা মাত্র "শ্রী"ই দেবে—কিম্বা "শ্রী" নাইবা দিলে। আমার বিলেত যাবার একটা কথা উঠ্‌চে, কিন্তু শুধু কথায় যদি বিলেত যাওয়া যেত তাহলে আমার ভাবনা ছিল না; কথা একলা যদি না জোটাতে পারতুম তাহলে তুলসীমঞ্জরীকে ডেকে পাঠাতুম। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এই যে, বিলেত যেতে জাহাজের দরকার করে, যুদ্ধের উৎপাতে সেই জাহাজের সংখ্যা ক'মে গেছে অথচ যাবার লোকের সংখ্যা বেড়ে গেছে—তাই এখন

"ঘাটে ব'সে আছি আনমনা
যেতেছে বহিয়া সুসময়।"

এদিকে রোজ আমার একটা ক'রে নতুন গান বেড়েই চলেচে। গানের সুবিধা এই-যে তার জন্যে জাহাজের দরকার হয় না, কথাতেই অনেকটা কাজ হয়। প্রায় পনেরোটা গান শেষ হ'য়ে গেল। তুমি দেরি ক'রে যদি আসো তাহলে ততদিনে এত গান জমে উঠ্‌বে যে, শুন্‌তে শুন্‌তে তোমার চারুপাঠ তৃতীয়ভাগ আর পড়া হবে না—তোমার শিশু মহাভারত বৃদ্ধ মহাভারত হ'য়ে উঠ্‌বে। তুমি হয়ত এম্ এ পাশ করার সময় পাবে না। ইতি ২৪ অগ্রহায়ণ, ১৩২৫।

৩০

শান্তিনিকেতন

তুমি ভাবচ মজা কেবল তোমাদেরই হয়েচে, তাই তোমাদের ইস্কুলের প্রাইজের মজার ফর্দ আমাকে লিখে পাঠিয়েচে, কিন্তু এত সহজে আমাকে হার মানাতে পারচ না। মজা আমাদের এখানেও হয় এবং যথেষ্ট বেশি ক'রেই হয়। আচ্ছা তোমাদের প্রাইজে কত লোক জমেছিল? পঞ্চাশ জন? কিন্তু আমাদের এখানে মেলায় অন্ততঃ দশ হাজার লোক ত হয়েইছিল। তুমি লিখেচ একটি ছোট মেয়ে তার দিদির কাছে গিয়ে খুব চিৎকার ক'রে তোমাদের সভা খুব জমিয়ে তুলেছিল—আমাদের এখানকার মাঠে যা চিৎকার হয়েছিল তাতে কত রকমেরই আওয়াজ মিলেছিল, তার কি সংখ্যা ছিল? ছোট ছেলের কান্না, বড়দের হাঁকডাক, ডুগ্‌ডুগির বাদ্য, গোরুর গাড়ির ক্যাঁচ্‌কোঁচ্, যাত্রার দলের চিৎকার, তুবড়ীবাজির সোঁ সোঁ, পটকার ফুট্ ফাট্, পুলিশ চৌকীদারের হৈ হৈ, হাসি, কান্না, গান, চেঁচামেচি, ঝগড়া ইত্যাদি ইত্যাদি। ৭ই পৌষে মাঠে খুব বড় হাট বসেছিল, তাতে গালার খেলনা, কলের মোরব্বা, মাটির পুতুল, তেলে-ভাজা ফুলুরি, চিনে বাদাম ভাজা প্রভৃতি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য জিনিষ বিক্রি হ'ল। এক এক পয়সা দিয়ে ছেলেমেয়েরা সব নাগরদোলায় দুল্‌ল; চাঁদোয়ার নীচে নীলকণ্ঠ মুখুজ্যের কংসবধ যাত্রার পালা গান হচ্ছিল—সেইখানে একেবারে ঠেলাঠেলি ভিড়। তারপরে ৯ই পৌষে আমাদের মেয়েরা আবার এক মেলা করেছিলেন—তাতে সিঙাড়া আলুর-দমের দোকান বসিয়েছিলেন—এক একটা আলুর-দম এক-এক পয়সায় বিক্রি হ'ল। সুকেশী বউমা চিনেবাদামের পুতুল গড়েছিলেন, তার এক-একটা

ছ-আনা দামে বিক্রি হ'য়ে গেল। কমল কাদা দিয়ে একটা ঘর বানিয়েছিল—তার খড়ের চাল, চারিদিকে মাটির পাঁচিল, আঙিনায় শিব-স্থাপন করা আছে—সেটা কেউ কিনতে চায় না, তাই কমল আমাকে সেটা জোর ক'রে তিন টাকায় বিক্রি করেচে। ভেবে দেখ কি রকম ভয়ানক মজা! ছোট মেয়েরা এক টুকরো নেকড়া ছিঁড়ে তার চারিদিকে পাড় সেলাই ক'রে আমার কাছে এনে বল্লে, "এটা রুমাল, এর দাম আট আনা, আপনাকে নিতেই হবে"—ব'লে সেটা আমার পকেটে পুরে দিলে—এমন ভয়ানক মজা! ওঁদের বাজারে এই রকম শ্রেণীর সব ভয়ানক মজা হ'য়ে গেছে—তোমরা যে-সব প্রাইজ পেয়েছ সে এর কাছে কোথায় লাগে! তার পরে মজা, মেলা যখন ভেঙে গেল সমস্ত রাত ধ'রে চেঁচাতে চেঁচাতে বেসুরো গান গাইতে গাইতে দলে দলে লোক ঠিক আমার শোবার ঘরের সামনের রাস্তা দিয়েই যেতে লাগ্‌ল—মজায় একটুও ঘুম হ'ল না। নীচে যতগুলো কুকুর ছিল সবাই মিলে উর্দ্ধশ্বাসে চেঁচাতে লাগ্‌ল, এমন মজা! তারপরে কলকাতার অনেক মেয়ে তাঁদের ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে এসেছিলেন—তাঁদের কারো কাশী কারো জ্বর। নিশ্চয়ই তোমাদের প্রাইজে এমন ধুমধাম গোলমাল কাশী সর্দ্দি অসুখ বিসুখ আট আনার রুমাল বেচা প্রভৃতি হয়নি—অতএব আমারই জিৎ রইল।

৩১

শান্তিনিকেতন

নাঃ, তোমার সঙ্গে পারলুম না—হার মানলুম। তুমি যে ইস্কুলে যেতে যেতে একেবারে রাস্তার মাঝখানে গাড়ি সুদ্ধ, একগাড়ী মেয়ে সুদ্ধ, তোমাদের মোটা দিদিমণি সুদ্ধ একেবারে উল্টে কাৎ হ'য়ে পড়বে, এত বড় ভয়ঙ্কর মজা করবে, এ কি ক'রে জানব বল? তারপরে আর এক ভদ্রলোককে বেচারার একা-গাড়ি থেকে নামিয়ে তার গাড়িতে চ'ড়ে বসবে; এত মজাতেও সন্তুষ্ট নও, আবার একপাটি জুতো রাস্তার মাঝখানে ফেলে আসবে আর সেই জুতোর পিছনে কাশীবাসী ভদ্রলোকটীকে দৌড় করাবে—তারো উপরে আবার ইস্কুলে পৌঁছে কান্না—কি মজা! যদি সেই জুতো-শিকারী বেচারা ভদ্রলোকটী কাঁদত তা হ'লেও বুঝতুম—কিন্তু তুমি! বিনা ভাড়ায় পরের একা-গাড়িতে চ'ড়ে, বিনা আয়াসে পরকে দিয়ে হারানো চটিজুতো খুঁজিয়ে নিয়ে—তারপরে কিনা কান্না! একেই না বলে লঙ্কাকাণ্ডের পরেও আবার উত্তরকাণ্ড। তুমি লিখেছ আমিও যদি তোমাদের গাড়ির মধ্যে থাকতুম, আর হাত পা মাথা বুদ্ধি সুদ্ধি সমস্ত একেবারে উল্টে-পাল্টে যেত, তাহলে তোমাদের মতই বাবারে মলুমরে ক'রে চিৎকার করতুম। এ কথা আমি কিছুতেই স্বীকার করব না—নিশ্চয়ই পা দুটো উপরে আর মাথাটা নীচে ক'রে আমি তানানানা শব্দে কানাড়া রাগিণীতে গান ধ'রতুম

হায়রে হায়, সারে গামা পাধা নিসা!
(আমার) গাড়ীর হ'ল উল্টো দশা,
কোথায় হবে আমার গতি
খুঁজে আমি না পাই দিশা!
সারে গামা পাধা নিসা।

যখন কাশীতে যাব আমার গাড়িটা উল্টে দিয়ে বরঞ্চ পরীক্ষা ক'রে দেখো। ইস্কুলে গিয়ে কাঁদব না, তোমার মাথার সামনে দাঁড়িয়ে হাত পা নেড়ে তান লাগিয়ে দেব—

যদিও আঘাত গায়ে লাগেনি
তবুও করুণ সুরে,
দিব আমি গান জুড়ে
ঝাঁপতালে ভৈরবী রাগিণী।
শুন সবে দিদিমণি, মামা,
সারে সারে সারে গারে গামা।

এইত গেল মজার কথা! এইবার কাজের কথা। পরশু চল্লুম মৈসুরে, মান্দ্রাজে, মাদুরায় এবং মদনাপল্লিতে। ফিরতে বোধহয় জানুয়ারি কাবার হ'য়ে ফেব্রুয়ারি সুরু হবে—ইতিমধ্যে ঐ দুটো গানের সুর বসিয়ে এসরাজে অভ্যাস ক'রে নিয়ো। আবার যদি বিশ্বেশ্বরের গোরু গাড়ি উল্টে দিয়েনন্দী-ভৃঙ্গীর গোয়ালের দিকে দৌড় মারে তাহলে পথের মাঝখানে কাজে লাগাতে পারবে। আর যে ব্যক্তি তোমার একপাটি চটিজুতো নিয়ে আসবে তাকে উচ্চৈঃস্বরে তানে মানে লয়ে চমৎকৃত ক'রে জিতে পারবে।

ততদিন কিন্তু ডাকঘরের পালা বন্ধ। আমার চিঠি ফুরোলো নটে শাকটী মুড়োলো ইত্যাদি। ১৯ পৌষ, ১৩২৫।

৩২

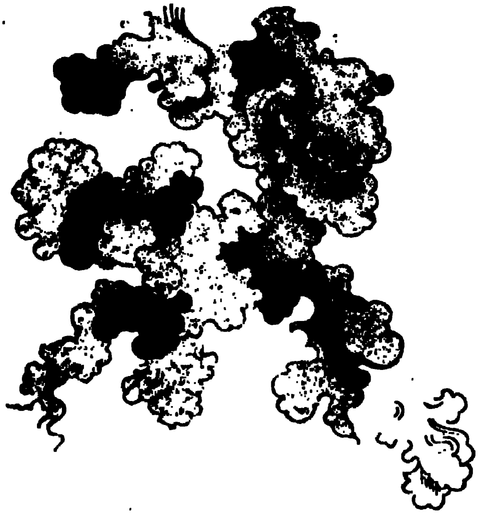
শান্তিনিকেতন

তোমার ভ্রমণ বৃত্তান্ত এই মাত্র পাওয়া গেল। আমি ভাবচি তোমার এমন চিঠির বেশ সমান ওজনের জবাবটি দিই কি ক'রে? তুমি চলিষ্ণু, আমি স্তব্ধ; তুমি আকাশের পাখী, আমি বনান্তের অশথগাছ; কাজেই তোমার গানে আর আমার মর্ম্মরে ঠিক সমকক্ষ হ'তে পারে না। এক জায়গায় তোমার সঙ্গে আমার মিলেচে; তুমিও গেছ হাওয়া বদল করতে, আমিও এসেছি হাওয়া বদল করতে। তুমি গেছ কাশী থেকে সোলনে, আমি এসেচি আমার লেখবার ডেস্ক থেকে আমার জানলার ধারের লম্বা কেদারায়। খুব বদল,—তোমাদের বিশ্বেশ্বরের মন্দির থেকে আর তাঁর শশুরবাড়ী যত বদল তার চেয়ে অনেক বেশি। আমি যে-হাওয়ায় ছিলুম এ হাওয়া তার থেকে সম্পূর্ণ তফাৎ। তবে কিনা তোমার ভ্রমণে আমার ভ্রমণে একটী মূলগত প্রভেদ আছে, তুমি নিজে চ'লে চ'লে ভ্রমণ করচ, কিন্তু আমি নিজে থাকি স্থির আর আমার সামনে যা কিছু চলচে তাদের চলায় আমার চলা। এই হচ্চে রাজার উপযুক্ত ভ্রমণ - অর্থাৎ আমার হ'য়ে অন্যে ভ্রমণ করচে, চলবার জন্যে আমার নিজেকে চলতে হচ্চে না। ঐ দেখ না, আজ রবিবার হাটবার, সামনে দিয়ে গোরুর গাড়ি চলেচে,—আমার দুই চক্ষু সেই গোরুর গাড়িতে সওয়ার হ'য়ে বসল। ঐ চলেছে সাঁওতালের মেয়েরা মাথায় খড়ের আঁটি, ঐ চলেছে মোষের দল তাড়িয়ে সন্তোষ বাবুর গোষ্ঠের রাখাল। ঐ চলেছে ইষ্টেশনের দিক থেকে গোয়াল-পাড়ার দিকে কারা এবং কিসের জন্যে তা কিছুই জানিনে—একজনের হাতে ঝুলচে এক থেলো হুঁকো, একজনের মাথায় ছেঁড়া ছাতি, একজনের কাঁধে চ'ড়ে বসেছে একটা উলঙ্গ ছেলে। ঐ আসচে ভুবনডাঙ্গার গ্রাম থেকে কলসী কাঁখে মেয়ের দল, তারা শান্তিনিকেতনের কুয়ো থেকে জল নিয়ে যাবে। ঐ সব চলার স্রোতের মধ্যে আমার মনটাকে ভাসিয়ে দিয়ে আমি চুপ ক'রে ব'সে আছি। আকাশ দিয়ে মেঘ চলেচে, কাল রাত্রিবেলাকার ঝড়-বৃষ্টির ভগ্ন-পাইকের দল অত্যন্ত ছেঁড়া খোঁড়া রকমের চেহারা।

এরাই দেখব আজ সন্ধ্যেবেলায় নীল লাল সোনালি বেগ্নি উর্দ্দি প'রে কালবৈশাখীর নকিবের মত গুরু গুরু দামামা বাজাতে বাজাতে উত্তরপশ্চিম থেকে কুচ-কাওয়াজ ক'রে আসতে থাকবে—তখন আর এমনতর ভালোমানুষি চেহারা থাকবে না।

আমাদের বিদ্যালয় বন্ধ, এখন আশ্রমে যা কিছু আসর জমিয়ে রেখেছে শালিখ পাখির দল, আরো অনেক রকমের পাখি জুটেচে—বটের ফল পেকেচে তাই সব অনাহূতের দল জমেচে। বনলক্ষ্মী হাসিমুখে সবার জন্যেই পাত পেড়ে দিয়েচেন। ইতি ৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬।





পাহাড়িয়া

মেঘমণ্ডল

—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

— গদ্য-ছন্দ —

মেঘমণ্ডল—
মায়ূরী-নীল বনস্থলীর,
ও সেই কুহেলী কুহর পাহাড়তলার মেঘ;—
পারাবত পায়রা যেন দুই রঙা
দুই দল এরা,—
বসে ওরা এপারে ওপারে ঝর্ণার,
রোদ ঝিল্‌মিল্‌ উত্তর হাওয়ায় ডানা মেলে।

বাসিন্দা মেঘ কস্তুরী-কালো ভারি-ডানা,
নিবাসিন্দা মেঘ ধুতুরা-সাদা লোটানো-পাখ্‌না।

শীতের বেলায় নতুন পাখী—
জলভরা মেঘ জলহারা মেঘ,—
ঝিলিক্‌-দেওয়া পাখনা মেলিয়ে ঘোরে ফেরে,
বাতাসে-লোটানো ডানা হেলিয়ে ওঠে নামে;
শূন্যে তোলে ঘূর্ণা,
আলো-ছায়ার হিলিমিলি হিল্লোল জাগায়।

পাহাড়িয়া

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মেঘে মেঘে যেন পাখ্‌নার শিহরণ
ঝুহরী ঝুহরী ওঠে,
ঝুহরী দ্রুত-বিদ্রুত বাজে পাখ্‌না ঝরঝরি ;
—দূরে কাছে ঘুরে ফিরে
বাতাসে হেলে পাখা নীল আর শাদা।

মেঘ ওরা পারাবত পায়রা ওড়ে,
ঘোরে ফেরে খেলে খেলা সারাদিনই,
—আকাশে লোটায় বাতাসে লোটায়
লোটায় পাথরে,
—ঝর্ণার স্রোতে ধরে ছায়া আর ছায়া ;
—কায়া আর ছায়া পাশাপাশি
ক্ষণে ক্ষণে আসে যায়।

নিমেষে কাটে রোদের বেলা,
নেমে আসে মেঘ,—
খেলাশেষে ঘর-ভোলা পাখী যেন
খুঁজে খুঁজে চলে
অন্ধকারের পারের বাসা ;
শীতের রাতে সেখানে ঝাঁপে ডানা
—দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে মেঘ
ঝামর ঝুহর শুভ্র আকাশে ভাসে
চাঁদনী-ছোঁয়ানো ঘুমে অলস।



মহাভারত ও গীতা

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

১

দেশপূজ্য ও লোকমান্য ৺বালগঙ্গাধর তিলক মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একখানি বিরাট ভাষ্য রচনা করেছেন, এবং মহাত্মা তিলকের অনুরোধে ৺জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় সে গ্রন্থ বাঙলায় অনুবাদ করেছেন। সে ভাষ্য যে কত বিরাট তার ইয়ত্তা সকলে এই থেকেই করতে পারবেন যে, গীতার সপ্তশত শ্লোকের মর্ম্ম প্রায় সপ্তবিংশতি সহস্র ছত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এ ভাষ্য এত বিশাল হবার কারণ এই যে, এতে বেদ, উপনিষদ, ব্রাহ্মণ, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, ছন্দ, জ্যোতিষ, পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য, দর্শন প্রভৃতি সমগ্র সংস্কৃত শাস্ত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সুবিচার করা হয়েছে। মহাত্মা তিলক এ গ্রন্থে যে বিপুল শাস্ত্র-জ্ঞান, যে সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন,—তা' যথার্থই অপূর্ব্ব। সমগ্র মহাভারতের নৈলকণ্ঠীয় ভাষ্যও আমার বিশ্বাস, পরিমাণে এর চাইতে ছোট। তাইতে মনে হয় যে এ ভাষ্য মহাত্মা তিলক, প্রাকৃতে না লিখে সংস্কৃতে লিখলেই ভাল করতেন। কারণ এ গ্রন্থের পারগামী হতে পারেন, শুধু সর্ব্বশাস্ত্রের পারগামী পণ্ডিতজনমাত্র, আমাদের মত সাধারণ লোক এ গ্রন্থে প্রবেশ করা মাত্রই বলতে বাধ্য হবে যে,

"ন হি পারং প্রপশ্যামি গ্রন্থভাষ্য কথঞ্চন।
"সমুদ্রস্য মহতো ভুজাভ্যাং প্রতরন্নিব॥" *

২

মহাত্মা তিলক এ গ্রন্থের নাম দিয়েছেন "কর্ম্মযোগ"। কেননা তিনি ঐ সুবিস্তৃত বিচারের দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে গীতা কর্ম্মত্যাগের শিক্ষা দেয় না, শিক্ষা দেয় "কর্ম্মযোগের"। আর যোগ মানে যে "কর্ম্মসু কৌশলং" এ কথা ত স্বয়ং বাসুদেব গোড়াতেই অর্জ্জুনকে বলেছিলেন। এই ব্যাখ্যাসূত্রে আমার একটা কথা মনে পড়ে গেল। নীলকণ্ঠ গীতার ব্যাখ্যা আরম্ভ করেছেন এই ক'টি কথা বলে' :—

"প্রণম্য ভগবৎপাদান শ্রীধরাদীংশ্চ সদ্‌গুরূন্
সম্প্রদায়ানুসারেণ গীতাব্যাখ্যা সমারভে॥"

নীলকণ্ঠ অতি সাদা ভাবে স্বকীয় ব্যাখ্যা সম্বন্ধে যে কথা মুখ ফুটে বলেছেন, গীতার সকল টীকাকারই সে কথা স্পষ্ট করে না বললেও চাপা দিতে পারেন না। সকলেই স্ব-সম্প্রদায় অনুসারে ও-গ্রন্থের ব্যাখ্যা করেন। যিনি জ্ঞানমার্গের পথিক তিনি গীতাকে জ্ঞানপ্রধান ও যিনি ভক্তিমার্গের পথিক তিনি গীতাকে ভক্তিপ্রধান শাস্ত্র হিসেবেই আবহমান কাল ব্যাখ্যা করে এসেছেন। মহাত্মা তিলক তাঁর ভাষ্যে, উক্ত কাব্য অথবা স্মৃতির পঞ্চদশখানি পূর্ব্ব-টীকার যুগপৎ বিচার ও খণ্ডন করেছেন। উক্ত পোনেরো খানিই যে স্ব স্ব সম্প্রদায় অনুসারেই রচিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মহাত্মা তিলকও স্ব-সম্প্রদায় অনুসারেই তার নূতন ব্যাখ্যা করেছেন। যদি জিজ্ঞাসা করেন যে, মহাত্মা তিলক কোন সম্প্রদায়ের লোক? তার উত্তর এ যুগে আমরা সকলেই যে সম্প্রদায়ের লোক, তিনিও সেই একই সম্প্রদায়ের লোক। এ যুগ, "জ্ঞানের" যুগ নয় বিজ্ঞানের যুগ, ভক্তির যুগ নয় কর্ম্মের যুগ। মার্কণ্ডেয় পুরাণের মতে, আমাদের জন্মভূমি হচ্ছে কর্ম্মভূমি। ভারতবর্ষ পৌরাণিক যুগে মানুষের কর্ম্মভূমি ছিল কি না জানি না, কিন্তু ভারতবর্ষের এ যুগ যে ঘোরতর কর্ম্মযুগ সে বিষয়ে আশা করি, শিক্ষিত সমাজে দ্বিমত নেই। এতদ্দেশীয় ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোক, সকলেই জীবনে না হোক্ মনে doctrine of action-এর অতি ভক্ত।

* মহাভারতের উপরোক্ত শ্লোকের আমি কেবল একটি শব্দ বদলে দিয়েছি, "দুঃখভাক্ত" পরিবর্তে গ্রন্থভাষ্য বসিয়ে দিয়েছি। আশা করি তাতে "অর্থের" কোনও ক্ষতি হয়নি।

সন্ন্যাসী হবার লোভ আমাদের কারও নেই—যদি কারও থাকে ত সে একমাত্র পলিটিকাল সন্ন্যাসী হবার। বলা বাহুল্য যে পলিটিক্স্ কর্ম্মকাণ্ডের ব্যাপার, জ্ঞানকাণ্ডের নয়, ভক্তিকাণ্ডেরও নয়। সংসারের প্রতি বিরক্তি নয়, আত্যন্তিক অনুরক্তিই পলিটিক্সের মূল। ইউরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রধান প্রভেদ এই কি নয় যে, সে দেশের লোক অজরামরবৎ বিদ্যা ও অর্থের চর্চ্চা করে, আর আমরা গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মচিন্তা করি। আমার কথা যে সত্য তার টাট্‌কা প্রমাণ,—মহাত্মা তিলকের একটি আজীবন পলিটিকাল সহকর্ম্মী, লালা লাজপত রায়, এই সেদিন সকলকে বলে গেলেন যে, হিন্দুধর্ম্ম আসলে সন্ন্যাসের ধর্ম্ম নয়, কর্ম্মের ধর্ম্ম। এবং সেই সঙ্গে আমাদের সকলকে কায়মনোবাক্যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করবার জন্য গীতার মাত্র দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ করবার আদেশ দিয়ে গেলেন, বোধ হয় এইভয়ে যে, মনোযোগ সহকারে অষ্টাদশ অধ্যায় গীতা পাঠ করলে, আমাদের কর্ম্ম-প্রবৃত্তি হয়ত নিস্তেজ হয়ে পড়্‌তে পারে। এ ভয় অমূলক নয়।

৩

ইংরাজের শিষ্য আমরা যেমন কর্ম্মের উপাসক, শ্রীধরের শিষ্য নীলকণ্ঠও তেমনি ভক্তির উপাসক ছিলেন, তথাপি তিনিও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে :—

"ভারতে সর্ব্ববেদার্থো ভারতার্থশ্চ কৃৎস্নশঃ।
গীতায়ামস্তি তেনেয়ং সর্ব্বশাস্ত্রময়ী মতা॥
কর্ম্মোপাস্তিজ্ঞানভেদৈঃ শাস্ত্রং কাণ্ডত্রয়াত্মকম্।
অন্তে তূপাসনাকাণ্ডাত্তৃতীয়ো নাতিরিচ্যতে॥
তদেব ব্রহ্ম বিদ্ধি ত্বং নেদং যত্তদুপাসতে।
ইতি শ্রুত্যৈব বেদ্যত্ত হ্যুপাস্যাদন্ততেরিতা॥
ইয়মষ্টাদশাধ্যায়ী ক্রমাৎ ষটকত্রিণেণ হি।
কর্ম্মোপাস্তিজ্ঞানকাণ্ডত্রিতয়াত্মা নিগদ্যতে॥

নীলকণ্ঠের এই সরল কথাই হচ্ছে সত্যকথা। গীতার প্রথম ছয় অধ্যায় যে কর্ম্মকাণ্ডের, মধ্যের ছয় অধ্যায় যে ভক্তিকাণ্ডের, আর শেষ ছয় অধ্যায় যে জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত, এরকম তিন অংশে সমান ও পরিপাটি ভাগবাটোয়ারার হিসেব আমরা না মানলেও, এ কথা সকলেই মানতে বাধ্য যে, ও শাস্ত্রে জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তি তিনই আছে। ও-গ্রন্থ একে তিন কিন্তু তিনে এক নয়। গীতায় ও ত্রিকাণ্ডের রাসায়নিক যোগের ফলে কোনও একটি নবকাণ্ডের সৃষ্টি হয় নি। এই কারণে গীতার এমন কোনও এক ব্যাখ্যা হতে পারে না, যা চূড়ান্ত হিসেবে সর্ব্বলোকগ্রাহ্য হবে, কেননা এ ক্ষেত্রে তিন রকম ব্যাখ্যারই সমান অবসর আছে। গীতার অন্তরে নানারূপ ধাতু আছে। কোন ভাষ্যকারই তাকে ব্যাখ্যার বলে তাঁর মনোমত এক ধাতুতে পরিণত করতে কৃতকার্য্য হবেন না—তা সে ধাতু, জ্ঞানের স্বর্ণই হোক্ আর কর্ম্মের লৌহই হোক্। পূর্ব্বাচার্য্যেরা প্রধানতঃ গীতাভাষ্যে জ্ঞান-ভক্তি-মার্গই অবলম্বন করেছিলেন—গীতার ধর্ম্ম যে মুখ্যতঃ সন্ন্যাসের ধর্ম্ম নয়, ভগবৎ-গীতা যে অবধূত-গীতা ও অষ্টাবক্র-গীতার জ্যেষ্ঠসহোদর নয়, এ কথা কিন্তু আজ আমরা জোর করে বলতে পারি।

গীতার মতকে কর্ম্মযোগ বলবার আমাদের অবাধ অধিকার আছে। আর যুগধর্ম্মানুসারে আমরা গীতা নিংড়ে সেই মতই বার করবার চেষ্টা করব। আর এ প্রযত্ন মহাত্মা তিলকের তুল্য আর কে করতে পারেন? এ যুগের তিনিই যে হচ্ছেন অদ্বিতীয় কর্ম্মযোগী, এ সত্য আর শিক্ষিত অশিক্ষিত কোন্ ভারতবাসীর নিকট অবিদিত? এই গীতাভাষ্যও মহাত্মা তিলকের কর্ম্মযোগের অদ্ভুত ক্রিয়া। জ্ঞানের তরফ থেকে শঙ্করের ভাষ্য যেমন একমেবাদ্বিতীয়ং কর্ম্মের তরফ থেকে মহাত্মা তিলকের ভাষ্যও আমার বিশ্বাস, তেমনি একমেবাদ্বিতীয়ং হয়ে থাকবে।

৪

গীতা কর্ম্মমার্গের, জ্ঞান-মার্গের কি ভক্তি-মার্গের শাস্ত্র, এ তর্ক হচ্ছে এ-দেশের ও সেকালের। কিন্তু এই গ্রন্থ নিয়ে এ যুগে এক নূতন তর্কের সৃষ্টি হয়েছে। সে তর্কটা যে কি তা মহাত্মা তিলকের ভাষাতেই বিবৃত করছি।

—"গ্রন্থ কোথায় রচিত হইয়াছে, কে রচনা করিয়াছে, তাহার ভাষা কিরূপ—কাব্যদৃষ্টিতে তাহাতে কতটা মাধুর্য্য ও প্রসাদ-গুণ আছে, গ্রন্থের শব্দরচনা ব্যাকরণ-শুদ্ধ অথবা তাহাতে কতকগুলি আর্ষ-প্রয়োগ আছে, তাহাতে কোন্ কোন্ মতের, স্থলের কিংবা ব্যক্তির উল্লেখ আছে, এই সকল ধরিয়া গ্রন্থের কাল নির্ণয় করা যাইতে পারে কি না, ইত্যাদি"—

এরূপ আলোচনাকে মহাত্মা তিলক "বহিরঙ্গ পর্য্যালোচনা" বলেন।—

এ আলোচনা আমরা অবশ্য বিলেত থেকে আমদানী করেছি।

"পরন্তু, একণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অনুকরণে এ দেশের আধুনিক বিদ্বানেরা গীতার বাহ্যাঙ্গেরই বিশেষ অনুশীলন করিতেছেন"।

এরূপ আলোচনার প্রতি যাঁরা আসক্ত তাঁদের প্রতি মহাত্মা তিলক যে আসক্ত নন, তার পরিচয় তিনি নিজ-মুখেই দিয়াছেন। তিনি বলেন :—

"বাগ্‌দেবীর রহস্যজ্ঞ ও তাহার বহিরঙ্গ-সেবক এই উভয়ের ভেদ দর্শন করিয়া মুরারি কবি এক সরস দৃষ্টান্ত দিয়াছেন :—

অব্ধির্লঙ্ঘিত এব বানরভটৈ কিং ত্বস্য গম্ভীরতাম্।
আপাতালনিমগ্ন পীবরতনুর্জানাতি মন্থাচলঃ॥

আর গ্রন্থ-রহস্য মধ্যে মৈনাক পর্ব্বতের মত আপাতাল নিমজ্জিত হওয়ারই নাম অন্তরঙ্গ পর্য্যালোচনা।—মুরারি কবির এই সরস উক্তিটি অবশ্য দেশী বিলেতি বহিরঙ্গ সেবকদের কর্ণে একটু বিরস ঠেক্‌বে। কিন্তু এ বিষয়ে যাঁরা মদমত্ত জর্ম্মাণ পাণ্ডিত্যের উল্লম্ফন নিরীক্ষণ করেছেন, তাঁদের পক্ষে মুরারি কবির উক্তির পুনরুক্তি করবার লোভ সম্বরণ করা কঠিন।

কাব্যের অন্তরঙ্গের সাধনা ও বহিরঙ্গের সেবা এ দুটি ক্রিয়ার ভিতর যে শুধু প্রভেদ আছে তাই নয়; এর একটি প্রবল্ অপরটির অন্তরায়। কাব্যের ভিতর থেকে ইতিহাস উদ্ধার করতে বসলে দেখা যায় যে, তার কাব্যরস শুকিয়ে এসেছে আর তার ভিতর নিমজ্জিত ঐতিহাসিক উপলখণ্ড সব দন্তবিকাশ করে হেসে উঠেছে। আমাদের মত কাব্য-রসিকরা কাব্যের সমগ্ররূপ দেখেই মোহিত হই 'অপরপক্ষে' পণ্ডিতেরা কাব্যের রস জিনিষটিকে উপেক্ষা করেন। অন্ততঃ জর্ম্মাণ পণ্ডিতরা কাব্যের সম্মুখীন হ'বামাত্র তাকে সম্বোধন করে বলেন :—

মাইরি রস ঘুরে ব'স্,
দাঁত দেখি তোর বয়েস কত"।

এরি নাম Scholarship।

তবে এ রকম ঐতিহাসিক কৌতূহল যখন মানুষের মনে একবার জেগেছে, তখন কাব্যের ঐ বহিরঙ্গ পর্য্যালোচনায় যোগ দেবার প্রবৃত্তি দমন করা অসম্ভব। বিশেষতঃ আধুনিক বিদ্বান ব্যক্তিদের পক্ষে। অন্যে পরে কা কথা,—মহাত্মা তিলকও গীতার বহিরঙ্গ পর্য্যালোচনার মায়া কাটাতে পারেন নি। তিনি তাঁর গীতাভাষ্যের পরিশিষ্টে অতি বিস্তৃতভাবেই এই বাহ্যবিচার করেছেন। এতে আমি মোটেই আশ্চর্য্য হইনি। এই পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে শাস্ত্র বিচারের এ দেশে রাজা ছিলেন ৺রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর। আর মহাত্মা তিলক যে-পুরিকে পুণ্যপুণাপুর বলেন সেই পুরিই হচ্ছে রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের রাজধানী এবং সেই পুরিতেই এ দেশের যত বড় বড় Orientalist অবতীর্ণ হয়েছেন। "কর্ম্মযোগে" যত সব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের উল্লেখ আছে সে সবই মহারাষ্ট্রীয়—একটিও বঙ্গদেশীয় নয়। স্বয়ং মহাত্মা তিলক হচ্ছেন, এই বিলেতি-দস্তুর-পণ্ডিতদের মধ্যে অগ্রগণ্য। এ বিষয়ে তাঁর কৃতিত্ব এতই অসামান্য যে, পাশ্চাত্য Orientalist সমাজেও তিনি অতি উচ্চ আসন লাভ করেছেন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা বিশেষ করে এই মহা প্রশ্ন তুলেছেন যে মহাভারতে ভাগবৎ-গীতা প্রক্ষিপ্ত কি না। মহাত্মা তিলক এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে—

"যে ব্যক্তি বর্ত্তমান মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন তিনিই বর্ত্তমান গীতাও বিবৃত করিয়াছেন"।

এ সিদ্ধান্তে তিনি অবশ্য উপনীত হয়েছেন বাহ্যপ্রমাণের বলে। কেননা তিনি একথা স্পষ্ট করে বলেছেন যে—

"যাঁহারা বাহ্য-প্রমাণকে মানেন না এবং নিজেরই সংশয়-পিশাচকে অগ্রস্থান দেন, তাঁহাদের বিচার পদ্ধতি নিতান্ত অশাস্ত্রীয় সুতরাং অগ্রাহ্য"।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

মহাত্মা তিলকের মতে "গীতাগ্রন্থ ব্রহ্মজ্ঞানমূলক, এই ভুল ধারণা হইতেই এই সন্দেহ তো প্রথমে বাহির হয়।" আমি অবশ্য আচার্য্যের শিষ্য নই অর্থাৎ শঙ্কর-পন্থী বৈদান্তিক নই—এমন কি শঙ্করকে "প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ" বলতেও আমার তিলমাত্র দ্বিধা নেই। তবুও মহাত্মা তিলকের সংগৃহীত বাহ্য-প্রমাণ আমার মনের সন্দেহ-পিশাচকে একেবারে বধ করতে পারে নি। এর প্রকৃত কারণ তিনিই উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন "সন্দেহ নিরঙ্কুশ"। আমি অবিদ্বান, কিন্তু "এতদ্দেশীয়" ও আধুনিক। অতএব আমার মনেও যে অনেক বিষয়ে সন্দেহ আছে, সে কথা বলাই বাহুল্য। মনোজগতে আধুনিক ও সংশয়গ্রস্ত এ দুটি কথা পর্য্যায়শব্দ। যাঁর মনে কোনরূপ সংশয় নেই তাঁর একালে জন্ম আসলে অকালে জন্ম, কারণ দেহে তিনি একেলে হলেও—মনে সেকেলে। এ প্রবন্ধে আমার সেই সন্দেহই আমি ব্যক্ত করতে চাই। পণ্ডিতের বিচারে অবশ্য যোগ-দান করবার অধিকার আমার নেই, কেননা পণ্ডিত ব্যক্তিদের প্রস্থানভূমি "সন্দেহ" হলেও নিঃসন্দিগ্ধ চূড়ান্ত সিদ্ধান্তই হচ্ছে তাঁদের গম্যস্থান। আর তাঁরা অবলীলা-ক্রমেই সেখানে পৌঁছে যান। অপরপক্ষে আমি মহা-ভারতের নানাদেশ পর্য্যটন করে অবশেষে কোনও মানসিক রাজপুতনায় উপনীত হতে পারি নি। কারণ মহাভারতের ভিতর আমার পর্য্যটন শুধু "ভ্রমণ কারণ"। সুতরাং আমি অপণ্ডিত ও কাব্যরসিক বাঙালী হিসেবেই, এ বিষয়ে একটু উচ্চবাচ্য করতে চাই।

৬

আমাদের শাস্ত্র সম্বন্ধে এই "প্রক্ষিপ্ত" কথাটার চল করেছেন, ইউরোপীয় পণ্ডিতরা। এর একটি স্পষ্ট কারণ আছে। Andre Gide নামক জনৈক বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক, রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির উপর একটি চমৎকার প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি আরম্ভেই বলেছেন যে, গীতাঞ্জলির তনুতা দেখেই তিনি পুলকিত হয়েছিলেন। কারণ তার ভয় ছিল যে, যে-দেশের মহাকাব্যের শ্লোকসংখ্যা হচ্ছে শত সহস্র সে দেশের গীতিকাব্যের শ্লোক সংখ্যা হবে অন্ততঃ এক সহস্র। Andre Gide সংস্কৃত জানেন না, যদি জানতেন ত তিনি মহাভারতের গোড়াতেই দেখ্‌তে পেতেন যে, লোমহর্ষণ-পুত্র উগ্রশ্রবা বলেছেন যে, বর্ত্তমান মহাভারত হচ্ছে মূল মহাভারতের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। "বিস্তীর্য্যৈতন্মহজ্জ্ঞানমৃষি সংক্ষিপ্য চাব্রবীৎ"। লোমহর্ষণ-পুত্রের এ কথা শুনলে Gide সাহেবের যে শুধু লোমহর্ষণ হত তাই নয়—তিনি হয়ত মূর্চ্ছিত হয়ে পড়্‌তেন।

ইউরোপীয়েরা হোমারের ইলিয়াডের পরিমাণকেই মহাকাব্যের Standard মাপ ধরে নিয়েছেন। কিন্তু গ্রীস নামক ক্ষুদ্র দেশের পরিমাণের সঙ্গে, ভারতবর্ষ নামক মহাদেশের পরিমাণের তুলনা করলেই তাঁরা বুঝতে পারবেন, কেন ইলিয়াডের মাপের সঙ্গে মহাভারতের মাপ মেলে না ও মিলতে পারে না। কিন্তু ভৌগোলিক হিসেব অনুসারেই যে, কাব্যের দেহ সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হতে হবে এ কথা তাঁরা মানতে প্রস্তুত নন। তাঁরা বলেন, মানচিত্রের সঙ্গে মন-চিত্রের কোনরূপ কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নেই। অতএব মহাভারত যখন কাব্য, তখন নৈসর্গিক নিয়মে তা এতাদৃশ মহাকায় হতে পারে না। কাব্যের কথা ছেড়ে দিলেও কাব্যরচয়িতা কবির ত দম বলে একটা জিনিষ আছে। কোনও কবি একদমে মহাভারতের অষ্টাদশ পর্ব্বের পাল্লা ছুটতে পার্‌তেন না। এর থেকে অনুমান করা যায় যে; মহাভারতের মধ্যে অধিকাংশ শ্লোকই প্রক্ষিপ্ত। এর উত্তর হচ্ছে ইউরোপীয় পণ্ডিতরা ঐ কাব্য নামেই ভুলেছেন। মহাভারত কাব্য নয়, মহাভারত হচ্ছে একটি Encyclopædia সুতরাং একলক্ষ শ্লোকের অর্থাৎ দু'লক্ষ ছত্রের বিশ্বকোষকে সংক্ষিপ্ত বললে Andre Gide-ও কোনও আপত্তি করতে পারবেন না। এ গ্রন্থের নাম সংহিতা না হয়ে কাব্য কি করে হল, তার পরিচয় মহাভারতেই আছে। বেদব্যাসের মনে যখন এ গ্রন্থ জন্ম গ্রহণ করে, তখন তিনি ব্রহ্মাকে বলেন যে আমি মনে মনে একখানি কাব্য রচনা করেছি। বেদব্যাসের মুখে সে কাব্যে কি কি জিনিষ থাকবে তার ফর্দ্দ শুনে স্বয়ং ব্রহ্মাও একটু চমকে ওঠেন ও থমকে যান, তার পর তিনি সসম্ভ্রমে বলেন যে "হে বেদব্যাস তুমি যখন ও-গ্রন্থকে কাব্য বলতে চাও, তখন ওর নাম

কাব্যই হবে, কেননা তুমি কখন মিথ্যা কথা বলো না।" এর থেকেই দেখা যাচ্ছে যে বর্ত্তমান মহাভারতকে কাব্য বলা যায় কি না, সে বিষয়ে স্বয়ং ব্রহ্মারও সন্দেহ ছিল। কিন্তু তিনি যে ও-গ্রন্থকে অবশেষে কাব্য বলতে স্বীকৃত হয়েছিলেন, তার কারণ মহাভারত একাধারে কাব্য ও Encyclopædia এবং এই দুই বস্তু একই গ্রন্থের অন্তর্ভূত হলেও মিলে মিশে একদম একাকার হয়ে যায় নি এবং মোটামুটি হিসেবে, উভয়েই চিরকাল নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে আসছে। মহাভারতের যে অংশ আমাদের মত অবিদ্বান লোকরা পড়ে এবং উপভোগ করে সেই অংশ তার কাব্যাংশ, আর যে অংশ বিদ্বান লোকেরা কষ্ট ভোগ করে পর্য্যালোচনা করেন, সেই অংশই তার Encyclopædia-র অংশ। এ বিষয়ে বোধ হয় অপণ্ডিত মহলে কোনও মতভেদ নেই।

মহাভারতের এই যুগলরূপের প্রহেলিকাই হচ্ছে ইউরোপীয় পাণ্ডিত্যের শান্তিভঙ্গের মূল কারণ। এ হেঁয়ালির যা হোক্ একটা হেস্তনেস্ত না করতে পারলে পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁদের পণ্ডিতী মনের শান্তি ফিরে পাবেন না। এর জন্ম তাঁরা সকলে মিলে পাণ্ডিত্যের দাবাখেলা খেলতে সুরু করেছেন। এ খেলায় সকলেই সকলকে মাৎ করতে চান্। আমি সে খেলার দর্শক হিসেবে দু'টি একটি উপর চাল দিচ্ছি। সে চাল নেওয়া না নেওয়া নির্ভর করছে খেলোয়াড়দের উপর। একটু চোখ চেয়ে দেখলেই দেখতে পাবেন, যে পণ্ডিতের দল ভারতবর্ষের অতীতকে প্রায় বেদখল করে নিয়েছে। বেদ এখন Philology-র, ইতিহাস Numismatics-এর, Art-Archeology-র অন্তর্ভূত হয়ে পড়েছে অর্থাৎ একাধারে বিজ্ঞানের ও ইংরাজির। এ অবস্থায় মহাভারত যাতে বাঙলা সাহিত্যের হাতছাড়া না হয়ে যায়, সে চেষ্টা আমাদের করা আবশ্যক। তার একমাত্র উপায় হচ্ছে বিচারের হট্টগোলে যোগ দেওয়া। হেঁয়ালি সম্বন্ধে বাঙলায় একটা কথা আছে যে,—

মূর্খেতে বুঝিতে পারে।
পণ্ডিতের লাগে ধন্ধ॥

এই প্রবচনের উপর ভরসা রেখে এ হেঁয়ালির উত্তর দিতে চেষ্টা করছি।

৭

বলা বাহুল্য যে কাব্য ও Encyclopædia এক বৃন্তের দুটি ফুল নয়। কাব্য মানুষের অন্তর হতে আবির্ভূত হয় আর Encyclopædia বাহির থেকে সংগৃহীত। সুতরাং এ উভয়েই যে একস্থানে ও এক সঙ্গে জন্মলাভ করেছে এ কথা অবিশ্বাস্য। সুতরাং আমাদের ধরে নিতেই হবে যে, এ দুই পৃথক বস্তু, গোড়ায় পৃথক ছিল পরে কালবশে জড়িয়ে গিয়েছে। তার পর প্রশ্ন ওঠে এই যে, কাব্যের গায়ে Encyclopædia ভর করেছে, না, Encyclopædia-র অন্তরে কাব্য কোন ফাঁকে ঢুকে গেছে? এখন এ প্রশ্নের উত্তর নির্ভয়ে দেওয়া যেতে পারে। বিশ্ব অবশ্য কাব্যের পূর্ব্বে সৃষ্ট হয়েছে কিন্তু বিশ্বকোষ কাব্যের অনেক পরে নির্ম্মিত হয়েছে। এ গ্রন্থের কথার বয়স ওর বক্তৃতার বয়সের চাইতে ঢের বেশি। অর্থাৎ ও-গ্রন্থের সার ওর ভারের চাইতে অনেক প্রাচীন। আর ভাগ্যিস ও-সারটুকু তার উপর চাপানো ভারের ভরে মারা যায় নি, তাই ও-কাব্য আজও বজায় আছে। ও-গ্রন্থের কাব্যাংশ অর্থাৎ সারাংশ যদি, বিশ্বকোষের চাপে পিষে যেত তাহলে মহাভারত হত অর্দ্ধেক বৃহৎ-সংহিতা আর অর্দ্ধেক বৃহৎ-কথা, অর্থাৎ তা সকলের পাঠ্য হত না, পাঠ্য হ'ত একদিকে বৃদ্ধের, অপরদিকে বালকের। এ বিষয়ে আমাদের সঙ্গে পণ্ডিতমণ্ডলী প্রায় একমত। তাঁরা নানা শাস্ত্র ঘেঁটে এই সত্য আবিষ্কার করেছেন যে, মূলে এ কাব্যের নাম ছিল ভারত তার পরে তার নাম হয়েছে মহাভারত। এ সত্য উদ্ধারের জন্যে আমার বিশ্বাস নানা শাস্ত্র অনুসন্ধান করবার প্রয়োজন ছিল না। বর্ত্তমান মহাভারতেই ও-দুটি নামই পাওয়া যায়। আর ভারত যে মহাভারত হয়ে উঠেছে, তার মহত্ত্ব ও গুরুত্বের গুণে অর্থাৎ তার পরিমাণ ও ওজনের জন্যে এ কথা আদিপর্ব্বেই লেখা আছে।

৮

অতঃপর দেখা গেল যে, মহাভারতের পূর্ব্বে "ভারত" নামক একখানি কাব্য ছিল। মহাভারত আছে, কিন্তু "ভারত" নেই। অতএব এখন প্রশ্ন হচ্ছে "ভারত" গেল কোথায়? সে গ্রন্থ লুপ্ত হয়েছে, না গুপ্ত হয়েছে? এ প্রশ্নের একটা সোজা উত্তর পেলেই আমরা বর্ত্তমান মহাভারতের কোন্ অংশ তার অপরিমিত মহত্ব ও গুরুত্বের কারণ তা অনুমান করতে পারব। মহাত্মা তিলক এ প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছেন, তা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। তাঁর বক্তব্য এই যে,—

"সরল শব্দার্থে "মহাভারত" অর্থে বড় ভারত হয়। * * * * * বর্ত্তমান মহাভারতের আদিপর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, উপাখ্যান সমূহের অতিরিক্ত মহাভারতের শ্লোক-সংখ্যা চব্বিশ হাজার, এবং পরে ইহাও লিখিত হইয়াছে যে, প্রথমে উহার নাম "জয়" ছিল। "জয়" শব্দে ভারতীয় যুদ্ধে পাণ্ডবদের জয় বিবক্ষিত বলিয়া বিবেচিত হয়, এবং এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে, ইহাই প্রতীত হয় যে, ভারতীয় যুদ্ধের বর্ণনা প্রথমে "জয়" নামক গ্রন্থে করা হইয়াছিল, পরে সেই ঐতিহাসিক গ্রন্থের মধ্যেই অনেক উপাখ্যান সন্নিবেশিত হইয়া উহাই ইতিহাস ও ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারেরও নির্ণয়কারী এই এক বড় মহাভারতে পরিণত হইয়াছে।"

অর্থাৎ "জয়" ওরফে "ভারত" কাব্য লুপ্ত হয় নি, মহাভারতের অন্তরেই তা গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে। তাই যদি হয়, তাহলে মহাভারতের মহত্ব ও গুরুত্বের চাপের ভিতর থেকে "জয়ের" ক্ষুদ্র দেহ উদ্ধার করা অসম্ভব। "ভারত" যে লুপ্ত হয় নি এ বিষয়ে আমি মহাত্মা তিলকের মত শিরোধার্য্য করি, কারণ সে কাব্যের লুপ্ত হবার কোনও কারণ নেই। সেকালে ছাপাখানা ছিল না, সব গ্রন্থই হাতে লিখতে হত, সুতরাং উপযুক্ত লেখকের অভাবে বড় ভারতেরই লুপ্ত হবার কথা, ছোট ভারতের নয়। সেকালে একটানা শত সহস্র শ্লোক লেখবার লোক যে কতদূর দুষ্প্রাপ্য ছিল তার প্রমাণ—স্বয়ং ব্রহ্মাও বেদব্যাসের মনঃসংকল্পিত গ্রন্থ লেখবার ভার গণেশের উপর দিয়েছিলেন। দেশে লেখবার মানুষ পাওয়া গেলে, আর হিমালয় থেকে লম্বোদর দেবতাকে টেনে আনতে হত না। ভগবান গজাননও যে ইচ্ছাসুখে এই বিরাট গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করতে রাজি হন নি, তার প্রমাণ, তিনি লেখা ছেড়ে পালাবার এক ফন্দি বার করেছিলেন। তিনি ব্যাসদেবকে বলেন যে,—"আমি বৃথা সময় নষ্ট করতে পারব না, আপনি যদি গড় গড় শ্লোক আবৃত্তি করে যান, তাহলেই আমি ফস্ ফস্ করে লিখে যাব। আপনি যদি একবার মুখ বন্ধ করেন ত, আমি একেবারে কলম বন্ধ করব।" বেদব্যাস কি চালাকি করে হাঁপ ছেড়ে জিরিয়েছিলেন, অথচ হেরম্বকে দিয়ে আগাগোড়া মহাভারত লিখিয়ে নিয়েছিলেন, সে কথা ত সবাই জানে। গণেশকে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়ে দেবার জন্য তিনি অষ্টসহস্র অষ্টশত শ্লোক রচনা করেন যার অর্থ তিনি বুঝতেন আর শুকদেব বুঝতেন, আর সঞ্জয় হয়ত বুঝতেন, হয়ত বুঝতেন না; সেই ৮৮০০ শ্লোক যদি কেউ মহাভারত থেকে বেছে ফেলতে পারেন, তাহলে তিনি আমাদের মহা উপকার করবেন। তবে জর্ম্মাণ পণ্ডিত ছাড়া এ কাঁটা বাছবার কাজে আর কেউ হাত দেবেন না।

তারপর বড় বই লেখাও যেমন শক্ত পড়াও তেমনি শক্ত। এমন কি সেকালের পণ্ডিত লোকেও বড় বই ভালবাসতেন না। এই গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে জর্ম্মাণ পণ্ডিতদের মত হাজার হাজার পাতা বই গেলা এতদ্দেশীয়দের পক্ষে অসম্ভব। এতদ্দেশীয় পণ্ডিতদের বিরাট গ্রন্থ যে ইষ্ট ছিল না, সেকথা মহাভারতেই আছে। "ইষ্টং হি বিদুষাং লোকে সমাসব্যাসধারণম।" সুতরাং লেখার হিসেব থেকে হোক্ আর পড়ার হিসেব থেকেই হোক্, দুহিসেব থেকেই আমরা মানতে বাধ্য যে "ভারত" লুপ্ত হয় নি, ও-কাব্য মহাভারতের অন্তরে সেইভাবে অবস্থিতি করছে, যেভাবে শকুন্তলার আংটি মাছের পেটে অবস্থিতি করেছিল।

আমরা যদি মহাভারতের ভিতর থেকে "ভারত"কে টেনে বার করতে পারি, তাহলে, "ভারতের" অন্তরে ও অঙ্গে কোন্ কোন্ উপাখ্যান, ইতিহাস, দর্শন ও ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার প্রক্ষিপ্ত ও নিক্ষিপ্ত হয়েছে, তার একটা মোটামুটি হিসেব পাই। আর যদি ধরে নিই যে, মহাভারতের অতিরিক্ত মালমসলা সব ঐ ভারতকাব্যের ভিতর

interpolated হয়েছে, তাহলে অবশ্য ঐ শ্লোকস্তূপের ভিতরে ভারতের সন্ধান আমরা পাব না। আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যিনি গ্রীক দেবতা Hercules-এর মত ওরকম পঙ্কোদ্ধার করতে প্রবৃত্ত হবেন। অপর পক্ষে গ্রীকবীর Alexander-এর মত এই জটিল গ্রন্থের Gordian knot যদি আমরা দ্বিখণ্ড করতে পারি, তাহলে হয়ত মহাভারত থেকে ভারতকে পৃথক করে নিতেও পারি।

৯

Interpolation-এর দৌলতেই "ভারত" যে মহাভারতে পরিণত হয়েছে, সে বিষয়ে দেশী বিলেতি সকল আধুনিক পণ্ডিত একমত।

কিন্তু এই interpolation ভাষান্তরে "প্রক্ষিপ্ত" কথাটা তাঁরা কি অর্থে ব্যবহার করেন, সেটা যথেষ্ট স্পষ্ট নয়।

যদি তাঁদের মত এই হয় যে, যেমন মোরগের পেটে চাল পুরে দিয়ে একাধারে কাবাব ও পোলাও বানানো হয়, তেমনি 'ভারতের' অন্তরে নানা বস্তু নানা যুগে পুরে দিয়ে তার গুরুত্ব ও মহত্ত্ব সাধন করা হয়েছে, তাহলে সে মত আমি সন্তুষ্ট মনে গ্রাহ্য করতে পারি নে।

আমার বিশ্বাস বর্ত্তমান মহাভারতের কতক অংশ "ভারতের" ভিতর পুরে দেওয়া হয়েছে এবং অনেক অংশ তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। প্রক্ষিপ্ত অংশের বিচার এখন স্থগিত রেখে যদি আমরা তার সংযোজিত অংশকে ভারতকাব্য থেকে বিযুক্ত করতে পারি, তাহলে আমাদের সমস্যা অনেক সরল হয়ে আসে।

আমরা যদি সাহস করে এক কোপে মহাভারতকে দ্বিখণ্ড করে ফেলতে পারি, তাহলে আমার বিশ্বাস "ভারতকে"—মহাভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারি। বর্ত্তমান মহাভারতের নয় পর্ব্ব হচ্ছে প্রাচীন-ভারত, আর তার বাদবাকী নয় পর্ব্ব হচ্ছে অর্ব্বাচীন-মহাভারত—এই হিসেবটাই হচ্ছে গণিতের হিসেবে সোজা; অতএব অপণ্ডিতদের কাছে গ্রাহ্য হওয়া উচিত।

প্রথম নয় পর্ব্বের ভিতর অবশ্য অনেক প্রক্ষিপ্ত বিষয় আছে যা পূর্ব্বে ভারত-কাব্যের অঙ্গস্বরূপ ছিল না, কিন্তু শেষ নয় পর্ব্বের ভিতর সম্ভবতঃ এমন একটি কথাও নেই, যা পূর্ব্বে ভারতকাব্যের অন্তর্ভূত ছিল।

সংক্ষেপে দুইখানি বই একসঙ্গে জুড়ে মহাভারত তৈরী করা হয়েছে। এ দুইখানি গ্রন্থকে "পূর্ব্ব ভারত" ও "উত্তর ভারত" আখ্যা দেওয়া যায়। সকলেই জানেন যে, সংস্কৃত সাহিত্যে এ রকম কাব্য আরও অনেক আছে। কাদম্বরী কুমার-সম্ভব, মেঘদূত প্রভৃতির এইরকম দুটি স্পষ্ট ভাগ আছে। পূর্ব্ব মেঘ ও উত্তর মেঘ অবশ্য একই হাতের লেখা এবং একই কাব্যের বিভিন্ন অঙ্গ। কাদম্বরীর পূর্ব্ব ভাগ বানভট্টের রচনা, আর উত্তর ভাগ তাঁর পুত্রের। কুমার-সম্ভবের পূর্ব্ব ভাগ কালিদাসের রচনা, আর উত্তর ভাগ আর যারই লেখা হোক্, কালিদাসের লেখা নয়। এমন কি রামায়ণের উত্তরাকাণ্ড যে বাল্মীকির লেখনী-প্রসূত নয়—সে বিষয়েও সন্দেহ নেই।

১০

মহাভারতকে এরকম দ্বিধাবিভক্ত করা নেহাৎ গোঁয়ার-তুমি নয়। সত্য সত্যই দুটি আধখানিকে এখন গ্রথিত করে মহাভারত নামে একখানি গ্রন্থ করা হয়েছে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ চিরকালই রয়ে যাবে, কেননা মহাভারত সম্বন্ধে বড় বড় আবিষ্কার সম্বন্ধে সমান সন্দেহ রয়ে গেছে। একটি দৃষ্টান্ত দেই! Dahlmann নামক জনৈক ধনুর্দ্ধর জর্ম্মাণ পণ্ডিত আজীবন গবেষণার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মহাভারত খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত হয়েছে। অপর পক্ষে Holtzmann নামক অপর একটি সমান ধনুর্দ্ধর জর্ম্মাণ পণ্ডিত আজীবন-গবেষণার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়েছেন যে, মহাভারত খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত হয়েছে। বলা বাহুল্য এই উভয় আবিষ্কারই যুগপৎ সমান সত্য হতে পারে না। ফলে এর একটিও সত্য কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ লোকের মনে থেকেই যায়। কিন্তু এতৎ-সত্ত্বেও জার্ম্মান পণ্ডিতের প্রতি ভক্তি কারও কমে নি। বিদ্বান ব্যক্তিদের পদানুসরণ করেই আমি আমার মত ব্যক্ত

কোনার্ক

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

"কোনার্কে এখন কিছুই নাই, ধূ ধূ প্রান্তর মধ্যে শুধু একটী অতীতের সমাধি মন্দির—শৈবালাচ্ছন্ন পরিত্যক্ত জীর্ণ দেবালয় এবং তাহারই বিজন বক্ষের মধ্যে পুরাতন দিনের একটী বিপুল কাহিনী। সেই পুরাতন দিন—যখন এই মন্দিরদ্বারে দাঁড়াইয়া লক্ষ লক্ষ শুভ্রকান্তি ব্রাহ্মণ যাজক যজ্ঞোপবীত-জড়িত হস্তে সাগরগর্ভ হইতে প্রথম সূর্য্যোদয় অবলোকন করিতেন; নীল জল, শুভ্র আনন্দে তাঁহাদের পদতলে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত এবং নীল আকাশ অবারিত প্রীতিভরে অরুণিম আশীর্ব্বাদধারা বর্ষণ করিত। তাম্রলিপ্তির বন্দর হইতে সিংহলে, চীনে এবং অন্যান্য নানা দূর দেশে পণ্য ও যাত্রী লইয়া নিত্য যে-সকল বৃহৎ অর্ণবযান যাতায়াত করিত, তাহাদের নাবিকেরা এই কোনার্ক মন্দিরের মধুর ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া বহুদিন সন্ধ্যাকালে দূর হইতে দেবতাকে সসম্ভ্রম অভিবাদন জানাইত; এবং দেবতার যশ-ঘোষণায় তরণীর সুবিস্তৃত চীনাংশুককেতু উড্ডীয়মান হইত। মন্দিরের বহিঃপ্রাঙ্গণে, দ্বারের সম্মুখে, সিদ্ধগন্ধর্ব্বসেবিত প্রাচীন কল্পবটমূলে শত সহস্র যাত্রী—কত দুরারোগ্য রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে আসিয়াছে। একবার যদি সূর্য্যদেবের অনুগ্রহ হয়, একবার যদি মহাদ্যুতি আপন কনক-কিরণে সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা হরণ করিয়া লয়েন।"

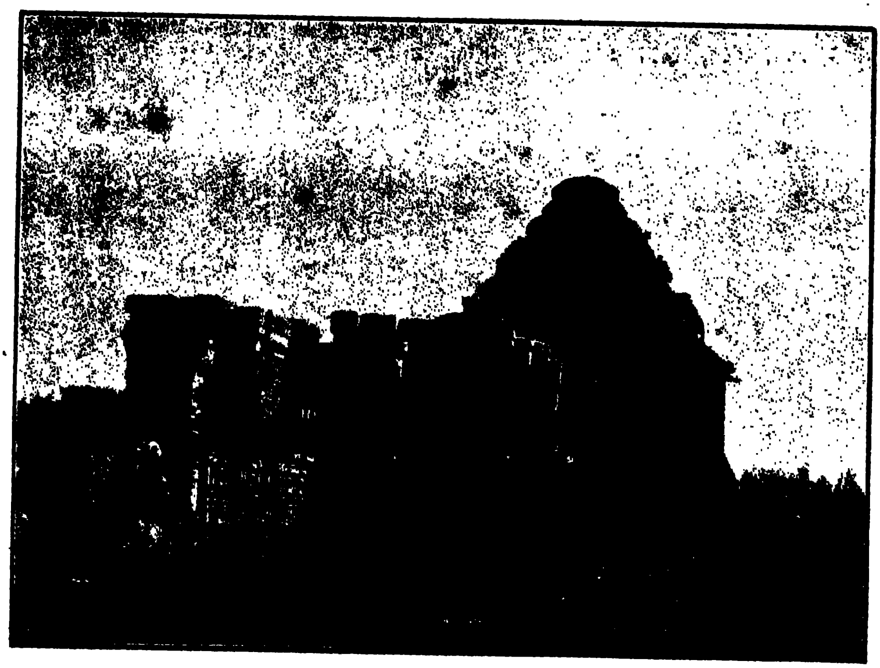
বলেন্দ্রনাথের লেখনীর কালি শুষ্ক হবার পূর্ব্বেই ইতিবৃত্ত প্রমাণ ক'রে দিয়েছে যে কোনার্কের মন্দির কোনদিনই শাস্ত্রসম্মত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; গর্ভগৃহে রত্নবেদী রচিত হ'য়েছিল বটে, কিন্তু তাতে দেবতার অধিষ্ঠান হ'ল না। অদূরে চন্দ্রভাগা তীরে অর্কক্ষেত্র। সেখানে এখনও রথসপ্তমীর দিনে যাত্রীর মেলা বসিয়া থাকে, সূর্য্যদেবের উদ্দেশে অনেক অর্ঘ্য অর্পিত হয়। কিন্তু কোনার্কের পুণ্যক্ষেত্র পূজারতির শঙ্খঘণ্টায় কোনদিন মুখরিত হ'য়ে উঠে নাই। অপ্রতিষ্ঠিত দেবতার কর্ণে সাগরোর্ম্মির বিলাপ-সঙ্গীত ব্যতীত অন্য কোন সুর কোনদিন ধ্বনিত হয় নাই।



সূর্য্য-মন্দির ও মায়াদেবীর মন্দির

কোনার্ক একটা ব্যর্থতার ইতিহাস বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বোধ হয় এইজন্তই তার দিকে আমাদের হৃদয় এত আকৃষ্ট হয়। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের বিশালতায় আমরা স্তম্ভিত হই, ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দিরের ভিত্তি-গাত্রে দৃঢ়-নিশ্চিত হস্তের কারুকার্য্য আমাদের মন মোহিত করে। কিন্তু ব্যর্থতার জালে জড়িত কোনার্কের স্থাপত্য শিল্প আমাদের শুধু নয়ন মন আকৃষ্ট ক'রেই ক্ষান্ত হয় না, পর্য্যবসিত হ'য়চে প্রত্নতাত্ত্বিকের পুঁথির পৃষ্ঠা বৃদ্ধিকরণে এবং বিদেশী টুরিষ্টের ইতর কৌতুহল নিবৃত্তিকরণে। কচিৎ কখনো কবি-শিল্পীর মুগ্ধ নেত্রপাত এই লাঞ্ছনাটুকু মুছে নেয়। কিন্তু কতটুকুই বা!

তবু এই বিফলতার বিরাটত্ব আমাদের মধ্যে একটা বাক্যহীন সম্ভ্রমের ভাব জাগিয়ে না তুলে যায় না। কোনার্ক মন্দির হিন্দু স্থাপত্যের শেষতম ও শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন।



ভোগমণ্ডপ ও মন্দির

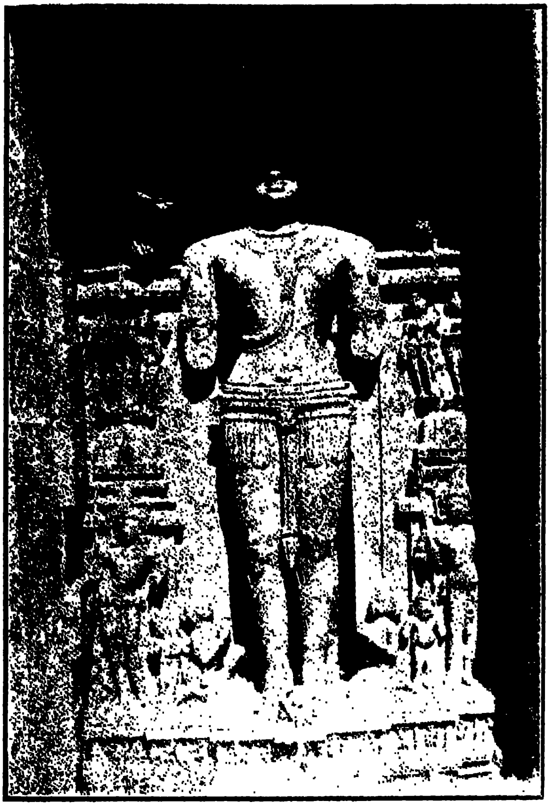
মানুষের মতো আমাদের সমবেদনার তন্ত্রীতে ঘা দিয়ে ভালবাসাটুকুও কেড়ে নেয়।

সে আজ প্রায় আট শত বৎসর আগেকার কথা। গঙ্গাবংশীয় রাজা লাঙ্গুলিয়া নরসিংহদেবের রাজত্বকালে কোনার্ক মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হয়। উড়িষ্যার দ্বাদশ বৎসরের রাজস্ব, স্থপতি শিবাই সামন্তরাও এবং তাঁর দ্বাদশ শত শিল্পীর দ্বাদশ বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টা—সমস্ত এর পরে খাঁটি হিন্দু স্থাপত্যের পরিচয় ভারতের কোথাও আর পাওয়া যায় না।

অথচ এ বিফলতার কারণ-ইতিহাস আমাদের কাছে একেবারেই অজ্ঞাত। এই শিল্পস্তূপ কেন যে অসমাপ্ত অবস্থায় পরিত্যক্ত হয়েছিল, তা' কেউ জানে না। লাঙ্গুলিয়া নরসিংহদেবের অকালমৃত্যুই কি ইহার কারণ—না স্থপতি শিবাই সামন্তরাও-এর বিফলতাজনিত আত্মহত্যা?

কোনার্ক

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ



কোনার্কের সূর্য্যমূর্ত্তি

গঙ্গাবংশীয় নৃপতিগণের ভাণ্ডার কি শূন্য হ'য়ে গিয়েছিল—না বারশত শিল্পীর মধ্যে জাতীয় অধঃপতনের সূচনা আত্মকলহ রূপে দেখা দিয়েছিল? বালুচরে ভিত্তিমূল কি সুপ্রোথিত হয় নাই? দ্বাদশ বৎসরের রাজস্ব শোষণে কি উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষের সূচনা হয়েছিল এবং তাহাই কি লক্ষ শ্রমজীবির মনে চাঞ্চল্য উপস্থিত ক'রেছিল? ইতিহাস শুধু অনুমান করে, সঠিক কিছুই বলে না।

কোনার্ক মন্দির সূর্য্যদেবের নামে উৎসৃষ্ট হ'য়েছিল। আজকাল কুষ্ঠরোগ দূরীকরণে সূর্য্যরশ্মির প্রয়োগ-ব্যবস্থা চিকিৎসা-শাস্ত্র সম্মত। এ তথ্য প্রাচীনদের কাছেও অজ্ঞাত ছিল না ব'লে মনে হয়। কৃষ্ণ-পুত্র শাম্ব সূর্য্যোপাসনা ক'রে কুষ্ঠ রোগ মুক্ত হন—কোনার্কের নিকট চন্দ্রভাগা তীরে। সেখানে এখনও অনেক কুষ্ঠরোগীর সমাগম হয়। কোনার্ক মন্দিরের প্রতিষ্ঠান এই কিম্বদন্তীকে চিরন্তন করবার প্রয়াস মাত্র।

মন্দির মহাদ্যুতির রথের আকারে পরিকল্পিত। সুগ্রীব অশ্বমূর্ত্তি এখন বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বালুচরে দণ্ডায়মান, কিন্তু অরুণ-সারথির কোন নিদর্শনই পাওয়া যায় না। বৌদ্ধ প্রভাব-জ্ঞাপক হস্তীমূর্ত্তির স্থান কোথায় ছিল? পণ্ডিতেরা সঠিক কিছুই বলেন না। সূর্য্যমূর্ত্তি, বিষ্ণুমূর্ত্তি নবগ্রহমূর্ত্তি-ফলক—ভাস্কর্য্যের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন—এখন পার্শ্বস্থ ম্যুসিয়ম গৃহে আশ্রয় লাভ ক'রেছে।

বদ্ধদ্বার জগমোহন, পশ্চাতে ভগ্ন গর্ভগৃহ, অদূরে মায়াদেবীর অসমাপ্ত মন্দির, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রস্তর মূর্ত্তি, মন্দির সম্মুখে নবনির্ম্মিত ম্যুসিয়ম, নিকটে সরকারী ইন্‌স্পেকশন্ বাংলো—বালুগর্ভোত্থিত কোনার্কের ইহাই বর্ত্তমান চিত্র।

মন্দিরের ভিত্তিগাত্র অতুলনীয় কারুকার্য্য সম্ভারে দর্শকের মনে বিস্ময় উৎপাদন করে। একটী অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণও



মন্দির চক্র ও ভাস্কর্য্য নিদর্শন

স্থান নেই যেখানে শিল্পীর ছেদনী-স্পর্শের চিহ্ন না পাওয়া যায়। সে যে কত রকমের চিত্র! পৌরাণিক ঘটনার পাশে গ্রাম্যবিবাহের শোভাযাত্রা, নর্ত্তকীর লাস্যলীলা, পুরনারীর প্রসাধন, গার্হস্থ্য জীবনের দৈনন্দিন ঘটনা, যুদ্ধ, পূজা, ব্যসন—সমস্তই শিল্পীর হাতে প্রাণময় হ'য়ে উঠেছে। এর সঙ্গে আছে নরনারীর ঘনিষ্ঠ মিলনের চিত্র—তার অনেকগুলি হয়ত শ্লীলতার সীমা অতিক্রম ক'রে গেছে। শুধু কোনার্কে নয়, উড়িষ্যার প্রায় সকল মন্দিরেই ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু এ সমস্তই বাহিরের ভিত্তিগাত্রে, ভিতরে কিছুই নাই। এগুলি কি নির্ব্বাণোন্মুখ বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতার অবরুদ্ধ প্রভাবের শেষ নিদর্শন? সমাগত ভক্তের শক্তি পরীক্ষার আয়োজন? বজ্রপাত নিবারণার্থ শিল্পশাস্ত্রের অনুজ্ঞা? না, শিল্পীর ইচ্ছায় মনুষ্য জীবনের সমস্ত রহস্যোদ্‌ঘাটনের প্রচেষ্টা? কেহই এ বিষয়ে একমত নন্। অনেকেই একটা না একটা কৈফিয়ৎ দিয়েছেন, কিন্তু তা' সবই অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত।

ভিত্তিগাত্রের কারু-সৌন্দর্য্য শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথকে অভিভূত ক'রেছিল। সে সৌন্দর্য্য তিনি অতুলনীয় শব্দচিত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন:—"চির-যৌবনের হাট বসিয়াছে, চির-পুরাতন অথচ চির-নূতন কেলিকদম্বতলে নিখিলের রঙ্গলীলা চলিয়াছে···এখানে কিছুই নীরব নাই, নিশ্চল নাই, অনুর্ব্বর নাই। পাথর বাজিতেছে মৃদঙ্গের মন্দ্রস্বনে, পাথর চলিয়াছে তেজীয়ান অশ্বের মতো বেগে রথ টানিয়া, উর্ব্বর পাথর ফুটিয়া উঠিয়াছে নিরন্তর-পুষ্পিত কুঞ্জলতার মতো শ্যামসুন্দর আলিঙ্গনের সহস্র বন্ধে চতুর্দ্দিক বেড়িয়া। ইহারই শিখরে, এই শব্দায়মান চলায়মান উর্ব্বরতার চিত্র বিচিত্র শৃঙ্গারবেশের চূড়ায়,—শোভা পাইতেছে কোনার্কের দ্বাদশ-শত শিল্পীর মানস-শতদল, সকল গোপনতার সীমা হইতে বিচ্ছিন্ন, নির্ভীক, সতেজ, আলোকের দিকে উন্মুখ।"



বন্ধদ্বার জগমোহন

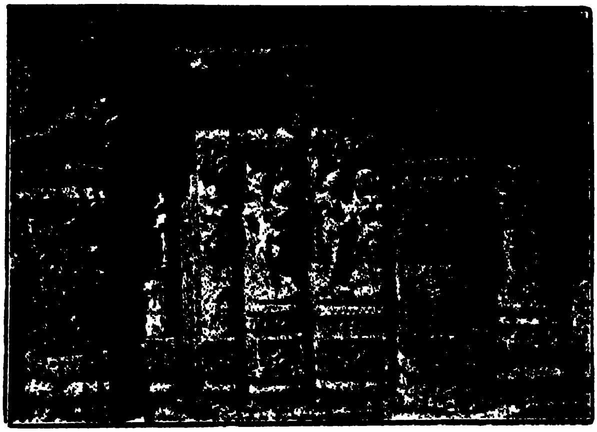
কোনার্কে যাত্রা ক'রেছিলেম গো-যানে—এক জ্যোৎস্না-পুলকিত রজনীতে। সঙ্গী ছিলেন সুকান্তি মহারাষ্ট্রীয় অধ্যাপক এবং তাঁহারই বাঙ্গালী সহধর্ম্মিণী। এই করুণা-

কোনার্ক

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

মন্নী বান্ধবীর উদ্যোগেই কোনার্ক যাত্রা সফলতায় মণ্ডিত হ'য়েছিল। 'পথি নারী বিবর্জ্জিতা' যাঁরা বলেন, তাঁরা নিশ্চয়ই উপবাসে অভ্যস্ত।

কোনার্কের পথে, পুরী থেকে কিছু দূরে, সাগর-বিচ্ছিন্ন এক হ্রদ বামে অনেক দূর অবধি বিস্তৃত; দক্ষিণে প্রান্তর; তার পর সমুদ্র। কত সুপ্ত গ্রামের ভিতর দিয়ে শকট চলেছিল; নারিকেল-বীথির মধ্য দিয়ে চাঁদের আলো-ছায়ায় হেঁটে পথ অতিক্রম ক'রতে আমরা কিছুই ক্লান্তি অনুভব করিনি। তবে সব পথটা নয়; শকট-কারের অনুজ্ঞা—পথে সর্প থাকা বিচিত্র নয়। চন্দ্রের



ভিত্তি গাত্রস্থ লতামণ্ডল
ও নর্ত্তকী মূর্ত্তি



জগমোহন—পশ্চাতে অসমাপ্ত গর্ভগৃহ

কলঙ্ক অবাস্তব—তাই সেটা সহ্য হয়। কিন্তু চন্দ্রালোকিত পথে সর্পের অস্তিত্বটা নিতান্তই বাস্তব। অতএব পথ-চলার সঙ্গে সঙ্গে ছেদ প'ড়েছিল।……প্রত্যুষে ক্ষীণকায়া কুশভদ্রা নদী পার হ'য়ে দ্বিতীয় দণ্ডে কোনার্কে অবতরণ।

খোদাই করিয়া লাগান হয় নাই; স্বস্থানে সন্নিবিষ্ট হওয়ার পর in sita খোদাই করা হইয়াছে। তাহাই না হয় হইল। কিন্তু তিন চার টন ভারি পাথর উপরে উঠান হইল কি করিয়া? একটা গজসিংহের মাপ লইয়া দেখা গিয়াছিল



কোণার্কের বিষ্ণুমূর্ত্তি

শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার 'মন্দিরের কথা'য় লিখিতেছেন:—'মন্দির তো তৈয়ারী হইয়াছে কোন্ কালে কিন্তু এখন পর্য্যন্ত নির্ম্মাণ-কৌশল সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনা বাদানুবাদের নিবৃত্তি হয় নাই। অনেকের মতে পাথরগুলি

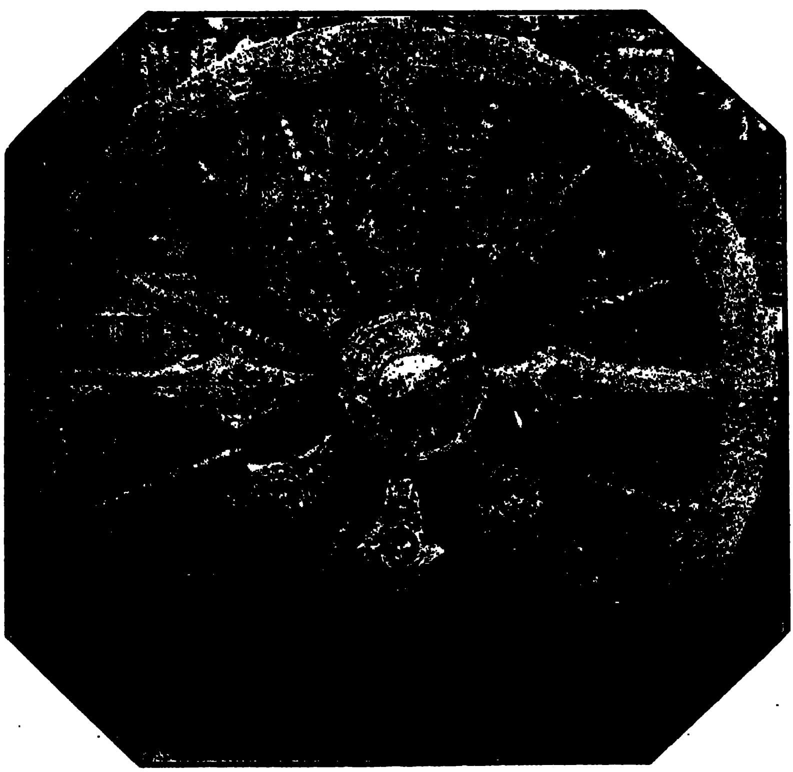
যে সেটা উচ্চে বিশ ফিট, তলদেশের পরিমাণ পনর ফিট এবং চওড়া চার ফিট সাত ইঞ্চি। মূর্ত্তিটী দুই খণ্ড সুবৃহৎ প্রস্তর হইতে নির্ম্মিত।'……কেহ কেহ বলেন, চারিদিকে ঢালু বাঁধ বাঁধিয়া, উহার উপর দিয়া পাথরগুলি টানিয়া

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

বা গড়াইয়া তোলা হইয়াছিল, কেহ বলেন—কপিকলের সাহায্যে। বস্তুতঃ, কোনার্ক দর্শকচিত্তে বিস্ময়ের পর বিস্ময় সৃজন করে...আমাদের দেশের এঞ্জিনীয়াররা না জানি কত বড় ছিলেন।.........

কোনার্ক থেকে যখন ফিরলেম তখন সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে। অতীতের স্বপ্ন, বিষাদের আবেষ্টন অতিক্রম ক'রে পুরাতন পথে পুনর্যাত্রা সুরু হ'ল। মনে হ'ল পিছনে যা' রেখে এসেছি, সেখানে—বলেন্দ্রনাথের ভাষায়—'এক নিশ্চল বৈরাগ্য বাসা বাঁধিয়াছে। তাহার মুখে কেবল হায় হায়। বৈদান্তিক মায়াবাদীর মতো সে শুধু বলিতেছে জীবন অনিত্য, যৌবন অনিত্য, ধনজন অনিত্য, সুখ অনিত্য, সংসার অনিত্য; সকলি যেখানে অনিত্য ও মায়া সেখানে দেবালয়ে এ বিড়ম্বনা কেন? দ্বাদশ বৎসরের দুর্ভিক্ষ দিয়া এ পাষাণ স্তূপ রচনা করিয়া কি ফল? দেশ কাল তো সাগর বক্ষে একটা ক্ষণিক বুদ্বুদ মাত্র; হায়, মায়াহত, তুমি জানিয়া শুনিয়াও ইহা বুঝিলে না!'

মায়াই বটে, বিধাতার মায়ারাজ্যে এ শুধু মানবের মায়া স্বপ্ন।



রাণী

—গল্প—

—শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বিপিন আর সুলতার বিয়ের সময় জ্যোতিষী অঙ্কপাত ক'রে দেখেছিলেন রাজযোটক, কিন্তু বিয়ের পর সে অঙ্কপাতের সার্থকতা র'য়ে গেল জ্যোতিষীর পুঁথি-পত্রেই, কারণ বাস্তব জীবন যা সুরু হ'ল, তাতে যোটকের কোন লক্ষণ পাওয়া যেত না, রাজযোটকের ত নয়ই।

বিপিন জন্মেছিল গৃহস্থের ঘরে, মনটি ছিল যেমনি কোমল তেমনি সাদা। যথা-নিয়মে বাঙালীর ঘরের ছেলের মত লেখা-পড়া ক'রে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দু একটা খেতাব নিয়ে, যে চাকুরী পেলে তা উৎকৃষ্ট না হ'লেও, একেবারে কেরাণী-গিরি নয়, এবং মোটের ওপর বিপিন তার এই সৌভাগ্যে খুসীই ছিল।

তার এই চাকুরী পাওয়ার পর প্রজাপতির ফুল-বনে প'ড়ে গেল বিষম সাড়া, এবং বহু অঙ্ক এবং দরকসাকসির পর একদিন শুভ-রাত্রে বিপিন এবং সুলতার মিলন হ'য়ে গেল।

বিবাহের পূর্ব্বের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই, কিন্তু পরের ইতিহাস কিঞ্চিৎ জটিল।

যদিও সুলতা জন্মেছিল গৃহস্থের ঘরে, কিন্তু সে মন নিয়ে এসেছিল একেবারে রাজ-রাণীর। অর্থাৎ যে গৃহস্থের নারী সমস্ত দিন প্রসন্নমুখে সংসারের কাজকর্ম্ম করে, হাস্যমুখে স্বামীকে আবাহন করে, তার মন নয়। তার মাথার ভিতর কোথায় যে দুর্জ্জয় রাগ বাসা করেছিল, এবং মনের ভিতর কোথায় রাণীর বিলাস-বাসনা লুকিয়ে ছিল তা জানা না গেলেও সময়ে-অসময়ে যখন তারা বার হ'য়ে পড়ত তখন বিপিনের গৃহে চকিতে একটা তাণ্ডবের সৃষ্টি হ'য়ে মুহূর্ত্তে যেন সমস্ত ওলট-পালট হ'য়ে যেত। তখন দেওয়ালের ছবি লুটাত ভূমিতে এবং ভূমির ধূলি উড়ত আকাশে।

বিপিন এক-আধবার কড়া হবার চেষ্টা ক'রে বিপদে প'ড়ে গিয়েছিল; শাসনের উত্তরে যে গর্জ্জন মাথাকুটাকুটির পালা প'ড়ে যেত তাকে সামলান আরও দায়।

বিপিন যদি হেসে ওড়াবার চেষ্টা করত ত সক্রোধ প্রশ্ন হ'ত,—হাসচ যে? এবং যদি চুপ ক'রে থাকত ত পুনরায় প্রশ্ন হ'ত, মৌনী সাধু হ'য়ে গেলে যে, কথা কইচ না যড়?

কথা কইলেও বিপদ, না কথা কইলেও বিপদ; হাসলেও দোষ, না হাসলেও দোষ।

সুতরাং গোপনে তার সমস্ত মনটা ভ'রে প'ড়ে যেত একটা কান্নার সাড়া!

রাজোদ্যানের প্রচণ্ড-শোভা গৌরবময়ী গোলাপ-রাণীকে পোঁতা হয়েছিল গৃহস্থের ফুলবনে, যেখানে কুন্দ-বেলীই শোভা পায়, যেখানে তারা প্রসন্ন-কোমল হাস্যে জেগে উঠে, অপূর্ব্ব পরিমলে গৃহস্থের দরিদ্র কুটিরকে পরিপূর্ণ ক'রে, যাবার সময় নিঃশব্দে খ'সে প'ড়ে!

এমনি ক'রেই চলতে লাগলো তারী দিনগুলো।

২

সেদিনও একটা খণ্ড-প্রলয় হ'য়ে গিয়েছিল। আপিসের সমস্ত-দিনের ক্লান্তির পর বিপিন যখন একটুখানি স্নেহ একটুখানি সান্ত্বনার প্রত্যাশা ক'রে বাসায় ফিরে এল, তখন সে সুলতার মেঘাচ্ছন্ন মুখ দেখে একেবারে দ'মে গেল। মাঝে মাঝে মনে হয়, আজও মনে হ'ল যে, সংসার-রণে এইখানেই ভঙ্গ দিয়ে সে স'রে পড়ে; এবং বাকি জীবনটা কোন গহন বনে অথবা পর্ব্বতের গুহায় স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে দেয়। কিন্তু বাধা অনেক; প্রথমত চাকুরী যায়, এবং দ্বিতীয়ত সুলতা ও তাহার শিশু-পুত্রটি একেবারে নিরুপায় হ'য়ে পড়ে। বিবাহ ক'রে এই পন্থা গ্রহণ করতে মন অসম্মত।

সুতরাং বাকি রইল কোনো প্রকারে সহ্য ক'রে যাওয়া, কিন্তু সে কাজটাও ক্রমশঃ অত্যন্ত কঠিন হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে বিপিন মড়ার মত প'ড়ে প'ড়ে সুলতার নিম্নলিখিত-রূপ দুঃখের কাহিনী শুনে যাচ্ছিল।

রাণী

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সমস্ত দিনটা ঘরের কোণে বদ্ধ হ'য়ে দম আটকে যায়, বিকালে যে একটা গাড়ী কিংবা মোটর ক'রে একটু বেড়িয়ে আসি এমন যুগ্যতা নেই। লোকেদের গা গয়নায় ভরা, তাদের সামনে বেরোতে আমি লজ্জায় ম'রে যাই। পা-হাত ব্যথা করে, কোমর কন্‌কন্ করে, একটা দাসী নেই যে টিপে দেয়। গরমের দিনে প্রাণান্ত হ'লে একটু পাখার তলায় গিয়ে আরাম করি তার উপায় নেই! দাসী হ'য়ে আছি, দু বেলা দু মুটো অচ্ছেদ্দার ভাত খাই, সে ত কুকুর বেরালেও পায়। যদি রাণী হতাম! হে ঠাকুর, এই আমার প্রার্থনা যে আর-জন্মে যদি মেয়ে মানুষ হই ত যেন রাণী হই!

* * * *

তথাস্তু। একেবারে রাজরাণী!

ঘরের পর ঘর, পাথরের মেঝে, পেন্টিং করা দেওয়াল, কত বিচিত্র ছবিতে ভরা, ঝাড়-লণ্ঠন, বৈদ্যুতিক আলো, পাখা, কিংখাবে মোড়া কৌচ, গদি, সোনার খাট, পালঙ্কের শয্যা, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আর্শি, গরম-জলের ঠাণ্ডা-জলের ফোয়ারা, বিলাসিতা এবং স্বাচ্ছন্দ্যের কোথাও এতটুকু অভাব নেই। শিশ-মহাল, রঙ-মহাল, শয়ন গৃহ, প্রসাধন গৃহ, তহ-খানা, তোষা-খানা, মাথা একেবারে গুলিয়ে যায়!

কিন্তু রাজা কৈ?

আজ তিন দিন সুলতা এই বাড়ীতে রাণী হ'য়ে এসেছে, কিন্তু রাজার দর্শন নেই। সন্ধ্যার সময় তার ঘরে সুলতা পায়চারি ক'রে বেড়াচ্ছিল, ঘরের পাখা-গুলা বন্‌বন্ ক'রে ঘুরছে, তবু যেন গরম যাচ্ছে না। প্রকাণ্ড আর্শিতে তার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের ছবি ফুটে উঠেছে। আগা-গোড়া সমস্ত গা বহুমূল্য গয়নায় ভরা। তাদের দুর্মূল্য হীরা-মাণিক্যে আলো প'ড়ে ঠিকরে উঠ্‌ছিল। তবু যেন মনে আনন্দ নেই।

সুলতা রাগ ক'রে তার পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করলে, ছুবি, তোমাদের রাজা কোথায়? তিন দিনে একবারও দেখা নেই।

ছুবি বল্লে, মা, তিনি এ ক'দিন বড়রাণীর মহলে আছেন।

সুলতা কপালে চোখ তুলে বল্লে, বড়রাণী?—তোদের রাজার ক'রাণী?

ছুবি বল্লে, আপনাকে নিয়ে সাত রাণী।

সুলতা ভারী রাগ ক'রে বল্লে, একজন রাজার সাত রাণী? তবে আমাকে বিয়ে করবার কি দরকার ছিল? রাণীরা কি ভেড়া ছাগল?

ছুবি সহজ হাসি হেসে বল্লে, তা বুঝি জানেন না মা! আগেকার দিনে এক-এক রাজার হাজার দু' হাজার পর্য্যন্ত রাণী থাকৃত! এ ত' ঢের ভাল।

সুলতা রেগে গস্ গস্ করতে লাগল, মনে হ'ল এই সব আসবাব পত্তর ভেঙ্গে-চুরে একশা ক'রে দেয়। কিন্তু এ রকম কায়দা-দোরস্ত সব বিধি-নিয়ম এখানকার, যে ভরসা হ'ল না।

সুলতা বল্লে, তোদের নিয়ম-গুলো জেনে নিই। কতদিন পরে রাজার সঙ্গে দেখা হয়?

ছুবি বল্লে, তার কি ঠিক আছে মা? যেমন তাঁর ইচ্ছে; ইচ্ছে হ'লে রোজও আসতে পারেন, না হ'লে এক বছরেও দেখা হয় না।

সুলতার চোখ যেন ব্যথায় টন্‌টন্ করতে লাগল।

তখমা-পোষাক পরা নোকর এসে খবর দিলে, বেড়াতে যাবার মোটর তৈরী।

সুলতা বল্লে, যাব না।

পরিচারিকা চুপি চুপি বল্লে, ও-কথা বল্লে চলবে না মা, যেতেই হবে। রাণীমাদের রোজ সন্ধ্যায় বেড়ান একেবারে বাঁধা নিয়ম। নড়-চড় হবার জো নেই।

সুলতা বল্লে, যদি না যাই!

পরিচারিকা মাথা নেড়ে বল্লে, তা হ'লে মহারাজা বড় রাগ করবেন।

—তোদের রাজার দেখাই নেই ত' রাগ করবে কে?

—দেখা না পেলেও তাঁর রাগের প্রকাশ ভয়ানক মা, ভয়ানক! তোমার ইচ্ছে অনিচ্ছে নেই মা, যেতেই হবে।

হু' হাতে কে যেন শক্ত ক'রে দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে নিয়ে সুলতাকে মোটরে বসিয়ে দিলে; রাগে তার বুকের ভেতরটা আছড়াতে লাগল। কিন্তু উপায় কি—রাজার রাণী সে!

মোটর চল্লো বিজয়-গর্ব্বে!

৩

বেড়িয়ে ফিরে এসে সুলতা বল্লে, আমি আজ খাব না।

পরিচারিকার দল হৈ হৈ ক'রে উঠ্‌ল। সুবি জিভ কেটে বল্লে, তা হয় না রাণীমা! একি কুকুর বেরালের খাদ্য! এ-যে একেবারে রাজ-ভোগ! রাণী-মাদের যে খেতেই হবে, এই ত রাজার নিয়ম।

সুলতা বল্লে, যদি ক্ষিদে না থাকে!

সুবি গালে হাত দিয়ে বল্লে, শোন কথা! রাণীর আবার ক্ষিদে থাকবে না কি মা! তবে আর রাণী কি হ'ল? আমাদের দাস-দাসীদের এক-আধ দিন ক্ষিদে না থাকলে চলতে পারে, কিন্তু রাণী হ'য়ে ক্ষিদে থাকবে না? তা হয় না, রাজার হুকুম না পেলে ক্ষিদে হ'তেই হবে!

—খেয়ে যদি অসুখ হয়?

—অসুখ ত হয়ই মাঝে মাঝে। রাণীদের অসুখ হবে না ত' হবে কাদের? অসুখ হ'লে রাজার ঘরে ডাক্তার বদ্যি, কবিরাজের অভাব কি মা?

সুতরাং রাজ-ভোগ গ্রহণ করতেই হ'ল।

বিছানায় শোয়ার পর চার দাসী এসে উপস্থিত। একজন মাথা টিপবে, দ্বিতীয় হাত, তৃতীয় কোমর, চতুর্থ পা।

সুলতা বল্লে, দোহাই তোদের, আজ আর নয়, আজ আমি ক্লান্ত।

দাসীরা হাত-জোড় ক'রে বল্লে, রাণী-মা, রাজার হুকুম যে, আপনার গা হাত-পা রোজ টিপে দিতেই হবে। এ হুকুম আমাদের না মান্‌লে চল্‌বেনা।

—আর যদি আমার ভাল না লাগে?

দাসীরা সভয়ে বল্লে, ভাল লাগবে না কি রাণীমা? সবার কি এ ভাগ্যি হয় যে চার-চার জন দাসী একসঙ্গে সেবা করবে? এ ত রাণীরই ভাগ্যি। আমরা হুকুমের চাকর, হুকুম না মেনে ত উপায় নেই।

চারিজন দাসীর দলন-মলন সুরু হ'ল। উচ্ছলিত অশ্রু রোধ ক'রে সুলতা পাথরের মত শুয়ে রইল।

এই রাণী!

৪

সাতদিন পরে সুবি এসে খবর দিলে, মা আজ মহারাজা খবর পাঠিয়েছেন যে, আজ তিনি আসবেন আপনার ঘরে। বড় ভাগ্যি মা, এ তাঁর বিশেষ দয়া বলতে হবে। কেননা, সাধারণ নিয়ম-মত আরও দেরী হ'ত।

সুলতার এই কদিনে মন এমনি তিক্ত হ'য়ে উঠেছিল, আর এই সব প্রচণ্ড নিয়মকানুনের ওপর এমনি ভয় হ'য়েছিল যে, এ সংবাদে সে যেন শিউরে উঠ্‌ল। বল্লে, হুঁ।

সুবি বল্লে, মা আপনার যত গহনা আছে, আর সবচেয়ে বহুমূল্য যে শাড়ী আছে, সেই সব পরতে হবে।

সুলতা বল্লে গহনা ত' অনেক, ওজনে আধমনটাক হবে, এত গহনা পরব কি ক'রে? পরলে ত' নড়ন-চড়নের জো থাকবে না!

সুবি বল্লে, উপায় নেই। নিয়ম এই। সমস্ত গহনা পরতেই হবে। তা নইলে মহারাজা ভারী রাগ করবেন।

সুলতা চুপ্ ক'রে রইল।

সুবি বল্লে, আরও একটা কথা। আগে থেকে ব'লে রাখি মা। রোজ রাত্তিরে বাইজিদের নাচ-তামাসা হয়। সে সব শেষ ক'রে মহারাজার আসতে রাত্তির বারোটা একটা কখনো বা দুটো-ও হয়, সেই অবধি আপনাকে জেগে ব'সে থাকতে হবে, কেননা মহারাজা এলে আপনাকে গিয়ে তাঁকে অভিবাদন ক'রে নিয়ে আসতে হবে।

সুলতা বল্লে, অত রাত্তির অবধি মানুষে জেগে ব'সে থাকতে পারে? যদি ঘুমিয়ে পড়ি?

সুবি মাথা নেড়ে বল্লে, তা হ'লে ভারি অনর্থ হবে মা!

সুলতা তার দিকে কটমট ক'রে তাকিয়ে বল্লে, সুবি তোদের এ রাজপুরী, না জেলখানা? এখানে তোদের

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

নিয়ম-কানুনের চোটে মানুষ একেবারে পঙ্গু পাথর হ'য়ে যায়,—জানিনে কবে এখান থেকে মুক্তি পাব!

সুবি ঠোঁটের ওপর আঙুল দিয়ে বল্লে, চুপ্ কর মা, এখানে দেওয়ালেরও কান আছে। এ সব কথা রাজার কাছে পৌঁছতে একটুও দেরী হবেনা—আর তার-পর যা কাণ্ড হবে, তা মনে কর্‌তেও গা শিউরে উঠছে!

৫

এই কয়দিনে সুলতার দেহের অর্দ্ধেক লাবণ্য চ'লে গিয়েছে—চোখ দুটো কোটরগত। এখন সে স্পষ্ট বুঝতে পার্‌ছে যে মানুষের মন যেখানে পীড়া পায় সেখানে বাইরের শত ঐশ্বর্য্যও তাকে কোন শান্তি দিতে পারে না। রাত বারোটাই হবে কি একটাই হবে, বাইরে থেকে বাইজীর গান দুঃস্বপ্নের মত তার কানে এসে বাজছে, গহনার ভারে সমস্ত দেহ পীড়িত, ঘুমের ঘোরে চোখ বুজে আসচে! তবু জেগে ব'সে থাকতে হবে—মনের ভেতর যে হাহাকার উঠেছে, তাকে হাসি দিয়ে চাপা দিয়ে অভিনয় করতে হবে! ওই যে অজানা লোকটি এখনি আসবে, যার প্রতাপে সবাই সন্ত্রস্ত, তাকে কি ব'লে তুষ্ট করতে হবে, কেমন ক'রে তার সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে, এই কথা ভেবে তার বুক দুরুদুরু করতে লাগল।

তার পরে এলেন রাজা। তাঁর আগমন উপলক্ষে এমনি সব সুপ্রচুর ব্যবস্থা যে তাঁকে আর ভুল করা চলে না।

মদ খেয়ে এমনি উন্মত্ত যে ভাল ক'রে পা পড়ে না, কয়েক জনে ধরাধরি ক'রে এনে শয্যার উপর বসিয়ে দিলে। সুলতার দিকে একবার জোর ক'রে আধ-খোলা চোখে চেয়ে, মুখ থেকে অস্পষ্ট একটা শব্দ বেরোলো, 'ছোট—রাণী', তার পর শুয়ে প'ড়ে মহারাজা গভীর নাসিকা গর্জ্জনে নিদ্রাভিভূত হ'য়ে পড়লেন।

সুলতা চুপ ক'রে ব'সে ব'সে দেখতে লাগলো; তার চোখ থেকে ঘুমের অবশেষটুকু পর্য্যন্ত লুপ্ত হ'য়ে গেল। মদের উৎকট গন্ধে ও নাসিকা-গর্জ্জনে তার সমস্ত দেহটা গুলিয়ে উঠ্‌তে লাগলো। এই রাজা, এই রাজার রাণী সে? এর সমস্ত অন্তরটা কুষ্ঠ-রোগীর মত কুৎসিৎ ক্ষতে পরিপূর্ণ, একেই তার স্বামী ব'লে স্বীকার কর্‌তে হবে? তপ্ত অশ্রুতে তার দুই চোখ ভ'রে গেল। চোখ ফিরিয়ে খোলা জানালার পথে মুক্ত আকাশের দিকে চেয়ে যেন কতকটা স্বস্তি বোধ হ'ল।

তখনও ভাল ক'রে আলো ফোটেনি, সুলতা এই নিদ্রিত পশুর ঘর ত্যাগ ক'রে অন্য ঘরে গিয়ে বাঁচল।

তিন দিন পালা, দ্বিতীয় দিনও কাটলো এমনি ক'রে।

তৃতীয় রাত্রের গোড়াকার কাহিনী এই রকমই, কিন্তু বোধ করি সেদিন পানটা হয়েছিল কিছু কম, সুতরাং শেষ রাত্রে রাজা জেগে উঠে বসল। ডাকলে,—রাণী।

সুলতা আকাশের দিকে চেয়ে চুপ্‌চাপ বসেছিল, নড়লও না, কথার জবাবও দিলে না।

রাজা উঠে গিয়ে তার হাত ধ'রে যথাসম্ভব গলার স্বর মিঠে করবার চেষ্টা ক'রে ডাকলে,—রাণী।

মুহূর্ত্তে রাজার হাত ছাড়িয়ে, সুলতা গর্জ্জন ক'রে উঠল, খবরদার ছুঁয়োনা।

গোড়ায় রাজার মুখে একটা প্রচ্ছন্ন হাসির ভাব দেখা দিল, তারপর সুলতার মুখের দিকে তাকিয়ে, ক্রমশঃ মুখ কালো গম্ভীর হ'য়ে উঠল।

রাজা হেঁকে বল্লে, তার মানে রাণী?

সুলতা বল্লে, তুমি আমাকে ছুঁয়োনা!

রাজা চোখ পাকিয়ে বল্লে, কি? এতবড় সাহস? জানো তুমি, আমার শক্তি?

সুলতার মন একেবারে বিদ্রোহী হ'য়ে উঠেছিল। সে বললে, শক্তি তোমার প্রচণ্ড, সে পরিচয় কত বিবিধ প্রকারেই না পাচ্ছি। বাঘেরও শক্তি প্রচণ্ড মহারাজ। কিন্তু বাঘের ওপর আমার কোন মোহ নেই। আমি চাই মানুষ। আমাকে বিদায় দাও মহারাজ।

রাজা হেসে বল্লে, রাণী এত সুখ, এত সম্পদ, এত গহনা, দাস-দাসী চাকর, গাড়ী ঘোড়া আসবাব আয়োজন,—একবার ভেবে দেখ, এই সবই কি তুমি চাও নি, এই সবই কি তুমি চাও না?

সুলতা কেঁদে বল্লে—না কখ্‌খনো চাই না, কখ্‌খনো চাই না—আমাকে যেতে দাও রাজা,—আমি তোমার

খেলার পুতুল নই, আমি উচ্ছৃঙ্খলের বিলাস-সামগ্রী নই, আমি নারী!

অত্যন্ত কঠোর হাসি হেসে রাজা বল্লে,—না তুমি রাণী!

সুলতা কাঁদতে কাঁদতে বল্লে, না আমি হৃদয়-হীন উচ্ছৃঙ্খল রাজার ঘরে রাণী হ'তে চাইনে, আমার বিলাস-সামগ্রীতে কোনো দরকার নেই, আমাকে বিদায় দাও রাজা!

রাজার কঠোর হাস্যে সমস্ত ঘরটা যেন খট্‌-খট্‌ ক'রে উঠল।

রাজা কঠিন হ'য়ে বল্লে, যে একবার রাজার ঘরে রাণী হ'য়ে আসে, তার আর মৃত্যু ছাড়া মুক্তি নেই রাণী।—ব'লে রাজা তার কোষবদ্ধ তরবারি দৃঢ় ক'রে ধরলে, কোষের ভেতর তরবাল ঝন্‌ঝন্‌ ক'রে উঠল।

সুলতার চোখ দিয়ে যেন আগুন বেরোচ্ছিল, বল্লে, তবে মৃত্যুই দেও!

রাজা বল্লে, তাই ভাল। মুক্তি আর অন্য কোনো উপায়েই নেই। আমার এই তরবারি বহু নারীর রক্ত পান করেছে রাণী, তার কোনো দ্বিধা নেই।

তার পর দক্ষিণ-হস্ত সুলতার দিকে প্রসারিত ক'রে বললে, এখনো ভেবে দেখ,—এই ঐশ্বর্য্য, এই সম্পদ, এখনো রাজা তোমাকে আহ্বান করছে রাণী হবার জন্যে।

সুলতা তার দিকে স্থির ভাবে চেয়ে বল্লে, পশু, তোমার রাণীত্বে আমি পদাঘাত করি। ভগবান, মেয়েমানুষ হ'য়ে যদি আবার জন্মাই ত' আমার এই প্রার্থনা যেন আর রাণী না হই, যেন নারী হ'য়ে গৃহস্থের সংসারে আমার স্থান হয়।

উত্তরে সশব্দে রাজা কোষ থেকে তরবারি বার ক'রে বল্লে, তবে প্রস্তুত?

সুতীক্ষ্ণ তরবারির উপর উজ্জ্বল আলো প'ড়ে ঝকমক ক'রে উঠল, তারই কঠিন আলো সুলতার মনেরভেতর কেমন একটা ভয়ের ধাঁধা লাগিয়ে দিলে, ওরই এক আঘাতে তার এই অপরূপ রূপ-লাবণ্য-সৌন্দর্য্য মুহূর্ত্তে শেষ হ'য়ে যাবে,—প্রাণপণে সে চীৎকার ক'রে উঠল, রাজা—রাজা!

কে যেন দূর থেকে ডাকলে, সুলতা, সুলতা—

সেই প্রেমোত্তপ্ত বীণা-নিন্দিত স্বর এই বিভীষিকাময় ঘরের ভিতর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হ'য়ে যেন এর রুক্ষতাকে মুহূর্ত্তে শান্ত ক'রে দিলে; রাজার উত্থিত তরবারি স্তম্ভিত হ'য়ে গেল, এবং সেই অত্যন্ত সুপরিচিত স্বরের নিক্কণ যেন সুলতার হৃদয়ের অন্তর-তম প্রদেশে অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে বারংবার ঝঙ্কৃত হ'য়ে ফিরতে লাগল—

* * *

সুলতা—সুলতা,

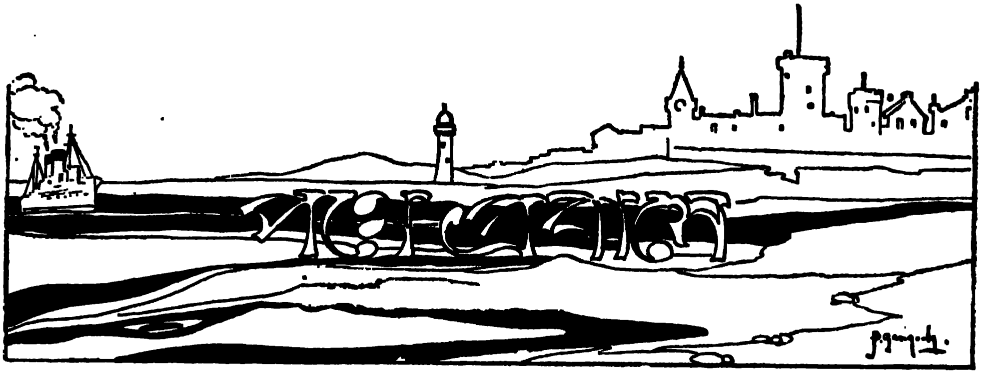
চোখ খুলে সুলতা দেখলে বিপিন।

বিপিন জিজ্ঞাসা করলে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাঁদছিলে কেন সুলতা?

সুলতা বিস্ফারিত চোখে বিপিনের মুখের দিকে চেয়ে রইল, দেখে যেন আর তৃপ্তি নেই? তারপর সহসা তার পা দুটো জড়িয়ে ধ'রে কেঁদে উঠল।

বিপিন তাকে তুলে বল্লে, হয়েছে কি?

সুলতা বিপিনের বুকের ভেতর মুখ লুকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললে,—আ বাঁচলুম, বড় দুঃস্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম!



—শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

১

আমার পথের আরম্ভ হলো শ্রাবণের এক মধ্যরাত্রে—তিথি মনে নেই, কিন্তু শুক্লপক্ষের আকাশে চাঁদ ছিল না।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ ঘুরে ভারতবর্ষের বাইরে আমার পথ—কটক থেকে বম্বে, বম্বে থেকে লণ্ডন। বঙ্গোপসাগরের কূলে কূলে, পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতমালার ধারে ধারে, চিল্কাহ্রদের কোল ঘেঁষে, গোদাবরীর বুক চিরে, হায়দরাবাদের তেপান্তরী মাঠ পেরিয়ে, পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালার সানু জুড়ে আমার পথ—কটক, ওয়ালটেয়ার, বেজওয়াড়া, সেকান্দ্রাবাদ, পুনা, বম্বে।

চিল্কার সঙ্গে এবার আমার দেখা আঁধার রাতের শেষ প্রহরে, সুন্দরী তখন আলোর স্বপ্ন দেখ্ছে, তার দিগন্তজোড়া চোখের পাতায় যোগমায়ার অঞ্জন শ্বেতাভ হয়ে আস্ছে।

তমালবন দেখ্তে পেলুম না, কিন্তু চিল্কা থেকে গোদাবরী পর্য্যন্ত—হয়তো আরো দক্ষিণেও তালীবনের অন্ত নেই। পথের একধারে পাহাড়ের পর পাহাড়, কিন্তু সব ক'টাই রুক্ষ, গায়ে তরুলতার শ্যাম প্রলেপ নেই, মাথায় নির্ঝরিণীর সরস স্নেহ নেই। পথের অন্যধারে ক্ষেত—কিন্তু বাংলার মতো তরল হরিৎ নয়।

প্রকৃতির এই বর্ণ-কার্পণ্য মানুষ তার পরিচ্ছদের বর্ণ-বৈচিত্র্য দিয়ে পুষিয়ে দিয়েছে। বিধাতা যেখানে শিল্পী সাজেন না মানুষকে সেখানে শিল্পী সাজ্তে হয়। মেয়েরা তো রঙীন ছাড়া পরেই না, পুরুষরাও রঙীন পরে, এমন দেখ্তে পেলুম। এদেশে অবরোধ-প্রথা নেই, পথে ঘাটে সুবেশা সুকেশীর সাক্ষাৎ মেলে—"সুকেশী", কারণ এদেশের মেয়েরা মাথায় কাপড় দেয় না, বিধবারা ছাড়া। এদেশের জীবননাট্যে নারীর ভূমিকা নেপথ্যে নয়। দক্ষিণ-ভারত নারীকে তার জন্মস্বত্ব থেকে বঞ্চিত না করে পুরুষকে সহজ হবার সুযোগ দিয়েছে। মুক্ত প্রকৃতির কোলে Wordsworth-এর Lucy যেমন ফুলের মতো ফুটেছিল মুক্ত সমাজের কোলে মানুষও তেমনি মাধবী লতার মতো সুন্দর এবং সহকারের মতো সবল হতে পায়। বদ্ধ সমাজের অর্দ্ধজীবি নারী-নর এহেন সত্য অস্বীকার করবে জানি, কিন্তু এদেশের লোককে তর্কের দ্বারা বোঝাতে হবে না যে, মানুষ মানে পুরুষ ও মানুষ মানে নারী। নারীকে নিজের কাছে দুর্লভ করে আমরা উত্তর-ভারতের লোক নিজেকে চিন্‌তে ভুলেছি এবং যে আনন্দ আমরা হেলায় হারিয়েছি তার ধারণাও আমরা কর্‌তে কষ্ট পাচ্ছি। জন্মান্ধের যেমন আলোকবোধ থাকে না আমাদের তেমনি নারী-বোধ নেই, যা আছে তার নাম দিতে পারা যায় "কামিনী-জননী-বোধ"।

এখন যার নাম হায়দারাবাদের নিজামরাজ্য আগে তার নাম ছিল গোলকোণ্ডা। দেশটি সুদৃশ্য নয়, সুজলা সুফলাও নয়। যতদূর দৃষ্টি যায় কেবলি প্রান্তর, কদাচ কোথাও শৈলশুচিত, কদাচ কোথাও শস্তচিত্রিত। মাঝে মাঝে দেখা যায়—পাহাড়ের গায়ে দুর্গ। সন্দেহ হয় পাহাড়টাই দুর্গ, না দুর্গটাই পাহাড়। সমস্ত দেশটাই

যেন একটা বিরাট ঘুমন্তপুরী—জনপ্রাণী নেই, গাছপালা নেই, পাখী-পাখা নেই। তাবলে হায়দরাবাদের লোকসংখ্যা বড় অল্প নয়—প্রায় দেড় কোটী। এর পূর্ব্বভাগে তেলেগুদের বাস, পশ্চিমভাগে মারাঠা ও কানাড়ীদের। আর এদেশের রাজার জাত মুসলমানেরা। রেলে যাদের দেখ্‌লুম তাদের বেশির ভাগ মুসলমান। উর্দ্দু জবান জানা থাক্‌লে ভ্রমণের অসুবিধা নেই।

কানাড়ী মেয়েদেরও অবরোধ নেই। তারা পুরুষের সঙ্গে পুরুষেরই মতো কঠিন খাট্‌ছে, এমন দেখা গেল। পথের ধারে ক্ষেত, কিসের ক্ষেত জানিনে, ধানের নয়, জোয়ারের কিম্বা বাজ্‌রার কিম্বা অন্য কিছুর। ছাব্বিশ জন পুরুষের মাঝখানে হয়তো একজন মেয়েও খাট্‌ছে, "লজ্জা সরম" নেই! নারী যে কর্ম্মসহচরীও।

মহারাষ্ট্র পাহাড় পর্ব্বতের দেশ—বহিঃপ্রকৃতি রুদ্র সুন্দর। নর নারীর মুখে চোখে কমনীয়তা প্রত্যাশা করাই অন্যায়। বেশভূষায় নারী যেন পুরুষের দোসর। মালাবারে যেমন পুরুষেও কাছা দেয় না, মহারাষ্ট্রে তেমনি মেয়েমানুষেও কাছা দেয়। ফলে, পায়ের পশ্চাদ্ভাগ অনাবৃত থেকে যায় ও কটু দেখায়। কিন্তু নারীকে যদি পুরুষের মতো স্বচ্ছন্দে চলাফেরা ও ছুটোছুটি কর্‌তে হয় তবে এছাড়া উপায়ান্তর নেই। আমেরিকায় কর্ম্মী মেয়েরা পায়জামা পরে কাজ করে। মারাঠা মেয়েরা কর্ম্মী-প্রকৃতি। তাদের অবরোধ নেই, তরুণীরা পায়ে হেঁটে স্কুল কলেজে যাচ্ছে, বয়স্কারা attache case হাতে বাজার কর্‌তে বেরিয়েছেন, কত মেয়ে একাকী ট্রামে উঠ্‌ছে, ট্রেণে বেড়াচ্ছে, ভয়ডর নেই, লজ্জা সঙ্কোচ নেই, পুরুষের সঙ্গে সহজ ব্যবহার। পায়ে বর্ম্মী চটীর মতো হাল্‌কা খোলা চটী, পরণে নীল বা বেগুনী—একটু গাঢ় রঙের—ঈষৎ কোঁচা কাছা দেওয়া শাড়ী, পিঠের ওপর একরঙা শাড়ীর বহুরঙা আঁচল চওড়া ক'রে বিছানো, মাথায় কাপড় নেই, কবরীতে ফুলের গাপ্‌ড়ী গোঁজা কিম্বা ফুলের মালা গোল করে জড়ানো, হৃষ্টপুষ্ট সুবলয়িত দেহাবয়বে অল্প কয়েকগাছা অলঙ্কার, প্রশস্ত সুগোল মুখমণ্ডলে সপ্রতিভ পুরুষকারের ব্যঞ্জনা—মহারাষ্ট্রের মেয়েদের দেখে মোটের ওপর মহাসম্ভ্রম জাগে। তন্বী এদের মধ্যে চোখে পড়্‌ল না, কিন্তু পৃথুলাও চোখে পড়ে না। সুস্থ সবল ও সপ্রতিভ বলে এদের অধিকাংশকেই সুশ্রী দেখায়, কিন্তু "রমণীয়" দেখায় বল্লে বোধ হয় বেশি বলা হয়। এদের চালে-চলনে-চেহারায় পৌরুষের ছায়া পড়েছে বলে এদের নারীত্বের আকর্ষণ কমেছে এমনও বলা যায় না। পুরুষের কাছে নারী যদি কাবুলী পায়জামার ওপরে গেরুয়া আলখাল্লা ও গাড়োয়ানী ফ্যাসানের দশ আনা ছ' আনা চুলের ওপরে চিম্‌নী প্যাটার্ণের সিল্ক টুপী পরে তবু পুরুষের কাছে সে এমনি



শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়

চিত্তাকর্ষক থাক্‌বে। মারাঠা পুরুষদের চোখে মারাঠা মেয়েদের যে অপূর্ব্ব রমণীয় ঠেকে এ তো স্বতঃসিদ্ধ, আমার চোখেও তাদের নারীর মতনই ঠেকেছে। দৃষ্টিকটু বোধ হচ্ছিল কেবল শ্রমিক-শ্রেণীর মেয়েগুলিকে; মালকোচ্চা মারা পালোয়ানদের বুকে একটুক্‌রো জামার ময়লা নীল কাপড় জড়িয়ে বাঁধলে যেমন দেখাতো এদেরও অনেকটা তেমনি দেখায়। যেমন এদের ভারবহন ক্ষমতা, তেমনি এদের ছুটে চলার ক্ষিপ্রতা। আমাদের অঞ্চলের পুরুষরা পর্য্যন্ত এদের তুলনায় কুঁড়ে।

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

মারাঠা পুরুষদের বাহুবল সম্বন্ধে যে প্রসিদ্ধি আছে সেটা সত্য নয়, অন্ততঃ আপাত দৃষ্টিতে। এদের মনের বল কিন্তু অসাধারণ। মুখের ওপর আত্মসম্মানবত্তার এমন সুস্পষ্ট ছাপ অন্য কোনো জাতের মধ্যে লক্ষ্য করি নি। অর্থনৈতিক জীবনযুদ্ধে কিন্তু মারাঠারা গুজ্‌রাটীদের কাছে হঠ্‌তে লেগেছে। বম্বে শহরটার স্থিতি মহারাষ্ট্রেরই জিওগ্রাফীতে বটে, বম্বে শহরের জিওগ্রাফীতে কিন্তু মহারাষ্ট্রের স্থিতি গলির বস্তিতে আর গুজরাটের স্থিতি শড়কের চারতলায়। বাঙালী বাঘের ঘরে যেমন মাড়োয়ারী ঘোগের বাসা মারাঠা বাঘের ঘরে তেমনি গুজরাটী ঘোগের বাসা। গুজ্‌রাটী মানে পার্সীও বুঝতে হবে। পার্সীদেরও মাতৃভাষা গুজ্‌রাটী। ইদানীং অবশ্য ওরা কায়-বাক্যে ইংরেজ হবার সাধনায় লেগেছে।

গুজরাটী জাতটার প্রতি আমার কেমন এক রকম পক্ষপাত আছে। শুনেছি ওদের সাহিত্য বাংলা সাহিত্যেরই ঠিক্ নীচে এবং রবিহীন বাংলা সাহিত্যের সমকক্ষ। গান্ধীর মতো ভাব-শিল্পী যে জাতির মনের শুন্যে পুষ্ট, সে জাতির মনকে বাঙালীমনের অনুজ ভাবা স্বাভাবিক। গুজরাটীরা পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে প'ড়ে নানা দেশের ধনের সঙ্গে সঙ্গে নানা দেশের মনেরও আম্‌দানী কর্‌ছে এবং বিদেশী মনের সোনার কাঠি আমাদের মতো ওদের সাহিত্যকেও সোনা করে দিচ্ছে। তফাৎ এই যে, আমরা যা বইয়ের মারফৎ পাই ওরা তা সংসর্গের দ্বারা পায়।

গুজরাটী পুরুষরা যে পরম কষ্টসহিষ্ণু ও কর্ম্মঠ এ তো আমরা দেশে থেকেও জানি, তাদের ব্যবসায়-বুদ্ধিও বহুবিদিত। গুজরাটী মেয়েদের মধ্যেও এই সব গুণ আছে কি না জানি নে। তাদের পর্দ্দা নেই, তবে উত্তর ভারতের সঙ্গে সংস্পৃষ্ট বলে গতিবিধির স্বাধীনতা মারাঠাদের চেয়ে কিছু কম। গুজরাটী মেয়েদের পরিচ্ছদ-পারিপাট্য আমাদেরি মেয়েদের মতো ; কাপড় পরার ভঙ্গীতে ইতরবিশেষ থাক্‌লেও মোটের ওপর মিল আছে। মারাঠা মেয়েরা সচরাচর যে অন্তর্ব্বাস পরে তার ঝুল বুকের নীচে পর্য্যন্ত—কোমরের কাছটা অনাবৃত ও শাড়ী দিয়ে ঢাক্‌তে হয়। গুজরাটী মেয়েরা কিন্তু আপাদচুম্বী অন্তর্ব্বাস পরে' তার ওপরে শাড়ী পরে। শুনেছি আমাদের মেয়েদের অন্তর্ব্বাস পরা সুরু হয় গুজরাটেরই অনুকরণে ও সত্যেন্দ্র ঠাকুর মহাশয়ের পত্নীর দ্বারা।

আমাকে সকলের চেয়ে মুগ্ধ কর্‌লে গুজরাটী মেয়েদের দেহের তনুত্ব ও মুখের সৌকুমার্য্য। মারাঠাদের সঙ্গে এদের অমিল যেমন স্পষ্ট বাঙালীদের সঙ্গে এদের মিলও তেমনি স্পষ্ট। তবে বাঙালী মেয়েদের দেহের গড়নের চেয়ে গুজরাটী মেয়েদের দেহের গড়ন অনেক বেশি সুসমঞ্জস (Symmetrical); এবং বাঙালী মেয়েদের মুখশ্রীতে যেমন স্নিগ্ধতার মাত্রাধিক্য গুজরাটী মেয়েদের মুখশ্রীতে তেমন নয়।

পার্সীরাই হচ্ছে এ অঞ্চলের Leaders of fashion। তারা কাঞ্চন কুলীন তো বটেই, রীতিরুচিতেও অভিজাত। পার্সী মেয়েদের জাঁকালো বেশভূষার সঙ্গে ইঙ্গবঙ্গদের পর্য্যন্ত তুলনা করা চলে না। অন্ততঃ তিনপ্রস্ত অন্তর্বাস বাইরে থেকে লক্ষ্য কর্‌তে পারা যায়; প্রৌঢ়াদেরও শাড়ীর বাহার আছে। মারাঠাদের যেমন আঁচলের বাহার পার্সীদের তেমনি পাড়ের বাহার। হাল্‌কা রঙের আদর এ অঞ্চলে নেই। হাজার হাজার নানা বয়সী মেয়ের মধ্যে মাত্র কয়েকজন কিশোরীকেই হাল্‌কা রঙের শাড়ী পর্‌তে দেখ্‌লুম। শাদার চল্ একমাত্র গুজরাটীদের মধ্যেই পরিলক্ষ্য। বল্‌তে ভুলে গেছি গুজরাটী ও পার্সীরা মাথায় কাপড় দেয়, কিন্তু ঘোমটার মতো করে নয়, খোঁপার সঙ্গে এঁটে। গহনার বাহুল্য নেই—আমাদের মেয়েদের তুলনায় এরা নিরলঙ্কার। পার্সী মেয়েরা ইংরেজী জুতো পায়ে দেয়—গুজরাটী মেয়েরা সচরাচর কোনো জুতোই পায়ে দেয় না—মারাঠা মেয়েরা চটী পরে।

বম্বে শহর কল্‌কাতার চেয়ে আকারে ছোট কিন্তু প্রকারে সুন্দর। প্রায় চারিদিকে সমুদ্র, অদূরে পাহাড়, ভিতরেও "মালাবার হিল্" (Malabar Hill) নামক অনুচ্চ পাহাড়, তার ওপরে বড় বড় লোকের সাজানো হর্ম্ম্য। শহরের রাস্তাগুলি যেন প্ল্যান করে তৈরি। বম্বেবাসীদের রুচির প্রশংসা কর্‌তে হয়—টাকা তো কল্‌কাতায় মাড়ো-

স্বামীদেরও আছে, কিন্তু তাদের রুচির নিদর্শন তো বড়-বাজারের "ইটের পর ইট"! বম্বের প্রত্যেক খানি বাড়ীরই যেন বিশেষত্ব আছে—প্রত্যেকেরই ডিজাইন স্বতন্ত্র। শহরটা ছবিল (picturesque)। কিন্তু আমার মনে হয় এ সত্ত্বেও বম্বে ভারতীয় নগর-স্থাপত্যের ভালো নিদর্শন নয়—বম্বের বাস্তু-শিল্পের গায়ে যেন ইংরেজী গন্ধ পেলুম, তাও খাঁটি ইংরেজী নয়। তবু কল্‌কাতার নাই-শিল্পের চেয়ে বম্বের কাণা-শিল্প ভালো।

(ক্রমশঃ)

অদৃশ্যা

(প্রাচীন আসামী হইতে অনুবাদ)

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

এমন সুন্দর তুমি কে জানিত আগে!
শঙ্কিত সন্ধ্যার তারা আসে রে যেমন
কুণ্ঠিত গুণ্ঠন টানি' অস্ত-রবি-রাগে
আলোক-উন্মুখ চোখে পড়ে কি তখন!
তারপরে একেবারে দিগন্তের কূলে
বিদায়-পাণ্ডুর মুগ্ধ শশিকলা সম
দেখা দিলে অকস্মাৎ—ক্ষুব্ধ আঁখি তুলে
'ওই বুঝি' বলিতেই গেলে প্রিয়তম!

অন্তরবাসীরে কেবা দেখেছে নয়নে!
দেখিয়াছি মেঘ-পাণ্ডু বসন তোমার—
কুসুম-পরশ হাত ক্বণিতকঙ্কণে
অদৃশ্য বীণার তারে কাঁপে বারম্বার!
যতটুকু দেখি নাই আছ তত খানি
দ্বিতীয়ার চন্দ্র বলে পূর্ণিমার বাণী!

আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার সমূহ অবলম্বন করিয়া লেখা "উদ্ভিদের চেতনা" নামক লেখকের যে গ্রন্থ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে, ইহা তাহার অন্যতম প্রবন্ধ।

উদ্ভিদের স্নায়ু

—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

লজ্জাবতীর পাতা ছুঁইলে পড়িয়া যায়, ইহা সকলেই দেখিয়াছে। কিন্তু কেন পড়িয়া যায়, কয়জন তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছে? এই 'কেন'র জবাব দিবার জন্য পৃথিবীর বহু বৈজ্ঞানিক বহুকাল যাবৎ নানারকম চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু কেহই এ পর্য্যন্ত তেমন কোন সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই।

উদ্ভিদরাজ্যের অন্যান্য অনেক সমস্যার মত আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র এই সমস্যাটিরও চমৎকার মীমাংসা করিয়াছেন। ঠাণ্ডা বাতাসের অথবা তুষার-শীতল হাতের ছোঁওয়া লাগিলে প্রাণীর দেহে যেমন কাঁপন ধরে, স্পর্শের ফলে লজ্জাবতীর সর্ব্বদেহের ভিতর দিয়াও তেমনি কম্পন বহিয়া যায়—এবং সে সঙ্কোচে নুইয়া পড়ে। আচার্য্য জগদীশ বলেন, স্পর্শানুভূতি বিষয়ে প্রাণী ও উদ্ভিদের তফাৎ নাই। আচার্য্যের এই উক্তি যে কত খাঁটি সে কথাই এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

প্রাণিগণ কিরূপে বাহিরের স্পর্শ দেহের ভিতর অনুভব করে প্রথমে সে কথাটাই জানা দরকার। প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ পরীক্ষার দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, শরীরের ভিতরের স্নায়ুমণ্ডলীর সাহায্যেই প্রাণীরা বাহিরের স্পর্শ বা অন্য যে কোনও রকমের আঘাতের কথা টের পাইয়া থাকে, বাহিরের আঘাত জনিত উত্তেজনা শরীরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া যখন মস্তিষ্কে পৌছায়—আমরা তখনই আঘাত অনুভব করি। যে পথ বাহিয়া এই উত্তেজনা মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত সঞ্চালিত হয় তাহাই স্নায়ু। মস্তিষ্ক ভিন্ন মাংসপেশীর সঙ্কোচন দ্বারাও আঘাত টের পাওয়ার কথা জানা যাইতে পারে। আহত স্থানের উত্তেজনা স্নায়ুর পথে মাংসপেশীতে পৌছিবামাত্রই পেশী সঙ্কুচিত হয়। সেই সঙ্কোচ দেখিয়াই বুঝা যায় আঘাত টের পাওয়া গিয়াছে কিনা। কয়েকটা উদাহরণ দিলেই বিষয়টা বেশ পরিষ্কার হইবে।

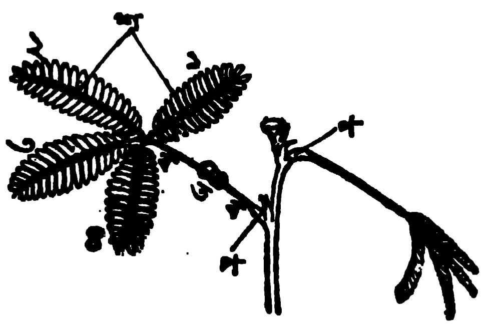
টিকটিকীর লেজ কাটিয়া ফেলিলে, শুধু লেজটাই লাফাইতে থাকে। আঘাতের উত্তেজনা স্নায়ুর সাহায্যে লেজের পেশীগুলিতে পৌঁছিবার পর পেশীগুলি কুঞ্চিত হইতে থাকে এবং সেই জন্যই লেজটা লাফায়। কাটা-কই-মাছ ভাজিবার সময় তেলে দেওয়ামাত্রই লাফাইয়া উঠে—ইহা অতি সাধারণ ঘটনা। এখানে সেই একই কথা; আঘাত জনিত উত্তেজনার ফলে মাংসপেশীর আকুঞ্চন। এই উভয় ক্ষেত্রেই মাথাটা কাটিয়া ফেলা হইয়াছে; তবু আঘাত যে উহারা টের পাইয়াছে; (কইমাছের বেলা গরম তেলের স্পর্শরূপ আঘাত) তাহাতে সন্দেহ নাই। কাহারও আঙ্গুলের ডগায় চিমটি কাটিলে সে যে শুধু ব্যথা অনুভবই করিবে, তাহা নহে, আঘাতের ফলে তাহার বাহুর পেশীও সঙ্কুচিত হইবে এবং হাতটা নিজে-নিজেই গুটাইয়া যাইবে।

প্রাণীদেহের এই স্নায়বিক ব্যাপারটাকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম—বাহিরের আঘাত, দ্বিতীয়—আঘাত জনিত উত্তেজনার স্নায়ুর পথে সঞ্চলন, এবং তৃতীয়—উত্তেজনা-প্রবাহ পেশীতে পৌঁছিলে তাহার সঙ্কোচ। পণ্ডিতগণ আবার স্নায়ুমণ্ডলীর কতকগুলি বিশেষত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। যাহাদের ভিতর এই বিশেষত্ব গুলি খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে তাহাদেরই স্নায়ু আছে বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। আগে সেই বিশেষত্বগুলির একটা হিসাব লওয়া যাক:—

(ক) ঠাণ্ডা লাগিলে স্নায়ুর উত্তেজনা বহন করিবার শক্তি কমিয়া যায়—অর্থাৎ আঘাত করার পর তাহার ফলে পেশী সঙ্কুচিত হইতে সাধারণ অবস্থায় যে সময় লাগে স্নায়ুর গায়ে ঠাণ্ডা লাগিলে সময়টা লাগে আরও বেশী।

(খ) স্নায়ুর উপর বিষপ্রয়োগ করিলে তাহার উত্তেজনা-বহন-শক্তি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যায়—অর্থাৎ হাজার আঘাত করিলেও তখন আর আঘাতের উত্তেজনা স্নায়ু বাহিয়া পেশীতে পৌঁছায় না—তাই আঘাতের ফলে পেশী কুঞ্চিত হয় না।

(গ) ঠাণ্ডা না লাগাইয়া অথবা বিষ প্রয়োগ না করিয়া যদি স্নায়ুশরীরে তড়িৎ প্রবাহিত করা যায় তাহা হইলেও অনুরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। যতক্ষণ তড়িৎ প্রবাহিত হয় স্নায়ুর উত্তেজনা-বহন-শক্তিও ততক্ষণ লুপ্ত থাকে। প্রবাহ রুদ্ধ করিলে আবার স্নায়ু তাহার সাধারণ শক্তি ফিরিয়া পায়।



লজ্জাবতীর পাতা।
১, ২, ৩, ৪, =চারিটি পত্রাংশ।
ব ব =বোঁটা, শ=শির,
প, প=পেশী,
ত=যে স্থানে তুলোজড়ানো বা যেখানে তড়িৎ প্রবাহিত।

এই তো গেল প্রাণিগণের স্নায়ু-বিশেষত্বের প্রধান কথা। এখন পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে উদ্ভিদের পক্ষেও এই নিয়মগুলি যথাযথ খাটে কি না।

পরীক্ষা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে কিন্তু কিরূপ ভাবে উদ্ভিদকে আঘাত করিতে হইবে, সে কথা একটু আলোচনা করা দরকার। অত্যন্ত জোর আঘাত দিয়া এসকল সূক্ষ্ম পরীক্ষা করা যায় না। চিমটি না কাটিয়া যদি হাতে কেহ একটা ছোরা বসাইয়া দেয়, তাহা হইলে মুহূর্ত্ত মধ্যেই লোকে লাফাইয়া উঠে। বাহুর পেশীই মাত্র সঙ্কুচিত হইল কিনা, তখন কেবল সেইটুক লক্ষ্য করিবার সুযোগ থাকে না—সমস্ত শরীরই যে একসঙ্গে শিহরিয়া উঠে! আরও একটা দৃষ্টান্ত লওয়া যাক্। বাড়ীর আদরের পুষীটিকে যখন ধীরে-ধীরে আঘাত করা যায়, হাত বুলাইয়া যখন তাহাকে আদর জানানো যায়, তাহার শরীর আস্তে আস্তে ফুলিয়া ওঠে, লোমগুলি দাঁড়াইয়া উঠিতে থাকে। স্পর্শের বার্ত্তা তাহার শরীরের স্নায়ু বাহিয়া সমস্ত দেহ ভরিয়া আনন্দ জানাইয়া দেয়। কিন্তু তাহাকে জোরে এক ঘা বসাইয়া দিলে তখনই সে আতঙ্কে পলাইবে, মুহূর্ত্তও অপেক্ষা করিবে না। গাছের বেলাতেও তাই। আঘাত বেশী হইলে চোখের পলক না ফেলিতেই সমস্ত গাছটা আতঙ্কে কুঁচকিয়া মুড়িয়া যায়। তাই ধীর সংযত আঘাত ভিন্ন উদ্ভিদ-দেহে কোন পরীক্ষাই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না।

বৈজ্ঞানিক খুঁটিনাটি মানিয়া চলিতে হইলে অবশ্য তড়িদাঘাতই (Electric Shock) সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু তাছাড়া আর কোন রকম আঘাতই যে কার্য্যকরী হইবে না—এমনও নহে। বৈদ্যুতিক আঘাত সকল সময়ে সকলের পক্ষে ব্যবহার করা সম্ভব হইয়া উঠে না। তাই অন্য দুই একটি সহজ উপায়ের কথাই এখানে উল্লেখ করিব:—

একটা ছুঁচের মুখ পাথরে ঘসিয়া খুব তীক্ষ্ণ করিয়া লইতে হইবে। এখন এই সূক্ষ্ম প্রান্তটি অতি ধীরে লজ্জাবতীর যে কোনও একটি পত্রাংশের শিরের গায়ে লঘুভাবে অতি সামান্য ফুটাইয়া দিতে হইবে—পাতাটা যেন নড়িয়া না যায়। * ছুঁচ-ফুটানো অপেক্ষা আরও সুবিধা হয় যদি বেশ ধারাল কাঁচি একখানা সংগ্রহ করা যায়।

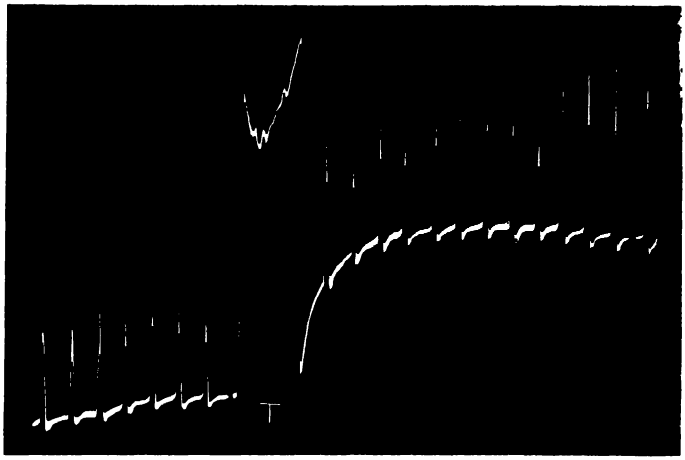
* চারিটি পত্রাংশ (Sub-petioles) মিলিয়া লজ্জাবতীর একটি সম্পূর্ণ পাতা। পাতার বোঁটা (Petiole) যেখানে শাখার গায়ে লাগিয়া থাকে, সেখানটা অপেক্ষাকৃত একটু মোটা বা ফুলা (স্ফীত)—ইহাই পাতার পেশী (Pulvinus)। প্রত্যেকটি পত্রাংশ আবার বহু ছোট ছোট পাতার (Leaflets) সংযোগে নির্ম্মিত। এই ছোট-পাতাগুলি জোড়ায়-জোড়ায় পত্রাংশের শিরের (Midrib) গায়ে লাগিয়া থাকে।

উদ্ভিদের স্নায়ু

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন-গুপ্ত

পত্রাংশের ডগার দিকের দুই-তিনটি ছোট পাতা কাঁচি দিয়া 'কুচ্' করিয়া কাটিয়া দিলেই চমৎকার কাজ চলে। এ কাজটা করাও যায় শীঘ্র এবং পাতাটারও নড়িয়া যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে না। এইবার পরীক্ষা আরম্ভ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ লজ্জাবতী পাতার বোঁটাতে যে কোনও স্থানে সামান্য একটু তুলা জড়াইয়া লইতে হইবে। তারপর কোন একটি পত্রাংশের দুই-একটি ছোট পাতা কাটিলেই—আঘাত দেওয়ার কাজ সম্পন্ন হইল। এইবার ছোট পাতাগুলি বুজিতে আরম্ভ হইবে। কিছুক্ষণ বাদেই পাতাটাও 'ঝুপ্' করিয়া পড়িয়া যাইবে। ঘড়ি দেখিলে দেখা যায়, পত্রাংশের শেষ ছোট পাতাজোড়া নিমীলিত হওয়ার পর হইতে পাতাটা পড়িয়া যাওয়া অবধি অর্থাৎ পেশী পর্য্যন্ত আঘাতের অনুভূতি পৌঁছিতে সময় লাগিয়াছে ১৫।২০ সেকেণ্ড। আচার্য্য জগদীশ বলেন,—ছোট পাতা কাটাজনিত আঘাতের অনুভূতি পাতার বোঁটার ভিতরকার স্নায়ুপথে প্রবাহিত হইয়া পেশীতে পৌঁছায়, পৌঁছানমাত্রই পেশীটি সঙ্কুচিত হয় এবং পাতাটা পড়িয়া যায়—ঠিক যেমনটী প্রাণীর দেহে ঘটিয়া থাকে।

যদি সত্যসত্যই বোঁটার ভিতর উদ্ভিদের স্নায়ু থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে প্রাণিগণের স্নায়ুতে যে যে বিশেষত্ব দেখিয়াছি, বোঁটার উপর ঠাণ্ডা লাগাইলে, বিষ প্রয়োগ করিলে অথবা তড়িৎ প্রবাহিত করিলেও আমরা অবশ্যই তাহা দেখিতে পাইব।



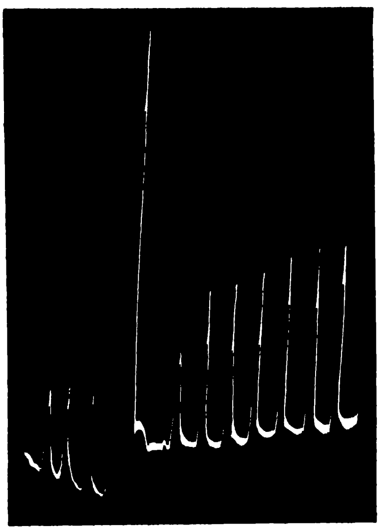
উদ্ভিদের অলস স্নায়ু।
T-তে আঘাত দেওয়া হইয়াছে।
উত্তেজনা-বহন-ক্ষমতা-বৃদ্ধি দীর্ঘতর রেখাদ্বারা সূচিত হইতেছে।

এইমাত্র দেখা গেল, পত্রাংশের শেষপ্রান্ত হইতে পেশী পর্য্যন্ত আঘাতের উত্তেজনা পৌঁছিতে সাধারণতঃ ১৫।২০ সেকেণ্ড সময় লাগিয়া থাকে। পাতাটা পড়িয়া যাওয়ার ১৫।২০ মিনিট বাদে আবার উহা প্রকৃতিস্থ হইয়া পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়াআসিবে। এইবার বোঁটার উপরে জড়ানো তুলা বরফ জল দিয়া ভালরূপে ভিজাইয়া দিতে হইবে। বোঁটাটা বরফের শীতে ভিতর অবধি বেশ ঠাণ্ডা হইয়া অন্তরস্থ স্নায়ুকেও শীতল করিয়া দিবে। এখন আবার পূর্ব্বের মত পত্রাংশের দুই-তিনটি ছোট পাতা কাটিয়া আঘাত দিতে হইবে। দুইবারের আঘাত যতটা সম্ভব একই রকমের হওয়া দরকার। * ঘড়ি ধরিয়া লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, আঘাতের উত্তেজনা পেশীতে পৌঁছিতে এবার আশ্চর্য্যরকম দেরী হইতেছে। বোঁটাটা যত বেশী ঠাণ্ডা করা যাইবে, এই বিলম্বের পরিমাণ ততই বাড়িয়া যাইবে। অনেকক্ষণ ধরিয়া খুব বেশী ঠাণ্ডা লাগিলে হয় তো উত্তেজনা পেশীতে মোটেই পৌঁছিবে না—অর্থাৎ পাতাটা মোটেই পড়িবে না। বরফজলের পরিবর্ত্তে তুলাটা কোনও বিষের জলে (যেমন, তীব্র

* আঘাতের সমতা বজায় রাখিবার জন্যই বৈজ্ঞানিকেরা তড়িতাঘাত সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন। তড়িৎ আঘাতের পরিমাণ ইচ্ছানুযায়ী ক্ষীণ ও ধীর করা যায়---সেও একটা সুবিধা। বসু বিজ্ঞান-মন্দিরে এই সকল পরীক্ষাই বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালী মতে করা হইয়াছে। শুধু যাহাতে পরীক্ষাগুলি সকলের পক্ষেই করিয়া দেখা সম্ভব হয়---এই জন্য সহজ উপায়ের কথাই মাত্র এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি।

'পটাশ সায়েনাইড্' বা তুঁতের জল) ভিজাইয়া দিলে ৪।৫ মিনিটের ভিতরেই উত্তেজনা-বহনশক্তি সম্পূর্ণ লোপ পাইবে। বিষের জল ব্যবহার না করিয়া তীব্র তড়িৎশক্তি প্রবাহিত করিয়াও ঠিক এইরূপ ফল পাওয়া গিয়াছে। যতক্ষণ তাড়িৎ-শক্তি প্রবাহিত করা যায়, উত্তেজনা বোঁটার ভিতর দিয়া পেশীতে গিয়া পৌঁছায় না; কিন্তু তড়িৎ রুদ্ধ করিলে আবার পূর্ব্বের মত আঘাতের ফলে পেশী সঙ্কুচিত হয়—পাতাটা পড়িয়া যায়।

কাজেই দেখা যাইতেছে, উত্তেজনা বহন বিষয়ে উদ্ভিদ ও প্রাণী একই নিয়ম মানিয়া চলে। প্রাণীর স্নায়ু আছে,



প্রাণীর অলস স্নায়ু।
আঘাতের পর উত্তেজিত অবস্থা।
প্রথম তিনটি অলস-অবস্থার সাড়া,
শেষের রেখাগুলি আঘাতের পর
অনুভূতি-বৃদ্ধি সূচনা করিতেছে।

আমরা সকলেই স্বীকার করি। উদ্ভিদও সেই রীতিনীতিই মানিয়া চলিল, তবে তাহারও স্নায়ু থাকিবে না কেন?

বৈজ্ঞানিকের সংশয় কিন্তু এত অল্পে তুষ্ট হয় না। আচার্য্যের জিজ্ঞাসু মনও ইহাতেই তৃপ্ত হয় নাই। তিনি আরও বহু পরীক্ষা দ্বারা তাঁহার মতবাদ দোষলেশহীন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সাধারণের পক্ষে সবগুলি পরীক্ষা নিজেদের হাতে করিয়া দেখা কষ্টসাধ্য। "বসু বিজ্ঞান-মন্দিরে" এই সব পরীক্ষা এমন নিখুঁতভাবে করা হইয়াছে যে, চোখে সেগুলি দেখিলে আর কোনও সংশয় থাকে না। তাহারই আরও দুই-একটি চিত্তাকর্ষক পরীক্ষার কথা উল্লেখ করিতেছি।

প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ প্রাণিদেহের স্নায়ু শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নানারূপ পরীক্ষা করিয়া থাকেন। আচার্য্য জগদীশচন্দ্রও উদ্ভিদের স্নায়ু বৃক্ষদেহ হইতে আলাদা করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। প্রাণীর স্নায়ু অনেককাল অকর্ম্মণ্য ভাবে পড়িয়া থাকিলে—বহুদিন কোনও ব্যবহারে না আসিলে, তাহার উত্তেজনা-বহন-শক্তি অনেকটা কমিয়া যায়, প্রায় অসাড় হইয়া পড়ে। হাত-পা ঝিঁ-ঝিঁ ধরার কথা সকলেই জানে। একখানা হাত কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া একইভাবে রাখিলে, মোটেই নাড়াচাড়া না করিলে দেখা যায় কিছুকালের জন্য তাহার বোধশক্তি কমিয়া গিয়াছে। সেই হাতে তখন চিম্‌টি কাটিলেও তেমন টের পাওয়া যায়না। বাতব্যাধির রোগীর যে কোনও অনুভব-শক্তি থাকে না, তা'র কারণ তাহার শরীরের সমস্ত স্নায়ু অসাড় হইয়া যায়। এরূপ কোনও অলস নিস্তেজ স্নায়ুকে আঘাত করিলে আবার তাহার অনুভব-শক্তি ফিরিয়া আসে—প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। বাতব্যাধির রোগীকে "ব্যাটারী" লাগাইবার কথা অনেকেরই জানা সম্ভব। "ব্যাটারী" লাগানো মানে আর কিছুই নহে, অসাড়-প্রায় স্নায়ুকে আঘাত দিয়া উত্তেজিত করা।

বসু বিজ্ঞান-মন্দিরে উদ্ভিদের অলস স্নায়ুর উপরও ঠিক এই পরীক্ষা করা হইয়াছে। আঘাতের ফলে প্রাণীর ও উদ্ভিদের অলস স্নায়ুর যে পরিবর্ত্তন হয়, এইখানে তাহার ছবি দেওয়া গেল—ছবি দুইটির সামঞ্জস্য মিলাইয়া দেখিবার বিষয়।

প্রাণীর স্নায়ুতে উত্তেজনা-প্রবাহ একদিকে অপেক্ষাকৃত বেশী তাড়াতাড়ি ভ্রমণ করে—ইহাও একটী পরীক্ষিত সত্য। স্নায়ুকেন্দ্রের দিকে তাহার গতি যত দ্রুত, বিপরীত দিকে তত দ্রুত নহে। উদ্ভিদেও অবিকল এইরূপ বিশেষত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। ছুঁচের তীক্ষ্ণ মুখ দিয়া লজ্জাবতী

গাছের একটা পত্রবাহী শাখার গা একটু খুঁচিয়া দেওয়া যাক্। এই আঘাতের উত্তেজনা শাখার ভিতরকার স্নায়ু বাহিয়া উপর ও নীচ দুইদিকেই প্রবাহিত হইবে এবং পাতার পেশীতে গিয়া পৌঁছিলে শাখার গায়ের পাতাগুলি পড়িতে থাকিবে। ঘড়ি দেখিয়া সময় লক্ষ্য করিলে দেখা যায়—উপরের দিকে একটা পাতার পর আরেকটা পাতা পড়িতে যত সময় লাগিয়াছে নীচের দিকে সময় লাগিয়াছে তার অনেক বেশী। অর্থাৎ আঘাত-জনিত উত্তেজনা লজ্জাবতীর স্নায়ু বাহিয়া উপর দিকে অধিকতর দ্রুত প্রবাহিত হইয়াছে।

আচার্য্য জগদীশের সুগভীর জ্ঞানদৃষ্টি এখানেও নিবৃত্ত হয় নাই। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ভিদের অন্তরতম ইতিহাস, তাহার ভিতরকার সূক্ষ্মতম গঠন-প্রণালী, আজ দিনের আলোকের মত উজ্জ্বল করিয়া তিনি বৈজ্ঞানিকের চোখে ধরিয়া দিয়াছেন। প্রত্যেক উদ্ভিদ্দেহের স্নায়ুসূত্র নিজের চোখে দেখিয়া অবিশ্বাসীর সকল সন্দেহ মিটিয়াছে, সংশয়ীর আর কোনও প্রশ্ন অমীমাংসিত নাই।

সকল তথ্য বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিয়া আচার্য্য জগদীশচন্দ্র কয়েকখানি বহুমূল্য পুস্তক লিখিয়াছেন। তাহাতে প্রাণীর স্নায়ুমণ্ডলীর প্রত্যেকটি বিশেষত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া উদ্ভিদের সঙ্গে তাহাদের অপূর্ব্ব সম্বন্ধ, চমৎকার সামঞ্জস্য প্রমাণিত হইয়াছে। আচার্য্যের জীবনব্যাপী সাধনার ফলে আজ সমস্ত বিজ্ঞানজগৎ বাঙালী বৈজ্ঞানিকের অতুলনীয় প্রতিভার কাছে শ্রদ্ধায় নতশির হইয়াছে।

ক্ষণিকা

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

জানি, বন্ধু, ক্ষণকালে রাঙিয়া রাঙিয়া
সত্যেরে করিয়া স্বপ্ন মিথ্যারে ভাঙিয়া,
নির্ম্মম পরশে গাঁথি চেতনা স্বপন
আমারে ক্ষণকে বাঁধি রচিলে ভুবন।
নিত্য দ্রুত সঞ্চয়ের জনমে মরণে
আহরণ বিসর্জ্জন প্রতি পলে ক্ষণে,
ছিঁড়িয়া জুড়িয়া ডোর ব্যাকুল মায়ার
সাজ ক'রে দিয়ে চলি সর্ব্ব চেতনার—
তারি মাঝে শেষ ক'রে নিতে দীপ জ্বালা
আরতির,—পরাইতে গেঁথে নেয়া মালা!
সম্মুখে পিছনে হায় জানা অজানার
স্রোত বহে চিরমূক সর্ব্ব জিজ্ঞাসার;
ব্যাকুল ক্ষণিকা তবু প্রাণপণে হায়,
সত্যমিথ্যা খুঁজি মরে আর্ত্ত বেদনায়।



(৫) শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী

কম্বোজের বিষাদভরা স্মৃতি নিয়ে আমরা সাইগণে ফিরলাম। এবার প্রাচীন চম্পা দেখবার পালা। কিন্তু দু' সপ্তাহ ধ'রে কম্বোজের বনে বনে ঘুরে আমরা এত ক্লান্ত হয়েছিলাম যে হঠাৎ কোথাও নড়বার সামর্থ্য ছিল না। সুতরাং বাধ্য হয়ে সাইগণের একটা ফরাসী হোটেলে ৪।৫ দিনের মত আশ্রয় নেওয়া গেল। হোটেল ফরাসী বটে কিন্তু কাজ চালায় আনামীরা। তা'রা কেউ ইংরাজী জানে না। ফরাসী ভাষাও এমন অদ্ভুত ভাবে বলে যে তা' বুঝ্‌তে বহু ভাষা-জ্ঞানের আবশ্যক। প্রথমতঃ আনামী-ভাষার উচ্চারণ-নীতি জানা চাই, তারপর সেই উচ্চারণ-পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে ফরাসী ভাষায় কথা কইলে কিরূপ শোনাতে পারে সে সম্বন্ধে গবেষণা থাকা চাই। সুতরাং সাইগণে যে ক'দিন ছিলাম সে ক'দিন হোটেলে কথা কইবার চেষ্টা মোটেই করি নি।

সাইগণে কয়েকদিন বিশ্রাম করবার পর আমরা চম্পার উদ্দেশ্যে রওনা হ'বার জন্য প্রস্তুত হ'লাম। এইবার চম্পার কথা বলা প্রয়োজন। বর্ত্তমানে ইন্দোচীনে চম্পা নামে কোন দেশ নেই। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে চম্পা নাম লোপ পেয়েছে। চম্পা ছিল ভারতের আর এক উপনিবেশ। বর্ত্তমান কোচীন-চীন ও আনাম প্রদেশ নিয়ে প্রাচীনকালে চম্পা রাজ্য গঠিত হয়েছিল। ভারতীয় ঔপনিবেশিকেরা দেশমাতৃকার নামে এই নূতন উপনিবেশের নামকরণ করেছিলেন অনুমান হয়। ভারতে যে চম্পা রাজ্য ছিল সে হ'চ্ছে বর্ত্তমান ভাগলপুর অঞ্চল। এই চম্পাপুরীই ছিল চাঁদ সদাগরের চম্পা। অতি প্রাচীন-কালেই যে এই চম্পাপুরীর নৌবহর দেশ বিদেশে যেত, তা'তে কোন সন্দেহ নেই। খৃষ্টীয় অব্দের প্রাক্কালে যে চম্পার বণিকেরা তাম্রলিপ্তির বন্দর হয়ে সাগর অতিক্রম ক'রে পূর্ব্ব মুখে বাণিজ্য করতে যেত তা'রও প্রমাণ আছে। বণিকদের অর্ণবপোতেই ভারতীয় ঔপনিবেশিকেরা দেশ বিদেশে যেতেন। তাঁদেরই একদল আনামের উপকূলে অবতরণ ক'রে খৃষ্টীয় প্রথম কিংবা দ্বিতীয় শতাব্দীতে চম্পার হিন্দু উপনিবেশের প্রথম সূচনা করেন। এই উপনিবেশ ক্রমশঃ ক্ষমতাশালী রাজ্যে পরিণত হয় এবং ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত কোচীন-চীন থেকে বর্ত্তমান টঙ্কিন (Tonkin) পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ তা'র অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্ত্তমান আনামীরা তখন টঙ্কিনের উত্তরে বাস করত। তা'দের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে চম্পা রাজ্য ধ্বংশে পরিণত হয়; আনামীরা নূতন রাজ্যের পত্তন করে ও দেশের নূতন নামকরণ করে—আনাম।

সেই থেকে চম্পার নাম লোপ পেয়েছে। আনামীদের অত্যাচারে চম্পার প্রাচীন অধিবাসীরা দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। কম্বোজের নানাস্থানে তা'রা এখন বহু কষ্টে দিনাতিপাত করে। তাদের পুরানো গৌরব কাহিনী তা'রা ভুলে গেছে। ভারতের সঙ্গে তাদের নিকট-সম্বন্ধও তাদের মনে নেই। এই প্রাচীন অধিবাসীর একটা শাখা

ইন্দোচীন-ভ্রমণ

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী

আনামের দক্ষিণাংশে ছোট দু'টী গ্রামে বাস করে। আনামীদের হাতে বহুভাবে নিপীড়িত হয়েও তারা মাতৃভূমির অঙ্ক ত্যাগ করে নি। তাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরে পূজা না দিলে তা'রা এখনো প্রাণে শান্তি পায় না। এদের বর্ত্তমান নাম চ্যাম (cham)— চম্পা নামেরই অপভ্রংশ।



প্রাচীন চম্পার ভাস্কর্য্য
দেবদাসী

পুরাণো হিন্দুকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ যথাসম্ভব দেখাই আমাদের চম্পা যাত্রার প্রধান উদ্দেশ্য। ফিরবার পথে বর্ত্তমান চ্যামদের দু'এক খানি গ্রাম ও তাদের পূজা-পদ্ধতি ও আচার ব্যবহারও দেখে আস্‌বার ইচ্ছা ছিল।

* * *

আনাম, কম্বোজের মত নদীমাতৃক নয়। দেশ পাহাড় ও উচ্চভূমিতে ভরা। আনামের সুধু দক্ষিণাংশে রেলপথ স্থাপিত হয়েছে। সুতরাং অন্যান্য অংশে ভ্রমণ কষ্ট-সাধ্য। সমুদ্রপথে রাজধানী হুয়ে (Hue) ও অন্যান্য স্থানে যাওয়া যায়। কিন্তু তা'তেও নানা অসুবিধা। শীতকালে মোটরে নানা স্থানে যাওয়া সম্ভবপর কিন্তু বর্ষার সময় পথ ঘাটের অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়। আনাম ফরাসীদের করদ রাজ্য। শাসন বিষয়ে ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষরা রাজাকে সাহায্য ক'রে থাকেন। সুতরাং বর্ত্তমানে আনামের স্বাধীনতার অনেক খর্ব্ব হ'য়েছে। আমরা যখন সাইগণ থেকে রওনা হ'লাম তখন বর্ষা। বৃষ্টিপড়া আরম্ভ হয়েছে। সুধু আনামের দক্ষিণাংশ ছাড়া অন্যান্য স্থান দেখবার আশা আমরা ত্যাগ করেই বেরিয়েছিলাম।

সাইগণ থেকে আমরা একদিন ভোর বেলায় গাড়ী ধ'রে রওনা দিলাম। দক্ষিণ আনামের ফান্-রাং (Phan-rang) নামক স্থানে প্রথম থাম্‌ব কথা ছিল। ফান্-রাং সাইগণ থেকে প্রায় ২০০ মাইল। সাইগণ থেকে বেরিয়ে আমাদের উত্তর-পূর্ব্বে যেতে হবে। সাইগণ থেকে কিছু দূরে গেলেই আনামের পাহাড় শ্রেণীর আরম্ভ। সমতল ভূমি ছেড়ে আমরা ছোট ছোট পাহাড়ের ভেতর দিয়ে চলেছি। কোথাও বা ছোট নদীর উপত্যকা অতিক্রম ক'রে, কোথাও বা ঘন বন ভেদ ক'রে আমাদের গাড়ী চলেছে। পাহাড়ের ওপর কোথাও প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ চোখে প'ড়ছে। এখানে আর কম্বোজের মত উর্ব্বর সমতল প্রদেশ চোখে পড়ে না। ঘন নারিকেল বনের সমাবেশও এখানে নেই। রেলপথ অনেক স্থানে সমুদ্রের উপকূল দিয়ে চলেছে। সুন্দর দৃশ্য। ডাইনে চীন-সাগরের বিশাল বক্ষ—প্রায় সব সময়েই উদ্দাম তরঙ্গে উদ্বেল হ'য়ে রয়েছে। বামে আনামের পর্ব্বত শ্রেণীর উচ্চ শিখর-প্রদেশ—ঘন বনরাজিতে আবৃত দেখা যাচ্ছে। এই সুন্দর পথ দিয়ে আমরা সন্ধ্যার প্রাক্কালে ফান্-রাং পৌঁছলাম।

ফান্-রাং সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত বর্ত্তমান আনামের একটী ছোট বন্দর। বড় জাহাজ এখানে না ভিড়লেও ছোট ষ্টীমারের খুব চলাচল আছে। তা' ছাড়া চীনেদের ও আনামীদের সাম্পান্। সাম্পান্ পুরাণো কালের অর্ণব

পোতের স্মৃতি এখনো বহন করছে। পালে চলে, এবং এতে ক'রে চীনেরা এখনো বিশাল সমুদ্র অতিক্রম ক'রে চীন থেকে যবদ্বীপ পর্য্যন্ত বাণিজ্য করে। ফান্-রাং প্রাচীন কালে চম্পার একটী বড় বন্দর ছিল। সেকালে এর নাম ছিল পাণ্ডুরঙ্গ। ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও পাণ্ডুরঙ্গ নাম প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমান ফান্-রাং যে পাণ্ডুরঙ্গ কথারই রূপান্তর তা' সহজেই বোঝা যায়।

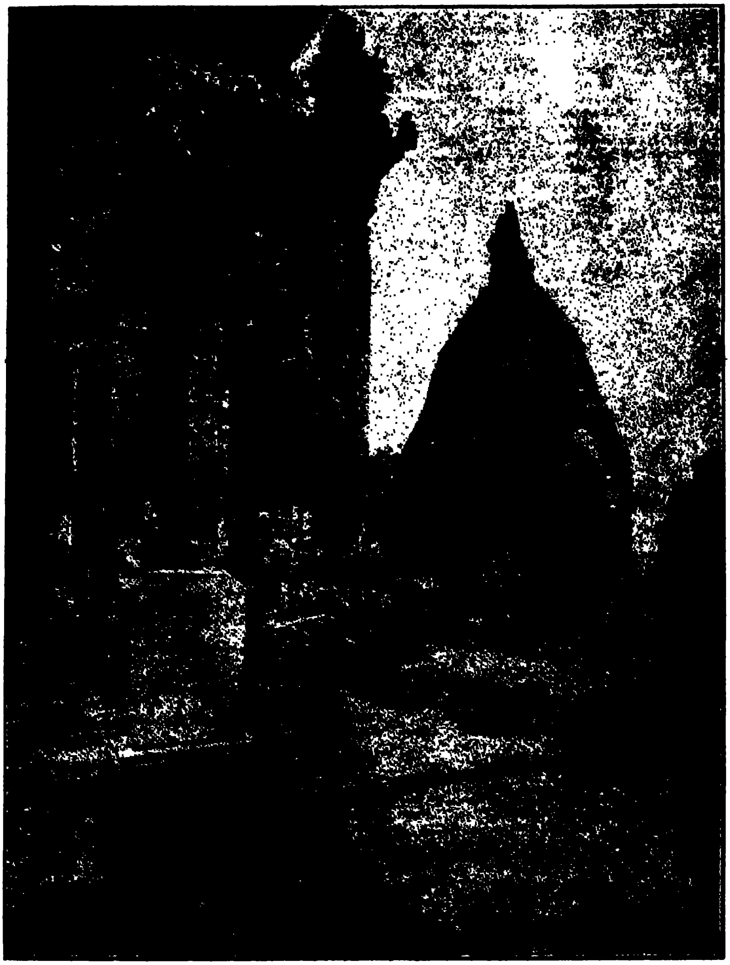
চারটী বিষয় নিয়ে প্রাচীন চম্পা রাজ্য গঠিত হয়েছিল। অমরাবতী, বিজয়, কৌঠার এবং পাণ্ডুরঙ্গ। প্রথম যুগে এই চারটী বিষয় এক রাজার অধীনে ছিল। মধ্যযুগে পাণ্ডুরঙ্গ ও কৌঠারের অধিপতিরা একটী ভিন্ন রাজ্যের স্থাপনা করেছিলেন। অমরাবতী ছিল বর্ত্তমান আনামের উত্তর ভাগে। রাজধানী ছিল ইন্দ্রপুর। অমরাবতী বর্ত্তমান কুয়াং-নাম (Quang-nam)। ইন্দ্রপুরীর ভগ্নাবশেষ কুয়াং-নামের নিকট ডং-ডুয়ং (Dong-duong) নামক স্থানে অবস্থিত। অমরাবতীর বন্দর ছিল সিংহপুর। সিংহপুর বর্ত্তমান তুরান (Tourane) বন্দরের নিকটেই অবস্থিত ছিল। বিজয় বর্ত্তমান বিন্-দিন্ (Binh-dinh)। বিজয়ের প্রধান বন্দর ছিল শ্রীবিনয়। শ্রীবিনয় বর্ত্তমান বিন-দিনের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রকূলে অবস্থিত ছিল। কৌঠার হচ্ছে বর্ত্তমান খান-হোয়া (Khan-hoa)। কৌঠারের রাজধানী বর্ত্তমান না-ত্রাং (Nha-trang) এর নিকট অবস্থিত ছিল। প্রাচীন চম্পার চতুর্থ-বিভাগ পাণ্ডুরঙ্গই হচ্ছে বর্ত্তমান ফান্-রাং। পাণ্ডুরঙ্গ কিছুকালের জন্য সমস্ত চম্পার রাজধানীতে পরিবর্ত্তিত হয়েছিল। পাণ্ডুরঙ্গেই চম্পার অধিবাসীরা আনামীদের শেষ বাধা দিয়েছিল।

ফান্-রাংকে আমরা পুরাণো নামেই (পাণ্ডুরঙ্গ) অভিহিত করবো। পাণ্ডুরঙ্গে সন্ধ্যাবেলা পৌঁছে আমরা সেখানকার সরকারী বাংলোতে আশ্রয় নিলাম। আনামের প্রায় সব স্থানেই বাংলো আছে। রাজধানী হুয়ে (Hue) ছাড়া কোথাও হোটেল নেই। পাণ্ডুরঙ্গে যে ক'দিন ছিলাম সে ক'দিন আমরা সরকারের অতিথি—সুতরাং আহারাদির ব্যবস্থা ছিল ফরাসী রেসিডেন্টের গৃহে। আনামে ও কম্বোজে প্রায় সমস্ত বিভাগের প্রধান সহরেই ফরাসীদের একজন প্রধান কর্ম্মচারী আছেন (Resident Super-



পো-নগরের মন্দির—না-ত্রাং
কৌঠার

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী



পো-নগরের মন্দির—না-ত্রাং
কোঠায়

আস্‌ছে। শ্রীলিঙ্গরাজের মন্দির দেখাই আমাদের প্রথম কাজ। মন্দিরটী ছোট একটী পাহাড়ের ও'রে অবস্থিত। আংশিকভাবে নষ্ট হয়েছে—কিন্তু একেবারে ধ্বংসে পরিণত হয় নি। এর প্রধান কারণ হচ্ছে যে চম্পার প্রায় মন্দিরই কোন পাহাড় অথবা উচ্চ ভূমিভাগে নির্ম্মিত। সুতরাং বর্ষায় মন্দির নষ্ট হ'বার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। চম্পার মন্দিরগুলি কম্বোজের মন্দিরের স্থায় বিশালকায় নয়; অপেক্ষাকৃত ছোট। নির্ম্মাণ-প্রণালীও একটু পৃথক। এই সব কারণেই চম্পায় অনেক মন্দির এখন দাঁড়িয়ে আছে। তবে উত্তর চম্পা, অর্থাৎ প্রাচীন অমরাবতী ও বিজয়ের মন্দিরগুলি সম্পূর্ণ ধ্বংসে পরিণত। বিজেতা আনামীরা এগুলিকে ইচ্ছা ক'রে নষ্ট করেছিল। পাণ্ডুরঙ্গেও এই মন্দির ছাড়া আর কোন প্রাচীন নিদর্শন নেই। কিছু দিনের জন্ম পাণ্ডুরঙ্গ সমস্ত চম্পার রাজধানীতে পরিণত হয়েছিল। তা' ছাড়া পাণ্ডুরঙ্গের স্বতন্ত্র অধিপতিরাও ছিলেন। কিন্তু এ'দের প্রাচীন পুরীর নিদর্শন বর্ত্তমানে কিছুই নেই। আছে সুধু "শ্রীলিঙ্গরাজের" মন্দির। এই মন্দিরে ও এঁর নিকটবর্ত্তী স্থানে অনেক সংস্কৃত লেখ পাওয়া যায়। লেখগুলি প্রায় সবই খৃষ্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীর। এ'সব লেখ মন্দিরের নির্ম্মাণকালের কোনই খোঁজ পাওয়া যায় নি। মন্দিরটী খুব সম্ভব খৃষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হয়েছিল। কারণ চম্পার সেইটী হচ্ছে গৌরবের যুগ।

ieur)। এঁরা শাসন বিষয়ে করদ রাজ্যের কর্ম্মচারীদের সাহায্য ক'রে থাকেন—প্রকৃতপক্ষে নিজেরাই শাসন করেন। শাসন-দক্ষতা তাঁদের যা'ই থাকুক তাঁরা অতিথি-সৎকার ভালভাবেই করতে জানেন। তাঁরা সত্যকার ফরাসীদের মতই সদালাপী এবং সহৃদয়।

পাণ্ডুরঙ্গের অনতিদূরে একটী প্রাচীন মন্দির আছে। এই মন্দিরের নাম হচ্ছে পো-ক্লাংগ-রাই (Po-klaung-rai)। পো-ক্লাংগ-রাই সংস্কৃত "শ্রীলিঙ্গরাজ" কথার রূপান্তর। চ্যামদের ভাষায় "পো" 'শ্রী' কথার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়ে

শ্রীলিঙ্গরাজের মন্দির পাথরে নির্ম্মিত। এ মন্দিরে কোন ভাস্কর্য্য লক্ষিত হয় না। ক্ষোদিত চিত্রও নেই। স্থাপত্যের ভিতর একটু বিশেষত্ব আছে। কিন্তু কম্বোজের

প্রতি মন্দিরে যে সৌন্দর্য্য ও শিল্পদক্ষতা ফুটে উঠেছে, চম্পায় তা' কোথাও দেখি নি। চম্পার মন্দিরগুলি দুর্গ বিশেষ, এবং বাইরের থেকে আক্রান্ত হ'লে চম্পার প্রাচীন অধিবাসীরা এ উচ্চ ভূমিভাগ থেকে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ ক'রত, মন্দিরের গঠন প্রণালী দেখ্‌লেই তা' অনুমিত হয়।

সেকালে শ্রীলিঙ্গরাজের মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রাচীন সংস্কৃত লেখ ও মন্দিরের নাম থেকে তা' সহজেই বোঝা যায়। হিন্দু ঔপনিবেশিকেরা প্রায় সকলেই শৈব ছিলেন। হিন্দু রাজাদের লেখা থেকেই তা' জানা যায়। চম্পার আদিম অধিবাসীরাও এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েছিল। পরবর্ত্তীকালে চম্পায় বৌদ্ধধর্ম্মেরও প্রচার হয়েছিল। শ্রীলিঙ্গরাজের মন্দিরের দ্বারের ও'রেই একটী শিব মূর্ত্তি। শিব মূর্ত্তি ষড়ভুজ। ওপরের দু'হাতে বজ্র ও পদ্ম, মাঝখানের দু'হাতে খড়্গ ও পাত্র। নীচের দু'হাত পশ্চাতে ফেরান। মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করলেই একটী পাথরে নির্ম্মিত সুন্দর নন্দী-মূর্ত্তি। নন্দীর সম্মুখেই মুখলিঙ্গ। এখনো নিকটবর্ত্তী গ্রাম থেকে চ্যাম অধিবাসীরা মন্দিরে পূজা দিতে আসে। আমরা যেদিন মন্দির দেখ্‌তে যাই সেদিনও তা'রা পূজা দিতে এসেছিল। এ'দের পূজা-পদ্ধতি হিন্দু পূজার অনুরূপ।

চ্যামদের প্রধান পুরোহিত মুখলিঙ্গের পূজায় বস্‌বার পূর্ব্বে নূতন কাপড় পরলেন ও হাত পা ধুয়ে নিলেন। চ্যামদের মেয়েরা পূজার উপকরণ এনে মুখলিঙ্গের সামনে রাখলেন। উপকরণের ভেতর ভাত, মাংস প্রভৃতিও ছিল। পূজারী পুষ্প-পাত্র হাতে নিয়ে পূজায় বসলেন। প্রথমতঃ তিনি মন্ত্র পড়ে আচমন করলেন। তার পর নানারূপ মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে শাঁক ও ঘণ্টা বাজিয়ে ফুল দিয়ে মুখলিঙ্গের পূজা করলেন। এ সব মন্ত্র চ্যামদের নিজেদের ভাষায় লেখা। অনেক সংস্কৃত রূপান্তরিত হয়ে এতে ঢুকেছে। উপকরণ দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ ক'রে পূজারী আগুন জ্বেলে হোম ও অঙ্গুলি সমাবেশে নানারূপ মুদ্রা-সাধন করলেন। পূজায় যে সব পাত্র ব্যবহার করা হ'ল সেগুলি প্রায়ই তাম্রপাত্র। এর ভিতর অনেকগুলিই আমাদের পূজার বাসনের অনুরূপ—পুষ্পপাত্র, তাম্রকুণ্ড, কোশাকুশি প্রভৃতির ন্যায়। হোম শেষ হ'লে পূজারী "নি নোমস"



মি-সনের ভগ্নাবশেষ
অমরাবতী

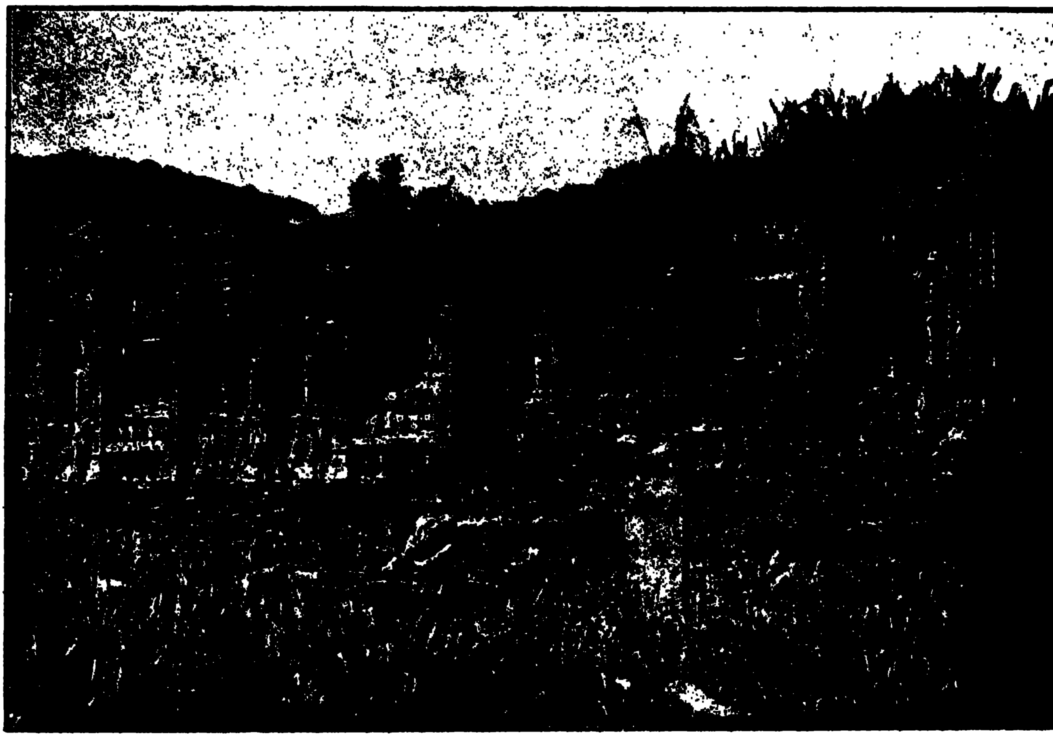
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী

(ওঁ নমঃ) উচ্চারণ ক'রে মন্দির দ্বারের শিবমূর্ত্তির ওপর তাম্রকুণ্ডের জল নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর পূজা শেষ হ'ল।

এই পূজাপদ্ধতি প্রাচীন হিন্দুকীর্ত্তির স্মৃতিচিহ্ন বহন করছে। বর্ত্তমান 'চ্যাম'রা অবশ্য হিন্দুদের নাম পর্য্যন্ত ভুলে গেছে। নিজেদের দেব-দেবীর তা'রা নামও জানে না।

* * * *

দু'খানি গ্রামে প্রায় পঞ্চাশ ঘর লোকের বাস। সকলের অবস্থা দেখলেই কষ্ট হয়। কোন গৃহেরই শ্রী নেই। আনামীরা এদের সঙ্গে কখনো মেশে না। এদের মুখের ওপর উৎপীড়নের সুস্পষ্ট চিহ্ন আঁকা রয়েছে। কোন উৎসাহ বা হাসির রেখা সেখানে নেই। সকলেই কষ্টে দিনপাত করে। গ্রামে কোন বিদ্যালয় নেই এবং এদের ছেলেরা কখনো লেখাপড়া শেখবার সুবিধা পায় না—ইচ্ছাও



মি-সনের ভগ্নাবশেষ—অমরাবতী

চ্যামদের পূজা দেখে আমরা তা'দের গ্রাম দেখ্‌তে গেলাম। 'শ্রীলিঙ্গরাজে'র মন্দির থেকে তাদের গ্রাম প্রায় দু' মাইল দূরে অবস্থিত। পাশাপাশি দু'খানি গ্রাম—চারদিকে মাঠ। গ্রামের পাশে কোন নদী নেই। তা'রা সাধারণতঃ কূয়ার জলে নিজেদের কাজ চালায়। গ্রামে কোন গাছ নেই। চ্যামেরা ইচ্ছা ক'রে গাছ কেটে ফেলে, কারণ তাদের মতে গাছ হচ্ছে ভূতপ্রেতের আবাস স্থল।

তা'দের নেই। আনামীদের হাত থেকে এদের বাঁচা'বার কোন বিশেষ চেষ্টা ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ এখনো করেন নি।

আনামের এই মুষ্টিমেয় চ্যামরা এখনো পুরাতন ধর্ম্মাবলম্বী (অর্থাৎ হিন্দু) রয়েছে। এদের বলা হয় "জাত চ্যাম" (Cham jat) খাঁটী চ্যাম। কোচীন চীন ও কম্বোজে যে সব চ্যাম আছে তাদের অনেকেই মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত। তাদের নাম "বাণী চ্যাম" বা "আস্‌লাম

চ্যাম"। এরা খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। "জাত-চ্যাম"দের এরা "কফির (Kaphir কাফির) নামে অভিহিত করে। এদের সঙ্গে হিন্দু চ্যামদের অবশ্য কোন বিবাদ নেই। কারণ মুসলমান হইলেও এরা নিজেদের প্রাচীন আচার ব্যবহার অনেক বজায় রেখেছে।

এইবার চ্যামদের গোড়ার খবর কিছু বলবো। চ্যামেরা মন-খ্মের (Mon khmer) জাতির শাখা বিশেষ। কম্বোজের প্রসঙ্গে বলেছি যে কম্বোজীয়েরাও এই জাতির একটী শাখা। চ্যামেরা ছিল প্রাচীন কোচান-চীন ও আনামের আদিম অধিবাসী। অনুমান খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে হিন্দু যবদ্বীপ থেকে জলপথে এসে এ'দের দেশে উপনিবেশ বিস্তার করেন ও নূতন উপনিবেশের নাম দেন চম্পা। দেশের নামানুসারে দেশবাসীরাও ক্রমশঃ ঐ নামে পরিচিত হ'তে থাকে। চম্পার অধিবাসীরা হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষা নেয় এবং ভারতীয় ঔপনিবেশিকেরা হ'ন তাদের দীক্ষা গুরু। তারা ভারতীয় সভ্যতার দীক্ষালাভ ক'রে ক্রমশঃ ক্ষমতাশালী হ'য়ে উঠ্‌ল। তাদের ভিতর শিল্পী স্থপতির সৃষ্টি হ'ল। ভারতীয় লেখা-পদ্ধতি তা'রা গ্রহণ করল ও ভাষাকে মার্জ্জিত ক'রে গড়ে তুললো। এ'দের ভাষায় লেখা বহু লেখ ও ধর্ম্মকথা পাওয়া গেছে। সে ভাষার ওপর অবশ্য সংস্কৃতের খুবই প্রভাব দেখা যায়। কারণ সংস্কৃত ছিল বিজেতাদের দেবভাষা।

বর্ত্তমান চ্যামদের ভাষা থেকে এখনো সে সংস্কৃত প্রভাব নষ্ট হয় নি। দৈনন্দিন ব্যাপারেও তারা যে ভাষা প্রয়োগ করে তার ভিতর অনেক সংস্কৃত কথা রূপান্তরিত হ'য়ে রয়েছে। পাণ্ডুরঙ্গের চ্যামদের থেকে যে ক'টী কথা সংগ্রহ করেছিলাম তার দু'একটী নমুনা দিলেই এ কথার সত্যতা বোঝা যাবে।

দিকের নাম,—পুর—পূর্ব্ব, দক্—দক্ষিণ, উৎ—উত্তর, অগ্নি—আগ্নেয়, নৈলভ—নৈঋর্ত্য, বাযোপ্—বায়ব্য, এবন্—ঐশান।

সপ্তাহের দিনগুলির নাম,—থোম —সোম, এঙ্গর—(আঙ্গিরস)—মঙ্গল.* বুধ—বুধ, জিপ্—জীব, বৃহস্পতির নামান্তর, সুক—শুক্র, থহর—শনৈশ্চর—শনি, আদিৎ—আদিত্য—রবি।

সূর্য্যের নাম আদিৎ—আদিত্য, সহরের নাম নোকর—নগর, মন্দিরের নাম মোধির। রাজাকে চ্যামেরা রায়, মন্ত্রীকে মোত্রি এবং রূপকে রূপ বলে।

চ্যামদের ভাষায় সংস্কৃতের আরও অনেক প্রভাব দৃষ্ট হয়। তাদের যে সব ধর্ম্মকথা আছে সেগুলির সমালোচনা করলে আরও অনেক কথার খোঁজ পাওয়া যায়।

* * *

চ্যামদের গ্রাম দেখে ফিরবার পথে আরও দু'একটী মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখ্‌তে পেলাম। প্রায় সব স্থানেই প্রাচীন সংস্কৃত লেখ আবিষ্কৃত হয়েছে। পাণ্ডুরঙ্গের আনামী অধিবাসীরা এ সব সম্বন্ধে কোনই খোঁজ নেয় না যেটুকু কাজ হয়েছে তা' ফরাসী পণ্ডিতেরাই করেছেন। হ্যানয়ের প্রাচ্য-বিদ্যাপীঠই এ সব প্রাচীন মন্দিরের তত্ত্বাবধানের ভার নিয়েছেন ও গত ত্রিশ বছর ধরে বহু কাজ করেছেন।

পাণ্ডুরঙ্গে হিন্দুকীর্ত্তির সমস্ত নিদর্শন দেখে আমরা বাংলোতে ফিরলাম। পরদিন প্রত্যূষে প্রাচীন কৌঠার (বর্ত্তমান না-ত্রাং) প্রদেশ দেখ্‌তে রওনা হ'ব স্থির করা হ'ল। সন্ধ্যায় সমুদ্রতীর দেখ্‌তে বেরুলাম। তটদেশে বর্ত্তমান যুগের কোনই নিদর্শন চোখে পড়ে না। পুরাণো ধরণের সাম্পান সারি সারি বাঁধা রয়েছে। কোনটীর মাস্তুলে পাল জড়ান, কোনটীর মাস্তুল নীচে নাবান। চীনা মাঝিরা কোনটীতে বা পাল খাটিয়ে সাগর অতিক্রম করবার আয়োজন করছে। এদের প্রধান পণ্য-সম্ভার হচ্ছে নারিকেল, কলা ও নানা প্রকারের মসলা। কোথাও বা মাঝিরা মাটীর প্রদীপ জ্বালিয়ে আহারাদির ব্যবস্থা করছে। অদূরে পাণ্ডুরঙ্গের ক্ষুদ্র পর্ব্বত-মালা দেখা যাচ্ছে। ঘন বন পাহাড়গুলি ঘিরে এক অভিনব শোভার সৃষ্টি করছে।

সন্ধ্যার শেষে পাণ্ডুরঙ্গের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে ইতিহাসের অনেক পুরাতন স্মৃতি মনে জেগে ওঠে। দু'হাজার বছর পূর্ব্বে ভারত-সন্তানেরা সাগরপথে যখন এই উপকূলে পৌঁছেছিলেন তখন তাঁদের অভিনন্দন জানাবার মত কেউ

* মঙ্গলবারের নাম আঙ্গিরস বলায় বুঝতে হ'বে ভুল। কিন্তু এঙ্গর, 'আঙ্গিরসে' শব্দেরই অপভ্রংশ বলে মনে হয়।

এখানে ছিল না। অপরিচিত বর্ব্বরের দেশে এসেছিলেন। অনেক বাধা বিপত্তি অতিক্রম ক'রে তাঁরা যে কাজ করেছিলেন, তার গরিমাময় ইতিহাস শোনাবার মত এখানে আর কেউ নেই। সে ইতিহাস এখন ভগ্নমন্দিরের প্রস্তরফলকে নিবদ্ধ। ভারতের সে কীর্ত্তিগাথা গাইবার মত এ উপকূলভাগে আর একজনকেও আজ দেখা যায় না। ভারতের অর্ণবপোত বহু শতাব্দী ধরে যখন চীনে যেত, তখন ভারত সন্তানেরা এই পাণ্ডুরঙ্গে অবতরণ ক'রে স্বদেশের কীর্ত্তিমান সন্তানদের একবার দেখে যেতেন। আজ আর এক ভারতসন্তান এই উপকূলভাগে এসেছে—কিন্তু প্রাচীন ভারতীয়দের আর এখানে কেউ নেই।

* * *



গণেশ মূর্ত্তি—মি-সনের ভগ্নমন্দিরে প্রাপ্ত
অমরাবতী



ভূমিকা

প্রসিদ্ধ দ্বিচক্র-ভ্রমণকারী শ্রীযুক্ত বিমল মুখোপাধ্যায়ের নাম সুপরিচিত। "কলিকাতা টুরিষ্ট ক্লাবে"র ইনি অন্যতম সদস্য। কিছুদিন হইতে এক-একটি দ্বি-চক্র দল গঠিত করিয়া ইনি কলিকাতা হইতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে দ্বিচক্র-অভিযান করিতেছিলেন;—কখনো বা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সুদূর পরিসীমা অবধি—, কখনো বা দুর্জ্জয় হিমালয়ের অত্যুচ্চ শিখরদেশ পর্য্যন্ত। দুস্তর পার্ব্বত্য-নদী, দুরন্ত মরুভূমি, দুর্ভেদ্য অরণ্য,—কিছুই ইঁহাদের গতি প্রতিহত করিতে সক্ষম হয় নাই।

বিগত ১৯২৫ সালের গ্রীষ্মকালে বিমল তিনজন সাইক্লিষ্টে একটি দল গঠিত করিয়া কলিকাতা হইতে সাইকেলে রওনা হইয়া সাত হাজার ফিট্ উচ্চ দার্জ্জিলিঙ্গে আরোহণ করিবার সঙ্কল্প করেন। কলিকাতা হইতে দার্জ্জিলিঙ্গ্—পথ যে তেমন দীর্ঘ, তাহা নহে,—বোধ করি সাড়ে চার শত মাইলের অধিক হইবে না। কিন্তু দ্বিচক্র অভিযানের অনুরোধে এই পথটি ফেলিতে হইয়াছিল সাঁওতাল পরগণার বক্ষ ভেদ করিয়া ভাগলপুর পর্য্যন্ত; এবং তথা হইতে ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া দার্জ্জিলিঙ্গ-হিমালয় ট্রাঙ্ক্ রোড



সাইক্লিষ্ট চতুষ্টয়
বাম হইতে
যথাক্রমে,
শ্রীযুক্ত বিমল
" মণীন্দ্র
" আনন্দ
" অশোক

ভূমিকা

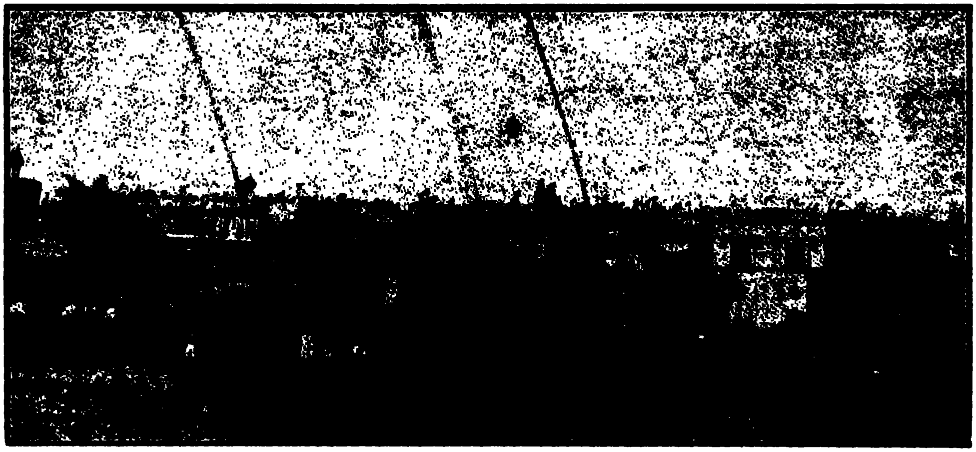


ব্রজবাবুর সঙ্গে—জয়পুরে

দিয়া দার্জ্জিলিঙ্গ অবধি। গিরি-প্রান্তর-অরণ্য-নদী-পীড়িত সাঁওতাল-পরগণার বন্ধুর ভূমির সহিত যাঁহারা পরিচিত তাঁহারা বুঝিবেন মে মাসের দুঃসহ উত্তাপের ভিতর দিয়া দস্যু-সর্প-হিংস্রজন্তু-সঙ্কুল এই কঠিন পথ সাইক্লে অতিক্রম করার অভিসন্ধির মধ্যে কতটা আয়াস এবং কতটা আশঙ্কা নিহিত ছিল। পথে নানাপ্রকার বিঘ্ন-বাধা অতিক্রম



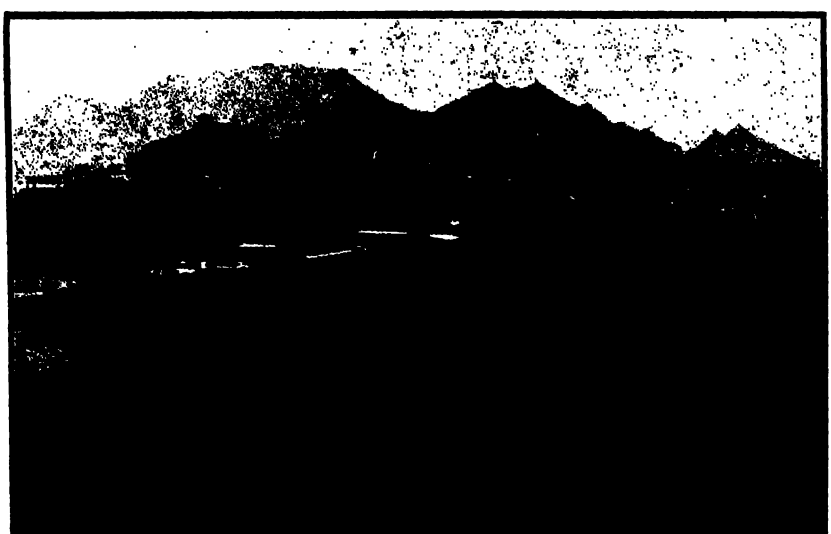
জয়পুর—মুাসিয়াম্



সিন্ধু-হায়দ্রাবাদ—সহরের কোণ এক
বাড়ীর উপর হাওয়া ধরবার বন্দোবস্ত আছে

করিয়া তাঁহাদের দার্জ্জিলিঙ্গ্ যাত্রা যেরূপ জয়-যুক্ত হইয়াছিল তাহার বিবরণ সে সময়ে নানা দৈনিক সংবাদ-পত্রে এবং মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। শিলিগুড়ি-দার্জ্জিলিঙ্গের পথে উর্দ্ধগামী রেলগাড়ীর সহিত সাইক্লিষ্ট-গণের একবার প্রতিযোগিতা ঘটিবার সুযোগ হয়। চড়াইয়ের মুখে রেল যখন ক্রমশঃ পিছাইতে আরম্ভ করিল তখন উৎসাহে ও আনন্দে রেলযাত্রীগণ গবাক্ষ দিয়া মুখ বাড়াইয়া বিপুল কলরবে সাইক্লিষ্টগণকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন।

এইরূপে বারংবার সাফল্যের দ্বারা সাহসী হইয়া অবশেষে একদিন একটা দুরন্ত কল্পনা প্রসারণ-লিপ্সু-চিত্তকে সহসা



আনা সাগর—আজমীর

ভূমিকা



পথের ধারে সাইকেল সারানো

অধিকার করিয়া বসিল,—বাংলা দেশের সীমা ছাড়াইয়া, ভারতবর্ষের সীমান্ত-রেখা অতিক্রম করিয়া দ্বিচক্রে সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া আসিবার একটা উন্মাদ সঙ্কল্প! বাধা বিস্তর,—বিঘ্ন অনেক। কত অজানা দেশের ভিতর দিয়া, কত অজ্ঞাত মনুষ্যমণ্ডলীর মধ্য দিয়া, কত পাহাড় পর্ব্বত, সরিৎ-সাগর, মরু-প্রান্তর, কত দুর্ভেদ্য অরণ্য অতিক্রম

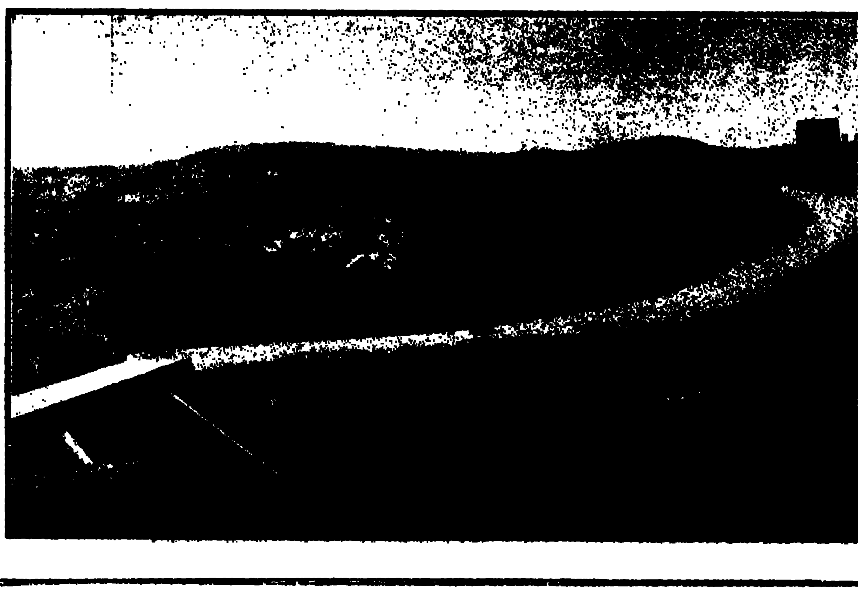


মস্ত পোলের উপর থেকে বাগ্দাদ শহর



বাগদাদে—হারুণ-অল্-রসীদের কবর
—বামে পত্নী জুবেদার সমাধি-মন্দির

করিয়া দিনের পর দিন চলিতে হইবে। পথে দস্যু-তস্কর-আরব-বেদুইনের ভয়, হিংস্রজন্তুর আশঙ্কা, আধি-ব্যাধির সম্ভাবনা,—দুঃখ-ক্লেশ, ঝড়-বৃষ্টি, শীত-গ্রীষ্মের নিপীড়ন। আরো এমনি কত কি! এরূপ স্থলে যেমন হইয়া থাকে, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন অনেকে এই বিপজ্জনক সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু অবশ্য তাহাতে কোনো ফল হইল না। যাঁহারা ভয় দেখাইতে গিয়াছিলেন তাঁহারা এ-কথা ভুলিয়াছিলেন যে, ভয়ানকের প্রতি, ভয়ঙ্করের প্রতি মানুষের মনে শুধু ভয়ই নাই,—একটা অত্যুগ্র আকর্ষণও আছে;—বাধা অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিবন্ধক না হইয়া অতিক্রম করিবার শক্তিকে উত্তেজিত করিয়াই তোলে।



ইরাক্—বাগদাদের পর উঁচু-নীচু পথ

ভূমিকা

সুতরাং সঙ্কল্প ক্রমশঃ কার্য্যে পরিণত হইল। 'ক্যালকাটা টুরিষ্ট ক্লাবে'র শ্রীযুক্ত বিমল মুখোপাধ্যায়, এবং 'গে হুইলার্স্' ক্লাবের শ্রীযুক্ত অশোক মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত আনন্দ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র ঘোষ এই চারজন মিলিত হইয়া একটি দল গঠিত করিলেন। বিগত ১২ই ডিসেম্বর ইঁহারা কলিকাতা হইতে যাত্রা আরম্ভ করেন; করাচি পর্য্যন্ত দ্বিচক্রে যাইয়া তথা হইতে ষ্টিমারে বস্‌রায় উপনীত হইয়া ইঁহারা পুনরায় দ্বিচক্রে যাত্রা সুরু করেন। উপস্থিত ইঁহারা



দু-দিন এই বেদুইন্ পরিবারের মধ্যে থাকতে বাধ্য হয়েছিলাম

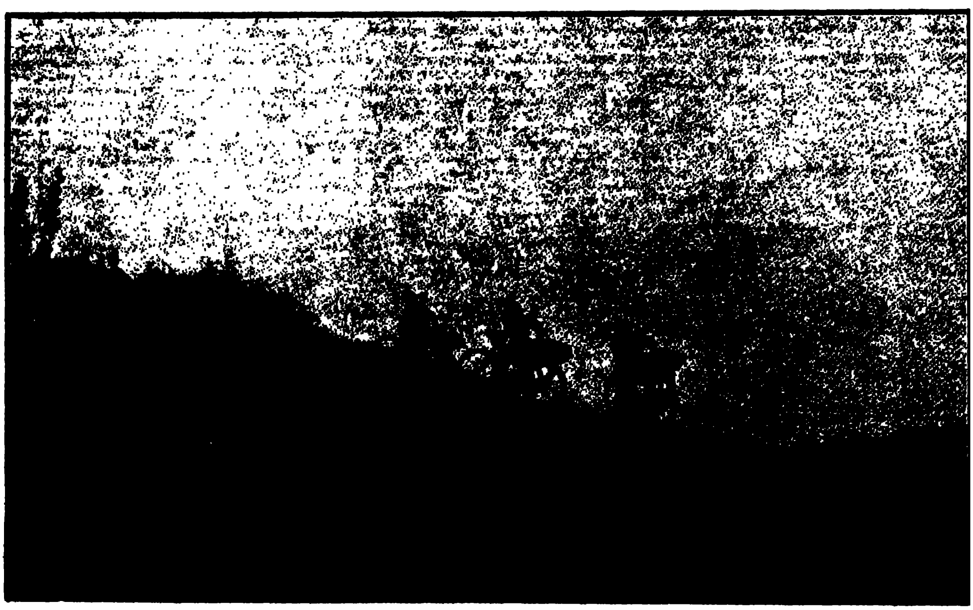
হ্যাঙ্গোরা পরিত্যাগ করিয়া কন্‌ষ্ট্যান্টিনোপ্‌লের পথে চলিয়াছেন। পথে ইঁহারা নানাস্থানে বিচিত্র বিষয়ের ও দৃশ্যের আলোক-চিত্র লইতেছেন। এইরূপ অনেকগুলি আলোক-চিত্র ও কয়েকখানি পত্র আমরা পাইয়াছি। বর্ত্তমান সংখ্যায় আমরা কয়েকখানি মাত্র চিত্র প্রকাশিত করিয়া ইঁহাদের পথের বৈচিত্র্য নির্দ্দেশ করিলাম। ভবিষ্যতে ক্রমশঃ ইঁহাদের প্রেরিত অন্যান্য চিত্র ও পত্রাংশ, এবং তৎপরে যথাসময়ে ধারাবাহিক ভাবে ইঁহাদের বিস্তৃত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইবে। পত্রাদি বহু দূর হইতে আসিতেছে বলিয়া সময়ের কোনো স্থিরতা নাই; সেইজন্য "দ্বিচক্রে ভূ-প্রদক্ষিণ" ঠিক নিয়মিত প্রতি মাসে বাহির না হইতেও পারে।

বাঙালী যুবক চতুষ্টয়ের এই সাহস ও উদ্যম বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। এই সকল কার্য্য এবং কীর্ত্তি যে, জাতীয় প্রগতির সহায়ক তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি এই সম্পর্কে কোনো এক হিসাবী ব্যক্তি বলিয়াছিলেন, 'আচ্ছা, মান্‌লাম তারা যেন সমস্ত পৃথিবীটাকেই পাক্ দিয়ে আসবে,—কিন্তু তাতে হবে কি? লাভটা কি হবে?" সেখানে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেহই অবশ্য টাকা-আনা-পয়সার কোঠায় লাভকে লইয়া গিয়া এ কার্য্যের সমীচীনতা প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই; কিন্তু কেবল অর্থের দ্বারাই কি সকল ব্যাপার সার্থক হয়? মুদ্রার ছাপ না পড়িলে কি লাভের মূর্ত্তি গড়া অসম্ভব? দুস্তর উত্তীর্ণ হইবার, দুরতিক্রমকে অতিক্রম করিবার, দুরধিগমকে অধিগম্য করিবার যে অদম্য স্পৃহা মানবচিত্তে নিহিত আছে তাহার অনুশীলন মানব-জাতির পক্ষে সাধনা।

করিতে পারিবার বাধাকে অতিক্রম করাই একটা সফলতা। টাকা-আনা-পয়সার হিসাবীদের অপেক্ষা পাউণ্ড-শিলিং-পেন্সের হিসাবে যাহারা অধিকতর পটু তাহারা কিছুদিন হইতে অর্থ এবং জীবন পণ করিয়া পৃথিবীর সর্বোচ্চ স্থানে উপনীত হইবার জন্ত চেষ্টা করিতেছে—অথচ তাহারা সুনিশ্চিত জানে সেই সর্বোচ্চ প্রদেশে শীতলতম তুষার ভিন্ন কোনো হীরা-মাণিকের খনি নাই,—এমন কি কয়লার পর্য্যন্ত নহে।

আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই দ্বিচক্র-ভ্রমণকারীগণের মঙ্গল কামনা করি।

বিঃ সঃ



বালির ওপর যখন সাইকেল ঠেলে চলেছি

চুঁচুড়ার ডাচ্-গার্ডেন্

শ্রীহরিহর শেঠ

চন্দননগরের পুরাতন ইতিহাস আলোচনা করিতে যেমন প্রাচীন মানচিত্রে ও ঐতিহাসিক গ্রন্থে চন্দননগরের দক্ষিণে ভাগীরথী-তীরে ফরাসি কোম্পানির পর্য্যবেক্ষক দুপ্লের গৌরহাটী বা গরুটীস্থ বিলাস-উদ্যানের নাম পাওয়া যায় "ফ্রেঞ্চ গার্ডেন্" বা "ওল্ড ফ্রেঞ্চগার্ডেন্", * সেইরূপ হুগলীতে "ইংলিস্ গার্ডেন" এবং চন্দননগরের উত্তরে চুঁচুড়ার দক্ষিণে "ডচ্ গার্ডেন্" নামে একটি বিশিষ্ট স্থানের নামোল্লেখ আছে। হেজের (William Hedges) রোজ-নামচায় ইহার অনেকবার উল্লেখ পাওয়া যায়। মাদ্রাজের ইংলিশ এজেন্ট্ (যিনি পরে মাদ্রাজের গভর্ণর হইয়াছিলেন) ষ্ট্রেণশাম্ মাষ্টার (Streynsham Master) ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানি কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া হুগলীর কুঠি-পরিদর্শনে আসিলে, তাঁহার তৎকালীন ভ্রমণের যে বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার মধ্যে "ডাচ গার্ডেনের" অধিকরণ স্থান পাওয়া যায়। দুই একখানি পুরাতন মানচিত্রেও ভাগীরথীর পশ্চিম কূলে এই নামাঙ্কিত একটি স্থান দেখা যায়।

'ফ্রেঞ্চ গার্ডেন্' নামটি এখন আর শুনা না যাইলেও উহা নিরাকরণের কোন অসুবিধা নাই। উহাকে গরুটি বা কেহ কেহ এখনও গরুটির বাগান বলিয়া থাকেন। উহা এখন পাটকলের আয়ত্বে থাকিলেও আজিও ফরাসীদের অধিকারভুক্ত। ইংলিশ গার্ডেনটি কোথায় ছিল আমি তাহার কোন সন্ধান এখনও করি নাই। কেহ সে সন্ধান রাখেন কিনা জানিনা। তবে প্রাচীন-স্মৃতিরক্ষানিপুণ ইংরাজ সরকারের কাছে সে সন্ধান থাকিতে পারে। কিন্তু আজ ওলন্দাজরা নাই, তাঁহাদের সে বাগান নাই, কাহারও কোনদিন সে স্থানের সন্ধানের আবশ্যকতাও দেখা যায়না। সুতরাং সে নাম ক্রমে লুপ্ত হইয়াছে। ওলন্দাজ অধিকার কালে উহার প্রসিদ্ধির কোন বিশেষ কারণ ছিল বা উক্ত কোম্পানির উহা একটি উদ্যান মাত্র ছিল তাহা ঠিকমত জানিবার আমার কোন সুযোগ এখন পর্য্যন্ত উপস্থিত হয় নাই, তবে উহা যে তখনকার দিনে খ্যাতনামা ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়, এমন কি এখানে ওলন্দাজদের কোন কুঠি বা প্রধান কর্ম্মচারীদের বাসভবন ছিল একথা নিশ্চয় রূপে বলিবার মত কিছু প্রমাণ না থাকিলেও, উহা যে একটি বিশিষ্ট-স্থান ছিল তাহা মনে করিতে পারা যায়।

প্রাচীন মানচিত্রে এই উদ্যানের যে নাম পাওয়া যায় তাহার কথা ছাড়িয়া দিলেও, হেজের দৈনন্দিন পত্রে যাহা আছে তাহা কিছু উদ্ধৃত করিয়া উহার যৎসামান্য পরিচয় দিতেছি :—

"July 24, 1682—Early in ye Morning I was met by Mr. Littleton and most of ye Factory, near Hugly; and about 9 or 10 o'clock by Mr. Vincent near ye Dutch Garden, who came attended by severall Boats and Budgerows, guarded by 35 Firelocks, and about 50 Rash-poots and Peons well armed. He invited me to go ashoar with him to the Dutch Garden where he had provided an entertainment for me, and made preparation for my reception........."

"August 29, 1684—............with this boat I got near ye Dutch Garden, where ye President and all his retinue had been some time arrived; and seeing I came not, Mr. Ed. Littleton sent his Palankeen and Peons to meet me, who carryed me with speed to the Garden........."

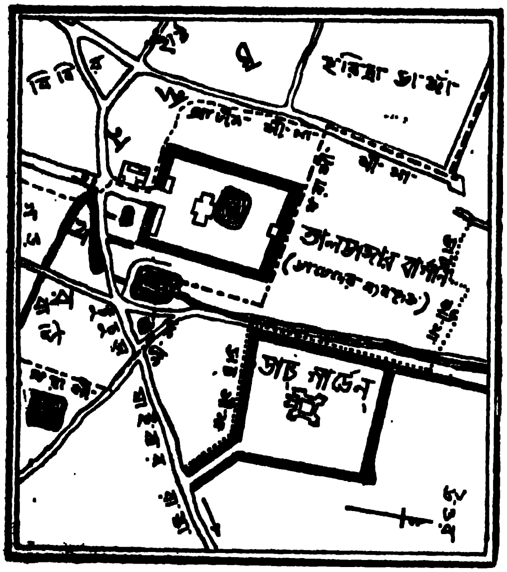
"December 6, 1684—This night, about 6 o'clock, ye President left ye Factory at Hugly, and lay at ye Dutch Gardens, about 3 miles down ye River."

"December 8, 1684—I went to visit President Gyfford at ye Dutch Garden, and take my leave of him..............."*

ষ্ট্রেনশাম্ মাষ্টার তাহার রোজনামায় ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে লিখিয়াছেন ... lesse than two miles short of Hugly we passed

* কেন্টের মানচিত্রে "ফ্রেঞ্চগার্ডেন্" এবং জোসেফ-সার্জেন্টের ম্যাপে "ওল্ড ফ্রেঞ্চ গার্ডেন্" নাম আছে। অন্যান্য স্থানেও এই নাম পাওয়া যায়।

* He dges' Diary Vol. I



'ডাচ্-গার্ডেন্' ও তালডাঙ্গার বাগান—চন্দননগর
(১৭৬৭-৬৯ খৃষ্টাব্দের ফরাসী মানচিত্র হইতে)

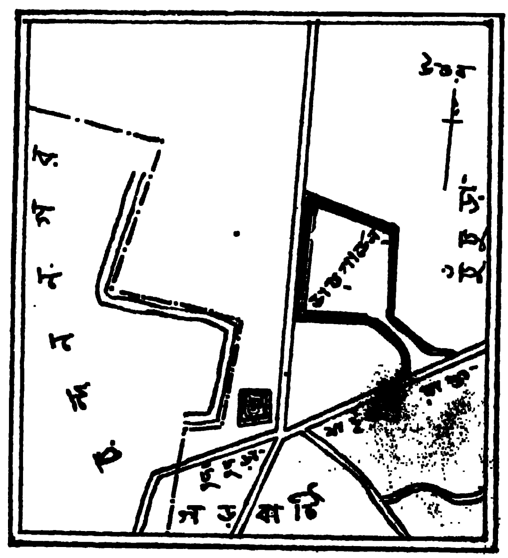
by the Dutch Garden, and a little further by a large spot of ground which the French had laid out in a ffactory, the gate to which was standing, but which was now in the possession of the Dutch.................."

তৎপরে হ্যামিণ্টন্ (Alexander Hamilton) ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশ পরিভ্রমণে আসিয়া চুঁচুড়ার যে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়—'about half a legue further up (from Chandernagore) is the Chinsurah, where the Dutch Emporium stands. It is a large Factory, walled high with Brick * * * *" †

বৃটিশ এজেন্ট যে ডাচ্ গাডে´নের উল্লেখ করিয়াছেন উহাই যে প্রাচীর বেষ্টিত বৃহৎ ওলন্দাজ কুঠি [illegible] উদ্ধৃত বর্ণনা হইতে নিশ্চয়রূপে বলা না যাই[illegible]ের বর্ণনায় চন্দননগর ও হুগলী হইতে দূরত্বের কথা ভাবিলে উহা একই স্থান বলিয়া ম[illegible]। তাহা হইতে ডাচ্গাডে´নের মধ্যে একটি ব[illegible] ছিল বুঝা যায়। যাহা হউক পুরাতন ডাচ গার্ডেনের স্থান নিরাকরণ করাই এখানে আমার উদ্দেশ্য।

আমি ঠিক এই উদ্দেশ্য লইয়া প্রথম অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই নাই। ফরাসী কোম্পানি চন্দননগরে কখন এবং কোথায় প্রথম তাঁহাদের কুঠিস্থাপন করেন তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া এই প্রাচীন স্থানটির সন্ধান পাই। ১৩৩১ সালের চৈত্রের 'প্রবাসী'তে এবং ১৯২৭-এর মে ও জুনের 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় বাঙ্গালায় ফরাসীদের আদি স্থান নির্ণয় বিষয়ক আমার প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ আছে। যদি কোন দিন কোন অনুসন্ধিৎসুর কোন উপকার আইসে এই মনে করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে সম্যক বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসুগণের মধ্য হইতে কেহ ইচ্ছা করিলে আমার গবেষণার সত্যাসত্য ঠিক করিতে পারিবেন।

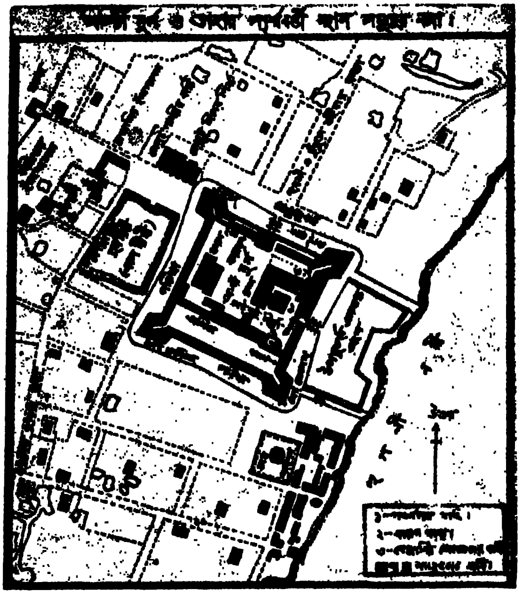
চন্দননগর অতিক্রম করিয়া গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া হুগলীর দিকে যাইতে প্রথম পথটি যেখানে উত্তরাভিমুখে বাঁকিয়াছে সে স্থান হইতে কিছু দূরে অগ্রসর হইলে পথের পূর্ব্ব দিকে পরিখা বেষ্টিত যে বৃক্ষাদি পূর্ণ একটি সু-উচ্চ



'ডাচ্-গার্ডেন্' —চুঁচুড়া
(১৮৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দের গবর্মেণ্ট সার্ভে ম্যাপ হইতে)

* Hedges Diary—Vol II.
† New Account of the East Indies.—Hamilton

শ্রীহরিহর শেঠ

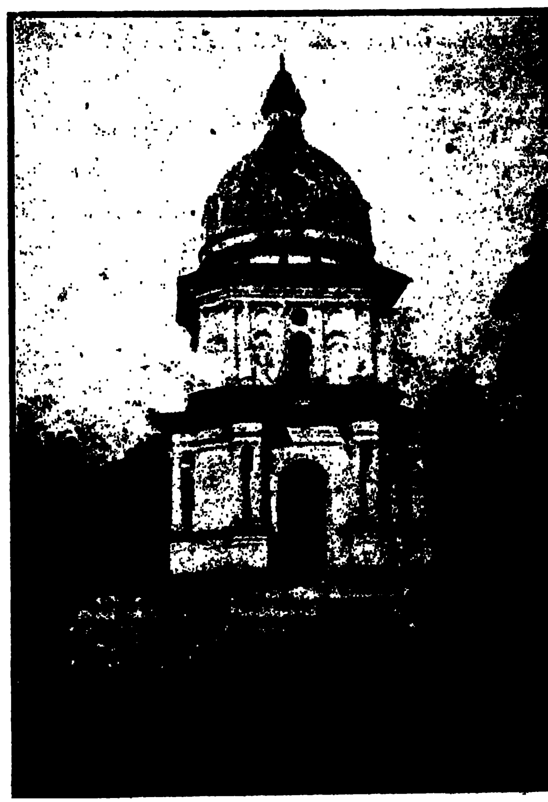


অর্লঁ্যা দুর্গ—চন্দননগর

সুন্দর সমাধি মন্দির শোভিত বৃহৎ ভূমিখণ্ড নয়ন পথে পতিত হয় সেই স্থানকেই আমি প্রাচীন "ডাচ্ গার্ডেন" বলিতেছি। যাহাকে স্থানীয় লোকে এক্ষণে সাট সাহেবের বাগান বা সাহেব বাগান বলে। পূর্ব্বে ইহা 'আয়েস-বাগ' নামেও অভিহিত হইত। এই উভয় নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু ঠিক করিতে পারি নাই।

এই বাগান সম্বন্ধে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় প্রথম একখানি পণ্ডিচারীর নথিশালা (archives) হইতে প্রাপ্ত অপ্রকাশিত-পূর্ব্ব হস্তাঙ্কিত প্রাচীন চন্দননগরের ফরাসী মানচিত্র হইতে। উহাতে চন্দননগরের বাহিরের অন্য কোন স্থানের কোন উল্লেখ নাই; কেবল উল্লিখিত স্থানটি অঙ্কিত আছে এবং উহাতেই প্রথম দেখি উহা ওলন্দাজদের বাগান বলিয়া নির্দ্দেশ আছে। নক্সাখানিতে স্পষ্ট দেখা যায় যে স্থানটি পরিখা বেষ্টিত এবং ইহার প্রায় মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ অট্টালিকা ছিল তাহার নক্শা (ground plan) ও আছে। এই সৌধের নক্সা সাধারণ অট্টালিকার মত নহে। সেকালের অন্যান্য পাশ্চাত্য কোম্পানির কুঠি বা দুর্গের সহিত তাহার সাদৃশ্য যথেষ্ট বর্ত্তমান আছে। চন্দননগরের যে প্রাচীন মানচিত্রে উহা পাইয়াছি, তাহাতেই পরিখা বেষ্টিত চন্দননগরের কুঠি বা অর্লঁ্যা দুর্গের (Fort d Orleans) যে নক্সা অঙ্কিত আছে, তাহার বহিরাকৃতিও অনেকাংশে এইরূপ।

হুগলী হইতে আসিতে "ডাচ্ গার্ডেনের" পর যে ফরাসীদের ভূখণ্ড, যেখানে তাঁহারা পূর্ব্বে কুঠি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং যাহা তৎকালে ওলন্দাজদের অধিকারে ছিল বলিয়া মাষ্টার বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা উক্ত মানচিত্রে স্পষ্ট দেখা যায় এবং উহাই যে সেই বৃহৎ ভূখণ্ড তাহা বুঝিতে কোন সংশয় থাকে না। উইলসন্ সাহেব (C. R.



পুরাতন ডাচ্-গার্ডেনের মধ্যস্থিত সমাধি মন্দির

* A sketch of the Administration of the Hooghly District from 1795 to 1845—Toynbee.

Wilson) এই ডাচ্ গার্ডেন্ চন্দননগরের মধ্যে ছিল বলিয়াছেন।* পুরাতন মানচিত্র দৃষ্টে চন্দননগরের উত্তর সীমার পর ও 'ডাচ্ গার্ডেনের' দক্ষিণ সীমার মধ্যের স্থানটি ঠিক তাহাদের অধিকারে ছিল তাহা বুঝিবার অসুবিধা হইলেও, এই গ্রন্থকারের কথা ঠিক মনে হয় না। উহা বাহিরে এবং ডাচ্ সীমার ঠিক প্রান্তভাগেই অবস্থিত ছিল। হুগলী হইতে ডাচ্ গার্ডনের দূরতা দুই মাইলের মধ্যে লেখা আছে; হেজ্ সাহেব দূরতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, হুগলীর কুঠি হইতে তিন মাইল। তাহাতেও উক্ত স্থানটিকে নির্দ্দেশ করিতে কোন বাধে না। জমির আকার এবং মাপও ফরাসী নক্শার ঠিক অনুরূপ। ইং ১৮৬৯-৭০ সালের ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট কৃত সার্ভে ম্যাপে এই জমির নক্সা পাওয়া যাইলেও উহাতে নামের কোন উল্লেখ নাই, বর্ত্তমানে যে সমাধি মন্দির আছে তাহা ইহাতে দেখান আছে।

এই উদ্যানের একটা পর পর ইতিহাস সংগ্রহ করিতে পারি নাই। এক্ষণে উহা হুগলী কলেক্টরি হইতে একজনকে জমা বিলি করা আছে। উহার সুপ্রশস্ত সুরক্ষিত প্রবেশ পথ আজিও সাধারণ পথের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া ঠিক মতই রহিয়াছে। যে মন্দিরাকৃতি সমাধি দেখা যায়, উহা ইট্স্ (Madame Yeats) নাম্নী কোন ওলন্দাজ রমণীর সমাধি। ১৮০৫ সালের ২১শে নভেম্বরের তাঁহার দানপত্র দ্বারা প্রদত্ত চারি সহস্র মুদ্রার সুদ হইতে এখনও নিয়মিত রূপে উহা মেরামত হইয়া থাকে। উক্ত দানপত্র হইতে বুঝা যায় ঐ জমিখণ্ড তিনি স্থানীয় ডাচ্ ও ইংরাজ অধিবাসীদের গোরস্থান রূপে ব্যবহারের জন্য দান করিয়াছিলেন।* কিন্তু সে কার্য্যে উহা ব্যবহৃত হইতেছে না। উহা এখন স্থানে স্থানে জল-শৈবালাদিতে পরিপূর্ণ পরিখার দ্বারা বেষ্টিত রহিয়াছে; একেবারে জনশূন্য নীরবতায় আচ্ছন্ন, কেবল বাঁশের ঝাড় ও বড় বড় বৃক্ষ এবং জঙ্গলে পরিপূর্ণ। মধ্যে কেবল সেই তুষারশ্বেত সমাধি মন্দিরটি একাকী মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া গাছের আড়াল হইতে দূরস্থিত পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। পূর্ব্বোক্ত সৌধের কোন চিহ্ন আর দেখা যায় না। আমার বিশ্বাস মৃত্তিকা খনন করিলে এখনও উহার ভিত্তির নিদর্শন পাওয়া যাইতে পারে।

* The Early Annals of the English in Bengal.

* A Sketch of the Administration of the Hooghly District from 1795 to 1845 by George Toynbee.



নির্ব্বাণ

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

এখন যে এসেছে নিদাঘ—
ঝরিয়া পড়িছে ফুলদল,
ধূলি-পাংশু ফাগুনের ফাগ
উড়িছে বাতাসে অবিরল!

শুষ্ক হ'ল আনাভি-রসনা—
মরীচিকা মরুৎ-মুকুরে!
জীবনের বিফল বাসনা
প্রেত হ'য়ে ঘোরে দূরে-দূরে!

জর-তাপে হৃদয়ের জতু
গলে' গলে' হ'ল অবশেষ,
সারাদেহে বেদনা-বেপথু,
আঁখি-তারা ম্লান অনিমেষ।

নিশীথের স্বপ্ন-বিভীষিকা,
দিবসের সুদীর্ঘ দাহন,
ভয়ঙ্কর বজ্রানল-শিখা
বৈশাখের ঝটিকা-বাহন

প্রাণ-গ্রন্থি করিছে শিথিল,—
নিবিড় আঁধারে অচেতন
করিবে না? এ বিশ্ব-নিখিল
হবে না কি নিদ্রা-নিকেতন?

ঘুমাইব আমি অকাতরে—
নভোতল রবিরশ্মিহীন,
জলধারা এ দেহ-পাথরে
অঝোরে ঝরিবে নিশিদিন!

জাগা'য়ো না হে বঁধু আমারে,
বাজা'য়ো না ও দুটি নূপুর!
এসো না প্রাবৃট-অভিসারে
ডাকিয়ো না বাঁশীতে, নিঠুর!

উল্লাসে নাচিবে যবে শিখী,
কদম ফুটিবে বনে-বনে,—
এ বুকে দিও না পুন লিখি'
পীরিতির রীতিটি গোপনে!

জানি এবে, হে বর-নাগর,
তোমার সে নাগর দোলায়—
হাসি চেয়ে আঁখিতে সাগর
কূলে কূলে নিতি উথলায়!

শরতের সোনার জুয়ার
আসিবে?—আসুক পুন ফিরে'
শীত-রাতে রুধিয়া দুয়ার
যেগে-থাকা কুটীর-তিমিরে!

তার লাগি' ডরে না হৃদয়,
ডরি সে ফাগুন-ফুল দোল!
সেই আঁখি—চাহনি নিদয়!
শোণিতে ক্ষণিক কলরোল!

সাজাতে চাহিনা তার চিতা
জীবনের নিদাঘ-শ্মশানে;
মধু-শেষ মুখের সে তিতা
সারা প্রাণে অরুচি যে আনে!

প্রীতি নাই, আছে শুধু স্মৃতি!
ব্যথা আছে, নাহি সে কামনা!—
বাদলের ধারাজলে তিতি'
নিবে যাক্ প্রাণ-বহ্নি-কণা।

বৃন্দাবন

—গল্প—

—শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়

কালিদাস সাগরকে ভীষণ ও রমণীয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বৃন্দাবনকেও ঐরূপ বর্ণনা করিলে কিছুমাত্র অতিরঞ্জন হয় না। কেবল আকৃতিতে নহে, প্রকৃতিতেও বৃন্দাবন ঐ দুইটী বিরুদ্ধ গুণের অধিকারী ছিল।

তাহার সুদীর্ঘ দেহ, বিশাল বক্ষস্থল, ও পালোয়ানের মত সুদৃঢ় মাংসপেশী প্রথমেই দর্শকের মনে ত্রাসের সঞ্চার করিত বটে, কিন্তু পরক্ষণেই তাহার প্রসন্নোজ্জ্বল মুখ-কান্তি ও আয়ত চক্ষের স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি সে ভাব অন্তর্হিত করিয়া দিত। অন্যায় দেখিলে, বৃন্দাবন সহিতে পারিত না, তাহার কঠোরতা ছিল এইখানে; কিন্তু পরদুঃখে তাহার চিত্ত বিগলিত হইত। ক্ষুধিতকে অন্ন দিতে, আশ্রয়হীনকে সাহায্য করিতে, রোগীর শুশ্রূষায়, মৃতের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় সে আপনাকে বিলাইয়া দিত।

বৃন্দাবন সমজদার মজলিসি লোক ছিল, সে কারণ, তাহার গাম্ভীর্য্য এবং সরস ভাব স্থানকালপাত্রাভেদে বিকীর্ণ হইত।

বৃন্দাবন নিঃসন্তান, পরিবারের মধ্যে তাহার পতিব্রতা পত্নী সুরমা ও বিশ্বাসী ভৃত্য রামচরণ। তাহাদের লইয়াই ক্ষুদ্র সংসার কিন্তু তাহার বুভুক্ষু রুদ্ধ স্নেহ, প্রতিবেশী ও শিশুদের মধ্যে বিস্তার লাভ করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিত। ছোটরা তাহাকে ডাকিত বৃন্দাবন কাকা, বড়রা বলিত বৃন্দাবন খুড়ো; পরে বৃন্দাবন অংশটুকু বাহুল্যবোধে পরিত্যক্ত হইয়া শুধু কাকা ও খুড়োতে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। তখন কাকা ও খুড়ো এই শব্দদুটী যোগরূঢ়ী শব্দের ন্যায় কেবল বৃন্দাবনকেই বুঝাইত।

বৃন্দাবনের শৈশবের ইতিহাস আমাদের অজ্ঞাত। শুনা যায় তারকেশ্বরের নিকটবর্ত্তী কোন ক্ষুদ্রগ্রামে তাহার বাসস্থান এবং সামান্য ভূসম্পত্তি তাহার ছিল। সে যখন পরিণত বয়সে চাকুরীর চেষ্টায় কলিকাতায় আসে এবং কোন প্রসিদ্ধ সওদাগরী আফিসে ছোট বেতনের একটী চাকুরী যোগাড় করিয়া, ভবানীপুর মনোহরপুকুরে একটি ছোট একতলা বাড়ী ভাড়া লয়, তখন বৃন্দাবনের সহিত আমাদের প্রথম পরিচয়। সে আজ ত্রিশ বৎসরের কথা।

লক্ষ্মীর প্রসাদ লাভ না করিলে যে বীণাপাণি প্রসন্ন হন, একথা অন্তত বৃন্দাবন প্রমাণ করিতে পারে নাই। যতদূর জানা যায়, শৈশবে বৃন্দাবনের চিত্ত বিদ্যামন্দির অপেক্ষা গ্রাম্য প্রান্তরেই অধিকতর নিবিষ্ট ছিল, এ নিমিত্ত লেখাপড়ায় বৃন্দাবন বিশেষ অগ্রসর হইতে পারে নাই। তবে কি উপায়ে এই দুর্দ্দিনে, সে নিজের চেষ্টায় সাহেবের মনস্তুষ্টি করিয়া চাকুরী যোগাড় করে, তাহা বুঝিতে হইলে তাহার স্বর্গগত পিতার অমূল্য উপদেশটি জানা আবশ্যক। বৃন্দাবনের মুখেই আমরা শুনিয়াছিলাম যে তাহার পিতা মৃত্যুকালে তাহাকে কাছে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন,—"বাবা সাহেবের সহিত ইংরাজীতে কথা বলিতে ভয় করিও না—সে লাট সাহেবই হউক আর যেই হউক। কথা কহিবার সময় ব্যাকরণের কথা একেবারে ভুলিয়া যাইবে। সে ত্রিসীমানায় না আসে। Telegraphic ইংরাজীতে কথা বলিবে অর্থাৎ ইংরাজী শব্দ মোটামুটি যা জানা আছে ক্রিয়া ও অনর্থক শব্দ বাদ দিয়া তাহাই সটান বলিয়া যাইবে। সাহেব যখন কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবে চট্‌পট্ জবাব দিবে, ইতস্ততঃ করিলেই বিপদ। সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবে এবং কাজে ফাঁকি দিবে না।"

শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়

আফিসে কাজ যোগাড় এবং তাহার সাফল্যের মূলে, যে তাহার পিতৃদত্ত ঐ অমূল্য উপদেশ নিহিত ছিল, একথা বৃন্দাবন কৃতজ্ঞতার সহিত বার বার স্বীকার করিত।

তাহার ছোট বাড়ীখানি পরিপাটিরূপে সাজান ছিল। বাড়ীর সম্মুখে খোলা জায়গাটুকু সুগন্ধি ফুলগাছ ও নয়না-ভিরাম লতাকুঞ্জে পরম রমণীয় হইয়া থাকিত। বাড়ীর সর্ব্বত্রই একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ভাব বিরাজ করিত। কোথায় এতটুকু ধূলা বা ময়লার লেশমাত্র নাই। ঝক্ ঝকে তক্ তকে গৃহের আসবাব-পত্র, মল্লিকা ফুলের মত শুভ্র শয্যা-আস্তরণ, নিপুণভাবে সজ্জিত চিত্রপট, দর্শকের চিত্তকে প্রবেশমাত্রেই স্নিগ্ধ করিয়া দিত। বেশভূষায় বৃন্দাবনের আড়ম্বর ছিল না বটে, কিন্তু শুচিতার সৌন্দর্য্য তার ছিল। গৃহখানি দেখিলেই মনে হইত যেন লক্ষ্মীর শ্রীহস্তের চিহ্ন সর্ব্বত্রই পরিস্ফুট।

বৃন্দাবনের আফিস ৯৷৽ টায় বসিত এবং ৫৷৷৽ টায় ছুটী হইত। কিন্তু কার্য্যগতিকে বৃন্দাবন কোন কোন দিন ছুটীর নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রম করিত। বৃন্দাবনের সে জন্য কোন বিরক্তি বা ক্ষোভের কারণ হইত না। ঘড়ির কাঁটার ন্যায় নির্দ্দিষ্ট গতিতে বৃন্দাবন আফিসে গিয়া হাজির হইত। কখনো বিলম্ব হইত না।

তাহার আফিসের পোষাক ছিল, সাদা থান কোট, (ঋতু-ভেদে ছিটের বা গরমের) কোঠের বোতাম সুন্দর ঝিনুকের, পকেটে একটি নিকেলের ঘড়ি, আইভরীর চেন, জুতা নাগ্‌রা পাটার্ণের কিন্তু কোমল সংস্করণ। আর তাঁহার পত্নীর সযত্নে প্রস্তুত খান কয়েক লুচি ও মিষ্টান্ন-রক্ষিত পরিষ্কার এলুমিনিয়ামের আধারটিও তাহার সঙ্গে থাকিত।

গরমের সময়ে ইহা ছাড়া একখানা ধবধবে সাদা গামছাও থাকিত—আফিসে যাইবার সময় বৃন্দাবন তখন কোট পরিত না! উহা স্কন্ধদেশের একপার্শ্বে লম্বিত রহিত। আফিসে গিয়া তাহার কোটটি টেবিলের উপর রাখিয়া গামছাখানি দ্বারা গাত্র মার্জ্জনা করিয়া কোটটি পরিত। পরে নিমীলিত নয়নে দুতিন মিনিট দাঁড়াইয়া বৈদ্যুতিক পাখার বাতাস খাইয়া তাহার আসনে বসিত ও কাজে লাগিয়া যাইত। বৃন্দাবনের কখনও আফিসে যাইতে বিলম্ব হইত না, কিন্তু গ্রীষ্মকালে একদিন দৈবাৎ ২।৪ মিনিট বিলম্ব ঘটে। সাহেব ম্যানেজার বৃন্দাবনের ঠিক সম্মুখে বসিত, এ বিলম্বটুকু তাহার দৃষ্টি এড়াইল না। সে বৃন্দাবনের নিকট অগ্রসর হইয়া ঘড়ির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিল,—Hallo, Brindaban, you are late। স্বর প্রভুত্বব্যঞ্জক এবং তাহাতে একটু স্নেহের ভাবও ছিল।

বৃন্দাবন আর থাকিতে পারিল না, দাঁড়াইয়া উঠিয়া তৎক্ষণাৎ জবাব দিল,—"You say late! Never late. This day first time Punjab and Bombay mail leaving Howrah station correct time, they sometime late. We human being coming 5 miles distance, you say late! What justice! And you see only time of arrival not departure. Late!— never mind late." এই বলিয়া ধপ্ করিয়া নিজের আসনে বসিয়া পড়িল।

উল্লিখিত অদ্ভুত টেলিগ্রাফিক ইংরাজীর তর্জ্জমা করিলে এইরূপ দাঁড়ায়—"হে সাহেব তুমি দেরী হয়েছ বল্‌চ, আমার ত' কোনদিন দেরী হয় নাই, এই প্রথম দেরী। যারা যন্ত্রে চলে এমন যে পাঞ্জাব ও বম্বে মেল,—হাবড়া ষ্টেশন থেকে ঠিক্ সময়ে বেরিয়ে কখন কখন তাদেরও দেরী হয়ে যায়, আর আমরা ত' মানুষ, যন্ত্র নয়—৫ মাইল থেকে আস্‌তে যদি একটু দেরীই হয়ে গিয়ে থাকে, তাতে এমনই কি অপরাধ হয়েছে। সাহেব, আর তোমার অদ্ভুত বিচার, তুমি আসবার সময়ই দেখ কিন্তু যাবার সময়টি ত লক্ষ্য কর না। দেরী হয়েছে, বেশ হয়েছে।" সাহেব বৃন্দাবনের বলিবার ভঙ্গী ও অকাট্য যুক্তি দেখিয়া না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। কথাটা আফিসে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল এবং এ কথা বড় সাহেবের কানেও গেল। বড় সাহেব বৃন্দাবনের সময়নিষ্ঠা ও কার্য্যদক্ষতায় সন্তুষ্ট ছিলেন এবং তাহার সরল ভাবের ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজী শুনিতে বড় ভাল বাসিতেন। সেদিন ছুটির সময় বৃন্দাবনের ডাক পড়িল। মেম সাহেবের চিত্ত বিনোদনের জন্য বড় সাহেব

সকালে যাহা ঘটিয়াছিল আনুপূর্ব্বিক তাহার আবৃত্তি করিবার জন্ত বৃন্দাবনকে বলিলে, বৃন্দাবন সেইরূপ ভঙ্গীতে ও সেইরূপ অপূর্ব্ব ইংরাজীতে ঘটনাটি ব্যক্ত করিল। মেম হাসিয়া খুন; সাহেবও তাহাতে যোগ দিলেন। ইহার ফলে, বড় সাহেবের হুকুম হইয়া গেল যে, বৃন্দাবনের যদি দৈবাৎ কোন দিন আসিতে বিলম্ব হয় তাহার জন্ত কৈফিয়ৎ দিতে হইবে না, অধিকন্তু কিছু মাহিয়ানাও বাড়িয়া গেল।

একবার বর্ষার সময় বেশী টাকার চেক্ লইয়া বৃন্দাবনকে Chartered Bank-এ যাইতে হইবে। বৃন্দাবন দেখিল রাস্তায় হাঁটু জল, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, এমন সময় কি কারণে বড় সাহেব নীচে আসিয়া বৃন্দাবনকে তদবস্থ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "what is the matter with you, Brindaban?" বৃন্দাবন বলিল water sir, foot-path to tram-car. Charter Bank going difficult. If dress dirty wet Charter Bank men hate us".

সাহেব হাসিয়া বড় বাবুকে হুকুম দিলেন—'আজ হইতে ব্যাঙ্কে যাইতে বৃন্দাবন গাড়ীভাড়া পাইবে এবং best water-proof ও ভাল এক জোড়া জুতা উহাকে দেওয়া হউক।' বৃন্দাবন হাসিমুখে সাহেবকে সেলাম করিল এবং সাহেব শিস্ দিতে দিতে উপরে চলিয়া গেলেন।

আর একবার কলিকাতায় ভয়ঙ্কর শীত—বড় সাহেব বৃন্দাবনকে ডাকিয়া বলিলেন, এরূপ শীত অনেক দিন পড়ে নাই। সাহেবের সহিত টেলিগ্রাফিক কথাবার্ত্তার পরে, একটি স্বেচ্ছা-প্রদত্ত গরম ভাল কোট বৃন্দাবনের লাভ হইল।

বড় সাহেব বৃন্দাবনকে তাহার সরলতা, নির্ভীকতা, আত্মমর্য্যাদা-বোধ ও কর্ম্মদক্ষতার জন্ত স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। দিন দিন তাহার উন্নতি হইতে লাগিল। এইরূপে কয়েক বর্ষ অতীত হইল।

স্বচ্ছন্দ গতিতে বৃন্দাবনের জীবনযাত্রা চলিয়া যাইতে ছিল, আফিসেও তাহার মানসম্ভ্রম উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছিল এমন সময় বড় সাহেব বিলাত চলিয়া গেলেন এবং ম্যানেজারও স্থানান্তরিত হইল। এবার যিনি বড় সাহেব হইয়া আসিলেন, তাঁহার মেজাজ রুক্ষ, ভাষা কর্কশ এবং নেটিভের উপর তিনি একেবারে খড়্গহস্ত।

বৃন্দাবন দেখিল, গতিক বড় সুবিধার নয়, মানে মানে এখন বিদায় লওয়াই কর্ত্তব্য। এমন সময়ে একদিন এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল।

বেলা প্রায় তিনটা বাজে; বৃন্দাবন দেখিল কুণ্ঠিতভাবে একটি যুবক আফিসে প্রবেশ করিল। ক্লান্তি ও অবসাদে, দৈন্তে ও নিরাশায় তাহার সুন্দর মুখের অব্যক্ত বেদনা বৃন্দাবনের হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত করিল। বৃন্দাবন সস্নেহে নিকটে ডাকিয়া তাহার পরিচয় লইল। ছেলেটি সম্প্রতি পিতৃহীন হওয়ায় সংসারের ভার তাহার ঘাড়ে পড়িয়াছে। বিধবা মাতা, অবিবাহিতা ভগ্নী, দুইটী ছোট ভাই আরও ২।১ জন নিকট আত্মীয় আছেন। সে বি-এ পড়িতে-ছিল। অকস্মাৎ পিতৃ-বিয়োগে সংসারের নিদারুণ অভাবের তাড়নায় পড়া ছাড়িয়া অর্থের সন্ধানে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। কেহ সাহায্য করিবার নাই, চাকুরীর চেষ্টায় আফিসে আফিসে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—কোথাও কিছু হয় নাই। সামান্ত যাহা কিছু সঞ্চিত অর্থ ছিল, তাহা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। কাল যে কি হইবে তাহার কোন উপায় নাই।

বৃন্দাবন এই করুণ-কাহিনী শুনিয়া আমাদের দেশের অভাবের তাড়নার তীব্রতা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিল। পকেট হইতে একখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া বলিল, "এ আফিসে কোন সুবিধা হইবে না। এই টাকা লইতে সঙ্কুচিত হইও না, এক মায়ের পেটে না জন্মিলেও আমরা ভাই ভাই। এ স্নেহের দান তোমার মা'র আশীর্ব্বাদে সার্থকতা লাভ করুক।" যুবকটীর চোখ দুটী জলে ভরিয়া আসিল তাহার পর আর সে দান প্রত্যা-খ্যান করিতে পারিল না।

এদিকে বড় সাহেব দূর হইতে লক্ষ্য করিতেছিল যে বৃন্দাবন অনেকক্ষণ একটা ছোকরার সহিত কি কথাবার্ত্তা কহিতেছে।

শ্রীতারারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

সাহেব রূঢ় ভাষায় জিজ্ঞাসা করিল—'ছোকরা কি চায়?' বৃন্দাবন উত্তর দিল "চাকুরীর সন্ধানে আসিয়াছে।" সাহেবের মেজাজ আজ বড় কড়া, বৃন্দাবনকে বলিল, 'You are wasting time'—যুবকটিকে লক্ষ্য করিয়া কর্কশ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল 'Get out at once, get out'। অপমানে যুবকটির মুখ লাল হইয়া গেল সে, ধীরপদবিক্ষেপে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। কিন্তু বৃন্দাবনের হৃদয়ে সে অপমান সূচের ন্যায় বিদ্ধ হইল। সে দাঁড়াইয়া উঠিল এবং অসঙ্কোচে ব্যক্ত করিল যে, যুবকটী গরীব হইলেও ভদ্রলোকের ছেলে। তাহাকে কুকুরের মত তাড়াইয়া দিবার অধিকার কাহারো নাই। আর যায় কোথায়? সাহেব তখন রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অকথ্য ভাষায় নেটিভের উপর তীব্র বিষ উদ্গীরণ করিল। বিষের জ্বালায় বৃন্দাবনের সর্ব্বশরীর নীল মেঘে আচ্ছন্ন হইল, রোষদীপ্ত নয়ন দুটী হইতে বিদ্যুতের শিখা ঝলসিয়া উঠিল। সে ঝড়ের মত বেগে সাহেবের দিকে অগ্রসর হইয়া ভীষণ গর্জ্জনে বলিল, "Hold your tongue" এবং তার পরক্ষণেই অশনিপাতের ন্যায় সাহেবের ললাটে যে প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত পড়িল তাহার বেগ সামলাইতে না পারিয়া সাহেব সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ধরাশায়ী হইল। পলকের মধ্যে এই ব্যাপারটি ঘটিল। এই আকস্মিক অপ্রত্যাশিত আক্রমণের জন্য সাহেব প্রস্তুত ছিল না। সমস্ত আফিস তোলপাড় হইয়া উঠিল, ছোট বড় সকল কর্ম্মচারী শশব্যস্ত, ম্যানেজার সাহেব স্বয়ং আসিয়া বড় সাহেবের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল। আফিসের ছোট সাহেব টেলিফোনে নিকটবর্ত্তী থানায় সংবাদ দিল।

এ দিকে বৃন্দাবনের চিত্ত উদ্বেগশূন্য। সে নিজের আসনে বসিয়া পদত্যাগ পত্রখানি লিখিয়া, পুলিশের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কয়েক মিনিটের মধ্যে পুলিশ আসিয়া পড়িল, বৃন্দাবন তৎক্ষণাৎ অপরাধ স্বীকার করিয়া আত্মসমর্পণ করিল। পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া গেল। ইহার কিছুক্ষণ পরে, বড় সাহেবের জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। শারীরিক যন্ত্রণা তখন অনেক উপশম হইয়াছিল, কিন্তু শিকার হাতছাড়া হইয়াছে জানিয়া স্বহস্তে রাস্কেলটার স্পর্দ্ধার সমুচিত প্রতিশোধ লইতে অক্ষম হওয়ায়, নিষ্ফল আক্রোশের দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল।

থানায় আসিয়াও কৃত কার্য্যের জন্য বৃন্দাবনের কোনরূপ ভাবান্তর হইল না। সে নিজের অপমান সহিতে পারে কিন্তু জাতীয় অপমান তাহার পক্ষে অসহ্য। পরাধীনতার অপমান ও লাঞ্ছনা অপেক্ষা মৃত্যু ভাল। ইহার তুলনায় চাকুরী ছাড়া ও কিছুকাল জেলভোগ করা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। সে স্বেচ্ছায় সাহেবকে মারিয়াছে তজ্জন্য দণ্ড লইতে সে প্রস্তুত হইয়াই আছে। জাতীয় গৌরব রক্ষায় জন্য আমাদের বহুকাল-সঞ্চিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক—এ কথার মর্ম্ম আজ সে গভীরভাবে অনুভব করিল।

অনেকক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিবার পর বড় সাহেব নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইল। নেটিভের মার খাইয়া আদালতে প্রতিকার লইতে কোন মতেই তাহার মন সাড়া দিল না, বিশেষতঃ এ ব্যাপার আদালতে গড়াইলে সংবাদপত্রে সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়া পড়িবে এবং নেটিভ কাগজগুলিতে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপধারা বর্ষিত হইবে এবং আদালতগৃহ স্বরাজ-প্রয়াসী নব্য বাঙ্গালী যুবকগণের 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে মুখরিত হইবে, এই সকল চিত্র একে একে সাহেবের মনশ্চক্ষে প্রতিভাত হইয়া উঠিল। সাহেব আর স্থির থাকিতে পারিল না, তাড়াতাড়ি একখানি পত্র লিখিয়া অবিলম্বে চাপরাশিকে দিয়া পত্রখানি থানায় পাঠাইয়া দিল।

থানার ইনেস্পেক্টর ছিলেন বাঙালী। তিনি পত্র পড়িয়া ব্যাপারটি বুঝিতে পারিলেন। ঈষৎ হাসিয়া বৃন্দাবনকে সংবাদ দিয়া বলিলেন, "বৃন্দাবন বাবু আপনি মুক্ত"।

বৃন্দাবন মুক্ত হইয়া প্রথমে নিজের বাড়ী গেল না, সরাসর বড়-সাহেবের বাড়ী গিয়া সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিল। সাহেবকে কোন কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া সে অনর্গল নিম্নলিখিত কথাগুলি বলিয়া গেল—"Scolding me no matter, but attacking my nation unbearable Therefore angry, therefore blowed you. You English-man—national pride goodly appreciate; therefore freed me, therefore I now apology।

সাহেবের কঠিন মুখচ্ছবি দেখিতে দেখিতে হাস্তকুঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি বৃন্দাবনের কর মর্দ্দন করিয়া বৃন্দাবনী ইংরাজীতে বলিলেন, 'Yes Brindaban babu very very appreciate. So not accept resignation. Agree?'

বৃন্দাবন পিঠ পিঠ বলিয়া উঠিল, 'You agree, I not? Impossible' এবং বলিয়াই সাহেবের টেবিলস্থ ফাইল হইতে নিজের কর্ম্মত্যাগের দরখাস্তখানি টানিয়া বাহির করিয়া সাহেবের সাম্‌নেই ছিঁড়িয়া সাহেবের দেশলাই জ্বালিয়া পুড়াইয়া দিল।

পাখীর প্রাণ

(জাপানী হইতে)

শ্রীরামেন্দু দত্ত

ব্যাধ, সে কেমনে বুঝিবে পাখীর
গোপন মনের কথা—
তা'র, কোথায় লুকানো ব্যথা?

* * *

সে বলে, "তোমায় দিয়েছি শস্ত, খাও;
শীতল সলিল দিয়েছি তোমায়, নাও;
অক্ষত র'বে পক্ষ তোমার,
হেম-পিঞ্জরে থাকো।"
হায়, হায়, ব্যাধ বিহগ-বুকের
ব্যথা কোথা বোঝেনাকো!!!

* * *

আসল পাখীটি, উড়ে গেছে তা'র
হেম-পিঞ্জর হ'তে—
বাহিয়া আকাশ, গাহিয়া চলেছে
কনক-আলোর স্রোতে।
কাণাভরা ক্ষেত সোণালি ফসলে হাসে,
তা'রি 'পরে পাখী, পত পত পত ভাসে!
হেম-পিঞ্জরে শুধু তা'রি ছায়া
রহিয়াছে অবশেষ।
আসল পাখীটি উড়ে গেছে, আছে
কেবল পাখীর বেশ।

বর্ব্বরের ব্রহ্মজ্ঞান

শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রাচীনদের দৃষ্টিতে বিদ্যার একটা অনাদি প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন ভাবে চলিয়া আসিয়াছে। জাহ্নবী-ধারা কখনও ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে, কখনও বা হরজটাজালে "গোপন" হইয়া পড়িলেও বিষ্ণুর পরমপদ হইতে আরম্ভ করিয়া সাগর-সঙ্গম পর্য্যন্ত তার প্রবাহ যেমন হিন্দুর চক্ষে অক্ষুণ্ণ, অব্যাহত, বিদ্যার ধারাও (Tradition) তেমনি, যুগবিশেষে বা দেশবিশেষে গুপ্ত অথবা ব্যক্ত হইলেও, সত্তায়, সংস্কারে ও স্বরূপে অবিচ্ছিন্ন। বিদ্যার এই অবিচ্ছিন্ন ধারাই ভারত-বর্ষে বেদপন্থী সমাজে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও আগম নামে বরণীয় হইয়া আসিতেছে। বিদ্যার মূল তত্ত্বগুলি কোন এক নির্দ্দিষ্ট দিন হইতে মানুষের জিজ্ঞাসা ও মননের বিষয় হইয়াছে—এমন মনে করা যায় না। তত্ত্ব-চিন্তার বাহিরের পরিচ্ছদ, অর্থাৎ নাম ও রূপ, অবশ্য যুগে যুগে, দেশে দেশে, আলাদা হইয়াছে। কিন্তু এমন যুগ দেখান যায় না যে যুগে আমরা বলিতে পারি—কোনো পুরুষের মধ্যেই তত্ত্বচিন্তার স্ফূর্ত্তি হয় নাই। উপনিষৎযুগে যে-তত্ত্ব-চিন্তার পরিচয় আমরা পাই, মন্ত্র বা ব্রাহ্মণযুগে সে তত্ত্বচিন্তা জাগে নাই, মানুষের আত্মা ততদূর বিকশিত হয় নাই,—এ অনুমানের কোনো দৃঢ় ভিত্তি আছে বলিয়া কোন প্রাজ্ঞ হিন্দুই মনে করেন না।

উপনিষৎ রহস্তবিদ্যা। অতি উৎকৃষ্ট অধিকারী শিষ্যকে গুরু কর্তৃক এই বিদ্যা প্রদত্ত হইত—স্বয়ং উপনিষৎই নানা প্রসঙ্গে এ-কথার সাক্ষ্য দিতেছেন। "উপনিষৎ" এ-শব্দটাই গুপ্ত বা রহস্ত অর্থ বুঝাইত—যেমন ব্রহ্মের উপ-নিষৎ "সত্যম্" ইত্যাদি। উপনিষৎ আরণ্যকের অন্তর্গত; আরণ্যকের ব্যুৎপত্তিগত মানে—The Secret Doctrine. শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি উপনিষদের ভাষ্যকারেরা ভাষ্য-ভূমিকায় উপ + নি + সদ্—এই কয়টি উপাদান লইয়া যেমন ব্যাখ্যাই দেন না কেন, উপনিষৎ যে রহস্তবিদ্যা, ইহা তাঁহারাও মানিয়া গিয়াছেন। এখন, এই রহস্তবিদ্যা সমগ্র শ্রৌত বিদ্যার একটা অঙ্গ—উত্তমাঙ্গরূপে বরাবরই বিদ্যমান ছিল। সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষৎ—এই চারিটি বেদরূপী বৃষের চারিটি পদ; বেদ-বৃষভ কোনো কালেই মাত্র একটি পায়ে বা দুইটি পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন না। উপনিষৎ বেদান্ত—এ কথার এ মানে নয় যে, "বৈদিক যুগের" চরম পরিণতি কালে ইহা দেখা দিয়াছিল। এ কথার এ মানে নয় যে, গোড়াতে যাজ্ঞিকেরা কেবল যজ্ঞই করিতেন, তত্ত্বচিন্তার কোনো ধার ধারিতেন না; পরে তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ বা যজ্ঞানুষ্ঠানে বিরক্ত হইয়া তত্ত্বচিন্তার দিকে মন দিয়াছিলেন। অবশ্য যুগবিশেষে মানুষ-সমাজে হয়ত আচার-অনুষ্ঠানেরই বাহুল্য ও প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকিতে পারে; তত্ত্বচিন্তা তখন থাকিলেও, হয়ত' তত্ত্বজিজ্ঞাসু ও তত্ত্বদর্শীদের সম্প্রদায় খুব সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। যে সময়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পার্থকে বৎসরূপে কল্পনা করিয়া সর্ব্বোপনিষৎ-রূপিণী গাভী হইতে, সুধী-সমাজের কল্যাণ-চিকীর্ষায়, মহৎ গীতামৃত দোহন করিয়াছিলেন, তখন খুব সম্ভবত ঐ প্রকার অবস্থা সমাজে হইয়াছিল। যে যজ্ঞ-বরাহের শাশ্বতী তনুর বন্দনায় পুরাণ-ভারতীর বীণা অক্লান্তবাণী, সে বরাহ সম্ভবত তৎকালে নিজ বরণীয় উত্তমাঙ্গ ও হৃদয় গোপন করিয়া চরণাঘাতেই মহীতল ক্ষুণ্ণক্ষুণ্ণ করিয়া তুলিয়াছিলেন। যজ্ঞীয় ধূমই তাঁর ক্ষুরোত্থিত পাংশুরাজি; সম্ভবত সেকালে সেই যজ্ঞীয় ধূমই সরল ভাবে "ঋতস্য পন্থানং" আশ্রয়ে আদিত্য-মণ্ডলাভিমুখে যাত্রা না করিয়া বেদীর চারিধারে ছড়াইয়া পড়িয়া সমবেত যাজ্ঞিকদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিটা আকুল ও কুণ্ঠিত করিয়া দিয়াছিল। সেই কারণে আবার শ্রীকৃষ্ণকে পাঞ্চজন্য-শঙ্খ-নিনাদে জগৎকে এই বাণী শুনাইতে হইয়াছিল—"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো

A

ত্তবার্জ্জুন'' ; "যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে। তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ''—ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু বলাবাহুল্য, সে-দিনেও তত্ত্ববিদ্যা লুপ্ত হইয়া যায় নাই ; সে বিদ্যা অনুশীলন করার একটা সম্প্রদায় অবশ্যই ছিল।

বিদ্যার শাখাগুলির অঙ্গাঙ্গিভাবটি (organic relation) ভুলিয়া যাই বলিয়াই, আমরা "এ বিদ্যার এই যুগ, ও বিদ্যার ওই যুগ''—এই বলিয়া বিদ্যার ঐতিহাসিক কুঠুরী বিলি করিয়া দিতে সুরু করিয়া দিই। মানবাত্মার নানান্ বৃত্তিগুলির মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাব আছে বলিয়াই বিদ্যার এই অঙ্গাঙ্গিভাব। মানুষ শুধু কর্ম্মই করিয়া যাইবে, মর্ম্ম বুঝিতে তার জিজ্ঞাসা জাগিবে না ; "অয়ং লোকঃ'' এ-র ভাবনাতেই ডুবিয়া থাকিবে, "অসৌ লোকঃ" এ-র পানে তার নয়ন কদাপি তুলিবে না ;—এ অতি অসঙ্গত ও অবাস্তব কল্পনা। সময়ে সময়ে একটার দিকে একটু বেশি জোর পড়িতে পারে ; কিন্তু পাশে পাশে আর একটা থাকিবেই ; নহিলে যে মানুষ মানুষই হয় না।

অষ্ট্রেলিয়ার ওয়ারামুঙ্গা অথবা তদনুরূপ বর্ব্বর সমাজকেই মানুষের আদি সমাজ মনে করিতে হিন্দুরা রাজি ন'ন। কেন রাজি ন'ন, তার কৈফিয়ৎ আমরা অন্যত্র দিয়াছি। হিন্দুর দৃষ্টিতে আদি মানবের ভিতরে তত্ত্ববিদ্যার অঙ্কুরটিই কেবল ছিল, সে অঙ্কুরের ঋদ্ধি বা বিকাশ হয় নাই—এ কল্পনা অবাস্তব। যে ভাগবতী ইচ্ছা হইতে আদি মানবের সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই ভাগবতী ইচ্ছাতেই আদি মানবের ভিতরে তত্ত্বের মননেরও স্ফুরণ হইয়াছিল। ভগবানের নিত্য অকুণ্ঠিত প্রজ্ঞা তারও ভিতরে, অধিকারানুরূপ ভাবে, সংক্রমিত হইয়াছিল। গীতার সেই "বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষাকবেঽব্রবীৎ''—বাক্যের উহাই অভিপ্রায়। যে "রাজগুহ্য" রাজযোগ তত্ত্ববিদ্যার চরম উৎকর্ষ, তাহাই আদি-মানব মনু স্বয়ং শ্রীভগবান্ হইতে ওয়ারিশ-সূত্রে পাইয়াছিলেন।

যদি হিন্দুর এই বিশ্বাসকে ভিত্তিহীন মনে করিয়া আমরা ভাবি যে, অষ্ট্রেলিয়ার ওয়ারামুঙ্গা প্রভৃতির মতন কোনো মানুষ পৃথিবীতে প্রথম দেখা দিয়াছিল, এবং লাখ লাখ বছর ধরিয়া বুনো অবস্থাতেই থাকিয়া সম্প্রতি কয় হাজার বছর হইল সভ্য হইতে সুরু করিয়াছে, তা হইলেও আমাদের খেয়াল রাখা দরকার একটা খুব প্রয়োজনীয় কথায় ; সেটা হইতেছে এই—ওয়ারামুঙ্গা অথবা এমন কোনো বর্ব্বর জাতি পৃথিবীতে নাই, যাদের ভিতরে তত্ত্ব-চিন্তা, এমন কি ব্রহ্ম-চিন্তা, এক ভাবে না এক ভাবে না জাগিয়াছে। ব্যাস-শঙ্কর, অথবা কান্ট-সোপেন্হাওয়ারের ব্রহ্ম-চিন্তার মতন উহাদের ব্রহ্ম-চিন্তা তেমন মার্জ্জিত ও পরিণত না হউক, এটা অস্বীকার করিবার জো নাই যে, উহাদেরও ভিতরে বিরাট্ একটা কিছুর, মহান্ একটা কিছুর, অনির্দ্দেশ্য ও সূক্ষ্ম একটা কিছুর বোধ ও চিন্তা আছে। এ সম্পর্কে ম্যাক্সমূলারের আঁচ ("Introduction to the Study of Religion" গ্রন্থে) বেঠিক্ হয় নাই। যাহা দেখা শোনা যায় না (beyond the senses), অথচ যেটি আমাদের দেখা শোনার জগৎটাকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে, চালাইতেছে, এমন একটা অগোচর, অবিজ্ঞেয়, অসীম মহাশক্তি (unseen, undefined, infinite Power)—ঐ সকল বর্ব্বর মস্তিষ্কের চিন্তা ও কল্পনার বাহিরে নয়। Lord Avebury হইতে সুরু করিয়া Dr. Frazer পর্য্যন্ত পশ্চিমা পণ্ডিতেরা বর্ব্বরের আধ্যাত্মিক আলেখ্যখানি উজ্জ্বল করিয়া না আঁকিলেও অনেকে এ কথাটা 'নিম'-স্বীকার করিয়া গিয়াছেন ; আজকালকার দিনে, "ম্যাজিক্" প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মর্ম্মটি একটু ভাল করিয়া বোঝার ফলে, কোন কোন পণ্ডিত একথাটা প্রায় পুরাপুরিই স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। এখন, এ কথাটা যদি সত্যই হয়, তবে কেমন করিয়া বলি যে, বর্ব্বরের মাথায় বড় কোনো চিন্তা, ব্রহ্মের কল্পনা, গজায় নাই ? যে অনির্দ্দেশ্য, অগোচর, অসীম একটা কিছু বর্ব্বর মানিতেছে, সেইটাই কি ব্রহ্ম নয় ? বর্ব্বর পলিনেশীয় ধর্ম্মবিশ্বাসের মূলতত্ত্ব "mana''টিকে কোনো কোনো সাহেব পণ্ডিত এখনও তেমন তারিফ করিতেছেন না বটে, কিন্তু আসলে "mana'' কি ব্রহ্মগোত্রীয়ই নয় ? আর, সে ব্রহ্মগোত্রীয় ধারণা শুধু কি প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জেই মিলে ? ডাঃ কারপেন্টারের "Comparative

শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়

Religion", "Religion in Lower Cultures", এবং ঐ জাতীয় অপরাপর লেখায় প্রচুর নজীর মিলিবে।

বর্ব্বর শুধু যে সেই অনির্দ্দেশ্য, অনির্ব্বচনীয় একটা কিছু মানিতেছে এমন নয়; তার সকল ধর্ম্মকর্ম্ম, ম্যাজিক ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তার "ব্রহ্ম-জ্ঞানের" উপর। বর্ব্বরের ব্রহ্ম-জ্ঞান—একথা শুনিয়া বিস্মিত হইবার কারণ নাই। খোসা লইয়া, সভ্যতার বাহিরের সাজ সরঞ্জাম লইয়া, বিচার করি বলিয়া, বর্ব্বর বর্ব্বর, আর আমরা সভ্য ভব্য। খোসার ভিতরে শাঁসের খবর লইলে, হিসাব অন্য রকমের দাঁড়াইলেও দাঁড়াইতে পারে। নৈতিক চরিত্রের মূল উপাদানগুলি, সামাজিক আচার-ব্যবহারের আসল ভঙ্গীগুলি লইয়া তুলনা করিলে, কে বড়, কে ছোট সে পক্ষে সন্দেহ করার অবকাশ মোটেই নাই, একথা বলা চলে না। এই প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ A. R. Wallace সাহেবের উক্তি কয়টি শোনান উচিত মনে করিতেছি :—

"It is very remarkable that among people in a very low stage of civilization we find some approach to such a perfect social state. Each man scrupulously respects the rights of his fellow, and any infraction of these rights rarely or never takes place. In such community all are nearly equal. There are none of those wide distinctions, of education and ignorance, wealth and poverty, master and servant, which are the product of our civilization; there is not that severe competition and struggle for existence or for wealth which the dense population of civilized countries inevitably creates. . . It is not too much to say that the mass of our population have not at all advanced beyond the savage code of morals, and have in many cases sunk below it."

Edward Carpenter সাহেব ত' "Civilization" টাকে একটা "ব্যাধি" সাব্যস্ত করিয়া, তার নিদান ও চিকিৎসার পুঁথি লিখিয়াছেন। তুলনার ফল যাই হউক না কেন, দুইটা কথা বোধ হয় না মানিয়া উপায় নাই। ১ম—"ব্রহ্ম" মানে যদি সব চাইতে বড়, সব চাইতে আন্তিক, সব চাইতে গোড়াকার একটা কিছু হয়, তবে বর্ব্বর সে ব্রহ্মকে যতখানি সত্যভাবে ও খাঁটিভাবে মানিয়াছে, আমরা অনেকে, সভ্যতার বড়াই করা সত্ত্বেও, ততখানি সত্যভাবে ও খাঁটিভাবে জানিতেছি না।

আমাদের অনেকের বুদ্ধি-বিবেচনায় জগৎস্রষ্টা যিনি তিনি জগৎ হইতে আলাদা; বর্ব্বরের ধারণায় তিনি ("তিনি" মানে একটা মহা শক্তি হউক আর যাই হউক) জগতের সর্ব্বত্র ওতপ্রোত ভাবে রহিয়াছেন অথচ যেটুকুখানি জগৎ আমরা দেখিতেছি, শুনিতেছি, তার বাহিরেও (beyond) তিনি। আমরা কেহ কেহ হয়ত এই রকমের immanent transcendent তত্ত্বের বিবৃতি শুনিয়া তাহাতে নাম স্বাক্ষর করিতে চাহিব; কিন্তু আমাদের প্রচলিত জ্ঞান বিশ্বাসে ও ধারণায় ব্রহ্মবস্তু আমাদের এই দেখাশোনার জগৎ হইতে দূরে সরিয়া রহিয়াছেন। "দূরে" ও "অস্তিকে"—এই দুইটা জড়াইয়া গোটা ব্রহ্ম চিন্তা; সুতরাং ব্যবহারে আমাদের ব্রহ্ম-চিন্তা দ্বিধাভিন্ন "জরাসন্ধবৎ" হইয়া বসিয়া আছেন। অখণ্ড, অপরিচ্ছিন্ন সত্তাই যদি ব্রহ্ম হয়, তবে আমাদের এই বাহালি চিন্তা ও ধারণা মোটেই ব্রহ্ম-চিন্তা নয়। তারপর, ২য়—আমাদের চিন্তায় জড়, প্রাণ ও চৈতন্য আলাদা আলাদা হইয়া পড়িয়াছে; একটা পাথর বা মাটির ঢেলা জড়, তার ভিতরে প্রাণ নাই, চৈতন্য নাই; সে আমাদের মতন একটা বস্তু নয়, আমাদের আত্মীয় নয়, আমাদের পর ও আমাদের চাইতে নিকৃষ্ট;—এই রকমের একটা ধারণা আমাদের পাইয়া বসিয়াছে, এবং আমাদের সকল ব্যবহারের নিয়ামক হইয়া পড়িয়াছে। আমরা আবার অনেকেই এই ধারণাটিকে স্বতঃসিদ্ধের মতনই মানিয়া লইয়াছি। সুতরাং, যে ব্যক্তি বা সমাজ মাঠে পাথরে, জলে বাতাসে, আকাশে মেঘে, চন্দ্রে সূর্য্যে আমাদেরই মতন প্রাণ আছে, চৈতন্য আছে বলিয়া মনে করে, সে ব্যক্তি বা সমাজকে "ফেটিশিষ্ট" "এনিমিষ্ট" ইত্যাকার অবজ্ঞাসূচক বিশেষণে লাঞ্ছিত করিয়া আমরা বর্ব্বরের কোঠায় ঠেলিয়া দিই। স্বয়ং টেইলর সাহেবের মতে "Animism" নিতান্ত খাটো জিনিষ নয় কিন্তু বর্ব্বরের অপরাধ সে একটা ধূলি-কণার ভিতরে, একটা অশনি-সম্পাত বা পবন-হিল্লোলের মাঝখানে, আমাদের চাইতে বড় একটা প্রাণ-সত্তা ও চিৎ-সত্তার "কল্পনা" করিয়া লইয়াছে। যে মহাশক্তি এই বিশ্ব-ভুবনে ওতপ্রোত, সেই মহাশক্তিই যে প্রাণ-শক্তি ও চিৎ-শক্তি, এবং সে

প্রাণ-শক্তি ও চিৎ-শক্তি যে বিশ্বের "তুচ্ছাদপিতুচ্ছ" কোনো কিছু হইতেও সত্য সত্যই সরিয়া নাই; সুতরাং বিশ্বের প্রত্যেক কেন্দ্রে, প্রত্যেক point-এ, সেই বিশ্ব-শক্তির সঙ্গে আমাদের সংযোগ সংঘটন করা সম্ভবপর;—এইটা মানা, এবং এইটা মানিয়া জীবনের সকল ধর্ম্ম-কর্ম্মে চলাফেরা করাই হইল তার অপরাধ! বর্ব্বর নাকি সেই মহাশক্তিকে আবার নানান্ দেবতা অপদেবতা বানাইয়া দেখে, পূজা করে, খুশী করে; সে নাকি বহুর ভিতরে একের সন্ধান পায় নাই! বর্ব্বরদের "প্রাণের ভাষা" এখনও আমরা বুঝিতে শিখি নাই—মিশর প্রভৃতি দেশের "হাইরোগ্লিফিক্‌স্", পারস্ত বাবিরুষের "কিউনিফর্‌ম্" লিপি পড়িতে শিখিলে কি হইবে? সুতরাং আমরা জোর করিয়া বলিতে পারিতেছি না, বর্ব্বরদের দেবতা আসলে এক কি বহু। সম্ভবত পাতিত্যের ফলে, তাদের ভিতরে মানবীয়-সত্তাসিদ্ধ (Homo-typal) ব্রহ্ম-জ্ঞান অনেকটা অবগুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু ঢাকা পড়িয়া গেলেও বড় বেশি বিকৃত হয় নাই। বেদের মধ্যেও বহু দেবতা ও অপদেবতা আছেন; নিখিলের মধ্যে প্রাণের ও চৈতন্যের অনুভূতি রহিয়াছে এত স্পষ্টভাবে যে, বিলাতি পণ্ডিতেরা এটাকেও সেই আদিম বর্ব্বরোচিত এনিমিজম্, টটেমিজম্, ফেটিশিজম্ ইত্যাদির "জের" মনে করিয়াছেন। ম্যাক্‌স্‌মূলার অবশ্য নাম রাখিয়াছিলেন—Henotheism কিন্তু আবার বেদের শুধু উপনিষৎ ভাগে কেন, সংহিতা ভাগেই, এবং সকল স্তরেই, ছেদহীন, খণ্ডহীন, সীমাহীন, দ্বৈতহীন ব্রহ্মবস্তুও, কখনও বা বরুণরূপে কখনও বা অদিতিরূপে, কখনও বা ইন্দ্ররূপে, কখনও বা অগ্নিরূপে, কখনও বা বিশ্বকর্ম্মা বা প্রজাপতিরূপে, কখনও বা বিরাট্ বা কাম বা কাল বা স্কম্ভ রূপে নিজের পরিচয় দিয়াছেন। বর্ব্বর সমাজে হয়ত, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক স্বচ্ছতার অভাবের ফলে, এই পরিচয়টি কতকটা গোপন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সেখানেও তত্ত্বের তেমন বিকার হয় নাই; যেটি "শিব" সেটি সত্যসত্যই "বানর" বলিয়া যায় নাই। আমাদের সত্য ধারণায় মাটি পাথর, প্রাণরূপী ও চৈতন্যরূপী। শিব-শক্তি-বিগ্রহ হইলে কি হইবে,—জড় হইয়া গিয়াছে, তুচ্ছ ও ছোট হইয়া গিয়াছে। ও সকল "ভূত" আমাদের অনাত্মীয় পর; তাদের ভিতর দিয়া নহে, তা'দিগকে একেবারে বাদ দিয়া, প্রাণ, আত্মা বা পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের যোগ স্থাপন করিতে হইবে, এবং তাহাতে আমাদের পৌঁছিতে হইবে। এ ধারণা সত্যকার ব্রহ্মজ্ঞানের কেবলমাত্র আবরণ নয়, বিক্ষেপ ও বিকৃতি। বর্ব্বর হয়ত মধু কৈটভ এই দৈত্য দুইটার মধ্যে একটার এলাকায় বাস করে; আমরা দুইটার এলেকাতেই এক রকম মৌরশী প্রজা-স্বত্ব লইয়াছি! আর সেই পাট্টা-কবুলতির উপর হাল সরকারের শীল মোহর পড়িয়াছে—"Civilization and Culture".

এই দুইটা কথা ছাড়া আরও একটা কথা আছে; সেটা হইতেছে এই—আমরা আমাদের ব্যবহারিক জীবনে তত্ত্বজ্ঞান (Metaphysical Theory) এবং কাজের (Practice) মধ্যে যতটা মিল রাখিতে পারিতেছি, তার চাইতে বেশী মিল রাখিয়া চলিতে পারিয়াছে ঐ বর্ব্বর। আমরা থিওরিতে হয়ত' অনেকেই ব্রহ্মবাদী, কিন্তু কাজে জড়বাদ ও দেহাত্মবাদকেই আমাদের সকল ব্যবহারের প্রতিষ্ঠা-ভূমি করিয়া রাখিয়াছি; আমাদের কাছে মাটি পাথর জড়, জড়ই বলবৎ, জড়ের উপাসনা করিয়াই সকল পুরুষার্থ সাধন করিতে হইবে। বর্ব্বর-সমাজের থিওরি-কে আমরা যতই গালি দিই না কেন, জীবনের সঙ্গে থিওরির সত্যকার যোগটি সেখানে এতটা শিথিল ও অসার হইয়া যায় নাই।

কথাটা দাঁড়াইতেছে এই যে, আদিম মানুষকে বর্ব্বর মনে করিলেও, তত্ত্বচিন্তার দিক্ দিয়া তাহার খুব বেশি লজ্জিত হইবার কারণ নাই। একটু তলাইয়া অনুসন্ধান করিলেই আমরা দেখিতে পাই যে, মানুষ সভ্য অসভ্য সকল অবস্থাতেই, এক ভাবে না এক ভাবে ব্রহ্মকে অর্থাৎ সব চাইতে বড়কে জানিতে বুঝিতে ধরিতে চাহিয়াছে।

মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া দেখিলে, এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক। আগেকার সাইকোলজিষ্টদের সেই টুক্‌রা টুক্‌রা sensation জড়াইয়া অনুভূতি, ভাব, চিন্তা ইত্যাদির "পাক প্রণালী" আজিকালিকার দিনে আর চলিবে না।

আমাদের অনুভূতির ভূমি (back ground) যেটি, যেটিকে আশ্রয় করিয়া আমাদের সকল ব্যবহারিক অনুভব, ভাবনা, চিন্তা ইত্যাদি হইতেছে, সেটি নিজে টুক্‌রা টুক্‌রা অনুভবের জোড়াতালির ফলে জন্মে নাই; সেটি নিজে একটা অখণ্ড বিরাট্ অনুভূতি-সত্তা (an undefined and indefinable experience of Being); আমরা ব্যবহারে এই বিরাট্ অনুভূতি-সত্তাটিকে কাটিয়া আমাদের দরকারমাফিক্ ছোট করিয়া লই, এবং বলি—"ঐ তারাটা দেখিতেছি, এই ব্যাপারটা ভাবিতেছি" ইত্যাদি। ব্যবহারে, বলা কওয়ায়, ছোট হইলেও, সেই বিরাট্ অনুভূতি-সত্তা আসলে কিন্তু ছোট হয় না; সেটি যে বিরাট্ সেই বিরাট্ই রহিয়া যায়—অবশ্য, আমাদের কাজ-চালানো হিসাবের বাহিরে। সেই বিরাট্ সত্তা—যাহা আমাদের সকল ব্যবহারিক অনুভব, ভাবনা-চিন্তা, কল্পনা-জল্পনা বুকে ধরিয়া রাখিয়াও—স্বয়ং অনির্দ্দেশ্য, তা'র সম্বন্ধে কোনোরূপ সীমা বা গণ্ডী টানিয়া বলা যায় না যে, সে এ-র মধ্যেই পরিসমাপ্ত, এ-র বেশী আর নহে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ "শক্বরী মন্ত্রে"র ব্যাখ্যায় দেখাইয়াছেন, প্রজাপতির সৃষ্ট পদার্থ সকল কেমন করিয়া "সীমা" পরিগ্রহ করিল; স্বয়ং প্রজাপতির শক্তি ('শক্নোতি' হইতে শক্বরী) কিন্তু কোনো "সিম" বা দড়িতেই বাঁধা পড়ে নাই। এই যে প্রজাপতির শক্তি, ইহাই আমাদের নিখিল জ্ঞানের আশ্রয় ও "পরায়ণ" সেই বিরাট্ অনুভূতি-সত্তা। এই সত্তার ক্রোড়ে যাহা কিছু জাগিতেছে, লয় পাইতেছে, সে সবই দড়ি দিয়া বাঁধা—সসীম। সে সবই নির্দ্দিষ্ট (defined or definite) কেন না, নির্দ্দিষ্ট একটা কিছু না পাইলে আমাদের যে কাজ চলে না, বলা কওয়া চলে না।

এখন, খেয়াল রাখিতে হইবে যে, এই যে আমাদের ভিতরের শাশ্বত অনুভূতি-সত্তা ইহাই ব্রহ্ম। ইহাই আমাদের সকল বৃহত্ব, মহত্ব, ভূমত্ব জ্ঞানের মূল। আমাদের অনুভূতি আসলে বড় ও বিরাট্ বলিয়াই, আমরা ছোট ছোট দড়িমাপা ও দড়িবাঁধা অনুভবগুলি লইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না। দড়িমাপা অনুভবগুলি লইয়াই আমরা কাজ চালাই, ভাবনা-চিন্তা, বলা-কওয়া করি; যেটি মোটেই বাঁধা পড়ে নাই ও মাপা যায় না, সেটি এক রকম আমরা ভুলিয়াই থাকি, কিন্তু পুরাপুরি ভুলিয়া থাকিবার জো নাই;—কেননা, সে বিরাট্-সত্তা আমাদেরি অনুভূতি-সত্তা। যেটি অনুভূতি, তাতে অমনোযোগ, খেয়ালের অভাব হইলে হইতে পারে, কিন্তু তাকে অনুভব না করিয়া পারি না; যেমন আকাশের পানে তাকাইয়া একটা তারাই বিশেষ-ভাবে দেখিয়াছি বলিয়া, সে কালে আর কিছু দেখি শুনি নাই বা অন্তভাবে অনুভব করি নাই এমন নয়।

এখন, এই যে প্রচ্ছন্ন (veiled and ignored) অনির্দ্দেশ্য মহান্ অনুভবটি আমাদের সকল কাজ-চালানো (Pragmatic) জ্ঞানের পিছনে রহিয়াছে, যেটির "ভান" সেই "অধ্যেতৃবর্গ-মধ্যস্থ-পুত্রাধ্যয়ন-শব্দবৎ" হইয়াও হইতেছে না, সেইটিকে খুঁজিয়া না ধরিতে পারিলে আমরা স্বচ্ছন্দ বোধ করি না। কি যেন কি একটা আমাদের মধ্যে রহিয়াও না থাকার মতন হইয়া রহিয়াছে; কি যেন কি একটা আমরা জানিয়াও জানিতেছি না, অথবা না জানিয়াও জানিতেছি;—সেই একটা-কিছুকে না খুঁজিয়া থাকি কি করিয়া? আকাশ, সমুদ্র, পৃথ্বী—যা কিছু বাহিরে বড় দেখি, তারই ভিতরেই মনে হয় সেই একটা-কিছুকে পাইলাম; অনেক সময় মানুষ বলিয়াছেও—সে 'অজানা' একটা-কিছু ঐ আকাশের মতন, ঐ সাগরের মতন, ঐ ভাবা-পৃথিবীর মতন। কিন্তু বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে খট্‌কা জাগিয়াছে—না, সে বুঝি ওর চাইতেও বড়, ওরও অতীত (beyond) একটা কিছু হইবে। অসভ্য বর্ব্বরের ভিতরেও এই রকমের খোঁজা, এটাকে সেটাকে দেখিয়া তারেই পাইলাম ভাবা, আবার সেই "এটা সেটা" ছাড়াইয়া যাওয়া—এই গোটা সাইকোলজিটা বর্ত্তমান রহিয়াছে। কেননা, বর্ব্বরও মানুষ, তার মনও মন। মন বলিয়াই, তাহা সকল দড়িমাপা কাজ-চালানো অনুভবের পিছনে তার আসল [illegible]বাধা-না-দেওয়া অনুভূতি-সত্তাটিকে খুঁজিতেছে। মনে [illegible]তে হইবে যে, এ আসল সত্তাটি অনুভূতি-সত্তা—এমন একটা বড় অনুভূতি, যার 'ভান' অবশ্যই হইতেছে, কিন্তু [illegible]টার, আমাদের কারবারী গরজ

নাই বলিয়া, আমাদের খেয়াল হইতেছে না। এ জিনিষের খোঁজ আর টোটেন খামেনের কবরের খোঁজ, অথবা 'অসীমের পরপারে'র একটা নক্ষত্রেরও খোঁজ এক কথা নয়। শেষ খোঁজ দু'টি মানুষ না করিলেও পারে; করিতে তার মানবত্বের ভিতরেরই কোনো "জোর তলব" নাই। কিন্তু প্রথম খোঁজটি হইতেছে নিজেরই যেটি আসল পুঁজি, তারই খোঁজ। সে খোঁজ না করিয়া কে পারিবে? শুধু কস্তুরী-মৃগই নিজের নাভি-গন্ধে আকুল হইয়া ছুটিয়া বেড়ায় না; আমরা সকলেই নিজের নিজের আসল লুকানো পুঁজিটি ঢুঁড়িয়া বেড়াইতেছি—সভ্য, অর্দ্ধ-সভ্য, অসভ্য, সকল অবস্থাতেই। আসলটি একেবারে লুকানো রহিলে গোল থাকিত না; আমরা "বিষয়কর্ম্ম" নিয়াই থাকিতাম, "তত্ত্বের" কোনই হদিশ হয়ত পাইতাম না। কিন্তু আসলের লুকানো থাকা মানে সে সম্বন্ধে অজ্ঞতা নয়, খেয়াল না থাকা, এই পর্য্যন্ত। আমাদের খেয়ালের অভাবের ভিতরেও তার যে পরিচয়টুকু আমরা পাই, সে পরিচয়ের চাইতে নিবিড় ও মধুর পরিচয় আর কিছুই যে নাই! সে পরিচয়—আত্মপরিচয়, প্রাণের পরিচয়, রস ও আনন্দের পরিচয়, চিৎ-সত্তার পরিচয়। বলা বাহুল্য, পরিচয়টি বড়ই অস্ফুট, বড়ই গোপন। কিন্তু তবু যেটুকু পাই, তাতেই যে আকৃষ্ট না হইয়া পারি না! মানবাত্মার অন্তঃপুরে সে গোপন পরিচয়ের "মিষ্ট ব্যথা" কোন্ চিরবিরহিণীর অজানা মধুরের প্রতীক্ষার ভিতর দিয়া মিলনাভাসের মতই নিত্য ফুটিয়া উঠিতেছে—"এখনো তারে চোখে দেখিনি, শুধু বাঁশী শুনেছি।"

বাঁশীর রবে আকৃষ্ট হইয়া আমরা প্রথমে ঠিক ধরিয়া ফেলিতে পারি না, কে কোথা হইতে বাঁশী বাজায়। আত্মা বা ব্রহ্মের সেই দূরাগত-অব্যক্ত "নিবেদন" আমরা ঠিক যেন "localize" করিতে পারি না; বুঝিতে পারি না, কোথা হইতে কার এই নিবেদন-সুর উঠিতেছে। আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাম, এবং চিত্তবৃত্তির মুখটি যে বাহিরের দিকেই ফিরানো। সুতরাং প্রথমে খুঁজিতে সুরু করি বাহিরে। বড় যাহা, ভূমা যাহা, ব্রহ্ম যাহা, তাহা যে আমারি নিজস্ব চিরন্তন অনুভব—ইহা গোড়ায় মনে করিতে পারি না। গোড়ায় দৃষ্টি যায়—এই বিপুল পৃথিবীর পানে, ঐ বিশাল সমুদ্রের পানে, ঐ উদার আকাশের পানে। মনে হয়, এই পৃথিবী, ঐ আকাশইত' সব ধরিয়া রাখিয়াছে—আমাদিগকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সকল অনুভব, ভাবনা, চিন্তাকে। অতএব উহাই ব্রহ্ম।

এ নিরাকরণ একেবারে নিরর্থকও নহে, বাজে বাতিলও নহে। বড়কে, আসলকে, "পরায়ণ"কে খোঁজাও যেমন স্বাভাবিক, সেটিকে গোড়ায় বাহিরে খোঁজা, এবং বাহিরের বড় কোনো কিছুর সাথে মিলাইয়া দেওয়াও, তেমনি স্বাভাবিক। সকল দেশে, সকল যুগেই দেখিতে পাই—মানুষের চিন্তা এই স্বাভাবিক বর্ত্ম অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। কেবল থেলিস্, আনাক্সাগোরাস্, আনাক্সিমন্দর বলিয়া কেন, সকল দেশের দার্শনিক চিন্তাই বড়র খোঁজ, আসলের খোঁজ কতক কতক করিয়াছে বাহিরে। বেদের সংহিতা ভাগে অগ্নি, অদিতি, বরুণ, সবিতা, ইন্দ্র, এবং উপনিষদেও, অধিকার বিশেষে, আকাশ, বায়ু, অপ্, প্রাণ, বিদ্যুৎ—এ সকল আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক 'মূর্ত্তিতেও' যে ব্রহ্মই অন্বেষিত হইয়াছিলেন, সেপক্ষে সন্দেহ করা চলেনা। শঙ্করাচার্য্য উপনিষদ্‌ভাষ্যে ও ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে আকাশ, প্রাণ, তেজ ইত্যাদির নির্গুণ-ব্রহ্মপর ব্যাখ্যা দিয়া উচ্চতম থাক বা সম্প্রদায়ের অনুবর্ত্তন করিয়াছেন; কিন্তু ভুলিলে চলিবে না যে, সত্যকার ব্রহ্মোপলব্ধির ক্ষেত্র জীবন, সুতরাং সম্প্রদায়, ছোট বড় মাঝারি সকল রকমেরই ছিল; এবং যাঁর অধিকার অন্ন বা প্রাণকেই ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিবার তিনি সেই ভাবেই ব্রহ্মকে বুঝিতেন। তা'তে তত্ত্বদর্শী আচার্য্যদের অসহিষ্ণুতা বা বিরক্তি ছিলনা।

কিন্তু আমাদের ভিতরের সত্তাকে গোড়ায়, বাহিরে খোঁজার যেমন একটা স্বাভাবিক প্রণোদন আছে, তেমনি আবার বাহিরকে "বাহিরে" রাখিয়া, অখণ্ড ও পূর্ণকে খণ্ডিত ও অপূর্ণ রাখিয়া, আত্মীয়কে "পর" করিয়া রাখিয়া আমরা যে আখেরে সুস্থির থাকিতে পারিব না—এমন ব্যবস্থাও আমাদের ভিতরেই আছে। তাই দেখি, শুধু দার্শনিক বা সাধক বলিয়া কেন, বর্ব্বরের ব্রহ্মান্বেষণও একান্তভাবে, সুস্থির

শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়

ভাবে, বাহিরে পরিসমাপ্ত হয় নাই। সেও জানে, তার আসল চিজ্‌টি রহিয়াছে—সে যাহা কিছু দেখিতেছে শুনিতেছে, তাকে ছাড়াইয়া অথচ তার ভিতরেও রহিয়া। অসভ্যদের ধর্ম্মবিশ্বাস ও "ম্যাজিকের" যতটুকু খোঁজ আমরা রাখিয়াছি, তাতেই এতটুকু দাবী তাদের তরফ হইতে আমরা করিতে পারি। অতএব আমরা যেন এমন মনে না করি যে, কোনো অসভ্য জাতি পৃথিবীকে অথবা আকাশকেই সকলের সেরা ভাবিয়া নিশ্চিন্তমনে আঁকড়াইয়া পড়িয়া আছে। যেমন সকলের সেরাটিকে না খুঁজিয়া সে পারে না, তেমনি আবার সত্যসত্যই সকলের সেরাটিকে না পাওয়া পর্য্যন্ত সে সুস্থির হইতে পারে না। আসলে ও "খোদে" যার প্রয়োজন, সে নকল বা প্রতিনিধি বা অনুকল্প লইয়া কতক্ষণ সুস্থির থাকিবে ?

বর্ব্বর আমাদের মত সাইকোলজির বিশ্লেষণ করে না বলিয়া, তার ভিতরে যে সাইকোলজিটা আদপে নাই—এমন যেন মনে আমরা না করি। নৈয়ায়িকেরা স্বার্থ ও পরার্থ—এই দুই রকমের অনুমিতি মানিয়াছেন। পরার্থ, অর্থাৎ পরকে বুঝাইবার জন্য যে অনুমিতি, তাহাতেই ন্যায়ের সকল অবয়বগুলি (Steps of Reasoning) খোলসা করিয়া দেখান হইয়া থাকে। আমরা নিজে নিজে লিঙ্গ-পরামর্শ করিয়া যে সব অনুমান হামেশা করিতেছি, সেগুলি সংক্ষিপ্ত; তাদের অবয়বগুলি প্রায়ই গা ঢাকা দিয়া অব্যক্ত ভূমিতে রহিয়া যায়। বস্তুত, আমাদের মানসিক ব্যাপারের এমন কি যেগুলি জটিল, তাদেরও প্রায় সাড়ে পনের আনাই অব্যক্ত ভাবে, কতকটা অজ্ঞাতসারেই, নির্ব্বাহ হয়। উইলিয়াম্ জেম্‌স্ প্রমুখ যে সব সাইকোলজিষ্ট মনের অব্যক্ত ভূমিতে সুড়ঙ্গ কাটিতে অস্বীকার করিয়া অভ্যাস, সংস্কার, স্বার্থ-অনুমান প্রভৃতি মানসিক ব্যাপারগুলিকে মগজ যন্ত্র (Cerebral mechanism) দ্বারাই, বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁদের সে চেষ্টা যে কত দূর সফল হইয়াছে, তার আলোচনা এক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। তাঁদের মতে কেহ কেহ "Ejective Consciousness," অর্থাৎ, আমাদের ব্যবহারিক চেতনা হইতে আলাদা এবং তার অগোচর, অথচ শারীরিক স্নায়ু-যন্ত্রের মস্তিষ্ক ছাড়া অপরাপর অংশে অভিমানী বা ব্যাপারাধ্যক্ষ, একটা চৈতন্যও মানিয়াছেন। সম্ভবত হিপ্‌নটিজম্ ইত্যাদিতে 'সব্‌জেক্ট'-বিশেষের চেতনা ও ব্যক্তিত্ব (Personality) কেমন ধারা-আলাদা আলাদা কুঠুরীতে ভাগ হইয়া যায়—তাই দেখিয়াই তাঁরা ঐরূপ Ejective Consciousness মানিবার দিকে ঝুঁকিয়াছেন। সে যাহা হইক, একই Organism-এ অধিষ্ঠিত, আমাদের আটপৌরে চৈতন্যের অগোচর তোলা চৈতন্যটিকে, একটা বিরাট্ চৈতন্যেরই অব্যক্ত ভূমি মনে করাতেই বোধ হয় সমস্যার লাঘব হয়। বর্ত্তমানে যে সকল পরীক্ষক ঐ সমস্ত Crypto-psychical ও Parapsychical phenomena লইয়া ঘাঁটিতেছেন, তাঁদের প্রায় সকলেই একটা বিরাট্ অব্যক্ত চৈতন্য না মানিয়া পারেন নাই। আমাদের উচ্চ প্রস্থানের দার্শনিকদের দৃষ্টিতে চৈতন্য প্রকাশস্বরূপ ও সর্ব্বাবভাসক বটে, কিন্তু একটা আবরক শক্তি সেই প্রকাশকে যেন ঢাকিয়া রাখিয়াছে; সুতরাং সেই আবরক 'তমে'র যেমন যেমন ক্ষয় হইতে থাকিবে, চৈতন্যের সর্ব্বাবভাসকস্বরূপটিও ততই ফুটিয়া উঠিবে। এই যে ঢাকা দেওয়া ও ঢাকা খোলা—এ ব্যাপারের মূলে আছে জীব ব্যবহার। সব সময়ে সব ঢাকা পড়িলেও যেমন ব্যবহার চলে না, সব সময়ে সব অপক্ষপাতে প্রকাশ হইলেও তেমনি ব্যবহার চলে না। আমাদের পক্ষপাত করিয়া, বাছিয়া বাছিয়া, দেখিতে শুনিতে জানিতে হয়; জ্ঞেয়ের, এমন কি অনুভূতিরও অনেকটা ঢাকিয়া, একটুখানি লইয়া কারবার করিতে হয়। এটা সহজ কথা, দৃষ্টান্ত দেওয়া অনাবশ্যক।

যা'দিগকে আমরা অসভ্য বর্ব্বর বলি, 'প্যালিও-লিথিক্ ম্যান্' বলি, তাদের ভিতরে হয়ত বেশীর ভাগ ঢাকাই পড়িয়া রহিয়াছে; অর্থাৎ, তাদের মানসিক ব্যাপারগুলির খোলসা ভাবে, স্পষ্টভাবে যতটা চলিতেছে, তার চাইতে অব্যক্ত ও অস্পষ্টভাবে হয়ত ঢের বেশি চলিতেছে। একই বিরাট্ চৈতন্য (ব্রহ্ম) তাদের ভিতরে যতটা লুকাইয়াছেন ও যতটা ধরা দিয়াছেন, আমাদের "ক্ষেত্রে" হয়ত তার চাইতে বেশী ধরা দিয়াছেন এবং কম লুকাইয়াছেন।

হইতে পারে যে, তাদের চিন্তা ও মানসিক ব্যাপারগুলি বেশী আড়ষ্ট ও সহজ সংস্কারের মতন (automatic)। কিন্তু সব চাইতে বড় ও সেরা যে ব্রহ্ম, তাঁর কোনো না কোনো এক ধরণের চিন্তা তাদের ভিতরেও আছে একথা একেবারে উড়াইয়া দিবার জো নাই।

যদি দেখিতাম যে, প্যালিও-লিথিক্ ম্যান্ আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুন লইয়াই তার বুনো জীবনটা কোনো মতে কাটাইয়া দিয়াছে, তার ভিতরে পশুধর্ম্ম ছাড়া আর কোনো-রূপ ধর্ম্মের (বিশ্বাস, ধারণা ও অনুষ্ঠানের) বিকাশ হয় নাই, তবে তাকে আমরা ব্রহ্ম-চিন্তার "দায়" হইতে অব্যাহতি দিলেও দিতে পারিতাম। কিন্তু ফ্রান্সে, জর্ম্মানিতে, দক্ষিণ আফ্রিকায়, ক্রীটে, নর্ম্মদা গোদাবরীর পলিমাটির স্তরে এবং আর আর যে সমস্ত জায়গায় প্যালিও-লিথিক্ ও নিওলিথিক্ ম্যানের অভিজ্ঞান আমরা পাইয়াছি, সেখানেই দেখিয়াছি যে, সে যেমন শিকার করিতেছে, লড়াই করিতেছে, লড়াই-এর জন্ম পাথরের বর্শাফলক তৈয়ারি করিতেছে, তেমনি আবার সঙ্গে সঙ্গে, ছবি আঁকিয়া, নানান্ রকমের উল্কি ইত্যাদি কাটিয়া, নানান্ রকমের "ম্যাজিকের" অনুষ্ঠান করিয়া, প্রেত-সংস্কারাদি ব্যাপারে নানান্ রকমের অদ্ভুত "তুক্ তাক" খাটাইয়া, তার চল্‌তি দেখা-শোনা খাওয়া-পরার বাহিরে, অগোচর অনির্দ্দেশ্য বড় একটা কিছুর সঙ্গে, প্রবল "অসুর" একটা কিছুর সঙ্গে নিজের সত্তার যোগ রাখিয়া চলিতেছে। যেদিন সে প্রথম অগ্নি উৎপাদন করিতে পারিল, (তাকে সাগ্নিক রূপেই আমরা ভূস্তর ইতিহাসে দেখি) যেদিন সে প্রথম ভূমি চষিতে শিখিল, সেদিন হইতে মানুষের ইতিহাসে একটা যুগান্তর সুরু হইল সন্দেহ নাই; কিন্তু আগুণ সে নাই জ্বালাক্, মাটি সে নাই চষুক্— আমরা মাটির স্তরের ভিতরে এতদিন পর্য্যন্ত যে পরিচয়টা তার পাইয়াছি, সে পরিচয় হইতেছে—মনন-শীল, অতীন্দ্রিয়ে অলৌকিকে বিশ্বাসশীল, বড় ও জবরদস্ত একটা কিছুর সঙ্গে নিজের যোগ স্থাপন করিতে উৎসুক মানবের পরিচয়।

ঠিক বাদরায়ণের মতন ব্রহ্মজিজ্ঞাসা তার ভিতরে ফুটিয়া থাকুক, আর নাই থাকুক, একথা অস্বীকার করার জো নাই যে, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মান্বেষণ এক না এক আকারে তার ভিতরেও দেখা দিয়াছে। অথবা এইটা বলাই উচিত যে, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মান্বেষণ মানব-সত্তার বা আদি মানবে (Human Type) থাকা স্বাভাবিক, এবং গোড়াতে ছিলও; সেই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মান্বেষণ, প্যালিওলিথিক্ প্রভৃতি মানবের অধিকারে, আবরক তমের দ্বারা অনেকটা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া, চৈতন্যের অব্যক্তভূমিতে সহজ সংস্কারগুলির কোঠায় আশ্রয় লইলেও, একেবারে "নস্যাৎ" হইয়া যায় নাই। আমাদের ঐতিহ্যে দেখিতে পাই—যিনি অগ্নিকে প্রথম মন্থন করিয়াছিলেন, তাঁর নাম অঙ্গিরা; যিনি পৃথ্বীকে প্রথম কর্ষণ করিয়া ছিলেন, তাঁর নাম পৃথু। [অথর্ব্ববেদে (৮।১০।২৪) বৈণ্য পৃথুকে পৃথিবীর দোগ্ধা বলিয়াছেন; ঋগ্বেদ (৮।৯।১০) ও দ্রষ্টব্য] ঐতিহ্যে এঁরা উভয়েই ঐশী বিভূতি-সম্পন্ন। একজন ব্রহ্মবিদ্যার সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকদের মধ্যে অন্যতম—"অথর্ব্বাঙ্গিরসে পরাবরা"—অপরজন বেণের ঊরুদেশ (ঋগ্বেদের পুরুষ-সূক্তে উক্ত বৈশ্যশক্তির আশ্রয় ও প্রতীক,—অথর্ব্ববেদে পুরুষের "মধ্য" হইতে বৈশ্যের জন্ম) ঋষিদের কর্ত্তৃক মথিত হবার ফলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

পৃথিবীতে বেণের রাজত্ব মানে (পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের দেওয়া মানবীয় কাল্‌চারের ইতিহাস মানিয়া লইয়াও) আমরা এইটুকু বুঝিতে পারি যে, মানব সভ্যতার ইতিহাসে, চারুশিল্প (Ornamental Art) "কেজো" শিল্পের (Useful Art) আগে দেখা দিয়াছিল। মানুষ সে যুগেও, কৃষি প্রভৃতি কে'জো শিল্পের আবিষ্কার করিতে না পারিলেও, ছবি আঁকিত, নিজেকে উল্কি, তিলক, পালক, পাতা, ফুল ইত্যাদি দিয়া সাজাইত; হয়ত' তখন কাপড় পরার চলনও হয় নাই, আগুনে রাঁধিয়া খাওয়াও বাহাল হয় নাই। কেবল, মাত্র সাজাইবার প্রবৃত্তি লইয়া জীবন সুন্দর ও সার্থক হয় না। বেণ তাই উচ্ছৃঙ্খল রাজা। ঋষিরা বেণকে ধ্বংস করিয়া পৃথুকে তার ভিতর হইতে মন্থন করিয়া তুলিলেন। পৃথুর অর্থ সপ্রয়োজন, সার্থক, সফল।

শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়

সুন্দরের আত্মজ ইনি, সুন্দরের সঙ্গে ইঁহার বিরোধ নাই। সুন্দরকে সত্য ও মঙ্গল করিয়া তোলেন ইনি। পৃথু আসিয়া ভূমিকে আবার চষিলেন; হয়ত' পূর্ব্বতন কোনো যুগে পৃথিবী কখনও কর্ষিতা হইয়া থাকিবেন। ঋগ্বেদ-সংহিতাদিতে নানা স্থলে মানুষকে "চর্ষণী" নাম দেওয়া হইয়াছে; যেমন আবার দেবতাদিগকে "নর", "নৃতম", "নরাসাংস" বলা হইয়াছে। পৃথু মানুষের চর্ষণী নাম সার্থক করিলেন।

এখন কথাটা এই যে, মানুষ বেণের এলেকাতে বাস করুক্, আর পৃথুর এলেকাতেই বাস করুক্, সে কোনো দিনই নিরেট পশু হইয়া বাস করে নাই। অথর্ব্বাঙ্গিরা লইয়া সাহেব পণ্ডিতদের অনেক থিওরি আছে। আর্য্যজাতি "বুনো" অবস্থায় কার কাছ হইতে প্রথম আগুনের ঐরূপ উৎপাদন এবং ব্যবহার শিখিয়াছিলেন—এই সব তথ্য নাকি ঐ অঙ্গিরা উপাখ্যানের ভিতর হইতে দোহন করিতে পারা যায়। সে যাই হউক, মানুষ সাগ্নিক হউক আর নিরগ্নি হউক, বেণের প্রজা হউক আর পৃথুর প্রজাই হউক, তার সত্ত্বা কখনই কেবল মাত্র "ইহ"-লোকের চিন্তা লইয়া, দৃশ্য, গোচর ও সসীমকে লইয়া পরিসমাপ্ত ভাবে পড়িয়া থাকে নাই। পড়িয়া যে থাকে নাই, তার অকাট্য প্রমাণ ঐ পশ্চিম-দেশেরই চিলিয়ান্, অরিগ্নেসিয়ান্, ম্যাগ্ডালেনিয়ান্ ইত্যাদি থাকের বর্ব্বর মানুষদের বসবাসের ও প্রেতসমাধির গুহাগুলি এখনও প্রচুর পরিমাণে মজুত করিয়া রাখিয়াছে। সকল অবস্থাতেই মানুষ জিজ্ঞাসু ও ব্রহ্মান্বেষী। ইহার হেতু তার "Primate" বংশ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলে মিলিবে না; ইহার একমাত্র হেতু এই যে, সে চিরদিনই মানুষ—প্রজাপতির "অর্ব্বাক্-স্রোতা" সর্গ—; সে যে-সত্তা হইতে এবং যে-সত্তা লইয়া আসিয়াছে, সেটি প্রজাপতি, মনু ও সপ্তর্ষিদের সত্তা; অবস্থা বিশেষে সে সত্তা তার নিজের ভিতরে যতই গোপন হইয়া পড়ুক না কেন।

"হারিকেন"

—কথানাট্য—

—শ্রীমন্মথ রায়

[তালপুকুরের পারে অট্টালিকা মধ্যস্থ এক কক্ষে মৃত্যু-শয্যায় শয়ান দশবর্ষীয় বালক কমল। কমলের শিয়রে তাহার বিধবা মাতা ষোড়শী। মৃদু দীপালোক।]

* * *

কমল। মা!

ষোড়শী। কি বাবা!

কমল। রাত বারোটা বেজে গেছে,...না?

ষোড়শী। হাঁ বাবা!

কমল। আজ আমি কেমন আছি?

ষোড়শী। কালকার চাইতে আজ ভালো আছ,... এখন একটু ঘুমোও।...আমি হাওয়া করি?

কমল। রাত বারোটার পরই আমি ঘুমুতে পারিনে।...আমায় ঘুমুতে দেয় না!

ষোড়শী। আবার?

কমল। হাঁ মা।...তুমি বিশ্বাস কর না...কিন্তু যদি তুমি দেখতে!

ষোড়শী। ...ও কিছু নয়।...না খেয়ে খেয়ে খুব দুর্ব্বল হয়ে পড়েছ, তারপর জ্বর তো লেগেই রয়েছে।... শরীর মন দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে···তাই ..ওসব...

কমল। না...মা, আমি তো সেরে উঠ্‌ছি!···ডাক্তারই বলুক আমি উঠ্‌ছি কি না!...কিন্তু শোন না কানে কানে···

ষোড়শী। বল বাবা!

কমল। সেরে যে উঠ্‌ছি···ডাক্তারের ওষুধে নয়,... কিসে জান?

ষোড়শী। কি বাবা?

কমল। তাদের ডাকে।···ওরা আমায় ভালোবাসে। ...ওরা আমায় ডাকে···।.. বলে "আয়! আয়!···কোলে আয়! বুকে আয়!···মা!"

ষোড়শী। কি বাবা!

কমল। ওদের তুমি সর্ব্বদাই দেখছ,...কিন্তু.. ওদের তুমি দেখেও দেখ না···কথা বল না···কেন? কেন মা?

ষোড়শী। ওরা যে কে, তাই তো বুঝলুম না বাবা!

কমল। সে কি মা!...তোমার কি চোখ নেই? কান নেই?

ষোড়শী। তুই ঘুমো কমল!

কমল। কেমন করে ঘুমুই!...ঐ যে...মা···ঐ যে···

ষোড়শী। কি? কমল, কি?

কমল। ঐ যে ডাকে!

ষোড়শী। কই?

কমল।...ঐ···শুনছ না?

ষোড়শী।...দুপুর রাতে ঝিল্লীর কলরব।

কমল। তবেই তো শুনতে পাও।

ষোড়শী। লক্ষ্মী আমার! ঘুমোও!

কমল। মা! দেখেছ? দেখেছ?

ষোড়শী। আবার কি বাবা!

কমল। ঐ আকাশের দিকে চেয়ে দেখ!

ষোড়শী। অন্ধকার!

কমল। চোখের মাথা খেয়েছিস তুই? লাখ লাখ তারা ..চোখে পড়ে না? মিটি মিটি চাইছে!...তারী দুষ্টু ওরা...আমায় শুধু ইসারা করে···। মা!...ওদের কতক তালপুকুরের জলে নেমে এসে খেলা করে···কালো জলে ওদের ঝিকিমিকি ভারি ভাল লাগে। আমার কি ইচ্ছা হয় জানিস মা?

ষোড়শী। কি বাবা?

কমল। ওদের সাথে ঐ কালো জলের শীতল বুকে সাঁতার কাটি...খেলা করি।·· মা! তালপুকুরের মাছ-গুলোও কম নয়···রাতদিন ছুটো ছুটি!···চোখে একটু...

শ্রীমন্মথ রায়

এতটুকু ঘুম নেই…! কি নিয়ে ওদের এত মাতামাতি মা ?

ষোড়শী। জানিনে বাবা।

কমল। কিছুই জানিসনে তুই!…চারিদিকে এত খেলা…এত ইসারা…এত হাতছানি…সেদিকে লক্ষ্য নেই… শুধু জানিস ঐ ডাক্তারকে…হয় ত ঐ ডাক্তার কিছু কিছু জানে মা!…আমি দেখেছি ডাক্তার তোকে মাঝে মাঝে ইসারা করে…হাতছানি দিয়ে ডাকে…ও-ডাকের অর্থ কি ও জানে · আমি জানিনে!…আমি জানিনে মা আমি জানিনে!…মা…! কথা কইছিস না যে!

ষোড়শী। তুমি যদি না ঘুমোও কমল ..তবে আমি ভারী রাগ কর্ব্ব কিন্তু—!

কমল। আমি ঘুমুব না…না…কিছুতেই না।.. ডাক্তার এলে আজ তাকে জিজ্ঞেস করে জানব…ঐ ইসারা …ঐ হাতছানির অর্থ কি!…

ষোড়শী। এত রাত্রে ডাক্তার আসবে না…আর… তুমি তো আজ ভালই রয়েছ বাবা!

কমল। আমার ভালো লাগছে না মা!.. যাও মা… ডাক্তারকে ডেকে পাঠাও!…আমার বেদনা বেড়েছে, হাঁ!

ষোড়শী। তাঁকে কি বলবি ?

কমল। একটি কথা! শুধু একটি কথা!

ষোড়শী। কি ?

কমল।…ওর অর্থ কি!

ষোড়শী। কিসের অর্থ ?

কমল।…ঐ ইসারা।…ঐ হাতছানি। যেই জানব… অমনি…ও-বাড়ীর বীণাকে ডেকে পাঠাব।..ওকে চমকে দেব…অমনি ইসারা কর্ব্ব…অমনি হাতছানি দিয়ে ডাকব…

ষোড়শী। এ সব ভালো কথা নয় বাবা! তুমি ঘুমোও!

কমল। …বাঃ · ডাক্তার যদি পারে…আমি পার্ব্ব না কেন ?…তারারা পারে · জোনাকীরা পারে…তালপুকুর পারে…ঘরের ঐ মাটির দীপ-টি পারে…আমি পার্ব্ব না কেন ?…মা…দেখেছ ? মাটির দীপ হাসছে! কাঁপছে!

ষোড়শী। তোকে নিয়ে যে আমি বিপদেই পড়লুম দেখছি

কমল। ডাকো ডাক্তারকে!

ষোড়শী। না…কোন দরকার নেই। তুমি ঘুমোও।

কমল। মা! তবে সর্ব্বনাশ হবে বলছি!

ষোড়শী। সে আবার কি ?

কমল। হাঁ, সর্ব্বনাশ। যে আমার আবদার রাখে না সে আমায় ভালোবাসে না।…আমায় ভালো না বাসলেই সর্ব্বনাশ!

ষোড়শী। কি সর্ব্বনাশ ?

কমল। তুমি আমার কথা শুনছ না। তুমি আমার ভালোবাস না।.. আমাকে হারানোর মতলব…না ?

ষোড়শী। সে কি বাবা ?

কমল। শোন মা। ওরা বলেছে।……ওরা বলেছে,… মা…এক গ্লাস জল দাও……মা…গলা শুকিয়ে আসছে!

ষোড়শী। তুমি ঘুমোও কমল!…

কমল। জল দাও মা!

ষোড়শী। রাত দুপুরে ঠাণ্ডা জল খাওয়া উচিত হবে না বাবা।…দুধ দেব ?

কমল। …জল! জল! একগ্লাস জল!

ষোড়শী। নাও বাবা!

কমল। আঃ জুড়িয়ে গেল।…এইবার শোন মা—

ষোড়শী। এইবার ঘুমোও বাবা।

কমল। ওরা আমায় বলে…তোকে আমরা ভালোবাসি…খুব ভালবাসি…এত ভালবাসি…যে…ইচ্ছে হয় তোকে জড়িয়ে ধরি ..চুমু খাই…! যখন বলে…আমার মনে হয় ওরা আমায় বুঝি গিলে ফেল্‌বে!

ষোড়শী। তবেই বুঝছ ওরা লোক ভালো নয়!

কমল। …কিন্তু ওরা আমার কাছে আসতে পারে না…সাহস পায় না…! কেন পায় না…আমি জিজ্ঞেস কর্লে বলে ·অধিকার নেই।…কেন অধিকার নেই… …তাও একদিন জিজ্ঞেস করেছিলুম।…কি বল্‌ল জানিস ?

ষোড়শী। কি বাবা ?

কমল। বল্‌ল…"তোর মা তোকে আমাদের চাইতেও বেশী ভালোবাসে।.. তোর মার ভালোবাসা যতই কমবে…

আমরা ততই এগিয়ে আসব।...তোর মা তোকে বেই একটু একটু করে তুলবে ..আমরা অমনি একটু একটু করে পথ পাব"...আরো কি বলে জানিস?

বোড়শী। আর বকিসনে বাবা।

কমল। বলে, আজ যদি তোর বাবা বেঁচে থাকতেন... তোর ত্রিসীমানায় আমরা আসতে পারতুম না।...তিনি মরে গেছেন, যে ষোলআনা ভালোবাসায় তুই ঢাকা ছিলি, তার আট আনা সরে গেছে...তাই আমরা আট আনা এগিয়ে এসে তোকে দেখা দিতে পেরেছি।...এখন ওৎ পেতে বসে আছি তোর মার দিকে চেয়ে।

বোড়শী। তবে শোন বাবা...ওরাই ভূত... ..... রামরাম বল। রামরাম বল।

কমল। ভূত।...ভূতের বুঝি ঐ অমন পাগল-করা চেহারা হয়?...অমন মন-ভোলানো চোখ হয়?...অমন প্রাণ-মাতানো ডাক হয়?

বোড়শী। ওরে কমল। তোর অসুখ কি তবে বেড়েছে? আমি যে কিছুই বুঝে উঠছি নে।

কমল।...ডাক্তারকে ডাক...ডাক্তারকে ডাক।

বোড়শী। এই আঁধার রাতে সে আসবে কেমন করে?

কমল। ডাক্তার আসবে কেমন করে তা কি যার অসুখ হয়েছে সে ভাববে?

বোড়শী। সে দিন এলেন..., আঁধার রাতেই চলে এলেন, সঙ্গে একটা লণ্ঠনও আনেন নি। আঁধার রাতে লোকে সাপের ভয় করে...সেদিকেও লক্ষ্য নেই।...আমার লজ্জা করে বাবা...তাকে রাত্রে ডাকতে।

কমল। তবে ডেকোনা মা...।

বোড়শী। কাল ভোরে ডাকলে হবে না বাবা?

কমল। ভোরে আমায় পেলে হয় মা!

বোড়শী। কি যে অলক্ষুণে কথা বলিস কমল।—[পার্শ্বস্থ কক্ষের দুয়ারে যাইয়া] ভুলু—ভুলু।—ওরে ভুলু। [দরজা খুলিয়া ভুলু সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল]—ডাক্তারবাবুকে গিয়ে বল—কমল ডাকছে। এখনি যেন একবার আসেন। সঙ্গে যেন আলো আনেন।

ভুলু। তিনি সঙ্গে আলো আনেন না...বলেন তিনি এখনো চসমা নেন নি।

বোড়শী। তবে না হয় তুইই আমাদের হারিকেনটা নিয়ে যা।...

ভুলু।—ঐ একটা হারিকেন মা। যদি এখানে হারিকেনের দরকার হয়!

বোড়শী। ঘরে প্রদীপ জলছে।—তুই হারিকেন নিয়ে যা...নিয়ে যাস্...বুঝলি?

ভুলু। নিয়ে যাব মা। [দোর বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল।]

বোড়শী। কমল।...তুমি না হয় এখন ঘুমোও। ডাক্তার এলে আবার ডেকে তুলব!

কমল। না মা ঘুমুব না...ডাক্তার এলেই তার পানে চেয়ে রইব...দেখব...আজ দেখব...ভালো করে দেখব... তার চোখের কথা...চোখের ইসারা...হাতের হাতছানি।...

বোড়শী। ..... তোকে বুঝি ইসারা করে?

কমল। আমাকে নয়,...তোকে— ।...মা...একটা গান গাইবি?

বোড়শী। ...তুমি বড় দুরন্ত হয়ে উঠেছ কমল।

কমল। তুমি আমায় বকৃছ মা?

বোড়শী। দুরন্তপনা করলে বক্‌ব না তো কি কর্ব্ব?

কমল। তুমি আমায় ভালোবাসছ না মা?

বোড়শী। ভালোবাসি কমল। ভালোবাসি। আমার লক্ষ্মী। আমার সোনা।

কমল। ...আট আনা ছিল...চার আনায় দাঁড়িয়েছে।

বোড়শী। ওরে আমার মাণিক।...ওরে আমার মণি। ...আমার সোনা। আমার লক্ষ্মী। আমার ..আমার... [কমলকে চুম্বনে চুম্বনে আচ্ছন্ন করিলেন।]

কমল। তবে আরো কমেছে...চার আনাও নেই... তাই অত চুমু খেয়ে ভুলোচ্ছ মা।...বাইরে কি ঝড় উঠল? ঐ যে...ঐ যে মা...উঃ

বোড়শী। তাই তো বাবা।...র'সো আমি জানলা বন্ধ করে দিয়ে আসি...।

কমল। [চীৎকার করিয়া] না—মা। না—

শ্রীমন্মথ রায়

ষোড়শী। ও ঘরে জানালার ধারের টেবিলের ওপর ডাক্তারের দামী ওষুধগুলো রয়েছে, নষ্ট হয়ে যাবে বাবা—, ভারী লজ্জা পাবো তবে।...যাই...এক্ষুনি আসছি।

কমল। যাও..কিন্তু আমার ঘরের জানলা দরজা বন্ধ করতে পার্বে না—

[ষোড়শী চলিয়া গেলেন।]

আঃ কি সুন্দর! ঐ ঝড় উঠেছে! গাছপালা নাচ্ছে! কাঁপ্ছে! দুলছে! তারারা নাচে! জোনাকিরা ছোটে! ...বাঃ বাঃ...প্রদীপের আলো নাচছে!..কেন নাচে? কি চমৎকার নাচে!. দেখি. [উঠিয়া প্রদীপ হাতে নিল। প্রদীপ মুখের কাছে ধরিয়া দেখিতে লাগিল!...হঠাৎ প্রদীপের আলো তাহার জামাতে ধরিয়া গেল।] মা! মা! আলো আমায় ধরেছে! আগুন! আগুন!...ভারী সুন্দর...কিন্তু পুড়ে গেলুম...জ্বলে মলুম! [হাত হইতে প্রদীপ পড়িয়া নিভিয়া গেল। ছুটিয়া ষোড়শী প্রবেশ করিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিলেন "সর্ব্বনাশ!" এবং তৎক্ষণাৎ জামা টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আগুন নিবাইলেন।]

ষোড়শী। কমল! কমল! বাবা আমার!

কমল। মা!...ভা-রি সু-ন্দ-র...কিন্তু পুড়ে গেলুম... জ্ব-লে ম-র-লু-ম! . আমায় ই-সা-রা করেছিল...হাতছানি দিয়ে...ডে-কে...ছি-ল!......আলো আ-লো!...আবার দে-খি!

ষোড়শী। ভুলু! ভুলু!...সর্ব্বনাশ! দেশলাইটা পর্য্যন্ত তার কাছে!

কমল। হারিকেন?

ষোড়শী। [নীরব রহিলেন।]

কমল। মা! হা-রি-কে-ন কই?

ষোড়শী। ভুলু নিয়ে গেছে—

কমল। কেন?

ষোড়শী।, [নীরব রহিলেন।]

কমল। আলো আন মা...আলো আন...আমার গায়ে জল ঢালো...আমায় স্নান করিয়ে দাও—

ষোড়শী। না বাবা জল নয়...আমি ভুলুর ঘরে আলোর খোঁজে যাই—

[ভুলুর ঘরে প্রস্থান]

কমল। জল! জলে গেল! জল!—ঐ তাল-পুকুরের কালো জল—[জানালার কাছে যাইয়া] নাচে! নাচে!—কালো জল নাচে!—কালোজলের শীতলবুকে তারারা নাচে!—খেলে!——জল! জল! জলে গেল [অন্ধকারেই দরজা খুঁজিয়া বাহির করিয়া দরজা খুলিল।] .. মা! তুমি সরে গেছ!...ঐ ওরা আমার কাছে এসেছে! ...[চীৎকার করিয়া] ডাকছে মা আমায় ডাকছে! ঐ ইসারা ..ঐ হাতছানি! মা! মা! ওরা আমার হাত ধরল!...আমায় নিয়ে গেল! আমায় জড়িয়ে ধরে নিয়ে গেল!

[অন্য দরজা পথে লণ্ঠন হস্তে ভুলু ও ডাক্তারের প্রবেশ।]

ভুলু। মা! মা!

ডাক্তার। কমল কই ভুলু?

[ছুটিয়া ষোড়শীর প্রবেশ]

ষোড়শী। লণ্ঠন এনেছ?

ডাক্তার। কমল কই ষোড়শী!

[ষোড়শী শয্যার দিকে তাকাইয়া দেখিলেন কমল নাই...কক্ষের চারিদিকে তাকাইয়া দেখিলেন কমল নাই। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে দেখিলেন তালপুকুরের দিকের দরজা খোলা—তখনই "সর্ব্বনাশ" বলিয়া সেই দিকে ছুটিয়া যাইতেই ডাক্তার তাহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন।]

ডাক্তার। কমল কোথায়?

ষোড়শী। হাত ছাড়ো...হাত ছাড়ো...তুমি এসেছ... তাই সে চলে গেছে!

[কপালে করাঘাত করিতে করিতে লুটাইয়া পড়িলেন।]

অন্ধকবি রুদকী *

মুহম্মদ মনস্থরউদ্দীন

ইয়োরোপ ও এশিয়ার অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা—সাদৃশ্য এই যে অমর কবি হোমরের ন্যায় কবি রুদকীও জন্মান্ধ ছিলেন। সামানিয়া বংশের রাজত্বকালে ফরিদ উদ্দীন মুহম্মদ আব্দুল্লাহ, ট্রাক্‌জোনিয়া প্রদেশে রুদকী গ্রামে ৮৭০—৯০০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে জন্ম গ্রহণ করেন। পারস্য সাহিত্য যখন শক্তিশালী আরবী সাহিত্য দ্বারা নির্ব্বাসিত হইতে যাইতেছিল, যখন সাহিত্যিক ও কবিগণ সকলেই আরবীকে সাদরে তাঁহাদের ভাবের বাহন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন তখন অন্ধকবি রুদকী তাঁহার অসামান্য কবি প্রতিভা ও অতুলনীয় সঙ্গীত—শক্তি লইয়া তাঁহার উপেক্ষিত মাতৃভাষার সৌকর্য্য সাধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রমকালেই তিনি সমগ্র কোরাণ শরিফ কণ্ঠস্থ করেন এবং শীঘ্রই 'ইল্‌মেকেরায়েত' (কোরাণ পাঠের বিভিন্ন রীতি) শেষ করেন। ইহা হইতেই তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভার সম্যক্‌ পরিচয় পাওয়া যায়। এই অতি অল্প বয়স হইতেই তিনি কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। সৌভাগ্য—ক্রমে তাঁহার স্বরও অতীব মধুর ছিল। তৎকালীন সম্রাট ও পারিষদগণের সভায় নদিমের (নিত্যসহচরের) স্থান অতীব উচ্চে ছিল। এই পদের জন্য যে সমস্ত গুণের প্রয়োজন তাহার সকলগুলিই তাঁহার মধ্যে বর্ত্তমান ছিল। তাঁহার এই সমস্ত গুণগরিমার খ্যাতি খোরাসান ও ট্র্যাক্‌-জোনিয়ার সম্রাট নসর-বিন-আহমদের রাজসভায়ও পৌঁছিয়াছিল। ইহার ফলে সম্রাট তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান এবং তাঁহার নিত্যসহচর করেন। সম্রাটের ঈদৃশ অনুগ্রহের ফলে তিনি এত সম্মান ও সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন যে অনেক ধনী সভাসদের ভাগ্যেও তাহা ঘটে না। সমস্ত পারস্য সাহিত্যের ইতিহাসেই উল্লিখিত আছে যে যখন তাঁহার সোয়ারী বাহির হইত তখন তিনশত দাস তাঁহার অশ্বের অনুগমন করিত। বিদেশে ভ্রমণ কালে তাঁহার আসবাবপত্র চারিশত উষ্ট্র বহন করিয়া লইয়া যাইত।

(২)

সামানিয়া বংশের রাজত্বকালে শত সহস্র কবি বর্ত্তমান ছিলেন কিন্তু রুদকীর প্রসাদেই আজও সামানিয়া বংশের নাম বিখ্যাত। কবি শরিফ সত্যই বলিয়াছেন—

আজ্‌ আঁ চান্দ ী নইম-ই-জারেদানী,
কেমান্দাজ্‌ আল্‌-সাসান' ও আল্‌-সামান।
সানায়ে রুদকী মান্দাস্ত ও মদেহ্‌ শ,
নওয়ায়ে বারবদ মান্দাস্ত দোস্তান॥

[কবি রুদকীর যে শাশ্বত দান চিরন্তন হইয়া রহিয়াছে তাহা সামানীয়া ও সাসানিয়া বংশের প্রশংসা ও প্রশস্তি-পাঠ। রুদকীর প্রশংসামূলক ও স্তুতিমূলক কবিতা এবং বরবাদের সঙ্গীত ও গল্প বাঁচিয়া রহিয়াছে।]*

সম্রাট নসর বিন আহ্‌মদের আদেশে রুদকী "কলিলা ও দমনা"র পারশী অনুবাদ করেন। কলিলা ও দমনা প্রথমে সংস্কৃত হইতে আরবী ভাষায় অনূদিত হয়। রুদকীর এই বিখ্যাত পুস্তকের অনুবাদ লক্ষ্য করিয়াই বিখ্যাত কবি আন্‌সারী বলিয়াছেনঃ—

চেহেল্‌ হাজার দেরম রুদকী জে মেহতরে খেশ,
'আতা গেরেস্ত বনজ্‌মে কলিলা দর কেশোয়ার।

[রুদকী তাঁহার সম্রাটের নিকট হইতে চল্লিশ হাজার দেরেম, কলিলা ও দমনার গল্প কবিতায় লিখিবার জন্য পুরস্কার পাইয়াছিলেন।]

* এই প্রবন্ধ লিখিতে শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক আগা মুহম্মদ কাজেম শিরাজী সাহেব ব্যক্তিগত হিসাবে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। —লেখক।

*পারস্য কবিতার যে স্থানে 'স' আছে তথায় সংস্কৃত 'স' বা ইংরাজীতে 's' এর ন্যায় উচ্চারণ হইবে। —লেখক।

মুহম্মদ মনস্থুরউদ্দীন

দুর্ভাগ্যক্রমে এই অমূল্য পুস্তকখানি নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

একবার সম্রাট নসরবিন আহমদ হিরাটে ভ্রমণ করিতে গমন করেন। বাদ-ই-গিস্ হিরাটের একটী প্রসিদ্ধ প্রমোদ স্থান। তখন বসন্তকাল, সমস্ত মাঠ পুষ্পে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সম্রাট সেই স্থানের আনন্দদায়ক ও রমণীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ ও আত্মবিস্মৃত হইয়া সমস্ত বসন্তকালই তথায় অতিবাহিত করিলেন। বসন্ত গেল, শীত আসিল। তখন সমস্ত বৃক্ষ ফলভারে সুশোভিত হইল। সেই স্থানে ১২০ প্রকার আঙ্গুর উৎপন্ন হইত। ইহার মধ্যে তিরনিয়ান ও কালিঞ্জুর সাতিশয় সুস্বাদু, উপাদেয় ও নরম ছিল। নসর মাঠ পরিত্যাগ করিয়া আবাদী স্থানে আসিলেন এবং দরওয়াজ নামক বিখ্যাত স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই স্থান শস্যশালী ও প্রসিদ্ধ ছিল। উহার প্রত্যেক দিকই প্রাসাদোপম দিওয়ান ও হর্ম্ম্যরাজি দ্বারা সুশোভিত ছিল এবং প্রত্যেক দিওয়ানের সহিত উদ্যান সংলগ্ন ছিল। এই সময় সিস্তান ও মাজেন্দারাণের ফলাদি তথায় আমদানী হইত। নসর সমস্ত শীতকালই তথায় অতিবাহিত করিলেন। প্রতিবারই তিনি রাজধানীতে দূত প্রেরণ করিতেছিলেন যে বসন্তকাল শেষ হইলে রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইব। কিন্তু এক ঋতু চলিয়া গেলে অন্য ঋতুর বন্ধনে তিনি দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হইতে ছিলেন। এই প্রকারে চারি বৎসর অতিবাহিত করিলেন। সুতরাং সভাসদ ও সৈন্যগণ হৃদয়ে কষ্ট অনুভব করিতেছিলেন কিন্তু কেহই প্রকাশ করিয়া সম্রাটকে কিছুই বলিতে সাহস করেন নাই। পরিশেষে সকলে মিলিয়া রুদকীর নিকট উপনীত হইয়া বলিলেন "আমরা আপনাকে পাঁচ হাজার আশরাফী এই সর্ত্তে দিতে সম্মত আছি যে আপনি সম্রাটকে বোখারায় ফিরাইয়া আনিবেন।" পরদিন রুদকী সম্রাট সমক্ষে গমন করিয়া দেখিলেন সম্রাট মদ্যপান করিতেছেন। রুদকী প্রেমের সুরে গান ধরিলেন,

বুয়ে জুয়ে 'মুলিয়ান' আইয়াদ্ হামী,
ইয়াদে ইয়ারে-মেহেরবান আইয়াদ হামী।
রিগ-ই-আমু ও দরস্তীহায়েউ,
জেরে পায়েম পোরনিয়ান আইয়াদ হামী।
আব-ই-জয়হুন বাহামা পাহ্নাওয়ারী,
খঙ্গে মারা তা মিয়ান আইয়াদ্ হামী।
আয় বোখারা শাদ্ বাস্ ও শাদজী,
শাহে সুইয়ত মেহ্মান আইয়াদ হামী।
শাহ "সরও" আস্ত ও বোখারা বুস্তান,
সরও সুয়ে বুস্তান আইয়াদ হামী।
সাহ মাহ আস্ত ও বোখারা আস্মান,
মাহ সুয়ে আসমান আইয়াদ হামী।

['মুলিয়ার' নদীর গন্ধ আমি অনুভব করিতেছি, অনুগ্রহশীল বন্ধুবান্ধবগণের কথা আমার মনে পড়িতেছে। আমুদরিয়ার উপল সমূহ ও তাহার বন্ধুর বিস্তৃত ভূভাগ আমার পায়ের নীচে যেন মলমলের মত লাগিতেছে। দীর্ঘপ্রসারী জয়হুন নদীর জল আমার ঘোড়ার বুক পর্য্যন্ত পৌঁছিতেছে। হে বোখারা খুশী হও ও উৎসব কর, কেননা বাদশাহ্ তোমার অতিথি হইতে যাইতেছেন। সম্রাট দেওদার তরু (সরও) এবং বোখারা যেন বাগান, দেবদারু তরু বাগানের দিকে অগ্রসর হইতেছে। সম্রাট চন্দ্র এবং বুখারা আকাশ, চন্দ্র আকাশের দিকে আসিতেছে।]

নসরের উপর ইহার ঐন্দ্রজালিক প্রভাব এতদূর বিস্তৃত হইল যে তিনি মোজা পরিধান না করিয়াই অশ্বারোহণ করিলেন এবং পূর্ণ এক মঞ্জিল গমন করিয়া বিশ্রাম করিলেন। সম্রাটের পারিষদ ও সৈন্যদল রুদকীকে তাঁহাদের প্রতিশ্রুত আশরফী দান করিয়া কবিকে সম্মানিত করিয়াছিলেন।

রুদকীর জীবন সম্বন্ধে আমাদের বেশী জানিবার বিশেষ কোন গ্রন্থই নাই। "চাহার মাকালার" গ্রন্থকার, কবি নিজামী উরুজী যদি এই ঘটনাটীর উল্লেখ না করিতেন তাহা হইলে আমরা ইহাও জানিতে পাইতাম না।

আমির মুয়িজ্জীও একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন কিন্তু রুদকীর কবিতার নিকট তাঁহার রচনা দাঁড়াইতে পারিত না। রুদকীর উচ্চস্থান ও রচনার নিকট মুয়িজ্জীর রচনা ভাবপ্রকাশের দৈন্যে নিপীড়িত। রুদকীর কবিতা ভাবের-

প্রকাশে গৌরবান্বিত। রশিদী সমরকন্দী তাঁহার 'মজমা'—অল-কসাহা' নামক গ্রন্থে রূদকীর কবিতা সংখ্যা একলক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেননা তিনি বলিতেছেন,

শয়রে উস্তাবরশমার্ দম্ সিজ্ দহ্ রহ্ সদ্ হাজার
হাম কজুন তর আইয়াদ্, আর চুনান্ কেবাইয়াদ বশমরী।

[তাঁহার কবিতা আমি ত্রয়োদশবার গণনা করিয়াছিলাম, একলক্ষ হইয়াছিল।

যদি অধিক সুচারুরূপে গণনা করা যায় তবে ইহা হইতে বেশী হইবার সম্ভাবনা।]

রূদকী, কাসিদা, রুবাই, কিতারা, গজল ও মর্সিয়া প্রভৃতি সকল প্রকারের কবিতাই লিখিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে তিনি মসনভীও লিখিয়াছিলেন কিন্তু তাহার কোন অস্তিত্বই নাই। 'কলিলা ও দমনা' নামক বর্ণাত্মক গ্রন্থ মসনভী ব্যতীত অন্য কোন ছন্দে লেখা সম্ভবপর নহে।

মৌলানা শিবলী বলেন, ওমর খইয়ামের মধ্যে যে দর্শন ও চিন্তাধারার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় উহার মূলে রূদকীর রচনা রহিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ তিনি একটা কবিতা উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন। যথা,

শাদজী, বা সিয়াহ্ চশমান শাদ
কে জাহান নিস্ত যজ্ ফাসানাও বাদ।
যে আমাদা শাদমান না বায়েদ বুদ,
ওজে গুজাস্তা নাকরদা বায়েদ ইয়াদ।
নেক বখ্ত আঁ কাসে কে দাদও বাখোরদ,
শোর বখ্ত আঁকে উ নাখোরদ ও নাদাদ।
বাদ, আবর আস্ত, ইঁ জাহান আফস্নস,
বাদা পেশ আর, হরচে বাদা বাদ।

[আনন্দে তরুণী তম্বীর সহিত জীবন যাপন কর, কেননা পৃথিবী আজব গল্প (বা কল্পনা-কাহিনী) ও বাতাস ব্যতীত আর কিছুই নয়।

অতুল ধনের অধিকারী বলেই খুশী হওয়ার কারণ নাই, বা অতীত ধনের কথা মনে করেও দুঃখ করার প্রয়োজন নাই। সেই সৌভাগ্যবান, যে নিজে ভোগ করিয়াছে ও বিলাইয়াছে, সেই দুর্ভাগ্যবান যে নিজেও ভোগ করে নাই বা অন্য কা'কও দেয় নাই।

এই পৃথিবী, বাতাস ও মেঘের মতই চঞ্চল ও ক্ষণস্থায়ী এবং গল্পের মতই অলীক।

মদ লইয়া আইস, বাতাসে মিশিয়া যাইবার আগেই উপভোগ করিয়া লই।]

হাফেজের সমস্ত গজলের মধ্যেও এই সুরের ঝঙ্কার পাওয়া যায়।

রুয়ে ব মিহরাব নেহাদান চে সুদ,
দিল বেহ্ বোখারায় ও বুতানা-ই-তরাজ।
ইজদ্ তা ওসুসায়ে আশেকী,
আজ তু পজিরদ, না পজিরদ নামাজ।

[মিহ্‌রাবের (prayer niche বেদীর) নিকট মস্তক রাখিবার কি প্রয়োজন ?

তোমার দিল্ বুখারার সুন্দরী তরুণীর হাতে সমর্পণ কর। যতক্ষণ তোমার হৃদয় প্রেমের জন্য পাগল ততক্ষণই সৃষ্টিকর্ত্তা তোমার আবেদন গ্রহণ করিবেন; তিনি তোমার প্রার্থনার প্রার্থী নহেন।]

কবি, জীবনের ও জগতের প্রতি যে ভাব দেখাইয়াছেন তাহা বড়ই সুন্দর। তিনি বলিয়াছেন "ইঁ হামা বাদ ও বুদে তু খাব আস্ত", তোমার অস্তিত্ব, তোমার অতীত, ভবিষ্যৎ সমস্তই একটা নিদ্রার ঘোর। তিনি বলিতেছেন,

জেন্দেগানী চে কুতাহ্ ওচে দারাজ,
না বেহ্ আখের বেমরদ ও বায়েদ বাজ।
হাম্ বেহ্ চম্বর গুজার খাহাদ বুদ,
ইঁ রসন রা আগর চে হাস্ত দারাজ।
খাহী আন্দর অনা ও মেহনত জেই,
খাহী আন্দর নেশাত ও নেয়ামত ও নাজ।
খাহী আন্দকতর আজ জাহান্ বগজির,
খাহী আজরেই বগীর তা ব হেজাজ।
ইঁ হামা বুদে ও বাদ তু খাবত আস্ত,
খাবরা হুকুম নায় মাগর বমজাজ।
ইঁ হামা রুজ মরগ আগর বিনী,
নশেনাসি জে এক দিগর শাম বাজ।

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন

[দীর্ঘজীবন কি সংক্ষিপ্ত জীবন, কোন পার্থক্য নাই, ইহাই কি সত্য নহে যে শেষে সকলেই মরিবে? হইতে পারে, জীবন-সূত্র অতিশয় দীর্ঘ, একদিন তাহাকে ও নীল আকাশের গম্বুজ পার হইয়া যাইতে হইবে। তুমি সম্পদ মধ্যেই বাস কর বা দুঃখ কষ্টেই জীবন যাপন কর, অথবা তুমি ঐশ্বর্য্য প্রাচুর্য্যও আনন্দের ক্রোড়েই কালাতিপাত কর, তুমি পৃথিবীর অতি সামান্যই উপভোগার্থ পাইয়াছ, তুমি রায়' হইতে 'হেজাজে'রই অধিপতি হও, তোমার এই সমস্ত, তোমার ঐশ্বর্য্য, দুঃখ, সকলই স্বপ্ন; স্বপ্ন চিরদিন অবাস্তব। তুমি যদি এই সমস্ত আঁধ-অমক দুঃখ দৈন্য সত্বেও মৃত্যুর মুখ দেখ, তাহা হইলে এক জনকে অন্যজন হইতে পৃথক করিতে পারিবে না।]

তিনি আবার অন্যত্র বলিয়াছেন,

ব রোজে নেকে কাসাঁ গোফত গম্ মা খোর জিনহার,
বসা কাস্ কে বরোজে তু আরজু মন্দ আস্ত।

[কাহারও সুখের দিন দেখিয়া তুমি দুঃখ করিও না, পৃথিবীতে এমন লোক আছে যা'রা তোমার অবস্থাকেও হিংসার চক্ষে দেখে।]

সুতরাং অন্যের সুখ ঐশ্বর্য্যের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া লাভ নাই, প্রত্যুত রুদকীর কথা শ্রবণ কর—

রুদকী চান্দ বর্ গেরেফ্ত নোয়াখ্ত,
বাদাহ্ আন্দাজ্ কো সরুদ আন্দাখ্ত।
আঁ আকিকিনে মায় কে হর্ কে বদিদ,
আজ আকীক গোদাখ্ত নেশাখ্ত।
হর্ দো এক গওহর আন্দ, লায়েক বতবয়ে',
ঈঁ বে কেসারদ, ও আঁ দিগর বগোদাখ্ত।
না বসুদাহ্ দুদ আস্ত রঙ্গীন ক্ দ,
না চশিদাহ্ তারিক আন্দর তাখত।

[রুদকী অনেক গান গহিয়াছে এবং যথেষ্ট মদ পান করিয়াছে। সেই লাল মদ যেই দেখিয়াছে কেহই চিনিতে পারে নাই যে তাহা আকিক (Cornelian) চূর্ণ বা মদ। তাহারা উভয়েই প্রকৃতির বুক হইতে উৎপন্ন; একটী জমীভূত অন্যটী তরল।

মদ পরশমাত্র হাত রঙীণ করিয়া ফেলে, মদ পানমাত্র দুশ্চিন্তা সব মস্তিষ্ক হইতে দূর করিয়া দেয়।]

আরও বলিয়াছেন,—

বনফ শাহায়ে তরবে খিল্ খিলে সের বর করদ,
চু আতশে কে বগো গরদ বর দমীদ কবুদ।
বইয়ার হাঁ বদেহ্ আঁ আফতাব কাশ বগোয়ী,
জেলব ফেরু শোদ ও আজ দাহাঁ বর আয়দ দুদ।

[আনন্দপ্রদ 'বনফশাহ্' অত্যধিক পরিমাণে প্রস্ফুটিত হইয়াছে, অনন্ত গন্ধকের নীল শিখার মত।

তোমার মুখে লও,—আগুনের মত লাল মদ আনয়ন কর, যখনই তুমি ইহা পান করিবে তখনই তোমার দুঃখ ধুঁয়া মস্তিষ্ক হইতে পলায়ন করিবে।]

এই জীবনের মোহনিদ্রার মধ্যে প্রেম মদিরা গ্রহণ করিয়া জীবন ধন্য কর। হাফেজ একটী সুন্দর গজলে বলিয়াছেন,

"এই মদ গ্রহণ কর, যা' সুন্দরী কুমারীর চুম্বন হইতেও মধুর।"

পৃথিবীর এই রম্যকানন, স্বর্গের নন্দন কানন হইতেও সুন্দর, এখানে সেই জীবনের চরম সার্থকতা, তাই তিনি সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন,

ইয়ারে মনে গোফতা বেহেশ্ত আস্ত আয়ে শেগফত।
ঈঁবাগ নিস্ত, গোফতাম ঈঁ বাগ ইস্তগয়রম চুঁবে
হেশতে কেরদগার।
আঁ বেহেশত না পদিদ আস্ত, ঈঁ বেহেশত আস্তই আইয়ান,
ঈঁ বেনকদ আস্ত আঁবে নিসা আঁ
নেহান ঈঁ আশকার।

[প্রিয়তম বলিল "কি আশ্চর্য্য (পৃথিবী রূপ) বাগান! ইহা স্বর্গতুল্য, বাগান নহে"

আমি উত্তর করিলাম "এই বাগান সৃষ্টিকর্তার স্বর্গ—উদ্যানের মতই মনোরম ও সুন্দর।

সৃষ্টিকর্তার স্বর্গোদ্যান অদৃশ্য, এই উদ্যান দৃশ্যমান।]

রুদকী শুধু তাঁহার প্রিয়তমের গানই করেন নাই, শুধু তিনি প্রেমের কবিই নহেন, বা দর্শনের জটিল সমস্যা সমূহ সমাধান করিতেই ব্যস্ত ছিলেন না প্রত্যুত বাস্তব

জীবনের অস্তিত্বসম্বন্ধেও সজাগ ছিলেন। তিনিই পারস্ত সাহিত্যে 'কাসিদা'* (প্রশস্তিসূচক কবিতা) লিখিবার প্রথা সৃষ্টি করিয়া যান। যদিও কাসিদা সাধারণতঃ সম্রাট বা অন্য কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তির প্রশংসা সূচক কবিতা, তথাপি রুদকী কোন কোন কাসিদায় প্রাকৃতিক বর্ণনাও দিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত কাসিদা তাঁহার বিশেষত্ব, ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা দ্বারা দীপ্ত॥ যথা

বাহার। আজ বনফ্‌শাহ্‌ মর্‌জ্জহা গুস্তরদান্দ্‌
দিরাহা বে চীন,
ওআজ শেগুফা শাখ্‌হা বরবস্তা দোর্‌রে শাহওয়ার।
বাহাওয়ায়ে উস্ত গুফ্‌তী হরচে গুফ্‌তী দর নসীম,
বরজমীনে উস্ত গুফ্‌তী হরচে দর আলম বাহার।
আজ মিয়ানে জুয়ে আন্‌ আবি রওয়ান হামচু গুলাব,
শাখ্‌হায়ে গুল শেগোফ্‌তা বর কেনারে জুয়েবার।
বুদ হরজা বহরে নজহ্‌তগাহ্‌ বারো ও নকল ওমোল,
গুল্‌সিতান দর গুল্‌সিতান ও মেওয়া আন্দর
মেওয়াজার।

খেজাম॥ কুহ্‌ দিগর কুহে সিমিন গশ্‌ত ও গরবীন্‌
সদ্‌ চমন,
আব্‌ দিগর বারা রওশন শগ্‌ত ওতীরা
শোদ্‌ হাওয়া।
গশ্‌ত খামুশ ফাখ্‌তা স্তা শোদ চমন পরদাখ্‌তা,
গশ্‌ত বুল্‌বুল্‌ বেনওয়া তা বুস্তান্‌ শোদ বেনওয়া।
নারচুন বর হোক্কায়ে জররীন-নজীন্‌হায়ে আকীক,
সিব চুন্‌ বর চেহরায়ে সিমীন নেশানহায়ে বোকা।
বাদে সু সর্‌দ আমাদ চু আহে আশেকান্‌ হাঙ্গামে
সুবোহ্‌,
বোজাগ আমাদ চু আজ মা'শুক পায়গামে জফা।
মা'রকা বেদান্‌, গাহি দো লস্কর বরুয়ে একদিগর,
গের্‌দা কুনান্দ রেকাব ও সবক কুনান্দ' অনান।

জেগর্‌দে আসপান তিরা শোদ্‌ রুখে খুরশিদ,
জে বুঙ্গে মরদান্‌ খিরা শোদ দিলে কাইওয়ান।
একে কশিদা সেনান ওএকে কোশাদা হোসাম,
একে কোশাদাহ্‌ কামান্দ ও একে কশিদা কামান।
[বসন্ত। 'বনফশাহ্‌' পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে, পৃথিবীর বুকে যেন বহুমূল্য চৈনিক গালিচা বিছাইয়া দিয়াছে,

বৃক্ষের শাখা সমূহ পুষ্প মুকুলে সুশোভিত হইয়াছে, কে যেন মূল্যবান মণিমুক্তা শাখায় শাখায় লাগাইয়া দিয়াছে।

তুমি যাহাই বল, মলয় বাতাস তাঁহার সন্ধানেই উতলা হইয়াছে, তাঁহার ধরণীর বুকে সকলই যেন বসন্ত ঋতুর বিকাশ।

নদীর বুকে স্বচ্ছ সলিল যেন গুলাবের মত প্রতিভাত হইতেছে, তাহার তীরে পুষ্প সমূহ মনোরম হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমোদ প্রমোদের জন্য সকল স্থানেই ফল, মিষ্টসামগ্রী ও মদ রহিয়াছে, সকল দিকেই নয়নাভিরাম ফুল ও ফলের বাগান।

শরৎ। আবার শৈল-শিখর, তুষারে সমাচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছে এবং পুষ্প সমূহ পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছে,

আবার নদীর জল পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে এবং আবহাওয়া কুজ্ঝটিকাময় হইয়া গিয়াছে।

ঘুঘুর স্বর স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে, কেননা প্রকৃতি নগ্ন হইয়া গিয়াছে, বুলবুল আর গান গাহে না কেননা বুস্তান পুষ্প শূন্য হইয়া গিয়াছে। ডালিম হলুদ রঙা পাথর বসানো পাত্রের মত হলুদ হইয়া গিয়াছে,

সেব্‌ সুন্দরী তরুণীর কান্নাভরা মুখের মত পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছে।

প্রভাতের ঠাণ্ডা হাওয়া যেন মাশুকের (প্রেমিকের) বুকের প্রাভাতিক দীর্ঘশ্বাসের মত লাগিতেছে।

কাকের কর্কশ ধ্বনি যেন প্রেমাস্পদের নির্দ্দয় পয়গামের (message-এর) মত লাগিতেছে।

যুদ্ধ। যখন দুই দল সৈন্য পরস্পর পরস্পরের সম্মুখীন হইল এবং পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিল, তখন অশ্ব খুরের ধূলিতে সূর্য্যের আলো নিভিয়া গেল, এবং যুদ্ধ-ধ্বনিতে বীর শনির (Saturn) বুক কাঁপিয়া উঠিল।

---

* কাসিদা—কসদ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কসদ্‌ অর্থ ইচ্ছা। কাসিদা সে ধরণের কবিতা যাহাতে কবি তাঁহার পৃষ্ঠপোষক বা অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রশংসা করেন।

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন

একজন বর্শা নিক্ষেপ করিতে উদ্যত, অন্যজন উন্মুক্ত তরবারী হস্তে; একজন ফাঁশ নিক্ষেপ করিতেছে, অন্যজন ধনুকে তীর সংযোজিত করিতেছে।]

রুদকী তাঁহার কবিতার মধ্যে এমন সুন্দর ও সুষ্ঠু বর্ণনা দ্বারা মনোরম চিত্র পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে পারেন যে উহা দেখিয়া অবাক বিস্ময়ে ও আনন্দে প্রাণ পুলকিত হইয়া উঠে। তাঁহার "যৌবন ও বার্দ্ধক্য" নামক একটী কবিতায় এই প্রকারের একখানি জীবন্ত ছবি হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। কোথাও কষ্টকল্পিত ছন্দ বা ভাবের দৈন্য সমগ্র কবিতাটীর মধ্যে একটুকু নাই। শব্দচয়নের সৌষ্ঠব, ভাবের মাধুর্য্য ও সুরের ঝঙ্কারে কবিতাটী ভরপুর, যথা,

মারা বস্থুদ ও ফর বে্খ্ত হরচে দান্দান বুদ,
না বুদ দান্দান. লাবল্, চেরাগে খান্দান বুদ।
একি নমুন্দ কমুন, বল হামা বেস্থুদ ও বেরিখ্ত,
চে নহ্স বুদ্ হামানা কে নহস্ কাইওয়ান বুদ।
না নহ্সে কাইওয়ান বুদ্, না রোজগারে দেরাজ,
চে বুদ? রাস্ত বগুয়েম, কাজায়ে ইয়াজদানবুদ।
হামী নাদানী আয় মাহ্রুয়ে গালিয়া মুই,
কেহালে বান্দাহ্ আজই পেশ বরচে সামান্ বুদ।
বজুলকে চওগান নাজেশ্ হামী কুনী তোবে দেহ্,
না দিদী উরা আঁগাহ্ কে জুলকে চওগান বুদ।
শোদআন জমানা কে রুয়েশ বসানে দিবা বুদ্,
শোদ আঁ জমানা কে মুয়েশ বসাঁ কত্রান্ বুদ।
শোদ আঁ জমানা কেউ শাদ বুদ ও খোররম বুদ,
নেশাতে উ বফজু বুদ ও গম্ নবো নকসান বুদ।
হামেশা দস্তশ জেই জুলফগান খুশ বুদ,
হামেশা গোশশ জে-ই মরদমে সুখনদান বুদ।
হামেশা শাদ না দানেস্তমে কে গম চে বুওয়াদ।
দেলম নেশাতে-ই-তোরব রা ফরাখে ময়দান বুদ।
আইয়াল নাহ্, জন্ ওকরজন্দ নাহ্ মুউনাত্ নাহ্,
আজই হামা তনম আসুদা বুদ ও আসান্ বুদ।
হামী খরিদ ও হামী রিখ্ত বেশুমার দেরাম,
বেশহর হরচে হামী তুরকে নর পিস্তান বুদ।
বসা কনিজকে নেকো কে মাইলে দাস্ত বেদো,
বশব জিয়ারতে উ নজ্দে উ বেপেনহান বুদ।
শোদ আনজমানাকে শেয়রে আহা বেনাবেস্ত,
শোদ আঁ জমানা কে উশায়েরে খরামান বুদ।
তু রুদকীরা সায় মাহ্রু কমুন বিনী,
বদাঁকা জমানা না দিদী কেদর খোরাসান বুদ।
বেদান্ জমানা না দিদী কে দর চমন রফ্তী
সরুদ গুয়ান্দ গুই হেজার দাস্তান বুদ।
কেরা বজরগী ও নেয়া'মত আজই ও আঁ বুদি,
ওয়রা বজরগী ও নেয়া'মত-জে আলি সামান বুদ।
বদাদ মিরে খোরাসান্শ চেল্ হেজার দেরম,
আজু ফেজুনী এক পঞ্জ, মীরে মাকান বুদ।
কনু জমানা দিগর গশ্ত, ওমান্দিগর গাশ্তম,
আসা বেইয়ার কে ওয়াক্তে আসা আমবান বুদ।

[আমার যে সমস্ত দন্ত ছিল তাহা সকলই পড়িয়া গিয়াছে, সেগুলি দাঁত ছিল না, প্রকৃতপক্ষে তাহারা উজ্জ্বল আলোর ন্যায় ছিল। তাহাদের একটীও নাই, তাহাদের সকলই পড়িয়া গিয়াছে ও নষ্ট হইয়া গিয়াছে; তাহারা কি অপয়া ছিল! সত্যই তাহারা শনির মতই অমঙ্গলজনক ছিল।

ইহা শনির দৃষ্টি বা দীর্ঘ বয়সের জন্য নহে, তবে ইহা কি? সত্য বলিব? ইহা বিধির বিধান।

হে চন্দ্রমুখী প্রিয়ে, তোমার দীর্ঘ চুলগুলি সুঘ্রানযুক্ত ও ঘনকালো, তুমি কি ইহার পূর্ব্বে আমার অবস্থা জানিতে? তুমি তোমার দীর্ঘ কুন্তলগুচ্ছের জন্য গর্ব্ব অনুভব কর, তুমি কবিকে সেই সময় দেখ নাই যখন তাহারও বাবরী চুল ছিল।

সেদিন চলিয়া গিয়াছে যখন তাহার মুখ কারুকার্য্য-খচিত বহু মূল্যবান গালিচার মত আনন্দদায়ক ছিল; সেদিন চলিয়া গিয়াছে যখন তাহার চুলগুলি কুঞ্চিত ও কালো ছিল সে সময় অতীতে মিশিয়া গিয়াছে যখন সে সুখী ও আনন্দিত ছিল।

তখন তাহার সুখ ক্রমবর্দ্ধনশীল এবং দুঃখ ক্রমহ্রাসশীল ছিল। সকল সময় তাহার হাত তাহার প্রিয়তমের কুন্তল মধ্যে থাকিত, এবং সকল সময় গুণী ও জ্ঞানীগণের বাণী শ্রবণ করিত। সে সর্ব্বদা সুখী ছিল এবং দুঃখ কাহাকে

বলে জানিত না, সর্ব্বদা তাহার হৃদয় আনন্দের প্রমোদ-ভূমি ছিল। সে সময় তাহার পরিবার ছিল না, স্ত্রী পুত্র ছিল না এবং কোন সাহায্য ছিল না, তাহার প্রাণ এই সকল হইতে দূরে ছিল এবং শান্তিপূর্ণ ছিল। তাহার অসংখ্য স্বর্ণ মুদ্রা ছিল এবং সে তাহা সুন্দরী নবকুমারীগণের জন্ত অজস্রভাবে ব্যয় করিত।

অনেক তরুণী তাহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিত এবং সে তাহাদের উদ্দেশ্তে নিশাকালে গোপন অভিসারে যাইত। সেদিন চলিয়া গিয়াছে যখন সকলেই তাহার কবিতা লিখিয়া লইত, সে দিন চলিয়া গিয়াছে যখন সে গর্ব্বিত ভাবে পথ অতিক্রম করিত।

হে চন্দ্রমুখী! তুমি এখন রুদকীকে দেখিতেছ; যখন সে খোরাসানে (সম্পদের কোলে) ছিল তখন তাহাকে দেখ নাই। তুমি সেদিন তাহাকে দেখ নাই যখন সে বুলবুলের মত বাগানে ভ্রমণ করিত ও গান করিত।

অন্তলোকে ইহার বা উহার কাছ হইতে অনুগ্রহ পাইয়া ধন্ত হইত। কিন্তু সে সাসানিয়া সম্রাটগণের অনুগ্রহ-দানে ধন্ত হইত। খোরাসানের সম্রাট তাহাকে চল্লিশ হাজার দেরেম দিয়াছিল, এবং মীর-ই-মাকান তাহাকে তাহার পাঁচগুণ দিয়াছিল। এখন সময়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং তাহারও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন যষ্টি লইয়া আইস এবং ভিক্ষা-ঝুলি দাও।]

তিনি শুধু জীবনের আনন্দ ও প্রেম লইয়াই বিভোর ছিলেন না, জীবনের ব্যথা ও বেদনা, শোক ও মৃত্যু তাঁহার প্রাণের বীণায় বিষাদ সুরের সৃষ্টি করিয়াছিল। জীবনের বিভিন্ন দিকের প্রতি সম্যক দৃষ্টি, সুখ-দুখ, কান্না-হাসি সকলগুলি মিলিয়া তাঁহার কবিপ্রতিভার স্ফুরণ করিয়াছিল। তাঁহার 'মর্সিয়া'র (শোকগীতির) মধ্যে দেখিতে পাই যে শোক তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলে নাই, শোকের প্রচণ্ড আঘাতে তাঁহার বিচার ভূমির ভিত্তি ধ্বসিয়া পড়ে নাই, ইংরাজ কবি টেনিসনের মত তিনিও একটী বিধানের সন্ধান খুজিয়া পাইয়াছেন। আমাদের শত সহস্র অশ্রুপাতে সে বিধানের কোনই পরিবর্ত্তন হইবে না, তাই তিনি বলিয়েছেন,

আয় আঁকে গমগিনী ও সাজাদারী,
ও আন্দর নিহান্ সেরশকহামী বারী।
রফ্ত আঁকে বফ্ত, আমাদ আঁকে আমাদ,
বুদ উনচে বুদ, খায়ের চে গমদারী?
হামওয়ার করদ খাহী গিতীরা?
গিতী আস্ত কে পজিরদ হামওয়ারী।
মস্তী মাকুন, না শোদ উ মস্তী,
জার মাকুন, না শোদ উ জারী।
শো তা কেয়ামত জারী কুন,
কে রফ্তা বজারী বাজ আরী।

[হে শোকাতুর প্রাণ এবং যাহারা শোক প্রকাশ করিতে ভালবাসে এবং যাহারা গোপনে অশ্রুপাত করে!

যে চলিয়া গিয়াছে সে চলিয়া গিয়াছে এবং যে আসিয়াছে সে আসিয়াছে, যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, এখন দুঃখ করিয়া কি লাভ?

তুমি কি পৃথিবীকে সমদুঃখ-ভাগী করিতে চাও?

ইহার নাম পৃথিবী, ইহা কি কখনও তোমার দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করিবে?

বাতুলতা প্রকাশ করিও না, পৃথিবী তোমার মত বাতুল হইবে না, ক্রন্দন করিও না, পৃথিবী তোমার জন্ত ক্রন্দন করিবে না। তুমি যদি কেয়ামত (doomsday) পর্য্যন্ত ক্রন্দন কর তাহা হইলেও যে চলিয়া গিয়াছে, সে আর আসিবে না।]

BIBLIOGRAPHY.

(১) Literary History of Persia Vol. I. by Prof. E. G. Browne, M. A., M. B. (T. Fisher Union, London.)

অধ্যাপক ব্রাউন পারস্ত সাহিত্য, ইসলামিক সভ্যতা ও কালচারের ইতিহাস অতি সুন্দর ও মনোরম ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। পারস্ত কবিদের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে অধ্যাপক ব্রাউনের গ্রন্থ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয়।

ইহার মত বিজ্ঞান-সঙ্গত ও তথ্যপূর্ণ ইতিহাস আর ইংরাজি ভাষায় পারস্ত সাহিত্য সম্বন্ধে নাই।

(২) চাহার মাকালা—কবি নিজামী উরুজী প্রণীত, পারস্যবাসী মির্জ্জা মুহম্মদ কাজভিনী সম্পাদিত, এবং E. J. Gibb Memorial Series-এ ইংলণ্ডে প্রকাশিত।

ইহা পারস্ত সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গদ্য গ্রন্থ। পারস্ত সাহিত্য আলোচনায় ইহা অমূল্য গ্রন্থ। মির্জ্জা কাজভেনী যথেষ্ট পরিশ্রম সহকারে পারস্ত ভাষায় অসংখ্য টীকা টীপ্পনী সম্বলিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

(৩) শিয়র-উল-আজম, আল্লামা শিবলী নোমানী প্রণীত। আজমীর, দারুল মুসান্নাফিন হইতে প্রকাশিত।

অধ্যাপক ব্রাউনের পরেই বা সঙ্গেই অধ্যাপক শিবলীর গ্রন্থের স্থান। পারস্ত সাহিত্য আলোচনায় ইহার মত গ্রন্থ কোন ভারতবাসী লিখিতে সক্ষম হন নাই।

(৪) ক। Rudagi—Ency. Britannicaর প্রবন্ধ।
খ। „ Ency. of Islamএর প্রবন্ধ।

ঝাঁটার গান

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

সাঁঝে প্রাতে ঘর ঘর
ঝাঁটা চলে বার্‌বার্।

ওঠে গান শুচিতার,
সাথে সাথে বাজে তা'র
চুড়ি বালা কঙ্কণ,—
লক্ষ্মীর মন্তর।

সপ্‌ সপ্‌ সর্‌ সর্‌
ঝাঁটা চলে ঘর ঘর।

জঞ্জাল, ধুলা বালি,
কঙ্কর, ঝুল কালি,
ছাইপাঁশে লাগে ত্রাস্‌
চারিধার ত্‌র্‌ ত্‌র্‌।

খস্‌ খস্‌ খর্‌ খর্‌
ধ্বনি তা'র সর্‌ সর্‌!

বধূদের করে করে
সকরুণ মর্ম্মরে
চলে চল-চঞ্চল
দ্রুত কভু মন্থর।

খেটে খেটে ঘর ঘর
দেহ তার জর্জ্জর।

নির্ম্মল চারিধার
অঙ্গন গৃহ দ্বার
'কুন্দ'-র শোভা ধরে
চারি দিক সুন্দর!
কাঁপে দূরে থর্‌ থর্‌
অশুচির পঞ্জর!

লাড়ুগোপালের কীর্ত্তি

—গল্প—

—শ্রীজীবনময় রায়

মাখনলাল গ্রামের এণ্ট্রান্স স্কুল হইতে ম্যাট্রিক্যুলেশন পাশ করিয়া যখন কলিকাতায় তাহার মামার বাড়ীতে পড়িতে আসিল, তখন সে মোটেই ভাবে নাই যে এমনটা কোন কারণেই তাহার জীবনে ঘটিতে পারে। স্কুলে "ভাল ছেলে" বলিয়া তাহার একটা নাম-ডাক ছিল। পড়াশুনা অবশ্য সে ভালই করিত এবং স্কুলের খারাপ, অর্থাৎ সে ছাড়া বাকী আর সব, ছেলেদের সহিত সে কদাচ মিশিত না। উক্ত প্রকার নানা কারণে ক্লাসের ফার্ষ্ট প্রাইজ এবং গুড্ কণ্ডাক্টের প্রাইজ তাহার চিরকাল একচেটিয়া ছিল। স্কুলের ঘণ্টার পাঁচ মিনিট থাকিতেই বামকুক্ষিতলে ফালাটবাঁধা খাতাবইয়ের বাণ্ডিল এবং দক্ষিণ স্কন্ধ হইতে পশ্চাদ্ভাগে লম্বমান সাদাকাপড়ে ছাওয়া একটি ছাতা লইয়া ঘড়ির কাঁটার মত তাহাকে হেড্মাষ্টারের ঘরটিতে দেখা যাইত। বলা বাহুল্য ক্লাসের দুষ্ট ছেলেদের দুষ্কর্ম্মের তালিকা হেড্মাষ্টার মহাশয় তাহারই নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া ছাত্রদিগের মনে যুগপৎ বিস্ময় ও আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন। এমনি করিয়া গ্রামের স্কুলে আটটি বৎসর কাটাইয়া দিয়া মাখনলাল গ্রামের অন্যান্য বালকদিগের দৃষ্টান্তস্থল ও বিদ্বেষের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

কলিকাতায় আসিয়া যখন সে মামারবাড়ীর বৈঠকখানার এক পাশে একটা ছোট টেবিল পাতিয়া, রীতিমত রুটিন করিয়া একেবারে প্রথম দিন হইতেই পড়াশুনা করিতে লাগিয়া গেল, তখন সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে এই কলিকাতারূপ ভয়ানক স্থানে যে সকল প্রলোভন ও চিত্তবিক্ষেপের কারণ আছে বলিয়া শুনিয়াছে, তাহার দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিবে না; এবং তাহার চিরদিনের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সকলকে সে দেখাইয়া দিবে যে তাহার সহিত অন্যান্য ছেলেদের কি আকাশ-পাতাল তফাৎ। এমন কি ম্যাট্রিক্যুলেশনে যদিচ স্কলারশিপটা তাহার এক মার্কের জন্য ফস্কাইয়া গিয়াছে, তথাপি এবার সে দেখিয়া লইবেই। পেষ্টবোর্ডের উপর মোটা মোটা অক্ষরে "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন" বাক্যটি লিখিয়া সর্ব্বদা নিজেকে সচেতন রাখিবার জন্য রুটিনের ঠিক তলায় চোখের সামনে দেয়ালের গায়ে সেটা লটকাইয়া দিল।

আরম্ভটা ভালই হইয়াছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহার প্রতিজ্ঞা অটল থাকা সত্ত্বেও যে কোন্ দিক দিয়া কেমন করিয়া কি হইয়া গেল তাহাই ভাবিয়া সে কূল পাইতেছিল না; এবং আজ সন্ধ্যাবেলা চাঁদপাল ঘাটের জেটির উপর বসিয়া তাহার এই কয়টি মাসের কলিকাতার অবস্থান পর্য্যালোচনা করিতে করিতে ভয়ে এবং অনুশোচনায় তাহার হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতেছিল। সেই প্রথমদিন যখন সে তাহার গ্রাম হইতে চলিয়া আসে তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি ঘটনা তাহার এক এক করিয়া মনে পড়িতে লাগিল। তাহার মায়ের সেই জলভরা চোখ; ভবিষ্যতের আশায় সান্ত্বনা পাইবার চেষ্টায় আশীর্ব্বাদভরা তাঁহার শেষ কথাগুলি তাহার কাছে যেন প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল। এমন কি তাহার দিদির সেই মঙ্গলযাত্রার দধির ফোঁটাটি পর্য্যন্ত যেন জীবন্তস্পর্শের মত সে তাহার কপালের উপর অনুভব করিল। উঃ! সে আর মুখ দেখাইবে কি করিয়া? কেনই বা সে কলিকাতায় আসিল? তাহার এক খুড়তুত দাদা "নন-কোঅপারেশন" করিয়া গ্রাম সংস্কারে এবং চাষবাসে লাগিয়াছিল—সে কেন তাহারই সঙ্গে জুটিয়া পড়িল না? তাহা হইলেও ত আর এমনটা ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিত না। ইস্, সে আবার নিজেকে সাধু বলিয়া অহংকার করিয়াছিল! "সাধু! সাধু!" বলিয়া নিজেকে ভ্যাংচাইয়া নিজের গালে ঠাস্ ঠাস্ করিয়া চড় মারিতে লাগিল। ইচ্ছা হইল একটা চাবুক লইয়া নিজেকে ক্রমাগত খানিকটা চাবকাইয়া দেয়। এত বড় নীচ সে, এত

লাড়ুগোপালের কীর্ত্তি

শ্রীজীবনময় রায়

বড় আহাম্মক? ছি ছি ছি! একবার ভাবিল সে যদি এখনি জেঠির উপর হইতে গঙ্গায় ঝাঁপ দেয়, তাহা হইলে আর মুখ দেখাইতে হয় না! বেশ হয়, খুব হয়। এই মুখ নিয়া তাহার আর বাঁচিয়া কি হইবে? সে মরিয়া যাইবে—কোথায় মিলাইয়া যাইবে! আজ এই নির্জ্জনে, সকলের অজ্ঞাতে—তাহার মা' দিদি সকলকে ছাড়িয়া সে চলিয়া যাইবে। আর কাহারও সহিত তাহার দেখা হইবে না। ভাবিতে গিয়া নিজের প্রতি করুণায় তাহার চক্ষে জল আসিল। হায়, তখনও কি তাহার কথা লোকে একটু স্নেহের সহিত ভাবিবে না? আর "সে"? তখনও কি তাহার একটু দয়া হইবে না? আবার অভিমানে তাহার বুকের ভিতরটা উথলিয়া উঠিল। আবার মনে হইল কিন্তু মরিবার পর যদি তাহার অনুশোচনা হয়? তখন কি হইবে? তখন ত আর ফিরিয়া আসিবার উপায় থাকিবে না। হয়ত তাহার আত্মা "তাহার" চারিদিকে নিষ্ফল শোকে ঘুরিয়া মরিবে। না, তাহা সে পারিবে না। সে মরিবে না; বরং গঙ্গার ধারে তাহার জামা জুতা খুলিয়া, যেন জলে ডুবিয়া মরিয়াছে এইভাবে, একেবারে নিরুদ্দেশ হইয়া যাইবে। হয়ত সন্ন্যাসী সাজিয়া আসিয়া একদিন ছদ্মবেশে তাহার মন পরীক্ষা করিবে। হয়ত দেখিবে যে সে পলে পলে অনুতাপে পুড়িয়া মরিতেছে। তারপর একদিন কোন একটা অভাবনীয় বিপদের হাত হইতে তাহাকে উদ্ধার করিতে যাইয়া অকস্মাৎ আত্মপ্রকাশ হইয়া পড়িবে। তারপর—। কিন্তু সে যাহাই হোক এমনি নানা কথা চিন্তা করিতে করিতে রাত আটটা বাজিয়া গেল এবং কল্পনার প্রলেপে তাহার মনও অনেকখানি হাল্কা হাওয়াতে সে অত্যন্ত ক্ষুধা অনুভব করিল। পকেট হাতড়াইয়া দেখিল মাত্র দুইটি পয়সা পকেটে আছে। "তাইত কি করা যায়?" ভাবিতে ভাবিতে জেটি হইতে উঠিয়া সে রাস্তায় আসিয়া পড়িল। এমন সময় একটা চল্‌তি ট্রামের ভিতর হইতে গলা বাড়াইয়া একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাহাকে ডাকিতে লাগিলেন, "ননি, অ ননি!" বেচারা চাহিয়া দেখে সর্ব্বনাশ, তাহার মামা। যেন শুনিতেই পায় নাই এইভাবে সে তাড়াতাড়ি আবার জেটির দিকে রওনা দিল। বৃদ্ধ বিরক্ত হইয়া মনে মনে বলিলেন 'দেখ, ছোঁড়াটা এত রাত্তে ওদিকে কোথায় যায়? ননি, অ মাখন।' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে তিনি ট্রাম হইতে নামিয়া পড়িলেন। মাখন দেখিল আর উপায় নাই—সে আস্তে আস্তে ফিরিল।

"কি রে এত রাতে কোথায় যাস্?"

"আজ্ঞে, মাথাটা বড় ধরেছে, তাই একটু বেড়াতে বেরিয়েছিলুম।"

"তা বেশ করেছ বাপু। মাথার আর অপরাধ কি? দিনরাত টেবিলের কোণে মুখ গুঁজে পড়ে থাকলে কি আর শরীর টেঁকে? তা যাক্, এখন বাড়ী চল। আজ আর পড়াশুনো কোরে কাজ নেই। সকাল সকাল খেয়ে শুয়ে-পোড়ো গে।"

অগত্যা মাখন আর কি করে 'যে আজ্ঞে' বলিয়া শান্ত ছেলেটির মত সুড়সুড় করিয়া মামার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া ট্রামে উঠিয়া বসিল। একবার ভয় হইল বাড়ীতে যদি এতক্ষণ জানাজানি হইয়া গিয়া থাকে? মামা যে এখনও জানেন নাই এটা সে বেশ বুঝিতে পারিল এবং কতকটা নিশ্চিন্ত হইল। ঠিক করিল যে বেশ ভাল করিয়া সকলের ভাবগতিক না বুঝিয়া ভিতরে যাইবে না। এই ভাবিয়া মনে মনে কতকটা স্থির হইয়া সে জানালার বাহিরে মুখ বাহির করিয়া বসিয়া রহিল।

২

নূতন গ্রাম হইতে আসিয়াছে বলিয়া মাখনলাল সহসা কাহারও সহিত আলাপ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিত। কতকটা সেজন্যও বটে এবং পড়াশুনায় মনোযোগ দিতে তাহার প্রতিজ্ঞা অটল রাখিবার উৎকট চেষ্টারও বটে। সে এমন কি বাড়ীর কাহারও সহিত ভাল করিয়া মিশিত না। মামা একটু রাশভারী মানুষ, ছেলেপিলের বাচালতা তিনি পছন্দ করিতেন না। সুতরাং ভাগিনেয়ের প্রতি তিনি অতিমাত্রায় সন্তুষ্ট ছিলেন। পড়াশুনায় তাহার মনোযোগ দেখিয়া তিনি বাড়ীর সকলকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যে, অযথা তাহারা যেন মাখনের পড়াশুনায়

ব্যাঘাত না জন্মায়। মাখন মাত্র খাইবার সময় অন্দর মহলে বার দুই দায়ে পড়িয়া যাইত। নিজের মধ্যে নিজেকে লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া দিনাতিপাত করা তাহার স্বভাবের মধ্যে এমনি বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে নিজের মামার বাড়ীতেও সে সহজ ভাবে বিচরণ করিতে পারিত না। বৈঠকখানা হইতে রান্নাঘর পর্য্যন্ত মাত্র তাহার পরিচয়ের সীমা ছিল। ইহার বাহিরে বোধ করি এ বাড়ীরও ভূ-পরিচয় তাহার অজ্ঞাত ছিল।

ক্লাসের একটি মাত্র ছেলের সহিত সে কথা কহিত। তাহার গুটি দুই অকাট্য কারণ ছিল। প্রথম এই যে, সে শুনিয়াছিল ছেলেটি ম্যাট্রিকে ফার্ষ্ট হইয়াছে; দ্বিতীয় কারণ সে তাহাদের পাড়াতেই থাকিত এবং সময় অসময় বর্গীর হাঙ্গামার মত আসিয়া পড়িয়া তাহার মামার অন্দর বাহির অপ্রতিহত প্রতাপে তোলপাড় করিয়া তুলিত, গায়ে পড়িয়া তাহার সহিত আলাপ করিত; মাঝে মাঝে সন্ধ্যার পর তাহাকে টানিয়া লইয়া বেড়াইতে যাইত এবং অনেকক্ষণ তাহাকে ধরিয়া রাখিয়া, তাহার রুটিনের মিয়াদ ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিত। সুতরাং তাহার প্রতি মনে মনে বিরক্ত হইলেও তাহাকে এড়াইবার উপায় ছিল না। অবশ্য তাহার প্রতি বিরক্তি সম্বন্ধে মাখনকে অপরাধ দেওয়া যায় না। একেত এমন একটা ডানপিটে ছেলে কেন যে ফার্ষ্ট হইল, আর সে-ই বা কেন হইল না, তাহার কোন সঙ্গত কারণ পাওয়া যায় না। তারপর এত হুটপাট ফাজলামি সে কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিত না। সব চেয়ে মুস্কিল এই যে ইহার প্রতীকার করিবার তাহার কোনও হাত ছিল না এবং এই দুরন্ত বালকটিকে বাড়ীর সকলে অযাচিত ভাবে ভালবাসিত। উপযাচক হইয়া এমন ছেলের সহিত হৃদ্যতা করিবে, মাখন সে প্রকৃতির ছেলে ছিল না অথচ ইহাকে যে কেমন করিয়া এড়াইয়া চলিবে সে কিছুতেই তাহা ভাবিয়া পাইত না। শচীনও মাখনের এই অতিশুচিবায়ুগ্রস্ততার বিশেষ কৌতুক অনুভব করিত এবং তাহাকে জ্বালাইতে ছাড়িত না।

হয়ত সকাল বেলা বসিয়া সে রঘুবংশের শ্লোকের বিস্তারয়ুক্ত নোট মুখস্থ করিতেছে এবং চিরাভ্যাসমত আত্মপরীক্ষার জন্য চক্ষু বুজিয়া মুখস্থপাঠের পুনরাবৃত্তি করিতেছে, এমন সময় শচীন পিছন হইতে চুপি চুপি আসিয়া টুক্ করিয়া বইখানি তুলিয়া লইয়া চেয়ারের পিছনে বসিয়া পড়িল। আবৃত্তির একস্থানে ভুলিয়া গিয়া চক্ষু খুলিতেই দেখিল "একি, বই কোথায়!" অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া সে উঠিয়া টেবিলের উপর বই নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল। যখন পাইল না, তখন হতাশ ভাবে যেমন সে বসিতে যাইবে অমনি "বাসুকী-শিরশ্ছিন্ন-বসুধার মত" চেয়ারের পরিবর্ত্তে কাহার যেন ঘাড়ের উপর উল্টিয়া পড়িল। শচীন বলিল "আচ্ছা লোক ত হে! লোকের ঘাড়ে এসে পড়া যেন একটা রোগ; পাশে একখানা চেয়ার রয়েছে দেখ্‌তে পাওনা? মাখন অত্যন্ত অপ্রস্তুত এবং তদধিক বিরক্ত হইয়া তাড়াতাড়ি সামলাইয়া উঠিয়া বলিল "আঃ কী যে কর।"

আবার হয়ত একদিন সন্ধ্যাবেলা পাঠের অবসরে রুটিন মাফিক সে তাহাদের বাটীর সম্মুখের রাস্তায় পায়চারি করিয়া দৈনিক ব্যায়াম-কার্য্য সম্পাদন করিতেছে, এমন সময় শচীন আসিয়া বলিল "ওহে, নিমে যে তোমাকে ডেকেছে।" নিমাইধন চট্টোপাধ্যায় তাহাদের কলেজের ইংরাজির প্রফেসর। ছেলেরা তাঁহাকে নিজেদের মধ্যে "নিমে" "ধাছাধন" প্রভৃতি বলিত। মাখন যে ইহাতে অত্যন্ত পাপস্পর্শ-ভয় ভীত, সংকুচিত ও বিরক্ত হইত, শচীন তাহা জানিত। মাখন মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেও, একজন প্রফেসর ক্লাসের দেড় শত ছেলের ভিতর তাহারই সম্বন্ধে যে বিশেষ করিয়া নজর দিতেছেন ইহা মনে করিয়া মনে মনে অত্যন্ত পুলকিত হইল; এবং কারণ জানিবার জন্য কৌতুহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল 'কেন'?

শচীন বলিল "তুমি Milton-এর যে criticism লিখেছ—সে বলেছে যে তা তোমার নয়—আগাগোড়া চুরি।"

"কক্ষনো না"। "চুরি" এই শব্দ তাহার প্রতি কোন কারণে কেহ ব্যবহার করিতে পারে, এই কথা ভাবিয়া তাহার অভিমানে অত্যন্ত আঘাত লাগিল।

শচীন বলিল "বেশ ত, গেলেই জানতে পারবে"।

সে কথার কোন উত্তর না দিয়া মাখন বলিল "কি বল্লেন? 'চুরি' বলে বলেছেন?"



শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ

শ্রীযুক্ত অলকেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৌজন্যে

জ্যাঁমেল ম্যাডসেন-সাহেব কর্ত্তৃক
কাঠ-কয়লা দ্বারা অঙ্কিত চিত্র হইতে

কার্ত্তিক, ১৩৩৪

শ্রীজীবনময় রায়

"বাবা, অতশত আমি জানি না। তোমায় ডেকেছে, তুমি তার সঙ্গে গিয়ে বোঝা-পড়া করগে।"

"আমি তাঁর বাড়ী চিনি না।"

"আরে বাড়ী ত কলেজের পেছনেই। ঐ যে লাল গণেশওয়ালা বাড়ী, নীচে একটা দোকানঘর! পাশ দিয়ে দরজা। বাছাধন বলেছে যে ৭টা থেকে ৭॥০ পর্য্যন্ত তোমার জন্যে সে বাড়ীতে থাকবে।"

মনে মনে কতকটা ভয় হইলেও একজন প্রফেসর বা কেউ অযথা তাহার সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা যে করিতে পারে ইহা অসহ্য, ইহার একটা প্রতীকার হওয়া আবশ্যক। চিরটা-কাল সে গুড্‌কণ্ডক্টের প্রাইজ পাইয়া আসিল, আর আজ কিনা—। মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া ৭টার সময় একটা ধুতি ও একটি পিরান পরিয়া সে নিমাই বাবুর বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। কলেজের পিছনেই একটি সরু গলির মধ্যে সারি সারি কয়েকখানি ছোট ছোট লাল বাড়ী। সুখনলাল নামধেয় এক মাড়োয়ারী বাড়ীগুলিকে ভাড়া দিবার জন্য তৈয়ার করিয়াছে। প্রত্যেক বাড়ীর দরজার মাথায় একটা করিয়া গণেশ মূর্ত্তি, এবং বাহিরের ঘরগুলি দোকান-ঘররূপে ভাড়া দেওয়া হইয়া থাকে। অনেকক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরিয়া সে কিছুতেই ঠিক করিতে পারিল না যে কোনটা নিমাই বাবুর বাড়ী হওয়া সম্ভব। তখন উপায় না পাইয়া ভাবিল, ডাকিয়া দেখি না কেন, তিনি ত বাড়ীতেই আছেন! এই ভাবিয়া একটা বাড়ীর দরজায় যাইয়া দাঁড়াইল। ভাবিল কি বলিয়া ডাকিবে। অধ্যাপকের নাম ধরিয়া ডাকে কেমন করিয়া। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে ডাকিল "এ বাড়ীতে কে আছেন?" একটি অতি মিষ্ট মেয়েলী গলায় উত্তর আসিল "ভিতরে আসুন"। মাখন বুঝিল যে বাড়ীরই কোনও মেয়ে হইবে। নিমাই বাবু বোধ হয় কোনও কারণে একটু বাহিরে গিয়াছেন। কিন্তু নিমাই বাবু যে তাহাকে মাত্র Class-এ দেখিয়াই তাহার অনন্য-সাধারণ সচ্চরিত্রতা ধরিতে পারিয়াছেন এবং নিঃসঙ্কোচে বাড়ীর একটি মেয়েকে অভ্যর্থনার ভার দিয়াছেন, ইহাতে নিমাই বাবুর প্রতি তাহার অভিমান অনেকটা পাৎলা হইয়া আসিল এবং একটুও ইতস্তত না করিয়া সে ঢুকিয়া পড়িল। কিন্তু একি! এ সে কোথায় আসিল? চকমিলান বাড়ীর বারান্দায় বসিয়া তিন চারটি স্ত্রীলোক আয়না চিরুনী প্রভৃতি সরঞ্জাম লইয়া প্রসাধনে নিযুক্ত, আর তাহাকেই অভ্যর্থনা করিবার জন্য একটা অলঙ্কার বিভূষিতা সুন্দরী হাসিমুখে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে! পল্লীগ্রামের ছেলে হইলেও সে নিতান্ত নির্ব্বোধ ছিল না। কাণ্ডকারখানা দেখিয়া সে ভয়ে, লজ্জায়, দিশাহারা হইয়া একদৌড়ে বাড়ী হইতে একেবারে রাস্তায় যাইয়া পড়িল। তাহার হাত পা ঘামিয়া উঠিয়াছিল, বুক ধড়ফড় করিতেছিল। রাস্তায় পড়িয়াও সে থামিতে পারিল না। অকস্মাৎ এইরূপ দৌড়িয়া পালাইতে দেখিয়া স্ত্রীলোকগুলি যে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়াছিল তাহার মনে হইল সেই হাসি যেন একপাল খেঁকী কুকুরের মত তাহাকে পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাড়া করিয়া লইয়া চলিয়াছে। কয়েক কদম দৌড়াইয়া বেচারা একেবারে এক ভদ্রলোকের ঘাড়ে গিয়া পড়িল। "কে মশায়? চোখের মাথা খেয়েছেন, না মদ খেয়েছেন?" বলিয়া লোকটা তাহার জামা চাপিয়া ধরিল। মাখন আমতা আমতা করিয়া আবার পলায়নের চেষ্টা দেখিতে লাগিল। কিন্তু লোকটা তাহাকে আরও চাপিয়া ধরিয়া বলিল "এই যে লাড়ুগোপাল, কোথায় ঢুকেছিলে চাঁদ?" মাখন দেখিল সে শচীন।

"ছেড়ে দেও, ছেড়ে দেও আমাকে। আমার সঙ্গে কথা বোলোনা। কেন তুমি মিথ্যে ক'রে এমন ক'রে...?" বলিতে বলিতে সে কাঁদিয়া ফেলিল এবং ইহার পর প্রায় একমাস সে শচীনের সঙ্গে কথা কহে নাই।

৩

একদিন, সে দিন শনিবার। মাখনের মাসীমা অসময়ে অর্থাৎ সকাল বেলা মাখনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহার মা দেশ হইতে তাহার গুরুদেবের চরণামৃত ও শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের প্রসাদ পাঠাইয়াছিলেন, মাখন সসঙ্কোচে অন্দর মহলের দিকে অগ্রসর হইল। ভিতরে ঢুকিয়া হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার মাসীমা দাওয়ায় বসিয়া তর-কারী কুটিতেছেন আর তাঁহারই সামনে একটী মেয়ে এক

বোঝা তেঁতুল লইয়া ছাড়াইতে বসিয়াছিল। এইরূপ মেয়ের অস্তিত্ব এ বাড়ীতে তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকায় সে আর অগ্রসর হইতে পারিল না। মেয়েটা পিছন ফিরিয়া বসিয়াছিল—সুতরাং মুখ ঠিক পরিষ্কার দেখা গেল না। অপরিচিতা নারীর প্রতি কুতূহলী নেত্রপাত করা যে একপ্রকার পাপ, এইরূপ একটা ধারণা তাহার অন্তঃকরণে বদ্ধমূল থাকায় সে আর সে দিকে স্বাভাবিক সোজা ভাবে তাকাইতে পারিল না; এবং তাহার কৌতূহল এইরূপে বাধা পাইয়া উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিল। পিছন হইতে যতটা বুঝা যায় তাহাতে মেয়েটিকে সুন্দরী বলিয়াই বোধ হইল; সুতরাং "দেখিব না" এইরূপ সঙ্কল্প করিতে গিয়া বারংবার তাহার দিকে তাকাইয়া ফেলিল। তাহার মনের মধ্যে লজ্জা, সঙ্কোচ, পাপ-ভয় অপিচ, উক্ত মেয়েটিকে ভাল করিয়া দেখিবার ইচ্ছা সব মিলিয়া একটা বিপ্লব বাধাইয়া তুলিল। সে কি করিবে? ফিরিয়া যাইবে কি? কিন্তু ফিরিতে গিয়া যদি শব্দ হয়? তাহা হইলে যে ভারী লজ্জার বিষয় হইবে! কিন্তু ও কে? কখন আসিল? কি সুন্দর। —আবার ভাবিল "ছি! আমি অন্যায় করিতেছি।" এইরূপ সাতপাঁচ ভাবিতেছে এমন সময় তাহার মাসীমা মুখ তুলিয়া চাহিতেই তাহার এই দ্বিধাগ্রস্ত সংকুচিত ভাবখানা তাঁহার চোখে পড়িয়া গেল।

"কিরে মাখন! আয়, লজ্জা কি? যা'ত মা মণি, একখানা আসন এনে পেতে দে।

'মা-মণি' চকিতে একবার পিছন দিকে চাহিয়া দেখিল এবং মাখনের অবস্থাটা বুঝিতে পারিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

তাহাকে দেখিয়া অমন করিয়া পলাইয়া গেল দেখিয়া মাখনের মনে একটু আঘাত লাগিল। সে যে কত সৎ, অন্য পাঁচজনের মত নহে, সে যে স্ত্রীজাতি-মাত্র-সম্পর্কেই কী শ্রদ্ধান্বিত, সে যে ইহারই মধ্যে তাহাকে কী শ্রদ্ধাভরে তাহার মনের পবিত্র স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তাহা তাহাকে কি উপায়ে জানাইয়া দিবে! আচ্ছা, মাসীমা কেন বলিলেন না যে "লজ্জা করিস না মনি, কি মনু, কি মনুয়া, ও যে আমাদের মাখন, বড় ভাল ছেলে।" কেমন সহজেই একটা আপনার মত হইয়া যাইতে পারিত, আর মাখনকেও ঠিক মত চিনিতে পারিত।

যাহাই হউক মাসীমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়া ফিরিবার পথে সে একবার নিরুদ্দিষ্টার উদ্দেশে ঘরের ভিতর চাহিয়া দেখিতেই চমকিয়া উঠিল। সে যাহা দেখিল তাহাতে তাহার সর্ব্বশরীর একেবারে জ্বলিয়া গেল এবং তাহার মনের অনাহত শান্তি চিরদিনের মত বিলুপ্ত হইল। সে দেখিল যে ঘরের জানালার কাছে দাঁড়াইয়া মণি অত্যন্ত বিরক্ত ক্রুদ্ধ ভাবে মাথা ঝাঁকি দিয়া বলিতেছে "না"। এবং জানালার ওপারে গলিতে দাঁড়াইয়া কে যেন চাপা গলায় কি বলিতেছে স্পষ্ট বোঝা যায় না। স্পষ্ট কিছু বোঝা না গেলেও যাহা দেখা গেল তাহাতে মাখনের মনে এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ রহিল না যে মেয়েটি কোন একটি দুর্বৃত্তের কোন গর্হিত প্রস্তাব অত্যন্ত ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিতেছে। এমন সময় মেয়েটি আর একবার ক্রুদ্ধ স্বরে "যাও" বলিয়া চকিতে অন্তঘরে চলিয়া গেল। মাখন দেখিল মেয়েটি আশ্চর্য্য সুন্দরী। ক্রোধের উদ্দীপনায় দীপ্ত মুখখানি সেদিন মাখনের চিত্তের মধ্যে অভূতপূর্ব্ব ভাবরসের সঞ্চার করিল। মেয়েটি সরিয়া যাইতে, যে লোকটা বাহিরে ছিল তাহার প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল, এবং যুগপৎ বিস্ময় ও ক্রোধে তাহার সর্ব্বশরীর একেবারে রি-রি করিয়া উঠিল। বাহিরে যে দাঁড়াইয়াছিল সে আর কেহই নয়—সে শচীন। বটে। এত বড় পাষণ্ড ওটা! ইচ্ছা হইল ছুটিয়া গিয়া ধাঁ করিয়া উহার মুখে একটা ঘুসি বসাইয়া দেয়। কিন্তু সাহসে কুলাইল না; সুতরাং সে ধীরে ধীরে বৈঠকখানায় ফিরিয়া গেল।

সেদিন আর তাহার পড়াশুনা হইল না। নানারূপ চিন্তা আসিয়া তাহার ক্ষুব্ধ চিত্তকে বিধ্বস্ত করিয়া তুলিল। আহা, না জানি মেয়েটিকে শচীন কী পরিমাণ উত্যক্ত করিয়া তাহার জীবন একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে! হয়ত এমনি করিয়া অসহ্য হইলে মেয়েটি একদিন আত্মহত্যাও করিয়া বসিতে পারে। ওঃ তখন সে কি করিবে? কোথায় যাইবে? কেমন করিয়া বাঁচাইবে? শচীনের উপর নিশ্চয় সে ইহার প্রতিশোধ লইবে। উঃ, কি ভয়ানক

শ্রীজীবনময় রায়

ছেলে শচীন্‌! "সাবধান শচীন, সাবধান" বলিয়া সে মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ করিয়া, দাঁতে দাঁত চাপিয়া, চোখ পাকাইয়া অনুপস্থিত শচীনের প্রতি কল্পনায় মারমুখী হইয়া উঠিল। সেদিন আর তাহার স্নান করা হইল না। কোন রকমে দুটো মুখে গুঁজিয়া পিত্ত রক্ষা করিয়া সে কলেজ-অভিমুখে রওনা হইল। কিন্তু মনের এইরূপ সংক্ষুব্ধ অবস্থা লইয়া তাহার আর কলেজ যাওয়া হইল না। গোলদীঘির ধারে, একটা গাছের তলায় বসিয়া বর্ত্তমান সমস্যা ও তৎপ্রতি তাহার জীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। কি উপায় করা যায়? বিপন্ন অবলাকে দুর্বৃত্তের কবল হইতে রক্ষা করা সম্পর্কে ইংরাজি উপন্যাসে যাহা পড়িয়াছে ও বাংলায় যে সকল গল্প শুনিয়াছে, (কারণ বাংলা উপন্যাস চরিত্রনাশক বলিয়া সে পড়ে নাই) তাহার সকলগুলি পন্থাই একে একে আলোচনা করায় কোনটাই কেমন যেন কার্য্যকরী বলিয়া বোধ হইল না। অবশেষে এ সব চিন্তা ছাড়িয়া দিয়া ঠিক করিল, মামাকে গিয়া সব বলিয়া দিবে। কিন্তু স্কুলে যাঁহাদের নিকট সন্দেশস্বরূপ কার্য্য করা তাহার অভ্যাস ছিল, তাহাদের সহিত মামার চরিত্রের একটু তফাৎ ছিল; সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত সে সংকল্প ত্যাগ করিতে হইল—তাহার সাহসে কুলাইল না। একবার ভাবিল গোপনে কোনও প্রকারে "মণির" সহিত দেখা করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা ও অভয় দান করে। কিন্তু কি করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিবে অনেক চিন্তা করিয়াও তাহা ঠাওর করিতে পারিল না। অবশেষে আর কিছু না পাইয়া তাহার নোটের খাতা বাহির করিয়া সে দুইখানি পত্র লিখিয়া ফেলিল। প্রথম খানি লিখিল তাহার মাতুলকে।

শ্রীশ্রীচরণ কমলে প্রণাম শত সহস্র কোটি নিবেদন মিদং—

অদ্য একটী দারুণ দুঃসংবাদ আপনার শ্রীচরণে নিবেদন করিতেছি। লজ্জাবশতঃ মৌখিক নিবেদন অসম্ভব হইল। শচীন্দ্রনাথ আমাদের অন্দরে বাহিরে অব্যাহতভাবে যাতায়াত করে। তাহার চরিত্র ও মৎলব ভাল নহে। আপনকার বাটিতে যে সুন্দরী সরলা বালিকাটি অধুনা অবস্থিতি করিতেছেন তাহাকে অসহায় পাইয়া স্বীয় অভিলাষ চরিতার্থ করিবার চেষ্টায় বালিকাটির জীবন ঘোর দুঃখময় করিয়া তুলিয়াছে। জ্ঞাতার্থ নিবেদন ইতি—

সেবকাধম শ্রীমাখনলাল ঘোষ দাস।

দ্বিতীয়খানি এইরূপ :—

অপরিচিতাসু,

শচীন আপনার প্রতি পশুর মত ব্যবহার করিয়া আপনার পুষ্পের ন্যায় পবিত্র জীবনকে যে দুর্ব্বহ করিয়া তুলিয়াছে তাহা জানিতে পারিয়া তাহার প্রতিবিধানের উপায় করিতেছি। দুর্বৃত্তকে শীঘ্রই ইহার ফলভোগ করিতে হইবে। আপনি নিশ্চিন্ত হোন। আজ প্রাতে বড় ঘরের জানালার কাছে যে দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, তাহাতে আমার ক্রোধ সংবরণ করা দুরূহ হইয়া উঠিয়াছিল। কেবল আপনারই লোকাপবাদের ভয়ে দুর্বৃত্তকে তখনই সমুচিত দণ্ডবিধান করিতে বিরত ছিলাম। পত্র পাঠ আপনার মানসিক অবস্থা আমাকে জানাইলে আপনার সামান্য উপকারের জন্য আমি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হইব না।

ইতি—সহধর্ম্মী শ্রীমাখনলাল ঘোষ।

পত্র দুইখানি লেখা হইলে সে সেখান হইতে উঠিয়া বাড়ীর দিকে রওনা হইল। কলেজ কামাই করিয়াও জীবনে সর্ব্ব প্রথম সে আত্মতৃপ্তি অনুভব করিল। যাহা হউক এখন চিঠি দু'খানা দিবার কি উপায় করা যায়? মামার চিঠিখানা সে কোন প্রকারে মামার নিকট পৌঁছাইয়া দিতে পারিবে। কিন্তু অপর খানি সম্বন্ধে কি উপায় করিবে? ডাকে ত আর দিতে পারে না? একে ত "মণির" ভাল নাম সে জানে না, তাহার পর আবার ডাকে দিলে যদি অপর কেহ খোলে তবেই সর্ব্বনাশ। যাহা হউক একটা সুযোগ খুঁজিয়া নিজেই সে চিঠিটা হাতে হাতে দিবে এইরূপ স্থির করিল। এইরূপ ঠিক করিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া সে ৫টার পর আজ একবার গড়ের মাঠে বেড়াইতে গেল। ইচ্ছা, মনুমেন্টের তলে বসিয়া নির্জ্জনে একটু "চিন্তা" করে।

৪

আসল ব্যাপারটা এই :—

শচীনের বাবা অতি কৃতবিদ্য লোক। হাইকোর্টের উকিল, খুব পসার না হইলেও তাঁহার সংসার বেশ স্বচ্ছল। পাঠ্যাবস্থায় পুত্রের বিবাহ দেওয়া তাঁহার মতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ হইলেও, পুত্র কন্যাদির বিবাহ, পূজা পার্ব্বন প্রভৃতি পারিবারিক ব্যাপারে তাঁহার মায়ের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটী করিবার যো ছিল না। সর্ব্ব প্রকার সংস্কার-চেষ্টাকে তিনি ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। প্রথম যৌবনে তিনি মায়ের অজ্ঞাতে একবার ব্রাহ্মসমাজে ১১ই মাঘের উপাসনায় গিয়াছিলেন। রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া শুনিলেন যে তাঁহার মাতা উক্ত ব্যাপারের সন্ধান পাইয়া একমাত্র হরিনামের ঝুলি ও বৃদ্ধ ভৃত্য যুধিষ্ঠিরকে সম্বল করিয়া পাঞ্জাবমেলে কাশী রওয়ানা হইয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় যাওয়া এবং খৃষ্টান হওয়া ত একই কথা। এ-হেন মায়ের দাপটে সন্ত্রস্ত হইয়া স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণী পার না হইতেই উপহাস-পরায়ণ বন্ধুজনের গঞ্জনা পরিপাক করিয়া ১৬ বৎসর বয়সেই তিনি শ্রীমান শচীন্দ্রনাথকে পাত্রী-স্থ করিতে বাধ্য হন। তবে কন্যার অনন্যসাধারণ রূপৈশ্বর্য্য যে তাঁহার প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ-জনিত পাপাচরণের জন্য বহুল পরিমাণেই দায়ী এমন কথাও বিবাহ-সভায় বধূকে চাক্ষুষ যাঁহারা দেখিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকেই সন্দেহ করিয়াছিলেন। মাখনের মামীমা, গ্রামসম্পর্কে মণিমালার মাসী হইতেন এবং এই বিবাহ-সংঘটন ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ছিলেন না। সুতরাং ম্যাট্রিকুলেশনের সংবাদ বাহির হইবার পর বধূ যখন প্রথম শ্বশ্রুগৃহে আসিল তখন গ্রামসম্পর্কে হইলেও এই মাসীর বাড়ীই তাহার প্রথম শ্বশ্রুগৃহবাসজনিত অবরোধ হইতে বাহিরে আসিয়া হাঁপ্ ছাড়িবার একমাত্র নিরাময় স্থান ছিল। ঠাকু'মা প্রায় মাস ছয়েক হইল গঙ্গা লাভ করিয়াছিলেন সুতরাং খিড়কীর দরজা দিয়া সময় অসময়ে মামীর বাড়ী আসার যে প্রধান বাধা জন্মিবার সম্ভাবনা, তাহা আর ছিল না; এবং খিড়কীর দরজার কুলুপগুলি ইতিপূর্ব্বে অভদ্র রকমের শব্দ করিত বলিয়া শচীন সযত্নে সকলের অজ্ঞাতে সেগুলি তৈলাক্ত করিয়া আগম ও নির্গমের পথ সুগম করিয়া তুলিয়াছিল। শরৎ আকাশের রৌদ্র ও ছায়ার লীলাচঞ্চল আলো-আঁধারের মত এই দুইটী কিশোর-কিশোরীর প্রথম প্রণয়োচ্ছ্বসিত চিত্তাকাশে আড়ি ও ভাবের পালা পর্য্যায়ক্রমে চলিত এবং তাহারই কোন একটি অভিনব অভিনয়ের শুভ-মুহূর্ত্তে সেই ঘরের জানালায় শচীন তাহার লাঞ্ছিতাভিমান বাঞ্ছিতা সুন্দরীকে দুর্বৃত্ত-কর্ত্তৃক উত্যক্ত প্রপীড়িত ও বিপদগ্রস্ত অবস্থায় দেখিতে পাইয়াছিল এবং তাহার অক্ষুব্ধ-পূর্ব্ব চিত্তে বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছিল।

৫

কলেজের ছুটীর পর বাড়ী ফিরিয়া শচীন ভাবিল যাই, একবার দেখিয়া আসি লাড়ুগোপাল আজ কলেজ যায় নাই কেন? এই ভাবিয়া সে নবলব্ধ কেমিষ্ট্রির নোটখানা হাতে করিয়া মাখনদের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু এ কি! লাড়ুগোপাল আজ কোথায়? রাস্তায়ও পায়চারী করিতেছে না, ঘরেও নাই, অথচ কলেজ গেল না।—ব্যাপার কি? ভাবিল খানিক ক্ষণ অপেক্ষা করিয়া দেখিবে, এই ভাবিয়া সে টেবিলে যাইয়া বসিল এবং নূতন নোটগুলি টুকিয়া দিবে বলিয়া মাখনের কেমিষ্ট্রির খাতাখানি খুলিল। খুলিয়াই দেখিল শ্রীশ্রীচরণ কমলে ইত্যাদি। অল্পক্ষণের মধ্যেই চিঠি দু'খানা পড়িয়া তাহার ব্যাপারটা বুঝিতে বাকী রহিল না। তাহার ভারি মজা বোধ হইল। সে হাসিয়া মনে মনে বলিল "আচ্ছা রোসো, তোমার কবিত্ব বের করছি"। এই বলিয়া সে তাড়াতাড়ি চিঠি দু'খানা নকল করিয়া লইয়া, নোটের খাতাখানি যথাস্থানে রাখিয়া এবং বাড়ী গিয়া একেবারে নিজের ঘরে ঢুকিয়াই বিছানার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া উচ্ছ্বসিত হাসির আবেগে কম্পমান হইতে লাগিল। মণি বলিল "ও আবার কি?" সিদ্ধি খেয়েছ নাকি? শচীন বলিল, বাবারে! একটু পেলে খাই নইলে আর সামলাতে পারছি নে—হায় হায়, আমার কি হবে গো! বলিয়া চিঠি দু'খানা তাহাকে পড়িতে দিয়া

শ্রীজীবনময় রায়

আবার হাসিতে লাগিল। হাসির বেগ কতকটা সংযত করিয়া সব কথা খোলসা করিয়া বলাতে মণি খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল "ম্যাগো, কি ঘেন্না! ছিঃ"।

৬

দু'তিন দিন পরে মাখন যখন কিছুতেই চিঠি দু'খানা তাহাদের ঠিকানায় পৌঁছাইয়া দিবার কোনও উপায় করিতে না পারিয়া প্রায় হতাশ হইয়া পড়িয়াছে তখন একদিন কলেজ হইতে ফিরিবার পথে একটি অপরিচিত ছোট্ট ছেলে তাহার হাতে একটুক্‌রা কাগজ দিয়া গেল। তাহাতে লেখা আছে—"তেতলার ছাদ।
১২টা। মি।"

এই কয়দিন ধরিয়া মেয়েটিকে অত্যাচার হইতে উদ্ধার করিবার সম্ভব ও অসম্ভব নানা প্রকার উপায় কল্পনা করিতে করিতে সে উহার মধ্যে এতই ডুবিয়া গিয়াছিল যে অপরিচিতা বালিকার নিকট হইতে অকস্মাৎ এইরূপ নিশাভিসার নিমন্ত্রণ-পত্র প্রাপ্তি যে একটা অসম্ভব ব্যাপার হইতেও পারে এ সম্বন্ধে তাহার মনে একবার প্রশ্ন উঠিল না। বরং নিজের চরিত্র ও সাধুতা সম্বন্ধে নিজের প্রতি তাহার অসম্ভব বিশ্বাস থাকাতে মেয়েটির পক্ষে এই পত্র তাহাকে লেখা স্বাভাবিকই বলিয়া মনে হইল। আর কাহার কাছেই বা যাইবে? সংসারে সহসা কাহাকেই বা বিশ্বাস করা যায়? চলিতে চলিতে চিঠিখানা সে তিনচার বার পড়িল এবং পড়িতে পড়িতে সে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। উঃ! কি না জানি বিপদে পড়িয়াছে। ভাবিতে ভাবিতে মেয়েটির দুঃখ কল্পনা করিয়া তাহার চক্ষে জল আসিল, এবং পকেটে পুরিবার পূর্ব্বে অত্যন্ত সমাদরে ও সসঙ্কোচে সে মি' এই অক্ষরটি সই করিয়া তাহার উপর একটি চুম্বন করিল। এমন সময় তাহার পিঠে একটা চাপড় মারিয়া শচীন একটা বিশ্রী হাসি হাসিয়া বলিল "এই যে বাবাজী। ওটা কি হে? হাঃ হাঃ হাঃ মিস্ ডিসুজার ভলবির নাকি?" মিস্ ডিসুজা মেডিকেল কলেজের একটী পার্শী নার্স। তাহার অদ্ভুত সৌন্দর্য্যের খ্যাতি তখন ছেলে মহলে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। একজন হাউস সার্জ্জনের সঙ্গে একটি Student এর, তাহাকে লইয়া নাকি মারামারি পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। কলিকাতার Student মহল তাহার সহিত যেন একযোগে প্রেমে পড়িয়াছে। ইহারই মধ্যে তাহাকে লইয়া এত প্রকার অদ্ভুত romantic ঘটনাবলীর সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে যে সাবিত্রী এবং পিয়ারী বাইজী প্রভৃতিকেও তাহা মহানুভবতা, সতীত্বের তেজ-প্রভৃতি বাইজীসুলভ গুণে লজ্জা দিতে পারে। মাখন হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া কাগজখানা চট্ করিয়া পকেটে পুরিল। মনে মনে শচীনের কথাগুলি আলোচনা করিয়া দেখিল যে শচীন জিনিষটা ঠিক্ দেখিতে পায় নাই, সুতরাং একদিকে সে যেমন নিশ্চিন্ত হইল অন্যদিকে তেমনি তাহার সম্বন্ধে এইরূপ কুৎসিত কথা ভাবার দরুণ একটা দারুণ নৈতিক-ঘৃণায় সে জলিয়া উঠিল; এবং তেজের সঙ্গে বলিল "আমার সঙ্গে তুমি কথা ব'লবে না। সংসারে সকলকেই নিজের মত আলো-য়ার মনে কোরো না"। শচীন আবার বলিল "হাঃ! হাঃ! সকলকেই নিজের মত ভাবলে, সংসারে তোমার মতোটির স্থান কি ক'রে হবে? হাঃ হাঃ, চিন্তা কোরো না হে, সংসারের বৈচিত্র্যে আমি অবিশ্বাস করি নে।" বলিয়া অযথা নিজেই আবার হাঃ হাঃ করিয়া হাসিতে লাগিল। মাখন এই মুখ-ভ্যাঙ্গানোর মতো হাসিতে উত্তরোত্তর এত চটিতেছিল যে আর তাহার কোন কথা বলা সম্ভব হইল না। শচীন অত্যন্ত 'গায়ে মাখামাখি' ভাবে তাহার কাঁধে হাত দিতেই সে এক ঝটকায় সরিয়া "ছুঁয়ো না আমাকে ব'লছি" বলিয়া একেবারে উল্টো মুখো হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল। সেই দিন রাত ১২টার সময় সকলে ঘুমাইলে একখানি চিঠি হাতে করিয়া সে অন্ধকারে ধীরে ধীরে ছাদের উপর গেল। আলিসার কাছে আগাগোড়া কম্বল মুড়ি দিয়া একজন বসিয়া ছিল। নিকটে যাইতেই সে ঠোঁটে আঙ্গুলি দিয়া তাহাকে নিঃশব্দে থাকিতে ইঙ্গিত করিল এবং তাহার হাতে একখানি পত্র দিয়া তাহাকে চলিয়া যাইতে ইসারা করিল। মাখন দেখিল যে তাহার চিঠিখানি দিবার এমন সুযোগটা বুঝি

হাতছাড়া হইয়া যায়। সে তাড়াতাড়ি নিজের চিঠিখানি লইয়া মূর্ত্তিটির গায়ের উপর ছুড়িয়া দিল। একটি কথা কহিবার জন্ম মনটা তাহার ছটফট্ করিতে থাকিলেও অনেক ভাবিয়া সে নিজেকে সংযত করিয়া অন্ধকারে পা টিপিয়া টিপিয়া আবার বৈঠকখানায় নামিয়া গেল। উদ্বেগ ও উত্তেজনায় তাহার বুক ধড়াস ধড়াস করিতেছিল। ক্ষণকালের জন্ম একবার মনে হইল যে কাজটা বোধহয় গর্হিত হইতেছে। কিন্তু তখনই 'বিপদগ্রস্ত অবলা' এবং 'নিজের চরিত্রবলের' কথা ভাবিয়া সে চিন্তা সে মন হইতে দূর করিয়া দিল। অন্তের চিত্তে ইহাতে কলুষ স্পর্শ করিতে পারে বটে কিন্তু সে কি অন্তের মত? সে ধীরে ধীরে বাতি জ্বালাইয়া চিঠির ভাঁজ খুলিল। পূর্ব্বদিনকার সেই হাতের লেখা—

"হায়, উৎসবের বেশে আমার মরণ ঘনাইয়াছে। নিজের সুবিধার জন্তে শচীন আমাকে তাহার প্রাণের বন্ধুর সহিত—আর কি লিখিব। বিদায় বন্ধু বিদায়। কাল, বেলা ছুইটা। দক্ষিণের গলির জানালায়—শেষবার।"

মাখন আর নিজেকে সামলাইতে পারিল না। উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িয়া, চিঠির উপর মুখ রাখিয়া সে বলিতে লাগিল "মণি, মণি, আমার মণি! কি ক'রে তোমাকে বাঁচাব? হে ঠাকুর, আমায় উপায় করে দাও। আমি এই ভয়ঙ্কর হিংস্রতার কবল থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যেখানে হোক চলে যাব। মণি! আমি থাকতে কেউ তোমায় কেশাগ্রও ছুঁতে পারবে না।" হঠাৎ তাহার মনে হইল জানালার ধারে কাহার যেন চাপা কান্নার খুক্‌খুক শব্দ শোনা গেল। উঠিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল; অন্ধকারে কিছুই ঠাহর করিতে পারিল না। ভাবিয়া দেখিল তাহাকে না পাইলে এই অনতিস্ফুট পারিজাত নরপিশাচের কলুষরুক্ষ পীড়নে অকালেই ঝরিয়া পড়িবে। মণির জীবন ব্যর্থ হইয়া যাইবে। কি অধিকার আছে তাহার এমনি করিয়া একটা অমূল্য পবিত্র জীবন ব্যর্থ হইতে দিবার? সে কি এত বড় পাষণ্ড কাপুরুষ যে, শেষে শচীনের বাসনা চরিতার্থ করিবার পথে সে ঐ অসহায় সরলা বালিকাকে বিসর্জ্জন দিবে? শচীন!—যে কাপুরুষ ফন্দী করিয়া—নাঃ, কখনই না। শচীন তাহার কে? কি অধিকার আছে তাহার? এত বড় নীচ যে—সাবধান শচীন,—নহিলে জানিও তোমার আয়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে। উত্তেজনায় মাথায় শেষের কথাগুলি সে একটু জোরেই বলিয়া ফেলিল। হঠাৎ আবার জানালার কাছে সেইরূপ খুক্‌খুক শব্দ। এবার যেন মনে হইল দু'জন। যেন ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা কহিল। মাখন ভাবিল দুঃখ কি কেহ একলা সহ্য করিতে পারে—নিশ্চয়ই তাহার কোন সঙ্গীও সঙ্গে আছে। এবার সে উঠিল না—জানালার অন্তরাল-বর্ত্তিনীর গোচর করিয়া সে একটা বুক ভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িল।

পরদিন ভোরবেলা উঠিয়া সে গঙ্গাস্নান করিতে গেল, এবং চিৎপুরের মোড় হইতে পূর্ব্ব রাত্রির জলে ভিজানো একছড়া মালা কলাপাতায় মুড়িয়া লইয়া আসিল। পাছে লোকে বুঝিতে পারে এই ভয়ে তাহার উপর ভিজে কাপড় ও গামছা জড়াইয়া লইয়া গিয়া তাহার টেবিলের তলে রাখিয়া দিল। রুটিনে সেদিন ৪টা পর্য্যন্ত ক্লাস থাকিলেও সে ১টার পর কলেজ হইতে চলিয়া আসিল। আসিবার সময় দেখিল শচীন কলেজের বড় সিঁড়িটার নীচে দাঁড়াইয়া অত্যন্ত ভাল মানুষের মত একজন প্রফেসরের সহিত আলাপ করিতেছে। তাহাকে দেখিয়াই মাখনের পিত্ত শুদ্ধ জ্বলিয়া উঠিল। সে যে কি তাহা ত আর মাখনের জানিতে বাকী নাই। শচীন তাহার দিকে চাহিয়া একটু হাসিতেই সে দারুণ ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

বৈঠকখানায় ঢুকিয়া আজ ঘরের এই দ্বিপ্রহরের স্তব্ধতাটি তাহার ভারি মনোরম বোধ হইল। সে বেশ অনুভব করিল যে তাহার জীবনের আজ একটি বিশেষ দিন। আজ নিজেকে সে ব্যক্ত করিয়া উৎসর্গ করিবে। অন্তরে অন্তরে বিনিময় ত হইয়াই গিয়াছে—আজ আবরণ ঘুচাইয়া বরণ করিবার পালা আসিল। একটা কথা মনে করিয়া তাহার হাসি পাইল। সেকালের স্বয়ংবরা কন্তা মাল্য লইয়া বরকে বরণ করিত; আর আজ—? সে

শ্রীজীবনময় রায়

যাহাই হউক, সময় অধিক ক্ষণ ছিল না। সে তাহার প্যাঁটারী হইতে আরনা ও কাঁকুই বাহির করিয়া (বিলাস দ্রব্য সে কখনও বাহিরে রাখিত না—পাছে লোকে ভুল বোঝে) আজ প্রথম সে ঈষৎ সি থি কাটিল এবং ভিজা গামছা দিয়া মুখখানি বেশ করিয়া মুছিল, তাহার পর ভাবিল যে শুধু মালা দিলে কেমন যেন খাপছাড়া স্তাড়া স্তাড়া বোধ হয়! কবিতা লেখা তাহার একটু একটু অভ্যাস ছিল। স্কুলে থাকিতে "বিবেক ও আত্মপরীক্ষা" শীর্ষক একটি কবিতা লিখিয়া তাহাদের স্কুলের নীতিশিক্ষক ধনেশ বাবুর নিকট হইতে আমূল সংশোধন করাইয়া লইয়া, তর্ক সভায় পাঠ করিয়াছিল। সে একখানি কাগজ লইয়া লিখিল—

মণি, আমার মণি, ওগো আমার মণিমালা
পর আজি গলায় তব আমার বরণ মালা।

পড়িয়া দেখিল বেশ হইয়াছে, তবে মালা'র সঙ্গে মালা একটু যেন—। তখনই মনে হইল ইহাকে 'অন্ত যমক' বলে। এই কথা মনে হইতেই সে খুসী হইয়া উঠিল। অন্ত-যমক কিনা অবশেষে মিলন। 'মিলন' শব্দটি মনে আসিয়াই একটু সলজ্জ হাসি তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল। এমন সময় বড় ঘড়িটাতে টং টং করিয়া দুইটা বাজিয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া কবিতা ও মালা লইয়া গলির ভিতর যাইয়া উত্তীর্ণ হইল, এবং কি বলিয়া এই কবিতা ও মালা নিবেদন করিবে মনে মনে তাহারই মোহাড়া দিতে দিতে তীর্থ-বাতায়নাভিমুখে অগ্রসর হইল। জানালার নীচে গিয়া দাঁড়াইতেই একটা পিঁয়াজী রংএর শাড়ীর একটা কোণ সে দেখিতে পাইল। তাহার বুকের ভিতর দুরুদুরু করিতে লাগিল। যদি কেহ দেখিয়া ফেলে এই ভয়ে এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে সে আস্তে আস্তে প্রথমে পকেট হইতে কবিতার কাগজখানি বাহির করিয়া জানালার চৌকাঠের উপর রাখিল। তাহার পর ধীরে ধীরে মালাটির আবেষ্টন মোচন করিয়া, পদাঙ্গুলির উপর ডিঙি মারিয়া দুই হাতে উহা তুলিয়া ধরিল এবং গলার সুর আবেশে গাঢ় করিয়া বলিতে লাগিল "আমার প্রাণের—" আর বলিতে হইল না। সহসা মালাখানি তাহার হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া একখানি শালপ্রাংশু হস্ত তাহার মুখের উপর মালাখানিকে সবেগে ছুঁড়িয়া মারিল এবং চাপা গলায় দাঁত চাপিয়া বলিল "ন্যাকা বজ্জাৎ"। সুরটা ঠিক "মধুমত্ত মধুকরে"র মত মিঠে বোধ হইল না। তথাপি তাহাতে বিষের জ্বালাও কম ছিল না। মন্দারমালার আঘাতে ইন্দুমতী মূর্চ্ছা গিয়াছিল। চিৎপুরের মোড়ে মালার ঘা'ও বড় কম নয়। বেচারার চোখের সামনে, মুরগির চোখের মত, দিনের আলোর যেন চোখ উল্টাইয়া গেল এবং একরাশ তারার ফুলঝুরি চিক্‌মিক্‌ করিয়া উঠিল। অকস্মাৎ ঘা খাইয়া মিনিটখানেক সে কেমন হতবুদ্ধি হইয়া গেল; কিন্তু পর-মুহূর্ত্তেই একটা অনাগত বিভীষিকা আতঙ্কের মত তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ধরিল। ভয়ে, দুঃখে, লজ্জায় সে একছুটে আপনার বৈঠকখানা ঘরে গিয়া ঢুকিল। কিন্তু সেখানেও থাকিতে সাহস হইল না—ভয় হইল যদি সে এখনি তাহার দুঃসাহসের কথা গিয়া সকলকে বলিয়া দেয়? মামা যদি একথা জানিতে পারেন? যদি তাহাকে আজই বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেন? উঃ সে আর ভাবিতে পারিল না। সেখান হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া একেবারে সে ইডেন গার্ডেনের একটা নির্জ্জন জায়গায় গিয়া হাজির হইল। দুষ্কর্ম্মের জন্ত অনুতাপে তাহার অন্তঃকরণ দগ্ধ হইতেছিল—দুর্নামের ভয়ে? তাহার এতদিনের সযত্নে উপার্জ্জিত সুনাম! স্কুলে থাকিতে একদল ছেলে তাহাকে "মিট্‌মিটে ডাইন" বলিয়া ডাকিত; তাহার মনে হইল তাহারা যেন আজ পরস্পরে চোখ মটকাইয়া, মুচ্‌কি হাসিয়া তাহাকে ঘেরিয়া নৃত্য করিতেছে। সব চেয়ে বিশ্রী শচীনের সেই পিত্তজ্বালাকর হাসি "হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ—"। সে আর স্থির হইয়া বসিতে পারিল না। ঘুরিতে ঘুরিতে অপরাহ্নের দিকে শ্রান্ত হইয়া সে চাঁদপাল ঘাটে যাইয়া বসিল।

৭

চাঁদপাল ঘাট হইতে মামার সহিত গুটি গুটি বাড়ী ফিরিয়া সে একেবারে যাইয়া বিছানায় ঢুকিল। চাকরকে দিয়া বলিয়া পাঠাইল যে তাহার ক্ষুধা নাই, আজ সে খাইবে না। ঠিক করিল যে মামা ভিতরে যাইলে দোকান হইতে কিছু কিনিয়া খাইবে।

সমস্ত রাত তাহার দুশ্চিন্তা এবং দুঃস্বপ্নে অতিবাহিত হইল। একবার দেখিল তাহার মামা তাহাকে ঘাড়ধাক্কা দিতে দিতে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিতেছেন এবং শচীন মৃণালিনীর হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছে। ক্রোধে তাহার ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠিল। কাছেই একটা থান ইট পড়িয়াছিল। সেইটা তুলিয়া সে যেই ছুঁড়িয়া মারিতে যাইবে অমনি হটাৎ পা হড়কাইয়া পড়িয়া গেল। আর একবার দেখিল পুলিশে তাহার হাতে হাতকড়ি দিয়া বাঁধিয়া কোড়া মারিতে মারিতে লইয়া চলিয়াছে। বলিতেছে যে সে মৃণালিনীর বালা চুরি করিয়াছে এবং বাহির করিয়া না দিলে শচীনের বাড়ীর দরজায় নাকে শিকলী দিয়া বাঁধিয়া রাখা হইবে। এইরূপ কত রকম বীভৎস স্বপ্ন যে দেখিল তাহার সংখ্যা নাই। এক সময় জাগিয়া সে ভাবিল এইবার উঠিয়া চুপি চুপি পলাইয়া যায়। কিন্তু অত রাত্রে কলিকাতার সহরে সে কোথায় যাইবে? হয়ত বা পুলিশের হাতেই পড়িতে হইবে। সন্ত-দৃষ্ট স্বপ্নের স্মৃতি তাহার মনে জাগিতেই সে শিহরিয়া উঠিল। অনেক ভাবিয়া দেখিল, কিছুতেই কিছু উপায় করিতে পারিল না। তখন ঠিক করিল নাঃ, আত্মহত্যাই করিবে—কাল রাত্রে তাহাকে আর কেহ ইহজগতে জীবিত দেখিতে পাইবে না। আজ রাত্রেই করিতে পারিত, কিন্তু হাতের কাছে সহজ উপায় না থাকায় কালকের জন্তই অনুষ্ঠানটা মুলতবী রাখিল। আত্মহত্যা করিবে এইরূপ স্থির করিতেই তাহার মন হইতে অনেকখানি ভার মোচন হইয়া সে নিজেকে অত্যন্ত হাল্কা অনুভব করিল এবং তখন পৃথিবীর তাবৎ নিন্দুক ও সন্দেহকারীদের নিষ্ফল ষড়যন্ত্র পৃথিবীর পঙ্কিলতার মধ্যে কোন্ নিয়ে পড়িয়া রহিবে এই কথা ভাবিয়া ইতিমধ্যেই নিজেকে তাহাদের অপেক্ষা অনেক খানি উর্দ্ধে অনুভব করিয়া যেন একটা নির্লিপ্ত ঔদাসীন্তে মনে মনে এই মর্ত্ত্যলোকের প্রতি নেত্রপাত করিয়া দেখিল।

সকাল বেলা তাহার ঘুম ভাঙিতে বিলম্ব হইল। সে দিন রথের ছুটি, কলেজের তাড়া ছিল না। আর তাহার আর কলেজই বা কি? সে আস্তে আস্তে গিয়া তাহার টেবিলের ধারে বসিল। তাহার পর বেশ গুছাইয়া তিনখানি পত্র লিখিল। প্রথমখানি তাহার মাকে, দ্বিতীয়খানি মাতুলকে এবং তৃতীয়খানি মৃণালিনীকে। তিনখানিরই উদ্দেশ্য এক। প্রত্যক্ষ প্রমাণই যে জগতে সত্য উদ্‌ঘাটনের একমাত্র সহায় নয় এবং কোন একটি রহস্যময় অবর্ণনীয় গূঢ় ষড়যন্ত্রজালের ক্রীড়নক হইয়াই যে আজ তাহার আচরণ তাহার নামে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে এবং তাহার অপাপস্পৃষ্ট চিত্তে যে লোকাপবাদের তীব্র কষাঘাত করিতে পারিবে না বলিয়াই কেবল মৃত্যুর আশ্রয় গ্রহণ করিল—এইগুলিই ছিল তাহার প্রতিপাদ্য বিষয়। মৃত্যুর পরে, যখন তাহাকে আর জেরা করেবার উপায় রহিবে না, তখন এই কয়খানি পত্রই যেন লোকাপদের বিরুদ্ধে তাহার চরিত্রের নির্ম্মলতা সপ্রমাণ করিয়া দেয়।

চাকর আসিয়া জানাইল যে তাহাদের আজ 'ও বাড়ী'তে নিমন্ত্রণ, তাহার মামীমা সকাল বেলাই সেখানে চলিয়া গিয়াছেন এবং বলিয়া গিয়াছেন যে ঠিক সময় স্নান করিয়া সে যেন তাহার মামার সঙ্গে খাইতে যায়। 'নিমন্ত্রণ' শুনিয়া তাহার মুখে ভারী একটা নিষ্কাম কৌতুকের হাসি ফুটিয়া উঠিল। আজও আবার নিমন্ত্রণ! কাল এতক্ষণ আমি কোথায়? 'কোথায়' এই কথা মনে হইতেই তাহার মনটা উদাসীন অন্তমনস্কতার মধ্যে উধাও হইয়া গেল। 'ও-বাড়ী' বলিতে কোন্ বাড়ী বুঝায় তাহা তাহার জানা ছিল না। সুতরাং যথা-সময়ে সে স্নান সারিয়া মামার সহিত বাহির হইয়া পড়িল।

বাড়ী পাশাপাশি এবং খিড়্কীর দরজা সামনা সামনি হইলেও দুইটা বাড়ীর সদর দরজা দুইটা বিভিন্ন রাস্তার উপর ছিল। নিমন্ত্রণ বাড়ী গিয়া দেখিল যে শচীন এখানেও নিজের বাড়ীরই মত খালি গায়ে সকলের অভ্যর্থনা ইত্যাদিতে নিযুক্ত আছে। একবার তাহাকে দেখিয়া তাহার চিত্ত জ্বালা করিয়া উঠিল—'এমনি করিয়া শচীন গায়ে পড়িয়া সব বাড়ীতেই আব্দার কাড়িয়া বেড়ায়'। আবার তখনই মনে মনে হাসিয়া ভাবিল যে মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও মানুষে রাগদ্বেষ ত্যাগ করিতে পারে না। এমনি করিয়া একটা বিরাট শ্মশান-বৈরাগ্য (অবশ্য নিজের মৃত্যু-হেতুক)

শ্রীজীবনময় রায়

আসিয়া তাহার সমস্ত চিত্তকে অধিকার করিয়া ফেলিল। এমন কি শচীনকেও ক্ষমা করিয়া ফেলা তাহার কিছুমাত্র কঠিন বলিয়া মনে হইল না।

খাওয়া দাওয়ার পর একটি ছোট্ট মেয়ে তাহাকে আসিয়া বলিল "আপনাকে একবার ও ঘরে ডেকেছেন।" অকস্মাৎ এ বাড়ীতে তাহাকে কে ডাকিতে পারে ভাবিয়া সে একটু অবাক হইল। তারপর ভাবিল হয়ত তাহার মামীমা তাহাকে কোনও কারণে ডাকিয়া থাকিবেন, এই ভাবিয়া সে মেয়েটির পিছন পিছন একটি ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। এবং প্রায় একই সময় শচীন একটি ঘোমটা-পরা অলঙ্কৃতা কন্যাকে হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে ঘরের অপরদিকের দরজা দিয়া আসিয়া প্রবেশ করিল। শচীনের ব্যবহারে তাহার বিস্ময় ও বিরক্তি যখন প্রায় ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছে তখন শচীন হাসিয়া বলিল "Allow me to introduce my wife, Mr. Ghosh" এই বলিয়া সে তাহার স্ত্রীর ঘোমটা খুলিয়া ফেলিল। মাখন দেখিল —একি! এ যে মৃণালিনী!—সিন্দুরশোভিত সুন্দর কপালে, আনত চক্ষে এবং শরৎপদ্মের মত ঈষদোদ্ভাসিত স্নিগ্ধ মুখখানিতে লজ্জা এবং কৌতুকের স্মিতহাস্য ঝলমল করিতেছে। মাথার উপরে হঠাৎ একটা বাড়ী পড়িলে যেমন সহসা বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইয়া যায়, মাখন তেমনি ভাবে বিস্ফারিত লোচনে কিয়ৎকাল নির্ব্বোধের মত তাকাইয়া রহিল। তাহার পর হঠাৎ 'এ্যাঁ এ্যাঁ তুমি আপনি আমাকে ক্ষমা করুণ......আমি অতি—অতি—' বলিতে বলিতে সে সত্য সত্যই হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল। মৃণালিনী আর সামলাইতে পারিল না, "ছি ছি" বলিয়া ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিয়া দৌড়াইয়া অন্তঃঘরে পলাইয়া গেল। শচীন দেখিল বড়ই বাড়াবাড়ি হইয়া যাইতেছে। বলিল "আরে কি পাগল! ওঠ, ওঠ" বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিল। বাড়ীর গুরুজন কেহ পাছে এই দৃশ্য হঠাৎ দেখিয়া ফেলেন এই ভাবিয়া সে সামনের দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া আসিল। মাখন তখনও সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই, "মৃণালিনী,......এ্যাঁ... তোমার স্ত্রী?" শচীন বলিল "হ্যা ভাই, নিতান্তই আমার স্ত্রী, তা আর অস্বীকার করবার যো নেই। এখন আর এই দুর্ব্বৃত্তের কবল থেকে তাকে রক্ষা করবার কোনই উপায় নাই—'প্রাণ দিলেও' না।" এই বলিয়া সে তিন টুকরা কাগজ তাহার হাতে দিয়া বলিল "এই নাও ভাই তোমার সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলীর তিনটি পৃষ্ঠা, নিতান্ত লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'য়ে আমার হাতে এসে পড়েছিল।"

এতক্ষণে মাখন ধীরে ধীরে কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল। সে দেখিল যে তাহার অত্যন্ত দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে সে বারংবার শচীনের কাছে আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে। প্রত্যেক দিনের একটির পর একটি ঘটনা মনে পড়িয়া সে একেবারে মাটিতে মিশিয়া যাইবার মত হইল। মনে পড়িল শচীনের সেই বিশ্রী হাসি,—এই লইয়া, হ্যা-হ্যা করিতে করিতে সে যদি সকলের কাছে তাহাকে অপদস্থ করে? তাহার মামা, তাহার বাড়ীর সকলে, তাহার ক্লাসের ছেলেরা, তাহার শিক্ষকেরা—উঃ সকলে তাহাকে কি মনে করিবে? কোথায় নামিয়া যাইবে সে দুনিয়ার সকলের চোখে! তাহার এতদিনের সুনাম! হে ঠাকুর, হে দয়াময়! তাহার অপকর্ম্মের কথা তাহার মন হইতে অনেক ক্ষণ দূর হইয়া গিয়া অপবাদের ভয়ে, মনস্তাপে সে একেবারে দগ্ধ হইতেছিল। একটিমাত্র আশা এত মনস্তাপের মধ্যেও তাহাকে একবার আত্মরক্ষার শেষ চেষ্টায় প্রবৃত্ত করিল। তাহার হাতের লেখা চিঠিগুলি সে ফিরিয়া পাইয়াছে—হয়ত শচীন ও তাহার স্ত্রী ছাড়া এখনও একথা আর কেহই জানে না—এখনও সময় আছে। এই ভাবিয়া সে হঠাৎ শচীনের পায়ের তলায় পড়িয়া তাহার পা চাপিয়া ধরিল এবং কণ্ঠস্বর চাপা কান্নার আভাবে কাতর করিয়া বলিতে লাগিল "বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও। এ কথা আর কারুকে বোলো না।"

সতী

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

(৮)

জ্যোতি মুখ লাল করিয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছিল। সুপতি চলিয়া গেলে সেও মুখ ফিরাইয়া বাহিরের দিকে অগ্রসর হইল।

সুরমা চীৎকার করিয়া ডাকিয়া বলিল, "ঠাকুরপো, কোথা যাও?"

জ্যোতি ফিরিয়া সুরমার পায় হাত দিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "চল্‌লাম বউদি, এর পর আর এক মুহূর্ত্ত এ বাড়ীতে থাকলে আমার পুরুষত্বের অপমান হ'বে।"

আকুল হইয়া সুরমা বলিল, "কি বলছো ঠাকুর পো! উনি তোমার বাড়ী থেকে বেরুতে বল্লে তুমি সুড় সুড় ক'রে চ'লে যাবে? এ বাড়ী কার? তোমায় বেরই বা করে কে?"

"অত সূক্ষ্ম হিসাব করবার সময় নেই বউদি; বাড়ীর কর্ত্তা দাদা, তিনি আমাকে বাড়ী ছেড়ে যেতে ব'লেছেন, তাই যথেষ্ট।"

জ্যোতির হাত ধরিয়া অশ্রু-আপ্লুত লোচনে সুরমা বলিল, "কিন্তু আমাকে কোথায় ফেলে যাচ্ছ ঠাকুর পো, তা' একবার ভাবছো না? তোমার পুরুষত্বই কি সব, আমি কেউ নই, কিছুই নই?"

দুঃখার্ত্ত স্বরে জ্যোতি বলিল, "তুমি আমার মায়ের মত বউদি, তুমি দেবী। তোমার দুঃখ আমার বুকে শূলের মত বিঁধছে, কিন্তু তবুও আমি থাকতে পারি না।"

যখন কিছুতেই জ্যোতিকে টলাইতে পারিল না তখন সুরমা বলিল, "নিতান্তই যদি যাবে তবে একটা প্রতিজ্ঞা ক'রে যাও যে আমার সঙ্গে রোজ দেখা ক'রবে, আর আমি ডাকলেই তুমি আসবে—যেখানেই থাক।"

অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া শেষে জ্যোতি সে প্রতিজ্ঞা করিল।

তার পর সুরমা বলিল, "তোমার টাকা? তোমার বাড়ী কেনবার টাকা না নিয়ে যাবে?"

উদাস ভাবে জ্যোতি বলিল, "কি ক'রবো? দাদা যখন দেবেন না তখন উপায় কি?"

"কিন্তু টাকা তো তোমার দাদার একলার নয় ঠাকুর-পো! তোমার টাকা তুমি নেবে তাতে তাঁর কথায় কি আসে যায়?"

"না বউদি, দাদা আজ রাগ ক'রেছেন ব'লে তাঁ'র চিরজীবনের স্নেহ ভুলে আজ তাঁ'র সঙ্গে বিষয় নিয়ে ঝগড়া করবো? আশীর্ব্বাদ কর বউদি, যেন এমন মতি কোনো দিন আমার না হয়।"

সুরমা মাথায় হাত দিয়া অনেকক্ষণ ভাবিল। তার পর সে জ্যোতিকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া তার শুইবার ঘরে গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া সে জ্যোতির হাতে পাঁচ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ দিয়া বলিল, "ঠাকুর পো, কিছুই যখন নেবে না তুমি, তখন এ ক'খানা তোমাকে নিতেই হ'বে। এ টাকা তোমারও নয়, তোমার দাদারও নয়। আমার শ্বশুর আমাকে দিয়েছিলেন। এ নিতে তোমার কোনও অপমান নেই।"

জ্যোতির দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। একটু ইতস্তত করিয়া শেষে সে বলিল, "নিলাম তোমার দান

মাথায় ক'রে বউদি, আশীর্ব্বাদ কর যেন এ টাকা তোমার সার্থক হয়।"

সুরমার মুখ এতক্ষণে আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে বলিল, "আশীর্ব্বাদ ক'রছি ঠাকুর পো, তোমার ব্রত সফল হোক, গৌরবে মণ্ডিত হোক। এখন তুমি এসো; এর পর এর জন্যে যা সই টই ক'রতে হয় তুমি করিয়ে নিও। কিন্তু যাবার আগে তোমার কাছে আর একটা প্রতিশ্রুতি আমি চাই—সে ত তোমার দিতেই হ'বে। যদি অভাব হয় কখনও তোমার, টাকার জন্য যদি তোমার কোনও দরকার হয়, তবে আর কারো কাছে চাইবার আগে আমার কাছে তুমি জানাবে।"

ঘাড় নাড়িয়া জ্যোতি বলিল, "সে হয় না বৌদি। দাদার টাকা আমি নেব না।"

"তোমার দাদার এক পয়সাও তোমাকে আমি দেব না। তা না দিয়ে যদি আমি দিতে পারি তবে নেবে তো?"

অনেক আপত্তির পর জ্যোতি সম্মত হইয়া গেল। সুরমা তার ঘরে প্রবেশ করিয়া বিছানায় পড়িয়া ধড় ফড় করিতে লাগিল। তার ঘরে তার শ্বশুরের একখানা ছবি ছিল তার দিকে চাহিয়া সে কেবলি কাঁদিতে লাগিল। ছবির তলায় মাথা খুঁড়িয়া সে বলিতে লাগিল, "বাবা স্বর্গে আছেন আপনি, একবার চেয়ে দেখুন আপনার অভাগ্য সন্তানদের সব যে ছার-খার হ'য়ে গেল ঠাকুর!"

(৯)

তার গতিবিধির উপর কোনও বাধা ভূপতি কোনও দিনই কার্য্যতঃ স্বীকার করে নাই, তবু এতদিন পর্য্যন্ত তার মনের ভিতর একটু সঙ্কোচ, একটু অপরাধ-বোধ ছিল। এখন সে লেঠাও চুকিয়া গেল। প্রথমতঃ সুরমার সঙ্গে বোঝা পড়া হইয়া সব পরিষ্কার জানাজানি হইয়া যাওয়ায় তার একটা সঙ্কোচ কাটিয়া গিয়াছে; তার পর বিবেকের যে ক্ষীণ একটা আর্ত্তনাদ থাকিয়া থাকিয়া তার প্রাণের ভিতর শোনা যাইত, তাহাও চুকিয়া গেল, কেন না এখন সে মনে মনে স্থির করিল যে সুরমা তাহাকে অন্যায় রকম অপমান করিয়াছে। সুরমা তাহাকে ঘৃণা করে, তার ছোট ভাইয়ের কাছে তার প্রভুত্ব সে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে এবং সে যখন সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ ছিল তখনও তাহাকে মাতাল বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছে। স্ত্রী হইয়া স্বামীকে এমন অবহেলা ও অপমান করিবে, আর ভূপতি কেবলি সহিয়া যাইবে? কেন ভূপতি কি পুরুষ নয়? সে যাই করুক, সে স্বামী, তার স্বামীত্বের মর্য্যাদা সে রক্ষা করিবে। সে পুরুষ, তার পৌরুষ সে বজায় রাখিবে।

সুরমার কল্পিত অপরাধের ভিত্তির উপর এই মিথ্যা দম্ভের এক প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া ভূপতি তার পাপের জন্য একটা দুর্ভেদ্য দুর্গ রচনা করিল এবং এখন সে নিশ্চিন্ত ভাবে সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার চিত্তে তার পাপ-পথে স্পর্দ্ধার সহিত বিচরণ করিতে লাগিল। সে আর এখন কাহারও তোয়াক্কা রাখে না। কেন সে রাখিবে? সে কাহারও খায় পরে না। সে প্রভু, সে কাহারো অধীন নয়।

ক্রমশঃ বাড়ীতে আসাও সে প্রায় বন্ধ করিল। হয় বিলাসের বাড়ীতে, না হয় থিয়েটারে সে রাত্রি কাটায়; মাঝে মাঝে বিলাসের কড়া শাসন সত্ত্বেও সে এদিক সেদিক অন্যত্র গিয়া থাকে। মদের মাত্রাটা সে খুব বেশী বাড়াইতে পারে নাই কেবল বিলাসের তাড়নায়—তা' ছাড়া সে চারিদিক দিয়া তার জীবনটাকে নিঃশেষে ছার-খার করিতে লাগিল।

টাকা পয়সার তার এ পর্য্যন্তও কোনও অভাব হয় নাই। অবশ্য এখন টাকা সে পায় কম, কারণ এখনও সব টাকা সুরমার কাছেই থাকে। মাইনার টাকাটি গুণিয়া তাহাকে দিতে হয়। দেশের টাকা আসিলে ভূপতি তাহা হইতে যথাসম্ভব সরাইয়া ফেলে, কেননা সে টাকার কোনও বাঁধা পরিমাণ নাই। তবু অনেকটা টাকা তাহা হইতেও সুরমাকে দিতে হয়। তাহা হইলেও, এককড়ির অনুগ্রহে তার টাকার অভাব নাই। যখন যে টাকার দরকার হয়, কেবল একখানা হাণ্ডনোট সই করাইয়া লইয়া এককড়ি তাহা কোনও না কোনও মহাজনের নিকট হইতে আনিয়া দেয়। সুতরাং ভূপতির টাকার কোনও অভাবই এ পর্য্যন্ত হয় নাই। কিন্তু ক্রমে টাকার ভাবনা তাহাকে ভাবিতে হইল।

হঠাৎ একজন মহাজন তার নামে তিন হাজার টাকার ডিক্রী করিয়া বসিল। তিন হাজার টাকা তার স্তায্য পাওনা নয়, তবে কাপ্তেনী হুণ্ডীর যা নিয়ম সেই অনুসারে এক হাজার টাকা ধার করিলেও ভূপতিকে তিন হাজার টাকার জন্ত দায়ী হইতে হইল। মহাজন শাসাইল যে সে টাকা অবিলম্বে না পাইলে ডিক্রী জারী করিবে। ভূপতি ইহাতে ভারী চটিয়া গেল, বিপন্নও হইল। সে এককড়িকে টাকার জোগাড় করিতে পাঠাইল।

সন্ধ্যার সময় এককড়ি বিলাসের বাড়ীতে উপস্থিত হইল, ভূপতি সেদিন অন্তত্র গিয়াছিল, তখনও আসিয়া পৌঁছায় নাই।

বিলাস সাজ-গোজ করিয়া অপ্রসন্ন চিত্তে বসিয়া ছিল।

এককড়ি জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু কোথায় বিলাস বিবি ?"

বিলাস এ কথায় অস্বাভাবিক উষ্মার সহিত উত্তর দিল, "কি জানি সে কোথায় ম'রতে গেছে।"

তারপর সে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ? কি দরকার ?"

"জরুরী দরকার—টাকার দরকার।"

"কার ? তোমার ?"

"আরে আমার তো দরকার দিনরাতই আছে, এখন দরকার বাবুর।"

বিস্মিত হইয়া বিলাস সমস্ত কথা শুনিতে চাহিল; শুনিল ভূপতির ডিক্রীর টাকা জোগাড় করিবার জন্ত এককড়ি হুণ্ডী লইয়া মহাজনদের কাছ গিয়াছিল, কেহ টাকা দিতে স্বীকৃত হয় নাই। তারপর আরও প্রশ্নোত্তরে সে জানিল যে ভূপতির অনেক দেনা হইয়া বাজারে বদনাম হইয়াছে, এমন আর কেহ তাহাকে হুণ্ডী বা হাণ্ডনোটে টাকা দিতে চায় না।

বিলাস বলিল, "সে কি ? তোমার বাবুর না অনেক টাকা শুনেছিলাম সে সব কি হ'ল ?"

এককড়ি হাসিয়া বলিল, "যা হ'য়ে থাকে; তোমাদের পাঁচজনের কৃপায় সে সব উবে এসেছে।"

বিলাস ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দন্তে অধর দংশন করিল। তারপর বলিল, "তা হ'লে এখনও আর পাঁচজন আছে,—কি বল ?"

এককড়ি জিভ কাটিয়া বলিল, "শ্রী বিষ্ণু! ভুল হ'য়ে গেছে বিলাস বিবি! তোমার কাছে কথাটা বলা অন্তায় হ'য়েছে। দোহাই বিবি, আমি এমন কথা বলি নি।"

কিন্তু বিলাস এককড়িকে একটু চাপিয়া ধরিতেই সে বলিয়া ফেলিল যে ভূপতির ইতস্ততঃ গতিবিধি কিঞ্চিৎ বিলক্ষণই আছে, এবং আজও যে তার আসিতে বিলম্ব হইতেছে তার কারণ ডালিম নাম্নী একটি সম্ভোদ্ভিন্ন-যৌবনা রূপসী।

বিলাস গুম হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

এককড়ি বলিল, "এ তোমার অন্তায় রাগ বিলাস বিবি! বাবু একটু এদিক-সেদিক না গিয়ে করে কি ? তুমি নেহাৎ নিরামিষ মেয়েমানুষ, মদটি পর্য্যন্ত খাবে না, তাই বাবুকে একটু প্রাণটায় হাওয়া খেলাবার জন্ত এদিক সেদিক যেতেই হয়। ঘরের বউ ফেলে লোকে যখন তোমাদের কাছে আসে তখন—"

বিলাস ধমক দিয়া বলিল, "চুপ কর এককড়ি দা।" অগত্যা এককড়ি থামিয়া গেল।

একজন মাড়োয়ারী ধনী বিলাসের কাছে অনেকদিন হইতে দূত পাঠাইতেছিল। বিলাস এতদিন তাহার কথায় কান দেয় নাই। এই সময় সেই দূত আবার আসিয়া উপস্থিত হইল। বিলাস তাহাকে লইয়া অন্ত ঘরে গেল—এবং মোটা রকম বায়না লইয়া দালালকে বিদায় করিল।

ইহার পর যখন ভূপতি আসিল তখন বিলাস চট্ করিয়া তাহার কাছে আসিল না।

এককড়ি ভূপতিকে সমস্ত অবস্থা জানাইয়া বলিল, "তারা সবাই বলে আপনার ভাই যদি হুণ্ডী সই ক'রে দেয় তবে টাকা দেবে, তা নইলে সিকিউরিটি চায়।"

ভূপতি বলিল, "জ্যোতি! তবেই হ'য়েছে! তার সই পাওয়া যাবে না—সে আশা ছেড়ে দেও।"

এককড়ি বলিল, "তার জন্তে ভাববেন না, তার হাতের সই একটা আপনার কাছে নেই ?"

ভূপতি চমকাইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "না, না সে হ'বে না।"

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

এককড়ি বলিল, "কেন এতে দোষটা কি? আপনি অত ভাবছেনই বা কেন? মাত্র তিন হাজার টাকা, এতো আপনি দু'মাস গেলে ফেলে দিতে পারবেন। এ নিয়ে তো নালিশ আদালত হ'বে না।"

ভূপতি আবার থমকিয়া গেল, শেষে সে বলিল, "না, না, ও সবে কাজ নেই এককড়ি।"

এককড়ি গম্ভীর ভাবে বলিল, "তা হ'লে তো আর কোনও উপায় দেখছি না। কাল সকালেই ওরা বেলিফ বের ক'রবে। এর ভিতর টাকার কোনও ব্যবস্থা হওয়া অসম্ভব।"

ভূপতি গম্ভীর হইয়া ভাবিতে লাগিল। তখন এককড়ি কাগজ কলম লইয়া বসিল। ভূপতির সই করা হণ্ডীখানা সামনে ধরিয়া সে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে তার স্বাক্ষর নকল করিয়া ভূপতিকে দেখাইয়া বলিল, "এই দেখুন, আপনার সই থেকে এর কোনও তফাৎ বের ক'রতে পারেন?"

ক্রমে সে ভূপতিকে নিম-রাজী করিয়া ফেলিল। কিন্তু হঠাৎ বিলাস আসিয়া গণ্ডগোল বাধাইয়া দিল।

বিলাস দমকা হাওয়ার মত ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, "ও সব হ'বে না আমার এখানে; এককড়ি দা ফের যদি তুমি অমন কথা বলবে তো দরোয়ান দিয়ে আমি তোমায় বের ক'রে দেবো বলছি।"

ভূপতিকে সে বলিল, "বলি এ সব হ'চ্ছে কি? একেবারে যে ডুবতে বসেছ দেখছি! তোমার না অনেক বিষয় আসয়, অনেক টাকা! এখন দেনার দায়ে শুনছি তোমার চুল পর্য্যন্ত বিক্রী হবার জোগাড়!"

ভূপতি আমতা আমতা করিয়া বলিল, "না, না ওসব বাজে কথা! দেনা কিছু হ'য়েছে, তার জন্যে চিন্তা নেই। কথাটা কি জান? আমার স্ত্রীর কাছে সব টাকাকড়ি থাকে, তার কাছ থেকে টাকা বের করা দায়। কেবল দেশ থেকে যখন টাকা আসে তারই ভিতর থেকে আমি যা' রাখতে পারি। যা' দেনা আছে সে আমি সামনের পূজোর কিস্তির টাকাটা পেলেই শোধ ক'রে দেব, সেজন্য চিন্তা নেই।"

বিলাস বলিল, "ও বাবা! বাড়ীতে এত কড়া শাসন তাতেও তোমার এই দশা! তবে আমি হাল ছাড়লুম। কিন্তু যাই কর, ওসব জাল জোচ্চুরী আমার এখানে হ'বে না। আর তোমার চাল শোধরাতে হ'বে, আর দেনা ক'রতে পারবে না। তুমি আজ কাল একেবারে জাহান্নমে যেতে বসেছ। ওসব চলবে না, বাগান ফাগান বন্ধ কর।"

বাগানের কথায় ভূপতি একটু ভড়কাইয়া গেল। সে বলিল, "কই বিলাস, আর তো আমি বাগানে যাই নি।"

"ছি, ছি, মিথ্যে কথা বলতে একটু বাধলো না তোমার? গেল শনিবারে কোথায় গিয়েছিলে তুমি? আর আজই বা ডালিমকে নিয়ে কোথায় গিয়েছিলে?"

তার পর সে ভূপতিকে যা নয় তাই বলিয়া গালি দিয়া বলিল, "যাক, সে যাক; যে চুলোয় মরতে হয় মরগে তুমি! কিন্তু আমি ও-সব জাল জুচ্চুরি হ'তে দেবো না। তুমি এখন ওঠো। ঘরে গিয়ে স্ত্রীর পায়ে ধ'রে, নয় গয়না বিক্রী ক'রে, যেমন ক'রে পার টাকার জোগাড় কর গে। জাল জুচ্চুরী না ক'রে যদি কাল সকালের ভিতর ডিক্রীর টাকা শোধ ক'রে আসতে পার ত এসো, নইলে আর এ মুখো হ'য়ো না।"

ভূপতি নানারকম ওজর আপত্তি করিল, কিন্তু বিলাস অটল হইয়া রহিল। কাজেই তখন ভূপতিকে উঠিতে হইল।

ভূপতি ও এককড়ি চলিয়া যাওয়ার এক ঘণ্টা পরে মাড়োয়ারী বাবু আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন বিলাস সাজ-সজ্জা করিয়া তার সঙ্গে মোটরে বাহির হইল।

(ক্রমশঃ)

স্বরলিপি

"নটরাজ"

শরতের ধ্যান—"আলোর অমল কমলখানি"

কথা ও সুর—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

II মা -া -পা । -গা -মা -দা I -ণপা -ণা -ণদা । পা -া -া I
আ . . . . লো . র্

I পা দা -পা । মা পা পা I পদা -ণদা -পা । মগা -া -া I
অ ম ল্ ক ম ল খা .. . নি . .

I গপা -া -া । সা -ঋা -গা I -মা -পা -দা । -মা -পা -দা I
কে . . কে . . . .

I -না -র্সা র্ঋা । -র্সা -া -র্ঋা I র্সর্ঋা র্সা -া । ণা -া -দা I
. . . . . . ফু টা . লে . .

I দা -পা -মা । -গা -মা -দা I -ণপা -ণা -ণদা । পা -া -া I
আ . . . . লো . র

I না -া -া । র্সা র্সা -ঋা I র্সনা -র্সা -া । -া -া -া I
নী . ল্ আ কা . শে . . . . র

I সা -ঋা -মা । মা মা -া I মা -া -া । মপা -পা -া I
ঘু . ম্ ছু টা . লে . . কে . .

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

I সা -ঋা -গা | -মা -পা -দা I -মা -পা -দা | -ণা -র্সা -র্ঋা I
কে · · · · · · · · · · ·

I -ণর্সা -া -র্জ্ঞা | র্জ্ঞর্ঋা র্সা -া I ণা -া -দা | দা -পা -মা I
· · · টু টা · লে · · আ · ·

I -গা -মা -দা | -দপা -ণা -ণদা I পা -া -া | -া -া -া I
· · · · · · লো · · · · র্

I দা দা -া | না -া -া I নর্সা -া -া | -া -া -া I
আ মা র্ ম · · নে · · · · র্

I র্সর্ঋা -া র্ঋা | র্ঋা -র্সা -না I নর্সা -া -া | -া -া -া I
ভা ব্ না গু · · লি · · · · ·

I সর্জ্ঞা র্জ্ঞা -া | র্জ্ঞা -া র্রা I র্মর্জ্ঞা -া -া | -র্ঋা -র্সা -া I
বা হি র্ হ · · ল · · · · ·

I সর্মা র্মা -া | র্জ্ঞা -া -র্ঋা I র্সা -া -া | -া -া -া I
বা হি র্ হ · · ল · · · · ·

I র্সর্ঋা র্ঋা -র্সা | র্সা -ণা -া I ণা -া -া | -দা -া -া I
পা খা · ফু · · লি · · · · ·

I দা -র্ঋা র্ঋা | ণর্সা র্সা -া I র্সণা ণা -দা | দা পা -া I
ও ই অ ম লে র্ প থে · তা দে র্

I র্সা -ঋা -মা । -মা -মা -া I মা -া -া । মপা -পা -া I
সে • ই ফু টা • লে • • কে • •

I সা -ঋা -গা । -মা -পা -দা I -মা -পা দা । -না -র্সা -ঋা I
কে • • • • • • • • • • •

I র্সা -া -র্জ্ঞা । র্ঋা -র্সা -া I ণা -া -দা । দা -পা -মা I
• • • ফু টা • লো • • আ • •

I -গা -মা -দা । -পা -ণা -দা I পা -া -া । -া -া -া I
• • • • • • লো • • • • র্

I সা ঋা মা । মা মা -া I মা মা -া । মপা মা -গা I
শ র ত বা ণী র্ বী ণা • বা জে •

I মা মা ঋা । গা মা -া I মা মা পা । গমা গা -া I
ক ম ল দ লে • ল লি ত্ রা গে র্

I মা -দা দা । না র্সা -া I ণা -া -া । দা -া -মা I
সু র্ র রে তা ই ব • • রে • •

I মা -া মগা । গপা গমা -া I দা -া দা । না র্সা -া I
শি উ লি ত লে • আ ই ত্ বা তা স

I র্সঋা ঋা -র্সা । র্সঋা -া -না I র্সা -া -া । -া -া -া I
বে তা র্ যে • • তে • • • • •

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

I র্সনা -সা -জ্ঞা । জ্ঞঋা র্সা -া I র্সনা র্সা -া । র্সনা সা -দা I
ক চি • ধা নে র্ স বু জ্ ক্ষে তে •

I না র্সা -া । র্সনা র্সা -দা I না সা -া । র্সনা র্সা -দা I
বে ড়া য়্ মে তে • বে ড়া য়্ মে তে •

I না র্সা -া । র্সঋা -া -না I র্সা -া -া । -া -া -া I
বে ড়া য়্ মে • • তে • • • • •

I সজ্ঞা জ্ঞা -া । জ্ঞরা জ্ঞা -া I জ্ঞরা -র্সা জ্ঞা । জ্ঞঋা র্সা -া I
ব নে র্ প্রা ণে • ম র্ ম রা গি র্

I সা -ঋা মা । মা মা -া I মা -া -া । মপা -গা -া I
ঢে • উ উ ঠা • লে • • কে • •

I সা -ঋা -গা । -মা -পা -দা I -মা -পা -দা । -না -র্সা -ঋা I
কে • • • • • • • • • • •

I -র্সা -া -জ্ঞা । জ্ঞঋা সা -া I ণা -া -দা । দা -পা -মা I
• • • কু টা • লে • • আ • •

I -মগা -মা -দা । -মপা -ণা -পদা I পা -া -া । -া -া -া IIII
• • • • • • লো • • • • র্

বিবিধ সংগ্রহ

মাইকেল পুপিন

আমেরিকার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডক্টর মাইকেল পুপিনের সম্বন্ধে দু'একটি কথা আশা করি 'বিচিত্রা'র পাঠকদিগকে আনন্দ দান করিতে পারে। ৬৮ বৎসর পূর্ব্বে সার্বিয়ার এক কৃষক পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যকালে তিনি মাঠে গরু চরাইতেন। সেই সময়ে রাত্রে আকাশের দিকে চাহিয়া তাঁহার মনে হইত এই যে অসংখ্য নক্ষত্র ইহারা কি পৃথিবীতে শুধুই আলোক দান করিতেছে—তাঁহার মনে হইত ইহারা যেন ভগবানের কোনও বার্ত্তা কাছে লইয়া আসিতেছে, ইহারা যেন আসন্ন উষার সংবাদ লইয়া আসিতেছে। গির্জ্জার ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া তাঁহার মনে হইত ভগবান যেন গির্জ্জায় তাঁহাকে ডাকিতেছেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার মনে প্রবল বাসনা হয় যে এই আলো ও শব্দের রহস্য ভেদ করিতে হইবে—সত্যই ইহারা মানুষের কাছে ভগবানের কোনও বাণী লইয়া আসে কি না। তাঁর ১৫ বৎসর বয়সের সময়ে তিনি আমেরিকায় আসেন—কৃষকের কাজ করিতে করিতে তিনি পড়াশুনা আরম্ভ করেন—একান্ত অধ্যবসায়ের দ্বারা তিনি তাঁহার জীবনের উন্নতিসাধন করেন। সামান্য কৃষক হইতে আজ তিনি আমেরিকার এক প্রসিদ্ধ বিজ্ঞান সভার সভাপতির পদে উন্নীত হইয়াছেন। বিজ্ঞানের আলোচনা ক্রমশঃই যেন তাঁহাকে ভগবানের আরও কাছে আনিয়াছে, তাঁহার বাল্যকালের ধারণাগুলি আরও সুদৃঢ় করিয়া তুলিয়াছে। তিনি বলেন অঙ্কশাস্ত্রের দ্বারা যদিও নিখুঁত ভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব আমরা প্রমাণ করিতে পারি না, কিন্তু এই যে বাতাস, জল, আকাশ, আলো, বিদ্যুৎ, ইলেক্ট্রণ ইত্যাদি প্রতি মুহূর্ত্তে আশ্চর্য্য শৃঙ্খলার সহিত তাহাদের কাজ করিয়া যাইতেছে ইহার দ্বারা কি আমরা ভগবানের হস্তের পরিচয় পাই না—ইহাতেই কি তাঁহার অস্তিত্বের উপর আমাদের বিশ্বাস আনে না? অন্ততঃ তাঁকে অবিশ্বাস করিবার মত কোনও প্রমাণ আজ পর্য্যন্ত কোনও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিতে পারেন নাই ইহা সুনিশ্চিত।



বিজ্ঞানাচার্য্য পুপিন

উই-পোকা

মরিস মেটারলিঙ্কের "উই-পোকার জীবনী" নামে গ্রন্থ এই নিতান্ত ক্ষুদ্রায়তন জীবের জীবন যাপন প্রণালীর এক নূতন দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়াছে। চোখের আড়ালে



বল্মীক স্তূপ

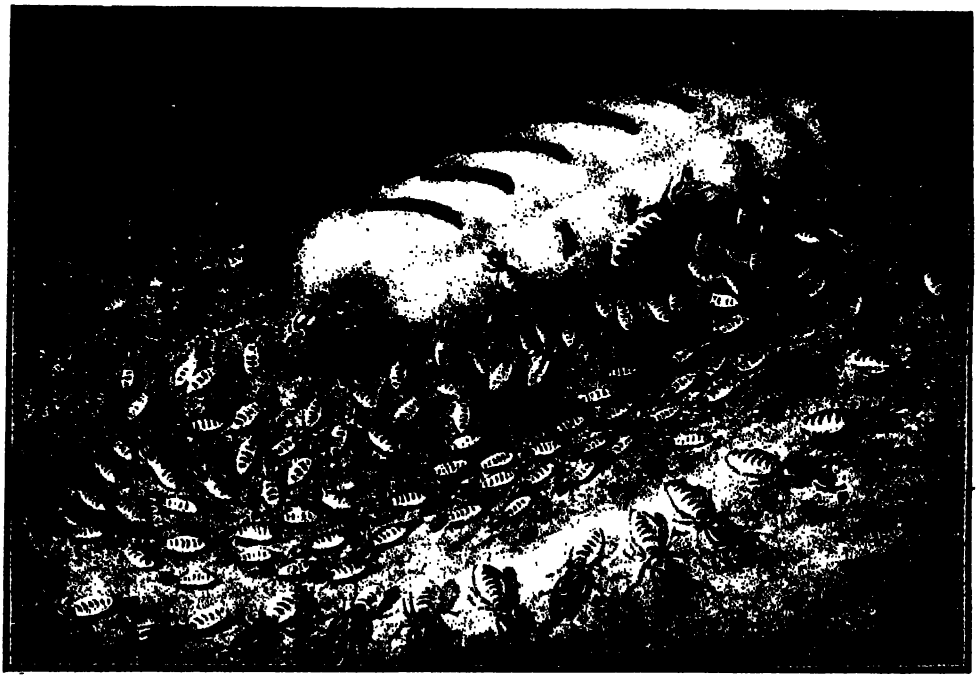
মানবের সর্ব্বনাশ করিবার ইহাদের অদ্ভুত প্রথার নিকট মানুষের বুদ্ধি পরাজিত হয়। ইহারা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে জীবন যাপন করে। বাসস্থানগুলি ইহাদের এক কলোনি বিশেষ। গাছের ডালে সেলুলোস্ নামে যে পদার্থ থাকে তাহাই ইহাদের প্রধান খাদ্য। এই সর্ব্বনেশে জীবগুলি হয়ত পৃথিবীর সমস্ত গাছ গাছড়া একদিন নষ্ট করিয়া দিবে। আশ্চর্য্যের বিষয়, কেমিষ্টরা, ইহাদের বিনষ্ট করিবার মত কোনও পদার্থ আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। প্রকৃতি এই প্রাণী সৃজন করিয়া পরে বোধ হয় লজ্জা পাইয়াছিল তাই ইহাদের জীবন ধারণ যতদূর বাধাসঙ্কুল হইতে পারে তাহাই করা হইয়াছে। প্রথমতঃ ইহাদের চক্ষু হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে—দেখিবার ক্ষমতা ইহাদের নাই, উড়িবার পক্ষও নাই; অত্যধিক ঠাণ্ডা বা প্রখর সূর্য্যের তাপ ইহারা সহ্য করিতে পারে না। অথচ গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলিতেই ইহাদের বাসস্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ইহাদের গায়ের মাংস অত্যন্ত নরম এবং সেইজন্য অন্যান্য প্রাণীদের ইহারা এক উপাদেয় খাদ্য। শত্রুদের পরাস্ত করিতে এমন কি নিজেদের আত্মরক্ষা করিবার মতও কোন অস্ত্র ইহাদের নাই। এত রকম বাধা সত্ত্বেও নিজ বুদ্ধিবলে নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবন করিয়া ইহারা বাঁচিয়া থাকে। উইঢিবিগুলি ইহারা এমনভাবে নির্ম্মাণ করে যে প্রখর সূর্য্যের তাপ বা ঋতু—পরিবর্ত্তনহেতু আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন ইহাদের কোনও ক্ষতি করিতে পারে না। গাছের গুঁড়িতে বা মাটির নীচে ইহারা বাসা তৈরি করে। বেশীর ভাগ মাটির নীচে হইতে আরম্ভ করিয়া খানিকটা উপর পর্য্যন্ত ঢিবির মত করে। ঢিবিগুলির আকার নানা রকমের হয়। কখনও বা পিরামিডের মত কখনও বা ধ্বংসাবশেষ গির্জ্জার মত—কখনও বা থামের মত। চক্ষু না থাকার দরুণ ইহাদের ভাস্কর্য্য ইহারা নিজেরা দেখিতে পায় না। দেখিবার ক্ষমতা থাকিলে বোধ হয় ইহাদের বাসস্থানগুলিকে সুদৃশ্য করিতে পারিত। ঢিবিগুলি অত্যন্ত কঠিন। কোনও কোনও দেশে রাস্তা প্রস্তুত করিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহাদের মুখ হইতে যে লালা নির্গত হয় তাহা দ্বারা ঢিবিগুলি সিমেণ্টের মত শক্ত হইয়া উঠে। ফ্রাগ্যাট ও জ্যাভেল নামে দুইজন প্রফেসর একবার করাত দ্বারা খানিকটা কাটিয়া ইহাদের বাসস্থানগুলির আভ্যন্তরীণ দৃশ্য দেখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। দেখিলেন, তাহারা একটি গাছের গুঁড়ির ভিতর ঘর নির্ম্মাণ করিয়াছে—সেই ঘরগুলিতে

পৌঁছিবার অসংখ্য রাস্তা—মাঝখানের ঘরটি ডিম্ব প্রসব করিবার জন্ত—ঘর গুলিতে হাওয়া এবং স্বর্য্যের আলোক যাইবার ব্যবস্থা আছে। নীচের তলায় ইহাদের রাণী ও তাহার স্বামীর থাকিবার জায়গা—এই গৃহ প্রয়োজনমত বড় করা হয়—রাণীর আয়তন যত বাড়িতে থাকে গৃহের আয়তনও সেই পরিমাণে বড় করিয়া দেওয়া হয়। রাণীর শরীর তার প্রজাদের অপেক্ষা প্রায় ৩০।৪০ হাজার গুণ বড়। রাণীর গৃহের নীচে নানা প্রকারের গ্যাল্যারী—তাহার নীচে ভাঁড়ার। ভাঁড়ারটি ইহাদের খাস্ত দ্রব্যে পরিপূর্ণ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সেলুলোস্ ইহাদের প্রধান খাস্ত কিন্তু সেলুলোস্ হজম করিবার ক্ষমতা ইহাদের নাই, অন্যান্য পোকা যখন সেলুলোস খাইবার চেষ্টা করিয়া ফেলিয়া যায় তখন এই গুলি তাহাদের খাইবার উপযুক্ত হয়। ইহারা দুই জাতীয়—একদল গৃহস্থালীর কাজ লইয়া থাকে আর একদল বাহির হইতে খাস্ত সংগ্রহ করিয়া আনে। শেষোক্ত গুলি আকারে কিছু বড় হয়—তাদের কাঠের উপর ছিদ্র করিবার জন্ত দুইটি করিয়া হুল থাকে। প্রথমোক্ত জীব গুলির খাস্ত সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা নাই, তাই তাহাদের যখন খাইবার প্রয়োজন হয় তখন শেষোক্ত কোনও পোকার মুখ হইতে খাবার লইয়া খায়। শেষোক্ত জীবগুলি তাহাদের গৃহস্থালীর ব্যাপারে নানারকমে প্রভুত্ব করে। প্রথমোক্তের সংখ্যা যখন অনেক বাড়িয়া উঠে তখন তাহাদের ইহারা বিনষ্ট করিয়া ফেলে। এমন কি রাণীর পাঁচ বৎসর বয়সের পর যখন তাহার ডিম প্রসব করিবার ক্ষমতা চলিয়া যায় তখন রাণীকেই তাহারা বিনষ্ট করে। উপরে বলা হইয়াছে—দেখিবার চক্ষু বা উড়িবার পক্ষ ইহাদের থাকে না—কিন্তু ইহাদের কতকগুলি চক্ষু ও পক্ষ বিশিষ্ট হয়—সেইগুলি যখন দেখিবার ও উড়িবার মত ক্ষমতা পায় তখন বাহিরের আলোক ও নির্ম্মল হাওয়ার জন্ত তাদের প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে—একদিন তারা দলবদ্ধ হইয়া তাদের দুর্গের প্রাচীর ভেদ



আর একটা—বল্মীকের ছবি

করিয়া বহির্গত হইয়া পড়ে, সেই দিন তাহাদের মহা উৎসবের দিন—সকলেই সেদিন সে উৎসবে যোগ দেয়—কিন্তু বাহির হইবামাত্র অন্যান্য জীব তাহাদের খাইয়া ফেলে—বাহিরের আনন্দ ভোগ করিবার সময় তাহারা



পিপীলীকা রাণী ও তাহার শরীররক্ষী বৃন্দ

পায় না। এই ভাবে এই হতভাগ্য জীবের জীবন-নাট্য শেষ হয়।

অ্যামাজনরা নারী না পুরুষ ?

আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সরল মনে অনেক কিছুই বিশ্বাস করিয়া গিয়াছেন। ভুল হউক্, ঠিক হউক্, সেই সমস্ত বিশ্বাস তাঁহাদের রচিত কাব্যে ও পুরাণে, চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে আজিও মূর্ত্ত ও অমর হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু ঐতিহাসিক ইহাতে সন্তুষ্ট নহেন। তিনি পৌরাণিক নরনারীদের হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প। তাঁহার স্কেল, কম্পাস, পঞ্জিকা ও পুঁথি অতীতকে বুঝি আর বাঁচিয়া থাকিতে দেয় না।

আমরা সকলেই জানি অ্যামাজনরা নারী সৈনিক। ট্রোজান যুদ্ধে গ্রীকদের বিপক্ষে তাহারা দুর্নিবার বীরত্ব ও অপূর্ব্ব রণচাতুর্য্য দেখাইয়াছিল। তাহাদের নেত্রী রাজ্ঞী পেনথেসিলিয়ার বিরুদ্ধে স্বয়ং অ্যাকিলিসকে রথারূঢ় হইতে হইয়াছিল। শেষে অ্যাকিলিসের হস্তে রাণীর মৃত্যু হয়। শত্রুপক্ষীয় হইলেও এই বীর রমণীরা গ্রীকদের শ্রদ্ধা ও পূজা হইতে কখনও বঞ্চিত হয় নাই। উত্তরকালে তাহাদের স্মৃতি গ্রীক মনের কল্পোদ্যানে অনেক পুষ্পই ফুটাইয়াছিল। কত প্রবাদ ও কাহিনী, মূর্ত্তি ও চিত্রই যে অ্যামাজনদের লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। শোনা যায়, অ্যামাজনসাম্রাজ্ঞী হিপোলাইটির কটিবন্ধন জয় করিয়া আনা মহাবীর হারকিউলিসের বিশ্ববিশ্রুত শ্রমকীর্ত্তিগুলির অন্যতম। আরও শোনা যায়, হিপোলাইটির ভগ্নী অ্যান্টিয়োপিকে

হরণ করিয়া আনিবার সময় থেসিয়ুসকে অ্যামাজনদের সহিত রীতিমত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। ঐতিহাসিক যুগের গ্রীক ইতিহাসেও অ্যামাজনদের উল্লেখ মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়। প্রবাদ আছে, অ্যামাজনদের অন্যতম রাণী থ্যালেষ্ট্রিস আলেকজাণ্ডারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করেন। রোমীয় সেনাপতি পম্পিও নাকি মিথ্রাইডেটিসের সহিত যুদ্ধ করিবার সময় বিপক্ষ-দলে দু'একজন অ্যামাজনকে দেখিতে পাইয়াছিলেন।

অ্যামাজনদের জাতি কুল ও চরিত্র সম্বন্ধে সে সময়কার লোকদের কিরূপ ধারণা ছিল হেরোডোটাস পড়িলে তাহা পরিষ্কার বোঝা যায়। হেরোডোটাসে দেখি একবার একদল অ্যামাজন গ্রীকদের হাতে পরাজিত হইয়া বন্দী হয়। পথে, সমুদ্রের উপর বন্দিনীরা বিদ্রোহী হইয়া গ্রীকদের মারিয়া ফেলে। জাহাজ বিস্তর ঝড়ঝাপটা খাইয়া শেষে যেখানে ডাঙ্গায় লাগে, সেটা হইল সীথিয়ানদের রাজত্ব। আগন্তুকদের সহিত অধিবাসীদের সংঘর্ষ বাধিল; ফলে বুঝা গেল তাহারা নারী। তখন সীথিয়ানরা একটু মুস্কিলে পড়িয়া গেল। বেচারীরা কি করে? যাহা-দের হাতের দাপটে অস্থির তাহারা যদি আবার হৃদয়ে অনধিকার প্রবেশ করে তবে বিপদের ত কথাই। অনেক চিন্তার পর স্থির হইল যে নারী হত্যাটা কোন মতেই করা চলিতে পারে না। তার চেয়ে বরং একদল যুবককে অ্যামাজনদের বিরুদ্ধে পাঠান যাক; কিন্তু তাহাদের পরিষ্কার বলিয়া দেওয়া হউক্ যে অবলারা যদি আক্রমণ করে তবে যুবকরা যেন পৃষ্ঠপ্রদর্শনও করাইতে পশ্চাৎপদ না হয়। তাহাই হইল। একদল তরুণ ও আর একদল তরুণী সশস্ত্র রণসজ্জায় মুখোমুখী আড্ডা আস্তানা গাড়িয়া বসিয়া রহিল। কাজেই প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে সন্ধি হইতে আর বিলম্ব হইল না। সীথিয়ান যুবকরা প্রস্তাব করিল যে এইবার গৃহে ফিরিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা যাক্। তরুণীরা উত্তর দিল—"তোমা-দের রমণীদের সহিত আমরা ঘর করিব কেমন করিয়া? আমাদের হালচাল সম্পূর্ণ আলাদা। আমরা তীর ছুঁড়ি; বর্শা ছুঁড়ি, ঘোড়ায় চাপি। আমরা গৃহস্থালীর কিছুই জানি না। তোমাদের মেয়েরা শিকারে বাহির হয় না। তাহারা রাঁধে-বাড়ে আর বাকী সময়টা পড়িয়া পড়িয়া ঘুমায়। না, তাহা হইতে পারে না। তবে তোমরা যদি মানুষ হও আর সত্য সত্যই আমাদের চাও তবে যাও, ফিরিয়া গিয়া তোমাদের সম্পত্তির অংশ আদায় করিয়া আন। তাহার পর অন্যত্র এক জায়গায়, নূতন একটা উপনিবেশ স্থাপনা করা যাইবে।" অ্যামাজনের উপযুক্ত কথা বটে। হেরোডেটাস্ বলেন তাহাদের মধ্যে নিয়ম ছিল, যতদিন না কোন কুমারী একজন শত্রুকেও বধ করিতে পারিবে ততদিন তাহার বিবাহে অধিকার থাকিবে না। এইজন্য অনেককে সারাজীবন কৌমার্য্যেই কাটাইতে হইত।

এ সব ত গেল পুরাবৃত্তের কথা। এখন প্রশ্ন এই অ্যামাজনদের অস্তিত্বের প্রমাণ কি? তাহারা যে সত্য সত্যই নারী তাহারই বা প্রমাণ কি? উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এই ধরণের প্রশ্নের কোন অর্থই ছিল না। তখন ট্রয়ের অত বড় যুদ্ধটারই ঐতিহাসিক সত্যতা সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ ছিল। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে স্যার আর্থার ইভান্স্ ক্রীটে যে খননকার্য্য আরম্ভ করেন তাহার ফলে প্রাগৈতিহাসিক গ্রীস নূতন আলোয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ক্রমে প্রাচীন ট্রয়নগরীর ধ্বংসাবশেষও পাওয়া গেল। জানা গেল ট্রোজান যুদ্ধ প্রবাদ ত নয়ই; এমন কি তাহার প্রচলিত তারিখটা পর্য্যন্তও বিশেষ ভুল নয়। ঠিক ১১৮৪ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে না হইলেও ট্রোজান যুদ্ধ যে খ্রীঃ পূঃ দ্বাদশ শতাব্দীতেই হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সমস্ত আবিষ্কারের ফলে প্রাগৈতিহাসিক গ্রীসের কথা কাহিনী ও জনপ্রবাদগুলিকে ঐতিহাসিক বলিয়া মানিয়া লওয়ারই একটা হাওয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে অ্যামাজনরাও ইতিহাসের কোঠায় উন্নীত হয়।

সম্প্রতি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রসিদ্ধ ঐতি-হাসিক জেঃ এল, মায়ার্স্ প্রমাণ করিতে চান যে অ্যামা-জনরা বাস্তবিক নারী নয়; তাহারা শ্মশ্রুহীন পুরুষ। অধ্যাপক মায়ার্স হিটাইট সভ্যতার নিদর্শন পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে খ্রীঃ পূঃ দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে কোন

শ্রীঅমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

হিটাইট মূর্ত্তিরই দাড়ি দেখিতে পাওয়া যায় না ; সকলেরই মুখ বেশ চাঁচা ছোলা। দ্বাদশ শতাব্দীর পর আস্তে আস্তে দাড়ি গজাইতে থাকে। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে গ্রীকদের সংস্পর্শে আসিয়াই হিটাইটরা দাড়ি রাখিতে শিখিয়াছিল ; এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে তাহারা যখন ট্রোজানদের স্বপক্ষে যুদ্ধ করিতে আসে তখন তাহাদের মসৃণ আনন দেখিয়া গ্রীকরা ঘৃণায় তাহাদের "মেয়ে যোদ্ধা" নাম রাখিয়াছিল।

অধ্যাপক মায়ার্স্ প্রতিথনামা ঐতিহাসিক। তাঁহার মত সহজে ঠেলিবার নহে। তবু সাধারণ লোকের মনে হইতে পারে,অবজ্ঞার আখ্যা এত রূপান্তরিত হইল কিরূপে? ট্রোজান যুদ্ধের এত অসংখ্য তথ্য লোকের মুখে মুখে আবিকৃত রহিল আর শুধু যাহারা ঘৃণার পাত্র তাহারাই দেবতা হইয়া উঠিল ইহা কি করিয়া সম্ভব হয়? তারপর হিটাইটরা গ্রীকদের দেখিয়া দাড়ি রাখিতে শিখিল বলিয়াই যে অ্যামাজনরাই হিটাইট এ-কথার যথেষ্ট প্রমাণ কোথায়? ঐতিহাসিক যুগে আলেকজাণ্ডার ও পম্পির সময়েও যখন অ্যামাজনদের উল্লেখ দেখি তখন বিরুদ্ধ প্রমাণের ভার সম্পূর্ণ ঐতিহাসিকের উপর। আরও অকাট্য যুক্তি ও সাক্ষ্য না পাইলে মত বদলান বোধ হয় ঠিক হইবে না।

যাহাই হউক্, হিটাইটদের দাড়ি থাক্ বা না থাক্ ইতিহাসের পাটীগণিত কাজে ও শিল্পে অচল। সেখানকার অ্যামাজনদের নারীত্ব কিছুতেই ঘুচিবার নহে। এসিয়া মাইনারে না হউক্ মানবের হৃদয়ে একদল নারী সৈনিক চিরকাল বাস করিয়াছে। প্রত্নতত্ত্বের ফলে তাহারাও যদি দাড়িহীন পুরুষে পরিণত হইয়া যায়, তবে পৃথিবীর তাহাতে একটু ক্ষতি হইবে—ইহা নিঃসন্দেহ।

শ্রীঅমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র



অ্যামাজন নারী

সহযোগী-সাহিত্য

যোহান বোয়ার

হুমায়ুন কবির

মানবাত্মার আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার এই যে সাধনা Great Hunger-এ তাহা যেমন করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে, পৃথিবীর সাহিত্যে কোথাও তাহার তুলনা আছে কিনা সন্দেহ। Russel বলিয়াছেন যে মানুষের জীবনের সকল ক্ষুধাকে তিন পর্য্যায়ে ভাগ করা যায়,—দেহের ক্ষুধা, মনের ক্ষুধা এবং আত্মার ক্ষুধা। দেহের ক্ষুধা মানুষ অন্যান্য সকল প্রাণীর সঙ্গে সমান ভাবে অনুভব করে· তাই সকল প্রাণীর মতনই সে আহরণ করে, সম্ভোগ করে, সঞ্চয় করে। মনের ক্ষুধা কেবলমাত্র জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপাদান সংগ্রহ করিয়া তৃপ্ত হয় না, তাই মানুষ সকল কিছুরই কারণ খুঁজিয়া ফেরে, জীবনের অর্থ বুঝিতে প্রয়াস পায়। কিন্তু মানুষের ক্ষুধার শেষ সেখানেও নহে। সকল জানা, সকল পাওয়ার অতীত যে বেদনা তাহার সকল অন্তরকে আলোড়িত করিয়া তোলে, তাহার তৃপ্তি কোথায়? শিশুর মুখে হাসি দেখিয়া আমাদের প্রাণ হাসিয়া ওঠে, বর্ষাসন্ধ্যার সজল মেঘভারাক্রান্ত অন্ধকারে আমাদের হৃদয় ভরিয়া ওঠে, সাগরবেলায় দাঁড়াইয়া ঊর্ম্মিভঙ্গ-মুখর বারি আন্দোলনে আশা-আশঙ্কায় মন দুলিতে থাকে, তাহারা ত দেহের ক্ষুধা বা মনের ক্ষুধা নয়!

পিয়র হোম্‌ শৈশব হইতে দেখিয়াছে যে সমাজে তাহার স্থান নাই। সকলেই করুণাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার পানে চায়—বিবাহবন্ধনের মধ্যে ত তাহার জন্ম হয় নাই। পিতার অর্থপ্রাচুর্য্যে এ অগৌরব ঢাকা পড়িয়াছে—যে সুদূর পল্লীতে তাহার শৈশব কাটিয়াছে, সেখানে সকলেই তাহার জন্মের লজ্জা ভুলিয়া গিয়া তাহাকে ভালবাসিয়াছে। কিন্তু পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাহার জন্য জগতের মূর্ত্তি বদলাইয়া [illegible] চিরদিন হাসিই দেখিয়া আসিয়াছে, এখন সেখানে মিলিল অবজ্ঞা, অনাদর, উপহাস। শৈশবের সকল আশা ধূলায় লুটাইল, সকল স্বপ্ন টুটিয়া গেল, কিন্তু অদৃষ্টের এ ক্রূর পরিহাসে ভাঙিয়া না পড়িয়া সে নূতন করিয়া জীবনের যাত্রাপথ স্থির করিতে অগ্রসর হইল। শৈশবের বন্ধু Klaus Brock আসিয়া এ সময়ে তাহার পাশে না দাঁড়াইলে হয়ত সে সত্যই ভাঙিয়া পড়িত।

কিন্তু এখন হইতেই তাহার মনে বিদ্রোহের সূত্রপাত। চারিদিকে এত অন্যায়, এত অবিচার রহিয়াছে, ইহাই যদি ভগবানের সৃষ্টি, তবে তাঁহার করুণা কোথায়? ধনীর ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া সুখ উছলিয়া পড়িতেছে, অথচ দরিদ্রের জীবনে যে সুখের আশাটুকু ছিল তাহাও কি তাঁহার সহিল না? মানুষ সকল জীবন ভরিয়া যে সাধনা করে, এক মুহূর্ত্তে তাহা নিঃশেষ হইয়া যায়—তবে মানুষের জীবনের অর্থই বা কি? কেনই বা তাহার জন্ম, কেনই বা এত দুঃখ সহিয়া জীবনের পথে তাহার যাত্রা, ইহার উত্তর তাহাকে কে দিবে?

আপনার সকল উৎসাহ, সকল উদ্যম পুঞ্জীভূত করিয়া পিয়র জ্ঞানার্জ্জনে মনোনিবেশ করিল। জ্ঞান তাহাকে লাভ করিতেই হইবে, ধনজন সম্মান আপনার বলে অর্জ্জন করিয়া সে পৃথিবীকে দেখাইবে যে নিয়মিত অন্যায় আদেশ মানিয়া চিরদিন সে কিছুতেই চলিবে না, অদৃশ্য অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসকে লঙ্ঘন করিয়া আপনার পুরুষকারের বলে সে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবে। কিন্তু কেবল জ্ঞানার্জ্জনে কি হৃদয়ের ক্ষুধা মেটে? যখন কঠিন পরিশ্রমের পরে চিত্ত ক্লান্ত, বুদ্ধি অবসন্ন, তখন স্নেহের করুণ পরশের জন্য মন কাঁদিতে থাকে, হৃদয়ের প্রান্তদেশ বড় শূন্য মনে হয়,

হুমায়ুন কবির

কাহাকেও ভালবাসিবার জন্য, কাহারও ভালবাসা পাইবার জন্য সকল জীবন কাঁদিতে থাকে।

পিয়রের মনে পড়িল যে তাহার এক কনিষ্ঠা ভগিনী আছে। জীবনে তাহাকে সে কখনও দেখে নাই, কিন্তু তবু সেত তাহারি সহোদরা, তাহারি মত নিঃসঙ্গ একাকী জীবন যাপন করিতেছে। লুইজি আসিয়া যখন তাহার জীবনে প্রবেশ করিল, তখন তাহার হৃদয়ের শূন্যতা ঘুচিল; লুইজিকে ভালবাসিয়া, তাহার রক্ষার ভার আপনি গ্রহণ করিয়া পিয়ার, জীবনে স্নেহের সন্ধান পাইল; তাহার সেবায়, তাহার সঙ্গলাভে জীবন মধুর হইয়া উঠিল। দারিদ্র্যের প্রতিমূর্ত্তি যে কক্ষে একা থাকিতেও তাহার কষ্ট হইত, দুইজনকে আশ্রয় দিয়া তাহারো যেন প্রসার বাড়িয়া গেল। মানুষের হৃদয় সততই ভালবাসার কাঙাল, সকলেই একটু স্নেহের বাণী, একটু সান্ত্বনার পরশের জন্য কাঙাল; সকলেই এই মনে করিয়া বেদনা পায় যে আমাকে কেহ ভালবাসিল না।

পিয়রের জীবন আনন্দেই কাটিতেছিল—সমস্ত দিন কঠিন পরিশ্রমের শেষে যখন সে ঘরে ফিরিত, তখন লুইজির স্নেহ-নিপুণ কল্যাণ-করের সেবায় তাহার ক্লান্তি ঘুচিত, পরস্পরের সাহচর্য্যে তাহাদের দারিদ্র্যের কঠিনতাও দূর হইয়া গিয়াছিল—কিন্তু নিয়তির বুঝি তাহা সহ্য হইল না, পিয়ার কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িল। রুগ্ন প্রিয়-জনকে আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান দিতে আমরা সকলেই উন্মুখ। যে দরিদ্র, যাহার কিছুই দিবার সঙ্গতি নাই, সে ও অশ্রু-সজল চোখের পাতায় হাসি ফুটাইয়া তোলে—সেই সঙ্কুচিত ভীরু হাসির রেখাই তাহার শ্রেষ্ঠ উপহার। লুইজি আসিয়া একদিন পিয়রের রোগশয্যার পাশে দাঁড়াইয়া বেহালা বাজাইতে লাগিল—তাহার সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ জীবনে সেই মুক্তির একমাত্র বিকাশ। উচ্ছ্বসিত সুর-তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে পিয়ারের হৃদয় মন দুলিতে লাগিল; রোগশয্যার যন্ত্রণা, দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্র বাধা, ক্ষুদ্র বিরক্তি, হৃদয়ের দুর্ব্বার পিয়াসা সকলি মিটিয়া তাহার হৃদয় ভরিয়া বাজিতে লাগিল অপূর্ব্ব শান্তির সঙ্গীত। তাহার মনে হইল শৈশব হইতে তাহার হৃদয় ইহারই জন্য কাঁদিতেছে—সুরের এই অনির্ব্বচনীয় প্রকাশে জীবনের সমস্যারও বুঝি সমাধান হইয়া যায়। লুইজির সত্য পরিচয় সেদিন সে প্রথম পাইল।

এমনি সময়ে লুইজির মৃত্যু আসিয়া তাহাকে বড় কঠিন আঘাত করিল। যাহাকে ঘেরিয়া সে আপনার জীবন গড়িয়া তুলিতেছিল, যাহার প্রীতির স্পর্শে হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইতেছিল, তাহারি অকস্মাৎ বিরহ তাহার হৃদয়ে বড় বাজিল। তাহার হৃদয়কে আরো বেদনা দিল এই চিন্তা যে লুইজির রোগশয্যার পাশে একদিনও আসিয়া সে বসে নাই—এতটুকু সেবায় তাহার রোগযন্ত্রণা লাঘব করিবার সুযোগ তাহার ভাগ্যে ঘটিল না। আপনাকে তাই সে হারাইয়া ফেলিল, বিদ্রোহে তাহার মন ভরিয়া গেল। যে ঈশ্বর তাহার জীবনে এতটুকু সুখ দেখিতে পারে না তাহাকে কেন সে শ্রদ্ধা করিবে, কেন তাহাকে সে উপাসনা করিবে? ভগবান করুণাময় এ কথা যে বলে সে মিথ্যাবাদী। ভগবানও ধনীর মতন দরিদ্রের প্রতি অত্যাচারী; যাহার সব কিছু আছে তাহাকে সে আরো বেশী করিয়া করুণা ঢালিয়া দেয়; যাহার কিছুই নাই, তাহার জীবনের শেষসম্বলটুকুও সে কাড়িয়া নেয়। যে ভগবান এমন নিষ্ঠুর, এমন পক্ষপাতী, তাহাকে আর যেই পূজা করুক, পিয়র কখনো তাহার পায়ে মাথা লুটাইবে না!—কিন্তু মৃত্যুর পরে মানুষের কি হয়? লুইজি কি আর ফিরিয়া আসিবে না? যে সঙ্গীত তাহার অন্তরে নিহিত ছিল, যে আনন্দের উৎসারিত ধারায় সে সকলের রোগযাতনা দূর করিয়াছে, সে আনন্দ আজ কি তাহারই সঙ্গে বিলুপ্ত হইল? বর্ষা-রজনীতে পিয়র চমকিয়া উঠিয়াছে, শীতল কঠিন ভূমিশয্যায় সমাধির তলে লুইজি যে একা রহিয়াছে, বৃষ্টিধারায় অভিমানিনী ভাসিয়া গেলেও তবু একটিও অনুযোগ ত তাহার মুখে বাহির হইবে না! পুষ্পের মত সুকুমার যাহার তনু, আলোর মত দীপ্ত যাহার হাসি, তাহার শেষ শয়ন আজ সমাধির অতল গহ্বরে!

বিদ্রোহে পিয়রের মন ভরিয়া উঠিল। এ অত্যাচারী ভগবানের ক্ষমতা কাড়িয়া লইতেই হইবে। আরো জ্ঞান চাই, আরো শক্তি চাই। ইস্পাতের সঙ্গে আগুনের সংযোগে মানুষ প্রকৃতিকে বশ করিয়া আনিয়াছে, প্রতিদিন

প্রকৃতির দুর্গম দুরূহ প্রদেশ নূতন করিয়া মানুষ জয় করিতেছে,—এ যাত্রার শেষে সেকি ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য কাড়িয়া লইতে পারিবে না? Prometheus স্বর্গ হইতে আগুন আনিয়াছিলেন, তাহারি প্রতিশোধে Jupiter তাহার উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছে, আজ সেই আগুনেই কি Jupiter-এর অত্যাচারের শোধ দেওয়া যাইবে না? বাহির জগতের সকল আনন্দ, সকল রূপ-রস-গন্ধ হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিয়া পিয়র একাগ্রমনে দিবসরজনী জ্ঞানার্জ্জনে আপনাকে প্রবৃত্ত করিল—জ্ঞানের সীমানা তাহাকে যে পাইতেই হইবে। তখনো কি শান্তি মিলিবে না?

এই সময় Fredrick Holm-এর সঙ্গে তাহার পরিচয়। ফ্রেডরিক তাহারই বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। ধনীর সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াও সে আজন্ম সমাজদ্রোহী—সমাজ তাহাকে যে-সকল অধিকার ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিতে উৎসুক, অপরকে বঞ্চিত করিয়া তাহা ভোগ করিতে তাহার প্রবৃত্তি নাই। দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার, শক্তিশালীর সকল অপরাধের ক্ষমা সেও দেখিয়াছে, তাই তাহারো অন্তর ভরিয়া আগুন জ্বলিয়াছে—যে শক্তি এই অত্যাচার এই অন্যায় অবিচার নির্ব্বিকারভাবে সহ্য করে, তাহা সর্ব্বশক্তিশালী হইলেও কখনই মঙ্গলময় নহে—তাহার ক্ষমতা কাড়িয়া লইতেই হইবে। জ্ঞানের রাজ্য-প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের শক্তি দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে—যেদিন এ সাধনায় সে সিদ্ধিলাভ করিবে, সেদিন আর আজিকার দুর্ব্বল ভীরু মানুষ প্রতিপদে নিয়তির ক্রূর করে কঠিন আঘাত খাইয়া কাঁদিবে না—সেদিন সে আপনার বীর্য্যে আপনার শক্তিতে নিয়তিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া জীবনকে আলোক-হাসিতে মুখর করিয়া তুলিবে; সেদিন আর এ সংসারে মায়ের বুকে শিশু মরিবে না, ক্ষুধিতের ক্ষুধার বেদনায় ধরণী কাঁদিয়া উঠিবে না—সেদিন সকল মানুষ আপনার দেবত্বে মহীয়ান হইয়া উঠিবে।

পিয়রও এই বিদ্রোহ, নবীন পৃথিবী সৃষ্টি করিবার এই সাধনাকে, আপনার ধর্ম্ম বলিয়া বরণ করিয়া লইল। কিন্তু তাহার এই সাধনার সঙ্গে তাহার অন্তরে মিশিয়া রহিল দুর্জ্জয় অভিমান। যে সমাজ তাহাকে অবহেলা করিয়াছে, ঘৃণাভরে তাহাকে অস্বীকার করিতে চাহিয়াছে, তাহার কাছে সে প্রমাণ করিবে যে সে নগণ্য নহে, সে তুচ্ছ নহে। যেদিন তাহার জ্ঞানের সাধনা পূর্ণ হইবে সেদিন বিস্মিত জগৎ কৃতজ্ঞ চোখে চাহিয়া দেখিবে যে পিয়রকে চিরদিন সে অনাদর করিয়া আসিয়াছে তাহারি কল্যাণে আজ মানুষের বেদনাবন্ধন ঘুচিয়া গেল, তাহারি সাধনায় মানুষ আপনার দেবত্ব খুঁজিয়া পাইল।

ফ্রেডরিকের প্রতি তাহার মনোবৃত্তিতে এই অভিমানেরই আর একটী ভঙ্গী প্রকাশ পাইয়াছে। ফ্রেডরিক তাহার ভাই—একই পিতার সন্তান তাহারা—অথচ সে আজন্ম বিলাস-পালিত, আজন্ম সমাজের চোখে আদৃত, আর পিয়র চির-অনাদৃত, চির-উপেক্ষিত। যেমন করিয়াই হোক জীবনের যুদ্ধে ফ্রেডরিককে পরাজিত করিতেই হইবে এই এক কামনা, জ্ঞানে অজ্ঞানে তাহার সকল চেতনা আচ্ছন্ন করিয়া রহিল। দেহের রক্ত যদি পরিশ্রমে শুকাইয়া যায়, কঠিন সাধনায় যদি জীবনের আনন্দের অবসান হয়, তবু তাহাকে জয় করিয়া অর্জ্জন করিতেই হইবে—তাহা নহিলে তাহার তৃপ্তি নাই।

শিক্ষার শেষে তাহারা সকলেই বিপুল জগতে আপনার স্থান খুঁজিয়া লইতে বাহির হইয়া গেল। পিয়রের মনের সকল কামনাই পূর্ণ হইল,—অর্থ সে উপার্জ্জন করিল, সম্মান বিভব তাহার ভাগ্যে জুটিল, ফ্রেডরিককে সে পরাজিত করিল, কিন্তু তবু হৃদয়ের ক্ষুধা ত মেটে না। শৈশবের কথা তাহার মনে পড়িতে লাগিল,—তারায় ভরা আকাশের পানে চাহিয়া তাহার হৃদয় গান গাহিয়াছে, তারার মালাও যেন সুরের আগুনে দীপ্ত হইয়া ঝলমল করিয়া উঠিয়াছে, সকল প্রকৃতি তাহার মুখে চাহিয়া হাসিয়াছে—সেই হাসি, গানের সেই মোহন উৎস, তাহার অন্তরে কি আজ শুকাইয়া গেল? বাহির-জগতে বিপুল কর্ম্ম-প্রেরণা তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না, পৃথিবীর অজ্ঞাত শক্তির সন্ধান ও জয়ের লোভ তাহার হৃদয়কে আর টানিতে পারিল না—দেশে ফিরিয়া আসিল সে শান্তির জন্য, অলস বিশ্রান্তিতে জীবনের দিনগুলি সুরে ভরিয়া তুলিবার

হুমায়ুন কবির

জন্ত। তাই যখন তাহার শৈশবের সহপাঠী আসিয়া তাহাকে বিজ্ঞানের নব নব বিজয়-কাহিনী জিজ্ঞাসা করিল, তাহার আপনার কীর্ত্তির কথা শুনিতে চাহিল, সে শুধু শ্রান্ত হাসি হাসিয়া বলিল যে, এবার ক্ষুদ্র পল্লীতে সমস্ত দিন কঠিন পরিশ্রম করিয়া সন্ধ্যায় যখন আঁধার আকাশে একটী তারা জ্বলিতে থাকিবে, তাহারি পানে চাহিয়া জীবনের অবশিষ্ট দিন সে আনন্দে কাটাইতে চেষ্টা করিবে।

সৌন্দর্য্যকে হত্যা করিয়া যে জ্ঞানের প্রকাশ, তাহাতে ত মানুষের আত্মা তৃপ্ত হয় না। কেবলমাত্র বুদ্ধির তীব্র আলোকে আমরা অভিজ্ঞতাকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিতে পারি, সমগ্র জগতকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারি, কিন্তু তাহাতে ত আমাদের আবেগ বাঁধন মানে না। হৃদয়ের কোণে কোণে তখন ক্ষুধা জমিয়া উঠে,— সৌন্দর্য্যের জন্য, করুণা-স্নেহ-ভালবাসার জন্য, প্রিয়জনকে হৃদয়ের কাছে একান্তে পাইবার জন্য এ ক্ষুধা। বসন্তের চন্দ্রা নিশীথিনী যখন ঘুমন্ত পৃথিবীর উপর মায়ার জাল ছড়াইয়া দেয়, বাতাস সুরার মত মদির হইয়া উঠে, ফুলে ফুলে ধরণী হাস্যময়ী তরুণীর মতন শোভন সুন্দর হইয়া ওঠে, তখন কি হৃদয় কেবল মাত্র তত্ত্বকথা শুনিয়া ক্ষান্ত হইতে চায়?

পিয়র এবার সৌন্দর্য্যের মধ্যে আপনাকে ছাড়িয়া দিল। স্থল-জল-বন-বিজন-গিরি-পল্লীর অপরূপ সৌন্দর্য্যে তাহার বুভুক্ষু বঞ্চিত যৌবন যেন নূতন করিয়া ফিরিয়া আসিল। প্রকৃতির সকল সুষমাকে সার্থক করিয়া তাহার জীবনে আসিল মার্লি। অতল অকূল নয়নের তলে গহন রহস্য সে গোপন করিয়া রাখিয়াছে, অগ্নিশিখার মতন তাহার তরুণ তনুখানি দীপ্ত, রক্তবিম্বাধরে সুধার ভাণ্ডার ভরিয়া এতদিন বুঝি সে পিয়রের প্রতীক্ষা করিয়াই বসিয়া ছিল। যৌবনে তাহার দেহমন মুরতি হইয়া উঠিয়াছে, চঞ্চল মদিরার মত রক্ত-স্রোতে জীবনের উদ্দাম আবেগ। তাহার কাছে ধরা দিয়া, তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া পিয়র আপনাকে ভুলিল, তাহার হৃদয়ের সকল সন্দিগ্ধ প্রশ্নের বুঝি অবসান হইল। গভীর রাত্রিতে হ্রদের বুকে তরণী ভাসাইয়া পিয়র ভাবে পৃথিবীতে এত সৌন্দর্য্য এত আনন্দ কোথায় ছিল?

কিন্তু প্রেম লাভ করিয়াও ত মানুষ শান্তি পায় না। প্রেমের প্রথম উন্মেষ সুরার মত মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। কিন্তু হৃদয়ের ক্ষুধা যখন মেটে, তখন আবার আত্মা ক্রন্দন-মুখর হইয়া ওঠে, তখন আবার তাহার নূতন সাধনা, কঠিন পথে তাহার নূতন জয়যাত্রা। তাই গৃহ-কোণের কল্যাণ পিয়রকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। প্রেমিকের হৃদয়ের ক্ষুধা, যখন মার্লি সুধা বণ্টন করিয়া মিটাইল, তখন দুঃসাহসী পথিক আবার নূতন পথের সন্ধানে বাহির হইল—পিয়র নূতন প্রেরণায় নূতন কার্য্যে যোগ দিল। প্রকৃতির শক্তিকেই সে চিরদিন আপনার ব্যবহারে লাগাইয়াছে, এবার যেন সে শক্তি বিমুখ হইয়া উঠিল। পদে পদে নিয়তি যেন ক্রূর পরিহাসে তাহার সকল সতর্কতা, সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া তাহাকে প্রতিহত করিতে লাগিল। একে একে পিয়র সকলি হারাইল। ধনমান ঐশ্বর্য্যসম্ভার নিশি-শেষের স্বপ্নের মতনই যখন অবসান হইল, তখন স্বপ্নচ্যুত পিয়র বিমূঢ় নয়ন মেলিয়া দেখিল, সংসারের প্রান্তদেশে আবার নিঃস্ব বেশে আসিয়া সে দাঁড়াইয়াছে, এবার সঙ্গে রহিয়াছে সুখদুঃখের সঙ্গিনী মার্লি এবং তাহাদের ভালবাসারই দান কয়েকটী শিশু। একা যখন সংসারের সঙ্গে সে যুদ্ধ করিয়াছে, বেদনা সহিয়াছে, তখন দুঃখ তাহাকে টলাইতে পারে নাই, কিন্তু প্রিয়জনের অঙ্গে যদি কণ্টক-আঘাত লাগে তাহাতে কঠিনতম হৃদয়ও বেদনায় গুমরিয়া ওঠে, সকল অন্তর ভাসাইয়া অশ্রুপ্লাবন বহিয়া যায়। স্বাস্থ্য, সুখ, যশ-সম্ভ্রম, সম্পত্তি-বিভব হারাইয়া যখন পিয়র পথের ভিখারী সাজিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, তখনো যে ক্ষুধায় তাহার অন্তর জ্বলিতেছে, সে কি কেবল হারানো ঐশ্বর্য্য, হারানো আনন্দের জন্য? দুঃখ-প্লাবনে সকলি ত তাহার ভাসিয়া গেল. কিন্তু তবু সেত ভাঙিয়া পড়ে নাই। স্নেহ-হীন আত্মীয় স্বজনের করুণার দান ভিন্ন যখন আপনার পুত্র-কন্যার ভরণ-পোষণ করিবারও তাহার ক্ষমতা রহিল না, যখন নিষ্ঠুর শত্রুর নীচতায় হারাণো আনন্দের শেষ

কণিকা তাহার শিশু কন্যা Asta-ও তাহার জীবন অন্ধকার করিয়া চলিয়া গেল, তখন বিদ্রোহে তাহার সকল অন্তর জ্বলিয়াছে, বিষে হৃদয় ভরিয়া গিয়াছে, হিংসায় সকল জীবন জর্জ্জর হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সেই বিষের তলাতেও যে অমৃত লুকানো ছিল সে কথা কি পিয়র নিজেই জানিত? দুঃখ-সাধনার শেষ প্রান্তে গিয়া এই সত্য সে আবিষ্কার করিল যে পারিপার্শ্বিক জগতের ক্রুরতা, নিয়তির কঠিন পরিহাস, প্রকৃতির প্রাণহীন নিষ্ঠুরতার মধ্যে মানুষ আপনার অন্তরে যে আলোকের কণা সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহারি মুখ চাহিয়া সকল দুঃখ তাহাকে নীরবে সহিতে হইবে। সকল ক্ষুদ্রতা, সকল হিংসা, সকল প্রতিশোধের ইচ্ছা বর্জ্জন করিয়া আপনার আদর্শের আলোকে জীবন উদ্ভাসিত করিয়া তাহাকে চলিতে হইবে। জীবনের সুখ যদি তাহাতে ভস্ম হইয়া যায়, সকল আনন্দ নিদাঘ ক্লান্ত পুষ্পের মতন ধূলিতলে লুটাইয়া পড়ে, তবু সেই সুখহীন কঠিন পথে মানবত্বের প্রতিষ্ঠার জন্য আপনার স্বপ্ন-স্বর্গকে মূর্ত্ত করিবার জন্ম যুগযুগান্ত ধরিয়া মানুষকে চলিতে হইবে। জ্ঞানের সন্ধানে পিয়রের আত্মা তৃপ্ত হয় নাই, প্রেমের অমরাবতীতে সে সুখী হইতে পারে নাই, দুঃখ-বিপদ আঘাত-বেদনার মধ্যে যখন সে আপনার মানবত্বকে মহীয়ান করিয়া দেখিল, তখনই তাহার জীবনে শান্তির সন্ধান মিলিল।

মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সঙ্ঘাতে যে বেদনা, বারে বারে তাহা বোয়ারের হৃদয়কে আকর্ষণ করিয়াছে—সেই বেদনার বন্ধনকে স্বীকার করিয়া লইয়া বারে বারে তিনি তাহার ছবি আঁকিয়াছেন। God and Woman-এ Martha সকল জীবন ধরিয়া যে সন্তানের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়াছিল, সেত কোনদিনই আসিল না—তাহার শূন্য কোল চিরদিন শূন্যই রহিয়া গেল। এই যে বুভুক্ষার তীব্র বেদনা, আকাঙ্ক্ষার ব্যর্থতার কঠিন আঘাত, তাহাতে আমাদের হৃদয়ও কি অশ্রুসজল হইয়া ওঠে না? Treacherous Ground-এ Evje আপনার আদর্শ পূর্ণ করিবার সাধনায় সকল জীবন ভরিয়া কঠিন পরিশ্রম করিল, আপনার স্বার্থকে খণ্ডন করিয়া সে বহু দিন ধরিয়া যত্নে যাহা গড়িয়া তুলিল, নৈসর্গিক শক্তির সংঘাতে তাহা এক নিমেষেই চূর্ণ হইয়া ধূলায় লুটাইয়া পড়িল। জীবনের স্বপ্ন ত এমনি করিয়া টুটিয়া যায়—এমনি করিয়া চক্ষের পলকে পৃথিবীর আনন্দ ধুইয়া মুছিয়া নিঃশেষ হইয়া যায়।

Life-এ বোয়ার জীবনের আনন্দের ও বেদনার যে ছবি আঁকিয়াছেন তাহা অতুলন। যাহাকে সকল দেহমন দিয়া ভাল বাসিয়াছি, সে যদি আমাদের প্রেমের সম্মান না করে, তবে চক্ষের নিমেষে পৃথিবী বিষে ভরিয়া ওঠে। তাই ভালবাসিয়াও অবজ্ঞা অনাদরের ভয়ে আপনার প্রেম আপনার কাছেই আমরা স্বীকার করিতে চাহি না—হৃদয়ের নিরুদ্ধ প্রেম প্রকাশ পায় পদে পদে প্রণয়াস্পদকে আঘাত করিয়া। একবার যদি তাহার কাছে আপনাকে ধরা দিই, তবে সকল স্বাতন্ত্র্য, সকল অভিমান কোথায় ভাসিয়া চলিয়া যাইবে, তাই প্রাণপণে আমরা আপনার ব্যক্তিত্বকে আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকি। Astrid তাই Reider-কে ভালবাসিয়াও নিজের কাছেও সে-কথা স্বীকার করে নাই—পদে পদে রাইডারের ইচ্ছাকে সে প্রতিহত করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু তাহার এ অভিমান যে তাহাকে কোথায় লইয়া যাইবে, তাহা কি সে নিজেই জানিত? শৈশবে সে মাতৃহীনা। কঠিন পিতার আদেশবাণী সহিয়াই তাহার জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে, পিতার স্নেহ, পিতার সহানুভূতি তাহার ভাগ্যে জোটে নাই। সংসারের আঘাত সহিয়া সহিয়া তাহার পিতার হৃদয়ও পাষাণ হইয়া গিয়াছে—পৃথিবীর ব্যবহারের প্রতিশোধ লইবে এই স্বপ্নেই তাহার জীবন কাটিতেছে। তাহার সকল আক্রোশ পুঞ্জীভূত হইয়া General Bang-কে ঘেরিয়া রহিয়াছে, সেই ব্যাঙের পুত্র রাইডারকেই যখন আষ্ট্রিড ভালবাসিয়া ফেলিল, তখন তাহার হৃদয়ের দ্বন্দ্ব ও সংশয় আমরা সহজেই অনুভব করিতে পারি। প্রেম-প্রত্যাখ্যানের আশঙ্কা, পিতার ক্রোধের ভয় এবং তাহাকে বেদনা দিবার অনিচ্ছার সঙ্গে যখন উন্মেষোন্মুখ তরুণ হৃদয়ের সকল প্রেম-কামনার সংঘাত লাগিয়া তাহার জীবন বেদনায় জটিল হইয়া উঠিল, তখন

হুমায়ুন কবির

যদি সে বাস্তব জগতের কঠিনতায় সন্ত্রস্ত হইয়া স্বপ্ন গড়িয়া আপনাকে ভুলাইতে চাহে, তাহা কি এমনি অপরাধের ?

কিন্তু ঘটনার সংস্থানে তাহাতেই আগ্রিডের জীবনে দুঃখের বোঝা জমিয়া উঠিল। Dr. Holth আগ্রিডের শৈশবের শিক্ষক। নানা দুঃখ বেদনার আঘাত সহিয়া দারিদ্র্যের সঙ্গে দিবানিশি যুদ্ধ করিয়া করিয়া সে অকাল-বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। যৌবন বাহার চলিয়া গিয়াছে, যৌবনের সঙ্গ সেই তত বেশী আকাঙ্ক্ষা করে। তাই হল্‌থ আগ্রিডের সঙ্গলাভ করিতে ব্যাকুল। আগ্রিডের সকল অন্তর তখন প্রেম ও সংশয়ের দ্বন্দ্বে কাতর, রাইডারকে বারে বারে আঘাত দিয়া তাহার হৃদয় ব্যথিত, তাই তাহার নিঃসঙ্গ জীবনে হল্‌থের সঙ্গলাভ করিয়া সে তাহার বন্ধুত্বে তৃপ্তি পাইবে আশা করিল। কিন্তু তাহার এ বন্ধুত্ব-আকাঙ্ক্ষাকে হল্‌থ প্রেম বলিয়া ভুল করিল, আগ্রিডের প্রতি তাহার আচরণ বন্ধুর ব্যবহার ছাড়িয়া প্রণয়ীর প্রেম নিবেদন হইয়া উঠিল।

আগ্রিড হল্‌থের প্রণয় নিবেদন গ্রহণ করিল অর্দ্ধ স্বপ্নাচ্ছন্ন চেতনায়। রাইডারকে তখন সে ভালবাসিয়াছে, আপনার অন্তরের সঙ্গে অহরহ যুদ্ধ করিয়া তাহার হৃদয় পরাজয় মানিয়াছে, আপনার মনে সে এখন জানে যে রাইডারের প্রেমলাভ না করিলে জীবনে তাহার সুখ নাই, অথচ সঙ্কোচ অভিমান লজ্জা এবং গর্ব্ব আসিয়া তাহার প্রেম প্রকাশের পথে বাধা দিতেছে। তাই সে দিবানিশি রাইডারকে ঘেরিয়া স্বপ্ন রচনা করে—হল্‌থের প্রণয়ের মধ্যে সে রাইডারের প্রণয়ই দেখিতে পাইল, তাই আপনাকে আপনি ভুলাইবার ব্যর্থ চেষ্টায় সে রাইডারের বলিয়া হল্‌থের প্রেমাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিল। কিন্তু স্বপ্ন টুটিয়া যায়। চমকিয়া সে দেখিল যে যে প্রেম সে গ্রহণ করিয়াছে তাহা ত তাহার প্রণয়াস্পদের নহে, তাহার সকল জীবন স্নেহমন, আঘাত খাইয়া টলিয়া উঠিল। হল্‌থের স্নেহমন সঙ্গে বন্ধুত্বেরও অবসান হইল।

রাইডারও আগ্রিডকে ভালবাসিয়াছে, কিন্তু বারে বারে তাহার কাছে আঘাত খাইয়া সে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। অবশেষে আগ্রিডকে যখন সে ত্যাগ করিল, তখন আগ্রিডের সকল চেতনা অনুশোচনার কাতর, আপনার অপরাধের বোঝা বহিয়া তাহার হৃদয় অবসন্ন। আত্মহত্যা ব্যতীত তাহার নিজের কাছে তাহার অপরাধ ক্ষালনের উপায় রহিল না।

কিন্তু Life যে আমাদের হৃদয়কে এমন করিয়া আকর্ষণ করে তাহার কারণ রাইডার ও আগ্রিডের করুণ প্রেম কাহিনী নহে। জীবনের এমন নিখুঁত সুন্দর ছবি সাহিত্যে কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। চিত্রকার Tangen, গৃহ-শিল্পী Henrik, রাইডারের কনিষ্ঠা ভগ্নী আগ্রিডের সখী Inga, তাহারা সকলেই আমাদের চোখের সম্মুখে ভাসিয়া ওঠে। তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধে, বন্ধুত্ব ও কলহে জীবনের যে চিত্র আমরা দেখিতে পাই, তাহাতে কেবলমাত্র নায়ক বা নায়িকার জীবনের ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ করিতে ভুলিয়া গিয়া আমরা তাহাদের মধ্যে সজীব জীবনের যে লীলা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাই দেখিতে থাকি। গিরিদেশে চঞ্চল আনন্দের যে প্রকাশ তাহাদের জীবনে আমরা দেখিতে পাই তাহার বর্ণ-বৈচিত্র্য, আলোক ও ঔজ্জ্বল্য আমাদিগকে মুগ্ধ করে। চিত্রের পানে চাহিয়া আমরা যেমন কেবলমাত্র বর্ণবিকাশ লক্ষ্য করি না, তাহাদের সকলের সামঞ্জস্য সম্পাদন করিয়া যে ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহারই পানে আমাদের দৃষ্টি, তেমনি জীবনের এই ছবিতে আমরা কেবল-মাত্র ব্যক্তিসমূহকেই দেখি না, তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধের ফলে যে সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাতে জীবনের যে বিশেষ প্রকাশ তাহাই লক্ষ্য করি। সাধারণ উপন্যাসের সঙ্গে Life'র পার্থক্য এইখানে। বোয়ারের বিশেষ কৃতিত্বও এইখানে যে তাহদের সকলের জীবনই আমাদিগকে সমান ভাবে আকর্ষণ করে। তাহারা সকলেই যে বাস্তব-জীবনের মানুষ, আপনার সুখ-দুঃখ সংঘাত সহিয়া প্রত্যেকে আপনার পথে চলিয়াছে, Life এই অনুভূতি আমাদের মনে আনিয়া দেয়। নরওয়ের বাতাস, নরওয়ের আকাশ, নরওয়ের ফুল-ফলের শোভা আমাদের কাছে মূর্ত্ত হইয়া ওঠে, অশ্রু-হাসিতে উজ্জ্বল যে চিত্রখানি আমাদের নয়নের সম্মুখে খুলিয়া যায়, তাহার মধ্যে মানুষ ও প্রকৃতি এমন ভাবে পরস্পরের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে যে তাহাদিগকে

বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা অসম্ভব। নরওয়ে ব্যতীত পৃথিবীর আর কোথাও জীবনের এমন প্রকাশ সম্ভব হইত না এ কথা যেমন আমরা অনুভব করি ঠিক তেমনি এ কথাও আমরা স্পষ্ট করিয়া বুঝি যে এই কয়টী নরনারীর সম্মিলন না হইলেও ঘটনা সংস্থান ঠিক এমনটী হইত না। ইহা একান্ত করিয়া আগ্রিড ও রাইডার, হল্‌থ ও ট্যানগেন, ঈঙ্গা ও হেনরিকেরই জীবনের কাহিনী—ইহা যেন কাহারও রচিত মানসপ্রসূত গল্প নহে।

বাস্তবতায় এমন অপূর্ব্ব নিদর্শন আর কোথায় আছে জানি না—কিন্তু কেবলমাত্র বাস্তব জীবনের ছবি আঁকিয়া বোয়ার তৃপ্ত হ'ন নাই। অন্ততঃ একখানি গ্রন্থে তিনি যে ঔপন্যাসিক একথা ভুলিয়া গিয়া তিনি যে অপরূপ সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছেন, উপন্যাস হিসাবে হয়ত তাহার মূল্য অপেক্ষাকৃত অল্প হইলেও কথাকাব্য হিসাবে তাহার তুলনা পৃথিবীর সাহিত্যে বিরল। বাস্তব জীবনের ছাপ হয়ত তাহাতে নাই, আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা মূর্ত্তি ধরিয়া সেখানে বিচরণ করিতেছে। আমাদের মনের গহন গহ্বরে কত সুখ দুঃখ বাসা বাঁধে, কত গোপন আশা, কত গভীর বেদনা যে সেখানে নিয়ত প্রকাশ মাগিয়া কাঁদিয়া ফেরে, তাহার সন্ধান কে রাখে? প্রতি দিবসের জীবনে যে কত অসম্পূর্ণ আশা, কত অর্দ্ধপরিস্ফুট স্বপ্ন অগোচরে ঝরিয়া পড়িতেছে, তাহারা যদি একবার ভাষা পাইয়া বাহির হইয়া আসিত! একটী জীবনের ক্ষুদ্র সীমানা লঙ্ঘন করিয়া আমাদের অন্তর আপনাকে উৎসারিত করিয়া দিতে চাহে, জীবনের বিচিত্র লীলায় বহুমুখী প্রকাশকে সম্ভোগ করিতে চাহে, কিন্তু আমরা আমাদের অন্তরের মধ্যেই তাহাদিগকে বাঁধিয়া রাখি। সমাজশাসনের ভয়ে, আপনার নীতিবোধের প্রেরণায় তাহারা বাহির জগতে প্রকাশিত হইতে পারে না—মনের গহন গোপনে ফুটিয়া গোপনেই ঝরিয়া পড়ে। জীবনের পূর্ণ প্রকাশ আমরা উপলব্ধি করিতে চাহি, কিন্তু তরঙ্গায়িত জীবন-সিন্ধুর কূল কিনারা খুঁজিয়া কে কোথায় সীমানা পাইবে? অনন্ত জীবন সমুদ্রে কত তরঙ্গ দিবসরাত্রি উঠিতেছে পড়িতেছে, ভাঙিতেছে, তাহার সন্ধান কে রাখে?

Prisoner Who Sang মানব জীবনের সেই গোপন আশা ও আকাঙ্ক্ষার কাহিনী। Andreas কেবলমাত্র আপনার ব্যক্তিত্ব লইয়া তৃপ্ত হইতে পারে নাই, বিচিত্র অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিবার জন্য বহু লোকের জীবন সে নিজের মধ্যে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছে। সংসারে ধনী রহিয়াছে, দরিদ্র রহিয়াছে, মানব চরিত্রের অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে সুখ ও দুঃখ বোধের কত অমৃত ও গরল ছড়াইয়া রহিয়াছে, তাহার কি কেহ শেষ করিতে পারে? জীবনের সর্ব্বতঃ প্রকাশ আণ্ড্রিয়াস আপনার মধ্যে দেখিতে চাহিয়াছে, প্রতি দিবসের কর্ম্মের মধ্যে যে বৈচিত্র্যহীনতা, বিভীষিকার মতন তাহা সে এড়াইয়া চলিতে চাহিয়াছে। তাই মাতার স্নেহ তাহাকে বাঁধিতে পারে নাই, বন্ধুর প্রীতি, তরুণীর প্রেম সকলই উপেক্ষা করিয়া সে কেবল আপনার সুখ সমাধানের প্রয়াস করিয়াছে।

কিন্তু বোয়ার বারে বারে একই কথা বলিয়াছেন, আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি নাই, কামনায় শান্তি মিলিবেনা। জীবনের বিচিত্র প্রকাশ আণ্ড্রিয়াসের হৃদয়কে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল। সকলের জীবনের সকল আশা, সকল ভরসা, সকল স্বপ্ন পুঞ্জিত করিয়া আপনার মধ্যে উপলব্ধি করিবার আকাঙ্ক্ষা তাহার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল, কিন্তু সে কি শান্তি পাইয়াছে? নিজের মধ্যে নিজেকে বাঁধিয়া রাখিলে, আপনাকে লইয়া আপনার স্বপ্ন রচনা করিলে সুখ মিলিবে না, আপনাকে ভুলিয়া অপরের প্রেমে আপনাকে বিলাইয়া না দিতে পারিলে তৃপ্তি নাই। তাই আণ্ড্রিয়াস অবশেষে মুক্তি পাইল তখন, যখন Sylvia-কে ভালবাসিয়া সিলভিয়ার সুখের জন্য আপনার সুখ সে বিসর্জ্জন দিল। জীবনের বিচিত্র প্রকাশভঙ্গি তাহার জন্য স্তব্ধ হইয়া গেল। ভালমন্দের সংঘাত শেষে তাহার প্রীতির বন্ধনে বন্দী হইয়া তবে সে শান্তি পাইল।

ভালমন্দের তন্ত্রীগুলি জীবনে জড়াইয়া গিয়াছে, কিন্তু সকল ভালমন্দকে অতিক্রম করিয়া মানবের মহত্ব, প্রেমে আপনাকে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছে—সেখানেই মানবের কল্যাণ। অন্তরের নিগূঢ়তম অন্ধকারে যে কামনা আপনাকে লুকাইতে চাহে, তাহা বোয়ারের দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই;

গভীর হৃদয়ে গোপনে যে স্বপ্ন পুষ্পের মত বিকশিয়া ওঠে, তাহাকেও তিনি প্রভাতের আলোকে প্রকাশ করিয়াছেন। মানুষের জীবনে মানুষের জন্য প্রেম মানুষের দুর্ব্বলতায় সহানুভূতির বাণীতে তাঁহার সাহিত্য মুখর। সুখদুঃখ সহিয়া, আলোক-অন্ধকার-বিলসিত পথে মানুষের আত্মা যে অমৃতের অভিযান চলিয়াছে, তাহারি পথের পাশে দাঁড়াইয়া তিনি দুর্ব্বল নিরাশা দীপ্ত করিয়া মানবাত্মার জয়গান গাহিয়াছেন। পথের কণ্টককে তিনি কণ্টক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, মানবজীবনের সকল ক্ষুদ্রতা, সকল নীচতা সকল হীনতা তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছে, কিন্তু রজনীর অন্ধকার অতিক্রম করিয়া যে আলোকের রেখা তাঁহার হৃদয় জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তুলিয়াছে, তাহারি আশ্বাসে তিনি আমাদিগকে অভয়বাণী শুনাইতেছেন। আদর্শের সিদ্ধির জন্য মৃত্যুকে লঙ্ঘন করিবার দুঃসাহস মানুষের নিত্যকার অধিকার; মৃত্যুর পথে মানুষ নিয়ত জীবনের সন্ধানে চলিয়াছে। সমতল ভূমিকে আলোকে উদ্ভাসিত করিবার আগে তরুণ প্রভাতের অরুণ কিরণ গিরিরাজের তুষার-শৃঙ্গেই বিকশিয়া ওঠে—মানব সমাজের সমতল ভূমিতে বোয়ার হিমালয়েরই চির তুষারাবৃত কাঞ্চনশিখর।

উমা

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

কোন্ সে অতীতে স্নেহের পুত্তলী উমারে তোমার হিমালয়
পাঠাইলে কোন্ দূর কৈলাসে, কে জানে তাহার পরিচয়।
কেটে গেল সারা দীর্ঘ বরষ পথ পানে রহি চাহিয়া,
ফিরিল না নীড় দুহিতা-বিহগ শূন্য পাথার বাহিয়া।
নিশ্বাস রুধি পুরুষ-কঠোর নির্ব্বাক গুরু বেদনায়
সহন-যোগ্য কঠিন পাষাণ করে নিলে বুঝি আপনায়;
বক্ষে আছাড়ি মেনকা তোমার হ'ল নির্ঝর শতধার
অশ্রু-দেহেতে উচ্ছ্বসি উঠে আজিও বিলাপ-গীতি তার।
তার পরে কত শত শতাব্দী ঊর্দ্ধ নয়নে দাঁড়ায়ে
এখনো রয়েছ হে গিরি প্রাচীন, শৃঙ্গের বাহু বাড়ায়ে;
শীত বসন্ত গ্রীষ্ম বরষা কোন মতে যায় কাটিয়া,
শরত আসিলে শিলা-পঞ্জর যেতে চায় তবু ফাটিয়া।
উমার পায়ের রক্ত যাবক রাঙাইয়া দেয় উষারে,
উমার মুখের মৃদুল হাসিটি ঝিকিমিকি করে তুষারে,
উমার দেহের অতসী বরণ পীতাভ রৌদ্রে ঝলকে,
শাল-নির্য্যাস-সুরভি উথলে যেন সে উমারি অলকে।
বিদায়-দীর্ণ হিয়াটি তখন অন্তরে তুলি হাহাকার
'উমা' 'উমা' দুটি আখর-মন্ত্র জপে তন্ময়ে অনিবার,—
সে ব্যাকুল ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে তাই 'মা' 'মা' রবে শরতে
ছড়াইয়া পড়ে নিখিল ভারত-ভূমির বুকের পরতে।



৭

ড্রয়িং-রুম, এবং তৎপরে আর একটি কক্ষ, পার হইয়া ভিতরের বারান্দায় পৌছিয়া অন্তঃপুরের মূর্ত্তি দেখিয়া কমলা যতখানি বিস্মিত ততখানি খুসী হইল। হ্যাট্-কোট-ধারী স্বামী সাহেবের পশ্চাতে শাড়ী-পরিহিতা শান্ত স্ত্রী-টির মত, হালফ্যাশনের বহির্বাটির পশ্চাতে সেকেলে প্রথার অন্তঃপুরটি নির্ব্বিবাদ নিশ্চিন্ততায় অবস্থান করিতেছিল। উভয়ের বহিরাবরণে যতখানিই বৈলক্ষণ্য থাকুক না কেন, অন্তরের যোগ-প্রবাহে তাহাতে কিছুমাত্র বাধা পড়ে নাই। বহির্বাটি হইতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া মনে হয় রেল হইতে নামিয়া, ষ্টীমারে না চড়িয়া, নৌকায় চড়িলাম। একটি চলে কলে, অপরটি পালে; কিন্তু গতি-বিধির যোগ-সূত্রে পরস্পরে আবদ্ধ।

নিত্য-লিপ্ত পরিচ্ছন্ন সুবৃহৎ অঙ্গন; চতুর্দ্দিকে চক্-বাঁধা বারান্দা, তাহার কোলে কোলে কক্ষ-শ্রেণী। উঠানের একদিকে শস্য পূর্ণ তিনটি মরাই, তাহার পাশে একটি সান-বাঁধানো চাতাল, উপরে খাপ্‌রার ছাউনি। চাতালের উপর গুরু তার পাথরের জাতা; দুইটি স্থানীয় রমণী মৃদু-গীত-গুঞ্জনের সহিত গম পিষিতেছে। অপর দিকে মর্ম্মর-মণ্ডিত তুলসী-মঞ্চে তুলসী গাছ। তাহার ঘন-পল্লবিত শাখায় শাখায় নিষ্ঠাবতী অন্তঃপুরচারিণীগণের সেবা-যত্নের চিহ্ন অঙ্কিত। চতুর্দ্দিক মার্জ্জিত, লিপ্ত,—কোথাও মালিন্যের বিন্দু মাত্র সংস্পর্শ নাই। মনে হয় লক্ষ্মী যেন গৃহ-পদ্মাসনটি আলোকিত করিয়া বসিয়াছেন।

বিস্ময়ে-পুলকে ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া কমলা বলিল, "কি চমৎকার!"

শোভা মৃদু হাসিয়া বলিল, "কি চমৎকার?"

"তোমাদের বাড়ির ভেতরটি।"

"তোমার ভাল লাগ্‌চে?"

"খুব!"

চতুর্দ্দিকে একবার ত্বরিত দৃষ্টিপাত করিয়া শোভা বলিল, "খুব?—কি এমন দেখ্‌লে কমলা যে খুব ভাল লাগ্‌ল!"

শোভার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সহাস্যমুখে কমলা বলিল, "তা তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না শোভা। যে যেখানে প্রতিদিন বাস করে সেখানকার সৌন্দর্য্য তার চোখে ঢাকা প'ড়ে যায়। ও-গুলো কি বল ত?" বলিয়া অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া কমলা অঙ্গনের একদিকে দেখাইল।

সবিস্ময়ে শোভা বলিল, "ও-গুলো মরাই। মরাই তুমি কখনো দেখনি?"

লজ্জিত মুখে কমলা বলিল, "এই মরাই?—না, এর আগে আমি মরাই কখনো দেখি নি।"

"মরাইয়ে কি হয় তা জান ত?"

শোভার এ প্রশ্নে কমলা হাসিয়া ফেলিল; বলিল, "ধান-টান থাকে,—বইয়ে পড়েছি।"

অন্তরাগ

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

পাশের একটি কক্ষে গিরিবালা গৃহকর্ম্মে রত ছিলেন, শোভার সহিত অপরিচিত কণ্ঠের কাথাবার্ত্তা শুনিয়া কৌতূহলী হইয়া বাহিরে আসিয়া কমলাকে দেখিয়া বলিলেন, "এটি কে শোভা ?"

শোভা স্মিতমুখে বলিল, "আন্দাজ কর ত মা, কে ? আন্দাজ ক'রে তোমার বলা উচিত !"

গিরিবালা কোনো কথা বলিবার পূর্ব্বে কমলা তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া গিরিবালার পদধূলি লইয়া প্রণাম করিয়া হাসিমুখে বলিল, "আন্দাজ আর কি করবেন মা ? আন্দাজ করবারো একটা উপায় থাকা চাই ত।"

কমলার চিবুক স্পর্শপূর্ব্বক চুম্বন করিয়া গিরিবালা সহাস্তমুখে কহিলেন, "সে উপায় আছে বৈ-কি মা। লক্ষ্মীর মত এমন শ্রী কমলার ভিন্ন আর কার হবে ? তুমি কমলা। বিন্তুর মুখে তোমার এত সুখ্যাতি শুনেছি যে তোমার মত এমন সুন্দরী আর একটি মেয়ে অল্প দিনের মধ্যে দেখ্‌তে পাওয়া সম্ভব নয়, এ আন্দাজ করা খুব শক্ত নয়।"

যে কথার মধ্যে এই অপরিমিত রূপ-প্রশংসা নিহিত রহিয়াছে সে কথার একটা কোনো উত্তর দিতে পারিলে বোধহয় ভাল ছিল,—সুরুচি-সঙ্গত মৃদু প্রতিবাদের মত যা হয় একটা কিছু; কিন্তু—মুখ-মণ্ডলে শুধু একটা ফিকা রক্তোচ্ছ্বাস ভিন্ন কমলার মুখ দিয়া কোনো কথাই বাহির হইল না।

শোভা জননীর কথায় প্রীত হইয়া বলিল, "আমি তাই ত বলেছিলাম মা, তুমি ঠিক আন্দাজ করতে পারবে।"

এবার কমলা কথা কহিল; বলিল "মার আন্দাজ ঠিক হয়েছে, কিন্তু ভুল প্রণালীতে।"

সকৌতুহলে গিরিবালা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন মা ? ভুল প্রণালীতে কেন ?"

শোভা হাসিয়া বলিল, "বুঝতে পারছ না মা ?—কমলা বল্‌তে চায় ও এখন কিছু সুন্দরী নয় যে তাকে দেখে তোমার আন্দাজ করা উচিত হয়েছে যার বিষয়ে বিন্তুদা অত সুখ্যাতি করেন ও সেই কমলা।" তাহার পর কমলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "যে যে-জিনিষ প্রতিদিন দেখে সে-জিনিষের সৌন্দর্য্য তার চোখে ঢাকা প'ড়ে যায়। তুমি যদি তোমাকে নিত্য না দেখ্‌তে তা হ'লে—বাকিটুকু বুঝেছ ত কমলা ?" বলিয়া শোভা উচ্ছ্বসিত হইয়া হাসিতে লাগিল।

কমলা সহাস্যমুখে বলিল, "বুঝেছি, আমারই অস্ত্রে আমাকে মারতে চাও।"

শোভা হাসিয়া বলিল, "দেখ্‌ছ ত ? নিজের অস্ত্র কেমন সময়ে সময়ে নিজেরই গলা কাটে ?"

কমলা বলিল, "দেখ্‌চি বৈ কি !"

কমলার আত্মীয়-পরিজন এবং অপরাপর বিষয়ে সমস্ত সংবাদ লইয়া গিরিবালা দ্বিজনাথ ও কমলার জন্ত জলযোগের ব্যবস্থা করিতে প্রস্থান করিলেন। কমলাকে লইয়া শোভা তাহার নিজ কক্ষে উপস্থিত হইল।

"এইটি তোমার ঘর ?"

"এইটি।"

"এ ঘরে তুমি একলা শোও ?"

"আমি আর বিশু দুজনে শুই। পাশের ঘরে মা থাকেন।"

"বিশু কে ?"

বিস্ময় বিস্ফারিত চক্ষে শোভা বলিল, "বিশুকে জানো না ? বিশু আমার দাদার বড় ছেলে।"

"তোমার দাদার বড় ছেলে ? তা হ'লে তোমার বউদিদি কই ?"

শোভা বলিল, "বউদি আজ সকালে ছেলেদুটিকে নিয়ে তাঁর মামীর বাড়ী গেছেন। এখনি আসবেন। দেখো, তোমাকে দেখে কত খুসী হবেন।"

ঘরের একদিকে একটা আলমারীর ভিতর বাঙ্‌লা ও ইংরাজী বহুসংখ্যক পুস্তক সাজানো রহিয়াছে দেখিয়া কমলা আলমারীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, "তুমি এত বই পড় শোভা ?"

শোভা বলিল, "এত বই পড়লে ত তোমার মত পণ্ডিত হ'তাম কমলা ! পড়ি আর কই ?"

শোভার কথা শুনিয়া কমলা মৃদু হাস্য করিল, কিছু বলিল না। তাহার পর কথায় কথায় ক্রমশঃ ছবি আঁকার কথা পুনরায় উঠিল।

"শোভা ?"

"কি ভাই ?"

"তোমার ছবি আঁকতে বিনয়বাবু প্রত্যহ কত সময় নেন ?"

"তার কি কোনো ঠিক আছে ? কোনো দিন পনেরো কুড়ি মিনিট—কোন দিন বা তিন ঘণ্টা !"

"কেন,—এ রকম কেন ?"

শোভা হাসিয়া বলিল, "কেনর কোনো উত্তর আছে ? খেয়াল! শিল্পীমানুষ, যেদিন যেমন মেজাজ থাকে।"

একমুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া কমলা বলিল, "ছবি আঁকবার সময়ে তোমার সঙ্গে গল্প করেন ?"

"অনবরত।"

"কি সব গল্প করেন ?"

"তারো কি ঠিক আছে ? যা-তা। বেশীর ভাগ তোমার কথা বলেন।"

শুনিয়া কমলা মনে মনে চমকিয়া উঠিল। সবিস্ময়ে বলিল, "বেশীর ভাগ আমার কথা ? কি বিপদ! আমার কথা এমন উনি কি জানেন যে আমার কথা এত বলেন ?"

শোভা বলিল, "এই ধর, আজই আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন যে লাল স্থলপদ্ম আর শাদা স্থলপদ্ম, এই দুইয়ের মধ্যে আমার কোন্‌টা ভাল লাগে। আমি বল্‌লাম শাদা। তাতে উনি বললেন, 'কমলার ভাল লাগে লাল'।"

"ওঁর কোনটা ভাল লাগে তা কিছু বল্‌লেন ?"

"বল্‌লেন, লাল।"

শুনিয়া কমলার মুখ অনেকটা লাল স্থলপদ্মেরই মত লাল হইয়া উঠিল।

"আচ্ছা ভাই কমলা, তোমার কি শাদা স্থলপদ্ম একেবারেই ভাল লাগে না ? আমাদের বাড়ীর পেছন দিকে লাল আর শাদা দু'রকমই আছে; তুমি যদি দেখতে চাও তোমাকে দেখাতে পারি শ্বেত স্থলপদ্ম, গাছ আলো ক'রে না হ'ক, গাছ কালো ক'রেও দাঁড়িয়ে নেই।" বলিয়া শোভা হাসিতে লাগিল।

এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া কমলা বলিল, "আমাদেরো বাড়ীর পিছন দিকে শ্বেত স্থলপদ্মের গাছ আছে—আজ দুপুরবেলা দু'রকম স্থলপদ্ম মিলিয়ে দেখছিলাম। কি জানি কেন তখন ব'লেছিলাম লাল, আমারো শ্বেত স্থলপদ্মই ভালো লাগে।"

কমলার কথা শুনিয়া শোভা উল্লসিত হইয়া উঠিল। বলিল, "তোমারও শ্বেত স্থলপদ্ম ভালো লাগে ?—বলতে হবে এ কথা বিনুদাদাকে। দেখি তিনি কি বলেন।"

ব্যস্ত হইয়া কমলা বলিল, "ছি! শোভা! এ কথা কখনো বিনয়বাবুকে বোলো না!"

সবিস্ময়ে শোভা বলিল, "কেন ? বল্‌লে ক্ষতি কি হবে ?"

"তিনি মনে মনে কি ভাববেন বল দেখি ?—সকালে লাল, বিকেলে শাদা! আরো একটা রঙ্‌ থাকলে কাল সকালে হয়ত সেইটেই হোত!"

শোভা বলিল, "তাতে কোনো দোষ হয় না। শাদা যদি সত্যিই ভালো লেগে থাকে তাহলে সকালে লাল ভালো ব'লেছ ব'লে বিকেলেও যে লাল ভালো বলতে হবে তার কোনো মানে নেই।"

কথাটার শেষ নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে বাহিরে ঠক্ ঠক্ করিয়া জুতার শব্দ শুনা গেল, এবং পর মুহূর্ত্তেই 'পিচিমা এচেচি' বলিয়া তিন বৎসরের ছেলে বিশ্বপতি প্রশান্ত মনে ঘরে প্রবেশ করিল; কিন্তু ঘরে প্রবেশ করিয়া অপরিচিতাকে দেখিয়াই মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার মুখে চক্ষে একটা কঠিন ভাব ফুটিয়া উঠিল। ত্বরিত-পদে শোভার নিকট উপস্থিত হইয়া দৃঢ় মুষ্টিতে তাহার অঞ্চল-প্রান্ত ধরিয়া নিঃশব্দ ঔৎসুক্যের সহিত সে কমলার দিকে চাহিয়া রহিল।

বিশুর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে স্মিতমুখে শোভা জিজ্ঞাসা করিল, "বিচু, ইনি কে বল্ দেখি ?"

কোনো কথা না বলিয়া কমলার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া বিশু বার দুই তিন সজোরে মাথা নাড়িল,—অর্থাৎ এ-সকল অবাঞ্ছনীয় প্রসঙ্গে লিপ্ত হইতে সে আদৌ স্বীকৃত নহে।

শোভা বলিল, "ইনি তোর কমলাপিচি হন।"

ঠিক পূর্ব্বের মত নিঃশব্দে শিরঃসঞ্চালিত করিয়া বিশু তাহার পরিপূর্ণ অনাসক্তি ব্যক্ত করিল। কিন্তু কমলা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সহসা সকলের অতর্কিতে একটা কাণ্ড করিয়া বসিল; দুই বাহু দিয়া হঠাৎ বিশ্বপতিকে একেবারে তুলিয়া লইয়া বক্ষের উপর স্থাপন করিল। এই আকস্মিক দুর্ঘটনার জন্ত বিশু একেবারেই প্রস্তুত ছিল না; কি করিবে ভাবিয়া না পাইয়া কমলার অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ স্বরূপ সে নিজের আলম্বিত পদদ্বয় কমলার দেহ হইতে যথাসম্ভব দূরে রাখিয়া নিঃশব্দে নাড়িতে লাগিল। মস্তক কমলার মুখের অত্যন্ত নিকটে থাকায় এবার সে শিরঃসঞ্চালন সমীচীন মনে করিল না।

বামবাহু দ্বারা বিশুর পৃষ্ঠদেশ জড়াইয়া ধরিয়া দক্ষিণ-হস্তে তাহার চিবুকস্পর্শ করিয়া সহাস্তমুখে কমলা বলিল, "সত্যি বিচু, আমি তোমার কম্‌লাপিচি।"

অবশেষে সুন্দর মুখের জয় হইল; বিশ্বপতি পদ সঞ্চালন বন্ধ করিয়া কমলার স্কন্ধে তাহার পরাজিত মস্তক ন্যস্ত করিল।

এমন সময়ে ঘরে প্রবেশ করিল শৈলজা। বিশুকে কমলার ক্রোড়ে দেখিয়া সে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "এরি মধ্যে এসে কাঁধে চড়েছ?"

কমলা হাসিয়া বলিল, "এরি মধ্যে নয়; অনেক পরে, আর অনেক কষ্টে।"

শৈলজা হাসিমুখে বলিল, "তুমি ওকে চেন না ভাই। এমন পেয়ে বস্‌বে তখন যাবার সময়ে কাঁধ থেকে নামাতে পারবে না।"

কমলা বলিল, "বেশত না নামে বাড়ি নিয়ে যাব।"

এই আদরের উক্তির মধ্যে বিপদের আশঙ্কা দেখিয়া বিশু আবার পদসঞ্চালন আরম্ভ করিল এবং উক্ত প্রক্রিয়া উত্তরোত্তর বাড়াইয়া তুলিয়া অবশেষে ক্রোড় হইতে নামিয়া পড়িল।

তখন শৈলজা ঔৎসুক্য-ভরে কমলার সহিত আলাপনে প্রবৃত্ত হইল। নানা কথাবার্তার পর অবশেষে ছবি আঁকার কথা উঠিল। শৈলজা বলিল, "তোমার ছবি আঁকবার বিষয়ে বিনয়ঠাকুরপোর আগ্রহের আর শেষ নেই। কাল এঁদের কাছে দুঃখ করছিলেন যে তোমার মুখ আঁকবার মত ভাল রং-ই ঠিক করতে পারছেন না। এত বড় আঁকিয়ে, রং-এর খেলা উনি সবই জানেন; সে সব কথা কিছু নয়। আসলে, তোমার ছবি ভাল কি ক'রে হবে সে বিষয়ে ভাবনার অন্ত নেই।"

শোভা বলিল, "আমার মুখ আঁকবার সময়ে সে-সব বালাই কিছুই নেই। রং পছন্দ না হ'লে আইভরি ব্ল্যাকের পরিমাণ একটু বাড়িয়ে দিলেই আর কোনো গোল থাকে না।" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

শৈলজা তাহার এই সরলহৃদয়া ননদটিকে অন্তরতম প্রদেশে ভালবাসিত। কমলার সম্মুখে শোভার এই আত্ম-নিন্দা সে সহ্য করিতে পারিল না; ঈষৎ ঝঙ্কারের সহিত বলিল, "তা মনে কোরো না! বরং কমলার রং ফলানো সহজ, তোমার রং ফলানো মোটেই সহজ নয়। তুমি ত কালো নও।"

শৈলজার কথায় শোভার হাসির মাত্রা আরো বাড়িয়া গেল। বলিল, "শাদাও নই, কালোও নই, তবে আমি কি বউদি?—নীল?"

কমলা বলিল, "বোধ হয়। নীলপদ্মের কথা শুনেছি, চোখে কখনও দেখিনি; কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হয় শোভা, নীলপদ্ম বোধহয় তোমারি মত কিছু হবে।"

কমলার এই কথায় শৈলজা মনে মনে অত্যন্ত খুসী হইল। তুলনায় শোভার বর্ণ খর্ব্ব হইতেছিল বলিয়া তাহার চিত্তে কমলার প্রতি অলক্ষিতে সামান্য যে একটু বিদ্বেষ আসিয়াছিল তাহা নিমেষে অপসৃত হইয়া গেল। প্রসন্ন-মুখে সে বলিল, "ঠিক বলেছ! তোমাদের দুজনকে দেখে আমা মনে হয় একটি লালপদ্ম আর একটি নীলপদ্ম।"

পদ্ম দুটির পক্ষ হইতে এ বিষয়ে হয় ত' কিছু প্রতিবাদ হইত, কিন্তু তাহার অবসর হইল না। গিরিবালা প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "বউমা, ঠাকুর ব'লে গেল খাবার তৈরী হয়েচে, তুমি গিয়ে বিজনাথ বাবুর ঠাঁই কর।"

তখন শৈলজা গৃহিণীর আদেশ পালন করিতে দ্রুত পদে প্রস্থান করিল।

(ক্রমশঃ)

যৌবনে সুরেন্দ্রনাথ

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল তাদ্রের 'প্রবাসী'তে তাঁহার 'সত্তর বৎসর প্রবন্ধে স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনের একটি চিত্রাভাস দিয়াছেন। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

১৮৭১ ইংরাজীর নভেম্বর মাসের শেষে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিলাত হইতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া শ্রীহট্টে যান। বিলাত ও ভারতবর্ষ এখন প্রায় "এঘর-ওঘর" হইয়াছে। সুরেন্দ্রনাথ প্রথম যখন বিলাতে যান তখন এইরূপ ছিল না। রাজা রামমোহনই প্রথম বিলাত-যাত্রী বাঙ্গালী। তাঁহার পরে তাঁহার বন্ধু প্রিন্স দ্বারকানাথ য়ুরোপে গিয়াছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরই শিক্ষার্থীরূপে বোধ হয় প্রথম বিলাত যান। সত্যেন্দ্রনাথই প্রথম বাঙ্গালী সিভিলিয়ান্। তবে তাঁহার কর্ম্মজীবন বোম্বাই-প্রদেশেই অতিবাহিত হয়, বাংলায় নহে। ইহার পরে তিনজন বাঙ্গালী এক জাহাজে বিলাতে যাইয়া একইসঙ্গে সিভিলিয়ান্ হইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন—৺রমেশচন্দ্র, ৺বিহারীলাল গুপ্ত এবং ৺সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সে-কালের বিলাত-ফেরতা বাঙ্গালীরা পোষাক-পরিচ্ছদে, আহারে বিহারে, চালচলনে—সকল বিষয়েই ইংরাজের অনুকরণ করিয়া চলিতেন। ইঁহাদিগকে নির্দ্দেশ করিয়াই নবীনচন্দ্র 'অবকাশরঞ্জিনী'তে লিখিয়াছিলেন :—"সিংহচর্ম্মে তুমি মেষ অহ্-প্রাণ"।

সুরেন্দ্রনাথ শ্রীহট্টে যাইয়া সাহেবীভাবেই চলিতে-ফিরিতে আরম্ভ করেন। দেশের শিক্ষিত ভদ্রলোকদিগের সঙ্গেও বাংলায় কথা কহিতেন কি না সন্দেহ। ইংরাজ সিভিলিয়ানেরা যে-ভাবে থাকিতেন, সুরেন্দ্রনাথও সেইভাবেই চলিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণীও শ্রীহট্টে গিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ যেরূপ সর্ব্বদা সাহেব সাজিয়া থাকিতেন, তাঁহার ব্রাহ্মণীও সেইরূপ বিবি সাজিয়া বেড়াইতেন। সুরেন্দ্রনাথ ঘোড়ায় চড়িয়া সহরের সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতেন। তাঁহার গৃহিণীও সে-যুগের ইংরাজ মহিলাদের মত মেয়েজিনে (Lady's Saddle) চড়িয়া অশ্বপৃষ্ঠে অপরাহ্ণে হাওয়া খাইতে বাহির হইতেন। সে-সময়ে ম্যাক্‌কার্টিস (McCartis) নামে একজন আর্ম্মেণী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীহট্টে ছিলেন। ইঁহার সঙ্গে বন্দ্যোপাধ্যায় দম্পতির বিশেষ আত্মীয়তা জন্মে। ইঁহারা তিনজনে যখন ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতে বাহির হইতেন, তখন আমরা বালকের দল তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য প্রায়ই রাস্তার ধারে আসিয়া দাঁড়াইতাম। সেই সময়ে সাদারল্যাণ্ড (Sutherland) নামে একজন ফিরিঙ্গী সিভিলিয়ান্ শ্রীহট্টের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। সাদারল্যাণ্ড একজন অতিকায় পুরুষ ছিলেন। এরূপ গল্প শোনা গিয়াছে যে, ইনি যখন প্রথমে শ্রীহট্টে বদলী হইয়া যান, তখন ম্যাজিষ্ট্রেটের দপ্তরে বা এজলাসে এমন চৌকী ছিল না যা তাঁহার বিশাল বপু ধারণ করিতে পারে বা তাঁহার ভার সহ্য করিতে পারে। আরও গল্প আছে যে, সাদারল্যাণ্ড সাহেব প্রতিদিন সান্ধ্য-ভোজের সময় একটা আস্ত মিষ্টি কুমড়া নিঃশেষ করিতেন। সুরেন্দ্রনাথ প্রথমে শ্রীহট্টে গেলে সাদারল্যাণ্ড সাহেব তাঁহার সঙ্গে অতিশয় সস্নেহ ব্যবহার আরম্ভ করেন। সুরেন্দ্রনাথের ইহা বড় ভাল লাগে নাই। এই স্নেহের আবরণের ভিতর দিয়া একটা অনুকম্পার ভাব উঁকি মারিত। সুরেন্দ্রনাথকে সাদারল্যাণ্ড ইংরাজ সিভিলিয়ানদিগের মর্য্যাদা না দিয়া এইরূপে তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে থাকেন। ইহাতে সুরেন্দ্রনাথের আত্ম-সম্মানে ও স্বজাত্যাভিমানে আঘাত লাগে। এইরূপে কিছুদিন ধরিয়া শ্রীহট্টের ইংরাজ সিভিলিয়ানদিগের এবং সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে একটা অসন্তোষ এবং বিরোধ অলক্ষ্যে ঘনাইয়া উঠিতে থাকে। এই সময়ে বন্দ্যোপাধ্যায়-গৃহিণী ঘোড়দৌড়ের মাঠে যাইয়া যে-মঞ্চে ইংরাজ বিবিরা বসিয়াছিলেন সেই মঞ্চে আপনার স্বামীর পদোচিত আসন দখল করিয়া বসেন। এই হইতেই সুরেন্দ্রনাথের পদচ্যুতির আয়োজন আরম্ভ হয়। সুরেন্দ্রনাথ এমন কোন-গুরুতর অপরাধ করেন নাই যাহার [illegible] র্ত্তঃ তাঁহার উপরে এমন কঠোর দণ্ড বিহিত হ[illegible] মূল ব্যাপারটা

কিছুই নহে। একটা ফৌজদারী মামলার নথীতে যে-সকল কথা লিখা ছিল সুরেন্দ্রনাথ নিজে তাহার প্রত্যেক কথার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ না করিয়া সহি করিয়াছিলেন। ম্যাসপ্রেট (Muspratt) নামে একজন সিভিলিয়ান তখন শ্রীহট্টের জজ ছিলেন। তিনি, সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে যে-সকল অভিযোগ আনা হইয়াছিল তাহার সমুদয় নথী-পত্র পরীক্ষা করিয়া বলেন, সুরেন্দ্রনাথের অপরাধ অনবধানতা (carelessness)। আর ইহার সঙ্গেসঙ্গে এ কথাও কহেন যে, যে-সময়ে তিনি এই ভুল নথী সই করেন তখন তাঁহার উপরে অত্যধিক কাজের চাপ পড়িয়াছিল। জজ সাহেব হাইকোর্টকে লেখেন যে, সুরেন্দ্রনাথকে কিছুদিনের জন্য প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিলেই তাঁহার এই সামান্য অপরাধের যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হইবে। হাইকোর্ট এ বিষয়ে কি অভিমত প্রকাশ করেন জানি না। তবে গবর্ণমেন্ট এই সামান্য অপরাধের বিচার করিবার জন্য একটা বিশেষ কমিশন নিযুক্ত করেন। এই কমিশনের মন্তব্যের ফলে সুরেন্দ্রনাথকে অযথা কলঙ্কের ডালি মাথায় দিয়া সিভিল সার্ভিস হইতে সরাইয়া দেওয়া হয়। আমি তখন শ্রীহট্ট জেলা স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে পড়ি। মোটামুটি সুরেন্দ্রনাথের মোকদ্দমার সকল কথাই জানিতে পাই।

প্রাচীন ভারতের শাসনপদ্ধতি

গত শ্রাবণের 'মাসিক বসুমতী'তে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রাচীন ভারতে শাসনপদ্ধতি বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। প্রতীচ্যের বর্ত্তমান শাসনপদ্ধতির উল্লেখের পর তিনি এদেশের পুরাতন শাসন পদ্ধতির এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন —

আমরা দেখিতে পাই যে, প্রাচীন পল্লীগ্রামে ও নগরে এক একটা পঞ্চায়েত ছিল। এক একটি গ্রাম বা পল্লী যেন এক একটি ক্ষুদ্র জন-তন্ত্রবাদমূলক সমাজ ছিল। পল্লীবাসীরা তাহাদের মধ্য হইতে কয়েক-জনকে (অনেক সময় ৫ জনকে) তাঁহাদের নিয়ন্তা বা গ্রামণী নিযুক্ত করিতেন। ইঁহারাই ছিলেন গ্রামবাসীগণের মুখপাত্র। ইঁহারা কয়েক বৎসর অন্তর যে গ্রাম্য প্রজাসাধারণের প্রকাশ্য ভোটের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইতেন, সেরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে যিনি স্বীয় চরিত্র ধার্ম্মিকতা, নিরপেক্ষতা এবং বিচার-বুদ্ধি অনুসারে প্রকৃতপক্ষে গ্রাম-বাসীর শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণে সমর্থ হইতেন, তিনি গ্রামের নিয়ন্তা বা গ্রামমুখ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেন। ইঁহারা গ্রামবাসীর সর্ব্বপ্রকার বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিতেন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপরাধের বিচার করিতেন। তখন রাজ-শাসন এত প্রবল এবং সমাজের সর্ব্বস্তরে অনু-প্রবিষ্ট ছিল না। ছোট ছোট ব্যাপার মীমাংসার জন্য রাজদ্বারে নীত হইত না; যাঁহারা মণ্ডল বা পটেল ছিলেন সেই পঞ্চায়েৎগণ সম্মিলিত হইয়া অপরাধীর বিচার করিতেন। সাধারণতঃ গ্রামপ্রান্তস্থিত বটবৃক্ষ বা অশ্বত্থবৃক্ষমূলে গ্রাম্য পঞ্চায়েতের বৈঠক বসিত। গ্রাম্য জনসাধারণ বিচার দেখিবার জন্য তথায় সমবেত হইতেন। পঞ্চায়েৎ বাদী প্রতি-বাদীর কথা ও সাক্ষীদিগের সাক্ষ্যবাক্য শুনিয়া মামলার বিচার-নিষ্পত্তি করিতেন। সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে উক্তি প্রত্যুক্তি করিতে হইত বলিয়া লোক সহসা মিথ্যা কথা বলিতে সাহস পাইত না। শপথগ্রহণপূর্ব্বক মিথ্যা কথা বলা লোক মহাপাপ বলিয়া বিবেচনা করিত। ফলে সমস্ত প্রতিবেশীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া মিথ্যা কথা বলিতে লোকের সাহসে কুলাইত না। আর কোন্ কথাটা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা, তাহা বুঝিতে বিচারকদিগের বিলম্ব ঘটিত না। যাহারা দোষী বলিয়া বিবেচিত হইত পঞ্চায়েতের বিচারে তাহারা সামাজিক দণ্ড পাইত। পঞ্চায়তের মধ্যে মতভেদ প্রায়ই হইত না: যদি মতভেদ হইত, তাহা হইলে গ্রামের উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ যে পক্ষে মত দিতেন,—সেই মতই প্রবল হইত। আর যদি দুই পক্ষে মতভেদ প্রবল হইত, তাহা হইলে 'পঞ্চগ্রামী' করা হইত। পঞ্চগ্রামী অর্থে পাঁচখানি পাশাপাশি গ্রামের পাঁচজন শ্রদ্ধা-ভাজন ও বিশ্বস্ত ব্যক্তির দ্বারা বিচার ও মীমাংসা। তাঁহাদের বিচারই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইত। ইহা ভিন্ন গ্রামের পঞ্চায়েৎ অভাব অভিযোগ সকল বিষয়ের বিবেচনা করিয়া তাহার উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন। এখন এই ব্যবস্থার কিঞ্চিৎ অবশেষ সুদূর পল্লীগ্রামে দেখিতে পাওয়া যায়। এখন পঞ্চায়েৎরা আর ফৌজদারী বা দেওয়ানী মামলার বিচার করেন না। তবে সামাজিক অপরাধের বিচার করিবার জন্য সময়ে সময়ে বৈঠক বসাইয়া থাকেন।

অতি প্রাচীনকালে এই পল্লী পঞ্চায়েৎ প্রথাই প্রবল ছিল। বড় বড় সহরগুলিতে বহু লোকের সমাবেশ ছিল বলিয়া তথায় গণতন্ত্র দৃঢ়-ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তথায় বহু লোকই নিয়ন্তার কার্য্য করিতেন। ইঁহারা সকলে সমবেত হইয়াই সহরের রাজকার্য্য পরিচালিত করিতেন। ম্যাগেস্থেনিস ভারতে আসিয়া এইরূপ সহর অনেক দেখিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন,—At last after many generations had come and gone the sovereignty, it is said, was dissolved and democratic government set up in the cities. অর্থাৎ বহু পুরুষ আবি-র্ভূত এবং তিরোহিত হইবার পর জন-বহুল নগরগুলিতে রাজতন্ত্র লুপ্ত এবং গণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল শুনা যায় (Magasthenes Frag)

[illegible] রাজা বা রাজ্যপাল,—সেই সকল গ্রামমুখ্যদিগের মধ্য হইতেই তাহাদের সভাসদ্ বা পারিষদ মনোনীত করিতেন। সুতরাং তাঁহার মনোনীত ব্যক্তিরাই দেশের লোকের মনোনীত ব্যক্তি হইতেন। কামন্দকীয় নীতিসারে উক্ত হইয়াছে,—

প্রখ্যাতবংশমক্রূরং লোকসংগ্রাহিনং শুচিম্।
কুর্বীতাত্মহিতাকাঙ্ক্ষী পরিবারং মহীপতিঃ ॥ কাম ৪।১০ ॥

বিখ্যাতবংশ, অক্রূর, লোকসংগ্রাহী, যাহারা মানুষকে সহজে আকৃষ্ট করিতে পারেন এবং যাঁহারা শৌচাচারসম্পন্ন, আত্মহিতাকাঙ্ক্ষী, রাজা তাঁহাকেই পারিষদ মনোনীত করিবেন।

বিষ্ণুসংহিতাতেও ঠিক এইরূপ কথা বলা হইয়াছে, যথা—

কুলকর্ম্মব্রতোপেতাশ্চ রাজ্ঞা সভাসদঃ কার্য্যা রিপৌ মিত্রে চ
যে সমাঃ কামক্রোধ-ভয়লোভাদিভিঃ কার্য্যার্থিভিরনাহার্য্যাঃ ॥

বিষ্ণু ৩,৫২ ॥

যে সকল লোক সদ্বংশজাত, ধর্ম্মসংস্কারে সংস্কৃত, নিয়মপ্রতিপালক, শত্রু-মিত্রে সমদর্শী এবং কার্য্যপ্রার্থীরা যাহাদিগকে কাম, ক্রোধ, ভয় এবং লোভ প্রদর্শন করিয়া আপনাদের বশীভূত করিতে সমর্থ নহেন, রাজা এইরূপ লোকদিগকে বাছিয়া বাছিয়া সভাসদ মনোনীত করিবেন।

মহাভারতে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিয়াছিলেন :—

হ্রীনিষেবাস্তথা দান্তা সত্যার্জ্জবসমন্বিতাঃ।
শক্তা কথয়িতুং সম্যক্ তে তব স্যুঃ সভাসদঃ ॥ ম শা ৮৩।২ ॥

যে সকল ব্যক্তি লজ্জাশীল এবং জিতেন্দ্রিয়, যাহারা সত্য ও সরলতা সম্পন্ন এবং প্রিয় ও অপ্রিয় বাক্য মুখের উপর বলিতে পারেন, সেইরূপ লোকদিগকে বাছিয়া বাছিয়া তুমি সভাসদ্ করিবে।

পৌরজানপদদিগের মধ্যে এইরূপ পরীক্ষিত লোক বাছিয়া লইতে হইলে গ্রামনায়ক বা গ্রামমুখ্যদিগের মধ্য হইতেই কয়েকজনকে বাছিয়া লইতে হইত। রাজসভায় যে পৌরজানপদবর্গ উপস্থিত থাকিতেন, মহাভারতে ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। এ স্থলে আমি আর তাহার উল্লেখ করিব না। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণকালে কৌরবগণ কৃষ্ণার প্রশ্নের কোন উত্তর দান করিতে পারিলেন না দেখিয়া "সভায় নরদেবগণের লোমহর্ষণ ধিক্কার উপস্থিত হইয়াছিল।" "সজ্জনগণ ধৃতরাষ্ট্রকে নিন্দা করতঃ আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিলেন"। ধৃতরাষ্ট্র সেই সংক্ষুব্ধ জনমত অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই বলিয়া যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা ও পাঞ্চালীকে মুক্তি দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দুর্য্যোধন অনেকটা স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিতেছিলেন, কিন্তু তাহা হইলেও ধৃতরাষ্ট্র তখনও লোকমত উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। সুতরাং লোকমত রাজপরিষদে যে প্রবল হইত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

রবীন্দ্রনাথ ও টমসন

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী শ্রাবণ-ভাদ্রের 'সবুজপত্রে' রবীন্দ্রনাথ ও টমসন প্রসঙ্গে লিখিতেছেনঃ-

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত বাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায়, টমসন সাহেবের রবীন্দ্র-সমালোচনাকে যে দুষ্ট বলেছেন, সে কথায় আমরা সকলেই সায় দিই। সেই কথাটা আবার কলিয়ে বলবার আমার কোনই দরকার ছিল না। কিন্তু এই সূত্রে আর একটি কথা আমার মনে হয়েছে, এবং সেই কথাটা স্পষ্ট করে বলাই আমার এ প্রবন্ধ লেখবার উদ্দেশ্য।

আমার মতে, টম্‌সনের বিদ্যাবুদ্ধি নিয়ে আমাদের দেশের কাব্যের উপর হাত দেওয়াটা যদি অন্যায় হয়, তাহলে সে হাত তিনি যে ভাবেই আমাদের গায়ে দিন না কেন, সমান ঔদ্ধত্যের পরিচায়ক হবে। ও হাতের চিম্‌টি যদি কটু হয়, তাহলে তার বুলোনিটা কেন মিষ্টি হবে? মূর্খের নিন্দাপ্রশংসা দুই সমান অগ্রাহ্য। শ্রীযুক্ত বাণীবিনোদ বন্দোপাধ্যায় বলেছেন যে টমসন করেছেন শুধু মুরুব্বিয়ানা। চিমটি কাটার চাইতে পিঠ থাবড়ানোটা কি কম মুরুব্বিয়ানার পরিচায়ক?

নিত্য দেখতে পাই যে, যদি কোন সাহেব আমাদের পিঠ থাবড়ায়, তাহলে তখনি আমরা আনন্দে অধীর হই। লোকে বলে সাহেবের প্রশংসাপত্র লাভ করলে আমাদের জাতীয় আত্মমর্য্যাদা বাড়ে। আমার ত মনে হয়, ঠিক তার উল্টো। ওর ফলে আমাদের আত্মমর্য্যাদার লাঘব হয়। কেউ দুটো মিষ্টি কথা বললে তাতে যে চটতে হবে, এ অবশ্য সভ্য সমাজের নিয়ম নয়। ঐ ব্যাপারে প্রমাণ হয় যে বক্তা ভদ্রলোক; কিন্তু এ প্রমাণ হয় না যে, উক্ত মিষ্টি কথার কোনরূপ মূল্য আছে। আমার বিশ্বাস আমরা যখন উক্ত জাতীয় অনধিকারীদের নিন্দাপ্রশংসা দুই সমান উপেক্ষা করতে পারব, তখনই আমরা জাতীয় আত্মমর্য্যাদার পরিচয় দেব। টমসন সাহেবের সমালোচকরা জিজ্ঞাসা করছেন যে, তিনি ঐ ভাবে কোনও ফরাসী কবির নিন্দা করতে সাহসী হতেন কি? অবশ্য হতেন না। কিন্তু তিনি কোনও বড় ফরাসী লেখকের প্রশংসা করতেও সাহসী হতেন না। কেন না, ফরাসী জাত নিজের দেশের বড়লোকদের নিজেরাই চেনে, কোন ইংরেজ মিশনারির certificate তারা চায় না। টম্‌সন এই কথা একবার মুখ ফুটে বলুন যে, তাঁর মতে "Anatole France চমৎকার ফরাসী লিখতে পারে।" এ কথা তাঁর মুখে শুনে সমগ্র ফরাসী জাত হেসে লুটোপুটি খাবে।

রবীন্দ্রনাথের বাণী ইউরোপের বহু লোকের মনে যে প্রবেশ করেছে, এটা হচ্ছে ইউরোপের গৌরবের কথা। এ থেকে শুধু এই প্রমাণিত হয় যে, ইউরোপের বহুলোক শিক্ষাদীক্ষার ফলে সেই মন লাভ করেছে, যে মন পৃথিবীর সকল দেশের সকল জাতের বড় কথা সাদরে গ্রহণ করতে পারে। এ শ্রেণীর লোক কবির চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেয়, কবিকে সার্টিফিকেট দেবার ঔদ্ধত্য মনে পোষণ করে না।

আসল কথা আমাদের কাব্য নিয়ে নয়, আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের পলিটিক্স, আমাদের ঘরদোর, আমাদের দেশ,

আমাদের আহার, এই সব বিষয়েই অনেকে সার্টিফিকেট দেন। আমরা যদি উপোস করি, এ শ্রেণীর গুণগ্রাহীর দল উপবাসের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন, আর আমাদের হেঁকে বলেন "বাহবা কি বাহবা হিন্দু, তুহারি কাম"। যে জাত বেদান্ত লিখেছে, সে জাত ছাড়া নাকি আর কেউ মনের সুখে এমন অনশনব্রত পালন করতে পারে না। আর আমরা অমনি বেদব্যাসের শারীরিক সূত্রকে একটি dietetics-এর অমূল্য গ্রন্থ বলে ধরে নিই। এই রকম সব সার্টিফিকেটের বলে, আমরা কত বিষয়ে না বোকা বনে যাচ্ছি। সমালোচনার কাঁটা সকলেরই গায়ে লাগে। আমার বিশ্বাস তার ফুলও সব সময় গ্রাহ্য নয়, বিশেষতঃ সাহেবদের ছুঁড়ে-মারা সেই সব ফুল, যার ঘায়ে আমাদের আত্মজ্ঞান মূর্চ্ছা যায়। আর এই কথাটি সকলে মনে রাখবেন যে, ও-জাতীয় ফুল প্রায় সবই কাগজের ফুল।

আমি এতক্ষণ যা বলেছি, সে হচ্চে আমাদের ভাষা, আমাদের কাব্য ও আমাদের দর্শন সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ইউরোপীয়দের কথা। কিন্তু ইউরোপে আর একদল লোক আছেন, যাঁরা এ সকল বিষয়ে বিশেষজ্ঞ—এঁরা স্বদেশে Orientalist নামে পরিচিত। তাঁরা যে সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত প্রভৃতি ভাষায় সুপণ্ডিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এঁদের পাণ্ডিত্য স্বীকার না করা আমাদের পক্ষে মূর্খতা। ভারতবর্ষের অতীত এঁরাই আবার উদ্ধার করেছেন; আমাদের মধ্যে যাঁরা ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্বের আলোচনা করেন, তাঁরা সকলেই এঁদের শিষ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা আজও গুরুমারা বিদ্যে শিখিনি। এ দেশের পুরাতত্ত্ব যে এঁরা আবিষ্কার করেছেন, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু কোনও লুপ্ত গ্রন্থের উদ্ধার করা ও তার মর্ম্মগ্রহণ করা এক জিনিষ নয়। জিনিষের মর্ম্মগ্রহণ করতে হয়—নিজের মন দিয়ে। এবং আমাদের মন ও ইউরোপীয়-মন ঠিক এক মন নয়, এ কথা স্বীকার করতে আমরা ইতস্ততঃ করলেও, তাঁরা করেন না। সুতরাং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই Orientalist-এর ধারণা—ভারতবর্ষীয় ধারণা না হবারই কথা। আমি বড় বড় Orientalist-দের রচিত বড় বড় বুদ্ধ-চরিত সাগ্রহে পাঠ করেছি। কিন্তু তার প্রতিখানি পড়বার পর মনে মনে বলতে বাধ্য হয়েছি যে, "এহ বাহ্য, আগে কহ আর"। এ সব পণ্ডিতের কথায় মনস্তুষ্টি হয় না কেন? এর কারণ Sylvain Lévi পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি গ্রীক, লাটিন সম্বন্ধে জর্ম্মাণ পাণ্ডিত্যের বিষয় বলেছেন—

"Le grec, la latin, sont l' apanage des savants, separes de la multitude, les livres des "textes", ou l'erudition allemande appliqua des dons remarquables de recherche de construction systematique ; mais la vie secrete qui se dissimule dans les œuvres de l'esprit classique lui echappe ; elle les traite comme un material d' antiquite".

বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে

শ্রাবণ-ভাদ্রের 'সবুজ-পত্রে' শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় নীস্ নগরীর এক ভোজ-সভার বর্ণনা করেছেন। সেখানে ফ্রান্সের এক শ্রেষ্ঠা গায়িকার সঙ্গে বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে তাঁর যে আলাপ হয়েছিল তা' নিয়ে উদ্ধৃত করে দেওয়া গেল :---

"......গায়িকা বল্লেন : "বনেদী ঘরের কথা বলতে আমার মনে পড়ল স্বামী বিবেকানন্দের কথা। হাঁ, বনেদী ঘরের মধ্যে একটা মস্ত মহিমা আছে বটে—মানতেই হবে।"

আমি ইতিপূর্ব্বে শুনেছিলাম যে, ফরাসী গায়িকা স্বামী বিবেকানন্দের মস্ত ভক্ত, ও জীবনে একটা কঠিন পরীক্ষার সময়ে সে মহাপ্রাণ মানুষটির কাছ থেকে কম আলো পান নি। তাই আমি ব্যস্ত হ'য়ে বল্লাম : "বলুন না তাঁর গল্প। শুনেছি আপনার নষ্ট কণ্ঠস্বর নাকি তিনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।"

গায়িকা হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে গাঢ়স্বরে বল্লেন : "তিনি ছিলেন অলোকসামান্য মানুষ। মহাপুরুষ। আমি তাঁর কাছে যে কত ঋণী, তা বলতে পারব না।" (ফরাসী জাতি সহজেই আর্দ্র হ'য়ে ওঠে)।

কাউণ্টেসদুহিতা বল্লেন : "তাঁর সঙ্গে আপনার ত' আমেরিকাতেই আলাপ হয়েছিল, না?

গায়িকা আর্দ্রস্বরে বল্লেন, "হাঁ। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমি জাহাজে জাহাজে তিন মাস ঘুরেছিলাম। সে তিন মাস আমার যে কি পরমানন্দে কেটেছিল!..."

আমি বল্লাম : "কি সূত্রে তাঁর সঙ্গে আপনার আলাপ হয়?"

গায়িকা সমস্বরেই বললেন : "সে সময়ে আমি বড় মনঃকষ্টে ছিলাম। আমার স্বামী ও মেয়ে পর পর মারা যান, ও আরও নানা রকম উপসর্গ ছিল। আমার মনের সেই সঙ্কট সময়ে হঠাৎ একদিন আমার একটি বন্ধু বল্লেন—'চল, তোমাকে একজন হিন্দু মহাত্মার কাছে নিয়ে যাই, যিনি হয়ত' তোমাকে সান্ত্বনা দিতে পারবেন।' আমি বিশ্বাস করলাম না। কিন্তু গেলাম। ভাবলাম দেখাই যাক্ না।"

ব'লে স্বর একটু নাবিয়ে নিয়ে বলতে লাগলেন---

"সে সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ ধ্যান করছিলেন। আমি পাশে বসলাম একটা চেয়ারে। তিনি মাটিতে ব'সেছিলেন। অনেকক্ষণ এই ভাবে কাটল।

আমি ভারি বিরক্ত হয়ে উঠলাম। কি এ অসভ্য! আমি এতবড় একজন গায়িকা! আমাকে কি না এতক্ষণ অপেক্ষা করায়!...

হঠাৎ স্বামীজী ব'লে উঠলেন : 'ব্যস্ত হয়ো না, আমি ধ্যান ক'রে দেখে নিচ্ছি তোমার ঠিক কোনখানে ব্যথা ও কি প্রয়োজন। মুখে তোমার কাছ থেকে ত জানা যেতে পারে না।'

আমি তারি চক্রে গেলাম। খানিক বাদে স্বামীজী আমাকে আমার অতীত জীবনের এমন ঢের কথা বল্‌লেন, যা আমি ছাড়া আর কেউ জান্‌ত না।

আমি ত মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়্‌লাম। এ কী ব্যাপার!

তারপর তাঁর সঙ্গে কত জায়গায়ই না ঘুরেছি। আমার শত হৃদয়-ক্ষত কেমন যেন মুহূর্ত্তে সেরে গেল তাঁর উপদেশে! তাঁর কথাই সর্ব্বদা শুন্‌তাম. ও তাঁর মাতৃসম্বোধনে মুগ্ধ হ'তাম—যদিও আমি তখন ছেলেমানুষ।

বল্‌তে বল্‌তে ফরাসী গায়িকার কণ্ঠস্বর ভারি হ'য়ে এল।

কাউন্টেস আর্দ্রস্বরে বল্‌লেন: "হিন্দুর এই নারীমাত্রকেই মাতৃ-সম্বোধন করাটা কি সুন্দর!"

গায়িকা বল্‌লেন: "কিন্তু এমন মানুষেরও আমি নিন্দা শুনেছি, মনিয়ে যায়,—ভাব্‌তেও লজ্জা হয়। এমন মানুষেরও লোকে নিন্দা করে! তাঁর সেই তিন মা.সর সাহচর্য্যে ও উপদেশে আমি যা পেয়েছি, আমার সমগ্র জীবনেও তা পাইনি। য়ুরোপে ও আমেরিকায় এমন কত শোকতাপদগ্ধ মানুষকে তিনি আলো দেখিয়েছেন।"...

ঘরের মধ্যেকার উত্তপ্ত তর্ককোলাহল যেন হঠাৎ একটা অপূর্ব্ব স্নিগ্ধতারসে সিঞ্চিত হ'য়ে সুরভি বিকীরণ করছিল!...হঠাৎ মনে হ'ল এ যেন একটা উপন্যাসের মত সৃষ্টি! যেন একটা ছবির, একটা দৃশ্যের বর্ণতুলিপাত! সহসা বাগ্বিতণ্ডার ঘর্ঘর রব এই শান্ত কমনীয় শীকরসম্পাতে যেন মগ্ন হ'য়ে গেল!

সেদিন কাউন্টেসের সুরম্য নিকুঞ্জভবন থেকে বিদায় নিয়ে ফেরবার পথে কেবলই মনে হচ্ছিল, একটা মহৎ পরিণতির সৌরভ কি সুন্দর! জীবনের তুচ্ছতার ও ক্ষুদ্রতার পাশে কি ভাস্বর! ক্ষণবিধ্বংসী কাড়াকাড়ির পাশে কি অবিনশ্বর!...

কল্পনায় সে মহাত্মার চিত্র মানসপটে ফুটে উঠ্‌ল। মনে কেবলই ফরাসী গায়িকার শেষ কথাগুলি আনাগোনা করছিল:—

"য়ুরোপ আমেরিকায় কত শোকতাপদগ্ধ মানুষকেই না তিনি আলো দেখিয়েছেন!"

সত্যি একটা মহৎ ব্যক্তিসৃজনের চেয়ে সত্য সৃষ্টি জগতে কি আছে!

নানাকথা

ছুটির জন্য 'বিচিত্রা'র কার্ত্তিক সংখ্যা আশ্বিনেই বাহির হইল। অগ্রহায়ণ সংখ্যা অবশ্য ধার্য্য দিনেই বাহির হইবে। আমরা আমাদের গ্রাহক অনুগ্রাহক বর্গকে শারদীয় অভিনন্দন জানাইতেছি।

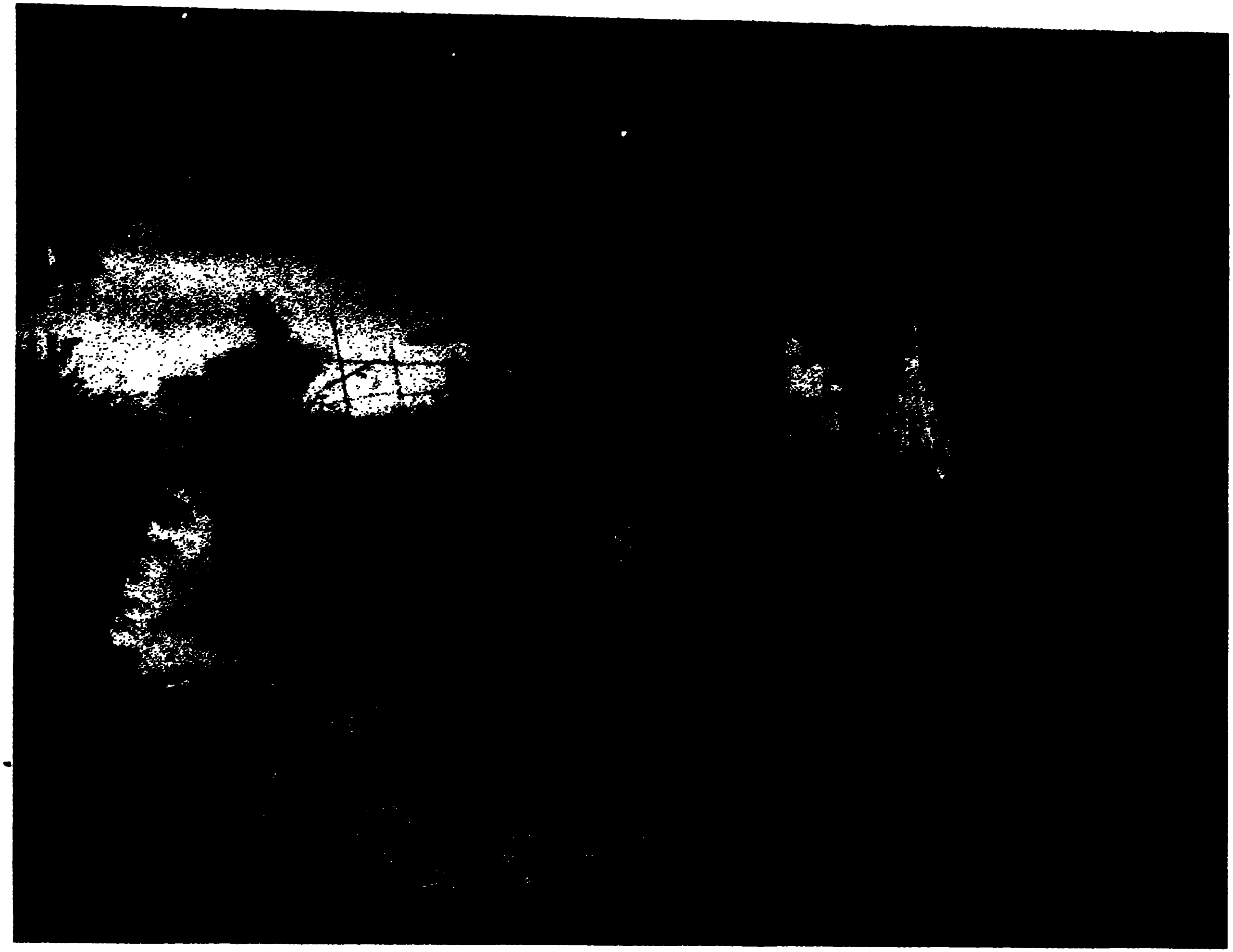
* * *

যে চারজন বাঙালী যুবক মাস কয়েক আগে দ্বিচক্র-যানে পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছেন, তাঁহারা এতদিনে এশিয়া মাইনর পার হইয়া পূর্ব্ব য়ুরোপে পৌঁছিয়াছেন। বাগদাদ হইতে প্রেরিত তাঁহাদের পত্রাংশ এবার 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত হইল। এরূপ পত্র আরও প্রকাশিত হইবে। তাঁহাদের নিজেদের তোলা ছবি অনেক-গুলি আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাহার মধ্যে মাত্র খান কতক এবার প্রকাশিত হইল, কেননা সব গুলির স্থানাভাব। সে গুলি অবশ্য পরে পরে প্রকাশিত হইবে।

* * *

সকলন পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত দিলিপকুমার রায়ের সবুজ পত্রে প্রকাশিত 'ভ্রাম্যমানের জল্পনা' হইতে আমরা কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছি। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ন্যুইয়র্কের সাটারডে ইভনিং পোষ্ট (Saturday Evening Post) নামক পত্রিকায় ফ্রান্সের গায়িকা-শ্রেষ্ঠা মাদাম কালভের (Madame Calve') স্মৃতিকথা ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হয়। তাহাতে বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে মাদাম কালভে ঠিক এইরূপ ঘটনাগুলিরই উল্লেখ করিয়া সেই হিন্দুসন্ন্যাসীর উদ্দেশে আপনার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা ভক্তি জানাইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত দিলিপকুমার রায় গায়িকার নাম উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু তাঁহার বর্ণিত কথা-বার্ত্তা থেকে মনে হয়, তিনি আর কেহই নহেন, পৃথিবীর অন্যতম গায়িকা-শ্রেষ্ঠা মাদাম কালভে। মাদাম প্রায় ষোল বৎসর আগে একবার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন এবং অনেকের অনুরোধে শুদ্ধ এক রাত্রির জন্য এম্পায়ার থিয়েটারে গান গাহিতে স্বীকৃত হন। তিনি বেলুড় মঠে গিয়াছিলেন এবং সেখানে ঠাকুর ঘরে যে স্তোত্র গান গাহিয়াছিলেন তাহার অর্থ ও সুর শ্রোতৃ-বর্গের কাছে দুর্ব্বোধ্য হইলেও, তাঁহার পাখীর মত কণ্ঠস্বর সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। সেখানে তাঁহাকে ভারতীয় সঙ্গীত শোনাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। বিশেষ করিয়া ভারতীয় বংশীবাদনের তিনি অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছিলেন। তাঁহারই অতিথিরূপে স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচ্য য়ুরোপ মিশর প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেন।

Printed at the Modern Art Press, 1/2 Durga Pituri Lane, Calcutta,
by Srijut Probodh Lal Mukherjee, and published by him from 51 Pataldanga Street, Calcutta.



খালের জল

শিল্পী — শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিচিত্রা

প্রথম বর্ষ, ১ম খণ্ড | অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪ | ষষ্ঠ সংখ্যা

অবুঝ মন

জাহাজ চল্‌চে, সমুদ্রের জল কেবলি ছল্‌ছল্‌ করে, আর লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে। একটি ছোট শিশু; আমরা আছি আপন আপন কোণে, একটিমাত্র কেদারা নিয়ে, কিন্তু সে আছে সমস্ত ডেক্ জুড়ে। তার অবুঝ মনখানি অসংলগ্ন অহৈতুক আগ্রহে ফ্যাল্‌ফেলে চোখের ভিতর দিয়ে বিশ্বের পরিচয় নিচ্চে। আমার অঙ্কবিহারী সেই আটদশমাসের শিশুটির খেলা দেখে আমার অনেকটা সময় কাটে।

এটা বুঝ্‌তে পারচি যে ওরি ঐ মনটি আদিমকালের বহু পুরাতন। আমার যে-মন ওকে দেখ্‌চে আর ভাবচে—সেই হ'ল নূতন; অনেক চেষ্টায় অনেক শিক্ষায় ও সাধনায় এই বিচার-বুদ্ধিমান মন গ'ড়ে উঠ্‌চে, এখনো সে অসমাপ্ত। ওরি অবচেতন মনটির সঙ্গে মেলে গাছপালার মধ্যে যে নির্ব্বোধ মন জলের দিকে তার শিকড় চালাচ্চে, সূর্য্যের দিকে যার আকূতি, যা স্বপ্নচালিতের মতো আপন ফুলের ভিতর দিয়ে আপন ফলের উদ্দেশ্য সাধন করে। আমার নতুন মন গাছপালার মধ্যে ঐ পুরাতন সহজ মন দেখে গভীর শান্তি পায় আনন্দিত হয়। শিশুর মধ্যেও সেই আদিম মনটি দেখ্‌তে তার এত ভালো লাগে। মেয়েদের প্রকৃতিতেও মনের এই আদিমতার প্রাধান্য, তাদের সহজ বোধ সহজ প্রবৃত্তি বিচারবুদ্ধির চেয়ে অনেক প্রবল। আমরা অনেকদিন থেকে ওদের সরলা অবলা ব'লে আস্‌চি, সে কথার মানেই ঐ, যে-তর্কে দ্বিধা আনে ওদের স্বভাবে ভালো ক'রে সেই তর্কবুদ্ধি দখল পায় নি। নতুনবুদ্ধিওয়ালা পুরুষের মনের কাছে এই সহজ মনের সংস্পর্শ আরামের। নতুনবুদ্ধিওয়ালা মনটা ক্লান্ত করে, বিভ্রান্ত করে, সংশয়ে আন্দোলিত করে; এই জন্যে মানুষ অনেক সময় মদ খায়, এই উদগ্রবুদ্ধিমান মনটাকে বিহ্বল ক'রে দিয়ে সেই আপন আদিম অবোধ মনের মধ্যে ছুটি নিতে চায়, যেখানে অরাজকতা।

শিশুর মধ্যে যাকে দেখ্‌চি সেই আদিম মনটাকে আর-এক জায়গায় দেখ্‌চি যেখানে গণ-সংঘ। সেই গণেশের হাতির মুণ্ড, তার যূথ-বুদ্ধির মাথা, সে বশ মানতেও যেমন, মেতে উঠ্‌তেও তেমনি। তার প্রকাণ্ড শক্তির সঙ্গে তার নীরব বশ্যতার মিল পাইনে, তেমনি তার অকস্মাৎ দুর্দ্দামতারও হিসেব পাওয়া যায় না। সেই অবুঝ মনটার সংস্কারগুলো, তার সমস্ত অন্ধ প্রবর্ত্তনা গণ-সম্প্রদায়কে ঠেলে নিয়ে চলে। তারাই হ'ল বাহন। নতুন মনটা সারথিগিরি করতে চেষ্টা করে, কিন্তু ঘোড়া প্রায়ই চার পা তুলে ছোটে,

নইলে য়ুরোপে সে দিন যে যুদ্ধকাণ্ড হ'য়ে গেল তা হ'তে পারত না। আদিম মনটা যখন বুদ্ধিওয়ালা মনটাকে একেবারেই মানতে চায় না তখন মানুষ যাকে সভ্যতা বলে তার ঘটে দুর্গতি। প্রাচীন গ্রীস্ তার অসামান্য বুদ্ধিসত্ত্বেও যদি ম'রে থাকে তার কারণটা ছিল অবচেতন মনের মধ্যে, যেখানে তার গুহাচর প্রবৃত্তির, তার গর্ত্তবাসী সংস্কারের বাসা। আজকের দিনে য়ুরোপ কোনো মতেই স্থায়ী শান্তির কোনো ব্যবস্থা করতে পারচে না, তার কারণ সংস্কারগুলো লাগাম দাঁতে চেপে ধ'রে ছুটতে চায়।

সভ্যতা এর উল্টো কারণেও মরে। নতুন মন যখন সনাতন সহজ মনের শক্তিকে আপন জটিল কর্ম্মজালে সম্পূর্ণ চাপা দিতে চায়, আপন রথের চাকার তলায় তাকে খণ্ড খণ্ড করে, তখন তার শক্তির আদিম আশ্রয় জীর্ণ হ'য়ে যায়। আকাশগামী চূড়াটা ধুলোর আশ্রয় ছাড়িয়ে উঠ্‌তে চায়; ক্ষতি নেই, কিন্তু যখন সামঞ্জস্যের সীমা অতিক্রম করে তখনি ফিরে তাকে সেই ধুলোয় এসে পড়তে হয়। আদিম অবুঝ মনের সঙ্গে নতুন বুদ্ধিমান মনের পদে পদে রফা নিষ্পত্তি ক'রে চলাই পাকাচালে চলা। এই তো গেল আমার চিন্তার কথা। কিন্তু শিশুর মুখের দিকে যখন তাকিয়ে দেখ্‌তুম তখন যে-আনন্দ বোধ করতুম সেটা চিন্তার আনন্দ নয়, তখন আমি বিশ্বব্যাপী আদিম প্রাণের বৃহৎ রঙ্গলীলা শিশুর দুটি চোখের বুদ্ধিবিহীন চঞ্চল ঔৎসুক্যের মধ্যে দেখ্‌তে পেতুম। শিশুর মধ্যে সেই বিশ্বশিশুকে দেখার আনন্দেই এই কবিতাটি লিখেছি।

অবুঝ শিশুর আব্‌ছায়া এই নয়ন-বাতায়নের ধারে
আপ্‌না-ভোলা মনখানি তার অধীর হ'য়ে উঁকি মারে।
বিনা-ভাষার ভাবনা নিয়ে কেমন ঝাঁকু-ঝাঁকুর খেলা,—
হঠাৎ ধরা, হঠাৎ ছড়িয়ে ফেলা,
হঠাৎ অকারণ
কি উৎসাহে বাহু নেড়ে উদ্দাম গর্জ্জন।
হঠাৎ দুলে দুলে ওঠে,
অর্থবিহীন কোন্ দিকে তার লক্ষ্য ছোটে।
বাহির ভুবন হ'তে
আলোর লীলায় ধ্বনির স্রোতে
যে বাণী তার আসে প্রাণে
তারি জবাব দিতে গিয়ে কী যে জানায় কেই তা জানে॥

এই যে অবুঝ এই যে বোবা মন
প্রাণের পরে ঢেউ জাগিয়ে কৌতুকে যে অধীর অনুক্ষণ;
সর্ব্ব দিকেই সর্ব্বদা উন্মুখ,
আপ্‌নারি চাঞ্চল্য নিয়ে আপ্‌নি সমুৎসুক,—
নয় বিধাতার নবীন রচনা এ,
ইহার যাত্রা আদিম যুগের নায়ে।

অবুঝ মন

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বকবির মানস সরোবরে
প্রাতঃস্নানের পরে
প্রাণের সঙ্গে বাহির হ'ল, তখন অন্ধকার,
নিয়ে এল ক্ষীণ আলোটি তার।
তারি প্রথম ভাষাবিহীন কূজন কাকলী যে
বনে বনে শাখায় পাতায় পুষ্পে ফলে বীজে
অঙ্কুরে অঙ্কুরে
উঠ্‌ল জেগে ছন্দে সুরে সুরে,
সূর্য্য পানে অবাক্ আঁখি মেলি'
গুঞ্জরিত উচ্ছল তার কেলি॥

নানারূপের খেলনা যে তার নানা বর্ণে আঁকে,
বারেক খোলে, বারেক তারে ঢাকে।
রোদ-বাদলে করুণ কান্না হাসি
সদাই ওঠে আভাসি' উচ্ছ্বাসি'॥

বিরাট অবুঝ এই সে আদিম মন,
মানব-ইতিহাসের মাঝে আপ্‌নারে তার অধীর অন্বেষণ।
ঘর হ'তে ধায় আঙন পানে, আঙন হ'তে পথে,
পথ হ'তে ধায় তেপান্তরের বিষম-বিষম অরণ্যে পর্ব্বতে;
এই সে গড়ে, এই সে ভাঙে, এই সে কি আক্ষেপে
পায়ের তলার ধরণীরে আঘাত করে ধূলায় আকাশ ব্যেপে;
হঠাৎ ক্ষেপে উঠে
রুদ্ধ পাষাণভিত্তি পরে বেড়ায় মাথা কুটে।
অনাসৃষ্টি সৃষ্টি আপন-গড়া
তাই নিয়ে সে লড়াই করে, তাই নিয়ে তার কেবল ওঠা-পড়া।
হঠাৎ ওঠে ঝেঁকে
যায় সে ছুটে কোন্ রাঙা রং দেখে
অদৃষ্ট তার দূর দিগন্ত পানে;
আবছায়া কোন্ সন্ধ্যা আলোয় শিশুর চোখে তাকায় অনুমানে,
তাহার ব্যাকুলতা
স্বপ্নে সত্যে মিশিয়ে রচে বিচিত্র রূপকথা॥

ঐ যে শিশুর অবুঝ ভোলা মন
তরীর কোণে ব'সে ব'সে দেখ্‌চি তারি আকুল আন্দোলন।
মাঝে মাঝে সাগর পানে তাকিয়ে দেখি যত
মনে ভাবি ও যেন এই শিশু-আঁখির মতো,
আকাশ পানে আব্‌ছায়া ওর চাওয়া
কোন্ স্বপনে-পাওয়া,
অন্তরে ওর যেন সে-কোন্ অবুঝ ভোলা মন
এ-তীর হ'তে ও-তীর পানে দুল্‌চে অনুক্ষণ।
কেমন কল ভাষে
প্রলয় কাঁদন কাঁদে ও যে প্রবল হাসি হাসে
আপ্‌নিও তার অর্থ আছে ভুলে,—
ক্ষণে ক্ষণে শুধুই ফুলে ফুলে
অকারণে গর্জ্জি উঠে শূন্যে শূন্যে মূঢ় বাহু তুলে ॥

আবা-মারু জাহাজ
২০শে অক্টোবর, ১৯২৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তিনপুরুষ

নামান্তর

"তিন-পুরুষ" নাম ধ'রে আমার যে গল্পটা "বিচিত্রায়" বের হ'চ্চে তার নাম রক্ষা করতেই হবে এমন কোনো দায় নেই। কাঁচা থাকতে থাকতেই ও নামটা বদল করব ব'লে স্থির করেচি। পাঠক দরবারে তার কারণ নির্দ্দেশ করি।

নবজাত কুমার কুমারীদের নাম দেবার জন্যে আমার কাছে অনুরোধ এসে থাকে, অবকাশ মতো সে অনুরোধ পালন ক'রেও এসেচি। কারণ এতে কোনো দায়িত্ব নেই। ব্যক্তি সম্বন্ধে মানুষের নাম তার বিশেষণ নয়, সম্বোধন মাত্র। লাউয়ের বোঁটা নিয়ে লাউয়ের বিচার কেউ করে না, ওটাতে ধরবার সুবিধে। যার নাম দিয়েচি সুশীল তার শীলতা নিয়ে আমার কোনো জবাবদিহি নেই। সুশীল-ঠিকানায় পত্র পাঠালে শব্দের সঙ্গে প্রয়োগের অসঙ্গতি দোষ নিয়ে ডাক-পেয়াদা কাগজে লেখালেখি করে না, ঠিক জায়গায় চিঠি পৌঁছয়।

ব্যক্তিগত নাম ডাকবার জন্যে, বিষয়গত নাম স্বভাব নির্দ্দেশের জন্যে। মানুষকেও যখন ব্যক্তি ব'লে দেখি নে, বিষয় ব'লে দেখি, তখন তার গুণ বা অবস্থা মিলিয়ে তার উপাধি দিই,—কাউকে বলি বড়ো-বউ, কাউকে বলি মাষ্টার মশায়।

সাহিত্যে যখন নামকরণের লগ্ন আসে দ্বিধার মধ্যে পড়ি। সাহিত্যরচনার স্বভাবটা বিষয়গত না ব্যক্তিগত এইটে হ'ল গোড়াকার তর্ক। বিজ্ঞানশাস্ত্রে বিষয়টাই সর্ব্বেসর্ব্বা, সেখানে গুণধর্ম্মের পরিচয়ই একমাত্র পরিচয়। মনস্তত্ত্বঘটিত বইয়ের শিরোনামায় যখনি দেখব "স্ত্রীর সম্বন্ধে স্বামীর ঈর্ষ্যা", বুঝব বিষয়টিকে ব্যাখ্যা দ্বারাই নামটি সার্থক হবে। কিন্তু 'ওথেলো' নাটকের যদি ঐ নাম হ'ত পছন্দ করতুম না। কেন না এখানে বিষয়টি প্রধান নয়, নাটকটিই প্রধান। অর্থাৎ আখ্যানবস্তু, রচনারীতি, চরিত্রচিত্র, ভাষা, ছন্দ, ব্যঞ্জনা, নাট্যরস সবটা মিলিয়ে একটি সমগ্র বস্তু। একেই বলা চলে ব্যক্তিরূপ। বিষয়ের কাছ থেকে সংবাদ

পাই, ব্যক্তির কাছ থেকে তার আত্মপ্রকাশজনিত রস পাই। বিষয়কে বিশেষণের দ্বারা মনে বাঁধি, ব্যক্তিকে সম্বোধনের দ্বারা মনে রাখি।

এমন একটা-কিছু অবলম্বন ক'রে গল্প লিখ্‌তে বসলুম যাকে বলা যেতে পারে বিষয়। যদি মূর্ত্তি গড়তেম একতাল মাটি নিয়ে বসতে হ'ত। অতএব ওটাকে "মাটি" শিরোনামায় নির্দ্দেশ করলে বিজ্ঞানে বা তত্ত্বজ্ঞানে বাধত না। বিজ্ঞান যখন কুণ্ডলকে উপেক্ষা ক'রে তার সোনার তত্ত্ব আলোচনা করে তখন তাকে নমস্কার করি। কিন্তু ক'নের কুণ্ডল নিয়ে বর যখন সেই আলোচনাটাকেই প্রাধান্য দেয় তখন তাকে বলি বর্ব্বর। রসশাস্ত্রে মূর্ত্তিটা মাটির চেয়ে বেশি, গল্পটাও বিষয়ের চেয়ে বড়ো। এই জন্যে বিষয়টাকেই শিরোধার্য্য ক'রে নিয়ে গল্পের নাম দিতে আমার মন যায় না। বস্তুত রসসৃষ্টিতে বৈষয়িকতাকে বড়ো জায়গা দেওয়া উচিত হয় না। যাঁরা বৈষয়িক প্রকৃতির পাঠক তাঁদের দাবীর জোরে সাহিত্যরাজ্যে হাটের পত্তন হ'লে দুঃখের বিষয় ঘটে। হাটের মালিক বিষয়-বুদ্ধি-প্রধান বিজ্ঞান।

এদিকে সম্পাদক এসে বল্লেন, সংসারে নাম রূপ দুটোই অত্যাবশ্যক। আমি ভেবে দেখলুম, রূপের আমরা নাম দিই, বস্তুর দিই সংজ্ঞা। সন্দেশ যেখানে রূপ সেখানে তাকে বলি "অবাক্ চাকি," যেখানে বস্তু সেখানে তাকে বলি মিষ্টান্ন। সম্পাদক মশায়ের সংজ্ঞা হচ্চে "সম্পাদক," এখানে অর্থ মিলিয়ে আদালতে হলফ ক'রে বল্‌তে পারি শব্দের সঙ্গে বিষয়ের ষোলো আনা মিল আছে। কিন্তু যেখানে তিনি বিষয় নন্, রূপ,—অর্থাৎ স্বতন্ত্র ও একমাত্র, সেখানে কোনো একটা মাত্র সংজ্ঞা দিয়ে তাঁকে বাঁধা অসম্ভব। সেখানে তাঁর আছে নাম। সেই নামের সঙ্গে মিলিয়ে শত্রু মিত্র কেউ তাঁর যাচাই করে না। পিতামাতা যদি তাঁকে "সম্পাদক" নামই দিতেন তবে নাম সার্থক করবার জন্যে সম্পাদক হবার কোনো দরকারই তাঁর থাকত না।

গল্প জিনিষটাও রূপ; ইংরেজিতে যাকে বলে ক্রিয়েশন্। আমি তাই বলি গল্পের এমন নাম দেওয়া উচিত নয় যেটা সংজ্ঞা, অর্থাৎ যেটাতে রূপের চেয়ে বস্তুটাই নির্দ্দিষ্ট। "বিষবৃক্ষ" নামটাতে আমি আপত্তি করি। "কৃষ্ণকান্তের উইল"—নামে দোষ নেই। কেননা ও নামে গল্পের কোনো ব্যাখ্যাই করা হয় নি।

সম্পাদক মশায় যখন গল্পের নামের জন্যে পেয়াদা পাঠালেন তাড়াতাড়ি তখন "তিন-পুরুষ" নামটা দিয়ে তাকে বিদায় করা গেল। তার পরক্ষণেই নামটা কাহিনীর আঁচলের সঙ্গে তার গ্রন্থিবন্ধন ক'রে নিয়ে কানে কানে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বল্‌তে লাগ্‌ল, "যদেতৎ অর্থং মম তদস্তুরূপং তব।" আমার সঙ্গে তোমাকে সম্পূর্ণ মিলে চল্‌তে হবে। "ছায়েবানুগতাস্বচ্ছা" ইত্যাদি। কাহিনী বলে, "তার মানে কি হ'ল?" নাম বলে, "বাক্যে ভাবে আজ থেকে আমাকে সপ্রমাণ ক'রে চলাই তোমার ধর্ম্ম।" কাহিনী বলে, "রেজিষ্টার বইয়ে কর্ত্তার তাড়ায় সম্মতি সই করেছি বটে, কিন্তু আজ আমি হাজার হাজার পাঠকের সামনে দাঁড়িয়েই সেটা বেকবুল যেতে চাই।"

কর্ত্তা বল্লেন,—তিন-পুরুষের তিন তোরণওয়ালা রাস্তা দিয়ে গল্পটা চ'লে আসবে এই আমার একটা খেয়াল মাত্র ছিল। এই চলাটা কিছুই প্রমাণ করবার জন্যে নয়, নিছক ভ্রমণ করবার জন্যেই। সুতরাং এই নামটা ত্যাগ করলে আমার গল্পের কোনো স্বত্বের দলিল কাঁচবে না।

অতএব সর্ব্বসমক্ষে আমার গল্প আজ তার নাম খোয়াতে বসেচে। আমরা তিন সত্যের জোর মানি 'বিচিত্রা'র পাতায় নাম সম্বন্ধে দুইবার সত্যপাঠ হ'য়ে গেছে। তিনবারের বেলায় মুখ চাপা দেওয়া গেল।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আর একটা নাম ঠাউরেচি। সেটা এতই নির্ব্বিশেষ যে গল্পমাত্রেই নির্ব্বিচারে খাটতে পারে। সরকারী জিনিষ মাত্রেরই মতো সে নামে চমৎকারিতা নেই। নাইবা রইল। জাপানে দেখেচি, তলোয়ারের ফলকটার উপরে কারিগর যখন তার কারুকলার আনন্দ ঢেলে দেয় খাপটাকে তখন নিতান্ত নিরলঙ্কার ক'রে রাখে। গল্প নিজেই নিজের পরিচয় দেবার সাহস রাখে যেন,—নামটাকে যেন জোর গলায় আগে আগে নকীবগিরি করতে না পাঠায়।

"তিনপুরুষ" নাম ঘুচিয়ে আমার গল্পের নাম দেওয়া গেল—

"যোগাযোগ"

"কিন্তা" জাহাজ
শ্যামের পথ
৪ অক্টোবর, ১৯২৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যোগাযোগ

১৫

বিপ্রদাস নবগোপালকে ডেকে বল্লে, "নবু, আড়ম্বরে পাল্লা দেবার চেষ্টা,—ওটা ইতরের কাজ।"

নবগোপাল বল্লে, "চতুর্ম্মুখ তাঁর পা ঝাড়া দিয়েই বেশী মানুষ গড়েচেন; চারটে মুখ কেবল বড়ো বড়ো কথা বল্‌বার জন্যেই। সাড়ে পনেরো আনা লোক যে ইতর, তাদের কাছে সম্মান রাখ্‌তে হ'লে ইতরের রাস্তাই ধরতে হয়।"

বিপ্রদাস বল্লে, "তাতেও তুমি পেরে উঠ্‌বে না। তার চেয়ে সাত্ত্বিকভাবে কাজ করি, সে দেখাবে ভালো। উপযুক্ত ব্রাহ্মণপণ্ডিত আনিয়ে আমাদের সামবেদের মতে বিশুদ্ধভাবে অনুষ্ঠান পালন করব। ওরা রাজা হয়েচে করুক আড়ম্বর; আমরা ব্রাহ্মণ, পুণ্যকর্ম্ম আমাদের।"

নবগোপাল বল্লে, "দাদা, পাঁজি ভুলেচ, এটা সত্যযুগ নয়। জলের নৌকো চালাতে চাও পাঁকের উপর দিয়ে! তোমার প্রজারা আছে,—তিনু সরকার আছে তোমার তালুকদার,—ভানু পরামাণিক, কমরুদ্দি বিশ্বেস, পাঁচু মণ্ডল,—এরা কি তোমার ঐ কাঁচকলাভাতেহবিষ্যি-করা বামনাইয়ের এক অক্ষর মানে বুঝবে? এরা কি যাজ্ঞবল্ক্যের প্রপৌত্র? এদের যে বুক ফেটে যাবে। তুমি চুপ ক'রে থাকো, তোমাকে কিছু ভাব্‌তে হবে না।"

নবগোপাল প্রহ্লাদের সঙ্গে মিলে উঠে প'ড়ে লাগ্‌লো। সবাই বুক ঠুকে বল্‌লে, টাকার জন্যে ভাব্‌না কি? আমলা কয়লা পাইক বরকন্দাজ সবারই গায়ে চড়ল নতুন লাল বনাতের চাদর, রঙীন ধুতি। সালুতে-মোড়া, ঝালর-ঝালানো, নিশেন-ওড়ানো এক নহবৎখানা উঠ্‌লো, সাত ক্রোশ তফাৎ থেকে তার চূড়ো দেখা যায়। দুই সরীকে মিলে তাদের চার চার হাতী বের করলে, সাজ চড়লো তাদের পিঠে, যখন-তখন বিনা কারণে ঘোষাল দীঘির সামনের রাস্তায় শুঁড় দুলিয়ে দুলিয়ে তারা টহলিয়ে বেড়ায়, গলায় ঢং ঢং ক'রে ঘণ্টা বাজতে থাকে। আর যাই হোক্, পাটের বস্তা থেকে হাতী বের হয় না, এই ব'লে সকলেই দুই পা চাপ্‌ড়ে হো হো ক'রে হেসে নিলে।

অঘ্রাণের সাতাশে পড়েচে বিয়ের দিন; এখনো দিন দশেক বাকি। এমন সময় লোকমুখে জানা গেলো, রাজা আস্‌চে দলবল নিয়ে। ভাবনা প'ড়ে গেলো কর্ত্তব্য কি। মধুসূদন এদের কাছে কোনো খবর দেয় নি। বুঝি মনে করেচে ভদ্রতা সাধারণ লোকের, অভদ্রতাই রাজোচিত। এমন অবস্থায় নিজেরা গায়ে প'ড়ে ষ্টেশন থেকে ওদের এগিয়ে আন্‌তে যাওয়া কি সঙ্গত হবে? খবর না দেওয়ার উচিত জবাব হচ্চে খবর না নেওয়া।

সবই সত্য, কিন্তু যুক্তির দ্বারা সংসারে দুঃখ ঠেকানো যায় না। কুমুর প্রতি বিপ্রদাসের গভীর স্নেহ; পাছে তাকে কিছুতে আঘাত করে এ কথাটা সকল তর্ক ছাড়িয়ে যায়। মেয়েদের পীড়ন করা এতই সহজ; তাদের মর্ম্মস্থান চারদিকেই অনাবৃত। জবরদস্তের হাতেই সমাজ চাবুক জুগিয়েচে; আর যারা বর্ম্মহীন তাদের স্পর্শকাতর পিঠের দিকে কোনো বিধিবিধান নজর করে না। এমন অবস্থায় স্নেহের ধনকে রোষ-বিদ্বেষ-ঈর্ষ্যার তুফানে ভাসিয়ে দিয়ে নিজের অভিমান বাঁচাবার চেষ্টা করা কাপুরুষতা, বিপ্রদাসের মনের এই ভাব।

বিপ্রদাস কাউকে না জানিয়ে ঘোড়ায় চ'ড়ে গেলো ষ্টেশনে। গাড়ি এসে পৌঁছলো, তখন বেলা পাঁচটা। সেলুন গাড়ি থেকে রাজা নাম্‌লো দলবল নিয়ে। বিপ্রদাসকে দেখে শুষ্ক সংক্ষিপ্ত নমস্কার ক'রে বল্‌লে, "একি, আপ্‌নি কেন কষ্ট ক'রে?"

বিপ্রদাস। "বিলক্ষণ! এই প্রথম আসা আমার দেশে, অভ্যর্থনা ক'রে নেবো না?"

রাজা। "ভুল করচেন। আপনার দেশে এখনো আসিনি। সে হবে বিয়ের দিনে।"

বিপ্রদাস কথাটার মানে বুঝতে পারলে না। ষ্টেশনে ভিড়ের মধ্যে তর্ক করবার জায়গা নয়—তাই কেবল বল্‌লে, "ঘাটে বজ্‌রা তৈরি।"

রাজা বল্‌লে, "দরকার হবে না. আমাদের ষ্টীম্ লঞ্চ্ এসেচে।"

বিপ্রদাস বুঝলে সুবিধে নয়। তবু আর একবার বল্‌লে, "খাওয়া-দাওয়ার জিনিষপত্র, রসুইয়ের নৌকো সমস্তই প্রস্তুত।"

"কেন এত উৎপাত করলেন! কিছুই দরকার হবে না। দেখুন, একটা কথা মনে রাখ্‌বেন, এসেচি আমার পূর্ব্বপুরুষদের জন্মভূমিতে—আপনাদের দেশে না। বিয়ের দিনে সেখানে যাবার কথা।"

বিপ্রদাস বুঝলে কিছুতেই নরম হবার আশা নেই। বুকের ভিতরটা দ'মে গেলো। ষ্টেশনের বসবার ঘরে কেদারায় গিয়ে শুয়ে পড়লো। শীতের সন্ধ্যা, অন্ধকার হ'য়ে এসেচে। উত্তর থেকে গাড়ি আসবার জন্যে ঘণ্টা পড়লো, ষ্টেশনে আলো জ্বল্‌লো,—লাগাম ছেড়ে ঘোড়াকে নিজের মরজি মতো চল্‌তে দিয়ে বিপ্রদাস যখন বাড়ি ফিরলে তখন যথেষ্ট রাত। কোথায় গিয়েছিল, কি ঘটেছিল, কাউকে কিছুই বল্‌লে না।

সেই দিন রাত্রে ওর ঠাণ্ডা লেগে কাশি আরম্ভ হোলো। ক্রমেই চল্‌লো বেড়ে। উপেক্ষা করতে গিয়ে ব্যামোটাকে আরো উস্‌কে তুল্‌লে। শেষকালে কুমু ওকে অনেক ধ'রে ক'রে এনে বিছানায় শোওয়ায়। অনুষ্ঠানের সমস্ত ভারই পড়্‌ল নবগোপালের উপর।

১৬

দুদিন পরেই নবগোপাল এসে বল্‌লে, "কি করি একটা পরামর্শ দাও।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিপ্রদাস ব্যস্ত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে, "কেন? কি হয়েচে?"

"সঙ্গে গোটাকতক সাহেব,—দালাল হবে, কিম্বা মদের দোকানের বিলিতী শুঁড়ি, কাল পীরপুরের চরের থেকে কিছু না হবে তো ছশো কাদাখোঁচা পাখী মেরে নিয়ে উপস্থিত। আজ চলেচে চন্দনদহের বিলে। এই শীতের সময় সেখানে হাঁসের মরসুম,—রাক্ষুসে ওজনের জীবহত্যা হবে,—অহিরাবণ, মহীরাবণ, হিড়িম্বা, ঘটোৎকচ, ইস্তিক কুম্ভকর্ণের পর্য্যন্ত পিণ্ডি দেবার উপযুক্ত,—প্রেতলোকে দশমুণ্ড রাবণের চোয়াল ধ'রে যাবার মতো।"

বিপ্রদাস স্তম্ভিত হ'য়ে রইলো, কিছু বল্লে না।

নবগোপাল বল্লে, "তোমারি হুকুম ঐ বিলে কেউ শিকার করতে পাবে না। সে-বার জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটকে পর্য্যন্ত ঠেকিয়েছিলে—আমরা ত' ভয় করেছিলুম তোমাকেও পাছে সে রাজহাঁস ভুল ক'রে গুলি ক'রে বসে। লোকটা ছিল ভদ্র, চ'লে গেলো। কিন্তু এরা গো-মৃগ-দ্বিজ কাউকে মানবার মতো মানুষ নয়। তবু যদি বলো তো একবার না হয়—"

বিপ্রদাস ব্যস্ত হ'য়ে বল্লে, "না, না, কিছু বোলো না।"

বিপ্রদাস বাঘ শিকারে জেলার মধ্যে সব-সেরা। কোনো একবার পাখী মেরে তার এমন ধিক্কার হয়েছিল যে, সেই অবধি নিজের এলেকায় পাখী মারা একেবারে বন্ধ ক'রে দিয়েচে।

শিওরের কাছে কুমু ব'সে বিপ্রদাসের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। নবগোপাল চ'লে গেলে সে মুখ শক্ত ক'রে বল্লে, "দাদা, বারণ ক'রে পাঠাও।"

"কি বারণ করব?"

"পাখী মারতে।"

"ওরা ভুল বুঝবে কুমু, সইবে না।"

"তা বুঝুক ভুল। মান-অপমান শুধু ওদের একলার নয়।"

বিপ্রদাস কুমুর মুখের দিকে চেয়ে মনে মনে হাসলে। সে জানে কঠিন নিষ্ঠার সঙ্গে কুমু মনে মনে সতী-ধর্ম্ম অনুশীলন করচে। ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা। সামান্য পাখীর প্রাণ নিয়ে কায়ার সঙ্গে ছায়ার পথভেদ ঘটবে না কি?

বিপ্রদাস স্নেহের স্বরে বল্লে, "রাগ করিসনে কুমু, আমিও একদিন পাখী মেরেচি। তখন অন্যায় ব'লে বুঝতেই পারিনি। এদেরও সেই দশা।"

অক্লান্ত উৎসাহের সঙ্গে চল্লো শিকার, পিক্‌নিক্, এবং সন্ধ্যেবেলায় ব্যাণ্ডের সঙ্গীত সহযোগে ইংরেজ অভ্যাগতদের নাচ। বিকালে টেনিস; তা ছাড়া দীঘির নৌকোর পরে তিনচার পর্দ্দা তুলে দিয়ে বাজি রেখে পালের খেলা;—তাই দেখতে গ্রামের লোকেরা দীঘির পাড়ে দাঁড়িয়ে যায়। রাত্রে ডিনারের পরে চীৎকার চলে, "ফর্ হী ইজ্ এ জলি গুড্ ফেলো।" এই সব বিলাসের প্রধান নায়কনায়িকা সাহেব মেম, তাতেই গাঁয়ের লোকের চমক লাগে। এরা যে সোলার টুপি মাথায় ছিপ ফেলে মাছ ধরে, সেও বড়ো অপরূপ দৃশ্য। অন্য পক্ষে লাঠিখেলা, কুস্তি, নৌকোবাচ, যাত্রা, সখের থিয়েটার এবং চারটে হাতীর সমাবেশ, এর কাছে লাগে কোথায়?

বিবাহের দু'দিন আগে গায়েহলুদ। দামী গহনা থেকে আরম্ভ ক'রে খেলার পুতুল পর্য্যন্ত সওগাদ বা বয়ের বাসা থেকে এলো তার ঘটা দেখে সকলে অবাক্। তার বাহনই বা কত! চাটুজ্জেরা খুব দরাজ হাতেই তাদের বিদায় করলে।

অবশেষে জনসাধারণকে খাওয়ানো নিয়ে বৈবাহিক কুরুক্ষেত্রের দ্রোণপর্ব্ব সুরু হোলো।

সেদিন ঢোল পিটিয়ে সর্ব্বসাধারণের নিমন্ত্রণ মধুসাগরের তীরে মধুপুরীতে। রবাহুত অনাহুত কারো বাদ নেই। নবগোপাল রেগে আগুন। "একি আস্পর্দ্ধা! আমরা হলুম জমিদার, এর মধ্যে উনি ওঁর মধুপুরী খাড়া করেন কোথা থেকে?"

এদিকে ভোজের আয়োজনটা খুব ব্যাপকরূপেই সকলের কাছে প্রকাশমান হ'য়ে উঠ্‌লো। সামান্য ফর্দ্দর নয়। মাছ, দই, ক্ষীর, সন্দেশ, ঘি, ময়দা, চিনি খুব সোরগোল ক'রে আমদানি। গাছতলায় মস্ত মস্ত উনন্ পাতা; রান্নার জন্যে নানা আয়তনের হাঁড়ি, হাঁড়া, মালসা,

কল্‌সী, জালা; সারবন্দী গোরুর গাড়ীতে এলো আলু, বেগুন, কাঁচকলা, শাক সব্‌জি। আহারটা হবে সন্ধ্যের সময় বাঁধা রোশনাইয়ের আলোয়।

এদিকে চাটুজ্জেদের বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজন। দলে দলে প্রজারা মিলে নিজেরাই আয়োজন করেচে। হিন্দুদের মুসলমানদের স্বতন্ত্র জায়গা। মুসলমান প্রজার সংখ্যাই বেশি—রাত না পোয়াতেই তারা নিজেরাই রান্না চড়িয়েচে। আহারের উপকরণ যত না হোক্, ঘন ঘন চাটুজ্জেদের জয়ধ্বনি উঠ্‌চে তার চতুর্গুণ। স্বয়ং নবগোপাল বাবু বেলা প্রায় পাঁচটা পর্য্যন্ত অভুক্ত অবস্থায় ব'সে থেকে সকলকে খাওয়ালেন। তার পরে হোলো কাঙালীবিদায়। মাতব্বর প্রজারা নিজেরাই দানবিতরণের ব্যবস্থা করলে। কলধ্বনিতে জয়ধ্বনিতে বাতাসে চল্‌ল সমুদ্রমন্থন।

মধুপুরীতে সমস্ত দিন রান্না বসেচে। গন্ধে বহুদূর পর্য্যন্ত আমোদিত। খুরি ভাঁড় কলাপাতা হয়েচে পর্ব্বতপ্রমাণ। তরকারি ও মাছকোটার আবর্জ্জনা নিয়ে কাকেদের কলরবের বিরাম নেই—রাজ্যের কুকুরগুলোও পরস্পর কাম্‌ড়াকাম্‌ড়ি চেঁচামেচি বাধিয়ে দিয়েচে। সময় হ'য়ে এলো, রোশ্‌নাই জলেচে, মেটিয়াবুরুজের রসনচৌকি ইমনকল্যাণ থেকে কেদারা পর্য্যন্ত বাজিয়ে চল্‌লো। অনুচর পরিচরেরা থেকে থেকে উদ্বিগ্নমুখে রাজাবাহাদুরের কানের কাছে ফিস্ ফিস্ ক'রে জানাচ্চে এখনো খাবার লোক যথেষ্ট এলো না। আজ হাটের দিন, ভিন্ন এলেকা থেকে যারা হাট ক'রতে এসেচে তাদের কেউ কেউ পাত পাড়া দেখে ব'সে গেছে। কাঙাল ভিক্ষুকও সামান্য কয়েকজন আছে।

মধুসূদন নির্জ্জন তাঁবুর ভিতর ঢুকে মুখ অন্ধকার ক'রে একটা চাপা হুঙ্কার দিলে—"হুঁ।"

ছোটো ভাই রাধু এসে বল্‌লে, "দাদা, আর কেন? চলো।"

"কোথায়?"

"ফিরে যাই কলকাতায়। এরা সব বদমাইষি করচে। এদের চেয়ে বড়ো বড়ো ঘরের পাত্রী তোমার ক'ড়ে আঙুল নাড়ার অপেক্ষায় ব'সে। একবার তু করলেই হয়।"

মধুসূদন গর্জ্জন ক'রে উঠে বল্‌লে, "যা চলে।"

একশো বছর পূর্ব্বে যেমন ঘটেছিল, আজও তাই। এবারেও একপক্ষের আড়ম্বরের চুড়োটা অন্যপক্ষের চেয়ে অনেক উঁচু ক'রেই গড়া হ'য়েছিল, অন্যপক্ষ তা রাস্তা পার হ'তে দিলে না। কিন্তু আসল হারজিৎ বাইরে থেকে দেখা যায় না। তার ক্ষেত্রটা লোক-চক্ষুর অগোচরে।

চাটুজ্জেদের প্রজারা খুব হেসে নিলে। বিপ্রদাস রোগশয্যায়; তার কানে কিছুই পৌঁছল না।

১৭

বিয়ের দিনে, রাজার হুকুম, কনের বাড়ি যাবার পথে ধুমধাম একেবারেই বন্ধ। আলো জ্বললো না, বাজ্‌না বাজ্‌লো না, সঙ্গে কেবল নিজেদের পুরোহিত, আর দুই জন ভাট। পাল্কীতে ক'রে নিঃশব্দে বিয়েবাড়ীতে বর এলো, লোকে হঠাৎ বুঝতেই পারলে না। ওদিকে মধুপুরীর তাঁবুতে আলো জ্বালিয়ে ব্যাণ্ড বাজিয়ে বিপরীত হৈ হৈ শব্দে বরযাত্রীর দল আহারে আমোদে প্রবৃত্ত। নবগোপাল বুঝ্‌লে এটা হোলো পাল্টা জবাব। এমন স্থলে কন্যাপক্ষ হাতে পায়ে ধ'রে বরপক্ষের সাধ্যসাধনা করে;—নবগোপাল তার কিছুই করলে না। একবার জিজ্ঞাসাও করলে না, বরযাত্রীদের হোলো কি।

কুমুদিনী সাজ-সজ্জা ক'রে বিবাহ-আসরে যাবার আগে দাদাকে প্রণাম করতে এলো; তার সর্ব্বশরীর কাঁপচে। বিপ্রদাসের তখন একশো পাঁচ ডিগ্রি জ্বর; বুকে পিঠে রাইশর্ষের পলস্তারা, কুমুদিনী তার পায়ের উপর মাথা ঠেকিয়ে আর থাকতে পারলে না, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌লো। ক্ষেমা পিসি মুখে হাত চাপা দিয়ে বল্‌লে, "ছি, ছি, অমন ক'রে কাঁদতে নেই।"

বিপ্রদাস একটু উঠে ব'সে ওকে হাতে ধ'রে পাশে বসিয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইলো—দুই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো। ক্ষেমা পিসি বল্‌লে, "সময় হোলো যে।"

বিপ্রদাস কুমুর মাথায় হাত দিয়ে রুদ্ধকণ্ঠে বল্‌লে,

যোগাযোগ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"সর্ব্বশুভদাতা কল্যাণ করুন।" ব'লেই ধপ্ ক'রে বিছানায় শুয়ে পড়লো।

বিবাহের সমস্তক্ষণ কুমুর দুচোখ দিয়ে কেবল জল পড়েচে। বরের হাতে যখন হাত দিলে সে হাত ঠাণ্ডা হিম, আর থর্থর্ ক'রে কাঁপ্‌চে। শুভদৃষ্টির সময় সে কি স্বামীর মুখ দেখেচে? হয় তো দেখেনি। এদের ব্যবহারে সবসুদ্ধ জড়িয়ে স্বামীর উপর ওর ভয় ধ'রে গেছে। পাখীর মনে হচ্চে তার জন্যে বাসা নেই, আছে ফাঁস।

মধুসূদনকে দেখতে কুশ্রী নয় কিন্তু বড়ো কঠিন। কালো মুখের মধ্যে যেটা প্রথমেই চোখে পড়ে সে হচ্চে পাখীর চঞ্চুর মতো মস্ত বড়ো বাঁকা নাক, ঠোঁটের সামনে পর্য্যন্ত ঝুঁকে প'ড়ে যেন পাহারা দিচ্চে। প্রশস্ত গড়ানে কপাল ঘন ভ্রূর উপর বাধাপ্রাপ্ত স্রোতের মতো স্ফীত। সেই ভ্রূর ছায়াতলে সঙ্কীর্ণ তির্য্যক চক্ষুর দৃষ্টি তীব্র। গোঁফদাড়ি কামানো, ঠোঁট চাপা, চিবুক ভারী। কড়া চুল কাফ্রিদের মতো কোঁকড়া, মাথার তেলো-ঘেঁষে ছাঁটা। খুব আঁটসাঁট শরীর; যত বয়েস তার চেয়ে কম বোধ হয়, কেবল দুই রগের কাছে চুলে পাক ধরেচে। বেঁটে, মাথায় প্রায় কুমুদিনীর সমান। হাত দুটো রোমশ ও দেহের তুলনায় খাটো। সবসুদ্ধ মনে হয় মানুষটা একেবারে নিরেট; মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই কি একটা প্রতিজ্ঞা যেন গুলি পাকিয়ে আছে। যেন ভাগ্যদেবতার কামান থেকে নিক্ষিপ্ত হ'য়ে একাগ্রভাবে চলেচে একটা একগুঁয়ে গোলা। দেখলেই বোঝা যায় বাজে কথা, বাজে বিষয়, বাজে মানুষের প্রতি মন দেবার ওর একটুও অবকাশ নেই।

বিবাহটা এমন ভাবে হোলো যে, সকলেরই মনে খারাপ লাগ্‌লো। বরপক্ষ কন্যাপক্ষের প্রথম সংস্পর্শমাত্রই এমন একটা বেসুর ঝন্‌ঝনিয়ে উঠ্‌ল যে, তার মধ্যে উৎসবের সঙ্গীত কোথায় গেলো তলিয়ে। থেকে থেকে কুমুর মনের একটা প্রশ্ন অভিমানে বুক ঠেলে ঠেলে উঠচে, "ঠাকুর কি তবে আমাকে ভোলালেন?" সংশয়কে প্রাণপণে চাপা দেয়, রুদ্ধঘরের মধ্যে একলা ব'সে বারবার মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে; বলে, মন যেন দুর্ব্বল না হয়। সব চেয়ে কঠিন হয়েচে দাদার কাছে সংশয় লুকোতে।

মায়ের মৃত্যুর পর থেকে কুমুদিনীর সেবার পরেই বিপ্রদাসের একান্ত নির্ভর। কাপড় চোপড়, দিনখরচের টাকাকড়ি, বইয়ের আলমারি, ঘোড়ার দানা, বন্দুকের সম্মার্জ্জন, কুকুরের সেবা, ক্যামেরার রক্ষণ, সঙ্গীতযন্ত্রের পর্য্যবেক্ষণ, শোবার বসবার ঘরের পারিপাট্যসাধন,—সমস্তই কুমুর হাতে। এত বেশি অভ্যাস হ'য়ে এসেছে যে, প্রাত্যহিক ব্যবহারে কুমুর হাত কোথাও না থাক্‌লে তার রোচে না। সেই দাদার রোগশয্যায় বিদায়ের আগে শেষ কয়দিন যে-সেবা করতে হয়েচে তার মধ্যে নিজের ভাবনার কোনো ছায়া না পড়ে এই তার দুঃসাধ্য চেষ্টা। কুমুর এসরাজের হাত নিয়ে বিপ্রদাসের ভারী গর্ব্ব। লাজুক কুমু সহজে বাজাতে চায় না। এই দুদিন সে আপনি বেচে দাদাকে কানাড়া মালকোষের আলাপ শুনিয়েচে। সেই আলাপের মধ্যেই ছিল তার দেবতার স্তব, তার প্রার্থনা, তার আশঙ্কা, তার আত্মনিবেদন। বিপ্রদাস চোখ বুজে চুপ ক'রে শোনে আর মাঝে মাঝে ফরমাস করে—সিন্ধু, বেহাগ, ভৈরবী—যে-সব সুরে বিচ্ছেদ-বেদনার কান্না বাজে। সেই সুরের মধ্যে ভাই-বোন দুজনেরই ব্যথা এক হ'য়ে মিশে যায়। মুখের কথায় দুজনে কিছুই বল্‌লে না; না দিলে পরস্পরকে সান্ত্বনা, না জানালে দুঃখ।

বিপ্রদাসের জ্বর, কাশি, বুকে ব্যথা সারলো না,—বরং বেড়ে উঠ্‌চে। ডাক্তার বলচে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, হয় তো ন্যুমোনিয়ায় গিয়ে পৌছতে পারে, খুব সাবধান হওয়া চাই। কুমুর মনে উদ্বেগের সীমা নেই। কথা ছিল বাসি বিয়ের কাল-রাত্রিটা এখানেই কাটিয়ে দিয়ে পরদিন কলকাতায় ফিরবে। কিন্তু শোনা গেল মধুসূদন হঠাৎ পণ করেচে বিবাহের পরদিনে ওকে নিয়ে চ'লে যাবে। বুঝ্‌লে, এটা প্রথার জন্যে নয়, প্রয়োজনের জন্যে নয়, প্রেমের জন্যে নয়, শাসনের জন্যে। এমন অবস্থায় অনুগ্রহ দাবী করতে অভিমানিনার মাথায় বজ্রাঘাত হয়। তবু কুমু মাথা হেঁট ক'রে লজ্জা কাটিয়ে কম্পিতকণ্ঠে

বিবাহের রাতে স্বামীর কাছে এইমাত্র প্রার্থনা করেছিল যে, আর দুটো দিন যেন তাকে বাপের বাড়ীতে থাকতে দেওয়া হয়, দাদাকে একটু ভালো দেখে যেন সে যেতে পারে। মধুসূদন সংক্ষেপে বল্‌লে, "সমস্ত ঠিকঠাক হ'য়ে গেছে।" এমন বজ্রে-বাঁধা এক পক্ষের ঠিকঠাক, তার মধ্যে কুমুর মর্ম্মান্তিক বেদনারও এক তিল স্থান নেই। তারপর মধুসূদন ওকে রাত্রে কথা কওয়াতে চেষ্টা করেছে, ও একটিও জবাব দিল না—বিছানার প্রান্তে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে রইল।

তখনো অন্ধকার, প্রথম পাখীর দ্বিধাজড়িত কাকলী শোনবামাত্র ও বিছানা ছেড়ে চ'লে গেল।

বিপ্রদাস সমস্ত রাত ছট্‌ফট্‌ করেচে। সন্ধ্যার সময় জরগায়েই বিবাহ সভায় যাবার জন্যে ওর ঝোঁক হোলো। ডাক্তার অনেক চেষ্টায় চেপে রেখে দিলে। ঘন ঘন লোক পাঠিয়ে সে খবর নিয়েচে। খবরগুলো যুদ্ধের সময়কার খবরের মতো, অধিকাংশই বানানো। বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা করলে, "কখন বর এলো? বাজনা-বাদ্যির আওয়াজ তো পাওয়া গেলো না।"

সংবাদদাতা শিবু বল্‌লে, "আমাদের জামাই বড়ো বিবেচক—বাড়ীতে অসুখ শুনেই সব থামিয়ে দিয়েচে—বর-যাত্রদের পায়ের শব্দ শোনা যায় না, এমনি ঠাণ্ডা!"

"ওরে শিবু, খাবার জিনিষ তো কুলিয়েছিল? আমার ঐ এক ভাবনা ছিল, এ তো কলকাতা নয়!"

"কুলোয় নি? বলেন কি হুজুর? কত ফেলা গেলো। আরো অতগুলো লোককে খাওয়াবার মত জিনিষ বাকী আছে।"

"ওরা খুসি হয়েছে ত?"

"একটি নালিশ কারো মুখে শোনা যায় নি। একেবারে টুঁ শব্দটি না। আরো তো এত এত বিয়ে দেখেচি, বর-যাত্রের দাপাদাপিতে কন্তাকর্ত্তার ভির্মি লাগে। এরা এমনি চুপ, আছে কি না আছে বোঝাই যায় না।"

বিপ্রদাস বল্‌লে, "ওরা কলকাতার লোক কি না, তাই ভদ্র ব্যবহার জানা আছে। ওরা বোঝে যে, যে-বাড়ি থেকে মেয়ে নেবে তাদের অপমানে নিজেদেরই অপমান।"

"আহা, হুজুর যা বল্‌লেন এই কথাটি ওদের লোক-জনদের আমি শুনিয়ে দেবো। শুনলে ওরা খুসি হবে।"

কুমু কাল সন্ধ্যের সময়েই বুঝেছিল অসুখ বাড়বার মুখে। অথচ সে যে দাদার সেবা করতে পারবে না এই দুঃখ সর্ব্বক্ষণ তার বুকের মধ্যে ফাঁদে-পড়া পাখীর মতো ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলো। তার হাতের সেবা যে তার দাদার কাছে ওষুধের চেয়ে বেশি।

স্নান ক'রে ঠাকুরকে ফুল দিয়ে কুমু যখন দাদার ঘরে এলো তখনো সূর্য্য ওঠে নি। কঠিন রোগের সঙ্গে অনেক-ক্ষণ লড়াই ক'রে ক্ষণকাল ছুটি পাবার সময় যে অবসাদের বৈরাগ্য আসে সেই বৈরাগ্যে বিপ্রদাসের মন তখন শিথিল। জীবনের আসক্তি, সংসারের ভাবনা সব তার কাছে শস্যশূন্য মাঠের মতো ধূসরবর্ণ। সমস্ত রাত দরজা বন্ধ ছিল, ডাক্তার ভোরের বেলায় পূবদিকের জানলাটা খুলে দিয়েচে। অশথ গাছের শিশির-ভেজা পাতার আড়ালে অরুণবর্ণ আকাশের আভা ধীরে ধীরে শুভ্র হ'য়ে আসচে,—অদূরবর্ত্তী নদীতে মহাজনী নৌকোর বৃহৎ তালি দেওয়া পালগুলি সেই আরক্তিম আকাশের গায়ে স্ফীত হ'য়ে উঠ্‌লো। নহবতে করুণ সুরে রামকেলি বাজচে।

পাশে ব'সে কুমু নিজের দুই ঠাণ্ডা হাতের মধ্যে দাদার শুক্‌নো গরম হাত তুলে নিলে। বিপ্রদাসের টেরিয়র কুকুর খাটের নীচে বিমর্ষ মনে চুপ ক'রে শুয়ে ছিল। কুমু খাটে এসে বস্‌তেই সে দাঁড়িয়ে উঠে দু পা তার কোলের উপর রেখে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে করুণ চোখে ক্ষীণ আর্ত্ত স্বরে কী যেন প্রশ্ন করলে।

বিপ্রদাসের মনে ভিতরে ভিতরে কি একটা চিন্তার ধারা চল্‌ছিল, তাই হঠাৎ এক সময়ে অসংলগ্নভাবে ব'লে উঠ্‌ল, "দিদি, আসলে কিছুই নয়,—কে বড়ো কে ছোটো, কে উপরে কে নীচে, এ সমস্তই বানানো কথা। ফেনার মধ্যে বুদ্‌বুদ্‌গুলোর কোন্‌টার কোথায় স্থান তাতে কী আসে যায়। আপনার ভিতরে আপনি সহজ হ'য়ে থাকিস্‌ কিছুতেই তোকে মারবে না।"

"আমাকে আশীর্ব্বাদ করো, দাদা, আমাকে আশীর্ব্বাদ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

করো," ব'লে কুমু দু-হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কান্না চাপা দিলে।

বিপ্রদাস বালিশে ঠেস দিয়ে একটু উঠে ব'সে কুমুর মুখ নামিয়ে ধরে তার মাথায় চুমো খেলে।

ডাক্তার ঘরে ঢুকে বল্লে, "আর নয়, কুমু দিদি, এখন ওঁর একটু শান্ত থাকা দরকার।"

কুমু রোগীর বালিশ একটু চেপে-চুপে ঠিক ক'রে, গায়ের উপর গরম কাপড়টা টেনে দিয়ে, পাশের টিপাইটার উপরকার বিশৃঙ্খলতা একটু সেরে নিয়ে দাদার কানের কাছে মৃদুস্বরে বল্লে, "সেরে গেলেই কলকাতায় যেয়ো দাদা, সেখানে তোমাকে দেখ্‌তে পাব।"

বিপ্রদাস বড়ো বড়ো দুই স্নিগ্ধ চোখ কুমুর মুখের উপর স্থির রেখে বল্লে, "কুমু, পশ্চিমের মেঘ যায় পূবে, পূবের মেঘ যায় পশ্চিমে, এ সব হাওয়ায় হয়। সংসারে সেই হাওয়া বইচে। মেঘের মতই অম্‌নি সহজে এটাকে মেনে নিস্‌ দিদি। এখন থেকে আমাদের কথা বেশি ভাবিস্‌নে। যেখানে যাচ্চিস্‌ সেখানে লক্ষ্মীর আসন তুই জুড়ে থাকিস্‌— এই আমার সকল মনের আশীর্ব্বাদ। তোর কাছে আমরা আর কিছুই চাইনে।"

দাদার পায়ের কাছে কুমু মাথা রেখে প'ড়ে রইলো। "আজ থেকে আমার কাছে আর কিছুই চাবার নেই। এখানকার প্রতিদিনের জীবন-যাত্রায় আমার কোনো হাতই থাক্‌বে না।"—এক মুহূর্ত্তে এত বড়ো বিচ্ছেদের কথা মনে মেনে নেওয়া যায় না। ঝড়ে যখন নৌকাকে ডাঙা থেকে টেনে নিয়ে যায় তখন নোঙর যেমন ক'রে মাটি আঁকড়ে থাক্‌তে চায়, দাদার পায়ের কাছে কুমুর তেম্‌নি এই শেষ ব্যগ্রতার বন্ধন। ডাক্তার দ্বারের এসে ধীরে ধীরে বল্লে, "আর নয় দিদি।" ব'লে নিজের অশ্রুসিক্ত চোখ মুছে ফেল্‌লে। ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে কুমু দরজার বাইরে যে চৌকিটা ছিল তার উপর ব'সে প'ড়ে মুখে আঁচল দিয়ে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগ্‌ল। হঠাৎ এক সময় মনে প'ড়ে গেল দাদার "বেসি" ঘোড়াকে নিজের হাতে খাইয়ে দিয়ে যাবে ব'লে কাল রাত্রে সে গুড়মাখা আটার রুটি তৈরি ক'রে রেখেছিল। সইস আজ ভোর বেলায় তাকে খিড়কির বাগানে রেখে এসেচে। কুমু সেখানে গিয়ে দেখ্‌লে ঘোড়া আমড়াগাছ তলায় ঘাস খেয়ে বেড়াচ্চে। দূর থেকে কুমুর পায়ের শব্দ শুনেই কান খাড়া করলে এবং তাকে দেখেই *চিঁহিঁ হিঁহিঁ* ক'রে ডেকে উঠল। বাঁ হাত তার কাঁধের উপর রেখে ডান হাতে কুমু তার মুখের কাছে রুটি ধ'রে তাকে খাওয়াতে লাগ্‌লো। সে খেতে খেতে তার বড়ো বড়ো কালো স্নিগ্ধ চোখে কুমুর মুখের দিকে কটাক্ষে চাইতে লাগ্‌লো। খাওয়া হ'য়ে গেলে বেসির দুই চোখের মাঝখানকার প্রশস্ত কপালের উপর চুমো খেয়ে কুমু দৌড়ে চ'লে গেলো।

১৮

বিপ্রদাস নিশ্চয় মনে করেছিল মধুসূদন এই কয়দিনের মধ্যে একবার এসে দেখা ক'রে যাবে। তা যখন করলে না তখন ওর বুঝ্‌তে বাকি রইলো না যে, দুই পরিবারের এই বিবাহের সম্বন্ধটাই এলো পরস্পরের বিচ্ছেদের খড়্গ হ'য়ে। রোগের নিরতিশয় ক্লান্তিতে এ কথাটাকেও সহজভাবে সে মেনে নিলে। ডাক্তারকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে, "একটু এস্রাজ বাজাতে পারি কি?"

ডাক্তার বল্লে, "না, আজ থাক্‌।"

"তাহ'লে কুমুকে ডাকো, সে একটু বাজাক্‌। আবার কবে তার বাজ্‌না শুনতে পাবো, কে জানে।"

ডাক্তার বল্লে, "আজ সকালে ন'টার গাড়িতে ওঁদের ছাড়তে হবে, নইলে সূর্য্যাস্তের আগে কলকাতায় পৌঁছতে পারবেন না। কুমুর তো আর সময় নেই।"

বিপ্রদাস নিশ্বাস ফেলে বল্লে, "না, এখানে ওর সময় ফুরোলো। উনিশ বছর কাট্‌তে পেরেচে, এখন এক ঘণ্টাও আর কাট্‌বে না।"

বিদায়ের সময় স্বামী স্ত্রী জোড়ে প্রণাম করতে এলো। মধুসূদন ভদ্রতা ক'রে বল্লে, "তাই তো, আপনার শরীর তো ভাল দেখ্‌ছিনে।"

বিপ্রদাস তার কোনো উত্তর না ক'রে বল্লে, "ভগবান তোমাদের কল্যাণ করুন্‌।"

"দাদা, নিজের শরীরের একটু যত্ন কোরো" ব'লে আর একবার বিপ্রদাসের পায়ের কাছে প'ড়ে কুমু কাঁদতে লাগ্‌ল।

হুলুধ্বনি শঙ্খধ্বনি ঢাক কাঁসর নহবতে একটা আওয়াজের সাইক্লোন্ ঝড় উঠলো। ওরা গেল চ'লে।

পরস্পরের আঁচলে চাদরে বাঁধা ওরা যখন চ'লে যাচ্চে সেই দৃশ্যটা আজ, কেন কি জানি, বিপ্রদাসের কাছে বীভৎস লাগ্‌লো। প্রাচীন ইতিহাসে তৈমুর জঙ্গিস্ অসংখ্য মানুষের কঙ্কাল-স্তম্ভ রচনা করেছিল। কিন্তু ঐ যে চাদরে-আঁচলের গ্রন্থি, ওর সৃষ্ট জীবন-মৃত্যুর জয়তোরণ যদি মাপা যায় তবে তার চূড়া কোন্ নরকে গিয়ে ঠেক্‌বে! কিন্তু এ কেমনতরো ভাবনা আজ ওর মনে!

পূজার্চ্চনায় বিপ্রদাসের কোনো দিন উৎসাহ ছিল না। তবু আজ হাত জোড় ক'রে মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগ্‌লো।

এক সময়ে চম্‌কে উঠে বল্‌লে, "ডাক্তার, ডাকোতো দেওয়ানজিকে।"

বিপ্রদাসের হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল, বিয়ে দিতে আসবার কিছু দিন আগে যখন সুবোধকে টাকা পাঠানো নিয়ে মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, হিসাবের খাতাপত্র ঘেঁটে ক্লান্ত, বেলা এগারোটা,—এমন সময়ে অত্যন্ত বে-মেরামৎ গোছের একটা মানুষ, কিছুকালের না-কামানো কণ্টকিত জীর্ণ মুখ, হাড়-বের-করা শির-বের-করা হাত, ময়লা একখানা চাদর, খাটো একখানা ধুতি, ছেঁড়া একজোড়া চটি পরা এসে উপস্থিত। নমস্কার ক'রে বল্‌লে, "বড়ো বাবু, মনে পড়ে কি?"

বিপ্রদাস একটু লক্ষ্য ক'রে বল্‌লে, "কি, বৈকুণ্ঠ নাকি?"

বিপ্রদাস বালককালে যে-ইস্কুলে পড়তো সেই ইস্কুলেরই সংলগ্ন একটা ঘরে বৈকুণ্ঠ ইস্কুলের বই, খাতা, কলম, ছুরি, ব্যাট্‌বল, লাঠিম আর তারি সঙ্গে মোড়কে করা চিনেবাদাম বিক্রি করতো। তার ঘরে বড়ো ছেলেদের আড্ডা ছিল—যত রকম অদ্ভুত অসম্ভব খোস গল্প করতে এর জুড়ি কেউ ছিল না।

বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "তোমার এমন দশা কেন?"

কয়েক বৎসর হোলো সম্পন্ন অবস্থার গৃহস্থের ঘরে মেয়ের বিয়ে দিয়েচে। তাদের পণের বিশেষ কোনো আবশ্যক ছিল না ব'লেই বরের পণও ছিল বেশি। বারোশো টাকায় রফা হয়, তাছাড়া আশী ভরি সোনার গয়না। একমাত্র আদরের মেয়ে ব'লেই মরীয়া হ'য়ে সে রাজি হয়েছিল। এক সঙ্গে সব টাকা সংগ্রহ করতে পারেনি, তাই মেয়েকে যন্ত্রণা দিয়ে দিয়ে ওরা বাপের রক্ত শুষেচে। সম্বল সবই ফুরোলো তবু এখনো আড়াইশো টাকা বাকি। এবারে মেয়েটির অপমানের শেষ নেই। অত্যন্ত অসহ্য হওয়াতেই বাপের বাড়ি পালিয়ে এসেছিল। তাতে ক'রে জেলের কয়েদীর জেলের নিয়ম ভঙ্গ করা হ'লো, অপরাধ বেড়েই গেলো। এখন ঐ আড়াইশো টাকা ফেলে দিয়ে মেয়েটাকে বাঁচাতে পারলে বাপ মরবার কথাটা ভাববার সময় পায়।

বিপ্রদাস ম্লান হাসি হাসলে। যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করবার কথা সেদিন ভাববারও জো ছিল না। ক্ষণকালের জন্যে ইতস্তত করলে, তার পরে উঠে গিয়ে বাক্সো থেকে থলি ঝেড়ে দশটি টাকার নোট এনে তার হাতে দিলো। বল্‌লে, "আরো দুচার জায়গা থেকে চেষ্টা দেখো, আমার আর সাধ্য নেই।"

বৈকুণ্ঠ সে কথা একটুও বিশ্বাস করলে না। পা টেনে টেনে চ'লে গেলো, চটিজুতোর অত্যন্ত অপ্রসন্ন শব্দ।

সেদিনকার এই ব্যাপারটা ভুলেই গিয়েছিল, আজ হঠাৎ বিপ্রদাসের মনে পড়ল। দেওয়ানজিকে ডেকে হুকুম হোলো—বৈকুণ্ঠকে আজই আড়াইশো টাকা পাঠানো চাই। দেওয়ানজি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকোয়। জেদাজেদির মুখে খরচ ক'রে বিবাহ তো চুকেছে, কিন্তু অনেকদিন ধ'রে তার হিসাব শোধ করতে হবে—এখন দিনের গতিকে আড়াইশো টাকা যে মস্ত বড়ো অঙ্ক।

দেওয়ানজির মুখের ভাব দেখে বিপ্রদাস আঙুল থেকে হীরের আঙটি খুলে বল্‌লে, "ছোটবাবুর নামে যে টাকা ব্যাঙ্কে জমা রেখেচি, তার থেকে ঐ আড়াইশো টাকা নাও,

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তার বদলে আমার আংটি বন্ধক রইলো। বৈকুণ্ঠকে টাকাটা যেন কুমুর নামে পাঠানো হয়।”

১৯

বিবাহের লঙ্কাকাণ্ডের সব শেষ অধ্যায়টা এখনও বাকি।

সকালবেলায় কুশণ্ডিকা সেরে তবে বরকনে যাত্রা করবে এই ছিল কথা। নবগোপাল তারি সমস্ত উদ্যোগ ঠিক ক'রে রেখেচে। এমন সময় বিপ্রদাসের ঘর থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এসে রাজাবাহাদুর ব'লে বস্‌ল,—কুশণ্ডিকা হবে বরের ওখানে, মধুপুরীতে।

প্রস্তাবের ঔদ্ধত্যটা নবগোপালের কাছে অসহ্য লাগ্‌লো। আর কেউ হ'লে আজ একটা ফৌজদারী বাধত। তবু ভাষার প্রাবল্যে নবগোপালের আপত্তি প্রায় লাঠিয়ালির কাছ পর্য্যন্ত এসে তবে থেমেছিল।

অন্তঃপুরে অপমানটা খুব বাজ্‌ল। বহুদূর থেকে আত্মীয়-কুটুম সব এসেচে, তাদের মধ্যে ঘর-শত্রুর অভাব নেই। সবার সামনে এই অত্যাচার। ক্ষেমা পিসি মুখ গোঁ ক'রে ব'সে রইলেন। বরকনে যখন বিদায় নিতে এলো তাঁর মুখ দিয়ে যেন আশীর্ব্বাদ বেরোতে চাইল না। সবাই বল্‌লে এ কাজটা কলকাতায় সেরে নিলে তো কারো কিছু বল্‌বার কথা থাকত না। বাপের বাড়ির অপমানে কুমু একান্তই সঙ্কুচিত হ'য়ে গেল,—মনে হ'তে লাগ্‌ল সেই যেন অপরাধিনী, তার সমস্ত পূর্ব্বপুরুষদের কাছে। মনে মনে তার ঠাকুরের প্রতি অভিমান ক'রে বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগ্‌ল, “আমি তোমার কাছে কি দোষ করেচি যে জন্যে আমার এত শাস্তি! আমি তো তোমাকেই বিশ্বাস ক'রে সমস্ত স্বীকার ক'রে নিয়েচি।”

বরকনে গাড়িতে উঠ্‌ল। কলকাতা থেকে মধুসূদন যে ব্যাণ্ড এনেছিল তাই উচ্চৈঃস্বরে নাচের সুর লাগিয়ে দিলে। মস্ত একটা সামিয়ানার নীচে হোমের আয়োজন। ইংরেজ মেয়েপুরুষ অভ্যাগত কেউ বা গদিওয়ালা চৌকিতে ব'সে কেউ বা কাছে এসে ঝুঁকে প'ড়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। এরি মধ্যে তাদের জন্যে চা-বিস্কুটও এলো। একটা টিপায়ের উপর মস্ত বড়ো একটা Wedding cake ও সাজানো আছে। অনুষ্ঠান সারা হ'য়ে গেলে এরা এসে যখন congratulate করতে লাগ্‌ল, কুমু মুখ লাল ক'রে মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো। একজন মোটা গোছের প্রৌঢ়া ইংরেজ মেয়ে ওর বেনারসী সাড়ির আঁচল তুলে ধ'রে পর্য্যবেক্ষণ ক'রে দেখ্‌লে; ওর হাতে খুব মোটা সোনার বাজুবন্ধ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখ্‌তেও তার বিশেষ কৌতূহল বোধ হ'ল। ইংরেজি ভাষায় প্রশংসাও করলে। অনুষ্ঠান সম্বন্ধে মধুসূদনকে একদল বল্‌লে, How interesting, আর একদল বল্‌লে, “Isn't it ?”

এই মধুসূদনকে কুমু তার দাদা আর অন্যান্য আত্মীয়দের সঙ্গে ব্যবহার করতে দেখেচে,—আজ তাকেই দেখ্‌লে ইংরেজ বন্ধুমহলে। ভদ্রতায় অতি গদগদভাবে অবনম্র, আর হাসির আপ্যায়নে মুখ নিয়তই বিকসিত। চাঁদের যেমন একপিঠে আলো আর একপিঠে চির-অন্ধকার, মধুসূদনের চরিত্রেও তাই। ইংরেজের অভিমুখে তার মাধুর্য্য পূর্ণচাঁদের আলোর মতোই যেমন উজ্জ্বল তেমনি স্নিগ্ধ। অন্য দিকটা দুর্গম, দুর্দ্দৃশ্য এবং জমাট বরফের নিশ্চলতায় দুর্ভেদ্য।

সেলুন গাড়িতে ইংরেজ বন্ধুদের নিয়ে মধুসূদন; অন্য রিজার্ভ-করা গাড়িতে মেয়েদের দলে কুমু। তারা কেউ বা ওর হাত তুলে টিপে দেখে, কেউ বা চিবুক তুলে মুখশ্রী বিশ্লেষণ করে; কেউ বা বলে ঢ্যাঙা, কেউ বা বলে রোগা। কেউ বা অতি ভালোমানুষের মতো জিজ্ঞাসা করে, “হাঁগা, গায়ে কী রঙ্ মাখো, তোমার ভাই বিলেত থেকে বুঝি কিছু পাঠিয়েচে ?” সকলেই মীমাংসা করলে, চোখ বড়ো নয়, পায়ের মাপটা মেয়েমানুষের পক্ষে অধিক বড়ো। গায়ের প্রত্যেক গয়নাটি নেড়ে চেড়ে বিচার করতে বসল,—সেকেলে গয়না, ওজনে ভারী, সোনা খাঁটি—কিন্তু কী ফ্যাশান ম'রে যাই!

ওদের গাড়িতে ষ্টেশন-প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের উল্টো দিকের জানলা খোলা ছিল সেই দিকে কুমু চেয়ে রইল, চেষ্টা করতে লাগ্‌ল এদের কথা যাতে কানে না যায়। দেখ্‌তে

গেলে একটা এক-পা-কাটা কুকুর তিন পায়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে মাটি শুঁকে বেড়াচ্ছে। আহা, কিছু খাবার যদি হাতের কাছে থাক্‌তো! কিছুই ছিলো না। কুমু মনে মনে ভাবতে লাগ্‌লো, যে-একটি পা গিয়েছে তারি অভাবে ওর যা-কিছু সহজ ছিল তার সমস্তই হ'য়ে গেলো কঠিন। এমন সময় কুমুর কানে গেলো সেলুন গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে একজন ভদ্রলোক বল্‌চে, "দেখুন এই চাষীর মেয়েকে আড়কাটি আসাম চা-বাগানে ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, পালিয়ে এসেচে; গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত টিকিটের টাকা আছে, ওর বাড়ি ঝুমরাঁও, যদি সাহায্য করেন তো এই মেয়েটি বেঁচে যায়।" সেলুন গাড়ি থেকে একটা মস্ত তাড়ার আওয়াজ কুমু শুন্‌তে পেলে। সে আর থাক্‌তে পারলে না, তখনি ডানদিকের জানলা খুলে তার পুঁথিগাঁথা থলে উজাড় ক'রে দশটাকা মেয়েটির হাতে দিয়েই জানলা বন্ধ ক'রে দিলে। দেখে একজন মেয়ে ব'লে উঠ্‌লো, "আমাদের বৌয়ের দরাজ হাত দেখি।" আর একজন বল্‌লে, "দরাজ নয় তো দরজা, লক্ষ্মীকে বিদায় করবার।" আর একজন বল্‌লে, "টাকা ওড়াতে শিখেচে, রাখ্‌তে শিখলে কাজে লাগ্‌তো।" এটাকে ওরা দেমাক ব'লে ঠিক করলে,—বাবুরা যাকে এক পয়সা দিলে না, ইনি তাকে অম্‌নি ঝনাৎ ক'রে টাকা ফেলে দেন, এত কিসের গুমোর! ওদের মনে হোলো এও বুঝি সেই চাটুজ্জে-ঘোষালদের চিরকেলে রেষারেষির অঙ্গ।

এমন সময়ে ওদের মধ্যে একটি মোটাসোটা কালো-কোলো মেয়ে, মস্ত ডাগর চোখ, স্নেহরসে ভরা মুখের ভাব, কুমুর সমবয়সী হবে, ওর কাছে এসে বস্‌লো। চুপি চুপি বল্‌লে, "মন কেমন করচে ভাই? এদের কথায় কান দিও না, দু'দিন এই রকম টেপাটেপি বলাবলি করবে, তার পরে কণ্ঠ থেকে বিষ নেমে গেলেই থেমে যাবে।" এই মেয়েটি কুমুর মেজো জা, নবীনের স্ত্রী। ওর নাম নিস্তারিণী, ওকে সবাই মোতির মা ব'লে ডাকে।

মোতির মা কথা তুললে, "যে-দিন নূরনগরে এলুম, ইষ্টিশনে তোমার দাদাকে দেখ্‌লুম যে।"

কুমু চম্‌কে উঠ্‌লো। ওর দাদা যে ষ্টেশনে অভ্যর্থনা করতে গিয়েছিল সে খবর এই প্রথম শুন্‌লে।

"আহা কি সুপুরুষ! এমন কখনো চক্ষে দেখি নি। ঐ যে গান শুনেছিলেম কীর্ত্তনে—

গোরার রূপে লাগ্‌লো রসের বান,—
ভাসিয়ে নিয়ে যায় নদীয়ার পুরনারীর প্রাণ,

আমার তাই মনে পড়লো।"

মুহূর্ত্তে কুমুর মন গ'লে গেলো। মুখ আড় ক'রে জানলার দিকে রইলো চেয়ে,—বাইরের মাঠ, বন, আকাশ অশ্রু-বাষ্পে ঝাপ্‌সা হ'য়ে গেলো।

মোতির মার বুঝ্‌তে বাকি ছিল না কোন্ জায়গায় কুমুর দরদ, তাই নানারকম ক'রে ওর দাদার কথাই আলোচনা করলে। জিজ্ঞাসা করলে, বিয়ে হয়েচে কি না।

কুমু বল্‌লে, "না।"

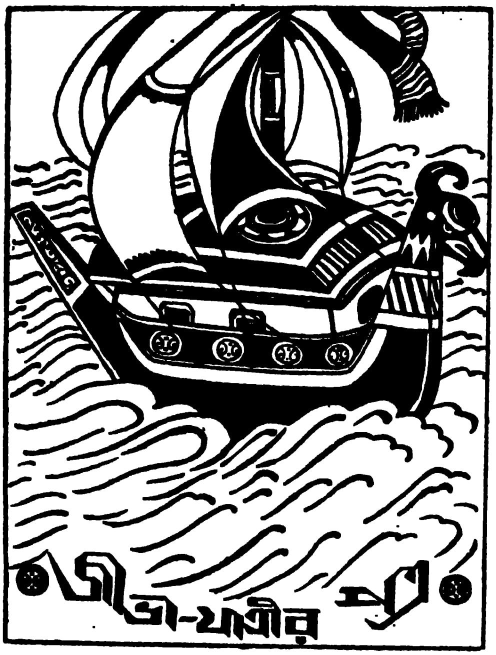
মোতির মা ব'লে উঠ্‌ল, "ম'রে যাই! অমন দেবতার মতো রূপ, এখনো ঘর খালি! কোন্ ভাগ্যবতীর কপালে আছে ঐ বর।"

কুমু তখন ভাব্‌ছে—দাদা গিয়েছিলেন সমস্ত অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে, কেবল আমারি জন্যে! তার পরে এঁরা একবার দেখতেও এলেন না! কেবলমাত্র টাকার জোরে এমন মানুষকেও অবজ্ঞা করতে সাহস করলেন! তাঁর শরীর এই জন্যেই বুঝি বা ভেঙে পড়লো!

বৃথা আক্ষেপের সঙ্গে বার বার মনে মনে বল্‌তে লাগ্‌লো,—দাদা কেন গেল ইষ্টেশনে! কেন নিজেকে খাটো করলে! আমার জন্যে? আমার মরণ হোলো না কেন?

যে কাজটা হ'য়ে গেছে, আর ফেরানো যাবে না, তারি উপর ওর মনটা মাথা ঠুক্‌তে লাগ্‌লো। কেবলি মনে পড়তে লাগ্‌লো, সেই রোগক্লান্ত শান্ত মুখ, সেই আশীর্ব্বাদে ভরা স্নিগ্ধ-গম্ভীর দুটি চোখ।

(ক্রমশঃ)



শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীমতী প্রতিমা দেবীকে লিখিত

৩

কল্যাণীয়াসু,—

বৌমা, মালয় উপদ্বীপের বিবরণ আমাদের দলের লোকের চিঠিপত্র থেকে নিশ্চয় পেয়েছ। ভালো ক'রে দেখবার মতো ভাববার মতো লেখবার মতো সময় পাইনি। কেবল ঘুরেচি আর বকেচি। পিনাঙ থেকে জাহাজে চ'ড়ে প্রথমে জাভার রাজধানী বাটাভিয়ায় এসে পৌঁছন গেল। আজকাল পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বড় সহর মাত্রই দেশের সহর নয়, কালের সহর। সবাই আধুনিক। সবাই মুখের চেহারায় একই, কেবল বেশভূষায় কিছু তফাৎ। অর্থাৎ কারো বা পাগড়িটা ঝক্‌ঝকে কিন্তু জামার বোতাম নেই, ধুতিখানা হাঁটু পর্য্যন্ত, ছেঁড়া চাদরখানায় ধোপ পড়ে না, যেমন কলকাতা;—কারো বা আগাগোড়াই ফিট্‌ফাট্‌ ধোওয়া-মাজা উজ্জ্বল বসনভূষণ, যেমন বাটাভিয়া। সহরগুলোর মুখের চেহারা একই বলেছি, কথাটা ঠিক নয়। মুখ দেখা যায় না, মুখোষ দেখি। সেই মুখোষগুলো এক কারখানায় একই ছাঁচে ঢালাই-করা। কেউ বা সেই মুখোষ পরিষ্কার পালিশ ক'রে রাখে, কারো বা হেলায় ফেলায় মলিন। কলকাতা আর বাটাভিয়া উভয়েই এক আধুনিক কালের কন্যা, কেবল জামাতারা স্বতন্ত্র, তাই আদরযত্নে অনেক তফাৎ। শ্রীমতী বাটাভিয়ার সিঁথি থেকে চরণ-চক্র পর্য্যন্ত গয়নার অভাব নেই। তার উপরে সাবান দিয়ে গা মাজা-ঘষা ও অঙ্গলেপ দিয়ে ঔজ্জ্বল্য সাধন চল্‌চেই। কলকাতার হাতে নোয়া আছে কিন্তু বাজুবন্দ দেখিনে। তার পরে যে-জলে তার স্নান সে জলও যেমন, আর যে-গামছায় গা মোছা, তারও সেই দশা। আমরা চিৎপুর বিভাগের পুরবাসী, বাটাভিয়ায় এসে মনে হয় কৃষ্ণপক্ষ থেকে শুক্লপক্ষে এলুম।

হোটেলের খাঁচায় ছিলেম দিন তিনেক; অভ্যর্থনার ত্রুটি হয় নি। সমস্ত বিবরণ বোধ হয় সুনীতি কোনো-এক সময়ে লিখ্‌বেন। কেননা সুনীতির যেমন দর্শনশক্তি তেমনি ধারণাশক্তি। যত বড়ো তাঁর আগ্রহ তত বড়োই তাঁর সংগ্রহ। যা-কিছু তাঁর চোখে পড়ে সমস্তই তাঁর মনে জমা হয়। কণামাত্র নষ্ট হয় না। নষ্ট যে হয় না সে দুদিক থেকেই, রক্ষণে এবং দানে। তন্নষ্টং যন্নদীয়তে। বুঝ্‌তে পারচি তাঁর হাতে আমাদের ভ্রমণের ইতিবৃত্ত লেশমাত্র ব্যর্থ হবে না, লুপ্ত হবে না।

বাটাভিয়া থেকে জাহাজে ক'রে বালী দ্বীপের দিকে রওনা হলুম। ঘণ্টা কয়েকের জন্যে সুরবায়া সহরে আমাদের নামিয়ে নিলে। এও একটা আধুনিক সহর; জাভার আঙ্গিক নয়, জাভার আনুষঙ্গিক। আলাদিনের প্রদীপের মন্ত্রে সহরটাকে নিউজীলণ্ডে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলেও খাপছাড়া হয় না।

পার হ'য়ে এলেম বালী দ্বীপে। দেখলেম ধরণীর চির-যৌবনা মূর্ত্তি। এখানে প্রাচীন শতাব্দী নবীন হয়ে আছে।

এখানে মাটির উপর অন্নপূর্ণার পাদপীঠ শ্যামল আস্তরণে দিগন্ত থেকে দিগন্তে বিস্তীর্ণ; বনচ্ছায়ার অঙ্কলালিত লোকালয় গুলিতে সচ্ছল অবকাশ। সেই অবকাশ উৎসবে অনুষ্ঠানে নিত্যই পরিপূর্ণ।

এই দ্বীপটুকুতে রেলগাড়ি নেই। রেলগাড়ি আধুনিক কালের বাহন। আধুনিক কালটি অত্যন্ত কৃপণ কাল, কোনো দিকে একটুমাত্র বাহুল্যের বরাদ্দ রাখ্‌তে চায় না। এই কালের মানুষ বলে Time is money। তাই কালের বাজে খরচ বন্ধ করবার জন্যে রেলের এঞ্জিন হাঁফাতে হাঁফাতে, ধোঁয়া ওগ্‌রাতে ওগ্‌রাতে মেদিনী কম্পমান ক'রে দেশদেশান্তরে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্চে। কিন্তু এই বালী দ্বীপে বর্ত্তমান কাল শত শত অতীত শতাব্দী জুড়ে এক হ'য়ে আছে। এখানে কাল সংক্ষেপ করবার কোনো দরকার নেই। এখানে যা-কিছু আছে তা চিরদিনের; যেমন একালের তেমনি সেকালের। ঋতুগুলি যেমন চলেচে নানা রঙের ফুল ফোটাতে ফোটাতে, নানা রসের ফল ফলাতে ফলাতে, এখানকার মানুষ বংশপরম্পরায় তেমনি চলেচে নানা রূপে বর্ণে গীতে নৃত্যে অনুষ্ঠানের ধারা বহন ক'রে।

রেলগাড়ি এখানে নেই কিন্তু আধুনিক কালের ভবঘুরে যারা এখানে আসে তাদের জন্যে আছে মোটর গাড়ি। অতি অল্পকালের মধ্যেই তাদের দেখাশুনো ভোগ করা শেষ করা চাই। তারা আঁটকালের মানুষ এসে প'ড়েচে অপর্য্যাপ্ত কালের দেশে। এখানকার অরণ্য পর্ব্বত লোকালয়ের মাঝখান দিয়ে ধুলো উড়িয়ে চলেচি আর কেবলি মনে হচ্চে এখানে পায়ে হেঁটে চলা উচিত। যেখানে পথের দুইধারে ইমারত সেখানে মোটরের সঙ্গে সঙ্গে দুই চক্ষুকে দৌড় করালে খুব বেশি লোকসান হয় না; কিন্তু পথের দুধারে যেখানে রূপের মেলা সেখানকার নিমন্ত্রণ সারতে গেলে গরজের মোটরটাকে গারাজেই রেখে আস্‌তে হয়। মনে নেই কি, শিকার করতে দুষ্মন্ত যখন রথ ছুটিয়েছিলেন তখন তার বেগ কত; এই হচ্চে যাকে বলে প্রোগ্রেস্, লক্ষ্যভেদ করবার জন্যে তাড়াহুড়ো। কিন্তু তপোবনের সাম্‌নে এসে তাঁকে রথ ফেলে নামতে হোলো, লক্ষ্যসাধনের লোভে নয়, তৃপ্তিসাধনের আশায়। সিদ্ধির পথে চলা দৌড়ে, সুন্দরের পথে চলা ধীরে। আধুনিক কালে সিদ্ধির লোভ প্রকাণ্ড প্রবল, তাই আধুনিক কালের বাহনের বেগ কেবলি বেড়ে যাচ্চে। যা-কিছু গভীরভাবে নেবার যোগ্য, দৃষ্টি তাকে গ্রহণ না ক'রে স্পর্শ ক'রেই চ'লে যায়। এখন হ্যামলেটের অভিনয় অসম্ভব হ'ল, হ্যামলেটের সিনেমায় হ'ল জিৎ।

আমাদের মোটর যেখানে এসে থামল সেখানে এক বিপুল উৎসব। জায়গাটার নাম বাঙ্‌লি। কোনো-এক রাজবংশের কার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। এর মধ্যে শোকের চিহ্ন নেই। না থাকবারই কথা,—রাজার মৃত্যু হয়েচে অনেকদিন আগে, এতদিনে তাঁর আত্মা দেবসভায় উত্তীর্ণ, উৎসব তাই নিয়ে। বহুদূর থেকে গ্রামের পথে পথে মেয়ে পুরুষেরা ভারে ভারে বিচিত্র রকমের নৈবেদ্য নিয়ে আসচে;—যেন কোন্-পুরাণে বর্ণিত যুগ হঠাৎ আমাদের চোখের সামনে বেঁচে উঠ্‌ল; যেন অজন্তার শিল্পকলা চিত্রলোক থেকে প্রাণলোকে সূর্য্যের আলো ভোগ করতে এসেচে। মেয়েদের বেশভূষা অজন্তার ছবিরই মতো। এখানে আবরণ-বিরলতার স্বাভাবিক আবরু সুন্দর হ'য়ে দেখা দিল, সেটা চারিদিকের সঙ্গে সুসঙ্গত; এমন কি, যে-কয়েকজন আমেরিকান মিশনরি দর্শকরূপে এখানে এসেচে, আশা করি তারাও এই দৃশ্যের সুশোভন সুরুচি সহজ মনে অনুভব করতে পেরেচে।

যজ্ঞক্ষেত্র লোকে লোকারণ্য। এই উপলক্ষ্যে সেখানে অনেকগুলি বাঁশের উঁচু মাচা-বাঁধা ঘরে এখানকার ব্রাহ্মণেরা সুসজ্জিত হ'য়ে শিখা বেঁধে ভূরি ভূরি খাদ্যবস্ত্র ফলপুষ্পপত্রের নৈবেদ্যের মধ্যে নানা রকম মুদ্রা সহযোগে মন্ত্র পড়চে; তারা কেউ বা কত রকম অর্ঘ্য উপকরণ তৈরি করচে। কোথাও বা এখানকার বহুযন্ত্রমিলিত সঙ্গীত; এক জায়গায় তাঁবুর মধ্যে পৌরাণিক যাত্রার অভিনয়। উৎসবের এত অতি-বৃহৎ আনুষ্ঠানিক বৈচিত্র্য আর কোথাও দেখিনি। অথচ কোথাও অসুন্দর বা বিশৃঙ্খল কিছু নেই,—বিপুল সমারোহের দৃশ্যরূপটি বস্তুরাশির অসংলগ্নতায় বা জনতার ঠেলাঠেলিতে খণ্ড-বিখণ্ড হ'য়ে যায় নি। এতগুলি মানুষের সমাবেশ, অথচ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গোলমাল বা নোংরামি বা অব্যবস্থা নেই। উৎসবের অন্তর্নিহিত সুন্দর ঐক্যবন্ধনেই সমস্ত ভিড়ের লোককে আপনিই সংযত ক'রে বেঁধেচে। সমস্ত ব্যাপারটি এত বৃহৎ এত বিচিত্র আর আমাদের পক্ষে এত অপূর্ব্ব যে এর বিস্তারিত বর্ণনা করা অসম্ভব। হিন্দু অনুষ্ঠানবিধির সঙ্গে এদেশের লোকের চিত্তবৃত্তির মিল হ'য়ে এই যে সৃষ্টি, এর রূপের প্রাচুর্য্যটিই বিশেষ ক'রে দেখবার ও ভাববার জিনিষ। অপরিমিত উপকরণের দ্বারা নিজেকে অশেষভাবে প্রকাশ করবার চেষ্টা, সেই প্রকাশ কেবলমাত্র বস্তুকে পুঞ্জিত ক'রে নয়, তাকে নানা নিপুণ রীতিতে সজ্জিত ক'রে।

জাপানের সঙ্গে এখানকার প্রাকৃতিক অবস্থার মিল আছে। জাপানের মতোই এখানে দ্বীপটি আয়তনে ছোটো, অথচ এখানে প্রকৃতির রূপটি বিচিত্র, এবং তার সৃষ্টিশক্তি প্রচুর ভাবে উর্ব্বরা। পদে পদেই পাহাড় ঝরণা নদী প্রান্তর অরণ্য অগ্নিগিরি সরোবর। অথচ দেশটি চলা ফেরার পক্ষে সুগম, নদী-পর্ব্বতের পরিমাণ ছোটো, প্রজাসংখ্যা বেশি, ভূমির পরিমাণ কম. এই জন্যে কৃষির উৎকর্ষ দ্বারা চাষের যোগ্য সমস্ত জমি সম্পূর্ণরূপে এরা চ'ষে ফেলেচে, ক্ষেতে ক্ষেতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জল সেঁচ দেবার ব্যাপক ব্যবস্থা এদেশে দীর্ঘকাল থেকে প্রচলিত। এখানে দারিদ্র্য নেই, রোগ নেই, জলবায়ু সুখকর। দেবদেবীবহুল, কাহিনীবহুল, অনুষ্ঠানবহুল পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম এখানকার প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গত,—সেই প্রকৃতি এখানকার শিল্পকলায়, সামাজিক অনুষ্ঠানে বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য্যের প্রবর্ত্তনা করেছে।

জাপানের সঙ্গে এর মস্ত একটা তফাৎ। জাপান শীতের দেশ, জাভা বালী গরমের দেশ। জাপান অন্য শীতের দেশের লোকের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আপনাকে রক্ষা করতে পারলে, জাভা বালী তা পারে নি। আত্মরক্ষার জন্যে যে দৃঢ়নিষ্ঠ অধ্যবসায় দরকার এদের তা ছিল না। গরম হাওয়া প্রাণের প্রকাশকে যেমন তাড়াতাড়ি পরিণত করে, তেমনি তাড়াতাড়ি ক্ষয় করতে থাকে। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে শক্তিকে সে শিথিল করে, জীবনের অধ্যবসায়কে ক্লান্ত ক'রে দেয়। বাটাভিয়া সহরটি যে এমন নিখুঁৎ ভাবে পরিপাটি পরিচ্ছন্ন তার কারণ, শীতের দেশের মানুষ এর ভার নিয়েচে; তাদের শীতের দেশের দেহে শক্তি অনেক-কাল থেকে বংশানুক্রমে অস্থিতে মজ্জাতে পেশীতে স্নায়ুতে পুঞ্জীভূত, তাই তাদের অক্লান্ত মন সর্ব্বত্র ও প্রতিমুহূর্ত্তে আপনাকে প্রয়োগ করতে পারে। আমরা কেবলি বলি, যথেষ্ট হয়েচে, তুমিও যেমন, চ'লে যাবে। যত্ন জিনিষটা কেবল হৃদয়ের জিনিষ নয়, শক্তির জিনিষ। অনুরাগের আগুনকে জ্বালিয়ে রাখতে শক্তির প্রাচুর্য্য চাই। শক্তি-সঞ্চয় যেখানে অল্প সেখানে আপনিই বৈরাগ্য এসে পড়ে। বৈরাগ্য নিজের উপর থেকে সমস্ত দাবী কমিয়ে দেয়। বাইরের অসুবিধা, অস্বাস্থ্য, অব্যবস্থা সমস্তই মেনে নেয়। নিজেকে ভোলাবার জন্যে বলতে চেষ্টা করে যে, ও-গুলো সহ্য করার মধ্যে যেন মহত্ত্ব আছে। যার শক্তি অজস্র সে সমস্ত দাবী মেনে নিতে আনন্দ পায়, এই জন্যেই সে জোরের সঙ্গে বেঁচে থাকে, ধ্বংসের কাছে সহজে ধরা দিতে চায় না। য়ুরোপে গেলে সব চেয়ে আমার চোখে পড়ে মানুষের এই সদা-জাগ্রত যত্ন। যাকে বলি বিজ্ঞান, সায়ান্স, তার প্রধান লক্ষণ হচ্চে জ্ঞানের জন্যে অপরাজিত যত্ন। কোথাও আন্দাজ খাটবে না, খেয়ালকে মানবে না, বলবে না ধ'রে নেওয়া যাক্, বলবে না সর্ব্বজ্ঞ ঋষি এই কথা ব'লে গেছেন। জ্ঞানের ক্ষেত্রে, নীতির ক্ষেত্রে যখন আত্মশক্তির ক্লান্তি আসে তখন বৈরাগ্য দেখা দেয়; সেই বৈরাগ্যের অযত্নের ক্ষেত্রেই ঋষিবাক্য, বেদবাক্য, গুরুবাক্য, মহাত্মাদের অনুশাসন আগাছার জঙ্গলের মত জেগে ওঠে, নিত্যপ্রয়াসসাধ্য জ্ঞানসাধনার পথ রুদ্ধ ক'রে ফেলে। বৈরাগ্যের অযত্নে দিনে দিনে চারদিকে যে প্রভূত আবর্জ্জনার অবরোধ জ'মে ওঠে তাতেই মানুষের পরাভব ঘটায়। বৈরাগ্যের দেশে শিল্পকলাতেও মানুষ অন্ধ পুনরাবৃত্তির প্রদক্ষিণ পথে চলে, এগোয় না, কেবলি ঘোরে। মাদ্রাজের শ্রেষ্ঠী ৩৫ লক্ষ টাকা খরচ করে, হাজার বছর আগে যে-মন্দির তৈরি হয়েছে ঠিক তারি নকল করবার জন্যে। তার বেশি তার সাহস নেই, ক্লান্ত মনের শক্তি নেই, পাখীর অসাড় ডানা খাঁচার বাইরে নিজেকে মেলে দিতে আনন্দ পায় না।

খাঁচার কাছে হার মেনে যে-পাখী চিরকালের মত ধরা দিয়েচে সমস্ত বিশ্বের কাছে তাকে হার মান্‌তে হোলো।

এদেশে এসে প্রথমে আনন্দ হয় এখানকার সব অনুষ্ঠানের বৈচিত্র্যে ও সৌন্দর্য্যে। তারপরে ক্রমে মনে সন্দেহ হ'তে থাকে এ হয় ত খাঁচার সৌন্দর্য্য, নীড়ের সৌন্দর্য্য নয়,—এর মধ্যে হয় তো চিত্তের স্বাধীনতা নেই। অভ্যাসের যন্ত্রে নিখুঁৎ নকল শত শত বৎসর ধ'রে ধারাবাহিক ভাবে চলেচে। আমরা যারা এখানে বাহির থেকে এসেচি আমাদের একটা দুর্লভ সুবিধা ঘটেচে এই যে, আমরা অতীত কালকে বর্ত্তমানভাবে দেখতে পাচ্চি। সেই অতীত মহৎ, সেই অতীতের ছিল প্রতিভা, যাকে বলে নব-নবোন্মেষ-শালিনী বুদ্ধি; তার প্রাণশক্তির বিপুল উদ্যম আপন শিল্পসৃষ্টির মধ্যে প্রচুর ভাবে আপন পরিচয় দিয়েচে। কিন্তু তবুও সে অতীত, তার উচিত ছিল বর্ত্তমানের পিছনে পড়া, সামনে এসে দাঁড়িয়ে বর্ত্তমানকে সে ঠেকিয়ে রাখল কেন? বর্ত্তমান সেই অতীতের বাহন মাত্র হ'য়ে বল্‌চে, আমি হার মান্‌লুম; সে দীনভাবে বল্‌চে এই অতীতকে প্রকাশ ক'রে রাখাই আমার কাজ, নিজেকে লুপ্ত ক'রে দিয়ে। নিজের পরে বিশ্বাস করবার সাহস নেই। এই হচ্চে নিজের শক্তি সম্বন্ধে বৈরাগ্য, নিজের পরে দাবী যতদূর সম্ভব কমিয়ে দেওয়া। দাবী স্বীকার করায় দুঃখ আছে, বিপদ আছে, অতএব বৈরাগ্য-মেবাভয়ং অর্থাৎ বৈনাশ্যমেবাভয়ং।

সেদিন বাঙ্‌লিতে আমরা যে অনুষ্ঠান দেখেচি সেটা প্রেতাত্মার স্বর্গারোহণ পর্ব্ব। মৃত্যু হয়েছে বহু পূর্ব্বে; এতদিনে আত্মা দেব সভায় স্থান পেয়েছে ব'লে এই বিশেষ উৎসব। সুখবতী নামক জেলায় উবুদ্‌ নামক সহরে হবে দাহক্রিয়া, আগামী পাঁচই সেপ্টেম্বরে। ব্যাপারটার মধ্যে আরো অনেক বেশি সমারোহ থাকবে—কিন্তু তবু সেই মাদ্রাজি চেটির ৩৫ লক্ষ টাকার মন্দির। এ বহু বহু শতাব্দীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, সেই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াই চলেচে, এর আর অন্ত নেই। এখানে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় এত অসম্ভব রকম ব্যয় হয় যে সুদীর্ঘকাল লাগে তার আয়োজনে—যম আপন কাজ সংক্ষেপে ও সস্তায় সারেন কিন্তু নিয়ম চলে অতি লম্বা ও দুর্ম্মূল্য চালে। এখানে অতীত কালের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া চলেচে বহুকাল ধ'রে, বর্ত্তমানকালকে আপন সর্ব্বস্ব দিতে হ'চ্চে তার ব্যয় বহন করবার জন্যে।

এখানে এসে বারবার আমার এই কথা মনে হয়েচে যে অতীতকাল যত বড় কালই হোক্ নিজের সম্বন্ধে তার একটা স্পর্দ্ধা থাকা উচিত, মনে থাকা উচিত তার মধ্যে জয় করবার শক্তি আছে। এই ভাবটাকে আমি একটি ছোটো কবিতায় লিখেচি, সেটা এইখানে তুলে দিয়ে এই দীর্ঘ পত্র শেষ করি।

নন্দ গোপাল বুক ফুলিয়ে এসে
বল্‌লে আমায় হেসে
"আমার সঙ্গে লড়াই ক'রে কখ্‌খনো কি পারো?
বারে বারেই হারো।"
আমি বল্‌লেম, "তাই বই কি! মিথ্যে তোমার বড়াই,
হোক্ দেখি তো লড়াই!"
"আচ্ছা, তবে দেখাই তোমায়," এই ব'লে সে যেম্‌নি টান্‌লে হাত
দাদামশায় তখ্‌খনি চিৎপাত।
সবাইকে সে আন্‌লে ডেকে, চেঁচিয়ে নন্দ করলে বাড়ি মাৎ॥

বারে বারে শুধায় আমায়, "বলো তোমার হার হয়েছে না কি।"
আমি কইলেম, "বল্‌তে হবে তা কি?
ধূলোর যখন নিলেম শরণ প্রমাণ তখন রইল কি আর বাকি?
এই কথা কি জানো
আমার কাছে নন্দগোপাল যখনি হার মানো
আমারি সেই হার,
লজ্জা সে আমার।
ধূলোয় যেদিন পড়ব, যেন এই জানি নিশ্চিত
তোমারি শেষ জিৎ॥"

ইতি ৩০ অগষ্ট, ১৯২৭।

কারেম আসন। বালি

জাভাযাত্রীর পত্র

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীমতী মীরা দেবীকে লিখিত

৪

কল্যাণীয়াসু

মীরা, যেখানে ব'সে লিখচি এ একটা ডাকবাঙলা; পাহাড়ের উপরে সকাল বেলা, শীতের বাতাস দিচ্ছে। আকাশে মেঘগুলো দল বেঁধে আনাগোনা করচে, সূর্য্যকে একবার দিচ্চে ঢাকা, একবার দিচ্চে খুলে। পাহাড় বললে যে-ছবি মনে জাগে এ একেবারেই সে রকম নয়। শৈলশিখরশ্রেণী কোথাও দেখা যাচ্চে না,—বারান্দা থেকে অনতিদূরেই সাম্‌নে ঢালু উপত্যকা নেমে গিয়েচে, তলায় একটি ক্ষীণ জলের ধারা এঁকে বেঁকে চল্‌চে,—সাম্‌নে অন্য পারের পাড়ি অর্দ্ধচন্দ্রের মতো, তার উপরে নারকেল বন আকাশের গায়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে।

উপর থেকে নীচে পর্য্যন্ত থাকে থাকে শস্যের ক্ষেত। পাহাড়ের বুক বেয়ে একটা ভাঙা-চোরা পথ জল পর্য্যন্ত নেমে গেছে। জলধারার কাছেই একটা উৎস। এই উৎসকে এ দেশের লোকে পবিত্র ব'লে জানে;—সমস্ত দিন দেখি, মেয়েরা স্নান করে, জল তুলে নিয়ে যায়। এরা বলে এই জলে স্নান করলে সর্ব্ব পাপ মোচন হয়। বিশেষ বিশেষ পার্ব্বণ আছে যখন বিস্তর লোক এখানে পুণ্যস্নান করতে আসে। এই জায়গাটার নাম তীর্ত আম্পূল। তীর্ত অর্থাৎ তীর্থ, আম্পুল মানে উৎস,—উৎস তীর্থ।

এই উৎস সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। বহুকাল পূর্ব্বে এক রাজার এক সুন্দরী মেয়ে ছিল। সেই মেয়েটি রাজার এক পারিষদকে ভালোবেসেছিল। পারিষদের মনেও যে ভালোবাসা ছিল না তা নয়, কিন্তু রাজকন্যাকে বিয়ে করবার যোগ্য তার জাতি-মর্য্যাদা নয় জেনে রাজার সম্মানের প্রতি লক্ষ্য ক'রে রাজকন্যার ভালোবাসা কর্ত্তব্যবোধে প্রত্যাখ্যান করে। রাজকন্যা রাগ ক'রে তার পানীয় দ্রব্যে বিষ মিশিয়ে দেয়। যুবক একটুখানি পান ক'রেই ব্যাপারখানা বুঝতে পারে, কিন্তু পাছে রাজকন্যার নামে অপবাদ আসে তাই পালিয়ে এই জায়গাকার বনে এসে গোপনে মরবার জন্যে প্রস্তুত হয়। দেবতারা দয়া ক'রে এই পুণ্য উৎসের জল খাইয়ে তাকে বাঁচিয়ে দেন।

হিন্দু ভাবের ও রীতির সঙ্গে এদের জীবন কি রকম জড়িয়ে গেছে ক্ষণে ক্ষণে তার পরিচয় পেয়ে বিস্ময় বোধ হয়। অথচ হিন্দুধর্ম্ম এখানে কোথাও অমিশ্র ভাবে নেই; এখানকার লোকের প্রকৃতির সঙ্গে মিলে গিয়ে সে একটা বিশেষ রূপ ধরেছে; তার ভঙ্গীটা হিন্দু, অঙ্গটা এদের। প্রথম দিন এসেই এক জায়গায় কোন্ এক রাজার অন্ত্যেষ্টি সৎকার দেখ্‌তে গিয়েছিলুম। সাজসজ্জা আয়োজনের উপকরণ আমাদের সঙ্গে মেলে না,—উৎসবের ভাবটা ঠিক আমাদের শ্রাদ্ধের ভাব নয়; সমারোহের বাহ্য দৃশ্যটা ভারতবর্ষের কোনো-কিছুর অনুরূপ নয়; তবুও এর রকমটা আমাদের মতোই,—মাচার উপরে এখানকার চূড়া-বাঁধা ব্রাহ্মণেরা ঘণ্টা নেড়ে ধূপ ধুনো জ্বালিয়ে হাতের আঙুলে মুদ্রার ভঙ্গী ক'রে বিড় বিড় শব্দে মন্ত্র প'ড়ে যাচ্চে। আবৃত্তিতে ও অনুষ্ঠানে কিছুমাত্র স্খলন হ'লেই সমস্ত অশুদ্ধ ও ব্যর্থ হ'য়ে যায়। ব্রাহ্মণের গলায় পৈতে নেই। জিজ্ঞাসা ক'রে জানা গেল এরা "গায়ত্রী" শব্দটা জানে কিন্তু মন্ত্রটা ঠিক জানে না। কেউ বা কিছু কিছু টুক্‌রো জানে। মনে হয় এক সময়ে এরা সর্ব্বাঙ্গীণ হিন্দুধর্ম্ম পেয়েছিল, তার দেব দেবী, রীতি নীতি, উৎসব অনুষ্ঠান, পুরাণ স্মৃতি সমস্তই ছিল। তার পরে মূলের সঙ্গে যোগ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেল, ভারতবর্ষ চ'লে গেল দূরে,—হিন্দুর সমুদ্র যাত্রা হ'ল নিষিদ্ধ, হিন্দু আপন গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে ক'ষে বাঁধলে, ঘরের বাইরে তার যে এক প্রশস্ত আঙিনা ছিল একথা সে ভুললে। কিন্তু সমুদ্র পারের আত্মীয় বাড়িতে তার অনেক বাণী, অনেক মূর্ত্তি, অনেক চিহ্ন, অনেক উপকরণ প'ড়ে আছে ব'লে সেই আত্মীয় তাকে সম্পূর্ণ ভুলতে পারলে না। পথে ঘাটে পদে পদে মিলনের নানা অভিজ্ঞান চোখে পড়ে। কিন্তু সেগুলির সংস্কার হ'তে পায়নি ব'লে কালের হাতে সেই সব অভিজ্ঞান কিছু গেছে ক্ষ'য়ে, কিছু বেঁকেচুরে, কিছু গেছে লুপ্ত হ'য়ে।

সেই সব অভিজ্ঞানের অবিচ্ছিন্ন সঙ্গতি আর পাওয়া যায় না। তার অর্থ কিছু গেছে ঝাপ্‌সা হ'য়ে, কিছু গেছে টুক্‌রো হ'য়ে। তার ফল হয়েচে এই, যেখানে যেখানে ফাঁক পড়েছে সেই ফাঁকটা এখানকার মানুষের মন আপন সৃষ্টি দিয়ে ভরিয়েচে। হিন্দুধর্ম্মের ভাঙাচোরা কাঠামো নিয়ে এখানকার মানুষ আপনার একটা ধর্ম্ম একটা সমাজ গ'ড়ে তুল্‌চে। এখানকার এক সময়ের শিল্পকলায় দেখা যায় পুরোপুরি হিন্দুর প্রভাব,—তার পরে দেখা যায় সে প্রভাব ক্ষীণ ও বিচ্ছিন্ন। তবু যে-ক্ষেত্রকে হিন্দু উর্ব্বর ক'রে দিয়ে গেছে সেই ক্ষেত্রে এখানকার স্বস্থানীয় প্রতিভা প্রচুরভাবে আপনার ফসল ফলিয়েচে। এখানে একটা বহু-ছিদ্র পুরোনো ইতিহাসের ভূমিকা দেখি; সেই আধ-ভোলা ইতিহাসের ছেদগুলো দিয়ে এদেশের স্বকীয় চিত্ত নিজেকে প্রকাশ করেচে।

বালিতে সব-প্রথমে কারেম আসন ব'লে একজায়গার রাজবাড়ীতে আমার থাকবার কথা। সেখানকার রাজা ছিলেন বাঙ্‌লির শ্রাদ্ধ উৎসবে। পারিষদসহ বালির ওলন্দাজ গবর্ণর সেখানে মধ্যাহ্নভোজন করলেন, সেই ভোজে আমরাও ছিলেম। ভোজ শেষ ক'রে যখন উঠ্‌লেম তখন বেলা তিনটে। সকালে সাড়ে ছটার সময় জাহাজ থেকে নেমেছি; ঘাটের থেকে মোটরে আড়াই ঘণ্টা ঝাঁকানি ও ধুলো খেয়ে যজ্ঞস্থলে আগমন। এখানে ঘোরাঘুরি দেখাশুনা সেরে বিনা স্নানেই অত্যন্ত ক্লান্ত ও ধূলিম্লান অবস্থায় নিতান্ত বিতৃষ্ণার সঙ্গে খেতে বসেচি; দীর্ঘকাল-প্রসারিত সেই ভোজে আহার ও আলাপ-আপ্যায়ন সেরে আমাদের নিমন্ত্রণকর্ত্তা রাজার সঙ্গে তাঁর মোটর-গাড়ীতে চ'ড়ে আবার সুদীর্ঘপথ ভেঙে চল্‌লুম তাঁর প্রাসাদে। প্রাসাদকে এরা পুরী বলে। রাজার ভাষা আমি জানিনে, আমার ভাষা রাজা বোঝেন না—বোঝাবার লোকও কেউ সঙ্গে নেই। চুপ ক'রে গাড়ির জান্‌লা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইলুম।

মস্ত সুবিধে এই, এখানকার প্রকৃতি বালিনী ভাষায় কথা কয় না, সেই শ্যামার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখি আর অরসিক মোটর গাড়িটাকে মনে মনে অভিশাপ দিই। মনে পড়ল কখনো কখনো শুষ্কচিত্ত গাইয়ের মুখে গান শুনেছি; রাগিণীর যেটা বিশেষ দরদের জায়গা, যেখানে মন প্রত্যাশা করচে গাইয়ের কণ্ঠ অত্যুচ্চ আকাশের চিলের মত পাখাটা ছড়িয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ স্থির থাকবে কিম্বা দুই একটা মাত্র মীড়ের ঝাপটা দেবে, গানের সেই মর্ম্ম-স্থানের উপর দিয়ে যখন সেই সঙ্গীতের পালোয়ান তার তানগুলোকে লোটন পায়রার মত পাল্‌টিয়ে পাল্‌টিয়ে উড়িয়ে চলেচে,—কিরকম বিরক্ত হয়েচি। পথের দুই-ধারে গিরি অরণ্য সমুদ্র, আর সুন্দর সব ছায়াবেষ্টিত লোকালয়, কিন্তু মোটর গাড়িটা দুন চৌদুন মাত্রায় চালিয়ে ধুলো উড়িয়ে চলেছে, কোনো কিছুর পরে তার কিছুমাত্র দরদ নেই,—মনটা ক্ষণে ক্ষণে ব'লে উঠ্‌চে, "আরে রোসো রোসো, দেখে নিই"। কিন্তু এই কাল-দৈত্য মনটাকে ছিনিয়ে নিয়ে চ'লে যায়,—তার একমাত্র ধুয়ো "সময় নেই, সময় নেই"। এক জায়গায় যেখানে বনের ফাঁকের ভিতর দিয়ে নীল সমুদ্র দেখা গেল রাজা আমাদের ভাষাতেই ব'লে উঠ্‌লেন, "সমুদ্র"; আমাকে বিস্মিত ও আনন্দিত হ'তে দেখে আউড়ে গেলেন, "সমুদ্র, সাগর, অব্ধি, জলাঢ্য"। তার পর বল্‌লেন, "সপ্তসমুদ্র, সপ্তপর্ব্বত, সপ্ত-বন, সপ্ত-আকাশ"। তার পরে পর্ব্বতের দিকে ইঙ্গিত ক'রে বল্লেন, "অদ্রি"; তার পরে ব'লে গেলেন, "সুমেরু, হিমালয়, বিন্ধ্য, মলয়, ঋষ্যমূক।" এক জায়গায় পাহাড়ের তলায় ছোটো নদী ব'য়ে যাচ্ছিল, রাজা আউড়িয়ে গেলেন, "গঙ্গা যমুনা নর্ম্মদা গোদাবরী কাবেরী সরস্বতী।" আমাদের ইতিহাসে একদিন ভারতবর্ষ আপন ভৌগোলিক সত্তাকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিল; তখন সে আপনার নদী-পর্ব্বতের ধ্যানের দ্বারা আপন ভূমূর্ত্তিকে মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ক'রে নিয়েছিল। তার তীর্থগুলি এমন ক'রে বাঁধা হয়েছে,—দক্ষিণে কন্যাকুমারী, উত্তরে মানস সরো-বর, পশ্চিম-সমুদ্রতীরে দ্বারকা, পূর্ব্ব-সমুদ্রে গঙ্গা সঙ্গম,—যাতে ক'রে তীর্থ ভ্রমণের দ্বারা ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ রূপটিকে ভক্তির সঙ্গে মনের মধ্যে গভীর ভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। শুধু ভারতবর্ষের ভূগোল জানা যেত তা নয়, তার নানা জাতীয় অধিবাসীদের সঙ্গে

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঘনিষ্ঠ পরিচয় আপনিই হ'ত। সেদিন ভারতবর্ষের আত্মোপলব্ধি একটা সত্যসাধনা ছিল ব'লেই তার আত্মপরিচয়ের পদ্ধতিও আপনিই এমন সত্য হ'য়ে উঠেছিল। যথার্থ শ্রদ্ধা কখনো ফাঁকি দিয়ে কাজ সারতে চায় না অর্থাৎ রাষ্ট্রসভার রঙ্গমঞ্চের উপর ক্ষণিক মিলনের অভিনয়কেই সে মিলন ব'লে নিজেকে ভোলাতে চায় না। সেদিন মিলনের সাধনা ছিল অকৃত্রিম নিষ্ঠার সাধনা।

সেদিনকার ভারতবর্ষের সেই আত্মমূর্ত্তি-ধ্যান সমুদ্র পার হ'য়ে পূর্ব্ব মহাসাগরের এই সুদূর দ্বীপ প্রান্তে এমন ক'রে স্থান পেয়েছিল যে, আজ হাজার বছর পরেও সেই ধ্যানমন্ত্রের আবৃত্তি এই রাজার মুখে ভক্তির সুরে বেজে উঠ্‌ল এতে আমার মনে ভারি বিস্ময় লাগল। এই সব ভৌগোলিক নাম-মালা এদের মনে আছে ব'লে নয়, কিন্তু যে প্রাচীন যুগে এই নাম-মালা এখানে উচ্চারিত হয়েছিল সেই যুগে এই উচ্চারণের কি গভীর অর্থ ছিল সেই কথা মনে ক'রে। সেদিনকার ভারতবর্ষ আপনার ঐক্যটিকে কত বড়ো আগ্রহের সঙ্গে জান্‌ছিল, আর সেই জানাটিকে স্থায়ী করবার জন্যে ব্যক্ত করবার জন্যে কি রকম সহজ উপায় উদ্ভাবন করেছিল তা স্পষ্ট বোঝা গেল আজ এই দূর দ্বীপে এসে যে-দ্বীপকে ভারতবর্ষ ভুলে গিয়েছে।

রাজা কি রকম উৎসাহের সঙ্গে হিমালয় বিন্ধ্যাচল গঙ্গা যমুনার নাম করলেন, তাতে কি রকম তাঁর গর্ব্ব বোধ হল! অথচ এ ভূগোল বস্তুতঃ তাঁদের নয়,—রাজা য়ুরোপীয় ভাষা জানেন না, ইনি আধুনিক স্কুলে পড়া মানুষ নন্, সুতরাং পৃথিবীতে ভারতবর্ষ জায়গাটি যে কোথায় এবং কি রকম, সে সম্বন্ধে সম্ভবত তাঁর অস্পষ্ট ধারণা; অন্ততঃ বাহ্যত এ ভারতবর্ষের সঙ্গে তাঁদের কোন ব্যবহার নেই, তবুও হাজার বছর আগে এই নামগুলির সঙ্গে যে সুর মনে বাঁধা হয়েছিল সেই সুর আজও এদেশের মনে বাজ্‌চে। সেই সুরটি কত বড় খাঁটি সুর ছিল তাই আমি ভাব্‌চি। আমি কয়েক বছর আগে ভারতবিধাতার যে জয়গান রচনা করেচি তাতে ভারতের প্রদেশগুলির নাম গেঁথেচি—বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গার নামও আছে। কিন্তু আজ আমার মনে হচ্চে ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশের ও সমুদ্র পর্ব্বতের নামগুলি ছন্দে গেঁথে কেবল মাত্র একটি দেশ-পরিচয় গান আমাদের লোকের মনে গেঁথে দেওয়া ভালো। দেশাত্মবোধ ব'লে একটা শব্দ আজকাল আমরা কথায় কথায় ব্যবহার ক'রে থাকি, কিন্তু দেশাত্মজ্ঞান নেই যার তার দেশাত্মবোধ হবে কেমন ক'রে?

তার পরে রাজা আউড়ে গেলেন,—সপ্তপর্ব্বত, সপ্তবন, সপ্ত-আকাশ—অর্থাৎ তখনকার ভারতবর্ষ বিশ্ববৃত্তান্ত যে-রকম কল্পনা করেছিল তার স্মৃতি। আজ নূতন জ্ঞানের প্রভাবে সেই স্মৃতি নির্ব্বাসিত, কেবল তা পুরাণের জীর্ণ পাতায় আটকে রয়েচে, কিন্তু এখানকার কণ্ঠে এখনো তা শ্রদ্ধার সঙ্গে ধ্বনিত। তারপরে রাজা চার বেদের নাম, যম বরুণ প্রভৃতি চার লোকপালের নাম, মহাদেবের নামাষ্টক ব'লে গেলেন,—ভেবে ভেবে মহাভারতের অষ্টাদশ পর্ব্বের নাম বল্‌তে লাগ্‌লেন, সবগুলি মনে এলোনা।

রাজপুরীতে প্রবেশ ক'রেই দেখি, প্রাঙ্গণে একটি বেদীর উপর বিচিত্র উপকরণ সাজানো, এখানকার চারজন ব্রাহ্মণ একজন বুদ্ধের, একজন শিবের, একজন ব্রহ্মার, একজন বিষ্ণুর পূজারি; মাথায় মস্ত উঁচু কারু-খচিত টুপি, টুপির উপরিভাগে কাঁচের তৈরি এক একটা চূড়া। এঁরা চারজন পাশাপাশি ব'সে আপন আপন দেবতার স্তবমন্ত্র প'ড়ে যাচ্চেন। একজন প্রাচীনা এবং একজন বালিকা অর্ঘ্যের থালি হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে। সব সুদ্ধ সাজ-সজ্জা খুব বিচিত্র ও সমারোহ-বিশিষ্ট। পরে শোনা গেল এই মাঙ্গল্য মন্ত্রপাঠ চল্‌ছিল রাজবাড়ীতে আমারি আগমন উপলক্ষ্যে। রাজা বল্‌লেন, আমার আগমনের পুণ্যে প্রজাদের মঙ্গল হবে, ভূমি সফলা হবে এই কামনায় স্তব মন্ত্রের আবৃত্তি। রাজা বিষ্ণু বংশীয় ব'লে নিজের পরিচয় দিলেন।

বেলা সাড়ে চারটের সময় স্নান ক'রে নিয়ে বারান্দায় এসে বসলুম। কারো মুখে কথা নেই। ঘণ্টা দুয়েক এই ভাবে যখন গেল তখন রাজা স্থানীয় বাজার থেকে বোম্বাই প্রদেশের এক খোজা মুসলমান দোকানদারকে তলব দিয়ে আনালেন। কি আমার প্রয়োজন, কি রকম আহারাদির ব্যবস্থা আমার জন্যে করতে হবে ইত্যাদি প্রশ্ন। আমি রাজাকে জানাতে বললুম, তিনি যদি আমাকে ত্যাগ

ক'রে বিশ্রাম করতে বান তাহলেই আমি সব চেয়ে খুসি হব।

তার পর দিনে রাজবাড়ির কয়েকজন ব্রাহ্মণপণ্ডিত তালপাতার পুঁথি-পত্র নিয়ে উপস্থিত। একটি পুঁথি মহাভারতের ভীষ্ম পর্ব্ব। এইখানকার অক্ষরেই লেখা। উপরের পংক্তি সংস্কৃত ভাষায়, নীচের পংক্তিতে দেশী ভাষায় তারি অর্থ ব্যাখ্যা। কাগজের একটি পুঁথিতে সংস্কৃত শ্লোক লেখা। সেই শ্লোক রাজা প'ড়ে যেতে লাগলেন; উচ্চারণের বিকৃতি থেকে বহুকষ্টে তাদের উদ্ধার করবার চেষ্টা করা গেল। সমস্তটা যোগতত্ত্বের উপদেশ। চিত্তবৃদ্ধি, ত্রি-অক্ষরাত্মক ওঁ, চন্দ্রবিন্দু এবং অন্য সমস্ত শব্দ ও ভাবনা বর্জ্জন ক'রে শুদ্ধ চৈতন্যযোগে, সুখমাপ্নুয়াৎ এই হ'চ্চে সাধনা। আমি রাজাকে আশ্বাস দিলেম যে, আমরা এখানে যে-সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত পাঠিয়ে দেব, তিনি এখানকার গ্রন্থগুলি থেকে বিকৃত ও বিস্মৃত পাঠ উদ্ধার ক'রে তার অর্থব্যাখ্যা ক'রে দিতে পারবেন।

এদিকে আমার শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হ'তে চলল। প্রতি মুহূর্ত্তে বুঝতে পারলুম আমার শক্তিতে কুলোবে না। সৌভাগ্যক্রমে সুনীতি আমাদের সঙ্গে আছেন, তাঁর অশ্রান্ত উদ্যম, অদম্য উৎসাহ। তিনি ধুতি প'রে কোমরে পট্টবস্ত্র জড়িয়ে 'পেদণ্ড', অর্থাৎ এখানকার ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ব'সে গেলেন। তাঁর সঙ্গে আমাদের দেশের পূজোপকরণ ছিল—পূজাপদ্ধতি তাদের দেখিয়ে দিলেন। আলাপ আলোচনায় সকলকেই তিনি আগ্রহান্বিত ক'রে তুলেচেন।

যখন দেখা গেল আমার শরীর আর সইতে পারচে না তখন আমি রাজপুরী থেকে পালিয়ে এই আম্পুল তীর্থাশ্রমেযু নির্ব্বাসন গ্রহণ করলুম। এখানে লোকের ভিড় নেই, অভ্যর্থনা পরিচর্য্যার উপদ্রব নেই। চারদিকে সুন্দর গিরিব্রজ, শস্যশ্যামলা উপত্যকা, জনপদবধূদের স্নানসেবায় চঞ্চল উৎস-জল-সঞ্চয়ের অবিরত কলপ্রবাহ, শৈলতটে নির্ম্মল নীলাকাশে নারিকেল শাখার নিত্য আন্দোলন; আমি ব'সে আছি বারান্দায়, কখনো লিখ্‌চি, কখনো সামনে চেয়ে দেখচি। এমন সময়ে হঠাৎ এসে থামল্ এক মোটর গাড়ি। গিয়ানয়ারের রাজা ও এই প্রদেশের একজন ওলন্দাজ রাজপুরুষ নেমে এলেন। এঁর বাড়িতে আমার নিমন্ত্রণ। অন্তত এক রাত্রি যাপন করতে হবে। প্রসঙ্গক্রমে আপনিই মহাভারতের কথা উঠল। মহাভারতের যে কয়টা পর্ব্ব এখনো এখানে পাওয়া যায় তাই তিনি অনেক ভেবে ভেবে আউড়িয়ে গেলেন। বাকি পর্ব্ব কি তাই তিনি জানতে চান। এখানে কেবল আছে, আদি পর্ব্ব, বিরাট পর্ব্ব, উদ্যোগ পর্ব্ব, ভীষ্ম পর্ব্ব, আশ্রমবাস পর্ব্ব, মুষল পর্ব্ব, প্রস্থানিক পর্ব্ব, স্বর্গারোহণ পর্ব্ব।

মহাভারতের কাহিনীগুলির উপরে এদেশের লোকের চিত্ত বাসা বেঁধে আছে। তাদের আমোদে আহ্লাদে কাব্যে গানে অভিনয়ে জীবনযাত্রায় মহাভারতের সমস্ত চরিত্রগুলি বিচিত্রভাবে বর্ত্তমান। অর্জ্জুন এদের আদর্শ পুরুষ। এখানে মহাভারতের গল্পগুলি কিরকম বদ্‌লে গেচে তার একটা দৃষ্টান্ত দিই। সংস্কৃত মহাভারতের শিখণ্ডী এখানে শ্রীকান্তি নাম ধরেচে। শ্রীকান্তি অর্জ্জুনের স্ত্রী। তিনি যুদ্ধের রথে অর্জ্জুনের সামনে থেকে ভীষ্মবধের সহায়তা করেছিলেন। এই শ্রীকান্তি এখানে সতী-স্ত্রীর আদর্শ।

গিয়ানয়ারের রাজা আমাকে অনুরোধ ক'রে গেলেন আজ রাত্রে মহাভারতের হারানো পর্ব্ব প্রভৃতি পৌরাণিক বিষয় নিয়ে তিনি আমার সঙ্গে আলোচনা করতে চান। আমি তাঁকে সুনীতির কথা বলেচি—সুনীতি তাঁকে শাস্ত্র বিষয়ে যথাজ্ঞান সংবাদ দিতে পারবেন।

ভারতের ভূগোলস্মৃতি সম্বন্ধে একটা কথা আমার মনে আন্দোলিত হচ্চে। নদীর নাম-মালার মধ্যে সিন্ধু ও শতদ্রু প্রভৃতির নাম নেই, ব্রহ্মপুত্রের নামও বাদ পড়েচে। অথচ দক্ষিণের প্রধান নদীগুলির নাম দেখচি। এর থেকে বোঝা যায় সেই যুগে পঞ্জাব প্রদেশ শক, হুন, যবন ও পারসিকদের দ্বারা বারবার বিধ্বস্ত ও অধিকৃত হ'য়ে ভারতবর্ষ থেকে যেন বিদ্যায় সভ্যতায় স্খলিত হ'য়ে পড়েছিল, অপর পক্ষে ব্রহ্মপুত্র নদের দ্বারা অভিষিক্ত ভারতের পূর্ব্বতম দেশ তখনো যথার্থরূপে হিন্দু ভারতের অঙ্গীভূত হয় নি।

এইত গেল এখানকার বিবরণ। আমার নিজের অবস্থাটা যেরকম দেখচি তাতে এখানে আমার ভ্রমণ সংক্ষেপ করতে হবে। ইতি—৩১ আগষ্ট ১৯২৭।

কারেম আসন। বালি

জাভাযাত্রীর পত্র

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীমতী নির্ম্মলকুমারী মহলানবীশকে
লিখিত

গিয়ানয়ার

৫

কল্যাণীয়াসু,

রাণী, এসেচি গিয়ানয়ার রাজবাড়িতে। মধ্যাহ্ন-ভোজনের পূর্ব্বে সুনীতি রাজবাড়ির ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের নিয়ে খুব আসর জমিয়ে তুলেছিলেন। খেতে ব'সে রাজা আমাকে বল্লেন একটু সংস্কৃত আওড়াতে। দুচার রকমের শ্লোক আওড়ানো গেল। সুনীতি একটি শ্লোকের পরিচয় দিতে গিয়ে যেমনি বল্লেন "শার্দ্দুল-বিক্রীড়িত" অমনি রাজা সেটা উচ্চারণ ক'রে জানালেন তিনিও জানেন। এখানকার রাজার মুখে অত বড় একটা কড়া সংস্কৃত শব্দ শুনে আমি তো আশ্চর্য্য। তার পরে রাজা ব'লে গেলেন শিখরিণী, স্রগ্ধরা, মালিনী, বসন্ততিলক; আরো কতকগুলো নাম যা আমাদের অলঙ্কার শাস্ত্রে কখনো পাইনি। বল্লেন, তাঁদের ভাষায় এ সব ছন্দ প্রচলিত। অথচ মন্দাক্রান্তা বা অনুষ্টুভ এঁরা জানেন না। এখানে ভারতীয় বিদ্যার এই সব ভাঙাচোরা মূর্ত্তি দেখে মনে হয় যেন ভূমিকম্প হ'য়ে একটা প্রাচীন মহানগরী ধ্ব'সে গিয়েচে, মাটির নীচে ব'সে গিয়েচে—সেই সব জায়গায় উঠেচে পরবর্ত্তী কালের ঘরবাড়ি চাষ-আবাদ; আবার অনেক জায়গায় সেই পুরোনো কীর্ত্তির অবশেষ উপরে জেগে, এই দুইয়ে মিলে জোড়াতাড়া দিয়ে এখানকার লোকালয়।

সেকালের ভারতবর্ষের যা কিছু বাকি আছে তার থেকে ভারতের তখনকার কালের বিবরণ অনেকটা আন্দাজ করা যায়। এখানে হিন্দুধর্ম্ম প্রধানতই শৈব। দুর্গা আছেন কিন্তু কপালমালিনী লোলরসনা উলঙ্গিনী কালী নেই। কোনো দেবতার কাছে পশুবলি এরা জানে না। কিছুকাল আগে অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ উপলক্ষ্যে পশুবধ হ'ত, কিন্তু দেবীর কাছে জীবরক্ত নৈবেদ্য দেওয়া হ'ত না। এর থেকে বোঝা যায় তখনকার ভারতবর্ষে ব্যাধ শবরদের উপাস্য দেবতা উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুমন্দিরে প্রবেশ ক'রে রক্তাভিষিক্ত দেবপূজা প্রচার করেন নি।

তারপরে রামায়ণ মহাভারতের যে-সকল পাঠ এদেশে প্রচলিত আমাদের দেশের সঙ্গে তার অনেক প্রভেদ। যে-যে স্থানে এদের পাঠান্তর তার সমস্তই যে অশুদ্ধ এমন কথা জোর ক'রে বলা যায় না। এখানকার রামায়ণে রাম সীতা ভাই-বোন; সেই ভাই-বোনে বিবাহ হয়েছিল। একজন ওলন্দাজ পণ্ডিতের সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল; তিনি বল্লেন, তাঁর মতে এই কাহিনীটাই প্রাচীন, পরবর্ত্তীকাল এই কথাটাকে চাপা দিয়েচে।

এই মতটাকে যদি সত্য ব'লে মেনে নেওয়া যায় তা হ'লে রামায়ণ মহাভারতের মধ্যে মস্ত কয়েকটি মিল দেখ্‌তে পাই। দুটি কাহিনীরই মূলে দুটি বিবাহ। দুটি বিবাহই আর্য্যরীতি অনুসারে অসঙ্গত। ভাই বোনে বিবাহ বৌদ্ধ ইতিহাসে কোনো কোনো জায়গায় শোনা যায়, কিন্তু সেটা আমাদের সম্পূর্ণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ। অন্যদিকে এক স্ত্রীকে পাঁচ ভাইয়ে মিলে বিবাহও তেমনি অদ্ভুত ও অশাস্ত্রীয়। দ্বিতীয় মিল হচ্চে, দুই বিবাহেরই গোড়ায় অস্ত্রপরীক্ষা, অথচ সেই পরীক্ষা বিবাহযোগ্যতা প্রসঙ্গে নিরর্থক। তৃতীয় মিল হচ্চে, দুটি কন্যাই মানবী গর্ভজাত নয়। সীতা পৃথিবীর কন্যা, হল-রেখার মুখে কুড়িয়ে পাওয়া; কৃষ্ণা যজ্ঞসম্ভবা। চতুর্থ মিল হচ্চে, উভয়ত্রই প্রধান নায়কদের রাজ্যচ্যুতি ও স্ত্রীকে নিয়ে বনগমন। পঞ্চম মিল হচ্চে, দুই কাহিনীতেই শত্রুর হাতে স্ত্রীর অবমাননা ও সেই অবমাননার প্রতিশোধ।

সেই জন্যে আমি পূর্ব্বেই অন্যত্র এই মত প্রকাশ করেচি যে, দুটি বিবাহই রূপকমূলক। রামায়ণের রূপকটি খুবই স্পষ্ট। কৃষির হলবিদারণ রেখাকে যদি কোনো রূপ দিতেই হয় তবে তাকে পৃথিবীর কন্যা বলা যেতে পারে। শস্যকে যদি নবদূর্ব্বাদলশ্যাম রাম ব'লে কল্পনা করা যায় তবে সেই শস্যও তো পৃথিবীর পুত্র। এই রূপক অনুসারে উভয়ে ভাইবোন, আর পরস্পর পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধ।

হরধনু ভঙ্গের মধ্যেই রামায়ণের মূল অর্থ। বস্তুত সমস্তটাই হরধনু ভঙ্গের ব্যাপার—সীতাকে গ্রহণ, রক্ষণ ও

উদ্ধারের জন্যে। আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্ব অংশ থেকে ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্ত পর্য্যন্ত কৃষিকে বহন ক'রে ক্ষত্রিয়দের যে-অভিযান হয়েছিল সে সহজ হয় নি,—তার পিছনে ঘরে-বাইরে মস্ত একটা দ্বন্দ্ব ছিল। সেই ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের ইতিহাস রামায়ণের মধ্যে নিহিত, অরণ্যের সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রের দ্বন্দ্ব।

মহাভারতে খাণ্ডববন দাহনের মধ্যেও এই ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের আভাস পাই। সেও বনের গাছপালা পোড়ানো নয়, সেদিন বন যে প্রতিকূল মানব শক্তির আশ্রয় ছিল তাকে ধ্বংস করা। এর বিরুদ্ধে কেবল যে অনার্য্য তা নয়, ইন্দ্র যাঁদের দেবতা তাঁরাও ছিলেন। ইন্দ্র বৃষ্টি বর্ষণে খাণ্ডবের আগুন নেবাবার চেষ্টা করেছিলেন।

মহাভারতেরও অর্থ পাওয়া যায় লক্ষ্যবেধের মধ্যে। এই শূন্যস্থিত লক্ষ্যবেধের মধ্যে এমন একটি সাধনার সঙ্কেত আছে, যে-একাগ্রসাধনার দ্বারা কৃষ্ণাকে পাওয়া যায়; আর এই যজ্ঞসম্ভবা কৃষ্ণা এমন একটি তত্ত্ব, যাকে নিয়ে একদিন ভারতবর্ষে বিষম দ্বন্দ্ব বেধে গিয়েছিল। এ'কে একদল স্বীকার করেছিল, একদল স্বীকার করেনি। কৃষ্ণাকে পঞ্চ পাণ্ডব গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু কৌরবেরা তাঁকে অপমান করতে ত্রুটি করেন নি। এই যুদ্ধে কুরুসেনাপতি ছিলেন ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য্য, আর পাণ্ডববীর অর্জ্জুনের সারথি ছিলেন কৃষ্ণ। রামের অস্ত্রদীক্ষা যেমন বিশ্বামিত্রের কাছ থেকে, অর্জ্জুনের যুদ্ধদীক্ষা তেমনি কৃষ্ণের কাছ থেকে। বিশ্বামিত্র স্বয়ং লড়াই করেন নি, কিন্তু লড়াইয়ের প্রেরণা তাঁর কাছ থেকে; কৃষ্ণও স্বয়ং লড়াই করেন নি কিন্তু কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রবর্ত্তন করেছিলেন তিনি,—ভগবদ্গীতাতেই এই যুদ্ধের সত্য এই যুদ্ধের ধর্ম্ম ঘোষিত হয়েছে, সেই ধর্ম্মের সঙ্গে কৃষ্ণ একাত্মক, যে-কৃষ্ণ কৃষ্ণার সখা, অপমান কালে কৃষ্ণা যাঁকে স্মরণ করেছিলেন ব'লে তাঁর লজ্জা রক্ষা হয়েছিল, যে-কৃষ্ণের সম্মাননার জন্যেই পাণ্ডবদের রাজসূয় যজ্ঞ। রাম দীর্ঘকাল সীতাকে নিয়ে যে-বনে ভ্রমণ করেছিলেন সে ছিল অনার্য্যদের বন, আর কৃষ্ণাকে নিয়ে পাণ্ডবেরা ফিরেছিলেন যে-বনে সে হচ্ছে ব্রাহ্মণ ঋষিদের বন। পাণ্ডবদের সাহচর্য্যে এই বনে কৃষ্ণার প্রবেশ ঘটেছিল। সেখানে কৃষ্ণা তাঁর অক্ষয় অন্নপাত্র থেকে অতিথিদের অন্নদান করেছিলেন। ভারতবর্ষে একটা দ্বন্দ্ব ছিল অরণ্যের সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রের, আর একটা দ্বন্দ্ব বেদের ধর্ম্মের সঙ্গে কৃষ্ণের ধর্ম্মের। লঙ্কা ছিল অনার্য্যশক্তির পুরী, সেইখানে আর্য্যের হ'ল জয়; কুরুক্ষেত্র ছিল কৃষ্ণ বিরোধী কৌরবের ক্ষেত্র সেইখানে কৃষ্ণভক্ত পাণ্ডব জয়ী হলেন। সব ইতিহাসেই বাইরের দিকে অন্ন নিয়ে যুদ্ধ, আর ভিতরের দিকে তত্ত্ব নিয়ে যুদ্ধ। প্রজা বেড়ে যায়, তখন খাদ্য নিয়ে টানাটানি পড়ে, তখন নব নব ক্ষেত্রে কৃষিকে প্রসারিত করতে হয়। চিত্তের প্রসার বেড়ে যায়, তখন যারা সঙ্কীর্ণ প্রথাকে আঁকড়ে থাকে তাদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব বাধে যারা সত্যকে প্রশস্ত ও গভীর ভাবে গ্রহণ করতে চায়। এক সময়ে ভারতবর্ষে দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ প্রবল হয়েছিল; এক পক্ষ বেদমন্ত্রকেই ব্রহ্ম বলতেন, অন্য পক্ষ ব্রহ্মকে পরমাত্মা ব'লে জেনেছিলেন। বুদ্ধদেব যখন তাঁর ধর্ম্ম প্রচার সুরু করেন তার পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণে ক্ষত্রিয়ে মতের দ্বন্দ্ব তাঁর পথ অনেকটা পরিষ্কার ক'রে দিয়েচে।

রামায়ণ মহাভারতের মধ্যে ভারতবর্ষের যে মূল ইতিহাস নানা কাহিনীতে বিজড়িত, তাকে স্পষ্টতর ক'রে দেখতে পাব যখন এখানকার পাঠগুলি মিলিয়ে দেখবার সুযোগ হবে। কথায় কথায় এখানকার একজনের কাছে শোনা গেল যে, দ্রোণাচার্য্য ভীমকে কৌশলে বধ করবার জন্যে কোন এক অসাধ্য কর্ম্মে পাঠিয়েছিলেন। দ্রুপদ বিদ্বেষী দ্রোণ যে পাণ্ডবদের অনুকূল ছিলেন না তার হয়ত প্রমাণ এখানকার মহাভারতে আছে।

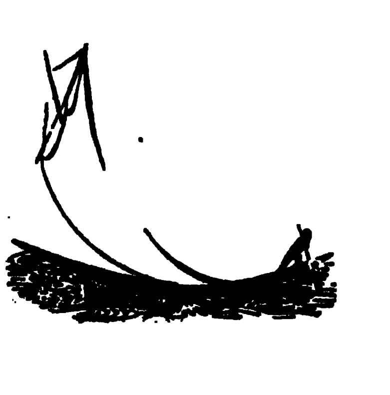
রামায়ণের কাহিনী সম্বন্ধে আর একটি কথা আমার মনে আসচে সেটা এখানে ব'লে রাখি। কৃষির ক্ষেত্র দুরকম ক'রে নষ্ট হ'তে পারে,—এক বাইরের দৌরাত্ম্যে, আর এক নিজের অযত্নে। যখন রাবণ সীতাকে কেড়ে নিয়ে গেল তখন রামের সঙ্গে সীতার আবার মিলন হ'তে পেরেছিল। কিন্তু যখন অযত্নে অনাদরে রাম-সীতার বিচ্ছেদ ঘটল তখন পৃথিবীর কন্যা সীতা পৃথিবীতেই মিলিয়ে গেলেন। অযত্নে নির্ব্বাসিতা সীতার গর্ভে যে যমজ সন্তান জন্মেছিল তাদের নাম লব কুশ। লবের মূল ধাতুগত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অর্থ ছেদন, কুশের জানাই আছে। কুশ ঘাস একবার জন্মালে ফসলের ক্ষেতকে যে কি রকম নষ্ট করে সেও জানা কথা। আমি যে মানেটা আন্দাজ করচি সেটা যদি একেবারেই অগ্রাহ্য না হয় তা হ'লে লবের সঙ্গে কুশের একত্র জন্মানোর ঠিক তাৎপর্য্য কি হ'তে পারে একথা আমি পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করি।

অন্যদের চিঠি থেকে খবর পেয়ে থাকবে যে এখানে আমরা প্রকাণ্ড একটা অন্ত্যেষ্টি সৎকারের অনুষ্ঠান দেখ্‌তে এসেচি। মোটের উপরে এটা কতকটা চীনেদের মতো—তারাও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় এই রকম ধূমধাম সাজসজ্জা বাজনাবাদ্য ক'রে থাকে। কেবল মন্ত্রোচ্চারণ প্রভৃতির ভঙ্গিটা হিন্দুদের মতো। দাহক্রিয়াটা এরা হিন্দুদের কাছ থেকে নিয়েচে। কিন্তু কেমন মনে হয় ওটা যেন অন্তরের সঙ্গে নেয়নি। হিন্দুরা আত্মাকে দেহের অতীত ক'রে দেখতে চায়, তাই মৃত্যুর পরেই পুড়িয়ে ফে'লে দেহের মমতা থেকে একেবারে মুক্তি পাবার চেষ্টা করে। এখানে মৃত দেহকে অনেক সময়েই বহু বৎসর ধ'রে রেখে দেয়। এই রেখে-দেবার ইচ্ছেটা কবর দেবার ইচ্ছেরই সামিল। এদের রীতির মধ্যে এরা দেহটাকে রেখে দেওয়া আর দেহটাকে পোড়ানো এই দুই উল্টো প্রথার মধ্যে যেন রফা নিষ্পত্তি ক'রে নিয়েচে। মানুষের মনঃ-প্রকৃতির বিভিন্নতা স্বীকার ক'রে নিয়ে হিন্দুধর্ম্ম রফানিষ্পত্তিসূত্রে কত বিপরীত রকম রাজিনামা লিখে দিয়েচে তার ঠিকানা নেই। ভেদ নষ্ট ক'রে ফেলে হিন্দুধর্ম্ম ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করে নি, ভেদ রক্ষা ক'রেও সে একটা ঐক্য আন্‌তে চেয়েচে।

কিন্তু এমন ঐক্য সহজ নয় ব'লেই এর মধ্যে দৃঢ় ঐক্যের শক্তি থাকে না। বিভিন্ন বহুকে এক ব'লে স্বীকার ক'রেও তার মাঝে মাঝে অলঙ্ঘনীয় দেয়াল তুলে দিতে হয়। এ'কে অবিচ্ছিন্ন এক বলা যায় না, এ'কে বল্‌তে হয় বিভক্ত এক। ঐক্য এ'তে ভারগ্রস্ত হয়, ঐক্য এ'তে শক্তিমান হয় না। আমাদের দেশের স্বধর্ম্মানুরাগী অনেকেই বালিদ্বীপের অধিবাসীদের আপন ব'লে স্বীকার ক'রে নিতে উৎসুক হবেন—কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই নিজের সমাজ থেকে ওদের দূরে ঠেকিয়ে রাখ্‌বেন। এইখানে প্রতিযোগিতায় মুসলমানের সঙ্গে আমাদের হারতেই হয়। মুসলমানে মুসলমানে এক মুহূর্ত্তেই সম্পূর্ণ জোড় লেগে যায়, হিন্দুতে হিন্দুতে তা লাগে না। এই জন্যেই হিন্দুর ঐক্য আপন বিপুল অংশ-প্রত্যংশ নিয়ে কেবলি নড়্‌নড়্‌ কর্‌চে। মুসলমান যেখানে আসে সেখানে সে যে কেবল মাত্র আপন বল দেখিয়ে বা যুক্তি দেখিয়ে বা চরিত্র দেখিয়ে সেখানকার লোককে আপন সম্প্রদায়ভুক্ত করে তা নয়, সে আপন সন্ততিবিস্তার দ্বারা সজীব ও ধারাবাহিক ভাবে আপন ধর্ম্মের বিস্তার করে। জাতির, এমন কি, পরজাতির লোকের সঙ্গে বিবাহে তার কোনো বাধা নেই। এই অবাধ বিবাহের দ্বারা সে আপন সামাজিক অধিকার সর্ব্বত্র প্রসারিত করতে পারে। কেবল মাত্র রক্তপাতের রাস্তা দিয়ে নয়, রক্তমিশ্রণের রাস্তা দিয়ে সে দূরে দূরান্তরে প্রবেশ করতে পেরেচে। হিন্দু যদি তা পারত তা হ'লে বালিদ্বীপে হিন্দুধর্ম্ম স্থায়ী, বিশুদ্ধ, ও পরিব্যাপ্ত হ'তে দেরী হ'ত না। ইতি ১ আগষ্ট, ১৯২৭।



সাহিত্যে মিথ্যাবাদ

শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ভাদ্রমাসের উত্তরায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যে দলাদলির একটি কারণ দেখিয়েছি। আমার মনে হয়েছিল যে দলাদলির কারণ অর্থ-সমস্যা, প্রতিপত্তি-বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা, কিম্বা শক্তি-হ্রাসের ভয়,—এক কথায় সাহিত্যিক ব্যবসায়ে লাভালাভ। এখন আমার মনে হচ্ছে, বিশেষতঃ নিজের লেখাটি ছাপার অক্ষরে প'ড়ে, আর্থিক উন্নতি ও সাহিত্যিক প্রতিপত্তি দলাদলির পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা হলেও সেগুলি অন্ত গূঢ় কারণের নিদর্শন মাত্র। এই গূঢ় কারণটির সত্তা ও পরম্পরা নির্দ্ধারণ করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কার্ল মার্ক্‌সের ব্যাখ্যা আমি ইতিহাস ও রাজনীতির ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ স্বীকার করি না, সাহিত্য-ক্ষেত্রে ত দূরের কথা। এখান থেকে মন নির্ব্বাসিত হয়েছে, অথচ বড় আদর্শের দোহাই দিয়ে নিজেকে ও পরকে ঠকান মনেরই কার্য্য।

গোড়ার কথা এই যে সাধারণ মানুষের সঙ্গে আর্টিষ্টের আকাশ পাতাল প্রভেদ রয়েছে। দু'জনেই মানুষ বোলে, গোটা কয়েক যন্ত্র-তন্ত্র সাধারণ হ'তে বাধ্য—যেমন মন ও দেহ। তবে আর্টিষ্ট-মনের কাজের বৈশিষ্ট্য আছে এবং আর্টিষ্টের দেহের উদ্দেশ্য ও অভিব্যক্তি কিছু অন্য ধরণের। সাধারণ মানুষের সঙ্গে আর্টিষ্টের মিলের চেয়ে গরমিলই দরকারী কথা। এক কথায়, তফাৎ হচ্ছে সাধারণ মানুষের মন অশিক্ষিত এবং আর্টিষ্টের মন সুশিক্ষিত। তর্ক উঠতে পারে যে বৈজ্ঞানিকের মনও শিক্ষিত, অতএব গরমিল শুধু আর্টিষ্টের সঙ্গে নয়, বৈজ্ঞানিকেরও সঙ্গে। কিন্তু 'বৈজ্ঞানিক মন' বোলে কোন মনের অস্তিত্ব বৈজ্ঞানিক-সম্প্রদায় ন্যায়তঃ স্বীকার কোরতে পারেন না, কেন না তাঁরা চোখ, কান এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়, অর্থাৎ মনের দ্বারকে প্রথম থেকে শেষ অবধি সন্দেহ করেন। বিজ্ঞান-পদ্ধতির কাজ হচ্ছে বস্তু কিম্বা ঘটনার সঙ্গে মনের ছোঁয়াচ না লাগতে দেওয়া। যতক্ষণ না বৈজ্ঞানিক একটি আইনষ্টিন্ হচ্ছেন, ততক্ষণ বৈজ্ঞানিকের মন সাধারণ ব্যক্তির মন থেকে একেবারে ভিন্ন জাতির হবার আবশ্যক নেই। অতএব আমাদের দুটি কাজের হিসাব নিতে হবে। একটি সাধারণ ব্যক্তির মনের, এবং অন্যটি আর্টিষ্টের।

মানুষের সঙ্গে বহিঃপ্রকৃতির মিলনও চলছে, বিরোধও ঘটছে। এই দ্বৈত সম্বন্ধের ফলে, মন ও বুদ্ধি উৎপন্ন না হলেও, মন ও বুদ্ধি যে সজাগ, ক্রিয়াশীল, এবং প্রখর হ'য়ে ওঠে তা অস্বীকার করা যায় না। তার ওপর আবার অন্তঃপ্রকৃতিও রয়েছে। ভিতরের এই জড় প্রকৃতি মধ্যে মধ্যে এমন বাধা তোলে যে, মন ও বুদ্ধি (mind) সেই বাধাগুলিকে সোজাসুজি অতিক্রম না কোরতে পেরে গলি দিয়ে পাশ কাটাতে চায়, কিম্বা বাধা-বিপত্তির আনাচে কানাচে দাঁড়িয়ে পড়ে। গলিগুলি নিতান্তই বাঁকা এবং কোথাও নীচু, কোথাও উঁচু। এইরূপ অসমতল ক্ষেত্রের মধ্যে বক্রগতির ইতিহাস সম্বন্ধে এই মন্তব্য প্রকাশ করা যেতে পারে যে সেইরূপ বাঁকা পথ অবলম্বন কোরে, কিম্বা তার ধারে কোন অলিগলিতে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম লাভ কোরে, মনের অনেক প্রবৃত্তিকে সাময়িকভাবে বশে আনা যেতে পারে, কিন্তু গন্তব্য স্থানে, অর্থাৎ যথার্থ কিম্বা সার্থক সত্যে পৌছান যায় না। মনের সাময়িক বিশ্রাম সত্যোপলব্ধির পরম আনন্দ বোলে মনে হওয়াই শ্রান্ত পথিকের পক্ষে স্বাভাবিক। যে ব্যক্তি কিন্তু ইয়ুলিসেসের মতন আরামকে অগ্রাহ্য ক'রে অগ্রসর হ'তে পারে সেই বেঁচে গেল, নচেৎ মিথ্যার কুহকে চিরকাল ভেড়া হ'য়েই রইল। এই জন্যই বোধ হয় হিন্দু দার্শনিক, মন ও বুদ্ধিকে অত নীচু স্তরে রেখেছেন। এই জন্যই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ আর্টের ব্যাখ্যায় মন ও বুদ্ধির উল্লেখ না কোরে আত্মারই উল্লেখ করেন। মন ও বুদ্ধির কাজে জুয়াচুরী থাকবেই থাকবে—কেননা তাদের রাস্তা, গলি-ঘুঁজি; আত্মার বিকাশে জুয়াচুরী নেই, তা'র রাস্তা চিত্তরঞ্জন-আভিনিউর

শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মতই সোজা ও চওড়া। সাধারণ ব্যক্তির ও বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে আর্টিষ্টের তফাৎ এইখানে—সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে আত্মার বালাই নেই,—কেবল দেহ, মন ও বুদ্ধির সঙ্গেই তার কারবার, এবং আর্টিষ্টের কারবার দেহ, মন, বুদ্ধি ও আত্মার সঙ্গে। সাধারণ ব্যক্তির মূলধন বুদ্ধি কিন্তু আর্টিষ্টের মূলধন আত্মা। আর্টিষ্টের গড়নই আলাদা। অতএব সাধারণ ব্যক্তি যে বাধা বিপত্তি, বৈষম্যের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে, সে বাধা, বিপত্তি ও বৈষম্যের মধ্যে আর্টিষ্টের হারিয়ে যাবার ভয় নেই। আর্টিষ্টও বুদ্ধিমান জীব—তারও মন আছে, সেই জন্য সে ফাঁকি তৈরী করে, কিন্তু সে দেহ, মন, বুদ্ধি ও আত্মার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বোলে ফাঁকে পড়ে না। মোদ্দা কথা এই যে এ জগতে একমাত্র আর্টিষ্টই গোটা মানুষ। আর একটা মোটা কথা এই যে, সমালোচনার বিষয় আর্ট নয়, আর্টিষ্ট এবং তাঁর চিন্তাধারা ও কার্য্যাবলী। বৈজ্ঞানিক সমালোচনা, অর্থাৎ ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কবিহীন সমালোচনা একেবারেই বাজে কথা। ব্যাপারখানি বিশদ কোরে বলা যাক্। Vaihinger তাঁর Philosophy of As If বই খানিতে মনের এই জুয়াচুরীর কথা জোর কোরেই জানিয়ে দিয়েছেন।

কোন জিনিষের স্বরূপ অর্থাৎ যথার্থ কিম্বা সার্থক সত্যকে সহজে বুঝতে না পেরে মানুষের বুদ্ধি তিনটি সত্যের মূর্ত্তি খাড়া করে। প্রথমটি সদৃশ সত্য (Fiction) কিম্বা কাল্পনিক সত্য, দ্বিতীয়টি আনুমানিক সত্য (Hypothesis) এবং তৃতীয়টি অনুমোদিত কিম্বা গৃহীত সত্য (Dogma)। এই ত্রি-মূর্ত্তির পূজা প্রত্যেক বুদ্ধিমান জীবই কোরে থাকেন—কি বৈজ্ঞানিক, কি তথাকথিত সাহিত্যিক। তবে পূজার রীতি-নীতি, বিধি-ব্যবস্থা পৃথক হয়; হ'তে বাধ্য। সেই জন্যই কাব্য ও কথা-সাহিত্যের পিছনে, চিত্র ভাস্কর্য্য ও সঙ্গীতের পিছনে, বৈজ্ঞানিক পন্থার পিছনে স্রষ্টার ও বৈজ্ঞানিকের বুদ্ধিগত চিন্তাধারার রীতি-নীতি ভিন্ন। যেকালে আর্টিষ্টেরও মন ও বুদ্ধি আছে, অথচ যেকালে সে মন ও বুদ্ধি আত্মার অধীন, এবং যেকালে বস্তুর স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম অর্থাৎ রস সৃষ্টি করবার জন্ত আত্মার ও জড়ের কোন না কোন প্রকার সম্বন্ধ স্থাপন্ন করা চাইই চাই, তখন সর্ব্বপ্রকার রস-স্রষ্টার সৃজন-নীতি প্রধানতঃ এক হ'তে বাধ্য, যদিও রূপের দিক থেকে ভিন্ন হওয়াই নিতান্ত স্বাভাবিক।

সদৃশ সত্যের গোটা কয়েক দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। রাজনীতির ক্ষেত্রে রুসো, হব্‌সের কল্পিত মানব সমাজের আদিম অবস্থা; অর্থ-নীতিতে আডাম স্মিথ্‌ কল্পিত স্বার্থপর ও স্বার্থান্বেষী সাধারণ ব্যক্তি; সমাজ-তত্ত্বে গড়পড়তা সুস্থ মানুষ; বিজ্ঞানে পরমাণু; জীব-বিজ্ঞানে গেটে-কল্পিত জীব-জন্তুর একমাত্র মূল আদর্শ (The animal archetype)। সাহিত্যে ঐ প্রকার গোটা কয়েক কল্পিত অর্থাৎ সদৃশ সত্যের সন্ধান পাই। যেমন প্রত্যেক ব্যক্তি হচ্ছেন প্রকৃতির কবল থেকে মুক্ত পুরুষ (আদর্শবাদীর গোড়ার কথা); এবং প্রত্যেক ব্যক্তি হচ্ছেন ভিতরের ও বাইরের প্রকৃতির দ্বারা আবদ্ধ জীব (বস্তুতন্ত্রবাদীর গোড়ার কথা)। অর্থাৎ মানুষ হয় ভগবানের বংশধর, না হয় সয়তানের।

সদৃশ তথা কল্পিত সত্যে সুস্থ মানুষের মন বসে না, সে তাই সত্যের সন্ধানে এগিয়ে পড়ে। ফলে হয় আনুমানিক সত্য-সৃষ্টি। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্ত যেমন ডারুইনের অভিব্যক্তি-বাদ। সাহিত্যিক দৃষ্টান্ত যেমন—প্রত্যেক মানুষই নিজের ইচ্ছাশক্তিতে কিম্বা ভগবৎকৃপায় প্রকৃতির হাত থেকে মুক্ত হচ্ছে (আদর্শ-বাদী), এবং কোন মানুষই এই নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে পারে না (বস্তুতন্ত্র-বাদী)।

যেমন অসুস্থ ব্যক্তি, মৃগীরোগী কিম্বা উন্মাদের দল সত্যে সাধারণতঃ পৌঁছতে পারে না, তেমনি বেশীর ভাগ তথা-কথিত সুস্থ লোক আনুমানিক সত্যেই জ'মে যায়। তখন সদৃশ (কল্পিত) সত্য ও আনুমানিক সত্যের সাহায্যে বেশীর ভাগ লোক যে নতুন সত্য অনুমোদন ও গ্রহণ করে তার প্রকাশ-ভঙ্গী এইরূপ—অতএব যে ডারুইনের অভিব্যক্তি-বাদ গ্রহণ করল না সেই গোঁড়া ধার্ম্মিক (সার্ আর্থার কীথের সেদিনকারের বক্তৃতা); অতএব সাহিত্যের একমাত্র ধর্ম্ম হচ্ছে

সাহিত্যিকের কল্পিত ও আনুমানিক সত্যের সাহায্যে চরিত্রকে দেবোন্মুখ কিম্বা পাতকী অঙ্কিত করা। অর্থাৎ একমাত্র প্রকৃতির অতিরিক্ত মানুষ (দেবতার আত্মীয়), কিম্বা একমাত্র প্রকৃতির দ্বারা আবদ্ধ জীব (সয়তানের আত্মীয়) হিসাবেই মানুষকে বোঝা যাবে। দেবতার প্রকাশ হয় অনুভূতির মধ্যে, এবং পাতকীর প্রকাশ তার প্রত্যেক খুঁটি নাটি কাজে, দৈনন্দিন ঘটনায়। অতএব একটি গৃহীত সত্যের (আদর্শ-বাদের) প্রকাশ-ভঙ্গী অনুভূতি-মূলক, অন্যটির (বস্তু-তন্ত্রবাদের) পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ সাপেক্ষ। একটি হচ্ছে দিব্য দর্শন, অন্যটি বিজ্ঞান; একটি কুলীন, অন্যটি শূদ্র। দৃষ্টান্ত অনুরূপা দেবী, যতীন সিংহের সাহিত্যালোচনা এবং জোলার বস্তুতন্ত্রের ব্যাখ্যা।

অথচ বিজ্ঞানে যথার্থ সত্য ডারুইনের Struggle for Existence (মৎস্য ন্যায়) ক্রপটকিনের Mutual Aid, ডী ভ্রিজের Mutation সব মিলিয়ে এবং তারও অতিরিক্ত একটি জীবনীশক্তির প্রকাশ। অথচ সাহিত্যের একমাত্র কর্ত্তা ও কর্ম্ম মানুষ, যে একাধারে দেবতা, সয়তান ও নিতান্ত সাধারণ, এবং যে মানুষ বোলেই কখনও কখনও বিজ্ঞান-সম্মত এবং সাধারণে-ব্যবহৃত পথের বাইরে যূথভ্রষ্ট হ'য়ে পড়ে।

এ ত গেল দৃষ্টান্ত। দৃষ্টান্তের দ্বারা অনেক সময় ভিতরের কথাটা বোঝা যায় না। কাল্পনিক (সদৃশ) সত্যের ধরণ এই যে সে-সত্যের সঙ্গে ব্যবহারিক জগতের অর্থাৎ বাহ্য ঘটনা ও অভিজ্ঞতা এবং মানসিক জগতের প্রয়োজনীয় চিন্তাধারার আন্তরিক বিরোধ থাকতে বাধ্য। সঙ্গে সঙ্গে এই বিরোধ দূর করবার, এই উৎকট প্রসারণের এই মানসিক অশান্তির হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার বাসনা সদৃশ (কাল্পনিক) সত্যের রূপের মধ্যে থাকবেই থাকবে প্রকাশ্যে কিম্বা অ-প্রকাশ্যে। (বস্তু-তন্ত্র-বাদীর অঙ্কিত পাষণ্ডের মধ্যেও একটি ছোট্ট মেয়ে না হয় একটি কুকুরের উপর মমতায় এবং আদর্শ-বাদীর অঙ্কিত মহাত্মার চরিত্রে একটি নির্দোষ খেয়াল কিম্বা একটি মিথ্যা কলঙ্কের চিহ্নে পূর্ব্বোক্ত বিরোধটি ধরা পড়ে)। কল্পিত সত্যের কল্পনাটুকু স্রষ্টার কাছে সর্ব্বদা প্রকট থাকলেই বুদ্ধির পক্ষে ভাল। কাল্পনিক সত্যের একমাত্র গুণ, বুদ্ধির সুবিধা ও উপকার, কেননা তার দ্বারাই বুদ্ধি অনুমান ও অনুমোদন কোরতে অগ্রসর হয়।

কাল্পনিক সত্যের ও আনুমানিক সত্যের উৎপত্তি এবং আকার অনেক সময় একই প্রকারের। আকার এক হ'লে গোলমালের সম্ভাবনা বেশী। আদিম মানব কামুক ও ক্ষুধার্ত্ত, কিম্বা ধার্ম্মিক এবং ব্রহ্মচারী। (আমাদের সভ্যতা মানবের আদিমত্বকে দূর কোরতে মোটেই পারে নি); এবং (অতএব) কাম ও ক্ষুধা কিম্বা সংযম অথবা ব্রহ্মচর্য্য সব মানুষেরই আদিম (যথার্থ) প্রবৃত্তি—এই দুটি বাক্যের তাৎপর্য্য পৃথক হোলেও বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যে একই আকার ধারণ করেছে। কিন্তু অনুমান সর্ব্বদাই সত্য বোলে প্রমাণিত হবার জন্য প্রস্তুত। প্রত্যেক অনুমান এক একটি challenge, যুদ্ধং দেহি হাঁক ছাড়ছে। অনুরূপা দেবীর চরিত্রগুলি যদি কারুর অ-সত্য বোলে মনে হয়, গ্রন্থকর্ত্রী অতি সহজেই উত্তর দিতে পারেন, 'মানুষ যে দেবতার বংশধর এই কথাটির ওপর আগে জীবন গ'ড়ে তুলুন, এক-বার নিজে মহাত্মা ও মুক্ত পুরুষদের সঙ্গে মিশুন, একবার সাদা চোখে মানুষকে দেখুন, তা হ'লেই বুঝবেন আমার চরিত্রগুলি সত্য কি কল্পনা-প্রসূত। তাও যদি না করেন, তা হ'লে প্রমাণ করুন যে মানুষ পুরুষকারের দ্বারা কিম্বা গুরুর কৃপায় নিজেকে উন্নত কোরতে পারে না।' তেমনি একজন নব্য সাহিত্যিক রস-সমালোচককে বোলতে পারেন 'একবার দুচোখ খুলে বেড়াবেন, দেখবেন মানুষের মন ও দেহ এক-একটি কুরুক্ষেত্র। নেহাৎ না পারেন, প্রমাণ করুন যে ঐ প্রকার বদ্ধজীব পৃথিবীতে নেই, কিম্বা এতই দুর্লভ যে যাদুঘরের কাচের ভেতর রাখা ছাড়া নভেল নাটকের পাতায় আনা যায় না।' রামচন্দ্র ও ক্যাসানোভা দুই-এরই অস্তিত্ব আছে—সেইজন্য রামায়ণ ও কামায়ণ লেখা দুই-ই অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ—তবে যার যেমন অভিজ্ঞতা। সেইজন্য কোন অনুমানই নিরীক্ষণের ভয় পায় না। আদর্শবাদীর যন্ত্র দূরবীক্ষণ, বস্তু তন্ত্রবাদীর অনুবীক্ষণ, অর্থাৎ একই যন্ত্রের উল্টো দিকটা। যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষিত হ'লেই আনুমানিক

শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সত্যকে যথার্থ সত্য বিবেচনা করা স্বাভাবিক। কিন্তু যন্ত্র কিছু আশাতিরিক্ত অভিজ্ঞতা দেখায় না—এ কথাটি সকলেই ভুলে যান্। সেইজন্য আনুমানিক সত্যকে অনেক সময় যথার্থ সত্য বোলে ভ্রম হয়। আনুমানিক সত্যের অনুমান অংশটুকু যন্ত্র অর্থাৎ অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথর দ্বারা পরীক্ষিত হ'লেই, সন্দেহাংশটুকু বিশ্বাসের দ্বারা দূরীভূত হ'লেই, আনুমানিক সত্য অনুমোদিত (dogma) সত্যের কোঠায় উঠে পড়ল।

অতএব কাল্পনিক সত্যের উৎপত্তি এবং মাপকাঠি নির্দ্দেশের যেমন সুবিধা, আনুমানিকের তেমনি সম্ভবনীয়তা। মানুষকে অতিপ্রাকৃত আঁকবার সুবিধা যে কত সকলেই জানেন—অলৌকিক ঘটনার অবতারণা থেকে আরম্ভ ক'রে অসম্ভব অথবা পূর্ব্বপরিচিত ধর্ম্ম ও মধুর ভাবের সমাবেশ পর্য্যন্ত সবই সুবিধা। রবিবাবুর অনুকরণে দু চারটা ভূমা, দু চারটা বাণী, অজানা, আনন্দের ঝিলিক প্রভৃতি কথা লেখার মধ্যে ছিটিয়ে দিলে অতি সহজেই আদর্শ-বাদী সাহিত্যিক বোলে প্রতিপন্ন হওয়া যায়। আবার শরৎ বাবুর অনুকরণে ঘেয়ো কুকুরের ডাক, প্যাঁচার আওয়াজ, ঘেঁটুফুল ও বস্তীর দুর্গন্ধ, বেশ্যাবাড়ীর কাঁকড়া চচ্চড়ির ছিবড়ে, গল্পে আনলেই বাস্তবপন্থী নাম কেনা অতি সহজ হ'য়ে ওঠে। কিন্তু দুই প্রকার সাহিত্যিকই, যাঁরা যথার্থ সত্যের সন্ধান পেয়েছেন—অর্থাৎ রবিবাবু ও শরৎচন্দ্রের, বহুদূরে প'ড়ে রইলেন। কাল্পনিক সত্য কল্পনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ কোরলেই, অর্থাৎ ন্যায্য হ'লেই তার কাজ ফুরাল। কিন্তু আনুমানিক সত্য ঘটনা-পারম্পর্য্যের মধ্যে আবিষ্কার কোরতে হয়, কতখানি সত্যের নিকটবর্ত্তী হয়েছে সর্ব্বদাই চোখ রাখতে হয়, অর্থাৎ প্রমাণ-সাপেক্ষ এবং সম্ভব কি না দেখতে হয়। এখানে অভিজ্ঞতাই একমাত্র পরীক্ষক। নতুন অভিজ্ঞতা যদি পুরাতন অভিজ্ঞতার প্রতিকূল হল, তা হ'লে আনুমানিক সত্যকে তৎক্ষণাৎ বর্জ্জন কোরতে হবে—একটি মাত্র অভিজ্ঞতা যদি পূর্ব্বতন অনুমানের বিপক্ষে যায়, তা হলে পুরাতন অনুমানকে অগ্রাহ্য কোরতে হবে। কল্পনার ও বালাই নেই, তার পরীক্ষক ঘটনা নয়—একটি কল্পনার সঙ্গে অন্য কল্পনার সুর জড়িয়ে না গেলেই হ'ল। তা হলেও অগ্রাহ্য হবে না—জোর mixed metaphor, বাংলা মিশ্র সুর, arabesque, grotesque, eclectic আর্ট হবে। তবে এ সবেও কল্পনার ধর্ম্ম বজায় রাখা চাই—গাঁজা, গুলি, ভাঙ্-এর সঙ্গে সুতরাং মেলান চাই।

যদি কল্পনার ধর্ম্ম রক্ষিত হ'ল, যদি অনুমান সব চেয়ে অধিক সংখ্যক অভিজ্ঞতাকে বরণ কোরতে পারলে, তা হ'লে কল্পনা ও অনুমান গৃহীত ও অনুমোদিত হল। তখন আগেকার পন্থাগুলি ঐতিহ্যে পরিণত হল। একবার যা তা কোরে কল্পনা ও অনুমানকে ঐতিহ্যে পর্য্যবসিত কোরতে পারলে সেই গোড়ার দ্বন্দ্ব ঘুচে গেল। সত্য গৃহীত হ'লেই মানুষ নিশ্চিন্ত হ'য়ে কাজ কোরতে পারে, কেন না তখন আর অ-সুবিধা, ন্যায্য-অন্যায্যর কথা থাকে না। এই প্রকার মানসিক দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি অনেকটা কাজীর বিচার, কিম্বা প্যাক্টের মতন। বীরবলের ভাষায় শেষে প্যাক্টই হ'য়ে যায় ফ্যাক্ট, গোড়ার সেই ট্যাক্টের কথা সকলেই ভুলে যায়—কেন না গোলমেলে জিনিষ ভুলে যাওয়াই বুদ্ধির ধর্ম্ম। মানুষ নিজের সৃষ্ট ফ্যাক্টকে ধূপ ধুনা দিয়ে অর্চ্চনা করে, পেঙ্গুইন দ্বীপের Saint Arber-osia-র ছাইএর মতন। তখন প্যাক্ট ও ফ্যাকটটি বেমালুম আদর্শে রূপান্তরিত হ'য়ে গিয়েছে। যে সেই আদর্শকে গ্রহণ কোরলে না সেই পাজী, অ-সাহিত্যিক; যে কোরলে সেই প্রকৃত ভক্ত, রসিক, সাহিত্যিক ইত্যাদি। অর্থাৎ ডাঃ নরেশ সেনগুপ্তের মতে শ্রীমতী অনুরূপা দেবী ভ্রান্ত এবং শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর মতে ডাঃ নরেশচন্দ্র থেকে বুদ্ধদেব সকলেই ভ্রান্ত—পাষণ্ড (heretic)। কিন্তু দুজনেই গোঁড়া; একজন কাল্পনিক সত্যকে যথার্থ সত্য বোলে ধ'রে নিয়েছেন, অন্যজন আনুমানিক সত্যকে সার্থক সত্য বোলে ধ'রে নিয়েছেন। সেই জন্য দুজনের কারুর মনে কোন প্রকার সন্দেহ নেই—দুজনেরই মনে শান্তি বিরাজ কোরছে। দুজনেই আত্মতৃপ্ত। তা না হ'লে মতগুলি অত জোরের সঙ্গে কেউ বোলতে পারে!

এক পারেন আর্টিষ্ট। জন কয়েক এমন লোকের সঙ্গলাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছে যাঁদের কার্য্যকলাপ

লক্ষ্য কোরে আমি পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে এসেছি। একমাত্র আর্টিষ্টই মন ও বুদ্ধির সঙ্গে প্রকৃতির আদিম দ্বন্দ্বের সমাধান কোরতে পারেন। আর্টিষ্ট কাল্পনিক সত্যের সুবিধা ও আনুমানিক সত্যের প্রয়োজনীয়তা মানেন। তবে তিনি তাদের মধ্যে একটিকেও যথার্থ সত্য বোলে মনে করেন না। তিনি জানেন যে প্রত্যেক মানুষ, কি সাধারণ কি বৈজ্ঞানিক, ফাঁকি খোঁজে এবং শেষে ফাঁকিতে পড়ে। তিনি জানেন যে তাঁকে সত্যবাদী হ'তেই হবে। সেই জন্য সুবিধা যে সুবিধা ছাড়া অন্য কিছু নয়, অনুমানের প্রয়োজন যে যাথার্থ্য নয়—শুধু মনের মিথ্যাবাদ, এ কথা তিনি ভাল রকমই জানেন। রস-সৃষ্টির আসরে মিথ্যার স্থান নেই—প্রজার মতন মিথ্যা, দরবারের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। মিথ্যা যেকালে বুদ্ধির সৃষ্টি, এবং আর্টিষ্ট যেকালে বোকা মানুষ নন্ অথচ ব্যবহারিক ও মনোময় জগতের দ্বন্দ্ব থেকে নিষ্কৃতি পেতে ব্যাকুল, তখন এই ব্যবহার-দুষ্টমন ছাড়া তাঁর অন্য একটি সম্বন্ধ, অ-ব্যবহারিক, অসম্পর্কিত মনের চর্চ্চা করা স্বাভাবিক। এই প্রকার মন (লোকে এই মনকে আত্মা বলে, শুনেছি ও পড়েছি) হয়ত ব্রহ্মজ্ঞানীর আছে, কিন্তু আর্টিষ্টের আছে নিশ্চয় জানি—কেন না দেখেছি। যাঁদের এই প্রকার মন আছে তাঁরা কল্পনা, অনুমানের এবং অনুমোদনের বাইরে সত্যের আভাস পেয়েছেন। তাঁরা মিথ্যার ধার ধারেন না, আদর্শ-বাদ ও বস্তুতন্ত্র-বাদ তাঁদের কাছে মিথ্যাবাদের কাব্য ও গদ্য-সংস্করণ মাত্র। শরৎ বাবুর লেখা অনেক হিন্দু ও ব্রাহ্ম রুচিবাগীশ পছন্দ করেন না—কেন না তাঁর লেখায় বাস্তবের পূতিগন্ধ বর্ত্তমান, কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় যে হিন্দু-সমাজের উত্তমাজ অর্থাৎ ব্রাহ্ম-সমাজ যে উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে সাধারণের মধ্যে স্ত্রী জাতির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি প্রচার-কার্য্যে ব্যগ্র, সেই উচ্চ আদর্শই শরৎ বাবুর প্রতি নভেলে, প্রতি পতিতা রমণীর বর্ণনায় ফুটে উঠেছে। 'ঘরে ঘরে, পথে ঘাটে মা বোন' যিনি দেখেন—তাঁর আদর্শহীনতা সম্বন্ধে কোন শুচিবাইগ্রস্ত পুরুষ কি রমণীই সন্দিহান হ'তে পারেন না। রবি বাবুর মতন বস্তু-তান্ত্রিকও দুর্ল্লভ—ঘরে বাইরের মেজ জায়ের মতন প্রকৃত ছবি কেউ এঁকেছেন কিনা জানি না, প্রেমের নীচতা এবং নিষ্ফলতা সন্দীপ ও বিনোদিনী অপেক্ষা সাহিত্যে অন্য কোন চরিত্রে পরিস্ফুট হয়েছে কি না জানি না। তাঁর পোষ্ট মাষ্টার ও বোষ্টমীর চিত্র নব্যতন্ত্রের সাহিত্যিক আঁকতে পারলে নিজেরাই যে ধন্য বিবেচনা কোরতেন সে বুদ্ধি হয়ত তাঁদের নিজেদেরই আছে। শরৎচন্দ্র পতিতাও এঁকেছেন, অন্য চরিত্রও এঁকেছেন, রবিবাবু বড় ঘরের কথাও লিখেছেন আবার অন্য চরিত্রও এঁকেছেন। দুজনেরই সূক্ষ্মদৃষ্টি আছে, দূরদৃষ্টি আছে—কারণ তাঁদের দৃষ্টিশক্তি আছে আর যা সত্য দেখেছেন, ভেবেছেন, বুঝেছেন, সবই চমৎকার ভাবে প্রকাশ কোরতে পেরেছেন। তাঁদের শক্তি আছে তাই তাঁদের সব অভিজ্ঞতাই সত্য—এমন কি খুঁটি নাটি-টি পর্য্যন্ত, অজানার আভাসটি পর্য্যন্ত। বৈজ্ঞানিকের মতন আর্টিষ্ট অভিজ্ঞতাকে বিচ্ছিন্ন কোরে, টুকরো কোরে ব্যবসা চালান না—আর্টিষ্টের কাজ তাঁর সমগ্র ব্যক্তিত্বের অর্জ্জিত সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা নিয়ে। তাঁদের এক পা স্বর্গে, অন্য পা মর্ত্ত্যে। এক পদ মর্ত্ত্যে রাখলে সাধারণ মানুষের অন্য পদটিকেও মর্ত্ত্যে রাখতে হয়, কিন্তু যাঁরা নটরাজের নৃত্যের তালে তালে ছন্দ রাখতে পারেন, তাঁদের পক্ষে এ প্রকার অদ্ভুত কুস্তী অসম্ভব নয়। আর্টিষ্ট সাধারণ মানুষও নন, বৈজ্ঞানিকও নন, সেই জন্য আদর্শবাদ ও বস্তু-তন্ত্রবাদের সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব হোমিওপ্যাথী ও এলোপ্যাথী সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনোভাবেরই মতন।

ভানুসিংহের পত্রাবলী

৩৩

শান্তিনিকেতন

তোমার চিঠিতে যে-রকম ঠাণ্ডা এবং মেঘলা দিনের বর্ণনা করেচ তাতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে তুমি তোমার ভানুদাদার এলাকার অনেক তফাতে চ'লে গেছ। বেশি না হোক, অন্তত দু-তিন ডিগ্রির মতোও ঠাণ্ডা যদি ডাক-যোগে এখানে পাঠাতে পার তাহলে তোমাদেরও আরাম, আমাদেরও আরাম। বেয়ারিং পোষ্টে পাঠালেও আপত্তি করব না; এমন কি, ভ্যালুপেবলেও রাজি আছে। আসল কথা, কদিন থেকে এখানে রীতিমত খোট্টাই ফেশানের গরম পড়েচে। সমস্ত আকাশটা যেন তৃষ্ণার্ত্ত কুকুরের মত জিব বের ক'রে হাঃ হাঃ ক'রে হাঁপাচ্চে। আর এই যে দুপুরবেলাকার হাওয়া, এ-যে কি-রকম সে তোমাকে বেশি বোঝাতে হবে না—এই বল্‌লেই বুঝবে যে, এ প্রায় বেনারসি হাওয়া, আগুনের লক্‌লকে জরির সুতো দিয়ে আগাগোড়া ঠাস বুননি; দিক-লক্ষ্মীরা পরেচেন, তাঁরা দেবতার মেয়ে ব'সেই সইতে পারেন, কিন্তু ওর আঁচলা যখন মাঝে মাঝে উড়ে আমাদের গায়ে এসে পড়ে তখন নিজেকে মর্ত্ত্যের ছেলে ব'লেই খুব বুঝ্‌তে পারি। আমি কিন্তু আমার ঐ আকাশের ভানুদাদার দূতগুলিকে ভয় করিনে; এই দুপুরে দেখবে ঘরে ঘরে দুয়ার বন্ধ, কিন্তু আমার ঘরের সব দরজা জানলা খোলা। তপ্ত হাওয়া হু হু ক'রে ঘরে ঢুকে আমাকে আগাগোড়া ঘ্রাণ ক'রে যাচ্চে,—এমনি তার ঘ্রাণ যে, ঘ্রাণেন অর্দ্ধভোজনং। গরমের ঝাঁঝে আকাশ ঝাপ্‌সা হ'য়ে আছে—কেমন যেন ঘোলা নীল—ঠিক যেন মূর্চ্ছিত মানুষের ঘোলা চোখ্‌টার মত। সকলেই থেকে থেকে ব'লে ব'লে উঠ্‌চে, "উঃ, আঃ, কি গরম!" আমি তাতে আপত্তি ক'রে বল্‌চি, গরম তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার সঙ্গে আবার ওই তোমার উঃ আঃ জুড়ে দিচ্চ কেন? যাই হোক, আকাশের এই প্রতাপ আমি এক রকম ক'রে সইতে পারি কিন্তু মর্ত্ত্যের প্রতাপ আর সহ্য হয় না। তোমরা ত পাঞ্জাবে আছ, পাঞ্জাবের দুঃখের খবর বোধ হয় পাও। এই দুঃখের তাপ আমার বুকের পাঁজর পুড়িয়ে দিলে। ভারতবর্ষে অনেক পাপ জমেছিল তাই অনেক মার খেতে হচ্চে। মানুষের অপমান ভারতবর্ষে অভ্রভেদী হ'য়ে উঠেচে। তাই কতশত বৎসর ধ'রে মানুষের কাছ থেকে ভারতবর্ষ এত অপমান সইচে, কিন্তু আজও শিক্ষা শেষ হয় নি। ইতি, ৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬।

৩৪

কলিকাতা

মাঝে তোমার একটা চিঠির জবাব দিতে পারিনি, কলকাতায় এসেচি। কেন এসেচি হয়ত খবরের কাগজ থেকে ইতিমধ্যে কতকটা জান্‌তে পার্‌বে। তবু একটু খোলসা ক'রে বলি। তোমার লেফাফায় তুমি যখন আমার ঠিকানা লেখ আমি ভাবলুম ঐ পদবীটা তোমার পছন্দ নয়। তাই কলকাতায় এসে বড়লাটকে চিঠি লিখেচি আমার ঐ ছার পদবীটা ফিরিয়ে নিতে। কিন্তু চিঠিতে আসল কারণটা দিইনি—তোমার নামের একটুও উল্লেখ করিনি। বানিয়ে বানিয়ে অন্য নানা কথা লিখেচি। আমি বলেচি বুকের মধ্যে অনেক ব্যথা জ'মে উঠেছিল, তারই ভার আমার পক্ষে অসহ্য হ'য়ে উঠেচে—সেই ভারের উপরে আমার ঐ

উপাধির ভার আর বহন ক'রতে পারচি নে তাই ওটা মাথার উপর থেকে নামিয়ে দেবার চেষ্টা করচি। যাক, এ সব কথা আর বলতে ইচ্ছা করে না—আবার অন্য কথাও ভাবতে পারিনে। ১লা জুন, ১৯১৯।

৩৫

শান্তিনিকেতন

কাল ছিলুম কলকাতায় আজ বোলপুরে। এসে দেখি তোমার একখানি চিঠি আমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছে। আর দেখি আকাশে ঘন ঘোর মেঘ,—বর্ষার আয়োজন সমস্তই রয়েচে কেবল আমি আসিনি ব'লেই বৃষ্টি আরম্ভ হয়নি। বর্ষার মেঘের ইচ্ছা ছিল আমাকে তার কাজরী গান শুনিয়ে দেবে তারপরে আমিও তাকে আমার গানে জবাব দেব। তাই এতক্ষণ পরে আমি দুপুর বেলায় যখন খেয়ে এসে বসলুম তখন বৃষ্টি সুরু ক'রে দিয়েচে এক মাঠ থেকে আর এক মাঠে। আর তার কলসঙ্গীতে আকাশে কোথাও যেন ফাঁক রইল না। নব বর্ষার জল-স্থলের আনন্দ-উৎসব যদি দেখতে চাও তাহলে এস আমাদের মাঠের ধারে, বস এই জানলাটিতে চুপ ক'রে। পাহাড়ে বর্ষার চেহারা স্পষ্ট দেখবার জো নেই, সেখানে পাহাড়েতে মেঘেতে ঘেঁষাঘেঁষি মেশামেশি একাকার কাণ্ড। সমস্ত আকাশটা বুজে যায়; সৃষ্টিটা যেন সর্দ্দিতে কাশীতে জবুথবু হ'য়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে প'ড়ে থাকে। পাহাড় আমার কেন ভাল লাগেনা বলি,—সেখানে গেলে মনে হয় আকাশটাকে যেন আড়-কোলা ক'রে ধ'রে একদল পাহারাওয়ালার হাতে জিম্মা ক'রে দেওয়া হয়েচে, সে একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। আমরা মর্ত্ত্যবাসী মানুষ—সীমাহীন আকাশে আমরা মুক্তির রূপটা দেখতে পাই—সেই আকাশটাকেই যদি তোমার হিমালয় পাহাড় একপাল মহিষের মতো শিং গুঁতিয়ে মারতে চায় তাহ'লে সেটা আমি সইতে পারি নে। আমি খোলা আকাশের ভক্ত,—সেই জন্যে বাংলা দেশের বড় বড় বিল-দরাজ নদীর ধারে অবারিত আকাশকে ওস্তাদ মেনে তার কাছে আমার গানের গলা সেধে এসেচি, এই কারণেই দূর হ'তে তোমাদের সোলন পর্ব্বতকে নমস্কার করি। যা হোক বর্ষা বিদায় হবার পূর্ব্বেই তোমরা আমার প্রান্তরে আতিথ্য নেবে শুনে আমি খুসি হয়েচি। তোমাদের জন্যে কিছু গান সংগ্রহ ক'রে রাখব,—আর পাকা জাম, আর কেয়াফুল, আর পদ্মবন থেকে শ্বেতপদ্ম, আর যদি পারি গোটা কতক আষাঢ়ে গল্প। অতএব খুব বেশি দেরি কোরো না, পর্ব্বত থেকে ঝরণা যেমন নেমে আসে তেমনি দ্রুত পদে নেমে এসো। ইতি আষাঢ়স্য তৃতীয় দিবসে ১৩২৬।

৩৬

শান্তিনিকেতন

তোমার আজকের চিঠি পেয়ে বড় লজ্জা পেলুম। কেন বলব? এর আগে তোমার একখানি চিঠি পেয়েছিলুম—তার জবাব দেব দেব করচি এমন সময় তোমার এই চিঠি, আজ তোমার কাছে আমার হার মানতে হ'ল। আমি এত বড় লেখক, বড় বড় পাঁচ ভলুম কাব্যগ্রন্থ লিখেচি,—এহেন যে আমি—যার উপাধিসমেত নাম হওয়া উচিত শ্রীরবীন্দ্রনাথ শর্ম্মা রচনালবণাম্বুধি, কিম্বা সাহিত্য-অজগর, কিম্বা বাগক্ষৌহিণীনায়ক, কিম্বা রচনা-মহামহোপদ্রব, কিম্বা কাব্য-কলাকল্পদ্রুম, কিম্বা—ফস্ ক'রে এখন মনে পড়চে না পরে ভেবে বলব—একরত্তি মেয়ে, "সাতাশ" বছর বয়স লাভ করতে যাকে অন্ততঃ পঁয়ত্রিশ বছর সাধনা করতে হবে, তারই কাছে পরাভব—Two goals to nil! তারপরে আবার তুমি যে-সব বিপজ্জনক ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখচ আমার এই ডেস্কে ব'সে তার সঙ্গে পাল্লা দিই কি ক'রে? আজ সকালে তাই ভাবছিলুম, পারুলবনের সামনে দিয়ে যে রেলের রাস্তা আছে সেখানে গিয়ে রাত্রে দাঁড়িয়ে থাকব—তারপরে বুকের উপর দিয়ে প্যাসেঞ্জার ট্রেনটা চ'লে গেলে পর যদি তখনো হাত চলে তাহ'লে সেই মুহূর্ত্তে সেইখানে ব'সে তোমাকে যদি চিঠি লিখতে পারি তবে তোমাকে টেক্কা দিতে পারব। এ সম্বন্ধে এখনো বউমার সঙ্গে পরামর্শ করিনি, এণ্ড্রুজ সাহেবকেও জানাইনি। আমার কেমন মনে মনে সন্দেহ হচ্চে ওঁরা হয়ত কেউ সম্মতি দেবেন না,

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তা ছাড়া আমার নিজের মনেও একটা কেমন খোঁকা লাগচে; মনে হচ্চে যদি গাড়িটার চাপে বুড়ো আঙুলটা কিছু জখম করে তাহ'লে হয়ত লেখা ঘ'টেই উঠ্‌বে না। আর যদি না ঘটে তাহ'লে অনন্তকালের মতো ঐ দুখানা চিঠির জিৎ তোমার র'য়েই যাবে, অতএব থাক্!

অল্পদিনের মধ্যে আমাদের এখানে ভয়ঙ্কর ব্যাপার একটাও ঘটেনি। ঝড়বৃষ্টি অল্প স্বল্প হয়েচে কিন্তু তাতে আমাদের বাড়ির ছাদ ভাঙেনি, আমাদের কারো মাথায় যে সামান্য একটা বজ্র পড়বে তাও পড়ল না। বন্দুক নিয়ে, ছোরাছুরি নিয়ে দেশের নানা জায়গায় ডাকাতি হচ্চে; কিন্তু আমাদের অদৃষ্ট এমনি মন্দ যে আজ পর্য্যন্ত অবজ্ঞা ক'রে আমাদের আশ্রমে তারা কিম্বা তাদের দূর সম্পর্কের কেউ পদার্পণ করলে না। না, না, ভুল বলচি। একটা রোমহর্ষণ ঘটনা অল্পদিন হ'ল ঘটেচে। সেটা বলি। আমাদের আশ্রমের সামনে দিয়ে নির্জ্জন প্রান্তরের প্রান্ত বেয়ে একটি দীর্ঘ পথ বোলপুর ষ্টেশন পর্য্যন্ত চ'লে গেছে। সেই পথের পশ্চিমে একটি দোতলা ইমারত। সেই ইমারতের একতলায় একটি বঙ্গ-রমণী একাকিনী বাস করেন। সঙ্গে কেবল কয়েকটি দাসদাসী বেহারা গোয়ালা পাচকব্রাহ্মণ, এবং উপরের তলায় এণ্ড্রুজ্‌ সাহেব নামক একটি ইংরেজ থাকেন। সমস্ত বাড়িটাতে এ ছাড়া আর জনপ্রাণী নেই। সেদিন মেঘাচ্ছন্ন রাত্রি, মেঘের আড়াল থেকে চন্দ্র ম্লান কিরণ বিকীর্ণ করচেন। এমন সময় রাত্রি যখন সাড়ে এগারোটা, যখন কেবলমাত্র দশবারো জন লোক নিয়ে একাকিনী রমণী বিশ্রাম করচেন, এমন সময়ে ঘরের মধ্যে কে ঐ পুরুষ প্রবেশ করলে? কোন্ অপরিচিত যুবক? কোথায় ওর বাড়ি, কি ওর অভিসন্ধি? হঠাৎ সেই নিস্তব্ধ নিদ্রিত ঘরের নিঃশব্দতা সচকিত ক'রে তুলে সে জিজ্ঞাসা করলে, "ইস্কুল কোথায়?" অকস্মাৎ জাগরণে উক্ত রমণীর ঘন ঘন হৃৎ-কম্প হ'তে লাগল; রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বল্‌লেন, "ইস্কুল ঐ পশ্চিম দিকে।" তখন যুবক জিজ্ঞাসা করলে, "হেড্‌ মাষ্টারের ঘর কোথায়?" রমণী বল্‌লেন, "জানি নে।"

তারপরে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। ঐ যুবক সেই ম্লান জ্যোৎস্নালোকে সেই ঝিল্লিমুখরিত মধ্যরাত্রে আবার আশ্রমের কঙ্কর-বিকীর্ণ পথে আশ্রম কুক্কুরবৃন্দের তারতিরস্কার শব্দ উপেক্ষা ক'রে দ্বিতীয় একটি নিঃসহায়া অবলার গৃহের মধ্যে প্রবেশ করলে। সেই ঘরে তৎকালে উক্ত রমণীর পূর্ণবয়স্ক একটি স্বামীমাত্র ছিল, আর জনপ্রাণীও না। সেখানেও পূর্ব্ববৎ সেই দুটি মাত্র প্রশ্ন। সেই প্রশ্নের শব্দে স্তিমিত-দীপালোকিত সেই নির্জ্জনপ্রায় কক্ষটি আতঙ্কে নিস্তব্ধ হ'য়ে রইল। লোকটা বহুদূর দেশ থেকে হেড্‌-মাষ্টারকে খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে কেন এখানে এল? তার সঙ্গে কিসের শত্রুতা? সেই রাত্রে স্বামী সনাথা ঐ একটি রমণী, এবং স্বামীদূরগতা অন্য অবলা না জানি তাদের সরল কোমল হৃদয়ে কি আশঙ্কা বহন ক'রে ঘুমিয়ে পড়ল! পরদিন প্রভাতে হেডমাষ্টারের মাষ্টার বাদ দিয়ে বাকি ছিন্ন অংশ কি কোথাও পাওয়া যাবে তাঁরা আশঙ্কা করেছিলেন?

তারপরে তৃতীয় পরিচ্ছেদ। পরদিন প্রথমা নারীটি আমাকে বল্‌লেন, "তাত, কাল মধ্যরাত্রে একটি যুবক ইত্যাদি।" শুনে আমার পাঠিকা বিস্মিতা হবেন না যে, আমি আশ্রম ছেড়ে পালাই নি; এমন কি, আমি তরবারিও কোষোন্মুক্ত করলুম না। করবার ইচ্ছে থাক্‌লেও তরবারি ছিল না, থাক্‌বার মধ্যে একটা কাগজ-কাটা ছুরি ছিল। সঙ্গে কোনো পদাতিক বা অশ্বারোহী না নিয়েই আমি সন্ধান করতে বেরলুম, কোন্ অপরিচিত যুবা কাল নিশীথে "হেডমাষ্টার কোথায়" ব'লে অবলা রমণীর নিদ্রা ভঙ্গ করেচে?

তার পরে উপসংহার। যুবককে দেখা গেল, তাকে প্রশ্ন করা গেল। উত্তরে জানা গেল এখানে তার কোনো একটি আত্মীয়-বালককে সে ভর্ত্তি ক'রে দিতে চায়। ইতি সমাপ্ত। ২৭ আষাঢ় ১৩২৭।

আপদ বিদায়

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

প্রথম দৃশ্য

[জীর্ণ-মলিন পোষাক পরা রতনরাম শ্রেষ্ঠী বীণকার তার কুটীরের দাওয়ায় ব'সে আপন মনে বীণ বাজিয়ে গান গাইচেন, আর তাঁর স্ত্রী সামনে দাওয়ার এক কোনে ব'সে রাঁধচেন বাড়চেন।]

বীণকারের গান

দুয়ার মোর পথ পাশে
সদাই তারে খুলে রাখি।
কখন তার রথ আসে
ব্যাকুল হ'য়ে জাগে আঁখি।
শ্রাবণে শুনি দূর মেঘে
লাগায় গুরু গরগর,
ফাগুনে শুনি বায়ু বেগে
জাগায় মৃদু মর মর ;
আমার বুকে ওঠে জেগে
চমক লাগে থাকি থাকি
কখন তার রথ আসে
ব্যাকুল হ'য়ে জাগে আঁখি।
সবাই দেখি যায় চ'লে
পিছন পানে নাহি চেয়ে,
উতল রোলে কল্লোলে
পথের গান গেয়ে গেয়ে।
শরৎ মেঘ যায় ভেসে
উধাও হয়ে কত দূরে
যেথায় সব পথ মেশে
গোপন কোন সুরপুরে,
স্বপনে ওড়ে কোন্ দেশে
উদাস মোর মন-পাখী।

গৃহিণী

থাম, থাম, ঘরে ব'সে গান গেয়ে আর বীণ বাজিয়ে ত পেট ভরবে না।

রতন

কি করি বল, পেট ত ভরবে না জানি, কিন্তু—

গৃহিণী

কিন্তু-টিন্তু বুঝিনে, অমন গলা অমন বীণ নিয়েও তোমার রোজগার হয় না এ রাজ্যে? আমি তা বিশ্বাস করিনে।

রতন

অল্প বয়েসে দেশ ছাড়া হ'য়ে এই পরদেশে এলুম, ভাবলুম, দুপয়সা রোজগার হবে, তার ত কোনোই রাস্তা দেখ্‌চি নে।

গৃহিণী

কেন? রাস্তা খুঁজলেই পাওয়া যায়। রাজবাড়ীতে কখন যাওয়া হয়েচে কি?

রতন

আরে পাগ্‌লী, রাজবাড়ীতে কি আর ছুট্ করলেই যাওয়া যায়, না হুকুম পেলে?

গৃহিণী

তা আমি জানিনে। তবে তুমি যদি মনে কর ত সবাই যেমন হুকুম পাচ্চে তেম্‌নি তুমিও যাবার হুকুম পেতে পার।

রতন

আরে পাগ্‌লী তা হয় না।

গৃহিণী

আচ্ছা বেশ, তাহ'লে স্বরূপ সদাগরের বারোয়ারীর মজ্‌লিসে বীণ বাজিয়ে গান গেয়ে রোজগার করেছিলে কি ক'রে?

রতন

আরে সে ত আমার নিমাই সেটা পাইয়ে দিয়েছিল।

আপদ বিদায়

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

গৃহিণী

দেখ বাপু, স্বরূপ সদাগরের দরুণ পুঁজিও আজ শেষ হ'ল, এখন কিন্তু—

রতন

তা আর ভাবনা নেই; আমি এবার দরবারে যাবার চেষ্টা করব।

গৃহিণী

তা বেশ, কিন্তু তাই ব'লে শুধু ব'সে ব'সে চেষ্টা করলে হবে না—যে কুঁড়ে মনিষ্যি তুমি!

রতন

তা সত্যি, একটু কুঁড়ে আছি বটে

[মুচকি হাস্য ও গান]

মোরা চল্‌ব না
মুকুল ঝরে ঝরুক, মোরা ফলব না!
সূর্য্য তারা আগুন ভুগে
জ্ব'লে মরুক্ যুগে যুগে,
আমরা যতই পাইনা জালা
জ্বল্‌ব না!
বনের শাখা কথা বলে,
কথা জাগে সাগর জলে,
এই ভুবনে আমরা কিছুই
বল্‌ব না!
কোথা হ'তে লাগেরে টান
জীবন জলে ডাকে রে বান,
আমরা ত এই প্রাণের টলায়
টল্‌ব না!

গৃহিণী

(সক্রোধে) হ্যাঁ রাখ তোমার রঙ্গরস এখন, পেটে নেই অন্ন, রঙ্গ করতে লজ্জা নেই—আদিখ্যেতা হচ্ছে!

[এমন সময় নানান বাদ্যযন্ত্র হাতে পিড়িং পিড়িং শব্দ করতে করতে রতনের একদল শিষ্যের আবির্ভাব। তাদের বয়স ছোট বড় মাঝারী সব রকমের। তাদের আসতে দেখে ঘোমটা টেনে গৃহিণীর অন্তঃপুরে প্রস্থান]

শিষ্য-বৃন্দ

গুরুজী নমস্তে!

রতন

(সাগ্রহে) এই যে, এস এস, তোমরা এস। আমি তাই ভাব্‌ছিলুম আজ এত দেরী কেন তোমাদের!

১ম শিষ্য

দেরী হ'ল, আজ বসন্ত পঞ্চমীর উৎসব ছিল, যুবরাজ আমাদের নিয়ে উৎসব কর্‌ছিলেন তাঁর মনোহরণ বাগে।

২য় শিষ্য

সেখানে গুরুজী, কেবল ছোট ছেলেদের আর গাইয়ে বাজিয়েদের মেলা; অন্য লোকের প্রবেশ নিষেধ।

রতন

কেন? গাইয়ে বাজিয়েরাও কি ছোট ছেলেদের সামিল নাকি?

৩য় শিষ্য

হ্যাঁ, তাঁর মতে ছোট ছেলেদের আনন্দে একমাত্র তারাই যোগ দিতে পারে, তাই তাদের তিনি উৎসবে যেতে বাধা দেন না।

রতন

যুবরাজকে নজর দিয়ে দেখা করতে পারি কি?

২য় শিষ্য

না, রাজা রাজপুত্রকে এই উৎসব ছাড়া আর কখন কোনো লোকের কাছে বেরুতে দেন না।

৩য় শিষ্য

রাইগড় কেল্লার সংলগ্ন প্রাসাদে তাঁকে আটকে রেখে দিয়েছেন।

৪র্থ শিষ্য

তাই তুলসী, আমাদের বেলা হ'য়ে যাচ্ছে সেই বিশ্বকবির মিশ্র তেতালা গানটা একবার গুরুজীর কাছে আজ সেখে নিলে হয় না?

রতন

আমার মত অধমকে নিয়ে রাজা কি করবেন ?

রাজপুরুষ

কি করবেন জানিনা, রাজার ডাক নয় শমন, বুঝ্‌লে কি না ?

[ব'লেই রাজপুরুষ জামার ভিতর থেকে একটা পরওয়ানা বার ক'রে দেখালে।]

গৃহিণী (নেপথ্যে)

যাওনা। রাজদরবারের হুকুম এল, আর তার অমান্ত করা হচ্চে ?

রতন

অমান্ত নয়, আমি এতই ক্ষুদ্র যে রাজদরবারের মত বড় জায়গায় যাবার অযোগ্য !

গৃহিণী

এদিকে পেট চলে কি করে ?

রতন

(রাজপুরুষের প্রতি) আজ্ঞা হাঁ যাব,—তা কখন যেতে হবে ?

রাজপুরুষ

ঠিক যে সময় রাজবাড়ীর রাধাবল্লবজীর মন্দিরের আরতির ঘণ্টা শেষ হবে তখন।

রতন

তা বেশ, নমস্কার !

[রাজপুরুষের প্রস্থান এবং বীণকারের বীণ বাদন। এমন সময় অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ এক রাজকর্ম্মচারীর আবির্ভাব]

প্রবীণ

মশাই ঘরে আছেন ?

রতন

আপনি কাকে চান ?

প্রবীণ

বীণকার রতনরাজ শ্রেষ্ঠীকে। মশাই বাড়ী আছেন ?

রতন

আসতে আজ্ঞা হোক্।

প্রবীণ

নমস্কার মশাই, আমার একটি প্রস্তাব আছে।

রতন

আজ্ঞা করুন।

প্রবীণ

আজ্ঞে আমি সরকারের অবসরপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী, এখন অবকাশটা কাটাবার এক উপায় স্থির করেছি।

রতন

কি বলুন।

প্রবীণ

আজ্ঞে আমার মাথায় একটা ভারি চমৎকার মৎলব এসেচে। তাতে দেশের দশের উপকার হবে আর আপনারও নাম দেশ বিদেশে ছড়িয়ে যাবে।

রতন

কি সেটা ?

প্রবীণ

সেটা এই যে—আপনি যেমন পাড়ার ছেলেদের বিনা-বেতনে বেগার খেটে শেখাচ্চেন, অথচ কেউ জান্‌তেও পারচেনা, আর আপনার পেটও ভরচেনা,—এতে আপনার মোটেই ধৈর্য্যের অপব্যবহার নেই।

রতন

সেটা কি ?

প্রবীণ

না, তাতে আপনারও উপকার আর তার সঙ্গে সঙ্গে দেশেরও কল্যাণ।

রতন

সেটা কিরূপে হবে জানতে পারি কি ?

প্রবীণ

অর্থাৎ আপনার মত গুরুর হাতে জিনিষটা পড়লে বেশ গ'ড়ে ওঠবার সম্ভাবনা, তাই বলচি—

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

রতন

মহাশয়, একটু ভেঙেই বলুন না, কি ব্যাপার ?

প্রবীণ

মহাশয়, এই শহরের এক প্রান্তে একটি নির্জ্জন কুটীরের কোনে ব’সে কুনো হ’য়ে থাকলে কি চলে ? আপনার মত গুণীর যাতে প্রচার হয় আমাদের দশের তা দেখা দরকার।

রতন

তা যেন বুঝ্‌লুম, কিন্তু কি ভাবে—

প্রবীণ

অর্থাৎ যদি আপনার হাতে একটা সঙ্গীত বিদ্যালয় খোলার ভার দেওয়া হয় তো তাতে আপনার আপত্তি কি ?

রতন

না, আপত্তি আর কিছু নেই, আমার সামর্থ্যের অভাব।

গৃহিণী (নেপথ্যে)

সামর্থ্য নেই, সামর্থ্য নেই, ঘরের কোনে ব’সে ব’সে পিড়িং পিড়িং করবার খুব সামর্থ্য আছে !

রতন

(প্রবীণের প্রতি) আজ্ঞে হ্যাঁ, তা বলুন, তারপর কি করতে হবে ?

প্রবীণ

(পুঁথিপত্রের তাড়া বার ক’রে) আজ্ঞে আর কিছু না, যদি আমার লেখা এই পুঁথিপত্র গুলো দেখেন ত—

রতন

মশাই, আমি পুঁথি থেকে কোনো বিদ্যে শিখিনি, তাই পুঁথি খুলতেও আমার সাহস নেই।

প্রবীণ

না, আমি এই পঞ্চবটী শিল্পকলারত্নম্ আর পুণ্ডরীক কোকিল-কণ্ঠ-বিজয়ম্, গীত-নীতিসূত্ররত্নম্, সঙ্গীতসারসাগর, দুন্দুভিদন্ত-মোচন সূত্রম্, তালমাত্রাঘাতকরণম্, সুপ্ততাল প্রবুদ্ধশাস্ত্রম্, এমনি ক’খানা বই থেকে সারসংগ্রহ ক’রে যা যা লিখেচি তাই আপনার মত গুণী ব্যক্তির কাছে নিবেদন করতে এসেচি।

রতন

না-না থাক্, এসব শাস্ত্রগুলো বরঞ্চ আপনার সঙ্গীত বিদ্যালয়ের কাজে লাগাবেন, আপাততঃ আপনার আর কি বক্তব্য—

প্রবীণ

না, বক্তব্য আর কিছু নয়, গৌড়ীয় রাজনীতি হিসাবে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠানের পূর্ব্বে রাজ সম্মতি নেবার বিধি আছে।

রতন

বেশ, তারপর—

প্রবীণ

তারপর বিদ্যালয়টিকে পাকা করতে হ’লে সেটির একটি দলিল তৈরী ক’রে চুক্তি-বদ্ধ ক’রে রাজ-মোহর দিয়ে কায়েমী সত্ব করতে হয়।

রতন

আচ্ছা, কিন্তু তাতে আমায় আর কেন ? আমায় আপনি আর—

প্রবীণ

তা বেশ, তবে আজ আসি। আবার আপনার অবকাশ মত একবার দর্শন করতে আসব।

রতন

যে আজ্ঞে।

[অবসরপ্রাপ্ত রাজকর্ম্মচারীর প্রস্থান ও গৃহিণীর আবির্ভাব]

গৃহিণী

এই দেখ, সাধে তোমায় বলি ডোকলা ? ওদিকে রাজবাড়ী থেকে তলব পড়েচে, এদিকে সঙ্গীত বিদ্যালয় খোলবার কথা হচ্চে, আর তুমি হাত পা গুটিয়ে নিশ্চিন্ত হ’য়ে বসে আছ ?

রতন

আরে জানইত লক্ষ্মী সরস্বতীর বিবাদ আছে, তা আমি আর কি করব বল ?

গৃহিণী

কি করব কেন? এমন সুযোগগুলোও কি মানুষে পায়ে ঠেলে?

রতন

আচ্ছা বেশ আমি আজই যাব, কিন্তু—

গৃহিণী

আবার কিন্তু কি?

রতন

আমি রাজদরবারে জীবনে কখনও দেখিনি, তাই—

গৃহিণী

তাতে কি হয়েচে?

রতন

না, বলচি কি,—কি পোষাকে যাব? আমার সবই ত জীর্ণ মলিন হ'য়ে রয়েচে। তাছাড়া আমরা হলুম বিদেশী, গৌড়ীয় রাজদরবারের তো—

গৃহিণী

হাঁ, তা বটে, কিন্তু কি করবে বল?

রতন

কিছুই না, যা আমার আছে তাই আমার মঙ্গল! এই পোষাকেই রাজসমীপে যাব।

গৃহিণী

ভাল কথা, তুমি যেমন ভুলোমন, সঙ্গে কিছু দর্শনী রাজার জন্যে নিয়ে যেতে ভুলো না যেন।

রতন

আচ্ছা।

গান

সবাই যারে সব দিতেছে
তার কাছে সব দিয়ে ফেলি,
কবার আগে চাবার আগে
আপনি আমায় দেব মেলি।
নেবার বেলা হলেম ঋণী
ভিড় করেছি জন করিনি,
এখনও ভয় করবনারে
দেবার খেলা এবার খেলি।
প্রভাত তারি সোনা নিয়ে
বেরিয়ে পড়ে নেচে কঁদে,
সন্ধ্যা তারে প্রণাম ক'রে
সব সোনা তার দেয় রে শুধে।
ফোটা ফুলের আনন্দ রে
ঝরা ফুলেই ফলে ধরে
আপনাকে ভাই ফুরিয়ে দেওয়া
চুকিয়ে দে তুই বেলাবেলি॥

গৃহিণী

গান থামাও,—ওদিকে যে রাজবাড়ীর আরতির ঘণ্টা সুরু হ'য়ে গেছে?

রতন

আচ্ছা, এই যে তৈরী হ'য়ে নিচ্চি।

[জীর্ণ রঙিন পাগড়ী বাঁধার উদ্যোগ]

যবনিকা

তৃতীয় দৃশ্য

[বীণ ঘাড়ে নাচতে নাচতে তুড়ি দিতে দিতে বীণকারের রাজসভায় প্রবেশ]

গান

সারানিশি ছিলেম শুয়ে
বিজন ভুঁয়ে;
মেঠো ফুলের পাশাপাশি
শুনেছিলেম তারার বাঁশি।
যখন সকাল বেলা খুঁজে দেখি
স্বপ্নে-শোনা সে সুর একি
মেঠো ফুলের চোখের জলে উঠে ভাসি।
এ সুর আমি খুঁজেছিলেম রাজার ঘরে
শেষে ধরা দিল ধরার ধূলির পরে।
এ যে ঘাসের কোলে আলোর ভাষা
আকাশ থেকে ভেসে আসা
এ যে মাটির কোলে মাণিক-খসা হাসিরাশি।

আপদ বিদায়

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

প্রহরী

(বীণকারের পথ রোধ ক'রে) থাম্ থাম্ বেকুব্ কোথাকার! রাজসভায় রাজ-আজ্ঞা না পেয়ে কি গান গাইতে আছে ?

রতন

কেন ? তিনি ত আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন ?

প্রহরী

আরে কি পাগল! ডেকে পাঠালে কি হয় ? হুজুর আদেশ না করা পর্য্যন্ত ঐ ঐধারে যে দাড়ীওয়ালা শিব ঠাকুরের মত বাবাজিকে-বাবাজি তরকারীকে-তরকারী লোকটি ব'সে আছেন, তাঁর পাশে গিয়ে থির হ'য়ে বস।

রতন

উনি কে ?

প্রহরী

কি আশ্চর্য্য! তুমি ওঁকে জাননা ?

রতন

তা কি ক'রে জানব ? আমি যে বিদেশী!

প্রহরী

তা' তুমি এতকাল এদেশে আছ আর এঁকে জান না ? ইনি হলেন খাওয়াস কাজী সাহেব—ইনি রাজার ডান হাত।

[বীণকার রাজসভার কাছে আসতেই একজন রাজকর্ম্মচারী তার নাম জিজ্ঞাসা ক'রে তার নির্দ্দিষ্ট স্থানে তাকে বসিয়ে দিলে। অন্তঃপুর থেকে রাজা রাজসভায় প্রবেশ ক'রে সিংহাসনে বসতেই চারণগণ সভারম্ভের বন্দনা-গান সুরু করলে।]

জনগণমন অধিনায়ক জয় হে, ভারত ভাগ্যবিধাতা!
পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধি তরঙ্গ,
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশীষ মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণ-মঙ্গল-দায়ক জয় হে, ভারত ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে ॥
পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা, যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী,
তুমি চির সারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি।
দারুণ বিপ্লব মাঝে, তব শঙ্খধ্বনি বাজে,
সঙ্কট-দুঃখ ত্রাতা।
জনগণ পথপরিচায়ক জয় হে, ভারত ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে ॥
রাত্রি প্রভাতিল উদিল রবিচ্ছবি পূর্ব্ব উদয় গিরিভালে
গাহে বিহঙ্গম, পুণ্য সমীরণ নবজীবন রস ঢালে।
তব করুণারুণরাগে　নিদ্রিত ভারত জাগে
তব চরণে নত মাথা।
জয় জয় হে, জয় রাজেশ্বর ভারত ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে ॥

[একে একে রাজসমীপে সভার লোকদের ডাক এবং রাজার নজর কুড়ানোর মূক অভিনয় চলল। সব শেষে পড়ল রতন রাজ বীণকারের ডাক। বীণকার তার গৃহিণীর দেওয়া স্বর্ণনীটি নিয়ে সেই রাজার সিংহাসনের কাছে গিয়ে রাজাকে কুর্ণিশ করেচে আর অমনি সভাস্থদ্ধ লোক "বেয়াদব, ধর ধর ওকে" ব'লে সমস্বরে চীৎকার ক'রে উঠল। রতন থতমত খেয়ে হাত গুটিয়ে বীণটিকে ঘাড়ে তুলে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।]

রাজা

বাঁধ ওকে।

প্রহরী

যে আজ্ঞা (ব'লেই রতনকে গ্রেপ্তার করলে)

রাজা

যাও, একে রাইগড় কেল্লার শেষ সীমানায় সব উঁচু পাঁচিল ঘেরা যে ঘর আছে, তাতে বন্দী ক'রে রাখ।

সভাসদগণ (সমস্বরে)

হুজুর ওর মাথা নেওয়া হোক!

সভাসদ্‌গণ

এঁ্যা, এতবড় আস্পর্দ্ধা মহারাজকে হুবার কুর্ণিশ না ক'রেই নজর দেখায় ?

সভাসদ্‌গণ

ওর উচিত সাজা হোক—

রাজা

না, ও বিদেশী তাই ওকে আমি প্রাণদণ্ড দিলুম না।

সভাসদগণ

আপনার অগাধ দয়া—

সভাসদ্‌গণ

আহা এমন রাজ্য, রামরাজ্য কোথায় লাগে ;

সভাসদ্‌গণ

বড়ই আনন্দে আছি মহারাজ।

সভাসদ্‌গণ

জয় রাজরাজেন্দ্র বিশ্বগৌরব শ্রীশ্রীল শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র প্রতাপজী সসাগরাধরাধিপতি গৌড়েশ্বরের জয়—

[সভাভঙ্গ। সভাসদগণেরা একে একে রাজাকে কুর্ণিশ ক'রে বিদায়]

রাজা

পুলকনাথ, তুমি কি বল ? রাজকুমারকে কি বাইরে—

মন্ত্রী

না মহারাজ, অমন কাজও করবেন না— যে বাইরের হাওয়া আজকাল !

রাজা

হুঁ। শুনচি, ঐ বীণকারটাই নাকি দল পাকিয়ে একটা গানের আখ্‌ড়া করেচে ?

মন্ত্রী

হাঁ হুজুর ! সেই আখড়ারই ছেলেদের এ বৎসর তাঁর বসন্তপঞ্চমীর উৎসবে পেয়ে যুবরাজের চোখে আর ঘুম নেই।

রাজা

কি, বলে কি ? কি চায় ?

মন্ত্রী

যুবরাজ বলেন, আমি ঐ ছেলেদের সঙ্গে বীণকারের বাড়ী যাব।

রাজা

গিয়ে কি করবে ?

মন্ত্রী

গান শিখবেন। তাঁর আর ধনুর্বিদ্যা, বিজ্ঞান, অর্থ-শাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, পড়াশুনা কিছুই ভাল লাগ্‌চে না।

রাজা

তাইত হে, কি করা যায় !

মন্ত্রী

মহারাজ, বীণকারকে আর ছাড়বেন না। তাহ'লেই ওর দল ভেঙ্গে যাবে, আর ততদিনে যুবরাজও সব ভুলে যাবেন।

রাজা

কিন্তু দেখ, ওকে যে কোথায় বন্দী ক'রে রেখেচ যুবরাজ যেন টের না পান।

মন্ত্রী

যে আজ্ঞে, কোটালকেও এ বিষয় সাবধান ক'রে দিচ্চি।

রাজা

তা বেশ !

[নমস্কারান্তে মন্ত্রীর প্রস্থান এবং সভা শূন্য দেখে অন্তঃপুর থেকে যুবরাজের প্রবেশ]

যুবরাজ

রাজন্‌, আমি বীণ শিখব !

রাজা

কোথায় ?

যুবরাজ

সহরতলির নির্জ্জন কুটীরে যে রতনজী বীণকার থাকেন তাঁর কাছে।

রাজা

সে আবার কে ?

যুবরাজ

আমি তাঁর নাম শিবতলার গোঁসাইয়ের ছেলেদের কাছে এবার উৎসবে শুনেচি।

রাজা

কৈ, আমি ত তার নাম কখনও শুনিনি ?

যুবরাজ

তা হোক্‌, আমি তাঁরই কাছে বীণ শিখব।

রাজা

তার জন্যে তাকে কেন ? রাজ্যে বড় বড় তান-সেনের শিষ্যেরা আছে তাদের কাউকে ব'লে দেব—

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

যুবরাজ

না মহারাজ! তা হবে না। আমি ঐ রতনজী শ্রেষ্ঠীর কাছেই গানবাজনা শিখব।

রাজা

আচ্ছা তা বেশ, তাকে আগে ডাকিয়ে দেখি কেমন গাইয়ে বাজিয়ে সে!

যুবরাজ

এবারকার উৎসবে আমি তাঁর শিষ্যের কাছে কটা গান শিখেছি!

রাজা

এঁ্যা, তুমি এই উৎসবের মধ্যেই গান শিখে ফেলেছ?

যুবরাজ

হাঁ, শুনবে?

রাজা

আচ্ছা গাও, কিন্তু দেরী করতে পারবনা। হাজারী-পুর, নহবৎডাঙ্গা, বিমলাগাঁয়ের সব দরখাস্তের তাড়া দেখতে হবে।

যুবরাজ

তা হোক তুমি শোনো।

গান

এই আসা যাওয়া খেয়ার কূলে
আমার বাড়ী,
কেউবা আসে এপারে, কেউ
পারের ঘাটে দেয়রে পাড়ি।
পথিকেরা বাঁশি ভ'রে
যে সুর আনে সঙ্গে ক'রে
তাই যে আমার দিবানিশি
সকল পরাণ লয় রে কাড়ি।
কার কথা যে জানায় তারা
জানিনে তা'
সেথা হ'তে কি নিয়ে বা
যায়রে সেথা।
সুরের সাথে মিশিয়ে বাণী
দুই পারের এই কানাকানি,
তাই শুনে যে উদাস হিয়া
চায়রে যেতে বাসা ছাড়ি।

[যুবরাজের প্রস্থান]

[প্রহরীর প্রবেশ]

প্রহরী

হুজুর! সম্বলপুরের রাজমন্ত্রী এসেচেন হুজুরকে নজর দিতে, আর রাজবার্ত্তা জানাতে।

রাজা

বসাও গিয়ে, আমি আসচি।

প্রহরী

যে আজ্ঞে।

[প্রহরীর প্রস্থান]

রাজা

(স্বগত) তাইত, ছেলেটার জন্যে বড়ই ভাবনা হচ্ছে। রতন বীণকারটাকে আর ছাড়া হবে না, ঐ হাজতে পচিয়ে মারতে হবে। নয়ত নির্ব্বাসন।

যবনিকা

চতুর্থ দৃশ্য

[কেল্লার এক প্রান্তে উঁচু পাঁচিল ঘেরার মধ্যে বন্দী বীণকার বীণ নিয়ে জীর্ণ কাঁথার উপর উপবিষ্ট]

রতন

(স্বগত) ঐ যে খুব দূরে কুল কুল জলের শব্দ শুনতে পাচ্চি, যেন কোনো ঝরণা মুক্তির গান গাইচে। তাইত, এ স্বচ্ছ-মুক্তির আস্বাদ কি এ জীবনে পাব?

গান

ও তুই কেনে এসেচিস কারে (মন মনরে আমার)
তাই জনম গেল, শান্তি পেলি নারে (মন মনরে আমার)
যে পথ দিয়ে চলে এলি
সে পথ এখন ভুলে গেলি (রে)

রতন

জানি।

নেপথ্যে

কোথায় ?

রতন

এই এইখানেই।

নেপথ্যে

কি ? আপনিই সেই রতনরাজ ?

[খানিকক্ষণ নীরব]

রতন

হাঁ আমি সেই হতভাগ্য—

(নেপথ্যে)

তাই এত মধুর আপনার কণ্ঠ !

রতন

আমি তাই কবির গান গেয়ে বলি :—

কেন তোমরা আমায় ডাক
আমার মন না মানে,
পাইনে সময় গানে গানে।

পথ আমারে সুধায় লোকে
পথ কি আমার পড়ে চোখে ?
চলি যে কোন দিকের পানে
গানে গানে।

দাওনা ছুটি ধর ত্রুটি, নিইনে কানে,
মন ভেসে যায় গানে গানে।

আজ যে কুসুম ফোটার বেলা
আকাশে আজ রঙের মেলা,
সকল দিকেই আমায় টানে
গানে গানে॥

রতন

তা এরা শোনে না। আমাকে আদব কায়দা শিখিয়ে দরবারের পোষাকী ক'রে তুলতে চায়, নইলে কোনো উপকারে লাগাবার জন্যে নেহাৎপক্ষে সঙ্গীতের একটা টোল খুলে গুরুমশাই ক'রে তুলতে চায়।

নেপথ্যে

তা বেশ ত, তুমি কেন গুরু হও না ?

রতন

ঐ ত, পাড়ার ছেলেরাও ঐ সামান্য কথাটা আজ পর্য্যন্ত বুঝলে না। শিল্পী হলেন আনন্দের উৎস, আর গুরু হচ্চেন নিয়মের বাঁধন ; দুটো কখনও মিশ খেতে পারে না।

নেপথ্যে

দেখ, কিন্তু গুরুরও ত দরকার আছে ?

রতন

দরকার যতটুকু হাঁটার কৌশল শেখবার জন্যে মায়ের দরকার।

নেপথ্যে

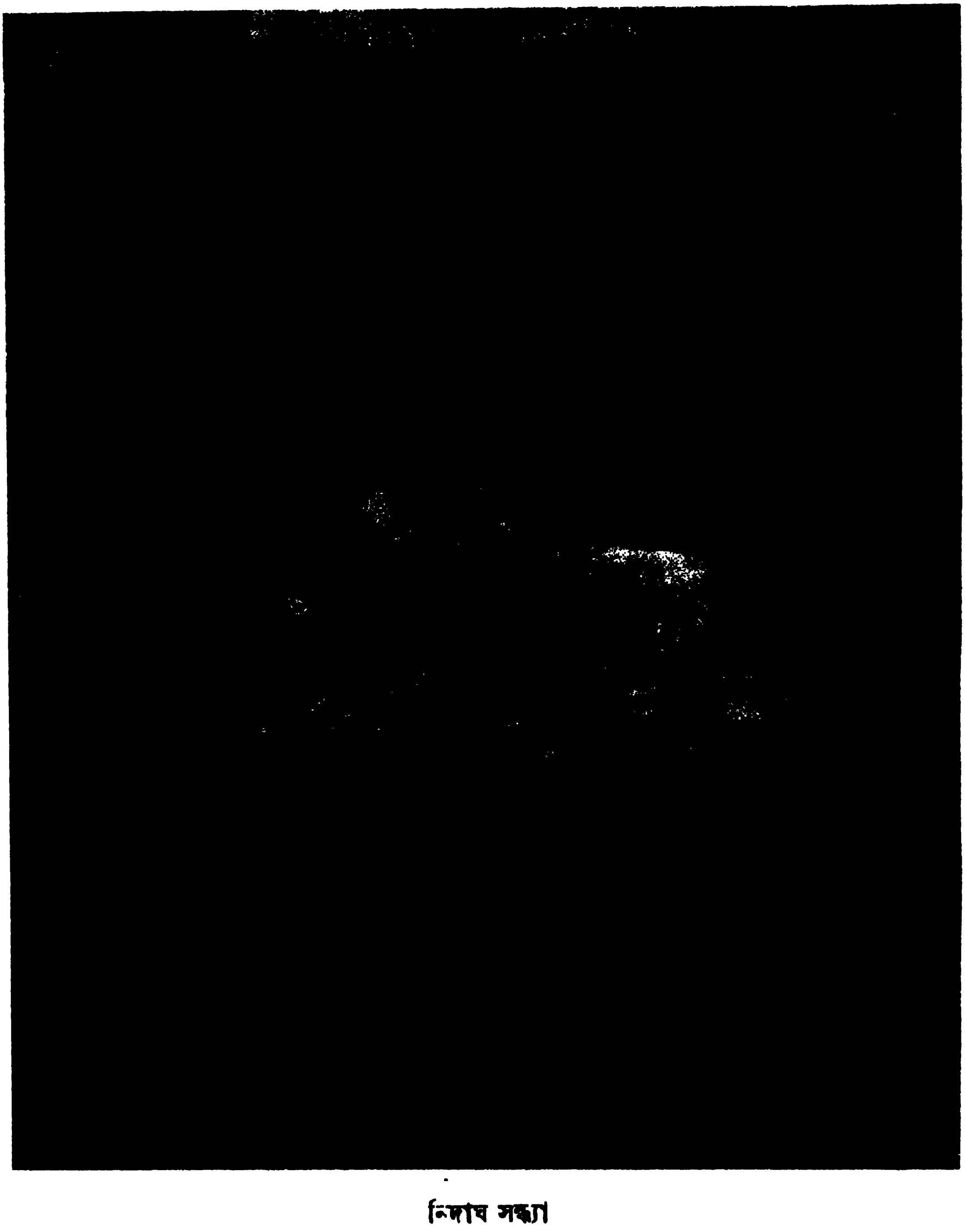
তারপর ?

রতন

তারপর হাঁটতে শিখলেই পথ আপনিই আবিষ্কার হ'য়ে যাবে।

গান

তুমি কোন পথে যে এলে পথিক
দেখি নাই তোমারে।
হঠাৎ স্বপন [illegible]খা দিলে
বনেরি কিনারে।
ফাগুনে যে বান ডেকেচে
মাটির পাথারে
তোমার সবুজ পালে লাগল হাওয়া
এলে জোয়ারে।
কোন্ দেশে যে বাসা তোমার
কে জানে ঠিকানা
কোন্ গানের সুরের পারে,
পথের নাই নিশানা।
তোমার সেই দেশেরি তরে
আমার মন যে কেমন করে,
তোমার মালার গন্ধে তারি আভাস
আমার প্রাণে বিহারে।



নিদাঘ সন্ধ্যা

শিল্পী—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর

অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

নেপথ্যে

আজ তাহ'লে আসি।

রতন

এস, ভুলে যেয়োনা।

যবনিকা

পঞ্চম দৃশ্য

[রাজসভায় রাজা ও যুবরাজ সমাসীন]

যুবরাজ

না মহারাজ! আমি জানি রাইগড় কেল্লায় আমার সেই বীণকারকে তুমি বন্দী ক'রে রেখেচ, আমি দেখেচি।

রাজা

এঁ্যা, কোতোয়ালকে মানা ক'রে পাঠালুম, তবুও।

যুবরাজ

হ্যাঁ, সহর কোতোয়ালের দোষ নেই, তার কণ্ঠস্বর বহুদূর থেকে শুনে আমি নিজেই তার সন্ধান পেয়েচি।

রাজা

এখন কি চাই?

যুবরাজ

আমি তাকে ছেড়ে দিতে চাই।

রাজা

ছাড়তে আমি তাকে পারব না।

যুবরাজ

না, তাকে ছাড়তেই হ'বে।

রাজা

আচ্ছা, যদি তুমি আর বীণ শেখ্‌বার জন্তে না ক্ষেপো তো—

যুবরাজ

তবে ছাড়বে?

রাজা

হ্যাঁ, কিন্তু—

যুবরাজ

তাকে প্রাণে মেরোনা মহারাজ!

রাজা

না, তার নির্ব্বাসন দণ্ড দেব।

যুবরাজ

তা বরং দাও, কিন্তু বন্ধ খাঁচার বুলবুলের মত ওকে দ'গে বন্দী ক'রে মেরোনা।

রাজা

প্রহরী!

[প্রহরীর প্রবেশ]

প্রহরী

হুজুর!

রাজা

যাও, বন্দীকে গড় থেকে নিয়ে এস।

প্রহরী

যে আজ্ঞে।

রাজা

তাহ'লে তুমি খুসী হবে?

যুবরাজ

হ্যাঁ, কিন্তু—

রাজা

না, আর কিন্তু হবে না,—তাকে আমি কিছুতেই এ রাজ্যে স্থান দিতে পারব না।

যুবরাজ

তবে সে কোথায় যাবে?

[এমন সময় বন্দীকে নিয়ে প্রহরীর প্রবেশ। রাজসমীপে আসবা-মাত্র বন্দীর মূর্চ্ছা।]

যুবরাজ

শীঘ্র ওর বাঁধন খুলে দিতে বলুন মহারাজ! উনি মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়েচেন।

রাজা

প্রহরী, বন্দীর বাঁধন খোলো।

প্রহরী

যথা আজ্ঞা।

[প্রহরী হাতের বাঁধন খুলে দিলে]

যুবরাজ

একি? একেবারে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়েচেন।

রাজা

রাজ-বৈদ্য শেখরনাথকে ডাক।

[রাজবৈদ্য শেখর ঔষধের তল্পী বাহককে সঙ্গে ক'রে এসে চিকিৎসার মূক অভিনয় করলেন। এমন সময় চোখ খুলে বন্দী ধীরে ধীরে গান গেয়ে উঠ্‌ল]

গান

ভেঙেচে দুয়ার এসেচে জ্যোতির্ম্ময়
তোমারি হউক জয়।
তিমির বিদার উদার অভ্যুদয়,
তোমারি হউক জয়।
হে বিজয়িবীর, নবজীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে
বন্ধন হোক্ ক্ষয়।
তোমারি হউক জয়।
এস দুঃসহ, এস এস নির্দ্দয়,
তোমারি হউক জয়।
এস নির্ম্মল, এস এস নির্ভয়,
তোমারি হউক জয়।
প্রভাত সূর্য্য এসেচ রুদ্র সাজে,
দুঃখের পথে তোমার তূর্য্য বাজে,
অরুণ-বহ্নি জ্বালাও চিত্ত মাঝে
মৃত্যুর হোক্ লয়।
তোমারি হউক জয়।

যুবরাজ

মহারাজ! এই জরাজীর্ণ বৃদ্ধকে কি তুমি ক্ষমা করবে না?

রাজা

না, এঁকে বিদায় কর, কিন্তু সহরের প্রান্তে আর এঁর ঠাঁই নেই।

যুবরাজ

আমি এঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব?

রাজা

তা যাও ঐ দ্বার পর্য্যন্ত। (রাজার প্রস্থান)

যুবরাজ

গুরু!

রতন

না ভাই, গুরু নয়, বল ভাই—এস আমার বুকে এস (আলিঙ্গন) এই শেষ আর এই গোড়া। আমার বাঁধন খুল্‌ল বটে কিন্তু আর এক দিকে আবার জটিল হ'য়ে উঠ্‌ল। তবে আজ আসি।

যুবরাজ

বিদায়।

নেপথ্যে বীণকারের গান

যাবার বেলায় পিছু ডাকে!
ভোরের আলো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে
পিছু ডাকে, পিছু ডাকে!
বাদল প্রাতের উদাস পাখী
ওঠে ডাকি'!
বনের গোপন শাখে শাখে
পিছু ডাকে, পিছু ডাকে!
ভরা-নদী ছায়াতলে
ছুটে চলে, ছুটে চলে!
আমার প্রাণের ভেতর সে কে
থেকে থেকে
বিদায় প্রাতের উতলাকে
পিছু ডাকে, পিছু ডাকে!

[শেষে মূক-চিত্র অভিনয় এবং সেই সঙ্গে সোহিনী রাগিণীতে অতি মৃদুস্বরে ঐক্যতান বাদন]

মূক-চিত্র অভিনয়

নদীর তীরে বীণকার গাছের ছায়ায় বীণটি শিয়রে রেখে নিদ্রিত। এমন সময় সেই নদীতে জল তুলতে এসে তার স্ত্রী তাকে ঐ অবস্থায় পেয়ে তার বীণটি তুলে নিয়ে নদীর স্রোতে ভাসিয়ে দিলেন আর যবনিকা পতন হ'ল।

সমাপ্ত

[এই নাটিকার গীতগুলি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের রচিত। তিনি এগুলি এ নাটিকায় ব্যবহার করিতে লেখককে অনুমতি দিয়াছেন। সঃ]

কর্ম্মে মুক্তি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সামনে সমুদ্রের অর্দ্ধচন্দ্রাকার তটসীমা। অনেক দূর পর্য্যন্ত জল অগভীর, জলের রঙে মাটির আভাস। সে যেন ধরণীর গেরুয়া আঁচল, এলিয়ে পড়েচে। ঢেউ নেই, সমস্ত-দিন জলরাশি এগোয় আর পিছোয় অতি ধীর গমনে। অপ্সরী আস্‌চে চুপি চুপি পিছন থেকে পৃথিবীর চোখটিপে ধরবে ব'লে,—সোনার রেখায় রেখায় কৌতুকের মুচ্‌কে হাসি।

সামনে বাঁদিকে একদল নারকেল গাছ,—সুদীর্ঘ গুঁড়ির উপর সিধে হ'য়ে দাঁড়াতে পারেনি,—পরস্পরের দিকে তাদের হেলাহেলি। নিত্য-দোলায়িত শাখায় শাখায় সূর্য্যের আলো ওরা ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিচ্চে,—চঞ্চল ছেলেরা যেমন নদীর ঘাটে জল-ছোঁড়াছুঁড়ি করে। সকালের আকাশে ওদের এই অবগাহন স্নান।

এটা একজন চিনীয় ধনীর বাড়ি। আমরা তাঁর অতিথি। প্রশস্ত বারান্দায় বেতের কেদারায় ব'সে আছি। সমুদ্রের দিক থেকে বুক ভ'রে বইচে পশ্চিমে হাওয়া। চেয়ে দেখচি আকাশের কোণে কোণে দলভাঙা মেঘগুলি শ্রাবণের কালো উর্দ্দি ছেড়ে ফেলেচে, এখন কিছুদিনের জন্যে সূর্য্যের আলোর সঙ্গে ওদের সন্ধি। আমার অস্পষ্ট ভাবনা-গুলোর উপর ঝ'রে পড়চে কম্পমান নারকেল পাতার ঝর ঝর শব্দের বৃষ্টি, বালির উপর দিয়ে ভাঁটার সমুদ্রের পিছু-হটার শব্দ ওরই সঙ্গে একই মৃদুস্বরে মেলানো। ওদিকে পাশের ঘরে ধীরেন এসরাজ নিয়ে আপন মনে বাজিয়ে চলেচে,—ভৈরোঁ থেকে রামকেলী, রামকেলী থেকে ভৈরবী;—আস্তে আস্তে অকেজো মেঘের মতো খেয়ালের হাওয়ায় বদল হচ্চে রাগিনীর আকৃতি।

আজ সকালে মনটা যেন ভাঁটার সমুদ্র,—তীরের দিক টান্‌চে তাকে কোন্ দিকে তার ঠিকানা নেই। আপনাকে আপন সর্ব্বাঙ্গে সর্ব্বান্তঃকরণে ভরপুর মেলে দিয়ে ব'সে আছি, নিবিড় তরুপল্লবের শ্যামলতায় আবিষ্ট রোদ-পোয়ানো ঐ ছোটো দ্বীপটির মতো।

আমার মধ্যে এই ঘনীভূত অনুভবটিকে বলা যেতে পারে হওয়ার আনন্দ। রূপে রঙে আলোয় ধ্বনিতে আকাশে অবকাশে ভ'রে ওঠা একটি মূর্ত্তিমান সমগ্রতা আমার চিত্তের উপরে ঘা দিয়ে বল্‌চে, "আছি"; তারি জগতে আমার চৈতন্য উছ্‌লে উঠ্‌চে,—সমুদ্র কল্লোলেরই মতো একতান শব্দ জাগচে, ওম্, অর্থাৎ এই যে আমি। বিরাট একটা "না", হাঁ-করা তার মুখগহ্বর, প্রকাণ্ড তার শূন্য,—তারি সামনে ঐ নারকেল গাছ দাঁড়িয়ে, পাতা নেড়ে নেড়ে বল্‌চে, এই যে আমি। দুঃসাহসিক সত্তার এই স্পর্দ্ধা গভীর বিস্ময়ে বাজ্‌চে আমার মনে, আর ধীরেন ঐ যে ভৈরবীতে মীড় লাগিয়েছে সেও যেন বিশ্ব-সত্তার আত্মঘোষণা, আপন কম্পমান সুরের ধ্বজাটিকে অসীম শূন্যের মাঝখানে তুলে ধরচে।

এই তো হ'ল "হওয়া"। এইখানেই শেষ নেই। এর সঙ্গে আছে করা। সমুদ্র আছে অন্তরে অন্তরে নিস্তব্ধ, কিন্তু তার উপরে উপরে উঠ্‌চে ঢেউ, চল্‌চে জোয়ার ভাঁটা। জীবনে করার বিরাম নেই। এই করার দিকে কত প্রয়াস, কত উপকরণ, কত আবর্জ্জনা। এরা সব জ'মে জ'মে কেবলি গণ্ডী হ'য়ে ওঠে, দেয়াল হ'য়ে দাঁড়ায়। এরা বাহিরে সমগ্রতার ক্ষেত্রকে, অন্তরে পরিপূর্ণতার উপলব্ধিকে, টুক্‌রো টুক্‌রো করতে থাকে। অহমিকার উত্তেজনায় কর্ম্ম উদ্ধত হ'য়ে একান্ত হ'য়ে আপনাকে সকলের আগে ঠেলে তোলে, হওয়ার চেয়ে করা বড়ো হ'য়ে উঠ্‌তে চায়। এতে ক্লান্তি, এতে অশান্তি, এতে মিথ্যা। বিশ্বকর্ম্মার বাঁশিতে নিয়তই যে ছুটির সুর বাজে এই কারণেই সেটা শুন্‌তে পাইনে; সেই ছুটির সুরেই বিশ্বকাজের ছন্দ বাঁধা।

সেই সুরটি আজ সকালের আলোতে ঐ নারকেল গাছের তানপুরায় বাজ্‌চে। ওখানে দেখ্‌তে পাচ্চি শক্তির রূপ আর মুক্তির রূপ অনবচ্ছিন্ন এক। এতেই শান্তি, এতেই সৌন্দর্য্য। জীবনের মধ্যে এই মিলনটিই তো খুঁজি—করার চিরবহমান নদীধারায় আর হওয়ার চির-গম্ভীর মহাসমুদ্রে মিলন। এই আত্মপরিতৃপ্ত মিলনটিকে লক্ষ্য ক'রেই গীতা বলেচেন, কর্ম্ম করো, ফল চেয়ো না। এই চাওয়ার রাহুটাই কর্ম্মের পাত্র থেকে তার অমৃত ঢেলে নেবার জন্যে লালায়িত। ভিতরকার সহজ হওয়াটি সার্থক হয় বাইরেকার সহজ কর্ম্মে। অন্তরের সেই সার্থকতার চেয়ে বাইরের স্বার্থ প্রবল হ'য়ে উঠ্‌লেই কর্ম্ম হয় বন্ধন; সেই বন্ধনেই জড়িত যত হিংসা দ্বেষ ঈর্ষ্যা, নিজেকে ও অন্যকে প্রবঞ্চনা। এই কর্ম্মের দুঃখ, কর্ম্মের অগৌরব যখন অসহ্য হ'য়ে ওঠে তখন মানুষ ব'লে বসে, দূর হোক্ গে, কর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে চ'লে যাই। তখন আবার আহ্বান আসে, কর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে কর্ম্ম থেকে নিষ্কৃতি নেই; করাতেই হওয়ার আত্মপ্রকাশ। বাহ্য ফলের দ্বারা নয়, আপন অন্তর্নিহিত সত্যের দ্বারাই কর্ম্ম সার্থক হোক, তাতেই হোক্ মুক্তি।

ফল-চাওয়া কর্ম্মের নাম চাকরি, সেই চাকরির মনিব আমি নিজেই হই বা অন্যেই হোক্। চাকরিতে মাইনের জন্যেই কাজ, কাজের জন্যে কাজ নয়। কাজ তার নিজের ভিতর থেকে নিজে যখন কিছুই রস জোগায় না, সম্পূর্ণ বাইরে থেকেই যখন আপন দাম নেয়, তখনই মানুষকে সে অপমান করে। মর্ত্ত্যলোকে প্রয়োজন ব'লে জিনিষটাকে একেবারেই অস্বীকার করতে পারিনে। বেঁচে থাকবার জন্যে আহার করতেই হবে। বল্‌তে পারব না, নেই বা করলেম। সেই আবশ্যকের তাড়াতেই পরের দ্বারে মানুষ উমেদারী করে, আর সেই সঙ্গেই তত্ত্বজ্ঞানী ভাব্‌তে থাকে কি করলে এই কর্ম্মের জড় মারা যায়। বিদ্রোহী মানুষ ব'লে বসে, বৈরাগ্যমেবাভয়ং। অর্থাৎ এতই কম খাব, কম পরব, রৌদ্রবৃষ্টি এমন ক'রে সহ্য করতে শিখব, দাসত্বে প্রবৃত্ত করবার জন্যে প্রকৃতি আমাদের জন্যে যত রকম কানমলার ব্যবস্থা করেচে সেগুলোকে এতটা এড়িয়ে চলব যে, কর্ম্মের দায় অত্যন্ত হালকা হ'য়ে যাবে। কিন্তু প্রকৃতির কাজে শুধু কানমলার তাড়া নেই, সেই সঙ্গে রসের জোগান আছে। একদিকে ক্ষুধায় দেয় দুঃখ, আর একদিকে রসনায় দেয় সুখ,—প্রকৃতি একই সঙ্গে ভয় দেখিয়ে আর লোভ দেখিয়ে আমাদের কাজ করায়। সেই লোভের দিক থেকে আমাদের মনে জন্মায় ভোগের ইচ্ছা। বিদ্রোহী মানুষ বলে, ঐ ভোগের ইচ্ছাটা প্রকৃতির চাতুরী, ঐটেই মোহ, ওটাকে তাড়াও, বলো বৈরাগ্যমেবাভয়ং,—মানবনা দুঃখ চাইবনা সুখ।

দুচার জন মানুষ এমনতরো স্পর্দ্ধা ক'রে ঘরবাড়ি ছেড়ে বনে জঙ্গলে ফলমূল খেয়ে কাটাতে পারে, কিন্তু সব মানুষই যদি এই পন্থা নেয় তাহ'লে বৈরাগ্য নিয়েই পরস্পর লড়াই বেধে যাবে,—তখন বল্কলে কুলোবে না, গিরি-গহ্বরে ঠেলাঠেলি ভিড় হবে, ফলমূল যাবে উজাড় হ'য়ে। তখন কপ্‌নি-পরা ফৌজ্‌ মেশিন্ গান্ বের করবে।

সাধারণ মানুষের সমস্যা এই যে, কর্ম্ম করতেই হবে। জীবনধারণের গোড়াতেই প্রয়োজনের তাড়া আছেই। তবুও কি করলে কর্ম্ম থেকে প্রয়োজনের চাপ যথাসম্ভব হাল্‌কা করা যেতে পারে? অর্থাৎ কি করলে কর্ম্মে পরের দাসত্বের চেয়ে নিজের কর্ত্তৃত্বটা বড়ো হ'য়ে দেখা দেয়? কর্ম্ম থেকে কর্ত্তৃত্বকে যতই দূরে পাঠানো যাবে কর্ম্ম ততই মজুরীর বোঝা হ'য়ে মানুষকে চেপে মারবে, এই শূদ্রত্ব থেকে মানুষকে উদ্ধার করা চাই।

একটা কথা মনে প'ড়ে গেল। সেদিন যখন শিলঙে ছিলেম, নন্দলাল কার্সিয়ঙ্‌ থেকে পোষ্টকার্ডে একটি ছবি পাঠিয়েছিলেন। স্যাকরা চারদিকে ছেলেমেয়েদের নিয়ে চোখে চশমা এঁটে গয়না গড়চে। ছবির মধ্যে এই কথাটি পরিস্ফুট যে, এই স্যাকরার কাজের বাইরের দিকে আছে তার দর, ভিতরের দিকে আছে তার আদর। এই কাজের দ্বারা স্যাকরা নিছক নিজের অভাব প্রকাশ করচে না, নিজের ভাবকে প্রকাশ করচে; আপন দক্ষতার গুণে আপন মনের ধ্যানকে মূর্ত্তি দিচ্চে। মুখ্যত এ কাজটি তার আপনারই, গৌণত যে মানুষ পয়সা দিয়ে কিনে নেবে তার। এতে ক'রে ফল-কামনাটা হ'য়ে গেল লঘু, মূল্যের সঙ্গে অমূল্যতার সম্মিলন হ'ল, কর্ম্মের শূদ্রত্ব গেল ঘুচে। এককালে বণিককে

সমাজ অবজ্ঞা করত, কেন না বণিক কেবল বিক্রি করে, দান করে না। কিন্তু এই ডাকরা এই যে গয়নাটি গড়লে তার মধ্যে তার দান এবং বিক্রি একই কালে মিলে গেছে। সে ভিতর থেকে দিয়েচে, বাইরে থেকে জোগায়নি।

ভৃত্যকে রেখেছি তাকে দিয়ে ঘরের কাজ করাতে। মনিবের সঙ্গে তার মনুষ্যত্বের বিচ্ছেদ একান্ত হ'লে সেটা হয় ষোলো আনা দাসত্ব। যে সমাজ লোভে বা দাম্ভিকতায় মানুষের প্রতি দরদ হারায়নি সে সমাজ ভৃত্য আর আত্মীয়ের সীমারেখাটাকে যতদূর সম্ভব ফিকে ক'রে দেয়। ভৃত্য সেখানে দাদা খুড়ো জ্যাঠার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছয়। তখন তার কাজটা পরের কাজ না হ'য়ে আপনারই কাজ হ'য়ে ওঠে। তখন তার কাজের ফল-কামনাটা যায় যথাসম্ভব ঘুচে। সে দাম পায় বটে তবুও আপনার কাজ সে দান করে, বিক্রি করে না।

গুজরাটে কাঠিয়াবাড়ে দেখেছি গোয়ালা গোরুকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসে। সেখানে তার দুধের ব্যবসায়ে ফল-কামনাকে তুচ্ছ ক'রে দিয়েচে তার ভালোবাসায়; কর্ম্ম ক'রেও কর্ম্ম থেকে তার নিত্য মুক্তি। এ গোয়ালা শূদ্র নয়। যে গোয়ালা দুধের দিকে দৃষ্টি রেখেই গোরু পোষে, কষাইকে গোরু বেচতে যার বাধে না, সেই হ'ল শূদ্র; কর্ম্মে তার অগৌরব. কর্ম্ম তার বন্ধন। যে কর্ম্মের অন্তরে মুক্তি নেই, যেহেতু তাতে কেবল লোভ, তাতে প্রেমের অভাব, সেই কর্ম্মেই শূদ্রত্ব। জাত শূদ্রেরা পৃথিবীতে অনেক উঁচু উঁচু আসন অধিকার ক'রে ব'সে আছে। তারা কেউ বা শিক্ষক, কেউ বা বিচারক, কেউ বা শাসনকর্ত্তা, কেউ বা ধর্ম্মযাজক। কত ঝি. দাই, চাকর, মালী, কুমোর, চাষী আছে যারা ওদের মতো শূদ্র নয়—আজকের এই রৌদ্রে-উজ্জ্বল সমুদ্রতীরের নারকেল গাছের মর্ম্মরে তাদের জীবন-সঙ্গীতের মূল সুরটি বাজচে।

মলক্কা
২৮শে জুলাই ১৯২৭



ডেপুটির দুরবস্থা

—গল্প— —শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

১

গল্পটা দস্তুরমাফিক সত্য। সত্য গল্পের মধ্যে মনস্তত্ত্বের দিকটা ফাঁকা। ইতিহাস সোজা, ও সহজে বোধগম্য। লেখকের পরিশ্রম অল্প। পাঠক, যে কোনো অংশ হ'ক, অনুগ্রহপূর্ব্বক প'ড়তে পারেন। শেষের দিক, কিংবা গোড়ার দিক, যে কোনো দিক্ হ'তে আরম্ভ ক'রতে পারেন। তাতে কিছু আসে যায় না। এমন কি শেষ না ক'রলেও চলে। যদি গল্পের দু একখানা পাতা হারিয়ে যায়, কিংবা চা খাবার সময় খুকি ছিঁড়ে ফেলে, তাতেও ক্ষতি নাই। গল্পটা এই—

তারাপদ বাবু বিপত্নীক.
কন্যা সরলা

তারাপদবাবু একটা 'হৌসের' মুচ্ছুদ্দি। টাকা রোজগার ক'রতেন অনেক। বিপত্নীক। একমাত্র কন্যা সরলা। ইচ্ছা ক'রলেই তারাপদবাবু টাকার বেশীভাগ উড়িয়ে দিতে পা'রতেন, কিন্তু তাঁর সে প্রকার প্রবৃত্তি ছিল না। তিনি যত্ন ক'রে সরলাকে লেখাপড়া, গান গাওয়া, ছবি আঁকা প্রভৃতি শিখিয়েছিলেন। রন্ধনকার্য্যেও সরলার কিছু দখল ছিল, অর্থাৎ, সে লুচি ও বেগুন বেশ ভাজ্তে পা'রত, তবে অন্নগুলো সম্বন্ধে তখনো শিক্ষানবিশী চ'ল্ছিল। টাকার জন্য, রূপের জন্য, গুণের জন্য সরলার পাণিগ্রহণার্থীর অভাব ছিল না। কিন্তু তারাপদবাবু তাহার জন্য বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন না।

পুরোহিত-সন্তান বিপিন—তাহার
সম্বন্ধে সরলার মন্তব্য

তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের বংশ বহুকালকার। এরূপ বংশে বংশানুক্রমে একজন পুরোহিত থাকে। তখনকার পুরোহিত কালীপদ ভট্টাচার্য্য। কালীপদের কেবল একমাত্র সন্তান বিপিন। বিপিন দেখ্তে খুব সুশ্রী, বি-এ পাশ, গীতা ও দর্শনশাস্ত্রের কথা জানে, শ্রাদ্ধ, ব্রতপ্রতিষ্ঠা, চণ্ডীপাঠ প্রভৃতি ক্রিয়াকর্ম্ম বেশ চালিয়ে দিতে পারে। সরলার মতে বিপিন একটা নিরেট মূর্খ, সংস্কৃত উচ্চারণ ক'রতে জানেনা, ব্যাকরণ অশুদ্ধ, দেখ্তে ভ্যাবাগঙ্গারাম, তবে 'চেষ্টা ক'রলে শোধরান যেতে পারে'। এবম্বিধ নিষ্ঠুর সমালোচনা সত্ত্বেও বিপিন ব'ল্ত 'সরলার মতো সুন্দর চক্ষু পৃথিবীতে কারো নাই, কথাও তেমনি মিষ্টি'। সেজন্য শত্রুভাবাপন্ন না হ'য়ে, বরঞ্চ, সরলা করুণাপরবশ হ'য়ে প'ড়েছিল। এমন কি কোনো যুবক কিংবা যুবতী বন্ধু বিপিনের বেয়াকুবি লক্ষ্য ক'রে উপহাস ক'রলে, সরলা অসন্তুষ্ট হ'য়ে প'ড়ত।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শরীর ক্রমশঃ নিস্তেজ হ'য়ে প'ড়ছিল, যজমানি-ক্ষেত্রে উপার্জ্জনের মাত্রা ক'মে আস্ছিল। একদিন তিনি তারাপদবাবুকে বল্লেন 'মুখুয্যে মশায়, বিপিনের একটা চাকুরি যদি হয়, তবে আমি তার বিবাহ দিয়ে নিশ্চিন্তভাবে 'পরলোকে যেতে পারি।'

সরলার সঙ্গে বিপিনের বিবাহের কথা উত্থাপন, এবং
তারাপদ বাবুর পরলোকে গমনের ইচ্ছা

পরলোক সম্বন্ধে নানাবিধ চিন্তা ইদানীং তারাপদবাবুরও মনে উদয় হ'ত। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুত্রের বিবাহের কথায় তাঁর নিজের কন্যার বিবাহের কথা মনে প'ড়ে গেল, ও মনের মধ্যে দু'জনে একত্র হওয়াতে তাঁর বোধ হ'ল যে দু'জনে পরস্পরের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হবার জন্য তাঁর মুখের দিকে ক্যাল ক্যাল ক'রে চেয়ে আছে। এই চিত্রটি প্রকাশ ক'রতে তিনি বাধ্য হলেন, এবং বল্লেন যে তাঁর হৌসের বড় সাহেবের সঙ্গে লাট সাহেবের খুব ভাব, সুতরাং বিপিনকে তিনি ডেপুটি করিয়ে দিতে পারবেন, এবং ডেপুটি করিয়ে দিয়ে সরলার সহিত তার বিবাহ দেবেন, এবং বিবাহ দিয়ে বিপিনকে গৃহজামাতা রূপে প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

ক'রবেন, এবং প্রতিষ্ঠিত ক'রে তিনি দিনকতক সুখী হবেন, এবং সুখী হ'য়ে পরলোকে যাবেন। তিনি পুনরায় চিন্তা ক'রে দেখ্‌লেন যে এটা ন্যায্য চিন্তাস্রোত। ক্রমে সেটা সঙ্কল্প হ'য়ে গেল।

পুরোহিত কালীপদ ভট্টাচার্য্যের আনন্দ

ব্যাসদেবের সময় হ'তে আরম্ভ ক'রে বিংশ শতাব্দীর ১৯২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ সন্তানের এরূপ সৌভাগ্য ঘটেছিল কিনা সন্দেহ। সুতরাং ভট্টাচার্য্য মহাশয় আহ্লাদে ক্রমাগত নস্যগ্রহণপূর্ব্বক হাঁচতে লাগলেন, ও সেই সঙ্গে তারাপদবাবু ও তাঁর পূর্ব্বপুরুষদের মাথায় আশীর্ব্বাদের স্রোত ছেড়ে দিলেন। তারপর উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন ক'রে আনন্দিত হ'লেন।

বিপিনের সহিত সেক্রেটরির কথোপকথন

হৌসের বড় সাহেব তারাপদবাবুকে বলেছিলেন যে গবর্ণমেণ্টের চীফ্‌ সেক্রেটারি সাহেব বিপিনকে একবার দেখ্‌বেন, কেননা মনোনীত ক'রবার পূর্ব্বে তাঁরা একবার পদপ্রার্থীদের সঙ্গে কথোপকথন করেন। সুতরাং বিপিনকে সেজেগুজে যেতে হ'ল। দস্তুরমাফিক হ্যাট, কোট, টাই দ্বারা ভূষিত হ'য়ে ও একটা রিষ্টওয়াচ কব্‌জিতে বেঁধে বিপিন বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল। বিপিনের সুচেহারা দেখে সাহেব খুসি হ'য়ে প'ড়লেন, তারপরেই কথোপকথন।

সাহেব। তারাপদবাবু তোমার কে হন?

বিপিন। শ্বশুর।

সাহেব। কতদিন তোমার বিবাহ হয়েছে।

বিপিন। এখন কেবল বাগ্‌দত্তা, চাক্‌রি হ'লেই গায়ে হলুদ হ'বে।

সাহেব। তুমি রাজভক্ত হ'তে পার্‌বে?

বিপিন। আমি জন্মাবধি প্রহ্লাদের মতন ভক্ত, হুজুররা হচ্ছেন নৃসিংহের অবতার। দুষ্টের দমনের জন্য এদেশে আসা। সুতরাং ভক্তি না হ'য়ে যেতেই পারে না।

সাহেব। হ্যাটকোট প'রে কোনো কষ্ট হচ্ছেনা ত?

বিপিন। সামান্য একটু হচ্ছে। শীতকালে পিতৃশ্রাদ্ধের সময় আঙুলে কুশ বেঁধে পিণ্ডি দিতে যেমন হয়।

সাহেব। বেশ! এখন হ্যাট্‌টা মাথা থেকে খুলে চলে যাও।

২

বিপিনের ডেপুটির পদপ্রাপ্তি

পাড়ায় গুজব উঠ্‌ল যে বিপিন হ্যাট খুলে সাহেবের সঙ্গে দেখা করেনি, ও বস্‌তে বলাতে বসেনি, ও আগড়ুম্‌ বাগ্‌ড়ুম কি বকেছে, তাতে সাহেব তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তাই শুনে তারাপদবাবু বড় সাহেবের কাছে গেলেন। সাহেব বলেন 'তুমি খুব সৌভাগ্যবান।' চীফ্‌ সেক্রেটারী বলেছেন যে ছেলেটি সত্যবাদী, সরল ও জিতেন্দ্রিয়। অন্য যারা এসেছিল, তারা কেবল আদবকায়দা শেখান ধড়াবাজ্‌। সুতরাং বিপিনই চাক্‌রিটা পেয়েছে।

তারাপদবাবু বাড়ী ফিরে এসেই একটা শুভদিন দেখে ফেল্লেন, ও বিপিনের বাঙ্গালী চিঠি পাওয়া মাত্র বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র প্রেসে ছাপ্‌তে গেল। বাটীতে একটা কোলাহল না হ'লে বিবাহ হয় না, সুতরাং তিনি দূরদেশ হ'তে আত্মীয়-কুটুম্ব ও বন্ধুবান্ধবের স্ত্রীদের এনে তাঁর হরিশ মুখুয্যের রোডের বাড়ী ঠেসে ফেল্লেন।

বিবাহের উদ্যোগপর্ব্ব—
প্রতিবাসীদের মতামত

যারা ঈর্ষাপরবশ, তারা নেপথ্যে বিপিনকে শ্যালক সম্বোধনে কৃতার্থ ক'রতে উদ্যত হ'ল। যারা অদৃষ্টবাদী, তারা বল্লে, 'বামুনের ছেলেটার কপাল ভাল'। বিপিনের জনকতক আত্মীয়-কুটুম্বই চুপি চুপি রটিয়ে দিলে যে বিপিনের সঙ্গে সরলার বহুদিন হ'তে গোপনে গোপনে প্রেম চলে' আস্‌ছিল, শেষটা প্রকাশ হ'য়ে পড়াতে এই ঘটনাটা ঘটেছে। এই যে জ্ঞানকৃত মহাপাপ, তাহার একটা প্রমাণ বের ক'রলে সরলাদের পাশের বাড়ীর একজন ভাড়াটে ভদ্রলোকের মেয়ে তিলোত্তমা। তার সঙ্গে সরলার একটু ভাব ছিল, সেই সূত্রে সে সরলাকে জিজ্ঞাসা করেছিল 'দিদি, তুমি বিপিনবাবুকে ভালবাস্‌তে?' তার উত্তরে সরলা বলেছিল 'মর! তোর কি একটু বুদ্ধি নেই যে স্ত্রী কি স্বামীকে কখনো

ভালবাসে বিয়ের আগে? তা হ'লে বজ্রাঘাত হ'য়ে মরে যাবে যে!' সকলে বল্লে 'সতের বছরের মেয়ের মুখে যখন এ কথা বেরিয়েছে, তখন সেটা গোপন কথা লুকোবার জন্যই।' কেউ কেউ বল্লে যে ভবেশবাবুর সঙ্গেই সরলার প্রণয় ঘটেছিল, কিন্তু তার টাকাকড়ি নাই; ও চাকরিও হয় নাই, সেইজন্য সরলার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই কাণ্ডটা হ'য়ে গেল। ভবেশ গানবাজনায় ওস্তাদ, পাড়ার থিয়েটরে অভিনয় ক'র্‌ত। সে কথাগুলো শুনে চ'টে খুন! বারংবার বল্‌তে লাগ্‌ল 'কোন শালা এ কথা বলে, আর কোন শালাই বা ঘরজামাই হ'য়ে থাক্‌তে চায়?'

বিবাহ সমাধা

এই রকম নানাবিধ দ্বন্দ্ব, সমালোচনা, কুৎসা ও গালাগালি সত্ত্বেও খুব সমারোহে বিবাহ নিষ্পন্ন হয়েছিল। কোন জিনিষে কেউ একটু খুঁৎ ধরতে পারে নাই। বাসর ঘরে গান বাজনাও হয়েছিল খুব, কিন্তু বর অভ্যাসবশতঃ প্রথম রাত্রিতেই গভীর নিদ্রায় মগ্ন হ'য়ে প'ড়েছিল, সুতরাং বরের তরফ হ'তে কন্তাই রসের প্রবাহে খানিকটা যোগদান করেছিল।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গৃহস্থাশ্রমের কথা

বিবাহের গোলমাল চুকে যাওয়ার পর সরলা তার শয়ন-গৃহের একপাশে ইজি-চেয়ারে পা ছড়িয়ে দিয়ে, এক পেয়ালা কো-কো খেতে খেতে গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস পড়ছিল। সেই সময় বিপিনের সেই ঘরে প্রবেশ। নূতন সম্বন্ধ হবার পর সরলার সঙ্গে দু'দণ্ড নির্জনে কথা বল্‌বার অবকাশ তার হয় নাই।

বিপিন। হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটে গেল, তার ত এখন কোনো চারা নেই, অর্থাৎ বিবাহ।

সরলা। তুমি যে রকম সাজে এসেছ, তাতে তোমার মুখ দেখতে ইচ্ছা ক'রছে না। যা হ'ক বিছানার উপর বসে' পড়।

বিপিন। (সভয়ে) কেন বলত?

সরলা। কাপড়খানা ময়লা, চটি-জুতা ছেঁড়া, তা'তে সমুদমায় কাদা লেগে আছে, পান খেয়েছ তার মাল্ গড়িয়ে প'ড়ছে। তুমি কি এইরকম ক'রে সাহেব-সুবোদের কাছে যাবে?

বিপিন। তবে কি পেন্টুলন প'রে আসব?

সরলা। মন্দ কি? অভ্যাসগুলো একটু উচ্চ শ্রেণীর হওয়া চাই। ঘরে অভ্যাস হ'লে বাইরেও হ'য়ে প'ড়বে। আর একটা কথা তুমি আমার নাকের দিকে চেয়ে থাক কেন? চোখের দিকে তাকাতে কি ভয় হয়?

বিপিন। একটু বাধ' বাধ' ঠ্যাকে।

সরলা। ওটা কুলক্ষণ। অন্য কোনো লোক হ'লে মনে ক'র্‌ত তোমার চরিত্র খারাপ। কিন্তু আমি তোমাকে ভাল রকম জানি, তাই বলে দিচ্ছি—ভবিষ্যতে চোখটা যত দূর সম্ভব বড় ক'রে তাকাবে। আর একটা কথা—হ্যাণ্ডেল ভাঙ্গা কাপে' চা কখনো খেওনা, আর বাঁ হাতের আঙ্গুল-গুলো পকেটে পুরে রেখনা। লোকে মনে ক'রতে পারে হয়ত তোমার ছটা আঙ্গুল, কিংবা একটা একেবারেই নাই।

বিপিন। ওঃ তুমি এত লক্ষ্য ক'রে দেখ?

সরলা। ছবি টেনে টেনে এসব দেখা অভ্যাস হ'য়ে গিয়েছে।

বিপিন। (সভয়ে) আমার ছবি টান্‌ছ' নাকি?

সরলা। এখনো রং দিয়ে টানিনি, আর, কাগজে টান্‌ব না, সেটাও নিশ্চয় জেন।

বিপিন। তবে কিসে টান্‌বে?

সরলা। সেটা চিন্তার বিষয় হ'য়ে পড়েছে। গত মহা-যুদ্ধের অবস্থা দেখে—। যাক্ সে কথা, আর একটা মনে হ'ল। অই রেকাবির উপর খানকতক লুচি আর বেগুন ভাজা আছে, ইচ্ছা হয় খেয়ে ফেল, কিন্তু খিদে না থাক্‌লে খেওনা।

বিপিনের তেমন ক্ষুধার উদ্রেক হয় নাই, কিন্তু সরলার নৈতিক উপদেশগুলো অপূর্ব্বভাবে তার মানসিক উন্নতি-সাধন কচ্ছিল, ও সেই সঙ্গে বিমলভাবে ক্ষুধার উদ্রেক হচ্ছিল।

ডেপুটির দুরবস্থা

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

৩

বিবাহের সম্বন্ধে সরলার মত ও ভবিষ্যদ্বাণী

বিপিন সেই লুচিগুলো একে একে উদরসাৎ ক'রে বল্লে', বাঃ।

সরলা। ময়দা বড় খারাপ, তা না হ'লে আর একটু ভাল লাগ্ত'।

বিপিন। ময়দার কোনো দোষ ত পেলেম না, আমার বোধ হয় আরও খানকতক হ'লে—

সরলা। আর নাই। এখন তোমার সঙ্গে একটা বিষম কথা আছে। তুমি ঘরে ঢুকেই বল্লে' যে বিবাহ হঠাৎ হ'য়ে গিয়েছে, তার কোনো চারা নাই। তার অর্থ কি?

বিপিন। সংসারের বড় বড় ঘটনা হঠাৎ হ'য়ে যায়।

সরলা। দারপরিগ্রহ, ধর্ম্মের একটা অঙ্গ, সেটা মান ত?

বিপিন। যখন এতগুলো বৈদিক মন্ত্র বিবাহের মধ্যে আছে, তখন ধর্ম্ম বৈকি।

সরলা। মনে কর যদি কেউ একটা স্ত্রীকে বিবাহ না ক'রে, কেবল ঘটস্থাপনা ক'রে বিবাহ করে, তবে সেটা ধর্ম্মতঃ বিবাহ কিনা?

বিপিন। শাস্ত্র বলে সবই ঘট আর পট। স্বামী ঘট ও স্ত্রী পট। কিংবা দু'জনেই ঘট কিংবা পট। বিবাহ করা নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতির একটা পবিত্র অঙ্গ, এই ত বরাবর শুনে আস্‌ছি, সুতরাং ঘটস্থাপনা ক'রে বিবাহ কেন চল্‌বে না?

সরলা। সুতরাং আমার বেশ বোধ হ'ল যে তোমার উক্তি খুব সত্য। ঘটস্থাপনা হ'য়ে গেছে, এখন কোনো চারা নাই। তবে এটাও হয়ত ঠিক যে এই আকস্মিক ঘটনার মধ্যে ভবিষ্যদ্‌জীবনের একটা সূত্রপাত হয়েছে, ত না হ'লে এটা হ'ত না।

বিপিন। হয়ত আমি উন্নত হ'ব ব'লেই হয়েছে।

সরলা। কিংবা আমার একটা কিছু অদ্ভুত রকম হ'বে ব'লে। বোধ হয় তুমি লক্ষ্য ক'রে দেখেছ' যে, নারীর সংসারে স্থান নাই। তারা নিজের ব'লে, ঘর বেঁধে সংসারে বাস ক'রবে, এ রকম বিধান সৃষ্টিতে কোনো কালে ছিল না। চেষ্টা ক'রলেও বিফল হ'য়ে পড়ে, কেননা, তার কোনো উদ্দেশ্য থাকে না। আমাদের ধর্ম্মই যে, স্বামীকে ঘটরূপে স্থাপনা ক'রে ঈশ্বরের উপাসনা করা। পাখীগুলো গাছে নীড় বাঁধে, শাবক হবার জন্য। কিন্তু তাদের মধ্যে যে একটা ঘটস্থাপনা হয়েছে, কিংবা, পশুর জীবন পার হ'য়ে তারা মানুষের কর্ত্তব্য কর্ম্মের আভাস পেয়েছে, সেটা বোধ হয় তাদের মনে হয় না। সেই কর্ম্মটুকু উপাসনা। যারা বিবাহ ক'রেছে তাদের দায়িত্ব বেশী, কেননা স্বামী স্ত্রী দুজনে মিলে উপাসনা করে, সেই উপাসনাতেই তাদের ভবিষ্যত-সন্তানদের চরিত্র-গঠন হয়। সন্তানদের দিয়েই সমাজ, ও তাই নিয়ে দেশ।

বিপিন। আমাদের দেশটা চরিত্রহীন হ'য়ে পড়েছে বোধ হয়। কেবল গালাগালি, কুৎসা ও বিদ্বেষ।

সরলা। আমাদের দোষ কি? স্বাধীন ও বলবন্ত দেশের লোক, দেশের মধ্যে আপনাকে দেখে। একটা কলের মতন কাজ ক'রে যায়। মানুষগুলোর চরিত্রের মধ্যে ভালও থাকে মন্দও থাকে, তাতে কল হঠাৎ বিগড়ে যায় না। আমরা কেবল আমাদের দিকেই তাকিয়ে থাকি। দেশটা কি তা ভেবে ভেবে ঠিক ক'র্‌তে হয়। আমরা নিজের আত্মা নিয়েই ব্যস্ত। নিজের চরিত্রের অবনতি বেশ বুঝতে পারি, ও তাই দেখে অন্য লোকের চরিত্রে দোষারোপ ক'রে আপনাকে খুব বুদ্ধিমান মনে করি। পাশবিক প্রবৃত্তি আছে, কিন্তু পাশবিক একতা নাই। এই পাশবিক আক্রমণ প্রথমে স্ত্রীর উপর, তারপরে স্ত্রীলোকের উপর। নিজের চরিত্র সংশোধন ক'রে, ভবিষ্যতে যদি একতার ভাব আসে, সেই দিন হয়ত দেশের কথা মনে প'ড়তে পারে। কিন্তু কলকারখানার সাজে এদেশে চল্‌বে না, অথচ কলকারখানার রাজত্বে থাক্‌তে হ'বে। তাই তোমাকে দিন রাত্রি সেজেগুজে সভ্যভব্য হ'য়ে থাক্‌তে বলেছিলেম।

বিপিন। বই প'ড়ে প'ড়ে তোমার দুর্ভাবনা বেড়ে গিয়েছে।

সরলা। তোমার জন্ত আমার প্রথম ভাবনা। আমি শুনতে পেয়েছি তুমি বদ্‌লি হ'বে। অন্তত্র যেতে হ'বে। সেখানে তোমাকে দেখ্‌বে কে?

বিপিন। তুমি সঙ্গে যাবে না?

সরলা। আপাততঃ নয়। বাবা রাজি হবেন না। যদি তাঁর অন্ত ছেলেপুলে থাক্‌ত, তাহ'লে বিদায় দিতে মায়া হ'ত না। বিদায় হয়ত শেষে দিতে হবে। এ বাড়ী মধ্যে মধ্যে শূন্ত ও নির্জন হ'য়ে প'ড়বে। তারপরে কি হবে বুঝতে পাচ্ছিনে। হয়ত তোমার কাছে যাব। আবার হয়ত সেখানেও বিদায় নিতে হবে। কোথায়, তা কে জানে?

বিপিন। আমার বোধ হচ্ছে তোমাকে ছেড়ে থাক্‌তে পা'রব না।

সরলার উপদেশ ও বিপিনের তাহা গ্রহণ

সরলা। চেষ্টা ক'রে দেখ্‌লে ঠিক বুঝতে পারবে। আপাততঃ কতকগুলো কথায় সাবধান ক'রে দিচ্ছি। র'দ্দুরে, বৃষ্টিতে খালি মাথায় বের হয়োনা। ছাতার শিকটা বেঁকে গিয়েছে সেটা মেরামত ক'রে নিও। পঞ্জাবির গলার বোতামগুলো ছিঁড়ে আমি গেঞ্জিতে বসিয়ে দিয়েছি, সেইটে প'রে থেক, খালি গায় থেক'না। সংস্কৃত ভাল ক'রে পড়বে। রামায়ণ মহাভারত মূলগ্রন্থ নিয়ে যাবে। বাসায় কোনো বন্ধুবান্ধব এলে খুব যত্ন ক'রবে। বিদেশে সহায়ের দরকার। লোকের উপর দয়া ক'রবে। মানুষ দেবতার মতো হ'লে তার শত্রু হয় না। মশারি খাটিয়ে শোবে। তোমার সঙ্গে আমাদের গিরিধারী চাকরকে দিচ্ছি। সে সব গুছিয়ে দেবে। মাথার চুলগুলো উস্কো রে'খনা। রোজ আঁচ্‌ড়াবে।

বিপিন। ভটচায্‌ বামুনের ছেলে, ওসব আসেই না।

সরলা। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এস'।

দর্পনের নিকট সরলা তার স্বামীকে টেনে নিয়ে, চুল কি ক'রে ফেরাতে হয় তা দেখিয়ে দিলে। বিপিন সেই সুযোগে সরলার চুলগুলো খুব ওলট পালট ক'রে, সেই নিবিড় কেশদামের মধ্যে তার মুখখানা লুকিয়ে, বোধ হয় সরলার আরক্ত কপোলের প্রান্তদেশ ঈষৎ স্পর্শ ক'রেছিল।

৪

বিপিনের নূতন কর্ম্মস্থান, গৃহস্থাপনা ও বন্ধুলাভ

বিপিন বদলি হয়েছিল মানভূমে। মানভূম একটা পার্ব্বতীয় বায়গা, সেখানে অনেকে হাওয়া বদ্‌লাতে যায়, বিশেষতঃ প্রেমিক যক্ষ্মারোগীর দল। বিপিন যে বাসা ভাড়া ক'রেছিল তারি সন্নিকটে একটি ভদ্রলোক বাস করতেন, তাঁর কলেজে প'ড়বার সময় প্রেমে প'ড়ে গিয়ে কলকাতায় যক্ষ্মার সূত্রপাত হয়। কেবল সূত্রপাত। রোগের উৎপাত পাছে বর্দ্ধিত হয়, সেই আশঙ্কায় তিনি খানকতক মাসিকপত্র সংগ্রহ ক'রে মানভূমে স'রে প'ড়ে, থানার কাছে বাসা করেন। ক্রমে মাসিক পত্রিকার 'আর্টিক্ল'গুলো মনোযোগ সহকারে (দিবা নিদ্রা পরিত্যাগ-করতঃ) পাঠ ক'রে, ও মধুসংযুক্ত ফটকিরি সেবন ক'রে, অনেকটা চাঙ্গা হ'য়ে উঠেছিলেন। অতিশয় অমায়িক তিনি, ও বিপিনকে তার নূতন বাসায় প্রতিষ্ঠিত ক'রবার জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করেছিলেন। এই অভাবনীয় বন্ধুলাভে বিপিনের বর্ণনাতীত আনন্দের উচ্ছ্বাস হয়েছিল। বন্ধুর নাম মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী। নামটা খুব সোজা না হ'লেও, লোকটা খুব চটপটে, ও তাঁর মনের দ্বার, যক্ষ্মারোগীর গৃহের দ্বারগুলোর মতো সদাই উন্মুক্ত। এক দিক দিয়ে বাতাস ঢুকছে, আর এক দিক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। বিপিনের সঙ্গে সরলার বাটীর বৃদ্ধ চাকর গিরিধারীও এসেছিল। গিরিধারী ও মুকুন্দবাবু মিলে বিপিনের গৃহ এমনভাবে সাজিয়ে ফেল্লে, যে হঠাৎ কেউ দেখ্‌লে না মনে ক'রতে পারে যে বিপিন একটা ঘটিরাম।

কালেক্টর সাহেব

বন্ধুও যেমন মনের মতো জুটে গেল, অদৃষ্টক্রমে কালেক্টর সাহেবও তেমনি জুটে গেল। সাহেব অক্সফোর্ডের এম-এ, যেমন দ্রুতগতি ঘোড়া চালাতেন, তথৈব রিপোর্টও লিখ্‌তেন। কোনো জিনিষ ভেবে দেখা তিনি আবশ্তক মনে ক'রতেন না, কাজেই ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্ত ভগবান আগেই ভেবে চিন্তে সাহেবের আঙুলে প্রবেশ ক'রে ব'সে

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

থাকৃতেন। বিপিনের সঙ্গে প্রথম দিন দেখা হ'তেই তিনি জিজ্ঞাসা ক'রলেন "বিপিনবাবু, দুটো বিবাহ (Bigamy) সম্বন্ধে তোমার মতামত কি? একটা স্ত্রীলোক যদি স্বামী বর্ত্তমানে লুকিয়ে আর একজনকে বিবাহ করে, সেটা কি এতবড় অপরাধ যে দায়রার বিচার-যোগ্য?"

আইন সম্বন্ধে বিপিনের অসাধারণ ব্যুৎপত্তি

বিপিন। আমরা এই রকম মনে করি। বিধাতা যখন সৃষ্টি করেছিলেন তখন আব্রহ্মস্তম্ব সকলকে ব'লে দিয়েছিলেন যে 'তোমরা পরস্পরকে খেয়ে মানুষ হও। এ কথা গীতা পাঠ ক'রলেই জানতে পারবেন। তা ছাড়া আর কোনো উপায় নাই; কেননা, সৃষ্টির বাহিরে কোনো খাদ্যের ভাণ্ডার নাই, অথচ সৃষ্টিকর্ত্তা ভরণপোষণ ক'রতে বাধ্য। স্বামী যখন স্ত্রীকে ভরণপোষণ ক'রতে বাধ্য, তখন তিনি সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতিনিধি অর্থাৎ ডেপুটি। যদি ভরণ-পোষণের উপায় না থাকে, তবে তিনি কেবল ব'লতে পারেন "পরস্পরকে খাওয়া ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নাই।" বিধাতা একটা বই দুটো হয় না। সত্য কথাও একটাই হয়। কাজেই বিধাতাকে অবিশ্বাস ক'রে অন্য বিধাতার অন্বেষণ, ও কথাটা সত্য কি মিথ্যা, তার পরীক্ষা ক'রতে গেলেই বিপদে প'ড়তে হ'বে নিশ্চয়। এরূপ বিশ্বাসহীনা স্ত্রীর পক্ষে দ্বীপান্তরই প্রশস্ত।

সাহেব। কিন্তু তোমাদের শাস্ত্রে স্ত্রী বর্ত্তমানেও স্বামীর দুটো বিবাহ ক'রলে অপরাধ হয় না কেন?

বাঙ্গালা ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ও ইংরাজি ভাষার সম্বন্ধ ব্যাখ্যা

বিপিন। একটা স্ত্রীলোকের যদি একই সময়ে দু'জন স্বামী হয়, তবে তা'র ছেলেপুলে দুটো বাপের সম্পত্তি দাবী ক'রে ব'স্‌বে। এ রকম ছেলে কি বাঁচে? ভাবাতত্ত্বে ও ইতিহাসেও তাই দেখা যায়? পঞ্চপাণ্ডবের ছেলেদের কুরুক্ষেত্রের শিবিরে দুর্য্যোধন গলা টিপে মেরে ফেলেছিল। খুব স্বাভাবিক পরিণাম। অপর পক্ষে, স্ত্রীলোকের কোনো সম্পত্তি নাই। কাজেই স্বামী দশটা বিবাহ ক'রলেও, সম্পত্তি একজন বাপেরই। এতে প্রমাণ হচ্ছে, সৃষ্টিকর্ত্তা একজনই। সৃষ্টির আধার অনেকগুলো। তাই সাংখ্য বলেছেন, পুরুষ এক, কিন্তু আত্মা বহু। বিবাহ না হ'লে—স্ত্রীলোকের কখনো আত্মা থাকতে পারে না। যেমন রস-বিহীন রসগোল্লা।

সাহেব। কিন্তু ভালবাসার দিক দিয়ে তাকিয়ে দেখ্‌লে কি মনে হয়?

বিপিন। আমাদের শাস্ত্রে ভালবাসা বলে কোনো কথা নাই। ভালবাসা কথাটা বিলাতী আমদানী। যেমন বাঁধাকপি। জমি তৈয়ারি ক'রতে, সার দিতে, চারা গজাতে, চারা নিয়ে অন্য জমিতে রুপ্‌তে, প্রখর রৌদ্র-বৃষ্টিতে তোয়াজ্‌ ক'রতে ও পোকার আক্রমণ হ'তে রক্ষা ক'রতে ক'রতে প্রাণান্ত। অথচ, শেষে মোটা পাতাগুলো ছাড়িয়ে ফেলে, যে সাদাটুকু খাওয়া যায় তাতে 'ভিটেমিন্‌' নাই বল্লেও চলে। ভালবাসাকে আমরা 'মায়া' বলি।

সাহেব। ভালবাসাটা তোমরা এখনো বুঝতে শেখনি, যদিও তোমাদের একালের কাব্যে দেখা যায়। তবে, তোমাদের সেকালের 'প্রেম' কে যদিও পিঠে পিঠে জীর্ণশীর্ণ ক'রে ফেলেছ, বোধ হয় এখনো চেষ্টা ক'রলে তাজা হ'তে পারে। আর একটা কথা, আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি, সাক্ষীগুলো বড় মিথ্যেকথা কয়, এদের দুরস্ত করবার কোনো উপায় নাই?

বিপিন। আমাদের শাস্ত্রে জগৎ মিথ্যা, এই ভাবনাটা ভেবে ভেবে লোকে সত্যমিথ্যার ব্যবধানটা ঝাপ্‌সা দেখে। হলক্‌ দিয়ে কাঠগড়ায় না চড়িয়ে, তাদের সঙ্গে একত্রে ব'সে মন খুলে খোস্‌ গল্প ক'রলে অবশেষে সত্যি কথা আপনিই বেরিয়ে প'ড়বে। কিন্তু জমানবন্দী লিখ্‌তে গেলে তারা কচ্ছপের মত সত্যি কথা পেটের মধ্যে লুকিয়ে ফেলে। পিঠ চেপে ধ'রলে কোনো লাভ নাই, কেননা এ দেশের মতো পুরাতন শক্ত পিঠ ভূমণ্ডলে কোথাও পাবেন না। এই জন্য পাতঞ্জল দর্শনে লেখে 'কূর্ম্মাত্মাং'। আপনারা যেমন নরসিংহের অবতার, আমরাও কূর্ম্মের অবতার।

বিপিনের প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতা প্রাপ্তি

সাহেব, বিপিনের সঙ্গে আলাপ ক'রে খুব খুসি হলেন, ও শীঘ্রই তাকে প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতা প্রদান ক'রলেন।

৫

বিপিনের পট-স্থাপনা ও বন্ধুর সহিত বিশ্রাম্ভালাপ

পাছে সরলার মুখখানি মনোমুকুর হ'তে অদৃশ্য হয়ে পড়ে, তাই একখানা ফটোগ্রাফ বিপিন নিয়ে এসেছি। সেটা কোন্-খানে টাঙ্গিয়ে রাখ্‌বে ঠিক না পেয়ে 'সাক্ষ্যসম্বন্ধীয় আইন' বহির মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল। বন্ধু মুকুন্দরাম সেটা হঠাৎ আবিষ্কার ক'রে ফেলাতে খুব লজ্জিত হ'ল। বন্ধু বল্লেন, 'বিপিনদা, তুমি খুব সৌভাগ্যবান পুরুষ, এখন তাঁকে এখানে এনে ফেল, নচেৎ তোমার কষ্ট হবে।'

বিপিন। ভায়া! আরাম করা কি চাকুরে লোকদের কপালে ঘটে?

মুকুন্দ। দাদা, আরাম দু'রকমের। শরীরের আর মনের। বেশী শরীরের আরাম ক'রতে গেলে মন বিকল হ'য়ে পড়ে, বেশী মনের আরাম ক'রলে শরীর অথর্ব্ব হয়। দুটোর সামঞ্জস্য করা চাই।

বিপিন। কিসে সামঞ্জস্য হয় বলত?

মুকুন্দ। আমার সঙ্গে তোমার মতের মিল হবে কিনা, জানিনা, তবে আমি যাতে স্থায়ী আরাম পেয়েছি তা'বলছি। আমি সন্ধ্যার সময় একটু সিদ্ধি খাই তার পর দু'মাইল হাঁটি। নেশা জমলেই বাসায় ফিরে এসে ইজি চেয়ারে বসি, ব'সেই মাসিক পত্রিকা পড়ি। তার মধ্যে কাব্য, উপন্যাস, দর্শন, নৃতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব অনেক রকম থাকে। যার যেমন পছন্দ, তার মধ্যে মাল আহরণ ক'রে মনের ক্ষুধা মিটিয়ে ফেলে। আমি কাব্যই বেশী পড়ি। মনের ক্ষুধা মিট্‌লেই শরীরের ক্ষুধা বাড়ে, তখন খানকতক লুচি খেয়ে বাইরে এসে আকাশ ও চন্দ্রতারার দিকে তাকিয়ে থাকি। তাতে বেশ বোধ হয় আমিও নিত্য; চন্দ্র, তারা তপনের সংসারও নিত্য। এর চেয়ে আর আরাম আমাদের ভাগ্যে কি হবে?

বিপিন। আমি কাব্য, উপন্যাস-টুপন্যাস বুঝিনে। তবে দর্শন-টর্শনগুলো মন্দ লাগেনা।

মুকুন্দ। তা' হ'লে সিদ্ধির নেশা চট্ করে জমে যাবে। কাব্য-টাব্য যারা লেখে তা'রাই কি বোঝে? আমি নিজেই একাদশপদী কবিতা লিখি, কিন্তু ছাপা হ'য়ে গেলে বুঝতে পারিনা কে লিখেছে, আর তার অর্থই বা কি। তবে সকলেই বাহবা দেয়, এমন কি, আমি ছাব্বিশ বৎসর পার না হ'তে আমার জীবন বৃত্তান্ত লেখা সুরু হ'য়ে গিয়েছে। প্রত্যেক বছরের জীবনের কথা ব'লে আমি দশটাকা পাই, তাতেই, আর কাব্য লিখে, দিন চলে যায়।

বিপিন। (উৎসুক হ'য়ে) কিসের কাব্য লেখ?

মুকুন্দ। (বিষাদিত স্বরে) মৃতা স্ত্রীর সম্বন্ধে। যাক্ সে কথা তুলে কাজ নাই। আমি দীন দুঃখী মানুষ। তুমি বড় চাকুরী কর, আর শুনেছি শ্বশুরও বড়লোক। এত টাকা খরচ কর কি ক'রে?

বিপিন। লোকের ওটা ভুল। আমি কখনো শ্বশুরের এক পয়সা নিইনি। কেবল বিয়ের সময় একটা হাজার টাকা দামের রিষ্ট-ওয়াচ পেয়েছিলেম, সেটাও ঐ বাক্সের মধ্যে তুলে রেখেছি। যাহ'ক, তোমার সিদ্ধি একটু চেখে দেখ্‌লে হয় ত?

মুকুন্দ। পকেটেই আছে।

সিদ্ধি-সেবন

মুকুন্দবাবু তৎক্ষণাৎ পকেট হ'তে একটা সিদ্ধির গুলি বের ক'রে, তার অর্দ্ধেকটা ভেঙ্গে বিপিনকে দিলেন, ও নিজে বাকি অর্দ্ধেকটা জলে গুলে খেয়ে ফেল্লেন, ও বিপিনকেও তা'র ভাগটার সরবত তৈয়ারি ক'রে খাইয়ে দিলেন। এক ঘণ্টার মধ্যেই দু'জনের খুব উৎফুল্ল অবস্থা হ'ল। বিপিন বল্লে 'ভায়া, তুমি গান যদি জান, তবে একটা গাও, আমি কেতাবটা বাজাই'।

মুকুন্দ। আমি গানের চর্চ্চা করেছিলেম খুব, তবে নূতন ধরণের, অর্থাৎ আমি সরিগম ও তাল বসিয়ে দিই, সেই অনুসারে গানের এক লাইনের এক অংশ একজন গায়, তার পরের অংশ আর একজন, তার পরের অংশ আর একজন, এমনি ক'রে দশজন মিলে দশ রকম গলায়, ও বিশ পঁচিশ রকম ভাবে গানটা গেয়ে আসর মাৎ ক'রে ফেলে। কিন্তু এখানে আমি একলা, সুতরাং আমার একাদশপদী কবিতার সুরটা তোমাকে শোনাই।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

বন্ধুর সহিত গীতবাদ্য

সাঁঝের তারা একবার নিভ্‌ছে,
তৎক্ষণাৎ আবার জ্ব'লে উঠ্‌ছে,
এতে মনের মধ্যে যাহা হচ্ছে,
সেটা প্রকাশ করা অসম্ভব।

এর রাগিণী হচ্ছে পূরবী। গ্রহ ও ন্যাসগুলো 'নিভ্‌ছে', 'উঠ্‌ছে' ও 'হচ্ছের' উপর। শেষ লাইনটা কেবল তালের উপর বিন্যস্ত।

বিপিন। তালটা কি?

মুকুন্দ। যে তাল বাজাও ঠিক মিলে যাবে। এইত বাহাদুরী একাদশপদী কবিতার। আর একটা বাহাদুরী যে এতে নাচাও চলে। যেমন প্রলয়কালীন তাল ও নৃত্য হয়ে থাকে। আমার মতে নাচ ও গান সবই প্রলয়সূচক, তা' বিশ্বের শেষ মুহূর্ত্তেই হ'ক, কিংবা আমাদের জীবনের কোনো সময়ই হ'ক। দাদার কি বোধ হয়?

বিপিনের নেশা তখন খুব জমেছিল, সে বল্লে 'তাই ত দেখ্‌ছি। এখন তুমি সুরু কর, আমি একটু বাজাই।

মুকুন্দবাবু সুরু ক'রে দিলেন, বিপিন কেতাব বাজাতে লাগ্‌ল। সঙ্গীতকলার বিশেষত্ব এই যে, যদি দুটো লোক আনন্দসহকারে গান বাজনা আরম্ভ করে, তা' হ'লে নৃত্য, গীত ও বাদ্য এমনভাবে পরস্পরের সঙ্গে মিলে মিশে যায় যে তার আর শেষ হয় না।

ক্রমে রাত্রি এগারটা বেজে গেল। গিরিধারী চাকর এসে খবর দিলে যে লুচি ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে। বিপিন তাই শুনে মুকুন্দবাবুকেও খেতে অনুরোধ কল্লে। মুকুন্দবাবু নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বন্ধুর অনুরোধে দু' থালা খেয়ে ফেল্লেন, ও শেষে বল্লেন, যে বাসায় হেঁটে যাওয়া অসম্ভব হ'য়ে পড়েছে। বিপিন তাই শুনে আহ্লাদে অধীর হ'য়ে প'ড়ল, ও আর একটা চৌকিতে মশারি খাটিয়ে বন্ধুর শয্যা সযত্নে পেতে দিলে। ক্রমশঃ উভয়ে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হ'লেন।

৬

কর্ম্মস্থলে কর্ম্মযোগ

সিদ্ধির সাত্ত্বিক নেশা অভ্যাস ক'রে বিপিনের নৈতিক বুদ্ধি যে পূর্ণভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছিল তা কতকগুলো দৃষ্টান্তে জানা গেল। সাহেব হাইকোর্টে রিপোর্ট কল্লেন যে বিপিন এত শীঘ্র নথি সাফ্‌ কর্ত্তে পারে যে একটা দক্ষ মিউনিসিপাল ওভারসিয়র তত শীঘ্র রাস্তা সাফ্‌ করাতে পারে কিনা সন্দেহ। একদিনে বিপিন পঞ্চাশজন সাক্ষীর জবানবন্দী নেয়। যত মোকদ্দমাই থাকুক না কেন, কোনোটা মুলতুবি করে না! সব মোকদ্দমার সাক্ষীগুলোকে একত্র জড়' ক'রে প্রত্যেক মোকদ্দমায় পাঁচটা, দশটা ক'রে বেঁটে সমান ভাগ ক'রে দেয়। সুতরাং একটা মোকদ্দমার সাক্ষী, অন্য মোকদ্দমার কিছু না জানলেও, তাকে সে মোকদ্দমার জবানবন্দী দিতে হয়। কাহাকেও কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয় না। যার যা খুসি কিছু ব'লে গেলেই হ'ল। উকীল মোক্তার জেরা ক'রতে না পারায় চ'টে গিয়ে বাহিরে 'শালা' ব'লে গালি দিতে সুরু কল্লে, তাতে বিপিন ভ্রূক্ষেপও করে না। বিপিন বলে 'কর্ম্ম ক'রে' যাবে মানুষ, ধর্ম্ম রাখ্‌বেন ভগবান। এ পর্য্যন্ত জগতে কার কোন্‌ কথাটা সত্য তা' ভগবান ছাড়া আর কেউ জানে না, কাজেই জেরা ক'রে লোকগুলোকে কষ্ট দেওয়া ঘোর নিষ্ঠুরতা।

বন্ধু মুকুন্দ বল্লে এতে দেশের একটা মঙ্গল হচ্ছে। বিভিন্ন গ্রামের আসামী, ফরিয়াদি ও সাক্ষীর মধ্যে সহানুভূতি দাঁড়াচ্ছে।

বিপিন। পরস্পরের দোষ পরস্পরে দেখ্‌তে পাচ্ছে। আমার বোধ হয় এরা ক্রমে সত্য কথা বল্‌বে, তাতে অপরাধীর সংখ্যা কমে যাবে।

মুকুন্দ। এ সম্বন্ধে তোমাকে আমার মত জানাই। প্রত্যেক মোকদ্দমা একটা ছোট গল্প। উকীল মোক্তার সাহিত্যিক। তাঁ'রা ভাষাটা মার্জ্জিত ক'রে নথির উপযুক্ত ক'রে দেয়। বিপক্ষের উকীল মোক্তার সমালোচক হ'য়ে জেরা ক'রে বুঝিয়ে দেয় যে গল্পের চরিত্রগুলো ফুটে বেরিয়েছে কি না। বিচারক কোনো দোষ পেলেই

আসামীকে সাজা কিংবা খালাস দেয়। গল্পটা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ক'রে নথিতে লিখ্‌তে পারলে হাকিম তার দায়ে খালাস। তুমি যে ভাবে কাজ কচ্ছ, তাতে সমালোচনা বন্ধ হ'য়ে, ছোট গল্পের আদর হ'বে বেশী। উভয় পক্ষ কেবল তৈরি ক'রতেই থাক্‌বে।

বিপিন। কিন্তু কর্ম্মভোগটা আমার। ভগবান গীতায় বলেছেন যে তিনি কর্ম্ম করেন না, অথচ প্রকৃতিবশে তাঁকে ক'রতে হয়। কেন বলত?

মুকুন্দ। বিচার ক'রবার জন্য। ধর্ম্মাধিকরণে বিচার করা ছাড়া ভগবানের আর কি কর্ম্ম আছে? তিনি পাপীকেও ব্যতিব্যস্ত করেন, পুণ্যবানকেও ব্যতিব্যস্ত করেন। কারণ, পুণ্য না ক'রলে কেউ পাপ বোঝে না, পাপ না ক'রলে পুণ্য বোঝে না। ছ'টা রিপুই হচ্ছে পাপপুণ্যের ষট্‌পদ। তাই নিয়ে ছোট ও বড় গল্প, ইতিহাস ও নাটক। এ দিকে জ্ঞান-বুদ্ধি একটাই। কাজেই কর্ম্ম অকর্ম্মের বিচার সূক্ষ্ম।

বিপিন। আমিও ত যতদূর সম্ভব ন্যায়তঃ বিচার কচ্ছি, অথচ লোকে গালি দেয় কেন?

মুকুন্দ। গালি দিলেই জেন' যে বিচার ঠিক হয়েছে। প্রশংসা ক'রলেই জান্‌বে যে চাটুকারের স্বার্থ তার মধ্যে আছে।

বিপিন। মাঝে মাঝে বড় বিপদে প'ড়তে হয়। আমার আফিসে একটা কেরাণীর দরকার। তের জন দরখাস্ত দিয়েছে। সকলেই উপযুক্ত, বাহাল করি কা'কে? এ সম্বন্ধে ভগবান গীতায় কেবল বলেছেন 'দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয়', কিন্তু তারা সকলেই দরিদ্র, এখন ভর্ত্তি করি কোন্‌টাকে?

মুকুন্দ। সব কটাকে।

বিপিন। তা' কি ক'রে হ'বে? মাইনে কুড়ি টাকা। তের জনকে সেই পদ দিলে এক একজনের দেড় টাকা পড়ে মাত্র। তা'তে দিন কি ক'রে চলে?

বন্ধু বিদায়

মুকুন্দ। হাকিম, দোকানদার, উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, সাহিত্যিক এদের দিন চ'লে যাচ্ছে কি ক'রে? একবার পদে ঢুকিয়ে দিলেই হ'ল। বুদ্ধি থাকে ত দেড় টাকার স্থলে দেড়শ' রোজগার ক'রবে, যদি দেশ সুজলাং সুফলাং শস্য শ্যামলাং হয়। এর নাম আসল কর্ম্মযোগ। বড়গুলো ছোট'কে মেরে খেতে পারবে না। দিগ্‌গজ সাহিত্যিকও দশ টাকার বদলে দু'টাকায় একটা গল্প লিখে দেবে। কোলাহল ও গাত্রদাহ ক্রমেই থেমে যাবে। সাধু ও চোরের কোনো নির্দ্দিষ্ট স্থান থাক্‌বে না। হয়ত এতে গালাগালি বেশী খেতে হ'বে। কিন্তু একজনকে বাহাল কল্লেও যে নিন্দা, তেরজনকে সেইপদে বাহাল কল্লেও তাই। গণতন্ত্র, রাষ্ট্রতন্ত্র, রাজাউজীরতন্ত্র, যত রকম তন্ত্র থাকুক না কেন, সকলের মূলেই সেই কর্ম্মযোগ। মারপিট হ'লে সৈন্যসামন্ত পুলিস হয়ত ডাক্‌তে হ'বে। ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য সেগুলো চাই। কোন্‌টা ঠিক তা' কেউ বল্‌তে পারে না। সাহিত্যই হ'ক, আর ধর্ম্মই হ'ক, আর কর্ম্মই হ'ক। কোনটা ঠিক না, তা' সকলেই ব'লে দেবে, কিন্তু কোন্‌টা ঠিক তা বলা অসম্ভব। তাই বেদান্ত বলছেন 'নেতি'। তার বেশী কিছু বল্‌তে পার দাদা? যাহ'ক আমি দু'দিনের জন্য এলাহাবাদে মামার বাড়ী বেড়াতে যাচ্ছি, আবার এসে দেখা ক'রব।

চুরি প্রকাশ

বন্ধু বিদায় নেবার পর বিপিনের মনটা খারাপ হ'য়ে প'ড়ল। রাত্রিতে নিদ্রা হয় নাই। প্রাতঃকালে সরলাকে মনে পড়াতে তার ফটোখানা কেতাবের মধ্যে খুঁজ্‌তে গিয়ে দেখে, যে সেখানে নাই। পাছে ভুলে হাত-বাক্সর মধ্যে রেখে থাকে, তাই বাক্সটা খুলে দেখ্‌ল যে সেখানেও নাই। বাক্সর মধ্যে রিষ্ট-ওয়াচটাও অন্তর্হিত। মাসের প্রথমে মাইনেটা পেয়েছিল, তাও গায়েব। কেবল গিরিধারীর হাতে মাসিক বাজার-খরচটা ছিল তাই রক্ষা! গিরিধারী বল্লে, 'দাদাবাবু, আপনার ঐ বন্ধুকে বিশ্বাস করাটা কাঁচা কাজ হ'য়েছে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

বিপিন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ ক'রে বল্লে, 'গিরিধারী, যা' করেন ভগবানই করেন; আমরা নিমিত্তমাত্র। এখন ফটোখানা পাওয়া যায় কি ক'রে?'

৭

বিপিনের বদলি হওয়ার একমাসের মধ্যেই এই সব ঘটনা। সেই সময়ের মধ্যে কলিকাতায় আর একটা ঘটনা প্রকাশ হ'য়ে পড়ল। ঘটনাগুলো মন্দিরের ঘণ্টার মতো; ঢং ঢং ক'রে বাজে আর চ'লে যায়। হয়ত একটা আওয়াজই আবাহমানকাল ধ্বনিত হচ্ছে, কিন্তু আমাদের সীমাবদ্ধ কানের মধ্যে বোধ হয়, যেন একটার পর আর একটা। বোধ হয়, যেন কত দিনরাত্রি, আলো-আঁধার, জন্মমৃত্যু, সুখদুঃখ হা-হুতাশ একটার পিছনে আর একটা তীর্থযাত্রীর মতো চ'লে গিয়েছে! এই যে অগ্রপশ্চাত্তের ভাব, সেটা সিনেমার মতো। লাফালাফি না ক'রে, স্থির হ'য়ে চিন্তা ক'রলে বোধ হয়, কাল অগ্রসরও হয় না পশ্চাৎগামীও হয় না। তখন আমরা হ্রস্ব নিশ্বাসপ্রশ্বাস দীর্ঘ ক'রে নিয়ে দুঃখপ্রকাশ করি।

সরলার পিতা তারাপদ বাবুর নবজীবন
এবং বিবাহার্থে খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম অবলম্বন

তারাপদ বাবু দেখ্‌তে পেলেন যে সরলাকে তার স্বামীর কর্ম্মস্থানে থাক্‌তেই হবে, তাহ'লে গৃহ অন্ধকার হ'য়ে পড়বে। অন্ধকারের মধ্যে বাস করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব, কারণ তাঁর বয়স মোটে পঁয়তাল্লিশ। তিনি যে-'হৌসের' মুচ্ছুদ্দি সেখানে একজন সুন্দরী টাইপিষ্ট্‌ ছিল, তার নাম 'মেরী'; বয়ঃক্রম পঁয়ত্রিশ। তারাপদ বাবু তাকে মধ্যে মধ্যে জীবনের দুঃখ জানাতেন। মেরী খুব সুশীলা ও শান্তপ্রকৃতি। সে তাই শুনে কেঁদে ফেল্‌ত। একজন স্ত্রীলোক যদি কোন পুরুষের জন্ম কাঁদে, তবে সেটা অমঙ্গলের চিহ্ন। সুতরাং সেই কান্না থামাবার জন্ত তারাপদ বাবু তাকে ভালবেসে ফেল্লেন। সেই ভালবাসা এতদূর তাঁকে আচ্ছন্ন করেছিল যে তাঁর গীতার কথা মনে হ'ল—'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'। কিন্তু অন্ততঃ খ্রীষ্টানধর্ম্মে দীক্ষিত না হ'লে মেরীকে সহধর্ম্মিণী করতে পারবেন না, তাই দেখে তিনি খৃষ্টান হ'য়ে গেলেন, ও মেরীকে বিবাহ কল্লেন। তারাপদ বাবুর নাম হ'ল 'স্তামুয়েল্'।

বৈবাহিক ভট্টাচার্য্য মহাশয় পূর্ব্বে যেমন আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করেছিলেন, এখন তেমনিই অভিশাপ বর্ষণ সুরু কল্লেন। তারাপদ দুঃখিত হ'য়ে বল্লেন, 'দাদা! পরলোকের ব্যবস্থা ইহলোকেই ক'রে ফেলেছি। অদৃষ্টের নির্ব্বন্ধ, কোন চারা নেই।'

সরলা কিন্তু তার নূতন 'মা'কে দেখে খুসি হয়েছিল। যেন লক্ষ্মীর মতো! কিন্তু পিতৃগৃহ ছেড়ে যেতে তার বুক ফেটে গেল। নূতন মা বল্লে, 'মা সরলা, ধনসম্পত্তি গৃহ সবই তোমার নামে স্তামুয়েল্ লিখে দেবেন স্থির করেছেন।'

সরলার পিতৃ-গৃহ ত্যাগ

সরলা বল্লে 'মা! সে-জন্ম কাঁদছি না, আমার চেতনার সঙ্গে এই ঘর, বাপ-মা, শৈশবের লীলাখেলা এতদূর জড়িয়ে গেছে যে, সেই পুরানো কাঁথার নিবিড় সূতোগাঁথাগুলোকে খুল্‌তে পাচ্ছি না। আমি টাকা কড়ির কাঙ্গালিনী না, কেবল মিনতি যে বাবাকে যত্নে রেখ, তাঁর যেন কষ্ট না হয়।'

তারাপদ বাবু তাই শুনে হাউ হাউ ক'রে কেঁদে ফেল্লেন। সরলা পিতার চ'খের জল অঞ্চল দিয়ে মুছে, তাঁর চরণে প্রণতা হ'ল। মেরী সরলাকে বুকে নিয়ে নিজেই কাঁদতে বস্‌ল।

স্বামীগৃহে আগমন

সরলা কেবল তার বিবাহের কাপড় ক'খানি ও গহনা নিয়ে শ্বশুরালয় গেল। মাও নাই, শাশুড়ীও পরলোকগতা। ভট্টাচার্য্য মহাশয় একখানা চাদর কাঁধে ক'রে সরলাকে নিয়ে মানভূমে চলে গেলেন। সেখানে তাকে পৌঁছে দিয়ে পুত্র ও পুত্রবধূকে আশীর্ব্বাদ ক'রে বাটীতে প্রত্যাগত হ'লেন।

পুলিস তদন্ত বন্ধুর শেষ অবস্থা প্রকাশ

সরলার আগমনে বিপিন একটু ত্রস্ত হ'য়ে পড়ল। চুরি সম্বন্ধে পুলিশ তদন্ত চলছিল, কিন্তু বিপিন বল্লে যে মুকুন্দ বাবুর উপর তার সন্দেহ মোটেই হয় না। তিনি নিশ্চয়

ফিরে আস্‌বেন। বিপিনের বাসার একপাশে এক জোড়া পুরানো ডেকৃণ্ড প'ড়ে ছিল, সেটা মুকুন্দ বাবুর পায় অনেকে দেখেছিল, তাতে পুলিসের সন্দেহ বেড়ে গেল। দারোগা মুকুন্দ বাবুর বাসার তালা ভেঙ্গে ফেল্লে। গৃহের মধ্যে অবাক কাণ্ড। একটা বিছানার উপর মুকুন্দ বাবু পড়ে আছেন। মুখ দিয়ে রক্তস্রোত বেরিয়েছিল, সেগুলো বিছানায় গড়িয়ে শুকিয়ে গিয়েছে। বালিশের পাশে অপহৃত রিষ্ট-ওয়াচ, দুশ' টাকা নগদ, ও একখানা চিঠি। চিঠিখানা দারোগা বাবু তৎক্ষণাৎ পড়ে ফেল্লেন। একাদশপদী কবিতার চিঠি।

একাদশপদী কবিতায় বন্ধুর Dying declaration
(মৃত্যুকালীন স্বীকারোক্তি)

যক্ষ্মাকাশ অত্যন্ত বেড়ে যাচ্ছে;
অবস্থা নিতান্ত খারাপ হচ্ছে,
খাবার সংস্থানটা কমে যাচ্ছে,
পরলোকের সন্নিকটবর্ত্তী।

তাই আমি চুরি ক'রে ফেলেছি,
সঙ্গে সঙ্গে অনুতাপ করেছি,
চিঠিতে তাই প্রকাশ করেছি,
মনে রেখ'—মুকুন্দ চক্রবর্ত্তী।

লোকটার চরিত্র কতদূর উন্নত ছিল, তাই বুঝ্‌তে পেরে দারোগা সাহেব পর্য্যন্ত কেঁদে ফেল্লেন। তদন্তে ও ডাক্তারের পোষ্ট-মর্টেম রিপোর্টে প্রকাশ হ'ল যে বেশী লেখাপড়া শিখে, ও মাসিক পত্রিকা প'ড়ে লোকটার মাথা খারাপ হয়েছিল। চুরি ক'রে হঠাৎ এত অনুতাপ হয়েছিল যে কাব্যে সেটা প্রকাশ ক'রতে গিয়ে মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়েছিল। এটা বোধ হয় পূর্ব্বে যক্ষ্মারোগের সূত্রপাত হয়েছিল ব'লে।

সাহেবের মন্তব্য

কালেক্টর সাহেব নিজে এসে সব দেখ্‌লেন শুন্‌লেন, ও বিপিনকে বল্লেন 'আমি তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু এই বন্ধুর সঙ্গে মিশে তোমার আপিসের কাজগুলো এত অদ্ভুত রকমের হয়েছে যে, সকলেরই বোধ হচ্ছে তোমার মাথা বিগ্‌ড়ে গেছে। তুমি দিনকতক ছুটি নিয়ে চিকিৎসা করাও।'

৮

সরলার পূর্ব্বে বড় সাধ ছিল যে স্বামীগৃহে এসে একটা সুখের সংসার পত্তন করে। কিন্তু ঘটনাগুলো এমনি হ'য়ে পড়ল যে, সে সাধ আর পূর্ণ হ'ল না।

সরলার মনের কথা

বিষাদপূর্ণগৃহে, বিষণ্ণ চিত্তে চারিটি অন্ন মুখে দিয়ে বিপিন সরলাকে কোলে টেনে নিয়ে তার বন্ধুর কথা, সিদ্ধি খাবার কথা, কাজকর্ম্মের কথা বল্লে,—ও সরলার কাছে তার বাপের কথা, নূতন মার কথা, গৃহত্যাগের কথা সবই শুন্‌লে তার পর হতাশ নয়নে সরলার দিকে তাকিয়ে থাক্‌ল। শেষে বল্লে, 'সরলা দুঃখের সময় তুমিই সম্বল'।

সরলার সেই কথাতেই মুখ অত্যন্ত উজ্জ্বল ও আনন্দপূর্ণ হ'য়ে পড়ল। সে বল্লে 'দুঃখ কিসের নাথ? আমি সংসারের মেয়ে, সংসারের দুঃখ ত আমার। তুমি স্বর্গের দেবতা, তোমার মনে সংসারের দুঃখ স্পর্শ করতে দেব কেন?'

বিপিন। আমাকে বোধ হয় ছুটী নিতে হবে। কাজকর্ম্মে অনেক গোলমাল হয়েছে।

সরলা। আমার ইচ্ছা, তুমি চাক্‌রিটেই ছেড়ে দেও। তোমার ধর্ম্ম হচ্ছে ব্রাহ্মণের। এ কাজে তোমার মনে শান্তি হবে না। আমি গান জানি, সেলাই জানি, লেখাপড়া জানি, অনেক বড়লোকের মেয়ে আমার ছাত্রী, আমাদের অন্নের অনটন হবে না। তুমি ধর্ম্মগ্রন্থ পড়, সেগুলো বিষদভাবে বই ছাপিয়ে বুঝিয়ে দেও, দেবভাষায় প্রচার কর। আমি সঙ্গে সঙ্গে খাটব।

বিপিনের কর্ম্ম পরিত্যাগ ও পিত্রালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন

সরলার মুখের আশাপূর্ণ কথা, বিপিনের চেতনার সঙ্গে মিলে গেল। সেই দিনই সাহেবকে সেলাম ঠুকে বিপিন কাজে এস্তফা দিলে। লোকে বল্লে, বেটা ব'সে টাকা জমাচ্ছিল, খুব জব্দ হয়েছে। সাহেবী মেজাজের স্ত্রী বিয়ে

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

করেছিল শ্বশুরের টাকাটা পাবার আশায়, সে পথও বন্ধ। এখন একবার কাঁচকলা খেয়ে দেখুক'।

বিপিন স্ত্রীকে নিয়ে পিত্রালয়ে আসাতে তার মনের একটা প্রকাণ্ড বোঝা হাল্‌কা হ'ল। বিবাহের পরে সেই প্রথম দিনের মুক্ত হাসি, তার মধ্যে সংসারের কোনো ভাবনা নাই। সরলা একখানা লালপেড়ে মট্‌কা পরিধান ক'রে প্রাতঃস্নানের পর কীটদষ্ট পুঁথিগুলো সাজিয়ে ফেল্লে, ও যেখানে যেখানে কথাগুলো নষ্ট হয়েছিলো সেগুলো লিখে দিলে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্লেন, 'মা, তুমি যে সরস্বতী, শাপভ্রষ্টা হ'য়ে আমার পুত্রবধূ হয়েছ, তুমি এত সংস্কৃত শিখ্‌লে কার কাছে?'

সরলা বল্লে, 'বাবা! আপনি যখন মন্ত্র পড়তেন আমার তখন বোধ হ'ত যে এগুলো দেবলোকের কথা, তাই আমি মাষ্টার মহাশয়ের কাছে সংস্কৃত-সাহিত্য ও ব্যাকরণ খুব মনোযোগ দিয়ে পড়তেম।'

পুত্রবধূর কথা শুনে কালীপদ ভট্টাচার্য্যের বোধ হ'তে লাগ্‌ল যে তাঁর গৃহ আজ সত্যযুগের বৈদিক গৃহস্থাশ্রম। সেখানে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জ্বলিত, ঈশ্বর বেদীতে অধিষ্ঠিত। সেখানে জরামৃত্যু নাই, অনাহারে মরলেও শোক নাই। যাহা সত্য, যাহা সর্ব্ব মঙ্গলের আধার, যাহা আনন্দময়, কেবল তাহাই দেখ্‌তে লাগলেন।

লোকে বল্‌তে লাগল, ডেপুটির দুরবস্থা হয়েছে বটে, কিন্তু বামুন পণ্ডিতের তেজ এখনো যায় নাই।

প্রতীক্ষা

শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

মাঝে মাঝে ভাবি, "বুঝেছি, বুঝেছি," হায়
কী আলোক দোলে স্বপনের কিনারায়
সবি কোথা ডুবে যায়।
সারা দেহমন পূজা-ঘরে আছি জাগি
চেতনায়-ছোঁওয়া পুণ্য সে-পাওয়া লাগি,
পাবনা কি তা'রে এ বিজন বেদনায়
তারা-ভরা অজানায়?

লুকানো কী মায়া ধেয়ান-উদয়াচলে
প্রথম প্রভাতী জাগরণে উঠে জ'লে
তাপস হৃদয়তলে।
বারে বারে যারে জীবন-সাগরতীরে
সুদূরে দেখেছি ছায়াসম আঁখিনীরে
হ'ল কি সময় অমর মূরতি-তার
পরশিবে নিরালায়?

সূরদাস

শ্রীঅনাথনাথ বসু

১

মধ্যযুগে ভারতবর্ষে বৈষ্ণবধর্ম্মের ভক্তির স্রোত মূলত দুইটি ধারা অবলম্বন করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। উত্তর ভারতে ইহার একটি ধারার—রামধারার কবি তুলসীদাস তাঁহার হিন্দী রামচরিতমানসে রামসীতার পবিত্র কাহিনীকে অমর করিয়া গিয়াছেন। তুলসীদাসের নাম জানেন না অথচ হিন্দীভাষা ও সাহিত্যের সহিত পরিচয় রাখেন এমন লোক বিরল। রামাৎ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থ তুলসীদাসের অমর রামায়ণ—রামচরিতমানস। উত্তর ভারতের হিন্দীভাষী সহস্র সহস্র নরনারীর জীবনকে ইহা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে; শত শত বুভুক্ষু হৃদয়ের ধর্ম্মের ক্ষুধা ইহা মিটাইতেছে।

অপর ধারার—কৃষ্ণধারার কবি সূরদাস। তাঁহার পূর্ব্বে জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস হইতে আরম্ভ করিয়া নরসিংহমেহতা, মীরাবাঈ প্রভৃতি অনেকেই কৃষ্ণবিষয়ক পদ রচনা করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছিলেন, দেশকে কৃষ্ণ-ধারায় অভিষিক্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র জীবনের মধুর কাহিনী লইয়া একটানা একখানা কাব্য-জীবনী হিন্দী সাহিত্যে এমনটি করিয়া পূর্ব্বে আর কেহ রচনা করেন নাই।

সূরদাস "সূরসাগর" রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহা সাগরই বটে। শোনা যায় কবি ১২৫০০০ পদে "সূরসাগর" রচনা করিয়াছিলেন কিন্তু সে "সূরসাগর" আর পাওয়া যায় না। সূরসাগরের যে দুইটী সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে মাত্র ৪০০০ পদ পাওয়া যায়। শোনা যাইতেছে সম্প্রতি নাকি সূরসাগরের একটি পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে ২৫০০০ পদ পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং জনশ্রুতি একেবারেই অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

সূরসাগরের সারাংশ লইয়া সূরসারাবলী গ্রথিত হইয়াছে। পদ-সংগ্রহ ও নাগলীলা নামক যে দুইটি গ্রন্থ সূরদাসের নামে প্রচলিত আছে তাহা সূরসাগরের অংশবিশেষ মাত্র। দৃষ্টি-কূট ছন্দে রচিত শতাধিক পদ লইয়া সাহিত্যলহরী। ইহা দুর্ব্বোধ্য, ও সাধারণ পাঠকের পক্ষে নীরস। পদের অর্থ সন্ধানে যে শ্রম করিতে হয় তাহা অনেক সময়েই পণ্ডশ্রম বলিয়া মনে হয়। বিনয়পত্রিকা নামে আর একটি গ্রন্থ সূরদাসের নামে চলিতেছে; তাহাও সম্ভবতঃ তাঁহার রচনা নহে। মনে হয় সূরদাসের কোন ভক্ত তুলসীদাসের বিনয় পত্রিকার অনুকরণে সূরসাগরের প্রথম স্কন্ধের কতকগুলি প্রার্থনাত্মক পদ সংগ্রহ করিয়া এই নাম দিয়াছিলেন। সূরসাগর সম্বন্ধে সূরদাস বিনয় করিয়া বলিয়াছেন—

শ্রীমুখ চারিশ্লোক দিয়ে ব্রহ্মাকো সুনাই।
ব্রহ্মা নারদসোঁ কহেঁ নারদ ব্যাস সুনাই॥
ব্যাস কহে শুকাদেবসোঁ দ্বাদশ স্কন্ধ বনাই।
সূরদাস সোই কহৈ পদভাষা কর গাই॥

কিন্তু সূরসাগরের কথাভাগ ভাগবত হইতে গৃহীত হইলেও স্বকীয় প্রতিভায় সূরদাস ইহাতে নূতন একটি রূপ দিয়াছেন। তিনি সমগ্র ভাগবত অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু দশম স্কন্ধ লইয়াই তাঁহার বেশী কারবার।

এই কৃষ্ণকাহিনী লইয়া কত কবিই না ভাগবতের দশম স্কন্ধকে আদর্শ করিয়া নিজের ভাষায় কত কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। ওড়িয়া কবি বলরামদাস, তেলেগু কবি পোতান, সকলেই কৃষ্ণচরিত্র গাহিয়াছেন, কিন্তু একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় তাঁহারা ভাগবতের একাদশ স্কন্ধ অবলম্বনে কৃষ্ণের চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু যে কৃষ্ণ বৃন্দাবনের কৃষ্ণ, যশোদাদুলাল, গোপীগণের প্রিয়তম, সুদাম-সুবলসখা, সেই কৃষ্ণের যে মধুর ছবি দশমে ফুটিয়া উঠিয়াছে একাদশে

শ্রীঅনাথনাথ বসু

তাহা তেমন করিয়া ফুটিয়া ওঠে নাই; একাদশে কৃষ্ণ ধর্ম্ম-দ্রষ্টা, দার্শনিক।

সুরদাস দশম স্কন্ধের সেই কৃষ্ণের ছবি আঁকিয়াছেন এবং তাঁহার আদর্শ ছিল ভাগবত; কিন্তু তুলসীদাস যেমন বাল্মিকীকে অতিক্রম করিয়াছেন, তেমনি সুরদাস তাঁহার অপরূপ ও অসমসাহসিক প্রতিভার বলে ভাগবতের কবিকে অতিক্রম করিয়া চলিয়াছেন; কোন বাধা তিনি স্বীকার করেন নাই; ইচ্ছামত কৃষ্ণকে লইয়া খেলা করিয়াছেন; যেখানে যেমন মনে হইয়াছে তেমনি সাজাইয়াছেন; তাহা মূলানুগত হইয়াছে কিনা সেদিকে তাঁহার দৃক্‌পাত নাই। তাই তাঁহার কৃষ্ণ ঠিক ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ নহেন; তিনি যেন কবির মানসশিশু, খেলার পুত্তলি।

উদাহরণ দেওয়া যাক্। বাল্যলীলায় শ্রীকৃষ্ণের যে ছবি সুরদাস আঁকিয়াছেন তাহাতে যশোদার অন্তরের বাৎসল্য-রসের সহিত সুরদাসের অন্তরের যে ভক্তি বাৎসল্যের রূপ ধারণ করিয়াছিল তাহার একটি মধুর চিত্র আমরা পাই। পদের পর পদ গাহিয়া কবি বলিতেছেন কেমন করিয়া শিশু-কৃষ্ণ বালকত্বে পৌঁছাইল, তাহারই মধ্যে কোথাও দেখি শিশু দুষ্টামি করিতেছে, মাতা যশোদা তাহাকে ভৎর্সনা করিতেছেন, তাই সে অভিমান করিতেছে; কোথাও বা শিশু আসিয়া পরের নামে নালিশ করিতেছে; মাখন চুরি করিয়া ধরা পড়িয়া কৃষ্ণ মাকে করুণভাবে মিনতি করিতেছে; কোথাও বা কিশোর কৃষ্ণ গোপীগণের সহিত শঠতা করিয়া তিরস্কার লাভ করিতেছে। কাব্যের সর্ব্বত্রই কবির ও তাঁহার দেবতার এমনি একটা মধুর সম্বন্ধের ছবি আমরা পাই। ইহার সবটুকুই ভাগবত হইতে গৃহীত হয় নাই। লোকমুখে ভক্ত সাধকগণের রচিত পদাবলীতে শ্রীকৃষ্ণের যে ছবি জনসমাজের হৃদয়ে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল সুরদাস তাহাই অবলম্বন করিয়া স্বেচ্ছামত তাহাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া এই মধুর গাথাচিত্র রচনা করিয়াছেন।

এইখানে তুলসীদাসের সহিত সুরদাসের এবং সেই প্রসঙ্গে রামধারার সহিত কৃষ্ণধারার প্রভেদের কথা মনে পড়ে। সুরদাস এবং তুলসীদাস দুইজনেই মহাকবি, দুইজনেই সাধক, তাঁহারা দুইজনেই তাঁহাদের মানসদেবতার ছবি কাব্যের ছন্দে আঁকিয়াছেন; কিন্তু দুইটি ছবির মধ্যে একটি পার্থক্য রহিয়া গিয়াছে যাহা অতি সাধারণ পাঠকেরও চোখে পড়ে। তুলসীদাসের রামায়ণ পড়িতে পড়িতে সর্ব্বদাই মনে হয় তিনি একজন সাধক, তাঁহার রাম পরব্রহ্মের প্রতীক; তাঁহার রচনার মধ্যে সাধনার ভাবটি অত্যন্ত সুপরিস্ফুট; রচনার যে লালিত্য তাহা পরম সাধকের স্বভাবগত সরলতাজাত। সুরদাসের সাধক জীবনের ইতিহাস তাঁহার কাব্যের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে নাই এ কথা বলিতেছি না, কিন্তু তাঁহার রচনার অন্তরালে কবির ছবিটাই বেশী করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে; তাঁহার সঙ্গীতের মধ্যে যে লালিত্য ও স্বচ্ছন্দগতি মাধুর্য্য রহিয়াছে তাহার আড়ালে সাধনার কথা যতখানি প্রকাশিত হইয়া থাকুক না কেন তাহার মধ্যে কবি সুলভ অখণ্ড রসবোধের একটি জাগ্রত পরিচয় পাওয়া যায়। তুলসীদাসের কাব্য পড়িতে পড়িতে এই কথাটাই বড় করিয়া মনে হয় যে একজন সাধকের সহিত চলিয়াছি, যাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বদাই এ জগৎ ছাড়াইয়া অতীন্দ্রিয় লোকের মধ্যে সন্নদ্ধ রহিয়াছে, তাঁহার কথায় যখন হাসি কাঁদি তাহার মধ্যে কোন চপলতা থাকে না, সে হাসিকান্না উভয়ই অত্যন্ত সংযত।

কিন্তু সুরদাসের বেলায় সে সংকোচের অবকাশ নাই; তাঁহার সহিত চলিতে চলিতে মনে হয় একজন একান্ত পরিচিত ঘরের লোকের সহিত তাঁহার জীবনের সুখদুঃখের কথা কহিতে কহিতে চলিয়াছি। এখানে সংযমের বিশেষ প্রয়োজন নাই। তাই বলিয়াই অসংযতভাবে চলি না, কিন্তু মোটের উপর সমস্তক্ষণ সংযত থাকিতেই হইবে এই ভাবটা মনের মধ্যে সর্ব্বদা জাগ্রত থাকিয়া আমাদিগকে কুণ্ঠিত করিয়া রাখে না; আমাদের এই ঘরের লোকটি তাহার যে প্রিয়তমের কথা বলিয়া চলিতেছে সে একান্ত-ভাবেই মর্ত্ত্যলোকের; মাঝে মাঝে এই কৃষ্ণের অবতারত্বের কথা আসিয়া পড়িয়াছে সত্য কিন্তু সুরদাসের এই মানস-দেবতা কবির নিকটে একান্তভাবেই মানব; তিনি আমা-দেরই মত রক্তমাংসের মানুষ; হাসেন, কাঁদেন, অভিমান করেন, রাগ খোসামোদ করেন; তাই কবি তাঁহাকে বকিতে-ছেন, আদর করিতেছেন, তাঁহার আনন্দে হাসিতেছেন, তাঁহার দুঃখে চোখের জল ফেলিতেছেন।

ইহার কারণ রামধারার উপাসক রামকে বিশেষভাবে দেবতারূপেই এবং নিজেকে দাসরূপে স্বতন্ত্রভাবে দেখিয়াছিলেন ; তিনি কৃষ্ণোপাসকের মত দেবতাকে একান্তভাবে আপন করিয়া লইতে পারেন নাই ; তাই রামধারার সাধকের আদর্শ ভক্তদাস মহাবীর,—সীতা নহে, লক্ষ্মণ নহে এমন কি গুহক চণ্ডালও নহে। কৃষ্ণধারার সাধক দেবতাকে একান্তভাবে আপনার করিয়া লইয়াছেন ; তিনি একান্তভাবেই সাধকের ঘরের লোক ; তাই কৃষ্ণধারার আদর্শ রাধা, গোপীগণ, সুবল, শ্রীদাম, সুদাম। দুই ধারার এই পার্থক্য এই দুই ধারার শ্রেষ্ঠ কবি দুই জনের রচনাতে অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এককালে ভারতের সর্ব্বত্র রামায়ণ ও কৃষ্ণকথা গীত হইত ; কিন্তু কৃষ্ণকথায় lyric-এর (গীতি কাব্যের) উপাদান রামায়ণের চেয়ে অনেক বেশী, তাই কৃষ্ণ কথার ছিন্ন ছিন্ন শত সহস্র পদ রচিত ও গীত হইয়া যেমন করিয়া সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছিল, রামায়ণ তেমনভাবে খণ্ডাকারে ছড়াইয়া পড়িতে পারে নাই ; তাই সুরদাসের পদগুলি খণ্ড খণ্ডভাবে লইয়া গাহিলেও তাহাদের সৌন্দর্য্যের বিশেষ হানি হয় না। কিন্তু রঘুকুলকে আশ্রয় করিয়া কবির যে মানসদেবতা প্রাণবান্ হইয়া উঠিয়াছিলেন, তুলসীদাসের রামচরিতমানস তাঁহারই ধারাবাহিক গুণকীর্ত্তন। রঘুনাথের জীবনের কথাটাই এখানে বড় নহে, তাঁহার দেবত্বই বড়। নেহাৎ সব কথা বলিতে হইবে বলিয়াই আমাদের প্রতিদিনের জীবনের সুখদুঃখের কাহিনী তাঁহার জীবনেও প্রতিভাত হইয়াছে ; যদি সে সব কথা বাদ দিলে চলিত কবি হয়ত বাদ দিতেন। তাই দেখি রামচরিতমানসে কবির অন্তর দেবতার কাহিনী সাধনার সংযমে গীত হইয়াছে ; তাহাতে কোন উচ্ছ্বাস নাই, কারণ উচ্ছ্বাস থাকে সেখানে যেখানে আপনার লোক লইয়া কারবার। দেবতা যদি মানুষ হইতেন তাহা হইলে তাঁহার সহিত যে সম্বন্ধ আমরা পাতাইতে পারিতাম এখানে তাহা পারি নাই। তাই তুলসীদাসের কবিতার প্রধান সম্পদ প্রসাদ ও শান্তি ; সুরদাসের কবিতায় মধ্যে এই দুইটি আপেক্ষিক ন্যূনতা পূর্ণ হইয়াছে লালিত্য ও সহজ আনন্দের ঝঙ্কারে।

২

কিন্তু সুরদাস হিন্দী সাহিত্য এবং হিন্দীভাষী সমগ্র উত্তরভারতকে এই যে এক অপূর্ব্ব সম্পদ দিয়া গেলেন অথচ তাঁহার জীবনের কোন ইতিহাসই রাখিয়া গেলেন না, তুলসীদাসের জীবন সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছে।

কিন্তু ভারতবর্ষে এরূপ ব্যাপারে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। ফুলের ফুলত্ব তাহার গন্ধ লইয়াই ; নিজের গন্ধকে ছড়াইয়া দিয়া সে আপনাকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়া নিজের অস্তিত্ব শেষ করিয়া দিয়া যায়, তাহাতে তাহার কোন দুঃখ নাই। এদেশে কবির জীবনকাহিনীর চেয়ে তাঁহার সাধনার ইতিহাস বড় করা হইয়াছে ; কবি তাঁহার জীবনের মূর্ত্ত ফল কাব্যেই রাখিয়া সেইখানেই নিজেকে নিঃশেষ করিয়া দিয়া যান্। রইদাস বলিয়া গিয়াছেন—

ফল কারণ ফুলৈ বনরায়।
পুহপ উপজৈ ত বিলাই যায়॥

সুরদাস তাঁহার দেশকে "সুরসাগর" দিয়াই কৃতার্থ হইয়া গিয়াছেন, ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্রতর সুখ-দুঃখের কাহিনী দিয়া পাঠকের চিত্তকে ভারাক্রান্ত করিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না।

কিন্তু ভক্ত শুনিবে কেন? সত্য ইতিহাসের অভাবকে সে কাল্পনিক কাহিনী দ্বারা অনুরঞ্জিত করিয়া সুরদাসের এক কল্পজীবনী রচনা করিয়াছে, তাহার মধ্যে সত্য আছে, অতিরঞ্জন আছে, নিছক কল্পনাও আছে ; কিন্তু এই মিথ্যায় লোকের অন্তর ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে নাই ; ভক্ত তাহার প্রিয়কে নিজের কল্পনা দ্বারা যে অপূর্ব্ব শ্রীতে মণ্ডিত করে, তাহার মধ্যে অতিরঞ্জন থাকিলেও তাহাতে তাহার কিছু আসে যায় না।

সুরদাসের জীবনকাহিনী লইয়া তাই ঐতিহাসিকগণের মধ্যে নানামত প্রচলিত আছে ; সাধারণতঃ সেগুলি সমসাময়িক যুগে বা সুরদাসের অল্পকাল পরে লিখিত গ্রন্থাবলীর আধারে লিখিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে চৌরাশী বৈষ্ণবোঁকো বার্ত্তা, নাভাজীর ভক্তমাল, প্রিয়াদাসজীর ভক্তমালের টীকা, মহারাজ রঘুরাজ সিংহের রামরসিকাবলীর

শ্রীঅনাথনাথ বসু

নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সকল গ্রন্থে সুরদাসের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা বহু অলৌকিক কাহিনী দ্বারা পরিপূর্ণ। ইদানীন্তন কালে সুরসাগরের সম্পাদক বাবু রাধাকৃষ্ণদাস, স্বর্গগত ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র, অধ্যাপক বেণী-প্রসাদ প্রভৃতি এ বিষয়ে নানা আলোচনা করিয়াছেন।

সুরদাস ছিলেন বিখ্যাত বৈষ্ণব সাধক বল্লভাচার্য্যের শিষ্য এবং তাঁহার পুত্র বিঠ্ঠলনাথের ভক্তসখা। বল্লভাচার্য্য যে সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা তাহার মূল কথা—শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি, বিশেষ করিয়া বালগোপালরূপী শ্রীকৃষ্ণে। এইজন্যই সুর-সাগরে শ্রীকৃষ্ণের মধুর বাল্যলীলা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত দেখিতে পাই। বিঠ্ঠলনাথ কয়েকজন ভক্ত কবিকে লইয়া "অষ্টছাপ" প্রতিষ্ঠা করেন। এই 'অষ্টছাপ অর্থাৎ কবি-অষ্টকের প্রত্যেকেই বিখ্যাত সাধক ও কবি ছিলেন; সুরদাস ছিলেন সেই 'অষ্টছাপের' শিরোমণি।

সুরদাস যখন কৃষ্ণকাহিনী কীর্ত্তন করিতেছিলেন তখন বৃন্দাবনে স্বামী হরিদাস হিতহরিবংশ প্রভৃতি সাধক কবিগণ নানাভাবে কৃষ্ণলীলা গান করিয়া সমগ্র ব্রজমণ্ডলে রসের বন্যা বহাইয়া দিতেছিলেন।

বল্লভাচার্য্য, বিঠ্ঠলনাথ, হরিদাস স্বামী প্রভৃতির সম-সাময়িক বলিয়া সুরদাসের সময় আনুমানিক পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষপাদ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যপাদের মধ্যে। অধ্যাপক বেণীপ্রসাদ অনুমান করেন তিনি ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন।

সুরদাস সম্বন্ধে এইটুকু কথাই ঠিকভাবে জানা যায় যে তাঁহার পিতা রামদাস ছিলেন দরিদ্র ব্রাহ্মণ; দিল্লীর নিকট সীহী গ্রামে সুরদাসের জন্ম হয়; যৌবনে তিনি আগ্রা ও মথুরার মধ্যবর্ত্তী গৌঘাটে বাস করিতেন; তিনি সুকণ্ঠ ছিলেন এবং পদরচনা করিতেন; এইখানেই তাঁহার গুরু-লাভ ও ভগবদ্দর্শন হয়। জীবনের শেষাংশ সুরদাস গোকুলে অতিবাহিত করেন; সেইখানেই গুরু বল্লভা-চার্য্যের আদেশে ভাগবত অবলম্বনে তিনি সুরসাগর রচনা করিয়াছিলেন।

সুরদাস বল্লভাচারী বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি নিজে কোন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন নাই; কিন্তু আজিও উত্তর পশ্চি-মাঞ্চলের যে সকল অন্ধ ভিখারী পথে পথে গান গাহিয়া বেড়ায় তাহারা নিজেদের 'সুরদাস' বলিয়া পরিচয় দেয়। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে যে অন্ধকবি একদিন কৃষ্ণলীলা কীর্ত্তন করিয়া সে যুগের জনসাধারণের চিত্ত মধুররসধারায় অভিষিক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, ইহা তাঁহারই স্মৃতিপূজা।

গ্রিয়ার্সন্ সুরদাসকে 'Blind Bard of Agra' বলিয়াছেন। কাহিনী আছে,—তিনি জন্মান্ধ ছিলেন, এক-দিন পথ চলিতে চলিতে এক কূপের মধ্যে পড়েন এবং সেখানে আকুলভাবে কৃষ্ণের দর্শন ও সাহায্য প্রার্থনা করেন। সাতদিন পরে ভগবানের কৃপা হইল; তিনি তাঁহার শ্রীহস্তের স্পর্শে সুরদাসকে দৃষ্টি দিলেন; জন্মান্ধ সুরদাস নবলব্ধ দৃষ্টির সম্মুখে প্রথমে শ্রীভগবানের অপরূপ রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাঁহার হাত ধরিলেন; ভগবান সে হাত ছাড়াইয়া লইয়া চলিয়া গেলেন। তখন সুরদাস গাহিলেন—

বাঁহ ছোড়াকর চলি জাতে হো দুর্ব্বল জানিকৈ মোহি।
হিরদয় সোঁ জব জইহো মরদ বচ্ছানিয়ৈঁ তোহি॥

"আজ আমায় দুর্ব্বল জানিয়াই তুমি আমার হাত ছাড়াইয়া চলিয়া যাইতে পারিলে; কিন্তু সেদিন তোমার শক্তি বুঝিব, সেদিন তোমাকে শক্তিমান বলিব, যেদিন তুমি আমার হৃদয় ছাড়াইয়া চলিয়া যাইতে পারিবে।"

অন্ধ সুরদাস এইভাবেই দিব্যদৃষ্টি পাইয়াছিলেন।

কেহ কেহ বলেন তিনি জন্মান্ধ ছিলেন না; এই অন্ধতা তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত। একদা এক যুবতীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া তাহাকে কামনা করিয়াছিলেন, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই এই দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারিয়া অনুতাপে নিজের চক্ষু উৎপাটিত করিয়া দেবতাকে উপহার দিয়া এই ক্ষণিক দুর্ব্বলতার প্রায়শ্চিত্ত করেন।

মধ্যযুগের অনেক সাধক সম্বন্ধেই এইরূপ কাহিনী প্রচলিত আছে।

সুরদাসের কাব্য পড়িলে, তাহার বর্ণনার সত্যতা ও সৌন্দর্য্য আলোচনা করিলে কিন্তু মনে হয় তিনি জন্মান্ধ ছিলেন না। হয়ত' জীবনের শেষ দিকে তিনি বাহিরের দৃষ্টি হারাইয়াছিলেন; কিন্তু তখন তাঁহার অন্তরের দৃষ্টির

আবরণ উন্মুক্ত হইয়া চিত্তশতদল সেই আলোতে বিকসিত হইয়াছিল—তখন আর তাঁহার বাহিরের দৃষ্টির প্রয়োজন ছিল না।

গোকুলে সাধন-ভজনের অবকাশে তাঁহার সুরসাগর রচিত হয়। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সুরদাস কৃষ্ণ-পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত শেষ পদ গুরু বল্লভাচার্য্যের উদ্দেশ্যে রচিত। সুরদাস তখন মৃত্যুশয্যায়; বিঠ্ঠলনাথ বলিলেন "সুরদাস বহু পদই ত' রচনা করিয়াছ কিন্তু তোমার গুরুর উদ্দেশ্যে কোনো পদ না রচনা করিয়াই চলিলে?" সুরদাস বলিলেন—"আমার দেবতাই আমার গুরু এবং গুরুই আমার শ্রীকৃষ্ণ। তবুও আজ তাঁহার কীর্ত্তন করি"—এই বলিয়া তিনি একটি পদ রচনা করেন। ইহাই তাঁহার শেষ রচনা। ইহার পর তাঁহার মৃত্যু হয়।

ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র সুরদাসের যে নূতন জীবনকাহিনী তাঁহার আত্মচরিত বলিয়া প্রচার করেন তাহাতে বলা হইয়াছে তিনি জগতিয়া ভাট বংশে বিখ্যাত রায়সা রচয়িতা চন্দ বরদাজের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; সুরদাসের আসল নাম ছিল সুরজচংদ; তাঁহার ছয় ভাই মুসলমানদের হস্তে নিহত হয়; তিনি জন্মান্ধ ছিলেন। নানা আভ্যন্তরীণ প্রমাণে মনে হয় এই জন্মকাহিনী মিথ্যা এবং বিঠ্ঠলনাথ প্রভৃতির প্রদত্ত জীবনী নানা অলৌকিক কাহিনী পূর্ণ হইলেও তাহা মূলত সত্য।

হিন্দী সাহিত্যে সুরদাসের আসন সম্বন্ধে বলিতে গিয়া একটি সুপরিচিত পদের উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে মনে করি।

সুর সুর তুলসী শশী উড়ুগণ কেশবদাস।
অবকে কবি খদ্যোতসম জহঁ তহঁ করত পরকাশ॥

হিন্দী সাহিত্যাকাশে সুরদাস রবি, তুলসীদাস শশী—আর কেশবদাস নক্ষত্র; আজকালকার কবিগণ খদ্যোতের মত সেই আকাশের বহু নিম্নে যেখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়ায়।

এই একটি পদে সুরদাসের সমালোচনা জনসাধারণ করিয়াছে এবং জনসাধারণের এই প্রাকৃতজনোচিত সমালোচনা নেহাৎই মিথ্যা নহে। হিন্দী সাহিত্যে সুরদাস তাঁহার সাধনা দ্বারা অক্ষয় আসন ও অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পরেও বহু কবি কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার সেই মধুরকামলকান্ত পদাবলী চিরদিনই অতুলনীয় হইয়া থাকিবে।

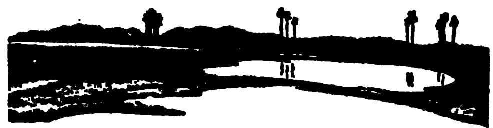
বোধ করি তাঁহার মত জন্মজন্মান্তরের অতৃপ্ত তৃষ্ণা লইয়া আর কোন কবিই কাব্য রচনা করেন নাই। তাঁহার জীবনে সে তৃষ্ণা মিটিয়াছিল কিনা জানি না; তিনি গাহিয়াছিলেন—

অঁখিয়া হরিদরশনকী প্যাসী।
দেখ্যো চাহত কমলনৈন কো, নিশিদিন রহত উদাসী॥

অন্ধ সুরদাস জীবনের শেষে সেই আকাঙ্ক্ষিত দর্শন লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। তাঁহার সমগ্র রচনা তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

নতুন চরে*

শ্রীসুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য



ভাঙন-ভরা ধলেশ্বরীর বুকে নতুন চর,
বন্ধুয়ারে আমার লাইগা বাইন্ধো সেথা ঘর।
রাইত পায়াল্যে কাচা রৈদের সোনায় চাইরো দিগ
সেথা,—করেরে ঝিক্‌মিক্।
সবার আগে মাছরাঙারা আইসা ঝাকে ঝাকে
সেই সোনা গায় মাখে।
খানিক পরে উড়াল দিয়া গাঙচিলারা আসে
বসে জলের পাশে,



আইসে কত যায় বা কত হরিষে ডগ্‌মগ্
হাশ বিস্তাশের নানান্ পাখী শালিক চখা বক।
ঠিক দুফরে যখন চরে বারে রৈদের ঝাজ্
আমি তখন করমো না আর কাজ,
আরেক পারের দিগে চায়্যা ঝির্ ঝিরানি হাওয়ায়
বস্‌মো খোলা দাওয়ায়,



কারু তখন কাম থামেনা আসেনা অবসর
ডাঙারি হাশ পর,
ব্যাপারি বয় মস্ত বোঝা অনেক দূরের হাটে
বউরা আসে ঘাটে,



ভাঙ্‌গি পারের ঘূর্ণা পথে গুণ টানে মাল্লায়,
বোঝাই-করা ভাওইলা নাও উজান বয়্যা যায়।
আর পারে কাম চলব্যো যখন এইমত, সেই সুমে
চোখ যে আমার আসব্যো বুজ্যা ঘুমে;
চরে যখন ঘনায় ছায়া, ফিরেন সোনার বাটে,
সূর্য্য ঠাকুর পাটে,
তখন পাখীর সাঁঝল্যা ডাকে ভাঙব্যো ধীরে ঘুম।

শিল্পী নিরঞ্জন

সাঁঝ সোনালির সোয়াগ্ মাখা আকাশ মাঝে যেই
দেখ্তে না দেখ্তেই
পর্থম তারা ফুট্ব্যো দূরের হীরামাণিকটুক
উঠ ব্যো কাঁপ্যা আচম্বিতে মাঝ দরিয়ার বুক ;—
আধ্ নীলা রং পাৎলা আন্ধে আব্ছা হৈবো সব,
আসব্যো থাম্যা পোখ পাখালির রব ;
ফিনিক দিয়া জলব্যো বাতি ছুইয়ো পারের গায় ;
তখন নিরালায়—



সপ্ত সায়র পারে যে ভাশ, তারো অনেক দূরে
নিদ্রা পরীর পুরে
সোনার কোঠায় মণির পালং শিথান পাশে তার,
হিরার ঝাপিটার
ঢাক্না খুল্যা স্বপনগুলা নিয়া যে নিচ্চুপে
দ্বিতীয়ারই চান্দ্ যখনে পলায় চুপে চুপে,



সেই স্বপনের একটা যদি আস্তে খস্যা পড়ে
নাম্ব্যো সে যে আমাগোর এই চরে
থাম্ব্যো সে যে চোখের আমার পাতায় দিয়া ভর,
কাপন থর থর্
জাগব্যো তখন বুকে আমার অবশ হৈবো হিয়া ;
একখানি হাত দিয়া
তখন তারে রাইখো তোমার সোয়াগ ভরা বুকে।
জোয়ার-লাগা-সুখে
পরাণ যখন উথাল পাথাল, তখন যবে তার এ
গহীন রাইতে ভাঙ্ব্যো স্বপন দারুণ অন্ধকারে ;



হাতটী তোমার নিজ হাতে সে থুইবো বুকের পর,
এক পলকে ঘুচব্যো সকল ডর,
অকূল আন্ধের অঠাই মাঝে তোমারি সে ছোঁয়ায়
লক্ষ রোমের রোয়ায়
পরাণ আমার কইবো কথা তোমার হিয়া মাঝে,
জনম ভরা লাজে
যে সাধ বুকে রইলো রে হায় দুখের হেন ঢাকা,
মেলব্যো সে যে পাখা,
এক উড়ালে প্রাণের আমার পাথার হয়্যা পার,
পড়ব্যো বয়্যা নিশুৎ রাইতের চুমায় বন্ধুয়ার।



(৬)

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী

পাণ্ডুরঙ্গ দেখা শেষ ক'রে আমরা কৌঠার যাত্রা করলাম। পূর্ব্বেই বলেছি কৌঠার হচ্ছে বর্ত্তমান খান-হোয়া (Khan-hoa) প্রদেশ। খান্‌-হোয়ার বর্ত্তমান রাজধানী হ'ল না-ত্রাং (Nha-Trang)। প্রাচীনকালে কৌঠার ছিল চম্পার একটী প্রধান বিষয়। কৌঠারের রাজধানী পো-নগরের ভগ্নাবশেষ না-ত্রাং-এর অনতিদূরেই অবস্থিত। না-ত্রাং থেকেই প্রাচান কৌঠারের কীর্ত্তিসমূহ দেখা সহজ সাধ্য। তাই না-ত্রাং-ই হ'ল আমাদের লক্ষ্যস্থল।

কান-রাং থেকে সকাল বেলা আমরা না-ত্রাং-এর উদ্দেশে বের হ'লাম। এখানে আমাদের একজন নূতন সহযাত্রী জুট্‌লেন। ইনি একজন ওলন্দাজ কুমারী। বয়স প্রায় যাটের কাছাকাছি। ইনি বাটাভিয়ার (Batavia) প্রাচ্যবিদ্যাপীঠে অনেকদিন ধ'রে কাজ ক'রে অবশেষে ইন্দোচীন দর্শনে এসেছিলেন। কান-রাং-এ এসে ইনি আমাদের সঙ্গে জুট্‌লেন, আমাদের সঙ্গে কৌঠার দেখ্‌বার উদ্দেশ্যে।

কান-রাং থেকে না-ত্রাং রেলপথে যেতে হয়। প্রায় ১০০ মাইল পথ তিন ঘণ্টায় পৌছানো যায়। এ রেলপথ না-ত্রাং থেকে কিছু দূরে গিয়েই শেষ হয়েছে। না-ত্রাং-এর পর আনামের পর্ব্বতমালা বেশী দুর্গম হ'য়ে উঠেছে। কান্‌-রাং থেকে না-ত্রাং পর্য্যন্ত যে ভূমিভাগ সেটা অনেক নীচু তাই ধন-ধান্যে সুশোভিত। ছোট্ট কয়েকটা নদী এই ভূমিভাগকে নদীমাতৃক ক'রে তুলেছে। এই নদীগুলির ভিতর যেটা সব চেয়ে প্রধান সেটা না-ত্রাং-এ এসে সমুদ্রে মিশেছে। নদীর একধারে বর্ত্তমান না-ত্রাং, অন্য ধারে প্রাচীন পো-নগর।

কান-রাং থেকে সকালে ৮টায় রওনা হ'য়ে আমরা বেলা প্রায় ১১টায় না-ত্রাং পৌছলাম ও সেখানকার বাংলোতে আশ্রয় নিলাম। আমাদের আহারাদির ব্যবস্থা ছিল ফরাসী রেসিডেণ্টের গৃহে। না-ত্রাং-এ যে ক'দিন ছিলাম—সে ক'দিন সরকারের অতিথি হিসাবেই কাটিয়েছিলাম। না-ত্রাং স্থানটী বেশ মনোরম। সমুদ্র থেকে বেশ একটু উঁচু—ও সুরক্ষিত। এর উত্তর দিক দিয়ে সুপ্রশস্ত নদীটা এসে সাগরে পড়েছে। নদীর পর পারেই উঁচু পাহাড়। পাহাড়ের উপরে প্রাচীন কৌঠারের ভগ্নাবশেষ। না-ত্রাং-এ অধিবাসীরা সকলেই আনামী। এদিকে কোন চ্যামকেই দেখা যায় না।

* * *

চম্পার উপকূলে কৌঠার বোধ হয় হিন্দুদের প্রথম উপনিবেশ। চম্পার সব চেয়ে প্রাচীন স্মৃতিচিহ্নগুলি কৌঠার কিম্বা তার নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহেই পাওয়া গেছে। না-ত্রাং-এর অনতিদূরে বো-চান্‌ (Vo-can) নামক স্থানে চম্পার সব চেয়ে প্রাচীন সংস্কৃত লেখ পাওয়া গেছে। এই



ডংডুয়ং-এর ভগ্নাবশেষ
(অমরাবতী)

হয়েছে এই কথার উল্লেখ আছে। "শিবো দাসো বধ্যতে"—কোন্ এক হতভাগ্য শিবদাসকে এইখানে যেন তান্ত্রিক মতে বলি দেওয়া হয়েছিল। মাতৃভূমি-হারা ও পথ-হারা হিন্দুকে ধর্ম্মের নামে আনামের এই সুদূর উপকূলে দুর্গম পর্ব্বতের প্রান্তভাগে হত্যা করা হয়েছিল। প্রাচীন সংস্কৃত অক্ষরের লেখ ও এই নির্জ্জন পর্ব্বত আজও সে বর্ব্বরতার সাক্ষ্য দিচ্ছে। সব চেয়ে বেশী লেখ পাওয়া গেছে পো-নগরে; কারণ সেইটাই ছিল প্রাচীন কৌঠারের রাজধানী। প্রাচীন লেখমালায় কৌঠারের যে রাজধানীর উল্লেখ আছে তার নাম হচ্ছে ইয়াং পু-নগর (Yang pu-Nagar)। এই নগরের দেবতার * উদ্দেশ্যে যে সমস্ত মন্দির নির্ম্মিত হয়েছিল সেগুলিকেই বর্ত্তমানে পো-নগরের মন্দির বলা হয়। প্রাচীন পু-নগর ও বর্ত্তমান পো-নগর যে এক তা'তে কোন সন্দেহ নেই।

কৌঠার এক সময়ে খুব পরাক্রমশালী হ'য়ে উঠেছিল এবং কৌঠারের রাজারা অনেক সময় সমস্ত চম্পার উপর আধিপত্য করতেন। প্রাচীন পু-নগর কিছুকালের জন্য সমস্ত চম্পার রাজধানীতে পরিণত হয়েছিল ও বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হ'য়ে উঠেছিল। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম পর্য্যন্ত এই সমৃদ্ধি অটুট ছিল।

লেখ খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ ভাগের ব'লে অনুমান করা হয়। এই লেখে শ্রীমার নামক রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়—তিনিই বোধ হয় কৌঠারের প্রথম হিন্দু রাজা ছিলেন। কৌঠারের কিছু উত্তরে চো-দিন্ (Cho-Dinh) নামক স্থানে সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী পাহাড়ের উপর দু'টী সংস্কৃত লেখ পাওয়া গেছে। এ দু'টী লেখও খুব প্রাচীন—একটীতে রাজা ভদ্রবর্ম্মণের উল্লেখ আছে (খৃঃ ৫ম শতাব্দী), অন্যটীতে এক হতভাগ্যকে বলি দেওয়া

* * *

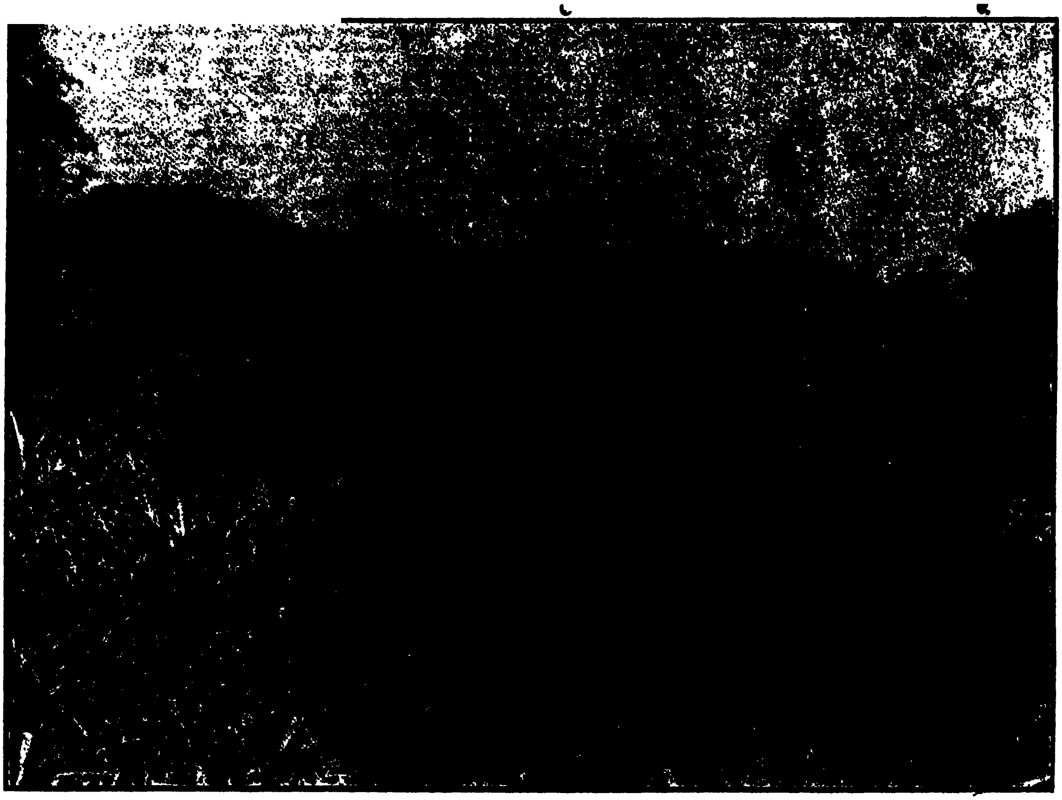
* এই নগর দেবতার নামও ইয়াং-পু-নগর দেওয়া হয়েছে। ইয়াং-পু-নগর কথাটির অর্থ "নগর-ভগবতী" বা "রাজেশ্বরী"। পো-নগরের মন্দিরের প্রধান অধিষ্ঠাত্রী দেবী ঠিক কে ছিলেন তা বর্ত্তমানে বলা যায় না। প্রাচীন লেখমালাতে এঁ-কে "ভগবতী" এবং "কৌঠার দেবী" আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

ইন্দোচীন ভ্রমণ

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী

আমরা একদিন মধ্যাহ্নে পো-নগরের মন্দির দেখ্‌তে বের হ'লাম। আকাশে তখন অল্প অল্প মেঘ দেখা দিয়েছে। বৃষ্টি হবার খুব আশঙ্কা নেই ভেবে আমরা সেদিন মন্দির দেখ্‌বার সঙ্কল্প করলাম। না-ত্রাং অতিক্রম ক'রে না-ত্রাং-এর নদীর মোহানায় এসে পৌঁছলাম। পো-নগরে যেতে হ'লে এখানে পার হ'তে হয়। অভিনব দৃশ্য—ডাইনে বিশাল সমুদ্র। পেছনে না-ত্রাং-এর ক্ষুদ্র নগর। নগরের নীচুতেই সমুদ্রতটে সারি সারি সাম্পান বাঁধা রয়েছে। বিদেশী বণিকেরা যেমনি ভাবে সেকালে কৌঠারে বাণিজ্য করতে আস্‌ত এখনো তেমনি আসে। এদের সঙ্গেই হিন্দুরা প্রথম কৌঠারের উপকূলে এসেছিলেন ও এ নদীর মোহানায় তাঁদের প্রথম উপনিবেশ গ'ড়ে তুলেছিলেন। নদী মোহানার কাছে সুপ্রশস্ত। পর পারেই উঁচু পাহাড়। তার উপর পো-নগরের মন্দির চূড়া দেখা যাচ্ছে।

ছোট নৌকায় নদী পার হ'তে হয়। নৌকায় উঠ্‌তেই অল্প বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল ও আমরা ভিজ্‌তে সুরু করলাম। পর পারে পৌঁছবার পূর্ব্বেই বৃষ্টিপাত খুব বেশী হ'য়ে উঠ্‌লো। বৃষ্টিতে এমনি ভাবে ভিজে আমরা কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে পো-নগরের পাহাড়ে চড়তে আরম্ভ করলাম। নদীর ধার দিয়ে পাহাড়টা খাড়া উঠেছে; এক পাশ দিয়ে পথ।



মি-সনের ভগ্নাবশেষ
(অমরাবতী)

প্রাচীনকালে নদীর ধার থেকে মন্দির প্রাঙ্গণে উঠ্‌বার জন্য প্রশস্ত সোপান ক'রে দেওয়া হয়েছিল। এখন তার ভগ্নাবশেষ মাত্র চোখে পড়ে। পাহাড়ের চারদিকে এখন ভীষণ বন। পথের দুই ধার লতাগুল্মে ভ'রে উঠেছে। বৃষ্টিতে এই চড়াই পথ এত পিছল হ'য়ে উঠেছিল যে আমাদের অতি সন্তর্পণে পাহাড়ে আরোহণ করতে হয়েছিল। উপরে উঠ্‌লেই সুপ্রশস্ত মন্দির প্রাঙ্গণে এসে পৌঁছানো যায়। প্রাঙ্গণের দু'ধারে ছোট ছোট কয়েকটী মন্দির, মাঝখানে "কৌঠার দেবীর" বৃহৎ মন্দির। চারদিকে দৃষ্টিপাত করলেই মনে হয় স্থানটী সেকালে বেশ সুরক্ষিত ছিল। যুদ্ধবিগ্রহের সময় কৌঠারের রাজারা এখানে ধন-রত্ন রক্ষা করতেন, অনুমান হয়। এই জন্যই পো-নগরের মন্দিরের উপর প্রায়ই বিদেশী শত্রুর লোলুপ দৃষ্টি পড়ত। না-ত্রাং-এর সমতল ভূমিতে শত্রুকে বাধা দেওয়া সম্ভবপর ছিল না। এই জন্যই কৌঠারের রাজারা পাহাড়ের উপর পো-নগরের এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন। চম্পা যখন এক রাজার অধিকারে এসেছিল তখনও অমরাবতী থেকে চম্পার রাজারা পো-নগরের তত্ত্বাবধান করতেন ও অনেক সময়ে এই মন্দিরে আশ্রয় নিতেন। মন্দির-প্রাঙ্গণ থেকে সমুদ্রে বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে। সুতরাং যুদ্ধ বিগ্রহের সময় এখান থেকে শত্রুর নৌবহর পর্য্যবেক্ষণ করা চল্‌ত।



স্কন্দমূর্ত্তি—মি-সন
(খৃঃ ৭ম শতাব্দী)

* * *

পো-নগরের মন্দিরগুলি প্রায় অটুট রয়েছে। ছোট দু'একটী মন্দির শুধু জীর্ণ। প্রধান মন্দিরটীর সংস্কার করা হয়েছে। এ মন্দিরে শিল্পনৈপুণ্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়না। পাণ্ডুরঙ্গের শ্রীলিঙ্গরাজের মন্দিরের মতই প্রস্তরে নির্ম্মিত। বাইরে যে সামান্য ভাস্কর্য্যের নিদর্শন ছিল তা এখন লোপ পেয়েছে। অধিষ্ঠাত্রী দেবতা "কৌঠার দেবীকে" আর কেউ এখন পূজা দেয় না। দেবার মত কেউ এখানে নেই। চ্যামেরা বিতাড়িত। মন্দির এখন একজন আনামীর তত্ত্বাবধানে আছে। মন্দিরে যে সব ধনরত্ন পাওয়া গিয়েছিল তা' বর্ত্তমানে হ্যানয়ের প্রাচ্যবিদ্যাপীঠের মিউজিয়মে সংরক্ষিত হয়েছে। প্রাচ্যবিদ্যাপীঠের কর্ত্তৃপক্ষই মন্দির রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিয়েছেন।

এই মন্দিরে যখন আমরা পৌঁছলাম তখন সকলেই শীতে কাঁপছি। মন্দিররক্ষকের অনুপস্থিতিতে তাঁর স্ত্রীই

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী

আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। আনা-মী-রমণী বিশিষ্ট ভদ্রতা সহকারে আমাদের জন্য মন্দিরের একপ্রান্তে আগুন তৈরী ক'রে দিলেন, ও চা নিয়ে এলেন। শরীরটাকে একটু গরম ক'রে নিয়ে আমরা মন্দির দর্শনে মনোনিবেশ করলাম। এই মন্দিরের সংস্কারক আঁরি পার্মাঁতিয়ে (Henri Parmentier) আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি তন্ন তন্ন ক'রে তাঁর সংস্কার প্রথা আমাদের বুঝিয়ে দিলেন।

* * *

পো-নগরের মন্দির ঠিক কোন সময়ে নির্ম্মিত হয়েছিল তা বলা যায় না। সংস্কৃতলেখমালায় এক কিম্বদন্তীর উল্লেখ আছে। মন্দির নির্ম্মাণের পূর্ব্বে এখানে প্রথমে এক শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করা হয়। লিঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজা বিচিত্রসাগর। লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল দ্বাপর যুগের ৫৯১১ বর্ষে। এই কিম্বদন্তীর ভিতর ঐতিহাসিক সত্য কিছু নেই। সুধু এইটুকু অনুমান হয় যে কৌঠারের প্রাচীন হিন্দু রাজবংশ সগরবংশের সহিত নিজেদের সম্বন্ধস্থাপনের জন্য এই কিংবদন্তীর উদ্ভাবন করেছিলেন।



মি-সনে প্রাপ্ত দেবীমূর্ত্তি
(খৃঃ ১০ম শতাব্দী)

পো-নগরের মন্দিরে প্রথমে পাণ্ডুরঙ্গের শ্রীলিঙ্গরাজের মত যে এক মুখলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তা'তে কোন সন্দেহ নেই। ৬৯৬ শকে (খৃঃ অঃ ৭৭৪) মালয়বাসীরা সমুদ্রপথে এই মন্দির আক্রমণ করে। মন্দির ধ্বংস ক'রে ধন-রত্ন সমূহ লুণ্ঠন করে ও রত্ন-মণ্ডিত মুখলিঙ্গকে অপহরণ করে। চম্পার রাজা সত্য-বর্ম্মণ শত্রুর নৌবহর অনুসরণ ক'রে শত্রুকে জল-যুদ্ধে পরাজিত করলেন বটে কিন্তু মুখলিঙ্গ সমুদ্রের অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হ'ল। দেবতার উদ্ধারসাধন আর সম্ভব হ'ল না।

সত্যবর্ম্মণ বিষাদ ভরা হৃদয়ে ফিরে এলেন। জয় গৌরব তাঁর কাছে বৃথা মনে হ'ল। কৌঠারে অধিষ্ঠাতা দেবতা চম্পার সব চেয়ে বড় রত্নকে ফিরিয়ে আনতে না পারায় চম্পার যশোগৌরব তাঁর কাছে অস্তমিত প্রায় মনে হ'ল। পুরোহিতদের সহিত পরামর্শ ক'রে পুনরায় মন্দির নির্ম্মাণ করা হ'ল। নূতন মুখলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা হ'ল। এর নাম হ'ল শ্রীসত্য মুখলিঙ্গ। শিবলিঙ্গের পাশে ভগবতী কৌঠার দেবীর ও গণেশের প্রতিষ্ঠা করা হ'ল। চম্পার

রাজারা আনামীদের আক্রমণের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এই মুখ-লিঙ্গকে ও কৌঠার দেবীকে পূজা দিয়েছিলেন। পো-নগরের বর্ত্তমান মন্দির রাজা সত্যবর্ম্মণের প্রতিষ্ঠিত মন্দির ব'লেই অনুমান করা হয়।

কৌঠার দেবী অর্দ্ধনারীশ্বর ও পো-নগরের প্রধান দেবতা ছিলেন। রাজা হরিবর্ম্মণের সময় (৮১৩—৮১৭ খৃঃ অঃ) কৌঠার দেবীর মন্দিরের পাশে অন্যান্য মন্দির নির্ম্মিত হয়েছিল, এবং যণ্ডকলিঙ্গ (শিবলিঙ্গের নামান্তর), শ্রীবিনায়ক ও শ্রীমলদাকুঠার দেবীর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এইরূপে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত চম্পার অধিপতিরা পো-নগর মন্দিরের সমৃদ্ধি বাড়িয়ে তুলছিলেন ও কৌঠার দেবীর পূজা দিয়ে আস্‌ছিলেন।



বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি—হ্যানয় মিউজিয়ম

উত্তর থেকে আনামীদের আক্রমণে চম্পার অধিপতিরা উদ্বাস্ত হ'য়ে অমরাবতী ও বিজয় ছেড়ে দিয়ে যখন দক্ষিণে স'রে আস্‌ছিলেন তখন কৌঠার ও পাণ্ডুরঙ্গই তাঁদের শেষ আবাসস্থলে পরিণত হয়েছিল। পঞ্চদশ খ্রীষ্টাব্দীর শেষ-ভাগে চম্পার রাজবংশের শেষ প্রতিনিধি শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হ'য়ে এই কৌঠারেই তাঁর শেষ জীবন যাপন করেছিলেন।

* * *

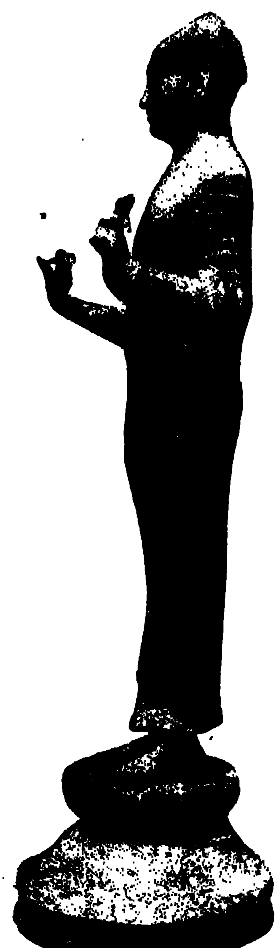
পো-নগর ও তার নিকটবর্ত্তী কয়েকটী স্থান দেখেই আমাদের চম্পা দেখা শেষ করতে হ'ল। অমরাবতী ও বিজয়ের ধ্বংসাবশেষ দেখ্‌বার আশা এবারকার মত ত্যাগ করতে হ'ল। বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় স্থলপথে আর অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর ছিল না। জলপথেও সমস্ত স্থান দেখা বহু সময় সাপেক্ষ। সুতরাং সাইগণে ফিরে আমি ও আমাদের সহযাত্রী ওলন্দাজ কুমারী জাহাজ নিয়ে হ্যানয় রওনা হব ঠিক হ'ল। আচার্য্য লেভি, পার্ম্যাতিয়ে এঁরা সকলে অন্যপথে হ্যানয়ের মিলিত হবেন। বৃদ্ধা ওলন্দাজ কুমারী ভ্যানগুর (Van Goor) পো-নগরের মন্দির দেখ্‌বার দিন বৃষ্টিতে ভিজে এমন ভয় পেয়েছিলেন যে দু'দিন তিনি শয্যাত্যাগ ক'রে বাইরেই আসেন নি। সাইগণ

ফিরবার আশায় তিনি খুব আনন্দই লাভ করলেন! সেখানে গেলেই পথশ্রম দূর হবে ভরসায়।

সাইগণের গাড়ী না-ত্রাং থেকে ভোর বেলা ছাড়ে,—প্রায় ৪টায়। সায়াহ্নে ফরাসী রেসিডেণ্ট মহাশয়ের বাড়ীতে ভূরি ভোজন ক'রে তাঁর কাছ থেকে আমরা বিদায় নিয়ে এলাম। রাত্রি জেগে জিনিষপত্র গুছিয়ে নিলাম। ৪টায় উঠ্‌তে হবে ভাবনায় বিশেষ ঘুম হ'ল না। ভোর বেলা আমরা হাতমুখ ধুয়ে ষ্টেশনের দিকে রওনা দিলাম। কিছুদূর যেতে না যেতেই থাম্‌তে হ'ল। রাস্তা সমস্ত জলে ভ'রে গেছে। দু'দিন ধ'রে অনবরত বৃষ্টি হবার ফলে সমস্ত পথ ডুবে গেছে। এতটুকুও অগ্রসর হবার উপায় নেই। হতাশ মনে আমরা বাংলোতে প্রত্যাবর্ত্তন করলাম। তখনও একটু একটু বৃষ্টি পড়ছিল। কুমারী ভ্যানগুর বিশেষ চিন্তাকুল হ'য়ে উঠ্‌লেন, ও সকাল হ'তেই পার্মাঁতিয়েকে খবর পাঠালেন।

দুপুর বেলা আমরা খেতে বসেছি। হঠাৎ পার্মাঁতিয়ে এসে খবর দিলেন যে আমাদের সাইগণ যাওয়া অসম্ভব। প্রায় ত্রিশ মাইল ধ'রে রেলপথ জল-প্লাবনে ধুয়ে গেছে। অথচ সাইগণে না গেলেও নয়। সেখানে হোটেলে আমাদের জিনিষপত্র ফেলে এসেছি। কুমারী ভ্যানগুর মনে এতই আঘাত পেলেন যে তাঁর চোখ জলে ভরে উঠ্‌লো। বর্ষণও কিছু হ'ল। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তাহ'লে কি হবে?" এতটা কাণ্ড হবে পার্মাঁ-তিয়ে আশঙ্কা করেন নি। তিনি লজ্জিত হ'য়ে বল্‌লেন যে "ভয়ের কোন কারণ নেই। জিনিষপত্র কিছু হারাবে না।" তিনি জাহাজে আমাদের জিনিষপত্র তুলে দেবার জন্ত সাইগণে পূর্ব্বেই তার করেছিলেন। না-ত্রাং-এর কিছু উত্তরে হোন-লোঙ্‌ (Hon-long) নামক বন্দরে জাহাজ ধরবার কথা। সুতরাং সাইগণে না ফিরতে পারলেও হোন-লোং-এ আমাদের জাহাজ ধরবার উপায় ছিল। পার্মাঁতিয়ের আশ্বাসবাণীতেও কুমারী ভ্যানগুর বিশেষ প্রফুল্লতা লাভ করলেন না।

পরদিন রেলপথে আমরা হোন-লোং-এ রওনা হলাম। না-ত্রাং থেকে হোন-লোং পর্য্যন্ত রেলপথ ভালই ছিল। প্রায় দেড় ঘণ্টার পথ। হোন লোং-এর বাংলোতে রাত্রি-বাস ক'রে পরদিন সকালে আমরা জাহাজে উঠ্‌লাম।


বুদ্ধমূর্ত্তি—হ্যানয় মিউজিয়ম

জাহাজে উঠে নিজের ক্যাবিনে গিয়ে যখন কুমারী ভ্যানগুর নিজের জিনিষ-পত্র দেখ্‌তে পেলেন তখন আশ্বস্ত হলেন ও মুখে তাঁর হাসি ফুটে উঠ্‌লো।

আমরা হ্যানয় যাত্রা করলাম।

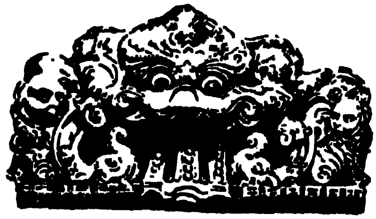
* * *

সে দিন সকালেও টিপ্‌ টিপ্‌ ক'রে বৃষ্টি পড়ছিল। আকাশ কুজ্ঝটিকায় ভরা। চীন সাগরের বক্ষ তরঙ্গে উদ্বেলিত। চম্পার উপকূলভাগ যেন কালীমায় ভরা। এই উপকূলভাগ ত্যাগ করবার সময় মনের উপর যে বিষাদ রেখা পড়েছিল তা আজও মোছে নি। চম্পার এ উপকূলভাগ থেকে হিন্দু বিতাড়িত হয়েছে—ভারতের নাম এখান থেকে লোপ পেয়েছে। এ প্রদেশ ছিল ভারতের উপনিবেশ—হিন্দু এ উপকূল-ভাগে প্রথম সভ্যতা বিস্তার করে। এ প্রদেশের আদিম অধিবাসীকে হিন্দুই প্রথম উন্নত করে। সে সভ্যতার ধারা এখানে আজও বর্ত্তমান—হিন্দুই শুধু এখানে নেই।

ঐতিহাসিকের মানসপটে অনেক চিত্রই আজ প্রতিফলিত হয়। মনে পড়ে—চম্পার অবনতির যুগে আনামী ও দস্যুর আক্রমণে ভগ্নোৎসাহ হ'য়ে কেমন ক'রে এক হিন্দুরাজা এই উপকূলভাগ ত্যাগ করেছিলেন। রাজকুমার সূর্য্যবর্ম্মণ ছিলেন চম্পার হিন্দুরাজবংশের কুমার। ভারতীয় ক্ষত্রিয়ের রক্ত তাঁর প্রতি ধমনীতে প্রবাহিত হ'ত। ভারতীয় গুরুর নিকট তিনি শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করেছিলেন। চম্পার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অনেক যুদ্ধবিগ্রহ তিনি করলেন। শেষে কুচক্রীর চক্রান্তে মাতৃভূমি পাণ্ডুরঙ্গ থেকে বিতাড়িত হলেন। বিজয় ও অমরাবতী থেকেও বিতাড়িত হ'য়ে তিনি দেশত্যাগ করলেন (১২০৩ খৃঃ অঃ)। চু'শো সাম্পানের নৌবহরে ভক্তরা তাঁর সঙ্গ নিয়েছিল। শ্রীবিনয় বন্দর থেকে তিনি কোন্ অজানা দেশের উদ্দেশে যাত্রা করলেন—এই বিশাল চীন সাগরের অশান্ত বক্ষের উপর দিয়ে তাঁর দুই শত সাম্পান পাল তুলে কুজ্ঝটিকার ভেতর দিয়ে কোথায় যে চ'লে গেল—সে কথা কেউ জানে না। সে দিনটাও বোধ হয় এমনি বিষাদভরা ছিল—বর্ষার মেঘে আকাশ ছেয়ে গিয়েছিল—কুজ্ঝটিকার কালীমায় চম্পার এই তটভূমি ভ'রে গিয়েছিল—দুর্দম বাতাস নাবিকের হৃদয়ে আতঙ্ক উপস্থিত করেছিল—চীন সাগরের বক্ষ তরঙ্গে উদ্বেল হ'য়ে উঠেছিল।

যে পর্ব্বতের উপর "শিবো দাসো বধ্যতে" লেখা রয়েছে সে পর্ব্বত এখনো চোখের অন্তরাল হয় নি। হিন্দুর উপনিবেশ স্থাপনার প্রাক্কালে যে-দিন সেই পথহারা শিবদাসকে চম্পার এই উপকূলে হত্যা করা হয়েছিল—সেদিনটাও বোধ হয় এমনি বিষাদভরা ছিল। নররক্তে চম্পায় যে হিন্দু দেবতাকে তান্ত্রিক হিন্দু প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী চম্পার দরিদ্র অধিবাসীদের রক্ত দিয়েই বিজেতা আনামী সে দেবতাকে মন্দিরচ্যুত করেছে। এই নিপীড়িতকে রক্ষা করবার জন্য কোন হিন্দুই আর সেদিন এ উপকূলভাগে আসেন নি।

সমাপ্ত



একান্নবর্ত্তী পরিবার

—গল্প—

—শ্রীসমীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

১

সাতপুকুরের সুবিখ্যাত রায় বংশের চতুর্দ্দশ পুরুষের একান্নবর্ত্তী পরিবার বুঝি এতদিনে পৃথক হইতে চলিল। কয়েক মাস ধরিয়া এ বংশের মেজ শরিক হরিকমলের সহিত ছোট সরিক খুড়তুতো ভাই প্রমথনাথের মোটেই বনিবনা হইতেছিল না। খুঁটী নাটি ব্যাপারে, পুকুরের মাছ লইয়া, বাগানের ফল লইয়া, ক্ষেতের ধানের ভাগ লইয়া দুই ভায়ে প্রায়ই মন কসা-কসি চলিতেছিল; কিন্তু ব্যাপারটা গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল হরিকমলের ভ্রাতুষ্পুত্র মোহিত কলিকাতা হইতে বাটী আসাতে। মোহিত তাহার জেঠামহাশয় নবকিশোরের কাছে থাকিয়া পড়াশুনা করিত। ব্যবসা করিয়া নবকিশোর প্রভূত ধন উপার্জ্জন করিয়া এখন কলিকাতাতেই বাস করিতেছিলেন; কিন্তু একান্নবর্ত্তী পরিবারের নিয়ম অনুসারে বংশের সকলেই নবকিশোরের কথায় উঠিত বসিত এবং তাঁহাকে বিলক্ষণ ভয় করিত। নবকিশোর চাহিতেন না যে এতদিনের একান্নবর্ত্তী পরিবার সামান্ত কারণে পৃথক হইয়া যায়—কিন্তু এতদিনে তিনিও বুঝি হাল ছাড়িয়াছিলেন—তবু একবার শেষ চেষ্টা করিবার জন্ত বৃদ্ধ বয়সে সকল অসুবিধা তুচ্ছ করিয়া স্বয়ং সাতপুকুরে যাইবার মনস্থ করিয়াছিলেন।

এই ব্যাপার লইয়াই ছোট গ্রামখানিতে বেশ একটু আন্দোলন পড়িয়াছিল। ঠিক যে-দলটি বৃহৎ পরিবারের কুৎসা পাইলে নাওয়া খাওয়া ত্যাগ করে সেই দলটির পাণ্ডাগুলি সকাল হইতে বাড়ীবাড়ী ফিরিতেছিল রায় বাবুদের গৃহবিচ্ছেদের সংবাদ লইয়া। এই দলেরই অন্ততম পাণ্ডা বালবিধবা মুখরা মাধবী একেবারে মেজবধূর উঠানে গিয়া হাঁকিল—"বলি হ্যাঁ মেজবউ, এবার নাকি কর্ত্তা নিজে আসছেন তোদের ঝগড়া মিটুতে?"

মেজবউ রকে বসিয়া বড়ি দিতেছিল; সে মুখ না তুলিয়া কহিল, "হ্যাঁ জ্বালার উপর জ্বালা বাড়াতে হবে ত?"

মেজবাবু হরিকমল বোধ করি ঘরে শয়নের উদ্যোগ করিতেছিলেন—তিনি অর্দ্ধসমাপ্ত মহাভারতখানির ভিতর চশমাটা রাখিয়া রকে আসিয়া বলিলেন,—"তুইও যেমন মাধবী, কর্ত্তা আসুন আর যেই আসুন, এবার ঝগড়া আমি মেটাচ্ছি নে। খুড়তুতো ভাই জ্ঞাতি; কিসের জন্তে তার সঙ্গে একত্র থাক্‌ব চিরকাল!"

মোহিত উপরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া সমস্ত কথাই শুনিতেছিল; সে কলিকাতায় থাকে পল্লীগ্রামের এ সমস্ত নীচতা তাহার কাছে অসহ্য ঠেকিতেছিল। সে থাকিতে না পারিয়া কহিল—"কিন্তু ছোটকাকাও ত একথা বল্‌তে পারেন কাকা। কই, তিনি ত কোনদিন আলাদা হবার কথা তোলেন নি।'

মাধবী ও হরিকমল একটু চুপ করিয়া গেল; সুধু মেজবধূ রমাসুন্দরী বলিলেন—"ছোটকাকা কেন বলবেন বাবা? সংসারের সমস্ত খরচই ত এঁর, তিনি আর কি করেন? দেশে ঘরে থাকোনা, বড়দের কথায় তোমার থাকবার দরকার কি বাবা?"

মোহিত হাসিয়া বলিল—"থাকি না, কিন্তু থাকবার আশা রাখি ত খুড়িমা।"

হরিকমল বারুদের মত জ্বলিয়া উঠিয়া কহিলেন—"সে দিনের ছেলে মোহিত—তুইও আমার সঙ্গে সরিকি চালাচ্ছিস! থাকবি ত আলাদা থাকগে যা। কুক্ষণে বড়দা আমাকে বিষয়ের ভার দিয়েছেন তাই গুষ্টীশুদ্ধকে খাওয়াতে খাওয়াতে গেলুম!"

মোহিত উচ্চহাস্ত করিয়া কহিল—"তা'ত গেলেন কাকা, কিন্তু আজ রাত্রি হ'তে ছোটকাকারা সকলে আমাদের সঙ্গে আগেকার মত এক সঙ্গে খাবেন জানেন ত? জেঠামশায়

লিগেছেন, আমি ও সব এক হাঁড়ি দু হাঁড়ি বুঝি না; আমি গিয়ে সব এক সঙ্গে দেখতে চাই।"

কথাটা শেষ হ'তেই মাধবী ফস্ করিয়া বলিয়া ফেলিল— "তা'হলে তোমাদের সাতপুকুরের বাস তুলে দিতে হয় বউ।"

মেজবউ মুখভার করিয়া কহিল—"হয়ই ত বোন্!"

হরিকমল ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন—"আপন ভাইপো হ'য়ে তুই আমার যা ক্ষতি কচ্ছিস্ মোহিত,তা শত্রুরেও করে না।"

মোহিত উষ্ণ হইয়া কি একটা জবাব দিতে যাইতেছিল, ছোটবধূ সুশীলা তাড়াতাড়ি তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া কহিল—"ছিঃ বাবা, গুরুজনদের সঙ্গে ঝগড়া করে না; চ'লে এস।"

২

সেদিন সকাল হইতে রমাসুন্দরীর শরীর ভাল ছিল না; সারাদিন অনিয়মে ও জায়েদের সহিত অযথা কলহে সন্ধ্যা হইতেই তাঁহার বেশ জ্বর আসিয়াছিল। সময়ের ম্যালেরিয়া বলিয়া হরিকমল বিশেষ কোন খেয়াল করিলেন না; কিন্তু দীর্ঘ চারমাসের মৌন ভঙ্গ করিয়া জ্ঞাতি-ভাই প্রমথ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"বৌঠানের জ্বরটা ত খুবই বেশী, একবার অঘোরকে খবর দেব কি?"

সন্ধ্যার আবছায়া আলোকে বৃদ্ধের মুখটি সম্পূর্ণ দেখা যাইতেছিল না, কিন্তু মনে হইল যেন তাঁহার স্বার্থকুটিল শিরাগুলির ভিতর একটা স্নেহরস দ্রুত প্লাবিত হইয়া তখনি মিলাইয়া গেল। ইহার ভিতরে যে একটা মৎলব আছে, কলসকাঠির তালুকটা যে এই ছলে হস্তগত করিবার ইচ্ছা,—ইহা তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না;—তাই তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিলেন—"সে ভাবনা ভাববার জন্যে আমি আছি; তুমি যাও, ততক্ষণ আমার অনিষ্ট করলে কাজ দেবে।"

প্রমথ চলিয়া গেল বটে কিন্তু হরিকমলের মনটা শান্ত হইল না; একটা আশু বিপদের আশঙ্কায় তিনি যেন শিহরিয়া উঠিলেন। আজ শনিবার, অমাবস্যা; "দুর্গা দুর্গা" বলিয়া মেজবধূর ঘরে গিয়া হরিকমল যাহা দেখিলেন তাহা মোটেই আশাপ্রদ নয়। রমাসুন্দরী জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান অচৈতন্য, মাঝে মাঝে ভুলও বকিতেছে—মাথার শিয়রে পাখা ও জলপটি লইয়া ছোটবধূ সুশীলা এবং পায়ের কাছে বিষণ্ণমুখে মোহিত।

এতগুলি গৃহশত্রুকে এক সঙ্গে পত্নীর ঘরে দেখিয়া হরিকমল একটু শঙ্কিত হইলেন, কিন্তু পত্নীর অবস্থা দেখিয়া কিছু বলিতে সাহস করিলেন না। ডাক্তার আসিল, ঔষধ পড়িল, বৃহৎ রায় পরিবারে বেশ একটু চাঞ্চল্যও দেখা গেল। রাত্রি প্রায় বারটার সময় হরিকমল বলিল, "বৌমাকে শুতে যেতে বল মোহিত, আমি বসছি।" ইসারায় হরিকমলকে বাহিরে যাইতে বলিবার জন্য মোহিতকে বলিয়া ছোটবধূ রমাসুন্দরী মাথায় আইস ব্যাগটা ধরিলেন।

হরিকমল কিন্তু সেইখানেই বসিয়া রহিলেন—তাঁহার সম্মুখে আজ যেন জীবনের আর একটা নূতন ছবি ধীরে ধীরে খুলিয়া যাইতেছিল। সে চিত্রের ভিতরে হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, স্বার্থপরতা নাই; সে যেন পরার্থে আত্মনিবেদনের স্নিগ্ধবর্ণে উদ্ভাসিত। ঠিক যে-জন্য এই ছোটবধূরই কনিষ্ঠা কন্যা মানুর হাত হইতে তিনি ভাগের বোম্বাই আম কাড়িয়া লইয়াছেন, যে-জন্য মোহিতের জন্য ধরানো মাছের ভাগ লইতে তিনি সঙ্কুচিত হন নাই, যে-জন্য শত্রুপক্ষ বলিয়া জ্ঞাতি-ভাই প্রমথর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পূর্ব্বদিনেও তিনি কোন খবর লন নাই পুকুরে মাছ ধরাইতে ব্যস্ত ছিলেন, সে কারণগুলি আজ যেন সমস্ত মন দিয়া তিনি সমর্থন করিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার চক্ষের সামনে এক রজনী-জাগরণ-ক্লান্তা, সেবাব্রতার মূর্ত্তি বিশ্বজননীর সমস্ত রূপ সমস্ত শান্তি লইয়া উপস্থিত হইয়াছিল। দূরে দিগন্তের কোলে অরুণিমার ক্ষীণ রক্তরেখা দেখা দিতেছিল, কিন্তু তথাপি এই দুটী আত্মীয় আত্মীয়ার ক্লান্তি নাই, অবসাদ নাই। এ যেন নিজের মাতা, নিজের ভগিনীকে যমদূতের হাত হইতে ছিনাইয়া আনিবার জন্য প্রাণপণ উদ্যম। তিনি আর থাকিতে না পারিয়া দৌড়িয়া প্রমথর ঘরে গিয়া বলিলেন—"প্রমথ, মেজবউ কি বাঁচবে নারে?"

প্রমথ প্রথমে একটু আশ্চর্য্য হইল; তার পর আস্তে

আস্তে হরিকমলকে বসাইয়া বলিল,—"কোন ভয় নেই মেজদা, জরটা বেশী ব'লেই ওরকম করছেন, আমরা থাকতে ভয় কি?"

হরিকমল অধির হইয়া কহিলেন,—"না না, তুই আমায় ক্ষমা কর ভাই! তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে অতি নীচের মত আমি তোর মনে অনেক কষ্ট দিয়েছি,—তুই না ক্ষমা করলে ও ভাল হবে না।"

৩

পরদিন প্রভাতে সমস্ত গ্রামখানিকে আন্দোলিত করিয়া গ্রামের গৌরব-রবি সৌম্যদর্শন নবকিশোর বাস্তু-ভিটার সুবৃহৎ অঙ্গনে প্রবেশ করিতেই হরিকমল পাগলের মত তাঁহার পায়ের উপর পড়িয়া উচ্ছলিত ক্রন্দনে কহিল,—"আমাদের ঝগড়া মিটে গেছে দাদা, তুমি পায়ের ধুলো দাও যেন তোমার মেজ-বৌমাকে এ যাত্রা সারিয়ে তুলতে পারি।"

নদী পটে

শ্রীউমা দেবী

অন্ধকার সন্ধ্যা, চারিদিক নিস্তব্ধ কেবল ঝিঁঝি ডাকচে। খালের জলে কালো কালো নৌকোগুলো নিঃশব্দে ভেসে চলেছে—ছইএর ভেতর তেলের আলো জলছে, ছোট ছোট ছেলেগুলো মুড়ি দিয়ে ব'সে আছে।

তাদেরি সঙ্গে আমার নৌকো ভেসে চলেছে খালের বুকে বুকে, মসজিদের গায়ে গায়ে, দেলুয়ার চড়ার চড়ায়, তাল-গাছির হাটের পাশে পাশে, বাঘাবাড়ী ডাইনে রেখে, যমুনার মোহানার ওপর দিয়ে কত ছোট ছোট নদী পার হ'য়ে—বাড়ীর পানে।

অন্ধকারে নদীর কালো জলের দিকে চেয়ে হঠাৎ মনে পড়্‌লো কবেকার হারানো সেই শৈশব সঙ্গীনীটিকে। অমনি বিশ্ব জগৎ লুপ্ত হোয়ে—তার কালো মুখে নদীর মত স্বচ্ছ জলভরা দুটি চোখ আমার সাম্‌নে ফুটে উঠ্‌লো।

একটানা সংসার-যাত্রার ভেতরে, কত জানা-অজানা জনের মাঝে তাকে তো কখনো খুঁজে পাইনি।

আজ সন্ধ্যার অন্ধকারে এই বিরাট নিস্তব্ধতার মাঝে নদীর জলের কল্‌কল্‌ শব্দে তার কলহাসি শুন্‌তে পাচ্ছি—আর দেখ্‌ছি ওই আঁধারের ভেতর থেকে সে চেয়ে আছে তার ডাগর দুটি চোখ মেলে। বিশ্বপ্রকৃতি নির্ব্বাক হোয়ে জেগে আছে।

পুবের আকাশ কালো ক'রে প্রকাণ্ড মেঘ দেখা দিল—তারই ছায়া নদীর বুকে ঘনিয়ে উঠ্‌লো; তখন মনে পড়্‌লো তার এলোচুলের কথা, মনে পড়্‌লো তার কালো ভুরু দুটির তলায় নিবিড় কাজ্‌লো চোখ দুটি।—

অগাধ জলে ঢেউএর মাথায় মাথায় নৌকো ভাস্‌তে ভাস্‌তে চল্ল। বোড়ো হাওয়ার একটানা শোঁ শোঁ শব্দের ভেতর কেবল তার একটি বাণী আমার কানে জেগে রইলো—"ডোব, ডোব, এ যে আমার ভালবাসার অকূল সাগর, আমার চোখেরজলে ভরা নদী—আবার ভেসে ওঠো আমারি চোখের কালো আঁখি তারার মাঝে।"



—শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

২

ভারতবর্ষের মাটীর ওপর থেকে শেষবারের মতো পা তুলে নিলুম আর সদ্যোজাত শিশুর মতো মায়ের সঙ্গে আমার যোগসূত্র এক মুহূর্ত্তে ছিন্ন হ'য়ে গেল। একটি পদক্ষেপে যখন সমগ্র ভারতবর্ষের কক্ষচ্যুত হ'য়ে অনন্ত শূন্যে পা বাড়ালুম তখন যেখান থেকে পা তুলে নিলুম সেই পদ-পরিমাণ ভূমি যেন আমাকে গোটা ভারতবর্ষেরই স্পর্শ-বিরহ অনুভব করিয়ে দিচ্ছিল; প্রিয়জনের আঙুলের ডগাটুকুর স্পর্শ যেমন প্রিয়জনের সকল দেহের সম্পূর্ণ স্পর্শ অনুভব করিয়ে দেয়, এও যেন তেমনি।

জাহাজে উঠে বসে দেখ্‌তে যেমন সুন্দর তেমনি করুণ। এত বড় ভারতবর্ষ এসে এতটুকু নগর প্রান্তে ঠেকেছে, আর কয়েক মুহূর্ত্তে ওটুকুও স্বপ্ন হবে, তখন মনে হবে আরব্য উপন্যাসের প্রদীপটা যেমন বিরাটাকার দৈত্য হ'য়ে আলাদিনের দৃষ্টি জুড়েছিল, ভারতবর্ষের মানচিত্রখানা তেমনি মাটী জল ফুল পাখী মানুষ হ'য়ে আজন্ম আমার চেতনা ছেয়েছিল, এতদিনে আবার যেন মানচিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে।

আর মানচিত্রে যাকে ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার মাঝখানে গোষ্পদের মতো দেখাত সেই এখন হয়েছে পায়ের তলায় আরব সাগর, পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ কোনো দিকে চক্ষু তার অবধি পায় না। ঢেউগুলো তার অনুচর হ'য়ে আমাদের জাহাজখানাকে যেন গলাধাক্কা দিয়ে দিয়ে তার চৌকাঠ পার ক'রে দিতে চলেছে। ঋতুটার নাম বর্ষাঋতু, মনসুনের প্রভঞ্জনাহুতি পেয়ে সমুদ্র তার শত সহস্র জিহ্বা লকলক্ করছে, জাহাজখানাকে একবার এদিকে কাৎ ক'রে একবার ওদিকে কাৎ ক'রে—যেন ফুটন্ত তেলে পাঁপরের মতো উল্টে পাল্টে ভাজ্‌ছে।

জাহাজ টল্‌তে টল্‌তে চল্‌ল, আর জাহাজের অধিকাংশ যাত্রি-যাত্রিণী ডেক ছেড়ে শয্যা আশ্রয় করলেন। অসহ্য সমুদ্র-পীড়ায় প্রথম তিন দিন আচ্ছন্নের মতো কাটল, কারুর সঙ্গে কারুর দেখা হবার জো ছিল না, প্রত্যেকেই নিজের নিজের ক্যাবিনে শয্যাশায়ী। মাঝে মাঝে দু'একজন সৌভাগ্যবান দেখা দিয়ে আশ্বাসন করেন, ডেকের খবর দিয়ে যান। আর ক্যাবিন ষ্টুয়ার্ড খাবার দিয়ে যায়। বলা বাহুল্য জিহ্বা তা গ্রহণ করতে আপত্তি না করলেও উদর তা রক্ষণ করতে অস্বীকার করে।

ক্যাবিনে প'ড়ে প'ড়ে বমনে ও উপবাসে দিনের পর রাত রাতের পর দিন এমন দুঃখে কাটে যে, কেউ-বা ভাবে মরণ হলেই বাঁচি, কেউ-বা ভাবে মরতে আর দেরী নেই। জানিনে হরবল্লভের মতো কেউ ভাবে কি না যে, মরে তো গেছি, দুর্গা-নাম ক'রে কি হবে। সমুদ্র-পীড়া যে কী দুঃসহ তা ভুক্তভোগী ছাড়া অপর কেউ ধারণা করতে পারবে না। হাতের কাছে রবীন্দ্রনাথের "চয়নিকা",—মাথার যন্ত্রণায় অমন লোভনীয় বইও পড়্‌তে

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

ইচ্ছা করে না। ইচ্ছা করে কেবল চুপ ক'রে প'ড়ে থাক্‌তে; প'ড়ে প'ড়ে আকাশ পাতাল ভাব্‌তে।

সমুদ্র-দুঃখার্ত্ত কেউ সংকল্প ক'রে ফেল্লেন যে এডেনে নেমেই দেশে ফিরে যাবেন, সমুদ্র যাত্রার দুর্ভোগ আর সইতে পার্‌বেন না। তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হলো এডেন থেকে দেশে ফিরে যেতে চাইলেও উটের পিঠে চ'ড়ে মরুভূমি পেরিয়ে পারস্যের ভিতর দিয়ে ফের্‌বার যখন উপায় নেই তখন ফির্‌তে হবে সেই সমুদ্র পথেই। আমরা অনেকেই কিন্তু ঠিক্ ক'রে ফেল্লুম মার্সেল্‌সে নেমে প্যারিসের পথে লণ্ডন যাব।

আরব-সাগরের পরে যখন লোহিত সাগরে পড়্‌লুম তখন সমুদ্রপীড়া বাসি হ'য়ে গেছে। আফ্রিকা-আরবের মধ্যবর্ত্তী এই হ্রদতুল্য সমুদ্রটি দুর্দ্দান্ত নয়, জাহাজে থেকে থেকে জাহাজটার ওপর মায়াও প'ড়ে গেছে; তখন না মনে পড়্‌ছে দেশকে, না ধারণা করতে পারা যাচ্ছে বিদেশকে; কোথা থেকে এসেছি ভুলে গেছি, কোথায় যা'চ্ছ বুঝ্‌তে পারছি নে; তখন গতির আনন্দে কেবল ভেসে চল্‌তেই ইচ্ছা করে, কোথাও থাম্‌বার বা নাব্‌বার সঙ্কল্প দূর হ'য়ে যায়।

বিগত ও আগতের ভাবনা না ভেবে উপস্থিতের ওপরে দৃষ্টি ফেল্লুম—আপাতত আমাদের এই ভাসমান পান্থশালাটায় মন ন্যস্ত করলুম। খাওয়া-শোওয়া-খেলা-পড়া-গল্প করার যেমন বন্দোবস্ত যে-কোনো বড় হোটেলে থাকে এখানেও তেমনি, কেবল ক্যাবিনগুলো যা যথেষ্ট বড় নয়। ক্যাবিনে শুয়ে থেকে সিন্ধু জননীর দোলা খেয়ে মনে হয় খোকাদের মতো দোল্‌নায় শুয়ে দুল্‌ছি। সমুদ্রপীড়া যেই সার্‌ল ক্যাবিনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অমনি কম্‌ল। শোবার সময়টা ছাড়া বাকী সময়টা আমরা ডেকে কিংবা বসবার ঘরে কাটাতুম। ডেকে চেয়ার ফেলে ব'সে কিংবা পায়চারি করতে করতে সমুদ্র দেখে দেখে চোখ শ্রান্ত হ'য়ে যায়; চারিদিকে জল আর জল, তাও নিস্তরঙ্গ, কেবল জাহাজের আশে পাশে ছাড়া ঢেউয়ের অস্তিত্ব নেই, যা আছে তা বাতাসের সোহাগ-চুম্বনে জলের হৃদয়-স্পন্দন। বসবার ঘরে কৌচে অর্দ্ধশায়িত থেকে খোস গল্প করতে এর্‌ চেয়ে অনেক ভালো লাগে।

লোহিত সাগরের পরে ভূমধ্যসাগর, দু'য়ের মাঝখানে যেন একটি সেতু ছিল, নাম সুয়েজ যোজক। এই যোজকের ঘটকালিতে এশিয়া এসে আফ্রিকার হাত ধরেছিল। সম্প্রতি হাতের জোড় খুলে দুই মহাদেশের মাঝখানে বিয়োগ ঘটিয়ে দেওয়া হয়েছে। যার দ্বারা তা ঘট্‌ল তার নাম সুয়েজ কেনাল। সুয়েজ কেনাল একদিকে বিচ্ছেদ ঘটাল বটে, কিন্তু অন্যদিকে মিলন ঘটাল—লোহিতের সঙ্গে ভূমধ্যের মিলন যেন ভারতের সঙ্গে ইউরোপের মিলন। কলম্বাস যা পারেনি, লেসেপ্‌স্ তা পার্‌লে। ভূমধ্য ও লোহিতের মধ্যে কয়েক শত মাইলের ব্যবধান, ঐটুকুর জন্যে ভূমধ্যের জাহাজকে লোহিতে আস্‌তে বহু সহস্র মাইল ঘুরে আস্‌তে হতো। মিশরের রাজারা কোন্ যুগ থেকে এর একটা প্রতীকারের উপায় খুঁজ্‌ছিলেন। উপায়টা দেখ্‌তে গেলে সুবোধ্য। ভূমধ্য ও লোহিতের মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ডটাতে গোটাকয়েক হ্রদ চিরকালই আছে, এই হ্রদগুলোকে দুই সমুদ্রের সঙ্গে ও পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত ক'রে দিলেই সেই জলপথ দিয়ে এক সমুদ্রের জাহাজ অন্য সমুদ্রে যেতে পায়। কল্পনাটা অনেক কাল আগের, কিন্তু সেটা কার্য্যে পরিণত হ'তে হ'তে গত শতাব্দীর দুই তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হ'য়ে গেল। কেনালটিতে কলা-কুশলতা কি পরিমাণ আছে তা স্থপতিরাই জানেন, কিন্তু অব্যবসায়ী আমরা জানি—যাঁর প্রতিভার স্পর্শমণি লেগে একটা বিরাট কল্পনা একটা বিরাট কীর্ত্তিতে রূপান্তরিত হলো সেই ফরাসী স্থপতি লেসেপ্‌স্ একজন বিশ্বকর্ম্মা—তাঁর সৃষ্টি দূরকে নিকটে এনে মানুষের সঙ্গে মানুষের পরিচয় ঘনিষ্ঠতর করেছে। যান্ত্রিক সভ্যতার শত অপরাধ যাঁরা নিত্য স্মরণ করেন এই ভেবে তাঁরা একটি অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

সুয়েজ কেনাল আমাদের দেশের যে-কোনো ছোট নদীর মতোই অপ্রশস্ত, এতে বড় জোর দুখানা জাহাজ পাশাপাশি আসা যাওয়া করতে পারে, কিন্তু কেনাল যেখানে হ্রদে পড়েছে সেখানে এমন সংকীর্ণতা নেই।

কেনালটির সুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত একটি দিকে নানান রকমের গাছ, যত্ন ক'রে লাগানো, যত্ন ক'রে রক্ষিত, অন্যদিকে ধূ ধূ করা মাঠ, শ্যামলতার আভাসটুকুও নেই। কেনালের দুই দিকেই পাথরের পাহাড়, যেদিকে মিশর সেই দিকেই বেশি। এই পাহাড়গুলিতে যেন যাদু আছে, দেখ্‌লে মনে হয় যেন কোনো কিউবিষ্ট্‌ এদের আপন খেয়াল মতো জ্যামিতিক আকার দিয়েছে আর এক-একটা পাহাড়কে এক-একটা পাথর কুঁদে গড়েছে।

কেনালটি যেখানে ভূমধ্য সাগরে পড়েছে সেখানে একটি শহর দাঁড়িয়ে গেছে, নাম পোর্ট সৈয়দ। জাহাজ থেকে নেমে শহরটায় বেড়িয়ে আসা গেল। শহরটার বাড়িঘর ও রাস্তাঘাট ফরাসী প্রভাবের সাক্ষ্য দেয়। কাফেতে খাবার সময় ফুটপাথের ওপর ব'সে খেতে হয়, রাস্তায় চল্‌বার সময় ডানদিক ধ'রে চল্‌তে হয়। পোর্ট সৈয়দ হলো নানা জাতের নানা দেশের মোসাফিরদের তীর্থস্থল—কাজেই সেখানে তীর্থের কাকের সংখ্যা নেই, ফাঁক পেলে একজনের ট্যাঁকের টাকা আরেকজনের ট্যাঁকে ওঠে।

পোর্ট সৈয়দ মিশরের অঙ্গ। মিশর প্রায় স্বাধীন দেশ। ইউরোপের এত কাছে ব'লে ও নানা জাতের পথিক-কেন্দ্র ব'লে মিশরীরা ইউরোপীয়দের সঙ্গে বেশি মিশ্‌তে পেরেছে, তাদের বেশি অনুকরণ কর্‌তে শিখেছে, তাদের দেশে অনায়াসে যাওয়া আসা কর্‌তে পার্‌ছে। ফলে ইউরোপীয়দের প্রতি তাদের অপরিচয়ের ভীতি বা অপরিচয়ের অবজ্ঞা নেই, ইউরোপের স্বাধীন মনোবৃত্তি তাদের সমাজে ও রাষ্ট্রে সঞ্চারিত হয়েছে। মিশরীরা মুসলমান, কিন্তু আমাদের মুসলমানদের সঙ্গে এদের অশেষ অমিল। মিশরী মেয়েরা এখনো কালো ওড়না দেয় বটে, এবং মিশরের নারী এখনো তুর্ক নারীর মতো স্বাধীন হ'তে পারেনি বটে, তবু ভূমধ্যসাগরের ওপারের হাওয়া মিশরের নারীকেও চঞ্চল ক'রে তুল্‌ছে। ইউরোপীয়দের সঙ্গে পাল্লা দেবার আগ্রহে মিশরী পুরুষরা এর প্রশ্রয় দিচ্ছে। যেমন দেখা যাচ্ছে, আর কয়েক বছরে মিশর ইউরোপের মাঝারি শক্তিদের সঙ্গে এক সারিতে দাঁড়াতে পার্‌বে। ইউরোপীয় সভ্যতার বহিরঙ্গটা এরা ইতিমধ্যে আয়ত্ত ক'রে নিয়েছে—অধিকাংশ পুরুষের গায় ইউরোপীয় পরিচ্ছদ ও মাথায় মুসলমানি ফেজ্‌। তুর্কীরা ফেজ্‌ও ছেড়েছে, দক্ষিণ ইউরোপীয়দের সঙ্গে তাদের রঙের অমিল না থাকায় বাইরে থেকে তাদের ইউরোপীয়ই মনে হয়। জাপানীরাও ইউরোপীয় পরিচ্ছদ ধরেছে—শিক্ষিত চীনারাও। ঠাণ্ডাদেশের লোক ব'লে ঐ পরিচ্ছদ প'রে ওরা আরামও পায়। আমাদের দেশে যখন কোট ও শার্ট সকলেই পর্‌ছে তখন এক জোড়া ট্রাউজার্স কি অপরাধ কর্‌লে? এটুকু যোগ ক'রে দিলে আমাদের পুরুষদের পোষাকও মোটামুটি ইউরোপীয় পোষাক হ'য়ে যায়। যা ছিল ইউরোপীয় পোষাক তাই এখন হয়েছে আন্তর্জাতিক পোষাক। কিন্তু আমাদের গরম দেশে এ পোষাক আটপৌরে হবার আশা নেই, এবং আমাদের গরীব দেশে এ পোষাক সার্ব্বজনীন হবারও সঙ্গতি নেই। তবু ইউরোপীয় পোষাকের জয়জয়কার দেখে এই মনে হয় যে একদিন ও পোষাক আমাদের কাছে বিজাতীয়-বোধ হবে না, আন্তর্জাতিক বোধ হবে। কলার টাইয়ের কথা বল্‌ছি নে, স্বয়ং ইউরোপ কলার টাইয়ের তিরোধান চায়, কিন্তু কোটের সঙ্গে ধুতির চেয়ে কোটের সঙ্গে ট্রাউজার্স্‌ অনেক যুক্তিযুক্ত ও অনেক সুসঙ্গত। সেকালের গ্রীসে ও রোমে কোট ট্রাউজার্স ছিল না, সেকালের রাশিয়ার মেয়েরা ঘোম্‌টা দিত ও অন্তঃপুরে থাক্‌ত; কিন্তু একালে ইউরোপের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত একই বেশ একই ভূষা। ইউরোপের উপনিবেশগুলিতে ও ইউরোপের আশেপাশের দেশগুলিতেও তাই। ভারতবর্ষ ক'দিন এর প্রভাব কাটিয়ে থাক্‌বে? ঠিক এই রকম না হোক্‌ এর কাছাকাছি কোনো পোষাক ভাবী ভারতবর্ষকে গ্রহণ কর্‌তেই হবে।

আমাদের দেশে যে পরিচ্ছদ-বিভ্রাট ঘটেছে তা যেমন দৃষ্টিকটু তেমনি রুচিহীন। মেয়েদের কথা বল্‌ছিনে। আমাদের মেয়েরা স্বভাবশিল্পীর মতো কি গ্রহণ ক'রে কি বর্জ্জন কর্‌তে হয় তা জানে। তবে ইউরোপের মেয়েদের মতো আমাদের মেয়েরাও খেলা-ধূলায় যোগ দেবে ও ছুটে ছুটে পথ চল্‌বে সেই অবশ্যম্ভাবী দিনে আমাদের মেয়েদের শাড়ী হাঁটুর ওপরে উঠ্‌বে কি ঘাগ্‌রায় পর্য্য-

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

বসিত হবে, কে বলতে পারে? ইউরোপের মেয়েরাও তো পঁচিশ বছর আগে ন্যাকড়ার পুঁটলী ছিল—গলা থেকে গোড়ালী পর্য্যন্ত অপুরুষস্পর্শ্যা। এখন তারা এমন retrenchment আরম্ভ করেছে যে, পোষাক থেকে চুল পর্য্যন্ত কিছুই বাদ দেয় নি, যেটুকু অবশিষ্ট আছে সেইটুকু শীতের দেশের পক্ষে এত হ্রস্ব যে, এ যেন আমাদের গরমের দেশে গান্ধীর মতো কটিবস্ত্র পরার সমান।

পোর্ট্ সৈয়দ ছেড়ে আমরা ভূমধ্যসাগরে পড়লুম। শান্ত শিষ্ট বলে ভূমধ্যসাগরের সুনাম আছে। প্রথম দিন-কতক চতুর ব্যবসাদারের মতো ভূমধ্যসাগর "Honesty is the best policy" করলে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ভদ্রতা রক্ষা করলে না। আর একবার ক'রে কেউ কেউ শয্যাশায়ী হলেন। অধিকাংশকে মার্সেল্সে নামতেই হলো। পোর্ট্ সৈয়দ থেকে মার্সেল্স্ পর্য্যন্ত জল ছাড়া ও দু'টি দৃশ্য ছাড়া দেখবার আর কিছু নেই। প্রথমটি ইতালি ও সিসিলীর মাঝখানে মেসিনা প্রণালী দিয়ে যাবার সময় দুই ধারের পাহাড়ের সারি। দ্বিতীয়টি, ষ্ট্রম্বোলী আগ্নেয় গিরির কাছ দিয়ে যাবার সময় পাহাড়ের বুকে রাবণের চিতা।

মার্সেল্স্ ভূমধ্যসাগরের সেরা বন্দর ও ফরাসীদের দ্বিতীয় বড় শহর। ইতিহাসে এর নাম আছে, ফরাসী "বন্দে মাতরমের" এই নগরেই জন্ম। কাব্যেও এ অঞ্চলের নাম আছে, ফরাসী সহজিয়া কবি (troubadour) দের প্রিয়ভূমি এই সেই Provence—বসন্ত যেখানে দীর্ঘস্থায়ী ও জ্যোৎস্না যেখানে স্বচ্ছ। এর পূর্ব্বদিকে সমুদ্রের কূলে কূলে ছোট ছোট অসংখ্য গ্রাম, সেই সব গ্রামে গ্রীষ্মযাপন করতে পৃথিবীর সব দেশের লোক আসে। ব্যাণ্ডোল (Bandol) নামক তেমনি একটি গ্রামে আমরা একটি দুপুর কাটালুম। মোটরে ক'রে পাহাড়ের পর পাহাড় পেরিয়ে সেখানে যেতে হয়। পাহাড়ের ওপর থেকে মার্সেল্সকে দেখলে মনে হয় যেন সমুদ্র তাকে সাপের মতো সাতপাকে জড়িয়ে বেঁধেছে। মার্সেল্স্ শহরটাও শহর কেটে তৈরি, ওর একটা রাস্তার সঙ্গে আরেকটা রাস্তা সমতল নয়, কোনো রাস্তায় ট্রামে ক'রে যেতে যেতে ডান দিকে মোড় ফিরলে একেবারে রসাতল, কোনো রাস্তায় চলতে চলতে বাঁদিকে বেঁকে গেলে সামনে যেন স্বর্গের সিঁড়ি। মার্সেল্সের অনেক রাস্তার দু'ধারে গাছের সারি ও তার ওপারে ফুট্‌পাথ্।

মার্সেল্স্ থেকে প্যারিসের রেলপথে রাত কাটল, তাই পার্শ্ববর্ত্তী দৃশ্যের বর্ণনা দিতে পারব না। প্যারিসে নামি নি, ট্রেন থেকে প্যারিসের যতটুকু দেখেছি তাকে "দেখা" বলা চলে না। প্যারিস্ থেকে রেলপথে ক্যালে, ক্যালে থেকে জলপথে ডোভার এবং ডোভার থেকে রেলপথে লণ্ডন।

মোটামুটি ফ্রান্সের যতটুকু দেখেছি ততটুকু থেকে মনে হয় না যে ফ্রান্স্ আমাদের দেশের থেকে বড় বেশি পৃথক। দেশটা অসমতল ও ছোট ছোট পাহাড়ে ছাওয়া। সে-সব পাহাড়ের কোনোটার মাথায় টাক, কোনোটা নাম-না-জানা গাছপালায় শ্যামল। কোনো কোনো পাহাড়ের মাথায় কচি কচি ঘাস গজিয়েছে, যেন কেউ কাঁচি দিয়ে ওদের সমান করে ছেঁটেছে ও চিরুণী দিয়ে সিঁথি বাগিয়ে দিয়েছে। নদীনালা বেশি চোখে পড়ল না; যে ক'টা দেখলুম সে-ক'টা আমাদের দেশে নদী নামের অযোগ্য। কিন্তু এরা নদীর যত্ন নেয়, তার কূলের ঘাসের তদ্বির করে, তার ধারে ধারে বাবুদের বাগানবাড়ী বানায়। রাস্তার দু'ধারে ক্ষেত, ফসল কাটা চলেছে, দৃশ্যটা আমাদেরি দেশের মতো।

ফরাসী দেশের নরনারী সম্বন্ধে এত স্বল্পপরিচয়ে কিছু না বলাই ভালো। তবে এতটুকু বল্লে ভুল হবে না যে, এদের আবালবৃদ্ধবনিতা প্রত্যেকেই সুন্দর ক'রে পোষাক পরে, এরা জাতকে-জাত পরিচ্ছদ-শিল্পী।

সতী

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

১০

সুরমা ঘরে বসিয়া জানালার দিকে চাহিয়াছিল, হঠাৎ ভূপতি ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "ওগো, তোমার কোম্পানীর কাগজ ক'খানা কয়েকদিনের জন্য দেবে ?"

সুরমা একবার তীব্র ভ্রূকুটি করিয়া তার মুখের দিকে চাহিল, তার পর-মুখ ফিরাইয়া সে আবার জানালার দিকে চাহিয়া রহিল। তার বিরাট অন্তর বিক্ষুব্ধ করিয়া তরঙ্গিত হইয়া উঠিল নিদারুণ অভিমান। স্বামী তার এতদিনকার প্রেম ভুলিয়া গিয়াছেন, তার অভিমানে তাঁর অন্তরে আর এক ফোঁটা আঘাত লাগে না, নিদারুণ অবহেলায় তাকে জর্জরিত করিয়া দিন দিন তিল তিল করিয়া তাহাকে হত্যা করিতেছেন, আর আজ টাকার দরকার হইয়াছে তাই তার কাছে আসিয়াছেন! ছাই টাকা! সে তার যথাসর্ব্বস্ব তাঁর হাতে অনায়াসে সমর্পণ করিতে পারিত, তার জীবন তাঁর পায় অনায়াসে লুটাইতে পারিত, যদি স্বামী তার থাকিত; কিন্তু আজ সে মর্ম্মরের মত কঠোর হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কথা কহিল না।

ভূপতি বলিল, "আমার বড় বিপদ সুরমা! আমি শপথ ক'রছি, সাত দিনের মধ্যে তোমার টাকা শোধ করবো।"

সুরমা কথা কহিল না।

ভূপতি তার পায় লুটাইয়া পড়িল, তার বিপদের কথা খুব বাড়াইয়া বলিল; বলিল, এই টাকাটা না দিতে পারিলে তার জেল হইবে। সুরমা কোনও কথাই বলিল না, দন্তে অধর চাপিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

তার পর ভূপতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিল, সুরমাকে যা-নয় তাই বলিয়া গালি দিল; বলিল, যে স্ত্রী স্বামীর বিপদের সময় হাতের টাকা ছাড়ে না, সে কুকুরের অধম—তা ছাড়া আরও কুৎসিৎ গালিগালাজ করিল।

কিছুতেই যখন হইল না তখন দারুণ হতাশায় "হা অদৃষ্ট" বলিয়া মাথা চাপড়াইয়া সে ফিরিল।

সুরমার অভিমান তার স্নেহের সঙ্গে অনেকক্ষণ যুঝিয়া এতক্ষণে পরাজয় মানিল। সে ফিরিয়া বলিল, "শোন, দাঁড়াও; তোমার কি বিপদ আমায় বুঝিয়ে বল।"

ভূপতি বুঝিল সুরমা গলিয়াছে; সে ফিরিয়া নরম সুরে বলিল, "আমার নামে একটা ডিক্রী হ'য়েছে, কাল তারা বাড়ীর সব আসবাব ক্রোক ক'রবে এসে। আর, একটা ডিক্রী জারী ক'রলেই সব পাওনাদার ভিড় ক'রে আসবে, তখন আমার চাকরী থাকবে না, আমার যথা সর্ব্বস্ব তারা কেড়ে নেবে। আমায় জেলে দেবে, ছেলে নিয়ে তোমায় পথে বসতে হ'বে। আজ যদি এ ডিক্রী আমি শোধ ক'রতে পারি, তবে আমি সব ক্রমে সামলে নিতে পারবো। তোমার গায়ে হাত দিয়ে শপথ করছি সুরমা, আর আমি ওপথে যাব না।"

সুরমা স্থির ভাবে সব শুনিয়া বলিল, "কত দেনা হয়েছে তোমার ?"

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

"ঠিক ব'লতে পারি না, তবে সুদটুদ নিয়ে বোধ হয় ত্রিশ হাজারের ওপর হবে—প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি।"

সুরমা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল; বলিল, "সর্ব্বনাশ, এত দেনা ক'রেছ তুমি!"

"হাঁ সুরমা, কিন্তু আমার চোখ ফুটেছে। এখন থেকে আমি একেবারে সামলে যাব। তার পর মাইনের টাকাটা মাসে মাসে পাওনাদারদের ধ'রে দিলে একদিন এ দেনা শোধ হ'য়ে যাবে। খরচ পত্তর আমাদের একটু কমাতে হবে।"

সুরমা বলিল, "আচ্ছা, আমি তোমার সব দেনা শোধ ক'রে দেব। তুমি তোমার পাওনাদারের একটা হিসাব আমায় ক'রে দেও, আমি ঠাকুরপো আর বিনোদ বাবুকে দিয়ে সব গুছিয়ে নেব।" বিনোদ বাবু ভূপতির বন্ধু—প্রতিষ্ঠাবান উকিল।

ভূপতি বলিল, "কিন্তু আজ টাকা না দিলে যে কাল এসে তারা ডিক্রী জারী করবে। তা হ'লে তো আর কাউকে সামলান যাবে না। আজ তুমি কোম্পানীর কাগজ কখানা দেও।"

দৃঢ়ভাবে সুরমা বলিল, "তোমার হাতে আমি এক পয়সা দেব না। কাল যদি তারা আসে তবে তাদের টাকা দিয়ে দিলেই হবে।"

"না না সুরমা, তুমি বুঝতে পারছো না! একবার একজন ডিক্রী জারী করলে বাকি সব পঙ্গপালের মত এসে পড়বে।"

"আচ্ছা বেশ, তুমি বিনোদ বাবু আর ঠাকুরপোকে ডেকে নিয়ে এসো, তাঁরা যদি বলেন তবে আমি যে ক'রেই হোক তোমাকে তিন হাজার টাকা দেবো।"

এইবার ভূপতির আর সহ্য হইল না, সে গর্জ্জিয়া বলিল, "কেন? আমি কি কিছুই নই; বিনোদ পরস্তপর তাকে তোমার এতটা বিশ্বাস, আর আমাকে বিশ্বাস নেই!"

"বিশ্বাসের যোগ্য যদি আবার তুমি হও তখন তোমায় বিশ্বাস করবো।" বলিয়া সুরমা মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল।

ভূপতি দাঁড়াইয়া রাগে ফুলিতে লাগিল। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া সে একদৃষ্টে সুরমার দিকে চাহিয়া রহিল। তার পর লাফাইয়া খপ করিয়া সুরমার চাবীর গোছা চাপিয়া ধরিল। কিন্তু পর মুহূর্ত্তে তাহার মনে হইল, চাবীর গোছা লইয়া কোনও লাভ নাই, সুরমা স্বেচ্ছায় সই না করিয়া দিলে কোম্পানীর কাগজ লইয়া কোনো ফল হইবে না। সে হাত ছাড়িয়া দিল।

সুরমা ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "চাবী চাও? চাবী দিয়ে কি করবে বল? সে কোম্পানীর কাগজ আর আমার নেই।"

"নেই? কেন? কি হ'য়েছে?"

"আমি তা ঠাকুরপো'কে দান করেছি।"

ভূপতি গর্জ্জিয়া উঠিল, "ঠাকুরপোকে দান করেছ! কেন শুনি? তার বদখেয়াল মেটাবার জন্যে? শয়তানি, তুমি ভাব আমি কিছু টের পাইনে। সব বুঝি। তোমার ঠাকুরপো যে কত বড় সাধু, আর তুমি কত বড় সতী তা জানি! কিন্তু এর শোধ আমি নেব—আমি পুরুষের বাচ্ছা।"

এইবার সুরমা তীব্র রোষে গর্জ্জিয়া উঠিল, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিল, "দূর হও, দূর হও তুমি!

ভূপতি তার সেই কম্পমান ক্রোধন মূর্ত্তি দেখিয়া ভয় পাইয়া গেল। সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল, কিন্তু যাইবার সময় শাসাইয়া গেল, ভাল করিয়া ইহার শোধ তুলিবে।

রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে অবশেষে সুরমা ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

বাহিরের ঘরে বসিয়া ভূপতি গজ্ গজ্ করিতেছিল। অনেকক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া সে এক বুদ্ধি স্থির করিয়া বিনায়কের কাছে উপস্থিত হইল। বিনায়ক তখন থিয়েটারে।

ভূপতি বিনায়কের কাছে প্রস্তাব করিল সে থিয়েটারে এক্ট করিবে। বিনায়ক তাহাকে চাকরী দিতে সম্মত হইল; বেতন স্থির হইল চার শত টাকা, যদি ভূপতি ভাল উৎরায়। ভূপতি নিশ্চিন্ত হইয়া বিলাসের কাছে গিয়া সুসংবাদ জানাইল।

বিলাস শুনিয়া বলিল, "সে কি, তুমি চাকরী ছেড়ে দেবে?"

ভূপতি বলিল, "তা ছাড়া আর উপায় কি? আজ চাকরী ছাড়লে মানে মানে বেরুতে পারবো। কাল ডিক্রী-জারী হবার পর যখন পাওনাদারেরা ডিক্রীর পর ডিক্রী-জারী করতে থাকবে তখন যে তারা আমায় এমনি বিদায় ক'রে দেবে। তা ছাড়া চাকরী ছাড়লে জামিনের কোম্পানীর কাগজগুলো দিয়ে ধারগুলো শোধ করা যাবে।" এর পর আর ধার করছি না—নাকে খত।"

বিলাস বলিল, "ভাল কথা, তোমার টাকা জোগাড় হ'ল?"

ভূপতি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না।"

"কেন? তোমার স্ত্রী দিলে না?"

"না, সে বোধ হয় আমি জেলে গেলেই সুখী হবে।"

"ধন্যি মেয়েমানুষ তোমার স্ত্রী! যাক গে, আমি টাকার জোগাড় করেছি। কাল সকালে জিটমল সুরযমলের নামে একখানা হ্যাণ্ডনোট লিখে একককড়িকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও—আমি টাকা পাবার ব্যবস্থা করবো।"

বিলাসের এ কথায় ভূপতি একেবারে অভিভূত হইয়া গেল। সে সেইখানে বিলাসের হাত ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

বিলাস হাসিয়া বলিল, "এখন কি বল? তোমার স্ত্রী তোমাকে বেশী ভালবাসে, না আমি?"

"তুমি, বিলাস, তুমি, হাজার বার তুমি! আমার স্ত্রী যে এত হারামজাদা সে আমি আগে কখনো জানতাম না।"

আনন্দের আতিশয্যে ভূপতির মনে এ প্রশ্ন উঠিল না যে বিলাস এ টাকা জোগাড় করিল কেমন করিয়া। সে-কথা শুনিলে সে সুখী না হইয়া ক্ষেপিয়া উঠিত, কেন না জিটমল সুরযমলের মুনিব-গোমস্তা রাধাকিশেন আর কেহ নয়,—সে সেই মাড়োয়ারী বাবু যার সঙ্গে আজ সন্ধ্যা বেলায় বিলাস মোটর-বিহারে গিয়াছিল।

এ দিকে সুরমা যখন মাটিতে লুটাইয়া কাঁদিতেছিল, সেই সময় জ্যোতি আসিয়া উপস্থিত হইল। তার সাড়া পাইয়াই সুরমা সুস্থির হইয়া উঠিয়া বসিল। সুরমার মনের ভিতর যে তুষানল জ্বলিতেছিল, তার ধোঁয়াটুকুও বাহিরের কেউ টের পাইত না। সে কাঁদিত অতি গোপনে; প্রকাশ্যে সে সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক ভাবে ব্যবহার করিত। লোকের কাছে সে খাটো হইতে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। তার সরস কোমল স্নেহপরায়ণ অন্তরের ভিতর এমন একটা প্রবল দর্প ছিল যাহা অন্যের কাছে তার দুঃখ ও দীনতা প্রকাশ হইতে নিবৃত্ত রাখিত।

জ্যোতি আসিয়া বলিল, "বউদি, আমায় ডেকেছ কেন?"

সুরমা তাকে বসিতে দিয়া বলিল, "তোমার আশ্রমের খবর শোন্‌বার জন্যে। আর কতগুলি পুষ্যি জুটলো তোমার?"

"পুষ্যি আর বড় বেশী জোটে নি। যা জুটেছে তাদের নিয়েই হিম্‌সিম্ খেয়ে যাচ্ছি। একা আর পেরে উঠি না। তোমার মত একজনকে যদি পেতাম আমি, হবে আমার কাজ অনেক সহজ হ'ত। জান বউদি, এই লোকগুলো কি ভয়ানক? এতটুকু-টুকু ছেলে, তাদের পেটে যে কি আশ্চর্য্য রকম শয়তানি বুদ্ধি খেলে তা ভাবলে অবাক্ হ'তে হয়। আর সেই যে দুটি মা মেয়ে, যাদের নিয়ে আশ্রম আরম্ভ ক'রেছিলাম, তারা যে কি লাঞ্ছনা দিচ্ছে আমায় তার ঠিক নেই। তাদের কেবল এক চেষ্টা কেমন ক'রে আমাকে ঠকিয়ে পয়সা নেবে, কেমন ক'রে দু'পয়সা চুরী করবে। এমন যে সুখে স্বচ্ছন্দে আছে তাতে তার আশ মেটে না। একটা কচি ছেলে রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছিলাম তাকে দিয়েছিলাম মা-টার কাছে পালতে। সে ছেলেটার দুধ চুরি করে, জামা চুরি করে। আমি এখন ছেলেটাকে চোখে চোখে রাখি তাই সে বেঁচে আছে।"

"আর কমলার কচি খোকাটি?"

"সে তারি চমৎকার হয়েছে বৌদি। কি খাসা চেহারা হয়েছে, কে বলবে যে ভিখারীর পেটের ছেলে। আর এমন চমৎকার কথা কয় যে কি বলবো। অনেকটা তোমার খোকার মত।"

ইতিমধ্যে—অনেক দিনের পর—সুরমার একটি পুত্র হইয়াছিল।

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

এমনি করিয়া অনেক বিবরণ জ্যোতি দিয়া গেল। শেষে সুরমা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার এত সব খরচ চলছে কোথ্ থেকে ?"

"চ'লে যাচ্ছে এক রকমে। আমি দুটো প্রাইভেট টুইশন করি। খান তিনেক নোট লিখেছি তাতেও কিছু পাই, এমনি ক'রেই চ'লে যাচ্ছে। ভাল কথা মনে করেছ বউদি, আমি এখন উঠি। এক মহারাজার সঙ্গে দেখা করতে যাব। তিনি কিছু চাঁদা দেবেন আমাকে শুনছি।"

সুরমা বলিল, "তোমরা কি দু' ভায়েই সমান ? একটি কথাও কি তোমাদের বিশ্বাস করবার উপায় নেই ?

জ্যোতি শুনিয়া অবাক্ হইল, শুষ্কমুখে বলিল, "কেন বউদি ? আমি কি করলাম ?"

সুরমা বলিল, "আমার সঙ্গে তোমার কি কথা ছিল ? তুমি না বলেছিলে তোমার টাকার দরকার হ'লে তুমি আর কারো কাছে চাইবার আগে আমার কাছে চাইবে ? আর আজ রাজ্যি জুড়ে ভিক্ষা মেগে বেড়াচ্ছ আমাকে কিছু না ব'লে।"

লজ্জিত হইয়া জ্যোতি বলিল, "ক্ষমা কর বউদি। তোমার কাছে তো আমি টাকা নিতে পারবো না। বলেছি তো আমি দাদার এক পয়সাও নেবো না।"

"কিন্তু আমি তো ভিখারীর মেয়ে নই, গরীবের পুত্রবধূও নই যে আমি দিলেই সেটা তোমার দাদার টাকা হবে। তোমার দাদা যার এক পয়সাও দেন নি এমন টাকা আমি তোমায় এখনো দিতে পারি। তুমি ব'সো এইখানে, আমি আজ যা' দেবো তা' তোমার নিতেই হবে।"

বলিয়া সুরমা উঠিয়া সিন্দুক খুলিল। সিন্দুক হইতে একটা নেকড়ার পুঁটুলী বাহির করিয়া সে জ্যোতির হাতে দিয়া বলিল, "এই নেও, এর ভিতরকার একটা পয়সাও তোমার দাদার নয়।"

জ্যোতি পোঁটলা খুলিয়া দেখিল যে পুঁটুলীর ভিতর সুরমার বহুমূল্য সব অলঙ্কার আর কতকগুলি মোহর ও গিনি। সেগুলি সুরমা পাইয়াছিল তা'র বিবাহের সময় আত্মীয়দের কাছে।

জ্যোতি ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া বউদির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তার পর সে কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "মাপ কর বউদি, আমি তোমার গায়ের গয়না নিয়ে তোমাকে নিরাভরণ করতে পারবো না।"

সুরমা দৃঢ়ভাবে বলিল "তুমি যদি না নেও তবে আমি ওগুলো ভিখারী ডেকে বিলিয়ে দেব। আমার তো আর ও সবের কোনও দরকার হবে না ভাই।" বলিতে বলিতে সুরমা কিছুতেই অশ্রু-রোধ করিতে পারিল না।

জ্যোতির চক্ষুও জলে ভরিয়া উঠিল। সে কি করিবে ভাবিয়া পাইল না; শেষে ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, "তোমার দান প্রত্যাখ্যান ক'রবো না বউদি, এ সব আমি নিলাম। কিন্তু তোমার আশীর্ব্বাদে যদি কোনও দিন আমার সে সঙ্গতি হয়, তবে তোমাকে আমার কাছ থেকে আবার ঠিক এমনি গহনা প্রণামী নিতে হবে।"

১১

যে মেয়েটীর প্রসব বেদনার সংবাদ পাইয়া জ্যোতি পড়াশুনা ছাড়িয়া সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছিল, তার নাম কমলা। তার বয়স এখন ষোল সতেরো। মেয়েটির রঙ ময়লা কিন্তু মুখশ্রী মন্দ নয়—পূর্ণ যৌবনের গৌরবে মণ্ডিত। এখন ভাল খাইয়া পরিয়া তাহার শ্রী শতগুণ বাড়িয়া গিয়াছে।

কমলা আজ প্রায় দুই বৎসর জ্যোতির আশ্রমে আছে। আশ্রমটি ছোট ও আড়ম্বরশূন্য, মাত্র কয়খানি খোলার ঘর। তার একটি প্রকোষ্ঠে কমলা ও তার মা থাকে, একটিতে থাকে জ্যোতি নিজে, আর একটি লম্বা ঘরে থাকে একরাশ ছোট ছোট ছেলেপিলে। আর যে কচি খোকাটি জ্যোতি কুড়াইয়া পাইয়াছিল, তার ছোট একটা খাট জ্যোতির ঘরেই ছিল; সেখানে আসিয়া কমলা তাকে দেখাশুনা করিত, কিন্তু জ্যোতির চোখের সামনে।

জ্যোতি নিজে ছেলেদের পড়ায়, ধর্ম্মশিক্ষা দেয় আর একটি মিস্ত্রী ও এক দরজী তাদের কাজ শেখায়। কমলার শিক্ষার ভার সম্পূর্ণ গ্রহণ করিয়াছে জ্যোতি। কমলা এখন চলনসই গোছ সেলাই করিতে শিখিয়াছে, তার একটা কল আছে, তাতে সে জামা কাপড় সেলাই করে, বৌ-

বাজারের একটা দরজীর দোকানে সে সব কাপড় বিক্রী হয়। তা' ছাড়া সে লেখাপড়াও চলনসই শিখিয়াছে। জ্যোতির একাগ্র চেষ্টা ও যত্ন একেবারে নিষ্ফল হয় নাই। কমলার ছেলেটির প্রতি জ্যোতির যত্ন ও আদরের সীমা নাই।

কমলার মা অনেক দিন হইল স্থির করিয়াছে জ্যোতি যে কমলাকে এত যত্ন করে তার একমাত্র কারণ কমলার উপর তার মন পড়িয়াছে। কিন্তু এত আদর যত্ন সত্ত্বেও কমলা যে ঠিক তাহাকে হাত করিতে পারিতেছে না সেজন্ত সে কমলাকে নিভৃতে তিরস্কার করে। তার বিশ্বাস ত্রুটিটা কমলার। কমলার কিন্তু এ বিষয়ে যত্নের বিরাম ছিল না। সে জ্যোতির সেবা করিয়া, সব বিষয়ে তার আজ্ঞার অনুবর্তিনী হইয়া যথাসম্ভব আপনাকে তার প্রিয় করিবার জন্ত চেষ্টা করিত। তা' ছাড়া তার মা তাকে কতকগুলি তাবিজ, মাদুলী, সিঁদুর-পড়া প্রভৃতি নানাবিধ উপচার সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিল—তার প্রত্যেকটি পুরুষমানুষের মন হরণ করিবার জন্ত অব্যর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেগুলি কমলা পরম শ্রদ্ধার সহিত ধারণ করিত এবং তার প্রত্যেকটির বিহিত অনুষ্ঠান সে অনন্যমনা হইয়া পালন করিত। কিন্তু তবু জ্যোতির মনের উপর কোনও দাগ পড়িল না।

সেদিন বেশ গভীর রাত্রে কমলা বসিয়া বসিয়া জামা সেলাই করিতেছিল। তার মা আসিয়া অতি সঙ্গোপনে কাপড়ের তলা হইতে একটা গেলাস বাহির করিয়া বলিল "আজ বাবু এলে তাকে এই জলপড়াটা খাইয়ে দিস।"

কমলা বলিল, "না, ওসব আমি পারবো না। তাঁকে যা' তা' খেতে দিতে পারবো না, কে জানে কিসে কি হবে?

"কি আর হবে, এ ফকীর সাহেবের পড়া জল, এতে আর কিছু হবে না, শুধু সে তোর জন্ত পাগল হবে।"

কমলা কিছুতেই রাজী হইল না; সে বলিল, "কে জানে বাপু এর ভিতর বিষ টিস্ কি আছে, কত লোক তো এমনি ক'রে মারা যায়। ওসব আমি পারবো না।"

কিছুতেই যখন কমলা রাজী হইল না তখন তার মা তাকে গালাগালি আরম্ভ করিল। বলিল, হাবা মেয়ে সে ভদ্র লোকের চাল চরিত্র জানে না, তাদের বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। এই জ্যোতি যে কমলার জন্ত পাগল তাতে সন্দেহমাত্র নাই, কিন্তু ভদ্রলোকের ছেলে লজ্জায় অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। কমলা যদি গিয়া তার গায় পড়িয়া একটু আদর করে তবেই সব চুকিয়া যায়—না হয় এই জলপড়াটুকু দিলেই হয়—তা আভাগীর বেটী করবে না।

কমলার এ কথায় কান্না পাইল। সে বলিল, "ছাই ভালবাসে বাবু আমাকে, তুই ছাই বুঝিস। আমি না করি কি? এত করি তবু সে একটা আদরের কথা কোনও দিন বলে না। ওসব বাজে কথা—সে আমাকে কিছু ভালবাসে না।" বলিতে বলিতে সে ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

কমলা কাঁদিতে লাগিল, কিন্তু তার মায়ের কথায় নয়। তার এত দিনকার রুদ্ধ অভিমান আজ তার মনের ভিতর গর্জিয়া উঠিল। সে সত্য সত্যই জ্যোতিকে ভালবাসিয়াছিল, আর ভালবাসিয়াছিল বলিয়াই তার বড় লজ্জা, বড় ভয়, বড় সঙ্কোচ ছিল। তাই সে মায়ের কথা-মত জ্যোতির গায়ে পড়িয়া সোহাগ দেখাইতে সাহস করিত না। তার মনে হইত, হয়তো জ্যোতি ইহাতে অসন্তুষ্ট হইবে, হয়তো রাগ করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিবে, না হয় চলিয়া যাইবে। তাহা হইলে তার এই যে প্রিয় সান্নিধ্যটুকু সে পাইতেছে তাহাও তো সে হারাইবে! সেইজন্ত সে বড় ভয়ে ভয়ে থাকিত, শিষ্টতার কোনও সীমাই সে লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইত না।

ক্রমে এই কথা লইয়া মায়ে-ঝিয়ে ভীষণ ঝগড়া লাগিয়া গেল। কমলার মা তাকে যা নয় তাই বলিয়া শাসাইতে ও গালি দিতে লাগিল।

জ্যোতি সে ঘরের ভিতর আসিয়া ঢুকিল। কমলা একেবারে ভীত লজ্জিত হইয়া এতটুকু হইয়া গেল, তার মায়েরও মুখ শুকাইয়া গেল। জ্যোতি বিরক্ত হইয়া তাহাদিগকে বলিল, "তোমাদের ঝগড়াঝাঁটি কি কোনও দিন মিটবে না বাছা। এখন ঝগড়া রাখ। কমলা, তুমি গিয়ে তাড়াতাড়ি আমার পাশের ঘরটা পরিষ্কার ক'রে একটা খাটিয়ার একটা বিছানার জোগাড় ক'রে রেখে দে। আর

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

তোমার একখানা পরিষ্কার সাড়ী দেও তো একে পরতে।"

এতক্ষণ দরজার কাছে একটি সিক্তবসনা বিধবা দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছিল। জ্যোতি তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "তুমি কাপড় ছেড়ে এইখানে ব'স।"

কমলা জ্যোতির কাপড়ে হাত দিয়ে বলিল, "সর্ব্বনাশ, এই শীতের রাত্তিরে কোথা থেকে ভিজে এয়েছ? যাও, শীগ্‌গির কাপড় ছাড়গে, নইলে অসুখ করবে।"

জ্যোতি বলিল, "যাচ্ছি, তুমি আগে এ-কে একখানা কাপড় বের ক'রে দেও।"

তোরঙ্গ হইতে একখানা কাপড় বাহির করিয়া দিয়া কমলা বলিল, "যাও এখন যাও, আর তুমি দাঁড়িয়ে থেকো না বলছি।"

জ্যোতি হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল। কমলা তার আগে ছুটিয়া গিয়া তার কাপড় ও জামা বাহির করিয়া দিয়া চায়ের জন্য জল বসাইল। তারপর সে পাশের ঘর পরিষ্কার করিতে গেল।

যতক্ষণ বিধবা কাপড় ছাড়িতেছিল, কমলার মা ততক্ষণ তাহাকে একাগ্রমনে নিরীক্ষণ করিয়া ভাবিতেছিল, "এই-বারে বুঝি কমলার কপাল ভাঙ্গিল।" কিন্তু সে স্থির করিল এ পথের কাঁটা সরাইতে হইবে। বিধবার ভরা যৌবনের অপূর্ব্ব রূপরাশি দেখিয়া তার মনে দারুণ হিংসা জ্বলিয়া উঠিল।

কাপড় ছাড়িয়া বিধবা বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কমলার মা বলিল, "তুমি কে বাছা?"

বিধবা বলিল, "আমি বড় অভাগিনী মা, আমাকে দয়া ক'রে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না।"

"তা অভাগী আছিস ত আছিস, আর কি মরবার জায়গা পেলি না, আমার মেয়ের ঘাড়ে ভূত হ'য়ে চাপতে এলি!"

বিধবা চমকাইয়া উঠিয়া বলিল, "সর্ব্বনাশ! এ কোথায় এলাম?"

কমলার মার সুবিস্তৃত বিচিত্র বাগ্‌বহুল বক্তৃতা চলিতে লাগিল, শুনিতে শুনিতে বিধবার বুকের রক্ত শুকাইয়া গেল। জ্যোতি আসিতে যেন সে বাঁচিল। জ্যোতি বলিল, "তোমার ঘর তৈরী হয়েছে দিদি, এসো।"

বিধবা নির্ব্বাক হইয়া তার অনুসরণ করিল। জ্যোতি তাহাকে ঘরে লইয়া গেলে, সে সভয়ে বলিল, "এ আপনি আমায় কোথায় নিয়ে এলেন?"

জ্যোতি বলিল, "ভয় ক'রো না দিদি, এখানে তোমার কোনও ভয় নেই। আজ রাত্রে তুমি বিশ্রাম কর, কাল সব জানবে।"

"না, না, আমায় বলুন—নইলে আমি এখানে থাকবো না।"

জ্যোতি বলিল, "এটা তোমার যোগ্য বাসস্থান নয় দিদি, কেননা, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তুমি বড় ঘরের মেয়ে। এটা গরীবদের জন্ম একটা ছোট্ট আশ্রম, এখানে যারা আছে তারা সবাই অনাথ, নিরাশ্রয়। তোমাকে এখানে থাকতে হবে না, কেবল দুটো দিন কষ্ট ক'রে তোমায় এখানে থাকতে হবে।"

বিধবার বড় ভয় করিতে লাগিল, সে কিছুতেই আশ্বস্ত হইতে পারিল না। অনেকক্ষণ নীরবে থাকিয়া সে বলিল, "কেন আপনি আমায় মরতে দিলেন না। আমার বেঁচে থেকে কি লাভ?"

"আত্মহত্যা যে বড় ভয়ানক পাপ দিদি! ভগবান আমাদের জীবন দিয়েছেন এর সদ্ব্যবহার করবার জন্য। একে নিয়ে যা' তা' করবার আমাদের কোনও অধিকার নেই। তোমার বয়স অল্প, অনেক দিন তোমার সামনে প'ড়ে রয়েছে, অনেক রকমে তোমার জীবন সার্থক করবার সম্ভাবনা আছে। তোমার কি উচিত জীবন নষ্ট করা।"

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিধবা বলিল, "আমার জীবন সার্থক হবে! আপনি জানেন না আমি কত বড় হত-ভাগিনী, কত বড় দুঃখে আমি জলে ঝাঁপ দিয়েছিলাম।"

"তা' আমি জানি না, জানতে চাইও না; কিন্তু এ কথা জানি যে তোমার চক্ষের সামনে যখন তোমার সত্যি-কার প্রকাণ্ড জীবনটা খুলে যাবে, ভগবানের আশীর্ব্বাদ যখন তোমার উপর ঝ'রে পড়বে তখন তুমি বুঝতে পারবে যে-দুঃখ তুমি পেয়েছ সে সব তাঁর দয়া। জানতে পারবে

জীবন সার্থক করবার একটা বৃহৎ অবসর তোমার আছে।”

ঘাড় নাড়িয়া বিধবা বলিল, “আপনি জানেন না তাই বলছেন। আমার যা’ হ’য়েছে তাতে মৃত্যু ভিন্ন আমার গতি নেই।”

“সে কথা নিয়ে তর্ক ক’রে কি হবে। ভগবানের ইচ্ছা ছিল না যে এখন তোমার মৃত্যু হয় তাই আমাকে উপলক্ষ্য ক’রে তিনি তোমার প্রাণ রক্ষা করেছেন। এখন শুয়ে তুমি একটু সুস্থ হও, দু’ একদিন হয় তো মন শান্ত করতে যাবে। তারপর দু’জনে ভেবে চিন্তে তোমার যাতে ভাল হয় তা’ করা যাবে।”

বিধবা অগত্যা নীরব হইল। জ্যোতি যাইবার আগে জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার পরিচয় আমি জানতে চাই না, কিন্তু তোমার নামটা বলতে বিশেষ আপত্তি আছে কি?”

বিধবা একটু ভাবিয়া বলিল, “বিমলা ব’লে আমায় ডাকবেন।”

* * *

বিমলা সপ্তাহ খানেক জ্যোতির আশ্রমে থাকিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। সে তখন চট্ করিয়া আশ্রমের সমস্ত ভার গ্রহণ করিল, সকল শিশু এবং কমলার অভিভাবিকা হইয়া বসিল। তাহার হাতে শিশুদের চেহারা ফিরিয়া গেল, তারা তার ভয়ানক ভক্ত হইয়া উঠিল।

একদিন সন্ধ্যার সময় ছেলেদের ঘুম পাড়াইয়া বিমলা তার নিজের ঘরে বসিয়া নীরবে চিন্তা করিতেছিল। একটা প্রকাণ্ড কালো ছায়া তার সমস্ত অন্তরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। সমস্ত দিন সে কাজ কর্ম্মে অন্যমনস্ক ছিল—বেশ তৃপ্তি পাইয়াছিল, এখন একা বসিয়া তার মনের ভিতরকার সব ভয় সব দুঃখ উথলিয়া উঠিল। গালে হাত দিয়া সে ভাবিতে লাগিল, আর তার দুই চক্ষে অজস্র অশ্রুর ধারা প্রবাহিত হইল।

জ্যোতি আসিয়া বলিল, “আবার কাঁদছো বিমলা?”

চক্ষু মুছিয়া বিমলা বলিল, “আমি কাঁদবো না তো কাঁদবে কে দাদা? আমার মত হতভাগিনী কে আছে।”

জ্যোতি গম্ভীরভাবে বলিল, “কি রকম ক’রে যে তোমায় সুখী করবো তাই ভেবে আমি অস্থির হচ্ছি। দেখ, তোমার থাকবার একটা বেশ ভাল ব্যবস্থা করেছি। বিধবাশ্রমে গিয়েছিলাম। সেখানে হিন্দু বিধবাদের থাকবার এবং পরিশ্রম ক’রে নিজের জীবিকা উপার্জ্জন করবার বেশ সুব্যবস্থা হ’য়েছে। চলো তোমাকে সেখানে নিয়ে যাই।”

ভীত হইয়া বিমলা বলিল, “না দাদা, সে কাজ নেই, আমি এখানেই থাকবো।”

জ্যোতি বলিল, “না, না, এখানে তোমার কষ্ট হচ্ছে সে আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি। তুমি বড় ঘরের মেয়ে, তোমার পক্ষে এত কষ্টে থাকা সম্ভব হবে না। বিধবাশ্রমে বেশ বড় বাড়ী, ইলেক্‌ট্রিক লাইট আছে, সুন্দর একটা স্কুল হ’য়েছে আর সব ভদ্র ঘরের বিধবারা আছেন। তুমি সেখানে চল।”

বিমলা বলিল, “না দাদা, তোমার এখানে আমার কোনও কষ্ট নেই, তুমি আমায় যে সুখে রেখেছ আমার এত সুখ যে হ’তে পারে তা’ কখনও ভাবতেও পারিনি। আমার এক কষ্ট, আগে তোমার আশ্রয় পাইনি; তা যদি পেতাম তবে আমার জীবন ধন্য হ’য়ে যেত। এখন—এখন যে আমার সর্ব্বনাশ হ’য়ে গেছে।”

বলিয়া বিমলা কাঁদিয়া ফেলিল। জ্যোতি হাজার হউক ছেলে মানুষ—সে কিছুই বুঝিতে পারিল না,—ভয়ানক ভাবিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে বিমলা বলিল, “কোথায় আমায় নেবে দাদা? ভদ্রসমাজে আর তো আমার স্থান নেই। তুমি দয়াময়, তাই এ অভাগীকে এমন আশ্রয় দিয়েছ। তুমি তো জান না কি দুঃখে আমি খালের জলে ডুবতে গিয়েছিলাম।”

সত্যই জ্যোতি তা জানে না, কিছুই সে জানে না। সেদিন অনেক রাত্রে সে কলিকাতা হইতে নারিকেলডাঙ্গায় আসিতেছিল। পথে সে দেখিতে পাইল এক অবগুণ্ঠিতা নারী সন্তর্পণে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে খালের দিকে অগ্রসর হইতেছে। তার মনে নানা রকম সন্দেহ হইল,

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

সে একটু দাঁড়াইয়া দেখিল। দেখিতে পাইল সেই নারী খালের পুলের উপর গিয়া হঠাৎ জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। জ্যোতি তৎক্ষণাৎ লাফাইয়া পড়িয়া বহুকষ্টে তাহাকে তীরে উঠাইল। ইতিমধ্যে মেয়েটি অচেতন হইয়া পড়িয়াছিল। তার চৈতন্য সম্পাদন করিয়া সে তার বাড়ীর ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিল, কিছুতেই মেয়েটি বলিল না। তারপর অনেক কষ্টে তাহাকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া সে তার আশ্রমে লইয়া আসিল। কেন সে মরিতে আসিয়াছিল তাও জ্যোতি জিজ্ঞাসা করে নাই, তার পরিচয়ও জিজ্ঞাসা করে নাই। তার সম্বন্ধে আরো কিছু জানিবার জন্য তার আগ্রহ ছিল, কেননা সব কথা না জানিয়া সে ইহার চিত্ত শান্ত কেমন করিয়া করিবে? কিন্তু জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে ব্যথা দিতে সে সঙ্কোচ বোধ করিয়াছিল।

আজ সে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ডুবতে গিয়েছিলে বলতে ইচ্ছা কর কি তুমি?"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বিমলা বলিল, "সে পাপের কথা তোমাকে বলতেই হবে, নইলে তুমি বুঝতে পারবে না। আমি বড় ঘরের বউ, বড় ঘরের মেয়ে,—আজ দুই বৎসর হ'ল আমার স্বামী মারা গেছেন। তার পর আমি বাপের বাড়ী ছিলাম। সেখানে আমার মরণ হ'ল—আমি—অন্তঃস্বত্বা হলাম। তাই মরতে গিয়েছিলাম।" লজ্জায় বিমলা মাটির সঙ্গে মিশিয়া গেল।

জ্যোতি বলিল, "ওঃ এই কথা! এর জন্য মরতে গিয়েছিলে তুমি? সুধু আত্মহত্যা নয়, আর একটা জীবহত্যা করতে গিয়েছিলে? কি সর্ব্বনাশ! দিদি, যে পাপ তুমি করেছ সেটা বড় পাপ। কিন্তু তার চেয়ে বেশী পাপ হ'ত যদি তুমি সত্যি মরতে।"

"মরা ছাড়া আর আমার উপায় কি দাদা? আমার—আমার কি গতি আছে? কে আর আমাকে ঠাঁই দেবে? কে আমাকে ঘৃণা না করবে? কেমন ক'রে আমি বেঁচে থাকবো।"

জ্যোতি বলিল, "বেঁচে থাকবে তুমি মা হ'য়ে। মাতৃত্বের গৌরব তোমার সব গ্লানি মুছে দেবে। দিদি, আমায় আশ্রয় যদি ভগবান দেন তবে তোমার আশ্রয়ের অভাব হবে না। আর কোথাও তোমার ঠাঁই না হয় আমার এ কুটির ত তোমার রইলই। তোমার পেটে যাকে ভগবান স্থান দিয়েছেন তাকে মানুষ করবার ভার তোমার! তুমি পাপ করেছ, কিন্তু সে শিশু নিরপরাধ। তাকে তুমি মানুষ করবে, আশ্রমের ছেলেদের মানুষ করবে—এতে ক'রে তোমার জীবনের সব পাপ ধুয়ে গিয়ে তোমার পুণ্যের সিংহাসন রচনা হবে। মিছে ভয় পাচ্ছ দিদি, ভুল সবাই করে, পাপও সবাই করে। কিন্তু সমস্ত জীবনের কর্ম্ম দিয়ে যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে, সে পুণ্যবতী, পাপী নয়!"

বিমলা মুগ্ধ হইয়া জ্যোতির মুখে এ আশা ও উৎসাহের বাণী শুনিল, তার সমস্ত হৃদয় অনির্ব্বচনীয় আনন্দে আপ্লুত হইল। সে কিছুক্ষণ জ্যোতির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তার মনে হইল তার মুখে যেন কি এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় আভা ফুটিয়া রহিয়াছে। সে নত হইয়া জ্যোতিকে প্রণাম করিয়া বলিল,—

"তুমি মানুষ নও দাদা, তুমি দেবতা! ভগবান করুন তোমার আশীর্ব্বাদ যেন সফল হয়, যেন আমি তোমার চরণের ছায়ায় আমার এ পাপের জীবন পবিত্র ক'রে গড়তে পারি। কিন্তু দাদা, আর কোথাও আমায় যেতে ব'লো না—তোমার চরণ ছাড়া আমার অন্য আশ্রয় নেই, তোমার কাজ ছাড়া আমার অন্য কাজ নেই।"

(ক্রমশঃ)

বামা

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

'বামা' অর্থে স্ত্রীলোক। কিন্তু কেন স্ত্রীলোকের নাম বামা হল তা ভাববার বিষয়। বাংলা ভাষার কোন ভাষা-বিজ্ঞান এখনো তৈরী হয় নি। কাজেই স্ত্রীত্ববোধক 'বামা' শব্দের রহস্য ভেদ করা কঠিন।

মৈথিলী ভাষা বাংলা ভাষার একটা প্রাচীন রূপ। সে ভাষায় শিবকে কখনো কখনো বামা বলে। বিদ্যাপতির একটা পদাবলীতে আছে

'ভনই বিদ্যাপতি শুনু দেব কামা
এক দোষ অছ ওহি নামক বামা'

কিন্তু যেহেতু শিবের সঙ্গে নারীর কোনই বড় একটা সাদৃশ্য নেই, এজন্য মনে হয় ও 'বামা' থেকে এ 'বামা'র উৎপত্তি হয় নি। অবশ্য কবিকল্পনায় বিরহিনী রাধার সঙ্গে শিবের খানিকটা সাদৃশ্য দাঁড়িয়েছিল কিন্তু কবিই সে সাদৃশ্যকে নিরাশ করে রাধার মুখ দিয়ে বলাচ্চেন—

'কত ন বেদন মোহে দেহৈ মদনা
হর নহি বোলো মোহ যুবতি জনা।
নহি মোহি জটাজুট চিকুরক বেণী
থির সুরসুরি নহি কুসুমক শ্রেণী।
চানি তিলক মোহি নহি ইন্দু গোটা
ললাট পাবক নহি সিন্দূরক ফোঁটা।
কণ্ঠ গরল নহি মৃগমদ চারু
ফণী পতি মোর নহি মুকুতা হারু।'

সংস্কৃত ভাষার কারবার যখন উঠে যায়, তখন সেই ভাষার কিছু কিছু অভিধান-জাত মাল সস্তার কিস্তিতে কিনে নাকি বাংলা ভাষা তার কারবার সুরু করে। তার পর সে নিজের কারখানাতেও মাল তৈরী করচে। আশপাশের পাঁচটা কারখানা থেকেও মাল আমদানী করচে—কিন্তু যে সব পণ্ডিত তার হাঁড়ির খবর নাড়ির খবর দুই-ই জানেন তাঁরা দেখেই ব'লে দিতে পারেন কোন্ মালটা কোন্‌খান থেকে পাওয়া। কিন্তু আমরা নাকি অতটা পণ্ডিত নই—কেবল মার্কার ছাপ দেখে চলি, কাজেই আমাদের এক এক সময় ধোঁকা লাগে। এই ধরুন, কোন পণ্ডিত যদি বলেন 'বামা' শব্দটা ইংরাজী 'বাম্' শব্দের অপভ্রংশ, কেননা নারীর সেবা-শুশ্রূষা ও মিষ্টবচন মলমের মতই স্নিগ্ধ

'When sorrow and care wrinkles the brow
A ministering angel thou"

তাহলে আমরা প্রতিবাদ করতে অক্ষম। তবে আমরা যখন সংস্কৃতের শব্দ-ক্যাটালোগ্ থেকে দেখতে পাই যে তার গুদামেও 'বামা' বলে একটা শব্দ ছিল এবং তার অর্থও স্ত্রীলোক তখন আমাদের প্রাকৃত বুদ্ধি এইটেই সিদ্ধান্ত করে ব'সে যে এই দুই 'বামাই' এক।

কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্ত সত্য হলেও সমস্যার কোন মীমাংসা হল না। বামা শব্দের অর্থ নারী হল কি ক'রে? সংস্কৃত বামা শব্দের আদিম অর্থ যে নারী ছিল না, তা নিশ্চিত—কেননা, 'বাম' শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গসূচক আকার জুড়েই ও শব্দের উৎপত্তি। কাজেই দেখতে হবে বাম শব্দের কি-কি অর্থ সংস্কৃত কোষে আছে। 'বাম' শব্দের প্রথম অর্থ হচ্চে 'বাঁ'। কিন্তু 'বাঁ-র সঙ্গে নারীর কি সম্পর্ক?

'বাঁ' মানে বাঁ অঙ্গ ধরলে দেখা যায় যে নারীর সঙ্গে 'বাঁ'-র একটা গূঢ় অথচ অনির্দেশ্য বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধ আছে। নারীকে সংস্কৃতে শুধু বামা নয় বামাঙ্গীও বলে। কেন? পুরুষের যেমন বাঁ হাত পা-র চেয়ে ডান হাত পা-ই চলে বেশী, নারীর কি তেম্নি ডান হাত পা-র চেয়ে বাঁ হাত পা-ই চলে বেশী? অর্থাৎ এক কথায় নারী মাত্রেই কি ল্যাডা? প্রাচীন যুগে তাঁরা কি ছিলেন জানি না, কিন্তু এ যুগে আর যা-ই হোন্ তাঁরা ল্যাডা ন'ন্। তাঁরা ডান



“ অর্‌—র্‌ ”

অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪

শিল্পী—শ্রীচঞ্চল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বামা

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

হাত দিয়েই ছেলে পেটেন, ডান হাত দিয়েই হাঁড়ির গলায় বেড়ী পরান্। কিন্তু সুক্ষ্মদর্শীরা হয় ত আপত্তি ধরে বল্‌বেন যে স্ত্রীলোক ন্যাঙা মানে পুরুষের চেয়ে ন্যাঙা। চলবার সময় সব পুরুষই আগে ডান পা বাড়ান্ কিন্তু নারীরা বাড়ান্ তার বিপরীত। অবশ্য আমি লক্ষ্য করে দেখেছি এ সত্যের অনেক স্থলেই ব্যতিক্রম হয় কিন্তু পুরুষের পক্ষে ও-রকম ব্যতিক্রম নাকি আর্ষ প্রয়োগ এবং নারীর পক্ষে নিপাতনে সিদ্ধ। কেউ কেউ আবার বলেন, নারী এই অর্থে ন্যাঙা যে তাঁর ডান বাঁ দুদিককার হাতে পায়েই সমান জোর, যা পুরুষের নয়। পুরুষের দেখাদেখি তাঁরা চালান্ অবশ্য ডান হাত পা-ই বেশী কিন্তু সেটা বলাধিক্যের জন্য নয়। যিনিই নাকি নারীকে ঢেঁকিতে 'পার' দিতে দেখেছেন তিনিই এ সত্য জলের মত বুঝতে পার্বেন। এ পা ভারিয়ে গেলে তাঁরা এ পা-কে জিরোতে দিয়ে ও পা-কে কাজে জোতেন, কিন্তু 'পার' পড়তে থাকে সেই একই জোরে, একই ঘন ঘন তালে। আমি কিন্তু এ প্রমাণকেও চূড়ান্ত বলে নিতে পারলুম না। চুড়ীওয়ালাদের সাক্ষ্য একেবারে উড়িয়ে দোব কি করে? তারা হলপ্ করে বলে যে, নারীর ডান হাতটা বাঁ হাতের চেয়ে অনেক মোটা, অনেক শক্ত সুতরাং অনেক জোরালো। যে চুড়ী তারা অনায়াসেই বাঁ হাতে পরায় তাই ডান হাতে পরাতে গেলে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। সাবান-জল দিয়ে টিপ্‌তে টিপ্‌তে কপালে ঘাম বেরিয়ে যায়, তবু ওই অদম্য ক্ষতিকর হাতটা সঙ্কোচ ও কোমলত্বের বাঞ্ছনীয় সীমায় নাবে না। এ-র বিরুদ্ধে কোন কোন তার্কিক অবশ্য বলেন যে, হতে পারে নারীর বাঁ হাতের চেয়ে ডান হাতের জোর বেশী কিন্তু সহিষ্ণুতায় ডান হাত বাঁ হাতের কাছে পরাস্ত—উদাহরণ, নারীরা ভুলেও কখনো ডান কাঁকে কলসী নে'ন না, ছেলেকে বাঁ কোলে নিয়েই পাড়া বেড়াতে যান্। আমার মতে এ ব্যাখ্যাও গা-জুরী। মানুষের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে দুর্ব্বলের ঘাড়েই ভার চাপানোর। তবে আমি নারীর 'বামা' নামকে এই হিসাবে সার্থক বলতে পারি যে, বাঁ অঙ্গই তাঁদের প্রধান অঙ্গ। পুরুষের ডানঅঙ্গ নাচে ভালোর জন্যে কিন্তু স্ত্রীলোকের বাঁ অঙ্গ নাচলেই পোয়া বারো। শকুন্তলা-লাভের পূর্ব্বে দুষ্মন্তের দক্ষিণ বাহু স্ফুরিত হয়েছিল কিন্তু কৃষ্ণমিলনাসন্না রাধার স্ফুরিত হয়েছিল দক্ষিণেতর চক্ষু।—

> 'চিকুর ফুরিছে　　　বসন খসিছে
> পুলক যৌবন ভার
> বাম অঙ্গ আঁখি　　　সঘনে নাচিছে
> দুলিছে হিয়ার হার।'

এ ছাড়া আধ্যাত্মিক শারীর বিজ্ঞানে নাকি বলে যে নারীর বাঁ দিকের স্নায়ুমণ্ডলী ও অন্ত্রযন্ত্রই বেশী জোরালো। তাঁরা বাঁ কাতে শুলেই ঘুমোন্ ভালো, বাঁ নাকে নিশ্বাস টান্‌লেই থাকেন ভালো আর দুচোখের মধ্যে বাঁ চোখে দেখ্‌লেই দেখেন্ ভালো।

এইবার বাঁ মানে বাঁ অঙ্গ না ধরে বাঁ দিক ধরেই দেখা যাক্। আমার বিশ্বাস এতে করে 'বামা' শব্দের অর্থটি আরো পরিষ্কার হবে। নারী পুরুষের বামার্দ্ধভাগিনী। তাঁরা পুরুষের বাঁ দিকে বসেন্, বাঁ দিকে শোন্, এমন কি বাঁ হাত ধরে চলেন্। এটা কি একটা যুক্তিহীন চিরাগত প্রথা? কখনই নয়। নিশ্চয় এর মূলে কোন গভীর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিহিত আছে। আমি সাদাসিদে লোক, বিজ্ঞানের ধার ধারি না—তবু যে উৎকট গবেষণাটি বুদ্ধির দ্বার ঠেলে আমার সজ্জাহীন অন্তর-পুরে অনধিকার প্রবেশ কর্‌চে তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারচি না। বিজ্ঞের দল সেটাকে হয় ত ছেলেমানুষী বলে হেসে উঠবেন কিন্তু তাঁদের কাছে আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে তাঁরা যেন তাঁদের স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীর ভাবেই কথাটাকে উড়িয়ে দেন—হেসে উড়িয়ে দেন্ না।

আমার মনে হয় নারী যে সর্ব্বদাই পুরুষের বাঁ দিকে থাকেন—ডান দিকে থাক্‌লেও আপনা হতে বাঁ দিকে এসে দাঁড়ান্, তার মানে আর কিছুই নয়, অম্বরাগত সংস্কার। প্রাচীন কাল থেকেই পুরুষের বাঁ দিক দখল করাটা তাঁদের অস্থিমজ্জাগত হয়ে গেছে। কেন হয়ে গেছে তা সংক্ষেপে বোঝাবার চেষ্টা করবো।

আমি তিনটী স্বীকার্য্য থেকে প্রতিপাদ্য বিষয় বের করবো। আমার প্রথম স্বীকার্য্য এই যে পুরুষের

বাঁ হাতের চেয়ে ডান হাতের জোর চিরদিনই বেশী। দ্বিতীয় স্বীকার্য্য—সেকালে হিংস্র জন্তু ও হিংস্র মানুষের সংখ্যা একালের চেয়ে বেশী ছিল—সুতরাং মানুষকে সর্ব্বদাই আত্মরক্ষার জন্য সশস্ত্র হয়ে বেড়াতে হত। তৃতীয় স্বীকার্য্য,—সেকালেও সন্তান-প্রসবের জন্যই হোক্ আর পরিশ্রম-ন্যূনতার জন্যই হোক্, নারী পুরুষের চেয়ে দুর্ব্বলতর ছিল—সুতরাং তাদের রক্ষার ভার ছিল পুরুষেরই উপর। এ তিনটী স্বীকার্য্য স্বীকার করে নিলে একটুও বুঝতে দেরী হবে না যে সেকালের পুরুষরা নারীদের বাঁ দিকে রেখেই চলতো। পুরুষ ডান হাত দিয়েই যুদ্ধ করবে—সুতরাং সেদিকে স্ত্রীলোক থাকলে যুদ্ধ চালানোও যেমন দায়, অবলা-গাত্রে চোট লাগারও তেম্নি সম্ভাবনা। সুতরাং বড় যুদ্ধ-জাহাজ যেমন ছোট বাণিজ্য-জাহাজকে সেই দিকে রাখে সেদিকে যুদ্ধের হাঙ্গামা নেই, সেকালের পুরুষরাও তেম্নি নারীদের সেই দিকে রেখে চল্‌তো যে দিকটা আক্রমণের দিক নয়, সুতরাং অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। এখনকার নারীরা সেই প্রাচীন যুগের অভ্যাসকেই অজ্ঞাত-সারে তামিল করে যাচ্ছেন্।

'বাঁ' অর্থ ছাড়া 'বাম' শব্দের অন্য অর্থও সংস্কৃত কোষে আছে। এইবার সেই সব অর্থ ধরেই দেখা যাক্ রমণীর বামা নামের ভিত্তি কোথায়। 'বাম' শব্দের এক মানে বাঁকা। বাঁকা চাউনিকে সংস্কৃতে বামদৃষ্টি বলে। এ দৃষ্টি নারীরই একচেটে সম্পত্তি। পুরুষের কুটিল কটাক্ষে এক হিংস্র ভাব ভিন্ন অন্য কোন ভাব প্রকটিত হয় না—এজন্য এর অনুশীলন হতে পুরুষ সর্ব্বতোভাবে বিরত। কিন্তু নারীর আড় চোখের সলজ্জ মধুর চাউনিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভাবসমুদ্র 'চন্দ্রোদয়ারম্ভে ইবাম্বুরাশিঃ' স্ফীত, মথিত ও উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। আর শুধুই কি বাঁকা চাউনি? নারীর সবই বাঁকা। তাঁরা 'অরাল কুন্তলা', 'সাচীকৃতচারুবক্ত্রা'। কেবল চলনটাই তাঁদের বাঁকা নয়—কেননা তাঁদের না দেখতে পারে এমন লোকই নেই—নৈলে হাসি, কথা, বুদ্ধি কিছুই তাঁদের সোজা নয়। আগে সীমন্তটা সোজা ছিল, এখন দেখ্‌চি তাও বেঁকে যাচ্ছে।

রমণীর কথা ও বুদ্ধি যে বাঁকা এ শুনে হয় ত অনেক পাঠিকাই আমার দিকে ভ্রু বাঁকাবেন, অর্থাৎ ভ্রুকুটী নিক্ষেপ করবেন, কিন্তু কি করবো? আমার চাঁচাছোলা কথাকে ঈষৎ বেঁকিয়েও তাঁদের শ্রোত্রসুখকর করতে পারলুম না। কি করে পারবো? আমার পুরুষ-বাক্য—(পরুষ-বাক্য বল্‌লেও চলে) যে ঢোঁড়া সাপের মতই সরল মোটা গতিতে চলে, কালসর্পের মত কুটিল ভঙ্গীতে এঁকে বেঁকে চলা তার পক্ষে অসাধ্য। আমাদের তুলনায় নারীরা যে শোনেন বাঁকা এবং বলেন বাঁকা তা পাঠিকারা অস্বীকার করলেও পাঠকরা বোধ হয় করবেন না। দাম্পত্য-জীবনে এমন প্রতি পুরুষেরই ঘটে থাকে, যাতে তিনি তাঁর বালা স্ত্রীর কাছেও কথার মারপ্যাচে হার মেনে যান্, চাতুর্য্যের ঘটনা-নাগপাশে জড়িত হয়ে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়েন। হয়ত স্বামী সোজা বুদ্ধির সোজা ভাষায় বলে ফেল্‌লেন—'ও বাড়ীর বৌ কেমন লক্ষ্মী।' অম্‌নি স্ত্রী নাক ও ঠোঁট যুগপৎ বেঁকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'কি করে জান্‌লে?' স্বামী একটু ত্রস্ত হয়ে আম্‌তা আম্‌তা স্বরে বল্লেন—'এই চেহারা দেখেই মনে হয়।' স্ত্রী একটা অস্বাভাবিক বাঁকা নিশ্বাস ফেলে বল্লেন—'হুঁ'। কিংবা স্বামী হয় ত কিছুমাত্র ভবিষ্যৎ না ভেবে জিজ্ঞাসা করলেন—'আজ কে রেঁধেচে?' স্ত্রী সে কথার সোজা উত্তর না দিয়ে উল্টে জিজ্ঞাসা করলেন—'কেন, কেমন হয়েচে?' স্বামী নির্ব্বাক বক্রতাকে আশ্রয় না করে মূর্খের মত উত্তর করলেন—'চমৎকার'। স্ত্রী অসীম দুঃখসূচক বক্রকণ্ঠঝঙ্কারে বল্লেন—'চমৎকারই ত হবে। ও যে তোমার বামুনদিদির রান্না। আমার রান্না আর কবে ভাল হয়? তা ভাল হলে ত বল্‌বে। আমাদের সবই মন্দ: কপাল মন্দ হলে সবই মন্দ হয়।' স্বামী হয় ত এই অকারণ আত্মগ্লানির মর্ম্মস্পর্শী স্রোতে একটা সোজা কথার বাঁধ দিতে গিয়ে বল্লেন—'আহাহা, আমি কি তাই বল্‌চি?' স্ত্রী টঙ্কার-দেওয়া ধনুকের মত বঙ্কিমতর ভঙ্গীতে জবাব দিলেন—'আর কি করে মানুষে বলে? ও ঠারেঠোরে বলাও যা স্পষ্ট বলাও তাই। তা কাজ কি? আমার যখন কিছুই ভাল নয়—আর একটা ভাল দেখে—'আর বল্‌তে পারলেন না, কণ্ঠস্বর বাষ্পরুদ্ধ হয়ে চোখের কোণে একটা সজল ছলছল ভাবের সৃষ্টি করলে। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় স্বামীর হাতের গ্রাস হাতেই থেকে গেলো, বা পাতের উপর খসে পড়লো।

বামা

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

'বাম' শব্দের আর এক অর্থ হচ্চে উল্টো। এ অর্থে বামা শব্দের মানে যাঁদের সবই উল্টো। উল্টোই ত। আমরা বোঁটা ফেলে দিয়ে পান খাই, তাঁদের সদীর্ঘবৃন্ত পান না হলে মুখ ভরে না। আমরা রোগ হবে শব্দে ডাক্তার ডাকি তাঁরা ততক্ষণ রোগ চেপে রাখেন যতক্ষণ না সে নিজে ধরা দেয়। পরের ছেলে যদি নিজের ছেলেকে অন্যায় করে ধরে মারে, তাহলে আমরা নালিশ করি পরের ছেলের বাপ মা'র কাছে, তাঁরা পালিশ করেন নিজের ছেলের পৃষ্ঠদেশ এবং সঙ্গে সঙ্গে গর্জ্জন করেন—'কেন গিয়েছিলি? মরতে যাস্ কেন?'

'বাম' শব্দের যে বিরুদ্ধ বা বিমুখ অর্থ অভিধানে লেখে সে হিসাবেও বামা শব্দ অন্বর্থ। নারীরা কথায় কথায় মুখ ঘুরিয়ে বসেন। তাঁদের কথায় কথায় রাগ, কথায় কথায় মান, কথায় কথায় অসন্তোষ। এ ছাড়া কখনো লজ্জা, কখনো অহঙ্কার, কখনো ঈর্ষা তাঁদের কুন্দ-সুন্দর মুখখানিকে বেঁকিয়ে দেয়। এ অবস্থায় তাঁরা হয় মৌনব্রতে থাকেন, না হয় কুন্দনন্দিনীর মত বের করতে থাকেন ছোট্ট এক একটি 'না'। স্তব স্তুতি, সাধ্য সাধনা, বস্ত্র অলঙ্কার এ সবের সাহায্যেও তাঁদের তখন দক্ষিণা করে তোলা দুর্ঘট হয়ে ওঠে। বরং দক্ষিণা করতে গিয়ে অনেক সময় দক্ষিণা মেলে সহুঙ্কার মুখ-ঝামটা। পৃথিবীতে সীতা, শকুন্তলা, মৃণালিনীর মত দক্ষিণা নায়িকার ঐতিহাসিক অস্তিত্ব যদিও থাকে তবু তাদের সংখ্যা এত কম যে মোটের উপর সব স্ত্রীলোককেই 'বামা' বলা যেতে পারে।

বেঁটে অর্থেও বাম শব্দের প্রয়োগ সংস্কৃত সাহিত্যে দেখা যায়। ঠিক বামন না হলেও বামারা যে বেঁটে তা কে অস্বীকার করবে? চীনে জাপানী মেয়েদের ছেড়ে দিয়ে আফ্‌গান, জর্ম্মান্ মেয়েদের দিকেই চাও, দেখ্‌বে পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গিনী হবার যোগ্যতা তাদের মোটেই নেই। যে কোন জাতের সব চেয়ে লম্বা পুরুষের চেয়ে সব চেয়ে লম্বা স্ত্রীলোক অন্তত ছচার আঙুল খাটো। কথকদের মুখে এক রেবতীর কথাই শুনেছি যার সঙ্গে কানে কানে কথা বলতে হলে বলরামের মত প্রাংশু পুরুষকেও কাঁধে মই লাগাতে হতো। এই বিষম অসুবিধার জন্যই নাকি বলরাম একদিন লাঙ্গলের টানে তাঁর ঢেঙা পত্নীটির দেহদৈর্ঘ্যকে কথঞ্চিৎ খর্ব্ব করেছিলেন এবং তাতে করে রেবতীর মুখ যদিও তাঁর নিজের মুখের সমসূত্রে নেবে থাকে, তাহলেও তার পিঠখানি যে উষ্ট্রপৃষ্ঠের কুব্জত্ব ও ন্যুব্জত্ব দুই-ই লাভ করেছিল তা নিশ্চিত।

কন্দর্পার্থক 'বাম' শব্দ হতেও বামা শব্দের উৎপত্তি হওয়া বিচিত্র নয়। প্রত্যেক যুবতীর দেহমধ্যেই যে সকার্ম্মুক কন্দর্প অরণিমধ্যস্থ অগ্নির মতো লুক্কায়িত আছেন তা অবিসংবাদিত। যুবতীর আরক্তিম ভ্রূলতার ভিতর দিয়ে যে পুষ্পধন্বার ভ্রমর-মৌর্ব্বী ধনুকটি উঁকি মারে এবং কৃষ্ণতারকার মর্ম্মভেদী কটাক্ষের ভিতর দিয়ে যে সম্মোহন বাণের ফলাটুকু দেখা যায় তা যার চোখ আছে সেই বল্‌বে। ধ্যানমগ্ন মহাদেবের প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি দেখে মদন ত ঘেবড়েই গিয়েছিলেন—অবশ হাত থেকে ফুলের ধনুক খসে পড়েছিল। তিনি ফের চাঙ্গা হয়ে মহাদেবকে বাণ মারতে উঠ্‌লেন কিসে? পার্ব্বতীকে দেখে। দেখলেন পার্ব্বতীর মধ্যে তাঁরই মত এবং তাঁর চেয়েও দুর্নিবার আর এক কন্দর্প ধনুক উঁচিয়ে তীর বাগিয়ে রয়েচেন। জুড়ীদার পেলে চৌকিদারের সাহস বাড়ে আর কন্দর্পের বাড়বে না?

'বাম' শব্দের আর যে সব অর্থ অভিধানে পাওয়া যায়, তা থেকে জোর জবরদস্তি না করলে বামা শব্দের অর্থ নিঙড়ে বের করা যায় না। তবে 'বাম' শব্দের একটি অর্থ আছে যা থেকে বামা শব্দের সার্থকতা ঠিক তেমনি সহজভাবে বেরিয়ে আসে যেমন বেরিয়ে আসে পাকা আঙুরের ভিতর হতে রস। বাম শব্দের অর্থ 'সুন্দর'। পুরুষের চক্ষে নারীর মত সুন্দর আর কি আছে? তাঁরা বামলোচনা বামোরু, বামকেশী। যিনি সকল দেবতার মধ্যে সুন্দর সেই বামদেবও এক বামার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে তপস্যার জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন।

'বাম' শব্দের 'সুন্দর' অর্থটি বোধ হয় 'বাঁকা' অর্থেরই পরিণতি। যা বাঁকা নয় তা কবে সুন্দর? প্যারী নগরীর সব রাস্তাই সটান সোজা—কিন্তু তাতে করে তার প্রাসাদ উপবন প্রমোদকুঞ্জের শোভা যে কতটা কমিয়ে দিয়েচে তা আজকাল ফরাসীরা বুঝেচে। বেগ, হিল্লোল, আবেগ সবই বাঁকা টানের খেলা। কোন্ গ্রহ, কোন নক্ষত্র, কোন্ ধূমকেতু

সরলরেখায় চলে? নারীর চোখ যদি ত্রিভুজের মতো ত্রিকোণ হতো, আর মুখ যদি রম্বসের মতো চারকোণা হতো, তাহলে নিশ্চয় বলতে পারতুম 'বাম' শব্দের 'সুন্দর' অর্থ থেকে বামা শব্দের জন্মলাভ হয়নি।

যাই হোক্ আমার শেষ সিদ্ধান্ত এই যে বামা শব্দের আদিম অর্থ ছিল্ সুন্দরী, তারপর যেহেতু নারীমাত্রেই কোন না কোন বয়সে কারো না কারো চোখে পরম সুন্দরী বলে প্রতিভাত হয়, এইজন্য 'বামা'র বর্ত্তমান অর্থ দাঁড়িয়েচে স্ত্রীলোক। আর এ কথা কে অস্বীকার করবে যে এক এক জন বামা এতই সুন্দরী আছেন যে বিদ্যাপতির সঙ্গে একসুরে বল্‌তে ইচ্ছা হয়—

অপরূপ পেখলু রামা
কনকলতা অব- লম্বনে উয়ল
হরিণীহীন হিমধামা।

'রামা'র পরিবর্ত্তে 'বামা' পাঠ কি কোন পুরাণো পুঁথিতে নেই? তাহলে যে অর্থটা আরো খোল্‌তাই হয়। যদি না থাকে তাহলে লিপিকরদের স্বাধিকারপ্রমত্ত স্বাধীনতার উপর যে বড়ই অশ্রদ্ধা এসে পড়ে। তাঁরা 'অর্ক'র জায়গায় 'অশ্ব' এবং 'অস্তাচল'-এর জায়গায় 'আস্তাবল' করতে পারেন' আর তাঁদের একজনও একটা ছোট কুট্‌কি তুলে দিতে পারেননি!

বিজয়িনী

শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়

প্রিয়ে ধরা!
একদিন মৃত্যু আসি লয়ে যাবে ছিন্ন করি
তব সুকোমল আলিঙ্গন পাশ।
তার পর কতদিন চলি যাবে—!
ততদিন—হে তন্বী ধরণী,
রবে কি তখনো তুমি এমনি সুন্দরী—
পুষ্পভারেনতা, পবনচঞ্চলা, সূর্য্যপ্রিয়া?
ফুটিবে কি প্রতিদিন এমনি মোহন সাজে
ভুলাইতে পলে পলে মুগ্ধ মানবেরে,
শুধু ক্ষণিকের তরে?

ওরে চির পুরাতন মানব-প্রেয়সী
তুই কি হবি না কভু জরায় জর্জ্জর?
চিরকাল রহিবি কি একেলা একক!
অন্ত কি কোথায় নাহি তোর
রে মোহিনী ওরে বিজয়িনী!
তুই শুধু জেগে রবি হাসিতে অবজ্ঞাভরে,
স্তব্ধ তুই আঁখি মেলি, মৃদুহাস্য-প্রসন্ন-আননে—
যবে একে একে মিশে যাবে তোর যত পূজারক
কালের নিবিড় অন্ধকারে!

ওরে বল্, শুধু একবার বল,
কবে তুইও শেষে যাবি মরণের কোলে
আমাদেরই মতো?
আর কভু তুলিবি না ধরে
তোর ওই সুধামাখা বিষ-পাত্র খানি
মূঢ় মানবের মুখে?

খেয়ালিয়া

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

তোমায় স্মরি' হে সুন্দরী,
আমার মনের খেয়ালিয়া
আজ প্রভাতে হ'ল সুরু।
তোমার চোখের দীপ্তি দিয়া
রচ্‌ব এরে সহজ সুরে
রচ্‌ব সহজিয়ার তালে
কতক সত্য অনুসারে,
কতকটা বা স্বপ্ন-জালে

অতল গভীর মনের গতি
করবে এরে মনের মতন.
ইচ্ছা-সুখে চলবে ইহার
ছন্দ এবং ছন্দ-পতন।
মান্‌বো নাকো অনুশাসন
অলঙ্কার ও ব্যাকরণের,
যে-পথ দিয়া চল্‌বে হিয়া
হবে ইহা সেই ধরণের।

কখনো বা সুখের প্রভা
করবে এরে প্রভান্বিত,
নিবিড়-ঘন দুখের ছায়া
করবে কভু শ্যামলিত।
কখনো বা অভিমানের
রুদ্ধ-দৃঢ় কঠিনতায়
উঠ্‌বে ফুটে করুণতা
চোখের পাতা লেখার পাতায়

মলিন কভু হবেনা এ
ছাপাখানার মসী মাখি ;
অসির আঘাত নারবে দিতে
সমালোচক রক্ত-আঁখি,
সম্পাদকে খোঁজ পাবে না,
খোঁজ পাবে না প্রকাশকে
তুমি যাহার প্রকাশিকা
থাক্‌বে গোপন খেয়াল-ছকে

নেত্রে আমার লাগ্‌লো তোমার
চোখের আলো হে সুন্দরী,
বাজ্‌লো চিত্ত-নহবতে
শতেক আশার আশাবরী,
অনাহুতা প্রভাতী এ
খেয়ালিয়ার লগ্ন-কালে
ভরলো নিখিল আকাশ-ভুবন
তোমার সুরে আমার তালে।



সহযোগী-সাহিত্য

কবি টমাস হার্ডি

শ্রীসোমনাথ মৈত্র

টমাস্ হার্ডিকে আমরা জগদ্বিখ্যাত ঔপন্যাসিক হিসাবেই জানিয়া আসিয়াছি, এবং উপন্যাস-জগতে তাঁহার স্থান বহু-দিন হইতে সুনির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়াই তাঁহার বই-গুলি সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহলও কমিয়া গিয়াছে। তাঁহার প্রায় বিশখানি গল্প ও উপন্যাসের সবগুলি না পড়িয়াও তাঁহাকে প্রথম শ্রেণীর কথাশিল্পী বলিতে আপত্তি তোলার কথাও আমাদের মনে আসে না, কেননা প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীর যাচাইয়ের ফলে যে প্রতিভা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে তাহা বিনা চিন্তায় মানিয়া লওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু হার্ডির কবি রূপটি আমাদের নিকট তত সুপরিচিত নহে, যদিও তাঁহার জীবনের শেষ ত্রিশ বৎসর তিনি কবিতা ছাড়া আর কিছুই লিখেন নাই। শুধু আমাদের কাছে কেন, তাঁহার নিজের দেশেও তাঁহার কবিখ্যাতি অপেক্ষা-কৃত অল্পসংখ্যক মুগ্ধ পাঠকের মধ্যেই আবদ্ধ, তাহা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত নহে।

ইহার কারণ যে ঠিক কি, তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন, যেহেতু কারণ মাত্র একটি নহে। আপাত দৃষ্টিতে তাঁহার কাব্যের কয়েকটা বিশেষ লক্ষণ চোখে পড়ে যাহা নয়ন মনকে তৎক্ষণাৎ আকৃষ্ট করে না। কবিতার মধ্যে যে ছন্দের মাধুর্য্য ও শব্দের লালিত্য প্রত্যাশা করিতে আমরা চিরাভ্যস্ত, হার্ডির বহু কবিতায় তাহার একান্ত অভাব। তাঁহার কবিতায় এমন পরিপূর্ণ সরলতা, সকল প্রকার শব্দ-চাতুর্য্য ও অলঙ্কারের এমন একান্ত বিরলতা আছে যাহা তাঁহার পাঠকদের দৃষ্টিতে কটু লাগে; তাঁহার কাব্যলক্ষ্মীর সর্ব্ববাহুল্যবর্জ্জিত, নিরাভরণ সহজ শ্রীকে তাহারা উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যায়, যেন যাহা অনাড়ম্বর তাহা দীন।

তারপর, উনবিংশতি অঙ্ক ও একশত ত্রিশ গর্ভাঙ্ক সম্বলিত যে মহাকাব্য তিনি ছয় বৎসর ধরিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা পড়িবার মত দুঃসাহস কয়জন পাঠকের থাকিতে পারে? আজিকার দিনে যিনি মহাকাব্য রচয়িতা বলিয়া পরিচিত হন, তাঁহার একান্ত দুর্ভাগ্য; তাঁহার এপিক্ তো লোকে পড়েই না, উপরন্তু তাঁহার অন্য কবিতাও মহা-কবিতার ছাঁচে ঢালা ভাবিয়া ত্রস্ত পাঠক দূরে পলায়ন করে!

তৃতীয়ত, হার্ডির যেমন চেলা নাই, তেমনি গুরুও নাই। তাঁহাকে যে কোন্ পর্য্যায়ে ফেলা যায় তাহা স্থির হইল না। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে জন্মিয়াও তিনি ভিক্টোরীয় যুগের নহেন, অতি আধুনিক "জর্জ্জিয়ান" ত নহেন-ই। যাহার শিষ্যও নাই, গুরুও নাই, যে এ-যুগেরও নহে ও-যুগেরও নহে, কোনো শিল্পী-সম্প্রদায় বা কবিদলভুক্ত যে নহে, তাহাকে বুঝিয়া উঠা শক্ত। পরিচিত কোঠায় না ফেলিতে পারিলে কোনো সাহিত্যসৃষ্টিকেই পাঠকের মন গ্রহণ করিতে চাহে না, কারণ যাহা শ্রেণীবিভাগে ধরা দেয় না সেই অপরিচিতকে, সেই বিশিষ্টকে বুঝিতে ও গ্রহণ করিতে চেষ্টা চাই, শ্রদ্ধার সঙ্গে বিচার চাই, সমালোচনা-সাহিত্যের বাঁধিগতের মাপকাঠি ছাড়িয়া নিজ নিজ জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির ভিতর দিয়া রসোপলব্ধির প্রয়াস চাই।

সুতরাং একদিকে যেমন বিগত শতাব্দীর ইংরাজ কবি-শেখরদের ন্যায় হার্ডি প্রখ্যাত নাম মাত্রে পরিণত হন নাই, যাঁহার সম্বন্ধে নূতন কিছু বলিবার নাই বা বলিলেও কেহ শুনিবে না,—অন্যদিকে তেমনি ইংরাজ কবিতায় এই অতি-

আধুনিক যুগে তিনি অনাদৃত। যেখানে কাব্য বাঁধাবন্ধহীন এবং উৎকটরূপে অভিনব হওয়াই রীতি, যেখানে যাহা অপ্রত্যাশিত ও বিস্ময়কর তাহার আকস্মিক প্রবর্ত্তনের দ্বারা চমক লাগানোই প্রতিভার লক্ষণ বলিয়া প্রশংসিত, সেখানে হার্ডি যেন কোন পথভ্রান্ত পরদেশী—স্বজনবিহীন, অবজ্ঞাত, অথচ আপন সৌম্য, শান্ত শ্রীতে অম্লান।

যে যুগে তিনি উপন্যাসের পর উপন্যাস রচনা করিয়াছেন, সেই সময়ে তিনি গীতি-কবিতাও লিখিয়া গিয়াছেন, এবং



কবি টমাস হার্ডি

উপন্যাস রচনা বন্ধ হওয়ার পর বহু বৎসর ধরিয়া কবিতাই লিখিয়া চলিয়াছেন। মনে হয় তাঁহার যত কথা বলিবার ছিল উপন্যাসে তাহা সব বলা হয় নাই; তাঁহার বিশাল, গভীর, অসীম রহস্যময় অন্তঃপ্রকৃতি প্রকাশের অন্য উপায় চিরদিনই খুঁজিয়াছে, এবং যে ব্যাকুলতা, যে গূঢ় বেদনা উপন্যাসে অব্যক্ত বা অপরিস্ফুট ছিল তাহা রূপ লাভ করিয়াছে তাঁহার গীতি-কবিতায়। তাই হার্ডির পূর্ণরূপ শুধু তাঁহার উপন্যাসে মিলিবে না, সেগুলির সঙ্গে তাঁহার কবিতাও আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে। তাহা হইলেই তাঁহার সকল আশা ও আকাঙ্ক্ষা, অনুরাগ ও বিরাগ, তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস, তাঁহার নিত্য অনুভূত সুখ বেদনা, তাঁহার জীবনব্যাপী চিন্তা ও সাধনা আমরা উপলব্ধি করিতে পারিব; তাঁহার বিরাট চৈতন্যের সমগ্র মূর্ত্তি আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।

প্রথম প্রকাশ অনেক সময়েই কুণ্ঠিত, অস্বচ্ছ হয়। হার্ডির প্রথম যুগের অনেকগুলি কবিতা সম্বন্ধেও একথা খাটে। অনেক স্থলে শব্দযোজনা কর্কশ, ছন্দের গতি বড় আড়ষ্ট। মনে হয় কবি বাহিরের কয়েকটা ছাঁচ পাইয়াছেন তাহাতেই তাঁহার কল্পনাকে ঢালাই করিতে চাহিতেছেন। মনে হয় তাঁহার ধ্যানমূর্ত্তি কঠিন মর্ম্মরে বা প্রস্তরে তিনি ফুটাইতে শিখিয়াছেন, সুকুমার কথায়, ললিত ছন্দে নয়। তাই শব্দ ও ছন্দ লইয়া এত টানাহেঁচড়া, অন্তরের ব্যাকুলতা সত্ত্বেও প্রকাশ এত সঙ্কুচিত। তাছাড়া হার্ডির মধ্যে যে বৈজ্ঞানিকটা আছে এই কবিতাগুলিতে সময়ে অসময়ে সে দেখা দেয়। অনেক সময় মনে হয় হার্ডি যাহা দেখিয়াছেন বা অনুভব করিয়াছেন তাহা অতি ধৈর্য্যসহকারে মনের নোটবুকে টুকিয়া রাখিয়াছিলেন, পরে তাহারই প্রতিলিপি কবিতার অক্ষরে যথাযথভাবে আমাদের দিয়াছেন। কবি তাঁহার অভিজ্ঞতা ও পর্য্যবেক্ষণের ব্যক্তিস্বভাববর্জ্জিত বৈজ্ঞানিক ইতিবৃত্ত আমাদের সম্মুখে স্তূপাকার করিয়াছেন; কিন্তু সকল দেখা ও পাওয়া তাঁহার চেতনায় মিলিয়া মিশিয়া রূপান্তরিত হইয়া তাঁহার বেদনায় পাণ্ডুর, তাঁহার অনুরাগে রঞ্জিত হইয়া আমাদের মুগ্ধ বা বিচলিত করে না। তাছাড়া দেখি, যাহা সাধারণতঃ ঘটে না, যে সকল লোক সচরাচর দেখা যায় না, সেই সব লইয়া তিনি অনেক সময়ে ব্যস্ত; সেজন্যও এ সকল কবিতার আবেদন অনেকটা কমিয়া যায়। যাহা দৈবাৎ ঘটে, যে লোক স্রষ্টার অদ্ভুত খেয়াল বই কিছু নয়, তাহাদের কথায় আমাদের মন সাড়া দেয় না। হয়ত এ সকল কদাচ কখনও বিদ্যুৎ ঝলকের মত জীবনের একটা অজ্ঞাত দিক আলোকিত করিয়া দেয়, কিন্তু যে সব সহজ অনুভূতি ও সাধারণ অভিজ্ঞতা সকল আর্টের ভিত্তি, ও যাহার উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই শ্রেষ্ঠ

শ্রীসোমনাথ মৈত্র

সাহিত্যের সার্ব্বজনীনতা, তাহার সহিত যাহা শুধু অদ্ভুত বা অসম্ভব তাহার কোন যোগ নাই। সেইজন্য কাব্যের অমরলোকে ও সকল জিনিষ কখনও স্থান পায় না।

হার্ডির মধ্যে এই বৈজ্ঞানিক দিকটা খুবই বড়। তিনি ক্রমাগত সমস্ত জগৎ-ব্যাপারকে বুঝিতে চাহিয়াছেন তাঁহার প্রখর বুদ্ধিশক্তি দিয়া। সকল প্রকার সংস্কার ও বিশ্বাস হইতে মনকে নির্ম্মুক্ত করিয়া তিনি জাগতিক সকল বস্তুর মধ্যে, মানব ইতিহাসের মধ্যে, সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে মনকে প্রসারিত করিয়া সত্যের অন্বেষণ করিয়াছেন, সমস্ত বিশ্ব-ব্যাপারের একটা সুস্পষ্ট অর্থ খুঁজিয়াছেন। কিন্তু তিনি চিত্তের সহজ বোধশক্তিকে বাদ দিয়া শুধু বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া অহর্নিশি "কেন? কেন?" বলিতে বলিতে যেখানে আসিয়া পৌঁছিলেন সেখানে সমগ্র বিশ্বকে তিনি এক অন্ধ, অচেতন, প্রচণ্ড শক্তি দ্বারা চালিত দেখিলেন। মানুষকে তিনি "Time's Laughing Stock" হিসাবে জানিলেন, তাহার জীবনে লক্ষ্য করিলেন একটা প্রকাণ্ড "Irony", একটা "Satire of Circumstance."

Has some vast Imbecility,
Mighty to build and blend,
But impotent to tend,
Framed us in jest, and left us now
to hazardry?
Or come we of an Automaton
Unconscious of our pains?

কিন্তু তিনি এইখানেই থামিয়া যান নাই। হার্ডি কোনো দিন কোথাও থামেন নাই, তিনি চিরদিনই জিজ্ঞাসু। বিশ্বের যত মূক বেদনা তিনি অনুভব করিয়াছেন, চারিদিকে দেখিয়াছেন মানবের বিরামহীন সংগ্রাম ও পরাজয়; যেখানে যত অন্যায়, যত ব্যর্থতা, যত নবীন জীবনের অকাল অবসান, যত রঙীন আশার সমাধি, সব যেন তাঁহাকে শেলের মত বিঁধিয়াছে। ব্যথিত, সন্দেহাকুল চিত্তে তিনি অন্ধকারে কেবল পথ খুঁজিয়াছেন; এত বিফলতা, এত বেদনার একটা কারণ বুঝিতে চাহিয়াছেন। প্রথমে, নিরাশার গভীর অতলে তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল বিশ্ব-ব্যাপার বুঝি এক অনিষ্টের, এক প্রকাণ্ড অশুভের উন্মত্ত-লীলা। এ সন্দেহ হইতে যখন তিনি উদ্ধার পাইলেন তখন ভাবিলেন জগতে ভালও নাই মন্দও নাই, আছে শুধু অন্ধ শক্তি—the Incognizant—যার গতি আছে, লক্ষ্য নাই।

Like a knitter drowsed,
Whose fingers play in skilled
unmindfulness,
The will has woven with an absent heed
Since life first was, and ever will so weave.

এ অবস্থাও তাঁহার কাটিয়া গেল; তিনি আশার ক্ষীণ আলোক-রশ্মি দেখিতে পাইলেন। তিনি উপলব্ধি করিলেন বিশ্বশক্তি চেতনার দিকে চলিতেছে, এবং পূর্ণ চৈতন্য লাভের সহিত, হয় পুঞ্জীভূত ভুল ভ্রান্তি, রোগদুঃখ সহ সারা জগতকে তাহা এক প্রলয়-বহ্নিতে ভস্ম করিয়া দিবে, নয় তাহার কল্যাণপ্রেরণায় ধীরে ধীরে যত ভুল তাহা সারা হইবে, যত অশুভ যত অন্যায় একে একে দূর হইয়া যাইবে। এই ভাবটি একটি সুন্দর কবিতায় প্রকাশ হইয়াছে। বিশ্ব-শক্তি এখানে তাঁর কাছে মাতৃরূপিনী :—

When wilt thou wake, O Mother,
wake and see—
As one who, held in trance,
has laboured long
By vaccant rote and prepossession strong—
The coils that thou hast wrought
unwittingly;
Wherein have place, unrealised by thee,
Fair growth, foul cankers, right
enmeshed with wrong,
Strange orchestras of victim-shriek
and song,
And curious blends of ache and ecstasy?
Should that day come, and show
thy opened eyes
All that Life's palpitating tissues feel,
How wilt thou bear thyself in thy surprise?

Wilt thou destroy, in one wild
shock of shame,
Thy whole high heaving firmamental
frame,
Or patiently adjust, amend, and heal ?

এখন বুঝা যাইবে হার্ডির কবিতার পাঠক সংখ্যা কেন কম। লঘু চিত্ত, সুখাবেষী কাব্যবিলাসীর নিকট তাঁহার জীবনধর্ম্ম অতি কঠোর ঠেকে। তাঁহার বহু কবিতায় বিষাদের যে একটী ম্লান ছায়া পড়িয়াছে তাহা হইতে অনেকেই তাঁহাকে ঘোরতর দুঃখবাদী বলিয়া স্থির করেন। নিশ্চিন্ত, সুতরাং দ্বিধাহীন ঈশ্বরবাদী তাঁহার জিজ্ঞাসাকে নাস্তিকতার লক্ষণ ভাবিয়া তাহা হইতে সরিয়া গিয়া নিজের শ্রেষ্ঠত্বে অধিরূঢ় হইয়া থাকেন। কিন্তু ইঁহারা সকলেই হার্ডির প্রতি অবিচার করেন। তাঁহার অসাধারণ তীক্ষ্ণ অনুভূতির মূল্য ইঁহারা বুঝেন না; সকল মানবের প্রতি, শুধু মানব কেন, যাহা কিছু সৃষ্ট সকলের প্রতি তাঁহার অসীম ভালবাসা ও করুণার কথা ইঁহারা ভুলিয়া যান। ইঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে চরাচর বিশ্বের প্রতি প্রগাঢ় প্রীতিই তাঁহাকে সকল ব্যথার সমব্যথী করিয়াছে; এবং সেইজন্যই তিনি ভাবনা-হীন অনুভব-হীন অন্ধ বিশ্বাসের নিশ্চিন্ত আরাম পরিহার করিয়া সংশয়-কাতর চিত্তে সৃষ্টির অন্তরালে কল্যাণ অভিপ্রায়ের সন্ধানে ফিরিয়াছেন। সকল সংশয় জয় করিয়া তিনি অবশেষে সত্যের অখণ্ড আনন্দরূপ দেখিতে পাইয়াছেন বলিলে ভুল বলা হয়, কিন্তু তাঁহার অকপট, জিজ্ঞাসাকে সস্তা pessimism বা নাস্তিক্যের প্রমাণ বলা চলে না। আর একজন অধুনা-অবজ্ঞাত ইংরাজ কবির ভাষায় তাঁহার সম্বন্ধে বলিতে পারা যায়:

He fought his doubts and gather'd strength,
He would not make his judgment blind,
He faced the spectres of the mind
And laid them ; thus he came at length
To find a stronger faith his own.

এবং বিরাট চিত্তের সহিত মানবচিত্তের ঘাত-প্রতিঘাত তিনি অনুভব করিয়াছেন ও পৃথিবীব্যাপী বিরোধ ও দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়া যাহারা তাঁহাকে বিশ্বাসহীন, ধর্ম্ম-হীন বলিয়া অভিহিত করেন, উত্তরে তাঁহাদের বলা চলে:

There lives more faith in honest doubt
Believe me, than in half the creeds.

কেননা, "আমরা বাইরের শাস্ত্র থেকে' যে ধর্ম্ম পাই সে কখনই আমার ধর্ম্ম হয়ে ওঠে না। তার সঙ্গে কেবলমাত্র একটা অভ্যাসের যোগ জন্মে। ধর্ম্মকে নিজের মধ্যে উদ্ভূত করে তোলাই মানুষের চিরজীবনের সাধনা। চরম বেদনায় তাকে জন্মদান করতে হয়, নাড়ির শোণিত দিয়ে তাকে প্রাণদান করতে চাই, তারপর জীবনে সুখ পাই আর না পাই চরিতার্থ হয়ে মরতে পারি।" (রবীন্দ্রনাথ)

এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল হার্ডিকে পূর্ণভাবে বুঝিতে হইলে তাহার প্রয়োজন আছে; কিন্তু কোনো বিশেষ জীবনধর্ম্ম বা ধর্ম্মতত্ত্বই তাঁহার সবখানি, ইহা মনে করা অপেক্ষা ভুল আর কিছু হইতে পারে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি হার্ডি জীবন সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন বলিয়া কোনোদিন ঘোষণা করেন নাই। তাঁহার সুদীর্ঘ জীবন ধরিয়া তিনি চিরদিন চলিয়াছেন, কোথাও ক্লান্ত দেহে অবসন্ন মনে বসিয়া পড়েন নাই। "The Dynasts" প্রকাশের পর তিনি যে সকল 'লিরিক' লিখিয়াছেন তাহাতে সে চিন্তাভার আর নাই, তাহার প্রথম কবিতার সে নির্লিপ্ত নৈর্ব্যক্তিকতাও অন্তর্হিত। জীবনের ছোটখাটো সুখ দুঃখ, হাসি অশ্রু তাঁহার মানসপটে কত বিচিত্র রং ধরিতেছে। কবিতাগুলির সুর একান্ত মধুর হইয়া আসিয়াছে যেন যাহা কিছু আছে সকলের প্রতি কবির চিত্ত অপরিসীম করুণায় আর্দ্র। বস্তুতঃ তাঁহার সাতাত্তর বৎসরে প্রকাশিত "Moments of Vision" শীর্ষক কবিতা সংগ্রহটীতে এই অতি বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার মনের অসাধারণ সরসতা দেখিয়া বিস্ময়বিমুগ্ধ হইতে হয়। বারান্তরে তাঁহার এই সরসতা, ও সৌন্দর্য্যের তীক্ষ্ণ বোধের কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল। আজ তাঁহার এই সর্ব্বশেষ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্য গ্রন্থ হইতে মাত্র একটী কবিতা উদ্ধৃত করিয়া নিবৃত্ত হইব। তাহা হইতেই বুঝা যাইবে জগতের বজ্র কোলাহল, দ্বন্দ্ব বিরোধের ভার তাঁহার চিত্তে কত লঘু হইয়া আসিয়াছে, এখন আর

তিনি শুধু তত্ত্বান্বেষী বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক নহেন, তিনি রসপিপাসু, সৌন্দর্য্যমুগ্ধ নিতান্তই সহজ মানুষ :—

Sweet cyder is a great thing,
A great thing to me,
Spinning down to Weymouth town
By Ridgway thirstily,
And maid and mistress summoning
Who tend the hostelry :
O Cyder is a great thing,
A great thing to me !

The dance it is a great thing,
A great thing to me,
With candles lit and partners fit
For night-long revelry ;
And going home when day-dawning
Peeps pale upon the lea :
O dancing is a great thing,
A great thing to me !

Love is, yea, a great thing,
A great thing to me,
When, having drawn across the lawn
In darkness silently,
A figure flits like one a-wing
Out from the nearest tree :
O love is, yes, a great thing,
A great thing to me !
Will these be always great things,
Great things to me ?

Let it befall that One will call,
"Soul, I have need of thee" :
What then ? Joy-jaunts, impassioned flings,
Love, and its ecstasy,
Will always have been great things,
Great things to me.

জীবন

শ্রীসারস্বত শর্ম্মা

কোন্ বনে কোন্ শমী-সমিধের গূঢ় মর্ম্মতলে
প্রসুপ্ত ছিলাম আমি কতযুগ, সহসা সবলে
আমারে মথিলে তুমি, অগ্নি-মন্থ-মন্ত্র-উচ্চারণে
টানিয়া আনিলে বিশ্বে অগ্নিহোত্রি ! অরণি-ঘর্ষণে।
তারপর হতে লক্ষ জীবদেহ-যজ্ঞ বেদিকায়
জ্বলিতেছি লেলিহান্ জিহ্বা মেলি আহুতি-তৃষায়—
অনন্ত অতৃপ্তি মাঝে নিত্য নব হবির্বলিদানে
সাধিবারে কোন্ ইষ্ট চাহ তুমি, তৃপ্তির সন্ধানে ?
সন্ধ্যা-হোম করি শেষ ভৃঙ্গারের শান্তিজল সেঁচে
ভস্মগুপ্ত করে রাখ, মৃত্যুতলে রই তবু বেঁচে
স্ফুলিঙ্গের রূপে, প্রাতে পুনর্ব্বার সমন্ত্র ফুৎকারে
জাগাও কুণ্ডের গর্ভে, জ্বলি শুষ্ক রসনা বিস্তারে।
দিনে দিনে, বর্ষে বর্ষে, যুগে যুগে একই অনুষ্ঠান,—
ঊর্দ্ধার্চ্চি পিঙ্গল নীল অরুণের কভু দ্যুতিমান্
হিরণ্নেত্রে হের হোতা—এ কি তব অনিদান লীলা !
নির্ব্বাপিত কর মোরে বক্ষে চাপি নির্ব্বাণের শিলা।

কৈফিয়ৎ

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

আশ্বিনের "বিচিত্রা"য় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী মহাশয় আমার প্রবন্ধের "উতোর" দিয়াছেন। দেখিয়া দুঃখিত হইলাম যে লেখক মহাশয় তাঁর বয়সের উপযুক্ত ধৈর্য্য কিম্বা ধীর বিচার-শক্তির পরিচয় দিতে পারেন নাই। নব্য ন্যায়ে লেখক মহাশয়ের কি প্রকার অধিকার আছে জানি না, কিন্তু তাঁর আলোচনা দেখিয়া মনে হয় তিনি নব্য ন্যায়ের চর্চ্চায় কৃতিত্ব অর্জ্জন করিতে পারিবেন।

দ্বিজেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধের উত্তরে আমার কিছুই বলিবার নাই। কেন না, তিনি আমার কোনও কথাই খণ্ডন করেন নাই; আমার যুক্তি বা প্রতিপাদ্যের সমগ্র ধারা অনুসরণ করিবার কোনও চেষ্টা না করিয়া তিনি কেবলমাত্র প্রবন্ধ হইতে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন কথা ধরিয়া তার উপর সূক্ষ্ম কারওয়াই করিয়াছেন, এবং সেই প্রক্রিয়ায় প্রচুর পরিমাণে পরমত-অসহিষ্ণুতা ও অধীরতার পরিচয় দিয়াছেন। অপর পক্ষকে গালি দিলে, তাহাতে নিজের মত প্রতিষ্ঠা বা অপর পক্ষের যুক্তির নিরসনের কিছুই হয় না—এই সাদা কথাটা তাঁকে যদি এ বয়সে শিখাইতে হয় তবে বড়ই পরিতাপের কথা।

তিনি আমাকে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ অষ্টোত্তর শত বার পাঠ করিতে বলিয়াছেন। আমি তাঁহাকে আমার প্রবন্ধটি কেবলমাত্র আটবার পাঠ করিতে বলি, কিন্তু দয়া করিয়া তিনি যেন নামতা পাঠের মত কেবলমাত্র পড়িয়াই না যান—যেন সঙ্গে সঙ্গে অর্থ পরিগ্রহের কিঞ্চিৎ চেষ্টা করেন। তাহা হইলে তিনি দেখিতে পাইবেন যে তাঁর দীর্ঘ প্রবন্ধ একেবারে বাজে কাগজ ছাড়া আর কিছুই হয় নাই। তিনি পড়ুন বা না পড়ুন, তাঁর প্রবন্ধের উত্তরে আমি পাঠকবর্গকে কেবলমাত্র আমার প্রবন্ধটিই ফিরিয়া পড়িতে বলিব। তাহাতেই দ্বিজেন বাবুর সব কথার উত্তর আছে, তার পুনরাবৃত্তি বা ব্যাখ্যা করিয়া আমি পাঠকের ধীশক্তির অপমান করিব না।

দ্বিজেন বাবুর একটা কথার সম্বন্ধে একটু বলা আবশ্যক কেন না সে কথা অন্যেও বলিয়াছেন। তিনি এবং অপর কেহ কেহ বুঝিয়াছেন যে আমার মতে শারীর বৃত্তি কতটা আর্টের বস্তু আর কতটা তাহা নয়, তাহা একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা-রেখা দিয়া নির্দ্ধারণ করা যায়, এবং আমি কবিকে তাঁর প্রবন্ধের উত্তরে সেই সীমারেখাটা নির্দ্ধারণ করিতে আহ্বান করিয়াছি। এমন একটা ভ্রান্ত ধারণা কেন যে ইঁহাদের হইল বুঝিতে পারি না। কারণ আমার প্রবন্ধে স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছি যে আর্টের পক্ষে বস্তু অবস্তুর ভেদ নাই—সকল বিষয় লইয়াই রস রচনা হইতে পারে এবং শারীর ব্যাপার লইয়াও রসোদ্বোধন হইতে পারে যদি রচয়িতার কৃতিত্ব থাকে। যাহা আর্ট বা যাহা আর্ট নয় তার মধ্যে একমাত্র প্রভেদ এই যে একের ভিতর রসবস্তু আছে, অপরের ভিতর তাহা নাই; একটা আমাদের অন্তর্নিহিত রস ও রূপ-বোধে সাড়া দেয়, আর একটা রস-বোধ বা রূপবোধে কোনও সাড়া দেয় না। যৌন সম্পর্কের শারীর ব্যাপার লইয়া যদি কবি এমন ভাবে আলোচনা করেন যাতে আমাদের রূপবোধে সাড়া জাগায় তবে তাহা আর্ট, আর যদি তাহা না করিয়া কেবলমাত্র আমাদের নিকৃষ্ট শারীর বৃত্তি উত্তেজিত করিয়া তৃপ্ত করে, তবে তাহা আর্ট নয়। যৌন সম্পর্কের কতকটা আর্টের বিষয় আর তার বাহিরে যাহা তাহা আর্টের বিষয় হইতে পারে না কবির প্রবন্ধে এই যে উক্তি আছে তাহা আমি অস্বীকার করিয়াছি। এবং আমার সেই আপত্তি একটি প্রশ্নের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছি। শারীর ব্যাপার মাত্র যখন আর্টের বহির্ভূত নয়, তখন জিজ্ঞাসা করিয়াছি শারীর ব্যাপারের কোন্ স্থানে কবি আর্টের সীমানা নির্দ্দেশ

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

করিতে চান? এ প্রশ্নের তাৎপর্য্য ইহা নয় যে সত্য সত্য এমন একটা লাইন টানা সম্ভব—তাহা যে সম্ভব নয় সে কথা আমি পরে প্রকাশ করিয়াছি। সমগ্র প্রবন্ধ এক সঙ্গে পড়িলে এ সম্বন্ধে কোনও ভুল হইতে পারে বলিয়া আমার মনে হয় না।

শুধু এই কথাটুকু বলিবার জন্য আমার এ প্রবন্ধের অবতারণা করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আমার প্রবন্ধের পর চারিদিকে যে সব আলোচনা হইয়াছে ও যে সব নূতন তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে অনেকের মনে দুই একটা ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়াছে, সেগুলি দূর করিবার জন্য দুই একটা কথা বলিবার অনুমতি ভিক্ষা করি।

প্রথম কথা এই যে অনেকেরই বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ আমার লেখা লক্ষ্য করিয়া তাঁর "সাহিত্য ধর্ম্ম" প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং আমার গায়ে লাগিয়াছে বলিয়াই আমি তাঁর প্রতিবাদ করিয়াছি। কোনও এক কাগজে কোনও ব্যক্তি তাঁর একখানা পত্র ও কবির উত্তর প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে এ অনুমান অসঙ্গত মনে হয় না যে রবীন্দ্রনাথ যাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন, আমি তার মধ্যে একজন। তবে একথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে আমি যখন "সাহিত্য ধর্ম্মের সীমানা" লিখিয়াছিলাম তখন পর্য্যন্ত আমার মনে এ ধারণা মোটেই ছিল না যে তাঁর প্রবন্ধের লক্ষ্যের কোনও খানে আমি নিজে আছি। যদি তাহা ভাবিতাম তবে হয় তো আমি ও প্রবন্ধ লিখিতাম না। পক্ষান্তরে আমি যে লক্ষ্য নই একথা ভাবিবার আমার যথেষ্ট হেতু ছিল। কেন না, আমার যে বইখানা লইয়া স্বাস্থ্যরক্ষার দলে খুব বেশী হৈ চৈ হইয়াছে সেখানা—"শান্তি"। "শান্তি" বই খানা প্রকাশিত হইবার পরই আমি রবীন্দ্রনাথকে উপহার দিয়াছিলাম, এবং পরে, আলিপুরে শ্রীযুক্ত প্রশান্ত মহলানবিশ মহাশয়ের বাড়ীতে একদিন কবির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁর সঙ্গে "শান্তি" সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তিনি যে ভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন তাহাতে বুঝিয়াছিলাম যে তিনি বই খানা ভাল করিয়াই পড়িয়াছেন। সে আলোচনায় তিনি "শান্তি"র প্রশংসা করিয়াছিলেন, দুই একটা ত্রুটি দেখাইয়াছিলেন, স্থল বিশেষে আর একটু বিশদ আলোচনার উপদেশ দিয়াছিলেন—কিন্তু তাহার রুচি বা নীতির কিম্বা সাহিত্য-ধর্ম্মের পরিপন্থিতা সম্বন্ধে কোনও কথাই বলেন নাই। সুতরাং "সাহিত্য-ধর্ম্ম" প্রবন্ধ পড়িয়া আমার একথা মনেই আসে নাই যে আমার লেখা সম্বন্ধে ইহাতে তিনি কোনও বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়াছেন; এবং আমার এখনও বিশ্বাস যে তিনি আমাকে লক্ষ্য করিয়া কিছু লেখেন নাই।

সুতরাং আমি আত্মরক্ষার জন্য লিখিয়াছি এই রকম যে একটা ধারণা চারি দিকে প্রকাশিত হইতেছে—"বঙ্গবাণীতে" শরৎ বাবুও সে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন,—সে ধারণার কোনও ভিত্তি নাই।

আমার দ্বিতীয় কথা—রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার ঠিক সম্পর্ক সম্বন্ধে। দ্বিজেন্দ্র বাবু ইঙ্গিত করিয়াছেন এবং অপর অনেকে বলিয়াছেন যে রবীন্দ্রনাথের প্রকাশিত কোনও রচনার সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করিয়া তাঁকেই আমার বক্তব্য জানাইয়া সন্তুষ্ট না থাকিয়া প্রকাশ্য প্রতিবাদ করা আমার পক্ষে গুরুতর অপরাধ হইয়াছে, কেননা, তিনি গুরু এবং আমি তাঁর শিষ্য। রবীন্দ্রনাথের রচনা হইতে আমি যে প্রেরণা পাইয়াছি তার ঋণ আমার শোধ হইবার নয়। কিন্তু যাঁরা আমাকে ওই খোঁটা দেন, তাঁদের আমার সহিত কবির সম্পর্ক সম্বন্ধে বোধহয় কিছু ভ্রান্ত ধারণা আছে। কবির সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় আমার যৎসামান্য। মাত্র তিন দিন তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে এবং একদিন মাত্র আমার সঙ্গে বিশেষ আলাপ হইয়াছে। তা ছাড়া তাঁর প্রকাশিত রচনার দ্বারা তাঁর সঙ্গে সমস্ত জগতের যে পরিচয়, আমার পরিচয় তার চেয়ে বেশী নয়। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আলাপ করিবার সৌভাগ্য বা সুযোগ আমার ঘটিয়াই উঠে না। তিন বৎসরের মধ্যে বহু চেষ্টায় একদিন সুযোগ পাইয়া তাঁর দর্শন লাভের আকাঙ্ক্ষায় গিয়া দেখিতে পাইলাম যে আমার

সুযোগের সঙ্গে তাঁর সুযোগের সংযোগ হয় নাই। দর্শন পাইয়াছিলাম, কিন্তু আলাপ হয় নাই। সুতরাং যাঁরা আমাকে রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ শিষ্য মনে করিয়া আমাকে তিরস্কার করিয়াছেন তাঁরা ভ্রান্ত।

আমার এ কথা বলিবার তাৎপর্য্য ইহা নহে যে কবির সহিত আমার নিবিড়তর পরিচয় থাকিলেও আমার সমালোচকের অনুযোগ সার্থক হইত। গুরু যদি প্রকাশ্যে কোনও মত প্রকাশ করেন, তবে শিষ্য যে উপযুক্ত শ্রদ্ধার সহিত প্রকাশ্যে সে মতের আলোচনা বা প্রতিবাদ করিতে পারিবে না, এ কথা আমি স্বীকার করি না।

আমার তৃতীয় কথা—আমার প্রবন্ধে আমি বলিয়াছিলাম যে আমার বই Criminology-র ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এ কথা সত্য নহে। কথাটা আমি কেবল দৃষ্টান্ত স্বরূপে উত্থাপন করিয়াছিলাম। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে আধুনিক কথাসাহিত্য বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত লইয়া কথা রচনা করিয়াছে, এবং সেই হেতুমূলে তিনি আধুনিক লেখকদিগকে তিরস্কার করিয়াছেন। আমি বলিয়াছিলাম যে, কথাটা সত্য নয়। এ রকম কথা অনেকের মুখে শোনা যায় কিন্তু কোনও একটা দৃষ্টান্ত দিয়া পরীক্ষা করিলেই দেখা যায় যে ইহা সত্য নয়—দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমার নিজের কথা বলিয়াছিলাম। ইহা হইতে কোনও তরুণ সমালোচক সাব্যস্ত করিয়াছেন যে আমার মতে বিজ্ঞানের ভিত্তি আশ্রয় করিয়া কথা রচনা দোষের। বুদ্ধিমান পাঠককে বলা বাহুল্য যে এ কথা আমি বলি নাই। —আমি শুধু বলিয়াছি যে অভিযোগটার মূলে সত্য নাই, সত্য থাকিলে তাহা যুক্তিসঙ্গত হইত কি না তাহা বলি নাই। বিজ্ঞানের প্রতিপাদ্য সত্য। জীবনের গতি ও পরিণতি সম্বন্ধে আমরা বিজ্ঞান আলোচনা করিয়া যদি কোনও সত্য পাই, তবে সে সত্য কথ-সাহিত্যে ব্যবহার করিলে যে কোনও দোষ হইতে পারে ইহা আমি কল্পনা করি না। তবে যদি কেহ কেবল বিজ্ঞানের দৃষ্ট সত্য আশ্রয় করিয়া মানব জীবনের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা ও রস-সৃষ্টির কল্পনার সাহায্য ছাড়া কথা রচনা করিতে যান, তবে তাহা সুন্দর ও সার্থক হইবে না সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আমার চতুর্থ কথা এই যে আমার রচনা রবীন্দ্রনাথের প্রতি ব্যক্তিগত বিদ্বেষ-প্রসূত বলিয়া কোনও কোনও লোকে ইঙ্গিত করিয়াছেন। যাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কোনও সাক্ষাৎ সম্পর্কই নাই তাঁর প্রতি ব্যক্তিগত বিদ্বেষ লোকে কি প্রকারে কল্পনা করে তাহা ভাবিয়া অবাক্ হই। "সাহিত্য-ধর্ম্ম" প্রবন্ধের লক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে আমি একজন এ কথা যদি আমি ভাবিতাম তবে হয় তো বা এ কল্পনার একটা ভিত্তি থাকিতেও পারিত। কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমার এ ধারণা হইবার কোনও হেতু ছিল না। তা' ছাড়া, ভরসা করি নিরপেক্ষ পাঠক আমার লেখার ভিতর কবির প্রতি কোনও রূপ বিদ্বেষ বা বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধার অভাব লক্ষ্য করিতে পারিবেন না। ইদানীং বা কোনও কালে রবীন্দ্রনাথের প্রতি আমার ক্ষুব্ধ হইবার কোনও হেতুর কথা অন্ততঃ আমি জানি না। ইতিপূর্ব্বে আমি বহু স্থানে কবির প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছি—আমার প্রকাশিত রচনা-সংগ্রহ "আহুতি"তে ও "আনন্দ মন্দিরের" উৎসর্গ-পত্রে কৌতূহলী পাঠক তার পরিচয় পাইবেন। তা' ছাড়া বিনা পরিচয়ে অযাচিত ভাবে আমি কবির নিকট, যে সমাদর ও প্রশংসা লাভ করিয়াছিলাম, তাহা আমার জীবনের একটা শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়া আমি মনে করি। সুতরাং আমার সম্বন্ধে কবির প্রতি ব্যক্তিগত বিদ্বেষ-কল্পনা যে কেমন করিয়া লোকে করিতে পারে তাহা আমি ভাবিয়া পাই না।

এ কথা লইয়া ঘাঁটান আমি আবশ্যকই মনে করিতাম না, কিন্তু কবির কয়েকটি অন্তরঙ্গ ভক্ত প্রসঙ্গান্তরে আমার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে এ অভিযোগ করিয়াছেন এবং তার মধ্যে একজন দুইটি বিশিষ্ট হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং এ বিষয়ে লোকের ভ্রান্ত ধারণা হইতে পারে, তাই কথাটা তুলিলাম। পূর্ব্বোক্ত ভক্ত যে দুইটি বিশিষ্ট হেতুর উল্লেখ করিয়াছেন তার মধ্যে একটি কবির প্রবন্ধ "সাহিত্য-ধর্ম্ম"। তাহাতে আমার ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর উপর আক্রোশ হইবার কোনও হেতুই আমি খুঁজিয়া পাই নাই। তাঁর উল্লিখিত দ্বিতীয় ঘটনা এই যে আলবার্ট হলে আন্তর্জাতিক

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

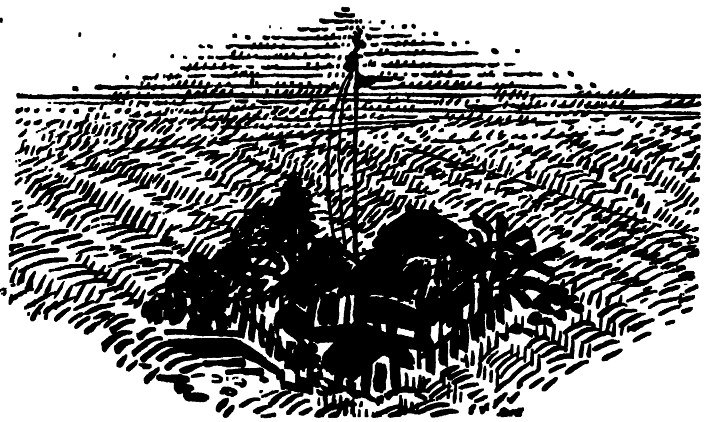
সমবায় দিবসে কবি আমাকে প্রকাশ্য সভায় তিরস্কার করিয়াছিলেন। এ ঘটনায় ভিতরও আমি বিদ্বেষের কোনও হেতু খুঁজিয়া পাইলাম না। কারণ, উক্ত সভায় কবি আমাকে বা কাহাকেও কোনও রকম তিরস্কারই করেন নাই। অতএব তিনি আমার বিরুদ্ধে তাঁর এই স্বতন্ত্র মত প্রকাশেই আমি তাঁর উপর ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি এ কথা নিতান্ত হাস্যাস্পদ। এ অনুযোগ আমি পূর্ব্বে অনেক শুনিয়াছি—শুনিয়া অভ্যস্ত হইয়াছি।

তা' ছাড়া আমার বক্তৃতা ও কবির বক্তৃতা দুইটি আদ্যোপান্ত "ভাণ্ডার" পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। কৌতূহলী পাঠক যদি সে দুটি পড়েন তবে দেখিতে পাইবেন যে রবীন্দ্রনাথ উপোদঘাতে উত্তেজনা সৃষ্টি বিষয়ে যে আপত্তিই করুন, মূল কথাটার বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমার এক ফোঁটা মতভেদ নাই; কেন না, ধনিক ও শ্রমিকের বিরোধ লইয়া তিনি তাঁর অতুলনীয় ভাষায় যে চিত্র আঁকিয়াছিলেন, আমার চিত্র তার চেয়ে বেশী তীব্র বা বেশী উত্তেজনার হেতু হয় নাই।

সুতরাং বলা বাহুল্য আমার কবির প্রতি ব্যক্তিগত বিদ্বেষের কোনও হেতুই নাই। মত ভেদ যে বিদ্বেষ বা বিরোধ ছাড়া হইতে পারে না এ বিষয়ে আমাদের দেশে অনেকের দৃঢ় বিশ্বাস কথায় ও কার্য্যে প্রকাশ হয় সত্য কিন্তু এ কথা আমি কোনও দিন ভাবি নাই, জীবনেও কোনও দিন সে মূলসূত্র লইয়া কাজ করি নাই। যাহার স্বাধীন চিন্তা শক্তি আছে তার কোন বিশিষ্ট লোকের সঙ্গেই সর্ব্বদা সব বিষয়ে মতের সম্পূর্ণ ঐক্য থাকিতে পারে না সে লোক যত বড় লোকই হউন। লোকোত্তরশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তির আশে পাশে এমন অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায় যারা কোনও দিন মতের পার্থক্য প্রকাশ করে না। তারা হয় ব্যক্তিত্ব-বিহীন অন্ধ স্তাবক, না হয় কপট চাটুকার। তারা যে মতভেদ অনুভব করে না বা অনুভব করিলে প্রকাশ করে না, তাহাতে ইহা প্রমাণ হয় না যে সেই মহামানবের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি, কি গভীরতায় কি মর্য্যাদায় তাদের ভক্তি শ্রদ্ধাকে অতিক্রম করে যারা অন্তরের ভিতর তাঁর মহত্ব পরিপূর্ণরূপে অনুভব করে কিন্তু মতভেদ প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

রবীন্দ্রনাথকে আমি যত বড় করিয়া দেখি তার চেয়ে কেহ সত্যমর্য্যাদায় তাঁকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানে কি না আমি জানি না। রবীন্দ্রনাথের প্রতি বাঙ্গলা সাহিত্যের, সাহিত্যিকের এবং ব্যক্তিগত ভাবে আমার ঋণ যে কত গভীর তাহা আমি যত বুঝি তার চেয়ে বেশী কেহ বুঝিতে পারে বলিয়া জানি না। তাঁর সহিত মতপার্থক্য আজ আমার নূতন নয়। যখন সাহিত্যে আমি কোনও প্রতিষ্ঠা লাভ করি নাই, তখন তাঁর প্রতি আমার ভক্তি এখনকার মতই প্রগাঢ় ছিল, এবং মতভেদও আজকার চেয়ে কম ছিল না। কিন্তু তখনও কোনও দিন স্বীকার করি নাই, আজও স্বীকার করিতে প্রস্তুত নই যে আমার চেয়ে তাঁর বড় ভক্ত কেহ আছে।





স্বরলিপি

"নটরাজ"

দীপালি

হিমের রাতে ঐ গগনের
দীপগুলিরে
হেমন্তিকা করল গোপন
আঁচল ঘিরে।

ঘরে ঘরে ডাক পাঠালো—
"দীপালিকায় জ্বালাও আলো,
জ্বালাও আলো, আপন আলো,
সাজাও আলোয় ধরিত্রীরে" ॥

শূন্য এখন ফুলের বাগান,
দোয়েল কোকিল গাহে না গান,
কাশ ঝ'রে যায় নদীর তীরে।

যাক্ অবসাদ বিষাদ কালো,
দীপালিকায় জ্বালাও আলো,
জ্বালাও আলো, আপন আলো,
শুনাও আলোর জয়-বাণীরে ॥

দেব্‌তারা আজ আছে চেয়ে
জাগো ধরার ছেলে মেয়ে,
আলোয় জাগাও যামিনীরে।

এলো আঁধার, দিন ফুরালো,
দীপালিকায় জ্বালাও আলো,
জ্বালাও আলো, আপন আলো,
জয় করো এই তামসীরে ॥

কথা ও সুর—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

II সা রা গা । গা গা -া I গা -া গা । গা গা -মা I
হি মে র রা তে · ঐ · গ গ নে র্

I রগা -রা গা । গা গা -পা I পগা পমা -া । গা রসা -না I
দী প গু লি রে · হে ম ন্ তি কা ·

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

I সা -া গা । মা পা -া I সা সগা -া । মা পা -া I
ক র্ ল গো প ন্ আঁ চ ল্ ঘি রে •

I গগা পমা -া । গা রসা -ন্া I সা রা গা । গা গা -া I
ঘি রে • ঘি রে • হি মে র রা তে •

I গা -া গা । গা গা -মা I রগা -রা গা । গা গা -পা I
ঐ • গ গ নে র্ দী প্ গু লি রে •

I র্সা র্সা -র্গা । র্গর্রা র্রা -া I র্সা -া র্সা । র্সা র্সা -া I
ঘ রে • ঘ রে • ডা ক্ পা ঠা লো •

I র্সনা না -র্রা । র্সা র্সা -া I র্সনা ধা -র্সা । না ধপা -া I
দী পা • লি কা য়্ আ লা ও আ লো •

I পর্সা র্সা -া । র্সনা ধপা -া I পর্সা র্সা -া । র্সনা ধপা -া I
আ লা ও আ লো • আ প ন্ আ লো •

I পর্সা র্সণা -া । ধা পা -ধপা I গগা পমা -া । মগা রসা -ন্া I
সা জা ও আ লো য়্ ধ রি • ত্রী রে •

I সা রা গা । গা গা -া I গা -া গা । গা গা -মা I
হি মে র রা তে • ঐ • গ গ নে র্

I রগা -রা গা । গা গা -পা I গগা পমা -া । গা রসা -ন্া I
দী প্ গু লি রে • হে ম ন্ তি

I গপা পমা -গা । গরা -াঃ -পমঃ I মগা -া -া । -া -া -া I
আ লো য়্ আ • •• গা • • • • ও

I র্সা র্সা -র্গা । র্গরা র্রা -া I র্সা -া র্সা । র্সা র্সা -া I
এ লো • আঁ ধা র্ দি ন্ দু রা লো •

I র্সনা না -রা । র্গর্সা র্সা -া I র্সনা ধা -র্সা । না ধপা -া I
দী পা • লি কা য়্ আ লা ও আ লো •

I পর্সা র্সা -া । র্সনা ধপা -া I পসা র্সা -া । না ধপা -া I
আ লা ও আ লো • আ প ন্ আ লো •

I পা -র্সা র্সণা । ধা ধপা -ধপা I পগা পমা -া । গা রসা -ন্া I
জ য়্ ক র এ •ই তা ম • সী রে •

I সা রা গা । গা গা -া I গা -া গা । গা গা -মা I
হি মে র রা তে • ঐ • গ গ নে র্

I রগা -রা গা । গা গা -পা I পগা পমা -া । গা রসা -ন্া I
দী প্ গু লি রে • হে ম ন্ তি কা •

I সা -া গা । মা পা -া I সা সগা -া । মা পা -া II
ক র্ ল গো প ন্ আঁ চ ল্ ঘি রে •

মেয়েলি ও পুরুষালি

বঙ্গনারী

নরনারীর মানসিক বিভিন্নতায় যে প্রবচনগুলি প্রচলিত তাহা প্রধানতঃ শিক্ষিতাশিক্ষিতের মনের তফাৎই নয় কি? মেয়েদের যে সহজ-বোধের কথাও এত শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাও কি অনেকটা তাই নয়? মেয়েরা ভদ্র ও শিক্ষিতবংশে জন্মলাভ ও শিক্ষিত ভদ্রের মধ্যে অবস্থান করিয়াও অশিক্ষিত থাকে বলিয়া উত্তরাধিকার-সূত্রে কতকটা মানসিক ক্ষমতা এবং শিক্ষিতাবেষ্টনীর সূক্ষ্ম, মার্জ্জিতভাব লাভ করিয়া থাকে। বিনাশিক্ষায় তাহার ব্যবহার করিতে হইলে উহা সহজ-বোধই হইয়া উঠিতে বাধ্য। তারপর যুগযুগান্ত শিক্ষিত-জ্ঞানে বঞ্চিত থাকিয়া উহার ব্যবহারই করিয়া আসিতে থাকায় সহজ-বোধই তাহাদের কিছু বেশী বিকাশ পাওয়া সম্ভব। মেয়েদের আদিম অস্পষ্ট ভাবের কথাও যে বলা হয়, তাহাও অশিক্ষিত অমার্জ্জিত শক্তি মাত্র। শিক্ষাবিহীন হইয়া মেয়েরা কেবল এইভাবের রুদ্ধশক্তি হইয়া আছে। কিন্তু মেয়েদের এই যে ভয়াবহ শক্তি ইহা অশিক্ষিত পুরুষেই বেশীমাত্রায় নাই কি? এমন কি পুরুষেরও সকলেরই মধ্যে কিছু না কিছু আদিম অযৌক্তিকতা আছে,—গায়ের জোর যেখানে যুক্তিতর্কাতীত-ভাবে আসিয়া পড়ে। মানুষের মধ্যে যে তাহার বর্ব্বর পূর্ব্বতনদিগের রক্ত রহিয়াছে ইহা তাহারই চিহ্ন।

সহজ-বোধ অবশ্য আবার সব জ্ঞানেরই ভিত্তি। তাহা না থাকিলে যুক্তিতর্কেও কোন বিষয়ের সত্যানুভূতি জাগাইতে পারে না। তাই কোন বিষয় লইয়া তর্ক আরম্ভ হইলেই বোধ সম্বন্ধে আর কোন আশা থাকে না। তবে যুক্তিতে বোধের স্বরূপ প্রকাশ করে সন্দেহ নাই। তাহার অভাবে বোধ অস্পষ্ট, অব্যবহার্য্য ভাবমাত্র থাকিয়া যায়। মনকে আলোকিত করিয়া নব নব জ্ঞানাবিষ্কারের কাজে লাগিতে পারে না। তাহাতে ক্ষণপ্রভার দীপ্তি থাকিলেও মনের অন্ধকার দূর হয় না। অনেক বাহুল্য, ভাবালুতা ইত্যাদি আগে পুরুষেরও ছিল, এবং এখনও নাই এমন নয়। তবে বুদ্ধিবিদ্যার বিস্তার ও কালের হাওয়া-বাতাসের পরিবর্ত্তনের সহিত তাহা ঝরিয়া পড়িতেছে। এইবার মেয়েদের মধ্যেও সেই পরিবর্ত্তনটা আসিতেছে মাত্র। ইহা পুরুষালিত্ব নয়,—শিক্ষা ও মানুষের রুচির পরিবর্ত্তনের ফল। অনেক তথাকথিত মেয়েলিপনাই অশিক্ষিতভাব, ন্যাকামি, আহ্লাদেপনা, ভাবালুতা, মনের দুর্ব্বলতা, ইত্যাদির নামান্তর। অশিক্ষার সঙ্গে মেয়েদের সম্বন্ধ এমনিই জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে যে এইগুলিই মেয়েলিত্বের অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে। তাই শিক্ষিতাদেরও তাহা কায়দা করিয়া করিতে হয়। এবং করিতে করিতে অবশেষে তাঁহাদেরও উহা স্বভাবের অঙ্গ হইয়া পড়ে। কতক আবার মেয়েদের শোচনীয় অবস্থার ফল। এগুলি গেলে মেয়েলি, পুরুষালি বলিয়া দুই বিপরীত ব্রহ্মাণ্ডের বস্তুর নিদর্শন অল্পই পাওয়া যাইবে।

বাস্তবিক মেয়েলি, পুরুষালি বলিলেই ত হয় না।—স্বাধীনতা, ধন, স্বাস্থ্য, বিদ্যা, বুদ্ধি, ও তাহার চর্চ্চার ক্ষেত্র, আনন্দ, সম্মান, প্রতিপত্তি, ক্ষমতা ইত্যাদি জগতের কাম্য-জিনিষগুলি সকল মানুষেরই বাঞ্ছনীয়। শূদ্রদের শূদ্র বলিয়া এতদিন এগুলি হইতে হটাইয়া রাখা হইত, এখন মেয়েদের সম্বন্ধেও তাহাই চলিতেছে মাত্র। তবে সংস্কার-বশে তাহার প্রকৃত কারণ অবশ্য কাহারই চোখে পড়ে না; অধিকন্তু সবই খুব ন্যায্য, সঙ্গত ও সদ্ভাবপূর্ণ বলিয়াই বোধ হয়।

পুরুষের মধ্যে যেগুলি মেয়েলিপনা এবং মেয়েদের মধ্যে যেগুলি পুরুষালিত্ব বলিয়া নিন্দিত হয়, তাই দেখিলেই ত ঐ স্বতন্ত্ররকমের মেয়েলি, পুরুষালি জিনিষগুলি যে কি স্তরের তাহা প্রকাশ পায়। এ সব দেখিয়াও কি নরনারীকে শুধু মেয়েলিত্ব বা পুরুষালিত্ব লইয়াই থাকিতে বলা যায়?

মেয়েরা যাহা কিছু করিতে গেলেই এই যে পুরুষালির গালি উঠে, এতকাল হইতে মেয়েরা যে "মেয়েলি" হইয়াই রহিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের চোখ খুলিতেছে বলিয়াই লোকের দৃষ্টিও সেইদিকে পড়িতেছে না কি? যাহাকে শ্রদ্ধা, সম্মান করিয়া থাকি, তাহার নিজস্ব বিষয়গুলিও সহজেই আমাদের শ্রদ্ধা, সম্মান লাভ করে। মেয়েদের হীনাবস্থার মধ্যে তাঁহাদের নিজস্ব বিষয়গুলিও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া থাকায় মুখে যতই বলা হউক, এতদিন প্রকৃত সম্মান পায় নাই। নারীর প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটিলেই তাঁহার সংক্রান্ত বিষয়গুলিরও মর্য্যাদা বৃদ্ধি পায়। বিদ্যা, বুদ্ধি, দক্ষতার দ্বারা তিনি সেগুলিকে তাহার উপযুক্তও করিয়া তুলিতে পারেন। পাশ্চাত্যবিদ্যা যেমন যতই আমাদের আয়ত্ত হইতেছে, দেশীয় বিদ্যার মর্ম্মও আমরা ততই বুঝিতেছি এবং তাহা ততই নিখিল মানবেরও সমাদরের বিষয় হইয়া উঠিতেছে।

তারপর বিজ্ঞান যে পাশ্চাত্য জিনিষ, তাহাও কি পাশ্চাত্যেই থাকিতেছে না থাকিবে? আমরাও কি তাহাকে আপনার করিয়া লইতেছি না। তবুও হয়ত পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানের এবং আমাদের তত্ত্ববিদ্যার বিশেষত্ব থাকিতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া কি প্রাচ্যজাতি বিজ্ঞান বা পাশ্চাত্যজাতি তত্ত্ববিদ্যার আলোচনায় বিরত থাকিবে? বর্ত্তমানে উভয়ের আদান প্রদানই বরং কি বেশী আবশ্যক হইয়া পড়ে নাই? নরনারীর মধ্যেও পরস্পরের গুণকর্ম্মের যোগ হওয়া তেমনি প্রয়োজনীয় হইয়াছে।

মেয়েরা যে পরিমাণে জগতের সর্ব্বত্র আপনাদের প্রসারিত, প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন সেই পরিমাণেই তাহা ত আপনিই মেয়েলি হইয়া উঠিবে। মেয়েলিত্ব কি মেয়ে হইতে স্বতন্ত্র কোন অদ্ভুত জিনিষ? তাঁহাদের আটকাইলেই সব অন্তরেও পীড়াকরভাবে পুরুষালি হইয়া পড়ে। এখন তাহা ক্রমেই সর্ব্বত্র পরিস্ফুট হইতেছে। এদিকে ঘর মেয়েলিত্বের কাদায় পচিয়া থাকিলেও সত্যই কিছু মেয়েলি নয়। কারণ তাহাও সম্পূর্ণ পুরুষ-শাসন-নিয়ন্ত্রিত এবং তাহারই সুখ, সুবিধা ও বাসনানুসারে গঠিত, পরিচালিত। জগতে নরনারীদ্বয়ের আবশ্যকতা পরস্পরের স্বাধীন যোগ ও একতাতেই মাত্র পূর্ণ হওয়া সম্ভব। তাহাতে আপনিই সব বিশ্বমানবতায় সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। কিন্তু স্বাধীনতা ও সমান স্থান লাভ ভিন্ন সহযোগের যে কোনই মূল্য নাই, তাহা আমাদের দেশের লোকেরই আরও ভাল বুঝিবার কথা। কারণ তাঁহাদেরও সাম্যের সহযোগের জন্য প্রভুশক্তির সহিত যুঝিতে হইতেছে। ইহার অভাবেই এতদিনকার নরনারীর সহযোগও সত্য হইতে পারে নাই। আর সকলবিষয়ে সমগ্রতা, সম্পূর্ণতার জন্য নরনারীর যোগ ও সহায়তা ত আবশ্যকই, ব্যক্তিগতভাবেও নিজস্বত্বের সহিত নরনারীর প্রত্যেকে অপরের বলিয়া অভিহিত সদ্‌গুণগুলি যত আয়ত্ত করিতে পারে, ততই সে শ্রেষ্ঠতা, পূর্ণতা লাভ করিয়া থাকে। পুরুষের কীর্ত্তিতে মেয়েদের শক্তি, সাধনা ও ত্যাগ অপ্রকাশ থাকিয়াও অবশ্য যথেষ্টই কাজ করিয়াছে। সেইজন্য সভ্যতা কেবল পুরুষের সৃষ্টি একথা সত্য নয়। কিন্তু ঐরকম দাসত্বগন্ধী, কেবল নেতিমূলক সাহায্যের সহিত প্রকৃত সহযোগের তুলনা হয় না।

নরনারীর গুণকর্ম্মের মিশ্রণে সব একাকার হইয়া বৈচিত্র্যনাশের অভিযোগও সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মানুষ যখনই জগতকে বোঝে, তখনই আপনাকেও জানিতে পারে বেশী করিয়া। তাই এখন সমস্তই যেমন সর্ব্বমানবের হইতেছে, তেমনি প্রত্যেক জাতির জাতীয়-চৈতন্যও কত বেশী জাগিতেছে! মেয়েদেরও তাহাই হওয়াতেই কি এত গণ্ডগোল বাধিতেছে না? ইহাতে আবার এখন সর্ব্বজাতির মধ্যের বাজে জিনিষগুলিও ঝরিয়া যাইতেছে। বিশ্বমানবের সহিত তুলনায় খাঁটি, মেকি ধরা পড়িতেছে বলিয়াই সেগুলি পরিত্যক্ত হইতেছে। অথচ জাতীয় গর্ব্ব, সম্মানবোধ ও নিজের খাঁটি জিনিষগুলির প্রতি শ্রদ্ধা বাড়িতেছে,—লোকে তাহার বেশী মূল্য দিতেছে এবং পাইতেছেও। ইহাতে পৃথিবীর জাতিবৈচিত্র্যের অভাব ঘটিতেছে বলিয়াও ত দুঃখ করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা কি ততটা দুঃখ করিবার মত জিনিষ? আগে যে পৃথিবীতে জাতিতে জাতিতে বিষম ভেদ ছিল, তাহাতে কি মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্দ, আত্মীয়তা বেশী ঘটিয়াছিল?

বঙ্গনারী

এখন বাহিরের ভেদ তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই সকলে সকলের সম্পদ বেশী পাইতেছে, দিতেছে, বুঝিতেছে ও চিনিতেছে না কি? খালি ভেদই ত আর সব নয়, ভেদের মধ্যে পদার্থ থাকা চাই,—অন্যকে দিবার মত শক্তি, সম্পদও চাই। আবার অন্যের সম্পদ গ্রহণ করিবার, বুঝিবার মত ক্ষমতাও তাহাতে চাই। প্রকাশ পাইবার ক্ষেত্র পাইলে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যই জগতকে যথেষ্ট বৈচিত্র্য দান করে। জাতীয় বৈচিত্র্যও তাহাতে লুপ্ত হয় না। তারপর নরনারী কিছু আর ভিন্নজাতীয়ও নয়। এক ছাঁচে ঢালিয়া মেয়েদের সকল বৈচিত্র্য ও সম্ভাবনাকে এতদিনই ত বরং মারিয়া ফেলা হইত। এখন তাহা প্রকাশ ও বিকাশের সুযোগ পাইলে বিচিত্রতায় তাঁহারা অনেক বেশী সম্পন্নই হইয়া উঠিতে পারিবেন।

অন্যের দুই চারিটী মন্দও যদি দেখা যায়, তাহাই প্রধান কথা নয়। যে দোষ যেখানে দেখা অভ্যাস সেখানে তাহা চোখে পড়ে না। অন্যত্রও দেখা গেলেই তাহার মন্দত্ব সম্বন্ধে চৈতন্য জন্মিয়া সে দোষটী দূর হইবার সম্ভাবনা ঘটে। এদিকে যেখানে যাহা দেখা অভ্যাস নাই, সেখানে তাহা দেখিলেই তাহার সম্বন্ধে যে অযথা অন্যায় বিচার হয় তাহাও কমিয়া থাকে। সুতরাং যতই দুঃখের বিষয় হউক ইহাতেও ন্যায় ও সত্যদর্শনে সাহায্য করে।

ভাল-মন্দর বিষয়ে আর একটা কথাও মনে রাখিতে হয়। মানুষমাত্রই চিরদিন দোষে, গুণে মিশ্রিত। কিন্তু মেয়েদের বেলাই সকলে তাঁহাদের কাছে নিজের নিজের খোস খেয়াল মতো বিশেষ বিশেষ নির্জলা গুণরাজিই চাহিয়া থাকেন,—আর তাহা না পাইলেই চটিয়া উঠেন। এইজন্য এতদিন এত আটকাইয়া, বেড়া দিয়া, জন্মাবধি পাখী পড়াইয়াও মেয়েদের শুধু এক ধরণের ভালমাত্রই করিতে না পারিয়া স্তবস্তুতির পাশাপাশিই মেয়েদের সম্বন্ধে এত ঘৃণা ও নিন্দার উদ্গারও চলিয়া আসিতেছে। যে কোন অবস্থাতেই মেয়েদের কেবল ভাল চাহিতে গেলে নিরাশ হইতে হইবেই;—কারণ তাহা সত্য নয়। বিধাতা নরনারীকে একই কাঠামোতে গড়িয়া ফেলিয়াছেন যে।

নরনারীর মনের কাজ সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয় বলিয়াও শোনা যায়। কিন্তু তাঁহাদের মন ও অনুভূতির বিশেষ আকাশ, পাতাল পার্থক্যের পরিচয় ত পাওয়া যায় না। উভয়েই একই কারণে আনন্দ ও বেদনা বোধ করিয়া থাকেন। একের পক্ষে যাহা দুঃখ, অপরের পক্ষে তাহা সুখে পরিণত হইতেও দেখা যায় না। যে ক্ষেত্রে তাহা হইতেছে মনে হয়, সেখানেই গলদ আছে। ভিন্নতা কেবল মেয়েদের মাতৃত্বে। অন্য ভেদের মধ্যে তাঁহাদের শারীরিক শক্তি কিছু কম। সেইজন্য বলিষ্ঠ পুরুষের মতো বলসাধ্য কাজ তাঁহারা করিতে পারেন না। কিন্তু তাহাতেও দেখা যায়, যথাযথ অনুশীলিত হইলে শারীরিক ক্ষমতাও তাঁহাদের যথেষ্টই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। তখন তাহা অনেক পুরুষের সমান বা অনেকের অপেক্ষা বেশীও যে হয়না, এমন নয়। শারীরিক ক্ষেত্রেও তাই জাতিগত ভেদ অপেক্ষা ব্যক্তিগত ভেদও বড় কম নয়। শারীরিক কাজকর্ম্ম যাহা কিছু করিতে গেলেও নরনারীকে একভাবেই করিতে হয়। সুতরাং মানসিক কাজের সম্বন্ধেও ইহার ব্যতিক্রমের কারণ নাই। সব বিষয়ে স্বাধীন স্ফূর্ত্তিলাভ করিবার ক্ষেত্র পাইয়াও যে যেমন থাকিবে তাহাই স্বাভাবিক। কাহাকেও আটকাইয়া বেড়া দিয়া রাখিবার অধিকারও যেমন কাহারও নাই,—তাহা তেমনি অস্বাভাবিকও।

অনেকে রাষ্ট্রসমাজে মেয়েদের সমান আসনের কথা বলিয়াও তাঁহাদের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জীব করিয়া রাখিতে চান। আমাদের ঠাকুরমাদের ইঁহারা তবে ব্যবস্থাপক সভায় বসিতে দিবেন ত? মেয়েদের শিক্ষা, স্বাধীনতা সম্বন্ধে লোকের যখন কোন ধারণাই ছিল না, তখন কিন্তু ঠাকুরমা ছাড়া আর কিছুই যে তাঁহারা হইতে পারেন, ধারণা করিতে না পারিয়া ঐ অবস্থায় তাঁহারা পার্লামেন্টে আসিলে ব্যাপারটী যে কেমন হইবে তাহাই লইয়া বিলাতে হাসি-তামাসা চলিত। এখন আবার সেই ভাবকেই মেয়েলি বলিয়া সব বিষয়ে মেয়েদের সেই অবস্থার মধ্যেই সকলে ফিরাইতে চাহিতেছেন।

এই যে মেয়েদের আলাদা জন্তু করিয়া গড়িবার চেষ্টা ইহাই হইল আসল ভিতরের কথা। ফ্রান্সে

কিন্তু এখন মেয়েদের ভোট না দেওয়ার একটা কারণ শোনা যাইতেছে যে মেয়েরা বেশী যাজকপন্থী। ফরাসী গভর্ণমেণ্ট এখন শিক্ষাবিভাগাদি লইতে যাজকতন্ত্রতা উঠাইয়া দিতেছেন বলিয়া মেয়েদের হাতে ক্ষমতা দিতে ভয় পাইতেছেন। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে নরনারী মিলিয়া কিছু করিতে হইলে তাঁহাদের মনের সমতা চাই।

মেয়েরা জগদ্ব্যাপার কিছু না জানিলে, বুঝিলে, কি পুরুষেরা তাহাদের কথা শুনিবেন?—না, শুনিবার উপযুক্ত কথা তাঁহারা বলিতেই পারিবেন? পুরুষের বলিয়া অভিহিত বিষয়গুলি জানিলেই ত তবে মেয়েরাও পুরুষকে বুঝিবেন—আপনাদের এবং আপনাদের বিশেষ বিষয়গুলিও আবার পুরুষকে বোঝান ততই তাঁহাদের সম্ভব হইবে। এখন মেয়েরা জগতের জ্ঞান, কর্ম্ম আনন্দের ক্ষেত্রে আসিতেছেন বলিয়া তাঁহাদের পুরুষালি বলা হইতেছে। কিন্তু মেয়েরা নিজে ভাবিতে আরম্ভ করায় এখনই বরং জগত মেয়েলি ভাব ও চিন্তার পরিচয় কিছু পাইতেছে না কি? এতদিনই ত তাঁহারা কেবল পুরুষালি ভাব ও চিন্তা লইয়াই ছিলেন। মেয়েলি ভাব ও চিন্তা একেবারেই অপ্রকাশ ছিল। এ বিষয়ে আমাদের ও পাশ্চাত্য মেয়েদের লেখা দেখিলে হয়। আমাদের লেখিকাদের অল্পেরই মন খুলিতে পারিয়াছে বলিয়া তাঁহাদের বেশীর ভাগ, পুরুষেরই প্রতিধ্বনি করিয়া থাকেন, নিজেদের কোন বিশেষত্বের পরিচয় দিতে পারেন না। এমন কি এতদিনে তাঁহারা এখনকার পুরুষদেরও নয়, সেকেলে পুরুষালি মত ও ভাবেরই পুনরাবৃত্তি করিয়া থাকেন। কিন্তু পাশ্চাত্য মেয়েরা তথাকথিত পুরুষালি অনেক বেশী হইলেও তাঁহাদের মধ্যেই মেয়েলি মত ও চিন্তার প্রকাশ বেশী হইতেছে। তবে মেয়েরা লিখিতে বা কিছু করিতে গেলেই তাহা পুরুষের অপেক্ষা কতটা ভিন্ন তাহাই অবশ্য প্রধান কথা নয়,—উৎকর্ষ্যের পরিমাণের উপরই তাহার মূল্য নির্ভর করে।

এমন সব প্রত্যক্ষ বিষয়ও তর্ক করিয়া বলিতে হয়!

মাড়োয়ারী

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

আমি চিনিগো চিনি তোমারে ওগো মাড়োয়ারী
তুমি আছ বিশ্বজুড়ে, ওগো মাড়োয়ারী।
তোমায় দেখেছি সাগরপারে
তোমায় দেখেছি মরু-কিনারে
তোমায় দেখেছি বড়বাজারে, ওগো মাড়োয়ারী।
আমি আশাতে পাতিয়া হাট
কিনেছি কিনেছি তোমারি পাট,
আমি তোমারে সঁপেছি মাঠ, ওগো মাড়োয়ারী।
বাজার ভ্রমিয়া শেষে
আমি এসেছি খাতক বেশে,
আমি যাচক তোমারি দ্বারে, ওগো মাড়োয়ারী।

বিবিধ সংগ্রহ

সিংহলের বৌদ্ধস্তূপ

ভগবান্ বুদ্ধের কোন কল্পিত স্মৃতিচিহ্ন প্রোথিত করিয়া তাহার উপর বিরাট ইষ্টকের স্তূপ নির্ম্মাণ করা প্রথম আরম্ভ হয় যখন বৌদ্ধধর্ম্ম পৃথিবীময় বেশ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই ধরণের স্মৃতি মন্দিরগুলির মধ্যে বর্ম্মার প্যাগোডাই সব চেয়ে লোক-প্রসিদ্ধ। প্যাগোডা দেখিতে ঠিক ঘণ্টার মত; মাথায় দীর্ঘ চূড়া এবং ছত্র আছে। সিংহলের দাগোবার নাম অনেকেই হয়ত জানেন না। দাগোবার স্মৃতিমন্দির কিন্তু দেখিতে প্যাগোডার মত নহে। ভারতবর্ষের সাঞ্চীতে ও অন্যান্য জায়গায় যে সকল বৌদ্ধস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায় দাগোবার আকৃতি কতকটা সেইরূপ; অর্দ্ধ-



পলোনা-রোয়ার শুভ্র দাগোবা —কিরি

বৃত্তাকার গোলকের মত। প্রত্যেক দাগোবাতেই যে তথাগতের কোন না কোন অঙ্গাংশ সত্যসত্যই সমাহিত আছে এরূপ মনে করার বিশেষ কারণ নাই; খুব সম্ভব দু একটা ছাড়া আর সব দাগোবাই শুধু শাক্যমুনির উদ্দেশেই রচিত; স্মৃতিমন্দির মাত্র, সমাধি মন্দির নহে।

দাগোবার অস্তিত্ব সিংহলের দুইটি জায়গাতেই আবদ্ধ। প্রথমটি অনুরাধাপুর এবং দ্বিতীয়টি পল্লনারুয়। অনুরাধাপুর খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দী হইতে ৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সিংহলের

"মহাবংশে" আছে রাজা দত্তগামুনি (খৃঃ পূঃ ১০১) বহু পবিত্র স্মৃতি-চিহ্ন জোগাড় করিয়া তাঁহার স্থপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন মন্দিরের আকার কিরূপ হওয়া উচিত। শিল্পী তৎক্ষণাৎ এক জলপূর্ণ স্বর্ণপাত্রে হস্ত নিক্ষেপ করিতেই অনেক বুদ্বুদ্ ভাসিয়া উঠিল। শিল্পী দেখাইলেন ওই বুদ্বুদের মত। প্রথম যখন তৈয়ারী হয় তখন স্তূপগুলি বুদ্বুদের মতই দেখাইত বটে। এখন অনেক দাগোবার ভিত্ বসিয়া গিয়াছে, ইঁট খসিয়া পড়িয়াছে; কোথাও বা



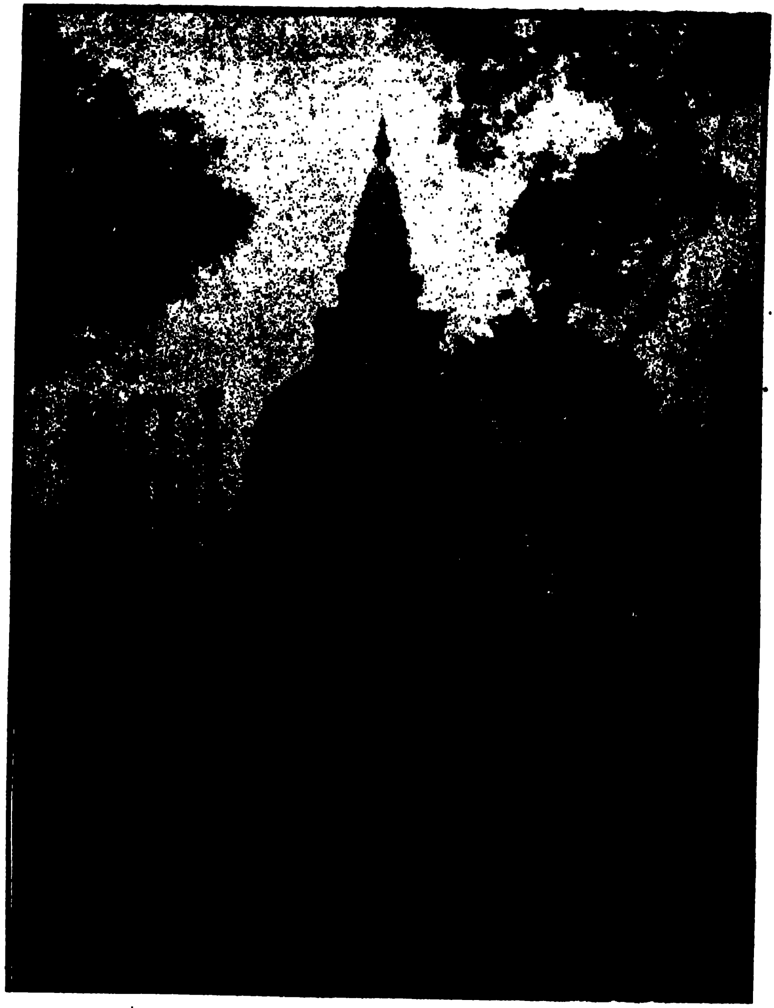
অনুরাধাপুরে বৃহত্তম দাগোবা—জেতবনরাম

রাজধানী ছিল। তার পরে রাজধানী পল্লনারুয়ে স্থানান্তরিত হয়। সিংহলের জাতীয় ইতিহাস "মহাবংশে" এই দুই নগরীর প্রত্যেক দাগোবার নির্ম্মাণকাল, ইতিহাস ও উদ্দেশ্য নির্ভুল ও ধারাবাহিকভাবে লিখিত আছে। ভারতীয় স্থাপত্য সম্বন্ধে আমরা কোথাও এত ঐতিহাসিক তথ্যের একত্র সন্নিবেশ দেখিতে পাই না। সেই হিসাবে সিংহলীয় স্থাপত্য ভারতীয় স্থাপত্যের চেয়ে আমাদের অধিকতর পরিচিত বলিতে হইবে।

জমি সরিয়া যাওয়ার দরুণ সমস্তটাই ইঁটের পাঁজায় পরিণত হইয়াছে। তবু দু একটা বুদ্বুদাকার বিরাট স্তূপ এখনও অটুট আছে; তাহাদের বিপুল আয়তন ও অদ্ভুত গঠন দেখিলে বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়।

অনুরাধাপুর ও পল্লনারুয়ের গৌরবের দিন চিরস্থায়ী হয় নাই। বহু শতাব্দী ধরিয়া মানুষ উহাদের নিশানাই ভুলিয়া গিয়াছিল। সেই বিস্মৃতির যুগে অরণ্য তাহাদিগকে গ্রাস করে। মন্দির, দীঘি, চত্বর, চূড়া, স্তম্ভ, মূর্ত্তি কত ঝোপঝাড়ে

আবৃত হইয়া একেবারে এক হইয়া যায়। তার উপর বনদৈত্য বটের বিপুল শিকড় ইঁটপাথরের বুক চিরিয়া মাটি কামড়াইয়া জমি উল্টাইয়া মানুষের এত সাধের শিল্পরাজ্যে যে অরাজকতা আনিয়াছে, সে কথা আর নাই বলিলাম। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে লুপ্ত নগরী যখন পুনরাবিষ্কৃত হইল তখন জঙ্গল কাটা ও মন্দিরের পুনর্গঠন আরম্ভ হয়। এখন দাগোবাগুলি, দু একটা বাদে, গবর্ণমেন্টের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তত্ত্বাবধানে আছে।

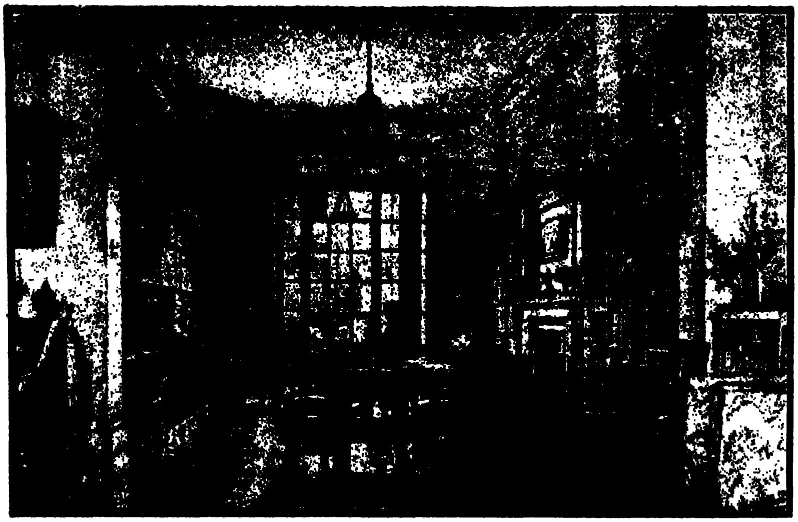


অনুরাধাপুরের দাগোবা—স্থূপারাম।
ইহার মধ্যে বুদ্ধদেবের কণ্ঠার অস্থি নিহিত আছে।

অনুরাধাপুরের দাগোবাগুলির মধ্যে অভয়গিরি ও জেতবানরাম আয়তনে বিশালতম। দুইটিই প্রায় ১৬৫ হাত উঁচু। অভয়গিরি খৃঃ পূঃ ৮৮ বৎসরে নির্ম্মিত হয়। ইহা ঠিক অর্দ্ধ-বৃত্তাকার। ইহার চূড়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে কয়েদীদের পরিশ্রমে পুনঃ-সংস্কৃত হয়। উপরে যাইবার জন্য কয়েদীরা যে পথ কাটিয়াছিল সেই পথ এখনও বিদ্যমান; সেই পথ দিয়া এখনও উপরে যাওয়া যায় এবং ইচ্ছা করিলে দিগন্তপ্রসারী মহানগরীকে নিমেষের মধ্যে নিঃশেষে দেখিয়া লওয়া যায়। জেতবানরাম ২৫৭ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত হয়। আশ্চর্য্য এই, দাগোবা দুইটির নাম পরস্পরের মধ্যে বদল হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ এখন যেটা জেতবানরাম সেইটাই ছিল আগে অভয়গিরি।

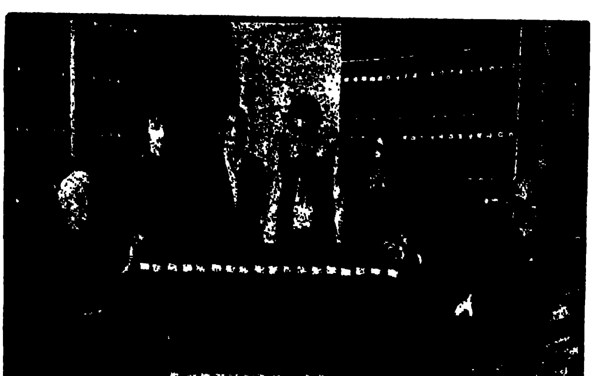
কিন্তু আয়তনে একটু ছোট হইলেও ধর্ম্মমাহাত্ম্যে ও পবিত্রতায় রুয়ানবেলি দাগোবাই শ্রেষ্ঠ। অনুরাধাপুরের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অষ্ট তীর্থের ইহা অন্যতম। শোনা যায় রাজা দত্তগামুনি ইহার ভিত্তির নীচে আটটি সোণার ও আটটি রূপার পাত্র এবং আটটি সোণার ইঁট ও অসংখ্য রূপার ইঁট পুঁতিয়াছিলেন। সুতরাং রুয়াণবেলি অর্থাৎ স্বর্ণরেণু নামটি সার্থক বলিতে হইবে। ভগবান্ বুদ্ধের একটি রত্নখচিত স্বর্ণমূর্ত্তিও নাকি স্মারকচিহ্নরূপে ইহার নীচে প্রোথিত হইয়াছিল। কথিত আছে, চব্বিশ বৎসর রাজত্বের পর

দত্তগামুনি যখন মৃত্যুশয্যায়, রুয়াণবেলির নির্ম্মাণ কার্য্য তখনও শেষ হয় নাই। তাঁহার ভ্রাতা অসম্পূর্ণ অংশের উপর একটি কাঠাম রাখিয়া সমস্তটাকে কাপড় দিয়া জুড়িয়া দিলেন। মুমূর্ষু রাজাকে বাহিরে লইয়া যাওয়া হইল। তিনি প্রস্তর শয্যায় শুইয়া তাঁহার বড় আদরের রুয়াণবেলির সম্পূর্ণ রূপ দেখিয়া ব্রত উদ্‌যাপন করিলেন। রুয়াণবেলির পূর্ব্ব গৌরব এখন আর কিছুই নাই। ভাঙ্গিয়া চুরিয়া এরূপ হইয়া গিয়াছে যে আগে আয়তন বা আকৃতি কিরূপ ছিল কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। যাহা কিছু জানা যায় তাহা "মহাবংশে"র কল্যাণে।



ইট্ লডাইব্রেরীর একদিক

অনুরাধাপুরের আর একটি দাগোবার নাম মিরিশ্বেতীয়। প্রবাদ আছে, দত্তগামুনি একবার মিরিশ্বেতীয় অর্থাৎ লঙ্কার তরকারী রাঁধিয়া লোভের বশে ভিক্ষুদের না দিয়াই খাইয়া ফেলিয়াছিলেন। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য তিনি দাগোবা তৈয়ার করিয়া দিলেন; নাম রাখিলেন মিরিশ্বেতীয়। এখন দাগোবাটির কিছুই নাই; স্তূপটি সম্পূর্ণ গিয়াছে; আছে শুধু বাহিরের খোসাটা। জীর্ণ দেওয়ালের ফাটলে এখন অসংখ্য বাছুড়ের বাসা; তাহারা প্রতি সন্ধ্যায় উড়িয়া ধূমের মত আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া আনন্দবর্দ্ধন করে।



সার রবার্ট, লেডীউ ইট্ ও তাঁহাদের সহকর্ম্মিগণ

থুপরামায় ও লঙ্কারামায় এই দুইটি দাগোবার একটু বিশেষত্ব আছে। ইহাদের স্তূপ অর্দ্ধ বৃত্তাকার নহে; বরং লম্বা, অনেকটা প্যাগোডার মত। আর একটা বিশেষত্ব, এই পাদপীঠের উপরে তিন সারি অনেকগুলি স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। স্তম্ভগুলি সমগ্র পাথরের; দশ হাত হইতে ষোল হাত পর্য্যন্ত উঁচু। এই স্তম্ভগুলি লইয়া অনেক জল্পনা কল্পনা হইয়া গিয়াছে; ইহাদের উদ্দেশ্য কি; ইহাদের উপর ছাদ ছিল কি না, ইত্যাদি ইত্যাদি। কেহ কেহ বলেন উৎসবের সময়ে যখন বুদ্ধাবতারদিগের চিত্র লইয়া শোভাযাত্রা বাহির হইত তখন স্তম্ভগুলির উপর পুষ্পমাল্য টাঙান হইত। কে জানে? হয়ত বা তাহাই।

অনুরাধাপুর হইতে প্রায় আট মাইল দূরে মিহিন্তালে পাহাড় হাজার ফুট উঁচুতে উঠিয়াছে। প্রবাদ আছে, রাজা তিষ্য যখন এই পাহাড়ের উপরে শিকারে মত্ত ছিলেন, তখন বৌদ্ধ প্রচারক মাহিন্দের সহিত তাঁহার দেখা হয়। তিষ্য তৎক্ষণাৎ সপরিষদে বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। তখন হইতে তিষ্যের নাম হইল দেবানাম্পিয় তিষ্য। যেখানে এই স্মরণীয় সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল, সেখানে এখনও একটি দাগোবা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার নাম অম্বস্তালে দাগোবা।

দাগোবার কথা তো অনেক বলা হইল। এখন না দেখিয়া দাগোবার রূপ কি কল্পনা করিয়া লওয়া যাইতে পারে? সেটা বিশেষ শক্ত নয়। প্রথমে বিশ, পঁচিশ, ত্রিশ বিঘা জমি ঘিরিয়া চতুর্দ্দিকে একটা দেওয়াল। দেওয়ালের গায়ে বিশেষ কোন মূর্ত্তি নাই, শুধু এখানে ওখানে দু একটা হাতীর মূর্ত্তি। দেওয়ালের ফাঁকে ফাঁকে দরজা ও প্রশস্ত সিঁড়ি। সিঁড়ি বাহিয়া উপরে গিয়া প্রকাণ্ড পাদপীঠ। পাদপীঠের উপর বিরাট অর্দ্ধ বৃত্তাকার স্তূপ। স্তূপের উপর চূড়া। স্তূপের গায়ে কোথাও বা চারি কোণে চারি বুদ্ধের চারিটি সিংহাসন; আর কোথাও বা পাদপীঠের উপর সারি সারি স্তম্ভ। তাহার উপর কল্পনা করা যাক্ সমস্তটা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গাছপালায় কণ্টকাকীর্ণ; আর বর্ত্তমান সিংহলীয় বা গবর্ণমেণ্টীয় রুচিতে পুনর্গঠনের ব্যঙ্গপ্রয়াস। ইহাই হইল বর্ত্তমানে দাগোবার চিত্র।

শ্রীঅমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

উইট্ লাইব্রেরী

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ



উইট্ লাইব্রেরীতে রক্ষিত একখানি চিত্রের সংস্কারের পূর্ব্বের অবস্থা

উইট্ লাইব্রেরী

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে মোরেলি প্রবর্ত্তিত চিত্রের তুলনায় সমালোচনামূলক গবেষণা পদ্ধতির উপকারিতা এত বাড়িয়া উঠিয়াছে যে এই বিদ্যার অনুশীলনকারীদের এমন এক স্থানের প্রয়োজন হইয়াছে যেখানে সুবিধা মত নানা প্রকার চিত্র বা তাহার কোন প্রকার প্রতিলিপি দেখিতে পাইবার সুযোগ পাওয়া যায়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিলাতে সার রবার্ট উইট্ ও তাঁহার পত্নী ন্যাশন্যাল আর্ট কলেকশন ফাণ্ড্ নামে এক ধনভাণ্ডার স্থাপন করেন। সার রবার্ট ইহার সভাপতি। এই ভাণ্ডারের অর্থে তাঁহারা বিলাতে পোর্ট্ম্যান স্কোয়ারে "উইট্ রেফারেন্স্ লাইব্রেরী অব্ পিক্চার্স্" নামে এক চিত্রশালা স্থাপন করিয়াছেন। এই দম্পতি তাঁহাদের বিবাহের পর স্থির করেন যে তাঁহাদের সমস্ত অবসর তাঁহারা এই চিত্রশালার



সংস্কারের পর

উন্নতির জন্য নিয়োগ করিবেন। এই কার্য্যে তাঁহাদের পুত্র ও বহুসংখ্যক যুবক বিনা পারিশ্রমিকে তাঁহাদের সহায়তা করিতেছেন। একাদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য দেশসমূহের সমস্ত উল্লেখযোগ্য চিত্রের প্রতিলিপি সংগ্রহ করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য। আজ পর্য্যন্ত তের হাজার চিত্রকরের প্রায় সার্দ্ধ দুই লক্ষ চিত্রের প্রতিলিপি তাঁহারা সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রত্যেক প্রতিলিপির সহিত মূল চিত্রের রচয়িতার নাম, চিত্রের আকার, রচনার তারিখ এবং সেই সম্বন্ধে যতরকম সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে এইরূপ সমস্ত তথ্য যথাসম্ভব নির্ভুলভাবে রাখা হইয়াছে। যে সকল চিত্রের সংস্কার করা হইয়াছে তাহাদের পূর্ব্বের অবস্থা এবং সংস্কারের পরের অবস্থা উভয়েরই প্রতিলিপি তাঁহারা রাখিয়াছেন। চিত্রের সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িয়া উঠিতেছে। বহুসংখ্যক লোক প্রতিদিন এই লাইব্রেরীতে আসিয়া গবেষণা করেন। সার রবার্ট ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ নানা প্রকারে তাঁহাদের সাহায্য করেন। প্রতিলিপিগুলি রাখিবার এমন সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে যাহাতে কোনও চিত্রকরের যে কোনও চিত্রের প্রতিলিপি এবং সে বিষয়ে সমস্ত তথ্য দুই মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে বাহির করা যাইতে পারে। এই অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া নু্যইয়র্কে মিস ফ্রিক্ এইরূপ একটী চিত্রশালা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাহার নাম, "পিক্‌চার্ রিপ্রোডাক্‌শন্ লাইব্রেরী।"

মানুষ নির্ম্মিত গুহা

ব্যাল্‌ডেসেয়ার ফরেষ্টেয়ার নামে এক ইতালীয়ান কালিফর্নিয়ার ফ্রেস্‌নো সহরের নিকটে প্রায় দশ একার জমি লইয়া মাটির নীচে গুহা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন। এই গুহার মধ্যে তিনি ষাট্‌টি ঘর করিয়াছেন, তাছাড়া কমলা লেবু, পিচ ইত্যাদি নানা প্রকার ফলের বাগান করিয়াছেন। আমাদের দেশে পশ্চিমাঞ্চলে যেমন তয়খানা আছে এই গুহা মধ্যে ঘরগুলি প্রায় সেই প্রকারের। খুব বেশী গরম বা খুব বেশী ঠাণ্ডার সময়ে গুহার মধ্যের আবহাওয়ার বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় না, সেই জন্য ফল ইত্যাদির বাগানের পক্ষে খুব সুবিধাজনক। ঘরগুলির মধ্যে আলো ও বাতাস প্রবেশের সুবন্দোবস্ত আছে। গুহার মধ্যে মোটার লইয়া যাবার রাস্তা আছে। রাস্তাগুলির দুই ধারে সারি সারি নানা প্রকার ফলের গাছ। ফরেষ্টেয়ারের ইচ্ছা আছে আরও জমি লইয়া গুহার আয়তন বৃদ্ধি করিয়া তার মধ্যে হোটেল, নাচঘর ইত্যাদি স্থাপন করেন। এই গুহার মধ্যে ফরেষ্টেয়ার প্রায় কুড়ি বৎসর যাবৎ বাস করিতেছেন।

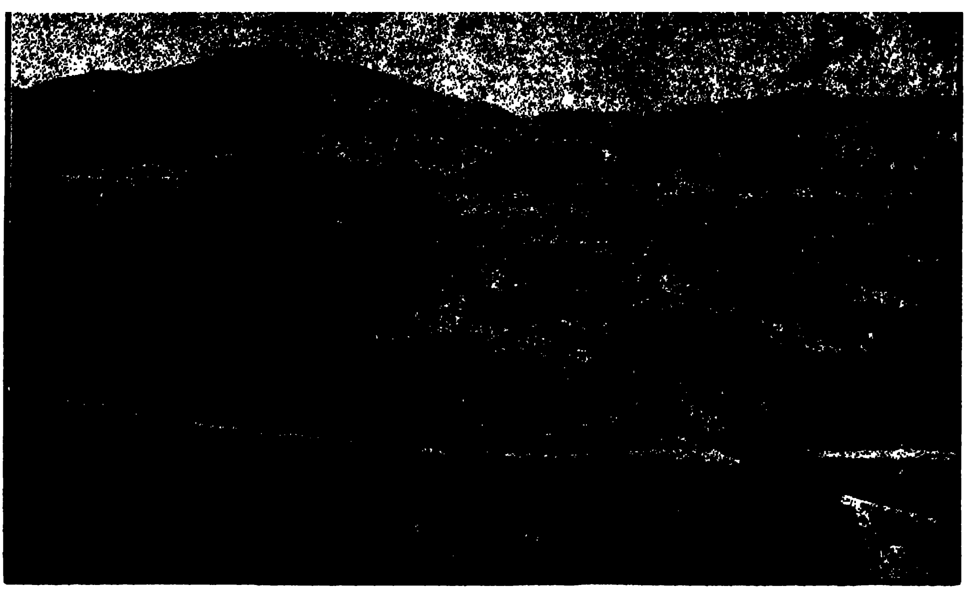
শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ



দক্ষিণ টিউনিসিয়ায় ট্রোগ্লো ডাইটের বাসস্থান

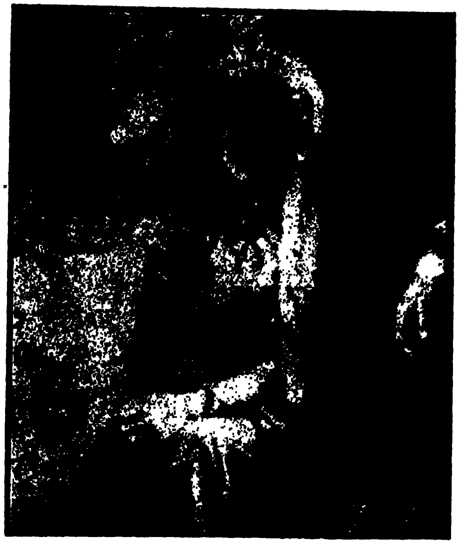
ট্রোগ্লো ডাইট.

পুরাতন কার্থেজ হইতে প্রায় তিনশত মাইল দক্ষিণে মাটমাটা পর্ব্বতে ট্রোগ্লো ডাইট নামে এক জাতি পর্ব্বত কন্দরে বাস করে। পর্ব্বত কন্দরে বাস করে বলিয়াই উহাদের ঐ নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের সম্বন্ধে যতটুকু ইতিহাস সংগ্রহ করিতে পারা গেছে তাহা হইতে জানা যায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ পাহাড়ের নীচে তাঁবুর মধ্যে বাস করিত। সিজারের সৈন্য কার্থেজ আক্রমণের পর যখন আরও দক্ষিণে অগ্রসর হয় সেই সময়ে ইহারা পর্ব্বত কন্দরে আশ্রয় লয়। সেই অবধি এই ভাবেই বাস করিতেছে। পাহাড়ের পাথরগুলি কোনটা ছাদের মত কোনটা পাঁচিল ইত্যাদি নানা প্রকারে তাহারা ব্যবহার করে। ইহারা মুসলমান, সেই জন্য স্ত্রীলোকদিগের জন্য আব্রুর বন্দোবস্তও আছে। ঘরের মধ্যে আসবাব কিছুই নাই, একধারে শয়ন করিবার স্থান। ভূমি হইতে তিন ফুট উচ্চে



ট্রোগ্লো ডাইটের কূপগৃহ

এক কাঠের তক্তা তাহার উপর খান কয়েক মোটা কম্বল, ইহাই তাহাদের শয্যা। এই কম্বল তাহাদের স্ত্রীলোকদের হাতে বোনা। ঘরের আর এক ধারে আর একটি উঁচু স্থান বসিবার জন্য। স্ত্রীলোকরা যে ঘরে বাস করে প্রত্যেকটির মধ্যে একটি করিয়া তাঁত আর নানা প্রকারের আচারের পাত্র। প্রত্যেক বাড়ির সম্মুখভাগে পাথরের পাঁচিল ঘেরা প্রশস্ত উঠান। এই উঠানগুলি স্ত্রীলোকদের আক্রম সাহায্য করে, শস্য রাখিবার গোলার মতও ব্যবহৃত হয়, তাছাড়া তাহাদের পালিত ছাগ, মেষ, কুক্কুট ইত্যাদিও রাখা হয়। কখনও কখনও ২।১টা উটও থাকে। প্রয়োজন হইলে শত্রুদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য দুর্গরূপেও ব্যবহৃত হইতে পারে।



ট্রোগ্লো ডাইট্‌ সুন্দরী

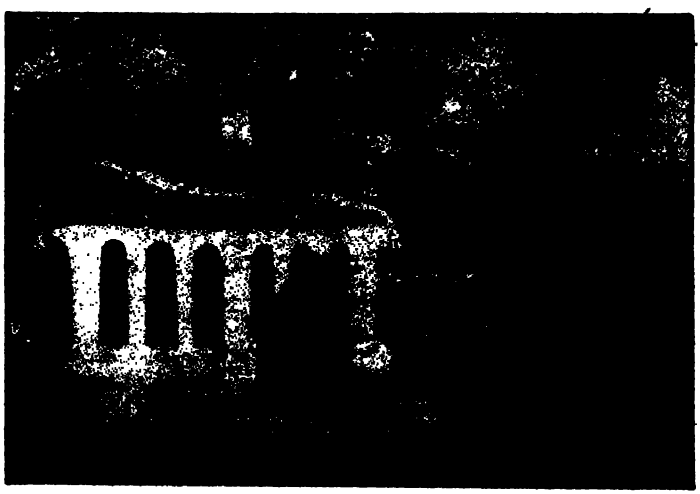
এই দুর্গের মত পাহাড়গুলি হইতে নিকটস্থ অন্যান্য পাহাড় ও সুদূরে উপত্যকার দৃশ্য ভারি সুন্দর। বিশেষতঃ সূর্য্যাস্তের সময়ে। সেই সময়ে নানা প্রকার রংএর খেলা ঐ পাহাড়গুলির উপর দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহাদের আর এক দল দক্ষিণ টিউনিসায় মেডে-নাইন নামক স্থানে বাস করে। তাহা-দের বাসস্থানগুলি আর এক ধরণের। সেগুলি সমতল-ভূমির উপর প্রকাণ্ড পাউরুটির মত দেখায়। তোরেগের দস্যু-দিগের হাত হইতে রক্ষা পাই-বার জন্য নাকি এই রকম ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহারা বৎসরের মধ্যে নয় মাসকাল প্রবাসে থাকিয়া কৃষিকার্য্য করে। বৃদ্ধদের গৃহে রাখিয়া যায়। এই বৃদ্ধেরা শরৎ-কালের পানে চাহিয়া থাকে, সেই সময়ে তাহাদের আত্মীয়গণ শস্য লইয়া গৃহে ফেরে।

মেডেনাইন হইতে যাট মাইল দক্ষিণে আর একদল ট্রোগ্লো ডাইট বাস করে। তাহাদের বাসস্থান-গুলি আর এক অভিনব প্রকা রের। ছোট ছোট পাহাড় ঘেরা উপত্যকা, সেই উপত্যকায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কূপ খনন করিয়া তাহার মধ্যে তাহারা জীবন যাপন করে। কূপগুলির ব্যাস ৬০।৭০ ফিট এবং সেগুলি প্রায় ত্রিশ ফিট গভীর। এই উপত্যকার কূপের মধ্যে প্রায় বার হাজার ট্রোগ্লো ডাইট বাস করে। এই জাতি খুব অতিথিপরায়ণ, যে কোনও বিদেশী আগন্তুকের প্রতি তাহারা নানা প্রকারে সহৃদয়তা প্রকাশ করে।

সম্প্রতি ফরাসিরা এই উপত্যকায় তিনখানি পাকা বাড়ি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছে, একটি স্কুল, একটি মস্‌জিদ আর একটি বাজার।

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ



একটি গুহাভ্যন্তরের দৃশ্য



৮

পরদিন প্রত্যূষে চা-পানের সময়ে কমলার মুখমণ্ডলে একটা বিরসতা লক্ষ্য করিয়া দ্বিজনাথ উৎকণ্ঠিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কমল, অসুখ করেছে না কি ?"

মৃদুভাবে মাথা নাড়িয়া কমলা বলিল, "না।"

"তবে মুখ অমন শুক্‌নো কেন ?"

"কই, শুক্‌নো না তো ?"

"সেটা তুমি দেখ্‌তে পাচ্ছ না, কিন্তু আমি পাচ্ছি।"

এবার কমলার মুখে হাসি দেখা দিল ; বলিল, "না বাবা, অসুখ কিছু করেনি,—ভাল আছি।"

দ্বিজনাথ মুখে আর কিছু বলিলেন না, কিন্তু মনে মনে মাথা নাড়িলেন। মুখের কষ্টি-পাথরে হাসির পরীক্ষা হইয়া গেল ; হাসি দিয়া কমলা যে-জিনিষ চাপিতে চেষ্টা করিল, হাসির পৃষ্ঠ-পটেই তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। দ্বিজনাথ স্থির করিলেন, অসুখ বটে,—তবে দেহের নয়, মনের। কিন্তু মানসিক ব্যাধির চিকিৎসক ও ঔষধ সু-প্রাপ্য নহে বলিয়া অতঃপর এ বিষয়ে আর-কিছু আলোচনা ফলপ্রদ নহে বিবেচনা করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

পিতার নিঃশেষিত পেয়ালায় চা ঢালিতে ঢালিতে কমলা বলিল, "বাবা, তোমার কিন্তু দু' পেয়ালা ক'রে চা খাওয়া উচিত হচ্ছে না।"

"কেন ? ডাক্তাররা মানা করেছে ব'লে ?"

"হ্যাঁ।"

পূর্ব্বোক্ত পেয়ালাটা নিজের কাছে টানিয়া লইয়া দ্বিজনাথ উপেক্ষার সুরে বলিলেন, "হ্যাঃ, ডাক্তাররা তো সবই বোঝে ! চিরটাকাল দু' পেয়ালা ক'রে চা খেয়ে খেয়ে স্বভাব দাঁড়িয়ে গেছে, এখন সেটাকে উল্টে দিয়ে প্রাণে মারতে চায় !"

"না বাবা, তাঁরা যখন মানা করেছেন তখন একটু কম ক'রে খাওয়াই উচিত।"

এক চুমুক চা খাইয়া পেয়ালা টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিয়া দ্বিজনাথ বলিলেন, "তাঁরা ত এমন অনেক জিনিষই কম ক'রে খেতে বলেছেন, কিন্তু দিনে ভাত আর রাত্রে লুচি খাবার সময় তোমাদের সে কথা মনে থাকে না কেন ? ডাক্তারের উপদেশ কি শুধু চা'র বেলাই খাটাতে হবে ?"

কমলা বলিল, "ভাত আর লুচি তুমি যত কম খাও এত কম খেতে তাঁরা বলেন নি। কম খেয়ে খেয়ে তোমার শরীর রোগা হ'য়ে যাচ্ছে।"

দ্বিজনাথ বলিলেন, "রোগা হওয়াই ত' ভালো। যত রোগা হব তত ব্লড্‌ প্রেশার্‌ কম্‌বে। একটা যে কথা আছে, না খেয়ে যত লোক মরে তার চেয়ে খেয়ে অনেক বেশী মরে, সেটা আমাদের বাংলা দেশের পক্ষে যেমন খাটে এমন আর কোনো দেশের পক্ষে নয়। আমরা কত জিনিষ খাই তা জান ? আমরা গাল খাই, চড় খাই, কিল খাই, চাপড় খাই, ভূত দেখে ভয় খাই, ধার দিয়ে সুদ খাই, খাবার আটকে বিষম খাই, চৌকাঠ আটকে হোঁচট খাই, দোলায়

উঠে দোল খাই, নদীতে নেমে ঢেউ খাই, মনিবের কাছে তাড়া খাই, শালীর কাছে কানমলা খাই, বিদেশে গিয়ে হাওয়া খাই, এই রকম হরেক রকম জিনিষ খেতে খেতে অবশেষে মরবার সময়ে খাবি খাই।"

বাঙালীর আহার্য্যের সুদীর্ঘ কৌতুকপ্রদ তালিকা শুনিয়া কমলা পুলকিত হইয়া হাসিতে লাগিল; বলিল, "সত্যি বাবা, এত জিনিষ যে নিঃশব্দে আমরা খাই তা এতদিন খেয়াল হয় নি!"

গম্ভীরমুখে দ্বিজনাথ বলিলেন, "তা হ'লে আমাদের ডাল-ভাত একটু কম ক'রে খাওয়া উচিত কিনা?"

কমলা হাসিতে হাসিতে বলিল, "তা হ'লে উচিত বৈকি!"

জশিডি হইতে দুই তিন মাইল দূরে রোহিণী গ্রামে আজ হাটবার; অতি প্রত্যূষ হইতে ক্রেতার স্রোত রোহিণীর দিকে চলিয়াছে। এখন ইহাদের বস্ত্র মধ্যে তহবিল, মুখে উৎসাহ পদক্ষেপে লঘুগতি; কিছুকাল পরে ইহারাই বিবিধ দ্রব্য-সম্ভার বহন করিয়া অলস মন্থর গতিতে গৃহাভিমুখে ফিরিবে। দূরে পাহাড়তলীর পাকদণ্ডী পথ দিয়াও বিভিন্ন গ্রাম হইতে দলে দলে লোক ক্রয় ও বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে হাটের দিকে চলিয়াছে। চতুর্দ্দিকে একটা যেন গতির চিত্র জাগিয়া উঠিয়াছে।

কমলা বলিল, "বাবা, একদিন রোহিণীর হাট দেখ্‌তে গেলে হয়।"

দ্বিজনাথ বলিলেন, "বেশ ত, এর পরের হাটবারেই গেলে হবে। জীবন এলে জিজ্ঞাসা কোরো এর পর হাট-বার কবে।"

জীবন গৃহাধিপতির বেতনভুক্ গৃহরক্ষক।

সাময়িক উত্তেজনা প্রশমিত হইলে তাহার পর চিকিৎসক যেমন রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করে, কন্যার মুখমণ্ডল হইতে মালিন্য অপহৃত হইয়াছে দেখিয়া দ্বিজনাথ তেমনি কমলার ব্যাধি নিরাকরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

"এর মধ্যে সন্তোষের কোনো চিঠি-পত্র পেয়েছ কমল?"

কমলার মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল; এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "না"।

'এর মধ্যে' যে কিসের মধ্যে সে বিষয়ে প্রশ্ন যেমন অনির্ণীত, উত্তরও তেমনি অনভিব্যক্ত। এ প্রশ্ন যে উপ-ক্রান্ত প্রশ্ন, মূল প্রশ্ন নহে, তাহা প্রশ্ন-কারক এবং উত্তর-কারিকা উভয়েরই জানা ছিল।

"সে কবে এখানে আস্‌বে সে বিষয়ে শেষ চিঠিতে তোমাকে কিছু লিখেছিল?"

নিঃশব্দে মাথা নাড়িয়া কমলা জানাইল, লিখে নাই।

রোগের মূল কতকটা ধরিতে পারিয়াছেন মনে করিয়া দ্বিজনাথ বলিলেন, "অনেক দিন সে আসেনি, একবার আস্‌তে লিখে দিলে হয়।"

এবার কমলার দিক হইতে, কথা ত দূরের কথা, কোনো ইঙ্গিত পর্য্যন্ত পাওয়া গেল না; সে নিঃশব্দে পথের লোক-চলাচলের দিকে চাহিয়া রহিল।

দ্বিজনাথ বলিলেন, "আজই না হয় তাকে একখানা চিঠি লিখে দোবো।"

ইহাতেও কমলা কোনো কথা কহিল না, তেমনি নীরবে অন্যদিকে চাহিয়া রহিল।

যে-কথা মনে-মনে সন্দেহ করিতেছিলেন সে বিষয়ে কোনো প্রকারে নিঃসন্দেহ হইতে না পারিয়া দ্বিজনাথ ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন; একটু ঝোঁক দিয়া তিনি বলিলেন, "তুমিই না-হয় একটা চিঠি লিখে দিয়ো না কমল?"

এবার কমলা ফিরিয়া চাহিয়া দেখিয়া বলিল, "আমি লিখব না বাবা, লিখ্‌তে হয় তুমিই লিখো। কিন্তু—" কথা অসমাপ্ত রাখিয়া কমলা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া নীরব হইল।

ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া অধীরভাবে দ্বিজনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু কি?"

মুখ না ফিরাইয়া কমলা বলিল, "আস্‌তে লেখবার দরকার কি বাবা? সময় পেলে তিনি নিজেই ত আস্‌বেন। কোর্ট বন্ধ হবার সময় হ'য়ে আস্‌চে—এখন হয়ত' তিনি কাজে কর্ম্মে ব্যস্ত আছেন।"

একটু চিন্তা করিয়া দ্বিজনাথ বলিলেন, "তা বটে। আচ্ছা, তা হ'লে না হয় থাক্।"

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

টেবিলের একদিকে একটা দৈনিক ইংরাজী সংবাদপত্র পড়িয়াছিল, সেটা টানিয়া লইয়া দ্বিজনাথ পকেট হাতড়াইয়া দেখিলেন চশমা নাই।

"কমল, আমার চশমাটা এনে দাও ত' মা। আমার ঘরের ভিতর টেবিলের উপর আছে।"

কমলা ক্ষিপ্রপদে প্রস্থান করিল, তাহার পর চশমা আনিয়া পিতাকে দিয়া জীবনের নিকট উপস্থিত হইল। জীবন তখন নিজ গৃহ হইতে দুধ দুহিয়া আনিয়া পদ্মমুখীর জিম্মা লাগাইয়া নানা প্রকার ছকে-কাটা ভূমিতে সীজ্‌ন্‌ ফ্লাওয়ার্‌ লাগাইবার জন্য জমি প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত হইয়াছিল।

পিছন দিক হইতে কমলা আসিয়া ডাকিল, "জীবন!"

জীবন খুরপি ফেলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "দিদিমণি!"

"এত লোক কোথায় যাচ্চে?—হাটে?"

"হ্যাঁ দিদিমণি!"

"এত সকালে কেন? অন্য দিন ত' এত সকাল-সকাল যায় না?"

"আজ সকালে হাট দিদিমণি। আগের হাটে জমীদারের ইস্তিহার জারী হয়েছিল।"

"হাটের কাছ পর্য্যন্ত আমাদের মোটর যেতে পারবে?"

"একেবারে হাট পর্য্যন্ত যাবে। যাবেন না কি দিদিমণি?"

"দেখি। যেতেও পারি।"

দ্বিজনাথের নিকট উপস্থিত হইয়া কমলা বলিল, "বাবা, আজই ত' রোহিণী গেলে হয়? জীবন বলছিল মোটার একেবারে হাট পর্য্যন্ত যাবে।"

সংবাদপত্র হইতে মুখ তুলিয়া কমলার দিকে চাহিয়া দ্বিজনাথ দেখিলেন, যে-আকাশ নির্ম্মল হইয়া আসিয়াছিল তাহাতে পুনরায় মেঘের সঞ্চার হইয়াছে; বলিলেন, "তা বেশ ত' চল না।" তাহার পর সহসা ছবি আঁকার কথা স্মরণ হওয়ায় বলিলেন, "কিন্তু বিনয় যে একটু পরে আসবে কমল?"

কমলা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, 'একদিন না হয় ছবি আঁকা না-ই হ'ল। একটা চিঠি লিখে রেখে গেলেই হবে।"

কমলার এ ব্যবস্থা দ্বিজনাথের মনঃপূত হইল না; ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া তিনি বলিলেন, "না, না, সে ঠিক হবে না। বিনয় কোনো দিন দেরি ক'রে আসে না—আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই সে এসে পড়বে। তারপর তাকে শুদ্ধ ধ'রে নিয়ে গেলেই হবে।"

কমলা সবিস্ময়ে বলিল, "বিনয় বাবুকেও আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবে? সে কি ক'রে হবে বাবা? না,—সে ভাল হবে না!"

দ্বিজনাথ কমলার মুখের দিকে চাহিয়া সকৌতুহলে বলিলেন, "কেন কমল, তাতে দোষ কি? এখন ত বিনয়ের সঙ্গে আমাদের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হ'য়ে গেছে, এখন আর আপত্তির কারণ কি?"

কমলা কোনো কথা বলিল না—চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু তাহার মৌনের দ্বারা স্পষ্টই বুঝা গেল যে তাহার ইচ্ছা নহে বিনয় তাহাদের সঙ্গে যায়।

সদানন্দ দ্বিজনাথের প্রশস্ত ললাট ঈষৎ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল—ক্ষণকাল মনে-মনে কত-কি ভাবিয়া তিনি বলিলেন, "কেন মা?—বিনয়ের আচরণে কখনো কিছু অন্যায় পেয়েছ কি?"

দ্বিজনাথের কথায় কমলার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল; প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া সে বলিল, "না বাবা, কখনো না! আমি বল্‌ছি অন্য কথা—আমি বলছি সুবিধে-অসুবিধের কথা।"

দ্বিজনাথের মুখ আবার প্রসন্ন হইল; তিনি উৎসাহভরে বলিলেন, "কোনো অসুবিধে হবে না মা, বরং সুবিধেই হবে। বিনয়ের মত একজন উঁচুদরের শিল্পীর সঙ্গ অবহেলার জিনিষ নয়।"

পিতার আগ্রহাতিশয্যে কমলা পুলকিত হইয়া হাসিয়া ফেলিল; বলিল, "বেশ ত' বাবা, তুমি যদি খুসী হও তো তাই হবে। কিন্তু আমি ভাবছিলাম, রোহিণী একদিন না-হয় বিকেল বেলা গেলেই হবে—আজ ছবি আঁকাই চলুক।"

দ্বিজনাথ বলিলেন, "আচ্ছা বিনয় আসুক, তার পর যা হয় স্থির করলেই হবে।"